তত্ত্ব-বিবেচনী গীতা

॥ শ্রীহরিঃ ॥

বিষয়-সূচী

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়

ষোড়শ অধ্যায়

সপ্তদশ অধ্যায়

অষ্টাদশ অধ্যায়

শ্রদ্ধা নিবেদন

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব। ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব॥
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব। ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব॥
বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দনম্। দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্॥

গীতার মহিমা

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা হল সাক্ষাৎ ভগবানের দিব্যবাণী। তাঁর মহিমা অপার এবং অসীম। গীতার যথার্থ বর্ণনার সামর্থ্য কারোরই নেই। শেষ, মহেশ, গণেশও এঁর মহিমা পূর্ণভাবে বর্ণনা করতে পারেন না। তাহলে মানুষের আর কী কথা ! ইতিহাস পুরাণাদিতে বহুস্থানে গীতার মহিমা কীর্তিত হয়েছে। কিন্তু এঁর যত মহিমা এ যাবৎ বলা হয়েছে, সেই সব একত্র করলেও বলা যাবে না যে এর মহিমা কেবল এইটুকুই। আসল কথা হল, এঁর মহিমা পুরোপুরি বর্ণনা করা যেতেই পারে না। যে বস্তুর বর্ণনা করা যায়, তা তো পরিমিত। কিন্তু, গীতা তো অপরিমিত।

গীতা এক পরম রহস্যময় গ্রন্থ। এতে সমগ্র বেদের সারতত্ত্ব সংগৃহীত হয়েছে। এর রচনা এতই সুন্দর এবং সরল যে সামান্য অভ্যাসের ফলেই মানুষ সহজেই এর অর্থ বুঝতে পারে। কিন্তু এর তাৎপর্য এতই গূঢ় এবং গভীর যে আজীবন নিরন্তর মনন-চিন্তন করলেও এর অন্ত পাওয়া যায় না, প্রতিদিন নতুন নতুন ভাব উৎপন্ন হতে থাকে, তাই গীতা সর্বদা নতুনই থাকে। একাগ্র চিত্তে শ্রদ্ধা-ভক্তিপূর্বক চিন্তা করলে দেখা যায় এঁর পদে-পদে অতি গূঢ় রহস্য নিহিত রয়েছে। ভগবানের গুণ, প্রভাব, স্বরূপ, তত্ত্ব, রহস্য এবং উপাসনার তথা কর্ম এবং জ্ঞানের বর্ণনা যেভাবে এই গীতাশাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে, ঐ ধরনের বর্ণনা অন্য গ্রন্থাদিতে একসঙ্গে পাওয়া খুবই কঠিন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা এমনই এক অনুপম শাস্ত্র যে এঁর একটি শব্দও সদুপদেশ শূন্য নয়। এতে এমন একটি শব্দও নেই যাকে মনোরঞ্জক বলা যায়। এতে যা বলা হয়েছে, তা সবই প্রতিটি শব্দার্থে যথার্থ। সত্যস্বরূপ ভগবানের বাণীতে মনোরঞ্জনের কল্পনা করা হল বস্তুতঃ তাঁর অনাদর করা।

গীতা হল সর্বশাস্ত্রময়ী। গীতায় রয়েছে সকল শাস্ত্রের নির্যাস। একে সকল শাস্ত্রের ভাণ্ডার বললেও অত্যুক্তি হয় না। গীতার যথার্থ জ্ঞান হলে সকল শাস্ত্রের তাত্ত্বিক জ্ঞান আপনা থেকেই হতে পারে। তারজন্য পৃথকভাবে পরিশ্রম করার প্রয়োজন হয় না।

মহাভারতে বলা হয়েছে—**'সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা'** (ভীষ্মপর্ব ৪৩।২)। কিন্তু, এটুকু বলাই পর্যাপ্ত নয়। কেননা, সকল শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়েছে বেদ হতে। ভগবান ব্রহ্মার মুখকমল হতে বেদের আবির্ভাব। আর ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়েছে ভগবানের নাভিকমল হতে। এইভাবে শাস্ত্র এবং ভগবানের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। কিন্তু, গীতা তো স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখ হতে নির্গত। এইজন্য তাঁকে সকল শাস্ত্রের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বললেও অত্যুক্তি হবে না। স্বয়ং ভগবান বেদব্যাস বলেছেন—

গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্ বিনিঃসৃতা॥
(মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ৪৩।১)

'গীতাকেই ভালো করে শ্রবণ, কীর্তন, পঠন-পাঠন, মনন এবং ধারণ করা চাই। অন্য শাস্ত্র-পাঠের কী প্রয়োজন ? কেননা, এই গীতা স্বয়ং পদ্মনাভ ভগবানের মুখকমল হতে নির্গত।'

এই শ্লোকে **'পদ্মনাভ'** শব্দের প্রয়োগ করে মহাভারতকার এই কথাটিই ব্যক্ত করেছেন। তাৎপর্য হল, এই গীতা সেই ভগবানের মুখকমল হতে নির্গত, যাঁর নাভিকমল হতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়েছেন। ব্রহ্মার মুখ হতে বেদ উদ্‌গীত হয়েছে। আর এই বেদই হল সকল শাস্ত্রের মূল।

গঙ্গার চেয়েও গীতা অধিক মাহাত্ম্যপূর্ণ। শাস্ত্রে বলা হয়েছে গঙ্গাস্নানের ফল হল মুক্তি। কিন্তু গঙ্গায় যে স্নান করে সে নিজেই মুক্ত হয়, অন্যদের মুক্ত করার সামর্থ্য তার থাকে না। কিন্তু গীতারূপিণী গঙ্গাতে যে ডুব দেয় সে নিজে তো মুক্ত হয়েই থাকে, অধিকন্তু সে অন্যকেও ত্রাণ

করতে সমর্থ হয়। গঙ্গা তো ভগবানের চরণ হতে উৎপন্ন, আর গীতা সাক্ষাৎ ভগবদ্মুখ হতে উদ্‌গীত। আবার গঙ্গায় গিয়ে যে স্নান করে, গঙ্গাদেবী তাকে মুক্ত করেন। কিন্তু, গীতা তো নিজেই ঘরে ঘরে গিয়ে মুক্তির মার্গ উন্মুক্ত করছেন। এইসব কারণে গীতাকে গঙ্গার চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলা হয়েছে।

গীতা গায়ত্রীর চাইতেও শ্রেষ্ঠ। গায়ত্রীজপের দ্বারা মানুষের মুক্তি হয়, এ তো ঠিকই কথা। কিন্তু, গায়ত্রী জপকারীও নিজেই মুক্ত হয়। আর, গীতার অভ্যাসকারী তো তরণ-তারণ হয়ে যান। যখন মুক্তিদাতা স্বয়ং ভগবানই তাকে তাঁর আপনজন বলে স্বীকার করে নেন, তখন আর মুক্তির কী কথা ! মুক্তি তো তাঁর চরণের ধুলায় নিবাস করে। তিনি তো মুক্তির দানসত্র খুলে দেন।

গীতাকে যদি আমরা স্বয়ং ভগবানের চেয়েও বড়ো বলি তবে তাতেও কোনো অত্যুক্তি হয় না। ভগবান নিজে বলেছেন—

গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে চোত্তমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞানমুপাশ্রিত্য ত্রীংল্লোকান্ পালয়াম্যহম্॥
(বরাহপুরাণ)

'আমি গীতার আশ্রয়ে থাকি। গীতা আমার শ্রেষ্ঠ গৃহ। গীতার জ্ঞানকে আশ্রয় করেই আমি ত্রিলোক পালন করি।'

এতদ্‌ব্যতীত গীতাতে ভগবান মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, যে-কেউ আমার গীতারূপ আদেশ পালন করবে, সে নিঃসন্দেহে মুক্ত হয়ে যাবে (৩।৩১)। শুধু তাই নয়, ভগবান বলছেন যে, যে-কেউ এর অধ্যয়নও করবে, তার দ্বারা আমি জ্ঞানযজ্ঞের মাধ্যমে পূজিত হব (১৮।৭০)। যখন গীতার অধ্যয়নমাত্রেরই এত মাহাত্ম্য, তাহলে যে মানুষ এর উপদেশ অনুসারে নিজেকে তৈরী করবে এবং এর রহস্য ভক্তদের ধারণ করাবে এবং তাদের মধ্যে গীতার প্রচার এবং প্রসার করবে, তার সম্বন্ধে তো কিছু বলারই নেই ! তারজন্যই তো ভগবান বলেছেন যে সে আমার অতিশয় প্রিয়। সে তো ভগবানের প্রাণের চেয়েও প্রিয়, একথা বললেও কোনো অত্যুক্তি হবে না। ভগবান স্বয়ং এই ভক্তদের অধীন হয়ে যান।

শ্রেষ্ঠ লোকেদের মধ্যেও দেখা যায় যে, তাঁদের সিদ্ধান্তের অনুসরণকারিগণ তাঁদের যত প্রিয় হন, ততো তাদের নিজেদের প্রাণও প্রিয় নয়। গীতা ভগবানের রহস্যময় প্রধান আদেশ। এইজন্য সেই আদেশপালনকারী তাঁর প্রাণের চেয়েও প্রিয় হবেন—এতে আর আশ্চর্যের কী আছে?

গীতা ভগবানের শ্বাস, হৃদয় এবং তাঁর বাঙ্ময়ী মূর্তি। যাঁর হৃদয়ে, বাক্যে, শরীরে এবং সকল ইন্দ্রিয় ও কর্মে গীতা অবস্থান করেন, সেই ব্যক্তি সাক্ষাৎ গীতার মূর্তি। তাঁর দর্শন, স্পর্শন, ভাষণ এবং চিন্তনেও অন্যান্য মানুষ পরম পবিত্র হয়ে যায়। আর, তাঁর আদেশ যাঁরা পালন করেন, যাঁরা তাঁকে অনুসরণ করেন, তাঁদের তো কথাই নেই। বাস্তবে সংসারে গীতার তুল্য যজ্ঞ, দান, তপ, তীর্থ, ব্রত, সংযম আর উপবাসাদি কিছুই নেই।

গীতা সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল হতে নির্গত বাণীসম্ভার। এর সংকলনকর্তা হলেন শ্রীব্যাসদেব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের উপদেশের যতটা অংশ পদ্যে বলেছেন, তা ব্যাসদেব যেমনটি, তেমনটি রেখে দিয়েছেন। কিছু অংশ যা তিনি গদ্যে বলেছিলেন, সেই অংশ ব্যাসদেব নিজেই শ্লোকাবদ্ধ করেছেন। তৎসহ অর্জুন, সঞ্জয় এবং ধৃতরাষ্ট্রের বচনকেও নিজের ভাষায় শ্লোকাবদ্ধ করেছেন এবং সাতশত শ্লোকে এই পূর্ণ গ্রন্থকে আঠারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে মহাভারতের ভিতরে বিন্যস্ত করে দিয়েছেন, যা আজ আমাদের নিকট বর্তমান গ্রন্থরূপে উপলব্ধ রয়েছে।

গীতার তাৎপর্য

গীতা হল জ্ঞানের অথৈ সমুদ্র, তাতে রয়েছে জ্ঞানের অনন্ত ভাণ্ডার। এর তত্ত্ব বোঝাতে বড় বড় দিগ্বিজয়ী বিদ্বান এবং তত্ত্বালোচকদের বাণীও কুণ্ঠিত হয়ে যায়। কেননা, এর পূর্ণ রহস্য তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং জানেন। এরপর বলতে গেলে জানেন এঁর সংকলনকর্তা ব্যাসদেব এবং শ্রোতা অর্জুন। এই অগাধ রহস্যময়ী গীতার অভিপ্রায় এবং মহত্ত্ব বোঝানো আমার মতো মানুষের পক্ষে ঠিক তেমনই কঠিন, যেমন এক সাধারণ পাখির অনন্ত আকাশের সীমানা সন্ধানের প্রয়াস করা !

গীতা অনন্ত ভাবের অথৈ সমুদ্র। রত্নাকরের গভীরে ডুব দিলে যেমন রত্নের প্রাপ্তি হয়, তেমনই এই গীতারূপ সাগরের গভীরে ডুব দিলে জিজ্ঞাসুদের নিত্যনতুন

অনুপম ভাবরত্নরাশির উপলব্ধি হয়। কিন্তু আকাশে গরুড়ও উড়েন, সাধারণ মশাও ওড়ে। এইভাবে সবাই নিজ নিজ ভাব অনুসারে কিছু কিছু অনুভব করে থাকেন।

অতএব গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলে স্পষ্ট মনে হয় যে গীতার মুখ্য তাৎপর্য হল অনাদিকাল হতে অজ্ঞানবশতঃ সংসার-সমুদ্রে আবদ্ধ হয়ে থাকা জীবকে পরমাত্মার প্রাপ্তি করানো এবং তার জন্য গীতা এমন পথের সন্ধান দিয়েছেন, যাতে মানুষ নিজেদের সাংসারিক কর্তব্যকর্ম ভালোভাবে সম্পাদনের দ্বারাই পরমাত্মাকে লাভ করতে পারে। ব্যবহারিক জীবনে পরমার্থ প্রয়োগের এই অনুপম যুক্তি গীতাতে বলা হয়েছে। আর, তাতে অধিকারীভেদে ঈশ্বর লাভের জন্য দুটি নিষ্ঠার প্রতিপাদন করা হয়েছে। এই নিষ্ঠা দুটির নাম হল **জ্ঞাননিষ্ঠা** অর্থাৎ সাংখ্যযোগ এবং **যোগনিষ্ঠা** অর্থাৎ কর্মযোগ (৩।৩)।

এইখানে এই প্রশ্ন হতে পারে যে প্রায় সকল শাস্ত্রেই ভগবানকে লাভ করার জন্য তিনটি প্রধান পথের কথা বলা হয়েছে—কর্ম, উপাসনা আর জ্ঞান। অতএব গীতায় দুটি নিষ্ঠা কেন মানা হল ? গীতা কি ভক্তির সিদ্ধান্ত মানা করে না ? বহু লোক তো গীতার উপদেশ ভক্তিপ্রধানই বলে মনে করেন। আর ভগবানও বিভিন্ন স্থানে ভক্তির বিশেষ মহত্ত্বের কথা স্পষ্ট শব্দে বলেছেন (৬।৪৭)। তিনি বলেছেন যে ভক্তির দ্বারাই তাঁকে সহজে পাওয়া যায় (৮।১৪)। এর উত্তর হল, শাস্ত্রে কর্ম আর জ্ঞানের অতিরিক্ত যে 'উপাসনার' প্রকরণ এসেছে, সেই উপাসনা এই দুই নিষ্ঠারই অন্তর্গত। যখন নিজেকে পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন মনে করে উপাসনা করা হয়, তখন তা সাংখ্যনিষ্ঠার অন্তর্গত হয় আর, যখন ভেদদৃষ্টিতে উপাসনা করা হয়, তখন তা যোগনিষ্ঠার অন্তর্গত হয়। সাংখ্যনিষ্ঠা এবং যোগনিষ্ঠার এই হল মুখ্য পার্থক্য। এইভাবে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের চতুর্বিংশ শ্লোকে কেবল ধ্যানের দ্বারা ঈশ্বর-লাভের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সেখানেও এই কথা বুঝে নিতে হবে যে, যে ধ্যান অভেদ দৃষ্টিতে করা হয়, তা সাংখ্যনিষ্ঠার অন্তর্গত, আর যে ধ্যান ভেদদৃষ্টিতে করা হয় তা হল যোগনিষ্ঠার অন্তর্গত। গীতাতে ভক্তিকে ভগবৎ-প্রাপ্তির প্রধান সাধনরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে—লোকেদের এই ধারণাও যথার্থ। গীতায় ভক্তিকে খুব উচ্চ স্থান প্রদান করা হয়েছে এবং স্থানে স্থানে অর্জুনকে ভক্ত হবার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে (৯।৩৪ ; ১২।৮ ; ১৮।৫৭, ৬৫, ৬৬)। কিন্তু, নিষ্ঠারূপে গীতাতে এই দুটি নিষ্ঠাই মানা হয়েছে। এর মধ্যে ভক্তি হল যোগনিষ্ঠার অন্তর্গত। কেননা, ভক্তিতে রয়েছে দ্বৈতভাব, তাই এরূপ মানা যুক্তিবিরুদ্ধও নয়। ভক্তি কী ভাবে যোগনিষ্ঠার অন্তর্গত, তা পরে আলোচনা করা হচ্ছে।

গীতায় কেবল ভজন-পূজন অথবা কেবল ধ্যানের দ্বারাও নিজের প্রাপ্তির কথা বলাতে ভগবানের এই তাৎপর্য যে, যোগনিষ্ঠার পূর্ণাঙ্গ সাধনায় তো তাঁর প্রাপ্তি হবেই, আবার তার এক একটি অঙ্গের দ্বারাও তাঁর প্রাপ্তি হতে পারে। এই হল তাঁর কৃপা যে, তিনি নিজেকে জীবের জন্য এতই সুলভ করে দিয়েছেন।

এতদ্ব্যতীত গীতায় 'জ্ঞান' এবং 'কর্ম' শব্দ দুটির প্রয়োগ যে অর্থে করা হয়েছে, তাও বিশেষ রহস্যময়। গীতার কর্ম এবং কর্মযোগ ও জ্ঞান এবং জ্ঞানযোগ একই বস্তু নয়। গীতার বক্তব্য অনুসারে শাস্ত্রবিহিত কর্ম জ্ঞাননিষ্ঠা ও যোগনিষ্ঠা—দুভাবেই হতে পারে। জ্ঞাননিষ্ঠাতেও কর্মের বিরোধ নেই। আর যোগনিষ্ঠাতে তো কর্মের সম্পাদনকেই সাধন মানা হয়েছে (৬।৩) এবং তার স্বরূপতঃ (বাহ্যিক) ত্যাগকে বরং বাধক বলা হয়েছে (৩।৪)। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৭ সংখ্যক শ্লোক হতে আরম্ভ করে ৫১ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত তথা তৃতীয় অধ্যায়ের ১৯ সংখ্যক শ্লোক এবং চতুর্থ অধ্যায়ের ৪২ সংখ্যক শ্লোকে অর্জুনকে যোগনিষ্ঠার দৃষ্টিতে কর্ম সম্পাদনের জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে। আবার তৃতীয় অধ্যায়ের ২৮ সংখ্যক শ্লোকে তথা পঞ্চম অধ্যায়ের ৮, ৯ এবং ১৩ সংখ্যক শ্লোকে সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠার দৃষ্টিতে কর্ম সম্পাদনের কথা বলা হয়েছে। সকাম কর্মের কোনো নিষ্ঠাতেই স্থান নেই। সকাম-কর্মীকে তো ভগবান অল্পবুদ্ধি বলেছেন (২।৪২—৪৪ এবং ৪৯ ; ৭।২০—২৩ ; ৯।২০, ২১, ২৩, ২৪)।

জ্ঞানের অর্থও গীতাতে কেবল জ্ঞানযোগ নয়। ফলরূপ জ্ঞান যা সর্বপ্রকার সাধনের ফল—যা হল জ্ঞাননিষ্ঠা এবং যোগনিষ্ঠা দুইয়েরই ফল, আর যাকে যথার্থ জ্ঞান অথবা তত্ত্বজ্ঞানও বলা হয়, তাকেও জ্ঞান

শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ের ২৪ এবং ২৫ শ্লোকের উত্তরার্ধে জ্ঞানযোগের বর্ণনা রয়েছে এবং চতুর্থ অধ্যায়েরই ৩৬ হতে ৩৯ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত ফলরূপ জ্ঞানের বর্ণনা রয়েছে। এইভাবে অন্যত্রও প্রসঙ্গানুসারে বুঝে নিতে হবে।

এখন, সাংখ্যনিষ্ঠা এবং যোগনিষ্ঠার কী স্বরূপ, এই দুইয়ের মধ্যে কী পার্থক্য, এই দুটির কতগুলি এবং কী কী অবান্তর ভেদ, তথা এই নিষ্ঠা দুটি স্বতন্ত্র না পরস্পর সাপেক্ষ, এই নিষ্ঠা দুটির অধিকারী কারা, ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে—

সাংখ্যনিষ্ঠা এবং যোগনিষ্ঠার স্বরূপ

(১) সমস্ত পদার্থ মরীচিকার জলের মতো অথবা স্বপ্নের সৃষ্টির মতো মায়াময় হওয়ায় মায়ার কার্যরূপ সম্পূর্ণ গুণই গুণরাশির মধ্যে প্রবর্তিত হচ্ছে—এই রকম বুঝে মন, ইন্দ্রিয় আর শরীরের দ্বারা হওয়া সমস্ত কর্মে কর্তৃত্বের অভিমানশূন্য হওয়া (৫।৮-৯) তথা সর্বব্যাপী সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার স্বরূপে একীভাবে নিত্য স্থিত থেকে এক সচ্চিদানন্দঘন বাসুদেব ব্যতীত অন্য কারও অস্তিত্ব না ভাবা (১৩।৩০)—এই হল সাংখ্যনিষ্ঠা। 'জ্ঞানযোগ' অথবা 'কর্মসন্ন্যাস'ও একেই বলা হয়। আর—

(২) সবকিছুকে ভগবানের মনে করে সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমভাব রেখে আসক্তি তথা ফলের ইচ্ছা ত্যাগ করে ভগবৎ-আজ্ঞানুসারে সকল কর্মের সম্পাদন করা (২।৪৭-৫১) অথবা শ্রদ্ধা-ভক্তিপূর্বক কায়-মনো-বাক্যে সর্বপ্রকারে ভগবানের শরণ নিয়ে, নাম, গুণ এবং প্রভাবসহ তাঁর স্বরূপের নিরন্তর চিন্তা করা (৬।৪৭)—এটিই হল 'যোগনিষ্ঠা'। একেই ভগবান সমত্বযোগ, বুদ্ধিযোগ, তদর্থকর্ম, মদর্থকর্ম এবং সাত্ত্বিক ত্যাগ প্রভৃতি নামে উল্লেখ করেছেন।

যোগনিষ্ঠাতে সাধারণরূপে অথবা প্রধানরূপে ভক্তি থাকেই। গীতোক্ত যোগনিষ্ঠা ভক্তিবিবর্জিত নয়। যেখানে ভক্তি অথবা ভগবানের কথার স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই (২।৪৭-৫১) সেখানেও ভগবানের আদেশের পালন তো হয়েই থাকে—এই দৃষ্টিতে ভক্তির সম্বন্ধ সেইখানেও রয়েছে।

জ্ঞাননিষ্ঠার সাধনের জন্য ভগবান অনেক যুক্তির উল্লেখ করেছেন। সেই সবেরই ফল হল একমাত্র সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার প্রাপ্তি। জ্ঞানযোগের অবান্তর অনেক ভেদ হলেও তাকে চারটি মুখ্য ভেদে বিভক্ত করা যায়—

(১) যা কিছু রয়েছে, সবই ব্রহ্ম।

(২) যা কিছু দৃশ্যরূপে প্রতীত হয়, ঐ সবই মায়াময়। বাস্তবে এক সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মের অতিরিক্ত আর কিছুই নেই।

(৩) যা কিছু প্রতীত হয়, সব আমারই স্বরূপ—আমিই সবকিছু।

(৪) যা কিছু প্রতীত হয়, ঐ সবই মায়াময়, অনিত্য, বাস্তবে তার অস্তিত্বই নেই। কেবল এক নিত্য চেতন আত্মা আমিই বর্তমান।

প্রথম দুটি সাধন 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের 'তৎ' পদের দৃষ্টিতে বলা হয়েছে এবং পরের দুটি সাধন 'ত্বম্' পদের দৃষ্টিতে উল্লিখিত হয়েছে। এদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা এইভাবে করা হচ্ছে—

(১) এই চরাচর জগতে যা কিছু প্রতীত হয়, সবই ব্রহ্ম। কোনো বস্তুই এক সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা থেকে পৃথক নয়। কর্ম, কর্মের সাধন এবং উপকরণ তথা স্বয়ং কর্তা—সব কিছুই হল ব্রহ্ম (৪।২৪)। যেমন, সমুদ্রে বরফের টুকরোর বাইরে ও ভেতরে সর্বত্র জলই ব্যাপ্ত, আর ঐ টুকরোও স্বয়ং-জলরূপই, তেমনি সমস্ত চরাচর ভূতের বাইরে ও ভেতরে সর্বত্রই পরমাত্মার দ্বারা পরিপূর্ণ আর সমস্ত ভূতের রূপেও তিনিই রয়েছেন (১৩।১৫)।

(২) যা কিছু দৃশ্যসমূহ রয়েছে, তাকে মায়িক, ক্ষণিক এবং বিনাশশীল মনে করে—এই সবের অস্তিত্ব স্বীকার না করে ঐ সবের অধিষ্ঠানরূপে এক সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাই রয়েছেন, আর কিছুই নেই—এই রকম চিন্তা করে মন-বুদ্ধিকেও ব্রহ্মে নিবিষ্ট করা এবং পরমাত্মার মধ্যে একীভাবে স্থিত হয়ে অপরোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা তাঁর সঙ্গে 'একত্ব' প্রাপ্ত হওয়া (৫।১৭)।

(৩) চর, অচর সবই ব্রহ্ম আর সেই ব্রহ্ম আমিই ; এইজন্য সব আমারই স্বরূপ—এইরকম চিন্তা করে সম্পূর্ণ চরাচর প্রাণীসমূহকে নিজের আত্মা বলে জানা।

এই প্রকারের সাধকের দৃষ্টিতে একমাত্র ব্রহ্ম ব্যতীত

অন্য কিছুই থাকে না। তখন তিনি নিজের বিজ্ঞানানন্দঘন স্বরূপেই আনন্দের অনুভব করতে থাকেন (৫।২৪ ; ৬।২৭ ; ১৮।৫৪)।

(৪) যা কিছু এই মায়াময়, ত্রিগুণের কার্যরূপ দৃশ্যসমূহ রয়েছে— তাদের এবং তাদের দ্বারা ক্রিয়মাণ সকল ক্রিয়াকে নিজের থেকে পৃথক, বিনাশশীল এবং অনিত্য মনে করা তথা এই সবেরই একান্ত অভাব স্বীকার করে কেবল ভাবরূপ আত্মাকেই অনুভব করা (১৩।২৭, ৩৪)।

এই প্রকারের স্থিতি লাভ করার জন্য ভগবান গীতায় অনেক যুক্তির দ্বারা সাধককে স্থানে স্থানে এই কথা বুঝিয়েছেন যে আত্মা হলেন দ্রষ্টা, সাক্ষী, চেতন এবং নিত্য আর এই দেহাদি জড় দৃশ্যবর্গ— যা কিছু প্রতীত হয়— সেই সব অনিত্য হওয়ায় অসৎ ; কেবল আত্মাই সৎ। এই কথার সমর্থনে ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ হতে ত্রিংশ শ্লোক পর্যন্ত নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, নিরাকার, নির্বিকার, অক্রিয়, গুণাতীত আত্মার স্বরূপের বর্ণনা করেছেন। অভেদরূপে সাধনকারী পুরুষদের আত্মার এরূপ স্বরূপ মনে করে সাধনা করলে আত্মার সাক্ষাৎকার হয়। যা কিছু প্রয়াস হয় তা গুণাবলীর দ্বারা গুণেই হচ্ছে, আত্মার সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নেই (৫।৮, ৯ ; ১৪।১৯)। তিনি নিজে কিছু করেন না, করানও না— এইটি উপলব্ধি করে সাধক নিত্য-নিরন্তর নিজেই নিজের মধ্যে অতিশয় আনন্দ অনুভব করেন (৫।১৩)।

পূর্বোক্ত জ্ঞানযোগের চারটি সাধনের মধ্যে প্রথম দুটি সাধন ব্রহ্মের উপাসনার সঙ্গে যুক্ত এবং তৃতীয় আর চতুর্থ সাধন অহংগ্রহ উপাসনার সঙ্গে যুক্ত।

এখানে এই প্রশ্নই উত্থিত হয় যে 'পূর্বোক্ত চারটি সাধন ব্যুত্থান অবস্থান করতে হয়, নাকি ধ্যানাবস্থায় অথবা দুটি অবস্থাতেই করা যায়।' এর উত্তর হল এই যে, চতুর্থ সাধনের শেষে যে প্রক্রিয়া পঞ্চম অধ্যায়ের নবম শ্লোকানুসারে বলা হয়েছে—তা কেবল ব্যবহারকালে করার জন্য এবং দ্বিতীয় সাধনের আরম্ভে পঞ্চম অধ্যায়ের সপ্তদশ শ্লোক অনুসারে যে সাধনের কথা বলা হয়েছে, ঐটি কেবল ধ্যানকালেই করা যেতে পারে। অবশিষ্ট সাধনগুলি প্রায়শঃ দুই অবস্থাতেই করা যেতে পারে।

এইখানে কেউ এই কথা জিজ্ঞেস করতে পারেন যে প্রথমে সাধনে **'বাসুদেবঃ সর্বমিতি'**—যা কিছু পরিলক্ষিত হয় সব বাসুদেবেরই স্বরূপ (৭।১৯) তথা **'সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ'**—যে ব্যক্তি একীভাবে স্থিত হয়ে সকল ভূতে আত্মস্বরূপে স্থিত সচ্চিদানন্দঘন বাসুদেব আমাকেই ভজনা করে (৬।৩১) —এগুলির উল্লেখ কেন করা হয়নি ? এর উত্তর হল এই যে, এই শ্লোকদুটি ভক্তির প্রসঙ্গে বলা হয়েছে এবং দুটিতেই ঈশ্বর-প্রাপ্ত পুরুষের বর্ণনা করা হয়েছে। তাই এই প্রসঙ্গে এগুলির উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু, যদি কেউ এই দুটিকে জ্ঞানের অন্তর্গত ধরে নিয়ে সেই অনুসারে সাধনা করতে ইচ্ছুক হন তো করতে পারেন। এতে আপত্তির কিছু নেই।

যেভাবে পূর্বে সাংখ্যনিষ্ঠার চারটি বিভাগ করা হয়েছে, সেইভাবে যোগনিষ্ঠারও তিনটি মুখ্য ভেদ রয়েছে।

১—কর্মপ্রধান কর্মযোগ

২—ভক্তিমিশ্রিত কর্মযোগ

৩—ভক্তিপ্রধান কর্মযোগ

(১) সমস্ত কর্মে এবং সাংসারিক পদার্থে ফল আর আসক্তি সর্বতোভাবে ত্যাগ করে নিজের বর্ণাশ্রম অনুসারে শাস্ত্রবিহিত কর্ম করতে থাকাই হল কর্মপ্রধান কর্মযোগ। এর উপদেশে কোথাও কোথাও ভগবান কেবল ফলত্যাগের কথা বলেছেন (৫।১২ ; ৬।১ ; ১২।১১ ; ১৮।১১), কোথাও কেবল আসক্তি ত্যাগের কথা বলেছেন (৩।১৯, ৬।৪) এবং কোথাও ফল এবং আসক্তি দুটিকেই ত্যাগের কথা বলেছেন (২।৪৭, ৪৮, ১৮।৬, ৯)। যেখানে কেবল ফল ত্যাগের কথা বলা হয়েছে, সেখানে আসক্তি ত্যাগের কথাও এর সঙ্গে ধরে নিতে হবে ; আর, যেখানে কেবল আসক্তি ত্যাগের কথা বলা হয়েছে, সেখানেও ফল-ত্যাগের কথা তার অন্তর্গত ধরে নিতে হবে। কর্মযোগীর সাধন বাস্তবে তখনই পূর্ণ হয়, যখন ফল এবং আসক্তি দুইয়েরই ত্যাগ হয়।

(২) ভক্তিমিশ্রিত কর্মযোগ—এই সাধনায় সমগ্র সংসারে পরমেশ্বর ব্যাপ্ত রয়েছেন মনে করে নিজ নিজ বর্ণোচিত কর্মের দ্বারা ভগবানকে পূজা করার কথা বলা হয়েছে (১৮।৪৬)। সেইজন্য এটিকে ভক্তিমিশ্রিত

কর্মযোগ বলা যেতে পারে।

(৩) ভক্তিপ্রধান কর্মযোগ—এর আবার দুটি অবান্তর ভেদ রয়েছে।

(ক) 'ভগবদর্পণ' কর্ম।

(খ) এবং 'ভগবদর্থ' কর্ম।

ভগবদর্পণ কর্মও দুই ভাবে করা যায়। পূর্ণ ভগবদর্পণ তখনই হয় যখন সমস্ত কর্মে মমতা, আসক্তি এবং ফলেচ্ছা ত্যাগ করে তথা সব কিছুই ভগবানের, আমিও ভগবানের এবং আমার দ্বারা যে সকল কর্ম হয়, তাও ভগবানেরই মনে করে কাঠের পুতুলের মতো ভগবানই আমার দ্বারা সব করাচ্ছেন—এইটি উপলব্ধি করে ভগবানের আজ্ঞানুসারে ভগবানেরই প্রসন্নতার জন্য শাস্ত্রবিহিত কর্ম পালিত হয় (৩।৩০ ; ১২।৬ ; ১৮।৫৭, ৬৬)।

এর অতিরিক্ত প্রথমে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে কর্ম প্রারম্ভ করে পরে তা ভগবানে অর্পণ করা, কর্ম সমাপ্ত হবার পর সঙ্গে সঙ্গেই ভগবানকে অর্পণ করা অথবা কর্মের ফলকে ভগবানে অর্পণ করা—এইসবও ভগবদর্পণেরই প্রকারভেদ। এইগুলি হল ভগবদর্পণের প্রাথমিক সোপান। এইভাবে করতে করতেই পূর্বোক্ত পূর্ণ ভগবদর্পণ হয়।

'ভগবদর্থ' কর্মও দুই প্রকারের—

যেসকল শাস্ত্রবিহিত কর্ম ভগবৎপ্রাপ্তি, ভগবৎপ্রেম অথবা ভগবানের প্রসন্নতার জন্য ভগবদাজ্ঞানুসারে করা হয় সেগুলি এবং ভগবানের বিগ্রহাদির অর্চন তথা ভজন-ধ্যানাদি উপাসনারূপ কর্ম, যা ভগবানের জন্যই করা হয় এবং স্বরূপতই যা ভগবৎসম্বন্ধীয়, এই উভয় প্রকারের কর্মই ভগবদর্থ কর্মের অন্তর্গত এবং তা মৎকর্ম এবং মদর্থকর্ম নামেও গীতাতে উল্লিখিত হয়েছে (১১।৫৫ ; ১২।১০)।

যাকে অনন্য ভক্তি অথবা ভক্তিযোগ বলা হয় (৮।১৪ ; ২২ ; ৯।১৩, ১৪, ২২, ৩০, ৩৪ ; ১০।৯ ; ১৩।১০ ; ১৪।২৬) তাও 'ভগবদর্পণ' এবং 'ভগবদর্থ' এই দুটিতেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই সবেরও ফল হল ভগবৎপ্রাপ্তি।

এখন প্রশ্ন হল, যোগনিষ্ঠা স্বতন্ত্ররূপে ভগবৎপ্রাপ্তি করায়, নাকি জ্ঞাননিষ্ঠার অঙ্গ হয়ে করায় ? এর উত্তর হল এই যে, এই দু'টি গীতায় অনুমোদিত হয়েছে। অর্থাৎ ভগবদ্গীতা যোগনিষ্ঠাকে ভগবৎপ্রাপ্তি অর্থাৎ মোক্ষের স্বতন্ত্র সাধনও মনে করে এবং জ্ঞাননিষ্ঠার সহায়করূপেও মনে করে। সাধক ইচ্ছা করলে জ্ঞাননিষ্ঠার সাহায্য ছাড়াও সরাসরি কর্মযোগের দ্বারা পরম সিদ্ধি লাভ করতে পারে অথবা কর্মযোগের দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠাকে লাভ করে পুনরায় জ্ঞাননিষ্ঠার দ্বারা পরমাত্মাকে লাভ করতে পারে। দুটির মধ্যে কোন্ পথ গ্রহণ করা হবে, তা তার রুচির ওপর নির্ভর করে। যোগনিষ্ঠা স্বতন্ত্র সাধন, এই কথা ভগবান স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন (৫।৪, ৫ তথা ১৩।২৪)। ভগবানে চিত্ত নিয়োগ করে ভগবানের জন্যই যিনি কর্ম করেন, ভগবানের কৃপাতে তিনি ভগবানকেই লাভ করেন, এই কথাও ভগবান বিভিন্ন স্থানে বলেছেন (৮।৭, ১১।৫৪, ৫৫ ; ১২।৬-৮)।

এইভাবেই নিষ্কাম কর্ম এবং উপাসনা—দুই-ই জ্ঞাননিষ্ঠার অঙ্গ হতে পারে (৫।৬ ; ১৪।২৬)। কিন্তু, জ্ঞানযোগে রয়েছে অভেদের উপাসনা। সেইজন্য জ্ঞাননিষ্ঠা ভেদোপাসনারূপ ভক্তিযোগের অথবা যোগনিষ্ঠার অঙ্গ হতে পারে না। এইটি অবশ্য অন্য কথা যে, জ্ঞাননিষ্ঠার কোনো সাধকের যদি পরবর্তীকালে রুচি অথবা মত বদলে যায় এবং তিনি জ্ঞাননিষ্ঠা ত্যাগ করে যোগনিষ্ঠাকে আঁকড়ে ধরেন, তবে তাঁর ঐ যোগনিষ্ঠার দ্বারাই ভগবৎপ্রাপ্তি হয়ে যায়।

যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, কর্মযোগের সাধনা আরম্ভ করার পর মাঝপথে সাংখ্যযোগের সাধনা অবলম্বন করে যিনি সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাকে লাভ করেন, তার প্রণালী কীরূপ, তাহলে সেটিকে জানার জন্য 'ত্যাগে'র নামে সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে নিম্নরূপে জানাতে হবে—

(১) নিষিদ্ধ কর্মের সর্বতোভাবে ত্যাগ

চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা, কপট, ছল, জবরদস্তি, হিংসা, অভক্ষ্য-ভোজন এবং প্রমাদাদি শাস্ত্রনিষিদ্ধ নিম্নশ্রেণীর কর্ম কায়-মনো-বাক্যে না করা—এটি হল প্রথম শ্রেণীর ত্যাগ।

(২) কাম্য কর্মের ত্যাগ

স্ত্রী, পুত্র এবং ধনাদি প্রিয় বস্তু প্রাপ্তির এবং রোগ সংকটাদির নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে যজ্ঞ, দান, তপস্যা এবং উপাসনাদি সকাম কর্ম নিজের স্বার্থের জন্য না করা—এটি

হল দ্বিতীয় শ্রেণীর ত্যাগ।

যদি কোনো লৌকিক অথবা শাস্ত্রীয় এমন কোনো কর্ম পরিস্থিতিবশতঃ উপস্থিত হয়, যা স্বরূপতঃ সকাম, কিন্তু, তা না করলে কারও মনে কষ্ট হতে পারে বা কর্ম উপাসনার পরম্পরায় কোনো প্রকারের বাধা উপস্থিত হয়, তাহলে সেই অবস্থায় স্বার্থ ত্যাগ করে লোক-সংগ্রহের জন্য তা করা সকাম কর্ম নয়।

(৩) তৃষ্ণার সর্বতোভাবে ত্যাগ

মান-সম্মান, কীর্তি, প্রতিষ্ঠা এবং স্ত্রী, পুত্র, ধনাদি যা কিছু অনিত্যপদার্থ ভাগ্যবশতঃ প্রাপ্ত হয়, সেগুলির বৃদ্ধির ইচ্ছাকে ভগবৎপ্রাপ্তিতে বাধক মনে করে তা ত্যাগ করা। এটি হল তৃতীয় শ্রেণীর ত্যাগ।

(৪) স্বার্থবশতঃ অপরের সেবা গ্রহণ-ত্যাগ

নিজের সুখের জন্য কারও কাছে ধনাদি বস্তু অথবা সেবার ইচ্ছা করা এবং বস্তু বা সেবা স্বীকার করা তথা কারও নিকটে কোনও ভাবেই নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মনে মনে ইচ্ছা করা প্রভৃতি স্বার্থের জন্য অপরের সেবা গ্রহণের যে ভাব, ঐ সবকে ত্যাগ করা— এটি হল চতুর্থ শ্রেণীর ত্যাগ।

যদি যোগ্যতা অনুসারে এমন কোনও পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যাতে শরীর সম্বন্ধীয় সেবা অথবা ভোজনাদি স্বীকার না করলে কারো কষ্ট হয়, বা লোকশিক্ষায় কোনো প্রকার বাধা আসে, তাহলে সেইসময়ে স্বার্থ ত্যাগ করে, কেবল অপরের প্রীতির জন্য সেবাদি স্বীকার করা দোষযুক্ত নয়। কেননা, স্ত্রী-পুত্র এবং ভৃত্যাদির কৃত সেবা এবং বন্ধু-বান্ধব এবং মিত্রাদির দ্বারা প্রদত্ত ভোজ্যদ্রব্যাদি স্বীকার না করলে তাদের কষ্ট হতে পারে, লোকমর্যাদায় বাধা পড়ারও সম্ভাবনা থাকে।

(৫) সকল কর্তব্য-কর্মে আলস্য এবং ফলের ইচ্ছার সর্বতোভাবে ত্যাগ

ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, দেবগণের পূজা, মাতা-পিতা আদি গুরুজনদের সেবা, যজ্ঞ, দান, তপ, তথা বর্ণাশ্রম অনুসারে জীবিকা এবং শরীরসম্বন্ধীয় পান-ভোজনাদি যত কর্তব্য-কর্ম রয়েছে সেই সবেতে আলস্যের এবং সর্বপ্রকারের কামনার ত্যাগ করা—এই হল পঞ্চম শ্রেণীর ত্যাগ।

(৬) সংসারের সকল পদার্থে আর কর্মে মমতা এবং আসক্তির সর্বতোভাবে ত্যাগ

ধন, গৃহ এবং বস্ত্রাদি সকল বস্তু তথা স্ত্রী, পুত্র ও সকল আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং মান, অহংকার আর প্রতিষ্ঠাদি ইহলোকের এবং পরলোকের বিষয়-ভোগরূপ যত পদার্থ আছে, ঐ সবই ক্ষণভঙ্গুর এবং বিনাশশীল হওয়ায় অনিত্য মনে করে তাতে মমত্ব এবং আসক্তি না রাখা, তথা কেবল এক পরমাত্মাতেই অনন্যভাবে বিশুদ্ধ প্রেম হবার জন্য কায়-মনো-বাক্যে কৃত সকল কর্মে এবং শরীরেও মমত্ব এবং আসক্তির সর্বপ্রকারে অভাব হয়ে যাওয়া—এই হল ষষ্ঠ শ্রেণীর ত্যাগ।

এই ছয় শ্রেণীর ত্যাগ যে ব্যক্তির জীবনে বাস্তবায়িত হয়েছে, তাঁর সংসারের সকল পদার্থে বৈরাগ্য হয়ে পরম প্রেমময় এক ভগবানের প্রতি প্রেম জন্মে। ফলে ভগবানের গুণ, প্রভাব এবং রহস্যে পূর্ণ বিশুদ্ধ প্রেমের বিষয়ে কথা শোনা এবং শোনানো এবং মনন করা ও নির্জন স্থানে অবস্থান করে নিরন্তর ভগবানের ভজন, ধ্যান এবং শাস্ত্রের মর্ম বিচার করাই তাঁর প্রিয় কর্ম হয়ে ওঠে। বিষয়াসক্ত মানুষের মধ্যে থেকে হাস্য, বিলাস, প্রমাদ, নিন্দা, বিষয়-ভোগ এবং অসার কথায় জীবনের অমূল্য সময়ের একটি মুহূর্তও ব্যয় করা তাঁর ভালো লাগে না। তাঁর সকল কর্মে ভগবানের স্বরূপ আর নামের মনন হতে থাকে এবং নিরাসক্তভাবে কেবল ভগবানের জন্যই তাঁর সকল কর্ম সম্পাদিত হয়।

এইটিই হল কর্মযোগের সাধনা। এই সাধনা করতে করতেই সাধক পরমাত্মার কৃপায় পরমাত্মার স্বরূপকে তত্ত্বতঃ জেনে অবিনাশী পরমপদ লাভ করেন (১৮।৫৬)।

কিন্তু কেউ যদি সাংখ্যযোগের দ্বারা পরমাত্মাকে লাভ করতে চান, তাহলে তাঁকে পূর্বোক্ত ঐ সাধনা করার পর নিম্নলিখিত সপ্তম শ্রেণীর প্রণালী অনুসারে সাংখ্যযোগের সাধনা করতে হবে।

(৭) সংসার, শরীর এবং সকল কর্মে সূক্ষ্ম বাসনা এবং অহংভাবের সর্বতোভাবে ত্যাগ

সংসারের সকল পদার্থ মায়ার কার্য হওয়ায় সর্বথা অনিত্য এবং এক সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাই সর্বত্র সমভাবে পরিপূর্ণ— এই বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হয়ে শরীরসহ সংসারের সকল পদার্থ এবং কর্মের সূক্ষ্ম বাসনা হতে

সর্বপ্রকারে মুক্ত হয়ে যাওয়া অর্থাৎ অন্তঃকরণে ঐ সকলের সংস্কারও না থাকা, এবং শরীরে অহংভাবের সর্বপ্রকারে অভাব হওয়ায় কায়-মনো-বাক্যে কৃত সকল কর্মে কর্তৃত্বের লেশমাত্রও অভিমান না থাকা এবং তদনুরূপ শরীরসহ সকল পদার্থ ও কর্মে বাসনা এবং অহংভাবের অত্যন্ত অভাব হয়ে এক সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার স্বরূপেই একীভাবে নিত্য-নিরন্তর দৃঢ় স্থিতি থাকা—এই হল সপ্তম শ্রেণীর ত্যাগ।

এইভাবে সাধনা করলে সেই ব্যক্তি সেই মুহূর্তে সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাকে অনায়াসেই প্রাপ্ত হন (৬।২৮)। কিন্তু, যে ব্যক্তি উক্ত প্রকারে কর্মযোগের সাধনা না করে আরম্ভ থেকেই সাংখ্যযোগের সাধনা করতে থাকেন, তাঁকে একটু বেগ পেতে হয়।

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ। (৫।৬)

এইখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, কোনো সাধক একই সময়ে (৫।৬) এই দুই নিষ্ঠা অনুসারে সাধনা করতে পারেন, না পারেন না ? যদি না পারেন তাহলে কারণ কী ? এর উত্তর হল এই যে—সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগ—এই দুই সাধনার সম্পাদন একই সময়ে একই পুরুষের দ্বারা হতে পারে না। কেননা, কর্মযোগী সাধনকালে কর্ম, কর্মফল, পরমাত্মা এবং নিজেকে ভিন্ন ভিন্ন মনে করে কর্মফল এবং আসক্তি ত্যাগ করে ঈশ্বরের জন্য অথবা ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম করে থাকেন (৩।৩০ ; ৫।১০ ; ১১।৫৫ ; ১২।১০ ; ১৮।৫৬-৫৭)। আর, সাংখ্যযোগী মায়ার দ্বারা উৎপন্ন সকল গুণই গুণে প্রবৃত্ত রয়েছে অথবা ইন্দ্রিয়সমূহ ইন্দ্রিয়সমূহের কার্যে প্রবৃত্ত আছে—এইরূপ মনে করে কায়-মনো-বাক্যে সকল কর্মে কর্তৃত্বের অভিমানশূন্য হয়ে কেবল সর্বব্যাপী সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার স্বরূপে অভিন্নভাবে অবস্থান করেন (৩।২৮ ; ৫।১৩ ; ১৩।২৯ ; ১৪।১৯-২০ ; ১৮।৪৯-৫৫)। কর্মযোগী নিজেকে কর্মের কর্তা মনে করেন (৫।১১), সাংখ্যযোগী নিজেকে কর্তা মনে করেন না (৫।৮, ৯) ; কর্মযোগী নিজের কর্মরাশিকে ভগবানে অর্পণ করেন (৯।২৭, ২৮), সাংখ্যযোগী মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা সম্পাদিত অহংবোধশূন্য কর্মসমূহকে কর্ম বলেই মনে করেন না (১৮।১৭) ; কর্মযোগী পরমাত্মাকে নিজের থেকে পৃথক মনে করেন (১২।১০), সাংখ্যযোগী নিজেকে সর্বদা পরমাত্মার সঙ্গে অভেদ মনে করেন (১৮।২০) ; কর্মযোগী প্রকৃতি এবং প্রকৃতির পদার্থসমূহের সত্তা স্বীকার করেন (১৮।৬১), সাংখ্যযোগী এক ব্রহ্ম ব্যতীত কারোরই সত্তা মানেন না (১৩।৩০) ; কর্মযোগী কর্মফল এবং কর্মের সত্তা মানেন, সাংখ্যযোগী ব্রহ্ম হতে ভিন্ন কর্ম এবং তার ফলের সত্তা মানেন না এবং তার সঙ্গে নিজের কোনো সম্বন্ধ মানেন না। এইজন্য দুটির সাধন প্রণালী এবং মান্যতায় পূর্ব-পশ্চিমের মতো বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এই অবস্থায় এই দুটি নিষ্ঠার সাধন একই ব্যক্তি একই সময়ে করতে পারে না। তবে উভয় সাধনার ফল একই। যেমন, কোনো মানুষকে যদি ভারতবর্ষ থেকে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে যেতে হয়, তাহলে সে যদি ঠিক রাস্তা ধরে এইখান হতে ক্রমাগত পূর্বদিকেই চলতে থাকে তাহলে সে আমেরিকা পৌঁছে যাবে আর যদি সে পশ্চিম দিক ধরেও চলতে থাকে তাহলেও সে আমেরিকা পৌঁছে যাবে। ঠিক সেইভাবেই সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগের সাধনপ্রণালী পরস্পর ভিন্ন হলেও যে ব্যক্তি কোনো একটি সাধনায় দৃঢ়তার সঙ্গে যুক্ত হয়, তাহলে সে দুটিরই একমাত্র পরম লক্ষ্য পরমাত্মা পর্যন্ত সত্বরই পৌঁছে যাবে (৫।৪)।

অধিকারী

এখন এই প্রশ্ন এসে যাচ্ছে যে গীতোক্ত সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগের অধিকারী কে—সকল বর্ণের এবং সকল আশ্রমের তথা সকল জাতির লোকই কি এই যোগ দুটির আচরণ করতে পারে, নাকি কোনো বিশেষ বর্ণ, বিশেষ আশ্রম বা কোনো বিশেষ জাতির লোকই এর সাধনা করতে পারে ? এর উত্তর হল এই যে, যদিও গীতায় যে পদ্ধতি নিরূপণ করা হয়েছে, সেইটি সর্বপ্রকারে ভারতীয় এবং ঋষিসেবিত, তবুও গীতায় প্রদত্ত শিক্ষা নিয়ে বিশেষভাবে অনুধাবন করলে এই কথাই বলা যায় যে গীতায় কথিত সাধন-অনুসারে আচরণ করবার অধিকার মনুষ্য মাত্রেরই রয়েছে। জগদ্গুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশ সমগ্র মানবজাতির জন্য—কোনো বিশেষ বর্ণ বা আশ্রমের জন্য নয়। এইটিই হল গীতার বৈশিষ্ট্য। ভগবান উপদেশ-কালে বিভিন্নস্থানে **'মানবঃ'**, **'নরঃ'**, **'দেহভৃৎ'**, **'দেহী'**

প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করে এই কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। যেখানে সাংখ্যযোগের মুখ্যসাধন বলেছেন, সেখানে ভগবান 'দেহী' শব্দের প্রয়োগ করে মনুষ্যমাত্রকেই তার অধিকারী বলেছেন (৫।১৩)। এইভাবে ভগবান স্পষ্ট শব্দে বলেছেন যে মনুষ্যমাত্রই নিজ নিজ শাস্ত্রবিহিত কর্মের দ্বারা সর্বব্যাপী পরমেশ্বরের পূজা করে সিদ্ধিলাভ করতে সমর্থ (১৮।৪৬)। এইভাবেই ভগবান ভক্তিতে স্ত্রী, শূদ্র তথা পাপযোনি পর্যন্ত সকলকেই অধিকারী বলেছেন (৯।৩২)। উপরন্তু যেখানেই ভগবান কোনও সাধন-পথের নির্দেশ দিয়েছেন সেখানে এমন কোনও কথা বলেননি যে এই সাধনা করার জন্য কোনো বিশেষ বর্ণ, আশ্রম বা জাতিরই অধিকার রয়েছে, অন্যের নয়।

তা সত্ত্বেও স্মরণে রাখতে হবে যে সকল কর্ম সকল মানুষের জন্য উপযোগী নয়। এইজন্য ভগবান বর্ণাশ্রম ধর্মের ওপর খুব জোর দিয়েছেন। যে বর্ণের জন্য যে কর্ম বিহিত, সেই বর্ণের জন্য ঐ কর্মই কর্তব্য, অন্য বর্ণের জন্য নয় ; এই কথা মনে রেখেই কর্ম করতে হবে। এইভাবে বর্ণাশ্রমধর্মের দ্বারা নিয়ত কর্তব্যকর্ম নিজ নিজ অধিকার আর রুচি অনুসারে মনুষ্যমাত্রেই করতে সমর্থ। বর্ণাশ্রমধর্মের অতিরিক্ত মানব মাত্রের জন্য পালনীয় সদাচার, ভক্তি প্রভৃতির সাধনা তো সকলেই করতে পারে।

কিছু লোক মনে করে যে সাংখ্যযোগের অধিকার সন্ন্যাসীদের জন্যই রয়েছে, অন্য আশ্রমের জন্য নয়। এই কথা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় না। ভগবান তো সাংখ্যের দৃষ্টিতেও যুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছেন (২।১৮)। ভগবান যদি কেবল সন্ন্যাসীদেরই সাংখ্যযোগের অধিকারী মনে করতেন, তাহলে তিনি অর্জুনকে সাংখ্যযোগের দৃষ্টিতে কখনো যুদ্ধ করার নির্দেশ দিতেন না। কেননা, সন্ন্যাস আশ্রমে কর্মমাত্রেরই ত্যাগের কথা বলা হয়েছে, তাহলে যুদ্ধরূপী ঘোর কর্মের কী কথা ? আর অর্জুন তো সন্ন্যাসীও ছিলেন না। তাঁকে ভগবান জ্ঞানীদের কাছে গিয়ে জ্ঞানার্জন পর্যন্ত করার কথা বলেছেন (৪।৩৪)।

এর অতিরিক্ত, তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে ভগবান সাংখ্যযোগের সিদ্ধি কেবল কর্মের স্বরূপতঃ ত্যাগ করলেই হয় না বলে জানিয়েছেন। যদি ভগবান কেবল সন্ন্যাসীদেরই সাংখ্যযোগের অধিকারী মনে করতেন, তাহলে তো সাংখ্যযোগের জন্য কর্মের স্বরূপতঃ (বাহ্যতঃ) ত্যাগ আবশ্যক বলে জানাতেন এবং এই কথা বলতেন না যে কর্মকে স্বরূপতঃ ত্যাগ করলেই সাংখ্যযোগের সিদ্ধি হয় না। শুধু তাই নয় ; ১৩।৭-১১ তে যেখানে জ্ঞানের সাধনা বলেছেন, সেইখানেও একটি সাধনা হল স্ত্রী-পুত্র-ধন-গৃহাদিতে আসক্তি এবং মমত্বের ত্যাগ—

'অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু'

স্ত্রী, পুত্র, ধন, গৃহাদির সঙ্গে স্বরূপতঃ সম্বন্ধ থাকলে তবেই তাদের প্রতি আসক্তি এবং মমত্ব ত্যাগের কথা বলা যেতে পারে। সন্ন্যাস আশ্রমে এদের স্বরূপতই ত্যাগ হয়ে যায়। এই অবস্থায় যদি সন্ন্যাসীদেরই জ্ঞানযোগের সাধনার অধিকারী মনে করা হয়, তাহলে তাঁদের জন্য এই সবের প্রতি আসক্তি এবং মমত্ব ত্যাগের কথা বলা অনাবশ্যক ছিল।

তৃতীয় কথা হল এই যে অষ্টাদশ অধ্যায়ে যেখানে অর্জুন প্রকৃত সন্ন্যাস এবং ত্যাগের সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন, সেইখানে ভগবান সন্ন্যাসের স্থানে সাংখ্যযোগেরই বর্ণনা করেছেন (১৩ থেকে ৪০ শ্লোক পর্যন্ত), সন্ন্যাস আশ্রমের উল্লেখ কোথাও করেননি। যদি ভগবানের 'সন্ন্যাস' শব্দের দ্বারা সন্ন্যাস-আশ্রম অভিপ্রেত হত অথবা সাংখ্যযোগের অধিকারী রূপে তিনি কেবল সন্ন্যাসীকেই মনে করতেন, তাহলে এই প্রসঙ্গে অবশ্যই স্পষ্ট শব্দে তার উল্লেখ করতেন। এইসব কথার দ্বারা এইটিই স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে সাংখ্যযোগের অধিকার সন্ন্যাসী, গৃহস্থ, সবারই সমানভাবে রয়েছে। হ্যাঁ, এই কথা অবশ্যই বলা যায় যে সাংখ্যযোগের সাধনা করার জন্য সন্ন্যাস আশ্রমে আনুকূল্য বেশি। এই দৃষ্টিতে সাংখ্যযোগের সাধনের জন্য সন্ন্যাস-আশ্রমকে গৃহস্থাশ্রম অপেক্ষা অধিক সুবিধাজনক বলা যেতে পারে।

কর্মযোগের সাধনায় কর্মের প্রাধান্য রয়েছে আর রয়েছে স্ববর্ণোচিত বিহিত কর্ম করার জন্য বিশেষরূপে নির্দেশ (৩।৮ ; ১৮।৪৫ ; ৪৬), বরং কর্মের স্বরূপতঃ ত্যাগকে এতে বাধক বলা হয়েছে (৩।৪), এইজন্য সন্ন্যাস-আশ্রমে কর্মপ্রধান কর্মযোগের আচরণ হতে পারে না। কেননা, সেইখানে দ্রব্য এবং যজ্ঞ-দানাদি কর্মের

স্বরূপতঃ আগেই হয়ে যায়। কিন্তু, ভগবানের প্রতি ভক্তি সকল আশ্রমেই করা যায়। তাই, ভক্তিপ্রধান কর্মযোগ সকল আশ্রমেই করা যেতে পারে।

কিছু লোকের মধ্যে এই বিভ্রান্তি রয়েছে যে গীতা তো কেবল সাধু-সন্ন্যাসীদেরই জন্য, গৃহস্থের জন্য নয়। এইজন্য তাঁরা প্রায় এই ভয়ে সন্তানদের গীতা পাঠ করতে দেন না। কারণ, গীতা পড়লে তো তারা গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করে চলে যাবে। কিন্তু, তাঁদের এরূপ ধারণা এইবারেই ভ্রান্ত। এটি উপরের কথায় স্পষ্ট হয়ে যায়। তাঁরা একবারের জন্যও ভেবে দেখেন না যে, মোহের কারণে স্ব-ক্ষাত্রধর্মে বিমুখ হয়ে ভিক্ষার অন্নে জীবন নির্বাহ করার জন্য উদ্যত অর্জুন গীতার যে রহস্যময় উপদেশের দ্বারা আজীবন গৃহস্থাশ্রমে থেকে নিজের কর্তব্যপালন করেছেন, সেই গীতাশাস্ত্রের এই বিপরীত পরিণাম কী ভাবে হতে পারে ? এই শুধু নয়, গীতার উপদেষ্টা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যতদিন এই ধরাধামে অবতাররূপে বর্তমান ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত তিনি কর্ম করে গেছেন—সাধুদের রক্ষা এবং দুর্জনদের সংহার করে জগৎকে উদ্ধার করেছেন এবং ধর্মের সংস্থাপন করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি এই পর্যন্তও বলেছেন যে, যদি আমি সতর্ক হয়ে কর্ম না করি, তাহলে তো জনগণ আমায় দেখে কর্ম পরিত্যাগ করে অলস হয়ে পড়বে, আর এভাবে লোকেদের মর্যাদা ছিন্নভিন্ন করার দায়িত্ব আমার ওপরই বর্তাবে (৩।২৩-২৪)। এর অর্থ আবার এও নয় যে, গীতা সন্ন্যাসীদের জন্য নয়। গীতা সকল বর্ণ এবং আশ্রমবাসীদের জন্যই। সকলেই নিজ নিজ বর্ণাশ্রমের কর্ম পালনের মাধ্যমে সাংখ্য বা যোগ—দুইয়ের কোনো একটি নিষ্ঠায় যুক্ত থেকে অধিকার অনুসারে সাধনা করতে পারে।

গীতায় ভক্তি

গীতায় ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম—সকল বিষয়েই বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সকল পথের অনুসরণকারীদের পাথেয় এতে সঞ্চিত রয়েছে। কিন্তু, অর্জুন ছিলেন ভগবানের ভক্ত। তাই, সকল বিষয়ের প্রতিপাদন করতে গিয়েও যেখানে অর্জুনকে স্বয়ং আচরণ করার কথা বলেছেন, সেখানে ভগবান প্রায়শঃ তাঁকে ভক্তিপ্রধান কর্মযোগেরই উপদেশ দিয়েছেন (৩।৩০ ; ৮।৭ ; ১২।৮ ; ১৮।৫৭ ; ৬২, ৬৫, ৬৬)। কোথাও কোথাও কেবল কর্ম করারও কথা বলেছেন (২।৪৮, ৫০ ; ৩।৮, ৯, ১৯ ; ৪।৪২ ; ৬।৪৬ ; ১১।৩৩-৩৪), কিন্তু এর সঙ্গেও অন্যান্য স্থলের বর্ণনা অনুসারে ভক্তির অধ্যাহার করে নিতে হবে। চতুর্থ অধ্যায়ের ৩৪ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান যেখানে অর্জুনকে জ্ঞানীদের কাছে গিয়ে জ্ঞানার্জনের কথা বলেছেন, তা হল জ্ঞানলাভের প্রণালী জানানো তথা অর্জুনকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে। বাস্তবে ভগবানের কথার তাৎপর্য অর্জুনকে জ্ঞানার্জনের জন্য কোনো জ্ঞানীর কাছে পাঠানো নয় এবং অর্জুনও ঐ প্রক্রিয়াতে কোথাও গিয়ে জ্ঞানার্জন করেননি। উপক্রম এবং উপসংহার দেখলেও এটিই প্রতীত হয় যে গীতার শেষকথা হল শরণাগতি। যদিও গীতার উপদেশ **'অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্'** (২।১১)—এই শ্লোক হতে আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু এই উপক্রমের বীজ **'কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ'** (২।৭) অর্জুনের এই উক্তিতে রয়েছে, যাতে **'প্রপন্নম্'** পদের দ্বারা শরণাগতির ভাব স্পষ্টই প্রকাশ পায়। এইজন্য **'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য'** (১৮।৬৬)—এই শ্লোকের দ্বারা ভগবান শরণাগতির কথা বলে উপদেশের উপসংহার করেছেন।

গীতার এমন কোনো অধ্যায়ই নেই যেখানে কোথাও না কোথাও ভক্তির প্রসঙ্গ নেই। উদাহরণের জন্য নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলি দেখা যেতে পারে। ২।৬১, ৩।৩০, ৪।১১, ৫।২৯, ৬।৪৭, ৭।১৪, ৮।১৪, ৯।৩৪, ১০।৯, ১১।৫৪, ১২।২, ১৩।১০, ১৪।২৬, ১৫।১৯, ১৬।১ (যাতে **'জ্ঞানযোগ-ব্যবস্থিতিঃ'** পদের দ্বারা ভগবানের ধ্যানের কথা বলা হয়েছে), ১৭।২৭ এবং ১৮।৬৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য। এইভাবে প্রত্যেক অধ্যায়ে ভক্তির প্রসঙ্গ এসেছে। সপ্তম হতে দ্বাদশ অধ্যায় তো ভক্তিযোগের প্রকরণে পূর্ণ। এইজন্য এই ছয়টি অধ্যায়কে ভক্তিপ্রধান মনে করা হয়। এখানে উদাহরণের জন্য প্রতিটি অধ্যায়ের একটি করে শ্লোক সংখ্যা দেওয়া হয়েছে।

এই প্রকারে জ্ঞানপ্রধান শ্লোকও বহু অধ্যায়ে পাওয়া যায়। যেমন—২।২৯, ৩।২৮, ৪।২৪, ৫।১৩, ৬।২৯, ৮।১৩, ৯।১৫, ১২।৩, ১৩।৩৪, ১৪।১৯, ১৮।৪৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য। এদের মধ্যেও দ্বিতীয়, পঞ্চম, ত্রয়োদশ,

চতুর্দশ তথা অষ্টাদশ অধ্যায়গুলিতে জ্ঞানপ্রধান শ্লোক বেশি রয়েছে।

গীতায় যেভাবে ভক্তি এবং জ্ঞানের রহস্য স্পষ্ট করে উন্মোচিত হয়েছে, সেইভাবেই কর্মের রহস্যও ভালোভাবে প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৯ হতে ৫৩ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত, তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোক থেকে ৩৫ সংখ্যা শ্লোক পর্যন্ত, চতুর্থ অধ্যায়ের ১৩ হতে ৩২ সংখ্যা পর্যন্ত, পঞ্চম অধ্যায়ের ২ হতে ৭ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১ম থেকে ৪ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত কর্মের রহস্য পূর্ণরূপে বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যেও দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৭ শ্লোক এবং চতুর্থ অধ্যায়ের ১৬ হতে ১৮ নং সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত কর্মের রহস্যের বিবেচনা বিশেষ ভাবে করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য অধ্যায়েও কর্মের বর্ণনা রয়েছে।

স্থান সংক্ষেপের জন্য বেশি প্রমাণ দেওয়া যাচ্ছে না। এর দ্বারা এইটিই প্রমাণিত হয় যে গীতায় কেবল ভক্তিরই বর্ণনা নেই—জ্ঞান, কর্ম এবং ভক্তি—এই তিনটিই গীতায় সম্যক্‌ভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে।

সগুণ-নির্গুণের উপাসনা এবং তত্ত্ব

পূর্বে এই কথা বলা হয়েছে যে পরমাত্মার উপাসনা ভেদ-দৃষ্টিতে করা হোক বা অভেদ-দৃষ্টিতে, দুটিরই ফল এক—এই কথা কীভাবে বলা হয় ? কেননা, ভেদোপাসককে তো ভগবান সাকার রূপে দর্শন দেন এবং এই শরীর ত্যাগের পর তিনি পরম ধামে গমন করেন এবং অভেদ-উপাসক নিজেই ব্রহ্মরূপ হয়ে যান, তাঁর গমনাগমন নেই। এর উত্তর হল এই যে, ওপরে যে কথা বলা হল, তা যথার্থই এবং প্রশ্নকর্তা যে কথা বলেছেন, তাও ঠিক। দুইয়েরই সমন্বয় কীভাবে হয়, এখন সেই বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

সাধনাকালে সাধক যে প্রকারের ভাব এবং শ্রদ্ধায় ভাবিত হয়ে পরমাত্মার উপাসনা করেন, তাঁর সেই ভাবেরই অনুসারে ভগবৎপ্রাপ্তি হয়। যিনি অভেদরূপে অর্থাৎ নিজেকে পরমাত্মা হতে অভিন্ন মনে করে পরমাত্মার উপাসনা করলে অভেদরূপে তাঁর পরমাত্মার প্রাপ্তি ঘটে। আর, যিনি ভেদরূপে তাঁকে ভজনা করেন, তিনি ভেদরূপেই তাঁর দর্শন লাভ করেন। সাধকের ধারণা অনুসারে পরমাত্মা সেই রূপে তাঁকে দর্শন দেন।

ভেদোপাসনা এবং অভেদোপাসনা—দুই-ই পরমাত্মার উপাসনা। কেননা, পরমাত্মা সগুণ-নির্গুণ, সাকার-নিরাকার, ব্যক্ত-অব্যক্ত—সব কিছুই। যে ব্যক্তি পরমাত্মাকে নির্গুণ-নিরাকার মনে করেন, তাঁর জন্য তিনি নির্গুণ-নিরাকার (১২।৩) ; যিনি তাঁকে সগুণ-নিরাকার মনে করেন, তাঁর জন্য তিনি সগুণ-নিরাকার (৮।৯) এবং যিনি তাঁকে সর্বশক্তিমান, সর্বাধার, সর্বব্যাপী, সর্বোত্তম অর্থাৎ সর্বপ্রকার উত্তম গুণে যুক্ত মনে করেন, তাঁর জন্য তিনি সকল সদ্‌গুণ-সম্পন্ন (১৬।১৫, ১৭, ১৯[ক])। যে ব্যক্তি তাঁকে সর্বরূপ মনে করেন, তার জন্য তিনি সর্বরূপ (৭।৭–১২ ; ৯।১৬-১৯)। যিনি তাঁকে সগুণ সাকার মনে করেন, তাঁর জন্য তিনি সগুণ সাকার রূপে আবির্ভূত হন (৪।৮ ; ৯।২৬)।

ওপরে যে কথা বলা হল, তা তো ঠিকই ; কিন্তু, তার দ্বারা প্রশ্নকর্তার মূল প্রশ্নের সমাধান হয়নি, তা যেমনটি ছিল তেমনই রয়ে গেল। প্রশ্ন ছিল যখন ভগবান সকল সাধকের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন রূপে মিলিত হন, তখন তার ফল একই হয় কী করে ? এর উত্তর হল, প্রথমে পরমাত্মা সাধকের ঐ ভাব অনুসারেই উপলব্ধ হন। তারপরে ভগবানের যথার্থ তত্ত্বের যে উপলব্ধি হয়, তা বাক্যের দ্বারা বলা যায় না, সেটি অনির্বচনীয় তথা শব্দের অতীত। ভেদ অথবা অভেদরূপে যত প্রকারেই পরমাত্মার উপাসনা হয়ে থাকে, ঐ সবেরই অন্তিম ফল একই হয়। এই কথা স্পষ্ট করার জন্য ভগবান অভেদোপাসককে নিজের প্রাপ্তির কথা বলেছেন (১২।৪ ; ১৪।১৯ ; ১৮।৫৫) এবং ভেদোপাসকের জন্য বলেছেন যে তিনি ব্রহ্মকে লাভ করেন (১৪।২৬), চির শান্তি লাভ করেন (৯।৩১), ব্রহ্মকে অবগত হন (৭।২৯), অবিনাশী শাশ্বত পদ লাভ করেন (১৮।৫৬) ইত্যাদি ইত্যাদি। অভেদোপাসনা এবং ভেদোপাসনা—দুই প্রকারের

[ক]পূর্বোক্ত শ্লোকে ভগবানের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর বর্ণনা রয়েছে। অতএব ১৫।১৫ সংখ্যক শ্লোকে 'অপোহন' শব্দের অর্থ জ্ঞান এবং স্মৃতিনাশ না ধরে সংশয়-বিপর্যয়ের নাশ ধরা হয়েছে।

উপাসনার ফল একই হয়, এই কথাকে লক্ষ্য করাবার জন্য ভগবান একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে বর্ণনা করেছেন।

ভেদোপাসক এবং অভেদোপাসক দুইয়ের দ্বারা প্রাপ্ত বস্তু, যথার্থ তত্ত্ব একই ; তাঁকেই কোথাও প্রাপ্ত এবং শাশ্বত স্থান নামে বলা হয়েছে (১৮।৬২), কোথাও পরম ধাম নামে (১৫।৬), কোথাও অমৃতের নামে (১৩।১২), কোথাও 'মাম্' দ্বারা (৯।৩৪), কোথাও পরমগতি নামে (৮।১৩), কোথাও সংসিদ্ধি নামে (১৮।৪৫), কোথাও অব্যয় পদের নামে (১৫।৫), কোথাও ব্রহ্মনির্বাণ নামে (৫।২৪) এবং কোথাও নির্বাণপরমা শান্তি নামে (৬।১৫) ব্যক্ত করা হয়েছে। আরো কিছু শব্দ গীতায় ঐ অন্তিম ফলের অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। কিন্তু, সেই তত্ত্ব সকল সাধনেরই অন্তিম ফল—এর অতিরিক্ত তাঁর বিষয়ে আর কিছুই বলা যেতে পারে না। তিনি বাক্যের বিষয় নন। যিনি তাঁকে লাভ করেছেন, তিনিই তাঁকে জানেন। কিন্তু, তিনিও তাঁকে বর্ণনা করতে সমর্থ নন। ওপরে কথিত শব্দ এবং এই রকমের অন্য শব্দসমূহের দ্বারা শাখাচন্দ্র ন্যায়ে তাঁকে লক্ষ্যমাত্র করানো হয়। তাই, সকল সাধনার ফলস্বরূপ যে পরম তত্ত্ব, তা একই—এই কথা যুক্তিসঙ্গত।

পরমাত্মার এই তাত্ত্বিক স্বরূপ অলৌকিক, পরম রহস্যময় এবং গুহ্যতম। যিনি তাঁকে পেয়েছেন, তিনিই তাঁকে জানেন। কিন্তু, এই কথাও তাঁকে লক্ষ্য করানোর উদ্দেশ্যেই বলা হয়। যুক্তির দ্বারা বিচার করলে এই কথাও বলা যায় না।

গীতায় সমত্ব

গীতায় সমত্বের কথা প্রধানরূপে উল্লিখিত হয়েছে। সমত্বই হল ভগবৎপ্রাপ্তির কষ্টিপাথর। জ্ঞান, কর্ম এবং ভক্তি—তিনটি পথেই সাধনরূপেও সমত্বের প্রয়োজন জানানো হয়েছে এবং তিনটি পথেই পরমাত্মাকে যাঁরা লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যেও এক অসাধারণ লক্ষণরূপে যেটি বলা হয়েছে তা হল সমভাব। সমত্ব ব্যতিরেকে সাধনা অসম্পূর্ণ এবং সিদ্ধি তো সুদূর পরাহত। যাঁর মধ্যে সমত্ব নেই, তিনি কখনও সিদ্ধপুরুষ হতে পারেন না। **'সমদুঃখসুখম্'** পদের দ্বারা জ্ঞানমার্গের সাধকদের মধ্যে সমত্বসম্পন্ন ব্যক্তিকেই অমৃতত্বের অর্থাৎ মুক্তির অধিকারী বলা হয়েছে (২।১৫)। **'সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে'**—এই প্রকার কর্মযোগের সাধককে সমত্বযুক্ত হয়ে কর্ম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (২।৪৮) এবং ভক্তিমার্গের সাধকের জন্যও এই সমত্ব ধারণ করার কথা বলা হয়েছে (১২।২০)। এইভাবে গুণাতীত বা সিদ্ধ জ্ঞানযোগীর লক্ষণসমূহের মধ্যেও সমত্বের সমাবেশ প্রধানরূপে লক্ষ করা যায় (১৪।২৪-২৫) এবং সিদ্ধ কর্মযোগীকেও 'সম' বলা হয়েছে (৬।৭-৯) তথা সিদ্ধ ভক্তের লক্ষণসমূহেও সমত্বের উল্লেখ রয়েছে (১২।১৮-১৯)।

এই সমত্বের তত্ত্ব সহজ সরল এবং ভালোভাবে বোঝাবার জন্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বিভিন্নভাবে সকল প্রাণী, ক্রিয়া, ভাব এবং পদার্থে সমত্বের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন—

মানুষের মধ্যে সমত্ব

সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু ।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে॥

(৬।৯)

'সুহৃদ্, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, আত্মীয়গণ, ধর্মাত্মা এবং পাপীদের প্রতিও যিনি সমভাব পোষণ করেন, তিনিই অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ।'

মানুষ এবং পশুদের মধ্যে সমত্ব

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

(৫।১৮)

'জ্ঞানী ব্যক্তিরা বিদ্যা এবং বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ এবং গো, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডালেও সমদর্শী হয়ে থাকেন।'

সকল জীবের প্রতি সমত্ব

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥

(৬।৩২)

'হে অর্জুন ! যে যোগী নিজের মতো সকল প্রাণীতে সম-ভাব পোষণ করেন এবং সুখ ও দুঃখকেও সমানভাবে দেখেন সেই যোগীকেই পরম শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়।'

কোথাও কোথাও ভগবান ব্যক্তি, ক্রিয়া, পদার্থ এবং ভাবের সমত্বকে একই সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। যেমন—

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ।।
(১২।১৮)

'যিনি শত্রু-মিত্র এবং মান-অপমানে সম থাকেন ও শীত-গ্রীষ্ম এবং সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বেও সম থাকেন, আর আসক্তিশূন্য হন (তিনিই হলেন ভক্ত)।'

এইখানে শত্রু-মিত্র 'ব্যক্তির' বাচক, মান-অপমান 'পরকৃত ক্রিয়া', শৈত্য-উষ্ণ 'পদার্থ' আর সুখ-দুঃখ হল 'ভাব'।

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ।।
(১৪।২৪)

'যিনি নিরন্তর আত্মভাবে স্থিত ; সুখ-দুঃখকে সমান মনে করেন ; মৃত্তিকা, প্রস্তর এবং স্বর্ণে যাঁর সমান ভাব ; যিনি জ্ঞানী, প্রিয় এবং অপ্রিয়কে একই প্রকার মনে করেন আর নিজের নিন্দা ও স্তুতিকে সমান ভাবেই গ্রহণ করেন (তিনিই হলেন গুণাতীত)।'

এতেও সুখ-দুঃখ হল ভাব ; মৃত্তিকা, পাথর ও সোনা হল পদার্থ ; নিন্দা-স্তুতি 'পরকৃত ক্রিয়া' ; আর, প্রিয়-অপ্রিয় হল 'প্রাণী', 'ভাব', 'পদার্থ' এবং 'ক্রিয়া' —সব কিছুরই বাচক।

এইভাবে যিনি সর্বত্র সমদৃষ্টি রক্ষা করেন — ব্যবহারিক দৃষ্টিতে শুধুমাত্র অহং ও মমত্ব থাকলেও যিনি সবকিছুতে সমবুদ্ধি রক্ষা করেন, যাঁর সমষ্টিরূপ সমগ্র সংসারে সমভাব, তিনিই সমতাযুক্ত পুরুষ এবং তিনিই হলেন প্রকৃত সাম্যবাদী।

গীতার সাম্যবাদ এবং আজকাল যাকে সাম্যবাদ বলে, উভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। বর্তমানের সাম্যবাদ ঈশ্বর-বিরোধী আর গীতার সাম্যবাদ সর্বত্র ঈশ্বরকে দর্শন করে। ঐটি ধর্মের নাশক, আর এটি পদে পদে ধর্মের ধারক ও পোষক। ঐটি হিংসাময়, আর এটি অহিংসার প্রতিপাদক ; ঐটি স্বার্থমূলক আর এটিতে স্বার্থের লেশমাত্রও নেই ; ঐটি পান-ভোজন-স্পর্শাদিতে পার্থক্য না রেখে অন্তরে ভেদভাব রক্ষা করে আর, এইটি পান-ভোজন-স্পর্শাদিতে শাস্ত্রমর্যাদানুসারে যথাযোগ্য বিভেদ রক্ষা করেও অন্তরে ভেদ রাখে না এবং সকলের মধ্যে পরমাত্মাকে সমানভাবে দর্শনের শিক্ষা দান করে ; ঐটির লক্ষ্য কেবল অর্থের উপাসনা, আর এর লক্ষ্য হল পরমাত্মার প্রাপ্তি। ঐটিতে রয়েছে নিজের দলের অভিমান এবং অন্যের প্রতি অনাদর, এতে রয়েছে সর্বপ্রকারে অভিমানশূন্যতা এবং সমগ্র জগতে পরমাত্মাকে দর্শন করে সকলকে সম্মান করা, ঐটিতে রয়েছে বাহ্যিক ব্যবহারের প্রাধান্য, এতে রয়েছে ভিতরের ভাবের প্রাধান্য ; ঐটিতে ভৌতিক সুখই মুখ্য, এতে মুখ্য হল আধ্যাত্মিক সুখ ; ঐটিতে রয়েছে পরধন এবং পরমতে অসহিষ্ণুতা, এতে রয়েছে সকলের সমান সমাদর ; ওতে রয়েছে আসক্তি এবং বিদ্বেষ, আর এতে রয়েছে আসক্তি ও বিদ্বেষ-রহিত ব্যবহার।

জীবের গতি

গীতায় গুণ এবং কর্মানুসারে জীবের উত্তম, মধ্যম এবং কনিষ্ঠ—এই তিন প্রকার গতির কথা বলা হয়েছে। কর্মযোগ এবং সাংখ্যযোগের দৃষ্টিতে শাস্ত্রোক্ত কর্ম এবং উপাসনাকারীদের গতির বর্ণনা অষ্টম অধ্যায়ের চতুর্বিংশ শ্লোকে বলা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে যাঁরা যোগভ্রষ্ট হন তাঁদের গতির বর্ণনা ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৪০ থেকে ৪৫নং শ্লোকে করা হয়েছে। সেখানে এই কথা বলা হয়েছে যে তাঁরা মৃত্যুর পর স্বর্গাদি লোকে গিয়ে সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত সেখানে দিব্যলোকের সুখ ভোগ করে পবিত্র আচরণসম্পন্ন ঐশ্বর্যবানের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন অথবা স্বর্গে গমন না করে সোজা যোগীদের কুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেইখানে পূর্বের অভ্যাসবশতঃ আবার যোগের সাধনে প্রবৃত্ত হয়ে পরম গতি লাভ করেন।

সকামভাবে বিহিত কর্ম এবং উপাসনাকারীদের গতির বর্ণনা নবম অধ্যায়ে বিংশ এবং একবিংশ শ্লোকে করা হয়েছে—ঐখানে স্বর্গের কামনায় বেদবিহিত যাগ-যজ্ঞাদি কর্মের অনুষ্ঠানকারীদের স্বর্গভোগপ্রাপ্তি এবং পুণ্য ক্ষয়ে তাঁদের আবার মর্ত্যলোকে পতনের কথা বলা হয়েছে। এই ব্যক্তিরা কোন্ পথে কীভাবে স্বর্গে গমন করেন, তার প্রক্রিয়া অষ্টম অধ্যায়ের পঞ্চবিংশ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে।

চতুর্দশ অধ্যায়ের ১৪, ১৫ এবং ১৮ সংখ্যক শ্লোকে সাধারণভাবে সকল মানুষের গতির কথা সংক্ষেপে বলা হয়েছে। সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিকালে যাদের

দেহত্যাগ হয়, সেই মানুষেরা মৃত্যুর পর উত্তম গতি লাভ করে ; রজোগুণের বৃদ্ধিতে দেহত্যাগী মানুষ মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে আর তমোগুণের আধিক্যে মৃত্যু হলে তারা মৃত্যুর পর পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ এবং বৃক্ষাদি যোনীতে জন্মগ্রহণ করে। এইভাবে সত্ত্বগুণে স্থিত মানুষ মরণান্তে উর্ধ্বলোকে গমন করে, রজোগুণে স্থিত রাজসলোক মনুষ্যলোকে ফিরে আসে এবং তমোগুণে স্থিত তামস ব্যক্তি অধোগতি অর্থাৎ নরক এবং তির্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হয়। ষোড়শ অধ্যায়ের ১৯ এবং ২০ সংখ্যক শ্লোকে আসুরী প্রকৃতির তমোগুণযুক্ত মানুষদের সম্বন্ধে ভগবান বলেছেন যে তাদের আমি বারবার আসুরী যোনিতে অর্থাৎ কুকুর-শূকরাদির জন্মে পতিত করি আর এরপর তারা ঘোর নরকে পতিত হয়। এইভাবে অন্যান্য স্থানেও গুণ-কর্ম অনুসারে গীতায় জীবের গতির কথা বলা হয়েছে। মুক্তপুরুষের গতির বর্ণনা বিস্তৃতভাবে সাংখ্য এবং যোগের ফলরূপে স্থানে স্থানে বলা হয়েছে। জীবন্মুক্ত পুরুষের কোথাও গমনাগমন করতে হয় না। তিনি তো এইখানেই পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লাভ করেন।

গীতার কতিপয় প্রধান কথা

(১) গুণাবলীর পরিচয়

গীতায় সাত্ত্বিক-রাজস-তামস পদার্থ, ভাব এবং কর্মের কিছু প্রধান লক্ষণ বলা হয়েছে। সেইগুলি হল—

(ক) যে ভাব বা কর্মের সঙ্গে স্বার্থের সম্বন্ধ থাকে না এবং যা আসক্তি ও মমত্বশূন্য এবং যার ফল হল ভগবৎ-প্রাপ্তি, তাকে সাত্ত্বিক বলে জানতে হবে।

(খ) যে ভাব কর্মে লোভ, স্বার্থ এবং আসক্তির সম্বন্ধ থাকে তথা যার ফল হল ক্ষণিক সুখ এবং অন্তিম পরিণাম দুঃখ, তাকে রাজস বলা হয়।

(গ) যে ভাব বা কর্মে হিংসা, মোহ এবং প্রমাদ থাকে তথা যার ফল দুঃখ এবং অজ্ঞান, তাকে তামস বলে জানতে হবে।

এইভাবে তিন প্রকারের ভাব এবং কর্মের ভেদ বলে ভগবান সাত্ত্বিক ভাব এবং কর্ম গ্রহণ করার এবং রাজস ও তামস ভাব এবং কর্ম ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

(২) গীতায় আচরণের অপেক্ষা ভাবের প্রাধান্য

যদিও উত্তম আচরণ এবং অন্তঃকরণের উত্তম ভাব—দুটিকেই গীতায় উদ্ধারের সাধন বলে মানা হয়েছে, কিন্তু প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ভাবকেই। দ্বিতীয়, দ্বাদশ এবং চতুর্দশ অধ্যায়ের অন্তে ক্রমশঃ স্থিতপ্রজ্ঞ, ভক্ত এবং গুণাতীত পুরুষের লক্ষণগুলিতে ভাবেরই প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে (২।৫৫ থেকে ৭১ ; ১২।১৩ থেকে ১৯ ; ১৪।২২ থেকে ২৫)। দ্বিতীয় এবং চতুর্দশ অধ্যায়ে তো অর্জুন প্রশ্ন করেছেন আচরণের প্রাধান্য নিয়ে, কিন্তু ভগবান উত্তর দিয়েছেন ভাবেরই প্রাধান্য অনুসারে।

গীতা অনুসারে সকামভাবে কৃত যজ্ঞ, দান, তপ, সেবা, পূজাদি সর্বোচ্চ ক্রিয়ার অপেক্ষা নিষ্কামভাবে করা যুদ্ধ, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প এবং সেবাদি ছোট ছোট কর্মও মুক্তিদায়ক হওয়ার শ্রেষ্ঠ (২।৪০, ৪৯ ; ১২।১২ ; ১৮।৪৬), চতুর্থ অধ্যায়ে যেখানে কয়েক প্রকারের যজ্ঞরূপ সাধনের কথা বলা হয়েছে (৪।২৪ থেকে ৩২) তাতেও ভাবের প্রাধান্যেই মুক্তির কথা বলা হয়েছে।

গীতা এবং বেদ

গীতা বেদকে খুবই মর্যাদা দেয়। ভগবান নিজেকে সকলে বেদের দ্বারা জ্ঞাতব্য, বেদান্তের রচয়িতা এবং বেদসমূহের জ্ঞাতা—এই কথা জানিয়ে বেদের মহিমা বৃদ্ধি করেছেন (১৫।১৫)। সংসাররূপী অশ্বত্থ বৃক্ষের বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান বলেছেন যে, মূলসহ ঐ বৃক্ষকে বস্তুতঃ যে জানে, বাস্তবে সেই বেদের তত্ত্ব জানে (১৫।১)। এই কথায় ভগবানের তাৎপর্য হল, জগতের কারণ যে পরমাত্মা, তাঁকে এবং জগতের বাস্তবিক স্বরূপকে তত্ত্বতঃ জানা— এতেই বেদের তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। ভগবান বলেছেন যে—'যে কথা বেদে বিভাগপূর্বক বলা হয়েছে, তাই আমি বলছি (১৩।৪)।' এইভাবে নিজের উক্তির সমর্থনে বেদকে প্রমাণরূপে বলে ভগবান বেদকে খুবই মর্যাদা প্রদান করেছেন। ভগবান ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ এবং সামবেদ—এই বেদত্রয়কে নিজের স্বরূপ বলে তাকে অত্যধিক সম্মান জানিয়েছেন (৯।১৭)। বেদসমূহকে ভগবান তাঁর নিজের থেকে আবির্ভূত বলেছেন (৩।১৫ ; ১৭।২৩)। ভগবান জানিয়েছেন যে, ঈশ্বর-লাভের বহুবিধ পন্থা বেদে কথিত হয়েছে (৪।৩২)। এর দ্বারা যেন ভগবান স্পষ্টরূপে এই

কথা বলছেন যে বেদে কেবল ভোগপ্রাপ্তির উপায়েরই বর্ণনা নেই —যেমন কিছু অবিবেকী মানুষ মনে করে। কিন্তু, ঈশ্বর-লাভেরও দুটি-চারটি নয়, বহুবিধ সাধনের বর্ণনায় বেদ পরিপূর্ণ। ভগবান পরমপদের নামে নিজের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন যে বেদবেত্তাগণ তাঁকে অক্ষর (ওঙ্কার) নামের দ্বারা নির্দেশ করেন (৮।১১)। এর দ্বারা ভগবান এইটিই সূচিত করছেন যে বেদে সকাম পুরুষের দ্বারা লভ্য শুধুমাত্র ইহলোকের এবং স্বর্গের অনিত্য ভোগের বর্ণনা নেই, তাতে পরমাত্মার অবিনাশী স্বরূপেরও বিশদ্ বর্ণনা রয়েছে। ওপরের বর্ণনায় একথা খুবই স্পষ্ট যে, বেদকে ভগবান খুবই মর্যাদা দিয়েছেন।

এতে এই প্রশ্ন উৎপন্ন হয় যে, তাহলে ভগবান কয়েকটি স্থলে বেদের নিন্দা করেছেন কেন ? উদাহরণরূপে বলা যায় যে, ভগবান সকাম পুরুষকে বেদবাদে রত এবং অবিবেকী বলেছেন (২।৪২) তথা বেদকে ত্রিগুণের কার্যরূপ সাংসারিক ভোগ এবং তার সাধনের প্রতিপাদক বলে অর্জুনকে ঐ ভোগরাশিতে অনাসক্ত হওয়ার জন্য বলেছেন (২।৪৫) এবং বেদত্রয়ে প্রতিপাদিত ধর্মের আশ্রয়গ্রহণকারী সকাম ব্যক্তি সম্বন্ধে ভগবান এই কথাই বলেছেন যে সে বারবার জন্ম ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সংসারে গমনাগমনের চক্র হতে সে মুক্তি লাভ করে না (৯।২১)। এই অবস্থায় কোনটি মানা হবে ?

এই প্রশ্নের উত্তর হল এই যে, পূর্বোক্ত বাক্যের দ্বারা যদিও বেদের নিন্দা প্রতীত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেখানে বেদের নিন্দা করা হয়নি। গীতায় সকাম ভাবের চেয়ে নিষ্কাম ভাবের মহত্ত্বকেই বেশি করে ঘোষণা করা হয়েছে এবং ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সেটি খুবই আবশ্যক বলে জানানো হয়েছে। সেইজন্য তুলনামূলকভাবে সকাম ভাবকে নিম্ন শ্রেণীর এবং যে বিষয়-সুখ বিনাশশীল, সেটির প্রদানকারী বলার জন্যই স্থানে স্থানে তার তুচ্ছতা সিদ্ধ করা হয়েছে, নিষিদ্ধকর্মের মতো তার নিন্দা করা হয়নি। যেখানে বেদের ফল লঙ্ঘন হবার কথা বলেছেন, সেখানেও সকাম কর্মকে লক্ষ্য করেই ঐরকম বলা হয়েছে (৮।২৮)। ওপরের আলোচনায় এই কথা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে ভগবান গীতায় কোথাও বেদের নিন্দা করেননি, বরং নানা স্থানে বেদের প্রশংসা করেছেন।

গীতা এবং সাংখ্যদর্শন তথা যোগদর্শন

কিছু লোক মনে করে যে গীতায় যেখানে যেখানে 'সাংখ্য' শব্দের প্রয়োগ হয়েছে, সেটি মহর্ষি কপিলের দ্বারা প্রবর্তিত সাংখ্যদর্শনের বাচক। কিন্তু এই কথা যুক্তিসঙ্গত নয়। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্রমাগত তিনটি শ্লোকে (১৯, ২০ এবং ২১) এবং অন্যত্রও 'প্রকৃতি' এবং 'পুরুষ'— এই দুটি শব্দ একসঙ্গে প্রযুক্ত হয়েছে। আর প্রকৃতি-পুরুষ তো সাংখ্যের বিশেষ শব্দ হওয়াতে অনেকে মনে করেন যে গীতায় কপিলকৃত সাংখ্যের সিদ্ধান্ত মানা হয়েছে। এইভাবে 'যোগ' শব্দকেও কিছু ব্যক্তি পাতঞ্জলযোগের বাচক বলে মনে করেন। পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারম্ভে এবং অন্যত্রও অনেক স্থানে 'সাংখ্য' আর 'যোগ' শব্দ একই জায়গায় প্রযুক্ত হয়েছে। এর দ্বারাও কিছু লোক মনে করে যে 'সাংখ্য' এবং 'যোগ' শব্দ ক্রমশঃ মহর্ষি কপিল কথিত সাংখ্য এবং পাতঞ্জল যোগের বাচক ; কিন্তু, এই কথা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় না। গীতায় কথিত সাংখ্য মহর্ষি কপিলের সাংখ্য নয় এবং গীতার যোগও মহর্ষি পাতঞ্জলির যোগ নয়। নিম্ন লিখিত আলোচনায় এই কথা স্পষ্ট হয়ে যায়।

(১) গীতাতে ঈশ্বরকে যে রূপে মানা হয়েছে, সাংখ্যদর্শন সেই রূপ মানে না।

(২) যদিও 'প্রকৃতি' শব্দ গীতায় কয়েক স্থানে প্রযুক্ত হয়েছে, কিন্তু গীতার প্রকৃতি এবং সাংখ্যের প্রকৃতির মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। কপিল সাংখ্যের 'প্রকৃতি' হল গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা। কিন্তু, গীতার 'প্রকৃতি' হল গুণত্রয়ের কারণ, গুণ তার কার্য (১৪।৫)। সাংখ্য প্রকৃতিকে নিত্য এবং অনাদি মনে করে। গীতাতেও প্রকৃতিকে অনাদি বলা হয়েছে (১৩।১৯) কিন্তু, নিত্য নয়।

(৩) গীতার 'পুরুষ' এবং সাংখ্যের 'পুরুষ'-এর মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। মহর্ষি কপিলের সাংখ্যের মতে পুরুষ 'বহু'। কিন্তু গীতার সাংখ্য পুরুষকে 'এক' বলেই মনে করে (১৩।২২, ৩০ ; ১৮।২০)।

(৪) গীতার 'মুক্তি' এবং সাংখ্যের 'মুক্তি'তেও বিরাট ব্যবধান রয়েছে। সাংখ্যের মতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হল মুক্তির স্বরূপ। গীতা অনুসারে 'মুক্তি'তে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি তো রয়েছে কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে

পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মার প্রাপ্তিও আছে (৬।২১-২২)।

(৫) ওপরে কথিত সিদ্ধান্তভেদ ছাড়াও পাতঞ্জল যোগে 'যোগের' অর্থ হল— 'চিত্তবৃত্তির নিরোধ'। কিন্তু, গীতায় প্রকরণ অনুসারে 'যোগ' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। (২।৫৩-এর টীকা দেখুন)।

এইভাবে গীতা এবং সাংখ্যদর্শন তথা যোগদর্শনের সিদ্ধান্তে প্রভূত পার্থক্য রয়েছে।

এই গীতার টীকা রচনা কেন ?

বহুদিন থেকে কিছু বন্ধুর আগ্রহ এবং প্রেরণা ছিল যে আমি নিজের ভাব অনুসারে গীতার ওপর একটি বিস্তৃত টীকা লিখি। গীতার ওপর পূজ্যপাদ আচার্য, সন্ত-মহাত্মা এবং শাস্ত্রমর্মজ্ঞ বিদ্বদ্‌বৃন্দ যে বহু ভাষ্য, টীকা এবং ব্যাখ্যা রচনা করেছেন সেই সবই সমাদরের যোগ্য। সবগুলিতে নিজ নিজ দৃষ্টিতে তাঁরা গীতার মর্ম বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু, সেই সবের অধিকাংশই সংস্কৃতে রচিত আর সেগুলি বিশেষ করে বিদ্বজ্জনদের লক্ষ্য করে রচিত হয়েছে। এইজন্য আমার বন্ধুরা বলেছিলেন যে, সরল ভাষায় এমন এক সর্বজনের উপযোগী টীকা লিখি যা সকলেই বুঝতে পারবে এবং যাতে গীতার তাৎপর্য সবিস্তারে বলা হবে। এই দৃষ্টিতে এবং এতে সবচেয়ে অধিক উপকার তো আমারই হবে, এই কথা চিন্তা করে এই কার্য আরম্ভ করি। এই কার্য প্রথমে যেমন সহজ বলে মনে হয়েছিল পরে গিয়ে দেখি তা ততই কঠিন।

আমি জানি যে যোগ্যতা এবং অধিকার— দুভাবেই আমার এই প্রয়াস দুঃসাহসিক কার্য। বর্ণের দিক থেকে আমি তো এক বৈশ্যের সন্তান। আর বিদ্যা-বুদ্ধির দৃষ্টিতেও আমি নিজেকে এই কার্যের নিতান্ত অযোগ্য বলে মনে করি। তাই, আমি গীতার ন্যায় সর্বমান্য গ্রন্থের টীকা রচনায় সর্বপ্রকারে অনধিকারী। এবার গীতার ভাব উপলব্ধি করা নিয়ে যদি বলা হয় তাহলে বলব, শ্রীভগবানের উপদেশের সম্পূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি করা তো দূরের কথা— তার শতাংশের একাংশও যে আমি বুঝতে পেরেছি—এই কথা বলা আমার পক্ষে দুঃসাহসই হবে। ভগবানের উপদেশের যৎকিঞ্চিৎও বুঝে তাকে জীবনে বাস্তবায়িত করা তো আরো কঠিন। তাকে তিনিই কাজে লাগাতে পারেন, যাঁর ওপর ভগবানের বিশেষ কৃপা রয়েছে। পুরো উপদেশ অনুসারে আচরণ করা তো দূরের কথা, যিনি গীতার সাধনাত্মক যে কোনো একটি শ্লোক অনুসারেও নিজের জীবনকে তৈরি করতে পারেন, সেই ব্যক্তি তো বাস্তবে ধন্যই এবং তাঁর চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। এইরূপ ব্যক্তিই গীতা-ব্যাখ্যার প্রকৃত অধিকারী।

যাই হোক, আমার তো এই প্রয়াস সবরকমে দুঃসাহসপূর্ণ এবং ছেলে-মানুষির মতো। তবুও এই নিমিত্তে গীতার তাৎপর্যের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা হল, ভগবানের দিব্য উপদেশের মনন হল, অধ্যাত্ম বিষয়ের কিছুটা চর্চা হল এবং জীবনের এই সময়টা খুবই ভালো কাজে ব্যয় হল—এই জন্য আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। এর দ্বারা আমার গীতা সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি হল এবং ভুলেরও অনেক মার্জনা হল। তবুও ভুল তো এই কাজে পদে পদে হয়ে থাকবে। কেননা গীতার তাৎপর্যের একাংশও পুরোপুরি আমি বুঝেছি, এই কথা বলতে পারি না। গীতার বাস্তবিক তাৎপর্য পূর্ণভাবে তো স্বয়ং শ্রীভগবানই জানেন। আর, অংশতঃ কিছু অর্জুন জানেন, যাঁর উদ্দেশে ভগবান এই গীতা ব্যক্ত করেছেন। অথবা, যাঁর ঈশ্বর-লাভ হয়েছে, ভগবৎকৃপায় যাঁর পূর্ণ অনুভূতি হয়েছে, তিনিও কিছুটা জানতে পারেন। আমি এই বিষয়ে কী বলতে পারি ? যে সকল পূজ্য মহাত্মা গীতার ওপর ভাষ্য অথবা টীকা লিখেছেন, আমি তো তাঁদের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ও ঋণী। কেননা, এই টীকা লেখার সময় আমি বিশেষভাবে বহু ভাষ্য এবং টীকার সাহায্য নিয়েছি। এইজন্য সেই সকল বন্দনীয় পুরুষদের প্রতি আমি আন্তরিক সকৃতজ্ঞ কোটি কোটি প্রণাম জানাই।

হ্যাঁ, এই টীকার সম্বন্ধে আমি নিঃসংকোচে এই কথা বলতে পারি যে এইটি সর্বপ্রকারে অপূর্ণ। ভগবানের ভাবকে ব্যক্ত করা তো দূরের কথা, অনেক স্থানে তা বুঝতে আমার ভুল হতে পারে, আর অনেক স্থানে তার বিপরীত ভাবও এসে যেতে পারে। ঐসব ভুলের জন্য আমি দয়ালু পরমাত্মা এবং সকল গীতাপ্রেমিকের কাছে করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি যা কিছু লিখেছি, তা নিজের তুচ্ছ বুদ্ধি অনুসারে লিখেছি। আর, এইভাবে নিজের অপূর্ণ উপলব্ধির পরিচয় দিতে গিয়ে আমি যে

শিশুসুলভ চাপল্য করেছি, তা যেন বিদ্বজ্জনেরা ক্ষমা করেন। এই টীকায় আমি কোনো আচার্য অথবা টীকাকারের সিদ্ধান্ত উল্লেখও করিনি, খণ্ডনও করিনি। কিন্তু, নিজের কথা বলার সময় কারো বিরুদ্ধে কোনো কথা এসে পড়তে পারে, এইজন্য সবার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। খণ্ডন-মণ্ডন করা বা কোনো সিদ্ধান্তকে অন্য সিদ্ধান্তের সঙ্গে তুলনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়।

টীকা রচনাকালে যথাসাধ্য লক্ষ্য রেখেছি যে কোথাও পূর্বাপর বিরোধ যেন না আসে। কিন্তু টীকার কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ায় কোথাও কোথাও এই ধরনের ত্রুটি থেকে যেতে পারে। আশা করি, বিজ্ঞ পাঠকগণ এই ধরনের ভুল সংশোধন করে নেবেন এবং দয়া করে আমাকেও জানাবেন।

এই টীকা লেখার সময় আমি বহু পূজ্য মহানুভব, মিত্র এবং বন্ধুদের কাছ থেকে অমূল্য সাহায্য পেয়েছি। বর্তমানের রীতি অনুসারে তাঁদের নাম উল্লেখ করা আবশ্যক। কিন্তু, আমি যদি তা করি, তাহলে প্রথমতঃ তাঁদের কষ্ট দেওয়া হবে। দ্বিতীয়তঃ, তাঁদের সঙ্গে যেরকম সম্পর্ক রয়েছে, তাতে তাঁদের প্রশংসা করতে গিয়ে নিজেরই প্রশংসা করা হবে। এইজন্য আমি তাঁদের কারোরই নাম উল্লেখ না করে এইটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করি যে তাঁরা যদি মনোযোগের সঙ্গে এই কার্যে সহযোগিতা না করতেন, তাহলে এই টীকা এই রূপে কখনো প্রকাশিত হতে পারত না।

এই টীকা প্রথমে ১৯৯৬ বিক্রম সংবতে (তদনুসারে বঙ্গাব্দ ১৩৪৬ সালে) 'গীতা-তত্ত্বাঙ্ক' নামে প্রকাশিত হয়। সেই সময় জানানো হয়েছিল যে পুস্তকরূপে প্রকাশকের সময় ভুল সংশোধনের চেষ্টা করা যেতে পারে। সেই অনুসারে কোথাও ভাষার দৃষ্টিতে এবং কোথাও ছাপার ভুল এবং কোথাও কোথাও নতুন ভাবের সংযোজনও করা হয়েছে। কিন্তু, এখনও বহু ত্রুটি থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর কোথাও দোষদৃষ্টিতে নূতন ভুল হবারও সম্ভাবনা। তাই, পরিশেষে আমার সকলের নিকট আবার করবদ্ধ প্রার্থনা রইল যে আমার এই শিশুসুলভ চাপল্যের জন্য সুধী সজ্জনেরা প্রসন্ন হয়ে আমার ভুল সংশোধন করে নিন, আর সেই ভুল জানিয়ে আমাকে অনুগ্রহ করুন।

বিনীত—

জয়দয়াল গোয়েন্দকা

টীকা সম্বন্ধে কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য

গীতার এই বিস্তৃত টীকা গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত সাধারণ ভাষা-টীকার আধারে, ১৯৯৬ বিক্রম সংবতে (তদনুসারে বঙ্গাব্দ ১৩৪৬ সালে) লিখিত হয় এবং গীতা-তত্ত্বাঙ্ক রূপে প্রকাশিত হয়। এখন সেটি পুস্তকরূপে তত্ত্ববিবেচনী নামে প্রকাশ করা হচ্ছে। তাই, বহু স্থানে তার ভাষার সংশোধন করা হয়েছে। ভাব প্রায় ঐরূপই রাখা হয়েছে, কোথাও কোথাও কিছু নতুন ভাব সংযোজিত হওয়ায় পরিবর্তনও করা হয়েছে।

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের জন্য যে সব ভিন্ন ভিন্ন সম্বোধনের প্রয়োগ করা হয়েছে, সেইগুলির শব্দার্থ না দিয়ে প্রায়ই সেই সব শ্লোকের অর্থে 'শ্রীকৃষ্ণ' এবং 'অর্জুন' শব্দেরই প্রয়োগ করা হয়েছে। আর কোথাও কোথাও 'পরন্তপ' আদি শব্দ যেমনটি আছে, তেমনই রেখে দেওয়া হয়েছে, খুব কম ক্ষেত্রেই সেইগুলির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেখানে যেখানে কোনো সম্বোধন কোনো বিশেষ অভিপ্রায়কে সূচিত করার জন্য প্রযুক্ত বলে মনে হয়েছে, কেবল সেই ক্ষেত্রেই ঐ অভিপ্রায়কে প্রশ্নোত্তররূপে উন্মোচিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

টীকায় যেখানে অন্যান্য গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, সেখানে ঐ সব গ্রন্থের উল্লেখ কোথাও কোথাও সংকেতরূপে প্রদত্ত হয়েছে—যেমন উপনিষদের 'উঃ'। এই টীকায় যে সব গ্রন্থের সহায়তা নেওয়া হয়েছে, সেইগুলির নামের তালিকা পাঠকদের সুবিধার জন্য পৃথকভাবে দেওয়া হয়েছে। যেখানে গ্রন্থের নাম না দিয়ে কেবল সংখ্যাই দেওয়া হয়েছে, সেই সব স্থলে ঐটি গীতার শ্লোকসংখ্যা বুঝে নিতে হবে। অধ্যায় এবং শ্লোকসংখ্যাকে সোজা লাইন দিয়ে পৃথক করা হয়েছে। বাঁদিকে অধ্যায়-সংখ্যা এবং ডানদিকে শ্লোক-সংখ্যা বুঝে নিতে হবে।

শ্লোকের ভাবকে স্পষ্ট করার জন্য এবং বাক্যের রচনাকে আধুনিক ভাষাশৈলীর অনুকূল করার জন্য টীকায় মূলের চেয়ে বেশি শব্দ যত্রতত্র জুড়ে দেওয়া হয়েছে এবং ভাষার প্রবাহ যাতে নষ্ট না হয়, এইজন্য সেইগুলির ক্ষেত্রে বন্ধনী পরিহার করা হয়েছে। কোনো কোনো স্থলে যেখানে পূর্ণ বাক্য উপর থেকে সংযুক্ত হয়েছে, সেখানে বন্ধনীর প্রয়োগ করা হয়েছে। যতদূর সম্ভব অর্থকে অন্বয়ের অনুকূল করা হয়েছে এবং মূল পদের বিভক্তিও রক্ষার চেষ্টা হয়েছে। এইজন্য কোথাও কোথাও বাক্যরচনা ভাষার দৃষ্টিতে সুন্দর হতে পারেনি। তবুও মূল পদের অর্থ রক্ষা করতে গিয়ে ভাষার সৌন্দর্যের ওপরও যথাসাধ্য মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নোত্তরের ক্রম প্রায় সর্বত্র অর্থের ক্রমানুসারে রক্ষিত হয়েছে, তবে কোথাও কোথাও তা শ্লোকের ক্রমানুসারেও রাখা হয়েছে, খুব কম স্থলেই এই ক্রমের পরিবর্তন করা হয়েছে।

প্রশ্নোত্তরের সময় যেখানে সংস্কৃতের বিভক্তিসহ পদগুলিকে নেওয়া হয়েছে, সেখানে সেইগুলির জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিভাষানুসারে 'পদ' শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। আর, যেখানে হিন্দীর রূপ দেওয়া হয়েছে, সেখানে সেগুলোকে 'শব্দ' বলা হয়েছে। প্রশ্নাবলীতে যেখানে কোনো পদ, শব্দ বা বাক্যের ভাব বা অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, সেগুলোর উত্তরে কোথাও কোথাও তো ঐ পদ, শব্দ বা বাক্যের শুধু অর্থ দেওয়া হয়েছে এবং কোথাও কোথাও হেতুসহ ঐ পদ, শব্দ বা বাক্যের তাৎপর্য জানানো হয়েছে। দুভাবেই ঐসকল প্রশ্নের উত্তরে দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্নোত্তরের সময় কোথাও কোথাও অন্বয়ক্রমে মূল শ্লোকের অংশকে ভিত্তি করে প্রশ্ন করা হয়েছে। আবার কোথাও কোথাও অর্থের বাক্যাংশকে ভিত্তি করে প্রশ্ন করা হয়েছে। অর্থের বাক্যাংশকেও কোথাও কোথাও অবিকলরূপে উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং কোথাও কোথাও শব্দতে কিছু পরিবর্তন করে ঐগুলির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এর অতিরিক্ত কোথাও কোথাও কিছু নতুন প্রশ্নও আছে। প্রশ্নতে 'অভিপ্রায়', 'ভাবাদি' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলির মধ্যে কিছু অর্থের পর্যায়ে ব্যবহৃত হয়েছে এবং কিছু বিশেষ কথা জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়েছে।

গীতায় **'এতন্মে সংশয়ম্'** (৬।৩৯), **'হে সখেতি'**,

দেহত্যাগ হয়, সেই মানুষেরা মৃত্যুর পর উত্তম গতি লাভ করে ; রজোগুণের বৃদ্ধিতে দেহত্যাগী মানুষ মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে আর তমোগুণের আধিক্যে মৃত্যু হলে তারা মৃত্যুর পর পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ এবং বৃক্ষাদি যোনীতে জন্মগ্রহণ করে। এইভাবে সত্ত্বগুণে স্থিত মানুষ মরণান্তে উর্ধ্বলোকে গমন করে, রজোগুণে স্থিত রাজসলোক মনুষ্যলোকে ফিরে আসে এবং তমোগুণে স্থিত তামস ব্যক্তি অধোগতি অর্থাৎ নরক এবং তির্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হয়। ষোড়শ অধ্যায়ের ১৯ এবং ২০ সংখ্যক শ্লোকে আসুরী প্রকৃতির তমোগুণযুক্ত মানুষদের সম্বন্ধে ভগবান বলেছেন যে তাদের আমি বারবার আসুরী যোনিতে অর্থাৎ কুকুর-শূকরাদির জন্মে পতিত করি আর এরপর তারা ঘোর নরকে পতিত হয়। এইভাবে অন্যান্য স্থানেও গুণ-কর্ম অনুসারে গীতায় জীবের গতির কথা বলা হয়েছে। মুক্তপুরুষের গতির বর্ণনা বিস্তৃতভাবে সাংখ্য এবং যোগের ফলরূপে স্থানে স্থানে বলা হয়েছে। জীবন্মুক্ত পুরুষের কোথাও গমনাগমন করতে হয় না। তিনি তো এইখানেই পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লাভ করেন।

গীতার কতিপয় প্রধান কথা

(১) গুণাবলীর পরিচয়

গীতায় সাত্ত্বিক-রাজস-তামস পদার্থ, ভাব এবং কর্মের কিছু প্রধান লক্ষণ বলা হয়েছে। সেইগুলি হল—

(ক) যে ভাব বা কর্মের সঙ্গে স্বার্থের সম্বন্ধ থাকে না এবং যা আসক্তি ও মমত্বশূন্য এবং যার ফল হল ভগবৎ-প্রাপ্তি, তাকে সাত্ত্বিক বলে জানতে হবে।

(খ) যে ভাব কর্মে লোভ, স্বার্থ এবং আসক্তির সম্বন্ধ থাকে তথা যার ফল হল ক্ষণিক সুখ এবং অন্তিম পরিণাম দুঃখ, তাকে রাজস বলা হয়।

(গ) যে ভাব বা কর্মে হিংসা, মোহ এবং প্রমাদ থাকে তথা যার ফল দুঃখ এবং অজ্ঞান, তাকে তামস বলে জানতে হবে।

এইভাবে তিন প্রকারের ভাব এবং কর্মের ভেদ বলে ভগবান সাত্ত্বিক ভাব এবং কর্ম গ্রহণ করার এবং রাজস ও তামস ভাব এবং কর্ম ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

(২) গীতায় আচরণের অপেক্ষা ভাবের প্রাধান্য

যদিও উত্তম আচরণ এবং অন্তঃকরণের উত্তম ভাব—দুটিকেই গীতায় উদ্ধারের সাধন বলে মানা হয়েছে, কিন্তু প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ভাবকেই। দ্বিতীয়, দ্বাদশ এবং চতুর্দশ অধ্যায়ের অন্তে ক্রমশঃ স্থিতপ্রজ্ঞ, ভক্ত এবং গুণাতীত পুরুষের লক্ষণগুলিতে ভাবেরই প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে (২।৫৫ থেকে ৭১ ; ১২।১৩ থেকে ১৯ ; ১৪।২২ থেকে ২৫)। দ্বিতীয় এবং চতুর্দশ অধ্যায়ে তো অর্জুন প্রশ্ন করেছেন আচরণের প্রাধান্য নিয়ে, কিন্তু ভগবান উত্তর দিয়েছেন ভাবেরই প্রাধান্য অনুসারে।

গীতা অনুসারে সকামভাবে কৃত যজ্ঞ, দান, তপ, সেবা, পূজাদি সর্বোচ্চ ক্রিয়ার অপেক্ষা নিষ্কামভাবে করা যুদ্ধ, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প এবং সেবাদি ছোট ছোট কর্মও মুক্তিদায়ক হওয়ার শ্রেষ্ঠ (২।৪০, ৪৯ ; ১২।১২ ; ১৮।৪৬), চতুর্থ অধ্যায়ে যেখানে কয়েক প্রকারের যজ্ঞরূপ সাধনের কথা বলা হয়েছে (৪।২৪ থেকে ৩২) তাতেও ভাবের প্রাধান্যেই মুক্তির কথা বলা হয়েছে।

গীতা এবং বেদ

গীতা বেদকে খুবই মর্যাদা দেয়। ভগবান নিজেকে সকলে বেদের দ্বারা জ্ঞাতব্য, বেদান্তের রচয়িতা এবং বেদসমূহের জ্ঞাতা—এই কথা জানিয়ে বেদের মহিমা বৃদ্ধি করেছেন (১৫।১৫)। সংসাররূপী অশ্বত্থ বৃক্ষের বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান বলেছেন যে, মূলসহ ঐ বৃক্ষকে বস্তুতঃ যে জানে, বাস্তবে সেই বেদের তত্ত্ব জানে (১৫।১)। এই কথায় ভগবানের তাৎপর্য হল, জগতের কারণ যে পরমাত্মা, তাঁকে এবং জগতের বাস্তবিক স্বরূপকে তত্ত্বতঃ জানা— এতেই বেদের তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। ভগবান বলেছেন যে—'যে কথা বেদে বিভাগপূর্বক বলা হয়েছে, তাই আমি বলছি (১৩।৪)।' এইভাবে নিজের উক্তির সমর্থনে বেদকে প্রমাণরূপে বলে ভগবান বেদকে খুবই মর্যাদা প্রদান করেছেন। ভগবান ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ এবং সামবেদ—এই বেদত্রয়কে নিজের স্বরূপ বলে তাকে অত্যধিক সম্মান জানিয়েছেন (৯।১৭)। বেদসমূহকে ভগবান তাঁর নিজের থেকে আবির্ভূত বলেছেন (৩।১৫ ; ১৭।২৩)। ভগবান জানিয়েছেন যে, ঈশ্বর-লাভের বহুবিধ পন্থা বেদে কথিত হয়েছে (৪।৩২)। এর দ্বারা যেন ভগবান স্পষ্টরূপে এই

কথা বলছেন যে বেদে কেবল ভোগপ্রাপ্তির উপায়েরই বর্ণনা নেই —যেমন কিছু অবিবেকী মানুষ মনে করে। কিন্তু, ঈশ্বর-লাভেরও দুটি-চারটি নয়, বহুবিধ সাধনের বর্ণনায় বেদ পরিপূর্ণ। ভগবান পরমপদের নামে নিজের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন যে বেদবেত্তাগণ তাঁকে অক্ষর (ওঙ্কার) নামের দ্বারা নির্দেশ করেন (৮।১১)। এর দ্বারা ভগবান এইটিই সূচিত করছেন যে বেদে সকাম পুরুষের দ্বারা লভ্য শুধুমাত্র ইহলোকের এবং স্বর্গের অনিত্য ভোগের বর্ণনা নেই, তাতে পরমাত্মার অবিনাশী স্বরূপেরও বিশদ্ বর্ণনা রয়েছে। ওপরের বর্ণনায় একথা খুবই স্পষ্ট যে, বেদকে ভগবান খুবই মর্যাদা দিয়েছেন।

এতে এই প্রশ্ন উৎপন্ন হয় যে, তাহলে ভগবান কয়েকটি স্থলে বেদের নিন্দা করেছেন কেন ? উদাহরণরূপে বলা যায় যে, ভগবান সকাম পুরুষকে বেদবাদে রত এবং অবিবেকী বলেছেন (২।৪২) তথা বেদকে ত্রিগুণের কার্যরূপ সাংসারিক ভোগ এবং তার সাধনের প্রতিপাদক বলে অর্জুনকে ঐ ভোগরাশিতে অনাসক্ত হওয়ার জন্য বলেছেন (২।৪৫) এবং বেদত্রয়ে প্রতিপাদিত ধর্মের আশ্রয়গ্রহণকারী সকাম ব্যক্তি সম্বন্ধে ভগবান এই কথাই বলেছেন যে সে বারবার জন্ম ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সংসারে গমনাগমনের চক্র হতে সে মুক্তি লাভ করে না (৯।২১)। এই অবস্থায় কোনটি মান্য হবে ?

এই প্রশ্নের উত্তর হল এই যে, পূর্বোক্ত বাক্যের দ্বারা যদিও বেদের নিন্দা প্রতীত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেখানে বেদের নিন্দা করা হয়নি। গীতায় সকাম ভাবের চেয়ে নিষ্কাম ভাবের মহত্ত্বকেই বেশি করে ঘোষণা করা হয়েছে এবং ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সেটি খুবই আবশ্যক বলে জানানো হয়েছে। সেইজন্য তুলনামূলকভাবে সকাম ভাবকে নিম্ন শ্রেণীর এবং যে বিষয়-সুখ বিনাশশীল, সেটির প্রদানকারী বলার জন্যই স্থানে স্থানে তার তুচ্ছতা সিদ্ধ করা হয়েছে, নিষিদ্ধকর্মের মতো তার নিন্দা করা হয়নি। যেখানে বেদের ফল লঙ্ঘন হবার কথা বলেছেন, সেখানেও সকাম কর্মকে লক্ষ্য করেই ঐরকম বলা হয়েছে (৮।২৮)। ওপরের আলোচনায় এই কথা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে ভগবান গীতায় কোথাও বেদের নিন্দা করেননি, বরং নানা স্থানে বেদের প্রশংসা করেছেন।

গীতা এবং সাংখ্যদর্শন তথা যোগদর্শন

কিছু লোক মনে করে যে গীতায় যেখানে যেখানে 'সাংখ্য' শব্দের প্রয়োগ হয়েছে, সেটি মহর্ষি কপিলের দ্বারা প্রবর্তিত সাংখ্যদর্শনের বাচক। কিন্তু এই কথা যুক্তিসঙ্গত নয়। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্রমাগত তিনটি শ্লোকে (১৯, ২০ এবং ২১) এবং অন্যত্রও 'প্রকৃতি' এবং 'পুরুষ' — এই দুটি শব্দ একসঙ্গে প্রযুক্ত হয়েছে। আর প্রকৃতি-পুরুষ তো সাংখ্যের বিশেষ শব্দ হওয়াতে অনেকে মনে করেন যে গীতায় কপিলকৃত সাংখ্যের সিদ্ধান্ত মানা হয়েছে। এইভাবে 'যোগ' শব্দকেও কিছু ব্যক্তি পাতঞ্জলযোগের বাচক বলে মনে করেন। পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারম্ভে এবং অন্যত্রও অনেক স্থানে 'সাংখ্য' আর 'যোগ' শব্দ একই জায়গায় প্রযুক্ত হয়েছে। এর দ্বারাও কিছু লোক মনে করে যে 'সাংখ্য' এবং 'যোগ' শব্দ ক্রমশঃ মহর্ষি কপিল কথিত সাংখ্য এবং পাতঞ্জল যোগের বাচক ; কিন্তু, এই কথা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় না। গীতায় কথিত সাংখ্য মহর্ষি কপিলের সাংখ্য নয় এবং গীতার যোগও মহর্ষি পাতঞ্জলির যোগ নয়। নিম্ন লিখিত আলোচনায় এই কথা স্পষ্ট হয়ে যায়।

(১) গীতাতে ঈশ্বরকে যে রূপে মানা হয়েছে, সাংখ্যদর্শন সেই রূপ মানে না।

(২) যদিও 'প্রকৃতি' শব্দ গীতায় কয়েক স্থানে প্রযুক্ত হয়েছে, কিন্তু গীতার প্রকৃতি এবং সাংখ্যের প্রকৃতির মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। কপিল সাংখ্যের 'প্রকৃতি' হল গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা। কিন্তু, গীতার 'প্রকৃতি' হল গুণত্রয়ের কারণ, গুণ তার কার্য (১৪।৫)। সাংখ্য প্রকৃতিকে নিত্য এবং অনাদি মনে করে। গীতাতেও প্রকৃতিকে অনাদি বলা হয়েছে (১৩।১৯) কিন্তু, নিত্য নয়।

(৩) গীতার 'পুরুষ' এবং সাংখ্যের 'পুরুষ'-এর মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। মহর্ষি কপিলের সাংখ্যের মতে পুরুষ 'বহু'। কিন্তু গীতার সাংখ্য পুরুষকে 'এক' বলেই মনে করে (১৩।২২, ৩০ ; ১৮।২০)।

(৪) গীতার 'মুক্তি' এবং সাংখ্যের 'মুক্তি'তেও বিরাট ব্যবধান রয়েছে। সাংখ্যের মতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হল মুক্তির স্বরূপ। গীতা অনুসারে 'মুক্তি'তে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি তো রয়েছে কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে

পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মার প্রাপ্তিও আছে (৬।২১-২২)।

(৫) ওপরে কথিত সিদ্ধান্তভেদ ছাড়াও পাতঞ্জল যোগে 'যোগের' অর্থ হল— 'চিত্তবৃত্তির নিরোধ'। কিন্তু, গীতায় প্রকরণ অনুসারে 'যোগ' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। (২।৫৩-এর টীকা দেখুন)।

এইভাবে গীতা এবং সাংখ্যদর্শন তথা যোগদর্শনের সিদ্ধান্তে প্রভূত পার্থক্য রয়েছে।

এই গীতার টীকা রচনা কেন ?

বহুদিন থেকে কিছু বন্ধুর আগ্রহ এবং প্রেরণা ছিল যে আমি নিজের ভাব অনুসারে গীতার ওপর একটি বিস্তৃত টীকা লিখি। গীতার ওপর পূজ্যপাদ আচার্য, সন্ত-মহাত্মা এবং শাস্ত্রমর্মজ্ঞ বিদ্বদ্‌বৃন্দ যে বহু ভাষ্য, টীকা এবং ব্যাখ্যা রচনা করেছেন সেই সবই সমাদরের যোগ্য। সবগুলিতে নিজ নিজ দৃষ্টিতে তাঁরা গীতার মর্ম বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু, সেই সবের অধিকাংশই সংস্কৃতে রচিত আর সেগুলি বিশেষ করে বিদ্বজ্জনদের লক্ষ্য করে রচিত হয়েছে। এইজন্য আমার বন্ধুরা বলেছিলেন যে, সরল ভাষায় এমন এক সর্বজনের উপযোগী টীকা লিখি যা সকলেই বুঝতে পারবে এবং যাতে গীতার তাৎপর্য সবিস্তারে বলা হবে। এই দৃষ্টিতে এবং এতে সবচেয়ে অধিক উপকার তো আমারই হবে, এই কথা চিন্তা করে এই কার্য আরম্ভ করি। এই কার্য প্রথমে যেমন সহজ বলে মনে হয়েছিল পরে গিয়ে দেখি তা ততই কঠিন।

আমি জানি যে যোগ্যতা এবং অধিকার— দুভাবেই আমার এই প্রয়াস দুঃসাহসিক কার্য। বর্ণের দিক থেকে আমি তো এক বৈশ্যের সন্তান। আর বিদ্যা-বুদ্ধির দৃষ্টিতেও আমি নিজেকে এই কার্যের নিতান্ত অযোগ্য বলে মনে করি। তাই, আমি গীতার ন্যায় সর্বমান্য গ্রন্থের টীকা রচনার সর্বপ্রকারে অনধিকারী। এবার গীতার ভাব উপলব্ধি করা নিয়ে যদি বলা হয় তাহলে বলব, শ্রীভগবানের উপদেশের সম্পূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি করা তো দূরের কথা— তার শতাংশের একাংশও যে আমি বুঝতে পেরেছি—এই কথা বলা আমার পক্ষে দুঃসাহসই হবে। ভগবানের উপদেশের যৎকিঞ্চিৎও বুঝে তাকে জীবনে বাস্তবায়িত করা তো আরো কঠিন। তাকে তিনিই কাজে লাগাতে পারেন, যাঁর ওপর ভগবানের বিশেষ কৃপা রয়েছে। পুরো উপদেশ অনুসারে আচরণ করা তো দূরের কথা, যিনি গীতার সাধনাত্মক যে কোনো একটি শ্লোক অনুসারেও নিজের জীবনকে তৈরি করতে পারেন, সেই ব্যক্তি তো বাস্তবে ধন্যই এবং তাঁর চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। এইরূপ ব্যক্তিই গীতা-ব্যাখ্যার প্রকৃত অধিকারী।

যাই হোক, আমার তো এই প্রয়াস সবরকমে দুঃসাহসপূর্ণ এবং ছেলে-মানুষির মতো। তবুও এই নিমিত্তে গীতার তাৎপর্যের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা হল, ভগবানের দিব্য উপদেশের মনন হল, অধ্যাত্ম বিষয়ের কিছুটা চর্চা হল এবং জীবনের এই সময়টা খুবই ভালো কাজে ব্যয় হল—এই জন্য আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। এর দ্বারা আমার গীতা সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি হল এবং ভুলেরও অনেক মার্জনা হল। তবুও ভুল তো এই কাজে পদে পদে হয়ে থাকবে। কেননা গীতার তাৎপর্যের একাংশও পুরোপুরি আমি বুঝেছি, এই কথা বলতে পারি না। গীতার বাস্তবিক তাৎপর্য পূর্ণভাবে তো স্বয়ং শ্রীভগবানই জানেন। আর, অংশতঃ কিছু অর্জুন জানেন, যাঁর উদ্দেশে ভগবান এই গীতা ব্যক্ত করেছেন। অথবা, যাঁর ঈশ্বর-লাভ হয়েছে, ভগবৎকৃপায় যাঁর পূর্ণ অনুভূতি হয়েছে, তিনিও কিছুটা জানতে পারেন। আমি এই বিষয়ে কী বলতে পারি ? যে সকল পূজ্য মহাত্মা গীতার ওপর ভাষ্য অথবা টীকা লিখেছেন, আমি তো তাঁদের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ও ঋণী। কেননা, এই টীকা লেখার সময় আমি বিশেষভাবে বহু ভাষ্য এবং টীকার সাহায্য নিয়েছি। এইজন্য সেই সকল বন্দনীয় পুরুষদের প্রতি আমি আন্তরিক সকৃতজ্ঞ কোটি কোটি প্রণাম জানাই।

হ্যাঁ, এই টীকার সম্বন্ধে আমি নিঃসংকোচে এই কথা বলতে পারি যে এইটি সর্বপ্রকারে অপূর্ণ। ভগবানের ভাবকে ব্যক্ত করা তো দূরের কথা, অনেক স্থানে তা বুঝতে আমার ভুল হতে পারে, আর অনেক স্থানে তার বিপরীত ভাবও এসে যেতে পারে। ঐসব ভুলের জন্য আমি দয়ালু পরমাত্মা এবং সকল গীতাপ্রেমিকের কাছে করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি যা কিছু লিখেছি, তা নিজের তুচ্ছ বুদ্ধি অনুসারে লিখেছি। আর, এইভাবে নিজের অপূর্ণ উপলব্ধির পরিচয় দিতে গিয়ে আমি যে

॥ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ॥

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণ মুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগৎ গুরুম্॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(তত্ত্ব-বিবেচনী—গীতার তাত্ত্বিক আলোচনা)

প্রথম অধ্যায়

(অর্জুনবিষাদযোগ)

অধ্যায়ের নাম

শ্রীভগবান অর্জুনকে নিমিত্ত করে সমগ্র বিশ্বকে শ্রীগীতারূপে যে মহান উপদেশ প্রদান করেছেন, এই অধ্যায়টি তারই অবতারণা। এই অধ্যায়ে দুই পক্ষের প্রধান যোদ্ধাদের নাম জানানোর পর প্রধানতঃ অর্জুনের বন্ধুনাশের আশঙ্কা থেকে উৎপন্ন মোহজনিত বিষাদেরই বর্ণনা করা হয়েছে। এইরূপ বিষাদও সুসঙ্গ লাভ হলে জাগতিক ভোগে বৈরাগ্যের চিন্তাদ্বারা কল্যাণের পথে অগ্রসর করে দেয়। সেইজন্য এই অধ্যায়টির নাম রাখা হয়েছে '**অর্জুনবিষাদযোগ**'।

সংক্ষিপ্ত অধ্যায়-সার

এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের কাছে যুদ্ধের বিবরণ জানতে চেয়েছেন, দ্বিতীয় শ্লোকে দুর্যোধন দ্রোণাচার্যের কাছে গিয়ে কী কথা বললেন সঞ্জয় তার বর্ণনা করেছেন, তৃতীয় শ্লোকে দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে বিশাল পাণ্ডব-সেনা দেখতে বলে চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শ্লোক পর্যন্ত সেই সেনাদের বিশিষ্ট যোদ্ধাদের নাম বলেছেন। সপ্তম শ্লোকে দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে সেনানায়কদের ভালোভাবে জেনে নিতে বলে অষ্টম ও নবম শ্লোকে সেনানায়কদের মধ্যে কয়েকজনের নাম এবং সমস্ত বীরদের পরাক্রম এবং যুদ্ধ কৌশল বর্ণনা করেছেন। দশম শ্লোকে নিজ সৈন্যদলকে অজেয় এবং পাণ্ডব সেনাদের তাঁদের থেকে হীনবল জানিয়ে একাদশ শ্লোকে সমস্ত বীরকে ভীষ্মকে রক্ষা করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। দ্বাদশ শ্লোকে পিতামহ ভীষ্মের শঙ্খধ্বনি করার এবং ত্রয়োদশ শ্লোকে কৌরব সৈন্যদের শঙ্খ, নাকাড়া, ঢোল, মৃদঙ্গ, রণসিঙ্গা ইত্যাদি বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র একত্রে ধ্বনিত হওয়ার বর্ণনা করা হয়েছে। চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ শ্লোক পর্যন্ত ক্রমশঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, ভীমসেন, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব ও পাণ্ডব সেনাদের অন্যান্য সমস্ত বিশিষ্ট যোদ্ধাদের নিজ নিজ শঙ্খ ধ্বনিত করার এবং ঊনিশতম শ্লোকে সেই শঙ্খধ্বনির ভয়ংকর শব্দে আকাশ ও পৃথিবী ধ্বনিত হয়ে দুর্যোধনাদির হৃদয় ব্যথিত হওয়ার বর্ণনা আছে। বিশ ও একুশতম শ্লোকে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের রণে উৎসুক দেখে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে রথটি উভয় পক্ষের সৈন্যদলের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন এবং বাইশ ও তেইশতম শ্লোকে সমস্ত সেনাদলকে ভালোভাবে অবলোকন করার জন্য সৈন্যদলের মধ্যস্থলে স্থাপন করতে বললেন। চব্বিশ এবং পঁচিশতম

শ্লোকে অর্জুনের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ রথটি উভয় সৈন্যদলের মধ্যস্থলে স্থাপন করে অর্জুনকে বললেন যুদ্ধে একত্রিত সমস্ত বীরদের দেখে নিতে ; তারপর ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত অর্জুনের সমগ্র স্বজন-বান্ধবকে দেখে ব্যাকুল হওয়া এবং তাঁর শোকাকুল পরিস্থিতির বর্ণনা করা হয়েছে। একত্রিশতম শ্লোকে যুদ্ধের বিপরীত পরিণামের কথা বলে বত্রিশ ও তেত্রিশতম শ্লোকে অর্জুন বিজয় এবং রাজ্যসুখ আকাঙ্ক্ষা না করার জন্য যুক্তিপূর্ণ কথা বললেন। চৌত্রিশ এবং পঁয়ত্রিশতম শ্লোকে আচার্য এবং অন্য স্বজনদের বর্ণনা করে অর্জুন বললেন 'আমাকে হত্যা করলেও অথবা ত্রিলোকের রাজ্যলাভের বিনিময়েও আমি এই আচার্য এবং পিতা-পুত্রাদি আত্মীয়-স্বজনদের বধ করতে চাই না।' ছত্রিশ এবং সাঁইত্রিশতম শ্লোকে অর্জুন দুর্যোধন এবং আত্মীয়-স্বজনেরা আততায়ী হলেও তাদের হত্যা করলে পাপ হবে এবং সুখ-আনন্দ দূরীভূত হবে বলে জানিয়েছেন। আটত্রিশ-উনচল্লিশতম শ্লোকে কুলনাশ ও মিত্রদ্রোহের পাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যুদ্ধ না করাই উচিত বলে জানিয়ে দিয়েছেন। চল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশতম শ্লোকগুলিতে অর্জুন কুলনাশ থেকে উৎপন্ন হওয়া দোষগুলির বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। পঁয়তাল্লিশ ও ছিয়াল্লিশতম শ্লোকে রাজ্য ও সুখাদি লোভে স্বজন বধ করার জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতিকে মহাপাপের আরম্ভ বলে শোক প্রকাশ করে অর্জুন বলেছেন এর থেকে দুর্যোধন ইত্যাদির দ্বারা তাঁর মৃত্যুবরণ করাও শ্রেষ্ঠ। অবশেষে সাতচল্লিশতম শ্লোকে যুদ্ধ না করার জন্য কৃতসংকল্প হয়ে শোকমগ্ন অর্জুন অস্ত্রপরিত্যাগ করে রথে উপবেশন করলেন—এই কথা বলে সঞ্জয় অধ্যায় সমাপ্ত করলেন।

সম্বন্ধ—রাজসূয়যজ্ঞে পাণ্ডবদের বিশাল ঐশ্বর্য দেখে দুর্যোধন অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁর মাতুল শকুনি প্রভৃতির পরামর্শে যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং ছলনা দ্বারা তাঁকে প্রবঞ্চিত করে তাঁদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছিলেন। শেষকালে স্থির হয় যে যুধিষ্ঠির তাঁর চারজন ভ্রাতা ও দ্রৌপদী-সহ দ্বাদশ বৎসর বনবাসে এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে কাটাবেন ; এইভাবে ত্রয়োদশ বৎসর ধরে সমস্ত রাজ্যে দুর্যোধনের আধিপত্য বজায় থাকবে এবং যদি এক বৎসরের অজ্ঞাতবাসের মধ্যে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর কোনো খোঁজ না পাওয়া যায় তাহলে তিনি পাণ্ডবদের রাজত্ব ফিরিয়ে দেবেন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তেরো বছর পর পাণ্ডবেরা যখন তাঁদের রাজ্য ফেরৎ চাইলেন, তখন দুর্যোধন সরাসরি তা নাকচ করে দিলেন। তাঁকে বোঝাবার জন্য রাজা দ্রুপদ ও অন্যান্য জ্ঞানীগুণীজন বহু প্রয়াস করলেন কিন্তু দুর্যোধন কোনোভাবেই রাজ্য ফিরিয়ে দিতে রাজী হলেন না। তখন উভয় পক্ষে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধে আমন্ত্রণ জানাতে দুর্যোধন যেদিন দ্বারকায় পৌঁছলেন, অর্জুনও সেদিন দ্বারকায় গিয়েছিলেন। দুজনে গিয়ে দেখলেন—ভগবান নিদ্রামগ্ন। ভগবানকে নিদ্রাভিভূত দেখে দুর্যোধন তাঁর মাথার কাছে এক মূল্যবান আসনে উপবেশন করলেন এবং অর্জুন করজোড়ে বিনয়ের সঙ্গে তাঁর পদপ্রান্তে দাঁড়িয়ে রইলেন। জেগে উঠে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর সামনে দেখতে পেলেন, পরে পিছনে ঘুরে দেখলেন মাথার কাছে আসনে বসে আছেন দুর্যোধন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুজনকে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে তাঁদের আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন দুর্যোধন বললেন—'আমার এবং অর্জুনের সঙ্গে আপনার একইরকম সখ্যতা, আমরা দুজনেই আপনার আত্মীয় ; কিন্তু আমি আগে এসেছি, নিয়ম হল যে সজ্জন ব্যক্তি প্রথমে আসা ব্যক্তিকে সাহায্য করেন। সমস্ত পৃথিবীতে আপনিই সজ্জন শ্রেষ্ঠ এবং সম্মাননীয়, তাই আপনার আমাকে সাহায্য করা উচিত।' ভগবান বললেন—'আপনি যে প্রথমে এসেছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই ; কিন্তু আমি প্রথমে অর্জুনকেই দেখেছি। তাই আমি দুজনকেই সাহায্য করব। এই সাহায্য আমি দুভাবে করব। এক দিকে আমার অত্যন্ত শক্তিশালী নারায়ণী সেনা থাকবে আর অপরদিকে আমি যুদ্ধ না করার পণ নিয়ে একাকী থাকব এবং রণক্ষেত্রে অস্ত্রধারণও করব না। অর্জুন ! ধর্মানুসারে প্রথমে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করা উচিত ; অতএব এই দুইয়ের মধ্যে তোমার যা পছন্দ, বেছে নাও।' অর্জুন তখন শত্রুনাশন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই চেয়ে নিলেন আর দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণী সেনা চাইলেন এবং তাদের নিয়ে খুশীমনে হস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন।

অতঃপর ভগবান অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন—'অর্জুন ! আমি যখন যুদ্ধই করব না, তখন তুমি কি মনে করে নারায়ণী সেনা ছেড়ে আমাকে বেছে নিলে ?' অর্জুন বললেন—'ভগবান ! আপনি একাই সকলের বিনাশ করতে সক্ষম, আমি তবে কেন আর নারায়ণী সেনা নেব ? তাছাড়াও আমার বহুদিনের ইচ্ছা আপনি আমার সারথি হবেন,

এবার এই মহাযুদ্ধে আপনি আমার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করুন।' ভক্তবৎসল ভগবান অর্জুনের ইচ্ছানুযায়ী তাঁর রথ চালাবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রথের সারথি হলেন এবং যুদ্ধারম্ভকালে কুরুক্ষেত্রে গীতার দিব্য উপদেশ প্রদান করলেন।

দুর্যোধন ও অর্জুন দ্বারকা থেকে ফিরে এসে যখন সৈন্য সমাবেশ করছিলেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং হস্তিনাপুরে গিয়ে দুর্যোধনকে যুদ্ধ থেকে বিরত হবার পরামর্শ দিয়েছিলেন ; কিন্তু দুর্যোধন স্পষ্ট ভাষায় জানালেন—'আমি জীবিত থাকতে পাণ্ডবগণ কখনও রাজত্ব পাবে না, এমনকি সূচাগ্র জমিও আমি তাদের দেব না।' (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ১২৭।২২-২৫)। তখন নিজেদের ন্যায্য অধিকার ফিরে পেতে মাতা কুন্তীর আদেশে এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণায় পাণ্ডবগণ ধর্মযুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

দুপক্ষের যুদ্ধ প্রস্তুতি যখন সম্পূর্ণ, সেইসময় ভগবান বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রের সন্নিকটে এসে বললেন—'তুমি যদি এই ভয়ানক যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করতে চাও, তাহলে আমি তোমাকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করতে পারি।' তখন ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'ব্রহ্মর্ষি শ্রেষ্ঠ ! আমি এই কুলনাশক সংগ্রাম নিজ চোখে দেখতে চাই না, কিন্তু যুদ্ধের পূর্ণ বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শুনতে চাই।' তখন মহর্ষি সঞ্জয়কে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—'সঞ্জয় তোমাকে যুদ্ধের পূর্ণ বিবরণ জানাবে। যুদ্ধের সমস্ত ঘটনাবলী সে প্রত্যক্ষভাবে দেখতে, শুনতে এবং জানতে পারবে। সম্মুখে বা পিছনে, দিনে বা রাত্রে, গুপ্ত অথবা প্রকটিত, ক্রিয়ারূপে সংঘটিত অথবা শুধু মনেই অঙ্কুরিত, এরূপ কোনো বিষয়ই তার কাছে বিন্দুমাত্র লুকিয়ে থাকবে না। সঞ্জয় তোমাকে সমস্ত বিষয়ই পুরোপুরি জানাতে পারবে। একে কোনো অস্ত্র স্পর্শ করতে পারবে না এবং সে বিন্দুমাত্র ক্লান্তও হবে না।'

'এটি হবেই, অবশ্যই হবে, এই সর্বনাশকে কেউই রোধ করতে পারবে না। অবশেষে ধর্মেরই জয় হবে।'

মহর্ষি বেদব্যাস চলে যাওয়ার পর ধৃতরাষ্ট্রের জিজ্ঞাসার উত্তরে সঞ্জয় তাঁকে পৃথিবীর বিভিন্ন দ্বীপের বর্ণনা শোনাতে লাগলেন, তাতে তিনি ভারতবর্ষেরও বর্ণনা করলেন। তারপর যখন কৌরব-পাণ্ডবদের যুদ্ধ আরম্ভ হল এবং একনাগাড়ে দশদিন যুদ্ধ করার পর যখন পিতামহ ভীষ্মকে রথচ্যুত করে ভূপাতিত করা হল, তখন সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে ভীষ্মের এই দুঃসংবাদ জানালেন (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ১৩)। সেই সংবাদ শুনে ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং যুদ্ধের সমস্ত খবর বিস্তারিতভাবে শোনাবার জন্য সঞ্জয়কে বললেন। সঞ্জয় তখন দুপক্ষের সৈন্যদের ব্যূহরচনা ইত্যাদির বিস্তৃত বর্ণনা করলেন। তারপর ধৃতরাষ্ট্র বিশেষভাবে আরম্ভ থেকে পুরো ঘটনা জানাবার জন্য সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করলেন। সেখান থেকেই শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার প্রথম অধ্যায় শুরু হয়। মহাভারত, ভীষ্মপর্বে এটি পঁচিশতম অধ্যায়। এর প্রারম্ভে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে প্রশ্ন করেছেন—

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়॥ ১

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—হে সঞ্জয় ! ধর্মভূমি (ধর্মক্ষেত্র) কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থে একত্রিত হওয়া আমার ও পাণ্ডু পুত্রগণ কী করল ? ॥ ১

প্রশ্ন—কোন্‌ স্থানের নাম কুরুক্ষেত্র, তাকে ধর্মক্ষেত্র বলা হয় কেন ?

উত্তর—মহাভারত, বনপর্বের তিরাশীতম অধ্যায়ে এবং শল্যপর্বের তিপ্পান্নতম অধ্যায়ে কুরুক্ষেত্রের মাহাত্ম্যের বিশেষ বর্ণনা পাওয়া যায়। এই স্থানটি সরস্বতী নদীর দক্ষিণভাগ এবং দৃষদ্বতী নদীর উত্তরভাগের মধ্যে অবস্থিত। কথিত আছে এটি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে পাঁচ যোজন করে ছিল। এটি অম্বালার দক্ষিণে এবং দিল্লীর উত্তরে অবস্থিত। বর্তমানেও ঐ স্থানটি কুরুক্ষেত্র নামে সুপ্রসিদ্ধ। এর অপর নাম সমন্তপঞ্চক।

শতপথব্রাহ্মণাদি শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে এই স্থানে অগ্নি, ইন্দ্র, ব্রহ্মা প্রমুখ দেবতা তপস্যা করেছিলেন ; রাজা কুরুও এখানে তপস্যা করেছিলেন, এখানে মৃত্যুপ্রাপ্ত ব্যক্তি উত্তম গতি লাভ করেন। এছাড়াও আরও কিছু কারণ আছে যার জন্য এই স্থানকে ধর্মক্ষেত্র বা পুণ্যক্ষেত্র বলা হয়।

প্রশ্ন—ধৃতরাষ্ট্র **'মামকাঃ'** পদটি কাদের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেছেন এবং **'পাণ্ডবাঃ'** পদটিও কাদের উদ্দেশ্যে ? সেই সঙ্গে **'সমবেতাঃ'** ও **'যুযুৎসবঃ'** বিশেষণ ব্যবহার করে যে **'কিম্ অকুর্বত'** বলেছেন, তার তাৎপর্য কী ?

উত্তর—**'মামকাঃ'** পদটি ধৃতরাষ্ট্র নিজ পক্ষীয় সমস্ত যোদ্ধা এবং দুর্যোধনসহ তাঁর একশত পুত্রের জন্য ব্যবহার করেছেন এবং **'পাণ্ডবাঃ'** পদটি যুধিষ্ঠিরের পক্ষের সমস্ত যোদ্ধাসহ যুধিষ্ঠিরের পঞ্চভ্রাতার জন্য ব্যবহার করেছেন। **'সমবেতাঃ'** এবং **'যুযুৎসবঃ'** বিশেষণ দ্বারা এবং **'কিম্ অকুর্বত'** কথাটি বলে ধৃতরাষ্ট্র বিগত দশদিনের ভীষণ যুদ্ধের পূর্ণ বিবরণ জানাতে চেয়েছিলেন যে যুদ্ধে একত্রিত এইসব যোদ্ধারা কীভাবে যুদ্ধ শুরু করলেন ? কে কীভাবে কার প্রতিদ্বন্দ্বী হল ? আর কে, কার দ্বারা, কীভাবে, কখন মৃত্যুবরণ করল ? ইত্যাদি।

পিতামহ ভীষ্মের পতন হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধের ভয়াবহ বিবরণ ধৃতরাষ্ট্র পূর্বেই শুনেছিলেন, তাই তাঁর প্রশ্নের তাৎপর্য এই নয় যে তিনি যুদ্ধের কোনো খবর না থাকায় জানতে চান যে ধর্মক্ষেত্রের প্রভাবে আমার পুত্রদের বুদ্ধি শুধরে গেছে কিনা কিংবা তারা পাণ্ডবদের রাজ্য প্রত্যর্পণ করে যুদ্ধ বন্ধ করেছে কিনা ? অথবা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কী ধর্মক্ষেত্রের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে যুদ্ধে নিবৃত্ত হয়েছেন ? নাকি দুপক্ষের সেনাবাহিনী এখনও দাঁড়িয়ে আছে, যুদ্ধই হয়নি অথবা যদি যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে থাকে তার পরিণাম কী হল ? ইত্যাদি।

সম্বন্ধ—ধৃতরাষ্ট্রের জিজ্ঞাসার উত্তরে সঞ্জয় জানালেন—

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্যোধনস্তদা।
আচার্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ॥ ২

সঞ্জয় বললেন—সেই সময় রাজা দুর্যোধন ব্যূহরচনায় সুসজ্জিত পাণ্ডব সেনাদের দেখে দ্রোণাচার্যের কাছে গিয়ে এই কথা বললেন ॥ ২

প্রশ্ন—দুর্যোধনকে কোন্ অভিপ্রায়ে 'রাজা' বলা হয়েছে ?

উত্তর—সঞ্জয়ের দুর্যোধনকে 'রাজা' বলার কয়েকটি অর্থ হতে পারে—

ক) দুর্যোধন অত্যন্ত বীর এবং বড় রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। শাসনাদি সমস্ত কার্য দুর্যোধনই দেখা-শোনা করতেন।

খ) সাধু-সন্তগণ সকলকেই মান-সম্মান দেন এবং সঞ্জয় ছিলেন সাধু-স্বভাবের।

গ) পুত্রের প্রতি সম্মানসূচক বিশেষণ শুনে ধৃতরাষ্ট্র প্রসন্ন হবেন।

প্রশ্ন—ব্যূহ রচনাযুক্ত পাণ্ডব-সেনাদের দেখে দুর্যোধন আচার্য দ্রোণের কাছে গেলেন কেন ?

উত্তর—পাণ্ডব সেনাদের ব্যূহরচনা এতো সুনিপুণভাবে করা হয়েছিল যে তা দেখে দুর্যোধন বিস্মিত ও অধৈর্য হয়ে উঠলেন এবং তৎক্ষণাৎ এ সম্বন্ধে অবহিত করার জন্য দ্রোণাচার্যের কাছে ছুটে গেলেন। তিনি ভাবলেন পাণ্ডব সেনাদের ব্যূহরচনা দেখে ও শুনে ধনুর্বেদের মহান আচার্য গুরু দ্রোণ ওঁদের থেকে নিজেদের সৈন্যদের ব্যূহ আরও বিশেষভাবে তৈরি করার জন্য পিতামহকে পরামর্শ দেবেন।

প্রশ্ন—দুর্যোধন রাজা হয়েও নিজে কেন সেনাপতির কাছে গেলেন ? তাঁকে কাছে ডেকে এনে কেন সব বললেন না ?

উত্তর— যদিও পিতামহ ভীষ্ম প্রধান সেনাপতি ছিলেন, কিন্তু কৌরব-সেনার মধ্যে গুরু দ্রোণাচার্যের স্থান অত্যন্ত উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ ছিল। সেনাদের মধ্যে বিশিষ্ট যোদ্ধাদের যেখানে নিযুক্ত করা হয় সেখান থেকে সরিয়ে নিলে সৈন্যরক্ষা ব্যবস্থায় অত্যন্ত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। তাই দ্রোণাচার্যকে স্বস্থান থেকে না সরিয়ে দুর্যোধন নিজেই তাঁর কাছে যাওয়া উচিত বলে মনে করলেন। তাছাড়াও দ্রোণাচার্য বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ হওয়ার সঙ্গে গুরু বলেও অত্যন্ত সম্মানের পাত্র ছিলেন এবং দুর্যোধনের নিজ স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে দ্রোণাচার্যকে সম্মান জানিয়ে তাঁর প্রিয়পাত্র হওয়ারও অভিলাষ অন্তর্নিহিত ছিল। পারমার্থিক দৃষ্টিতে সকলের প্রতি নম্রতাপূর্ণ সম্মানজনক ব্যবহার করা কর্তব্য এবং রাজনীতিতেও বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্যকে সম্মান দিয়ে থাকেন। সেই সব দৃষ্টিতে দুর্যোধনের দ্রোণাচার্যের কাছে যাওয়া উচিত কার্যই বটে।

সম্বন্ধ— দ্রোণাচার্যের কাছে গিয়ে দুর্যোধন যা বললেন, এবার সেই কথা বলা হচ্ছে —

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা॥ ৩

হে আচার্য ! আপনার বুদ্ধিমান শিষ্য দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের দ্বারা ব্যূহাকারে রচিত পাণ্ডুপুত্রদের এই বিশাল সৈন্য সমাবেশ অবলোকন করুন ॥ ৩

প্রশ্ন—দুর্যোধন কোন্ অভিপ্রায়ে একথা বললেন যে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রুপদের পুত্র, আপনার শিষ্য এবং বুদ্ধিমান ?

উত্তর—দুর্যোধন অত্যন্ত চতুর কূটনীতিজ্ঞ ছিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি প্রতিহিংসা এবং পাণ্ডবদের প্রতি বিরূপ মনোভাব জাগ্রত করে দ্রোণাচার্যকে বিশেষভাবে উত্তেজিত করার জন্য দুর্যোধন ধৃষ্টদ্যুম্নকে দ্রুপদপুত্র এবং 'আপনার বুদ্ধিমান শিষ্য' বলে অভিহিত করেছেন। এই কথাগুলির দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে দেখুন, দ্রুপদ আপনার সঙ্গে পূর্বে কত খারাপ ব্যবহার করেছেন আবার আপনাকে বধ করার জন্যই যজ্ঞ করে ধৃষ্টদ্যুম্নকে লাভ করেছেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন এতই কূটনীতিজ্ঞ আর আপনি এত সরল যে সে আপনাকে বধ করার জন্য জন্মেছে জেনেও আপনি তাকে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। এখানেও তার বুদ্ধিমত্তা দেখুন যে সে আপনাদের বধ করার জন্য কী সুন্দর ব্যূহরচনা করেছে। এমন ব্যক্তিকেই পাণ্ডবেরা তাদের সেনাপতি নিযুক্ত করেছে। এবার আপনিই বিচার করুন আপনার কী করা উচিত !

প্রশ্ন—কৌরব সেনা ছিল একাদশ অক্ষৌহিণী এবং পাণ্ডব সেনা ছিল মাত্র সাত অক্ষৌহিণী ; তাহলে দুর্যোধন তাকে বিশাল কেন বললেন এবং তা দেখার জন্য আচার্যকে অনুরোধ করলেন কেন ?

উত্তর—সংখ্যায় কম হলেও বজ্রব্যূহের নিমিত্ত পাণ্ডব-সৈন্যদের অত্যন্ত বিপুল বলে মনে হচ্ছিল ; অন্য ব্যাপার হল যে সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত কম হলেও যাদের মধ্যে পুরোপুরি সুব্যবস্থা থাকে, সেই সৈন্যদলকে বিশেষভাবে শক্তিশালী বলে মনে হয়। তাই দুর্যোধন বলেছেন যে, আপনি এই ব্যূহাকারে দণ্ডায়মান সুব্যবস্থাসম্পন্ন বৃহৎ সৈন্যদলকে দেখে এমন এক উপায় চিন্তা করুন যাতে আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করি।

সম্বন্ধ—পাণ্ডব-সেনাদের ব্যূহরচনা দেখিয়ে এবার দুর্যোধন তিনটি শ্লোকে পাণ্ডব-সৈন্যদলের বিশিষ্ট মহারথীদের নাম জানাচ্ছেন—

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ॥ ৪
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ॥ ৫
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ॥ ৬

এই সৈন্যদলের মধ্যে মহাধনুর্ধারী এবং ভীম-অর্জুনের ন্যায় পরাক্রমশালী শূরবীর সাত্যকি, বিরাট, মহারথী রাজা দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বলশালী যুধামন্যু, বীর্যবান উত্তমৌজা, সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র—এঁরা সকলেই মহারথী॥ ৪-৬॥

প্রশ্ন—'অত্র' পদটি এখানে কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

উত্তর—'অত্র' পদটি এইস্থানে পাণ্ডব-সেনাদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্ন—'যুধি' পদটির অন্বয় 'অত্রের' সঙ্গে না করে 'ভীমার্জুনসমাঃ'র সঙ্গে করা হয়েছে কেন?

উত্তর—'যুধি' পদটি এইস্থানে 'অত্রে'র বিশেষ্য হতে পারে না, কারণ সেই সময় যুদ্ধ আরম্ভই হয়নি। তাছাড়া এর আগে পাণ্ডব-সেনাদের বর্ণনা থাকায় 'অত্র' পদটি স্বভাবতঃই তার বাচক হয়ে ওঠে, তাইজন্য তার সঙ্গে কোনো বিশেষ্যের প্রয়োজনীয়তা নেই। 'ভীমার্জুনসমাঃ'র সঙ্গে 'যুধি' পদটির অন্বয় করে দেখানো হয়েছে যে এইস্থানে যেসব মহারথীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা ভীম ও অর্জুনেরই ন্যায় পরাক্রমশালী।

প্রশ্ন—যুযুধান, বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, কাশিরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, শৈব্য, যুধামন্যু ও উত্তমৌজা, এঁরা সব কে?

উত্তর—অর্জুনের শিষ্য সাত্যকির অপর নাম যুযুধান (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ৮১।৫-৮)। তিনি যাদববংশের রাজা শিনির পৌত্র (মহাভারত দ্রোণপর্ব ১৪৪।১৭-১৯)। যুযুধান ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম অনুগত, অত্যন্ত বলবান ও মহারথী ছিলেন। ইনি মহাভারতের যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেননি, যাদবদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বে মারা গিয়েছিলেন। যুযুধান নামে আরও একজন যাদববংশীয় যোদ্ধা ছিলেন (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ১৫২।৬)।

বিরাট ছিলেন মৎস্যদেশের ধার্মিক রাজা। পাণ্ডবগণ একবৎসর এঁর কাছেই অজ্ঞাতবাস করেছিলেন। এঁর কন্যা উত্তরার সঙ্গে অর্জুন-পুত্র অভিমন্যুর বিবাহ হয়েছিল। তিনি মহাভারতের যুদ্ধে উত্তর, শ্বেত ও শঙ্খ নামক তিন পুত্রসহ নিহত হয়েছিলেন।

দ্রুপদ ছিলেন পাঞ্চালদেশের রাজা পৃষতের পুত্র। রাজা পৃষৎ এবং ভরদ্বাজ মুনি পরস্পরের মিত্র ছিলেন। দ্রুপদ বালক অবস্থায় ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে ছিলেন। তাই ভরদ্বাজমুনির পুত্র দ্রোণের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল। রাজা পৃষৎ পরলোকগমন করলে দ্রুপদ রাজা হলেন। একদিন দ্রোণ রাজা দ্রুপদের কাছে গিয়ে তাঁকে বন্ধু বলে সম্বোধন করায় দ্রুপদের তা খারাপ লাগে। দ্রোণ মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে সেখান থেকে ফিরে আসেন। দ্রোণ কৌরব ও পাণ্ডবদের অস্ত্রশিক্ষা প্রদান করে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ অর্জুন দ্বারা রাজা দ্রুপদকে পরাজিত করে অপমানের প্রতিশোধ নেন এবং দ্রুপদের অর্ধেক রাজ্য নিয়ে নেন। দ্রুপদ বাহ্যিকভাবে দ্রোণের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করলেও তাঁর মনে ক্ষোভ জমে ছিল। তিনি দ্রোণকে বধ করার নিমিত্ত যাজ ও উপযাজ নামক ঋষিদের দ্বারা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করান। সেই যজ্ঞবেদী থেকেই ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং কৃষ্ণা প্রকটিত হন। এই কৃষ্ণাই 'দ্রৌপদী' এবং

'যাজ্ঞসেনী' নামে প্রসিদ্ধ আর স্বয়ংবর সভাতে বিজয়ী হয়ে পাণ্ডবগণ এঁকে বিবাহ করেন। রাজা দ্রুপদ খুবই শূরবীর এবং মহারথী ছিলেন। মহাভারতের যুদ্ধে দ্রোণের হাতে ইনি মৃত্যুবরণ করেন (মহাভারত, দ্রোণপর্ব ১৮৬)।

ধৃষ্টকেতু ছিলেন চেদিদেশের রাজা শিশুপালের পুত্র। ইনিও মহাভারতের যুদ্ধে দ্রোণের হাতে নিহত হন (মহাভারত, দ্রোণপর্ব ১২৫)।

চেকিতান বৃষ্ণিবংশীয় যাদব (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ৮৪।২০), মহারথী যোদ্ধা এবং অত্যন্ত শূরবীর ছিলেন। ইনি পাণ্ডবদের সাত অক্ষৌহিণী সেনার সাত সেনাপতির অন্যতম একজন (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ১৫১)। চেকিতান মহাভারতের যুদ্ধে দুর্যোধনের হাতে নিহত হন (মহাভারত শল্যপর্ব ১২)।

কাশিরাজ ছিলেন কাশীর রাজা। তিনিও অত্যন্ত বীর ও মহারথী ছিলেন। এঁর নাম সঠিকভাবে জানা যায় না। (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ১৭১)। কাশিরাজকে সেনাবিন্দু এবং ক্রোধহন্তাও বলা হয়েছে। কর্ণপর্ব অধ্যায় ষষ্ঠতে যেখানে কাশীরাজের মৃত্যুর বর্ণনা আছে, সেখানে তাঁর নাম 'অভিভূ' বলা আছে।

পুরুজিৎ ও কুন্তিভোজ—এঁরা দুজনেই কুন্তীর ভ্রাতা এবং যুধিষ্ঠিরাদির মাতুল ছিলেন। উভয়েই মহাভারতের যুদ্ধে দ্রোণাচার্যের হাতে নিহত হন (মহাভারত, কর্ণপর্ব ৬।২২-২৩)।

শৈব্য ছিলেন যুধিষ্ঠিরের শ্বশুর, এঁর কন্যা দেবিকার সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের বিবাহ হয়েছিল (মহাভারত, আদিপর্ব ৯৫)। ইনি মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অত্যন্ত বলবান ও বীর যোদ্ধা ছিলেন, এঁকে তাই 'নরপুঙ্গব' বলা হয়েছে।

যুধামন্যু ও উত্তমৌজা—এরা হলেন দুই ভাই এবং পাঞ্চাল দেশের রাজকুমার (মহাভারত, দ্রোণপর্ব ১৩০)। প্রথমে এঁদের নিযুক্ত করা হয়েছিল অর্জুনের রথচক্র রক্ষার উদ্দেশ্যে (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ১৫।১৯)। এঁরা দুজনেই অত্যন্ত পরাক্রমী ও বলসম্পন্ন বীর ছিলেন, তাই এঁদের সঙ্গে 'বিক্রান্ত' ও 'বীর্যবান্'—এই দুই বিশেষণ যুক্ত করা হয়েছে। এরা দুজনেই রাত্রে নিদ্রিত অবস্থায় অশ্বত্থামার দ্বারা নিহত হন (মহাভারত, সৌপ্তিকপর্ব ৮।৩৪-৩৭)।

প্রশ্ন—অভিমন্যু কে?

উত্তর—অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রাকে বিবাহ করেছিলেন, এঁরই গর্ভে অভিমন্যু উৎপন্ন হন। মৎস্যদেশের রাজা বিরাটের কন্যা উত্তরার সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। অভিমন্যু তাঁর পিতা অর্জুন এবং প্রদ্যুম্নের কাছে অস্ত্রশিক্ষা লাভ করেছিলেন। তিনি অসাধারণ বীর ছিলেন। মহাভারতের যুদ্ধে দ্রোণাচার্য একদিন এমন চক্রব্যূহ রচনা করেন যে পাণ্ডবপক্ষের যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি কোনো বীরই তাতে প্রবেশ করতে সক্ষম হননি ; জয়দ্রথ সকলকে পরাস্ত করেছিলেন। অর্জুন অন্য দিকে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। সেই দিন বীর যুবক অভিমন্যু একাকী সেই ব্যূহ ভেদ করে প্রবেশ করেন এবং অসংখ্য বীর সংহার করে তাঁর অসাধারণ শৌর্যের পরিচয় দেন। দ্রোণ, কৃপাচার্য, কর্ণ, অশ্বত্থামা, বৃহদ্বল এবং কৃতবর্মা—এই ছয় মহারথী তাঁকে অন্যায়ভাবে ঘিরে ধরেন, সেই অবস্থাতেও তিনি বহু বীরদের একাকী সংহার করেন। শেষে দুঃশাসনপুত্র তাঁর মস্তকে অত্যন্ত জোরে গদার দ্বারা আঘাত করেন, তাতেই তাঁর মৃত্যু হয় (মহাভারত, দ্রোণপর্ব ৪৯)। রাজা পরীক্ষিৎ এঁরই পুত্র।

প্রশ্ন—দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রের নাম কী?

উত্তর—প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকর্মা, শতানীক ও শ্রুতসেন। এই পাঁচজন ক্রমশঃ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেবের ঔরসে দ্রৌপদীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন (মহাভারত, আদিপর্ব ২২০।৭৯-৮০)। রাত্রের অন্ধকারে ঘুমন্ত অবস্থায় অশ্বত্থামা এঁদের হত্যা করেন (মহাভারত, সৌপ্তিকপর্ব ৮)।

প্রশ্ন—'সর্বে এব মহারথাঃ' কথাটির তাৎপর্য কী?

উত্তর—শাস্ত্র ও শস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ সেই অসাধারণ বীরদের মহারথী বলা হয়, যাঁরা একাকীই দশ হাজার ধনুর্ধারীকে পরিচালনা করতে সক্ষম।

একো দশসহস্রাণি যোধয়েদ্যস্তু ধন্বিনাম্।
শস্ত্রশাস্ত্রপ্রবীণশ্চ মহারথ ইতি ইতি স্মৃতঃ॥

দুর্যোধন এখানে যেসব যোদ্ধার নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁরা সকলেই মহারথী—এই অর্থেই একথা

বলা হয়েছে (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ১৬৯-১৭২)। নানাস্থানে পৃথকভাবেও এই সব বীরদের পরাক্রমের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। সেইস্থানেও এঁদের অতিরথী ও মহারথী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও পাণ্ডব সেনাদের মধ্যে আরও অনেক মহারথী ছিলেন ; তাঁদের কথাও ঐস্থানে বলা হয়েছে। ঐইস্থানে 'সর্বে' পদটির দ্বারা দুর্যোধনের কথায় তাঁদের সকলের কথা বলা হয়েছে বুঝতে হবে।

সম্বন্ধ— পাণ্ডব সেনাদের প্রধান যোদ্ধাদের নাম বলে দুর্যোধন এখন আচার্য দ্রোণকে অনুরোধ করছেন তাঁর সৈন্যদলের প্রধান যোদ্ধাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য—

অস্মাকং তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে॥ ৭

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আমাদের পক্ষেও যারা প্রধান, তাঁদের সঙ্গে আপনি পরিচিত হন। আপনার জ্ঞাতার্থে আমাদের সৈন্যদলে যেসব সেনাপতি আছেন, আমি তাঁদের নাম বলছি ॥ ৭

প্রশ্ন—'তু' পদটির অর্থ কী ? 'অস্মাকম্' পদটির সঙ্গে এটি প্রয়োগ করে কী ভাব প্রকটিত হয়েছে ?

উত্তর—'তু' পদটি এখানে 'আরও' অর্থে ব্যবহৃত ; '**অস্মাকম্**'-এর সঙ্গে এটি প্রয়োগ করে দুর্যোধন বলতে চেয়েছেন যে শুধুমাত্র পাণ্ডব সেনাতেই নয়, আমাদের পক্ষেও বহু মহা শূরবীর আছেন।

প্রশ্ন—'**বিশিষ্টাঃ**' পদের দ্বারা কাকে লক্ষ্য করা হয়েছে ? '**নিবোধ**' ক্রিয়াপদের অর্থ কী ?

উত্তর—দুর্যোধন 'বিশিষ্টাঃ' পদটির দ্বারা, তাঁর সেনাদলের ধীর, বীর, বুদ্ধিমান, সাহসী, পরাক্রমী, তেজস্বী ও শস্ত্রবিদ্দের এবং '**নিবোধ**' ক্রিয়াপদ দ্বারা জানিয়েছেন যে তাঁর সৈন্যদলেও এরূপ সর্বোত্তম শূরবীরের কোনো অভাব নেই ; আমি তাদের মধ্যে কয়েকটি বাছাই করা বীরেদের নাম আপনার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি ; আপনি আমার কাছে তাঁদের কথা শুনুন।

সম্বন্ধ— এবার দুটি শ্লোকে দুর্যোধন তাঁর পক্ষের বীরেদের নাম জানিয়ে অন্য বীরগণের সঙ্গে তাঁদের প্রশংসা করছেন—

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তিস্তথৈব চ॥ ৮

আপনি—দ্রোণাচার্য, পিতামহ ভীষ্ম, কর্ণ, যুদ্ধবিজয়ী কৃপাচার্য এবং তেমনই অশ্বত্থামা, বিকর্ণ এবং সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা॥ ৮

প্রশ্ন— দ্রোণাচার্য কে এবং দুর্যোধন সমস্ত বীরদের মধ্যে সর্বপ্রথমে তাঁকে 'আপনি' বলে কেন তাঁর নাম করলেন ?

উত্তর— দ্রোণাচার্য ছিলেন মহর্ষি ভরদ্বাজের পুত্র। ইনি মহর্ষি অগ্নিবেশ্য এবং শ্রীপরশুরামের কাছ থেকে রহস্যযুক্ত সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন বেদ-বেদাঙ্গের জ্ঞাতা, মহা তপস্বী, ধনুর্বেদ এবং শস্ত্র-বিদ্যায় অত্যন্ত মর্মজ্ঞ, অনুভবী, যুদ্ধকলা নিপুণ, পরম সাহসী অতিরথি বীর। ইনি ব্রহ্মাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র ইত্যাদি বিচিত্র অস্ত্রাদির প্রয়োগেও দক্ষ ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে যখন ইনি পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করতেন, তখন কেউই তাঁকে পরাজিত করতে পারত না। মহর্ষি শরদ্বানের কন্যা কৃপীর সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। অশ্বত্থামা এঁদেরই পুত্র। ইনি রাজা দ্রুপদের বাল্যসখা ছিলেন। কোনো একসময় ইনি

দ্রুপদের কাছে গিয়ে তাঁকে 'প্রিয় মিত্র' বলে সম্বোধন করেন, তখন ঐশ্বর্য মদমত্ত রাজা দ্রুপদ তাঁকে অপমান করে বলেছিলেন—'আমার ন্যায় ঐশ্বর্যশালী রাজার সঙ্গে তোমার ন্যায় নির্ধন, দরিদ্র মানুষের বন্ধুত্ব হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়।' দ্রুপদের এই অপমানজনক কথায় দ্রোণ অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং ফিরে এসে হস্তিনাপুরে তাঁর শ্যালক কৃপাচার্যের কাছে বাস করতে থাকেন। সেখানে পিতামহ ভীষ্মের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। পিতামহ তাঁকে কৌরব-পাণ্ডবদের শিক্ষক-রূপে নিযুক্ত করেন। শিক্ষা সমাপ্ত হলে তিনি গুরু দক্ষিণারূপে শিষ্যদের বলেন রাজা দ্রুপদকে বন্দী করে আনতে। একমাত্র অর্জুনই গুরুর এই আদেশ পালন করতে সক্ষম হন, তিনি রণক্ষেত্রে দ্রুপদকে পরাজিত করে তাঁকে সচিবসহ বন্দী করে গুরুর সম্মুখে উপস্থিত করেন। দ্রোণ দ্রুপদকে হত্যা না করেই মুক্তি দেন, কিন্তু তিনি দ্রুপদের ভাগীরথীর উত্তর ভাগের রাজ্য অধিকার করেন। মহাভারতের যুদ্ধে ইনি পাঁচদিন সেনাপতি পদে থেকে ভীষণ যুদ্ধ করেছিলেন। শেষে তিনি অশ্বত্থামার মৃত্যুর প্ররোচনামূলক সংবাদে বিচলিত হয়ে অস্ত্র ত্যাগ করে সমাধিস্থ হয়ে ভগবৎ-ধ্যানে নিমগ্ন হন। ইনি প্রাণত্যাগ করলে এঁর জ্যোতির্ময় আত্মা সারা গগনমণ্ডল তেজরাশিতে পরিপূর্ণ করেছিল। এরূপ অবস্থায় ধৃষ্টদ্যুম্ন তীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতে তাঁর মস্তক ছিন্ন করেন।

এইস্থানে দুর্যোধন 'আপনি' বলে এঁকে সর্বপ্রথমেই সম্বোধন করেছেন যাতে ইনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে উৎসাহের সঙ্গে দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করেন। শিক্ষাগুরু হওয়ায় সম্মান জানানোর জন্যও তাঁকে সর্বপ্রথমে 'আপনি' বলে গণনা করা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত।

প্রশ্ন—ভীষ্ম কে ?

উত্তর— ভীষ্ম রাজা শান্তনুর পুত্র। ভাগীরথী গঙ্গা থেকে এঁর জন্ম। ইনি 'দ্যো' নামক নবম বসুর অবতার (মহাভারত, শান্তিপর্ব ৫০।২৬)। এঁর অপর নাম দেবব্রত। ইনি সত্যবতীর সঙ্গে নিজ পিতার বিবাহ দেবার জন্য সত্যবতীর পালকপিতার আদেশানুসারে পূর্ণ যুবাবস্থায় নিজে জীবনে কখনও বিবাহ না করার এবং রাজপদ পরিত্যাগ করার ভীষণ প্রতিজ্ঞা করেন ; এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্যই তাঁর নাম হয় ভীষ্ম। পিতার সুখের জন্য ইনি মনুষ্যমাত্রের কাছে পরম লোভনীয় স্ত্রী-পুত্র ও রাজ্য-সুখ চিরতরে পরিত্যাগ করেন। তাঁর এই কাজে তাঁর পিতা অতি প্রসন্ন হয়ে তাঁকে ইচ্ছামৃত্যুর বর প্রদান করেন। ভীষ্ম অত্যন্ত তেজস্বী, শস্ত্র-শাস্ত্রে পূর্ণ পারদর্শী, মহাজ্ঞানী, মহাবীর, দৃঢ় সঙ্কল্পযুক্ত চির ব্রহ্মচারী ছিলেন। তাঁর মধ্যে শৌর্য, বীর্য, ত্যাগ, তিতিক্ষা, ক্ষমা, দয়া, শম, দম, সত্য, অহিংসা, সন্তোষ, শান্তি, বল, তেজ, ন্যায়প্রিয়তা, নম্রতা, উদারতা, লোকপ্রিয়তা, স্পষ্টবাদিতা, সাহস, ব্রহ্মচর্য, বিরতি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, মাতৃ-পিতৃ-ভক্তি এবং গুরুসেবা ইত্যাদি সমস্ত সদ্গুণ পূর্ণরূপে বিরাজিত ছিল। এঁর জীবন ভগবদ্ভক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ও তত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে জানতেন এবং তাঁর একনিষ্ঠ শ্রদ্ধাসম্পন্ন, পরম প্রেমিক ভক্ত ছিলেন। মহাভারতের যুদ্ধে এঁর সম্মুখে যুদ্ধ করার মতো কোনো বীর ছিল না। তিনি দুর্যোধনের নিকট প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি পঞ্চ পাণ্ডবকে কখনও বধ করবেন না, কিন্তু প্রতিদিন দশ হাজার সৈন্য বধ করবেন (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ১৫৬।২১)। ইনি কৌরব পক্ষের প্রধান সেনাপতির পদে সমাসীন থেকে দশদিন ভয়ানক যুদ্ধ করেছিলেন। তারপর শরশয্যায় শায়িত থেকে সকলকে মহান জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করে উত্তরায়ণের সময় স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেন।

প্রশ্ন—কর্ণ কে ?

উত্তর—কর্ণ ছিলেন কুন্তীর পুত্র। সূর্যদেবের প্রভাবে কুন্তীর কুমারী অবস্থায় এঁর জন্ম হয়। কুন্তী এঁকে একটি কাঠের ভেলায় করে নদীতে বিসর্জন দেন। সৌভাগ্যবশতঃ কর্ণ তাতে রক্ষা পান এবং ভাসতে ভাসতে তিনি হস্তিনাপুরে পৌঁছে যান। অধিরথ নামক জনৈক সূত বংশীয় ব্যক্তি তাঁকে উদ্ধার করে নিজ গৃহে নিয়ে যান এবং তাঁর পত্নী রাধা তাঁকে পুত্ররূপে লালন পালন করেন। কর্ণ কবচ-কুণ্ডলসহ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাই অধিরথ তাঁর নাম রাখেন 'বসুষেণ'। ইনি দ্রোণাচার্য ও পরশুরামের কাছে অস্ত্র ও শাস্ত্র বিদ্যালাভ করেন, তিনি এই দুই বিদ্যাতেই অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। অস্ত্রবিদ্যা ও যুদ্ধকলায় তিনি ছিলেন

অর্জুনের সমকক্ষ। দুর্যোধন এঁকে অঙ্গদেশের রাজা করেছিলেন। দুর্যোধনের সঙ্গে এঁর প্রগাঢ় মৈত্রী ছিল এবং কর্ণ সর্বদাই দুর্যোধনের হিত চিন্তা করতেন। এমনকি মাতা কুন্তী এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথাতেও তিনি দুর্যোধনকে ছেড়ে পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিতে অস্বীকার করেন। তাঁর দানশীলতা ছিল অদ্বিতীয়, তিনি সর্বদা সূর্যদেবের উপাসনা করতেন। সেই সময় কেউ যদি তাঁর কাছে কিছু চাইত, তিনি সহর্ষে তা প্রদান করতেন। একদিন দেবরাজ ইন্দ্র অর্জুনের হিতার্থে ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে কর্ণের শরীরে থাকা সেই নৈসর্গিক কবচ-কুণ্ডল চেয়ে নিলেন। কর্ণ অত্যন্ত প্রসন্নতা সহকারে তৎক্ষণাৎ তাঁকে কবচ-কুণ্ডল প্রদান করেন। এর পরিবর্তে ইন্দ্র তাঁকে এক বীরঘাতিনী অমোঘ অস্ত্র প্রদান করেন, যুদ্ধকালে কর্ণ সেই অস্ত্রের সাহায্যে ভীমসেনের বীরপুত্র ঘটোৎকচকে বধ করেন। দ্রোণাচার্যের মৃত্যুর পর মহাভারতের যুদ্ধে কর্ণ দুদিন কৌরবপক্ষের সেনাপতি হয়েছিলেন। অর্জুনের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রশ্ন—কৃপাচার্য কে ছিলেন ?

উত্তর—কৃপাচার্য ছিলেন গৌতমবংশীয় মহর্ষি শরদ্বানের পুত্র। ইনি ধনুর্বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। এঁর ভগিনীর নাম কৃপী, মহারাজ শান্তনু কৃপাপরবশ হয়ে এঁদের পালন করেন। তাই এঁদের নাম হয় কৃপ ও কৃপী। কৃপাচার্য বেদ ও শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্মাত্মা এবং নানা সদ্‌গুণসম্পন্ন ছিলেন। দ্রোণাচার্যের আগে ইনি কৌরব-পাণ্ডব এবং যাদবদের ধনুর্বেদ শিক্ষা প্রদান করতেন। সমগ্র কৌরববংশ ধ্বংস হওয়ার পরেও ইনি জীবিত ছিলেন এবং পরীক্ষিৎকে অস্ত্রবিদ্যা প্রদান করেন। তিনি অত্যন্ত বীর এবং বিপক্ষকে পরাজিত করতে নিপুণ ছিলেন। তাই তাঁর নামের সঙ্গে **'সমিতিঞ্জয়ঃ'** বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্ন—অশ্বত্থামা কে ?

উত্তর—অশ্বত্থামা আচার্য দ্রোণের পুত্র। তিনি শস্ত্রবিদ্যায় অত্যন্ত নিপুণ, যুদ্ধকলাতে প্রবীণ এবং শূরবীর মহারথী ছিলেন। ইনিও তাঁর পিতা দ্রোণাচার্যের নিকট যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন।

প্রশ্ন—বিকর্ণ কে ছিলেন ?

উত্তর—ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্রের মধ্যে একজনের নাম ছিল বিকর্ণ। ইনি অত্যন্ত ধর্মাত্মা, বীর ও মহারথী ছিলেন। কৌরবদের রাজসভায় অত্যাচার পীড়িতা দ্রৌপদী যখন সকলকে জিজ্ঞাসা করেন 'আমি হেরে গেছি কিনা', তখন বিদুর ব্যতীত অন্য সকল সভাসদ্‌ই চুপ করেছিলেন। একমাত্র বিকর্ণই সভার মধ্যে দণ্ডায়মান হয়ে অত্যন্ত তীব্র ভাষায় ন্যায় ও ধর্মের অনুকূলে স্পষ্টভাষায় বলেছিলেন যে 'দ্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। আমি মনে করি দ্রৌপদীকে আমরা জিতে নিইনি' (মহাভারত, সভাপর্ব ৬৭।১৮-২৫)।

প্রশ্ন—সৌমদত্তি কে ?

উত্তর—সৌমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবাকে **'সৌমদত্তি'** বলা হত। ইনি শান্তনুর বড় ভাই বাহ্লীকের পৌত্র ছিলেন এবং অত্যন্ত ধর্মাত্মা, যুদ্ধবিদ্যায় কুশল, শূরবীর মহারথী ছিলেন। ইনি অনেক দক্ষিণা দিয়ে বড় বড় যজ্ঞ করেছিলেন। মহাভারতের যুদ্ধে সাত্যকির হাতে ভূরিশ্রবার মৃত্যু হয়।

প্রশ্ন—**'তথা'** এবং **'এব'**—এই দুই অব্যয় পদে প্রয়োগের কী উদ্দেশ্য ?

উত্তর—এই দুটি অব্যয় প্রয়োগ করে দেখানো হয়েছে যে অশ্বত্থামা, বিকর্ণ এবং ভূরিশ্রবা ও কৃপাচার্যের ন্যায় যুদ্ধবিজয়ী ছিলেন।

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ॥ ৯

এছাড়াও আমার জন্য জীবন দান করতে প্রস্তুত নানা অস্ত্রধারী সুসজ্জিত বহু যোদ্ধা আছেন, তাঁরা সকলেই যুদ্ধবিদ্যা বিশারদ॥ ৯

প্রশ্ন—এই শ্লোকের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর আগে শল্য, বাহ্লীক, ভগদত্ত, কৃতবর্মা এবং জয়দ্রথ প্রমুখ মহারথীর নাম উল্লেখ করা হয়নি ; এই শ্লোকে এঁদের সকলের দিকে সংকেত করে দুর্যোধন বোঝাতে চেয়েছেন যে তাঁর পক্ষের যেসব শূরবীরদের নাম তিনি বলেছেন, তাঁরা ছাড়াও আরও অনেক যোদ্ধা আছেন, যাঁরা তলোয়ার, গদা, ত্রিশূল ইত্যাদি হাতে নেওয়া অস্ত্র এবং বাণ, তোমর, শক্তি ইত্যাদি নিক্ষেপণকারী অস্ত্রে ভালোভাবে সুসজ্জিত, তাঁরা যুদ্ধকলা কুশলী নিপুণ মহারথী। এঁরা প্রত্যেকেই দুর্যোধনের জন্য প্রাণত্যাগ করতে প্রস্তুত। এর দ্বারা আপনি নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন যে এঁরা আমৃত্যু আমার বিজয়লাভের জন্য পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ করবেন।

সম্বন্ধ—নিজ মহারথী যোদ্ধাদের প্রশংসা করে দুর্যোধন এবার উভয় সৈন্যদলের তুলনা করে নিজ পক্ষের সেনাদের পাণ্ডব-সেনা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ও উত্তম বলে জানাচ্ছেন—

অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০

পিতামহ ভীষ্মের দ্বারা রক্ষিত আমাদের সেনা সর্বপ্রকারে অজেয় এবং ভীম দ্বারা রক্ষিত ওঁদের সেনাদের পরাজিত করা সহজ॥ ১০

প্রশ্ন—পিতামহ ভীষ্ম দ্বারা রক্ষিত নিজেদের সেনাদের অপর্যাপ্ত বলে দুর্যোধন কী বলতে চেয়েছেন ?

উত্তর—এর দ্বারা দুর্যোধন কারণসহ নিজের সেনাদের মহত্ত্ব সিদ্ধ করেছেন। তাঁর বক্তব্য ছিল যে আমাদের সেনা উপরিউক্ত বহু মহারথী দ্বারা পরিপূর্ণ এবং পরশুরামের ন্যায় যুদ্ধবীরকেও জব্দ করার মতো, ভূমণ্ডলের অদ্বিতীয় বীর পিতামহ ভীষ্মের দ্বারা সংরক্ষিত, এঁরা সংখ্যাতেও পাণ্ডবসেনাদের থেকে চার অক্ষৌহিণী বেশি। এরূপ সেনাদের পরাজিত করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয় ; এঁরা সর্বভাবেই অপর্যাপ্ত—প্রয়োজনের তুলনায় অধিক শক্তিশালী, তাই সর্বতোভাবেই অজেয়। মহাভারত, উদ্যোগপর্বের পঞ্চান্নতম অধ্যায়ে যেখানে দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে তাঁর সেনার বর্ণনা করেছেন, সেখানেও এই মহারথীদের নাম করে এবং ভীষ্মের দ্বারা সংরক্ষিত জানিয়ে তাঁদের মহত্ত্ব প্রকট করেছেন এবং স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন—

গুণহীনং পরেষাঞ্চ বহু পশ্যামি ভারত।
গুণোদয়ং বহুগুণমাত্মনশ্চ বিশাম্পতে॥

(মহাভারত উদ্যোগপর্ব ৫৫।৬৭)

'হে ভরতবংশীয় রাজন্ ! আমি বিপক্ষের সেনাদের অধিকাংশকেই গুণহীন দেখতে পাচ্ছি এবং নিজ সেনাদের বহুগুণযুক্ত, পরিণামে গুণ-উদয়কারী বলে মনে করি।' তাই আমার পরাজিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। ঐরূপ ভীষ্মপর্বেও দুর্যোধন যেখানে দ্রোণাচার্যের সামনে পুনরায় তাঁর সৈন্যদের বর্ণনা করেন, সেখানেও গীতার উপরিউক্ত শ্লোক দ্বিতীয়বার একইভাবে বলা হয়েছে (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ৫১।৬) এবং তার পূর্বের শ্লোকেও একথা বলা হয়েছে—

একৈকশঃ সমর্থা হি যূয়ং সর্বে মহারথাঃ।
পাণ্ডুপুত্রান্ রণে হন্তুং সসৈন্যান্ কিমু সংহতাঃ॥

(ভীষ্মপর্ব ৫১।৫)

'আপনারা সকলে এমন মহারথী যে, যুদ্ধে একাকী সেনাসহ পাণ্ডবদের বধ করতে সক্ষম ; তাহলে সকলে মিলে যে ওদের সংহার অবশ্যই করবেন, তাতে আর বলার কিছু নেই।'

সুতরাং এই স্থানে 'অপর্যাপ্ত' শব্দটির সাহায্যে দুর্যোধন তাঁর সেনাদের মহত্ত্ব প্রকটিত করেছেন এবং উপরিউক্ত স্থানে তাঁর পক্ষের সেনাদের উৎসাহিত করতে বলেছেন, যা তাঁর পক্ষে উচিত এবং প্রাসঙ্গিক।

প্রশ্ন—পাণ্ডবসেনাদের ভীম কর্তৃক রক্ষিত এবং পর্যাপ্ত বলে কী বোঝাতে চেয়েছেন ?

উত্তর—এর দ্বারা দুর্যোধন তাদের ন্যূনতা বোঝাতে

চেয়েছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন যেখানে আমাদের সৈন্যদলের সংরক্ষক ভীষ্ম, সেখানে ওদের সেনাদলের সংরক্ষক ভীম, যিনি অত্যন্ত বলশালী হলেও ভীষ্মের তুলনায় অতি নগণ্য। ভীষ্ম রণনিপুণ, শস্ত্রজ্ঞ-শাস্ত্রজ্ঞ, পরম বুদ্ধিমান এবং সেই তুলনায় ভীম, ধনুর্বিদ্যাতে পারদর্শী নন, বুদ্ধিতেও তেমন চতুর নন। তাই ওদের সেনা পর্যাপ্ত ও সীমিত শক্তিসম্পন্ন, আমরা সহজেই ওদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করব।

সম্বন্ধ—এইভাবে ভীষ্ম-সংরক্ষিত নিজ সেনাদের অজেয় বলে, এবার দুর্যোধন দ্রোণাচার্য প্রমুখ মহারথীকে অনুরোধ করছেন, সর্বদিক দিয়ে ভীষ্মকে রক্ষা করতে—

অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব এব হি॥ ১১

সুতরাং আপনারা সকলে সুনিশ্চিতরূপে নিজ নিজ ব্যূহস্থানে অবস্থিত থেকে পিতামহ ভীষ্মকে সর্বদিক থেকে রক্ষা করুন॥ ১১

প্রশ্ন—এই শ্লোকটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—পিতামহ ভীষ্ম নিজেকে রক্ষা করতে সর্বতোভাবে সক্ষম, দুর্যোধন সে কথা জানেন। কিন্তু ভীষ্ম প্রথমেই বলে দিয়েছিলেন যে 'দ্রুপদ পুত্র শিখণ্ডী পূর্বজন্মে নারী ছিলেন, পরে পুরুষ-রূপে পরিবর্তিত হয়েছেন ; স্ত্রী-রূপে জন্ম নিয়েছিলেন বলে, তাঁকে আমি এখনও নারী বলেই মনে করি। স্ত্রী জাতির ওপর কোনো বীর পুরুষ অস্ত্রবর্ষণ করে না, অতএব তিনি সামনে এলে আমি তাঁর ওপর অস্ত্রাঘাত করব না।' সেইজন্য সমস্ত সৈন্য একত্রিত হলে দুর্যোধন আগেই সমস্ত যোদ্ধাসহ দুঃশাসনকে সতর্ক করে বিস্তারিত ভাবে এই কথা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ১৫।১৪-২০)। এইস্থানেও দুর্যোধন সেই ভয়ের সম্ভাবনাতেই তাঁর বিশিষ্ট মহারথীদের অনুরোধ করছেন যে তাঁরা যে যেখানে যে ব্যূহতে নিযুক্ত রয়েছেন, সকলেই নিজ নিজ স্থানে দৃঢ়তার সঙ্গে সতর্ক হয়ে অবস্থান করুন, যাতে কোনো ব্যূহদ্বার দিয়ে প্রবেশ করে শিখণ্ডী পিতামহ ভীষ্মের সামনে যেতে না পারেন। শিখণ্ডীকে দেখলেই তাকে মেরে অন্যত্র পাঠাবার জন্য যেন সব মহারথী প্রস্তুত থাকেন। তাঁরা যদি শিখণ্ডীর থেকে ভীষ্মকে দূরে রাখতে পারেন, তাহলে দুর্যোধন পক্ষে আর কোনো ভয় নেই। কারণ ভীষ্মের পক্ষে অন্য মহারথীদের বধ করা অত্যন্ত সহজ ব্যাপার।

সম্বন্ধ—দুর্যোধনের নিজ পক্ষের মহারথীদের, বিশেষ করে পিতামহ ভীষ্মের প্রশংসা করার বর্ণনা শুনিয়ে সঞ্জয় এবার তার পরবর্তী ঘটনাসমূহ বর্ণনা করছেন—

তস্য সঞ্জনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্॥ ১২

কুরুবংশের অতি প্রতাপশালী বয়োবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম তখন দুর্যোধনের হৃদয়ে হর্ষ উৎপন্ন করার জন্য সিংহের ন্যায় গর্জন করে উচ্চরবে শঙ্খধ্বনি করলেন॥ ১২

প্রশ্ন—এই শ্লোকটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—কুরুকুলে বাহ্লীক ছাড়া পিতামহ ভীষ্মই সর্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন, কৌরব ও পাণ্ডবদের সঙ্গে তাঁর একই প্রকার সম্পর্ক ছিল। পিতামহ হওয়ার সূত্রে ইনি উভয় পক্ষেরই পূজনীয় ছিলেন ; তাই সঞ্জয় এঁকে কৌরবদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ও পিতামহ বলে উল্লেখ করেছেন। বয়সে অতি বৃদ্ধ হলেও তেজ, পরাক্রম, বল, বীর্য ও ক্ষমতায় তিনি অনেক বীর যুবকদের থেকেও বলশালী ছিলেন ; তাই তাঁকে এখানে 'প্রতাপবান্' বলা হয়েছে। পিতামহ ভীষ্ম যখন দেখলেন দ্রোণাচার্যের পাশে দুর্যোধন

পাণ্ডবসেনাদের দেখে চকিত ও বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, সেই সঙ্গে নিজ চিন্তাকে গোপন রেখে যোদ্ধাদের উৎসাহিত করার জন্য নিজ সেনাদের প্রশংসা করছেন, ভীষ্মকে রক্ষা করার জন্য দ্রোণাচার্য ও সকল মহারথীকে অনুরোধ করছেন, তখন পিতামহ ভীষ্ম নিজের প্রভাব দেখিয়ে তাঁকে প্রসন্ন করার জন্য এবং সেনাপতি হওয়ার সুবাদে যুদ্ধ ঘোষণা করার নিমিত্ত সিংহের ন্যায় গর্জে উঠে উচ্চরবে শঙ্খবাদন করলেন।

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩

তারপর সমস্ত শঙ্খ, ঢোল, নাকাড়া, মৃদঙ্গ, রণশিঙ্গা ইত্যাদি বাদ্য একসঙ্গে বেজে উঠল। সেই শব্দ খুবই ভয়ংকর হয়ে উঠল॥ ১৩

প্রশ্ন—এই শ্লোকটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—পিতামহ ভীষ্ম যখন সিংহের ন্যায় গর্জে উঠে শঙ্খধ্বনি করে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন, তখন সর্বত্র উৎসাহ ছড়িয়ে পড়ল এবং সমস্ত সেনার মধ্যে সর্বদিক থেকে সেনানায়কদের নানাপ্রকার শঙ্খ ও বাদ্য একসঙ্গে ধ্বনিত হল। একসঙ্গে সমস্ত বাদ্য বেজে ওঠায় এতো ভয়ানক শব্দ হল যে তাতে আকাশ-বাতাস গুঞ্জরিত হয়ে উঠল।

সম্বন্ধ—ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে যুদ্ধের জন্য একত্রিত হয়ে আমার ও পাণ্ডু-পুত্রেরা কী করল ? তার উত্তরে সঞ্জয় এই পর্যন্ত ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষের সৈন্যসামন্তের কথা বলেছেন ; এবার পাণ্ডবেরা কী করলেন, পাঁচটি শ্লোকে সঞ্জয় তা জানাচ্ছেন—

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ॥ ১৪

তারপর শ্বেত অশ্বসমন্বিত উত্তম রথে উপবিষ্ট ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনও দিব্য শঙ্খ বাজালেন॥ ১৪

প্রশ্ন—এই শ্লোকটির কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—অর্জুনের রথ অতি উত্তম ও বিশাল ছিল। সেটি স্বর্ণমণ্ডিত, অত্যন্ত তেজোময়, প্রকাশযুক্ত, মজবুত এবং অত্যন্ত সুন্দর ছিল। তাতে নানারূপ পতাকা উড্ডীয়মান ছিল, তাতে ছোট ছোট কিঙ্কিণী লাগানো ছিল। সেই রথের চাকা দুটি ছিল সুদৃঢ় ও বিশাল। রথের উচ্চ ধ্বজাটি চন্দ্র ও নক্ষত্র চিহ্নিত এবং তথায় শ্রীহনুমান বিরাজ করছিলেন, সেটি বিদ্যুতের ন্যায় ঝলক দিচ্ছিল। ধ্বজার বিষয়ে সঞ্জয় দুর্যোধনকে বলেছিলেন যে 'সেই ধ্বজাগুলি বাঁকাভাবে সর্বদিকে আধযোজন পর্যন্ত উড্ডীয়মান হচ্ছিল। আকাশে যেমন ইন্দ্রধনুতে নানাপ্রকার রং দেখা যায়, সেই বিশাল ধ্বজাতেও তেমনই নানাপ্রকার রং দেখা যাচ্ছিল। এত বিশাল হওয়া সত্ত্বেও সেটি অত্যন্ত হালকাভাবে বিনা বাধায় উড়ছিল। বৃক্ষসমূহের মধ্যে দিয়েও এটি সহজেই সঞ্চালিত হত। চারটি অতি সুন্দর, সুসজ্জিত, সুশিক্ষিত, বলবান, বেগবান দিব্য সাদা ঘোড়া রথটিতে লাগানো হয়েছিল। এই ঘোড়াগুলি গন্ধর্ব চিত্ররথের প্রদত্ত দিব্য ঘোড়া। এর মধ্যে যত ঘোড়াই মরুক না কেন, তারা সংখ্যায় একই থাকে, কমে না। এই ঘোড়াগুলি পৃথিবী, স্বর্গ যে কোনো স্থানেই যেতে সক্ষম ছিল। রথের বিষয়েও এটি সমানভাবে প্রযোজ্য ছিল (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ৫৬)। খাণ্ডব বন দহনের সময় অগ্নিদেব প্রসন্ন হয়ে এই রথ অর্জুনকে প্রদান

করেছিলেন (মহাভারত, আদিপর্ব ২২৫)। এই মহান রথে উপবিষ্ট ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন যখন পিতামহ ভীষ্ম-সহ কৌরব সেনাদের শঙ্খ ও অন্যান্য রণবাদ্যের ধ্বনি শুনলেন, তখন তাঁরাও যুদ্ধারম্ভের ঘোষণা করে নিজ নিজ শঙ্খ-বাদ্য করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের শঙ্খ কোনো সাধারণ শঙ্খ ছিল না ; সেগুলি অত্যন্ত বিশিষ্ট, তেজোময় ও অলৌকিক ছিল। তাই সেগুলিকে দিব্য বলা হয়েছে।

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ॥ ১৫

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ, অর্জুন দেবদত্ত নামক শঙ্খ এবং ঘোরকর্মা ভীমসেন পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খ বাজালেন॥ ১৫

প্রশ্ন—এখানে 'হৃষিকেশ' নামে ভগবানকে সম্বোধনের তাৎপর্য কী ? তিনি এই 'পাঞ্চজন্য' শঙ্খ কার কাছ থেকে পেয়েছিলেন ?

উত্তর—'হৃষীক' ইন্দ্রিয়াদির নাম, তার প্রভুকে 'হৃষিকেশ' বলা হয়।[1] এবং হর্ষ, সুখ এবং সুখময় ঐশ্বর্যের নিধানকে 'হৃষিকেশ' বলা হয়।[2] ভগবান ইন্দ্রিয়াদিরও অধীশ্বর আবার হর্ষ, সুখ এবং সুখময় ঐশ্বর্যেরও নিধান, তাই তাঁর আর এক নাম 'হৃষীকেশ'। পঞ্চজন নামক শঙ্খ-রূপধারী এক দৈত্যকে বধ করে ভগবান তাকে শঙ্খরূপে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাই সেই শঙ্খের নাম হয়েছিল 'পাঞ্চজন্য' (হরিবংশপুরাণ ২।৩৩।১৭)।

প্রশ্ন—অর্জুনের 'ধনঞ্জয়' নাম হয়েছিল কেন এবং তিনি 'দেবদত্ত' শঙ্খ কোথা থেকে পেয়েছিলেন ?

উত্তর—রাজসূয়যজ্ঞের সময় অর্জুন অনেক রাজাকে পরাজিত করে বহু ধন-ঐশ্বর্য নিয়ে এসেছিলেন, তাই তাঁর এক নাম হয় '**ধনঞ্জয়**' এবং নিবাতকবচাদি দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় 'দেবদত্ত' নামক শঙ্খটি তাঁকে ইন্দ্র প্রদান করেছিলেন (মহাভারত, বনপর্ব ১৭৪।৫)। এই শঙ্খটির আওয়াজ এত ভয়ংকর যে শত্রুসেনা তা শোনামাত্র কম্পিত হয়ে উঠত।

প্রশ্ন—ভীমসেনের নাম 'ভীমকর্মা' এবং 'বৃকোদর' কী করে হল এবং তাঁর পৌণ্ড্র নামের শঙ্খকে মহাশঙ্খ বলা হয় কেন ?

উত্তর—ভীমসেন অত্যন্ত বলশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর কাজ-কর্ম এত ভয়ানক ছিল যে যারা তা দেখত বা শুনত তারা মনে মনে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ত তাই তাঁকে 'ভীমকর্মা' বলা হত। তাঁর আহারের পরিমাণও অত্যন্ত বেশি ছিল আর তা হজম করার শক্তিও ছিল প্রবল, তাই তাঁকে বলা হত 'বৃকোদর'। তাঁর শঙ্খটি ছিল বৃহৎ আকারের এবং তার আওয়াজ ছিল খুব গম্ভীর, তাই সেটিকে বলা হত 'মহাশঙ্খ'।

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ॥ ১৬

[1] 'হৃষীকাণীন্দ্রিয়াণ্যাহুস্তেষামীশো যতো ভবান্। হৃষীকেশস্ততো বিষ্ণো খ্যাতো দেবেষু কেশব॥' (হরিবংশপুরাণ ২৭৯।৪৬)। —বিষ্ণু ! ইন্দ্রিয়াদিকে হৃষীক বলা হয়। আপনি ওদের ঈশ (প্রভু), সুতরাং কেশব ! আপনি দেবতাগণের মধ্যে 'হৃষীকেশ' নামে বিখ্যাত।

[2] হর্ষাৎ সুখাৎ সুখৈশ্বর্যাদ্ধৃষীকেশত্বমশ্নুতে (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ৭০।৯)—হর্ষ (হৃষী), সুখ (ক), সুখময় ঐশ্বর্য (ঈশ) —এর জন্য শ্রীকৃষ্ণ হৃষীকেশ পদবী লাভ করেছিলেন।

কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামক শঙ্খ, নকুল সুঘোষ নামক শঙ্খ ও সহদেব মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ বাজালেন ॥ ১৬

প্রশ্ন—যুধিষ্ঠিরকে 'কুন্তীপুত্র' ও 'রাজা' বলার উদ্দেশ্য কী ?

উত্তর—মহারাজ পাণ্ডুর পাঁচ পুত্রের মধ্যে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন কুন্তীর গর্ভে এবং নকুল ও সহদেব মাদ্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। যুধিষ্ঠির এবং নকুল সহদেবের মাতা ভিন্ন ভিন্ন ছিলেন, সেটি জানাবার জন্য এই শ্লোকটিতে নকুল-সহদেবের নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং যুধিষ্ঠিরকে 'কুন্তীপুত্র' বলা হয়েছে। এই সময় রাজ্যভ্রষ্ট হলেও যুধিষ্ঠির এর পূর্বে রাজসূয়যজ্ঞে সমস্ত রাজাদের পরাজিত করে চক্রবর্তী সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। সঞ্জয়ের বিশ্বাস যে পরবর্তীকালে তিনিই রাজা হবেন এবং এখনও তাঁর শরীরে সমস্ত রাজচিহ্ন বিদ্যমান। তাই তিনি যুধিষ্ঠিরকে 'রাজা' নামে অভিহিত করেছেন।

কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ॥ ১৭
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্॥ ১৮

মহাধনুর্ধর কাশিরাজ, মহারথী শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, রাজা বিরাট, অজেয় সাত্যকি, রাজা দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং সুভদ্রাপুত্র বীর অভিমন্যু—হে রাজন্ ! এঁরা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নিজ শঙ্খবাদন করলেন॥ ১৭-১৮

প্রশ্ন—কাশিরাজ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট রাজা, সাত্যকি, দ্রুপদ রাজা এবং দ্রৌপদীর পাঁচপুত্রের পরিচয় তো প্রসঙ্গক্রমে আগেই জানা গেছে। শিখণ্ডী কে এবং তাঁর কীভাবে জন্ম হয়েছিল ?

উত্তর—শিখণ্ডী এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন উভয়েই রাজা দ্রুপদের পুত্র। শিখণ্ডী ছিলেন এঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন কনিষ্ঠ। দ্রুপদের যখন কোনো সন্তান ছিল না, তখন তিনি সন্তান কামনায় ভগবান আশুতোষ শংকরের উপাসনা করেন। ভগবান শিব প্রসন্ন হলে রাজা তাঁর কাছে সন্তান প্রার্থনা করলেন। শিব বললেন—'তোমার একটি কন্যা হবে।' রাজা দ্রুপদ বললেন—'ভগবন্ ! আমি কন্যা চাই না, আমার পুত্রের প্রয়োজন।' তখন শিব বললেন—'সেই কন্যাই পরে পুত্ররূপে পরিণত হবে।' এই বরপ্রদানের ফলে রাজা দ্রুপদের গৃহে কন্যার জন্ম হয়। ভগবান শিবের বাক্যে রাজার পূর্ণ আস্থা ছিল, তাই তিনি তাঁকে পুত্ররূপে অভিহিত করেন। রানিও প্রকৃত তথ্য গোপন করে কারো কাছেই সত্য প্রকটিত করেননি। সেই কন্যার নামও পুরুষের ন্যায় 'শিখণ্ডী' রাখা হয়েছিল এবং তাঁকে রাজকুমারদের ন্যায় পোষাক পরিয়ে যথোচিত শিক্ষা প্রদান করা হয়। যথাসময়ে দশার্ণদেশের রাজা হিরণ্যবর্মার কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। হিরণ্যবর্মার কন্যা শ্বশুরালয়ে এসে জানতে পারেন যে শিখণ্ডী পুরুষ নয়, নারী। তিনি তখন অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁর দাসীদের সাহায্যে পিতা হিরণ্যবর্মার কর্ণগোচর করলেন। রাজা হিরণ্যবর্মা ক্রোধান্বিত হয়ে দ্রুপদকে আক্রমণ করে তাঁকে বধ করতে কৃতসংকল্প হন। রাজা দ্রুপদ এই সংবাদ পেয়ে যুদ্ধ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে দেবার্চনা করতে লাগলেন। এদিকে পুরুষ বেশধারী শিখণ্ডী পিতার এই ভয়ানক বিপদ দেখে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে প্রাণত্যাগ করার উদ্দেশ্যে নিঃশব্দে গৃহত্যাগ করলেন। বনে তাঁর সঙ্গে স্থূণাকর্ণ নামে এক ঐশ্বর্যবান যক্ষের সাক্ষাৎ হয়। যক্ষ দয়াপরবশ হয়ে কিছুদিনের জন্য শিখণ্ডীকে নিজ পুরুষত্ব দান করে তাঁর নারীত্ব গ্রহণ করলেন। এইভাবে শিখণ্ডী নারী থেকে পুরুষ

হলেন এবং গৃহে ফিরে এসে তাঁর পিতা-মাতাকে আশ্বস্ত করে শ্বশুর হিরণ্যবর্মার কাছে গিয়ে পুরুষত্বের পরীক্ষা দিয়ে তাঁর ক্রোধ শান্ত করলেন। এদিকে ঘটনাক্রমে কুবেরের শাপে স্থূণাকর্ণ সারাজীবন নারীরূপে থেকে গেলেন। তাই শিখণ্ডীকে আর পুরুষত্ব ফেরৎ দিতে হয়নি, তিনি পুরুষরূপেই থেকে গেলেন। পিতামহ ভীষ্ম এসবই জানতেন। তাই তিনি শিখণ্ডীর ওপর শস্ত্রাঘাত করতেন না। শিখণ্ডীও অত্যন্ত বড় যোদ্ধা ও মহারথী ছিলেন। এঁকে সামনে রেখেই অর্জুন পিতামহ ভীষ্মকে বধ করেন।

প্রশ্ন—এঁরা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে শঙ্খ বাজালেন, এটি বলার কি বিশেষ কোনো অভিপ্রায় ছিল ?

উত্তর—'সর্বশঃ' শব্দটির দ্বারা সঞ্জয় একথাই বলতে চেয়েছেন যে শ্রীকৃষ্ণ, পঞ্চ পাণ্ডব এবং কাশিরাজ প্রমুখ প্রধান যোদ্ধা, যাঁদের নাম এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে, এতদ্ ব্যতিরেকে পাণ্ডব সেনাদলে যত রথী, মহারথী ও বীর ছিলেন—সকলেই নিজ নিজ শঙ্খ বাজিয়েছিলেন। এই হল আসল কথা।

সম্বন্ধ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের পরে পাণ্ডব-সেনার অন্যান্য শূরবীরদের দ্বারা সর্বদিকে শঙ্খ বাজাবার কথা বলে, তার পরিণাম কী হল—সেই কথা সঞ্জয় জানাচ্ছেন—

স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীং চৈব তুমুলো ব্যনুনাদয়ন্।। ১৯

সেই তুমুল শব্দ আকাশ ও পৃথিবীকে গুঞ্জরিত করে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদের অর্থাৎ আপনার পক্ষের সেনাদের হৃদয় বিদীর্ণ করল।। ১৯

প্রশ্ন—এই শ্লোকটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—পাণ্ডব সেনার সমস্ত বীরেদের শঙ্খ যখন একত্রে বেজে উঠল, তার সেই শব্দ এত বিশাল, গম্ভীর ও ভয়ানকভাবে ধ্বনিত হল যে আকাশ-বাতাস-পৃথিবী ছেয়ে গেল। এইভাবে সর্বদিকে সেই ভীষণ ধ্বনি পরিব্যাপ্ত হওয়ায়, চতুর্দিকে তা প্রতিধ্বনিত হতে লাগল, যার ফলে সমস্ত আকাশ-পৃথিবী গুঞ্জরিত হল। সেই ধ্বনি শুনেই দুর্যোধন ও তাঁর পক্ষের অন্য যোদ্ধাদের হৃদয়ে মহাভয় উৎপন্ন হল, মনে হল যেন তাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল।

সম্বন্ধ—পাণ্ডবদের শঙ্খধ্বনিতে কৌরবদের ভীত হওয়ার বর্ণনা করে এখন চারটি শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কথিত অর্জুনের উৎসাহপূর্ণ বচনের বর্ণনা করেছেন।

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।। ২০
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।

অর্জুন উবাচ

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত।। ২১

হে রাজন্ ! এর পর কপিধ্বজ রথারূঢ় অর্জুন যুদ্ধে উদ্যত ধৃতরাষ্ট্রের আত্মীয়-স্বজনদের দেখে যুদ্ধারম্ভের কালে ধনুক উঠিয়ে হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—হে অচ্যুত ! আমার রথটি উভয় সেনার মধ্যে স্থাপন করুন।

প্রশ্ন—অর্জুনকে কেন কপিধ্বজ বলা হয়েছে ?

উত্তর—মহাবীর হনুমান ভীমসেনকে কথা দিয়েছিলেন (মহাভারত, বনপর্ব ১৫১।১৭-১৮), তাই তিনি অর্জুনের রথের বিশাল ধ্বজায় বিরাজিত ছিলেন এবং যুদ্ধকালে মাঝে মাঝেই অত্যন্ত জোরে গর্জন করতেন (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ৫২।১৮)। ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা স্মরণ করাবার জন্য সঞ্জয় অর্জুনকে 'কপিধ্বজ' বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্ন—অর্জুন ব্যূহ রচনাযুক্ত ধৃতরাষ্ট্রের পরিজনদের দেখে অস্ত্রচালনার জন্য হাতে ধনুক তুলে নিলেন, এর তাৎপর্য স্পষ্ট করে বলুন।

উত্তর—অর্জুন যখন দেখলেন যে দুর্যোধনাদি সব ভ্রাতারা কৌরব পক্ষের যোদ্ধাগণসহ যুদ্ধ করতে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন, তখন তাঁর মনে বীর-রস জেগে ওঠে এবং তিনিও দ্রুত তাঁর গাণ্ডীব-ধনুক হাতে তুলে নেন।

প্রশ্ন—সঞ্জয় এইস্থানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পুনরায় হৃষীকেশ নামে সম্বোধন করলেন কেন ?

উত্তর—ভগবানকে হৃষীকেশ বলে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে মনে করাতে চাইলেন যে, ইন্দ্রিয়াদির স্বামী সাক্ষাৎ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যিনি অর্জুনের রথের সারথি হয়েছেন, তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করে আপনারা জয়লাভের আশা করছেন —এ কত বড় অজ্ঞতা !

প্রশ্ন—অর্জুন তাঁর রথটি উভয় সেনাদলের মধ্যস্থলে স্থাপন করার অনুরোধ জানাতে গিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে 'অচ্যুত' নামে সম্বোধন করেছেন, তার কারণ কী ?

উত্তর—যাঁর কোনো সময় পরাভব বা পতন হয় না অথবা যিনি নিজ স্বরূপ, শক্তি ও মহত্ত্বে সর্বতোভাবে সর্বদাই অস্খলিত থাকেন—তাঁকে বলা হয় 'অচ্যুত'। অর্জুন ভগবানকে এই নামে সম্বোধন করে তাঁর মহত্ত্ব এবং ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে নিজ জ্ঞান প্রকটিত করেছেন। তিনি যেন বলতে চেয়েছেন যে আপনি রথ চালনা করলেও আপনি সদা-সর্বদাই সাক্ষাৎ পরমেশ্বর।

যাবদেতান্ নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে॥ ২২

এই রণক্ষেত্রে যুদ্ধাভিলাষী বিপক্ষীয় যোদ্ধাদের মধ্যে আমাকে কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, তাদের যেন ভালোভাবে অবলোকন করতে পারি, সেইমতো রথটিকে যথাস্থানে নিয়ে স্থাপন করুন॥ ২২

প্রশ্ন—এই শ্লোকটি স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর—অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলেছেন যে আপনি আমার রথটিকে উভয় সেনার মধ্যস্থলে এমন উপযুক্ত স্থানে কিছু সময়ের জন্য স্থাপন করুন যাতে আমি যুদ্ধের জন্য সুসজ্জিত অপর পক্ষের যোদ্ধাদের ভালোভাবে নিরীক্ষণ করতে পারি ; অর্থাৎ আমি জানতে পারি এই রণোদ্যমে, যুদ্ধের এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আমাকে কোন্ বীরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে।

যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ॥ ২৩

দুর্বুদ্ধি দুর্যোধনের হিতার্থে যেসব রাজন্যবর্গ যুদ্ধ করার জন্য এইস্থানে এসে উপস্থিত হয়েছেন, সেইসব যুদ্ধার্থীদের আমি দেখতে চাই॥ ২৩

প্রশ্ন—অর্জুন দুর্যোধনকে দুর্বুদ্ধি বলে অভিহিত করেছেন কেন ?

উত্তর—পাণ্ডবদের বনবাস এবং অজ্ঞাতবাসের ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ণ হবার পর তাদের রাজ্য ফিরিয়ে দেবার কথা ছিল, ততদিন কৌরবদের রাজ্যের তত্ত্বাবধায়ক রূপে থাকার কথা। কিন্তু দুর্যোধন অন্যায়ভাবে রাজ্য দখল করার নিমিত্ত তা অস্বীকার করেন। দুর্যোধন পাণ্ডবদের সঙ্গে নানাপ্রকার অন্যায় অত্যাচার আগেও করেছেন, কিন্তু

এইবার তাঁর এই অন্যায় কাজ অসহনীয় হয়েছিল। দুর্যোধনের সেই পাপবুদ্ধির কথা স্মরণ করে অর্জুন তাঁকে দুর্বুদ্ধি বলে অভিহিত করেছেন।

প্রশ্ন—দুর্যোধনের হিতার্থে যেসব রাজা এই সৈন্যদলে যোগ দিয়েছেন, সেই যুদ্ধার্থীদের আমি দেখতে চাই, অর্জুনের এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—অর্জুনের কথায় এই ভাব প্রকটিত হয় যে, পাপবুদ্ধি দুর্যোধনের অন্যায়-অত্যাচার সমস্ত জগতেই প্রত্যক্ষভাবে বিদিত, এতদ্‌সত্ত্বেও যাঁরা তাঁর হিতার্থে তাঁকে সাহায্য করতে এখানে উপস্থিত হয়েছেন, সেইসব রাজারাও দুর্যোধনের ন্যায় ভ্রষ্টবুদ্ধি। তাই তো তাঁরা এই অন্যায়ের সমর্থন করে এখানে একত্রিত হয়ে নিজেদের অহংকার দেখাতে দুর্যোধনের পৃষ্ঠপোষক হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা দুর্যোধনের হিত করার পরিবর্তে অহিতই করছেন। নিজেদের অত্যন্ত বলশালী মনে করে যুদ্ধার্থে উৎসুক চিত্তে দণ্ডায়মান এই সব যোদ্ধাদের আমি একটু দেখতে চাই যে, এঁরা সব কারা ? যুদ্ধক্ষেত্রেও দেখব এঁরা কত বড় বীর, এঁদের অন্যায় ও অধর্মের পক্ষ গ্রহণ করার মজাও বুঝিয়ে দেব।

সম্বন্ধ—অর্জুনের এই কথা শুনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কী করলেন ? এখানে দুটি শ্লোকে সঞ্জয় তার বর্ণনা করেছেন—

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্॥ ২৪
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাং চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি॥ ২৫

সঞ্জয় বললেন—হে ধৃতরাষ্ট্র ! অর্জুন এইকথা বলায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উভয় পক্ষের সেনার মধ্যে, ভীষ্ম, দ্রোণ ও অন্যান্য রাজন্যবর্গের সামনে তাঁদের উত্তম রথটি স্থাপন করে বললেন—হে পার্থ ! যুদ্ধে উপস্থিত এই কৌরবদের দেখো।। ২৪-২৫

প্রশ্ন—'**গুড়াকেশ**' কথাটির অর্থ কী ? সঞ্জয় এইস্থানে অর্জুনকে গুড়াকেশ বলেছেন কেন ?

উত্তর—নিদ্রাকে 'গুড়াকা' বলা হয় ; যে ব্যক্তি নিদ্রা জয় করে তার ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন, তাঁকে বলা হয় '**গুড়াকেশ**'। অর্জুন নিদ্রা জয় করেছিলেন, তিনি না ঘুমিয়ে থাকতে পারতেন। নিদ্রা তাঁকে কষ্ট দিতে পারত না, তিনি আলস্যেরও বশীভূত ছিলেন না। সঞ্জয় 'গুড়াকেশ' কথাটি বলে জানাতে চাইছেন যে, যে অর্জুন সর্বদা এত সতর্ক ও সজাগ, আপনার পুত্ররা কীভাবে তাঁকে পরাজিত করবে ?

প্রশ্ন—যুদ্ধের জন্য একত্রিত এই কৌরব সেনাদের দেখো, ভগবানের এই কথার কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—ভগবান এই কথায় বলতে চেয়েছেন যে, তুমি যে বলেছিলে আমি যতক্ষণ সকলকে ভালো করে নিরীক্ষণ না করি, ততক্ষণ রথ এইস্থানেই স্থাপন করে রাখুন, সেই অনুযায়ী আমি রথটি এমন স্থানে রেখেছি, যেখান থেকে তুমি ভালোভাবে সবাইকে দেখতে পারো। এবার তুমি যতক্ষণ ইচ্ছা সবাইকে ভালো করে দেখে নাও।

এখানে '**কুরূন্ পশ্য**' অর্থাৎ কৌরবদের দেখো এই শব্দটির দ্বারা ভগবান একটি ভাব প্রকটিত করেছেন যে 'এই সৈন্যদলে যাঁরা আছেন, তাঁরা প্রায় সকলেই তোমার বংশের আত্মীয়-স্বজন। এঁদের তুমি ভালোভাবে দেখে নাও।' ভগবানের এই সংকেতে অর্জুনের হৃদয়ে লুক্কায়িত স্বজন-স্নেহ প্রকটিত হয়। অর্জুনের মনে আত্মীয়-বন্ধুস্নেহ থেকে উৎপন্ন করুণাজনিত কাপুরুষ ভাব জাগিয়ে

তোলার জন্য এই শব্দটি যেন বীজরূপে কাজ করল। মনে হয় অর্জুনকে নিমিত্ত করে লোক-কল্যাণের উদ্দেশ্যে স্বয়ং ভগবানই এই কথার দ্বারা তাঁর হৃদয়ে এমন ভাব জাগিয়ে তুললেন যার ফলস্বরূপ সাক্ষাৎ ভগবানের শ্রীমুখ থেকে ত্রিলোকপাবন দিব্য গীতার অমৃতধারা প্রবাহিত হবে, যা অনন্ত কাল ধরে অনন্ত জীবের পরম কল্যাণ করতে থাকবে।

সম্বন্ধ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশ শুনে অর্জুন কী করলেন ? এবারে তা জানাচ্ছেন —

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্।
আচার্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।। ২৬
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি।

তখন পৃথাপুত্র অর্জুন উভয় সেনার মধ্যে অবস্থানরত পিতৃব্যগণ, পিতামহগণ, আচার্যগণ, মাতুলগণ, ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, পৌত্রগণ, মিত্রগণ, শ্বশুরগণ এবং সুহৃদগণকে দেখলেন। ২৬ এবং ২৭ শ্লোকের পূর্বার্ধ।

প্রশ্ন—এর অর্থ স্পষ্টভাবে বলুন।

উত্তর—ভগবানের নির্দেশে অর্জুন উভয় সেনার মধ্যে অবস্থিত সমস্ত আত্মীয়-স্বজনদের দেখলেন। তাঁদের মধ্যে ভূরিশ্রবা প্রভৃতি পিতার ভাই, যিনি ছিলেন পিতৃতুল্য। ভীষ্ম, সোমদত্ত ও বাহ্লীকাদি পিতামহ-প্রপিতামহগণ ছিলেন। দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্যের ন্যায় গুরু ছিলেন। পুরুজিত, কুন্তিভোজ, শল্যের ন্যায় মাতুল ছিলেন। অভিমন্যু, প্রতিবিন্ধ্য, ঘটোৎকচ, লক্ষ্মণ ইত্যাদি ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণ ছিলেন, এঁদেরও পুত্র যাঁরা অর্জুনের পৌত্রস্বরূপ, তাঁরাও ছিলেন। একসঙ্গে খেলাধুলা করা বহু বন্ধু-সখা ছিলেন। দ্রুপদ, শৈব্য প্রমুখ শ্বশুরাদি ছিলেন এতদ্ব্যতীত অর্জুনের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী বহু সুহৃদও ছিলেন।

সম্বন্ধ—এইভাবে সকলকে দেখে অর্জুন কী করলেন ? এখার সেকথা জানাচ্ছেন—

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।। ২৭
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ।

উপস্থিত সেই স্বজন-বান্ধবদের দেখে কুন্তীপুত্র অর্জুন অত্যন্ত করুণার্দ্র চিত্তে বিষণ্ণ হয়ে বললেন। ২৭ এবং ২৮ শ্লোকের পূর্বার্ধ।

প্রশ্ন—'উপস্থিত সমস্ত বন্ধুদের' কথাটির লক্ষ্য কে ?

উত্তর—পূর্বের শ্লোকে অর্জুন তাঁর 'পিতা-পিতামহদের' অনেকের কথা বলেছেন ; এছাড়া যাঁদের কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি, সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সুরথ শ্যালকগণ ও জয়দ্রথাদি ভগিনীপতি ও অন্য বহু আত্মীয়—যাঁরা পারিবারিক সম্বন্ধে উভয় সৈন্যদলে অবস্থান করছিলেন—'উপস্থিত সমস্ত বন্ধুদের' বলে সঞ্জয় তাঁদের দিকে নির্দেশ করেছেন।

প্রশ্ন— অর্জুন অত্যন্ত করুণার্দ্র হয়ে উঠলেন, এর অর্থ কী ?

উত্তর—অর্জুন যখন তাঁর চতুর্দিকে উপরিউক্ত আত্মীয়-স্বজনদের দেখলেন, তিনি ভাবলেন যে, যুদ্ধে এঁরা সকলেই নিহত হবেন, তখন আত্মীয়স্বজনদের প্রতি মোহবশতঃ হৃদয় কম্পিত হল এবং তাঁর মধ্যে করুণাজনিত এক কাপুরুষভাব প্রবল ভাবে জেগে উঠল। এই 'অত্যন্ত করুণা'-কেই সঞ্জয় বলেছেন 'পরয়া কৃপয়া'। এই কাপুরুষতার বশেই অর্জুন তাঁর ক্ষত্রিয়োচিত বীর স্বভাব ভুলে মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন, এটাই তাঁর

করুণাযুক্ত হওয়া।

প্রশ্ন—**'ইদম্'** পদটির দ্বারা অর্জুনের কোন্ কথা বোঝানো হয়েছে ?

উত্তর—অর্জুন আগের শ্লোকটি থেকে ছেচল্লিশতম শ্লোক পর্যন্ত যেসব কথা বলেছেন **'ইদম্'** পদটি সে সবগুলির জন্যই প্রযুক্ত হয়েছে।

সম্বন্ধ—বন্ধুস্নেহের জন্য অর্জুনের কীরূপ অবস্থা হয়েছিল, পরবর্তী শ্লোকে অর্জুন নিজেই তার বর্ণনা করেছেন—

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেমং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎসুং সমুপস্থিতম্।। ২৮
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখং চ পরিশুষ্যতি।
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।। ২৯

অর্জুন বললেন—হে কৃষ্ণ ! যুদ্ধক্ষেত্রে উদ্যত এই যুদ্ধাভিলাষী স্বজন-বান্ধবদের দেখে আমার অঙ্গ শিথিল হচ্ছে, মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে, শরীরে কম্পন এবং রোমাঞ্চ হচ্ছে।। ২৮-এর শেষার্ধ এবং ২৯-অর্থ

প্রশ্ন—অর্জুনের এই কথার কী অর্থ ?

উত্তর—অর্জুনের একথা বলার অর্থ এই যে এই মহাযুদ্ধের পরিণাম ভয়ংকর হবে। ছোট-বড় যত আত্মীয়-স্বজন—যাঁরা এখন আমার সামনে বিরাজমান, তাঁরা সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হবেন। এই কথা মনে আসামাত্র আমার মর্মপীড়া হচ্ছে, হৃদয়ে ভয়ংকর দহন হচ্ছে আর ভয় উৎপন্ন হচ্ছে, তাতে আমার শরীরের এই দুরবস্থা হয়েছে।

গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে।
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।। ৩০

হাত থেকে গাণ্ডীব ধনুক পড়ে যাচ্ছে, ত্বক জ্বালা করছে, মন যেন ভ্রমাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, তাই আমার দাঁড়িয়ে থাকারও সামর্থ্য নেই।। ৩০

প্রশ্ন—এই শ্লোকের মর্মার্থ কী ?

উত্তর—করুণাজনিত কাপুরুষতায় অর্জুনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠেছে, তারই বর্ণনা করে অর্জুন বলছেন যে 'আমার অঙ্গ শিথিল হয়ে গেছে, হাত এমন দুর্বল হয়ে পড়েছে যে গাণ্ডীব ধনুকে বাণ চড়ানো দূরের কথা, সেটি ধরে রাখতে পারছি না। যুদ্ধের পরিণাম চিন্তা করে আমার মনে এমন দাহ উৎপন্ন হয়েছে যে আমার ত্বকও জ্বালা করছে, ভীষণ মানসিক পীড়ায় আমার মনও স্থির করতে পারছি না। তার পরিণামস্বরূপ আমার মাথা ঘুরছে, মনে হচ্ছে আমি এখনই মূর্ছিত হয়ে যাব।'

প্রশ্ন—অর্জুনের গাণ্ডীব ধনুক কেমন ছিল ? তিনি এটি কী করে পেয়েছিলেন ?

উত্তর—অর্জুনের এই গাণ্ডীব ধনুক ছিল দিব্য, এর আকার তালের মতো ছিল (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ১৬১)। গাণ্ডীবের পরিচয় প্রদানকালে বৃহন্নলারূপে স্বয়ং অর্জুন কুমার উত্তরকে বলেছিলেন—'এটি অর্জুনের জগৎপ্রসিদ্ধ ধনুক। এটি স্বর্ণদ্বারা মণ্ডিত, সকল অস্ত্রের মধ্যে উত্তম এবং লক্ষ অস্ত্রের সমান শক্তিমান। এই ধনুক দ্বারাই অর্জুন দেবতা ও মানুষকে পরাজিত করেছেন। এই বিচিত্র, নানা বর্ণে রঞ্জিত, অদ্ভুত, কোমল এবং বিশাল ধনুকের জন্য দেবতা, দানব ও গন্ধর্বরা দীর্ঘকাল ধরে আরাধনা করেছেন। এই পরম দিব্য ধনুকটিকে শ্রীব্রহ্মা এক সহস্র বৎসর, প্রজাপতি পাঁচশত তিন বৎসর, ইন্দ্র পঁচাশী বৎসর, চন্দ্র পাঁচশত বৎসর এবং বরুণদেব শত

বৎসর পর্যন্ত কাছে রেখেছিলেন (মহাভারত, বিরাটপর্ব ৪৩)। খাণ্ডব-বন দহনের সময় অগ্নিদেব এটি বরুণের কাছ থেকে নিয়ে অর্জুনকে প্রদান করেছিলেন (মহাভারত, আদিপর্ব ২২৫)।

সম্বন্ধ—নিজের বিষাদাচ্ছন্ন মনের কথা জানিয়ে অর্জুন তাঁর নিজস্ব ভাবনা অনুযায়ী যুদ্ধ করা কেন উচিত নয়, তা যুক্তিসহ জানাচ্ছেন।

নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব।
ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে॥ ৩১

হে কেশব ! এখানকার সমস্ত লক্ষণই আমি অশুভরূপে দেখতে পাচ্ছি এবং যুদ্ধে এইসব আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করায় আমি কোনো মঙ্গল দেখছি না॥ ৩১

প্রশ্ন—আমি লক্ষণসমূহকেও অশুভ (বিপরীত) দেখছি, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—কোনো ক্রিয়ার ভাবী পরিণামের আভাস দেওয়া নানারূপ চিহ্নকে লক্ষণ বলা হয়, এই শ্লোকে **'নিমিত্তানি'** পদটিতে এই লক্ষণের কথা বলা হয়েছে। অর্জুন লক্ষণগুলিকে বিপরীত বলে এই অর্থ বোঝাতে চেয়েছেন যে, অসময়ে গ্রহণ হওয়া, পৃথিবী কেঁপে ওঠা (ভূকম্পন হওয়া), আকাশ থেকে নক্ষত্র ঝরে পড়া, এইসব কুলক্ষণ দ্বারা মনে হয় যে এই যুদ্ধের ফল ভালো হবে না। তাই তাঁর মনে হচ্ছে যুদ্ধ না করাই মঙ্গলজনক।

প্রশ্ন—যুদ্ধে স্বজন-বন্ধুদের বধ করে হিতকর কিছু দেখছেন না, এই কথাটির কী তাৎপর্য ?

উত্তর—অর্জুনের কথার তাৎপর্য হল যে এই সব স্বজন-বন্ধুদের যুদ্ধে হত্যা করলে কোনোরূপ হিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই ; কারণ প্রথমতঃ আত্মীয়-স্বজন বধ করলে মনে অত্যন্ত অনুতাপ ও ক্ষোভ হবে, দ্বিতীয়তঃ তাঁরা না থাকলে জীবন দুঃখময় হবে এবং তৃতীয়তঃ এঁদের হত্যা করলে মহাপাপ হবে। এই দৃষ্টিতে ইহলোক বা পরলোকেও কোনো হিত হবে না। তাই তাঁর বিচারে যুদ্ধ করা কখনোই উচিত নয়।

সম্বন্ধ—অর্জুন জানালেন যে স্বজন হত্যায় কোনো প্রকারের হিতের সম্ভাবনা নেই, সে কথাই সমর্থন করে তিনি পুনরায় জানাচ্ছেন—

ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা॥ ৩২

হে কৃষ্ণ ! আমি জয়লাভ করতে চাই না, রাজ্য ও সুখভোগও নয়। হে গোবিন্দ ! আমাদের এমন রাজ্যে কী প্রয়োজন আর এরূপ সুখভোগ ও জীবন ধারণেই বা কী লাভ ?

প্রশ্ন—অর্জুনের এই কথাগুলির তাৎপর্য স্পষ্ট করে বলুন।

উত্তর—অর্জুন তাঁর মনের অবস্থার কথা জানিয়ে বলছেন যে—হে কৃষ্ণ ! এই আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুদের হত্যা করে যে জয়লাভ করব বা রাজ্য ও সুখভোগ পাব, আমি সেসব কিছুমাত্র চাই না। আমার মনে হয় যে এঁদের বধ করে ইহলোক ও পরলোকে আমার শোকই হবে, তাহলে কীসের জন্য যুদ্ধ দ্বারা এঁদের নিহত ও পরাজিত করব ? কী লাভ হবে এরূপ রাজ্যভোগে ? আমার তো মনে হয় এদের বধ করে যে জয় পাব তাতে কোনো লাভ হবে না।

সম্বন্ধ—অর্জুন এবার স্বজন বধের বিনিময়ে প্রাপ্ত রাজ্য ও সুখভোগ কেন চান না, তার কারণ দেখাচ্ছেন—

যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ।
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ॥ ৩৩

আমরা যাঁদের জন্য রাজ্য-ভোগ-সুখ ইত্যাদি কামনা করি তাঁরাই সকলে অর্থ ও জীবনের আশা ত্যাগ করে যুদ্ধার্থে উপস্থিত হয়েছেন॥ ৩৩

প্রশ্ন—অর্জুনের একথার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—অর্জুন এখানে বলতে চেয়েছেন যে, আমার নিজের জন্য রাজ্য-সুখ-ভোগাদির কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ আমি জানি এসবে স্থায়ী আনন্দ নেই আর এসব অনিত্য। আমি আমার এই সব আত্মীয়-স্বজনদের জন্যই রাজ্য-সুখ চেয়েছিলাম, কিন্তু আমি দেখছি এঁরাই যুদ্ধে প্রাণ-ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত। যদি এঁরা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন তাহলে এই রাজ্য-সুখ-ভোগের কী প্রয়োজন ? তাই যুদ্ধ করার কোনোই প্রয়োজন নেই।

সম্বন্ধ—এইরূপ যুদ্ধ যে অনুচিত তা জানিয়ে অর্জুন এবার যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করতে প্রস্তুত যেসব আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত রয়েছেন, সংক্ষেপে তাঁদের বর্ণনা করছেন—

আচার্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ।
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা॥ ৩৪

আচার্যগণ, পিতৃব্যগণ, পুত্রগণ, পিতামহগণ, মাতুলগণ, শ্বশুরগণ, পৌত্রগণ, শ্যালকগণ এবং আরও বহু স্বজন-বান্ধব রয়েছেন॥ ৩৪

প্রশ্ন—অর্জুন এইসব আত্মীয়দের নাম করে কী বলতে চেয়েছেন ?

উত্তর—আচার্যগণ, পিতৃব্যগণ প্রমুখের কথা আগেই সংক্ষেপে বলা হয়েছে। এখানে **'শ্যালাঃ'** শব্দটির দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সুরথ ইত্যাদির নাম এবং **'সম্বন্ধিনঃ'** শব্দের দ্বারা জয়দ্রথ প্রভৃতির কথা স্মরণ করিয়ে অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে জগতে মানুষ তাদের প্রিয় আত্মীয়-বন্ধুদের জন্যই ভোগাদি সংগ্রহ করে ; যদি তারাই সব মারা যায়, তাহলে রাজ্য-সুখ-ভোগ প্রাপ্তি করে কী হবে ? এরূপ ভোগ তো দুঃখেরই কারণ !

সম্বন্ধ—সৈন্যদলে উপস্থিত শূরবীরদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক জানিয়ে অর্জুন এবার কোনো কারণেই তাঁদের বধ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন—

এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে॥ ৩৫

হে মধুসূদন ! আমাকে বধ করলেও অথবা ত্রিভুবনের রাজত্বের জন্যও আমি এঁদের বধ করতে চাই না ; পৃথিবীর রাজত্বের তো কথাই নেই॥ ৩৫

প্রশ্ন—অর্জুন কী করে একথা বললেন যে, আমাকে বধ করলেও আমি এঁদের বধ করতে চাই না ; কেননা উভয় পক্ষের সৈন্যদলে অবস্থিত স্বজনদের মধ্যে যাঁরা অর্জুনের পক্ষে ছিলেন, তাঁরা যে অর্জুনকে বধ করবেন, তাতো কল্পনাই করা যায় না ?

উত্তর—সেইজন্যই অর্জুন **'ঘ্নতঃ'** এবং **'অপি'** শব্দদুটি প্রয়োগ করেছেন। তাঁর বলার অভিপ্রায় ছিল এই যে, আমার পক্ষের যোদ্ধাদের তো কোনো কথাই নেই ; কিন্তু বিপক্ষে অবস্থিত যেসব আত্মীয়-স্বজন আছেন, আমি যদি যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হই, তবে সম্ভবতঃ তাঁরাও,

আমাকে বধ করতে চাইবেন না ; কেননা এঁরা সকলে রাজ্যলোভেই যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়েছেন। আমরা যদি রাজ্যাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে যুদ্ধে নিবৃত্ত হই, তাহলে আমাদের মারার কারণই থাকবে না। তা সত্ত্বেও যদি এদের মধ্যে কেউ আমাকে বধ করতে চায়, তাহলেও আমি তাকে বধ করব না।

প্রশ্ন—ত্রিভুবনের রাজ্য লোভেও নয়, তখন পৃথিবীর রাজ্যের আর কথা কী ? এই কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এই কথাটির দ্বারা অর্জুন বোঝাতে চেয়েছেন যে পৃথিবীর রাজ্য ও সুখের কথা তো কোন্ ছার, এদের বধ করলে যদি ত্রিলোকের রাজত্বও নিষ্কণ্টকভাবে পাওয়া যায়, তাহলেও আমি এই সব আচার্য-আত্মীয়স্বজন-সকলকে বধ করতে চাই না।

সম্বন্ধ—এখানে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আপনি ত্রৈলোক্যের রাজত্বের লোভেও এঁদের কেন বধ করতে চান না ? উত্তরে অর্জুন তাঁর আত্মীয়দের বধ করায় যে ক্ষতি হবে এবং পাপ হওয়ার যে সম্ভাবনা থাকবে, সেই সব কথা জানিয়ে তাঁর কথার পক্ষে যুক্তির অবতারণা করছেন।

নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন।
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ ॥ ৩৬

হে জনার্দন ! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের হত্যা করে আমাদের কী সুখ হবে ? এই আততায়ীদের বধ করলে আমাদের তো পাপই হবে॥ ৩৬

প্রশ্ন—ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের হত্যা করে আমাদের কী সুখ হবে ? এই কথাটির কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—অর্জুন বলেছেন, বিপক্ষে অবস্থিত এই ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদের এবং তাঁর সঙ্গীদের বধ করলে ইহলোকে ও পরলোকে আমাদের কিছুই ইষ্ট সিদ্ধি হবে না, আর যদি ইপ্সিত বস্তুই না পাওয়া যায়, তবে আমরা সুখী হব কী করে ? অতএব কোনোভাবেই এঁদের আমি হত্যা করতে চাই না।

প্রশ্ন—স্মৃতিকারগণ স্পষ্টভাবে বলেছেন—

আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্।
নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন॥

(মনুস্মৃতি ৮।৩৫০-৫১)

'নিজের অনিষ্ট করতে আসা আততায়ীদের বিনা বিচারে মেরে ফেলা উচিত। আততায়ীকে হত্যা করলে হত্যাকারীর কোনো দোষ হয় না।'

বশিষ্ঠস্মৃতিতে আততায়ীর এইরূপ লক্ষণ বলা হয়েছে—

অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্র-দারাপহর্তা চ ষডেতে হ্যাততায়িনঃ॥ (৩।১৯)

'অগ্নি সংযোগকারী, বিষ প্রদানকারী, অস্ত্রদ্বারা বধ করতে উদ্যত, ধন অপহরণকারী, সম্পত্তি হরণকারী এবং স্ত্রী অপহরণকারী—এই ছয় প্রকারের ব্যক্তি হল আততায়ী।'

দুর্যোধনদের মধ্যে উপরিউক্ত সমস্ত লক্ষণ দেখা যায়। জতুগৃহে অগ্নি-সংযোগ করে তারা সব পাণ্ডবদেরই পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছিলেন, ভীমসেনের খাদ্যে বিষ মিশিয়ে ছিলেন, অস্ত্র নিয়ে মারতেও চেয়েছিলেন। ছলপূর্বক জুয়া খেলে পাণ্ডবদের সমস্ত ধন-সম্পত্তি হরণ করেছিলেন। অন্যায়ভাবে দ্রৌপদীকে সভায় এনে তাঁর ঘোর অপমান করেছিলেন এবং জয়দ্রথ তাঁকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই অবস্থায় অর্জুন একথা কী করে বললেন যে, এই আততায়ীদের বধ করলে আমাদের পাপ হবে ?

উত্তর—এতে কোনো সন্দেহ নেই যে স্মৃতিকারদের মতে আততায়ীকে বধ করা দূষণীয় নয় এবং এটিও সত্য যে দুর্যোধনেরা আততায়ীই ছিলেন। কিন্তু অন্য কোনো স্থানে স্মৃতিকারগণ একটি বিশেষ কথাও বলেছেন—

স এব পাপিষ্ঠতমো যঃ কুর্যাৎ কুলনাশনম্।

'যে নিজ কুল নাশ করে, সে সর্বাধিক পাপী।'

স্মৃতিশাস্ত্রের এই কথাটিকে সাধারণভাবে প্রদত্ত শাস্ত্রের আদেশ থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে অর্জুন বলেছেন 'ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা আততায়ী হলেও তাঁরা আমাদের আত্মীয়, তাই তাঁদের বধ করলে আমাদের পাপ হবে, কোনোভাবেই লাভ হবে না। এই অবস্থায় আমি এঁদের বধ করতে চাই না।' এই অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত অর্জুন এই কথাটিই বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

সম্বন্ধ—স্বজনদের বধ করা সর্বপ্রকারে ক্ষতিকারক জানিয়ে অর্জুন এবার নিজের মতপ্রকাশ করেছেন—

তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্তরাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব॥ ৩৭

সুতরাং হে মাধব! আমাদেরই আত্মীয় ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের বধ করা আমাদের যোগ্য কাজ নয়; কারণ নিজেদের আত্মীয়দের হত্যা করে আমরা কী করে সুখী হব? ৩৭

প্রশ্ন—এই শ্লোকটির কী অভিপ্রায়?

উত্তর—এই শ্লোকটিতে **'তস্মাৎ'** পদটি প্রয়োগ করে অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে, 'আমার যা মানসিক অবস্থা, যুদ্ধ না করার পক্ষে আমি এতক্ষণ যা কিছু বলেছি এবং আমার বুদ্ধিতে যা সঠিক মনে হচ্ছে, তাতে একথাই যথার্থ যে দুর্যোধনাদি স্বজন-বান্ধবদের হত্যা করা আমাদের পক্ষে কোনভাবেই উচিত নয়। কুটুম্বদের বধ করে ইহলোক বা পরলোকে কোথাও সুখী হবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। সুতরাং আমি যুদ্ধ করতে চাই না।

সম্বন্ধ—এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে কুটুম্ব-নাশ থেকে উৎপন্ন যে দোষ, তা তো দুপক্ষের জন্যই সমান হবে, দুর্যোধন যদি সেটি চিন্তা না করে যুদ্ধ করতে রাজী থাকে, তাহলে তুমি এসব নিয়ে এত চিন্তা করছ কেন? অর্জুন দুটি শ্লোকে **এই** প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্॥ ৩৮
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দন॥ ৩৯

লোভে ভ্রষ্টচিত্ত হয়ে যদিও এরা কুলনাশ থেকে উৎপন্ন দোষ এবং স্বজন বিরোধিতায় কোনো পাপ দেখতে পাচ্ছে না, তাহলেও হে জনার্দন! কুলনাশজনিত দোষের কথা জেনেও আমরা কেন এই পাপ থেকে বিরত হব না? ৩৮-৩৯

প্রশ্ন—এই দুটি শ্লোকের অভিপ্রায় কী?

উত্তর—অর্জুনের কথার মর্ম এই যে দুর্যোধনদের পক্ষে এই কাজ অত্যন্ত অনুচিত, তবুও তাঁদের পক্ষে এমন কাজ করা অসম্ভব নয়। কারণ লোভে তাঁদের বিবেক-বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে। তাই কুলনাশ হলে কীরূপ অনর্থ ও তার কী দুষ্পরিণাম হবে এবং উভয় সেনাদলে একত্রিত নিজ বন্ধু-বান্ধব ও মিত্রদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা করে একে অপরকে বধ করা কত ভয়ংকর পাপ—এসবের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি নেই। কিন্তু আমরা যাঁরা ওঁদের মতো লোভে অন্ধ হয়ে যাইনি এবং কুলনাশ থেকে উৎপন্ন দোষের কথা ভালোভাবে জানি—জেনে-শুনে আমরা কেন এই পাপে প্রবৃত্ত হব? এই সব চিন্তা-ভাবনা করে আমাদের এসব থেকে দূরে থাকা উচিত।

সম্বন্ধ—কুলনাশ হলে কী কী দোষ উৎপন্ন হয়, এবারে অর্জুন তা জানাচ্ছেন—

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্মোঽভিভবত্যুত॥ ৪০

কুলনাশ হলে সনাতন কুলধর্ম নষ্ট হয় এবং ধর্মনাশ হলে সমস্ত কুলেই পাপ বিস্তারিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে॥ ৪০

প্রশ্ন—'সনাতন কুলধর্ম' কাকে বলা হয় এবং কুলনাশ হলে সেই ধর্ম কীভাবে নষ্ট হয় ?

উত্তর—নিজ নিজ কুলে পরম্পরাগত ভাবে যে শুভ ও শ্রেষ্ঠ মর্যাদা প্রবহমান, যার দ্বারা সদাচার সুরক্ষিত থাকে এবং নারী-পুরুষের মধ্যে অধর্ম প্রবেশ করতে পারে না, সেই শুভ ও শ্রেষ্ঠ কুলমর্যাদাকেই বলা হয় 'সনাতন কুলধর্ম'। কুলনাশের দ্বারা যখন কুলধর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত বয়োবৃদ্ধরা শেষ হয়ে যান তখন যাঁরা অবশিষ্ট থাকেন সেই বালক ও নারীগণ এই ধর্ম স্বাভাবিক ভাবে বজায় রাখতে সক্ষম হন না।

প্রশ্ন—ধর্ম নষ্ট হলে সমস্ত কুলে পাপ ভীষণভাবে ছড়িয়ে পড়ে, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—নিম্নোক্ত পাঁচটি কারণে মানুষ অধর্ম থেকে রক্ষা পায় এবং ধর্মকে সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম হয়—(১) ঈশ্বরের ভয়, (২) শাস্ত্রের শাসন, (৩) কুল-মর্যাদা নষ্ট হওয়ার ভয়, (৪) রাজ্যের আইন ব্যবস্থার ভয় এবং (৫) শারীরিক ও আর্থিক অনিষ্টের আশঙ্কা। এর মধ্যে ঈশ্বর এবং শাস্ত্র সর্বতোভাবে সত্য হলেও এটি শ্রদ্ধার ওপর নির্ভরশীল, প্রত্যক্ষ হেতু নয়। রাজ্যের আইন ব্যবস্থা প্রধানত প্রজাদের জন্যই হয়ে থাকে ; যাঁদের হাতে অধিকার থাকে, তারা প্রায়শঃই এটি মানে না। শারীরিক ও আর্থিক অনিষ্টের আশঙ্কা প্রধানতঃ ব্যক্তিগত ব্যাপার। একমাত্র কুল-মর্যাদাই এমন এক অলিখিত নিয়ম যার সম্পর্ক সমস্ত আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে থাকে। যে সমাজ ও কুলে পরম্পরাগত ভাবে পালিত শুভ ও শ্রেষ্ঠ-মর্যাদা নষ্ট হয়ে যায়, সেই সমাজ বা কুল লাগামছাড়া ঘোড়ার ন্যায় যথেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। যথেচ্ছাচার কোনো নিয়ম-শৃঙ্খলা সহ্য করে না। তা মানুষকে উচ্ছৃঙ্খল করে তোলে। যে সমাজে মানুষের মধ্যে এইরূপ উচ্ছৃঙ্খলতার উদ্ভব হয়, সেই সমাজ ও কুলে স্বাভাবিকভাবেই সর্বত্র পাপাচার ছড়িয়ে পড়ে।

সম্বন্ধ—যখন সমস্ত কুলে এই ভাবে পাপাচার ছড়িয়ে পড়ে, তখন কী হয় ? এবারে অর্জুন সেই কথা জানাচ্ছেন—

অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥ ৪১

হে কৃষ্ণ ! পাপ অত্যধিক বৃদ্ধি হলে কুলস্ত্রীগণ দূষিত হয়ে যায়। হে বার্ষ্ণেয় ! কুলনারীগণ দূষিত হলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়॥ ৪১

প্রশ্ন—এই শ্লোকটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—কুলধর্ম নষ্ট হলে কুলের নারীপুরুষ যখন উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে, তখন প্রায়শঃ তাদের কাজ-কর্ম অধর্মযুক্ত হতে থাকে, তাতে পাপ বৃদ্ধি পেয়ে সমস্ত সমাজকে কলুষিত করে, তার ফলে সমাজের নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো মর্যাদারই কিছুমাত্র মূল্য থাকে না। তা পালন করা তো দূরের কথা, তারা সেসব জানারও চেষ্টা করে না। কেউ যদি তাদের জানাবার চেষ্টা করে তবে তারা বিদ্রূপ-সহকারে তা দূরে ফেলে দেয় এবং তাকে হিংসা করে। এরূপ অবস্থায় পবিত্র সতী-ধর্ম, যা সমাজ ও ধর্মের আধার, নষ্ট হয়ে যায়। সতীত্বের মহত্ত্ব হারিয়ে পবিত্র কুল-নারীগণ বিভিন্ন পুরুষের সঙ্গে

ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। মাতা ও পিতা ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের ও বর্ণের হওয়ায় সন্তানেরাও বর্ণসঙ্কর হয়ে যায়। এইভাবে সহজেই কুলের পরম্পরাগত পবিত্রতা একেবারেই বিনষ্ট হয়।

সম্বন্ধ—সন্তান বর্ণসঙ্কর হলে কী কী ক্ষতি হয়, অর্জুন তা জানাচ্ছেন—

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥ ৪২

বর্ণসঙ্কর কুলঘাতকদের এবং সমগ্র কুলকে নরকগামী করে এবং শ্রাদ্ধ-তর্পণ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় এদের পিতৃপুরুষগণও অধোগতি প্রাপ্ত হন॥ ৪২

প্রশ্ন—'কুলঘাতী' কাদের বলা হয় ? এই শ্লোকটিতে '**কুলস্য**' পদটির সঙ্গে 'চ' অব্যয় প্রয়োগ করে কী জানানো হয়েছে ?

উত্তর—'কুলঘাতী' তাদেরই বলা হয়, যারা যুদ্ধ ইত্যাদিতে নিজ কুলের সংহার করে. '**কুলস্য**' পদের সঙ্গে 'চ' অব্যয় প্রয়োগ করে জানানো হয়েছে যে, বর্ণসঙ্কর সন্তান শুধুমাত্র ঐ কুলঘাতকদেরই নরকে প্রেরণ করে না, তাদের সমস্ত কুলকেই নরকগামী করে।

প্রশ্ন—'পিণ্ড ও তর্পণাদি থেকে বঞ্চিত হওয়ায় এদের পিতৃপুরুষও অধোগতি প্রাপ্ত হয়'—এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—শ্রাদ্ধে যে পিণ্ডদান করা হয় এবং পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে যে ব্রাহ্মণ-ভোজন ইত্যাদি করানো হয় তাকে 'পিণ্ডক্রিয়া' এবং তর্পণে যে জল অঞ্জলি দেওয়া হয়, তাকে বলে 'উদক ক্রিয়া' ; এই দুটিকে একত্রে বলা হয় 'পিণ্ডোদকক্রিয়া'। এরই অপর নাম শ্রাদ্ধ-তর্পণ। শাস্ত্র ও কুলমর্যাদা যাঁরা জানেন তাঁরা এই শ্রাদ্ধ-তর্পণ করে থাকেন। কিন্তু কুলঘাতকদের কুলে ধর্মনষ্ট হওয়ায় যে বর্ণসঙ্কর সন্তান উৎপন্ন হয়, তা অধর্ম থেকে উৎপন্ন এবং অধর্মাভিভূত হওয়ায় সেই সন্তানেরা তো শ্রাদ্ধ-তর্পণ ক্রিয়ার কথা জানেই না, কেউ বললেও শ্রদ্ধা না থাকায় করে না আর যদি কেউ তা পালনও করে তাহলে শাস্ত্র-বিধি অনুসারে তার অধিকার না থাকায় তা পিতৃপুরুষের কাছে পৌঁছায় না। তাই পিতৃপুরুষগণের, সন্তান দ্বারা প্রাপ্ত পিণ্ড ও জলের অভাবে, স্ব-স্থান থেকে পতন হয়।

সম্বন্ধ—বর্ণসঙ্করকারক দোষে কী ক্ষতি হয়, এবার তা জানাচ্ছেন—

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ॥ ৪৩

এই বর্ণসঙ্করকারক দোষে কুলনাশকারীদের সনাতন কুলধর্ম ও জাতিধর্ম নষ্ট হয়ে যায়॥ ৪৩

প্রশ্ন—এই বর্ণসঙ্করকারক দোষগুলির দ্বারা কোন্ দোষের কথা বলা হয়েছে ?

উত্তর—উপরিউক্ত পদটির দ্বারা সেই সব দোষের কথা বলা হয়েছে যেগুলি বর্ণসঙ্কর উৎপত্তির কারণ। সেই দোষগুলি হল—(১) কুলনাশ, (২) কুলনাশের দ্বারা কুলধর্ম নাশ, (৩) পাপের বৃদ্ধি এবং (৪) পাপ-বৃদ্ধির কারণে কুল-নারীদের ব্যভিচার দোষে দূষিত হওয়া। এই চারটি দোষে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়।

প্রশ্ন—'সনাতন কুলধর্ম' এবং 'জাতিধর্মে'র পার্থক্য কী ? উপরিউক্ত দোষগুলির দ্বারা কী করে এর নাশ হয় ?

উত্তর—বংশপরম্পরাগত সদাচারের মর্যাদাকে বলা হয় 'সনাতন কুলধর্ম'। চল্লিশতম শ্লোকে এর সঙ্গে '**সনাতনাঃ**' বিশেষণ যুক্ত হয়েছে এবং এখানে এর সঙ্গে '**শাশ্বতাঃ**' বিশেষণ প্রযুক্ত হয়েছে। বেদ-শাস্ত্রোক্ত 'বর্ণ ধর্ম'কে বলা হয় 'জাতিধর্ম'। কুলের শ্রেষ্ঠ মর্যাদা জানা এবং সেই পথে চলা বয়োবৃদ্ধরা না থাকলে যখন

'কুলধর্ম' নষ্ট হয়ে যায় এবং বর্ণসঙ্করতাকারক দোষ বৃদ্ধি পায়, তখন 'জাতিধর্ম'ও নষ্ট হয়ে যায়। কারণ ভিন্ন বর্ণের ব্যক্তির সংযোগে উৎপন্ন সন্তানের বর্ণ-ধর্ম থাকে না। এইরূপ বর্ণসঙ্করকারক দোষে এই ধর্মনাশ হয়।

সম্বন্ধ—'কুলধর্ম' ও 'জাতিধর্ম' নাশে কী ক্ষতি হয়, এবার তা বলেছেন—

উৎসন্নকুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন।
নরকেঽনিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম॥ ৪৪

হে জনার্দন! আমরা শুনেছি যাদের কুলধর্ম নষ্ট হয়েছে, তাদের সুদীর্ঘকাল নরকে বাস করতে হয়॥ ৪৪

প্রশ্ন—এই শ্লোকটির অর্থ কী?

উত্তর—অর্জুন এখানে বলেছেন যে যাদের 'কুলধর্ম' ও 'জাতিধর্ম' নষ্ট হয়ে গেছে, সর্বতোভাবে অধর্মে পতিত সেইসব ব্যক্তিরা পাপের ফলস্বরূপ দীর্ঘকাল ধরে কুম্ভীপাক ও রৌরব ইত্যাদি নরকে পতিত হয়ে নানারূপ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে—একথা আমরা বংশপরম্পরায় শুনে এসেছি। সুতরাং কখনোই কুলনাশরূপ কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়।

সম্বন্ধ—এইভাবে স্বজন-বধের দ্বারা যে মহা-অনর্থ হতে পারে তার বর্ণনা করে অর্জুন এবার এরূপ কাজে নিজেকে সম্মিলিত করায় দুঃখ প্রকাশ করছেন।

অহো বত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ॥ ৪৫

হায়! দুর্ভাগ্য! বুদ্ধিমান হয়েও আমরা কী মহাপাপ করতে উদ্যত হয়েছি, রাজ্য ও সুখভোগের আশায় আমরা আত্মীয়-স্বজনদের বধ করতে প্রস্তুত হয়েছি॥ ৪৫

প্রশ্ন—আমরা মহাপাপ করতে প্রস্তুত হয়েছি, এই বাক্যটির সঙ্গে 'অহো' এবং 'বত' এই দুটি অব্যয় পদ ব্যবহারের কী প্রয়োজন?

উত্তর—'অহো' অব্যয়টি আশ্চর্যের এবং 'বত' পদটি হল মহাশোকের দ্যোতক! এই দুটির প্রয়োগ করে অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে, আমাদের ধর্মাত্মা এবং বুদ্ধিমান বলে মনে করা হয়, আমাদের পক্ষে এরূপ পাপ-কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া কোনোভাবেই উচিত নয়; সেই আমরাও এরূপ মহা-পাপকর্ম করতে প্রবৃত্ত হয়েছি। এ অত্যন্ত আশ্চর্য এবং শোকের বিষয়।

প্রশ্ন—যারা রাজ্য ও সুখলোভে স্বজন-বধে উদ্যত হয়েছে, এই কথাটির অভিপ্রায় কী?

উত্তর—অর্জুন এই কথার দ্বারা বলতে চেয়েছেন যে, রাজ্য ও সুখের লোভে এইরূপ যুদ্ধে প্রস্তুত হওয়া আমাদের অত্যন্ত বড় ভুল।

সম্বন্ধ—এইভাবে অনুতাপ করে এবার অর্জুন তাঁর সিদ্ধান্ত জানাচ্ছেন—

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ॥ ৪৬

যদি আমাকে শস্ত্ররহিত ও প্রতিকারহীন অবস্থায় দেখে অস্ত্র-শস্ত্র-সজ্জিত ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা বধও করে, সেই মৃত্যুও আমার পক্ষে কল্যাণকর হবে॥ ৪৬

প্রশ্ন—এই শ্লোকটির অর্থ কী ?

উত্তর—অর্জুন এখানে বলেছেন যে যুদ্ধঘোষণা হলেও যদি আমি অস্ত্র-ত্যাগ করি এবং ওঁদের কাজের কোনো বিরোধিতা না করি, তবে ওঁরা সম্ভবতঃ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন না, তাতে সমস্ত আত্মীয়দের জীবন রক্ষা হবে। কিন্তু তা না করে ওঁরা যদি আমাকে নিরস্ত্র ও যুদ্ধে নিবৃত্ত জেনে হত্যাও করেন, সেই মৃত্যুও আমার পক্ষে অত্যন্ত কল্যাণদায়ক হবে। কারণ তাতে আমি একপক্ষে কুলঘাতকরূপ ভয়ানক পাপ থেকে রক্ষা পাব, অন্যদিকে আমার আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধবের জীবন রক্ষা পাবে। এর ফলে কুলরক্ষাজনিত মহাপুণ্যকর্ম দ্বারা আমি অতি সহজেই পরম-পদ লাভ করব।

অর্জুন মনে করেন যে, প্রতিকারবিহীন উপরিউক্ত প্রকার মৃত্যুদ্বারা তাঁর কুলরক্ষা হবে এবং তাতে তাঁর কল্যাণ নিশ্চিত। তাই তিনি এরূপ মৃত্যুকে অত্যন্ত কল্যাণকারক (**'ক্ষেমতরম্'**) বলে জানিয়েছেন।

সম্বন্ধ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এতো কথা বলার পর অর্জুন কী করলেন, তা জিজ্ঞাসিত হওয়ায় সঞ্জয় অর্জুনের অবস্থা জানিয়ে বলছেন—

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ।। ৪৭

সঞ্জয় বললেন—শোকে উদ্বিগ্ন চিত্ত অর্জুন রণভূমিতে এই কথাগুলি বলে ধনুর্বাণ ত্যাগ করে রথের মধ্যে উপবেশন করলেন।। ৪৭

প্রশ্ন—এই শ্লোকে সঞ্জয়ের কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এখানে সঞ্জয় বলেছেন, বিষাদমগ্ন অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এই কথাগুলি বলে বাণসহ গাণ্ডীব ধনুক নীচে রেখে রথের পিছনে বসে নানা চিন্তায় নিমগ্ন হলেন। তাঁর মনে কুলনাশ দ্বারা হওয়া ভয়ানক পাপ ও তার ফলের কথা ভেসে উঠতে লাগল। মুখ বিষাদে ভরে গিয়েছিল, তাঁর চক্ষু জলে পূর্ণ হয়ে উঠল।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
অর্জুনবিষাদযোগো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।।১।।

প্রত্যেক অধ্যায়ের সমাপ্তিতে যে উপরিউক্ত পুষ্পিকা অঙ্কিত হয়েছে, তাতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মাহাত্ম্য ও প্রভাব প্রকটিত হয়েছে। **'ওঁ তৎসৎ'** ভগবানের পবিত্র নাম (১৭।২৩), স্বয়ং শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত হওয়ায় একে 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' বলা হয়, এতে উপনিষদের সারতত্ত্ব সংগৃহীত এবং এটি স্বয়ং উপনিষদ্, তাই একে উপনিষদ্ বলা হয়। নির্গুণ-নিরাকার পরমাত্মার পরম-তত্ত্বের পথপ্রদর্শক হওয়ায় এর নাম 'ব্রহ্মবিদ্যা' এবং যে কর্মযোগ যোগের নামে বর্ণিত হয়েছে, সেই নিষ্কামভাবপূর্ণ কর্মযোগের তত্ত্ব বর্ণনাকারী হওয়ায় একে 'যোগশাস্ত্র' বলে। এটি সাক্ষাৎ পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং ভক্তবর অর্জুনের কথোপকথন এবং এর প্রত্যেক অধ্যায়ে পরমাত্মাকে লাভ করার যোগ বর্ণিত হয়েছে, তাই একে 'শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে অর্জুনবিষাদযোগো' নামে বলা হয়েছে।

———০———

ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ

দ্বিতীয় অধ্যায়
(সাংখ্যযোগ)

অধ্যায়ের নাম

এই অধ্যায়ে অর্জুন তাঁর শোক নিবৃত্তির ঐকান্তিক উপায় কী তা জানতে চাইলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত আত্মতত্ত্ব বর্ণনা করেছেন। সাংখ্যযোগের সাধনায় আত্মতত্ত্ব শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনই প্রধান। যদিও এই অধ্যায়ের ত্রিশতম শ্লোকের পর স্বধর্ম বর্ণনা করে কর্মযোগের স্বরূপও বোঝানো হয়েছে, কিন্তু উপদেশ আরম্ভ করা হয়েছে সাংখ্যযোগ দ্বারাই। আত্মতত্ত্বের বর্ণনা অন্য অধ্যায়ের থেকে এখানেই বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে, তাইজন্য এই অধ্যায়ের নাম হল 'সাংখ্যযোগ'।

সংক্ষিপ্ত অধ্যায়-সার

এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে সঞ্জয় অর্জুনের বিষাদ বর্ণনা করেছেন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মোহ ও কাপুরুষতাপূর্ণ বিষাদের নিন্দা করে তাঁকে যুদ্ধে উৎসাহিত করেছেন। চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে অর্জুন ভীষ্ম-দ্রোণাদি পূজ্য গুরুজনদের বধ করার থেকে ভিক্ষান্নে জীবন-নির্বাহ করা শ্রেষ্ঠ বলে জানিয়েছেন। ষষ্ঠ শ্লোকে যুদ্ধ করা বা না-করার বিষয়ে সংশয়ান্বিত হয়ে, সপ্তম শ্লোকে মোহ ও কাপুরুষতা দোষের বর্ণনাপূর্বক ভগবানের শরণাগত হয়ে তাঁর কাছে কল্যাণপ্রদ উপদেশ জানতে চেয়েছেন। অষ্টম শ্লোকে ত্রৈলোক্যের নিষ্কণ্টক রাজ্যসুখও যে শোক-নিবৃত্তির কারণ নয় তা মেনে নিয়ে বৈরাগ্য প্রদর্শন করেছেন। তারপর নবম ও দশম শ্লোকে সঞ্জয় অর্জুনের যুদ্ধ না-করার সিদ্ধান্ত নিয়ে চুপ করে যাওয়া এবং তারপর ভগবানের মৃদুহাস্যের সঙ্গে উপদেশের উপক্রমের বর্ণনা দিয়েছেন। এরপর একাদশ থেকে ভগবানের উপদেশ আরম্ভ করে দ্বাদশ, ত্রয়োদশ শ্লোকে আত্মার নিত্যতা ও নির্বিকারত্বের নিরূপণ করেছেন। চতুর্দশ শ্লোকে সকল ভোগই অনিত্য জানিয়ে সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বগুলি সহ্য করতে বলেছেন, পঞ্চদশে সেই সহনশীলতা মোক্ষ প্রাপ্তির হেতু বলে জানিয়েছেন। ষোড়শ শ্লোকে সৎ ও অসতের লক্ষণ জানিয়ে সপ্তদশ শ্লোকে 'সৎ' ও অষ্টাদশে 'অসৎ' বস্তুর স্বরূপ বলে অর্জুনকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ঊনবিংশতিতম শ্লোকে যাঁরা আত্মাকে মৃত বা হত্যাকারী বলে মনে করেন তাঁদের অজ্ঞ বলে বিংশতিতম শ্লোকে জন্ম-মরণ ইত্যাদি ছয় বিকাররহিত আত্মস্বরূপের নিরূপণ করে একবিংশতিতম শ্লোকে প্রমাণ করেছেন যে আত্মতত্ত্ব জ্ঞানী কাউকে হত্যা করেন না বা করান না। এরপর দ্বাবিংশতিতম শ্লোকে বস্ত্র পরিবর্তনের উদাহরণ দিয়ে দেহান্তরপ্রাপ্তির তত্ত্ব বুঝিয়ে ত্রয়োবিংশতিতম থেকে পঞ্চবিংশতিতম শ্লোক পর্যন্ত আত্মতত্ত্বকে অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য এবং নিত্য, সর্বগত, স্থাণু, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও নির্বিকার জানিয়ে বলেছেন যে এর জন্য শোক করা উচিত নয়। ষড়্‌বিংশতি ও সপ্তবিংশতিতম শ্লোকে আত্মাকে জন্মশীল ও মরণশীল মনে করলেও এবং অষ্টাবিংশতিতম শ্লোকে দেহ অনিত্য ভাবলেও শোক করা উচিত নয় বলে জানিয়েছেন। ঊনত্রিশতমতে আত্মতত্ত্বের দ্রষ্টা, বক্তা ও শ্রোতার দুর্লভতার কথা জানিয়ে ত্রিশতমতে আত্মা সর্বদাই অবধ্য হওয়ায় কোনো প্রাণীর জন্যই শোক করা উচিত নয় বলে জানিয়েছেন। একত্রিংশত থেকে ষট্‌ত্রিংশত শ্লোক পর্যন্ত ক্ষাত্রধর্মের দৃষ্টিতে যুদ্ধই অর্জুনের স্বধর্ম জানিয়ে বলেছেন, এটি ত্যাগ করা সর্বপ্রকারে অনুচিত। সপ্তত্রিংশত শ্লোকে যুদ্ধ, ইহলোক ও পরলোক উভয়স্থানেই লাভপ্রদ জানিয়ে অর্জুনকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অষ্টত্রিংশত শ্লোকে যুদ্ধকর্মে সমত্বকে পাপ থেকে নির্লিপ্ত থাকার উপায় জানিয়ে ঊনচল্লিশতমতে কর্মবন্ধন ছিন্নকারী কর্মযোগ বিষয়ক বুদ্ধির (সমত্বের) বর্ণনা করার প্রস্তাবনা করেছেন। চল্লিশতম শ্লোকে কর্মযোগের মহিমা জানিয়ে একচল্লিশতম শ্লোকে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির এবং অস্থির চিত্ত সকাম ব্যক্তিদের বুদ্ধির পার্থক্য নিরূপণ করে বিয়াল্লিশতম থেকে চুয়াল্লিশতম শ্লোক পর্যন্ত স্বর্গপরায়ণ সকাম মানুষের স্বভাবের বর্ণনা

করেছেন। পঁয়তাল্লিশতমতে অর্জুনকে নিষ্কাম, নির্দ্বন্দ্ব ও নিত্যবস্তুতে স্থিত হতে এবং যোগ ও ক্ষেমের আকাঙ্ক্ষাহীন, আত্মপরায়ণ হতে বলেছেন। ছেচল্লিশতমতে ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের বেদোক্ত কর্মফলরূপ সুখভোগ অপ্রয়োজনীয় বলে সাতচল্লিশতমতে সূত্ররূপে কর্মযোগের স্বরূপ বলেছেন। আটচল্লিশতম শ্লোকে যোগের পরিভাষা যে সমত্ব তা জানিয়ে উনপঞ্চাশতমতে সমবুদ্ধির থেকে সকাম কর্ম যে নিতান্তই নিকৃষ্ট এবং যারা ফলের জন্য কর্ম করে তারা অত্যন্ত দীন, তা জানিয়েছেন। পঞ্চাশ ও একান্নতম শ্লোকে সমবুদ্ধিযুক্ত কর্মযোগীর প্রশংসা করে অর্জুনকে কর্মযোগের আশ্রয় নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন সমত্ববুদ্ধির ফল হল অনাময় পদপ্রাপ্তি। এরপর বাহান্ন ও তিপ্পান্নতম শ্লোকে ভগবান বৈরাগ্যপূর্বক বুদ্ধি শুদ্ধ, স্বচ্ছল ও নিশ্চল হলে যে পরমাত্মা-প্রাপ্তি হয় তা জানিয়েছেন। চুয়ান্নতম শ্লোকে অর্জুন স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তির বিষয়ে চারটি প্রশ্ন করেছেন। পঞ্চান্ন, ছাপ্পান্ন, সাতান্ন, আটান্নতম শ্লোকগুলিতে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রশ্নগুলির সূত্ররূপে উত্তর দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত কামনা সংযত করে, বাহ্য সাধনায় আসক্তি না রেখে নিজ আত্মাতেই সর্বদা সন্তুষ্ট থাকা, দুঃখে উদ্বিগ্ন না হওয়া, সুখে স্পৃহাহীন হওয়া, রাগ, ভয়, ক্রোধ, আসক্তিরহিত হওয়া, শুভাশুভ প্রাপ্তিতে হর্ষ-শোক বা রাগ-দ্বেষ না হওয়া, ইন্দ্রিয়াদির বিষয়সমূহ থেকে ইন্দ্রিয়গুলি সংহরণ করে রাখা ইত্যাদি স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বলে জানিয়েছেন। উনষাটতম শ্লোকে ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় ভোগে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তি বিষয়ভোগে নিবৃত্ত হলেও তার অনুরাগের নিবৃত্তি যে হয় না তা জানিয়ে বলেছেন শুধু পরমাত্মার সাক্ষাৎ-লাভেই তা নিবৃত্তি লাভ করে। ষাটতম শ্লোকে ইন্দ্রিয়াদির প্রাবল্য নিরূপণ করেছেন। একষট্টিতম শ্লোকে মন ইন্দ্রিয়কে সংযত করে ভগবৎ-পরায়ণ হওয়ার কথা বলে ইন্দ্রিয়বিজয়ী পুরুষদের প্রশংসা করেছেন। বাষট্টি ও তেষট্টিতম শ্লোকে বিষয়-চিন্তা দ্বারা মানুষের পতনের ধারা জানিয়ে চৌষট্টি ও পঁয়ষট্টিতম শ্লোকে রাগ (আসক্তি)-দ্বেষরহিত হয়ে কর্ম করলে প্রসন্নতা প্রাপ্তি, তার থেকে সর্বদুঃখ নাশ এবং শীঘ্রই বুদ্ধি স্থিরতা লাভ করে বলে জানিয়েছেন। ছেষট্টিতম শ্লোকে অযুক্ত ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি, ভগবদ্‌চিন্তন, শান্তি ও সুখের অভাব দেখিয়ে বায়ু ও নৌকার উদাহরণ দিয়ে সাতষট্টিতম শ্লোকে মনের সংযোগ থেকে ইন্দ্রিয়কে বুদ্ধিনাশকারী বলে জানিয়েছেন। আটষট্টিতম শ্লোকে প্রমাণ করেছেন যে, যাঁর ইন্দ্রিয়াদি বশে থাকে, তিনিই প্রকৃতপক্ষে স্থিরবুদ্ধি। এরপর উনসত্তরতম শ্লোকে সাধারণ প্রাণীর পক্ষে ব্রহ্মানন্দকে রাত্রির সমান বলে জানিয়েছেন এবং তত্ত্বজ্ঞ যোগীপুরুষের পক্ষে বিষয়সুখ রাত্রির সমান বলে, সত্তরতম শ্লোকে সমুদ্রের দৃষ্টান্ত দিয়ে জ্ঞানী মহাপুরুষদের মহিমা ব্যক্ত করেছেন এবং একাত্তরতম শ্লোকে যে পুরুষ সমস্ত কামনা-বাসনা-মমতা-অহং ত্যাগ করে বিচরণ করেন, তিনিই পরম শান্তি লাভ করে জানিয়ে বাহাত্তরতম শ্লোকে সেই ব্রাহ্মী স্থিতির মাহাত্ম্য বর্ণনা করে অধ্যায়ের উপসংহার করেছেন।

সম্বন্ধ—প্রথম অধ্যায়ে গীতোক্ত উপদেশের প্রস্তাবনারূপে উভয় সেনার মধ্যেকার মহারথী এবং তাঁদের শঙ্খধ্বনির বর্ণনা করে উভয় সেনার মধ্যে অর্জুনের রথ স্থাপন করার কথা বলা হয়েছে ; তারপর সেনাদের মধ্যস্থলে অবস্থিত স্বজন-বান্ধবদের দেখে শোক-মোহের কারণে অর্জুনের যুদ্ধে নিবৃত্ত হওয়ার এবং অস্ত্রত্যাগ করে বিষাদমগ্ন হয়ে উপবেশন করার কথা বলে অধ্যায় সমাপ্ত করা হয়েছিল। এরূপ অবস্থায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কী বললেন এবং কীভাবে তাঁকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করলেন ; এই সব জানাবার প্রয়োজনীয়তা থাকায় সঞ্জয় অর্জুনের অবস্থা বর্ণনা করে দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ করেছেন—

সঞ্জয় উবাচ

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ॥ ১

সঞ্জয় বললেন—ঐরূপ করুণার্দ্র এবং অশ্রুপূর্ণ আকুলনয়ন বিষণ্ণ অর্জুনকে ভগবান এই কথা বললেন॥ ১

প্রশ্ন—'তম্' পদটি এখানে কীসের বাচক এবং তার সঙ্গে **'তথা কৃপয়াবিষ্টম্', 'অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্'** এবং **'বিষীদন্তম্'**—এই তিনটি বিশেষণ প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—প্রথম অধ্যায়ের শেষে যাঁর বিষাদমগ্ন হয়ে বসে পড়ার কথা বলেছেন, **সেই অর্জুনের বাচক হল এই 'তম্'** পদটি, এর সঙ্গে উপরিউক্ত বিশেষণাদি প্রয়োগ করে অর্জুনের অবস্থার কথা জানানো হয়েছে। এর অভিপ্রায় হল যে, যে অর্জুনের অবস্থা প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেই অর্জুনের মধ্যে স্বজন-বান্ধব স্নেহজনিত করুণা, কাপুরুষভাব পরিব্যাপ্ত, যাঁর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ ও ব্যাকুল এবং যিনি বন্ধু-স্বজন নাশের আশঙ্কায় এবং তাদের বধ করায় যে পাপ হবে সেই ভয়ে শোক নিমগ্ন—এমন অবস্থাগ্রস্ত অর্জুনকে ভগবান বললেন।

প্রশ্ন—এখানে 'মধুসূদন' নাম এবং **'বাক্যম্'**-এর সঙ্গে **'ইদম্'** পদটি প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—ভগবানের 'মধুসূদন' নাম প্রয়োগ করে এবং **'বাক্যম্'**-এর সঙ্গে **'ইদম্'** বিশেষণ যোগ করে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে সতর্ক করেছেন। তাঁর বলার অভিপ্রায় হল যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইতিপূর্বে দেবতাদের ওপর অত্যাচারকারী 'মধু' নামক দৈত্যকে বধ করেছেন, তাই তাঁর নাম হয়েছিল **'মধুসূদন'**, সেই ভগবানই যুদ্ধ-বিমুখ অর্জুনকে এরূপ বাক্যদ্বারা (পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত) যুদ্ধে উৎসাহিত করছেন। এইরূপ অবস্থায় আপনার পুত্রেরা কীভাবে জয়লাভ করবে, কারণ আপনার পুত্রও অত্যাচারী এবং অত্যাচারীদের বিনাশ করাই ভগবানের কাজ ; সুতরাং আপনি[1] পুত্রদের বুঝিয়ে এখনও সন্ধি করে নিন, তাহলে এই সংহারলীলা বন্ধ হয় !

শ্রীভগবানুবাচ

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন ॥ ২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে অর্জুন ! এই অসময়ে তোমার মধ্যে এমন মোহ কী জন্য হল ? কেননা, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা এরূপ আচরণ করেন না, এটি স্বর্গ প্রদানকারী নয়, তথা ইহলোকেও যশদায়ক নয় ॥ ২

প্রশ্ন—'ইদম্' বিশেষণের সঙ্গে **'কশ্মলম্'** পদটি কীসের বাচক ? 'তোমার এই অসময়ে এই মোহ কীকরে হল' এই বাক্যটির অর্থ কী ?

উত্তর—'ইদম্' বিশেষণের সঙ্গে **'কশ্মলম্'** পদটি এইস্থানে অর্জুনের মোহজনিত শোক এবং কাতরতার বাচক। উপরিউক্ত বাক্যদ্বারা ভগবান অর্জুনকে ধমক দিয়ে আশ্চর্যের সঙ্গে জানতে চেয়েছেন যে এই বিষমস্থলে অর্থাৎ কাপুরুষতা ও বিষাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত এই রণভূমিতে, ঠিক যুদ্ধারম্ভের সময়ে, বড় বড় রথী-মহারথীদের পরাভবকারী—তোমার মধ্যে এই বিষাদপূর্ণ মোহ কোথা থেকে এল ?

প্রশ্ন—উপরিউক্ত **'মোহ'** (বিষাদভাব)কে **'অনার্যজুষ্ট', 'অস্বর্গ্য'** এবং **'অকীর্তিকর'** বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই শব্দগুলি ভগবানের আশ্চর্যের হেতুরূপে বলা হয়েছে। তাৎপর্য হল, তুমি যে ভাবে আচ্ছন্ন রয়েছ, তা কোনো শ্রেষ্ঠপুরুষের পক্ষে সম্ভব নয়, এটি স্বর্গ বা কীর্তি কিছুই প্রদান করে না। এর দ্বারা মোক্ষ-সিদ্ধি হয় না, ধর্ম-অর্থ-ভোগও পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় তুমি এই মোহ (বিষাদভাব) কী করে স্বীকার করে নিচ্ছ ?

---

[1]মনে রাখতে হবে যে সঞ্জয় এই কথাটি ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন দশ দিন যুদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরে ; সুতরাং 'এখনও সন্ধি করে নাও' এই কথার অর্থ এই বুঝতে হবে যে যারা এখনও বেঁচে আছে সেই আত্মীয়দের রক্ষার জন্য এই দশদিন পরেও আপনার সন্ধি করে নেওয়া উচিত ; এতেই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।

ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥ ৩

অতএব হে অর্জুন ! পৌরুষহীনতা প্রাপ্ত হয়ো না, তোমার পক্ষে তা উচিত নয়। হে পরন্তপ ! হৃদয়ের তুচ্ছ দুর্বলতা পরিত্যাগ করে যুদ্ধের জন্য উঠে দাঁড়াও॥ ৩

প্রশ্ন—'পার্থ' সম্বোধনটির সঙ্গে পৌরুষহীনতা প্রাপ্ত হয়ো না এবং তোমার পক্ষে এটি উচিত মনে হয় না—এই দুটি বাক্যের ভাব কী ?

উত্তর—কুন্তীর আর এক নাম পৃথা, তিনি ছিলেন বীর মাতা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন দূত হয়ে কৌরব-পাণ্ডবদের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের জন্য হস্তিনাপুর গিয়েছিলেন, সেসময় তিনি তাঁর পিসীমাতা কুন্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তখন কুন্তী শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা অর্জুনকে বীরত্বপূর্ণ খবর পাঠিয়েছিলেন এবং বিদুলা এবং তার পুত্র সঞ্জয়ের উদাহরণ দিয়ে অর্জুনকে যুদ্ধে উৎসাহিত করেছিলেন। তাই এখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে 'পার্থ' বলে সম্বোধন করে মাতা কুন্তীর সেই ক্ষত্রিয়োচিত সংবাদটি মনে করিয়ে উপরোক্ত দুটি বাক্যের দ্বারা বলতে চেয়েছেন, তুমি বীর জননীর বীর পুত্র, তোমার মধ্যে এইরূপ কাপুরুষতা আসা সর্বতোভাবে অনুচিত। কোথায় গেল সেই মহা-মহা রথীদের হৃদয় কম্পনকারী তোমার অতুল শৌর্য ? আর কোথায় তোমার এই দীন অবস্থা ? যার শরীরে রোমহর্ষণ হচ্ছে, শরীর কম্পিত হচ্ছে, গাণ্ডীব ধনুক হস্তচ্যুত হচ্ছে আর হৃদয় বিষাদমগ্ন হয়ে রয়েছে ! এরূপ কাপুরুষভাব ও ভীরুতা তোমার পক্ষে সর্বতোভাবে অনুপযুক্ত।

প্রশ্ন—এখানে **'পরন্তপ'** সম্বোধনের অর্থ কী ?

উত্তর—যে ব্যক্তি তাঁর শত্রুদের তাপ (ভয়ে সন্ত্রস্ত করে) দেয় তাঁকে বলা হয় **'পরন্তপ'**। এখানে অর্জুনকে **'পরন্তপ'** নামে সম্বোধন করার অর্থ হল যে তুমি শত্রুদের ভীতি প্রদানে প্রসিদ্ধ। নিবাতকবচাদি অসীম শক্তিশালী দানবদের অনায়াসে দমনকারী, আর আজ তোমার ক্ষত্রিয় স্বভাবের বিপরীত এই কাপুরুষোচিত ভীরুতা মেনে নিয়ে তুমি শত্রুদের প্রসন্ন করছ ?

প্রশ্ন—**'ক্ষুদ্রম্'** বিশেষণের সঙ্গে **'হৃদয়দৌর্বল্যম্'** পদ কোন্ ভাবের বাচক ? সেটি ত্যাগ করে যুদ্ধের জন্য উঠে দাঁড়াতে বলার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে তোমার মতো বীর পুরুষের হৃদয়ে যুদ্ধভীরু কাপুরুষ প্রাণীদের ন্যায়—যা বীরেদের দ্বারা সর্বভাবে পরিত্যাজ্য, এই তুচ্ছ দুর্বলতা কোনোভাবে আসা উচিত নয়। অতএব শীঘ্র এটি পরিত্যাগ করে যুদ্ধের জন্য উঠে দাঁড়াও।

সম্বন্ধ—ভগবান এই কথা বললে অর্জুন দুটি শ্লোকে গুরুজনদের সঙ্গে যুদ্ধ করা অনুচিত প্রমাণ করে তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন—

অর্জুন উবাচ

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণং চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন॥ ৪

অর্জুন বললেন—হে মধুসূদন ! যুদ্ধক্ষেত্রে আমি কী করে পিতামহ ভীষ্ম এবং আচার্য দ্রোণের বিরুদ্ধে বাণাদির সাহায্যে যুদ্ধ করব ? কারণ, হে অরিসূদন ! এঁরা দুজনেই আমার পূজনীয়॥ ৪

প্রশ্ন—এই শ্লোকটিতে **'অরিসূদন'** এবং **'মধুসূদন'** এই দুটি সম্বোধনের সঙ্গে **'কথম্'** পদটি প্রয়োগের কী অর্থ ?

উত্তর—মধু নামক দৈত্যকে সংহার করায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মধুসূদন বলা হয় এবং শত্রুনাশ করায় তাঁকে অরিসূদন বলা হয়। এই দুটি নামে সম্বোধন করে এই

শ্লোকে 'কথম্' পদটি প্রয়োগ করে অর্জুন আশ্চর্যের ভাব প্রকট করেছেন। তাঁর বলার অর্থ ছিল যে, আপনি আমাকে যে ভীষ্ম ও দ্রোণাদির সঙ্গে যুদ্ধ করতে উৎসাহ দিচ্ছেন, এঁরা দৈত্য অথবা শত্রু, কোনোটিই নয়, এঁরা আমার পূজনীয় গুরুজন ; তাহলে আপনি আপনার স্বাভাবিক গুণের বিরুদ্ধে আমাকে গুরুজনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বলছেন কেন ? এই ভয়ানক পাপের কাজ আমি কী করে করব ?

প্রশ্ন—'ইষুভিঃ' পদের অর্থ কী ?

উত্তর— বাণকে **'ইষু'** বলা হয়। 'ইষুভিঃ' পদটির দ্বারা অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে, যেসব গুরুজনদের প্রতি লঘুবাক্য প্রয়োগ করাও মহাপাপ বলা হয়, তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা আমি কীভাবে তাঁদের আঘাত করব ? আপনি আমাকে এই ভয়ানক পাপকার্য করতে কেন উৎসাহ দিচ্ছেন ?

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্ শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্।। ৫

তাই এই মহানুভব গুরুজনদের হত্যা না করে আমি ইহলোকে ভিক্ষার দ্বারা জীবন নির্বাহ করাও কল্যাণকর বলে মনে করি। কারণ গুরুজনদের বধ করে তাঁদেরই রুধির-লিপ্ত অর্থ ও কামরূপ ভোগসকলই তো ভোগ করতে হবে।। ৫

প্রশ্ন—'মহানুভাবান্' বিশেষণের সঙ্গে **'গুরূন্'** পদটি কীসের বাচক ?

উত্তর—দুর্যোধনের সৈন্যদলে দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য প্রমুখ অর্জুনের আচার্য ছিলেন এবং বাহ্লীক, ভীষ্ম, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা ও শল্য আদি গুরুজন ছিলেন, যাঁরা অত্যন্ত উদার ও মহান ছিলেন, সেই শ্রেষ্ঠ পূজ্য-ব্যক্তিদের বাচক **'মহানুভাবান্'** বিশেষণযুক্ত এই **'গুরূন্'** পদটি।

প্রশ্ন—এখানে **'ভৈক্ষ্যম্'**-এর সঙ্গে **'অপি'** পদ প্রয়োগ করে কী ভাব দেখানো হয়েছে ?

উত্তর—এর ভাব হল যে, যদিও ক্ষত্রিয়দের পক্ষে ভিক্ষায় জীবিকা-নির্বাহ নিন্দনীয়, তা সত্ত্বেও গুরু হত্যা করে রাজ্য ভোগ করার থেকে সেই নিন্দনীয় কর্মও অপেক্ষাকৃত শ্রেয়।

প্রশ্ন—**'ভোগান্'** শব্দটির সঙ্গে **'রুধিরপ্রদিগ্ধান্'** এবং **'অর্থকামান্'** বিশেষণ প্রয়োগ করার এবং **'এব'** অব্যয়টির প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা অর্জুন এই ভাব দেখিয়েছেন যে, যেসব গুরুজনদের হত্যা করা সর্বতোভাবে অনুচিত, তাঁদের বধ করে কী পাওয়া যাবে ? মুক্তি বা সিদ্ধি কোনোটিই পাওয়া যাবে না ; শুধু ইহলোকে অর্থ ও কামরূপ তুচ্ছ ভোগই লাভ হবে, এই গুরুজনদের জীবনের কাছে তার কোনোই মূল্য নেই। সেগুলিও গুরু হত্যার ফলস্বরূপ রক্তরঞ্জিত হবে। সুতরাং এরূপ ভোগ প্রাপ্ত করার জন্য গুরুজনদের হত্যা করা কখনোই উচিত নয়।

প্রশ্ন—'অর্থকামান্' পদটি যদি **'গুরূন্'**-এর বিশেষণ বলে মনে করা হয়, তাহলে ক্ষতি কী ?

উত্তর—'গুরূন্'-এর সঙ্গে **'মহানুভাবান্'** বিশেষণটি না থাকলে এরূপ মনে করা যেত ; কিন্তু একটি শ্লোকেই অর্জুন যে গুরুজনদের প্রথমে **'মহানুভাবান্'** বলেছেন, তাঁদেরই পরে **'অর্থকামান্'** ধনলোভী বলবেন, এরূপ কল্পনা করা উচিত বলে মনে হয় না। দুটি বিশেষণ পরস্পর-বিরুদ্ধ বলে মনে হয়, তাই **'অর্থকামান্'** পদটিকে **'গুরূন্'**-এর বিশেষণ মনে করা যায় না।

সম্বন্ধ—এরূপে নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েও অর্জুন সন্তোষ লাভ করেননি, তাঁর সিদ্ধান্তে তাঁর নিজেরই আশঙ্কা উৎপন্ন হয়েছিল, তাই তিনি আবার বলতে শুরু করলেন—

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ॥ ৬

আমরা এটাও জানি না যুদ্ধ করা বা না করা—কোন্‌টি আমাদের পক্ষে শ্রেয়, আমরা এও জানি না যুদ্ধে আমরা জিতব না ওঁরা জয়লাভ করবেন। যাঁদের বধ করে আমরা বাঁচতে চাই না, সেই আমাদের আত্মীয় ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণই আমাদের বিপক্ষে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন ॥ ৬

প্রশ্ন—'আমাদের পক্ষে যুদ্ধ করা বা না করা কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ ? তা আমরা জানি না।' এই বাক্যটির কী তাৎপর্য ?

উত্তর—এই বাক্যটিতে অর্জুন এই ভাব প্রকাশ করেছেন যে, আমাদের পক্ষে কী করা উচিত—যুদ্ধ করা নাকি যুদ্ধ ত্যাগ করা—এই বিষয়ে আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না ; কারণ যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, কিন্তু তার ফলস্বরূপ কুলনাশের মহাদোষ হয় বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—'আমরা জিতব না ওঁরা আমাদের জয় করবেন' এই বাক্যটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই বাক্যটির দ্বারা অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে, যদি আমি একদিকে মেনে নিই যে, যুদ্ধ করাই শ্রেয়, তবুও আমরা তো জানি না যে কে জয়লাভ করবে, আমরা না ওঁরা ?

প্রশ্ন—'যাঁদের হত্যা করে আমরা বাঁচতেও চাই না, সেই আমাদের আত্মীয় ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন' এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এই বাক্যটির দ্বারা অর্জুনের বক্তব্য হল যে, যদি আমরা মেনে নিই যে আমরাই জয়ী হব, তবুও যুদ্ধ করা উচিত বলে মনে হয় না ; কারণ যাঁদের হত্যা করে আমরা বেঁচে থাকতেও চাই না, সেই দুর্যোধনাদি আমার ভাইয়েরা মৃত্যুবরণ করার জন্য আমাদের সামনে উপস্থিত। সুতরাং যুদ্ধে যদি আমরা জয়লাভও করি, তবে এঁদের বধ করেই তা হবে। তাই আমরা ঠিক করতে পারছি না যে আমাদের কী করা উচিত ?

সম্বন্ধ—এইভাবে কর্তব্য ঠিক করায় নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে অর্জুন এবার ভগবানের শরণ গ্রহণ করে তাঁর নিশ্চিত কর্তব্য জানাবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন—

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥ ৭

আমি কাপুরুষতা দোষে অভিভূত এবং ধর্ম সম্পর্কে বিমূঢ় চিত্ত হয়ে পড়েছি। তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি যে, আমার পক্ষে যা নিশ্চিতরূপে কল্যাণকর, সেই সাধন সম্পর্কে আমাকে বলুন ; আমি আপনার শিষ্য, আপনার শরণ গ্রহণ করছি, আমাকে শিক্ষা দিন ॥ ৭

প্রশ্ন— 'কার্পণ্যদোষ' কী এবং অর্জুন যে নিজেকে তার থেকে 'উপহতস্বভাব' বলেছেন, তারই বা কী তাৎপর্য ?

উত্তর—'কৃপণ' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়—

১) যার পর্যাপ্ত ধন আছে, কিন্তু তার ধনে এতো প্রবল আসক্তি ও লোভ যে দান ও ভোগ ইত্যাদি ব্যাপারে ন্যায়সম্মত ও উপযুক্ত কারণেও এক পয়সা খরচ করতে চায় না, সেই ব্যক্তিকে কৃপণ বলা হয়।

২) মনুষ্য জীবনের শাস্ত্রসম্মত ও সাধুজন অনুমোদিত প্রধান লক্ষ্য হল 'ভগবৎ-তত্ত্ব অনুভব করা', যে ব্যক্তি এই লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে বিষয়-ভোগেই জীবন ব্যয় করে, সেই 'মূর্খ' ব্যক্তিকেও কৃপণ বলা হয়। শ্রুতি বলেছেন— '**যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।**' (বৃহ. উ. ৩।৮।১০)

'হে গার্গি ! এই অবিনাশী পরমাত্মাকে জ্ঞাত না হয়েই যে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়, সে ব্যক্তি কৃপণ।'

ভগবানও ভোগৈশ্বর্যে আসক্ত ফলের বাসনাসম্পন্ন

कृपासिन्धु भगवान् श्रीकृष्ण

Lord Kṛṣṇa, the ocean of grace

धृतराष्ट्र-सञ्जय

Dhṛtarāṣṭra and Sañjaya
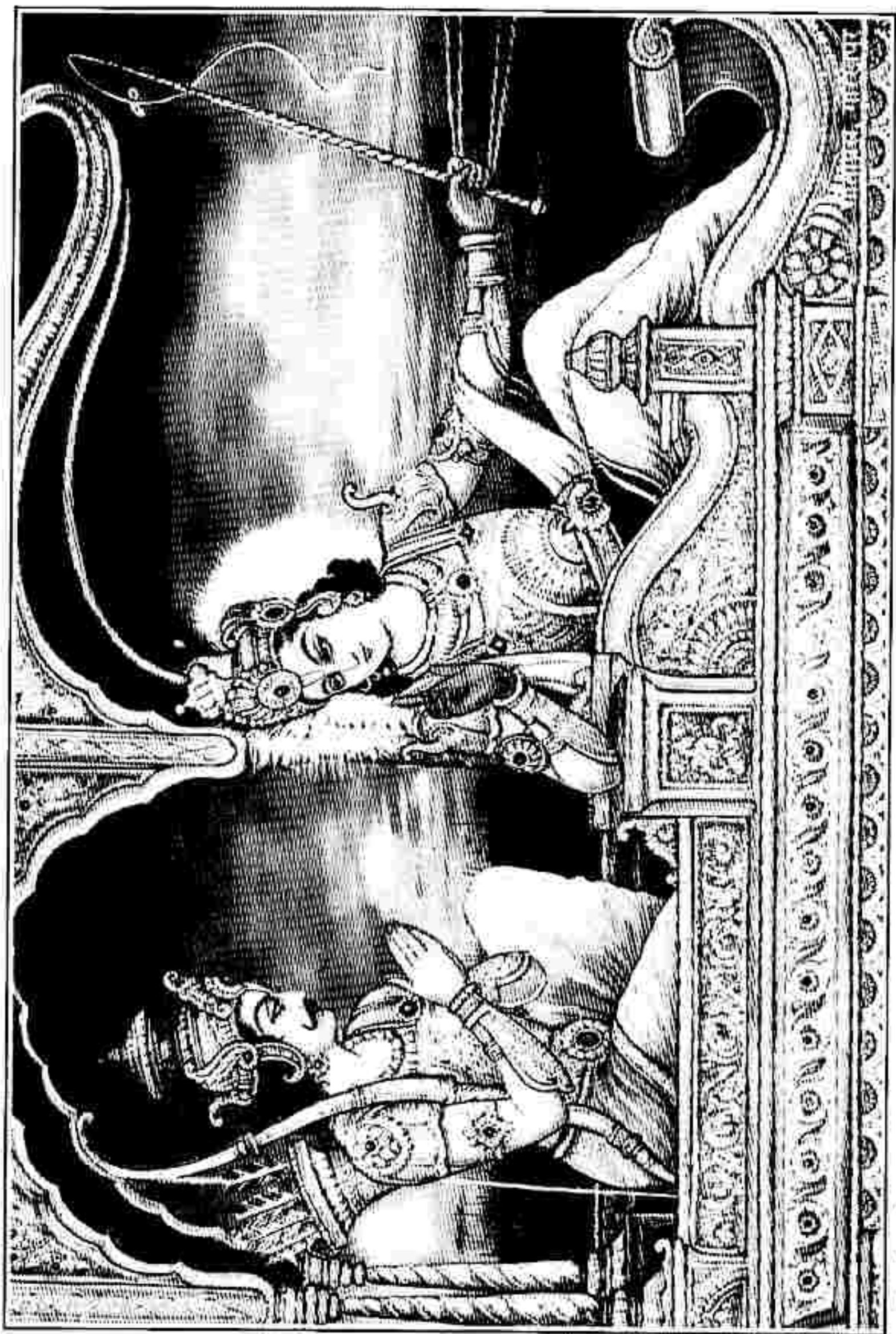
अर्जुनको उपदेश

Prescript to Arjuna

प्रजापतिकी शिक्षा Preachings of Prajāpati

सूर्यको उपदेश

Precept of Sun

समदर्शिता

Impartiality
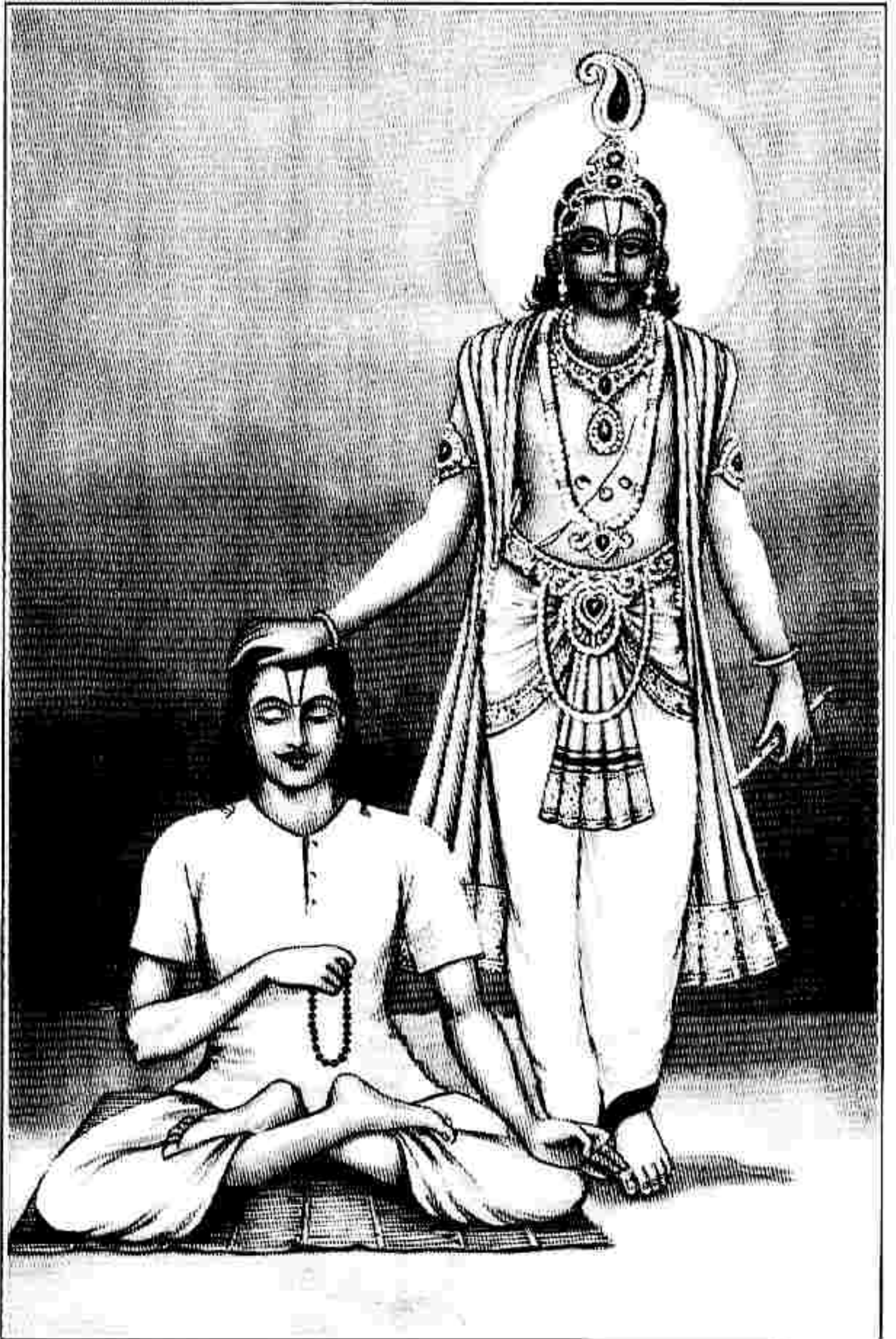
अनन्य चिन्तनका फल Undivided devotion fructified

ध्रुवपर अनुग्रह

Shower of grace of Dhruva

ব্যক্তিদের 'কৃপণ' বলেছেন **'কৃপণাঃ ফলহেতবঃ'** (২।৪৯)।

৩) সাধারণতঃ দীনস্বভাবের বাচক হল এই কৃপণ শব্দটি।

এখানে অর্জুনের মধ্যে যে 'কার্পণ্য' রয়েছে, তা লোভজনিত কৃপণতাও নয় বা ভোগাসক্তিরূপ কৃপণতাও নয়, কারণ অর্জুন স্বভাবতঃই অত্যন্ত উদার, দানশীল এবং ইন্দ্রিয়বিজয়ী পুরুষ। এখানেও তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে 'আমার নিজের জন্য বিজয়, রাজ্য বা সুখের কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই' ; যাঁদের জন্য এসব বস্তু আকাঙ্ক্ষিত সেই সব আত্মীয়-স্বজনেরা এখানে মৃত্যুর জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। শুধু এই পৃথিবী কেন, আমি ত্রিলোকের রাজত্বের জন্যও দুর্যোধনদের বধ করতে চাই না (১।৩২-৩৫)। সমস্ত ভূমণ্ডলের নিষ্কণ্টক রাজ্য ও দেবতাগণের আধিপত্যও আমাকে শোকরহিত করতে সক্ষম নয় (২।৮)।' যিনি এতোটা ত্যাগ করতে প্রস্তুত, তিনি কখনও কৃপণ বা ভোগাসক্ত হতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, এখানে এরূপ অর্থ মনে করা সর্বতোভাবে প্রকরণ বিরুদ্ধ।

এখানে অর্জুনের এই কার্পণ্য একপ্রকারের দীনতাই, যা করুণাযুক্ত কাপুরুষতা ও বিষাদরূপে প্রকটিত। সঞ্জয় প্রথম শ্লোকে অর্জুনের জন্য **'কৃপয়াবিষ্টম্'** পদটি প্রয়োগ করে এই বিষাদজনিত কাপুরুষতারই নির্দেশ করেছেন। তৃতীয় শ্লোকে স্বয়ং শ্রীভগবানও **'ক্লৈব্যম্'** পদ প্রয়োগ করে সেটি সমর্থন করেছেন। সুতরাং অর্জুনের এই কাপুরুষতা বস্তুত স্বজন-বান্ধব নাশের আশঙ্কায় উৎপন্ন করুণাজনিত বিষাদ।

অর্জুন আদর্শ ক্ষত্রিয়, স্বাভাবিক ভাবেই শূরবীর ; তাই যে কারণেই হোক না কেন অর্জুনের কাছে এই কাপুরুষতা দোষেরই। তাই অর্জুন একে বলেছেন 'কার্পণ্য-দোষ'।

এই কার্পণ্য-দোষে অর্জুনের অতুলনীয় শৌর্য, বীর্য, ধৈর্য, চাতুর্য, সাহস এবং পরাক্রমসম্পন্ন ক্ষত্রিয় স্বভাব যেন নষ্ট হতে বসেছিল ; তাই জন্য তাঁর শরীর শিথিল হয়েছিল, মুখ শুষ্ক হচ্ছিল, অঙ্গ কম্পিত হচ্ছিল, শরীরে জ্বালাবোধ হচ্ছিল এবং মন ভ্রমিত হচ্ছিল। করুণাযুক্ত কাপুরুষতার আবেশে অর্জুন তাঁর নিজের মধ্যে এই স্বভাববিরুদ্ধ লক্ষণ দেখে বলেছেন যে 'আমি কার্পণ্যদোষে অভিভূত হয়ে পড়েছি।'

প্রশ্ন—অর্জুন কেন নিজেকে **'ধর্মসম্মূঢ়চেতাঃ'** বলেছেন ?

উত্তর—ধর্ম-অধর্ম অথবা কর্তব্য-অকর্তব্য ঠিক করতে যার হৃদয় অসমর্থ হয়েছে, তাকে বলা হয় **'ধর্মসম্মূঢ়চেতাঃ'**। অর্জুনের মন সেই সময় অত্যন্ত ধর্ম-সঙ্কটগ্রস্ত হয়েছিল ; তিনি একদিকে প্রজাপালন, ক্ষাত্রধর্ম, স্বত্ব সংরক্ষণ ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি রেখে যুদ্ধকে ধর্ম মনে করে তাতে ব্যাপৃত হওয়া উচিত বলে মনে করেছিলেন, অন্যদিকে হৃদয়ে বর্তমান কার্পণ্যবৃত্তি যুদ্ধের নানাপ্রকার ভয়ানক পরিণাম উঠে আসছিল, তাঁকে ভিক্ষাবৃত্তি, সন্ন্যাস এবং বনবাসে প্রবৃত্ত করতে চাইছিল। তাঁর হৃদয় এতো বিষাদাচ্ছন্ন যে তিনি কোনো স্থির সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে পারছিলেন না, তাই নিজেকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেখে অর্জুন একথা বলেছেন।

প্রশ্ন—**'নিশ্চিতং শ্রেয়ঃ'** কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—কৌরবদের ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ প্রমুখ বিশ্ব-বিখ্যাত অজেয় যোদ্ধা সংরক্ষিত পাণ্ডবদের থেকে বিশাল সৈন্য সমারোহ দেখে অর্জুন ভীত হয়ে এবং যুদ্ধে নিজেদের জয় সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে, যুদ্ধ করায় কল্যাণ হবে কি হবে না, এই উদ্দেশ্যে **'শ্রেয়ঃ'** শব্দটি ব্যবহার করে জয়-পরাজয় বিষয়ে শ্রীভগবানের কাছে যে এক নিশ্চিত মত জানতে চেয়েছেন, এখানে সেরকম কোনো ব্যাপার নয়। আসলে তাঁর মনে একপ্রকার স্বজন-বান্ধবজনিত স্নেহ জাগরিত হয়েছিল এবং বন্ধুনাশজনিত এক বিরাট পাপের সম্ভাবনা মনে হয়েছিল, যার ফলে তিনি সেটি পরম কল্যাণের প্রতিবন্ধক মনে করেছিলেন আবার অন্য দিকে মনে মনে এমন চিন্তাও হয়েছিল যে ক্ষত্রিয়ধর্ম সম্মত যুদ্ধ, যা আমি ত্যাগ করতে যাচ্ছি, তা অধর্ম নয় তো ? এটি আমার পরম কল্যাণের পথে বাধা সৃষ্টি করবে না তো ? তাই তিনি 'নিশ্চিত শ্রেয়' কী, তাই জানতে চেয়েছেন। তাঁর এই 'নিশ্চিত শ্রেয়' কথাটি জয়-পরাজয় সম্পর্কে নয়, এর লক্ষ্য হল ভগবদ্‌প্রাপ্তিরূপ পরম কল্যাণ। অর্জুন বলেছেন—'ভগবন্ ! আমি কর্তব্য স্থির করতে অক্ষম। আপনি নিশ্চিতভাবে বলে দিন—আমার পরম কল্যাণের সাধন কোন্‌টি ?'

প্রশ্ন—আমি আপনার শিষ্য, আমি শরণাগত, আমাকে শিক্ষা দিন—এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—অর্জুন ছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা। আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কথা অন্য ব্যাপার, কিন্তু ব্যবহারে অর্জুনের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক প্রায় সর্বত্রই সমান সমান ছিল। খাওয়া, দাওয়া, শোওয়া, বসা, যাওয়া, আসা সর্বত্রই ভগবান তাঁর সঙ্গে সমান ব্যবহার করতেন এবং ভগবানের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি তাঁর মনে শ্রদ্ধা ও সম্মান থাকলেও অর্জুন তাঁর সঙ্গে সেইরূপ প্রতি-ব্যবহারই করতেন। আজ নিজের শোচনীয় অবস্থা দেখে তাঁর মনে হয় যে, তিনি এঁর (শ্রীকৃষ্ণের) সঙ্গে একই প্রকার ব্যবহার করার যোগ্য নন। সমান-সমান ব্যবহারিক জীবনে পরামর্শ পাওয়া যায়, উপদেশ নয়, প্রেরণা পাওয়া যায়—বলপূর্বক নির্দেশ নয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে পরামর্শ ও প্রেরণা দ্বারা কিছু হবার নয়। আজ আমার গুরুকে প্রয়োজন, যিনি উপদেশ দেবেন এবং বলপূর্বক শাসন করে আমাকে শ্রেয় পথে চালনা করবেন। আমার শোক-মোহ সর্বতোভাবে দূর করে আমার পরম-প্রাপ্তি লাভ করাবেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের থেকে বড়ো গুরু আমি আর কোথায় পাব। গুরুর উপদেশের অমৃতধারা তখনই পাওয়া যায়, যখন শিষ্যরূপী ক্ষেত্র তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে। তাই অর্জুন বলেছেন যে— 'ভগবন্ ! আমি আপনার শিষ্য।'

শিষ্য কয়েক প্রকারের হয়। যে শিষ্যেরা গুরুর উপদেশ গ্রহণ করলেও নিজের পৌরুষের অহংকার ত্যাগ করে না ; অথবা নিজের সদ্গুরুকে ত্যাগ করে অন্যের ওপর নির্ভর করে, তারা গুরুকৃপার যথার্থ লাভ পায় না। অর্জুন তাই শিষ্যত্বের সঙ্গে অনন্য শরণাগত হওয়ার কথা চিন্তা করে বলেছেন, ভগবন্ ! আমি শুধু শিষ্যই নই, আপনার শরণাগতও। 'প্রপন্ন' শব্দটির ভাবার্থ হল—ভগবানকে অত্যন্ত সক্ষম এবং পরমশ্রেষ্ঠ মেনে নিয়ে তাঁর প্রতি নিজেকে সমর্পণ করা। একেই বলা হয় 'শরণাগতি', 'আত্মনিক্ষেপ' বা 'আত্মসমর্পণ'। ভগবান সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্ব অন্তর্যামী, অনন্ত গুণের সমুদ্র। তিনি সর্বাধিপতি, ঐশ্বর্য, মাধুর্য, ধর্ম, শৌর্য, জ্ঞান, বৈরাগ্য ইত্যাদির অনন্ত আকর, ক্লেশ, কর্ম, সংশয় এবং ভ্রমাদি নাশকারী, পরম প্রেমী, পরম সুহৃদ, পরম আত্মীয়, পরম গুরু এবং পরম মহেশ্বর—এই বিশ্বাস করে নিজেকে সর্বতোভাবে নিরাশ্রয়, নিরবলম্ব (অবলম্বনশূন্য), নির্বুদ্ধি, নির্বল এবং নিঃসত্ত্ব মনে করে তাঁর আশ্রয়, অবলম্বন, জ্ঞান, শক্তি, সত্ত্ব এবং অতুলনীয় শরণাগত-বাৎসল্যের ওপর দৃঢ় ও অনন্য ভরসা করে নিজেকে সর্বপ্রকারে সর্বদার জন্য তাঁর চরণে পতিত হতে হবে। নির্নিমেষ নয়নে তাঁর নয়নাভিরাম মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করে, পুতুলের ন্যায় নিত্য-নিরন্তর তাঁর সঙ্কেতে চলার একমাত্র বাসনার দ্বারা তাঁকে অনন্যভাবে চিন্তা করাই ভগবানের প্রপন্ন হওয়া। অর্জুন চেয়েছিলেন এইভাবে ভগবানের শরণাগত হতে, তাই এই চিন্তায় চিন্তিত হয়ে তিনি বলেছেন—'ভগবন্ ! আমি আপনার শিষ্য এবং আপনার শরণাগত, আপনি আমাকে শিক্ষা দিন।' 'তে' এবং 'ত্বাম্' পদগুলির প্রয়োগ করে অর্জুন একথাই বলেছেন। অর্জুনের এই শরণাগতির সর্বোত্তম এবং যথার্থ-ভাব যখন অষ্টাদশ অধ্যায়ের পঁয়ষট্টি ও ছেষট্টিতম শ্লোকে ভগবানের সর্বগুহ্যতম উপদেশের প্রভাবে সত্যকার শরণাগতির রূপে পরিণত হবে এবং অর্জুন যখন তাঁর কথানুসারে চলার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারবেন, তখনই এই গীতার উপদেশ সমাপ্ত হবে। প্রকৃতপক্ষে এই শ্লোক থেকেই গীতার সাধনা আরম্ভ হচ্ছে। এটিই উপদেশের উপক্রমের বীজ এবং '**সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য**' শ্লোকেই এই সাধনার সিদ্ধি ও উপসংহার।

সম্বন্ধ—এইভাবে ভগবানের কাছে শিক্ষালাভের জন্য প্রার্থনা করে অর্জুন এবার প্রার্থনা করার কারণ জানাচ্ছেন ও নিজের চিন্তা প্রকাশ করছেন—

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্ যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্॥ ৮

কারণ পৃথিবীর নিষ্কণ্টক, ধন-ধান্য সমৃদ্ধ রাজ্য এবং দেবগণের প্রভুত্ব প্রাপ্ত হলেও, আমি এমন কোনো উপায় দেখছি না যা আমার ইন্দ্রিয়-সন্তাপক শোক দূর করতে পারে॥ ৮

প্রশ্ন—এই শ্লোকে অর্জুনের বক্তব্যের তাৎপর্য কী ?

উত্তর—অর্জুন আগের শ্লোকে ভগবানের কাছে শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, তাই এখানে বলেছেন যে আপনি ইতিপূর্বে আমাকে যুদ্ধ করতে বলেছেন, কিন্তু সেই যুদ্ধের অত্যধিক ফলরূপে বিজয়লাভ করলে, ইহলোকে নিষ্কণ্টক পৃথিবী লাভ করলেও বিচার করলে মনে হয় যে এই পৃথিবীর রাজ্য তো কোন্ ছার, আমি যদি দেবতাগণের আধিপত্যও লাভ করি, তাহলেও আমার এই ইন্দ্রিয়-সন্তাপক বিষাদ দূর হবে না। সুতরাং আমাকে এমন কোনো নিশ্চিত উপায় বলুন যা আমার এই বিষাদ দূর করে আমাকে চিরকালের মতো সুখী করে দেয়।

সম্বন্ধ—এরপর অর্জুন কী করলেন, তা বলা হচ্ছে—

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ॥ ৯

সঞ্জয় বললেন—হে রাজন্ ! নিদ্রাজয়কারী অর্জুন অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলার পর পুনরায় শ্রীভগবানকে 'আমি যুদ্ধ করব না', স্পষ্ট ভাবে একথা বলে নীরবে বসে রইলেন॥ ৯

প্রশ্ন—এই শ্লোকটির কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—সঞ্জয় এই শ্লোকে ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছেন যে উপরিউক্ত ভাবে ভগবানের শরণাগত হয়ে শিক্ষা প্রদানের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, নিজ চিন্তা প্রকটিত করে অর্জুন এবার 'আমি যুদ্ধ করব না' বলে চুপ করে রইলেন।

প্রশ্ন—'গোবিন্দ' শব্দটির অর্থ কী ?

উত্তর—**'গোভির্বেদবাক্যৈর্বিদ্যতে লভ্যতে ইতি গোবিন্দঃ'**—এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে বেদ-বাণীর দ্বারা ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি হয়, তাই তাঁর নাম 'গোবিন্দ'। গীতাতেও বলা হয়েছে **'বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ'** (১৫।১৫)। 'সমস্ত বেদাদির দ্বারা জ্ঞাতব্য একমাত্র আমিই।'

সম্বন্ধ—অর্জুন এইভাবে চুপ করে গেলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কী করলেন, তা জিজ্ঞাসা করায় সঞ্জয় বলেছেন—

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ॥ ১০

হে ভরতবংশীয় ধৃতরাষ্ট্র ! অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ উভয় সেনার মধ্যে শোকনিমগ্ন সেই অর্জুনকে মৃদুহাস্যে এই কথা বললেন॥ ১০

প্রশ্ন—'উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে বিষীদন্তম্' বিশেষণের সঙ্গে 'তম্' পদটি প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা সঞ্জয় বলতে চেয়েছেন যে, যে অর্জুন প্রথমে অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে তাঁর রথ উভয় সেনার মধ্যে স্থাপন করতে ভগবানকে বলেছিলেন, তিনিই এবার উভয় সেনার মধ্যে অবস্থিত স্বজনদের দেখে মোহাবিষ্ট ও ব্যাকুল হয়ে উঠলেন ; সেই অর্জুনকেই ভগবান বলেছেন।

প্রশ্ন—'মৃদু হাস্যে একথা বললেন' এই কথাটির ভাব কী ?

উত্তর—এই বাক্যের দ্বারা সঞ্জয় ভগবানের উপদেশ-শৈলী এবং সেই উপদেশের মর্মে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

অর্থ হল যে অর্জুন উপরিউক্ত ভাবে শৌর্য প্রকাশ করার স্থানে উল্টে বিষাদাচ্ছন্ন হয়েছেন এবং আমার শরণাগত হয়ে শিক্ষা প্রদানের জন্য প্রার্থনা করে আমার সিদ্ধান্ত শোনার আগেই যুদ্ধ না করার কথাও বলেছেন—এ তাঁর সাংঘাতিক ভ্রম। তাই ভগবান মনে মনে হেসে এই কথাগুলি (আগে যা বলা হবে, সেগুলি) বললেন।

সম্বন্ধ—উপরিউক্ত ভাবে চিন্তামগ্ন অর্জুন যখন ভগবানের শরণাগত হয়ে তাঁর মহাশোক নিবৃত্তির উপায় জিজ্ঞাসা করে বললেন যে ইহলোক বা পরলোকের রাজ্যসুখের দ্বারা এই শোক নিবৃত্তি হবে না, তখন অর্জুনকে অধিকারী জেনে তাঁর শোক ও মোহ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে ভগবান প্রথমে নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিচার করে সাংখ্যযোগের দৃষ্টিতেও যুদ্ধ করা উচিত—এটি প্রতিপাদন করতে গিয়ে সাংখ্য নিষ্ঠার বর্ণনা করেছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥ ১১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে অর্জুন! যাঁদের জন্য তোমার শোক করা উচিত নয়, তাদের জন্য তুমি শোক করছ আবার পণ্ডিতের মতো কথা বলছ। কিন্তু মৃত বা জীবিত—পণ্ডিতগণ কারো জন্যই শোকগ্রস্ত হন না॥ ১১

প্রশ্ন—অর্জুনের কোন্ কথা লক্ষ্য করে ভগবান এই কথা বলেছেন যে, যাদের জন্য শোক করা উচিত নয়, তাদের জন্য তুমি শোক করছ?

উত্তর—উভয় সেনার মধ্যে পিতৃব্য, বন্ধু-বান্ধব, আচার্যগণকে দেখেই তাঁদের বিনাশের আশঙ্কায় বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে অর্জুন প্রথম অধ্যায়ের আঠাশ, উনত্রিশতম ও ত্রিশতম শ্লোকে নিজের অবস্থা বর্ণনা করেছেন এবং পঁয়তাল্লিশতম শ্লোকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য শোক প্রকট করেছেন। সাতচল্লিশতম শ্লোকে সঞ্জয় তাঁর অবস্থার যে বর্ণনা করেছেন, তা লক্ষ্য করে ভগবান এই কথা বলেছেন যে, 'যাঁদের জন্য শোক করা উচিত নয়, তুমি তাঁদের জন্য শোক করছ।'

এখান থেকে ভগবানের উপদেশ আরম্ভ হচ্ছে, যাঁর উপসংহার হয়েছে অষ্টাদশ অধ্যায়ের ছেষট্টিতম শ্লোকে।

প্রশ্ন—অর্জুনের কোন্ কথা লক্ষ্য করে ভগবান বলেছেন যে, 'তুমি পণ্ডিতদের মতো কথা বলছ'?

উত্তর—প্রথম অধ্যায়ের একত্রিশ থেকে চুয়াল্লিশতম এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শ্লোক পর্যন্ত অর্জুন কুলনাশ দ্বারা উৎপন্ন মহাপাপের বর্ণনা করে দুর্যোধনের অহংকারপূর্ণ নীচতা এবং নিজের ধর্মজ্ঞানের কথা বলে নানাপ্রকার যুক্তি-সহকারে যুদ্ধের অনৌচিত্য প্রমাণ করেছেন; সেইসব কথা লক্ষ্য করে ভগবান বলেছেন যে তুমি পণ্ডিতের ন্যায় কথা বলছ।

প্রশ্ন—'গতাসূন্' এবং 'অগতাসূন্' কাদের বাচক এবং 'তাদের জন্য পণ্ডিতগণ শোক করেন না' এই কথাটির অভিপ্রায় কী?

উত্তর—যাদের প্রাণ চলে গেছে (ত্যাগ হয়েছে) তাদের বলা হয় 'গতাসু' আর যাদের প্রাণ যায়নি, তাদের 'অগতাসু' বলা হয়। 'তাঁদের জন্য পণ্ডিতেরা শোক করেন না'—এই কথাটির দ্বারা ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, তুমি যেমন তোমার পিতা, পিতামহ প্রভৃতি পরলোকগত পিতৃপুরুষের কথা চিন্তা করছ যে, যুদ্ধের পরিণামে আমাদের কুলনাশ হলে, বর্ণসঙ্কর হলে আমাদের পিতৃপুরুষগণ নরকে পতিত হবেন ইত্যাদি; বর্তমানে অবস্থিত বন্ধু-বান্ধবদের জন্যও চিন্তা করছ যে, এঁরা সব না থাকলে আমি রাজ্য ও সুখাদি ভোগ নিয়ে কী করব। কুল নষ্ট হলে নারীগণও ভ্রষ্টা হয় ইত্যাদি। পণ্ডিতগণ এসব নিয়ে চিন্তা করেন না। কারণ পণ্ডিতদের দৃষ্টিতে একমাত্র সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মই নিত্য ও সৎ বস্তু, তাঁর থেকে ভিন্ন কোনো বস্তুই নেই, তিনি সকলের আত্মা, তাঁর কখনো কোনো প্রকার বিনাশ হতে পারে না।

শরীর অনিত্য, সর্বদা তা থাকা সম্ভব নয়, আত্মা ও শরীরের সংযোগ-বিয়োগ ব্যবহারিক দৃষ্টিতে অনিবার্য হলেও প্রকৃতপক্ষে তা স্বপ্নের মতো কল্পিত ; তাহলে তাঁরা কার জন্য, কী জন্য শোক করবেন ? তাই তুমি যে শোক করছ, সেজন্য মনে হচ্ছে, তুমি পণ্ডিত নও, শুধু পণ্ডিতদের মতো কথাই বলছ।

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, যে ভীষ্মাদি স্বজনদের জন্য তোমার শোক করা উচিত নয়, তাঁদের জন্য তুমি শোক করছ। অতএব জানতে ইচ্ছা হয় যে, কেন তাঁদের জন্য শোক করা উচিত নয় ? তাই ভগবান প্রথমে আত্মার নিত্যতা প্রতিপাদন করে আত্মদৃষ্টিতে তাঁদের জন্য শোক করা অনুচিত বলে প্রমাণ করেছেন—

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃ পরম্॥ ১২

এমন নয় যে, আমি কোনো কালে ছিলাম না বা তুমিও ছিলে না, অথবা এই রাজন্যবর্গ ছিলেন না এবং পরেও যে আমরা সকলে থাকব না, তাও নয়॥ ১২

প্রশ্ন—এই শ্লোকটিতে ভগবানের কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই শ্লোকে ভগবান আত্মরূপে সকলের নিত্যতা সিদ্ধ করে এই ভাব প্রকাশ করেছেন যে তুমি যাঁদের বিনাশের আশঙ্কা করছ, তাঁদের সকলের এবং তোমার-আমার কখনো কোনো কালে বিনাশ নেই। বর্তমান শরীরের উৎপত্তির আগেও আমরা ছিলাম, পরেও থাকব। শরীর নাশ হলেও আত্মার বিনাশ হয় না, অতএব বিনাশের আশঙ্কায় এঁদের সকলের জন্য শোক করা উচিত নয়।

সম্বন্ধ—এই ভাবে আত্মার নিত্যতা প্রতিপাদন করে এবার তার নির্বিকারত্ব প্রতিপাদন করে আত্মার জন্য শোক করা যে অনুচিত তা প্রমাণ করেছেন—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥ ১৩

যেমন দেহীর (জীবাত্মার) এই দেহে কৌমার, যৌবন এবং বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত হয়, তেমনিই ভিন্ন দেহের প্রাপ্তি হয় ; ধীর ব্যক্তিগণ এই বিষয়ে মোহগ্রস্ত হন না॥ ১৩

প্রশ্ন—এই শ্লোকটিতে ভগবানের বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই শ্লোকে আত্মাকে বিকারশীল মনে করে অজ্ঞান ব্যক্তিগণ তাকে এক দেহ থেকে অন্য দেহে যাওয়াকে কষ্টকর মনে করে শোকগ্রস্ত হন ; সেটি অনুচিত বলে ভগবান জানিয়েছেন। ভগবান বলেছেন যে প্রকার কৌমারত্ব, যৌবন প্রাপ্তি এবং জরাগ্রস্ত অবস্থা আত্মার হয় না, স্থূল শরীরেরই হয় এবং সেটি আত্মার ওপর আরোপিত হয়, তেমনই এক দেহ থেকে অন্য দেহে যাওয়া-আসাও প্রকৃতপক্ষে আত্মার হয় না, সূক্ষ্ম শরীরেরই হয় এবং তা আত্মার ওপর আরোপিত হয়। তাই এই তত্ত্ব যাঁরা জানেন না, সেই অজ্ঞ ব্যক্তিরা দেহান্তর প্রাপ্তিতে শোক প্রকাশ করেন, ধীর, জ্ঞানী ব্যক্তিরা করেন না ; কারণ তাঁদের দৃষ্টিতে আত্মার সঙ্গে শরীরের কোনো সম্পর্ক নেই। অতএব তোমার শোক করা উচিত নয়।

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে ভগবান আত্মার নিত্যত্ব এবং নির্বিকারত্ব প্রতিপাদন করে তার জন্য যে শোক করা উচিত

নয়, তা প্রমাণ করেছেন ; তাতে এই প্রশ্ন আসতে পারে যে আত্মা নিত্য ও নির্বিকার হলেও বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সংযোগ-বিয়োগাদিতে যে সুখ-দুঃখের প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয়, তাতে শোক না করে কি থাকা যায় ? তাতে ভগবান নির্দেশ দিচ্ছেন যে সর্বপ্রকার সংযোগ-বিয়োগ অনিত্য জেনে তা সহ্য করা উচিত।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত।। ১৪

হে কৌন্তেয় ! শীত-গ্রীষ্ম এবং সুখ-দুঃখ প্রদানকারী ইন্দ্রিয় এবং বিষয়ের সংযোগ তো উৎপত্তি ও বিনাশশীল এবং অনিত্য ; সুতরাং হে ভারত ! তুমি তা সহ্য করো।। ১৪

প্রশ্ন—'মাত্রাস্পর্শাঃ' পদটি এখানে কীসের বাচক ?

উত্তর—যার দ্বারা কোনো বস্তুর পরিমাপ জানা যায়— তার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাকে **'মাত্রা'** বলা হয় ; সুতরাং **'মাত্রা'** দ্বারা এখানে অন্তঃকরণসহ সকল ইন্দ্রিয়াদিকে বোঝানো হয়েছে এবং **স্পর্শ** বলা হয় সম্বন্ধ বা সংযোগকে। অন্তঃকরণসহ ইন্দ্রিয়াদির শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদির বিষয়ের সঙ্গে যে সম্পর্ক, তাকেই এইস্থানে **'মাত্রাস্পর্শাঃ'** পদটির দ্বারা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—সেই সবগুলিকে **'শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ'** বলার অর্থ কী ?

উত্তর—শীত-গ্রীষ্ম ও সুখ-দুঃখ শব্দগুলি এখানে দ্বন্দ্বের উপলক্ষণ। সুতরাং বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদির সম্পর্ককে **'শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ'** বলে ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে, এই সমস্ত বিষয়ই ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হলে শীত-উষ্ণ, রাগ-দ্বেষ, হর্ষ-বিষাদ, সুখ-দুঃখ, অনুকূল-প্রতিকূল ভাব ইত্যাদি সমস্ত দ্বন্দ্বের উৎপন্নকারক হয়। এগুলির প্রতি নিত্যত্ব-বুদ্ধি হলেই নানাপ্রকার বিকার উৎপন্ন হয়, সুতরাং সেগুলিকে অনিত্য ভেবে তার সংযোগে তোমার কোনো প্রকারেই বিকারযুক্ত হওয়া উচিত নয়।

প্রশ্ন—ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে বিষয়াদির সংযোগকে উৎপত্তি-বিনাশশীল ও অনিত্য বলে অর্জুনকে তা সহ্য করতে নির্দেশ দেওয়ার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এরূপ নির্দেশ দিয়ে ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে সুখ-দুঃখ প্রদানকারী ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ের সঙ্গে যে সংযোগ, তা ক্ষণভঙ্গুর এবং অনিত্য, তাই তাতে প্রকৃত সুখের লেশমাত্র থাকে না। সুতরাং তুমি সেসব সহ্য কর অর্থাৎ সেগুলিকে অনিত্য জেনে তার আসা-যাওয়াতে রাগ-দ্বেষ বা হর্ষ-বিষাদ কোরো না। বন্ধু-বান্ধবের সংযোগও এর অন্তর্গত। কারণ অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারাই অন্য বিষয়ের মতো এদের সঙ্গেও সংযোগ-বিয়োগ হয়ে থাকে। তাই এইস্থানে সর্বপ্রকার সংযোগ-বিয়োগের পরিণাম-স্বরূপ সুখ-দুঃখাদি সহ্য করার জন্য ভগবান বলেছেন— এই কথা বুঝতে হবে।

সম্বন্ধ—এই সব কিছু সহ্য করলে কী লাভ হবে ? সেই জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেছেন—

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে।। ১৫

কারণ হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! সুখ-দুঃখকে সমান জ্ঞানকারী যে ধীর পুরুষকে ইন্দ্রিয় ও বিষয়জনিত সংযোগ বিচলিত না করে, তিনি মোক্ষলাভের অধিকারী হন।। ১৫

প্রশ্ন—এখানে **'হি'** পদটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে **'হি'** হেতুর অর্থে ব্যবহৃত। ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে বিষয়াদির সংযোগ কীসের জন্য সহন করা উচিত, সেই কথাটি জানানোই এই শ্লোকের

অভিপ্রায়।

প্রশ্ন—'**পুরুষর্ষভ**' সম্বোধনের অর্থ কী ?

উত্তর—'**ঋষভ**' শব্দটি শ্রেষ্ঠত্বের বাচক। সুতরাং পুরুষদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ শূরবীর এবং বলবান, তাঁকে '**পুরুষর্ষভ**' বলা হয়। এখানে অর্জুনকে '**পুরুষর্ষভ**' নামে সম্বোধন করে ভগবান এই ভাব প্রকট করেছেন যে, তুমি অত্যন্ত বড় শূরবীর, সহ্যশীলতা তোমার স্বাভাবিক গুণ, অতএব তুমি অতি সহজেই এসব সহ্য করতে পারবে।

প্রশ্ন—'**ধীরম্**' পদটি কিসের বাচক ?

উত্তর—'**ধীরম্**' পদটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরমাত্মা প্রাপ্ত পুরুষদের বাচক হয়, কিন্তু কোনো কোনো স্থানে পরমাত্মা প্রাপ্তির পাত্রকেও 'ধীর' বলা হয়। সুতরাং এখানে '**ধীরম্**' পদটি সাংখ্যযোগের সাধনায় সুউচ্চ স্থিতিতে অবস্থিত সাধকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়েছে।

প্রশ্ন—'**সমদুঃখসুখম্**' বিশেষণটির কী তাৎপর্য ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান ধীর পুরুষদের লক্ষণ জানিয়েছেন যে, যেসব পুরুষদের কাছে সুখ-দুঃখ সমান হয়েছে, সেগুলি অনিত্য ভেবে যাঁদের সেই দ্বন্দ্বে ভেদবুদ্ধি নেই, তাঁরাই 'ধীর' এবং সেসব সহ্য করতে সক্ষম হন।

প্রশ্ন—'**এতে**' পদটি কীসের বাচক এবং '**ন ব্যথয়ন্তি**' কথার তাৎপর্য কী ?

উত্তর—বিষয়াদির সঙ্গে ইন্দ্রিয়াদির যে সংযোগ, যার জন্য পূর্বশ্লোকে '**মাত্রাস্পর্শাঃ**' পদটি প্রয়োগ করা হয়েছিল, তারই বাচক এখানে 'এতে' পদটি এবং '**ন ব্যথয়ন্তি**' দ্বারা এই ভাব প্রকাশ করা হয়েছে যে বিষয়াদির সংযোগ-বিয়োগে সাধকের রাগ-দ্বেষ ও হর্ষ-বিষাদ না করার অভ্যাস করতে করতে এমন অবস্থা হয়ে যায়, যখন কোনো ইন্দ্রিয়ই তৎ সম্পর্কিত কোনো ভোগের সঙ্গে সংযোগে তাকে কোনোভাবে বিকারগ্রস্ত করতে পারে না। তখন বোঝা উচিত যে সে 'ধীর' এবং সুখ-দুঃখে 'সম-ভাবসম্পন্ন' হয়ে গেছে।

প্রশ্ন—'সে মোক্ষের যোগ্য হয়ে যায়' এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান বোঝাতে চেয়েছেন যে উপরিউক্ত সমভাবসম্পন্ন ব্যক্তি মোক্ষের—পরমাত্মা প্রাপ্তির পাত্র হয়ে ওঠে এবং তার শীঘ্রই অপরোক্ষভাবে পরমাত্মা প্রাপ্তি হয়।

সম্বন্ধ—দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শ্লোকে ভগবান আত্মার নিত্যতা ও নির্বিকারতা প্রতিপাদন করেছেন এবং চতুর্দশ শ্লোকে ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে বিষয়াদির সংযোগকে অনিত্য বলে জানিয়েছেন, কিন্তু আত্মা কেন নিত্য এবং এই সংযোগ কেন অনিত্য ? তা স্পষ্ট করে বলেননি ; অতএব এই শ্লোকে ভগবান নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বর্ণনার দৃষ্টিতে এই দুটির লক্ষণ জানিয়েছেন—

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।। ১৬

অসৎ বস্তুর অস্তিত্ব নেই এবং সৎ বস্তুর অনস্তিত্ব নেই। এইভাবে এই দুটিরই প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞানীগণ উপলব্ধি করেছেন।। ১৬

প্রশ্ন—'অসতঃ' পদটি এখানে কীসের বাচক এবং 'তার অস্তিত্ব নেই' এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'**অসতঃ**' পদটি এখানে পরিবর্তনশীল শরীর, ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়াদির বিষয়সহ সমস্ত জড়বস্তুর বাচক এবং 'তার অস্তিত্ব বা ভাব নেই' কথাটির দ্বারা ভগবান এইভাব প্রকট করেছেন যে সেটি যে কালে প্রতীয়মান হয়, তার আগেও সেটি ছিল না এবং পরেও থাকবে না ; অতএব যে সময় প্রতীয়মান হচ্ছে, সে সময়েও প্রকৃতপক্ষে তা নেই। সুতরাং যদি তুমি ভীষ্ম ইত্যাদি স্বজনদের শরীর অথবা অন্য জড় বস্তু বিনাশের আশঙ্কায় শোক করতে থাক, তাহলেও তোমার শোকগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়।

প্রশ্ন—'**সতঃ**' পদটি কীসের বাচক এবং 'তার অভাব নেই' কথাটি বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—**'সতঃ'** পদটি এখানে পরমাত্মতত্ত্বের বাচক, যা সর্বব্যাপী ও নিত্য। **'তার অভাব নেই'** কথাটির দ্বারা এই ভাব দেখানো হয়েছে যে এটির কখনো কোনো কারণেই পরিবর্তন বা অভাব হয় না। তা সর্বদা একরস, অখণ্ড ও নির্বিকারভাবে থাকে। তাই তুমি যদি আত্মরূপে ভীষ্মাদির বিনাশের আশঙ্কা করে শোকগ্রস্ত হও, তা হলেও তোমার শোক করা উচিত নয়।

প্রশ্ন—**'অনয়োঃ'** বিশেষণের সঙ্গে **'উভয়োঃ'** পদটি কীসের বাচক এবং তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী পুরুষেরা কীভাবে তার তত্ত্ব দেখতে পান ?

উত্তর—**'অনয়োঃ'** বিশেষণের সঙ্গে **'উভয়োঃ'** পদটি উপরিউক্ত **'অসৎ'** এবং **'সৎ'**—উভয়ের বাচক। তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষদের এই দুটির বিচারপূর্বক এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত যে, যা পরিবর্তন ও বিনাশশীল, যা সর্বদা থাকে না, তা হল অসৎ। অর্থাৎ অসৎ সদা বিদ্যমান থাকে না। আর যার কখনো কোনো অবস্থাতেই কোনো ভাবেই পরিবর্তন বা বিনাশ হয় না, সর্বদাই একইভাবে বিদ্যমান থাকে, তা হল সৎ। অর্থাৎ সৎ-এর কখনো অভাব হয় না—এটিই হল তত্ত্বদর্শী পুরুষদের দ্বারা দুটির তত্ত্ব জানা।

সম্বন্ধ—পূর্বশ্লোকে যে 'সৎ' তত্ত্বের জন্য এটি বলা হল—'এর অভাব নেই'। সেই 'সৎ' তত্ত্ব কী—সেই জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেছেন—

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি।। ১৭

অবিনাশী বলে তাঁকেই জানবে, যাঁর দ্বারা এই সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত। এই অবিনাশীর বিনাশ করতে কেহই সক্ষম নয়।। ১৭

প্রশ্ন—**'সর্বম্'**-এর সঙ্গে **'ইদম্'** পদ এখানে কীসের বাচক ? এটি কীসের দ্বারা পরিব্যাপ্ত এবং যার দ্বারা পরিব্যাপ্ত, তাঁকে অবিনাশী বলা হয়েছে কী অভিপ্রায়ে ?

উত্তর—শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, ভোগসামগ্রী এবং ভোগ স্থান ইত্যাদি সমস্ত জড়বর্গের বাচক **'সর্বম্'**-এর সঙ্গে **'ইদম্'** পদ ব্যবহৃত হয়েছে। এই সম্পূর্ণ জড়বর্গ চেতন পরমাত্মতত্ত্বের দ্বারা পরিব্যাপ্ত। সেই পরমাত্ম-তত্ত্বকে অবিনাশী বলে ভগবান এই ভাব প্রকটিত করেছেন যে, পূর্বশ্লোকে তিনি যে 'সৎ' তত্ত্বের লক্ষণ বলেছিলেন এবং তত্ত্ব-জ্ঞানীগণ যে তত্ত্বকে 'সৎ' বলে নিশ্চিত করেছেন, সেই পরমাত্মাকেই অবিনাশী নামে অভিহিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন—এই অবিনাশীকে বিনাশ করতে কেউই সক্ষম নয়, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—ভগবান এর দ্বারা দেখিয়েছেন যে আকাশের দ্বারা মেঘের ন্যায় এই পরমাত্মতত্ত্ব দ্বারা সমস্ত জড়বস্তু পরিব্যাপ্ত হওয়ায়, কেহই এই পরমাত্মতত্ত্বকে বিনাশ করতে সক্ষম নয় ; সদাসর্বদা বিরাজমান হওয়াতে ইনিই একমাত্র 'সৎ' তত্ত্ব।

সম্বন্ধ—এইভাবে 'সৎ' তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিয়ে এবার 'অসৎ' বস্তু কী সেই জিজ্ঞাসার উত্তরে জানিয়েছেন—

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত।। ১৮

অবিনশ্বর, অপ্রমেয়, নিত্যস্বরূপ জীবাত্মার এই সব শরীরকে বিনাশশীল বলা হয়েছে, তাই হে ভরতবংশীয় অর্জুন ! তুমি যুদ্ধ করো।। ১৮

প্রশ্ন—'**ইমে**'র সঙ্গে '**দেহাঃ**' পদটি এখানে কীসের বাচক ? এগুলিকে '**অন্তবন্তঃ**' বলার উদ্দেশ্য কী ?

উত্তর—'**ইমে**'র সঙ্গে '**দেহাঃ**' পদটি এখানে সমস্ত শরীরগুলির বাচক এবং অসতের ব্যাখ্যা করার জন্য একে '**অন্তবন্তঃ**' বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য হল যে অন্তঃকরণ এবং ইন্দ্রিয়াদি-সহ সকল শরীরই বিনাশশীল। স্বপ্নে যেমন শরীর ও জগৎ প্রকৃত বলে ভ্রম হয়, তেমনই এই সব শরীরও অজ্ঞতাবশতঃ সত্য বলে প্রতীত হয় ; বাস্তবে এর অস্তিত্ব নেই। তাই এর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং এর জন্য শোক করা উচিত নয়।

প্রশ্ন—এখানে '**দেহাঃ**' পদে বহুবচন এবং '**শরীরিণঃ**' পদে একবচনের প্রয়োগ করা হয়েছে কেন ?

উত্তর—এই প্রয়োগের দ্বারা ভগবান দেখিয়েছেন যে সমস্ত শরীরে একই আত্মা বিরাজমান। শরীরের পার্থক্যে অজ্ঞানতাবশতঃ আত্মাতে ভেদ প্রতীয়মান হয়, বাস্তবে কোনো ভেদ নেই।

প্রশ্ন — '**শরীরিণঃ**' পদটি এখানে কীসের বাচক এবং তার সঙ্গে '**নিত্যস্য**', '**অনাশিনঃ**' ও '**অপ্রমেয়স্য**' বিশেষণ ব্যবহারের আর শরীরাদির সঙ্গে তার সম্বন্ধ দেখানোর অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—পূর্বশ্লোকে যে '**সৎ**' তত্ত্ব দ্বারা সমস্ত জড়-পদার্থ পরিব্যাপ্ত বলা হয়েছে, সেই তত্ত্বের বাচক এখানে '**শরীরিণঃ**' পদ এবং এই তিনটি বিশেষণ প্রয়োগ সেই '**সৎ**' তত্ত্বের সঙ্গে এর ঐক্য প্রতিপাদন করার জন্য করা হয়েছে। এঁকে '**শরীরী**' জানিয়ে এবং শরীরের সঙ্গে এর সম্পর্ক দেখিয়ে আত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য প্রতিপাদন করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে যা ভিন্ন ভিন্ন শরীর-ধারণকারী তথা তাদের সঙ্গে সম্বন্ধরক্ষাকারী ভিন্ন ভিন্ন আত্মা বলে প্রতীত হয়, প্রকৃতপক্ষে তা ভিন্ন ভিন্ন নয়, সব একই চেতন-তত্ত্ব। যেমন নিদ্রার সময় স্বপ্ন কালে এক পুরুষ (চেতন) ব্যতীত কোনো বস্তু থাকে না, স্বপ্ন দেখার সময় নিদ্রাজনিত কারণে নানাত্ব প্রতীত হয়, নিদ্রাভঙ্গ হলে পুরুষ (চেতন) একই থেকে যায়, তেমনই এখানে সমস্ত বিভিন্নতা অজ্ঞতার কারণে হয়। আত্মজ্ঞান হলে আর কোনো বিভিন্নতা থাকে না।

প্রশ্ন—হেতুবাচক '**তস্মাৎ**' পদের প্রয়োগ করে যুদ্ধের জন্য আদেশ দেওয়ার এখানে কী অভিপ্রায় ?

উত্তর —হেতুবাচক '**তস্মাৎ**' পদের দ্বারা যুদ্ধের জন্য নির্দেশ দিয়ে ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, যখন এটি প্রমাণিত হল যে শরীর বিনাশশীল এবং তার বিনাশ অনিবার্য, অন্যদিকে আত্মা নিত্য, তার কখনো বিনাশ হয় না, তখন যুদ্ধে বিন্দুমাত্র শোকের কারণ নেই। অতএব এবার তোমার যুদ্ধ করায় কোনোরূপ ইতস্ততঃ করা উচিত নয়।

সম্বন্ধ—পূর্বশ্লোকে ভগবান আত্মার নিত্যত্ব ও নির্বিকারত্ব প্রতিপাদন করে অর্জুনকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু অর্জুন যে বলেছিলেন, 'আমি এঁদের বধ করতে চাই না, যদি এঁরা আমাকে বধ করেন, তা আমার পক্ষে শ্রেয়তর হবে' তার স্পষ্ট সমাধান করেননি। সুতরাং পরবর্তী শ্লোকে 'আত্মাকে বধকারী, বধ্য মনে করা অজ্ঞানতা'—এই কথা বলে তার সমাধান করছেন—

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ ১৯[১]

যিনি এই আত্মাকে হত্যাকারী মনে করেন কিংবা যিনি এঁকে নিহত বলে মনে করেন তাঁরা উভয়েই আত্মার স্বরূপ জানেন না ; কারণ আত্মা প্রকৃতপক্ষে কাহাকেও হত্যা করেন না এবং কাহারো দ্বারা হত হন না॥ ১৯

প্রশ্ন—আত্মা যদি না মরে এবং কাউকে না মারে, তাহলে মরে এবং মারে কে ?

উত্তর— স্থূল শরীর থেকে সূক্ষ্ম শরীরের বিয়োগ হওয়াকে '**মৃত্যু**' বলা হয়। অতএব স্থূল শরীরই মরে ;

[১]হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্। উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে।। (উ. কঠ. ১।২।১৯)

তাই প্রথমে **'অন্তবন্তঃ ইমে দেহাঃ'** বলা হয়েছে। তেমনই মন-বুদ্ধি-সহ যে স্থূল শরীরের ক্রিয়ার দ্বারা কোনো স্থূল দেহের প্রাণ বিয়োগ হয়, তাকে হত্যাকারী বলা হয়। সুতরাং হত্যাকারীও শরীর-(দেহ)-ই, আত্মা নয়। কিন্তু শরীরের ধর্মকে নিজের মধ্যে আরোপিত করে অজ্ঞ ব্যক্তিরা আত্মাকে হত্যাকারী (কর্তা) বলে মনে করে (৩।২৭), তাই তাঁদের এর ফল ভোগ করতে হয়।

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে বলা হয়েছে যে আত্মাকে কোনো কিছুর দ্বারা হত্যা করা যায় না। তাতে প্রশ্ন হতে পারে যে আত্মাকে কোনো কিছুর সাহায্যে হত্যা করা যায় না, তার কারণ কী ? তার উত্তরে ভগবান আত্মা সর্বপ্রকার বিকাররহিত জানিয়ে, তার স্বরূপ জানাচ্ছেন—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্ নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ২০

আত্মা কখনো জন্মান না এবং মরেনও না। আত্মার অস্তিত্ব উৎপত্তিসাপেক্ষ নয়, কারণ আত্মা জন্ম-রহিত, নিত্য, সনাতন এবং পুরাতন ; শরীর বিনষ্ট হলেও আত্মা বিনষ্ট হয় না॥ ২০

প্রশ্ন— **'ন জায়তে ম্রিয়তে'**—এই দুটি ক্রিয়াপদের ভাব কী ?

উত্তর—এতে ভগবান আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশরূপ আদি-অন্তের বিকাররহিত অবস্থার কথা জানিয়ে বস্তুত আত্মার উৎপত্তি ইত্যাদি ছটি বিকাররহিত অবস্থা প্রমাণ করেছেন। অতঃপর প্রতিটি বিকারের অভাব জ্ঞাপন হেতু পৃথক্ পৃথক্ শব্দের প্রয়োগ করেছেন।

প্রশ্ন—উৎপত্তি ইত্যাদি ছয় বিকার কী কী এবং এই শ্লোকে কোন্ কোন্ শব্দের সাহায্যে তার অভাব প্রমাণ করা হয়েছে?

উত্তর—১-উৎপত্তি (জন্ম), ২-অস্তিত্ব (উৎপন্ন হয়ে অস্তিত্বসম্পন্ন হওয়া), ৩-বৃদ্ধি (বেড়ে ওঠা), ৪-বিপরিণাম (রূপান্তর প্রাপ্ত হওয়া), ৫-অপক্ষয় (ক্ষয় হওয়া) এবং ৬-বিনাশ (মৃত্যু হওয়া) বিকার এই ছয় প্রকারের। এর মধ্যে আত্মাকে **'অজঃ'** (অজন্মা, জন্মরহিত) বলে তাতে 'উৎপত্তি' রূপ বিকার না থাকার কথা বলা হয়েছে। **'অয়ং ভূত্বা ভূয়ঃ ন ভবিতা'** অর্থাৎ এ জন্মগ্রহণ করে অস্তিত্ব গ্রহণ করে না, কারণ এ স্বভাবতঃই সৎ—এই বলে 'অস্তিত্ব'রূপ বিকারের, **'পুরাণঃ'** (চিরকালীন এবং সর্বদা একরূপে স্থায়ী) বলে 'বৃদ্ধি' রূপ বিকারের, **'শাশ্বতঃ'** (সর্বদা একরূপে অবস্থিত) বলে বিপরিণামের, **'নিত্যঃ'** (অখণ্ড অস্তিত্বসম্পন্ন) বলে **'ক্ষয়'**-এর এবং **'শরীরে হন্যমানে ন হন্যতে'** (দেহনাশে এর বিনাশ হয় না)—বলে 'বিনাশ'-এর অভাব দেখিয়েছেন।

সম্বন্ধ—ঊনিশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে আত্মা কাউকে বধ করে না অথবা কারো দ্বারা নিহত হয় না, সেই অনুসারে কুড়িতম শ্লোকে তাঁকে বিকাররহিত বলে এই কথা প্রমাণিত করেছেন যে তাঁকে কেন মারা যায় না। পরবর্তী শ্লোকে বলেছেন যে আত্মা কেন কাউকে মারে না—

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥ ২১

হে পার্থ ! যে ব্যক্তি এই আত্মাকে অবিনাশী, নিত্য, জন্মরহিত, অব্যয় বলে জানেন, তিনি কীভাবে কাহাকেও হত্যা করবেন বা করাবেন ? ২১

প্রশ্ন—এই শ্লোকে ভগবানের কথার উদ্দেশ্য কী ?

উত্তর—এখানে ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি আত্মস্বরূপকে যথার্থ বলে জেনে নেন, যিনি এই তত্ত্ব ভালোভাবে অনুভব করেন যে আত্মা অজ, অবিনাশী, অব্যয় ও নিত্য, অতএব তিনি (আত্মা) কী করে কারোকে হত্যা করবেন বা হত্যা করাবেন ? অর্থাৎ মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি-সহ স্থূল শরীরের দ্বারা অন্য শরীরের বিনাশে তিনি (আত্মা) কী করে মেনে নেবেন যে আমি কাউকে বধ করছি বা কাউকে দিয়ে বধ করাচ্ছি ? কারণ তিনি জানেন সর্বত্র একই আত্মতত্ত্ব বিরাজমান, যা মরেও না এবং মারাও যায় না। কাউকে সে মারেও না বা মারাতেও উদ্বুদ্ধ করে না ; সুতরাং এই মরা, মারা, হত্যা করানো সবই অজ্ঞতাবশতঃ আত্মাতে আরোপিত করা হয়, তা প্রকৃত সত্য নয়। সুতরাং কারো জন্যই শোক করা উচিত নয়।

সম্বন্ধ—এখানে এক আশঙ্কা হতে পারে যে আত্মা নিত্য এবং অবিনাশী। তার কখনও বিনাশ হতে পারে না, তাই তার জন্য শোক করা সাজে না। শরীর বিনাশশীল, তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং তার জন্যও শোক করা উচিত নয়—একথা সর্বৈব সত্য। কিন্তু আত্মার যে এক শরীর থেকে সম্পর্ক ত্যাগ করে অন্য শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক হয়, তাতে সে অত্যন্ত কষ্ট পায় ; তাহলে তার জন্য শোক করা অনুচিত কেন ? তাতে বলেছেন—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ ২২

মানুষ যেমন পুরানো বস্ত্র পরিত্যাগ করে অন্য নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে তেমনই জীবাত্মা জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে॥ ২২

প্রশ্ন—পুরানো বস্ত্র ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র ধারণ করলে মানুষ সুখী হয়, কিন্তু পুরানো দেহ পরিত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণে তো কষ্ট হয়। অতএব এই উদাহরণটি এখানে কীভাবে প্রযোজ্য হবে ?

উত্তর—পুরাতন দেহ পরিত্যাগ এবং নতুন দেহ গ্রহণে অজ্ঞ ব্যক্তিরাই দুঃখ পায়, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা নয়। মাতা যখন বালকের পুরানো নোংরা কাপড় বদল করেন, তখন বালকটি কাঁদতে থাকে ; কিন্তু মা তা গ্রাহ্য না করে তার ভালোর জন্য বস্ত্র-পরিবর্তন করে দেন। তেমনই ভগবানও জীবের হিতার্থে তার কান্না গ্রাহ্য না করে তার দেহ পরিবর্তন করে দেন। সুতরাং উদাহরণটি সঠিক হয়েছে।

প্রশ্ন—ভগবান এইস্থানে দেহের সঙ্গে 'জীর্ণানি' পদটি প্রয়োগ করলেও এমন কোনো নিয়ম নেই যে বৃদ্ধ হলেই (শরীর পুরানো হলে) মানুষ মারা যাবে। নবীন যুবক বা শিশুদেরও মরতে দেখা যায়। সুতরাং মনে হয় এই উদাহরণ যথাযথ নয়।

উত্তর—এখানে 'জীর্ণানি' শব্দটির দ্বারা আশি বা শত বৎসর আয়ুর কথা বলা হয়নি। প্রারব্ধবশতঃ যুবক বা বালক, যে যে অবস্থায় মৃত্যুমুখে পড়ে, সেটিই তার আয়ু বলে বুঝতে হবে। সেই আয়ু শেষের নামই হল জীর্ণাবস্থা। সুতরাং এই উদাহরণ সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত।

প্রশ্ন—'বাসাংসি' এবং 'শরীরাণি' দুটি পদই বহুবচনান্ত। মানুষ একসঙ্গেই তিন-চারটি পুরানো বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র ধারণ করতে পারে, কিন্তু দেহী অর্থাৎ জীবাত্মা একটি মাত্র দেহ পরিত্যাগ করে একটিই দেহ ধারণ করে। একসঙ্গে অনেক শরীর ত্যাগ বা গ্রহণ যুক্তিসিদ্ধ নয়। তাই এখানে শরীরের জন্য বহুবচন প্রয়োগ করা অনুচিত বলে মনে হয়।

উত্তর—(ক) জীবাত্মা এখন পর্যন্ত কত শরীর ত্যাগ করেছে এবং কত শরীর নতুন ভাবে ধারণ করেছে এবং ভবিষ্যতেও যতক্ষণ পর্যন্ত তার তত্ত্বজ্ঞান না হয় এই জীবাত্মাকে কত অসংখ্য পুরানো শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করতে হবে, তার ঠিক নেই। সেইজন্যই

এখানে বহুবচন প্রয়োগ করা হয়েছে।

(খ) স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ ভেদে শরীর তিন প্রকার। জীবাত্মা যখন একটি দেহ ছেড়ে অপর দেহে আশ্রয় নেয় তখন এই তিনটি শরীরই বদল হয়। মানুষ যেমন কর্ম করে সেই অনুসারে তার স্বভাব (প্রকৃতি) পরিবর্তিত হয়। সত্ত্বঃ, রজঃ, তম— এই তিন গুণময় ব্যষ্টি প্রকৃতিই হল কারণ শরির, একেই স্বভাব বলা হয়। প্রাথশঃ স্বভাব অনুসারেই অন্তকালে সঙ্কল্প হয় এবং সঙ্কল্প অনুসারেই সূক্ষ্মশরীর তৈরি হয়। কারণ ও সূক্ষ্মশরীরের সঙ্গেই জীবাত্মা এক শরীর থেকে নির্গত হয়ে সূক্ষ্মের অনুরূপ স্থূলশরীর লাভ করে। তাই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণভেদে তিন শরীরের পরিবর্তন হওয়ার জন্য বহুবচনের প্রয়োগ যুক্তিসংগত হয়েছে।

প্রশ্ন—আত্মা অচল, তার যাতায়াত নেই ; তাহলে দেহীর অন্য শরীরে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে কেন ?

উত্তর—প্রকৃতপক্ষে আত্মা অচল এবং অক্রিয় হওয়ায়, কোনো অবস্থাতেই তার গমনাগমন নেই ; কিন্তু একটি কলসীকে যেমন একটি গৃহ থেকে অন্য গৃহে নিয়ে যাওয়ার সময় তার ভিতরের আকাশও কলসীর সঙ্গে গমনাগমন করছে বলে মনে হয়, তেমনই সূক্ষ্মশরীর গমনাগমন করায় তার সম্বন্ধের দ্বারা আত্মারও গমনাগমন প্রতীত হয়। তাই সাধারণ লোকেদের বোঝাবার জন্য আত্মার গমনাগমনের ঔপচারিক কল্পনা করা হয়। এখানে **'দেহী'** শব্দটি দেহাভিমানী চেতনের বাচক। তাই দেহের সম্বন্ধে তাতে গমনাগমন হয় বলে মনে হয়। তাইজন্যই দেহীর অন্য শরীরে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন— বস্ত্রাদির জন্য **'গৃহ্লাতি'** এবং শরীরের জন্য **'সংযাতি'** কথাটি বলা হয়েছে। একই ক্রিয়ায় বিষয়টি বর্ণনা করা যেত, দুপ্রকার ভাব প্রয়োগ করা হয়েছে কেন ?

উত্তর— **'গৃহ্লাতি'**র প্রধান অর্থ হল 'গ্রহণ করা' এবং **'সংযাতি'**র প্রধান অর্থ হল 'গমন করা'। বস্ত্র গ্রহণ করা হয়, তাই এখানে **'গৃহ্লাতি'** ক্রিয়া প্রযুক্ত হয়েছে। আর একটি শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীরে যাওয়া প্রতীত হয়, তাই 'সংযাতি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্ন—**'নরঃ'** এবং **'দেহী'** —এই দুটি পদ কেন প্রয়োগ করা হয়েছে ? একটির দ্বারাও বিষয়টি বর্ণনা করা যেত ?

উত্তর—**'নরঃ'** পদ মনুষ্য মাত্রের বাচক এবং **'দেহী'** পদটি সমস্ত জীব সমুদয়ের বাচক। তাই দুটিই সার্থক ; কারণ বস্ত্র গ্রহণ বা ত্যাগ মানুষেই করে, অন্য জীব নয়। কিন্তু এক দেহ থেকে অন্য দেহে যাতায়াত সকল দেহাভিমানী জীবেরই হয়ে থাকে, তাই বস্ত্রাদির সঙ্গে **'নরঃ'** এবং শরীরের সঙ্গে **'দেহী'** প্রয়োগ করা হয়েছে।

সম্বন্ধ—এইভাবে এক দেহ থেকে অন্য দেহ লাভে শোক করা অনুচিত জানিয়ে ভগবান এবার আত্মার স্বরূপ দুর্বিজ্ঞেয় হওয়ার কারণে পুনরায় তিনটি শ্লোক দ্বারা প্রকারান্তরে তার নিত্যতা, নিরাকারতা এবং নির্বিকারতা প্রতিপাদন করে তার বিনাশের আশঙ্কায় শোক করা উচিত নয় প্রমাণ করেছেন।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ ২৩

শস্ত্র এই আত্মাকে কাটতে পারে না, অগ্নি এঁকে দগ্ধ করতে পারে না, জল এঁকে সিক্ত করতে পারে না এবং বায়ু এঁকে শুষ্ক করতে পারে না॥ ২৩

প্রশ্ন—এই শ্লোকের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—অর্জুন অস্ত্র-শস্ত্রের সাহায্যে তাঁর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বিনাশের আশঙ্কায় শোকাকুল হয়েছিলেন ; তাঁর শোক দূর করার জন্য ভগবান এই শ্লোকে পৃথিবী ইত্যাদি চার ভূতাদি আত্মাকে বিনাশ করতে অসমর্থ জানিয়ে নির্বিকার আত্মার নিত্যত্ব ও নির্বিকারত্ব প্রমাণ করেছেন। অর্থ হল যে, অস্ত্র দ্বারা শরীর নষ্ট হলেও আত্মা বিনষ্ট হয় না, আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা দেহ দগ্ধ হলেও

আত্মা দগ্ধ হয় না, বরুণাস্ত্র দ্বারা শরীর সিক্ত হলেও, আত্মা সিক্ত হয় না এবং বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা দেহ শুষ্ক হলেও আত্মা শুষ্ক হয় না। শরীর অনিত্য এবং সাকার বস্তু, আত্মা নিত্য ও নিরাকার ; অতএব পৃথিবীতত্ত্ব দ্বারা প্রস্তুত কোনো অস্ত্র-শস্ত্র বা বায়ু, অগ্নি, জলের সাহায্যে এর বিনাশ সম্ভব নয়।

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥ ২৪

কারণ আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য এবং নিত্য, সর্বব্যাপী, অচল, স্থির ও সনাতন॥ ২৪

প্রশ্ন—পূর্বশ্লোকে বলা হয়েছে যে অস্ত্রাদির সাহায্যে আত্মাকে বিনাশ করা যায় না ; তাহলে এই শ্লোকে দ্বিতীয়বার তাকে অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য বলার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান অস্ত্রাদির দ্বারা আত্মতত্ত্বের বিনাশ না হওয়ার কারণ দেখিয়েছেন। অর্থাৎ এই আত্মা কেটে ফেলা, জ্বালিয়ে দেওয়া, ভিজিয়ে দেওয়া বা শুকিয়ে ফেলার মতো বস্তু নয়। আত্মা অখণ্ড, অব্যক্ত, একরস এবং নির্বিকার ; তাই কোনো অস্ত্রই একে বিনাশ করতে সক্ষম নয়।

প্রশ্ন—অচ্ছেদ্য ইত্যাদি শব্দের দ্বারা আত্মার নিত্যত্ব প্রমাণিত করে আবার তাকে নিত্য, সর্বগত এবং সনাতন বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—অচ্ছেদ্য ইত্যাদি শব্দের সাহায্যে যেমন অবিনাশিত্ব প্রমাণিত হয়, তা আকাশেও সিদ্ধ হতে পারে ; কারণ অন্য সব ভূতাদির কারণ এবং সেই সবে পরিব্যাপ্ত হওয়ায় একে পৃথিবী-তত্ত্ব দ্বারা সৃষ্ট অস্ত্রদ্বারা কাটা যায় না, অগ্নির দ্বারা দহন করা যায় না, জল দিয়ে সিক্ত করা যায় না এবং বায়ু দ্বারা শুষ্ক করা যায় না। আত্মার অবিনাশিত্ব তার থেকে অত্যন্ত বিশিষ্ট—এই কথা প্রমাণ করার জন্য একে নিত্য, সর্বগত ও সনাতন বলা হয়েছে। অভিপ্রায় হল এই যে আকাশ নিত্য নয় ; কারণ মহাপ্রলয়ের সময় তার বিনাশ ঘটে, কিন্তু আত্মার কোনো বিনাশ নেই, তাই এটি নিত্য। আকাশ সর্বব্যাপী নয়, শুধু মাত্র নিজ কার্যে ব্যাপ্ত আর আত্মা সর্বব্যাপী। আকাশ সনাতন, সর্বদা বিরাজমান, অনাদি নয়—আত্মা সনাতন, অনাদি। এইরূপ উপরিউক্ত শব্দ দ্বারা আকাশের তুলনায় আত্মার বিশিষ্টতা দেখানো হয়েছে।

প্রশ্ন—আত্মাকে **'স্থাণু'** ও **'অচল'** বলার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা আত্মার নড়াচড়া করার ক্রিয়ার অভাব দেখিয়েছেন। একই স্থানে অবস্থান করে কাঁপতে থাকা 'নড়া' এবং একস্থান থেকে অপরস্থানে যাওয়াকে 'চলা' বলে। এই দুটি ক্রিয়ারই আত্মায় অভাব আছে। সেটি নড়েও না, চলেও না ; কারণ আত্মা সর্বব্যাপী, কোনো স্থানই তার থেকে খালি নয়।

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি॥ ২৫

এই আত্মাকে অব্যক্ত, অচিন্ত্য এবং বিকাররহিত বলা হয়। তাই হে অর্জুন ! উপরিউক্ত রূপে জেনে তোমার এই আত্মার জন্য শোক করা উচিত নয়॥ ২৫

প্রশ্ন—আত্মাকে 'অব্যক্ত' ও 'অচিন্ত্য' বলার অর্থ কী ?

উত্তর—আত্মাকে কোনো ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানা যায় না, তাই তাঁকে 'অব্যক্ত' বলা হয় এবং তিনি মনেরও বিষয় নন, তাই তাঁকে 'অচিন্ত্য' বলা হয়।

প্রশ্ন—আত্মাকে 'অবিকার্য' বলার তাৎপর্য কী ?

উত্তর—আত্মাকে 'অবিকার্য' বলে অব্যক্ত প্রকৃতি

থেকে এর বিশিষ্টতা প্রতিপাদন করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ প্রকৃতির কার্য, সেগুলি তাঁর কারণরূপা প্রকৃতিকে জানতে পারে না, তাই প্রকৃতিও অব্যক্ত এবং অচিন্ত্য ; কিন্তু তা নির্বিকার নয়, তাতে বিকার হয়। কিন্তু আত্মাতে কখনো কোনো অবস্থাতেই বিকার হয় না। সুতরাং প্রকৃতি থেকে আত্মা অতি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

প্রশ্ন—উপরিউক্ত প্রকারে এই আত্মাকে জেনে তোমার শোক করা উচিত নয়, এই কথাটির কী অভিপ্রায় ?

উত্তর— এর দ্বারা এই ভাব দেখানো হয়েছে যে আত্মাকে উপরিউক্ত প্রকারে নিত্য, সর্বগত, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও নির্বিকার জেনে নেওয়ার পর তার জন্য শোক করা সাজে না।

সম্বন্ধ— উপরিউক্ত শ্লোকে ভগবান আত্মাকে অজ ও অবিনাশী জানিয়ে তার জন্য শোক করা যে অনুচিত তা প্রমাণ করেছেন ; এবার পরবর্তী দুটি শ্লোকে আত্মাকে তর্কসাপেক্ষে জন্ম-মৃত্যুসম্পন্ন মেনে নিলেও তার জন্য শোক করা উচিত নয়, তা প্রমাণ করেছেন—

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈবং শোচিতুমর্হসি॥ ২৬

কিন্তু তুমি যদি এই আত্মাকে সর্বদা জন্মশীল ও সর্বদা মরণশীল বলে মনে কর, তাহলেও হে মহাবাহো ! তোমার এরূপ শোকগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়॥ ২৬

প্রশ্ন—'**অথ**' ও '**চ**' দুটি অব্যয় এখানে কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ? তার সঙ্গে যদি তুমি এদের সর্বদা জন্মশীল ও সর্বদা মরণশীল মনে কর, তবুও তোমার শোকগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়— এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—'**অথ**' এবং '**চ**' দুটি অব্যয় এখানে তর্কসাপেক্ষে স্বীকৃতির বাচক। এর সঙ্গে উপরিউক্ত বাক্য দ্বারা ভগবান বলতে চেয়েছেন যে যদিও আত্মা প্রকৃতপক্ষে জন্ম ও মরণশীল নয়—এটিই সত্য, তা সত্ত্বেও তুমি যদি আত্মাকে সর্বদা জন্মশীল অর্থাৎ প্রতিটি শরীরের সংযোগে প্রবাহরূপে জন্মশীল বলে মনে কর, তাহলেও তার জন্য তোমার এভাবে (যার বর্ণনা প্রথম অধ্যায়ের আঠাশ থেকে সাতচল্লিশতম শ্লোক পর্যন্ত করা হয়েছে) শোক করা উচিত নয়।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ২৭

কারণ এরূপ মনে করলেও যে জন্মায় তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এবং মৃতেরও জন্ম সুনিশ্চিত। অতএব এই অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে তোমার শোক করা উচিত নয়॥ ২৭

প্রশ্ন—'**হি**' বলার অর্থ কী ?

উত্তর—কারণ জানাতে '**হি**' ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্ব শ্লোকে শোক করা অনুচিত বলেছেন, তারই সমর্থনে এই শ্লোকটি উল্লিখিত হয়েছে।

প্রশ্ন—যে জন্মেছে, তার মৃত্যু নিশ্চিত—একথা ঠিক ; কারণ জন্ম নেওয়া প্রাণী চিরকাল জীবিত থাকে না, একথা সবাই জানে। কিন্তু একথা কী করে বললেন যে, যার মৃত্যু হয়েছে, তার জন্ম সুনিশ্চিত ? কারণ যে মুক্ত হয়ে যায়, তার পুনর্জন্ম হয় না—একথা প্রসিদ্ধ (৪।৯ ; ৫।১৭, ৮।১৫, ১৬, ২১ ইত্যাদি)।

উত্তর—ভগবান এখানে বাস্তবিক সিদ্ধান্তের কথা বলেননি, এক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য সেই অজ্ঞদের জন্য, যারা

আত্মার জন্ম-মৃত্যু নিত্য বলে মেনে নেয়। তাদের মত অনুসারে যারা মরণশীল, তাদের জন্মগ্রহণ করা নিশ্চিত ; কারণ সেই মত অনুসারে কারো মুক্তি হতে পারে না। যে বাস্তবিক সিদ্ধান্তে মুক্তি মানা হয়, তাতে আত্মাকে জন্ম-মৃত্যুশীল বলে মানা হয় না। জন্ম-মৃত্যু মেনে নেওয়া সবই অজ্ঞতাজনিত।

প্রশ্ন—'তস্মাৎ' পদটির অর্থ কী ? এবং **'অপরিহার্যে অর্থে'** এর কী তাৎপর্য ? এবং তার জন্য শোক করা অনুচিত কেন ?

উত্তর—'তস্মাৎ' পদটি হেতুর বাচক। এটি প্রয়োগ করে **'অপরিহার্যে অর্থে'** দ্বারা দেখিয়েছেন যে উপরিউক্ত ধারণা অনুযায়ী জন্ম ও মৃত্যু ধ্রুব সত্য হওয়ায় তাতে বিপরীত কিছু হওয়া অসম্ভব। এরূপ অবস্থায় নিরূপায় বিষয় নিয়ে শোক করা সাজে না। সুতরাং এই দৃষ্টিতেও তোমার শোক করা সর্বতোভাবে অনুচিত।

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকগুলির দ্বারা যারা আত্মাকে নিত্য, অজ, অবিনাশী মেনে নেয় এবং যারা তাঁকে সর্বদা জন্ম-মৃত্যুশীল বলে মনে করে, তাদের উভয়ের মতেই আত্মার জন্য শোক করা উচিত নয়—একথা প্রমাণ করা হয়েছে। এখন পরবর্তী শ্লোকে প্রমাণিত করেছেন যে প্রাণীদের শরীরের দৃষ্টিতেও শোক করা সাজে না।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥ ২৮

হে ভারত ! সমস্ত প্রাণী জন্মের পূর্বে অপ্রকট ছিল, মৃত্যুর পরেও তারা অপ্রকট হয়ে যায় ; শুধু মধ্যবর্তী সময়েই তারা প্রকটিত থাকে। এই পরিস্থিতিতে শোক বা বিলাপ কীসের জন্য ? ২৮

প্রশ্ন—'ভূতানি' পদটি এখানে কীসের বাচক ? তার সঙ্গে **'অব্যক্তাদীনি'**, **'অব্যক্তনিধনানি'** এবং **'ব্যক্তমধ্যানি'**—এই বিশেষণ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে **'ভূতানি'** পদটি সকলপ্রাণীর বাচক। তার সঙ্গে **'অব্যক্তাদীনি'** বিশেষণ যোগ করে বলা হয়েছে যে আদিতে অর্থাৎ জন্মের আগে এই বর্তমান স্থূল শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল না ; **'অব্যক্তনিধনানি'** দ্বারা এই ভাব দেখানো হয়েছে যে অন্তকালে অর্থাৎ মৃত্যুর পরও স্থূলদেহের সঙ্গে এর সম্বন্ধ থাকে না এবং **'ব্যক্তমধ্যানি'** দ্বারা এই ভাব প্রকট করা হয়েছে যে শুধুমাত্র জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্তই এটি ব্যক্ত থাকে অর্থাৎ শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে।

প্রশ্ন—এই অবস্থায় শোক করা কেন, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, যেমন স্বপ্নের সৃষ্টি স্বপ্নকালের আগে বা পরে থাকে না, কেবল স্বপ্ন দেখা কালেই থাকে, মানুষের তার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে হয়, তেমনই যে শরীরের সঙ্গে কেবল শরীর থাকাকালীনই শুধুমাত্র সম্পর্ক মনে হয়, তা নিত্য সম্পর্ক নয়, তার জন্য কীসের শোক ? মহাভারতের স্ত্রী-পর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিদুরও বলেছেন—

অদর্শনাদাপতিতাঃ পুনশ্চাদর্শনং গতাঃ।
নৈতে তব ন তেষাং ত্বং তত্র কা পরিদেবনা॥

অর্থাৎ যাকে তুমি নিজের বলে মনে করছ, তারা অব্যক্ত থেকে এসেছে, অর্থাৎ জন্মের আগে অপ্রকট ছিল এবং পুনরায় অব্যক্তে মিশে যাবে। সুতরাং এঁরা বাস্তবে তোমার নয়, তুমিও এঁদের নয়। তাহলে আর এ বিষয়ে শোক কীসের ?

সম্বন্ধ—আত্মতত্ত্ব অত্যন্ত দুর্বোধ্য হওয়ায় তাকে বোঝাবার জন্য ভগবান উপরিউক্ত শ্লোক দ্বারা বিভিন্ন ভাবে তার স্বরূপ বর্ণনা করেছেন ; পরবর্তী শ্লোকে সেই আত্মতত্ত্বের দর্শন, বর্ণন ও শ্রবণের অলৌকিকতা ও দুর্লভতা নির্ধারণ করছেন—

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥ ২৯[১]

কোনো মহাপুরুষ এই আত্মাকে আশ্চর্যবৎ দেখেন, অন্য কেউ এঁকে আশ্চর্যবৎ বলে বর্ণনা করেন এবং অন্য কেউ আত্মাকে আশ্চর্যান্বিত হয়ে শ্রবণ করেন। আবার কোনো কোনো মহাপুরুষ শুনেও এঁর সম্বন্ধে জানেন না, কারণ আত্মা দুর্বিজ্ঞেয়॥ ২৯

প্রশ্ন—'কোনো একজনই তাঁকে আশ্চর্যবৎ দেখেন'—এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান বলতে চেয়েছেন যে আত্মা আশ্চর্যময়, তাই তাঁকে দর্শনকারী সংসারে বিরল এবং তিনি তাঁকে আশ্চর্যবৎই দেখেন। মানুষ যেমন লৌকিক দৃশ্যাদি মন-বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে বুদ্ধিদ্বারা ইদং অর্থাৎ নিজের থেকে আলাদা দেখে, আত্মদর্শন তেমন নয়। আত্মাকে দেখা অদ্ভুত এবং অলৌকিক। যখন একমাত্র চেতন আত্মা ব্যতীত আর কোনো অস্তিত্ব থাকে না, সেই সময় আত্মা স্বয়ংই স্বয়ংকে দেখে। সেই দর্শনে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনের ত্রিপুটী থাকে না, তাইজন্য সেই দর্শন আশ্চর্যবৎ।

প্রশ্ন—'তেমনই কেউ কেউ একে আশ্চর্যের মতো বলে বর্ণনা করেন।' এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথার দ্বারা ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, সকল ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ অন্যকে বোঝাবার জন্য স্বরূপের বর্ণনা করতে সক্ষম হন না। যেসব মহাপুরুষ পরমাত্মতত্ত্ব উত্তমরূপে জানেন এবং বেদ-শাস্ত্রের জ্ঞাতা হন, তাঁরাই আত্মার বর্ণনা করতে সক্ষম, তাঁদের বর্ণনাও আশ্চর্যবৎ হয়। অর্থাৎ কোনো বস্তুকে বোঝাতে গেলে যেমন লৌকিক বস্তুর স্বরূপ বর্ণনা করা হয়, সেভাবে আত্মার বর্ণনা করা সম্ভব নয়, তার বর্ণনা অলৌকিক ও অদ্ভুত হয়ে থাকে।

যত উদাহরণের সাহায্যে আত্মতত্ত্ব বোঝানো হয়ে থাকে, তার মধ্যে কোনোটিই পূর্ণভাবে আত্মতত্ত্ব বোঝাতে সক্ষম হয় না। তার কোনো এক অংশই মাত্র বোঝানো যেতে পারে ; কারণ আত্মার সদৃশ কোনো বস্তুই নেই। সেই অবস্থায় কীভাবে অন্য উদাহরণ প্রযোজ্য হবে ? তবুও মহাপুরুষগণ বিধিমুখ, নিষেধমুখ ইত্যাদি বহু আশ্চর্যপূর্ণ সংকেতের সাহায্যে সেটি বোঝাতে সচেষ্ট হন, সেটিই হল আশ্চর্যবৎ বর্ণনা। প্রকৃতপক্ষে আত্মা বাক্যের বিষয় না হওয়ায় বাক্যদ্বারা তার বর্ণনা সম্ভবপর নয়।

প্রশ্ন—'অপরে তাকে আশ্চর্যবৎ শ্রবণ করে'—এই কথাটির কী তাৎপর্য ?

উত্তর—এই কথার দ্বারা ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, এই আত্মার বর্ণনা শ্রবণকারী সদাচারী, শুদ্ধচিত্ত, শ্রদ্ধাযুক্ত, আস্তিক ব্যক্তিও বিরল। তাই তা শ্রবণ করাও আশ্চর্যবৎ হয়। অর্থাৎ যেসব পদার্থকে সে প্রথমে সত্য, সুখরূপ ও রমণীয় বলে মনে করত তথা যে শরীরাদিকে সে নিজের স্বরূপ মনে করত সেই সবগুলিকে অনিত্য, বিনাশশীল, দুঃখপূর্ণ এবং জড় ও আত্মাকে তার থেকে সর্বতোভাবে বিশিষ্ট শুনে সে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়। কারণ সাধারণ মানুষ এই তত্ত্ব কখনও শোনেনি বা বোঝেনি। কোনো লৌকিক বস্তুর সঙ্গেও তার মিল নেই। সেইজন্যই সে এটিকে ভীষণই অদ্ভুত বলে মনে করে, সে এই তত্ত্বের কথা তন্ময়ভাবে শোনে এবং শুনে যেন মুগ্ধ হয়ে যায়। তখন তার চিত্ত আর কোনোদিকে যায় না—একেই বলা হয় আশ্চর্যবৎ শোনা।

প্রশ্ন—'কেউ কেউ শুনেও একে জানতে পারে না'

[১]এই শ্লোকটির মতো একই রকম মন্ত্র কঠোপনিষদেও আছে, সেটি হল—

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধাঽঽশ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥ (১।২।৭)

'যা (আত্মতত্ত্ব) অনেকের শোনার জন্য পাওয়া যায় না এবং অনেক শোনার ব্যক্তিও যাকে জানতে পারে না। কোনো আশ্চর্যময় পুরুষই সেই আত্মাকে বর্ণনা করতে পারেন। কোনো এক নিপুণ পুরুষই তাকে প্রাপ্ত করতে পারেন এবং কোনো কুশল আচার্য দ্বারা উপদেশ প্রাপ্ত কোনো আশ্চর্যময় পুরুষই তার জ্ঞাতা হতে পারেন।'

—এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—ভগবান এর দ্বারা বলেছেন যে, যার অন্তরে পূর্ণ শ্রদ্ধা ও আস্তিকভাব নেই, যার বুদ্ধি শুদ্ধ ও সূক্ষ্ম নয়—সেরূপ মানুষ এই আত্মতত্ত্ব শুনেও সংশয় ও বিপরীত চিন্তাবশতঃ এর স্বরূপ যথার্থরূপে বুঝতে সক্ষম হয় না ; সুতরাং অনধিকারীর পক্ষে এই আত্মতত্ত্ব বোঝা অত্যন্ত দুর্লভ।

প্রশ্ন—'আশ্চর্যবৎ'—পদটি এখানে আত্মার বিশেষণ, না কি তাকে দর্শনকারীর, বর্ণনাকারীর এবং শ্রবণকারীর অথবা দেখা, বর্ণনা করা এবং শ্রবণ করা —এই সব ক্রিয়ার ?

উত্তর—'আশ্চর্যবৎ' পদটি এখানে দেখা, শোনা ইত্যাদি ক্রিয়ার বিশেষণ। ক্রিয়া বিশেষণ হওয়ায় এর ভাব স্বতঃই কর্তা ও কর্মের ওপর প্রযুক্ত হয়।

সম্বন্ধ—এই ভাবে আত্মতত্ত্বের দর্শন, বর্ণন ও শ্রবণের অলৌকিকত্ব ও দুর্লভতা প্রতিপাদন করে এখন, 'আত্মা নিত্যই অবধ্য ; সুতরাং কোনো প্রাণীর জন্য শোক করা উচিত নয়'—এই কথা বলে ভগবান সাংখ্যযোগের প্রকরণের উপসংহার করছেন—

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।। ৩০

হে অর্জুন ! আত্মা সকলের দেহে সর্বদাই অবধ্য। এইজন্য কোনো প্রাণীর জন্যই তোমার শোক করা উচিত নয়।। ৩০

প্রশ্ন—'আত্মা সকলের দেহে সর্বদাই অবধ্য', বাক্যটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এই বাক্যটিতে ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে সমস্ত প্রাণীর যত শরীর আছে, সেসব শরীরে এক আত্মা বিরাজমান। অজ্ঞতাবশতঃ শরীরের ভেদে আত্মাতে ভেদ প্রতীয়মান হয়। প্রকৃতপক্ষে কোনো ভেদ নেই। এই আত্মা সদাই অবধ্য, একে কোনো ভাবেই বিনাশ করা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন—'এই জন্য সকল প্রাণীর অর্থাৎ কোনো প্রাণীর জন্যই তুমি শোক করার যোগ্য নও'—এই বাক্যটির অর্থ কী ?

উত্তর—এই বাক্যে হেতুবাচক 'তস্মাৎ' পদ প্রয়োগ করে ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, এই প্রকরণের মাধ্যমে এ কথা ভালোভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে আত্মা সদাসর্বদা অবিনাশী, কেউ তার বিনাশ করতে সক্ষম নয়। সুতরাং তোমার কোনো প্রাণীর জন্যই শোক করা উচিত নয় ; কারণ যখন তাদের নাশ কোনো কালেই কোনো ভাবেই হওয়া সম্ভব নয় তখন তাদের জন্য শোক করার অবকাশ কোথায় ? সুতরাং তোমার কারো বিনাশের আশঙ্কায় বিষাদগ্রস্ত না হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত।

সম্বন্ধ—এই পর্যন্ত ভগবান সাংখ্যযোগ অনুসারে নানা যুক্তিসহকারে নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, সম, নির্বিকার এবং অকর্তা আত্মার একত্ব, নিত্যত্ব, অবিনাশিত্ব ইত্যাদির প্রতিপাদন করে, শরীরকে বিনাশশীল জানিয়ে আত্মা বা শরীরের জন্য অথবা শরীর এবং আত্মার বিয়োগের জন্য শোক করা উচিত নয় বলে জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে প্রসঙ্গবশতঃ আত্মাকে জন্ম-মরণশীল মনে করলেও শোক করা অনুচিত বলে তিনি অর্জুনকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এবার সাতটি শ্লোকের সাহায্যে ক্ষাত্রধর্ম অনুসারে শোক করা অনুচিত প্রমাণ করে অর্জুনকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করেছেন—

স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে।। ৩১

এবং নিজ ধর্মের দৃষ্টিতেও তোমার ভীত হওয়া উচিত নয়, কারণ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মযুদ্ধের থেকে বড় আর কোনো কল্যাণকর কর্তব্য নেই।। ৩১

প্রশ্ন—'অপি' পদ ব্যবহারের তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এখানে **'অপি'** পদ প্রয়োগ করে ভগবান এই ভাব প্রকাশ করেছেন যে আত্মাকে নিত্য এবং শরীরকে অনিত্য বুঝে নেওয়ার পর শোক করা বা যুদ্ধতে ভীত হওয়া উচিত নয়, আমি তো একথা তোমায় বুঝিয়ে দিয়েছি ; এছাড়াও যদি তুমি তোমার বর্ণ ধর্মের দিকে নজর দাও, তাহলেও তোমার ভীত হওয়া উচিত নয়। কারণ যুদ্ধে বিমুখ না হওয়া ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক ধর্ম (১৮।৪৩)।

প্রশ্ন—'হি' শব্দটির অর্থ কী ?

উত্তর—'হি' পদটি এখানে হেতুবাচক। এর অভিপ্রায় হল, ভীত কেন হওয়া উচিত নয়, সেটি উত্তরার্ধে স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে।

প্রশ্ন—'ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মযুদ্ধের থেকে বড় আর কোনো কিছু শ্রেয় নয়' এই বাক্যটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এই বাক্যের দ্বারা ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, যে যুদ্ধ লোভ বা অনীতিবশতঃ আরম্ভ করা হচ্ছে না এবং যাতে অন্যায় আচরণও করা হচ্ছে না, যা ধর্মসঙ্গত, কর্তব্যরূপে প্রাপ্ত এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে করা হচ্ছে, এরূপ যুদ্ধই ক্ষত্রিয়দের জন্য অন্য সব ধর্মের থেকে অধিক কল্যাণকারক। ক্ষত্রিয়ের কাছে এর থেকে শ্রেয় অন্য কোনো কল্যাণপ্রদ ধর্ম নেই। কারণ ধর্মযুদ্ধকারী ক্ষত্রিয় অনায়াসে ইচ্ছানুযায়ী স্বর্গ বা মোক্ষলাভ করতে সক্ষম।

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥ ৩২

হে পার্থ ! স্বতঃ-প্রাপ্ত, উন্মুক্ত স্বর্গদ্বার সদৃশ এইরূপ ধর্মযুদ্ধ ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়রাই লাভ করে থাকেন॥ ৩২

প্রশ্ন—'পার্থ' সম্বোধনের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে অর্জুনকে **'পার্থ'** নামে সম্বোধিত করে ভগবান হস্তিনাপুর থেকে আসার সময় মাতা কুন্তি যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন তার স্মৃতি জাগরূক করছেন।

সেই সময় কুন্তী ভগবানকে বলেছিলেন—

এতদ্ধনঞ্জয়ো বাচ্যো নিত্যোদ্যুক্তো বৃকোদরঃ।
যদর্থং ক্ষত্রিয়া সূতে তস্য কালোঽয়মাগতঃ॥

(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ১৩৭।৯-১০)

অর্থাৎ 'ধনঞ্জয় অর্জুনকে এবং সর্বদা যুদ্ধে উদ্যত ভীমকে তুমি এই কথা বোল যে, যে কার্যের জন্য ক্ষত্রিয়-মাতা পুত্রের জন্ম দেয়, এখন তার সময় হয়েছে।'

প্রশ্ন—এখানে **'যুদ্ধম্'**-এর সঙ্গে **'যদৃচ্ছয়োপপন্নম্'** বিশেষণ প্রয়োগ করে **'অপাবৃতম্'**, **'স্বর্গদ্বারম্'** বলার অর্থ কী ?

উত্তর — 'যদৃচ্ছয়োপপন্নম্' বিশেষণের দ্বারা এই ভাব দেখিয়েছেন যে তুমি জেনেশুনে এই যুদ্ধ শুরু করোনি। তোমরা তো সন্ধি করার অনেক চেষ্টা করেছিলে। কিন্তু কোনো ভাবেই তোমাদের গচ্ছিত রাজ্য দুর্যোধন বিনা যুদ্ধে ফেরৎ দিতে যখন রাজী হল না—সে স্পষ্টভাবে বলেছিল যে সুঁচের ডগায় যে জমি থাকে —সেটুকু জমিও সে পাণ্ডবদের ফেরৎ দেবে না[১] (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ১২৭।২৫), তখন তোমাদের বাধ্য হয়ে যুদ্ধের আয়োজন করতে হয় ; তাই এই যুদ্ধ তোমাদের কাছে **'যদৃচ্ছয়োপপন্নম্'** অর্থাৎ বিনা ইচ্ছায় স্বতঃই প্রাপ্ত। **'অপাবৃতম্'**, **'স্বর্গদ্বারম্'** বিশেষণ দিয়ে জানিয়েছেন যে এটি উন্মুক্ত স্বর্গদ্বার, এরূপ ধর্মযুদ্ধে মৃত ব্যক্তি সোজা স্বর্গে গমন করে, তার পথে কেউ কোনো বাধার সৃষ্টি করতে পারে না।

প্রশ্ন— 'এই প্রকার যুদ্ধ ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়রাই লাভ

[১]যাবদ্ধি তীক্ষ্ণয়া সূচ্যা বিধ্যেদগ্রেণ কেশব। তাবদপ্যপরিত্যাজ্যং ভূমের্নঃ পাণ্ডবান্ প্রতি॥

করে' এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এই বাক্য দ্বারা ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে, এরূপ ধর্মযুদ্ধ, যা স্বতঃই কর্তব্যরূপে প্রাপ্ত এবং উন্মুক্ত স্বর্গদ্বারস্বরূপ—সব ক্ষত্রিয় এরূপ সুযোগ পায় না। কোনো ভাগ্যশালী ক্ষত্রিয়ই এরূপ সুযোগ পায়। অতএব তোমার অত্যন্ত সৌভাগ্য যে তুমি এরূপ ধর্মময় যুদ্ধ অনায়াসে লাভ করেছ। এখন তোমার এর থেকে সরে দাঁড়ানো উচিত নয়।

সম্বন্ধ—এইরূপ ধর্মময় যুদ্ধ প্রাপ্ত হয়ে তাতে কী লাভ হয় দেখিয়ে এবার সেই যুদ্ধ না করলে কী ক্ষতি তা দেখিয়ে ভগবান অর্জুনকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করছেন—

অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্মং কীর্তিং চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি।। ৩৩

কিন্তু যদি তুমি এই ধর্মযুদ্ধ না করো তাহলে স্বধর্ম ও কীর্তি থেকে চ্যুত হয়ে পাপভাগী হবে।। ৩৩

প্রশ্ন—'**অথ**' পদটির অর্থ কী ?

উত্তর—'**অথ**' পদটি এখানে পক্ষান্তরের অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ এবার প্রকারান্তরে যুদ্ধরূপ কর্তব্য পালনের সম্বন্ধে বলা হচ্ছে।

প্রশ্ন—'**সংগ্রামম্**'-এর সঙ্গে '**ইমম্**' এবং '**ধর্ম্যম্**'—এই দুটি বিশেষণ প্রয়োগ করে বলার কী অভিপ্রায় যে, যদি তুমি যুদ্ধ না করো, তাহলে স্বধর্ম ও কীর্তি থেকে চ্যুত হয়ে পাপভাগী হবে ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে এই যুদ্ধ ধর্মময় হওয়ায় অবশ্য করণীয়, এই কথা তোমাকে ভালোভাবে বোঝানো হয়েছে, তারপরও যদি তুমি কোনো কারণে যুদ্ধ না করো, তাহলে তোমার '**স্বধর্ম ত্যাগ করা**' হবে। নিবাতকবচ প্রভৃতি দানবদের সঙ্গে যুদ্ধে জয় লাভ করায় এবং ভগবান শিবের সঙ্গে যুদ্ধ করে তুমি যে জগতে অত্যন্ত বড় কীর্তি স্থাপন করেছ, তাতেও কলঙ্ক লেপন করা হবে। এতদ্‌ব্যতীত কর্তব্য ত্যাগ করায় তুমি পাপভাগী হবে ; সুতরাং তুমি যে পাপের ভয়ে যুদ্ধ পরিত্যাগ করতে চাইছ এবং ভীত-সন্ত্রস্ত হচ্ছ, তা সর্বতোভাবে অনুচিত।

অকীর্তিং চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে।। ৩৪

এবং সকলেই বহুকালধরে তোমার এই অকীর্তি নিয়ে আলোচনা করবে। সম্মাননীয় ব্যক্তির পক্ষে এই অকীর্তি মৃত্যুর থেকেও যন্ত্রণাদায়ক।। ৩৪

প্রশ্ন—এখানে '**অপি**' পদটি প্রয়োগ দ্বারা এই কথা বলার অর্থ কী যে, সকলে বহুকাল ধরে তোমার এই অকীর্তি নিয়ে আলোচনা করবে ?

উত্তর—'**অপি**' পদটি প্রয়োগ করে এই বাক্যে ভগবানের বক্তব্য হল, শুধুমাত্র স্বধর্ম এবং কীর্তিনাশ হবে, তোমার পাপ হবে, শুধু তাই নয় ; সেই সঙ্গে দেবতা, ঋষি, মানুষ—সকলেই তোমার অত্যন্ত নিন্দাও করবে। এই নিন্দা ও অকীর্তি-বদনাম অনন্তকাল পর্যন্ত স্থায়ী হবে। সুতরাং তোমার পক্ষে যুদ্ধ ত্যাগ করা কোনোভাবেই উচিত নয়।

প্রশ্ন—'সম্মাননীয় ব্যক্তির পক্ষে এই অপকীর্তি মৃত্যুর থেকেও যন্ত্রণাদায়ক'—এই বাক্যটির অর্থ কী ?

উত্তর—এই বাক্যের দ্বারা ভগবান দেখিয়েছেন যে, যদি তুমি কখনো একথা মনে কর যে অকীর্তি হলে আমার

কী ক্ষতি হবে ? এরূপ মনে করা ঠিক নয়। যেসব ব্যক্তি জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন, যাঁকে বহুলোক শ্রেষ্ঠ বলে মানেন, সেই ব্যক্তিদের কাছে অপকীর্তি মৃত্যুর থেকেও বেশি দুঃখদায়ক হয়। সুতরাং তোমার যখন সেই অপকীর্তি বা অপবাদ হবে, তুমি তা সহ্য করতে পারবে না ; কারণ তুমি এই জগতে মস্ত বড় শূরবীর ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলে বিখ্যাত। স্বর্গ থেকে পাতাল পর্যন্ত সর্বত্র তোমার প্রসিদ্ধি আছে।

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাং চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্॥ ৩৫

এবং যাঁদের দৃষ্টিতে তুমি আগে খুবই সম্মানিত ছিলে, তাঁদের কাছে তুমি হেয় হয়ে যাবে। এই মহারথীগণ মনে করবেন যে ভয়বশতঃ তুমি যুদ্ধে বিরত হয়েছ॥ ৩৫

প্রশ্ন—যাঁদের দৃষ্টিতে 'তুমি বহু সম্মানিত হয়ে লঘুত্ব প্রাপ্ত হবে' এই বাক্যটির অর্থ কী ?

উত্তর—উপরিউক্ত বাক্যের দ্বারা ভগবান একথা বলতে চেয়েছেন যে, ভীষ্ম, দ্রোণ, শল্য প্রমুখ এবং বিরাট, দ্রুপদ, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি মহারথীগণ, যাঁরা তোমার বহু সুনাম করেছেন, তোমাকে অত্যন্ত বড় যোদ্ধা, ধর্মাত্মা বলে জানেন, যুদ্ধ ত্যাগ করলে তুমি তাদের চোখে হেয় হয়ে যাবে—তাঁরা তোমাকে কাপুরুষ বলে ভাববেন।

প্রশ্ন—'মহারথীগণ মনে করবেন তুমি ভয়বশতঃ যুদ্ধে বিরত হয়েছ', এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এই বাক্যটির দ্বারা ভগবান স্পষ্টভাবে মহারথীদের দৃষ্টিতে অর্জুনের পতন হওয়ার কথা জানিয়েছেন। এটি বলার অর্থ হল যে, ঐসব মহারথীগণ একথা বুঝবেন না যে অর্জুন তাঁর স্বজন-বান্ধবদের প্রতি দয়াবশতঃ এবং যুদ্ধ করা পাপ মনে করে তা থেকে বিরত হতে চাইছেন। তাঁরা মনে করবেন যে অর্জুন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য যুদ্ধ পরিত্যাগ করছেন। এই পরিস্থিতিতে তোমার পক্ষে কোনোভাবেই যুদ্ধ থেকে বিরত হওয়া উচিত নয়।

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্॥ ৩৬

তোমার শত্রুরা তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করে অনেক অকথ্য কথাও বলবে, এর থেকে বেশি দুঃখজনক আর কী হতে পারে ?॥ ৩৬

প্রশ্ন—চৌত্রিশতম শ্লোকে একথা বলা হয়েছিল যে সকল প্রাণী তোমার নিন্দা করবে ; তাহলে এখানে আবার সেই কথা পুনরায় বলার কী তাৎপর্য যে তোমার শত্রুরা তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করে অনেক অকথ্য কথা বলবে ?

উত্তর—চৌত্রিশতম শ্লোকে সাধারণ মানুষের করা নিন্দার বর্ণনা করা হয়েছে, এখানে দুর্যোধন ইত্যাদি শত্রু দ্বারা মুখের সামনে বলা অকথ্য ভাষণের কথা বলা হয়েছে। পূর্বে উল্লিখিত নিন্দা কেবল সম্মাননীয় ব্যক্তিদের পক্ষে অধিক দুঃখজনক হয়, সকলের জন্য নয়। কিন্তু মুখের সামনে শত্রুদের দুর্বচন শুনলে সাধারণ মানুষও অত্যন্ত দুঃখ পায়। তাই ভগবান বলেছেন যে জগতে শুধুমাত্র তোমার অপযশ হবে এবং তোমাকে যারা এতোদিন বড় যোদ্ধা বলে মেনে নিয়েছিল, তারা যে কাপুরুষ ভাববে, শুধু তাই নয় ; এদের মধ্যে যারা তোমার ক্ষতি চায়, তোমার ক্ষতিতে যারা আনন্দিত হয়, তোমার সেই শত্রু দুর্যোধনরা তোমার বল, পরাক্রম, যুদ্ধকৌশল ইত্যাদির নিন্দা করে তোমার প্রতি সময়ে-অসময়ে অসহ্য বাক্-বাণ বর্ষণ করবে, তারা বলবে

— অর্জুন আবার কবে বীর হল, সে তো এক জন্মাবধি নপুংসক। তার গাণ্ডীব ধনুক এবং পৌরুষকে ধিক্কার।

প্রশ্ন—'এর থেকে বেশি দুঃখ আর কী হবে ?' এই বাক্যের অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান উপরিউক্ত ঘটনার ভয়াবহ দুঃখময় পরিণাম স্পষ্ট করেছেন। অভিপ্রায় হল যে এর থেকে বেশি দুঃখ তোমার আর কী হবে ; সুতরাং এখন তুমি যে যুদ্ধ-ত্যাগ করাকে সুখ বলে মনে করছ ও যুদ্ধ করাতে দুঃখ ভাবছ, তা তোমার ভ্রম। যুদ্ধত্যাগ করাই হবে তোমার পক্ষে অধিক দুঃখদায়ী।

সম্বন্ধ—উপরিউক্ত নানাকারণে যুদ্ধ না করলে বহুপ্রকার ক্ষতির বর্ণনা করে, ভগবান এবার যুদ্ধ করলে উভয় প্রকারের লাভ দেখিয়ে অর্জুনকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিয়েছেন—

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥ ৩৭

যদি তুমি যুদ্ধে নিহত হও, তবে স্বর্গলাভ করবে আর যদি জয়লাভ কর, তাহলে পৃথিবীর রাজ্য ভোগ করবে। তাই হে অর্জুন ! তুমি যুদ্ধের জন্য দৃঢ় নিশ্চয় হয়ে উঠে দাঁড়াও॥ ৩৭

প্রশ্ন—এই শ্লোকটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ষষ্ঠ শ্লোকে অর্জুন বলেছিলেন যে আমার পক্ষে যুদ্ধ করা শ্রেয়, কী না-করা শ্রেয় ; যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করব না আমাদের শত্রুরা জয়ী হবে, আমি এটি ঠিক করতে পারছি না। তার উত্তর দিতে গিয়ে ভগবান এই বাক্য দ্বারা যুদ্ধে মারা যাওয়া অথবা বিজয় লাভ করা—দুটিতেই লাভ দেখিয়ে অর্জুনের কাছে যুদ্ধের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। অভিপ্রায় হল যে, যদি যুদ্ধে তোমার শত্রুরা জয়লাভ করে এবং তুমি মারা যাও, সে-ও ভালো, কারণ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করলে তুমি স্বর্গলাভ করবে এবং যদি বিজয় লাভ করো, তাহলে পৃথিবীর রাজ্য-সুখ-ভোগ করবে। সুতরাং দুটি দৃষ্টিতেই তোমার পক্ষে যুদ্ধ করা সর্বতাবেই শ্রেয়। অতএব তুমি যুদ্ধের জন্য সর্বভাবে প্রস্তুত হও।

সম্বন্ধ—উপরিউক্ত শ্লোকে ভগবান যুদ্ধের ফল রাজ্যসুখ বা স্বর্গপ্রাপ্তি পর্যন্ত জানিয়েছেন ; কিন্তু অর্জুন আগেই বলে দিয়েছেন যে ইহলোকে রাজ্যলাভের কথা তো দূর, তিনি ত্রিলোকের রাজ্যের জন্যও নিজ কুলের বিনাশ করবেন না। তাই যাঁর রাজ্যসুখ ও স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা নেই সে কীভাবে যুদ্ধ করবে, পরের শ্লোকে সেই কথাই বলেছেন—

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥ ৩৮

জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি, সুখ-দুঃখকে সমান মনে করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। এইভাবে যুদ্ধ করলে তুমি পাপভাগী হবে না।॥ ৩৮

প্রশ্ন—জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি ও সুখ-দুঃখকে সমানভাবে দেখা কী ?

উত্তর—যুদ্ধে হওয়া জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি ও সুখ-দুঃখে কোনো প্রকার ভেদ-বুদ্ধি না হওয়া অর্থাৎ তার জন্য মনে রাগ-দ্বেষ বা হর্ষ-বিষাদ ইত্যাদি কোনোপ্রকার বিকার না হওয়া হল সেগুলিকে সমান মনে করা।

প্রশ্ন—তারপর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও—এই কথার কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—এই বাক্যটির দ্বারা ভগবান বলেছেন যে তোমার যদি রাজ্যসুখ ও স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা না থাকে তাহলে যুদ্ধের পরিণামে হওয়া বিষমভাব সর্বতোভাবে

পরিত্যাগ করে উপরিউক্ত প্রকারে সম হয়ে তারপর তোমার যুদ্ধ করা উচিত। এরূপ যুদ্ধ শাশ্বত-শান্তিদায়ক হয়।

প্রশ্ন—'এরূপে যুদ্ধ করলে তুমি পাপভাগী হবে না' এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এই বাক্যটির দ্বারা ভগবান অর্জুনের সেই কথার উত্তর দিয়েছেন, যেখানে অর্জুন বলেছিলেন যুদ্ধে স্বজনবধ মহাপাপ এবং তিনি স্থির করেছিলেন যে যুদ্ধ না করাই উচিত (১।৩৬, ৩৯, ৪৫)। অভিপ্রায় হল যে উপরিউক্ত প্রকারে যুদ্ধ করলে তোমার কোনোপ্রকারেই বিন্দুমাত্র পাপ হবে না অর্থাৎ তুমি শুভাশুভ কর্মবন্ধনরূপ পাপ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়ে যাবে।

সম্বন্ধ—ভগবান এই পর্যন্ত সাংখ্যযোগ এবং ক্ষত্রিয়ধর্মের দৃষ্টিতে যুদ্ধের ঔচিত্য প্রমাণ করে অর্জুনকে সমত্বপূর্বক যুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছেন। এবার কর্মযোগের সিদ্ধান্ত অনুসারে যুদ্ধের ঔচিত্য বলার জন্য কর্মযোগ বর্ণনার প্রস্তাবনা করছেন—

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি॥ ৩৯

হে পার্থ ! তোমার জন্য এই সমস্ত বুদ্ধি জ্ঞানযোগের বিষয়ে বলা হয়েছে, এবার তুমি কর্মযোগের কথা শোন—যে বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত হলে তুমি অনায়াসে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হবে॥ ৩৯

প্রশ্ন—এখানে '**এষা**' বিশেষণের সঙ্গে '**বুদ্ধিঃ**' পদটি কোন্ বুদ্ধির বাচক এবং 'এই বুদ্ধি তোমার জন্য জ্ঞানযোগের বিষয়ে বলা হয়েছে'—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভগবান আগের শ্লোকে অর্জুনকে যে সমভাবে যুক্ত হয়ে যুদ্ধ করতে বলেছিলেন, সেই সমত্বের বাচক এখানে '**এষা**' পদের সঙ্গে '**বুদ্ধিঃ**' পদটি। কারণ '**এষা**' পদটি অতি নিকটবর্তী বস্তুকে লক্ষ্য করায়। সুতরাং এই কথার দ্বারা ভগবান এই ভাব প্রকাশ করেছেন যে জ্ঞানযোগের সাধন দ্বারা এই সমভাব কীভাবে প্রাপ্তি হয় ; এজন্য জ্ঞানযোগী বিবেক-বিচারপূর্বক আত্মার প্রকৃত স্বরূপ জেনে কীভাবে সমভাবে যুক্ত থেকে বর্ণাশ্রম-মত বিহিত কর্ম পালন করবে, এ সমস্তই তিনি একাদশ থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত জানিয়েছেন।

প্রশ্ন—একাদশ থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত প্রকরণে কীভাবে এই সমভাবের বর্ণনা করা হয়েছে ?

উত্তর—আত্মার যথার্থ স্বরূপ না জানার ফলেই সমস্ত পদার্থে মানুষের বিষমভাব জন্মে। আত্মার প্রকৃত স্বরূপ জেনে যাওয়ার পর যখন তার দৃষ্টিতে আত্মা ও পরমাত্মার কোনো পার্থক্য থাকে না এবং একমাত্র সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ম ব্যতীত কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকে না, তখন তার কোনোকিছুতেই ভেদবুদ্ধি থাকতে পারে না। তাই ভগবান একাদশ শ্লোকে মৃত ও জীবিত থাকার মধ্যে ভ্রমমূলক এই বিষমভাব বা ভেদবুদ্ধির কারণে যে শোক হয়, তা সর্বতোভাবে অনুচিত জানিয়ে শোকরহিত হওয়ার ইঙ্গিত করেছেন। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শ্লোকে আত্মার নিত্যত্ব এবং অনাসক্তি প্রতিপাদন করে দেখিয়েছেন যে, প্রাণীর মৃত্যু ও জীবিত থাকার মধ্যে যে পার্থক্য প্রতীত হয়, তা অজ্ঞতাজনিত। আত্মজ্ঞানী বুদ্ধিমান ব্যক্তির মধ্যে এই ভেদবুদ্ধি থাকে না ; কারণ আত্মা সম, নির্বিকার এবং নিত্য। তদনন্তর সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব দ্বারা ভেদবুদ্ধি উৎপন্নকারী শব্দাদি বিষয়-সংযোগকে অনিত্য জানিয়ে অর্জুনকে তা সহ্য করতে, তাতে সম থাকতে বলেছেন (২।১৪)। যেসব পুরুষ সুখ-দুঃখাদিকে সম মনে করেন, তাদের প্রশংসা করে বলেছেন তাঁরাই পরমাত্মা প্রাপ্তির উপযুক্ত (২।১৫)। তারপর তিনি সত্যাসত্য বস্তুর নির্ণয় করে অর্জুনকে যুদ্ধের নির্দেশ দিয়ে (২।১৬-১৮) পরবর্তী শ্লোকে যারা আত্মাকে মরণশীল মনে করে তাদের অজ্ঞ বলে আত্মার

নির্বিকারত্ব, অকর্তৃত্ব ও নিত্যত্ব প্রতিপাদন করে প্রমাণিত করেছেন যে শরীর বিনাশে আত্মার বিনাশ হয় না। তাই এই জন্ম-মৃত্যুতে বিষমভাব করে কোনো প্রাণীর জন্য তোমার শোকগ্রস্ত হওয়া উচিত নয় (২।১৯-৩০)। এইভাবে উক্ত প্রকরণে সত্য ও অসত্যের বিবেচনাপূর্বক আত্মার প্রকৃত স্বরূপ জানলে যে সমস্ত লাভ হবে তার প্রতিপাদন করা হয়েছে।

প্রশ্ন—**'ইমাম্'** পদটি কোন্ বুদ্ধির বাচক এবং 'এবার তুমি এটি যোগের বিষয়ে শোন' এই কথাটির কী তাৎপর্য ?

উত্তর—**'ইমাম্'** পদটিও ঐ পূর্বশ্লোকে বর্ণিত সমভাবরূপ বুদ্ধির বাচক। তাই উপরিউক্ত বাক্যের দ্বারা ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে সেই সমভাব কর্মযোগের পালনে কীভাবে সাধ্য হয়, কর্মযোগীর কেমন সমভাব রাখা উচিত এবং সেই সমত্বের ফল কী— এইসব বিষয় আমি পরবর্তী শ্লোকে বলছি ; অতএব তুমি সাবধানে তা শোন।

প্রশ্ন—যদি এই কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল, তাহলে একত্রিশ থেকে সাঁইত্রিশতম শ্লোকের প্রকরণটি কী বিষয়ে বলা হল ?

উত্তর—ঐ প্রকরণটি অর্জুনকে বোঝানোর জন্য যে, তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ তোমার স্বধর্ম, তা ত্যাগ করা তোমার পক্ষে সর্বদা অনুচিত এবং যুদ্ধ করা সর্বভাবে লাভপ্রদ। আটত্রিশতম শ্লোকে বোঝানো হয়েছে যে, যুদ্ধ যখন করতেই হবে, তখন তা এমন যুক্তির দ্বারা করতে হবে যাতে তা বন্ধনের হেতু না হয়। তাই বলা হয়েছে যে জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ—উভয় যোগের সাধনাতে সমভাবে যুক্ত হওয়া প্রয়োজন। এই শ্লোকে সেই সমভাবের দুপ্রকার সাধনার সঙ্গে দেহলী-দীপক ন্যায়ের সঙ্গে সম্বন্ধ দেখানো হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে **'কর্মবন্ধম্'** পদটির অর্থ কী এবং উপরিউক্ত সমবুদ্ধির দ্বারা তার বিনাশ করার অর্থ কী ?

উত্তর—জন্ম-জন্মান্তরে করা শুভাশুভ কর্মসংস্কারের দ্বারা এই জীব আবদ্ধ। এই মনুষ্যদেহে পুনরায় অহং-ভাব, মমত্ব-বোধ, আসক্তি ও কামনা দ্বারা নতুন নতুন কর্ম করে সে আরো বেশি জড়িয়ে পড়ে। তাই এখানে এই জীবাত্মাকে বারংবার বিভিন্ন যোনিতে জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারচক্রে আবর্তনকারী জন্ম-জন্মান্তরে কৃত শুভাশুভ কর্মাদির সঞ্চিত সংস্কারগুলির বাচক হল **'কর্মবন্ধম্'** পদটি। কর্মযোগের বিধির দ্বারা সকল কর্মে মমতা, আসক্তি ও ফলেচ্ছা ত্যাগ করে, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম হয়ে, রাগ-দ্বেষ-হর্ষ-বিষাদ ইত্যাদি বিকাররহিত হয়ে ইহজন্ম ও জন্মান্তরে কৃত এবং বর্তমানে করা সমস্ত কর্মের ফল উৎপন্ন করার শক্তি নষ্ট করা—সেই কর্মের বীজ নষ্ট করে দেওয়া[1]—এটিই হল সমবুদ্ধিদ্বারা কর্মবন্ধন সম্পূর্ণভাবে বিনাশ করা।

সম্বন্ধ—এইভাবে কর্মযোগের বর্ণনার প্রস্তাবনা করে এবার তার গুরুত্ব ও রহস্যপূর্ণ মহত্ত্ব জানাচ্ছেন—

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥ ৪০

এই নিষ্কাম কর্মযোগে উপক্রমের অর্থাৎ প্রারম্ভের নাশ হয় না এবং বিপরীত ফলরূপ দোষও হয় না, অপর পক্ষে এই নিষ্কাম কর্মযোগরূপ ধর্মের স্বল্প অনুষ্ঠানও জন্ম-মৃত্যুরূপ মহাভয় থেকে রক্ষা করে ॥ ৪০

প্রশ্ন—এই কর্মযোগে উপক্রমের নাশ হয় না—এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা এই ভাব দেখানো হয়েছে যে, মানুষ যদি এই কর্মযোগের সাধন আরম্ভ করে এবং তা পূর্ণ হওয়ার আগে মধ্যপথেই ত্যাগ করে, তাহলে মানুষ যেমন ক্ষেতে বীজ বপন করে, তাকে রক্ষা না করে বা

[1]কোনো বীজকে আগুনে ভাজা হলে তার অঙ্কুরিত হবার শক্তি নষ্ট হয়। তদনুরূপ সমত্ব-ভাব রেখে কর্ম করলে তার দ্বারা কর্মবন্ধন হয় না।

জল সিঞ্চন না করে মধ্যপথে পরিত্যাগ করলে তা যেমন নষ্ট হয়ে যায়, তেমন এই কর্মযোগের শুরু করে মধ্যপথে ত্যাগ করলে তা কিন্তু বিনষ্ট হয় না। এর সংস্কার সাধকের অন্তরে থেকে যায় এবং পরবর্তী জন্মে সাধক অত্যন্ত জোরের সঙ্গে পুনর্বার সাধনে প্রবৃত্ত হয় (৬।৪৩-৪৪)। এর বিনাশ নেই, তাই ভগবান কর্মযোগকে 'সৎ' বলে অভিহিত করেছেন (১৭।২৭)।

প্রশ্ন—এতে বিপরীত ফলরূপ দোষ হয় না—এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা এই ভাব প্রকাশিত হয় যে, কর্ম কামনাযুক্ত হলে তবেই তাতে ভালো-মন্দের ফল পাবার সম্ভাবনা থাকে ; কিন্তু এক্ষেত্রে কামনা না থাকায় বিপরীত ফল হয় না। সকামভাবে দেবতা, পিতৃ, মানুষ ইত্যাদির সেবায় কোনোপ্রকার ত্রুটি হলে, তাঁরা রুষ্ট হলে সাধকের অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু স্বার্থরহিত যজ্ঞ, দান, তপ, সেবা ইত্যাদি কর্মপালনে ত্রুটি থাকলেও তাতে বিপরীত ফলরূপ অনিষ্ট হয় না। অথবা যেমন রোগনাশের জন্য ব্যবহৃত ওষুধ অনুকূল না হলে রোগবিনাশ না করে রোগবৃদ্ধিকারী হয়ে ওঠে, কিন্তু কর্মযোগের পালনে তেমন বিপরীত ফল হয় না (৬।৪০)। অর্থাৎ তা পূর্ণ না হওয়ায় এই জন্মে যদি সাধককে পরমপদ প্রদানে সক্ষম না হয় তা হলেও তা সেই ব্যক্তিকে পূর্বকৃত পাপের ফলস্বরূপ বা ইহজন্মের হিংসাদির ফলস্বরূপ তির্যকযোনি বা নরক ভোগ করায় না এবং পূর্বকৃত শুভকর্মের ফলস্বরূপ ইহলোক বা পরলোকের সুখভোগেও বঞ্চিত করে না। সেই ব্যক্তি পুণ্যবানদের উত্তমলোক লাভ করেন এবং বহুকাল সেখানে বাস করে পুনরায় শুদ্ধ শ্রীমানের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন অথবা যোগীকুলে জন্ম নেন ও পূর্বজন্মের অভ্যাসবশতঃ পুনরায় সাধনায় প্রবৃত্ত হন (৬।৪১-৪৪)।

প্রশ্ন—'**প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে**' পদের অর্থ যদি কর্মযোগে বিঘ্ন-বাধা-বিপত্তি আসে না—ধরা হয়, তাহলে আপত্তি কিসের ?

উত্তর—পূর্বজন্মের পাপের ফলে বিষয়ভোগে এবং প্রমাদী, বিষয়ী ও নাস্তিক ব্যক্তির সঙ্গদোষে সাধনায় বাধা-বিঘ্ন-বিপত্তি আসতে পারে ; কিন্তু নিষ্কাম কর্মের ফল খারাপ হয় না। তাই বিপরীত ফলরূপ দোষ হয় না, এই অর্থ গ্রহণই ঠিক।

প্রশ্ন—'অস্য' বিশেষণের সঙ্গে '**ধর্মস্য**' পদটি এখানে কীসের বাচক ?

উত্তর—আগের শ্লোকে 'যোগ' নামে যার বর্ণনা করা হয়েছে, এটি সেই কর্মযোগেরই বাচক।

প্রশ্ন—কর্মযোগ কাকে বলে ?

উত্তর—শাস্ত্রবিহিত উত্তম ক্রিয়াকে 'কর্ম' ও সমভাবকে 'যোগ' বলা হয় (২।৪৮) ; সুতরাং মমতা-আসক্তি, কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহ ইত্যাদি রহিত হয়ে যে ব্যক্তি সমতাপূর্বক নিজ বর্ণ, আশ্রম, স্বভাব ও পরিস্থিতি অনুযায়ী শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য-কর্মের আচরণ করে, সেটিই কর্মযোগ। একে সমত্বযোগ, বুদ্ধিযোগ, তদর্থকর্ম, মদর্থকর্ম ও মৎকর্মও বলা হয়।

প্রশ্ন—এই 'কর্মযোগ'রূপী ধর্মের অল্পসাধনও মহাভয় থেকে রক্ষা করে—এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কর্মযোগের সাধন যদি তার পূর্ণ সীমায় পৌঁছে যায়, তাহলে সেই ব্যক্তি সেই মুহূর্তে পরব্রহ্ম পরমাত্মা প্রাপ্তি লাভ করে। সুতরাং এর পূর্ণ সাধনের মহত্ত্বের সম্বন্ধে বলার কিছু নেই, কিন্তু মানুষ যদি এর আংশিক সাধনও করে অর্থাৎ সমত্বের অটল স্থিতি না হয়ে মানুষ যদি কর্তব্য-কর্মের সামান্য আচরণ সমভাবে করে আর সেই অল্প সম-ভাবও যদি অন্তকালে স্থির থাকে, তাহলেও সে নির্বাণ ব্রহ্ম লাভ করে (২।৭২) ; নচেৎ জন্মান্তরে সাধককে পুনরায় সাধনে প্রবৃত্ত করে পরম গতি লাভ করায় (৬।৪১-৪৫)। এইভাবে যথাসময়ে তাঁর অবশ্যই উদ্ধার হয়। সকামভাবের দ্বারা হাজার বছর ধরে করা বড় বড় যজ্ঞ, দান, তপস্যা, তীর্থসেবা এবং ব্রত-উপবাসাদি কর্মও মানুষকে সংসার থেকে উদ্ধার করতে পারে না আর সমভাবে করা যুদ্ধ, কৃষি, বাণিজ্য, সেবা ও শিল্প ইত্যাদি ছোট ছোট জীবিকা কর্মও ভাবপূর্ণ হওয়ায় ক্ষণমাত্রেই সংসার থেকে উদ্ধারকারী হয়ে ওঠে। কারণ কল্যাণ-সাধনে 'কর্ম' থেকে 'ভাব'-এরই প্রাধান্য থাকে।

প্রশ্ন—কর্মযোগের অল্প পালনও যখন মহাভয় থেকে রক্ষা করে, তখন আবার অল্পের কী মহত্ত্ব থাকে ?

উত্তর—নিষ্কামভাবের পরিণাম সংসার থেকে

উদ্ধার করা। সুতরাং তা উদ্ধার না করা পর্যন্ত নষ্টও হয় না বা অন্য কোনো ফলও প্রদান করে না। শেষে সাধককে পূর্ণ নিষ্কাম করে তাকে উদ্ধার করবেই—এই তার মহত্ত্ব।

প্রশ্ন—কর্মযোগের অল্পসাধনই যখন মহাভয় থেকে রক্ষা করে, তখন পূর্ণ সাধনের প্রয়োজন কী ?

উত্তর—অল্প সাধন যে রক্ষা করে—এতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তাতে কোনো সময়ের নিয়ম নেই। জানা নেই যে তা ইহজন্মে উদ্ধার করবে না কি পরজন্মে। কারণ এই অল্প সাধন ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে পূর্ণ হলে তবেই উদ্ধার করবে। সুতরাং শীঘ্র কল্যাণকামী যত্নশীল মানুষদের তৎপরতা ও উৎসাহসহকারে পূর্ণরূপেই সমত্বপ্রাপ্তির চেষ্টা করা উচিত।

প্রশ্ন—মহান ভয় কাকে বলে, তার থেকে রক্ষা করা কী ?

উত্তর—জীবের সব থেকে বড় ভয়, মৃত্যুভয়, তাই অনন্তকাল ধরে বারংবার জন্ম ও মরণ গ্রহণ করাই মহাভয়। এই জন্ম-মৃত্যুরূপ মহাভয়কেই ভগবান পরবর্তীকালে মৃত্যুসংসারসাগর নামে অভিহিত করেছেন (১২।৭)। সমুদ্রে যেমন অসংখ্য তরঙ্গ ওঠে, তেমনই এই সংসার-সমুদ্রেও জন্ম-মৃত্যুর অসংখ্য তরঙ্গ ওঠে আর মিলিয়ে যায়। সমুদ্রের তরঙ্গ যদিও গোণা সম্ভব, কিন্তু যতক্ষণ পরমাত্মার তত্ত্বের প্রকৃত জ্ঞান না হয় ততক্ষণ কতবার মৃত্যু বরণ করতে হবে ? এর গণনা করতে কেউই সক্ষম নয়। এইভাবে এই মৃত্যুরূপ সংসার-সাগর থেকে পার হওয়া—চিরকালের জন্য জন্ম-মৃত্যু থেকে রক্ষা পেয়ে এই প্রপঞ্চ থেকে সর্বতোভাবে অতীত সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মাতে মিশে যাওয়াই হল মহাভয় থেকে রক্ষা করা।

সম্বন্ধ—এই ভাবে কর্মযোগের মাহাত্ম্য জানিয়ে এবার তার আচরণ বিধি বলার পূর্বে কর্মযোগের পক্ষে পরম আবশ্যক যে (সিদ্ধ কর্মযোগীর) নিশ্চয়াত্মিকা স্থায়ী সমবুদ্ধি—সেটির, এবং কর্মযোগের বাধক যা সকাম মানুষদের বিভিন্ন বুদ্ধি, তার পার্থক্য জানাচ্ছেন—

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥ ৪১

হে কুরুনন্দন ! এই নিষ্কাম কর্মযোগে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একনিষ্ঠ হয়। কিন্তু অস্থির চিত্ত বিবেকহীন সকাম ব্যক্তিদের বুদ্ধি অবশ্যই বহুশাখাবিশিষ্ট ও অনন্ত হয়॥ ৪১

প্রশ্ন—'ব্যবসায়াত্মিকা' বিশেষণের সঙ্গে 'বুদ্ধিঃ' পদটি এখানে কোন্ বুদ্ধির বাচক এবং তা একই—এই কথাটির কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—অটল এবং স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণই যে বুদ্ধির স্বরূপ, উনচল্লিশতম শ্লোকে যে বুদ্ধিযুক্ত হওয়ার ফল কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেই স্থায়ী সমভাবরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির বাচক এখানে 'ব্যবসায়াত্মিকা' বিশেষণের সঙ্গে 'বুদ্ধিঃ' পদ। কারণ এই প্রকরণে স্থানে স্থানে এই অর্থে 'বুদ্ধি' শব্দের প্রয়োগ হয়েছে এবং 'সেই বুদ্ধি একই' একথা বলে এই ভাব দেখানো হয়েছে যে এতে শুধুমাত্র এক সচ্চিদানন্দ পরমাত্মারই নিশ্চয়তা থাকে। নানাপ্রকার ভোগ এবং তার প্রাপ্তির উপায়গুলি এই নিশ্চয়ে স্থান পায় না। একেই স্থিরবুদ্ধি ও সমবুদ্ধিও বলা হয়।

প্রশ্ন—'অব্যবসায়িনাম্' পদ কীরূপ মানুষের বাচক এবং তাদের বুদ্ধিকে বহু ভেদসম্পন্ন এবং অনন্ত বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যাদের মধ্যে উপরিউক্ত নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি নেই, অজ্ঞতাজনিত বিষমভাবের জন্য যাদের অন্তর মোহগ্রস্ত হয়ে রয়েছে, সেই বিবেকহীন ভোগাসক্ত মানুষদের বাচক 'অব্যবসায়িনাম্' পদ। তাদের বুদ্ধি বহু ভেদসম্পন্ন ও অনন্ত বলার তাৎপর্য হল, সকামভাবে যজ্ঞাদি সম্পন্নকারী মানুষদের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য থাকে, কেউ কোনো একটি ভোগ প্রাপ্তির জন্য কোনো কর্ম

করে, তো আর একজন ভিন্ন কোনো ভোগের জন্য অন্যপ্রকার কর্ম করে। তাছাড়াও তারা কোনো একটি উদ্দেশ্যে করা কর্মেও নানাপ্রকার ভোগের কামনা করে থাকে। জগতের সমস্ত পদার্থে এবং ঘটনায় তাদের বিষমভাব থাকে। তারা কাউকে প্রিয় আবার কাউকে অপ্রিয় বলে মনে করে। একই পদার্থের কোনো অংশটি প্রিয় আর অন্য অংশটিকে অপ্রিয় ভাবে। এইভাবে জগতের সমস্ত পদার্থে, ব্যক্তিদের মধ্যে এবং ঘটনাসমূহে তাদের নানাপ্রকার বিষমবুদ্ধি থাকে এবং তার অনন্ত ভেদ হয়।

সম্বন্ধ—এইরূপ কর্মযোগীদের জন্য অবশ্য ধারণযোগ্য নিশ্চয়াত্মিকাবুদ্ধি ও ত্যাজ্য সকাম মানুষদের বুদ্ধির স্বরূপ জানিয়ে এবার তিনটি শ্লোকে সকামভাব ত্যজনীয় বলার জন্য সকাম মানুষদের স্বভাব, সিদ্ধান্ত ও আচার-ব্যবহারের বর্ণনা করেছেন—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥ ৪২
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি॥ ৪৩
ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥ ৪৪

হে পার্থ! যাঁরা ভোগে আসক্ত, কর্মফল প্রশংসাকারক বেদবাক্যে যাঁদের চিত্ত আকৃষ্ট, যাঁদের কাছে স্বর্গই পরম প্রাপ্য বস্তু এবং স্বর্গ থেকে বড় কিছুই নেই—এরূপ বর্ণনাকারী, অবিবেকী ব্যক্তিরা যে পুষ্পিত ও শোভনীয় কথা বলে, যা জন্মরূপ কর্মফল প্রদানকারী এবং ভোগৈশ্বর্য প্রাপ্তির জন্য নানা ক্রিয়ার বর্ণনাকারী, সেই বাক্যদ্বারা যাঁদের চিত্ত অপহৃত হয়ে ভোগৈশ্বর্যে অত্যন্ত আসক্ত, তাঁদের পরমাত্মাতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি (শুদ্ধ ভক্তি) হতে পারে না॥ ৪২-৪৪

প্রশ্ন—'**কামাত্মানঃ**' পদটির অর্থ কী ?

উত্তর—এখানে '**কাম**' শব্দটি ভোগাদির বাচক ; সেই ভোগাদিতে অত্যন্ত আসক্ত হয়ে সেই চিন্তায় যারা তন্ময় থাকে, নিজ মনুষ্যত্ব পর্যন্ত সর্বতোভাবে বিস্মৃত হয়ে থাকে— সেই ভোগাসক্ত মানুষদের বাচক '**কামাত্মানঃ**' পদটি।

প্রশ্ন—'**বেদবাদরতাঃ**' পদটির অর্থ কী ?

উত্তর—বেদাদিতে ইহলোক ও পরলোকের ভোগাদির প্রাপ্তির জন্য বহু প্রকারের বিভিন্ন কাম্য কর্মের বিধান করা আছে এবং সেই কর্মের বিভিন্ন প্রকার ফল বলা হয়েছে ; বেদের ঐসব কথায় এবং তাতে বলা ফলরূপ ভোগাদিতে যাদের অত্যন্ত আসক্তি থাকে, '**বেদবাদরতাঃ**' পদটি সেই সব মানুষদের বাচক। বেদাদিতে সংসারে বৈরাগ্য উৎপাদনকারী এবং পরমাত্মার প্রকৃত স্বরূপ প্রতিপাদনকারী যেসব বচন আছে, তাতে শ্রদ্ধা রাখেন যেসব মানুষ, তাঁদের বাচক এই '**বেদবাদরতাঃ**' পদটি নয়। কারণ যাঁরা ঐসব বাক্যে শ্রদ্ধা রাখেন এবং তার মর্মোদ্ধার করতে পারেন, তাঁরা মনে করেন না যে 'স্বর্গপ্রাপ্তিই পরম পুরুষার্থ—এর থেকে বড়ো আর কিছুই নেই।' সুতরাং এখানে '**বেদবাদরতাঃ**' সেই সব মানুষদেরই বাচক যাঁরা এই রহস্য জানেন না যে বেদাদির প্রকৃত অভিপ্রায় পরমাত্মার স্বরূপ প্রতিপাদন করা, বেদাদির দ্বারা জ্ঞাতব্য হলেন এক পরমেশ্বরই (১৫।১৫)। এই রহস্য না বোঝার জন্যই তারা বেদোক্ত সকাম কর্মে ও তার ফলে আসক্ত হয়ে থাকে।

প্রশ্ন—'**স্বর্গপরাঃ**' পদটির অর্থ কী ?

উত্তর—যাঁরা স্বর্গকেই পরম প্রাপ্য বস্তু মনে করেন, যাঁদের বুদ্ধিতে স্বর্গের থেকে বড়ো আর কোনো বস্তু প্রাপ্ত করার যোগ্য নয় এবং এইজন্য যাঁরা পরমাত্মা লাভের সাধন থেকে বিমুখ হয়ে থাকেন, তাদের বাচক এই **'স্বর্গপরাঃ'** পদটি।

প্রশ্ন—এখানে **'নান্যদস্তীতি বাদিনঃ'** এই বিশেষণের কী ভাব ?

উত্তর—যে অবিবেকী মানুষেরা ভোগাদিতেই আবিষ্ট থাকেন, তাদের দৃষ্টিতে স্ত্রী, পুত্র, ধন, মান, অহংকার, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ইহলোকের সুখ এবং স্বর্গাদি পরলোকের সুখের অতিরিক্ত মোক্ষ ইত্যাদি কোনো কিছুই নেই—যা প্রাপ্তিলাভের জন্য চেষ্টা করা যায়। স্বর্গপ্রাপ্তিই তাঁরা পরম ধ্যেয় বলে মনে করেন এবং তাঁরা এটিই বেদাদির তাৎপর্য বলে মনে করেন। সুতরাং তাঁরা এই সিদ্ধান্তের কথাই বলেন ও প্রচারও করেন। এই ভাবটিই **'নান্যদস্তীতি বাদিনঃ'** বিশেষণে ব্যক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন—এরূপ ব্যক্তিদের **'অবিপশ্চিতঃ'** বিবেকহীন বলার কী ভাব ?

উত্তর—এঁদের বিবেকহীন বলে ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে, যদি এঁরা সত্যাসত্য বিচার করে নিজ নিজ কর্তব্য স্থির করতেন, তাহলে তাঁরা এই রূপ ভোগাদিতে আবদ্ধ হতেন না। সুতরাং মানুষের বিবেচনা পূর্বক নিজ কর্তব্য স্থির করা উচিত।

প্রশ্ন—**'বাচম্'**-এর সঙ্গে **'ইমাম্'**, **'যাম্'** ও **'পুষ্পিতাম্'** বিশেষণ যোগ করে কী ভাব দেখিয়েছেন ?

উত্তর—**'ইমাম্'** এবং **'যাম্'** বিশেষণের সাহায্যে এই ভাব দেখানো হয়েছে যে, নিজেকে পণ্ডিত মনে করা এইসব মানুষ যারা অপরকে বলে থাকেন যে স্বর্গভোগের থেকে অধিক আর কিছু নেই এবং জন্মরূপ কর্মফল প্রদানকারী যে বেদবাণী এঁরা বর্ণনা করেন, সেই বাণী তাঁদের এবং তাঁদের উপদেশ শ্রবণকারীদের চিত্ত অপহরণকারী হয়ে ওঠে। **'পুষ্পিতাম্'** বিশেষণের দ্বারা এই ভাব দেখিয়েছেন যে, যদিও বাস্তবে ঐ বাণীর বিশেষ কোনো মহত্ত্ব নেই, তা বিনাশশীল ভোগাদির নামমাত্র ক্ষণিক সুখেরই বর্ণনা করে, তবুও তা শিমুল ফুলের মতো ওপর থেকে অতি রমণীয় ও সুন্দর হয়, সেইজন্যই সাংসারিক মানুষ তার প্রলোভনে পড়ে যায়।

প্রশ্ন—এখানে **'ব্যবসায়াত্মিকা'** বিশেষণের সঙ্গে **'বুদ্ধিঃ'** পদটি কীসের বাচক এবং সমাধির অর্থ পরমাত্মা কেমন করে হল। যার চিত্ত উপরিউক্ত পুষ্পিতা বাক্য দ্বারা অপহৃত হয়েছে এবং যে ভোগ ও ঐশ্বর্যে অত্যন্ত আসক্ত, সেই পুরুষের পরমাত্মাতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হয় না—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—একচল্লিশতম শ্লোকে যার লক্ষণ বলা হয়েছে সেই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির বাচক এখানে **'ব্যবসায়াত্মিকা'** বিশেষণের সঙ্গে **'বুদ্ধিঃ'** পদটি। **'সমাধীয়তে অস্মিন্ বুদ্ধিঃ ইতি সমাধিঃ'** এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে এখানে সমাধির অর্থ পরমাত্মা ধরা হয়েছে। উপরিউক্ত বাক্যের দ্বারা এখানে এই ভাব দেখানো হয়েছে যে ঐসব মানুষের চিত্ত ভোগ ও ঐশ্বর্যে আসক্ত থাকায় সব সময় অত্যন্ত চঞ্চল থাকে। তারা অত্যন্ত স্বার্থপরায়ণ হয় ; তাই তাদের পরমাত্মাতে স্থির ও অটলবুদ্ধি হয় না।

সম্বন্ধ—এইভাবে ভোগ ও ঐশ্বর্যে আসক্ত সকাম মানুষদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি না হওয়ার কথা বলে এবার কর্মযোগের উপদেশ প্রদানের উদ্দেশ্যে ভগবান প্রথমে অর্জুনকে উপরোক্ত ভোগ ও ঐশ্বর্যতে আসক্তিশূন্য হয়ে সমভাবসম্পন্ন হতে বলেছেন—

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥ ৪৫

হে অর্জুন ! বেদ উপরোক্তভাবে ত্রিগুণের কার্যরূপ সমস্ত ভোগ এবং তারই সাধনের প্রতিপাদক ; সুতরাং তুমি ঐসব ভোগ ও তার সাধনে আসক্তিবর্জিত হও, হর্ষ-শোক দ্বন্দ্বরহিত এবং নিত্যবস্তু পরমাত্মাতে স্থিত হয়ে যোগক্ষেমের আকাঙ্ক্ষাবিহীন হয়ে স্বাধীন চিত্তপরায়ণ হও॥ ৪৫

প্রশ্ন—'**ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ**' পদটির অর্থ কী ? এবং বেদাদিকে '**ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ**' বলার তাৎপর্য কী ?

উত্তর—সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিন গুণাদির কার্যকে '**ত্রৈগুণ্য**' বলা হয়। তাই সমস্ত ভোগ ও ঐশ্বর্যময় পদার্থ এবং তার প্রাপ্তির উপায়ভূত সমস্ত কর্মের বাচক হল এই '**ত্রৈগুণ্য**' শব্দটি। সে সবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ যাতে এর বর্ণনা আছে তাকে বলা হয় '**ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ**'। এখানে বেদাদিকে '**ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ**' বলার মর্মার্থ হল যে, বেদাদিতে কর্মকাণ্ডের বর্ণনা বেশি থাকায় বেদ ত্রৈগুণ্যবিষয়।

প্রশ্ন—'**নিস্ত্রৈগুণ্য**' হওয়া কাকে বলে ?

উত্তর—তিন গুণাদির কার্যরূপ ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত ভোগে এবং তার সাধনভূত সমস্ত কর্মে মমতা, আসক্তি এবং কামনা থেকে সর্বতোভাবে রহিত হয়ে যাওয়াকে '**নিস্ত্রৈগুণ্য**' বলা হয়। এখানে সমস্ত কর্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ করাকে '**নিস্ত্রৈগুণ্য**' বলা হয়নি ; কারণ সমস্ত কর্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ করা বা সমস্ত বিষয়াদি পরিত্যাগ করা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় (৩।৫) ; এই শরীরও ত্রিগুণের কার্য, যা ত্যাগ করা সম্ভব নয়। তাই একথাই বুঝতে হবে যে শরীরে এবং তার দ্বারা কৃত কর্মাদি ও তার ফলস্বরূপ সমস্ত ভোগে অহং-ভাব, মমতা, আসক্তি ও কামনারহিত হওয়াই এখানে '**নিস্ত্রৈগুণ্য**' অর্থাৎ ত্রিগুণের কার্যরহিত হওয়া।

প্রশ্ন—'**দ্বন্দ্ব**' কাকে বলে এবং দ্বন্দ্বরহিত হওয়া কী ?

উত্তর—সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, কীর্তি-অকীর্তি, মান-অপমান ও অনুকূল-প্রতিকূল ইত্যাদি পরস্পর বিরোধী যুগ্ম পদার্থের নাম দ্বন্দ্ব। এই সবগুলির সংযোগ-বিয়োগে সর্বদা সমভাবে থাকা, এতে বিচলিত না হওয়া, মোহগ্রস্ত না হওয়া অর্থাৎ হর্ষ-বিষাদ, রাগ-দ্বেষাদিতে রহিত থাকাই হল এগুলিতে রহিত হওয়া।

প্রশ্ন—'**নিত্যসত্ত্ব**' কী এবং তাতে স্থিত হওয়া কাকে বলে ?

উত্তর—সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাই নিত্যসত্ত্ব-সত্য বস্তু ; সুতরাং নিত্য, অবিনাশী, সর্বজ্ঞ, পরম পুরুষ পরমেশ্বরের স্বরূপ নিত্য-নিরন্তর চিন্তা করে তাতে অটলভাবে স্থিত থাকাই নিত্য বস্তুতে স্থিত হওয়া।

প্রশ্ন—'**নিত্যসত্ত্বস্থঃ**'-এর অর্থ যদি নিরন্তর সত্ত্বগুণে স্থিত থাকা মেনে নেওয়া যায়, তাহলে কী ক্ষতি ?

উত্তর—তেমন অর্থও হতে পারে, তাতে ক্ষতির কোনো ব্যাপার নেই, কিন্তু উপরোক্ত অর্থে আরও ভালোভাবে নিহিত রয়েছে, কারণ কর্মযোগের অন্তিম পরিণামে সমস্ত গুণের অতীত হয়ে পরমাত্মাকে লাভ করার কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—'**যোগক্ষেম**' কাকে বলা হয়, অর্জুনকে নির্যোগক্ষেম হতে বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তিকে 'যোগ' বলা হয় এবং প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা করাকে বলা হয় '**ক্ষেম**'। সাংসারিক ভোগের কামনা ত্যাগ করে দেবার পরও শরীর-নির্বাহের জন্য মানুষের যোগক্ষেমের বাসনা থাকে। অতএব সেই বাসনা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করার জন্য অর্জুনকে 'নির্যোগক্ষেম' হতে বলা হয়েছে। এর অভিপ্রায় হল যে তুমি মমতা ও আসক্তিরহিত হও, কোনো বস্তুর আকাঙ্ক্ষাকারী বা বস্তু যেন বজায় থাকে—এরূপ ইচ্ছাও পোষণ করো না।

প্রশ্ন—'**আত্মবান্**' কাকে বলে এবং অর্জুনকে '**আত্মবান্**' হতে বলার অর্থ কী ?

উত্তর—ইন্দ্রিয়াদিসহ অন্তঃকরণ এবং শরীরের বাচক এখানে 'আত্মা' পদটি। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি যতক্ষণ মানুষের বশীভূত না হয়, পূর্ণ অধিকারে না আসে, সেগুলি তার শত্রু হয়ে থাকে, ততক্ষণ সে '**আত্মবান্**' হয় না। তাই যে নিজ, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি সম্পূর্ণ বশীভূত করেছে, তাকে '**আত্মবান্**' বলা উচিত। যার মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় বশীভূত নয়, তার 'সমত্বযোগ' লাভ কঠিন। যার মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি বশে থাকে, সে সাধন করলে সহজেই সমত্বযোগ লাভ করতে পারে। তাই ভগবান এখানে অর্জুনকে '**আত্মবান্**' হতে বলেছেন।

সম্বন্ধ—পূর্বশ্লোকে অর্জুনকে বলা হয়েছে যে সব বেদই ত্রিগুণের কার্য প্রতিপাদন করে এবং তুমি ত্রিগুণের কার্যরূপ সমস্ত ভোগ এবং তার সাধনে আসক্তিরহিত হও। এবার তার ফলস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের মহত্ত্ব জানাচ্ছেন—

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥ ৪৬

সর্বত্র পরিপূর্ণ জলাশয় প্রাপ্ত হলে ক্ষুদ্র জলাশয়ে মানুষের যে প্রয়োজন থাকে, ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণের সমস্ত বেদে ততটাই প্রয়োজন থাকে অর্থাৎ কোনো প্রয়োজন থাকে না॥ ৪৬

প্রশ্ন—এই শ্লোকে জলাশয়ের দৃষ্টান্তের দ্বারা কী বলা হয়েছে?

উত্তর—এই শ্লোকে জলাশয়ের দৃষ্টান্ত দিয়ে ভগবান জ্ঞানী মহাত্মাদের আত্যন্তিক তৃপ্তির বর্ণনা করেছেন। অভিপ্রায় হল যে, যে ব্যক্তি অমৃত সমান স্বাদু ও গুণকারী অথৈ জলপূর্ণ জলাশয়ের সন্ধান পেয়েছে, তার আর জলের জন্য কূপ, পুকুর ইত্যাদি ছোট জলাশয়ের প্রয়োজন নেই। তার জল সম্বন্ধীয় সমস্ত প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ হয়ে গেছে, তেমনই যে ব্যক্তি সমস্ত ভোগে মমত্ব, আসক্তি ত্যাগ করে সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাকে জেনে যায়, তার আনন্দলাভের জন্য বেদোক্ত কর্মাদির ফলরূপ ভোগাদিতে কোনো প্রয়োজন থাকে না। সে সর্বতোভাবে পূর্ণকাম ও নিত্যতৃপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং একরূপ স্থিতি লাভ করার জন্য মানুষের বেদোক্ত কর্মাদির ফলরূপ ভোগাদিতে মমতা, আসক্তি ও কামনা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে পূর্ণভাবে '**নিস্ত্রৈগুণ্য**' হয়ে যাওয়া উচিত।

প্রশ্ন—সর্বত্র পরিপূর্ণ জলাশয়ে মানুষের যত জলের প্রয়োজন, সে তত জল সেখান থেকে নিয়ে নেয়, তেমনই ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী বেদের অংশ গ্রহণ করেন—একরূপ অর্থ নেওয়াতে আপত্তি কীসের?

উত্তর—এরূপ অর্থও হতে পারে, এতে কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু উপরোক্ত অর্থের ভাব আরও সুন্দর, কারণ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তির জগৎ-সংসারে আর কোনোই প্রয়োজন থাকে না (৩।১৮)।

সম্বন্ধ—এইরূপ সমবুদ্ধিরূপ কর্মযোগের এবং তার ফলের মহত্ত্ব জানিয়ে এবার দুটি শ্লোকে ভগবান কর্মযোগের স্বরূপ জানিয়ে অর্জুনকে কর্মযোগে স্থিত হয়ে কর্ম করতে বলেছেন—

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি॥ ৪৭

তোমার কর্মেই অধিকার, তার ফলে নয়। তাই তুমি কর্মফলের হেতু হয়ো না আবার কর্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়॥ ৪৭

প্রশ্ন—'**কর্মণি**' পদটি এখানে কোন্ কর্মের বাচক এবং 'তোমার কর্মেই অধিকার', এই কথার দ্বারা কী ভাব দেখানো হয়েছে?

উত্তর—বর্ণ, আশ্রম, স্বভাব ও পরিস্থিতি অনুসারে যে মানুষের জন্য যে কর্ম বিহিত, '**কর্মণি**' পদটি এখানে তার বাচক। শাস্ত্রনিষিদ্ধ পাপকর্মাদির বাচক এই '**কর্মণি**' পদটি নয়। কারণ পাপকর্মে মানুষের অধিকার নেই, মানুষ রাগ-দ্বেষের বশীভূত হয়ে পাপকর্মে প্রবৃত্ত হয়, এসব তার অনধিকার চেষ্টা। তাই ঐসব কর্ম যারা করে তাদের নরক ভোগ করিয়ে দণ্ড প্রদান করা হয়। এখানে 'তোমার কর্ম করাতেই অধিকার' এই বলে ভগবান নিম্নলিখিত ভাব দেখিয়েছেন—

১) মনুষ্যদেহেই জীবকে নতুন কর্ম করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়, সুতরাং সে যদি নিজ অধিকার অনুযায়ী পরমেশ্বরের নির্দেশ পালন করতে থাকে এবং ঐ কর্মে এবং তার ফলে আসক্তি সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে সেইসব কর্মকেই পরমাত্মা লাভের সাধন করে তোলে, তাহলে সে সহজেই পরমাত্মাকে লাভ করতে পারে।

এখন তুমি মনুষ্য দেহ লাভ করেছ, তাই তোমার কর্মেই অধিকার। অতএব তোমার এই অধিকারের সদ্ব্যবহার করা উচিত।

২) মানুষের কাজ করাতেই অধিকার, তা বাস্তব ত্যাগ করায় সে স্বাধীন নয়। যদি সে অহংকারপূর্বক হটকারিতা করে কর্মাদি স্বরূপতঃ ত্যাগ করার চেষ্টাও করে তবুও সে তা সর্বভাবে ত্যাগ করতে পারে না (৩।৫), তার স্বভাবই তাকে জোর করে কর্মে ব্যাপৃত করে (৩।৩৩, ১৮।৫৯, ৬০)। এরূপ অবস্থায় তার দ্বারা সেই অধিকারের সঠিক উপযোগ হয় না এবং বিহিত কর্ম ত্যাগ করায় তাকে শাস্ত্র-নির্দেশ ত্যাগের দণ্ডও ভোগ করতে হয়। অতএব তোমার কর্তব্য-কর্ম অবশ্যই করা উচিত, সেগুলি কখনোই ত্যাগ করা উচিত নয়।

৩) সরকার যেমন লোকেদের আত্মরক্ষার জন্য বা প্রজারক্ষার জন্য নানাপ্রকার অস্ত্র তাদের কাছে রাখার ও প্রয়োগ করার অধিকার দেয় এবং সেই সময় সেগুলি ব্যবহারের নিয়মও জানিয়ে দেওয়া হয়, তারপর যদি কোনো ব্যক্তি সেই অধিকারের অন্যায় সুযোগ নেয়, তাকে তখন দণ্ড প্রদান করে তার অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়, তেমনই জীবকে জন্ম-মরণরূপ সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এবং অপরের হিতার্থে মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদিসহ এই মানব-দেহ দিয়ে এর দ্বারা নতুন-কর্ম করার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। অতএব যারা এই অধিকারের সদ্ব্যবহার করে, তারা কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরমপদ লাভ করে আর যারা সঠিক ব্যবহার করে না, তারা দণ্ডভাগী হয় এবং তাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয় অর্থাৎ তাদের পুনরায় শূকর-কুকুরাদি নীচ যোনিতে পাঠানো হয়। এই রহস্য জেনে মানুষের এই অধিকারের সুব্যবহার করা কর্তব্য।

প্রশ্ন—কর্মের ফলে তোমার কখনও অধিকার নেই, এই কথার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, মানুষ কর্মফল লাভ করতে কখনো কোনোভাবে স্বাধীন নয়। তার কোন্ কর্মের ফল কেমন হবে এবং সেই ফল সে কোন্ জন্মে, কীভাবে লাভ করবে, এসব সে নিজেও জানে না এবং সে তা নিজ ইচ্ছানুসারে সময়মতো পেতেও পারে না, কর্মফল ভোগ থেকে রক্ষাও পায় না। মানুষ চায় এক প্রকার আর হয় অন্য প্রকার। অনেক মানুষ নানাপ্রকার ভোগ করতে ইচ্ছা করে কিন্তু তার সুযোগ পাওয়া তার হাতের মধ্যে নেই। অনেকরকম সংযোগ-বিয়োগ মানুষ চায় না, কিন্তু তা হয়ে যায়। কর্মফলের বিধান করা সর্বতোভাবে বিধাতার অধীন, মানুষের কোনোরকম উপায় তাতে কার্যকরী হয় না। অবশ্য পুত্রেষ্টি ইত্যাদি শাস্ত্রীয় যজ্ঞানুষ্ঠান ভালোভাবে পূর্ণ হলে তার ফললাভের নিশ্চিত বিধান আছে এবং সকাম ব্যক্তি তা করতেও পারে ; কিন্তু তার এই বিহিত ফলও কর্ম-কর্তার অধীন নয়, দেবতারই অধীন। তাই এই প্রকার কামনা করা যে অমুক বস্তু, ধন-সম্পদ, মান-মর্যাদা, প্রতিষ্ঠা লাভ বা স্বর্গ ইত্যাদি আমি যেন লাভ করি—এ সবই এক প্রকারের অজ্ঞতা। তাছাড়া এ সব অত্যন্ত তুচ্ছ, স্বল্প কালস্থায়ী, অনিত্য পদার্থ। সুতরাং তোমার কোনো ফলের কামনা করা উচিত নয়।

প্রশ্ন—তাহলে কী মুক্তির কামনাও করা উচিত নয় ?

উত্তর—মুক্তির কামনা শুভেচ্ছা হওয়ায় মুক্তির সহায়ক ; যদিও এই ইচ্ছা না হওয়াই উত্তম। কিন্তু ভগবানের তত্ত্ব এবং মর্ম যথার্থভাবে না জানলে এই ইচ্ছাশূণ্য হওয়া এবং কর্তব্য-জ্ঞানে ঈশ্বরাজ্ঞা অনুসারে কোনো হেতু ছাড়াই কর্মাদির আচরণ করা অত্যন্ত কঠিন। অতএব মুক্তির কামনা করা অনুচিত নয়। মুক্তির ইচ্ছা না থাকলে শীঘ্রই মুক্তিলাভ হবে, এরূপ ভাব রাখলেও মুক্তির ইচ্ছা গোপন ভাবে পোষণ করা হয়।

প্রশ্ন—'কর্মফলের হেতু হওয়া' কী ? এবং অর্জুনকে কর্মফলের হেতু না হওয়ার জন্য বলার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা কৃত শাস্ত্রবিহিত কর্মে এবং তার ফলে মমতা, আসক্তি, বাসনা, আশা, স্পৃহা ও কামনা করাই হল কর্মফলের কারণ হওয়া। কারণ যে মানুষ উপরোক্ত প্রকারে কর্মে এবং তার ফলে আসক্ত হয়, সে-ই সেই কর্মের ফল লাভ করে, কর্মে এবং তার ফলে মমতা, আসক্তি ও কামনা সর্বতোভাবে পরিত্যাগকারীর কর্মফল ভোগ হয় না (১৮।১২)। তাই অর্জুনকে কর্মফলের হেতু না হওয়ার জন্য বলে ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে পরম শান্তি লাভের জন্য তুমি তোমার কর্তব্যকর্মগুলি মমতা, আসক্তি, কামনা ত্যাগ করে পালন করো।

প্রশ্ন— উপরোক্ত প্রকারে মমতা, আসক্তি, কামনা ত্যাগ করে কর্ম করে যে মানুষ, সে কি পাপকর্মফলেরও হেতু হয় না ?

উত্তর— উপরোক্ত প্রকারে কর্ম করে যারা, তারা কোনো প্রকার কর্মফলেরই হেতু হয় না। তাদের শুভ-অশুভ কোনো কর্মেই ফলপ্রদানের শক্তি থাকে না। কারণ আসক্তিই পাপকর্মের হেতু। তাই আসক্তি, মমতা, কামনা না থাকলে, তার দ্বারা নতুন কোনো পাপ হয় না এবং আগের কৃতকর্মের পাপ মমতা, আসক্তিরহিত কর্মের প্রভাবে ভস্ম হয়ে যায়। সেইজন্যই তারা আর পাপকর্মের হেতু হয় না এবং তারা শুভকর্মের ফল ত্যাগ করে, তাই তারও হেতু হয় না। এইভাবে যারা কর্ম করে, তাদের সমস্ত কর্ম বিলীন হয়ে যায় (৪।২৩) এবং তারা অনাময় পদ লাভ করে (২।৫১)।

প্রশ্ন— তোমার কর্ম না করাতেও যেন আসক্তি না হয়, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে, যেমন শাস্ত্রবিহিত কর্মের বিপরীত নিষিদ্ধ কর্ম করা হল কর্মাধিকারের অসদ্ব্যবহার, তেমনই বর্ণ, আশ্রম, স্বভাব ও পরিস্থিতি অনুসারে যার জন্য যা অবশ্য কর্তব্য, তা না করাও হল অধিকারের অসদ্ব্যবহার করা। বিহিত কর্মত্যাগ কোনোভাবেই ন্যায়সঙ্গত নয়। তাই মোহপূর্বক তা ত্যাগ করা তামস ত্যাগ (১৮।৭)। শারীরিক কষ্টের ভয়ে ত্যাগ করা রাজস ত্যাগ (১৮।৮)। বিহিত কর্মানুষ্ঠান না করলে মানুষ কর্মযোগে সিদ্ধিলাভও করে না (৩।৪)। সুতরাং কোনো কারণেই তোমার বিহিত কর্মানুষ্ঠান না করার আসক্তি হওয়া উচিত নয়।

সম্বন্ধ—উপরিউক্ত শ্লোকে বলা হয়েছে যে তুমি কর্মফলের হেতু হয়ো না এবং কর্ম না করার প্রতিও আসক্ত হয়ো না অর্থাৎ কর্মের ত্যাগ করা উচিত নয়। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে যে তাহলে কী প্রকারে কর্ম করা উচিত অর্থাৎ কর্ম-বিজ্ঞান কী ? তাই ভগবান বলেছেন—

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।। ৪৮

হে ধনঞ্জয় ! তুমি আসক্তি ত্যাগ করে এবং সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধিসম্পন্ন থেকে যোগস্থ হয়ে কর্তব্য-কর্ম করো। এই সমত্বকেই যোগ বলা হয় ॥ ৪৮

প্রশ্ন— সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম হলে স্বতঃই আসক্তি ত্যাগ হয়, তাহলে আবার আসক্তি ত্যাগ করার কথা বলার অর্থ কী ?

উত্তর—এই শ্লোকে ভগবান কর্মযোগের আচরণের প্রক্রিয়া জানিয়েছেন। কর্মযোগের সাধক যখন কর্ম ও তার ফলে আসক্তি পরিত্যাগ করেন, তখন তাঁর মধ্যে রাগ-দ্বেষ এবং তা থেকে উৎপন্ন হর্ষ-বিষাদ আদি স্বতঃই দূর হয় এবং তার ফলস্বরূপ তিনি সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম থাকেন। ঐ দোষগুলি থাকলে সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম থাকা যায় না এবং সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে অর্থাৎ কৃত-কর্মাদি পূর্ণ হওয়া বা না হওয়ায় ও তার অনুকূল-প্রতিকূল পরিণামে সমভাবে থাকার চেষ্টা থাকলে শেষে রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি থাকে না। এইরূপ আসক্তি ত্যাগ ও সমত্বের পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। দুটি পরস্পর একে অপরের সহায়ক হয়। তাই ভগবান এখানে আসক্তি পরিত্যাগ করে, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম হয়ে কর্ম করতে বলেছেন।

প্রশ্ন—সমত্বকেই যখন যোগ বলা হয়, তখন সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম হয়ে কর্ম করার অন্তর্গত যোগে স্থিত হওয়ার কথা স্বতঃই অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে পৃথকভাবে যোগে স্থিত হওয়ার কথা বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—কর্মের সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমত্ব রাখতে রাখতেই ক্রমশ মানুষের সমভাবে অটল স্থিতি হয় এবং

সমভাবে স্থির হয়ে থাওয়াই কর্মযোগের সীমা। তাই ভগবান এখানে যোগে স্থিত হয়ে কর্ম করার জন্য বলে এই ভাব দেখিয়েছেন যে, শুধুমাত্র সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমত্ব রাখলেই কাজ হবে না, প্রতিটি কর্ম করার সময়ও তোমার কোনো পদার্থ, কর্ম বা তার ফলে অথবা কোনো প্রাণীতে বিষমভাব না রেখে নিত্য সমভাবে স্থিত থাকা উচিত।

প্রশ্ন—'সমত্বকেই যোগ বলা হয়'—এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান 'যোগ' পদের পারিভাষিক অর্থ জানিয়েছেন। অর্থ হল যে, যোগ এখানে সমত্বেরই নাম এবং যে কোনো সাধন দ্বারা সমত্ব লাভ হলেই সে যোগী হয়। অতএব কর্মযোগী হওয়ার জন্য তোমার সমভাবে স্থিত হয়ে কর্ম করা উচিত।

সম্বন্ধ—এইভাবে কর্মযোগের প্রক্রিয়া জানিয়ে এবার সকামভাবের নিন্দা এবং সমভাবরূপ বুদ্ধিযোগের মহত্ত্ব প্রকটিত করে ভগবান তার আশ্রয় গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন—

দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯

এই সমত্বরূপ বুদ্ধিযোগের থেকে সকাম-কর্ম অত্যন্ত নিম্নমানের। তাই হে ধনঞ্জয় ! তুমি সমবুদ্ধির অর্থাৎ বুদ্ধিযোগের আশ্রয় নাও, কারণ যারা ফলের হেতু হয়ে কর্ম করে তারা অতি দীন ॥ ৪৯

প্রশ্ন—'**বুদ্ধিযোগাৎ**' পদটি এখানে কোন্ যোগের বাচক ? কর্মযোগের না জ্ঞানযোগের ?

উত্তর—মমতা, আসক্তি ও কামনা ত্যাগ করে সমবুদ্ধিপূর্বক যে কর্তব্য-কর্মের অনুষ্ঠান করা হয়, সেই কর্মযোগের রীতিকেই এখানে '**বুদ্ধিযোগাৎ**' নামে বলা হয়েছে। কারণ ঊনচল্লিশতম শ্লোকে '**যোগে ত্বিমাং শৃণু**' অর্থাৎ তুমি আমার কাছ থেকে এই বুদ্ধিযোগ শোন, এই কথা বলে ভগবান কর্মযোগের বর্ণনা আরম্ভ করেছেন। সেইজন্য এখানে '**বুদ্ধিযোগাৎ**' পদটিকে 'জ্ঞানযোগ' মেনে নেওয়ার কোনো অবকাশ নেই। এছাড়া এখানে ফলাকাঙ্ক্ষীদের কৃপণ বলা হয়েছে। পরের শ্লোকে বুদ্ধিযুক্ত পুরুষের প্রশংসা করে অর্জুনকে কর্মযোগের নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন যে বুদ্ধিযুক্ত মানুষ কর্মফল ত্যাগ করে 'অনাময়' পদ প্রাপ্ত হন (২।৫১)। সেইজন্যই এখানে '**বুদ্ধিযোগাৎ**' পদের প্রকরণ বিরুদ্ধ 'জ্ঞানযোগ' অর্থ মেনে নেওয়া যায় না। কারণ জ্ঞানযোগীদের জন্য এই কথা খাটে না যে তাঁরা কর্মফল ত্যাগ করে অনাময় পদ প্রাপ্ত হন, তাঁরা তো নিজেদের কর্মের কর্তা বলেই মনে করেন না, তাহলে আর তাঁদের জন্য ফলত্যাগের কথা কী করে বলা যায় ?

প্রশ্ন—বুদ্ধিযোগের থেকে সকাম কর্মকে অত্যন্ত নিম্নশ্রেণী বলার অর্থ কী এবং এখানে 'কর্ম' পদের অর্থ নিষিদ্ধ কর্ম ধরা হলে আপত্তি কেন ?

উত্তর—সকাম কর্মকে বুদ্ধিযোগের থেকে অত্যন্ত হীন বলে ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে সকাম কর্মের ফল হল বিনাশশীল ক্ষণিক সুখের প্রাপ্তি আর কর্মযোগের ফল পরমাত্মাপ্রাপ্তি। সুতরাং এই দুইয়েতে রাতদিনের পার্থক্য। এখানে 'কর্ম' পদের অর্থ নিষিদ্ধ কর্ম মনে করা যায় না ; কারণ সেগুলি সর্বতোভাবেই ত্যাজ্য এবং তার ফল মহাদুঃখদায়ক। তাই তার তুলনা বুদ্ধিযোগের মহত্ত্ব দেখানোর জন্য করা যায় না।

প্রশ্ন—'**বুদ্ধৌ**' পদটি কীসের বাচক এবং অর্জুনকে কেন তার আশ্রয় গ্রহণ করতে বলা হয়েছে ?

উত্তর—যে সমবুদ্ধির প্রকরণ চলছে, এখানে '**বুদ্ধৌ**' পদটি তারই বাচক। তার আশ্রয় গ্রহণের কথা বলে ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে, ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, শয়ন-জাগরণ এবং নানা কর্ম করার সময়ও তুমি নিরন্তর সমভাবে অবস্থিত থাকার চেষ্টা করো, এটিই কল্যাণ প্রাপ্তির সহজ উপায়।

প্রশ্ন—কর্মফলের হেতু যারা হয়, তারা অত্যন্ত দীন, এই কথার কী অর্থ ?

উত্তর—এর দ্বারা এই ভাব দেখানো হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কর্মে ও তার ফলে মমতা, আসক্তি ও কামনা পোষণ করে কর্মফলপ্রাপ্তির কারণ হয়, সে দীন অর্থাৎ দয়ার পাত্র ; সেইজন্য তোমার এরূপ হওয়া উচিত নয়।

সম্বন্ধ—এইভাবে অর্জুনকে সমতার আশ্রয় গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়ে এবার দুটি শ্লোকে সেই সমত্বরূপ বুদ্ধিযুক্ত মহাপুরুষদের প্রশংসা করে ভগবান অর্জুনকে কর্মযোগের অনুষ্ঠান করার জন্য পুনরায় নির্দেশ দিয়ে তার ফল জানিয়েছেন—

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্॥ ৫০

সমত্ববুদ্ধিযুক্ত পুরুষ পাপ ও পুণ্য—উভয়ই ইহলোকে পরিত্যাগ করেন অর্থাৎ এগুলি থেকে মুক্তিলাভ করেন। তাই তুমি সমত্বযোগের আশ্রয় নাও। এই সমত্বরূপ যোগই হল কর্মের কৌশল অর্থাৎ কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি লাভের উপায়॥ ৫০

প্রশ্ন—'সমত্ব বুদ্ধিযুক্ত পুরুষ ইহলোকেই পাপ ও পুণ্য উভয়কেই পরিত্যাগ করেন' এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর মর্ম এই যে, জন্ম-জন্মান্তরে এবং এই জন্মে যত পুণ্য ও পাপকর্ম সংস্কাররূপে অন্তঃকরণে সঞ্চিত থাকে, সমবুদ্ধিসম্পন্ন কর্মযোগী সেই সমস্ত কর্ম ইহলোকেই ত্যাগ করেন—অর্থাৎ এই বর্তমান জন্মেই তিনি সে সমস্ত কর্ম থেকে মুক্তি লাভ করেন। তাঁর সেই সব কর্মের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ থাকে না। তাই তাঁর কর্ম পুনর্জন্মরূপ ফল প্রদান করে না। কারণ নিঃস্বার্থভাবে শুধুমাত্র লোকহিতার্থে করা কর্মের দ্বারা তাঁর সমস্ত কর্ম বিলীন হয়ে যায় (৪।২৩)। এইভাবে তার কৃত পুণ্য ও পাপকর্মও পরিত্যক্ত হয়। কারণ পাপকর্ম স্বভাবতই তার দ্বারা পরিত্যক্ত হয় আর শাস্ত্রবিহিত পুণ্যকর্মে ফলাসক্তি ত্যাগ হওয়ায় সেই সকল কর্ম 'অকর্ম' হয়ে ওঠে (৪।২০), অতএব বলতে গেলে সেগুলিরও একপ্রকার ত্যাগ হয়।

প্রশ্ন—'অতএব তুমি সমত্বরূপ যোগ পালনে নিযুক্ত হও' এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে সমবুদ্ধিযুক্ত যোগী জীবন্মুক্ত হয়ে যান, তাই তোমারও সেরূপ হতে হবে।

প্রশ্ন—'এই সমত্বরূপ যোগই কর্মের কুশলতা'—এই কথার রহস্য কী ?

উত্তর—এর তাৎপর্য এই যে কর্ম স্বাভাবিকভাবে মানুষকে বন্ধনে আবদ্ধ করে এবং কর্ম না করে কোনো মানুষ থাকতে পারে না, কিছু না কিছু তাকে করতেই হয়। এরূপ অবস্থায় কর্ম থেকে মুক্তির লাভের সব থেকে বড় যুক্তি হল সমত্বযোগ। এই সমবুদ্ধিপূর্বক কর্ম করেন যে ব্যক্তি, তিনি এর প্রভাবে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হন। তাই কর্মে যোগই 'কুশলতা'। সাধন-কালে সমবুদ্ধিপূর্বক কর্ম করার চেষ্টা করা হয় এবং সিদ্ধাবস্থায় সমত্বে পূর্ণ স্থিতিলাভ হয়।

কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥ ৫১

কারণ সমবুদ্ধিসম্পন্ন জ্ঞানীগণ কর্ম থেকে উৎপন্ন হওয়া ফল ত্যাগ করে জন্মরূপ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নির্বিকার পরমপদ প্রাপ্ত হন॥ ৫১

প্রশ্ন—'হি' পদের অর্থ কী ?

উত্তর—'হি' পদটি হেতুবাচক। এটি প্রয়োগ করে সমবুদ্ধিসহকারে কর্ম করা কেন কুশল, তা এই শ্লোকে দেখানো হয়েছে।

প্রশ্ন—'বুদ্ধিযুক্তাঃ' পদ কীসের বাচক এবং তাকে 'মনীষিণঃ' বলার অর্থ কী ?

উত্তর—পূর্বের বর্ণনা অনুসারে যাঁরা সমবুদ্ধিসম্পন্ন অর্থাৎ সমভাবে অটল স্থিতিসম্পন্ন সেই কর্মযোগীদের এখানে 'বুদ্ধিযুক্তাঃ' বলা হয়েছে। তাঁদের 'মনীষিণঃ' বলার তাৎপর্য হল, যাঁরা এইভাবে সমভাবে যুক্ত হয়ে নিজেদের মনুষ্যজন্ম সার্থক করেছেন, তাঁরাই বাস্তবে বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী ; আর যাঁরা সাক্ষাৎ মুক্তি লাভের সুবর্ণ সুযোগ স্বরূপ এই মনুষ্যদেহ লাভ করেও ভোগে আবদ্ধ থাকেন, তাঁরা বুদ্ধিমান নয় (৫।২২)।

প্রশ্ন—এই বুদ্ধিযুক্ত (সমবুদ্ধিসম্পন্ন) মানুষদের কর্মদ্বারা উৎপন্ন ফলত্যাগ করে জন্মরূপ বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার তাৎপর্য কী ?

উত্তর—সমত্বরূপ যোগপ্রভাবে তাঁদের জন্ম-জন্মান্তরে এবং ইহজন্মে কৃত সমস্ত কর্মের ফল থেকে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হয়ে জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে চিরকালের মতো মুক্তিলাভ হয়—এটিই হল তাঁদের কর্ম থেকে উৎপন্ন হওয়া ফলত্যাগ করে জন্ম-বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করা। কারণ ত্রিগুণের কার্যরূপ জাগতিক পদার্থে আসক্তিই হল পুনর্জন্মের কারণ (১৩।২১), তার সেই আসক্তি না থাকায় তাদের আর পুনর্জন্ম হয় না।

প্রশ্ন—এরূপ ব্যক্তিদের নির্বিকার (অনাময়) পরম পদ প্রাপ্ত হওয়ার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—যেখানে রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি ক্লেশ (কষ্ট) শুভাশুভ কর্ম, হর্ষ-বিষাদাদি বিকার কিংবা এ জাতীয় কোনো বৈকল্য থাকে না, যা এই প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্য থেকে সর্বতোভাবে অতীত এবং সর্বতোভাবে ভগবানের থেকে অভিন্ন সাক্ষাৎ ভগবানের পরমধাম এবং যেখানে পৌঁছলে মানুষ আর ফিরে আসে না, সেই পরমধামকে বলা 'অনাময় পদ'। সুতরাং ভগবানের পরমধাম লাভ করা, সচ্চিদানন্দঘন নির্গুণ-নিরাকার বা সগুণ-সাকার পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া, পরমগতি লাভ করা বা অমৃতত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া এ সবই প্রকৃতপক্ষে একই ব্যাপার। বাস্তবে এতে কোনো পার্থক্য নেই, পার্থক্য শুধু সাধকের মান্যতায় অর্থাৎ ধারণায়।

সম্বন্ধ—ভগবান কর্মযোগের মাধ্যমে অনাময় পদপ্রাপ্তির কথা বলেছেন ; তাতে অর্জুনের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে আমার কবে এবং কীভাবে অনাময় পদ প্রাপ্তি হবে ? তার জন্য ভগবান দুটি শ্লোকে বলেছেন—

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥ ৫২

যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ কর্দম ভালোভাবে অতিক্রম করবে তখন তুমি ইহলোক ও পরলোক সম্পর্কীয় সমস্ত শ্রুত ও শ্রোতব্য ভোগে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হবে॥ ৫২

প্রশ্ন—'মোহকলিল' কী ? তার থেকে বুদ্ধিকে ভালোভাবে অতিক্রম করা কাকে বলে ?

উত্তর—স্বজন-বান্ধব বধের আশঙ্কায় স্নেহবশতঃ অর্জুনের হৃদয়ে যে মোহ উৎপন্ন হয়েছিল, যাকে এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে 'কশ্মল' বলা হয়েছে, এখানে 'মোহকলিল' তাকেই লক্ষ্য করে। এই 'মোহকলিল'-এর কারণেই অর্জুন 'ধর্মসম্মূঢ়চেতাঃ' হয়ে নিজ কর্তব্য স্থির করতে অসমর্থ হয়েছিলেন। এই 'মোহকলিল' এক প্রকারের আবরণযুক্ত 'মল' দোষ ; এটি বুদ্ধিকে স্থিরভূমিতে উত্তীর্ণ না করে নিজেতেই আবদ্ধ রাখে।

সৎসঙ্গ দ্বারা উৎপন্ন বিবেক দ্বারা নিত্য-অনিত্য ও কর্তব্য-অকর্তব্য স্থির করে মমতা, আসক্তি ও কামনা ত্যাগ করে ভগবৎপরায়ণ হয়ে নিষ্কামভাবে কর্ম করলে আবরণযুক্ত মলদোষ সর্বতোভাবে নাশ হয়, একেই বলা

হয় মোহরূপ কলিল পার করা।

প্রশ্ন—'**শ্রুত**' এবং '**শ্রোতব্য**'—এই দুটি শব্দ কেন উদ্ধৃত হয়েছে ? তার থেকে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হওয়া কাকে বলে ?

উত্তর—ইহলোক ও পরলোকের যত ভোগ এবং ঐশ্বর্য আজ পর্যন্ত দেখা, শোনা ও অনুভবে (ভোগ করা) এসেছে সেগুলিকে বলা হয় '**শ্রুত**' এবং ভবিষ্যতে যা দেখা, শোনা ও অনুভব (ভোগ) করা যাবে, তাকে '**শ্রোতব্য**' বলা হয়। সেসবগুলিকে দুঃখের কারণ এবং অনিত্য মনে করে তাতে যে আসক্তির সম্পূর্ণ অভাব হয়, তাকেই বলা হয় বৈরাগ্য লাভ। ভগবান বলেছেন যে মোহনাশ হলে যখন তোমার বুদ্ধি সম্যকভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় পৌঁছবে, তখন তোমার ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত (ক্ষণিক) পদার্থে বৈরাগ্য হবে।

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি॥ ৫৩

নানা কথার দ্বারা বিচলিত তোমার বুদ্ধি যখন পরমাত্মাতে অটল ও স্থির হবে, তখন তুমি যোগপ্রাপ্ত হবে অর্থাৎ পরমাত্মার সঙ্গে তোমার নিত্য সংযোগ স্থাপিত হবে॥ ৫৩

প্রশ্ন—'**শ্রুতিবিপ্রতিপন্না বুদ্ধি**' কথাটির স্বরূপ কী ?

উত্তর—ইহলোক ও পরলোকের ভোগৈশ্বর্য (ভোগ-ঐশ্বর্য) এবং তার প্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে নানাপ্রকার কথা শুনে বুদ্ধিতে বিক্ষিপ্ততা আসে ; সেইজন্য তা এক সিদ্ধান্তে অটল হয়ে থাকতে পারে না, কখনো একটি বিষয় ভালো লাগে আবার কিছুক্ষণ পরেই অন্য বিষয়ে আকর্ষণ হয়। এরূপ বিক্ষিপ্ত এবং অনিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকে এখানে 'শ্রুতিবিপ্রতিপন্না বুদ্ধি' বলা হয়েছে। এটি হল বুদ্ধির বিক্ষেপ দোষ।

প্রশ্ন—তার (বুদ্ধির) পরমাত্মাতে অচল ও স্থির থাকা কাকে বলে ?

উত্তর—মোহরূপ কর্দম অতিক্রম করে ইহলোক ও পরলোকের ভোগ থেকে সর্বতোভাবে বিমুখ হলে বুদ্ধি বিক্ষেপদোষরহিত হয়ে একমাত্র পরমাত্মাতেই স্থায়ীভাবে নিশ্চল হয়। সেইরূপ বুদ্ধিকে লক্ষ্য করে এখানে বলা হয়েছে সেটি পরমাত্মাতে অটল ও স্থির ভাবে অবস্থান করে।

প্রশ্ন—তখন '**যোগ**' লাভ হয়—একথার তাৎপর্য কী ?

উত্তর—'যোগ' শব্দটি এখানে পরমাত্মার সঙ্গে নিত্য ও পূর্ণ সংযোগের বাচক। কারণ এ হল মল, বিক্ষেপ ও আচরণ দোষরহিত বিবেক বৈরাগ্য সম্পন্ন ও পরমাত্মাতে নিশ্চলরূপে স্থিত বুদ্ধির ফল এবং তখনই অর্জুন পরমাত্মপ্রাপ্ত স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষদের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করেছেন, এর দ্বারাও সেটিই প্রমাণিত হয়।

প্রশ্ন—পঞ্চাশতম শ্লোকে যোগের অর্থ সমত্ব বলা হয়েছিল আর এখানে সেটিকে পরমাত্মা প্রাপ্তির বাচক মানা হয়েছে ; এর তাৎপর্য কী ?

উত্তর—ওখানে যোগরূপ সাধনার জন্য চেষ্টা করার কথা বলা হয়েছে, আর এখানে 'স্থিরবুদ্ধি' লাভের পর ফলরূপে প্রাপ্ত যোগের (সমত্বের) কথা বলা হয়েছে। তাই এখানে 'যোগ' শব্দটিকে পরমাত্মাপ্রাপ্তির বাচক বলে মানা হয়েছে। গীতায় 'যোগ' এবং 'যোগী' শব্দটি প্রসঙ্গ অনুসারে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন—

যোগ

১) **কর্মযোগ**—ষষ্ঠ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে যোগারূঢ় হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের জন্য কর্তব্য পালনরূপে কর্ম করার কথা বলা হয়েছে, তাই যোগ শব্দটি কর্মযোগের বাচক।

২) **ধ্যানযোগ**—ষষ্ঠ অধ্যায়ের উনিশতম শ্লোকে বায়ুরহিত স্থানে স্থিত প্রদীপের শিখার ন্যায় চিত্তের অত্যন্ত স্থিরতা বর্ণনা হওয়ায় এখানে 'যোগ' শব্দ ধ্যানযোগের বাচক।

৩) **সমত্বযোগ**—দ্বিতীয় অধ্যায়ের আটচল্লিশতম শ্লোকে যোগে স্থিত হয়ে আসক্তিরহিত এবং সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধি হয়ে কর্ম করার নির্দেশ হওয়ায় এখানে 'যোগ' শব্দটি সমত্বযোগের বাচক।

৪) **ভগবৎ প্রভাবরূপযোগ**—নবম অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে আশ্চর্যজনক প্রভাব দেখানোর বর্ণনা থাকায় এটি শক্তি অথবা প্রভাবের বাচক।

৫) **ভক্তিযোগ**—চতুর্দশ অধ্যায়ের ছাব্বিশতম শ্লোকে নিরন্তর অব্যভিচাররূপে ভজন করার উল্লেখ হওয়ায় এখানে 'যোগ' শব্দটি ভক্তিযোগের বাচক। এখানে স্পষ্টভাবেই ভক্তিযোগের উল্লেখ রয়েছে।

৬) **অষ্টাঙ্গযোগ**—চতুর্থ অধ্যায়ের আঠাশতম শ্লোকে 'যোগ' শব্দের অর্থ 'সাংখ্যযোগ' বা 'কর্মযোগ' নেওয়া যায় না ; কারণ এই দুটি শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। এখানে যজ্ঞের নামে যে সাধনসমূহের বর্ণনা আছে, তা সবই এই দুটি যোগের অন্তর্গত। তাই 'যোগ' শব্দের অর্থ 'অষ্টাঙ্গযোগ' নেওয়াই যথার্থ বলে মনে হয়।

৭) **সাংখ্যযোগ** —ত্রয়োদশ অধ্যায়ের চব্বিশতম শ্লোকে সাংখ্যযোগের বিশেষণের রূপে বর্ণনা থাকায় সাংখ্যযোগের বাচক। তেমনই অন্য স্থানেও প্রসঙ্গানুসারে বুঝে নিতে হবে।

যোগী

১) **ঈশ্বর**—অধ্যায় ১০।১৭—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্বোধন হওয়ায় এখানে 'যোগী' শব্দ ঈশ্বরের বাচক।

২) **আত্মজ্ঞানী**—অধ্যায় ৬।৩২—নিজের মতো সকলকে দেখার বর্ণনা হওয়ায় এখানে 'যোগী' শব্দ আত্মজ্ঞানীর বাচক।

৩) **সিদ্ধ ভক্ত**—অধ্যায় ১২।১৪—পরমাত্মাতে মন, বুদ্ধি অর্পিত উক্ত হওয়ায় এবং 'মদ্ভক্তে'র বিশেষণ হওয়ায় এখানে 'যোগী' শব্দ সিদ্ধ ভক্তের বাচক।

৪) **কর্মযোগী**—অধ্যায় ৫।১১—আসক্তি ত্যাগ করে আত্মশুদ্ধির জন্য কর্ম করার কথা বলায় এখানে 'যোগী' শব্দ কর্মযোগীর বাচক।

৫) **সাংখ্যযোগী**—অধ্যায় ৫।২৪—অভেদরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্তি এর ফল হওয়ায় এটি সাংখ্যযোগীর বাচক।

৬) **ভক্তিযোগী**—অধ্যায় ৮।১৪—অনন্য চিত্তে নিত্য-নিরন্তর ভগবানের স্মরণ উল্লেখ হওয়ায় এখানে 'যোগী' শব্দ ভক্তিযোগীর বাচক।

৭) **সাধকযোগী**—অধ্যায় ৬।৪৫—প্রযত্ন দ্বারা পরমগতি প্রাপ্তির উল্লেখ হওয়ায় এখানে 'যোগী' শব্দ সাধকযোগীর বাচক।

৮) **ধ্যানযোগী**—অধ্যায় ৬।২০—একান্ত স্থানে অবস্থান করে মনকে একাগ্র করে আত্মাকে পরমাত্মাতে যুক্ত করার প্রেরণা হওয়ায় এখানে 'যোগী' শব্দ ধ্যানযোগীর বাচক।

৯) **সকামকর্মী**—অধ্যায় ৮।২৫—ফিরে আসার উল্লেখ হওয়ায় এখানে 'যোগী' শব্দ সকামকর্মীর বাচক।

সম্বন্ধ—পূর্বশ্লোকে ভগবান বলেছেন যে তোমার বুদ্ধি যখন মোহরূপ কর্দম চিরতরে অতিক্রম করবে এবং তুমি ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত ভোগে বৈরাগ্য লাভ করবে এবং তোমার বুদ্ধি পরমাত্মাতে নিশ্চলভাবে স্থিত হবে তখন তুমি পরমাত্মাকে লাভ করবে। একথা শোনার পর অর্জুন পরমাত্মাকে প্রাপ্ত স্থিতপ্রজ্ঞ সিদ্ধযোগীর লক্ষণ এবং আচরণ জানার জন্য জিজ্ঞাসা করছেন—

অর্জুন উবাচ

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥ ৫৪

অর্জুন বললেন—**হে কেশব ! সমাধিতে স্থিত পরমাত্মাকে প্রাপ্ত স্থিরবুদ্ধি পুরুষের লক্ষণ কী ? সেই স্থিতধী পুরুষ কীভাবে কথা বলেন, কীরূপে অবস্থান করেন এবং কীভাবে চলেন ? ৫৪**

প্রশ্ন—এখানে '**কেশব**' সম্বোধনের অর্থ কী ?

উত্তর—ক, অ, ঈশ এবং ব—এই চার অক্ষর মিলে '**কেশব**' পদ হয়। অতএব ক-ব্রহ্মা, অ-বিষ্ণু, ঈশ-শিব—এই তিনটি যাঁর ব-বপু অর্থাৎ স্বরূপ, তাঁকে কেশব

বলা হয়। এখানে অর্জুন ভগবানকে **'কেশব'** নামে সম্বোধিত করে এই ভাব দেখিয়েছেন যে আপনি সমস্ত জগতের সৃজন, সংরক্ষণ এবং সংহারকারী, সর্বশক্তিমান সাক্ষাৎ সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর ; সুতরাং আপনিই আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম।

প্রশ্ন— 'স্থিতপ্রজ্ঞস্য' পদটির সঙ্গে **'সমাধিস্থস্য'** বিশেষণ প্রয়োগের কী তাৎপর্য ?

উত্তর — পূর্বশ্লোকে ভগবান অর্জুনকে বলেছিলেন যে, তোমার বুদ্ধি যখন সমাধিতে অর্থাৎ পরমাত্মাতে অচলভাবে স্থির হয়ে যাবে, তখন তুমি যোগপ্রাপ্ত হবে। সেইজন্য অর্জুন এখানে ভগবানের কাছে সেই পুরুষের লক্ষণ জানতে চেয়েছেন, যিনি পরমাত্মাকে লাভ করেছেন এবং যাঁর বুদ্ধি পরমাত্মাতে চিরতরে অচল ও স্থির হয়েছে। এই ভাবটি স্পষ্ট করার জন্য **'স্থিতপ্রজ্ঞস্য'**র সঙ্গে **'সমাধিস্থস্য'** বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন — উপরোক্ত অবস্থা পরমাত্মাপ্রাপ্ত সিদ্ধ-পুরুষের অক্রিয়া-অবস্থা বলে মানা উচিত না সক্রিয়-অবস্থা ?

উত্তর—উভয় অবস্থাই মানা উচিত। অর্জুনও এখানে উভয়ের কথাই জানতে চেয়েছেন— **'কিং প্রভাষেত'** এবং **'কিং ব্রজেত'** দ্বারা সক্রিয়ের আর **'কিমাসীত'** পদটির দ্বারা অক্রিয়ের অবস্থা জানতে চেয়েছেন।

প্রশ্ন—**'ভাষা'** শব্দটির অর্থ 'বাণী' না করে 'লক্ষণ' কেন ধরা হল ?

উত্তর— স্থিরবুদ্ধি পুরুষের বাণীর বিষয়ে **'কিং প্রভাষেত'** অর্থাৎ তিনি কীভাবে বলেন—এইরূপ পৃথক প্রশ্ন করা হয়েছে, সেইজন্য এখানে **'ভাষা'** শব্দের অর্থ 'বাণী' না করে **'ভাষ্যতে কথ্যতে অনয়া ইতি ভাষা'** যার সাহায্যে বস্তুর স্বরূপ বলা হয়, সেই লক্ষণের নাম 'ভাষা'—এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'ভাষা'র অর্থ লক্ষণ করা হয়েছে। প্রচলিত ভাষাতেও 'পরিভাষা' শব্দ লক্ষণেরই পর্যায়। সেই অর্থেই এখানে **'ভাষা'** পদটির প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তি কীভাবে বলেন, কীভাবে বসেন, কীভাবে চলেন ? এই প্রশ্নে কি সাধারণভাবে বলা, বসা এবং চলার কথা বলা হয়েছে না কি এতে কিছু বিশেষত্বের ইঙ্গিত আছে ?

উত্তর— পরমাত্মা যাঁরা লাভ করেছেন সেই সকল সিদ্ধ পুরুষের সমস্ত কথাতেই বিশেষত্ব থাকে ; সুতরাং তাঁদের সাধারণভাবে বলা, বসা এবং চলাতেও বৈশিষ্ট থাকে। কিন্তু এখানে সাধারণভাবে বলা, বসা বা চলার কথা বলা হয়নি ; এখানে বলার অর্থ—তাঁর কথা মনের কোন্ ভাব দ্বারা ভাবিত ? বসার অর্থ— ব্যবহাররহিত অবস্থায় তাঁর অবস্থা কীরূপ হয় ? আর চলার অর্থ—তাঁর আচরণ কেমন হয় ?

সম্বন্ধ—পূর্বশ্লোকে অর্জুন পরমাত্মাপ্রাপ্ত সিদ্ধ যোগীদের বিষয়ে চারটি কথা জানতে চেয়েছেন। সেই চারটি কথার উত্তর ভগবান অধ্যায়ের সমাপ্তি পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে কথাপ্রসঙ্গে অন্য বিষয়ও বলেছেন। পরবর্তী শ্লোকে তিনি অর্জুনের প্রথম প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥ ৫৫

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে অর্জুন ! যোগী যখন মন থেকে সমস্ত কামনা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করেন এবং আত্মা কর্তৃক আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, তখন তাঁকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়॥ ৫৫

প্রশ্ন —**'সর্বান্'** বিশেষণের সঙ্গে **'কামান্'** পদটি কীসের বাচক ? আর সেটি সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করা কাকে বলে ?

উত্তর—ইহলোক ও পরলোকের কোনো পদার্থের সংযোগ বা বিয়োগের ফলে মানুষের হৃদয়ে যে কোনো কারণে যে কোনো প্রকারের মন্দ বা তীব্র কামনা উদ্রেক

হওয়াকে এখানে 'সর্বান্' বিশেষণের সঙ্গে 'কামান্' পদটির দ্বারা লক্ষ্য করা হয়েছে। এটির বাসনা, স্পৃহা, ইচ্ছা ও তৃষ্ণা ইত্যাদি অনেক বিভেদ আছে। এই সবগুলি থেকে চিরকালের মতো রহিত হয়ে যাওয়াই হল সেগুলি সর্বতোভাবে ত্যাগ করা।

প্রশ্ন—বাসনা, স্পৃহা, ইচ্ছা ও তৃষ্ণাতে পার্থক্য কী ?

উত্তর—শরীর, স্ত্রী, পুত্র, ধন, মান, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি অনুকূল পদার্থ বজায় রাখার এবং প্রতিকূল পদার্থ নষ্ট হওয়ার যে রাগ-দ্বেষ-জনিত সূক্ষ্ম কামনা থাকে, যা অন্তরে অবদমিত থাকায় সহসা ধরা পড়ে না, তাকে 'বাসনা' বলা হয়। কোনো অনুকূল বস্তুর অভাব বোধ হলে যখন চিত্তে এরূপ ভাব হয় যে অমুক বস্তুর প্রয়োজনীতা আছে, সেটি ছাড়া কাজ চলবে না—এই অপেক্ষারূপ কামনার নাম স্পৃহা। এটি কামনা-বাসনার বিকশিত রূপ। যে অনুকূল বস্তুর অভাব হয়, সেটি লাভ করার এবং প্রতিকূল অবস্থা দূরীভূত করার বা না আসার প্রকট কামনার নাম 'ইচ্ছা'। এই কামনার পূর্ণ বিকশিত রূপ এবং স্ত্রী, পুত্র, ধন ইত্যাদি পদার্থ যথেষ্ট থাকলেও আরও বেশি পাবার যে ইচ্ছা, তাকে বলা হয় 'তৃষ্ণা'। এটি কামনার অত্যন্ত স্থূল রূপ।

প্রশ্ন—এখানে 'কামান্'-এর সঙ্গে 'মনোগতান্' বিশেষণ দেওয়ার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা এই ভাব দেখানো হয়েছে যে কামনার বাসস্থান হল মন (৩।৪০) ; অতএব বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন মন পরমাত্মাতে অটল স্থির হয়ে যায়, তখন এই সব কামনা সর্বতোভাবে দূর হয়। তাই বুঝতে হবে যে যতক্ষণ সাধকের মনে অবস্থিত কামনাগুলি সর্বদা দূরীভূত না হয়, ততক্ষণ তার বুদ্ধি স্থির হয় না।

প্রশ্ন—আত্মাতে আত্মার সন্তুষ্ট থাকা কাকে বলে ?

উত্তর—অন্তরে স্থিত সমস্ত কামনা চিরতরে দূর হয়ে যাওয়ার পর সমস্ত দৃশ্য জগৎ থেকে সর্বতোভাবে অতীত নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ পরমাত্মার যথার্থ স্বরূপ প্রত্যক্ষ করে তাতেই নিত্যতৃপ্ত হয়ে যাওয়া —একেই বলে আত্মাতে আত্মার সন্তুষ্ট থাকা। তৃতীয় অধ্যায়ের সতেরোতম শ্লোকেও মহাপুরুষদের লক্ষণে আত্মাতেই তৃপ্তি এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকার কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—ঐ সময় তাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে কর্মযোগের পালন করতে করতে যখন যোগী উপরিউক্ত স্থিতি লাভ করেন, তখন বুঝতে হবে যে তাঁর বুদ্ধি পরমাত্মাতে অটল স্থিতিলাভ করেছে, অর্থাৎ সেই যোগীর ঈশ্বর লাভ হয়েছে।

সম্বন্ধ—স্থিতপ্রজ্ঞের বিষয়ে অর্জুন চারটি কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তার মধ্যে প্রথম প্রশ্নটি এতো ব্যাপক যে তার পরের তিনটি প্রশ্ন এর অর্ন্তভুক্ত হয়ে যায়। এই দৃষ্টিতে দেখলে অধ্যায়ের সমাপ্তি পর্যন্ত সেই একই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অন্য তিনটি প্রশ্নের পার্থক্য বোঝাবার জন্য এবার দুটি শ্লোকে 'স্থিতপ্রজ্ঞ কী করে' এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর বর্ণিত হয়েছে—

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥ ৫৬

দুঃখে অনুদ্বিগ্ন চিত্ত, সুখে স্পৃহাহীন এবং আসক্তি, ভয় ও ক্রোধরহিত মুনিকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়॥ ৫৬

প্রশ্ন—'দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ' কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা স্থিরবুদ্ধি মানুষের হৃদয়ে উদ্বেগের সর্বতোভাবে অভাব দেখানো হয়েছে। অর্থ হল যে যার বুদ্ধি পরমাত্মার স্বরূপে অচল ও স্থির হয়ে যায়, সেই পরমাত্মাপ্রাপ্ত মহাপুরুষ সাধারণ দুঃখে তো নয়ই, অত্যন্ত ভয়ানক দুঃখ-কষ্টেও তাঁকে বিচলিত হতে দেখা যায় না (৬।২২)। অস্ত্রাঘাতে আহত হওয়া, অতি শীত-গ্রীষ্ম ও বর্ষায় শারীরিক কষ্ট, রোগজনিত ব্যথা, অতি প্রিয় ব্যক্তির

আকস্মিক বিয়োগ, অকারণে জগতে মহা অপমান ও নিন্দা, এছাড়াও আরও যেসব ভয়ানক দুঃখের কারণ আছে, সেসব একত্র উপস্থিত হলেও তাঁর মনে বিন্দুমাত্র উদ্বেগ সৃষ্টি করতে পারে না। তাইজন্য তাঁর বাক্যেও কোনো উদ্বেগ থাকে না। যদি লোকমর্যাদার জন্য তাঁর শরীর বা বাক্যে কোনো উদ্বেগের লক্ষণ দেখা যায়, তা বাস্তবে উদ্বেগ নয়।

প্রশ্ন—**'সুখেষু বিগতস্পৃহঃ'** কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এর দ্বারা স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তির চিত্তে সর্বতোভাবে স্পৃহারূপ দোষ না থাকার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি দুঃখ ও সুখ এই দুয়েতেই সর্বদা সমভাবে থাকেন (১২।১৩ ; ১৪।২৪)। যেমন অতি বড় দুঃখ তঁকে বিচলিত করতে পারে না, তেমনই অতি বড় সুখও হৃদয়ে কিছুমাত্র স্পৃহার ভাব উৎপন্ন করতে পারে না। সেইজন্য তাঁর বাক্যে স্পৃহা দোষ থাকে না। লোকসংগ্রহার্থে যদি তাঁর শরীর বা বাক্যে স্পৃহাভাব দেখা যায়, তা বাস্তবিক স্পৃহা নয়।

প্রশ্ন —**'বীতরাগভয়ক্রোধঃ'**—এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা স্থিরবুদ্ধি যোগীর হৃদয়ে ও বাক্যে আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ না থাকার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ কোনো পরিস্থিতিতে বা ঘটনাতে তাঁর অন্তরে কোনোপ্রকার আসক্তি উৎপন্ন হয় না এবং ভয় বা ক্রোধও উৎপন্ন হয় না। সেইজন্য তাঁর বাক্যও আসক্তি, ভয় এবং ক্রোধের ভাবরহিত হয়ে শান্ত ও সরল হয়ে থাকে। লোকসংগ্রহের জন্য তাঁর শরীর বা বাক্যের ক্রিয়া দ্বারা আসক্তি, ভয় বা ক্রোধের ভাব দেখানো যেতে পারে, কিন্তু বাস্তবে তাঁর মন বা বাক্যে কোনোপ্রকার বিকার থাকে না। শুধুমাত্র বাক্যের দ্বারা উপরোক্তভাবে বিকারশূন্য হয়ে কথা বলা তো কোনো ধৈর্যশীল বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষেও সম্ভব ; কিন্তু তাঁর হৃদয় বিকাররহিত হতে পারে না, এইজন্য এখানে ভগবান 'স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তি কীভাবে কথা বলেন ?' এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁর বাণীর বাহ্যিক ক্রিয়ার কথা না বলে তাঁর মনোভাবের বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এর দ্বারা বুঝতে হবে যে স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তির বাক্যও বাস্তবে তাঁর চিত্তের ন্যায় সর্বথা নির্বিকার ও শুদ্ধ হয়।

প্রশ্ন —'এরূপ মুনিকে স্থির বুদ্ধিসম্পন্ন বলা হয়' —এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে উপরোক্ত লক্ষণযুক্ত যোগীই প্রকৃতপক্ষে **'মুনি'** অর্থাৎ বাক্-সংযমকারী এবং তিনিই স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন। যার চিত্ত ও ইন্দ্রিয় বিকারে পূর্ণ থাকে, সে বাক্‌সংযমী হলেও স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন হতে পারে না।

যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৭

যে ব্যক্তি সকল বস্তু ও ব্যক্তিতে আসক্তিরহিত এবং শুভ ও অশুভ বস্তুর প্রাপ্তিতে প্রসন্ন হন না বা দ্বেষ করেন না তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ॥ ৫৭

প্রশ্ন—**'সর্বত্র অনভিস্নেহঃ'**র অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা স্থিরবুদ্ধি যোগীর অভিস্নেহের অর্থাৎ মমতাসহ যে জাগতিক আসক্তি হয় তার অভাব দেখানো হয়েছে। অভিপ্রায় হল যেরূপ সাংসারিক ব্যক্তি তার স্ত্রী, পুত্র, ভাই, বন্ধু এবং আত্মীয়-স্বজনে মমতা ও আসক্তিতে আবদ্ধ হয়, দিনরাত তাতেই মোহিত হয়ে থাকে এবং তার প্রতি বাক্যে সেই মোহযুক্ত স্নেহভাব স্ফুরিত হয়, স্থিরবুদ্ধি যোগীর তা হয় না। তাঁর কোনো প্রাণীতেই মমতা বা আসক্তিযুক্ত প্রেম থাকে না। তাই তাঁর বাক্যও মমতা ও আসক্তিদোষ বর্জিত, শুদ্ধ ও প্রেমময় হয়। আসক্তিই কাম-ক্রোধ ইত্যাদি সমস্ত বিকারের মূল। তাই আসক্তি না থাকলে কোনো বিকার থাকে না।

প্রশ্ন—**'শুভাশুভম্'** পদটি কীসের বাচক এবং তার সঙ্গে **'তৎ'** পদটি দুবার প্রয়োগ করে কী ভাব দেখানো হয়েছে ?

উত্তর—যেগুলিকে প্রিয় ও অপ্রিয় এবং অনুকূল ও প্রতিকূল বলা হয়, তারই বাচক এই **'শুভাশুভম্'** পদটি।

প্রকৃতপক্ষে স্থিরবুদ্ধি যোগীর জগতের কোনো বস্তুতে অনুকূল বা প্রতিকূল ভাব থাকে না ; শুধুমাত্র ব্যবহারিক দৃষ্টিতে যা তাঁর মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরের অনুকূল বলে প্রতীত হয় তাকে শুভ এবং যা প্রতিকূল বলে মনে হয় তাকে অশুভ বলার জন্য এখানে '**শুভাশুভম্**' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। তার সঙ্গে '**তৎ**' পদটি দুবার প্রয়োগ করে এই ভাব দেখানো হয়েছে যে এরূপ অনুকূল ও প্রতিকূল বস্তু অনন্ত, তার মধ্যে যেসব বস্তুর সঙ্গে ঐ যোগীর সংযোগ হয়, সেইসব সংযোগে তাঁর ভাব কেমন থাকে—এখানে সেটিই বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—'ন অভিনন্দতি' কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা এই ভাব দেখানো হয়েছে যে উপরোক্ত শুভাশুভ বস্তুর মধ্যে কোনো শুভ অর্থাৎ অনুকূল বস্তুর সংযোগ হলে সাধারণ মানুষের অন্তরে অত্যন্ত হর্ষ হয় এবং তারা হর্ষে বিভোর হয়ে অত্যন্ত খুশী হয়ে কথা বলে ও সেই বস্তুর গুণগান করে ; কিন্তু স্থিরবুদ্ধি যোগী অত্যন্ত অনুকূল বস্তু লাভ করলেও তাঁর অন্তরে বিন্দুমাত্রও হর্ষের বিকার হয় না (৫।২০)। এইজন্য তাঁর বাক্যও বিকারশূন্য হয়, তিনি কোনো অনুকূল বস্তু বা প্রাণীর হর্ষগর্বিত স্তুতি করেন না। যদি তাঁর শরীর বা বাক্য দ্বারা লোকসংগ্রহের জন্য হর্ষের ভাব প্রকটিত হয় বা স্তুতি করা হয়, তাহলে সেটি হর্ষজনিত বিকার ধরা যাবে না।

প্রশ্ন—'ন দ্বেষ্টি'র অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা এই ভাব দেখানো হয়েছে যে যেরূপ অনুকূল বস্তু লাভ হলে সাধারণ মানুষ অত্যন্ত আনন্দিত হয়, তেমনই প্রতিকূল বস্তু পেলে তারা খুবই দুঃখিত হয়, তাদের অন্তরে অত্যন্ত ক্ষোভের উদ্রেক হয়, তারা রাগ করে সেই বস্তুর নিন্দা করে। কিন্তু স্থিরবুদ্ধি যোগী অত্যন্ত প্রতিকূল বস্তু পেলেও তাঁর অন্তরে বিন্দুমাত্রও দ্বেষ ভাব উৎপন্ন হয় না। তাঁর অন্তঃকরণ যে কোনো বস্তুর প্রাপ্তিতেই সর্বদা সম, শান্ত ও নির্বিকার থাকে (৫।২০), তাইজন্য তিনি কোনো প্রতিকূল বস্তু বা প্রাণীর দ্বেষপূর্ণ নিন্দা করেন না। এরূপ মহাপুরুষ লোকসংগ্রহার্থে যদি কোনো প্রাণী বা বস্তুকে খারাপ কিছু বলেন, তাহলে বাস্তবে তা নিন্দা নয়, কারণ তার মধ্যে দ্বেষভাব থাকে না।

প্রশ্ন—তাঁর বুদ্ধি স্থির হয়ে থাকে—এই কথাটির ভাব কী ?

উত্তর—এর দ্বারা দেখানো হয়েছে যে, যে মহাপুরুষ উপরোক্ত লক্ষণসম্পন্ন, যাঁর অন্তরে ও ইন্দ্রিয়ে কোনো বস্তু বা প্রাণীর সংযোগ-বিয়োগে কোনো ঘটনার দ্বারা কোনোপ্রকারের বিন্দুমাত্র বিকার হয় না, তাঁকে স্থিরবুদ্ধি যোগী জানতে হবে।

প্রশ্ন—এই দুটি শ্লোকে কোথাও স্পষ্টভাবে কথা বলার প্রসঙ্গ নেই ; তাহলে কী করে বোঝা গেল যে এতে 'তিনি কীভাবে কথা বলেন।' এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর—প্রথমেই বলা হয়েছে যে, এখানে সাধারণভাবে কথা বলার বিষয় বর্ণিত নেই। শুধু যদি বাণীর কথা হত, তাহলে যে কোনো দাম্ভিক বা পাষণ্ড ব্যক্তি মুখস্ত করে ভালো ভালো কথা বলতে পারত। এখানে আসলে মনোভাবের প্রাধান্য বলা হয়েছে। এই দুটি শ্লোকে বর্ণিত মানসিক ভাব অনুসারে ভাবিত যে বাণী, ভগবানের বলার তাৎপর্য তাকেই লক্ষ্য করে। তাই এখানে বাণীর স্পষ্ট কথা না বলে মানসিক ভাবের কথা বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ—'স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন যোগী কীভাবে কথা বলেন ?' এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এবার ভগবান 'তিনি কীভাবে অবস্থান করেন ?'—এই তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে জানাচ্ছেন যে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির ইন্দ্রিয়াদি সর্বদা তাঁর বশীভূত থাকে এবং সেগুলির আসক্তিরহিত হয়ে নিজ নিজ বিষয়ে উপরত হয়ে যাওয়াই হল স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির অবস্থান করার লক্ষণ।

যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৮

কচ্ছপ যেমন তার অঙ্গসমূহ সংহরণ করে নেয়, তেমনই যিনি ইন্দ্রিয়াদির বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে সর্বপ্রকারে সংহরণ করেন, তাঁকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলে জানবে॥ ৫৮

প্রশ্ন—কচ্ছপের ন্যায় ইন্দ্রিয়াদির বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়াদিকে সর্বপ্রকারে সংহরণ করে নেওয়া কাকে বলে ?

উত্তর—কচ্ছপ যেমন তার সমস্ত অঙ্গ সবদিকের থেকে সংকুচিত করে স্থির হয়ে যায়, তেমনই সমাধিকালে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি ইন্দ্রিয়াদির ভোগসমূহ থেকে সরিয়ে নেওয়া, কোনো ইন্দ্রিয়কে কোনো ভোগের প্রতি আকর্ষিত হতে না দেওয়া এবং ঐ ইন্দ্রিয়াদিতে মন, বুদ্ধিকে বিচলিত করার শক্তি না থাকতে দেওয়া —এগুলিকেই বলা হয়েছে কচ্ছপের ন্যায় ইন্দ্রিয়াদিকে ইন্দ্রিয়াদির বিষয় থেকে সরিয়ে নেওয়া। বাহ্যিকভাবে ইন্দ্রিয়গুলিকে রোধ করে স্থূল বিষয় থেকে সরিয়ে নিলেও ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিসমূহ বিষয়ের দিকে ধাবিত হতে থাকে। এইজন্য সাধারণ মানুষ স্বপ্নে এবং মনোরাজ্যে ইন্দ্রিয় দ্বারা সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ উপভোগ করতে থাকে। এখানে **'সর্বশঃ'** পদটি প্রয়োগ করে এইরূপ বিষয়োপভোগ থেকেও ইন্দ্রিয়াদি সরিয়ে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—তার বুদ্ধি স্থির—এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথাটির তাৎপর্য এই যে যার ইন্দ্রিয়াদি সর্ব ভাবে এরূপ বশীভূত হয়েছে যে তাঁদের মধ্যে মন ও বুদ্ধিকে বিষয়ের দিকে আকর্ষিত করার বিন্দুমাত্র শক্তি নেই এবং এইভাবে যিনি বশীভূত ইন্দ্রিয়াদি সর্বতোভাবে বিষয় থেকে সরিয়ে নেন, তাঁরই বুদ্ধি স্থির থাকে। যার ইন্দ্রিয়াদি বশে নেই, তার বুদ্ধি স্থির থাকতে পারে না ; কারণ ইন্দ্রিয়সমূহ মন ও বুদ্ধিকে জোর করে বিষয় উপভোগে সংযুক্ত করে।

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থান করার বিধি জানিয়ে এবার তাতে যে আশঙ্কা হতে পারে তার সমাধানের জন্য ভিন্নপ্রকারে যে ইন্দ্রিয়সংযম করা হয় তার থেকে স্থিতপ্রজ্ঞের ইন্দ্রিয়সংযমের বৈশিষ্ট্য দেখাচ্ছেন—

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে।। ৫৯

ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বিষয়-উপভোগে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তির বিষয়ভোগ নিবৃত্ত হলেও ইন্দ্রিয়াদির বিষয়াসক্তি নিবৃত্ত হয় না। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির আসক্তি পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভে সর্বতোভাবে দূরীভূত হয়।। ৫৯

প্রশ্ন—এখানে **'নিরাহারস্য'** বিশেষণের সঙ্গে **'দেহিনঃ'** পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—সংসারে যিনি আহার ত্যাগ করেন, তাঁকে **'নিরাহার'** বলা হয়। কিন্তু এখানে **'নিরাহারস্য'** পদটি সেই অর্থে প্রয়োগ করা হয়নি, কারণ এখানে **'বিষয়াঃ'** পদে বহুবচন প্রয়োগ করে সমস্ত বিষয় থেকে নিবৃত্ত হতে বলা হয়েছে। আহার ত্যাগ করলে শুধু জিহ্বা-ইন্দ্রিয়ের বিষয়ই নিবৃত্ত হয় ; শব্দ-স্পর্শ-রূপ-গন্ধের বিষয়াদি নিবৃত্ত হয় না। সুতরাং বুঝতে হবে যে, যে ইন্দ্রিয়ের যেটি বিষয়, সেটিই তার আহার—সেই দৃষ্টিতে যিনি সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়াদির বিষয় গ্রহণ ত্যাগ করেন, সেইরূপ দেহাভিমানী ব্যক্তিদের বাচক এখানে **'নিরাহারস্য'** বিশেষণের সঙ্গে **'দেহিনঃ'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্ন—এরূপ মানুষেরও শুধুমাত্র বিষয় নিবৃত্ত হয়ে যায়, কিন্তু তাঁর মধ্যে থাকা আসক্তির নিবৃত্তি হয় না, এই কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এই কথাটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হল বিষয় পরিত্যাগকারী পাষণ্ড বা অজ্ঞ ব্যক্তিও বাহ্যতঃ কচ্ছপের ন্যায় নিজ ইন্দ্রিয়াদিকে বিষয় থেকে সরাতে পারে ; কিন্তু তার মধ্যে আসক্তি বজায় থাকে, সেটির নাশ হয় না। তাই জন্য তার ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিগুলি বিষয়ের দিকে অনবরত ধাবিত হতে থাকে এবং তার চিত্ত স্থির হতে দেয় না। নিম্নলিখিত উদাহরণের দ্বারা এটি ঠিকমতো বোঝা যাবে।

রোগ বা মৃত্যুভয়ে অথবা অন্য কোনো কারণে

বিষয়াসক্ত মানুষ কোনো এক বা একাধিক বিষয় ত্যাগ করে। সে যখন যে বিষয় পরিত্যাগ করে, তখন সেই বিষয়ের নিবৃত্তি হয়ে যায়। তেমনই সমস্ত বিষয় ত্যাগ করলে সমস্ত বিষয়ও নিবৃত্ত হওয়া সম্ভব। কিন্তু এই নিবৃত্তি, জোর করে ভয় বা অন্য কোনো কারণে বিষয়াদিতে আসক্তি থাকা অবস্থাতেই হয়। অতএব এরূপ নিবৃত্তিতে প্রকৃতপক্ষে আসক্তির নিবৃত্তি হতে পারে না।

দাম্ভিক ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কোনো সময় যখন বাইরে থেকে দশ ইন্দ্রিয়ের শব্দাদি বিষয় পরিত্যাগ করে, তখন বাহ্যতঃ বিষয়াদির নিবৃত্তি হলেও আসক্তি থাকায় মনের দ্বারা সেই ব্যক্তি ইন্দ্রিয়াদির বিষয়সমূহ চিন্তা করতে থাকে (৩।৬) ; সুতরাং তার আসক্তি আগের মতোই বজায় থাকে।

জাগতিক সুখের কামনাসম্পন্ন মানুষ অণিমাদি সিদ্ধি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বা অন্য কোনো বিষয়-সুখ প্রাপ্তির আশায় ধ্যানের সময় বা সমাধিকালে দশ ইন্দ্রিয়াদির বিষয়সমূহ বাহ্যতঃ পরিত্যাগ করে এবং মনে মনেও তার চিন্তা করে না, তা সত্ত্বেও ভোগসমূহে তার আসক্তি বজায় থাকে, তা সর্বতোভাবে নষ্ট হয় না।

এইভাবে বাহ্যতঃ বিষয়াদি পরিত্যাগ করলেও বিষয়াদি নিবৃত্ত হতে পারে, কিন্তু সেগুলির প্রতি আসক্তি নিবৃত্ত হয় না।

প্রশ্ন—এখানে 'রস'-এর অর্থ আস্বাদন অথবা মনের দ্বারা উপভোগ মেনে নিয়ে 'তার রস নিবৃত্ত হয় না' এই বাক্যটির এই অর্থ যদি ধরা হয় যে এরূপ ব্যক্তি স্বরূপতঃ বিষয় ত্যাগী হলেও মনে মনে সেই উপভোগের আনন্দ গ্রহণ করছে, তাহলে আপত্তি কীসের ?

উত্তর— উপরোক্ত বাক্যটির এরূপ অর্থ গ্রহণ করা যায় ; কিন্তু এই ভাবে মনের দ্বারা বিষয়াদির আস্বাদন সেগুলির প্রতি আসক্তি হলেই হয়। সুতরাং 'রস'-এর অর্থ আসক্তি ধরা হলে এর তাৎপর্য তার অন্তর্গত হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ এইভাবে মনের দ্বারা বিষয়োপভোগ পরমাত্মার সাক্ষাৎকারের আগে বিবেক-বিচারের সাহায্যে রোধ করা সম্ভব ; পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হলে সেগুলির মূল আসক্তিরও নাশ হয়ে যায় এবং এটিই হল পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করার চরিতার্থতা, মন থেকে বিষয় দূর করাতে নয়। সুতরাং 'রস'-এর অর্থ ওপরে যেটি দেওয়া হয়েছে, সেটিই সঠিক।

প্রশ্ন—'অস্য' পদটি কীসের বাচক ? এবং 'তাঁর আসক্তি ও পরমাত্মার দর্শন লাভ হলে নিবৃত্ত হয়ে যায়' —এই কথাটির কী তাৎপর্য ?

উত্তর—'অস্য' পদ, এখানে যার প্রকরণ চলছে, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ যোগীর বাচক এবং উপরোক্ত বক্তব্যের দ্বারা দেখানো হয়েছে যে সেই স্থিতপ্রজ্ঞ যোগীর পরমানন্দের সমুদ্র পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হওয়ায় তাঁর মধ্যে কোনো সাংসারিক পদার্থের প্রতি বিন্দুমাত্রও আসক্তি থাকে না। কারণ আসক্তির মূল কারণ হল অবিদ্যা[১]। পরমাত্মার সাক্ষাৎ লাভ হলে অবিদ্যা দূরীভূত হয়। সাধারণ ব্যক্তিদের মোহবশতঃ ইন্দ্রিয়াদির ভোগে সুখ প্রতীত হয় ; সেইজন্য তারা ভোগে আসক্ত হয় ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভোগে সুখের লেশমাত্র নেই। তাতে যা কিছু সুখের অনুভব হয়, তা হল সেই পরম আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মার আনন্দের যৎকিঞ্চিৎ আভাসমাত্র। যেমন অন্ধকার রাতে স্থলস্থলে নক্ষত্রতে যে আলোর প্রকাশ প্রতীত হয়, সেই প্রকাশ সূর্যেরই প্রকাশের আভাসমাত্র, সূর্য উদয় হলেই নক্ষত্রের প্রকাশ লুপ্ত হয়ে যায়। তেমনই জাগতিক পদার্থে প্রতীত হওয়া সুখ আনন্দময় পরমাত্মার আনন্দেরই আভাস। সুতরাং যে ব্যক্তি সেই পরম আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে লাভ করেন, তাঁর এই ভোগে সুখ প্রতীতি হয় না (২।৬৯) এবং তাতে তাঁর বিন্দুমাত্র আসক্তিও থাকে না।

কারণ পরমাত্মা এমন এক অদ্ভুত, অলৌকিক, দিব্য, আকর্ষক বস্তু, যা লাভ হলে এতো তল্লীনতা, মুগ্ধতা ও তন্ময়তা আসে যে সে নিজেকেই হারিয়ে

[১]অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ। (যোগদর্শন ২।৩)

অজ্ঞান, চিজ্জড়গ্রন্থি অর্থাৎ জড় ও চেতনের তাদাত্ম্য, আসক্তি, দ্বেষ, মৃত্যু-ভয়—এই পাঁচটিকে 'ক্লেশ' বলা হয়।

অবিদ্যা ক্ষেত্রমুত্তরেষাম্ ....। (যোগদর্শন ২।৪)

উপরোক্ত পাঁচটির মধ্যে চারটির কারণ অবিদ্যা অর্থাৎ অবিদ্যা থেকেই রাগ-দ্বেষাদির উৎপত্তি হয়।

ফেলে। তাহলে আর অন্য বস্তুর চিন্তা কে করবে ? তাই পরমাত্মার সাক্ষাৎকারের ফলে আসক্তি থেকে চিরতরে নিবৃত্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

এইভাবে আসক্তি না থাকায় স্থিতপ্রজ্ঞের সংযমে শুধু বিষয়েরই নিবৃত্তি হয় না, মূলসহ সমস্ত আসক্তি চিরতরে দূর হয়ে যায় ; এই তার বিশেষত্ব।

সম্বন্ধ—আসক্তির বিনাশ এবং ইন্দ্রিয়সংযম না হলে ক্ষতি কী ? তাতে বলেছেন—

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥ ৬০

হে অর্জুন ! আসক্তির বিনাশ না হলে চিত্ত আলোড়নকারী ইন্দ্রিয়সকল প্রযত্নশীল বুদ্ধিমান ব্যক্তির মনও বলপূর্বক হরণ করে॥ ৬০

প্রশ্ন—এখানে **'হি'** পদটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—**'হি'** পদটি এখানে 'দেহলী-দীপ ন্যায়' অনুসারে এই শ্লোকে পূর্ব এবং পরের শ্লোকের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে। আগের শ্লোকে বলা হয়েছিল যে, বিষয়াদি স্বরূপতঃ বর্জনকারী ব্যক্তির বিষয়ই নিবৃত্ত হয়, তার আসক্তি নিবৃত্ত হয় না। তাতে প্রশ্ন হতে পারে যে আসক্তি নিবৃত্ত না হলে ক্ষতি কী ? তার উত্তরে এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে, যতক্ষণ মানুষের বিষয়াদিতে আসক্তি বজায় থাকে, ততক্ষণ সেই আসক্তি তাকে বলপূর্বক বিষয়ে প্রবৃত্ত করে। অতএব তার মন-সহ বুদ্ধি পরমাত্মার স্বরূপে স্থির হয় না এবং যেহেতু ইন্দ্রিয়াদি বলপূর্বক মানুষের মন হরণ করতে সক্ষম, তাই পরের শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে এইসব ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত করে মানুষের সমাহিত চিত্ত এবং আমার পরায়ণ হয়ে ধ্যানে স্থিত হওয়া উচিত। এইভাবে **'হি'** পদটি আগের ও পরের— উভয় শ্লোকের সঙ্গে যোগসূত্র রূপে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—**'ইন্দ্রিয়াণি'** পদের সঙ্গে **'প্রমাথীনি'** বিশেষণ প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—**'প্রমাথীনি'** বিশেষণ প্রয়োগের দ্বারা দেখানো হয়েছে যে মানুষের ইন্দ্রিয় সকল যতক্ষণ তার বশীভূত না হয় এবং যতক্ষণ ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ে আসক্তি থাকে, ততক্ষণ ইন্দ্রিয়াদি মানুষের মনে বারবার বিষয় সুখের প্রলোভন দিয়ে তাকে স্থির থাকতে দেয় না, তাকে পেষণ করতে থাকে।

প্রশ্ন—এখানে **'যততঃ'** এবং **'বিপশ্চিতঃ'** এই দুই বিশেষণের সঙ্গে **'পুরুষস্য'** পদ কোন্ মানুষের বাচক এবং **'অপি'** পদ প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—যে ব্যক্তি শাস্ত্রের শ্রবণ-মনন এবং বিবেক-বিচার দ্বারা বিষয়াদির দোষগুলি জেনে যায় এবং তার থেকে ইন্দ্রিয়গুলি সরাবার চেষ্টা করে, কিন্তু যার বিষয়াসক্তি নাশ হয়নি, তাই তার ইন্দ্রিয়াদি বশে নেই —এইরূপ বুদ্ধিমান যত্নশীল সাধকের বাচক হল 'যততঃ' এবং **'বিপশ্চিতঃ'**—এই দুটি বিশেষণের সঙ্গে **'পুরুষস্য'** পদটি। এর সঙ্গে **'অপি'** পদ প্রয়োগ করে এখানে এই ভাব দেখানো হয়েছে যে যখন এই প্রমথনশীল ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়াসক্তির কারণে এরূপ বুদ্ধিমান, বিবেকবান, যত্নশীল মানুষের মনকেও বলপূর্বক বিষয়ে প্রবৃত্ত করে, তাহলে সাধারণ মানুষের তো কথাই নেই ! অতএব স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থা লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তির আসক্তি চিরতরে ত্যাগ করে ইন্দ্রিয়াদি বশ করার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা উচিত।

সম্বন্ধ—এইভাবে ইন্দ্রিয়াদি সংযমের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে ভগবান এবার সাধকের কর্তব্য বলতে গিয়ে পুনরায় ইন্দ্রিয় সংযমকে স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থার হেতুরূপে জানাচ্ছেন—

তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬১

অতএব সাধকেরা ইন্দ্রিয়াদি সংযত করে সমাহিত চিত্তে আমার পরায়ণ হয়ে অবস্থান করবেন ; কারণ যাঁদের ইন্দ্রিয়াদি বশে থাকে, তাঁদেরই বুদ্ধি স্থির হয়॥ ৬১

প্রশ্ন—এখানে ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে **'সর্বাণি'** বিশেষণ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—সব ইন্দ্রিয়গুলি বশে আনার প্রয়োজনীয়তা দেখানোর জন্য **'সর্বাণি'** বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে, কারণ বশীভূত না হওয়া একটি ইন্দ্রিয়ও মানুষের মন-বুদ্ধি বিচলিত করে সাধনে বিঘ্ন উপস্থিত করে (২।৬৭)। অতএব ঈশ্বর লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তির সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি ভালোভাবে বশে রাখা উচিত।

প্রশ্ন—'সমাহিতচিত্ত' এবং 'ভগবৎপরায়ণ হয়ে ধ্যানে বসতে বলার' কী তাৎপর্য ?

উত্তর—ইন্দ্রিয়াদি সংযত হলেও মন যদি বশীভূত না হয় তাহলে মনে মনে বিষয়-চিন্তা করলে সাধকের পতন হয় এবং মন-বুদ্ধি পরমাত্মায় নিবিষ্ট না হওয়ায় সেগুলি স্থির থাকতে পারে না। তাই সমাহিত চিত্ত এবং ভগবৎপরায়ণ হয়ে পরমাত্মার ধ্যানে বসতে বলা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ের ধ্যানযোগের প্রসঙ্গেও এই কথা বলা হয়েছে (৬।১৪)। এইভাবে মন ও ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত করে পরমাত্মার ধ্যানে নিরত মানুষের বুদ্ধি স্থির হয়ে যায় এবং তিনি শীঘ্রই পরমাত্মাকে লাভ করেন।

প্রশ্ন—যার ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত, তার বুদ্ধি স্থির হয়ে যায়—এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—শ্লোকের পূর্বার্ধে ইন্দ্রিয়াদি বশ করে সংযত চিত্ত ও ভগবৎপরায়ণ হয়ে ধ্যানে নিরত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেই কথার হেতু এই উত্তরার্ধে বলা হয়েছে। সুতরাং ভগবানের এই কথার অভিপ্রায় হল মমতা, আসক্তি ও কামনা চিরতরে ত্যাগ করে মন ও ইন্দ্রিয়াদি সংযত করে বুদ্ধিকে পরমাত্মার স্বরূপে স্থির করা উচিত, কারণ যার মন-সহ ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত হয়েছে, সেই সাধকের বুদ্ধি স্থির হয় ; যার মন-সহ ইন্দ্রিয়াদি বশে নেই, তার বুদ্ধি স্থির থাকতে পারে না। সুতরাং মন ও ইন্দ্রিয়াদি বশে রাখা সাধকের জন্য পরম প্রয়োজনীয়।

সম্বন্ধ—উপরোক্ত ভাবে মন-সহ ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত না করলে এবং ভগবৎপরায়ণ না হলে কী ক্ষতি ? এবার দুটি শ্লোকে তা বলা হচ্ছে—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥ ৬২

বিষয় চিন্তনকারী ব্যক্তির ঐ বিষয়ে আসক্তি জন্মায়, আসক্তি থেকে কামনা উৎপন্ন হয় এবং কামনায় বিঘ্ন পড়লে ক্রোধ উৎপন্ন হয়॥ ৬২

প্রশ্ন—বিষয়চিন্তাকারী ব্যক্তির ঐ বিষয়ে আসক্তি জন্মায়—একথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর তাৎপর্য এই যে, যেসব ব্যক্তির ভোগে সুখ ও সুখবুদ্ধি থাকে, যাদের মন বশীভূত নয় এবং যারা পরমাত্মার চিন্তা করে না, এইসব ব্যক্তিদের পরমাত্মায় প্রেম এবং তাঁর আশ্রয় না থাকায় তাঁদের মনে ইন্দ্রিয়াদির বিষয়-চিন্তা হতে থাকে। এইভাবে বিষয়-চিন্তা করায় তাঁদের বিষয়াসক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। তখন তাঁদের মন বিচলিত হয় এবং তা তাঁদের সাধ্যের বাইরে চলে যায়।

প্রশ্ন—বিষয়-চিন্তা দ্বারা কী সকল ব্যক্তির মনেই আসক্তি উৎপন্ন হয় ?

উত্তর—যে ব্যক্তি পরমাত্মাকে লাভ করেছেন, তাঁর তো বিষয়-চিন্তা দ্বারা আসক্তি হওয়ার কোনো প্রশ্নই

নেই। 'পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে' দ্বারা ভগবান এইসকল ব্যক্তিদের আসক্তির অত্যন্ত অভাব বলেছেন। এছাড়া অন্য সকলের মনে কম বেশি আসক্তি উৎপন্ন হতে পারে।

প্রশ্ন—আসক্তির দ্বারা কামনা উৎপন্ন হওয়ার মানে কী ? এবং কামনার দ্বারা ক্রোধ কীরূপে উৎপন্ন হয় ?

উত্তর—বিষয়াদি চিন্তা করতে করতে মানুষ যখন তাতে অত্যন্ত আসক্ত হয়, তখন তার মনে প্রবলভাবে নানাপ্রকার ভোগেচ্ছা জাগ্রত হয় ; এটিই হল আসক্তি থেকে কামনার উৎপন্ন হওয়া এবং সেই কামনায় কোনোরূপ বিঘ্ন উৎপন্ন হলে, সেই বিঘ্নের কারণে দ্বেষবুদ্ধি হয়ে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। একেই বলা হয় কামনা থেকে ক্রোধ উৎপন্ন হওয়া।

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥ ৬৩

ক্রোধ থেকে মূঢ়ভাব উৎপন্ন হয়, মূঢ়ভাব থেকে স্মৃতিভ্রংশ হয়, স্মৃতিভ্রংশে বুদ্ধিনাশ বা জ্ঞানশক্তির নাশ এবং বুদ্ধিনাশ হলে সেই ব্যক্তি নিজ স্থিতি থেকে পতিত হয়॥ ৬৩

প্রশ্ন—ক্রোধ থেকে উৎপন্ন অত্যন্ত মূঢ়ভাবের স্বরূপ কী ?

উত্তর—মানুষের হৃদয়ে যখন ক্রোধের বৃত্তি জাগ্রত হয়, সেই সময় তার চিত্তে বিবেক-শক্তি থাকে না। সে তখন অগ্র-পশ্চাৎ কিছু ভাবতে পারে না, ক্রোধবশে যে কার্যে সে প্রবৃত্ত হয়, তার পরিণামের দিকে তার কোনো খেয়াল থাকে না। একেই বলা হয় ক্রোধ থেকে উৎপন্ন সম্মোহ অর্থাৎ অত্যন্ত মূঢ়ভাব।

প্রশ্ন—সম্মোহ থেকে উৎপন্ন হওয়া 'স্মৃতিবিভ্রমে'র স্বরূপ কী ?

উত্তর— ক্রোধবশতঃ মানুষের চিত্তে যখন মূঢ়ভাব বৃদ্ধি পায়, তখন তার স্মরণশক্তি ভ্রমিত হয়, তখন তার খেয়াল থাকে না যে কার সাথে তার কী সম্পর্ক, তার কী করা উচিত, কী করা উচিত নয়, সে কোন্ কাজ কীভাবে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং এখন কী করছে। তার চিন্তা-ভাবনা এমনভাবে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায় যে তার কোনো কথারই আর ঠিক থাকে না। একেই সম্মোহ থেকে স্মৃতিবিভ্রম বলা হয়।

প্রশ্ন—স্মৃতিবিভ্রম দ্বারা বুদ্ধিনাশ হওয়া এবং বুদ্ধি-নাশের দ্বারা নিজ স্থিতি থেকে পতিত হওয়া কাকে বলে ?

উত্তর— উপরিউক্ত প্রকারে স্মৃতিবিভ্রম হলে চিত্তে কর্তব্য-অকর্তব্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার শক্তি না থাকাই হল বুদ্ধিনাশ হওয়া। এরূপ হলে মানুষ নিজ কর্তব্য ত্যাগ করে অকর্তব্যে প্রবৃত্ত হয়—তার ব্যবহারে কটুতা, কঠোরতা, কাপুরুষতা, হিংসা, প্রতিহিংসা, দীনতা, জড়তা, মূঢ়তা ইত্যাদি দোষ আসে। তখন তার পতন হয় এবং সে শীঘ্রই তার পূর্বের স্থিতি থেকে পতিত হয় এবং মৃত্যুর পর নানাপ্রকার নীচ যোনি বা নরকে গমন করে ; একেই বলা হয় বুদ্ধিনাশের দ্বারা নিজ স্থিতি থেকে পতন হওয়া।

সম্বন্ধ—এইভাবে মনসহ ইন্দ্রিয়াদিকে বশীভূত না করা ব্যক্তির পতনের ক্রম জানিয়ে ভগবান এবার 'স্থিতপ্রজ্ঞ যোগী কীভাবে বিচরণ করেন' সেই চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর আরম্ভ করতে গিয়ে প্রথম দুটি শ্লোকে যাদের মন ও ইন্দ্রিয়াদি বশে থাকে, সেই সাধকদের বিষয়াদিতে বিচরণ করার প্রকার এবং তার ফল জানিয়েছেন—

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥ ৬৪

কিন্তু যিনি তাঁর অন্তঃকরণকে বশীভূত করেছেন, তিনি রাগ-দ্বেষবর্জিত বশীভূত ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বিষয়সমূহে বিচরণ করেও অন্তঃকরণে প্রসন্নতা লাভ করেন॥ ৬৪

প্রশ্ন—'তু' পদটির অর্থ কী ?

উত্তর—আগের শ্লোকে যাদের মন, ইন্দ্রিয় বশীভূত নয়, সেই বিষয়ী মানুষের অবনতির বর্ণনা করা হয়েছে। এবার দুটি শ্লোকে তার থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তি যার মন, ইন্দ্রিয় বশীভূত হয়েছে, সেই বৈরাগী সাধকের উন্নতির বর্ণনা করা হয়েছে। সেই ভেদেরই দ্যোতক হল 'তু' পদ।

প্রশ্ন—'বিধেয়াত্মা' পদটি কীরূপ সাধকের বাচক ?

উত্তর—যার চিত্ত ভালোভাবে বশীভূত এখানে 'বিধেয়াত্মা' পদটি সেই সাধকদের বাচক।

প্রশ্ন—এরূপ সাধকের বশীভূত করা, রাগদ্বেষ-রহিত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা বিচরণ করার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—সাধারণ মানুষের ইন্দ্রিয়াদি স্বতন্ত্র হয়, তাদের বশে থাকে না, সেই ইন্দ্রিয়াদিতে রাগ-দ্বেষ পরিপূর্ণ থাকে। সেইজন্য সেই ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয়ে ভোগবিলাসী মানুষ উচিত-অনুচিত বিচার না করে যে কোনভাবে ভোগসামগ্রী সংগ্রহ করে ভোগ করার চেষ্টা করে এবং সেই ভোগে রাগ-দ্বেষপরবশ হয়ে সুখী বা দুঃখী হতে থাকে, সেই ব্যক্তি আধ্যাত্মিক সুখের অনুভব করতে পারে না। কিন্তু উপরিউক্ত সাধকের ইন্দ্রিয়াদি তাঁর বশে থাকায় তাঁর মধ্যে রাগ-দ্বেষ থাকে না—সেইজন্য তিনি তাঁর বর্ণ, আশ্রম ও পরিস্থিতি অনুসারে রাগ-দ্বেষশূন্য হয়ে ভোগে সংযুক্ত হন। তাঁর দেখা-শোনা, খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, শোয়া-জাগা ইত্যাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়াদির ব্যবহারই নিয়মিত ও শাস্ত্রবিহিত হয় ; তাঁর সমস্ত ক্রিয়াকর্মে রাগ-দ্বেষ, কাম-ক্রোধ-লোভ ইত্যাদি বিকারের লেশমাত্রও থাকে না। একেই বলা হয় তাঁর রাগ-দ্বেষরহিত ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়ে বিচরণ করা।

প্রশ্ন—আগের উনষাটতম শ্লোকে বলা হয়েছে যে পরমাত্মার সাক্ষাৎ না হলে রাগের (আসক্তির) বিনাশ হয় না আর এখানে বলা হয়েছে রাগ-দ্বেষরহিত হয়ে বিষয়ে বিচরণ করলে প্রসাদ (প্রসন্নতা) লাভ করে স্থিরবুদ্ধি হওয়া যায়। এখানকার বক্তব্যে প্রতীত হয় যে পরমাত্মা-প্রাপ্তির পূর্বেই রাগ-দ্বেষের বিনাশ হওয়া সম্ভব। এই দুটি বক্তব্যে যে বিরোধ প্রতীয়মান হয়, তার সমন্বয় কী করে হয় ?

উত্তর—দুটির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, কারণ উনষাটতম শ্লোকে রাগ-দ্বেষ না থাকার কথা বলা হয়েছে এবং এখানে রাগ-দ্বেষরহিত ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বিষয়-ভোগের কথা বলে রাগ-দ্বেষ শূন্য সাধনার কথা বলা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ের চল্লিশতম শ্লোকে ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি—এই তিনটিকেই কামের অধিষ্ঠান বলা হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ইন্দ্রিয়াদিতে রাগ-দ্বেষ না থাকলেও মন বা বুদ্ধিতে সূক্ষ্মরূপে রাগ-দ্বেষ থাকতে পারে। কিন্তু উনষাটতম শ্লোকে 'অস্য' পদ প্রয়োগ করে স্থিরবুদ্ধি পুরুষে রাগ-দ্বেষ থাকে না বলা হয়েছে। সেখানে শুধু ইন্দ্রিয়তেই রাগ-দ্বেষ না থাকার কথা বলা হয়নি।

প্রশ্ন—ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে বিষয়াদির সংযোগ হতে না দেওয়া অর্থাৎ বাহ্যতঃ বিষয় ত্যাগ, ইন্দ্রিয় সংযম ও ইন্দ্রিয়ের রাগ-দ্বেষরহিত হওয়া—এই তিনটির মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ এবং ভগবদ্‌প্রাপ্তির বিশেষ সহায়ক ?

উত্তর—তিনটিই ভগবদ্‌প্রাপ্তির সহায়ক, কিন্তু এর মধ্যে বাহ্য-বিষয় ত্যাগের থেকে ইন্দ্রিয়সংযম এবং ইন্দ্রিয় সংযমের থেকে ইন্দ্রিয়াদির রাগ-দ্বেষরহিত হওয়া বিশেষ উপযোগী এবং শ্রেষ্ঠ।

যদিও বাহ্যবিষয়াদি ত্যাগও ভগবদ্‌প্রাপ্তির সহায়ক, কিন্তু যতক্ষণ ইন্দ্রিয় সংযম এবং রাগ-দ্বেষ ত্যাগ না হয়, ততক্ষণ শুধুমাত্র বাহ্যবিষয়াদি ত্যাগের দ্বারা বিষয়ের পূর্ণ নিবৃত্তি হতে পারে না এবং সিদ্ধিলাভও হয় না। আবার এমন কথাও নেই যে বাহ্য বিষয় ত্যাগ না করলে ইন্দ্রিয়সংযম হবেই না। কারণ ভগবানের পূজা, সেবা, জপ ও বিবেক-বৈরাগ্য ইত্যাদি অন্য উপায়ে সহজেই ইন্দ্রিয়সংযম হয় এবং ইন্দ্রিয়সংযম হলে অনায়াসেই বিষয় ত্যাগ করা সম্ভব হয়। ইন্দ্রিয়াদি যার বশে থাকে, সে যখনই চাইবে বিষয় ত্যাগ করতে পারবে। তাই বাহ্যবিষয় ত্যাগের থেকে ইন্দ্রিয়সংযমই শ্রেষ্ঠ।

এইরূপ ইন্দ্রিয়সংযমও ভগবদ্‌প্রাপ্তির সহায়ক হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়াদি থেকে সম্পূর্ণরূপে রাগ-দ্বেষ ত্যাগ না হলে শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা বিষয়াদিতে আসক্তি সম্পূর্ণভাবে দূর হয় না এবং ফলতঃ পরমাত্মা প্রাপ্তি হয় না। আবার এও নয় যে বাহ্য বিষয় ত্যাগ ও ইন্দ্রিয় সংযম না হলে ইন্দ্রিয়ের রাগ-দ্বেষ দূর হতে পারবে না। সৎসঙ্গ, স্বাধ্যায় ও বিচার দ্বারা সাংসারিক ভোগের অনিত্যতা বুঝে গেলে এবং ঈশ্বরকৃপা ও ভজন-ধ্যানাদির ফলেও

রাগ-দ্বেষ বিনাশ হতে পারে। এবং যার ইন্দ্রিয়াদির রাগ-দ্বেষ বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে তার পক্ষে বাহ্য বিষয় ত্যাগ ও ইন্দ্রিয়সংযম অনায়াসেই হতে পারে। যার ইন্দ্রিয়াদিতে বিষয়ের প্রতি রাগ দ্বেষ থাকে না, সেই ব্যক্তি যদি বাহ্যতঃ বিষয়াদি ত্যাগ না করে, তবে সে বিষয়ে বিচরণ করেও পরমাত্মাকে লাভ করতে পারে। তাই ইন্দ্রিয়াদির রাগ-দ্বেষরহিত হওয়া বিষয় ত্যাগ ও ইন্দ্রিয়সংযমের থেকেও শ্রেষ্ঠ।

প্রশ্ন—**'প্রসাদম্'** পদটি কীসের বাচক ?

উত্তর—বশীভূত ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা রাগ-দ্বেষরহিত হয়ে ব্যবহারাদিতে যুক্ত হলেও সাধকের চিত্ত শুদ্ধ ও স্বচ্ছ হয়ে যায়, সেইজন্য তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিক শান্তি ও সুখ অনুভব হয় (১৮।৩৭) ; সেই সুখ ও শান্তির বাচক এই **'প্রসাদম্'** পদটি। এই সুখ ও শান্তির হেতুরূপ চিত্তের পবিত্র অবস্থাকে এবং ভগবানে অর্পণ করা বস্তু অন্তঃকরণকে পবিত্রকারী হয়ে থাকে, তাইজন্য তাকেও **'প্রসাদ'** বলা হয়। কিন্তু পরবর্তী শ্লোকে উপরোক্ত ব্যক্তির জন্য **'প্রসন্নচেতসঃ'** পদটি প্রয়োগ করা হয়েছে, তাই এখানে **'প্রসাদম্'** পদটির অর্থ অন্তঃকরণের প্রসন্নতা মনে করাই ঠিক বলে মনে হয়।

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে॥ ৬৫

অন্তরে প্রসন্নভাব হলে তাঁর সমস্ত দুঃখনাশ হয়ে যায় এবং সেই প্রসন্নচিত্ত কর্মযোগীর বুদ্ধি শীঘ্রই সর্বদিক থেকে সরে এসে এক পরমাত্মাতে স্থির হয়॥ ৬৫

প্রশ্ন—অন্তরে প্রসন্নতা হলে সমস্ত দুঃখ কীভাবে নাশ হয় ?

উত্তর—পাপের জন্যই মানুষ দুঃখ পায় এবং কর্মযোগের সাধন দ্বারা পাপনাশ হয়ে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়ে যায়। শুদ্ধ অন্তঃকরণেই উপরোক্ত সাত্ত্বিক প্রসন্নতা লাভ হয়। তাই সাত্ত্বিক প্রসন্নতাতে সমস্ত দুঃখের বিনাশ হয়, একথা বলা ন্যায়সঙ্গত (১৮।৩৬-৩৭)।

প্রশ্ন—**'সর্বদুঃখানাম্'** কোন্ পদের বাচক এবং তার বিনাশ হওয়া কাকে বলে ?

উত্তর—অনুকূল পদার্থের বিয়োগ এবং প্রতিকূল পদার্থের সংযোগে সাংসারিক মানুষ যেসব আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক নানাপ্রকার দুঃখপ্রাপ্ত হয়, সেই সবের বাচক এখানে 'দুঃখানাম্' পদটি। উপরোক্ত সাধকের আধ্যাত্মিক সাত্ত্বিক প্রসন্নতা অনুভব হলে তিনি আর কোনো বস্তুর সংযোগ-বিয়োগে দুঃখিত হন না। তিনি সর্বদাই আনন্দে মগ্ন থাকেন। একেই বলা হয় সর্বদুঃখের বিনাশ হওয়া।

প্রশ্ন—প্রসন্নচিত্তসম্পন্ন যোগীর বুদ্ধি শীঘ্রই সর্বদিক থেকে সরে এসে ভালোমতো পরমাত্মাতে স্থির হয়—এই কথাটির ভাব কী ?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে অন্তঃকরণ পবিত্র হলে সাধক যখন প্রসন্নতা লাভ করেন, তখন তাঁর মন মুহূর্তের জন্যও সেই সুখ ও শান্তি ত্যাগ করতে পারে না। সেইজন্য তাঁর চিত্তের বৃত্তিগুলি সর্বদিক থেকে সরে আসে এবং তাঁর বুদ্ধি শীঘ্রই পরমাত্মার স্বরূপে অটল হয়ে যায়। তখন তাঁর সিদ্ধান্তে এক সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা ভিন্ন কোনো বস্তু থাকে না।

প্রশ্ন—অর্জুনের প্রশ্ন ছিল স্থিতপ্রজ্ঞ সিদ্ধ পুরুষের বিষয়ে। এই শ্লোকে সাধকের বর্ণনা রয়েছে, কারণ এর ফলরূপী প্রসাদ লাভের দ্বারা শীঘ্র বুদ্ধি স্থির হওয়ার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং অর্জুনের চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর এই শ্লোকের দ্বারা কী করে মানা যায় ?

উত্তর—যদিও অর্জুনের প্রশ্ন সাধক সম্বন্ধে নয়, কিন্তু অর্জুন সাধক এবং ভগবান তাঁকে সিদ্ধ করে তুলতে চেয়েছিলেন। অতএব তাঁকে সহজে বোঝাবার জন্য ভগবান প্রথমে সাধকদের কথা বলে পরে একাত্তরতম শ্লোকে তার সিদ্ধিতে উপসংহার করেছেন। অর্জুনের প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর সেই উপসংহারেই আছে, তার ভূমিকা এই শ্লোক থেকেই আরম্ভ করা হয়েছে। অতএব অর্জুনের চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর এখান থেকেই আরম্ভ করা হচ্ছে, সেটি মেনে নেওয়াই সঠিক।

সম্বন্ধ—এইভাবে মন ও ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করে অনাসক্তভাবে ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা ব্যবহারকারী সাধকের সুখ-শান্তি ও স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থা প্রাপ্তির কথা বলে এবার দুটি শ্লোকে এর বিপরীত যাদের মন ও ইন্দ্রিয় জয় করা হয়নি, সেই বিষয়াসক্ত মানুষদের সুখ-শান্তির অভাব দেখিয়ে বিষয়াসক্তির দ্বারা তাদের বুদ্ধি বিচলিত হওয়ার প্রকার জানাচ্ছেন—

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্।। ৬৬

যে ব্যক্তির মন এবং ইন্দ্রিয় বশীভূত নয়, তার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হয় না এবং সেই অযুক্ত ব্যক্তির অন্তঃকরণে ভগবদ্চিন্তা আসে না। আত্মচিন্তাবর্জিত মানুষ শান্তি পায় না এবং শান্তিরহিত মানুষ সুখ পাবে কী করে? ৬৬

প্রশ্ন—'অযুক্তস্য' পদটি এখানে কীরূপ মানুষের বাচক?

উত্তর—যার মন ও ইন্দ্রিয় নিজ বশে নয় এবং যার ইন্দ্রিয়ভোগে অত্যন্ত আসক্তি থাকে, সেই বিষয়াসক্ত অবিবেচক মানুষদের বাচক এই **'অযুক্তস্য'** পদটি।

প্রশ্ন—অযুক্তের বুদ্ধি হয় না—এই কথার অর্থ কী?

উত্তর—এর দ্বারা এই ভাব দেখানো হয়েছে যে একচল্লিশতম শ্লোকে বর্ণিত 'নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি' তার হয় না। বিভিন্ন প্রকার ভোগাসক্তি ও কামনার জন্য তার মন বিক্ষিপ্ত থাকে, সেইজন্য সে নিজ কর্তব্য স্থির করে পরমাত্মার স্বরূপে বুদ্ধিকে স্থির করতে পারে না।

প্রশ্ন—অযুক্তের চিত্তে ভাবনাও হয় না—এই কথাটির অর্থ কী?

উত্তর—এর দ্বারা দেখানো হয়েছে যে মন ও ইন্দ্রিয়ের অধীনে থাকা বিষয়-আসক্ত মানুষের 'নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি' হয় না, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না, উপরন্তু তার মধ্যে কোনো সৎ-চিন্তাও হয় না। অর্থাৎ পরমাত্মার স্বরূপে বুদ্ধি স্থির রাখা তো দূরের কথা; বিষয়াসক্তির জন্য যে ব্যক্তি পরমাত্ম-স্বরূপের চিন্তাও করতে পারে না, তার মন সর্বদাই বিষয়ে রমণ করে।

প্রশ্ন—ভাবনাহীন মানুষ শান্তি পায় না, এই কথার অর্থ কী?

উত্তর—এর দ্বারা দেখানো হয়েছে যে পরম আনন্দ এবং শান্তির সমুদ্র পরমাত্মার চিন্তা না হওয়ায় অযুক্ত মানুষের চিত্ত সর্বদা বিক্ষিপ্ত থাকে; তার মধ্যে কাম-ক্রোধ, লোভ-ঈর্ষা ইত্যাদির জন্য মনে সবসময় জ্বালা ও ব্যাকুলতা বজায় থাকে। তাই সে কখনও শান্তি পায় না।

প্রশ্ন—শান্তিরহিত মানুষের সুখ লাভ সম্ভব হয় কী করে? এই কথাটির অর্থ কী?

উত্তর—এর দ্বারা এই ভাব প্রকাশিত হয়েছে যে চিত্তে শান্তির উদয় না হলে মানুষ কোথাও, কোনো অবস্থাতে বা কোনো উপায়ে যথার্থ সুখ পেতে পারে না। বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদির সংযোগে এবং নিদ্রা-আলস্য ও প্রমাদে ভ্রমবশতঃ যে সুখ প্রতীয়মান হয়, বাস্তবে তা সুখ নয়, তা দুঃখের কারণ হওয়ায়, বস্তুত তা দুঃখরূপই।

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি।। ৬৭

কারণ জলের মধ্যে বিচরণশীল নৌকাকে বায়ু যেমন বিচলিত করে, তেমনই বিষয়ভোগে বিচরণকারী ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন যেটিতে আকর্ষিত হয়, সেই ইন্দ্রিয়টিই অযুক্ত পুরুষের বুদ্ধি হরণ করে।। ৬৭

প্রশ্ন—**'হি'** পদটির অর্থ কী?

উত্তর—পূর্বশ্লোকে বলা হয়েছে যে অযুক্ত ব্যক্তির নিশ্চল বুদ্ধি, চিন্তা, শান্তি ও সুখ হয় না; সেই বিষয়টি স্পষ্ট করে বলার জন্য সেসব কেন হয় না—তার কারণ এই শ্লোকে বলা হচ্ছে—সেই ভাবেরই দ্যোতক হেতুবাচক এই **'হি'** পদটি।

প্রশ্ন— জলে বিচরণশীল নৌকা এবং বায়ুর দৃষ্টান্ত দিয়ে এখানে কী বলা হয়েছে ?

উত্তর—দৃষ্টান্তে নৌকার স্থানে বুদ্ধি, বায়ুর স্থানে যে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মন থাকে, সেই ইন্দ্রিয়, জলাশয়ের স্থানে সংসাররূপ সমুদ্র এবং জলের স্থানে শব্দাদি বিষয়-সমুদয় বলা হয়েছে। গন্তব্য স্থানে যাওয়ার সময় জলে বিচরণশীল নৌকাকে প্রবল বায়ু দুভাবে বিচলিত করতে পারে —প্রথমতঃ নৌকাকে পথভ্রষ্ট করে প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে তাকে আলোড়িত করতে পারে, দ্বিতীয়ত অগাধ জলরাশিতে ডুবিয়ে দিতে পারে ; কিন্তু যদি কোনো বুদ্ধিমান নাবিক সেই বায়ুকে নিজের অনুকূল করতে পারে, তাহলে সেই বায়ু তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না, বরং গন্তব্যস্থলে শীঘ্র পৌঁছে দেয়। তেমনই যার মন-ইন্দ্রিয় নিজ বশে নেই, তেমন মানুষ যদি তার বুদ্ধিকে পরমাত্মার স্বরূপে অচল রাখতে চায়, তাহলেও তার ইন্দ্রিয়াদি তার মনকে আকর্ষিত করে তার বুদ্ধিকে দুভাবে বিচলিত করে। প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়াদি বুদ্ধিরূপ নৌকাকে পরমাত্মা থেকে সরিয়ে নানা প্রকার ভোগ প্রাপ্তির উপায় চিন্তায় ব্যাপৃত করা—এটি হল প্রবল তরঙ্গে বুদ্ধিরূপী নৌকাকে আলোড়িত করা এবং দ্বিতীয়তঃ পাপাচরণে নিয়োজিত করে অধঃপতিত করা—এটি হল নৌকাকে ডুবিয়ে দেওয়া। কিন্তু যার মন এবং ইন্দ্রিয়াদি বশে থাকে, তার বুদ্ধিকে এরা বিচলিত করতে পারে না, বরং বুদ্ধি-রূপ নৌকাকে পরমাত্মার কাছে পৌঁছতে সাহায্য করে। চৌষট্টি এবং পঁয়ষট্টিতম শ্লোকে একথাই বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—সব ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বুদ্ধিকে বিচলিত করার কথা না বলে এক ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই বুদ্ধিকে বিচলিত করার কথা বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ইন্দ্রিয়াদির প্রাবল্য দেখানো হয়েছে। তাৎপর্য হল সব ইন্দ্রিয়গুলি মিলিত হয়ে মানুষের বুদ্ধিকে বিচলিত করবে, তাতে বলার কিছু নেই বরং যে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মন যুক্ত হয়, সেই একটি ইন্দ্রিয়ই বুদ্ধিকে বিষয়ভোগে আবদ্ধ করে বিচলিত করে থাকে। দেখা যায় যে এক কর্ণেন্দ্রিয়ের বশ হয়ে মৃগ, স্পর্শেন্দ্রিয়ের বশ হয়ে হাতি, চক্ষু ইন্দ্রিয়ের বশ হয়ে পতঙ্গ, রসনা ইন্দ্রিয়ের বশ হয়ে মাছ এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বশ হয়ে ভ্রমর—এইরূপ কেবল এক একটি ইন্দ্রিয়ের বশে হওয়ায় এরা নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে থাকে। এইরূপ মানুষের বুদ্ধিও এক একটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই বিচলিত হওয়া সম্ভব।

প্রশ্ন—এখানে 'যৎ' এবং 'তৎ'-এর সম্বন্ধ 'মনে'র সঙ্গে মানা হবে না কেন ?

উত্তর—এখানে **'ইন্দ্রিয়াণাম্'** পদে **'নির্ধারণে ষষ্ঠী'**, সুতরাং ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে যে একটি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মন থাকে, তার সঙ্গে 'যৎ' পদটির সম্বন্ধ মেনে নেওয়া যথার্থ এবং 'যৎ' ও 'তৎ'-এর নিত্য সম্বন্ধ, সুতরাং 'তৎ'-এর সম্বন্ধও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গেই হবে। **'অনুবিধীয়তে'**-তে **'অনু'** উপসর্গ নয়, এটি কর্ম-প্রবচনীয় সংজ্ঞক অব্যয়, তাই তার সহযোগে 'যৎ'-এ দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়েছে এবং কর্মকর্তৃপ্রক্রিয়া অনুসারে **'বিধীয়তে'র কর্মভূত** 'মনঃ' পদটিই কর্তা-রূপে প্রযুক্ত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত পরবর্তী শ্লোকে 'তস্মাৎ' পদটির প্রয়োগ করে ইন্দ্রিয় বশকারীদের বুদ্ধি স্থির বলা হয়েছে, তাই এখানেও 'যৎ' এবং 'তৎ' পদের ইন্দ্রিয়ের সঙ্গেই সম্পর্ক মেনে নেওয়া যুক্তিসংগত মনে হয়।

প্রশ্ন—শুধু মন বা শুধুমাত্র একটি ইন্দ্রিয় কী বুদ্ধিকে হরণ করতে সক্ষম ?

উত্তর—মন সঙ্গে না থাকলে একাকী ইন্দ্রিয় বুদ্ধিকে হরণ করতে পারে না, তবে মন ইন্দ্রিয়াদি ব্যতীত একাই বুদ্ধিকে হরণ করতে সক্ষম।

সম্বন্ধ—এভাবে অযুক্ত ব্যক্তির বুদ্ধি বিচলিত হওয়ার কারণ জানিয়ে এবার পুনরায় স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থা লাভের জন্য সর্বভাবে ইন্দ্রিয় সংযমের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা বলে স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের অবস্থার বর্ণনা করেছেন।

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।। ৬৮

সেইজন্য হে মহাবাহো ! যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গুলি ইন্দ্রিয়াদির বিষয় থেকে সর্বপ্রকারে নিবৃত্ত হয়েছে,

তাঁরই প্রজ্ঞা স্থির হয়েছে জানবে।। ৬৮।।

প্রশ্ন—'তস্মাৎ' পদটির অর্থ কী ?

উত্তর—পূর্বশ্লোকে বলা হয়েছে যে যার মন ও ইন্দ্রিয়াদি বশে নেই, সেই বিষয়াসক্ত মানুষের ইন্দ্রিয়াদি তার মনকে বিষয়ে আকর্ষিত করে বুদ্ধিকে বিচলিত করে অর্থাৎ স্থির থাকতে দেয় না। তাই মন ও ইন্দ্রিয়াদি অবশ্যই বশীভূত করা উচিত। এটি লক্ষ্য করে এখানে **'তস্মাৎ'** পদটির প্রয়োগ হয়েছে।

প্রশ্ন—'মহাবাহো' সম্বোধনটির ভাব কী ?

উত্তর—যাঁর বাহুদ্বয় দীর্ঘ, মজবুত ও বলিষ্ঠ, তাঁকেই বলা হয় 'মহাবাহু'। এই সম্বোধন শূরবীরের দ্যোতক। এই সম্বোধন প্রয়োগ করে ভগবান এই ভাবপ্রকাশ করেছেন যে, তুমি অত্যন্ত শূরবীর, অতএব ইন্দ্রিয় ও মনকে বশে করা তোমার পক্ষে বড় ব্যাপার নয়।

প্রশ্ন—ইন্দ্রিয়াদির বিষয়গুলি থেকে ইন্দ্রিয়াদিকে সর্বভাবে নিগৃহীত করা কাকে বলে ?

উত্তর—শ্রোত্রাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের শব্দাদি যত বিষয় আছে, সেইসব বিষয়ে কোনো বাধা না মেনে প্রবৃত্ত হওয়া ইন্দ্রিয়গুলির স্বভাব ; কারণ অনাদিকাল থেকে জীব এই সব ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয়াদি ভোগ করে এসেছে, সেইজন্য ইন্দ্রিয়গুলি এতে আসক্ত হয়ে পড়েছে। ইন্দ্রিয়গুলির এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি রোধ করা, তাদের বিষয় লোলুপ স্বভাবের পরিবর্তন করা, তার মধ্যে বিষয়াসক্তি আসতে না দেওয়া, মন-বুদ্ধিকে বিচলিত করার শক্তি থাকতে না দেওয়া—এই হল তাকে তার বিষয় থেকে চিরতরে নিগৃহীত করে নেওয়া। এইভাবে যাঁর ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত হয়েছে, সেই ব্যক্তি যখন ধ্যানের সময় ইন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়া (প্রতিটি ইন্দ্রিয়কে তার বিষয় থেকে সংযত করা, যেমন নেত্রকে দৃশ্য থেকে, কর্ণকে শব্দ থেকে ইত্যাদি ইত্যাদি) ত্যাগ করেন, তখন তাঁর কোনো ইন্দ্রিয় কোনো বিষয় গ্রহণ করতেও পারে না অথবা নিজ সূক্ষ্মবৃত্তি দ্বারা মনে বিক্ষেপও উৎপন্ন করতে সক্ষম হয় না। সেইসময় ইন্দ্রিয়গুলি মনে তদাকার হয়ে যায় এবং ব্যুত্থান সময়ে যখন তিনি দেখা-শোনা ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া করতে থাকেন, তখন ইন্দ্রিয়গুলি আসক্তি শূন্য হয়ে নিয়মিতরূপে যথাযোগ্য শব্দসমূহ বিষয়াদি গ্রহণ করে। কোনো বিষয়ই তাঁর মনকে আকর্ষিত করতে পারে না, বরং মনেরই অনুসরণ করে। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি লোকসংগ্রহের জন্য যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যত সময় ধরে যে শাস্ত্রসম্মত বিষয় গ্রহণ উচিত বলে মনে করেন, সেই ইন্দ্রিয় ততক্ষণ সময় সেই বিষয় গ্রহণ করে, এর অন্যথা কোনো ইন্দ্রিয় কোনো বিষয়কেই গ্রহণ করতে পারে না। এইভাবে ইন্দ্রিয়াদির ওপর পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করে সেগুলির স্বাধীনতা চিরতরে বিনাশ করে সেগুলিকে নিজের অনুকূলে আনা—একেই বলা হয় ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ে ইন্দ্রিয়াদিকে সর্বপ্রকারে নিগৃহীত করা।

প্রশ্ন—আটান্নতম শ্লোকের এবং এই শ্লোকের উত্তরার্ধ একই প্রকার ; তাহলে ওখানে পূর্বার্ধে **'সংহরতে'** এবং এই শ্লোকে **'নিগৃহীতানি'** পদ প্রয়োগ করে দুটির মধ্যে কী পার্থক্য দেখানো হয়েছে ?

উত্তর—আটান্নতম শ্লোকে ভগবান অর্জুনের **'কিমাসীত'** **'কীভাবে অবস্থান করেন'**—এই তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির অক্রিয়-অবস্থার বর্ণনা করেছেন ; তাই ওখানে কচ্ছপের দৃষ্টান্ত দিয়ে **'সংহরতে'** পদের দ্বারা 'বিষয় থেকে সরিয়ে নেওয়া' বলেছেন। বাহ্যভাবে ইন্দ্রিয়াদিকে বিষয় থেকে সরিয়ে নেওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষেও সম্ভব ; কিন্তু উল্লিখিত ক্ষেত্রে সরিয়ে নেওয়ার মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে, কারণ সেটি স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ। সুতরাং আসক্তিরহিত মন ও ইন্দ্রিয়াদির সংযমও এই সরিয়ে নেওয়ার অন্তর্গত। কিন্তু এখানে ভগবান স্থিতপ্রজ্ঞের স্বাভাবিক অবস্থার বর্ণনা করেছেন, তাই **'নিগৃহীতানি'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। বিষয়াসক্তি রহিত হলেই সবদিক থেকে মন-ইন্দ্রিয় এইভাবে নিগৃহীত হয়। 'নি' উপসর্গ এবং **'সর্বশঃ'** বিশেষণ দ্বারা এটিই প্রমাণিত হয়। সুতরাং দুটির বাস্তবিক স্থিতিতে কোনো পার্থক্য না থাকলেও ওখানে অক্রিয়- অবস্থার বর্ণনা আছে আর এখানে সব সময়ের সাধারণ অবস্থার—দুটির মধ্যে এই হল পার্থক্য।

প্রশ্ন—তাঁর বুদ্ধি স্থির, এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা এইভাবে দেখানো হয়েছে যে যাঁর মনসহ সমস্ত ইন্দ্রিয় উপরোক্ত ভাবে বশীভূত হয়েছে, তাঁরই বুদ্ধি স্থির ; যাঁর মন, ইন্দ্রিয় বশে নেই, তাঁর বুদ্ধি স্থির থাকতে পারে না।

সম্বন্ধ—এইভাবে মন ও ইন্দ্রিয়াদি সংযম না করাতে ক্ষতি এবং সংযম করলে লাভ দেখিয়ে ও স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থা প্রাপ্ত করার জন্য রাগ-দ্বেষ পরিত্যাগপূর্বক মনসহ ইন্দ্রিয়াদির সংযমের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করেছেন। এবার সাধারণ বিষয়াসক্ত মানুষে এবং মন-ইন্দ্রিয় সংযম করে ঈশ্বরপ্রাপ্ত স্থিরবুদ্ধি মহাপুরুষের মধ্যে কী পার্থক্য, এই বিষয়টি রাত ও দিনের দৃষ্টান্ত দ্বারা বোঝাতে গিয়ে তার স্বাভাবিক অবস্থার বর্ণনা করেছেন—

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥ ৬৯

সমস্ত প্রাণীর পক্ষে যা রাত্রির সমান, সেই নিত্যজ্ঞানস্বরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তিতে স্থিতপ্রজ্ঞ যোগী জাগ্রত থাকেন এবং যে বিনাশশীল জাগতিক সুখে সমস্ত প্রাণী জাগ্রত (সতর্ক) থাকে, পরমাত্ম তত্ত্বজ্ঞানী মুনির কাছে তা রাত্রির সমান॥ ৬৯

প্রশ্ন—'**সংযমী**' পদটি এখানে কিসের বাচক ?

উত্তর—যিনি মন ও ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত করে পরমাত্মাকে লাভ করেছেন, যাঁকে এই প্রকরণে স্থিতপ্রজ্ঞ নামে বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁরই বাচক এখানে '**সংযমী**' পদটি ; কারণ উত্তরার্ধে তাঁর জন্যই '**পশ্যতঃ**' পদটি প্রয়োগ করা হয়েছে, যার অর্থ '**জ্ঞানী**'।

প্রশ্ন—এখানে সমস্ত প্রাণীর ক্ষেত্রে রাত্রি বলার কী তাৎপর্য ? তাতে স্থিতপ্রজ্ঞ যোগীর জেগে থাকা কী ?

উত্তর—অজ্ঞ ব্যক্তি এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের অনুভবে রাত ও দিনের ন্যায় অত্যন্ত পার্থক্য আছে, এই ভাব দেখানোর জন্য রাত্রির উদাহরণ দিয়ে সাধারণ অজ্ঞ ব্যক্তিদের এবং জ্ঞানীব্যক্তিদের অবস্থানের বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে রাত্রির অর্থ সূর্যাস্তের পরে হওয়া রাত্রি নয়, কিন্তু যেভাবে আলোকোজ্জ্বল ঝলমল দিনকে পেচক তার দৃষ্টিদোষবশত তিমিরাচ্ছন্ন দেখে, তেমনই অনাদিসিদ্ধ অজ্ঞানের পরদা দ্বারা অন্তঃকরণরূপ নেত্রের বিবেক-বিজ্ঞানরূপ প্রকাশ-শক্তি আবৃত থাকায় অবিবেচক মানুষ স্বপ্রকাশ নিত্যবোধ পরমানন্দময় পরমাত্মাকে দেখতে পায় না। সেই পরমাত্মার প্রাপ্তিরূপ সূর্য প্রকাশিত হলে যে পরম শান্তি ও নিত্য আনন্দের প্রত্যক্ষ অনুভব হয় তা বাস্তবে দিনের ন্যায় প্রকাশমান হলেও পরমাত্মার গুণ, প্রভাব, রহস্য, তত্ত্ব সম্পর্কে যারা অজ্ঞ তাদের কাছে তা রাত্রিরই সমান। কারণ তারা সেই দিকে সর্বদাই বিমুখ থাকে, তাদের সেই পরমানন্দের কিছুই জানা নেই। তাই এই পরমাত্মার প্রাপ্তিই সমস্ত প্রাণীর কাছে এক্ষেত্রে রাত্রি। আবার এই রাত্রিই ঈশ্বর প্রাপ্ত সংযমী ব্যক্তিদের কাছে দিনের সমান। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিদের সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করে নিরন্তর তাতে অবস্থান করা—সেটিই হল তাঁদের ঐসব সম্পূর্ণ প্রাণীদের কাছে যা রাত্রি তাতে জেগে থাকা।

প্রশ্ন—সমস্ত প্রাণীদের জেগে থাকা কাকে বলে ? যাতে সব প্রাণী জেগে থাকে, তা পরমাত্মার তত্ত্বজ্ঞ মুনির কাছে রাত্রির সমান—এর মর্মার্থ কী ?

উত্তর—যদিও ইহলোক ও পরলোকে যত ভোগ আছে, সে সবই বিনাশশীল, ক্ষণিক, অনিত্য ও দুঃখরূপ, তবুও অনাদিসিদ্ধ অন্ধকারাচ্ছন্ন অজ্ঞানতা-বশতঃ বিষয়াসক্ত মানুষ তাকেই নিত্য ও সুখরূপ বলে মনে করে। তাদের কাছে বিষয় ভোগের থেকে বেশি আর কোনো সুখ নেই। এইভাবে ভোগাসক্ত হয়ে ভোগলাভের চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকা, তার প্রাপ্তিতে আনন্দ অনুভব করা—সমস্ত প্রাণীদের কাছে এটিই হল জেগে থাকা। এই ইন্দ্রিয় ও বিষয়াদির সংযোগে ও প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা হতে উৎপন্ন সুখরাত্রির ন্যায় অজ্ঞানরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে তা রাত্রিই অর্থাৎ ঘোর অন্ধকার। তা সত্ত্বেও অজ্ঞপ্রাণীরা একেই দিন মনে করে এতে এমনভাবে জেগে থাকে, সতর্ক থাকে, যেমন কোনো ব্যক্তি নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখার সময় মনে করে যে আমি জেগে আছি। কিন্তু পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞানী পুরুষের অনুভবে, স্বপ্নোত্থিত মানুষের যেমন স্বপ্নজগতের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকে না ; তেমনই তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের দৃষ্টিতে এক সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা ব্যতীত কোনো বস্তুরই অস্তিত্ব থাকে না। সেই জ্ঞানী ব্যক্তি এই দৃশ্য জগতের স্থানে এর অধিষ্ঠান স্বরূপ পরমাত্মতত্ত্বকেই প্রত্যক্ষ করেন ; তাই তাঁর কাছে সমস্ত জাগতিক ভোগ ও বিষয়ানন্দ রাত্রির সমান।

সম্বন্ধ—এইভাবে রাত্রির উপমার দ্বারা জ্ঞানী ও অজ্ঞ ব্যক্তিদের অবস্থানের পার্থক্য জ্ঞাপন করে এবার সমুদ্রের উপমার দ্বারা এই ভাব দেখাচ্ছেন যে জ্ঞানী ব্যক্তি পরম শান্তিলাভ করেন এবং ভোগকামনাকারী অজ্ঞ ব্যক্তি শান্তি লাভ করে না—

আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী।। ৭০

যেমন বিভিন্ন নদীর জল সর্বত্র পরিপূর্ণ অচল, স্থির সমুদ্রে এসে তাকে বিচলিত না করেই মিলিত হয়ে যায়, তেমনই সমস্ত বিষয়ভোগ যাঁর মধ্যে কোনো বিকার উৎপন্ন না করে বিলীন হয়ে যায়, তিনিই পরমশান্তি লাভ করেন, ভোগাকাঙ্ক্ষীরা নয় ।। ৭০

প্রশ্ন— স্থিতপ্রজ্ঞ জ্ঞানীদের সঙ্গে সমুদ্রের উপমা এখানে কী অভিপ্রায় প্রযুক্ত হয়েছে ?

উত্তর—কোনো জড় বস্তুর উপমার সাহায্যে স্থিতপ্রজ্ঞ যোগীর প্রকৃত স্থিতির সম্পূর্ণ বর্ণনা সম্ভব নয় ; তবুও উপমার সাহায্যে সেই অবস্থিতির কিছু অংশ লক্ষ্য করানো সম্ভব। অতএব সমুদ্রের উপমায় এই ভাব বুঝতে হবে যে সমুদ্র যেমন '**আপূর্যমাণম্**' অর্থাৎ গভীর জলে পরিপূর্ণ, স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিও তেমনই অনন্ত আনন্দে পরিপূর্ণ। সমুদ্রের যেমন জলের প্রয়োজন থাকে না, তেমনই স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিরও কোনো জাগতিক ভোগের বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই, তিনি সর্বদাই আপ্তকাম। সমুদ্রের স্থিতি যেমন অচল, ভয়ানক ঝড়-বাদল হলে বা বিভিন্ন নদীর জল তার মধ্যে প্রবেশ করলে সমুদ্র যেমন তার স্থিতি থেকে বিচলিত হয় না, মর্যাদা ত্যাগ করে না, তেমনই পরমাত্মার স্বরূপে স্থিত যোগীর স্থিতিও সর্বদা অচল হয়। অতিবড় সাংসারিক সুখ-দুঃখের সংযোগ-বিয়োগেও তাঁর স্থিতিতে কোনো পার্থক্য হয় না, তিনি সর্বদা সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাতে অটল ও একরস হয়ে অবস্থান করেন।

প্রশ্ন— '**সর্বে**' বিশেষণের সঙ্গে '**কামাঃ**' পদটি এখানে কীসের বাচক এবং স্থিতপ্রজ্ঞে সেগুলির সমুদ্রে জলের ন্যায় বিলীন হয়ে যাওয়া কাকে বলে ?

উত্তর— এখানে '**সর্বে**' বিশেষণের সঙ্গে '**কামাঃ**' পদটি '**কাম্যন্তে ইতি কামাঃ**' অর্থাৎ যার জন্য কামনা করা হয় তাকে কাম বলে— এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে এই পদটি সমস্ত ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ের বাচক—কামনার বাচক নয়। কারণ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির কামনা চিরতরে বিনষ্ট হয়, তাহলে কামনা কীভাবে তাঁর মধ্যে ব্যাপৃত হবে ? সুতরাং সমুদ্রের যেমন জলের প্রয়োজন না থাকলেও বহু নদ-নদীর জলপ্রবাহ তাতে প্রবেশ করে, কিন্তু নদী বা সরোবরের মতো তাতে বন্যাও হয় না বা সে নিজ অবস্থান থেকে বিচলিত হয়ে মর্যাদা ত্যাগ করে না। সমস্ত জলপ্রবাহই তাতে কোনোপ্রকার বিকৃতি উৎপন্ন না করেই বিলীন হয়ে যায়। তদনুরূপ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিরও কোনো জাগতিক ভোগ্যবস্তুর কিঞ্চিৎমাত্র প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও প্রারব্ধ অনুসারে তাঁর নানাপ্রকার ভোগ প্রাপ্ত হতে থাকে—অর্থাৎ তাঁর মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে প্রারব্ধ অনুসারে নানা প্রকার অনুকূল, প্রতিকূল বিষয় সংযোগ হতে থাকে। কিন্তু সেই ভোগ তাঁর মধ্যে হর্ষ-বিষাদ, রাগ-দ্বেষ, কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহ, ভয়-উদ্বেগ বা অন্য কোনো প্রকারের কোনো বিকার উৎপন্ন করে তাঁকে তাঁর অটল স্থিতি থেকে বা শাস্ত্রমর্যাদা থেকে বিচ্যুত করতে পারে না, সেগুলির সংযোগে তাঁর স্থিতিতে কখনো বিন্দুমাত্র পার্থক্য হয় না। কোনো প্রকার ক্ষোভ উৎপন্ন না করেই সেগুলি তাঁর পরমানন্দ স্বরূপে তদাকার হয়ে বিলীন হয়ে যায়—এই হল স্থিতপ্রজ্ঞে বিষয়াদির জলের ন্যায় সমুদ্রে বিলীন হয়ে যাওয়া।

প্রশ্ন—তিনিই পরম শান্তিলাভ করেন—ভোগাকাঙ্ক্ষীরা নয়—এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা দেখানো হয়েছে, যিনি উপরোক্ত প্রকারে আপ্তকাম, যাঁর কোনোপ্রকার ভোগের প্রয়োজন নেই, যাঁর মধ্যে সমস্ত ভোগ প্রারব্ধ অনুসারে আপনা-আপনি এসে বিলীন হয়ে যায় এবং যিনি নিজে কোনো ভোগ কামনা করেন না, তিনিই পরম শান্তিলাভ করেন।

ভোগাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি কখনো শান্তিলাভ করে না। কারণ তাদের চিত্ত সর্বদা নানাপ্রকার ভোগ ও কামনায় বিক্ষিপ্ত থাকে আর যেখানে বিক্ষেপ থাকে, সেখানে শান্তি কীভাবে সম্ভব ? সেখানে তো প্রতি পদে চিন্তা, ঈর্ষা এবং শোকই অবস্থান করবে।

প্রশ্ন—আটান্নতম থেকে এই শ্লোক পর্যন্ত অর্জুনের তৃতীয় প্রশ্নেরই উত্তর বলে যদি ধরা হয়, তাহলে আপত্তি কীসের ; কারণ এই শ্লোকে সমুদ্রের ন্যায় অচল থাকার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর—এটি তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর মানা সম্ভব নয়, কারণ তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর আটান্নতম শ্লোক থেকে শুরু করে একষট্টিতম শ্লোকে সমাপ্ত করা হয়েছে ; তাই সেখানে **'আসীত'** পদটি উদ্ধৃত হয়েছে। এর পরে প্রসঙ্গবশতঃ বাষট্টিতম ও তেষট্টিতম শ্লোকে বিষয় চিন্তা দ্বারা আসক্তিবশতঃ অধঃপতন দেখিয়ে চৌষট্টিতম শ্লোক থেকে চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর আরম্ভ হয়েছে, **'চরন্'** পদটির দ্বারা এই পার্থক্য স্পষ্ট। এই বিষয়ে নৌকার দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়াসক্ত অযুক্ত পুরুষের বিচরণশীল ইন্দ্রিয়াদির কোনো একটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বুদ্ধি হরণ করার কথা বলা হয়েছে। এতেও **'চরতাম্'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়াও এই শ্লোকে **'সর্বে কামাঃ প্রবিশন্তি'** পদ দ্বারা বলা হয়েছে যে সম্পূর্ণ ভোগ তার মধ্যে প্রবেশ করে। অক্রিয় অবস্থাতে প্রবেশের সব দ্বারই বন্ধ থাকে, কারণ সেখানে ইন্দ্রিয়াদি বিষয়-সংসর্গরহিত হয়। এখানে ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা আচরণের কথা বলা হয়েছে তাই সেখানে ভোগাদির প্রবিষ্ট হওয়া সম্ভব। তাঁর পরমাত্মার স্বরূপে 'অচল' স্থিতি থাকে, কিন্তু ব্যবহারে তিনি অক্রিয় নন। সুতরাং এখানে চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর মেনে নেওয়াই যুক্তিসংগত।

সম্বন্ধ—'স্থিতপ্রজ্ঞ কীভাবে বিচরণ করেন ?' অর্জুনের এই চতুর্থ প্রশ্ন ঈশ্বরপ্রাপ্ত পুরুষদের বিষয়েই করা হয়েছিল ; কিন্তু এই প্রশ্ন আচরণ বিষয়ক হওয়ায় তার উত্তরে চৌষট্টিতম শ্লোক থেকে এই পর্যন্ত কীভাবে আচরণ করলে কে শীঘ্র স্থিতপ্রজ্ঞ হতে পারেন, কে পারেন না এবং মানুষ যখন স্থিতপ্রজ্ঞ হন, সেই সময় তাঁর স্থিতি কেমন হয়—এই সব কথা বলা হয়েছে। এবার চতুর্থ প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দিতে গিয়ে স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের আচরণের প্রকার জানাচ্ছেন—

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥ ৭১

যে ব্যক্তি সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করে মমতাবর্জিত, অহংকাররহিত এবং নিস্পৃহ হয়ে বিচরণ করেন, তিনিই পরম শান্তি লাভ করেন ॥ ৭১

প্রশ্ন—**'সর্বান্'** বিশেষণের সঙ্গে **'কামান্'** পদটি কীসের বাচক এবং সর্বপ্রকারের কামনার ত্যাগ বলতে কী বুঝায় ?

উত্তর—ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত ভোগের সর্বপ্রকার কামনার বাচক এই **'সর্বান্'** বিশেষণের সঙ্গে **'কামান্'** পদটি। এই সর্বপ্রকার ভোগের সমস্ত কামনা থেকে চিরতরে রহিত হওয়াই হল এগুলি ত্যাগ করা।

এখানে **'কামান্'** পদ শব্দাদি বিষয়ের বাচক নয়, কারণ এর দ্বারা অর্জুনের চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে এবং স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কীরূপ আচরণ করেন তা বলা হয়েছে। সুতরাং এখানে যদি **'কামান্'** পদের অর্থ যদি শুধুমাত্র শব্দাদি বিষয় ধরা হয় তাহলে তা সর্বতোভাবে কামনা পরিত্যাগ করে বিচরণ করা বোঝায় না।

প্রশ্ন—**'নিরহংকারঃ'**, **'নির্মমঃ'** এবং **'নিঃস্পৃহ'**—এই তিনটি পদের পৃথক পৃথক কী ভাব এবং এরূপে বিচরণ করা কাকে বলে ?

উত্তর—মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে শরীরের প্রতি সাধারণ অজ্ঞ মানুষের একাত্মবোধ থাকে, যার জন্য সে শরীরকেই নিজের স্বরূপ বলে মনে করে, শরীর ব্যতীত নিজেকে ভাবতেই পারে না, শরীরের সুখ-দুঃখেই সুখী ও দুঃখী হয়, এরূপ দেহ-অভিমানকেই বলা হয় 'অহংকার', এবং তার থেকে সর্বতোভাবে রহিত হয়ে যাওয়াকে বলা হয় 'নিরহংকার' অর্থাৎ অহংকাররহিত

হওয়া।

মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি-সহ শরীরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত স্ত্রী, পুত্র, ভাই, বন্ধু-বান্ধব এবং গৃহ-ধন-ঐশ্বর্য ইত্যাদি পদার্থে, নিজের কৃত কর্মে এবং সেই কর্মের ফলরূপ সমস্ত ভোগাদিতে সাধারণ মানুষের মমত্ববোধ থাকে অর্থাৎ এই সবকে সে নিজের বলে মনে করে ; এই ভাবের নাম 'মমতা', এর থেকে সর্বতোভাবে রহিত হয়ে যাওয়াই হল 'নির্মম' বা মমতাশূন্য হওয়া।

কোনো অনুকূল বস্তু না পেলে মনে যখন এরূপ ভাব হয় যে ঐ বস্তুটির প্রয়োজনীয়তা আছে, সেটি না পেলে চলবে না, এই আকাঙ্ক্ষার নাম স্পৃহা, সেই আকাঙ্ক্ষার থেকে সর্বতোভাবে রহিত হয়ে যাওয়াই হল 'নিঃস্পৃহ' অর্থাৎ স্পৃহারহিত হওয়া। কামনার সূক্ষ্মরূপ হল স্পৃহা, তাই সমস্ত কামনা ত্যাগের থেকে এই ত্যাগকে পৃথক বলা হয়েছে।

এইভাবে এই বাক্যের মাধ্যমে অহংকার, মমতা, স্পৃহারহিত হয়ে নিজ বর্ণ, আশ্রম, প্রকৃতি ও পরিস্থিতি অনুসারে কেবলমাত্র লোকসংগ্রহার্থে ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ে বিচরণ করা অর্থাৎ দেখা-শোনা, খাওয়া-দাওয়া, শয়ন-জাগরণ ইত্যাদি শাস্ত্রবিহিত সমস্ত কর্মে সমস্ত কামনা ত্যাগ করে অহংকার-মমতা ও স্পৃহারহিত হয়ে বিচরণ করাকে লক্ষ্য করা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে **'নিঃস্পৃহ'** পদের অর্থ আসক্তিরহিত মেনে নিলে আপত্তি কীসের ?

উত্তর—স্পৃহা হল আসক্তিরই কার্য। তাই এখানে স্পৃহার অর্থ আসক্তি ধরা হলে কোনো দোষ নেই ; কিন্তু 'স্পৃহা' শব্দের অর্থ প্রকৃতপক্ষে সূক্ষ্ম কামনা, আসক্তি নয়। তাই আসক্তি না মেনে একে কামনারই সূক্ষ্ম স্বরূপ মানা উচিত।

প্রশ্ন—কামনা ও স্পৃহারহিত বলার পর আবার **'নির্মমঃ'** এবং **'নিরহঙ্কারঃ'** বলার কী প্রয়োজন ?

উত্তর—এখানে পূর্ণশান্তি প্রাপ্ত সিদ্ধ মহাপুরুষের বর্ণনা করা হয়েছে। তাই তাঁকে নিষ্কাম এবং নিঃস্পৃহের সঙ্গে নির্মম ও নিরহঙ্কারও বলা হয়েছে। কারণ নিষ্কাম এবং নিঃস্পৃহ হলেও যদি কোনো পুরুষের মধ্যে মমতা ও অহংকার থাকে তবে তিনি সিদ্ধপুরুষ নন। যে ব্যক্তি নিষ্কাম, নিঃস্পৃহ এবং নির্মম হয়েও অহংকাররহিত নয়, তিনিও সিদ্ধ নন। অহংকারের বিনাশেই সবকিছুর বিনাশ হয়। যতক্ষণ কারণরূপ অহংকার বজায় থাকে, ততক্ষণ কামনা, স্পৃহা, মমতা কোনো না কোনো রূপে থেকে যায় এবং যতক্ষণ বিন্দুমাত্রও কামনা-মমতা-স্পৃহা ও অহংকার থাকে, ততক্ষণ পূর্ণ শান্তি লাভ হয় না। এখানে **'শান্তিম্ অধিগচ্ছতি'** বাক্যের দ্বারাও পূর্ণ শান্তির কথাই প্রমাণিত হয়। এইরূপ পূর্ণ ও নিত্য শান্তি মমতা ও অহংকার থাকলে কখনও লাভ হয় না। তাই নিষ্কাম ও নিঃস্পৃহ বলার পরও নির্মম ও নিরহংকার বলা যথার্থ।

প্রশ্ন—তাহলে এক 'নিরহঙ্কার' শব্দটিই তো পর্যাপ্ত ছিল ; নিষ্কাম, নিঃস্পৃহ এবং নির্মম বলার প্রয়োজনীয়তা কীসের ?

উত্তর—একথা ঠিক যে নিরহংকার হলে কামনা-স্পৃহা ও মমতা থাকে না ; কারণ অহংকার সবের মূল কারণ। কারণের অভাবে কার্যের অভাব স্বতঃই সিদ্ধ। তবুও স্পষ্টভাবে বোঝাবার জন্য এই শব্দগুলির প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—তিনি শান্তিলাভ করেন, এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—এই শ্লোকে ঈশ্বরপ্রাপ্ত পুরুষের বিচরণ বিধি জানিয়ে অর্জুনের স্থিতপ্রজ্ঞবিষয়ক চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। সুতরাং উপরোক্ত কথার দ্বারা এই ভাব দেখানো হয়েছে যে এইভাবে বিষয়ে বিচরণকারী পুরুষই পরম শান্তিস্বরূপ ঈশ্বরপ্রাপ্ত স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি।

সম্বন্ধ—এইভাবে অর্জুনের চারটি প্রশ্নের উত্তর দেবার পর এবার স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির স্থিতির মহত্ত্ব জানিয়ে এই অধ্যায়ের উপসংহার করেছেন—

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি।। ৭২

হে অর্জুন ! এই হল ব্রহ্মপ্রাপ্ত পুরুষের স্থিতি, এই অবস্থা প্রাপ্ত হলে তিনি আর কখনো মোহগ্রস্ত হন না। অন্তিম সময়েও যিনি এই ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করেন, তিনিও ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন ॥ ৭২

প্রশ্ন—'এষা' এবং 'ব্রাহ্মী' এই দুটি বিশেষণের সঙ্গে 'স্থিতিঃ' পদটি কোন্ স্থিতির বাচক এবং তা লাভ করা কাকে বলে ?

উত্তর—ব্রহ্মবিষয়ক স্থিতিকে 'ব্রাহ্মী স্থিতি' বলা হয় এবং যে প্রকরণ চলছে তার দ্যোতক এই 'এষা' পদ ; অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে পঞ্চান্নতম শ্লোক থেকে বিভিন্ন স্থানে এই পর্যন্ত স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের যে স্থিতির বর্ণনা করা হয়েছে, যা ব্রহ্মপ্রাপ্ত মহাপুরুষের স্থিতি, এখানে তারই বাচক হল 'এষা' এবং 'ব্রাহ্মী' বিশেষণের সঙ্গে 'স্থিতিঃ' পদটি। এবং উপরোক্ত প্রকারে অহংকার-মমতা-আসক্তি-স্পৃহা ও কামনারহিত হয়ে সর্বতোভাবে নির্বিকার ও নিশ্চলভাবে সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার স্বরূপে নিত্য-নিরন্তর নিমগ্ন হয়ে থাকাই হল সেই স্থিতি লাভ করা।

প্রশ্ন—এই স্থিতি লাভ হলে যোগী কখনো মোহগ্রস্ত হন না—এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর— এর দ্বারা এই ভাব দেখানো হয়েছে যে, ব্রহ্ম কী ? ঈশ্বর কী ? সংসার কী ? মায়া কী ? এদের পরস্পরের সম্বন্ধ কী ? আমি কে ? কোথা হতে এসেছি ? আমার কর্তব্য কী ? আর আমি কি করছি —ইত্যাদি বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞান না হওয়া হল মোহ, অনাদিকাল থেকে জীব এভাবে মোহগ্রস্ত হয়ে আছে, সেই জন্যই সে এই সংসারচক্রে আবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু মানুষ যখন অহংকার, মমতা, আসক্তি ও কামনারহিত হয়ে উপরোক্ত ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করবে, তখন তার এই অনাদিসিদ্ধ মোহ সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। পুনরায় মোহ উৎপন্ন হয় না।

প্রশ্ন—অন্তকালেও এই স্থিতিতে স্থিত হয়ে যোগী ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন—এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—এই কথার দ্বারা এই ভাব দেখানো হয়েছে যে, যে ব্যক্তি জীবিতাবস্থাতেই এই স্থিতি লাভ করেন, তাঁর বিষয়ে তো বলারই কিছু নেই, তিনি তো ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ; কিন্তু যাঁরা সাধনা কালে অথবা অকস্মাৎ মৃত্যুকালেও এই ব্রাহ্মীস্থিতিতে স্থিত হন অর্থাৎ অহংকার, মমতা, আসক্তি, স্পৃহা ও কামনারহিত হয়ে অচলভাবে পরমাত্মার স্বরূপে স্থিত হন, তাঁরাও ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন।

প্রশ্ন—যে সাধক কর্মযোগে শ্রদ্ধা রাখেন এবং তাঁর মন যদি কোনো কারণবশতঃ মৃত্যুকালে সমভাবে স্থির না থাকে, তাহলে তাঁর কী গতি হয় ?

উত্তর—মৃত্যুকালে থাকা সমভাব সাধককে তৎক্ষণাৎ উদ্ধার করে দেয়, কিন্তু মৃত্যুকালে যদি সমভাব থেকে মন বিচলিত হয়ে যায়, তা হলেও তাঁর সাধনা ব্যর্থ হয় না ; তিনি যোগভ্রষ্টের গতি লাভ করেন এবং সমভাবের সংস্কার তাঁকে বলপূর্বক নিজের দিকে আকর্ষিত করে (৬।৪০-৪৪) এবং তিনি পরমাত্মাকে লাভ করেন।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২॥

ॐ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ

তৃতীয় অধ্যায়
(কর্মযোগ)

অধ্যায়ের নাম

এই অধ্যায়ে বিভিন্ন ভাবে বিহিত কর্মের অবশ্য প্রতিপালনের কথা বলা হয়েছে এবং প্রত্যেক মানুষের নিজ নিজ বর্ণ-আশ্রম অনুসারে বিহিত কর্ম কীভাবে করা উচিত, কেন করা উচিত, সেগুলি না করলে কী ক্ষতি, করলে কী লাভ, কোন্ কর্ম বন্ধনকারক, কোন্‌টি মুক্তির সহায়ক—ইত্যাদি বিষয় ভালোভাবে বলা হয়েছে। এইভাবে এই অধ্যায়ে কর্মযোগের বিষয় অন্যান্য অধ্যায়ের থেকে অধিক ও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, অন্য বিষয়ের আলোচনা অত্যন্ত কম করা হয়েছে, যা কিছু করা হয়েছে, তা-ও অত্যন্ত সংক্ষেপে ; তাই এই অধ্যায়ের নাম রাখা হয়েছে **'কর্মযোগ'**।

সংক্ষিপ্ত অধ্যায়-সার

এই অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে অর্জুন ভগবানের অভিপ্রায় বুঝতে না পারায় যেন অভিযোগের স্বরে তাঁর নিজের ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ সাধন বলার জন্য প্রার্থনা করছেন। তার উত্তর দিতে গিয়ে ভগবান তৃতীয়তে দুটি নিষ্ঠার বর্ণনা করে চতুর্থতে কোনো নিষ্ঠাতেই কর্মকে স্বরূপতঃ (বাহ্যতঃ) ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই বলে জানিয়েছেন। পঞ্চমে ক্ষণমাত্রের জন্যও কর্মত্যাগ সর্বতোভাবে অসম্ভব জানিয়ে ষষ্ঠতে শুধুমাত্র বাহ্যতঃ ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা কর্ম ত্যাগ করে বিষয়চিন্তাকারী মানুষদের মিথ্যাচারী বলেছেন এবং সপ্তমে মনের দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযম করে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনাসক্তভাবে যাঁরা কর্ম করেন তাঁদের প্রশংসা করেছেন। অষ্টম এবং নবমে কর্ম না করার অপেক্ষা কর্ম করা শ্রেষ্ঠ বলেছেন এবং কর্ম বিনা শরীর-নির্বাহ অসম্ভব জানিয়ে নিঃস্বার্থ ও অনাসক্তভাবে বিহিত কর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন। দশ থেকে দ্বাদশ শ্লোক পর্যন্ত প্রজাপতি ব্রহ্মার নির্দেশ উল্লেখ করে কর্মের প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ করে ত্রয়োদশে যজ্ঞশিষ্ট অন্নের দ্বারা সর্বপাপের বিনাশ হওয়া এবং যারা যজ্ঞ করে না তাঁদের পাপী বলেছেন। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শ্লোকে সৃষ্টি-চক্রের বর্ণনা করে সর্বব্যাপী পরমেশ্বর যজ্ঞরূপ সাধনে নিত্য প্রতিষ্ঠিত বলে জানিয়েছেন। ষোলোতম শ্লোকে যারা সেই সৃষ্টি-চক্র অনুসারে না চলে তাদের নিন্দা করেছেন। সতেরো এবং আঠারোতম শ্লোকে আত্মনিষ্ঠ জ্ঞানী মহাত্মা পুরুষের কর্তব্য পালনের বাধ্যবাধকতা থাকে না জানিয়ে বলেছেন যে তাঁদের কর্ম করা বা না করাতে কোনো প্রয়োজন থাকে না। উনিশতম শ্লোকে পূর্বে উল্লিখিত কারণে কর্ম করা আবশ্যক সিদ্ধ করে এবং নিষ্কাম কর্মের ফল পরমাত্মাপ্রাপ্তি জানিয়ে অর্জুনকে অনাসক্তভাবে কর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন। বিশতম শ্লোকে জনকাদির কর্ম দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্তির প্রমাণ দিয়ে এবং লোক সংগ্রহার্থেও কর্ম করা আবশ্যক বলে লোকসংগ্রহের সার্থকতা সিদ্ধ করেছেন। একুশতম শ্লোকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আচরণ ও উপদেশানুসারে লোকে কর্ম করে, এই বলে বাইশতম থেকে চব্বিশতম শ্লোকে ভগবান স্বয়ং নিজের দৃষ্টান্ত দিয়ে কর্ম করায় লাভ ও না করায় ক্ষতির কথা বলেছেন। পঁচিশতম ও ছাব্বিশতমতে জ্ঞানী ব্যক্তিরও লোকসংগ্রহার্থে কর্ম করা এবং অপরের দ্বারা কর্ম করানোর কথা জানিয়ে সাতাশতম ও আঠাশতমতে কর্মাসক্ত জনসমুদায়ের থেকে সাংখ্যযোগীর বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন করে ঊনত্রিশতমতে জ্ঞানী পুরুষকে সাধারণ মানুষদের বিচলিত না করার কথা বলেছেন। ত্রিশতমতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আশা, মমতা ও শোক সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে ভগবদর্পণ বুদ্ধির দ্বারা যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়ে একত্রিশতমতে সেই নির্দেশানুসারে চলা শ্রদ্ধাযুক্ত মানুষের মুক্ত হওয়া এবং বত্রিশতম শ্লোকে সেই অনুসারে যারা চলে না সেই দোষদর্শনকারীদের পতন হওয়ার কথা বলেছেন। তারপর তেত্রিশতমতে প্রকৃতি অনুযায়ী সমস্ত মানুষের বাহ্যিকভাবে কর্ম ত্যাগের অক্ষমতা জানিয়ে চৌত্রিশতম শ্লোকে রাগ-দ্বেষের বশবর্তী না হওয়ার প্রেরণা দিয়েছেন এবং পঁয়ত্রিশতম শ্লোকে পরধর্মের থেকে স্বধর্ম কল্যাণকারক ও পরধর্ম ভয়াবহ বলে জানিয়ে দিয়েছেন। ছত্রিশতম শ্লোকে অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন যে, 'মানুষকে বলপূর্বক পাপে কে প্রবৃত্ত করে ?'

সাঁইত্রিশতমতে কামরূপ বৈরী সকল পাপাচরণের মূল কারণ বলে জানিয়েছেন এবং আটত্রিশতম শ্লোকের থেকে একচল্লিশতম পর্যন্ত সেই কামকে অগ্নির ন্যায় দুষ্পূরণীয় এবং জ্ঞান আবরণকারী মহাশত্রু বলে, তার নিবাসস্থান বর্ণনা করে ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা তার বিনাশ করতে বলেছেন। পুনরায় বিয়াল্লিশতম শ্লোকে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি থেকে আত্মাকে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ জানিয়ে তেতাল্লিশতমতে বুদ্ধির দ্বারা মন সংযম করে কামনাশ করার নির্দেশ দিয়ে অধ্যায়ের সমাপ্তি করেছেন।

সম্বন্ধ—দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান **'অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্'** (২।১১) থেকে **'দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ম্'** (২।৩০) পর্যন্ত আত্মতত্ত্ব নিরূপণ করে সাংখ্যযোগের প্রতিপাদন করেছেন এবং **'বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু'** (২।৩৯) থেকে **'তদা যোগমবাপ্স্যসি'** (২।৫৩) পর্যন্ত সমবুদ্ধিরূপ কর্মযোগের বর্ণনা করেছেন। তারপর চুয়ান্নতম শ্লোক থেকে অধ্যায়ের সমাপ্তি পর্যন্ত অর্জুনের জিজ্ঞাসার উত্তরে ভগবান সমবুদ্ধিরূপ কর্মযোগের দ্বারা ঈশ্বরপ্রাপ্ত স্থিতপ্রজ্ঞ সিদ্ধপুরুষের লক্ষণ, আচরণ ও মহত্ত্ব প্রতিপাদন করেছেন। সেখানে কর্মযোগের মহিমা বলার সময় ভগবান সাতচল্লিশ এবং আটচল্লিশতম শ্লোকে কর্মযোগের স্বরূপ জানিয়ে অর্জুনকে কর্ম করতে বলেছেন। উনপঞ্চাশতম শ্লোকে সমবুদ্ধিরূপ কর্মযোগ অপেক্ষা সকাম কর্মের স্থান অত্যন্ত নীচে বলে জানিয়েছেন, পঞ্চাশতম শ্লোকে সমবুদ্ধিযুক্ত পুরুষের প্রশংসা করে অর্জুনকে কর্মযোগে রত হতে বলেছেন। একান্নতমতে জানিয়েছেন সমবুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানী ব্যক্তি অনাময় পদ প্রাপ্ত করেন। এই প্রসঙ্গ শুনে অর্জুন ভগবানের যথার্থ অভিপ্রায় অনুধাবন করতে পারেননি। 'বুদ্ধি' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান' মনে করায় তাঁর ভ্রম হয় এবং ভগবানের বক্তব্যে 'কর্মে'র থেকে 'জ্ঞানে'র অধিক মহিমা প্রতিভাত হতে থাকে এবং তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট বুঝতে অসুবিধা হওয়ায়, দুটি বিষয় যেন একাকার হয়ে গিয়েছিল। অতএব ভগবানের কাছে তা স্পষ্টভাবে জানতে চেয়ে এবং নিজের নিশ্চিত শ্রেয়ঃসাধন জানার ইচ্ছায় অর্জুন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করছেন—

জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন।
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব॥ ১

অর্জুন বললেন—হে জনার্দন ! আপনার মতে যদি কর্ম অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তাহলে হে কেশব, আমাকে এই ভয়ংকর কর্মে কেন নিযুক্ত করছেন ? ১

প্রশ্ন—কর্মের থেকে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, একথা এর আগে কোথায় বলেছেন ? যদি না বলে থাকেন, তাহলে অর্জুনের প্রশ্নের আধার কী ?

উত্তর—ভগবান এমন কথা কোথাওই বলেননি, কিন্তু অর্জুন ভগবানের কথার মর্ম ও তত্ত্ব বুঝতে না পারায় **'দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়'** দ্বারা এই কথা ভেবেছিলেন যে ভগবান 'বুদ্ধিযোগ' দ্বারা জ্ঞানকে লক্ষ্য করাচ্ছেন এবং সেই জ্ঞানের তুলনায় কর্মকে অত্যন্ত তুচ্ছ বলেছেন। বস্তুতঃ ঐস্থানে 'বুদ্ধিযোগ' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান' নয়। 'বুদ্ধিযোগ' ঐস্থানে সমবুদ্ধিপূর্বক অনুষ্ঠিত 'কর্মযোগের' বাচক এবং 'কর্ম' শব্দ হল সকাম কর্মের বাচক। কারণ ঐ শ্লোকে ভগবান ফলাকাঙ্ক্ষীদের **'কৃপণাঃ ফলহেতবঃ'** বলে অত্যন্ত দীন বলে জানিয়েছেন এবং সেই সকাম কর্মগুলিকে তুচ্ছ জানিয়ে **'বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ'** দ্বারা সমবুদ্ধিরূপ কর্মযোগের আশ্রয় গ্রহণ করতে আদেশ দিয়েছেন ; কিন্তু অর্জুন এই তত্ত্বটি অনুধাবন করতে পারেননি ; তাই তাঁর মনে উপরোক্ত প্রশ্নটি উঠেছিল।

প্রশ্ন—**'বুদ্ধি'** শব্দটির অর্থ এখানেও আগের মতো সমবুদ্ধিরূপ কর্মযোগ মনে করা হবে না কেন ?

উত্তর—এটা অর্জুনের প্রশ্ন। তিনি ভগবানের কথার প্রকৃত তাৎপর্য না বুঝে 'বুদ্ধি' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান' মনে করেছিলেন এবং তাই উপরোক্ত প্রশ্ন করছিলেন। অর্জুন যদি বুদ্ধির অর্থ সমবুদ্ধিরূপ কর্মযোগ বলে বুঝতেন তাহলে এই প্রশ্ন করার প্রয়োজন হত না। অর্জুন বুদ্ধির অর্থ 'জ্ঞান' ভেবেছিলেন, সুতরাং এখানে তাঁর ধারণা অনুযায়ী 'বুদ্ধি' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান' মনে করা যুক্তিসঙ্গত।

প্রশ্ন—আমাকে ভয়ংকর কর্মে কেন নিযুক্ত

করছেন ? এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—ভগবানের অভিপ্রায় বুঝতে না পারায় অর্জুন মনে করেছিলেন যে, যেসব কর্মকে ভগবান অত্যন্ত তুচ্ছ বলেছেন সেই কর্মগুলিতেই আমাকে প্রবৃত্ত করাচ্ছেন অর্থাৎ **'তস্মাদ্ যুদ্ধস্ব ভারত'** অতএব তুমি যুদ্ধ কর, **'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে'**—তোমার কর্মেই অধিকার, **'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি'**—যোগস্থিত হয়ে কর্ম কর ইত্যাদি বিধিবাক্য দ্বারা তিনি আমাকে যুদ্ধে লিপ্ত হতে বলেছেন। তাই অর্জুন উপরোক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে ভগবানের কাছে যেন অভিযোগের সুরে জানতে চেয়েছেন যে আপনি আমাকে এই যুদ্ধরূপ ভয়ানক পাপকর্মে কেন নিযুক্ত করছেন ?

প্রশ্ন—এখানে অর্জুন ভগবানকে 'জনার্দন' ও 'কেশব' নামে কেন সম্বোধন করলেন ?

উত্তর—**'সর্বৈর্জনৈরর্দ্যতে যাচ্যতে স্বাভিলষিত-সিদ্ধয়ে ইতি জনার্দনঃ'**—এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে সকলে যাঁর কাছে নিজ মনোরথ সিদ্ধির জন্য কামনা করে, তাঁর নাম হল 'জনার্দন' এবং 'ক'-ব্রহ্মা, 'অ'-বিষ্ণু, 'ঈশ'-মহেশ—এই তিন যাঁর 'ব'-বপু অর্থাৎ স্বরূপ, তাঁকে 'কেশব' বলা হয়। ভগবানকে এই নামে সম্বোধন করে অর্জুন জানাচ্ছেন যে, 'আমি আপনার শরণাগত—আমার কি কর্তব্য, সেটি বলার জন্য আমি পূর্বেই আপনার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছি (২।৭) এবং এখনও করছি ; কারণ আপনি সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। অতএব আমার ন্যায় প্রার্থনাকারী শরণাগতকে কৃপা করে আপনার স্থির সিদ্ধান্ত বলুন।'

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্॥ ২

আপনার মিশ্রিত বাক্য আমাকে যেন মোহগ্রস্ত করছে, সুতরাং তার মধ্যে একটি পথ আমাকে নিশ্চিত করে বলুন যাতে আমি কল্যাণ লাভ করতে পারি ॥ ২

প্রশ্ন—আপনি মিশ্রিত বাক্য দ্বারা আমাকে যেন মোহগ্রস্ত করছেন, এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যে বাক্যে কোনো একটি সাধন নিশ্চিত করে স্পষ্টভাবে বলা হয়নি, যাতে কয়েক প্রকার কথার সম্মিলন হয়েছে, তাকে বলা হয় 'ব্যামিশ্র'—মিশ্রিত বাক্য। এরূপ কথায় শ্রোতার বুদ্ধি কোনো এক স্থির সিদ্ধান্তে না পৌঁছে ভ্রমিত হয়ে যায়। ভগবানের বক্তব্যের তাৎপর্য না বোঝায় অর্জুনেরও ভগবানের বক্তব্য মিশ্রিত বলে মনে হয়েছিল ; কারণ 'বুদ্ধিযোগের থেকে কর্ম অতি নিকৃষ্ট, তুমি বুদ্ধির আশ্রয়ই গ্রহণ কর' (২।৪৯)—এই কথায় অর্জুন মনে করেছিলেন যে ভগবান জ্ঞানের প্রশংসা ও কর্মের নিন্দা করছেন এবং তাঁকে জ্ঞানের আশ্রয় নিতে বলছেন এবং 'বুদ্ধিমান ব্যক্তি পাপ-পুণ্য এখানেই পরিত্যাগ করেন' (২।৫০) এই কথায় অর্জুন ভেবেছিলেন যে পাপ-পুণ্যরূপ সমস্ত কর্ম স্বরূপতঃ (বাহ্যত) যাঁরা ত্যাগ করেন, ভগবান তাঁদের 'বুদ্ধিযুক্ত' বলেছেন। অন্য দিকে 'তোমার কর্মেই অধিকার' (২।৪৭), 'তুমি যোগে স্থিত হয়ে কর্ম কর' (২।৪৮) এইসব বাক্যে অর্জুন মনে করলেন যে ভগবান আমাকে কর্মে নিযুক্ত করছেন ; এতদ্ব্যতীত **'নিস্ত্রৈগুণ্যো ভব'**, **'আত্মবান্ ভব'** (২।৪৫) ইত্যাদি বাক্য দ্বারা কর্ম ত্যাগ এবং **'তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত'** (২।১৮), **'ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব'** (২।৩৮), **'তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব'** (২।৫০) ইত্যাদি কথা তিনি কর্মপ্রেরণার কথা বলে মনে করেছিলেন। এইরূপ উপরোক্ত নানা কথায় অর্জুন বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। তাই উপরোক্ত বাক্যে তিনি দুবার **'ইব'** পদটি প্রয়োগ করে এইভাব দেখিয়েছেন যে, যদিও আপনি প্রকৃতপক্ষে আমাকে স্পষ্ট এবং পৃথক পৃথক সাধনের কথা বলছেন, আপনি আমার পরম প্রিয় এবং হিতৈষী, সুতরাং আপনি আমাকে মোহগ্রস্ত করছেন না, বরং আমার মোহনাশ করার জন্যই এই উপদেশ দিচ্ছেন। কিন্তু আমার অজ্ঞতার জন্য আমার মনে হচ্ছে যে, আপনি যেন পরস্পর-বিরুদ্ধ এবং মিশ্রিত বাক্য দ্বারা আমার বুদ্ধি মোহগ্রস্ত করছেন।

প্রশ্ন—অর্জুনের যদি দ্বিতীয় অধ্যায়ের ঊনপঞ্চাশ ও পঞ্চাশতম শ্লোক দুটি শুনেই এইরূপ ভ্রম হয়ে থাকে, তাহলে তিপ্পান্নতম শ্লোকে ঐ প্রকরণটি সমাপ্ত হওয়া মাত্রই তিনি তাঁর ভ্রম দূর করার জন্য ভগবানকে কেন জিজ্ঞাসা করলেন না ? এত ব্যবধান হতে দিলেন কেন ?

উত্তর—একথা ঠিক যে অর্জুনের তখনই প্রশ্ন জেগেছিল, তাই চুয়ান্নতম শ্লোকেই তাঁর একথা জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল ; কিন্তু তিপান্নতম শ্লোকে যখন ভগবান জানালেন যে, 'তোমার বুদ্ধি যখন মোহরূপ কর্দম থেকে মুক্ত হবে এবং পরমাত্মার স্বরূপে স্থির হবে, তখন তুমি পরমাত্মার সংযোগরূপ যোগ প্রাপ্ত হবে' ; সেকথা শুনে অর্জুনের মনে পরমাত্মাপ্রাপ্তকারী স্থিরবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তির লক্ষণ ও আচরণ জানার প্রবল আগ্রহ হয়। সেইজন্য তিনি নিজের আগের প্রশ্নটি অন্তরালে রেখে স্থিতপ্রজ্ঞের বিষয়েই প্রথমে প্রশ্ন করেন এবং তার উত্তর পেয়েই তিনি এই প্রশ্নটি ভগবানকে উত্থাপন করেন। তিনি যদি প্রথমে ঐ প্রশ্নটি উত্থাপন করতেন, তাহলে স্থিতপ্রজ্ঞ সম্বন্ধীয় কথাটিতে অনেক ব্যবধান হয়ে যেত।

প্রশ্ন—সেই একটি কথা নিশ্চিত করে বলুন, যাতে আমি কল্যাণ লাভ করতে পারি—এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথার দ্বারা অর্জুন এই ভাব দেখিয়েছেন যে, এ পর্যন্ত আপনি আমাকে যত উপদেশ দিয়েছেন, তাতে বিরুদ্ধভাব প্রতীয়মান হওয়ায় আমি আমার কর্তব্য স্থির করতে পারছি না। আমি বুঝতে পারছি না যে আপনি আমাকে যুদ্ধ করতে বলছেন, নাকি সমস্ত কর্ম ত্যাগ করতে বলছেন ; যদি যুদ্ধ করতে বলেন তাহলে কী প্রকারে করতে বলেন, আর যদি কর্মত্যাগ করতে বলেন, তাহলে কর্মত্যাগের পর কি করণীয় তার নির্দেশ দিন। অতএব আপনি সবদিক থেকে ভাবনা-চিন্তা করে আমার কর্তব্য স্থির করে আমাকে এমন এক নিশ্চিত সাধন বলুন, যা পালন করে আমি কল্যাণ লাভ করতে পারি।

প্রশ্ন—এখানে 'শ্রেয়ঃ' পদটির অর্থ 'কল্যাণ' বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে শ্রেয়প্রাপ্তির দ্বারা অর্জুনের লক্ষ্য ইহলোক বা পরলোকের ভোগপ্রাপ্তি নয়, কারণ 'পৃথিবীর নিষ্কণ্টক রাজ্য এবং দেবতাদের আধিপত্য আমার শোক দূর করতে সক্ষম নয়' (২।৮) একথা তিনি আগেই বলেছিলেন। অতএব শ্রেয়প্রাপ্তির দ্বারা তাঁর অভিপ্রায় শোক-মোহ সর্বতোভাবে বিনাশ করে শাশ্বত শান্তি ও নিত্যানন্দ প্রদানকারী নিত্যবস্তু প্রাপ্ত করা, তাই এখানে 'শ্রেয়ঃ' পদটির অর্থ 'কল্যাণ' ধরা হয়েছে।

সম্বন্ধ—অর্জুনের এরূপ জিজ্ঞাসায় ভগবান অর্জুনের পক্ষে যা নিশ্চিত কর্তব্য সেই ভক্তিপ্রধান কর্মযোগ জানাবার উদ্দেশ্যে প্রথমে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে জানাচ্ছেন যে তাঁর বক্তব্য মিশ্রিত অর্থাৎ 'ব্যামিশ্র' নয় বরং সর্বতোভাবে স্পষ্ট ও পৃথকভাবে চিহ্নিত।

শ্রীভগবানুবাচ

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্।। ৩

শ্রীভগবান বললেন—হে নিষ্পাপ অর্জুন ! আমি পূর্বেই বলেছি যে ইহলোকে দু-প্রকারের নিষ্ঠা আছে। সাংখ্যযোগীর নিষ্ঠা জ্ঞানযোগে এবং কর্মযোগীর নিষ্ঠা কর্মযোগে।। ৩

প্রশ্ন—'অস্মিন্ লোকে' পদটি কোন্ লোকের বাচক ?

উত্তর—'অস্মিন্ লোকে' পদটি এই মনুষ্যলোকের বাচক, কারণ জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ—এই উভয় সাধনে মানুষেরই অধিকার থাকে।

প্রশ্ন—'নিষ্ঠা' পদটির অর্থ কী ? তার সঙ্গে 'দ্বিবিধা' বিশেষণের অর্থ কী ?

উত্তর—'নিষ্ঠা' পদের অর্থ 'স্থিতি'। তার সঙ্গে 'দ্বিবিধা' বিশেষণ প্রয়োগ করে ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে সাধনের স্থিতি প্রধানতঃ দুপ্রকারের হয়।

একটি স্থিতিতে মানুষ আত্মা এবং পরমাত্মাকে অভেদ মনে করে নিজেকে ব্রহ্মের থেকে অভিন্ন বলে মনে করে আর দ্বিতীয়টিতে পরমেশ্বরকে সর্বশক্তিমান সমস্ত জগতের হর্তা-কর্তা-স্বামী এবং নিজেকে তাঁর আজ্ঞাকারী সেবক বলে মনে করে।

প্রকৃতি হতে উৎপন্ন সমস্ত গুণই গুণাদিতে আবর্তিত হয় (৩।২৮), আমার এর সঙ্গে কোনোরূপ সম্পর্ক নেই—এরূপ মনে করে মন-ইন্দ্রিয় ও শরীর দ্বারা হওয়া সমস্ত ক্রিয়াগুলিতে কর্তৃত্ব-অভিমান থেকে সর্বতোভাবে রহিত হওয়া ; কোনো ক্রিয়া বা তার ফলে কিছুমাত্র অহংভাব, মমতা, আসক্তি ও কামনা না থাকা এবং সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে করে নিরন্তর পরমাত্মার স্বরূপে স্থিত হওয়া অর্থাৎ ব্রহ্মভূত (ব্রহ্মস্বরূপ) হওয়া (৫।২৪ ; ৬।২৭)—এ হল প্রথমে কথিত নিষ্ঠার স্বরূপ। এর নাম জ্ঞাননিষ্ঠা। এই স্থিতি লাভ করলে যোগী হর্ষ-বিষাদ-কামনার অতীত এবং সর্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন হন (১৮।৫৪) ; তখন তিনি সমস্ত জগৎকে আত্মাতে স্বপ্নবৎ কল্পিত দেখেন এবং আত্মাকে সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত দেখেন (৬।২৯)। এই নিষ্ঠা বা স্থিতির ফল হল পরমাত্মার স্বরূপের যথার্থ জ্ঞান লাভ হওয়া।

বর্ণ-আশ্রম-স্বভাব-পরিস্থিতি অনুসারে যে ব্যক্তির জন্য শাস্ত্রে যে কর্মের বিধান থাকে—যা পালন করা মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করা হয়—সেই শাস্ত্রবিহিত স্বাভাবিক কর্মগুলি ন্যায়পূর্বক, নিজ কর্তব্য মনে করে পালন করা উচিত ; সেই কর্মে এবং তার ফলে মমতা, আসক্তি ও কামনা সর্বতোভাবে ত্যাগ করে প্রতিটি কর্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে ও তার ফলে সর্বদাই সম থাকা (২।৪৭-৪৮) এবং ইন্দ্রিয়াদির ভোগে ও কর্মে আসক্ত না হয়ে সমস্ত সংকল্প পরিত্যাগ করে যোগারূঢ় হয়ে যাওয়া (৬।৪)—এই হল কর্মযোগের নিষ্ঠা। পরমেশ্বরকে সর্বশক্তিমান, সর্বাধার, সর্বব্যাপী, সকলের সুহৃদ এবং সকলের প্রেরক মনে করে, নিজেকে সর্বতোভাবে তাঁর অধীন মনে করে সমস্ত কর্ম এবং তার ফল ভগবানকে সমর্পণ করা (৩।৩০, ৯।২৭-২৮) ; তাঁর নির্দেশ এবং প্রেরণা অনুসারে তাঁর পূজা মনে করে তিনি যেমন করাবেন, তেমনই কর্ম করা ; সেই সব কর্মে বা তার ফলে বিন্দুমাত্র মমতা, আসক্তি ও কামনা না রাখা ; ভগবানের প্রত্যেক বিধানে সর্বদা সন্তুষ্ট থাকা ও নিরন্তর তাঁর নাম-গুণ-প্রভাব ও স্বরূপের চিন্তা করতে থাকা (১০।৯, ১২।৬, ১৮।৫৭)—এই হল ভক্তিপ্রধান যোগের নিষ্ঠা। উপরোক্ত কর্মযোগের স্থিতিপ্রাপ্ত ব্যক্তির রাগ-দ্বেষ ও কাম-ক্রোধাদি অপগুণ সর্বথা দূর হয়ে তাঁর সবকিছুতে সমতা এসে যায়, কারণ তিনি নিজ প্রভুকে সবাকার হৃদয়ে অবস্থিত দেখেন (১৫।১৫ : ১৮।৬১) এবং সম্পূর্ণ জগৎকে ভগবানেরই স্বরূপ বলে মনে করেন (৭।৭-১২ ; ৯।১৬-১৯)। এই স্থিতির ফল হল ভগবানকে লাভ করা।

প্রশ্ন—আমি পূর্বে দুপ্রকার নিষ্ঠার কথা বলেছি—এই কথাটির কী তাৎপর্য ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে, দুপ্রকার নিষ্ঠার কথা আমি আজই প্রথম বলেছি তা নয়, সৃষ্টির আদিকালে এবং তারপর ভিন্ন ভিন্ন অবতারের মাধ্যমে আমি এই দুই নিষ্ঠার স্বরূপ পৃথকভাবে জানিয়েছি। উপরন্তু তোমাকেও আমি দ্বিতীয় অধ্যায়ের এগারো শ্লোক থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত অদ্বিতীয় আত্মার স্বরূপ প্রতিপাদন করে সাংখ্যযোগের দৃষ্টিতে যুদ্ধ করতে বলেছি (২।১৮)। উনচল্লিশতম শ্লোকে যোগ-বিষয়ক বুদ্ধির বর্ণনা করার উপক্রম করে চল্লিশতম থেকে তিপ্পান্নতম শ্লোক পর্যন্ত ফলসহ কর্মযোগের বর্ণনা করে যোগস্থিত হয়ে তোমাকে যুদ্ধাদি কর্তব্যকর্ম পালন করতে বলেছি (২।৪৭-৫০)। এই দুই নিষ্ঠাকে আলাদা আলাদা জানানোর জন্য উনচল্লিশতম শ্লোকে স্পষ্টভাবে এও বলা হয়েছে যে এর পূর্বে আমি সাংখ্যবিষয়ে উপদেশ দিয়েছি আর এখন যোগবিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি। সুতরাং আমার বক্তব্য '**ব্যামিশ্র**' অর্থাৎ মিশ্রিত নয়।

প্রশ্ন—'অনঘ' সম্বোধনের ভাব কী ?

উত্তর—যিনি পাপরহিত, তাঁকে '**অনঘ**' বলা হয়। অর্জুনকে '**অনঘ**' নামে সম্বোধন করে ভগবান এই ভাব প্রকাশ করেছেন যে, যারা পাপী এবং পাপপরায়ণ, তারা এই সব নিষ্ঠার কোনোটিরই অধিকারী নয় ; কিন্তু তুমি পাপরহিত, তাই তুমি সহজেই এতে সফল হতে পারবে, তাই তোমাকে আমি এসব শুনিয়েছি।

প্রশ্ন—সাংখ্যযোগীর নিষ্ঠা জ্ঞানযোগের দ্বারা এবং

যোগীদের নিষ্ঠা কর্মযোগের দ্বারা হয়, এই কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে ঐ দুপ্রকার নিষ্ঠার মধ্যে সাংখ্যযোগের যে নিষ্ঠা, তা জ্ঞানযোগের সাধনাকালে দেহাভিমান সর্বতোভাবে বিনষ্ট হলে সিদ্ধ হয়, আর কর্মযোগীর নিষ্ঠা কর্মযোগের সাধনের দ্বারা কর্মে এবং তার ফলে মমতা, আসক্তি এবং কামনা দূর হয়ে সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমত্ব হলে সিদ্ধ হয়। পূর্বোক্ত এই দুই নিষ্ঠার অধিকারীও পূর্ব সংস্কার, শ্রদ্ধা ও রুচি অনুসারে পৃথক পৃথক হয় এবং দুটি নিষ্ঠাও স্বতন্ত্র।

প্রশ্ন—কোনো ব্যক্তি যদি জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ—উভয় যোগই এক সঙ্গে সম্পাদন করেন, তাহলে তাঁর কোন্ নিষ্ঠা হয় ?

উত্তর— এই দুটি সাধন পরস্পর ভিন্ন। সুতরাং একজন ব্যক্তি একই সময়ে দুটি সাধন করতে পারেন না ; কারণ সাংখ্যযোগের সাধনে আত্মা ও পরমাত্মাকে অভেদ মনে করে পরমাত্মার নির্গুণ-নিরাকার সচ্চিদাঘন-স্বরূপের চিন্তা করা হয় এবং কর্ম করতে করতে ভগবানকে সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান এবং সর্বেশ্বর মনে করে তাঁর নাম-গুণ-প্রভাব এবং স্বরূপের উপাস্য-উপাসকভাবে চিন্তা করা হয়। তাই জন্য উভয় নিষ্ঠার পালন এক সঙ্গে, এক কালে, একই মানুষের দ্বারা করা সম্ভব নয়।

সম্বন্ধ—পূর্বশ্লোকে ভগবান বলেছেন, সাংখ্যনিষ্ঠা জ্ঞানযোগের সাধন দ্বারা হয় এবং যোগনিষ্ঠা কর্মযোগের সাধন দ্বারা হয়, সেই কথা প্রমাণিত করবার জন্য এবার জানাচ্ছেন যে কর্তব্যকর্মাদির স্বরূপতঃ (বাহ্যিকভাবে) ত্যাগ করা কোনো নিষ্ঠারই কারণ নয়—

ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥ ৪

মানুষ কর্ম আরম্ভ না করে নৈষ্কর্ম্য অর্থাৎ যোগনিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় না এবং শুধুমাত্র কর্ম ত্যাগ করলেই সিদ্ধি বা সাংখ্যনিষ্ঠা লাভ করে না॥ ৪

প্রশ্ন—এখানে **'নৈষ্কর্ম্যম্'** পদটি কীসের বাচক এবং মানুষ কর্ম আরম্ভ না করে নৈষ্কর্ম্যভাব প্রাপ্ত হয় না, এই কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—কর্মযোগের যে পরিপক্ক স্থিতি—পূর্ব শ্লোকের ব্যাখ্যায় যাকে যোগনিষ্ঠার নামে অভিহিত করা হয়েছে, তারই বাচক এই **'নৈষ্কর্ম্যম্'** পদটি। এই স্থিতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সমস্ত কর্ম করেও তার থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত থাকেন, তাঁর কর্ম বন্ধনের হেতু হয় না (৪।২২, ৪১) ; সেইজন্য এই স্থিতিকে 'নৈষ্কর্ম্য' বা 'নিষ্কর্মতা' বলা হয়। মানুষ নিষ্কামভাবে কর্তব্যকর্ম করলে এই স্থিতি লাভ করে, বিনা কর্মে নয়। তাই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় কর্তব্য-কর্ম ত্যাগ করা নয়, বরং নিষ্কামভাবে তা করতে থাকা—এই অর্থে বলা হয়েছে, 'মানুষ কর্মারম্ভ না করে নিষ্কর্মতা প্রাপ্ত হয় না।'

প্রশ্ন—কর্মযোগের স্বরূপ হল কর্ম পালন করা, তাতে কর্ম আরম্ভ না করার প্রশ্ন ওঠে না ; তাহলে কর্ম আরম্ভ না করে 'নিষ্কর্মতা' লাভ করা যায় না, একথা বলার প্রয়োজনীয়তা কী ?

উত্তর—ভগবান অর্জুনকে কর্মে ফল ও আসক্তি ত্যাগ করতে বলেছেন এবং তার পরিণাম বলেছেন কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি লাভ (২।৫১) করা ; এই কথায় অর্জুন মনে করতে পারেন যে, যদি আমি কর্ম না করি তাহলে স্বতঃই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাব, তাহলে কর্ম করবার প্রয়োজনীয়তা কী ? এই ভ্রম দূর করার জন্য প্রথমে কর্মযোগের প্রকরণ আরম্ভ করার সময়ও ভগবান বলেছেন যে **'মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি'** অর্থাৎ কর্ম না করায় তোমার আসক্তি থাকা উচিত নয়। ষষ্ঠ অধ্যায়েও বলেছেন, 'আরুরুক্ষু অর্থাৎ যিনি যোগারূঢ় হতে ইচ্ছুক

সেই মুনির জন্য কর্ম করাই যোগারূঢ় হওয়ার উপায়' (৬।৩), তাই শারীরিক পরিশ্রমের ভয়ে বা অন্য কোনো আসক্তিতে মানুষের মধ্যে যে অপ্রবৃত্তির দোষ আসে তা কর্মযোগের বাধক—এটি জানাবার জন্যই ভগবান এরূপ বলেছেন।

প্রশ্ন—এখানে **'সিদ্ধিম্'** শব্দটি কীসের বাচক এবং কর্মত্যাগমাত্রই সিদ্ধিলাভ হয় না, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—জ্ঞানযোগের যা সিদ্ধি অর্থাৎ পরিপক্ব স্থিতি, যার বর্ণনা পূর্বশ্লোকের ব্যাখ্যাতে 'জ্ঞাননিষ্ঠা'র নামে করা হয়েছে এবং যার ফল তত্ত্বজ্ঞানপ্রাপ্তি, তার বাচক হল এই **'সিদ্ধিম্'** পদটি। এই স্থিতিতে পৌঁছলে সাধক ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন, তাঁর দৃষ্টিতে আত্মা ও পরমাত্মার কোনোমাত্র বিভেদ থাকে না, তিনি স্বয়ং ব্রহ্মরূপ হয়ে যান, তাই এই স্থিতিকে 'সিদ্ধি' বলা হয়। এই জ্ঞানযোগরূপ সিদ্ধি নিজ বর্ণাশ্রম অনুসারে বিহিত উপযুক্ত কর্মে কর্তৃত্বের অভিমান ত্যাগ করে এবং সমস্ত ভোগে মমতা, আসক্তি, কামনারহিত হয়ে নিরন্তর অভিন্নভাবে পরমাত্মার স্বরূপ চিন্তা করলে সিদ্ধ হয়, শুধুমাত্র কর্মগুলি বাহির থেকে ত্যাগ করলে সিদ্ধ হয় না। কারণ অহং-বোধ, মমতা ও আসক্তির বিনাশ না হলে মানুষ অভিন্নভাবে পরমাত্মাতে স্থিতিলাভ করতে সক্ষম হয় না। অপরপক্ষে মন-বুদ্ধি-শরীর দ্বারা হওয়া কর্মগুলিকে নিজে কর্তা বলে মনে না করে তার দ্রষ্টা-সাক্ষী হয়ে থাকলে (১৪।১৯) উপরোক্ত স্থিতিলাভ হয়। তাই সাংখ্যযোগীরও বর্ণাশ্রমোচিত কর্মাদি স্বরূপতঃ (বাহ্যভাবে) ত্যাগ করার চেষ্টা না করে তাতে কর্তৃত্ব-মমতা-আসক্তি এবং কামনারহিত হওয়া উচিত—এই ভাব দেখাবার জন্য এখানে বলা হয়েছে যে 'শুধুমাত্র কর্মাদি ত্যাগ করলেই সিদ্ধি প্রাপ্তি হয় না।'

প্রশ্ন—**'অনারম্ভাৎ'** ও **'সন্ন্যাসনাৎ'**—এই দুটি পদের অভিপ্রায় এক না ভিন্ন ভিন্ন ? যদি বিভিন্ন হয়, তাহলে দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কী ?

উত্তর—এখানে ভগবান দুটি পদ ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায়ে প্রয়োগ করেছেন ; কারণ **'অনারম্ভাৎ'** পদ দ্বারা কর্মযোগীর পক্ষে বিহিত কর্ম না করা যোগনিষ্ঠা প্রাপ্তির বাধক বলে জানিয়েছেন ; কিন্তু **'সন্ন্যাসনাৎ'** পদ দ্বারা সাংখ্যযোগীর জন্য কর্মাদি স্বরূপতঃ ত্যাগ করা সাংখ্যনিষ্ঠার প্রাপ্তির বাধাস্বরূপ নয় বলে জানিয়েছেন, শুধু একথাই বলা হয়েছে যে এর দ্বারা তাঁর সিদ্ধিলাভ হয় না, সিদ্ধিপ্রাপ্তির জন্য তাঁর কর্তৃত্বভাব ত্যাগ করে সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মে অভেদভাবে স্থিত হওয়া আবশ্যক। অতএব তার জন্য কর্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ করা মুখ্য ব্যাপার নয়, অন্তরের ত্যাগই প্রধান এবং কর্মযোগীর পক্ষে কর্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ করা উচিত নয়—এটিই দুটি পদের ভাবে পার্থক্য।

সম্বন্ধ—এইরূপ কর্মযোগীদের কর্তব্যকর্ম পালন না করলে যোগনিষ্ঠার প্রাপ্তিতে অন্তরায়ের কথা এবং সাংখ্যযোগীদের সিদ্ধিপ্রাপ্তির জন্য শুধু স্বরূপতঃ বাহ্য কর্মাদি ত্যাগ গৌণ বলে জানিয়েছেন। এবার অর্জুনকে কর্তব্যকর্মে প্রবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন কারণে কর্ম করার প্রয়োজনীয়তা জানাবার জন্য প্রথমে কর্মাদি সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা অসম্ভব জানিয়ে বলছেন—

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।। ৫

কোনো মানুষ কোনো সময়েই এক মুহূর্ত কর্ম না করে থাকতে পারে না ; কারণ সকল মনুষ্য সমুদায় প্রকৃতিজাত গুণাদিতে অবশ হয়ে কর্ম করতে বাধ্য হয়।। ৫।।

প্রশ্ন—কোনো মানুষ কোনো কালে এক মুহূর্তও কর্ম না করে থাকতে পারে না, এই বাক্যটির কী তাৎপর্য ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান দেখিয়েছেন যে ওঠা, বসা, খাওয়াদাওয়া, শয়ন, জাগরণ, চিন্তা, ভাবনা, স্বপ্ন দেখা, ধ্যান করা, সমাধিস্থ হওয়া—এ সবই কর্মের

অন্তর্গত। তাই যতক্ষণ শরীর থাকে, নিজ প্রকৃতি (স্বভাব) অনুসারে মানুষ ততক্ষণ কিছু না কিছু কাজ করতে থাকে। কোনো মানুষই এক মুহূর্তের জন্যও কর্মাদি স্বরূপতঃ (বাইর থেকে) ত্যাগ করতে পারে না। সুতরাং কর্ম ত্যাগের তাৎপর্য হল কর্তৃত্ব-ভাব ত্যাগ করা অর্থাৎ মমতা, আসক্তি ও ফলেচ্ছা ত্যাগ করাকে কর্মাদি সর্বতোভাবে ত্যাগ করা বোঝায়।

প্রশ্ন— এখানে '**কশ্চিৎ**' পদটির দ্বারা গুণাতীত জ্ঞানী ব্যক্তিকেও বোঝায় কি না ?

উত্তর—গুণাতীত জ্ঞানী ব্যক্তির গুণাদি বা তার কার্যের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকে না ; সুতরাং তিনি গুণাদির বশীভূত হয়ে কর্ম করেন, তা বলা যাবে না। তাই গুণাতীত জ্ঞানী ব্যক্তি '**কশ্চিৎ**' পদের অন্তর্গত হন না। তবুও মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে থাকায় লোকের দৃষ্টিতে তাঁর শরীর এবং সেই শরীর দ্বারা তাঁর ও লোকের প্রারব্ধানুসারে কিছু কর্ম তো অবশ্যই পালিত হয়, কিন্তু কর্তৃত্বভাব না থাকায় বাস্তবে সেগুলি কর্ম নয়। তবে তাঁদের মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির সম্মিলিত রূপকে '**কশ্চিৎ**'-এর অন্তর্গত মনে করলে কোনো আপত্তি নেই ; কারণ সেগুলিও গুণাদির কার্য হওয়ায় গুণের অতীত নয়। সেগুলি থেকে সর্বতোভাবে অতীত হলেই জ্ঞানীর গুণাতীত সংজ্ঞা হয়।

প্রশ্ন—'**সর্বঃ**' পদটি কীসের বাচক এবং গুণাদির দ্বারা বশীভূত হয়ে তাকে কর্ম করতে বাধ্য হতে হয়—এ কথার কী রহস্য ?

উত্তর—'**সর্বঃ**' পদটি সমস্ত প্রাণীর বাচক হলেও এটি বিশেষভাবে মনুষ্যসমাজকে লক্ষ্য করে ; কারণ কর্মে মানুষেরই অধিকার এবং পূর্বজন্মে কৃত কর্মের সংস্কার-জনিত স্বভাবের বশীভূত হয়ে যে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া, তাকেই গুণাদির বশ হয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া বলা হয়।

প্রশ্ন—'**গুণৈঃ**' পদের সঙ্গে '**প্রকৃতিজৈঃ**' বিশেষণ দেওয়ার কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—সাংখ্যশাস্ত্রে গুণাদির সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি বলা হয়, কিন্তু ভগবানের মতে তিন গুণ প্রকৃতির কার্য—এই কথাটি স্পষ্ট করার জন্যই ভগবান এখানে '**গুণৈঃ**' পদের সঙ্গে '**প্রকৃতিজৈঃ**' বিশেষণ ব্যবহার করেছেন। এইভাবেই কোথাও '**প্রকৃতিসম্ভবান্**' (১৩।১৯), কোথাও '**প্রকৃতিজান্**' (১৩।২১), কোথাও '**প্রকৃতিসম্ভবাঃ**' (১৪।৫) আবার কোথাও '**প্রকৃতিজৈঃ**' (১৮।৪০) বিশেষণ দিয়ে স্থানে স্থানে গুণাদিকে প্রকৃতির কার্য বলে জানানো হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে '**প্রকৃতি**' শব্দ কীসের বাচক ?

উত্তর— সমস্ত গুণ ও বিকারাদির সমুদয়রূপ এই জড়-দৃশ্য জগতের কারণভূত ভগবানের অনাদি সিদ্ধ যে মূল প্রকৃতি—যাকে অব্যক্ত, অব্যাকৃত ও মহদ্‌ব্রহ্মও বলা হয়—তারই বাচক হল এই 'প্রকৃতি' শব্দটি।

সম্বন্ধ—পূর্বশ্লোকে বলা হয়েছে যে কোনো মানুষ এক মুহূর্তও কর্ম না করে থাকতে পারে না ; তাতে প্রশ্ন হয় যে হঠকারিতাপূর্বক ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া রোধ করেও তো মানুষ কর্মাদি ত্যাগ করতে পারে ? কিন্তু বাহ্যতঃ ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া ত্যাগ করা যে কর্মত্যাগ নয়, সেই কথা জানাবার জন্য ভগবান বলেছেন—

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।। ৬

যে মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তি কর্মেন্দ্রিয়গুলি জোর করে সংযত করে মনে মনে ইন্দ্রিয়াদির বিষয় চিন্তা করে, তাকে মিথ্যাচারী বলা হয়।। ৬

প্রশ্ন—এখানে '**কর্মেন্দ্রিয়াণি**' পদটি কোন্ ইন্দ্রিয়-গুলির বাচক এবং তাকে বলপূর্বক রোধ করা কাকে বলে ?

উত্তর—এখানে '**কর্মেন্দ্রিয়াণি**' পদের পারিভাষিক অর্থ বলা হয়নি, তাই যার দ্বারা মানুষ বাহ্য ক্রিয়া করে থাকে অর্থাৎ শব্দাদি বিষয় গ্রহণ করে সেই চক্ষু-কর্ণ-ত্বক-নাসিকা-জিহ্বা অর্থাৎ বাক্য-হাত-পা-উপস্থ, মলদ্বার ইত্যাদি দশ ইন্দ্রিয়ের বাচক ; কারণ গীতায়

কোথাও শ্রোত্রাদি পঞ্চেন্দ্রিয়র জন্য 'জ্ঞানেন্দ্রিয়' শব্দের প্রয়োগ করা হয়নি। এছাড়া এখানে কর্মেন্দ্রিয়ের অর্থ শুধু বাক্য ইত্যাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের কথা মেনে নিলে কর্ণ-নেত্র ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গুলির রোধ করার কথা বাকি থেকে যায় এবং সেক্ষেত্রে মিথ্যাচারীর লক্ষণও সম্পূর্ণ হয় না। বাক্য ইত্যাদি ইন্দ্রিয়াদি রুদ্ধ করে কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা তিনি কী করেন, সেই কথা বলারও প্রয়োজন হয়ে যায়। কিন্তু ভগবান তেমন কোনো কথা বলেননি, তিনি পরবর্তী শ্লোকেও কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্মযোগের আচরণ করতে বলেছেন। কিন্তু শুধু বাক্য ইত্যাদি কর্মেন্দ্রিয়র দ্বারা কর্মযোগের আচরণ হতে পারে না। তাতে সকল ইন্দ্রিয়েরই প্রয়োজনীয়তা থাকে। তাই এখানে **'কর্মেন্দ্রিয়াণি'** পদটিকে যার দ্বারা কর্ম করা হয় সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলির বাচক মনে করা উচিত আর জোর করে শোনা, দেখা ইত্যাদি ক্রিয়া রুদ্ধ করাকে বলা হয়েছে হঠাৎপূর্বক সেগুলিকে রুদ্ধ করা।

প্রশ্ন—কোনো সাধক যদি ভগবানের ধ্যান করার জন্য বা ইন্দ্রিয়াদি বশে আনার জন্য জোর করে ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় থেকে রোধ করার চেষ্টা করেন এবং সেই সময় তাঁর মন বশীভূত না হয়ে যদি বিষয়চিন্তা করতে থাকে, তাহলে কি তাকে মিথ্যাচারী বলা হবে ?

উত্তর—তিনি মিথ্যাচারী নন, তিনি তো সাধক ; কারণ মিথ্যাচারীর ন্যায় বিষয়চিন্তা করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তিনি তাঁর মনকে রোধ করতেও চেষ্টা করেন, কিন্তু পূর্বের অভ্যাস, আসক্তি এবং সংস্কারবশতঃ তাঁর মন জোর করে বিষয়ের দিকে চলে যায়। সুতরাং তাতে তাঁর কোনো দোষ নেই, সাধনার প্রারম্ভে এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক।

প্রশ্ন—এখানে **'সংযম্য'** পদটির অর্থে 'বশীভূত করে নেওয়া' মনে করলে ক্ষতি কী ?

উত্তর—ইন্দ্রিয়াদি বশকারী মিথ্যাচারী হন না, কারণ ইন্দ্রিয়গুলি বশ করা যোগেরই অঙ্গ। তাই এখানে **'সংযম্য'** পদটির যে অর্থ ধরা হয়েছে সেটিই উপযুক্ত।

প্রশ্ন—**'ইন্দ্রিয়ার্থান্'** পদটি কীসের বাচক ?

উত্তর—দশ ইন্দ্রিয়াদির শব্দাদি সমস্ত বিষয়ের বাচক হল এখানে **'ইন্দ্রিয়ার্থান্'** পদটি। পঞ্চম অধ্যায়ের নবম শ্লোকেও এই অর্থে **'ইন্দ্রিয়ার্থেষু'** পদটির প্রয়োগ হয়েছে।

প্রশ্ন—তাকে মিথ্যাচারী বলা হয়, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে উপরোক্ত প্রকারে ইন্দ্রিয় রোধকারী ব্যক্তি, কপটাচারী। বক যেমন স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে মাছেদের বোকা বানায়, তেমনি তারাও মনে অন্য ভাব পোষণ করে বাইরে অপর ভাব দেখায় ; সুতরাং তাদের আচরণ মিথ্যা হওয়ায় তাদের মিথ্যাচারী বলা হয়।

সম্বন্ধ—এইভাবে শুধুমাত্র বাহ্যতঃ বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়গুলি সরিয়ে নেওয়াকে মিথ্যাচার জানিয়ে এবার আসক্তি ত্যাগ করে ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা নিষ্কামভাবে কর্তব্যরত যোগীদের প্রশংসা করেছেন—

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥ ৭

কিন্তু হে অর্জুন ! যে ব্যক্তি মনের সাহায্যে ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করে অনাসক্তভাবে ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে কর্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ॥ ৭

প্রশ্ন—এখানে **'তু'** পদটির অর্থ কী ?

উত্তর—বাহ্যতঃ কর্ম ত্যাগের চেয়ে বরং কর্মে রত থেকে ইন্দ্রিয়াদি বশে রাখা যোগীদের বৈশিষ্ট্য জানাবার জন্য এখানে **'তু'** পদটির প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে **'ইন্দ্রিয়াণি'** এবং **'কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ'**—এই দুটি পদে কোন্ ইন্দ্রিয়গুলি নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর—এখানে দুটি পদই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বাচক ; কারণ শুধু পাঁচটি ইন্দ্রিয় বশ করলেই ইন্দ্রিয়াদি বশে হওয়া

প্রমাণিত হয় না এবং শুধু পাঁচ ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই কর্মযোগের অনুষ্ঠানও সম্ভব নয় ; কারণ দেখা, শোনা ইত্যাদি ছাড়া কর্মযোগের পালন সম্ভব নয়। তাই উপরিউক্ত দুটি পদের দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়কে ধরা হয়েছে। এই অধ্যায়ের একচল্লিশতম শ্লোকেও ভগবান **'ইন্দ্রিয়াণি'** পদের সঙ্গে **'নিয়ম্য'** পদ প্রয়োগ করে সমস্ত ইন্দ্রিয় বশীভূত করার কথা বলেছেন।

প্রশ্ন—এখানে **'নিয়ম্য'** পদের অর্থ 'বশীভূত করা' না ধরে 'রোধ করা' অর্থ মনে করলে আপত্তি কীসের ?

উত্তর—'রোধ করা' অর্থ এখানে গ্রহণযোগ্য নয় ; কারণ ইন্দ্রিয়গুলি রোধ করলে তার দ্বারা কর্মযোগের আরচণ করা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন—সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা কর্মযোগের আচরণ করা কাকে বলে ?

উত্তর—সমস্ত বিহিত কর্মে এবং তার ফলরূপ ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত ভোগে রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ ত্যাগ করে, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম হয়ে, বশীভূত ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা শব্দাদি বিষয় গ্রহণ করতঃ যে যজ্ঞ-দান-তপ-অধ্যয়ন-অধ্যাপন-প্রজাপালন-নেওয়া-দেওয়ার ব্যাপার-সেবা-খাওয়াদাওয়া, শয়ন-জাগরণ, চলা-ফেরা, ওঠা-বসা ইত্যাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কর্ম শাস্ত্রবিধি অনুসারে করতে থাকা, এই হল সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কর্মযোগের আচরণ করা। দ্বিতীয় অধ্যায়ের চৌষট্টিতম শ্লোকে এর ফল প্রসাদ (প্রসন্নতা) প্রাপ্তি এবং সমস্ত দুঃখের নাশ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—**'স বিশিষ্যতে'** কথাটির কী ভাব ? এখানে কর্মযোগীকে কি পূর্বশ্লোকে বর্ণিত মিথ্যাচারীর থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে ?

উত্তর—**'স বিশিষ্যতে'** পদের দ্বারা এখানে কর্মযোগীকে সমস্ত সাধারণ মানুষের থেকে শ্রেষ্ঠ বলে তাঁদের প্রশংসা করা হয়েছে। অভিপ্রায় এই নয় যে কর্মযোগীকে কেবলমাত্র পূর্ববর্ণিত মিথ্যাচারীর থেকে শুধু শ্রেষ্ঠ বলা, কারণ পূর্বশ্লোকে বর্ণিত মিথ্যাচারী ব্যক্তি তো আসুরী সম্পদযুক্ত দাম্ভিক মানুষ। তার থেকে সকামভাবে বিহিত কর্মে সংলগ্ন মানুষও অনেক ভালো ; তাহলে দৈবী সম্পদযুক্ত কর্মযোগীকে মিথ্যাচারীর থেকে শ্রেষ্ঠ বলা তো কোনো বেশ্যার থেকে সতী নারীকে শ্রেষ্ঠ বলার মতো কর্মযোগীর স্তুতিতে নিন্দা করার সমান। সুতরাং এখানে **'স বিশিষ্যতে'** দ্বারা 'কর্মযোগী সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ' বলে তাঁর প্রশংসা করা হয়েছে।

সম্বন্ধ—অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আপনি আমাকে ভয়ানক কর্মে নিযুক্ত করছেন কেন ? তার উত্তরে বাহ্যরূপে কর্মত্যাগকারী মিথ্যাচারীদের নিন্দা এবং কর্মযোগীদের প্রশংসা করে এবার অর্জুনকে কর্ম করার নির্দেশ দিচ্ছেন—

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্মণঃ॥ ৮

তুমি শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্ম করো ; কারণ কর্ম না করার থেকে কর্ম করা শ্রেয়ঃ, কর্ম না করলে তোমার শরীর নির্বাহও হবে না॥ ৮

প্রশ্ন—**'নিয়তম্'** বিশেষণের সঙ্গে 'কর্ম' পদ কোন্ কর্মের বাচক এবং তা করার জন্য নির্দেশ দেবার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—বর্ণ, আশ্রম, স্বভাব ও পরিস্থিতিবশত যে মানুষের জন্য শাস্ত্রে যে কর্তব্য-কর্ম বলা হয়েছে, সেই সকল স্বধর্মরূপ কর্তব্য-কর্মের বাচক এখানে **'নিয়তম্'** বিশেষণের সঙ্গে 'কর্ম' পদটি এবং তা করার জন্য আদেশ দিয়ে ভগবান অর্জুনের সেই ভ্রম দূর করেছেন, যার জন্য তিনি ভগবানের বক্তব্য মিশ্রিত মনে করে তাঁকে নিশ্চিত কর্তব্য বলতে বলেছিলেন।

অভিপ্রায় হল যে, তোমার জিজ্ঞাসা অনুসারে আমি তোমাকে তোমার নিশ্চিত কর্তব্য জানাচ্ছি। উপরোক্ত কারণে তোমার পক্ষে কোনোভাবেই কর্ম স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করা হিতকর নয়। সুতরাং তোমার শাস্ত্রবিহিত

কর্তব্যকর্মরূপ স্বধর্ম অবশ্যই পালন করা উচিত। যুদ্ধ করা তোমার স্বধর্ম, তাই তাকে হিংসাত্মক ও ক্রূরতাপূর্ণ মনে হলেও, বাস্তবে তোমার পক্ষে তা ভয়ানক নয়, বরং নিষ্কামভাবে তা করলে সেটি তোমার কল্যাণেরই হেতু হবে। অতএব তুমি সংশয় ত্যাগ করে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হও।

প্রশ্ন—কর্ম না করার থেকে কর্ম করা শ্রেষ্ঠ, এই কথাটির কী তাৎপর্য ?

উত্তর—এই কথার দ্বারা ভগবান অর্জুনের সেই ভ্রমটি দূর করেছেন, যার জন্য তিনি মনে করেছিলেন, ভগবানের মতে কর্ম করার থেকে কর্ম না করাই শ্রেষ্ঠ। অভিপ্রায় হল যে কর্তব্যকর্ম করলে মানুষের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় এবং তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। উপরন্তু কর্তব্যকর্ম ত্যাগ করলে সে পাপের ভাগী হয় এবং নিদ্রা-আলস্য ও প্রমাদে আবদ্ধ হয়ে অধোগতি প্রাপ্ত হয় (১৪।১৮) ; সুতরাং কর্ম না করার থেকে কর্ম করা সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। সকামভাবে অথবা প্রায়শ্চিত্তরূপেও কর্তব্যকর্ম করা কর্ম না করার থেকে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ ; আর নিষ্কামভাবে করা যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাতে আর বলার কী আছে।

প্রশ্ন—কর্ম না করলে তোমার শরীর নির্বাহও হবে না, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, কর্মকে স্বরূপতঃ (বাহ্যিকরূপে) সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে মানুষ জীবিত থাকতেও পারে না, শরীর নির্বাহের জন্য তাকে কিছু না কিছু করতেই হয় ; এরূপ পরিস্থিতিতে বিহিত কর্ম ত্যাগ করলে মানুষের পতন হওয়া স্বাভাবিক। তাই কর্ম না করার থেকে সর্বপ্রকারে কর্ম করাই উত্তম।

সম্বন্ধ—এখানে এই প্রশ্ন উঠতে পারে যে শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ-দান-তপ ইত্যাদি শুভ কর্মগুলিকেও বন্ধনের হেতু বলে মানা হয়েছে ; তাহলে কর্ম না করার থেকে কর্ম করা শ্রেষ্ঠ কী করে ? তার উত্তরে বলেছেন—

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ ৯

যজ্ঞের জন্য করা কর্ম ভিন্ন অন্য কর্ম বন্ধনের কারণ হয়। অতএব হে কৌন্তেয় ! তুমি আসক্তিশূন্য হয়ে যজ্ঞের নিমিত্ত সকল কর্তব্যকর্ম করো॥ ৯

প্রশ্ন—যজ্ঞার্থে করা কর্মগুলির থেকে অন্য কর্মে ব্যাপৃত হওয়ার ফলেই মানুষ কর্ম-বন্ধনে আবদ্ধ হয়—এই বাক্যের অর্থ কী ?

উত্তর—এই বাক্য দ্বারা ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে, যেসব কর্ম মানুষ কর্তব্যরূপ যজ্ঞের পরম্পরা সুরক্ষিত রাখার জন্য অনাসক্তভাবে পালন করে, কোনো ফলের কামনায় নয়, সেই শাস্ত্রবিহিত কর্ম বন্ধনকারক হয় না, বরং সেই কর্মের দ্বারা মানুষের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়ে যায় এবং সে পরমাত্মাকে লাভ করে। কিন্তু এরূপ লোকোপকারক কর্ম ছাড়া পাপ-পুণ্যরূপ যত কর্ম আছে, সেগুলি সব পুনর্জন্মের হেতু হওয়ায় বন্ধনকারক হয়। মানুষ স্বার্থবুদ্ধিতে যা কিছু শুভ-অশুভ কর্ম করে, তার ফল ভোগ করার জন্য তাকে কর্ম অনুসারে নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হয় এবং বারংবার জন্মগ্রহণ ও মৃত্যু হওয়া হল বন্ধন, তাই সকাম কর্মে বা পাপকর্মে ব্যাপৃত মানুষ ঐসকল কর্মের দ্বারা আবদ্ধ হয়। তাই মানুষকে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নিষ্কামভাবে শুধুমাত্র কর্তব্যপালনের বুদ্ধিতেই শাস্ত্রবিহিত কর্ম করা উচিত।

প্রশ্ন—'অয়ং লোকঃ' কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—মানুষেরই কর্ম করার অধিকার থাকে এবং মনুষ্যযোনিতে কৃত কর্মের ফল ভোগ করার জন্যই অন্য যোনি প্রাপ্তি হয় এবং সেইসব যোনিতে পাপ-পুণ্যরূপ নতুন কর্ম হয় না। সেইজন্য অন্য যোনিতে কৃত কর্ম বন্ধনকারক হয় না, শুধুমাত্র মনুষ্যযোনিতে কৃত কর্মই বন্ধনকারক হয়—এর জন্যই **'অয়ং লোকঃ'** পদটি প্রযুক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন—তুমি আসক্তিরহিত হয়ে যজ্ঞের জন্য ভালোভাবে কর্তব্যকর্ম করো—এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে অনাসক্তভাবে যজ্ঞের জন্য কর্ম করলে তা বন্ধনকারী হয় না। এরূপ কর্ম করেন যেসব ব্যক্তি তাঁদের পূর্বসঞ্চিত সমস্ত পাপ-পুণ্যও বিলীন হয়ে যায় (৪।২৩) ; অতএব তুমি মমতা ও আসক্তি সর্বতোভাবে ত্যাগ করে শুধু শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্মের পরম্পরা সুরক্ষিত রাখার জন্য নিষ্কামভাবে সমস্ত কর্মের উৎসাহপূর্বক পালন করো।

প্রশ্ন—উপরিউক্ত বাক্যে **'মুক্তসঙ্গঃ'** বিশেষণ প্রয়োগের কী তাৎপর্য ?

উত্তর—**'মুক্তসঙ্গঃ'** বিশেষণের দ্বারা কর্মে এবং তার ফলে মমতা ও আসক্তি বর্জন করে কর্ম করতে বলা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, কর্মফল ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে কর্মে এবং তার ফলে মমতা ও আসক্তিও ত্যাগ করা উচিত।

সম্বন্ধ—পূর্বশ্লোকে ভগবান বলেছেন যজ্ঞের নিমিত্ত কর্ম করেন যে সব ব্যক্তি তাঁরা কর্মের দ্বারা আবদ্ধ হন না ; তাই এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে যজ্ঞ কাকে বলে, কেন তা করা উচিত এবং যজ্ঞকারী মানুষ কেন আবদ্ধ হন না। সুতরাং সেইগুলি বোঝাবার জন্য ভগবান শ্রীব্রহ্মার বক্তব্যের প্রমাণ দিয়ে বলেছেন—

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০

প্রজাপতি ব্রহ্মা কল্পের আরম্ভে যজ্ঞসহ প্রজা সৃষ্টি করে বলেছিলেন যে, তোমরা এই যজ্ঞের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও এবং এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্ট ফলপ্রদানকারী হোক ॥ ১০

প্রশ্ন—**'সহযজ্ঞাঃ'** বিশেষণের সঙ্গে **'প্রজাঃ'** পদটি এখানে কীসের বাচক এবং **'অনেন'** পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—যাঁর যজ্ঞে অর্থাৎ বর্ণাশ্রমোচিত শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ-দান-তপ ও সেবা ইত্যাদি কর্মরূপ স্বধর্ম পালনে অধিকার থাকে ; পূর্বশ্লোকে **'অয়ম্'** বিশেষণের সঙ্গে **'লোকঃ'** পদের দ্বারা যার বর্ণনা করা হয়েছে—সেই সব মানুষদের বাচক এখানে **'সহযজ্ঞাঃ'** বিশেষণের সঙ্গে **'প্রজাঃ'** পদটি এবং তাঁদের জন্য বর্ণ, আশ্রম, স্বভাব ও পরিস্থিতি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞ-দান-তপ-প্রাণায়াম-ইন্দ্রিয়সংযম-অধ্যয়ন-অধ্যাপন-প্রজাপালন-যুদ্ধ-কৃষি-বাণিজ্য-সেবা ইত্যাদি কর্মরূপ যে স্বধর্মরূপ যজ্ঞ—তারই বাচক হল **'অনেন'** পদটি।

প্রশ্ন—তোমরা এই যজ্ঞের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও এবং এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্ট ফলপ্রদানকারী হোক—এই বাক্যটির কী তাৎপর্য ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান ব্রহ্মা মানুষদের আশীর্বাদ করেছেন। ব্রহ্মার অভিপ্রায় হল যে, তোমাদের জন্য আমি এই স্বধর্মরূপ যজ্ঞ রচনা করেছি ; এটি সঠিকভাবে পালন করলে তোমার উন্নতি হতে থাকবে, পতন হবে না এবং তোমরা বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উচ্চে আরোহণ করবে। এই যজ্ঞ ইহলোকেও তোমাদের সকল প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ করতে থাকবে।

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১

তোমরা এই যজ্ঞের সাহায্যে দেবতাদের উন্নত করো এবং দেবতাগণও তোমাদের উন্নত করুন। এইভাবে নিঃস্বার্থভাবে একে অপরের উন্নতির দ্বারা তোমরা পরম কল্যাণ লাভ করবে ॥ ১১

প্রশ্ন—**'অনেন'** পদ এখানে কীসের বাচক এবং তার দ্বারা দেবতাদের উন্নত করা কী ?

উত্তর—**'অনেন'** পদ যার প্রকরণ চলছে, সেই স্বধর্মরূপ যজ্ঞের বাচক। কিন্তু এখানে যে যজ্ঞে বেদমন্ত্র

দ্বারা দেবতাদের হবিষ্যদান করা হয়, তাকে উপলক্ষ্য করে স্বধর্মপালনরূপ যজ্ঞ অবশ্যই করার কথা বলা হয়েছে ; তাই উপলক্ষ্যরূপে এটি যজ্ঞের বাচক বলে মনে করতে হবে এবং ঐ যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদের হবিষ্য দিয়ে পুষ্ট করা এবং তাঁদের প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ করে, তাঁদের উন্নত করা বুঝতে হবে। এই বর্ণনা উপলক্ষ্যরূপে হওয়ায় যজ্ঞের অর্থ স্বধর্ম মনে করে নিজ নিজ বর্ণাশ্রম অনুসারে কর্তব্যপালন দ্বারা ঋষি, পিতৃপুরুষ, ভূত-প্রেত, মানুষ, পশু-পক্ষী প্রভৃতি সকল প্রাণীকে সুখী করা, তাদের উন্নতি করাও এর অন্তর্গত বলে মনে করতে হবে।

প্রশ্ন—এই দেবতাগণ তোমাদের উন্নত করুন, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথার দ্বারা এই অর্থ পরিস্ফুট হয় যে, তোমার কর্তব্য যেমন যজ্ঞ দ্বারা দেবতাদের উন্নত করা, তেমনই দেবতাদেরও কর্তব্য তোমাদের প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ করে তোমাদের উন্নত করা। তাই তাঁদেরও আমার এই উপদেশ যে, তাঁরা তাঁদের কর্তব্য পালন করুন।

প্রশ্ন—নিঃস্বার্থভাবে একে অপরের উন্নতি করে তোমরা পরম কল্যাণ প্রাপ্ত হবে, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথার দ্বারা শ্রীব্রহ্মা বলতে চেয়েছেন যে এইভাবে নিজ নিজ স্বার্থ-ত্যাগ করে একে অপরকে উন্নত করার জন্য স্ব কর্তব্য পালন করলে তোমরা এই জাগতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পরমকল্যাণরূপ মোক্ষও লাভ করবে। অভিপ্রায় হল যে, এখানে দেবতাদের জন্য ব্রহ্মার আদেশ আছে যে মানুষ যদি তোমাদের সেবা, পূজা, যজ্ঞ ইত্যাদি না করে, তাহলেও তোমরা কর্তব্য মনে করে তাদের উন্নতি করবে এবং মানুষের প্রতি তাঁর আদেশ যে দেবতাদের উন্নতি ও পুষ্টিবিধানের জন্য স্বার্থত্যাগ করে দেবতাদের সেবা-পূজা-যজ্ঞ ইত্যাদি কর্ম করো। এতদ্ব্যতীত অন্য ঋষি, পিতৃপুরুষ, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদিরও নিঃস্বার্থভাবে সেবা করে স্বধর্ম পালনের দ্বারা তাদের সুখ প্রদান করো।

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ।। ১২

যজ্ঞের দ্বারা সংবর্ধিত হয়ে দেবতাগণ তোমাদের না চাইলেও অভীষ্ট বস্তু নিশ্চয়ই দিতে থাকবেন। এইভাবে দেবগণ প্রদত্ত ভোগ্যবস্তু যে ব্যক্তি তাঁদের নিবেদন না করে স্বয়ং ভোগ করে, সে অবশ্যই চোর।। ১২

প্রশ্ন—যজ্ঞের দ্বারা সংবর্ধিত হয়ে দেবতা তোমাদের অভীষ্ট বস্তু নিশ্চয়ই দিতে থাকবেন, এই বাক্যটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা এই ভাব প্রকাশ করা হয়েছে যে, তোমাদের নিজ নিজ কর্তব্য পালন করা উচিত, ফলস্বরূপ তোমাদের যজ্ঞের দ্বারা সংবর্ধিত হয়ে দেবতাগণ তোমাদের সর্বদাই সুখভোগ এবং জীবন-নির্বাহের জন্য আবশ্যক বস্তু দিতে থাকবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই ; কারণ তাঁরা নিজ কর্তব্য-পালন করতে বাধ্য।

প্রশ্ন—তাঁদের প্রদত্ত ভোগসমূহ যেসব মানুষ তাঁদের না দিয়েই নিজেরা ভোগ করে, তারা চোরই হয়ে থাকে, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—ভগবান এই পর্যন্ত প্রজাপতি ব্রহ্মার কথা জানাবার পর এবার উপরোক্ত বাক্যের দ্বারা এই ভাব দেখাচ্ছেন যে, এইভাবে শ্রীব্রহ্মার উপদেশানুসারে এই দেবগণ সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষদের সুখী করার জন্য তাদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার জন্য পশু, পক্ষী, ঔষধ, বৃক্ষ, তৃণ ইত্যাদি সহ সব কিছুর পুষ্টি করছেন এবং অন্ন, জল, পুষ্প, ফল, ধাতু ইত্যাদি মনুষ্যোপযোগী সমস্ত বস্তু মানুষকে প্রদান করছেন। যেসব ব্যক্তি ঐ দেবতাদের ঋণশোধ না করে—তাঁদের ন্যায়োচিত স্বত্ব তাঁদের অর্পণ না করে নিজ কাজে লাগায়, সে এমনই কৃতঘ্ন ও চোর হয় ; যেমন কোনো স্নেহশীল মাতা-পিতার দ্বারা পালিত পুত্র তাঁদের সেবা না করায় এবং তাঁদের

মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ-তর্পণ না করায় কিংবা কারো দ্বারা উপকৃত হওয়া মানুষ সেই উপকারী ব্যক্তির যথাসাধ্য প্রত্যুপকার না করায় অথবা দত্তক পুত্র পিতার দ্বারা প্রাপ্ত সম্পত্তি উপভোগ করে সেই মাতা-পিতার সেবা না করায় কৃতঘ্ন ও চোর পদবাচ্য হয়।

প্রশ্ন—যখন দেবতারা মানুষের দ্বারা সন্তুষ্ট হয়ে তাদের প্রয়োজনীয় ভোগপ্রদান করেন, তাহলে তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া ভোগাদি বস্তু যদি মানুষ তাঁদের ফিরিয়ে না দেয়, তবে তারা চোর কী করে হয় ?

উত্তর—সৃষ্টির আদিকাল থেকেই মানুষ যজ্ঞের সাহায্যে দেবতাদের সংবর্ধিত করে আসছে এবং দেবতারাও মানুষকে মনোবাঞ্ছিত ভোগ্যবস্তু প্রদান করে আসছেন। এই পরম্পরা সৃষ্টির আদি থেকে চলে আসছে। এই পরম্পরাগত আদান-প্রদানে যে সব মানুষ আগে যজ্ঞাদির সাহায্যে দেবতাদের সংবর্ধিত করেছেন এবং যাঁরা বর্তমানে সংবর্ধিত করছেন, তাঁরা চোর নন। কিন্তু অন্য ব্যক্তিদের দ্বারা সংবর্ধিত দেবগণের থেকে ইষ্ট ভোগ প্রাপ্ত করে, যারা তাঁদের জন্য যজ্ঞ করে না, তাদের চোর বলাই উচিত। যেমন অন্যের প্রতিপালিত গোরুর দুধ যদি অন্য একজন পান করে বলে যে, গোরুর সেবা মানুষেই করে আর আমিও মানুষ, তবে তাকে চোর মনেকরা হয়—তেমনই অপর মানুষের দ্বারা সংবর্ধিত দেবগণের থেকে ভোগপ্রাপ্ত করে, তাঁদের না দিয়ে যে ভোগ করে, তাকে চোরই বলা উচিত।

সম্বন্ধ—এইভাবে শ্রীব্রহ্মার কথার প্রমাণ দিয়ে ভগবান যজ্ঞাদিরূপ কর্তব্যকর্মের প্রতিপাদন করেছেন এবং সেই সঙ্গে যারা যজ্ঞাদি করে না, তাঁদের চোর বলে নিন্দা করেছেন। এখন সেই কর্তব্যকর্ম পালনকারী ব্যক্তিদের প্রশংসা করে তার বিপরীতে যারা দেহের পোষণ করার জন্যই শুধু কর্ম করে সেই পাপীদের নিন্দা করছেন—

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥ ১৩

যজ্ঞের অবশিষ্ট অন্নগ্রহণকারী শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ সর্বপাপ হতে মুক্ত হন, আর যে পাপাত্মাগণ নিজ শরীর পোষণের জন্য অন্নপাক করে, তারা পাপই ভক্ষণ করে॥ ১৩

প্রশ্ন—'যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ' পদটি কোন্ মানুষদের বাচক ?

উত্তর—এখানে 'যজ্ঞ' শব্দের দ্বারা প্রধানতঃ পঞ্চ-মহাযজ্ঞকে উদ্দেশ্য করে ভগবান সেই সব শাস্ত্রীয় সৎকর্মের কথা বলেছেন, যা কর্মের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। সৃষ্টিকার্য সুচারুরূপে সঞ্চালনে এবং সৃষ্টির জীবদের ভালোভাবে ভরণ-পোষণের নিমিত্ত পাঁচশ্রেণীর প্রাণী—দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ, মানুষ ও অন্য প্রাণী পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। এই পাঁচের সহযোগিতায় সকলের পুষ্টি হয়। দেবগণ সমস্ত জগৎকে বাঞ্ছিত ভোগবস্তু প্রদান করেন, ঋষি-মহর্ষি সকলকে জ্ঞান প্রদান করেন, পিতৃ-পুরুষগণ সন্তানদের ভরণ-পোষণ করেন এবং হিত কামনা করেন, মানুষ কর্মের দ্বারা সকলের সেবা করে এবং পশু-পক্ষী, বৃক্ষাদি সকলের সুখের সাধনরূপে নিজেকে সমর্পণ করে থাকে। এই পাঁচটির মধ্যে যোগ্যতা, অধিকার ও সামর্থ্যের দৃষ্টিতে সকলের উন্নতির দায়িত্ব মানুষের ওপরে বর্তায়। তাই মানুষ শাস্ত্রীয় কর্ম পালনের মাধ্যমে সকলের সেবা করে। পঞ্চমহাযজ্ঞ দ্বারা এখানে লোকসেবারূপ শাস্ত্রীয় কর্মকেই লক্ষ্য করা হয়েছে।[১] মানুষের কর্তব্য হল তার উপার্জন করা যা কিছু, তাতে সকলের ভাগ বা অংশ

[১]'পাঠো হোমশ্চাতিথীনাং সপর্যা তর্পণং বলিঃ। অমী পঞ্চ মহাযজ্ঞা ব্রহ্মযজ্ঞাদিনামকাঃ।'

সৎ শাস্ত্রাদি পাঠ (ব্রহ্মযজ্ঞ অথবা ঋষিযজ্ঞ), হবন (দেবযজ্ঞ), অতিথিদের সেবা (মানুষ যজ্ঞ), শ্রাদ্ধ ও তর্পণ (পিতৃযজ্ঞ), প্রাণীমাত্রকেই খাবার দিয়ে তাদের সেবা করা (ভূত যজ্ঞ)—এই পাঁচটি মহাযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ ইত্যাদি নামেও প্রসিদ্ধ।

আছে মনে করা, কারণ সে সকলের সাহায্যে এবং সহযোগেই উপার্জন করে এবং নিজের ভরণ-পোষণ করে। তাই যে ব্যক্তি যজ্ঞ করার পর সকলকে প্রাপ্য ভাগ দিয়ে তারপর উদ্বৃত্ত অন্নগ্রহণ করে, শাস্ত্রকার তাকেই অমৃতাশী (অমৃত-গ্রহণকারী) বলেছেন। যে ব্যক্তি এরূপ করে না, অপরের ভাগ নিজে নিয়ে শুধু নিজেই আহার করে সে পাপ আহার করে। বিভিন্ন ক্রিয়া দ্বারা উপার্জিত অন্নের ভোজন সেটি রন্ধন হলে তবেই করা সম্ভব এবং সেই অন্নের অগ্নিতে আহুতি না দিলে হবন ও পঞ্চমহাযজ্ঞ (বলিবৈশ্বদেব) সিদ্ধ হয় না, তাই এখানে হবন ও বলিবৈশ্বদেবকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র হবন-বলিবৈশ্বদেবরূপ কর্ম দ্বারাই পঞ্চমহাযজ্ঞাদির পূর্তি হয় না। বাস্তবে সেই ব্যক্তিই যজ্ঞাবশেষ গ্রহণকারী যে সকলকে নিজের উপার্জনের অংশ যথাযোগ্য দিয়ে তারপর উদ্বৃত্ত অংশ নিজে ভোগ করে। সেই স্বার্থত্যাগী কর্মযোগীর বাচক হল এই **'যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ'** পদটি।

প্রশ্ন—**'সন্তঃ'** পদটি এখানে সাধকদের বাচক না কি সিদ্ধদের ?

উত্তর—সাধকদের বাচক ; কারণ সিদ্ধ পুরুষদের পাপ হয় না আর এখানে পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—**'সন্তঃ'** পদটির প্রয়োগ কি সিদ্ধ পুরুষদের জন্য প্রযুক্ত হতে পারে না ? সিদ্ধ পুরুষরা কি যজ্ঞ করেন না ?

উত্তর—সিদ্ধ পুরুষরাই তো প্রকৃত সন্ত, কিন্তু এই প্রকরণে সন্ত পদের অর্থ হল 'নিঃস্বার্থভাবে কর্মকারী সাধক।' সিদ্ধ পুরুষও যজ্ঞ করেন ; কিন্তু পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নয়, তাঁরা স্বাভাবিকভাবে লোকসংগ্রহার্থে যজ্ঞ করে থাকেন।

প্রশ্ন—এখানে সর্বপাপ থেকে মুক্ত হওয়ার কী তাৎপর্য মনে করা উচিত ?

উত্তর—মানুষের পূর্বকৃত পাপের সঞ্চয় থাকে, বর্তমান জীবননির্বাহের জন্য বৈধভাবে অর্থোপার্জন করাতেও মানুষের আনুষঙ্গিক পাপ জমা হয়। **'সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ'** (১৮।৪৮) এবং ন্যায়সঙ্গত ভাবে করা যজ্ঞ, প্রজাপালন, যুদ্ধ, চাষবাদ, ব্যবসা ও শিল্প ইত্যাদি জীবনধারণের প্রত্যেক কাজে কিছু না কিছু হিংসা হয়ে থাকে। গৃহস্থের গৃহেও প্রাত্যহিক কাজকর্মে কিছু হিংসা হয়ে থাকে[১]। এতদ্ব্যতীত প্রমাদবশতঃ ও অন্যান্য কারণেও অনেক পাপ সঞ্চিত হয়। যে ব্যক্তি নিঃস্বার্থভাবে শুধুমাত্র লোকসেবার উদ্দেশ্যে সর্বজীবকে সুখী করার জন্যই পঞ্চমহাযজ্ঞ করেন এবং এতেই জীবনধারণের সার্থকতা মনে করে নিজ ন্যায়োপার্জিত ধন যথাসাধ্য সকলের সেবারূপ কার্যে ব্যয় করে তার থেকে উদ্বৃত্ত অর্থ শুধু তাদেরই সেবার উদ্দেশ্যে নিজ জীবনধারণের জন্য প্রসাদরূপে গ্রহণ করেন, সেই সৎ পুরুষ অতীত ও বর্তমানের সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন (৪।৩১) ; সেইজন্য এরূপ সাধককে সন্ত বলা হয়। অতএব এখানে সর্বপাপ থেকে মুক্ত হওয়ার এটিই তাৎপর্য বলে বুঝতে হবে।

গৃহস্থালিতে প্রত্যহ এই পঞ্চপাপ হয়ে থাকে। এই পঞ্চপাপ থেকে সেই সকাম ব্যক্তিও মুক্ত হয়ে যান যিনি নিজ সুখভোগলাভের উদ্দেশ্যে শাস্ত্রবিধি অনুসারে কর্ম করেন এবং প্রায়শ্চিত্তরূপে প্রত্যহ হবন-যজ্ঞ-বলিবৈশ্বদেবাদি কর্ম করে সকলের স্বত্ব তাদের দিয়ে দেন। কিন্তু এখানে কর্তার জন্য **'সন্তঃ'** পদটি এবং **'কিল্বিষৈঃ'**-এর সঙ্গে **'সর্ব'** বিশেষণ ব্যবহৃত হওয়ায় বুঝতে হবে যে এইরূপ নিষ্কামভাবে পঞ্চমহাযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানকারী সন্তপুরুষ অতীত ও বর্তমানের সর্বপাপ থেকে মুক্ত হন।

প্রশ্ন—যে ব্যক্তি শুধু নিজ শরীর পোষণের নিমিত্ত রান্না-খাওয়া করে তাকে পাপী এবং তার খাদ্যকে পাপ বলা হয়েছে কেন ?

উত্তর—এখানে রান্না-খাওয়া উপলক্ষ্যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগ করা সমস্ত ভোগের কথা বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি ভোগ্য উপার্জন ও তার যজ্ঞাবশিষ্ট নিষ্কামভাবে কেবল লোকসেবার্থে উপভোগ করেন, তিনি উপরোক্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যান এবং যিনি কেবল সকামভাবে সকলকে ন্যায়োচিত ভাগ দিয়ে উপার্জিত ভোগাদি উপভোগ করেন, তিনিও পাপী নন। কিন্তু যে ব্যক্তি

[১]কণ্ডনী পেষণী চুল্লী উদকুম্ভী চ মার্জনী। পঞ্চ সূনা গৃহস্থস্য বর্তন্তেঽহরহঃ সদা ॥

শুধুমাত্র নিজ সুখের জন্য—নিজের শরীর ও ইন্দ্রিয় পোষণের জন্য ভোগরাশি উপার্জন করে এবং নিজেই ভোগ করে, সেই ব্যক্তি পাপের দ্বারা পাপ উপার্জন করে এবং পাপই ভক্ষণ করে, কারণ তার ক্রিয়াগুলি যজ্ঞোচিত নয় এবং সে তার উপার্জন থেকে সকলকে যথাযোগ্য ভাগও দেয় না। তাই তার উপার্জন ও উপভোগ উভয়ই পাপময় হওয়ায় তাকে পাপী এবং তার ভোগসমূহকে পাপ বলা হয় (মনুস্মৃতি ৩।১১৮)।[১]

সম্বন্ধ—এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে যজ্ঞ না করলে কী ক্ষতি হয় ? তার উত্তরে সৃষ্টিচক্র সুরক্ষিত রাখার জন্য যজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করছেন—

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ।। ১৪
কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।। ১৫

সকল প্রাণী অন্ন থেকে উৎপন্ন হয়, অন্নের উৎপত্তি বৃষ্টি থেকে, বৃষ্টি হয় যজ্ঞ থেকে এবং যজ্ঞের উৎপত্তি হয় বিহিত কর্ম থেকে। কর্ম উৎপন্ন হয় বেদ থেকে এবং বেদ অবিনাশী পরমাত্মা থেকে উৎপন্ন বলে জানবে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সর্বব্যাপী পরম অক্ষর পরমাত্মা সর্বদাই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত।। ১৪-১৫

প্রশ্ন—'অন্ন' শব্দের অর্থ কী ? সমস্ত প্রাণী অন্ন থেকে উৎপন্ন হয় এই বাক্যটির কী তাৎপর্য ?

উত্তর—এখানে 'অন্ন' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত, তাই এর অর্থ হিসাবে শুধু গম বা ছোলা ইত্যাদি শস্য মাত্র নয়, যেসব ভিন্ন ভিন্ন আহার যোগ্য স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থের দ্বারা বিভিন্ন প্রাণীর জীবন ধারণ হয়, সেই সমস্ত খাদ্য-পদার্থের বাচক এই 'অন্ন' শব্দটি। সুতরাং সমস্ত প্রাণী অন্ন দ্বারা উৎপন্ন হয়—এই বাক্যটির অর্থ হল যে খাদ্য-পদার্থের দ্বারাই সমস্ত প্রাণীর শরীরে রজ, বীর্য তৈরি হয়, সেই রজ-বীর্যের সংযোগেই বিভিন্ন প্রাণীর উৎপত্তি হয় এবং উৎপত্তির পরে তাদের পোষণও খাদ্য-পদার্থের দ্বারাই হয়, তাই সর্বপ্রকারে প্রাণীদের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও পোষণের কারণই হল অন্ন। শ্রুতিতে বলা হয়েছে—**'অন্নাদ্ ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে অন্নেন জাতানি জীবন্তি'** (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ৩।২) অর্থাৎ এই সব প্রাণী অন্নের দ্বারাই উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন হয়ে অন্নের দ্বারাই জীবিত থাকে।

প্রশ্ন—বৃষ্টি থেকে অন্ন উৎপন্ন হয়, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে জগতে স্থূল, সূক্ষ্ম যত প্রকার খাদ্য পদার্থ আছে, সেসবের উৎপত্তিতে জলই প্রধান কারণ, কারণ স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে জলের সম্পর্ক সর্বত্রই থাকে এবং জলের আধারই হল বৃষ্টি।

প্রশ্ন—বৃষ্টি যজ্ঞের দ্বারা হয় ; এই কথার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—জগতে যত জীব আছে ; তাদের মধ্যে মানুষই এমন জীব যার ওপর সমস্ত জীবের ভরণ-পোষণ ও সংরক্ষণের দায়িত্ব বর্তায়। মানুষ নিজের এই দায়িত্বকে মেনে নিয়ে কায়-মনো-বাক্যে সমস্ত জীবের জীবন-ধারণাদিরূপ হিতার্থে যে কর্ম করে, সেই কর্ম দ্বারা সম্পাদিত হওয়া সৎকর্মকে যজ্ঞ বলা হয়। এই যজ্ঞে হবন, দান, তপ ও জীবিকা ইত্যাদি সকল কর্তব্যকর্ম সমাবিষ্ট রয়েছে। যদিও এতে হবনের প্রাধান্য থাকায় শাস্ত্রে বলা আছে যে অগ্নিতে আহুতি দিলে বৃষ্টি হয় এবং সেই বৃষ্টিতে অন্ন উৎপত্তি হওয়ায় প্রজার উৎপত্তি হয় ; কিন্তু 'যজ্ঞ' শব্দদ্বারা এখানে শুধু হবনই লক্ষ্য নয়। লোকের উপকারার্থে কর্ম দ্বারা সম্পাদিত সৎকর্ম মাত্রেরই নাম যজ্ঞ।

[১]অঘং স কেবলং ভুঙ্ক্তে যঃ পচত্যাত্মকারণাৎ। যে ব্যক্তি নিজের জন্য রন্ধন করে, সে শুধু পাপই ভক্ষণ করে।

'বৃষ্টি যজ্ঞ থেকে হয়' এই বাক্যের দ্বারা বুঝতে হবে মানুষের দ্বারা কৃত কর্তব্য-পালনরূপ যজ্ঞের দ্বারাই বৃষ্টি হয়। আমরা বলে থাকি, অমুক দেশে তো যজ্ঞ হয় না, তবে ওখানে বর্ষা হয় কেন ? তার উত্তর হল সেখানে কোনো না কোনো ভাবে লোকহিতার্থে সৎকর্ম পালিত হয়। তাছাড়া একটি কথা হল জগৎ সৃষ্টির আরম্ভ থেকেই যজ্ঞ হয়ে চলেছে। সেই যজ্ঞের ফলস্বরূপ সেখানে বৃষ্টি হয়। যতক্ষণ পূর্বার্জিত যজ্ঞসমূহ সঞ্চিত থাকবে—তা সমাপ্ত না হয়— ততক্ষণ বৃষ্টি হতে থাকবে ; কিন্তু মানুষ যদি যজ্ঞ করা বন্ধ করে, তবে এই সঞ্চয় ধীরে ধীরে সমাপ্ত হয়ে যাবে এবং তারপরে আর বৃষ্টি হবে না, যার ফলে জগতের জীবদের শরীর ধারণ ও ভরণ-পোষণ কঠিন হয়ে পড়বে ; তাই কর্তব্যপালনরূপে মানুষের যজ্ঞ অবশ্যই করা উচিত।

প্রশ্ন—যজ্ঞ বিহিত কর্মের দ্বারা উৎপন্ন হয় ; এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর— এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে ভিন্ন ভিন্ন মানুষের জন্য তাদের বর্ণ, আশ্রম, স্বভাব ও পরিস্থিতির ভেদে যে নানাপ্রকার যজ্ঞ শাস্ত্রে বলা হয়েছে, সেসবই মন, ইন্দ্রিয় বা শারীরিক ক্রিয়ার দ্বারা সম্পাদিত হয়। শাস্ত্রবিহিত কর্ম ছাড়া কোনো যজ্ঞই সিদ্ধ হয় না। চতুর্থ অধ্যায়ের বত্রিশতম শ্লোকে এটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

প্রশ্ন—'**ব্রহ্মোদ্ভবম্**' পদে '**ব্রহ্ম**' শব্দের অর্থ কী এবং কর্মকে তার থেকে উৎপন্ন হওয়া বলার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—গীতায় '**ব্রহ্ম**' শব্দের প্রয়োগ প্রকরণ অনুসারে 'পরমাত্মা' (৮।৩, ২৪), প্রকৃতি (১৪।৩, ৪), 'ব্রহ্মা' (৮।১৭, ১১।৩৭), 'বেদ' (৪।৩২, ১৭।২৪), 'ব্রাহ্মণ' (১৮।৪২)—এই সব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে কর্মের উৎপত্তির প্রকরণ রয়েছে এবং মানুষের বিহিত কর্মের জ্ঞান বেদ ও বেদানুকূল শাস্ত্রের থেকেই হয়। তাই এইস্থানে '**ব্রহ্ম**' শব্দের অর্থ বেদ বলে বুঝতে হবে। এছাড়াও এই ব্রহ্ম অক্ষর থেকে উৎপন্ন বলা হয়েছে। তাইজন্যও ব্রহ্মের অর্থ বেদ মনে করাই সঠিক ; কারণ পরমাত্মা স্বয়ং অক্ষর এবং প্রকৃতি অনাদি, সুতরাং তিনি অক্ষর থেকে উৎপন্ন বলা সাজে না এবং ব্রহ্মা ও ব্রাহ্মণের প্রকরণ এটি নয়। কর্মসমূহ বেদ থেকে উৎপন্ন জানিয়ে এখানে এই ভাব দেখানো হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তির পক্ষে কীরূপ কর্ম কীভাবে করা কর্তব্য—এই বিষয় বেদ ও শাস্ত্র দ্বারা বুঝে নিয়ে যারা বিধিসম্মতভাবে কর্ম করে, তাদের দ্বারাই যজ্ঞ সম্পাদিত হয় এবং এই সকল কর্ম বেদ অথবা বেদানুকূল শাস্ত্র থেকেই জানা যায়। সুতরাং যজ্ঞ সম্পাদন করার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ কর্তব্য-জ্ঞান অর্জন করা উচিত।

প্রশ্ন—'বেদ অক্ষর থেকে উৎপন্ন' বলার অভিপ্রায় কী ; কারণ বেদ তো অনাদি বলে মনে করা হয় ?

উত্তর— পরব্রহ্ম পরমেশ্বর নিত্য, তাই তাঁর বিধানরূপ বেদও নিত্য—এতে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং বেদ পরমেশ্বর থেকে উৎপন্ন বলার অভিপ্রায় এই নয় যে বেদ আগে ছিল না এবং পরে উৎপন্ন হয়েছে। এর অভিপ্রায় হল যে, সৃষ্টির আদিকালে পরমেশ্বর থেকে বেদ প্রকটিত হয় এবং প্রলয়কালে তাতেই বিলীন হয়ে যায়। বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোনো পুরুষ রচিত শাস্ত্র নয়। এই অর্থে এখানে বেদকে অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী পরমেশ্বর থেকে উৎপন্ন বলা হয়েছে। অতএব এই বক্তব্যের দ্বারা বেদের অনাদিত্বই প্রমাণিত হয়। এই ভাবে সপ্তদশ অধ্যায়ের তেইশতম শ্লোকেও বেদ পরমাত্মা থেকেই উৎপন্ন বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—'**সর্বগতম্**' বিশেষণের সঙ্গে '**ব্রহ্ম**' পদ এখানে কীসের বাচক এবং হেতুবাচক '**তস্মাৎ**' পদ প্রয়োগ করে তা যজ্ঞে নিত্য প্রতিষ্ঠিত বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর —'**সর্বগতম্**' বিশেষণের সঙ্গে '**ব্রহ্ম**' পদ এখানে সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান, সর্বাধার, পরমেশ্বরের বাচক এবং '**তস্মাৎ**' পদ প্রয়োগ করে সেই পরমেশ্বরকে যজ্ঞে নিত্য প্রতিষ্ঠিত জানিয়ে এই কথা বলা হয়েছে যে সমস্ত যজ্ঞের বিধি যে বেদে বলা হয়েছে, সেই বেদ ভগবানেরই বাণী। অতএব তাতে উদ্ধৃত বিধি দ্বারা সম্পাদিত যজ্ঞে সমস্ত যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা সর্বব্যাপী পরমেশ্বর সর্বদাই স্বয়ং বিরাজ করেন, অর্থাৎ যজ্ঞ সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের 'মূর্তি'। তাই প্রত্যেক ব্যক্তিকে ঈশ্বর লাভের জন্য ভগবানের আদেশানুসারে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করা উচিত।

সম্বন্ধ—এইভাবে সৃষ্টিচক্রের স্থিতি যজ্ঞের ওপর নির্ভরশীল জানিয়ে এবং পরমাত্মা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত বলে, এবার সেই যজ্ঞরূপ স্বধর্ম-পালন করা অবশ্য কর্তব্য প্রমাণ করার জন্য সেই সৃষ্টিচক্রের অনুকূলে যারা চলে না অর্থাৎ যারা নিজ কর্তব্য পালন করে না, তাদের নিন্দা করেছেন।

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি।। ১৬

হে পার্থ ! যে ব্যক্তি ইহলোকে এইরূপ পরম্পরা প্রচলিত ঈশ্বরকর্তৃক প্রবর্তিত সৃষ্টিচক্রের অনুবর্তন করে না অর্থাৎ নিজ কর্তব্য পালন করে না, সেই ইন্দ্রিয় সুখে আসক্ত পাপী পুরুষ ব্যর্থই জীবন ধারণ করে।। ১৬

প্রশ্ন—এখানে '**চক্রম্**' পদটি কীসের বাচক, তার সঙ্গে '**এবং প্রবর্তিতম্**' বিশেষণ প্রয়োগের অর্থ কী অর্থাৎ তার অনুকূলে চলা কাকে বলে ?

উত্তর—চতুর্দশ শ্লোকের বর্ণনানুসারে '**চক্রম্**' পদটি এইস্থানে সৃষ্টি-পরম্পরার বাচক, কারণ মানুষের দ্বারা শাস্ত্রবিহিত কর্ম দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদিত হয়, যজ্ঞ থেকে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি থেকে অন্ন উৎপন্ন হয়, অন্ন থেকে প্রাণীর সৃষ্টি হয়, আবার সেই প্রাণীদের অন্তর্গত মানুষদের করা কর্ম থেকেই যজ্ঞ এবং যজ্ঞ থেকে বৃষ্টি হয়। এইভাবে সৃষ্টি পরম্পরা সর্বদাই চক্রের ন্যায় আবর্তিত হচ্ছে। এইটি বোঝানোর জন্যই এখানে '**চক্রম্**' পদটির সঙ্গে '**এবং প্রবর্তিতম্**' বিশেষণ প্রযুক্ত হয়েছে। নিজ নিজ বর্ণ, আশ্রম, স্বভাব ও পরিস্থিতি অনুযায়ী যে ব্যক্তির যা স্বধর্ম, যা পালন করা তার দায়িত্ব—সেই অনুযায়ী সাবধান হয়ে নিজ কর্তব্য পালন করা হল সেই চক্র অনুসারে চলা। সুতরাং আসক্তি ও কামনা ত্যাগ করে শুধুমাত্র সৃষ্টি-চক্রকে সুচারুরূপে বজায় রাখার জন্য যিনি (যোগীপুরুষ) নিজ কর্তব্য পালন করেন, যাতে তাঁর বিন্দুমাত্রও স্বার্থের সম্পর্ক থাকে না, তিনি সেই স্বধর্মরূপ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত পরমেশ্বরকে লাভ করেন।

প্রশ্ন—যারা এই সৃষ্টিচক্রের অনুকূলে চলে না সেইসব মানুষদের '**ইন্দ্রিয়ারাম**' এবং '**অঘায়ু**' বলার এবং তাদের জীবন ব্যর্থ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—নিজ কর্তব্য পালন না করাই হল উপরোক্ত সৃষ্টিচক্রের অনুকূলে না চলা। নিজ কর্তব্য বিস্মৃত হয়ে যে ব্যক্তি বিষয়াসক্ত হয়ে ইন্দ্রিয়ভোগে আসক্ত হয়, যে কোনো প্রকারে ভোগের সাহায্যে ইন্দ্রিয় তৃপ্ত করাই যার প্রধান লক্ষ্য, সেই ব্যক্তিকে '**ইন্দ্রিয়ারাম**' বলা হয়েছে।

এইভাবে নিজ কর্তব্য ত্যাগ করা ব্যক্তি ভোগাদি কামনায় চালিত হয়ে স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে, নিজ স্বার্থের বশে অপরের হিতাহিতের কোনো পরোয়া করে না—যার ফলে অন্যের ওপর এর কুপ্রভাব পড়ে এবং সৃষ্টির ব্যবস্থাতে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। এরূপ হওয়ায় সমস্ত প্রজা দুঃখের সম্মুখীন হয়। তাই নিজ কর্তব্য পালন না করে সৃষ্টিচক্রে দুর্ব্যবস্থা উৎপন্নকারী ব্যক্তি অত্যন্ত ভয়ানক দোষের ভাগী হয়, সে নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সারাজীবন অন্যায়ভাবে ধন ও সম্পদ আহরণ করতে থাকে, তাই তাকে বলা হয় '**অঘায়ু**'।

সেই ব্যক্তি তার জীবনের প্রধান লক্ষ্য থেকে—জগতে নিজ কর্তব্যপালনের দ্বারা সমস্ত জীবকে সুখপ্রদান করে পরম কল্যাণরূপ পরমেশ্বরকে লাভ করা—এই উদ্দেশ্য থেকে সর্বতোভাবে চ্যুত হয় এবং নিজ অমূল্য মনুষ্যজীবন বিষয়ভোগে নিমজ্জিত করে ব্যর্থ কাল কাটায় ; তাই তার জীবনকে ব্যর্থ বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ—এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে উপরোক্ত প্রকারে সৃষ্টি-চক্র অনুসারে চলার দায়িত্ব কোন্ শ্রেণীর মানুষের ওপর বর্তায় ? এর উত্তরে শুধুমাত্র ঈশ্বর প্রাপ্ত সিদ্ধ মহাপুরুষ ব্যতীত এই সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত মানুষের ওপরই নিজ নিজ কর্তব্য পালনের দায়িত্ব থাকে—এটি জানানোর জন্য দুটি শ্লোকে জ্ঞানী মহাপুরুষদের জন্য কর্তব্যের অভাব এবং তার কারণ জানিয়েছেন—

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে।। ১৭

কিন্তু যে ব্যক্তি শুধু আত্মাতেই রমণ করেন, আত্মাতেই তৃপ্ত ও আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁর কোনো কর্তব্য থাকে না ॥ ১৭

প্রশ্ন—'তু' পদটির অর্থ কী ?

উত্তর—পূর্ব শ্লোকে যাদের জন্য কর্তব্য পালন অবশ্য কর্তব্য বলা হয়েছে এবং স্বধর্ম পালন না করায় যাদের 'অঘায়ু' বলে যাদের জীবন বৃথা বলা হয়েছে, সেই মানুষদের থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং শাস্ত্রের শাসনের ঊর্ধ্বে স্থিত জ্ঞানীমহাপুরুষদের অবস্থান বর্ণনা করার জন্য এখানে 'তু' পদটি প্রযুক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন— **'আত্মরতিঃ', 'আত্মতৃপ্তঃ'** এবং **'আত্মনি এব সন্তুষ্টঃ'**—এই তিনটি বিশেষণের সঙ্গে **'যঃ'** পদ কোন্ মানুষের বাচক এবং তাকে **'মানবঃ'** বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর— উপরোক্ত বিশেষণের সঙ্গে **'যঃ'** পদটি এখানে সচ্চিদানন্দঘন পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মাপ্রাপ্ত জ্ঞানী মহাত্মা পুরুষের বাচক এবং তাঁকে **'মানবঃ'** বলে এই ভাব দেখানো হয়েছে যে প্রত্যেক মানুষই সাধনার দ্বারা এরূপ হতে পারেন, কারণ পরমাত্মা প্রাপ্তিতে মানুষ মাত্রেরই অধিকার আছে।

প্রশ্ন—**'এব'** অব্যয়ের সঙ্গে **'আত্মরতিঃ'** বিশেষণের কী তাৎপর্য ?

উত্তর—এই বিশেষণটির দ্বারা বলা হয়েছে যে পরমাত্মাপ্রাপ্ত পুরুষের দৃষ্টিতে এই সম্পূর্ণ জগৎ যেমন স্বপ্নোত্থিত মানুষের কাছে স্বপ্নের জগৎ তদনুরূপ মনে হয়। তাই তাঁর কোনো জাগতিক বস্তুতেই বিন্দুমাত্র অনুরাগ থাকে না, তিনি কোনো বস্তুতে আসক্ত হন না। শুধুমাত্র পরমাত্মাতেই অভিন্নভাবে তাঁর অটল স্থিতি থাকে। এইজন্য তাঁর মন-বুদ্ধি জগতে আসক্ত হয় না। তাঁর দ্বারা একমাত্র পরমাত্মার স্বরূপের নিশ্চয় এবং চিন্তন সতত হতে থাকে। একেই বলা হয় তাঁর আত্মাতে রমণ করা।

প্রশ্ন—**'আত্মতৃপ্তঃ'** বিশেষণটির কী তাৎপর্য ?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে, ঈশ্বরপ্রাপ্ত মানুষ পূর্ণকাম হয়ে ওঠেন, তাঁর নিকট সাংসারিক কোনো বস্তুই প্রাপ্তযোগ্য বলে মনে হয় না এবং সাংসারিক কোনো পদার্থে তাঁর বিন্দুমাত্র প্রয়োজন থাকে না, তিনি পরমাত্মার স্বরূপে অনন্যভাবে স্থিত হয়ে চিরকালের মতো তৃপ্ত হয়ে যান।

প্রশ্ন—**'আত্মনি এব সন্তুষ্টঃ'** বিশেষণের কী ভাব ?

উত্তর—এর দ্বারা এই ভাব দেখাচ্ছেন যে ঈশ্বরপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিত্য-নিরন্তর পরমাত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, জগতের সংসারের অতি বড় প্রলোভনও তাঁকে আকর্ষণ করতে পারে না, তিনি কোনো কারণে বা কোনো ঘটনাতেই বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট হন না। সংসারের কোনো বস্তুতে তাঁর কোনোপ্রকার সম্বন্ধ থাকে না, তিনি হর্ষ-বিষাদ-বিকার থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়ে সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাতে সর্বদা সন্তুষ্ট থাকেন।

প্রশ্ন—তাঁর কোনো কর্তব্য থাকে না, এই কথাটির কী তাৎপর্য ?

উত্তর—এই কথার তাৎপর্য হল, উপরোক্ত বিশেষণে যুক্ত মহাপুরুষের ঈশ্বর লাভ হয়েছে, তাই তাঁর সমস্ত কর্তব্যের পূর্ণচ্ছেদ হয়েছে এবং তিনি কৃতকৃত্য হয়ে গেছেন ; কারণ মানুষের জন্য যতপ্রকার কর্তব্যের বিধান করা হয়েছে, সেসবের উদ্দেশ্য একমাত্র পরম কল্যাণ স্বরূপ পরমাত্মাকে লাভ করা। অতএব সেই উদ্দেশ্য যার পূর্ণ হয়ে গেছে, তার আর কোনো কিছু বাকি থাকে না, তার কর্তব্য সমাপ্ত হয়ে যায়।

প্রশ্ন— তাহলে জ্ঞানী ব্যক্তি কী কোনো কর্ম করেন না ?

উত্তর— জ্ঞানীর মন ও ইন্দ্রিয়াদি সহ দেহের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ থাকে না ; তাই বাস্তবে তিনি কিছুই করেন না। তবুও লোকদৃষ্টিতে তাঁর মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা পূর্বের অভ্যাসবশত প্রারব্ধ অনুসারে শাস্ত্রানুকূল কর্ম হতে থাকে। এরূপ কর্ম মমতা-অভিমান, আসক্তি ও কামনা থেকে সর্বতোভাবে রহিত হওয়ায় পরম পবিত্র ও অন্যের পক্ষে আদর্শ হয়। তেমন হলেও মনে রাখতে হবে যে এরূপ ব্যক্তির ওপর শাস্ত্রের কোনো শাসন থাকে না।

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥ ১৮

সেই মহাপুরুষের ইহজগতে কোনো কর্ম করা বা না করার কোনো প্রয়োজন থাকে না এবং কোনো প্রাণীর সঙ্গেও তাঁর বিন্দুমাত্র কোনো স্বার্থের সম্পর্ক থাকে না॥ ১৮

প্রশ্ন—সেই মহাপুরুষের কর্ম করা বা না করার কোনো প্রয়োজন থাকে না, এই কথা বলার কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—পূর্বশ্লোকে বলা হয়েছে যে, জ্ঞানী ব্যক্তির কোনো কর্তব্য থাকে না, সেই কথাটিই দৃঢ়তর করার জন্য এই বাক্যে তাঁর কর্তব্যের অভাবের হেতু জানিয়েছেন। তাৎপর্য হল যে, সেই মহাপুরুষ নিরন্তর পরমাত্মার স্বরূপে সন্তুষ্ট থাকেন, তাইজন্য তাঁর কোনো কর্মের দ্বারা লৌকিক বা পারলৌকিক প্রয়োজন সিদ্ধ করা বাকি থাকে না এবং এই প্রকার কর্ম ত্যাগ দ্বারাও তাঁর কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ করার থাকে না। কারণ তাঁর সমস্ত প্রয়োজন সমাপ্ত হয়ে গেছে। কোনো কিছুই লাভ করা তাঁর আর অবশেষ থাকে না। তাই তাঁর কর্ম করারও প্রয়োজন নেই এবং কর্ম না করারও প্রয়োজন নেই, তিনি শাস্ত্রের বিধিনিষেধ থেকে চিরতরে মুক্ত। যদি তাঁর মন, ইন্দ্রিয়ের সংঘাতরূপ শরীর দ্বারা কর্ম সম্পাদিত হয় তাহলে শাস্ত্র তাঁকে সেই কর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য করে না আর যদি কর্ম না করা হয়, তাহলেও শাস্ত্র কর্ম করার জন্য তাঁকে বাধ্য করে না।

সুতরাং জ্ঞানীর ক্ষেত্রে একথা মনে করার কোনো প্রয়োজন হয় না যে জ্ঞান হওয়ার পরও জীবন্মুক্তির সুখভোগের জন্য জ্ঞানীর কর্মত্যাগ অথবা কর্মের অনুষ্ঠান করার আবশ্যকতা আছে। কারণ জ্ঞান হওয়ার পর মন ও ইন্দ্রিয়াদির ভোগরূপ তুচ্ছ সুখের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্কই থাকে না, তিনি চিরকালের জন্য নিত্যানন্দে মগ্ন হয়ে যান এবং নিজেও আনন্দরূপ হয়ে ওঠেন। অতএব যে ব্যক্তি কোনো বিশেষ সুখলাভের জন্য তার পক্ষে 'গ্রহণ' বা 'ত্যাগ' রূপ কর্তব্য বাকি আছে বলে মনে করে, সে বাস্তবে জ্ঞানী নয়, কোনো স্থিতিবিশেষের জ্ঞান লাভ করে সে নিজেকে জ্ঞানী মনে করে। সতেরোতম শ্লোকে উল্লিখিত লক্ষণযুক্ত জ্ঞানীর মধ্যে এরূপ মনে করার কোনো অবকাশ নেই। এই কথাটি প্রমাণ করার জন্য ভগবান উত্তর-গীতাতেও বলেছেন—

জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তস্য কৃতকৃত্যস্য যোগিনঃ।
ন চাস্তি কিঞ্চিৎ কর্তব্যমস্তি চেন্ন স তত্ত্ববিৎ॥

(১।২২)

অর্থাৎ যে যোগী জ্ঞানরূপ অমৃত দ্বারা তৃপ্ত ও কৃতকৃত্য হয়ে গিয়েছেন, তাঁর জন্য কোনো কর্তব্য নেই। যদি কিছু কর্তব্য অবশেষ থাকে তাহলে তিনি তত্ত্বজ্ঞানী নন।

প্রশ্ন—সমস্ত প্রাণীর সঙ্গেও এঁর কিছুমাত্র স্বার্থের সম্পর্ক থাকে না, এই কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান এই তাৎপর্য দেখিয়েছেন যে, জ্ঞানীর যেমন কর্ম করা বা না করার কোনো প্রয়োজন থাকে না, তেমনই তাঁর স্থাবর-জঙ্গম কোনো প্রাণীর সঙ্গেও কোনো প্রয়োজন থাকে না। অভিপ্রায় হল যাঁর দেহাভিমান সর্বতোভাবে নাশ হয়নি এবং যিনি ঈশ্বর লাভের জন্য সাধনা করছেন, এরূপ সাধক যদিও তাঁর সুখ-ভোগের জন্য কিছু ইচ্ছা করেন না, তাহলেও শরীর নির্বাহের জন্য অন্য প্রাণীদের প্রতি কোনো না কোনো ভাবে তাঁর স্বার্থের সম্বন্ধ থাকে। সুতরাং তাঁর জন্য শাস্ত্রের নির্দেশানুসারে কর্মাদি গ্রহণ-ত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মাকে পাওয়ার পর জ্ঞানীর মধ্যে দেহের প্রতি অহংভাব না থাকায় তাঁর জীবনের চিন্তা থাকে না, এরূপ অবস্থায় প্রারব্ধানুসারে তাঁর শরীর-নির্বাহ স্বতঃই হয়ে থাকে। তাই তাঁর কোনো প্রাণীর সঙ্গে কোনোপ্রকার স্বার্থের সম্পর্ক থাকে না এবং তাঁর কোনো কর্তব্যও বাকি থাকে না, তিনি সর্বতোভাবে কৃতকৃত্য হয়ে যান।

প্রশ্ন—এইরূপ অবস্থায় তাঁর দ্বারা কর্ম করা হয় কেন ?

উত্তর—কর্ম করা হয় না, প্রারব্ধানুসারে লোক-দৃষ্টিতে তাঁর দ্বারা লোক-সংগ্রহার্থে কর্ম হতে থাকে, প্রকৃতপক্ষে সেই কর্মের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্বন্ধ থাকে না। তাই সেই কর্মগুলিকে 'কর্ম' বলে মানা হয় না।

সম্বন্ধ— এই পর্যন্ত ভগবান বহুপ্রকারের যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, মানুষ যতক্ষণ পরম শ্রেয় অর্থাৎ ঈশ্বর লাভ না করে, ততক্ষণ তার স্বধর্ম পালন করা অর্থাৎ নিজ বর্ণাশ্রম অনুসারে বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান নিঃস্বার্থভাবে করা অবশ্য কর্তব্য এবং ঈশ্বরপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য কোনো কর্তব্য না থাকলেও তাঁর মন-ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রারব্ধানুসারে লোকসংগ্রহার্থে কর্ম হয়ে থাকে। তাই এবারে ভগবান অর্জুনকে অনাসক্তভাবে কর্তব্যকর্ম করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন—

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥ ১৯

অতএব তুমি আসক্তিরহিত হয়ে সর্বদা কর্তব্যকর্মগুলি ভালোভাবে পালন করো। কারণ আসক্তিরহিত হয়ে কর্ম করলে মানুষ পরমাত্মাকে লাভ করে ॥ ১৯

প্রশ্ন—**'তস্মাৎ'** পদটির ভাব কী?

উত্তর—**'তস্মাৎ'** পদটি পূর্বের শ্লোকটির সঙ্গে সম্পর্কের দ্যোতক। এর দ্বারা ভগবান এই ভাব প্রকাশ করেছেন যে, এই পর্যন্ত আমি যেসব কারণে স্বধর্ম পালন করার পরম আবশ্যকতা প্রমাণ করেছি, ঐসব কথা বিচার করলে স্পষ্ট হয় যে সর্বপ্রকারে স্বধর্ম পালন করলেই তোমার হিত হবে। তাই তোমার নিজ বর্ণধর্ম অনুসারে কর্ম করা উচিত।

প্রশ্ন—**'অসক্তঃ'** পদটির অর্থ কী?

উত্তর—**'অসক্তঃ'** পদের দ্বারা ভগবান অর্জুনকে সমস্ত কর্ম ও তার ফলরূপে প্রাপ্ত সকল ভোগে আসক্তি ত্যাগ করে কর্ম করতে বলেছেন। আসক্তি ত্যাগ বললে কামনা ত্যাগও তার অন্তর্গত, কারণ আসক্তি থেকেই কামনার উৎপত্তি (২।৬২)। তাই এখানে ফলেচ্ছা ত্যাগের কথা পৃথকভাবে বলা হয়নি।

প্রশ্ন—**'সততম্'** পদের ভাব কী?

উত্তর—ভগবান প্রথমে একথা বলে এসেছেন যে, কোনো মানুষই কর্ম না করে একমুহূর্ত থাকতে পারে না (৩।৫); এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে মানুষ সর্বক্ষণ কিছু না কিছু করেই থাকে। তাই এখানে **'সততম্'** পদ প্রয়োগ করে তিনি এইভাব দেখিয়েছেন যে, তুমি সদা-সর্বদা যেসব কর্ম করো, সেসব কর্ম এবং তার ফলে আসক্তিরহিত হয়ে করো, কোনো সময় কোনো কর্ম আসক্তিপূর্বক কোরো না।

প্রশ্ন—**'কর্ম'** পদটির সঙ্গে **'কার্যম্'** বিশেষণের প্রয়োগের কী তাৎপর্য?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান বোঝাতে চেয়েছেন যে তোমার জন্য বর্ণ, আশ্রম, স্বভাব ও পরিস্থিতি অনুসারে যে কর্ম কর্তব্যবিহিত, সেই কর্মই তোমার করা উচিত; পরধর্মের কর্ম, নিষিদ্ধ কর্ম এবং ব্যর্থ বা কাম্যকর্ম করা উচিত নয়।

প্রশ্ন—**'সমাচর'** ক্রিয়ার অর্থ কী?

উত্তর—**'আচর'** ক্রিয়ার **'সম্'** উপসর্গ প্রয়োগ করে ভগবান বলতে চেয়েছেন যে ঐসব কর্ম তুমি সাবধানে বিধিপূর্বক যথাযথভাবে আচরণ করো। তা না হলে অসাবধানে করলে ঐ কর্মে ত্রুটি থাকতে পারে, তাহলে তোমার পরম শ্রেয়লাভে বিলম্ব হতে পারে।

প্রশ্ন—আসক্তিরহিত হয়ে যে ব্যক্তি কর্ম করেন, তিনি পরমাত্মাকে লাভ করেন, এই কথার অর্থ কী?

উত্তর—এই কথায় ভগবান উপরোক্ত কর্মযোগের ফল জানিয়েছেন। অভিপ্রায় হল যে, উপরোক্ত প্রকারে আসক্তি ত্যাগ করে কর্তব্যকর্মের আচরণকারী মানুষ কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরমপুরুষ পরমাত্মাকে লাভ করে, কর্মযোগের এতোই মহত্ত্ব। অতএব উপরোক্ত প্রকারে তোমার সমস্ত কর্ম করা উচিত।

সম্বন্ধ—পূর্বশ্লোকে ভগবান বলেছিলেন যে আসক্তিরহিত হয়ে যিনি কর্ম করেন তিনি পরমাত্মাকে লাভ করেন, সেই কথাটি দৃঢ় করার জন্য জনকাদির উদাহরণ দিয়ে পুনরায় অর্জুনের কর্ম করার ঔচিত্য সিদ্ধ করছেন—

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি ॥ ২০

জনকাদি জ্ঞানিগণও আসক্তিরহিত কর্মের দ্বারা পরম সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সেইজন্য লোকসংগ্রহের নিমিত্ত তোমারও নিষ্কাম কর্ম করা উচিত ॥ ২০

প্রশ্ন—'জনকাদয়ঃ' পদের দ্বারা কোন্ ব্যক্তিদের ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং ঐসব ব্যক্তিরাও কর্মের দ্বারা পরম সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, এই কথার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—ভগবানের উপদেশের সময় পর্যন্ত রাজা জনকের ন্যায় মমতা, আসক্তি ও কামনা ত্যাগ করে কেবল ঈশ্বরলাভের উদ্দেশ্যে কর্ম করে অশ্বপতি, ইক্ষ্বাকু, প্রহ্লাদ, অম্বরীষ প্রমুখ যত মহাপুরুষ ছিলেন, তাদের সকলকে লক্ষ্য করে 'জনকাদয়ঃ' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্বশ্লোকে বলা হয়েছিল যে, আসক্তিরহিত কর্মের দ্বারা মানুষ পরমাত্মাকে লাভ করেন, সেটি প্রমাণ করার জন্য এখানে বলা হয়েছে যে পূর্বকালে জনকের ন্যায় প্রধান প্রধান মহাপুরুষও আসক্তিরহিত কর্মের দ্বারা পরম সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। অভিপ্রায় হল যে আজ পর্যন্ত বহু মহাপুরুষ মমতা, আসক্তি ও কামনা ত্যাগ করে কর্মযোগ দ্বারা ঈশ্বর লাভ করেছেন, এ কোনো নতুন কথা নয়। সুতরাং এটি ঈশ্বরলাভের স্বতন্ত্র ও নিশ্চিত পথ, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন—পরমাত্মাপ্রাপ্তি তো তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা হয়, তাহলে এখানে আসক্তিরহিত কর্মকে পরমাত্মা প্রাপ্তির দ্বার বলা হয়েছে কী অভিপ্রায়ে ?

উত্তর—আসক্তিরহিত কর্মের দ্বারা যার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়ে যায়, পরমাত্মার কৃপায় তার তত্ত্বজ্ঞান আপনিই প্রাপ্তি হয় (৪।৩৮), এবং কর্মযোগযুক্ত মুনি তখনই পরমাত্মাকে লাভ করেন (৫।৬)। তাই এখানে আসক্তিরহিত কর্মকে পরমাত্মাপ্রাপ্তির দ্বার বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—লোকসংগ্রহ কাকে বলা হয় এবং এখানে লোকসংগ্রহের দিকে তাকিয়ে কর্ম করা উচিত বলার উদ্দেশ্য কী ?

উত্তর—সৃষ্টি-কার্য সুরক্ষিত করে রাখা, সেই ব্যবস্থাতে কোনোপ্রকার বাধা সৃষ্টি না করে তার সহায়ক হওয়া, তাকেই বলা হয় লোকসংগ্রহ। অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীর ভরণ-পোষণ ও রক্ষণের দায়িত্ব থাকে মানুষের ওপর ; সুতরাং নিজ বর্ণ, আশ্রম, স্বভাব, পরিস্থিতি অনুসারে কর্তব্যকর্মগুলি সঠিকভাবে পালন করে, অন্যকে নিজ আদর্শের দ্বারা দুর্গুণ-দুরাচার থেকে মুক্ত করে স্বধর্মে নিযুক্ত করা—তাকেই বলা হয় লোকসংগ্রহ।

এখানে অর্জুনের লোকসংগ্রহের দিকে দৃষ্টি রেখে কর্ম করা উচিত বলে ভগবান এই ভাব প্রকাশ করেছেন যে কল্যাণকাঙ্ক্ষী মানুষের পরম শ্রেয় পরমাত্মালাভের উদ্দেশ্যে আসক্তিরহিত হয়ে কর্ম করা উচিত। এছাড়া লোকসংগ্রহের জন্যও মানুষের কর্ম করতে থাকা উচিত। তাইজন্য তোমাকে লোকসংগ্রহের দিকে তাকিয়ে অর্থাৎ আমি নিজে যদি কর্ম না করি তাহলে আমাকে আদর্শ মনে করে অপরে নিজ কর্তব্য ত্যাগ করবে, যার ফলে জগৎ-সৃষ্টিতে বিপ্লব হয়ে সমস্ত ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যাবে ; সুতরাং জগৎ-সৃষ্টির সুব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য তোমার নিজ কর্তব্য পালন করতে হবে, এই দৃষ্টিতেও কর্ম করা উচিত, তা ত্যাগ করা তোমার পক্ষে কোনো মতেই উচিত নয়।

প্রশ্ন—লোকসংগ্রহার্থ কর্ম ঈশ্বরপ্রাপ্ত জ্ঞানী ব্যক্তি দ্বারাই কি শুধু সম্ভব নাকি সাধকও করতে পারেন ?

উত্তর—জ্ঞানীর জন্য তাঁর নিজের কোনো কর্তব্য থাকে না, তাঁর সকল কর্মই লোকসংগ্রহার্থে হয়ে থাকে ; জ্ঞানীকে আদর্শ করে সাধকও লোকসংগ্রহার্থে কর্ম করতে পারেন। অবশ্য তিনি পূর্ণরূপে তাতে সক্ষম হন না ; কারণ যতক্ষণ অজ্ঞতা সম্পূর্ণভাবে নিবৃত্ত না হয়, ততক্ষণ কোনো না কোনো ভাবে স্বার্থ থেকেই যায় এবং যতক্ষণ স্বার্থের বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ থাকে, ততক্ষণ পূর্ণরূপে লোকসংগ্রহার্থে কর্ম হয় না।

প্রশ্ন—যখন জ্ঞানীর কোনো কর্তব্য থাকে না এবং তাঁর দৃষ্টিতে কর্মের কোনো গুরুত্বই নেই, তখন তাঁর লোকসংগ্রহার্থ কর্ম কি শুধু লোক দেখানোর জন্যই হয় ?

উত্তর— জ্ঞানীর কোনো কর্তব্য না থাকলেও তিনি যা কিছু কর্ম করেন, তা শুধু লোক দেখাবার উদ্দেশ্যে করেন না, মনে যদি কর্মের কোনো গুরুত্ব না থাকে এবং তা কেবল লোক দেখানোর জন্য কর্ম করা হয়, তাহলে সেটি তো একপ্রকারের দম্ভ। জ্ঞানীর মধ্যে দম্ভ থাকতে পারে না। তাই তিনি যা কিছু করেন, লোকসংগ্রহের জন্য প্রয়োজন ও গুরুত্বপূর্ণ মনে করেই করেন ; তাতে লোক দেখানো বা আসক্তি বা কামনা-অহংকার কিছুই থাকে না। জ্ঞানী কোন্ ভাব নিয়ে কর্ম করেন, অপরে তা জানতেও পারে না ; এটিই হল তাঁর কর্মের বৈশিষ্ট্য।

সম্বন্ধ—পূর্বশ্লোকে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে লোকসংগ্রহের দিকে তাকিয়ে তাঁর কর্ম করা উচিত ; তাতে প্রশ্ন হতে পারে যে কর্ম করলে কীরূপ লোকসংগ্রহ হয় ? সেই বিষয় বোঝাতে গিয়ে ভগবান বলেছেন—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে।। ২১

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেমন আচরণ করেন, অন্য ব্যক্তিরাও সেই মতো আচরণ করে থাকে। তিনি যা কিছু প্রমাণ রূপে নির্দিষ্ট করে দেন, সকল মানুষ তারই অনুবর্তন করে।। ২১

প্রশ্ন—এখানে **'শ্রেষ্ঠঃ'** পদ কী প্রকার মানুষের বাচক ?

উত্তর—যাঁরা জগতে ভালো গুণ ও আচরণের জন্য ধর্মাত্মারূপে বিখ্যাত হয়েছেন, জগতের অধিকাংশ লোক যাঁদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করেন—সেই প্রসিদ্ধ মাননীয় মহাত্মা জ্ঞানীদের বাচক হল এইস্থানে **'শ্রেষ্ঠঃ'** পদটি।

প্রশ্ন—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যেসব কর্ম করেন, অপর ব্যক্তিরাও সেই সব কর্মই করে থাকেন, এই বাক্যটির কী ভাবার্থ ?

উত্তর— ভগবানের এই বাক্যটির তাৎপর্য এই যে, উপরোক্ত মহাত্মাগণ যদি তাঁদের বর্ণাশ্রম-ধর্ম যথাযথভাবে পালন করেন, তাহলে অন্য ব্যক্তিরাও তাঁদের দেখে নিজেদের বর্ণাশ্রম-ধর্ম শ্রদ্ধা সহকারে পালন করতে থাকবে। এর দ্বারা সৃষ্টির ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে, কোনোপ্রকার বাধা আসবে না। কিন্তু যদি কোনো ধার্মিক জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর বর্ণাশ্রম-ধর্ম পরিত্যাগ করেন, তাহলে লোকের ওপর এই প্রভাব পড়ে যে প্রকৃতপক্ষে কর্মের দ্বারা কিছু হয় না, যদি কর্মের দ্বারাই কিছু হত, তাহলে অমুক মহাপুরুষ কর্মত্যাগ করেছেন কেন—এই ভেবে তারা সেই মহাপুরুষকে অনুকরণ করে নিজ বর্ণাশ্রমের বিহিত নিয়ম ও ধর্ম ত্যাগ করে বসে। এর ফলে সংসারে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং সমস্ত ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। তাই মহাত্মা ব্যক্তিদের লোক-সংগ্রহের দিকে লক্ষ্য রেখে নিজ বর্ণ-আশ্রম অনুযায়ী সতর্কতার সঙ্গে সমস্ত কর্ম যথাযথভাবে পালন করা উচিত, কর্মের অবহেলা বা ত্যাগ করা উচিত নয়।

প্রশ্ন—তিনি যা কিছু প্রমাণ রূপে নির্দিষ্ট করেন, মনুষ্য সমাজ সেই অনুসারে আবর্তিত হয়—এই বাক্যটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নিজে আচরণ করে এবং লোকেদের শিক্ষা দিয়ে যে কথা প্রমাণ করেন অর্থাৎ মানুষের হৃদয়ে বিশ্বাস জাগিয়ে দেন যে অমুক কর্ম অমুক মানুষের এইভাবে করা উচিত এবং অমুক কর্ম এভাবে করা উচিত নয় ; সেই অনুযায়ী সাধারণ মানুষ চেষ্টা করতে থাকে। তাইজন্য মাননীয় শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী মহাপুরুষের সৃষ্টির ব্যবস্থা ঠিকমতো রাখার উদ্দেশ্যে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নিজে কর্ম পালনের মাধ্যমে সাধারণ লোকেদের শিক্ষা দিয়ে তাদের নিজ নিজ কর্তব্যকর্মে নিযুক্ত করা উচিত। তাঁর একথাও মনে রাখতে হবে যে তাঁর উপদেশ বা আচরণের দ্বারা জগৎ-সংসারের সুরক্ষিত ব্যবস্থা এবং বর্ণ-আশ্রমের কোনো ধর্ম বা মানবধর্মের পরম্পরাতে যাতে কোনোপ্রকার আঘাত না লাগে অর্থাৎ লোকেদের সেই সকল কর্মে শ্রদ্ধা ও ভাবে যেন কোনো ন্যূনতা না আসে।

প্রশ্ন—শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের আচরণ যখন সকলে অনুসরণ করে, তখন একথা বলার কী প্রয়োজন যে তিনি যা কিছু 'প্রমাণ' রূপে নির্দিষ্ট করে দেন, লোক সেই অনুসারে পরিচালিত হয় ?

উত্তর—জগতে সকল ব্যক্তির কর্তব্য একরূপ হয় না। দেশ-সমাজ-নিজ নিজ বর্ণাশ্রম-সময় এবং পরিস্থিতি অনুসারে সকলের ভিন্ন ভিন্ন কর্তব্য হয়ে থাকে। শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের পক্ষে সকলের যোগ্য কর্মগুলি পৃথকভাবে পালন করে দেখানো সম্ভব নয়। তাই শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ যেসব বৈদিক ও লৌকিক ক্রিয়াসমূহ তাঁর বাক্য দ্বারা প্রমাণ রূপে নির্দিষ্ট করেন, মানুষ সেই অনুসারে পরিচালিত হয়। এই দৃষ্টিতে পূর্বোক্ত কথা বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ—এইভাবে শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদের আচরণসমূহ লোকসংগ্রহের কারণ বলে ভগবান এবার তিনটি শ্লোকে নিজের উদাহরণ দিয়ে বর্ণাশ্রম অনুযায়ী বিহিত কর্ম অবশ্য পালন করার কথা প্রতিপাদন করছেন—

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি॥ ২২

হে পার্থ ! ত্রিলোকে আমার কোনো কর্তব্য নেই এবং প্রাপ্ত করার মতো বা অপ্রাপ্ত কোনো বস্তু নেই, তবুও আমি কর্মেই ব্যাপৃত থাকি॥ ২২

প্রশ্ন—অর্জুনকে 'পার্থ' শব্দ দ্বারা সম্বোধন করার অর্থ কী ?

উত্তর—কুন্তীর দুটি নাম—'পৃথা' এবং 'কুন্তী'। বাল্যাবস্থায় পিতা শূরসেনের কাছে থাকার সময় তাঁর নাম ছিল 'পৃথা' এবং যখন রাজা কুন্তিভোজ তাঁকে দত্তক নেন, তখন থেকে নাম হয় 'কুন্তী'। মাতার নামের সম্পর্কেই অর্জুনের নাম হয় পার্থ ও কৌন্তেয়। এখানে ভগবান অর্জুনকে কর্মে প্রবৃত্ত করতে পরম স্নেহ ও আত্মীয়তাসূচক 'পার্থ' নামে সম্বোধন করে যেন বলছেন 'আমার প্রিয় ভাই! আমি তোমাকে এমন কোনো কিছু বলছি না, যা কোনো অংশে নিম্নশ্রেণীর ; তুমি আমার নিজের ভাই, আমি তোমাকে সেই কথাই বলি যা আমি নিজেও করি এবং যা তোমার পক্ষে পরম শ্রেয়স্কর।'

প্রশ্ন—ত্রিলোকে আমার কোনোই কর্তব্য নেই, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা দেখানো হয়েছে যে মানুষের সম্বন্ধ তো শুধু এই জগতের সঙ্গে। তাই ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—এই চার পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য তার কর্তব্যের বিধান শুধু এই জগতেই সীমিত। কিন্তু আমি সাধারণ মানুষ নই, আমি স্বয়ং সকলের কর্তব্য-বিধানকারী সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। সুতরাং স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ত্রিলোকে আমি সর্বদাই অবস্থান করি। আমার জন্য কোনো লোকেই কোনো কর্তব্য বাকি নেই।

প্রশ্ন—এই তিন লোকে কোনো প্রাপ্তব্য বস্তুই আমার অপ্রাপ্ত নেই, এই কথার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—এই কথার দ্বারা ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, এই লোকের তো কথাই নেই, ত্রিলোকে কোথাও এমন কোনো প্রাপ্তব্য বস্তু নেই, যা আমার কাছে অপ্রাপ্ত ; কারণ আমি সর্বেশ্বর, পূর্ণকাম এবং সকলের স্রষ্টা।

প্রশ্ন—তা সত্ত্বেও আমি কর্মে ব্যাপৃত থাকি, এই কথার ভাবার্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, আমার কোনো বস্তুরই প্রয়োজন নেই, আর আমার কোনো কর্তব্যও বাকি নেই। তা সত্ত্বেও লোকসংগ্রহের দিকে দৃষ্টি রেখে এবং সব লোকেদের ওপর দয়া করে আমি কর্মে ব্যাপৃত থাকি, কর্ম ত্যাগ করি না। তাই কোনো ব্যক্তির এই ভেবে কর্মত্যাগ করা উচিত নয় যে, আমার যদি ভোগে আসক্তি না থাকে এবং কর্মফলরূপে কোনো বস্তুর প্রয়োজনীয়তা না থাকে, তাহলে আমি কর্ম করব কেন অথবা আমি তো পরমপদ লাভ করেছি, তবে আর কর্ম করার প্রয়োজন কী ? কারণ অন্য কোনো কারণে কর্ম করার প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও মানুষকে লোকসংগ্রহের দিকে দৃষ্টি রেখে কর্মে রত থাকা উচিত।

যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ ২৩

কারণ হে পার্থ ! আমি যদি সাবধানতার সঙ্গে কর্মে ব্যাপৃত না থাকি, তাহলে অত্যন্ত ক্ষতি হয়ে যাবে ; কারণ মানুষ সর্বপ্রকারে আমাকেই অনুসরণ করে॥ ২৩

প্রশ্ন—'**হি**' পদটির এখানে কী অর্থ ?

উত্তর—আগের শ্লোকে ভগবান যে বলেছিলেন আমার কর্তব্য না থাকলেও আমি কর্ম করি, তাতে প্রশ্ন হয় যে আপনার যখন কর্তব্যকর্মই নেই, তখন আপনি কীসের জন্য কর্ম করেন ? তাই দুটি শ্লোকে ভগবান তাঁর কর্মের হেতু জানাচ্ছেন, সেই কথাটির দ্যোতক হল এখানে '**হি**' পদটি।

প্রশ্ন—'**যদি**' এবং '**জাতু**'—এই দুটি পদ প্রয়োগের কী তাৎপর্য ?

উত্তর—এই দুটি পদের প্রয়োগ করে ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে আমার অবতার গ্রহণ ধর্ম স্থাপনের জন্য হয়ে থাকে, তাই আমি কোনো কালে কখনও যদি সমস্ত কর্মের পালন ঠিকমতো না করি বা অবহেলা করি —যদিও তা সম্ভব নয় ; তা সত্ত্বেও নিজ কর্ম পালনের গুরুত্ব বোঝাবার জন্য বলা হয়েছে যে 'যদি আমি কখনও সাবধানতা সহ কর্মে ব্যাপৃত না হই তাহলে ভয়ংকর ক্ষতি হবে ; কারণ সমস্ত জগতের হর্তা-কর্তা-সঞ্চালক এবং মর্যাদা-পুরুষোত্তম হয়েও যদি আমি অসাবধানতা অবলম্বন করি তাহলে সৃষ্টিচক্রে তুমুল অরাজকতা দেখা দেবে।

প্রশ্ন—মানুষ সর্বপ্রকারে আমার পথ অনুসরণ করে, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—ভগবানের বলার তাৎপর্য এই যে অনেকেই আমাকে অত্যন্ত শক্তিশালী ও শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন, অনেকে মনে করেন মর্যাদা-পুরুষোত্তম, তাইজন্য আমি যে কর্ম যে ভাবে করি, অন্যেরাও আমার দেখাদেখি সেগুলি সেইভাবে করতে থাকে অর্থাৎ আমার অনুকরণ করে। এই পরিস্থিতিতে যদি আমি কর্তব্যকর্মে অবহেলা করতে থাকি, সেগুলিতে সাবধানে বিধিপূর্বক ব্যাপৃত না হই, তাহলে সাধারণ লোকেও সেরূপ করতে থাকবে এবং তাহলে তারা স্বার্থ ও পরমার্থ—দুটি থেকেই বঞ্চিত হয়ে যাবে। অতএব লোকেদের কর্ম করার রীতি শেখানোর জন্য সমস্ত কর্ম আমি নিজে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে বিধিবৎ করে থাকি, কখনো কোথাও একটুও অসতর্ক হই না।

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥ ২৪

সেই জন্য আমি যদি কর্ম না করি তাহলে এই সব লোক উচ্ছন্নে যাবে এবং আমি বর্ণসঙ্করের হেতু হয়ে এই প্রজা বিনাশের কারণ হব॥ ২৪

প্রশ্ন—এখানে 'যদি আমি কর্ম না করি' একথা বলার কী প্রয়োজন ছিল ? কেননা আগের শ্লোকে তো বলেই ছিলেন যে 'যদি আমি সাবধানতার সঙ্গে কর্মে ব্যাপৃত না হই', তাই এই পুনরুক্তির অর্থ কী ?

উত্তর—পূর্বশ্লোকে 'যদি আমি সাবধান হয়ে কর্মে না ব্যাপৃত হই' এই বাক্যাংশের দ্বারা সাবধানতার সঙ্গে বিধিপূর্বক কর্ম না করলে যে ক্ষতি হবে তা নিরূপণ করা হয়েছে এবং এই শ্লোকে 'যদি আমি কর্ম না করি' এই বাক্যাংশের দ্বারা কর্ম না করলে অর্থাৎ তা ত্যাগ করলে সম্ভাব্য ক্ষতির কথা জানিয়েছেন। তাই এটি পুনরুক্তি নয়। দুটি শ্লোকে পৃথক পৃথক দুটি কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—আমি যদি কর্ম না করি, তাহলে এইসব মানুষ উচ্ছন্ন হয়ে যাবে, এই বাক্যটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান জানিয়েছেন যে আমি যদি কর্তব্যকর্ম ত্যাগ করি তাহলে সেই শাস্ত্রবিহিত কর্মগুলি বৃথা মনে করে অপরেও আমার দেখাদেখি তা পরিত্যাগ

করবে এবং রাগ-দ্বেষের বশীভূত হয়ে তথা প্রকৃতির প্রবাহে পড়ে ইচ্ছামতো নিকৃষ্ট কর্মে লিপ্ত হবে এবং একে অপরের অনুকরণ করে সকলেই স্বার্থপরায়ণ, ভ্রষ্টাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠবে। ফলস্বরূপ তারা জাগতিক ভোগে আসক্ত হয়ে নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে একে অপরের ক্ষতির পরোয়া না করে অন্যায়ভাবে শাস্ত্রবিরুদ্ধ লোকহানিকর পাপকর্মে ব্যাপৃত হবে। তার ফলে তাদের মনুষ্য-জন্ম ভ্রষ্ট হবে এবং মৃত্যুর পর নীচ জন্ম বা নরকে পতিত হতে হবে।

প্রশ্ন— আমি বর্ণসঙ্করের কারণ হব, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর— এখানে **'সঙ্করস্য'** পদটির দ্বারা সর্বপ্রকার সঙ্করতা বিবেচিত হয়েছে। বর্ণ-আশ্রম-জাতি-সমাজ-স্বভাব-দেশ-কাল-রাষ্ট্র ও পরিস্থিতি অনুসারে সব মানুষের নিজ-নিজ পালনীয় ধর্ম থাকে ; শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে নিয়মপূর্বক নিজ নিজ ধর্মপালন না করলে সমস্ত ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে এবং সব ধর্মেই সঙ্করতার সৃষ্টি হয় অর্থাৎ তার মিশ্রণ হয়। এইজন্য সর্বাহি নিজ নিজ কর্তব্য ভ্রষ্ট হয়ে নিন্দনীয় পরিস্থিতিতে পৌঁছে যায়— যার ফলে ধর্ম, কর্ম এবং জাতির নাশ হয়ে প্রায়শঃ মনুষ্যত্বই নষ্ট হয়ে যায়। তাই ভগবানের বক্তব্য হল যে, যদি আমি শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্ম ত্যাগ করি তাহলে ফলতঃ নিজের উদাহরণের মাধ্যমে এই লোকেদের শাস্ত্রীয় কর্ম ত্যাগ করিয়ে এদের ধর্মনাশক সঙ্করতা উৎপন্ন করাতে আমিই কারণ হব।

প্রশ্ন— এই সব প্রজাদের নষ্ট করার কারণ হব, এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর— কর্তব্যভ্রষ্ট হওয়ায় যখন লোকেদের মধ্যে সর্বপ্রকারের সঙ্করতা ছড়িয়ে পড়ে, সেইসময় মানুষ ভোগপরায়ণ ও স্বার্থান্ধ হয়ে ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বন করে একে অন্যের বিনাশ করতে উদ্যত হয়, নিজের ক্ষুদ্র ও ক্ষণিক সুখোপভোগের নিমিত্ত অপরের বিনাশ সাধনে একটুও ইতস্ততঃ করে না। এরূপ অত্যাচার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে, তার সঙ্গে নতুন নতুন দৈব বিপত্তিও এসে হাজির হয়—যার ফলে সকল প্রাণীর প্রয়োজনীয় খাদ্য-বস্ত্র ও জীবনধারণের সমস্ত সুবিধা নষ্ট হয়ে যায় ; চতুর্দিকে মহামারী, অনাবৃষ্টি, বন্যা-প্রলয়, অকাল, ভূমিকম্প, দাবানল, উল্কাপাত ইত্যাদি হতে থাকে। এর ফলে সমস্ত প্রজা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। তাই ভগবান 'আমি সমস্ত প্রজাদের নষ্ট করার কারণ হব' বাক্যটির দ্বারা এই ভাব দেখিয়েছেন যে যদি আমি শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য-কর্ম ত্যাগ করি তবে আমি উপরোক্ত প্রকারে লোকেদের উচ্ছৃঙ্খল করে সমস্ত প্রজানাশের কারণ হব।

সম্বন্ধ— এইভাবে তিনটি শ্লোকে কর্মসমূহ সাবধানে পালন না করলে এবং সেগুলি ত্যাগ করলে তার পরিণাম কি হতে পারে নিজের উদাহরণ দিয়ে তার বর্ণনা করে, লোকসংগ্রহের দৃষ্টিতে সকলের জন্য বিহিত কর্মের অবশ্য পালনের কথা প্রতিপাদন করে ভগবান এবার উপরোক্ত লোকসংগ্রহের দৃষ্টিতে জ্ঞানীদের কর্ম করার প্রেরণা দিয়েছেন—

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫

হে ভারত ! কর্মে আসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিরা যেমন কর্ম করে থাকে, আসক্তিবর্জিত বিদ্বান ব্যক্তিও লোকসংগ্রহ করার জন্য তেমনই ভাবে কর্ম করবেন ॥ ২৫

প্রশ্ন—এখানে **'কর্মণি'** পদ কোন্ কর্মসমূহের বাচক ?

উত্তর—নিজ নিজ বর্ণ, আশ্রম, স্বভাব ও পরিস্থিতি অনুসারে শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্মের বাচক এখানে **'কর্মণি'** পদটি ; কারণ ভগবান অজ্ঞ ব্যক্তিদের ঐ কর্মে ব্যাপৃত রাখার আদেশ দিয়েছেন এবং জ্ঞানীদেরও তাদের মতো কর্ম করার প্রেরণা দিচ্ছেন, অতএব এরমধ্যে নিষিদ্ধ কর্ম ও বৃথা কর্ম সম্মিলিত করা যাবে না।

প্রশ্ন—**'কর্মণি সক্তাঃ'** বিশেষণের সঙ্গে **'অবিদ্বাংসঃ'** পদটি এখানে কোন্ শ্রেণীর অজ্ঞ

ব্যক্তিদের বাচক ?

উত্তর—উপরোক্ত বিশেষণের সঙ্গে '**অবিদ্বাংসঃ**' পদটি এখানে শাস্ত্রে, শাস্ত্রবিহিত কর্মে এবং তার ফলে শ্রদ্ধা, প্রেম ও আসক্তি রক্ষাকারী ও শাস্ত্রবিহিত কর্মে নিজ নিজ অধিকার অনুযায়ী বিধিপূর্বক অনুষ্ঠানকারী সকাম কর্মঠ ব্যক্তিদের বাচক। এঁদের কর্মবিষয়ক আসক্তি থাকায় এঁরা কল্যাণকারী শুদ্ধ সাত্ত্বিক কর্মযোগী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত নন আবার শ্রদ্ধাপূর্বক শাস্ত্রবিহিত কর্মের আচরণকারী হওয়ায় আসুরী, রাক্ষসী ও মোহিনী প্রকৃতিসম্পন্ন তামসিক ব্যক্তিদের মধ্যেও আসেন না। সুতরাং এইসব ব্যক্তিকে সেই সত্ত্বগুণমিশ্রিত রাজসিক স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত বুঝতে হবে, যাঁদের বর্ণনা দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিয়াল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশতম শ্লোক পর্যন্ত '**অবিপশ্চিতঃ**' পদে, সপ্তম অধ্যায়ের কুড়ি থেকে তেইশতম শ্লোকে '**অল্পমেধসাম্**' পদে এবং নবম অধ্যায়ের কুড়ি, একুশ, তেইশ ও চব্বিশতম শ্লোকে '**অন্যদেবতা ভক্তাঃ**' পদগুলির দ্বারা করা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে '**যথা**' ও '**তথা**'—এই দুটি পদ প্রয়োগ করায় ভগবানের কী তাৎপর্য ?

উত্তর—স্বাভাবিক স্নেহ, আসক্তি ও ভবিষ্যতে সুখ পাওয়ার আশায় মাতা তার পুত্রকে যেভাবে সত্যকার উৎসাহ ও তৎপরতার সঙ্গে লালন-পালন করেন, সেইভাবে অন্য কেউ করতে পারে না, তেমনই যেসব ব্যক্তির কর্মে এবং তার থেকে পাওয়া ভোগে স্বাভাবিকভাবে আসক্তি থাকে এবং সেগুলির বিধানকারী শাস্ত্রে যার বিশ্বাস থাকে, তারা যেরূপ আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা ও বিধিপূর্বক শাস্ত্রবিহিত কর্ম সুষ্ঠুভাবে পালন করে, সেইভাবে যাদের শাস্ত্রাদিতে শ্রদ্ধা এবং শাস্ত্রবিহিত কর্মে প্রবৃত্তি নেই, সেইসব ব্যক্তি তা পালন করতে পারে না। তাই এখানে '**যথা**' ও '**তথা**' প্রয়োগ করে ভগবানের এই তাৎপর্য যে বিন্দুমাত্র অহং-ভাব, মমতা, আসক্তি ও কামনা না থাকলেও জ্ঞানী মহাত্মাদের শুধুমাত্র লোকসংগ্রহের জন্য কর্মাসক্ত ব্যক্তিদের মতো শাস্ত্রবিহিত কর্ম বিধিপূর্বক পালন করা উচিত।

প্রশ্ন—এখানে 'বিদ্বানে'র অর্থ তত্ত্বজ্ঞানী মনে না করে শাস্ত্রজ্ঞানী মনে করলে কী ক্ষতি ?

উত্তর—'**বিদ্বান্**'-এর সঙ্গে '**অসক্তঃ**' বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে, সেই জন্য এর অর্থ শুধু শাস্ত্রজ্ঞানী মানা যায় না ; কারণ শুধুমাত্র শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা কোনো ব্যক্তি আসক্তিরহিত হয় না।

প্রশ্ন—'**লোকসংগ্রহং চিকীর্ষুঃ**' পদ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে জ্ঞানীর মধ্যেও ইচ্ছা থাকে ; একথা কি ঠিক ?

উত্তর—হ্যাঁ, থাকে ; কিন্তু তা অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়। সর্বতোভাবে ইচ্ছারহিত ব্যক্তির ইচ্ছা হওয়ার রূপ কেমন হয়, তা বোঝানো সম্ভব নয় ; শুধু এটাই বলা যায় যে তাঁর এই ইচ্ছা সাধারণ মানুষদের কর্ম তৎপর করে রাখার জন্য কথনমাত্রই হয়ে থাকে। এরূপ ইচ্ছা তো ভগবানেরও থাকে। বাস্তবে এই ইচ্ছা ইচ্ছাই নয়, তাই এখানে '**লোকসংগ্রহং চিকীর্ষুঃ**' দ্বারা এই কথা বুঝতে হবে যে ওদের দেখাদেখি যাতে অন্য ব্যক্তিরা নিজ কর্তব্য-কর্ম ত্যাগ করে উচ্ছৃঙ্খল না হয়ে ওঠে, সেইজন্য জ্ঞানীর শুধুমাত্র লোকহিতার্থে কর্ম করা উচিত ; এছাড়া তাঁর কর্মের অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকে না।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥ ২৬

পরমাত্মার স্বরূপে অটলভাবে স্থিত জ্ঞানী ব্যক্তির উচিত শাস্ত্রবিহিত কর্মে আসক্ত অজ্ঞব্যক্তিদের বুদ্ধিভেদ অর্থাৎ সেইসকল কর্মে অশ্রদ্ধা যাতে না হয় তা লক্ষ্য রাখা। তিনি স্বয়ং শাস্ত্রবিহিত কর্মের যথাযথ অনুষ্ঠান করে তাদেরও সেইভাবে পালন করাবেন ॥ ২৬

প্রশ্ন—'**যুক্তঃ**' বিশেষণের সঙ্গে '**বিদ্বান্**' পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—পূর্বের শ্লোকে বর্ণিত পরমাত্মার স্বরূপে অটলভাবে স্থিত আসক্তিরহিত তত্ত্বজ্ঞানীর বাচক এখানে '**যুক্তঃ**' বিশেষণের সঙ্গে '**বিদ্বান্**' পদটি।

প্রশ্ন—শাস্ত্রবিহিত কর্মে আসক্তিসম্পন্ন অজ্ঞান ব্যক্তিদের বুদ্ধিতে ভ্রম উৎপন্ন না করার জন্য বলার অভিপ্রায় কী ? এরূপ ব্যক্তিদের তত্ত্বজ্ঞান বা কর্মযোগের উপদেশ প্রদান করা কি উচিত নয় ?

উত্তর—কারো বুদ্ধিতে সংশয় বা দ্বিধা উৎপন্ন করাকে বুদ্ধিতে ভ্রম উৎপন্ন করা বলা হয়। সুতরাং কর্মাসক্ত মানুষের কর্মে, কর্মবিধায়ক শাস্ত্রে এবং অদৃষ্টভোগে যে আস্তিক্যবুদ্ধি থাকে, সেই বুদ্ধি বিচলিত করে তাঁর মনে কর্ম ও শাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপন্ন করে দেওয়াকে বলা হয় তাঁর বুদ্ধিতে ভ্রম উৎপন্ন করা। তাই এখানে ভগবান জ্ঞানীকে কর্মাসক্ত অজ্ঞব্যক্তিদের বুদ্ধিতে ভ্রম উৎপন্ন না করার জন্য বলে জানাচ্ছেন যে ঐসব ব্যক্তিদের নিষ্কাম-কর্মের এবং তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ প্রদানের সময় জ্ঞানীর খেয়াল রাখা উচিত যাতে তাঁর কোনো আচার-ব্যবহারে বা উপদেশে সেই সকাম ব্যক্তিদের অন্তঃকরণে কর্তব্যকর্ম বা শাস্ত্রের প্রতি যেন কোনোরূপ অশ্রদ্ধা বা সংশয় সৃষ্টি না হয় ; কারণ তাহলে তারা যেসব শাস্ত্রবিহিত কর্ম শ্রদ্ধাসহকারে সকামভাবে করতে থাকে, তা-ও জ্ঞানের বা নিষ্কামভাবের নামে পরিত্যাগ করে বসবে। ফলে উন্নতির পরিবর্তে তাদের বর্তমান স্থিতি থেকেও পতন হবে। সুতরাং ভগবানের বলার তাৎপর্য এই নয় যে অজ্ঞানীব্যক্তিদের তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দেওয়া উচিত নয় বা নিষ্কামভাবের তত্ত্ব বোঝানো উচিত নয় ; তিনি আসলে বলতে চেয়েছেন যে অজ্ঞব্যক্তিদের মনে এই ভাব উৎপন্ন হতে দিতে নেই যে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য বা তত্ত্বজ্ঞান লাভের পর কর্ম অনাবশ্যক অথবা এই ভাবও আসতে দিতে নেই যে ফলেচ্ছা না থাকলে কর্ম করার প্রয়োজন নেই এবং তাদের এই ভ্রমেও রাখা উচিত নয় যে ফলাসক্তিপূর্বক সকামভাবে কর্ম করে স্বর্গলাভ করাই অত্যন্ত বিশাল পুরুষার্থ, মানুষের এর থেকে বড় কর্তব্য আর কিছুই নেই। তার পরিবর্তে নিজ আচরণ ও উপদেশ দ্বারা তার অন্তরের আসক্তি ও কামনার ভাবগুলি দূরীভূত করে তাকে পূর্বের মতো শ্রদ্ধাপূর্বক কর্মে ব্যাপৃত করে রাখা উচিত।

প্রশ্ন—কর্মাসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিরা তো আগে থেকেই কর্মে ব্যাপৃত থাকে ; তাহলে এখানে এই কথার অভিপ্রায় কি যে বিদ্বান ব্যক্তি সুষ্ঠুভাবে নিজে কর্মের আচরণ করে তাদের দিয়েও কর্ম করাবেন ?

উত্তর—অজ্ঞানী ব্যক্তিরা শ্রদ্ধাপূর্বক কর্মে রত থাকে, একথা ঠিক ; কিন্তু যখন তাদের তত্ত্বজ্ঞান বা ফলাসক্তি ত্যাগের কথা বলা হয়, তখন তারা সেই বিষয় ঠিকমতো বুঝতে না পারায় ভ্রমবশতঃ মনে করে যে তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্য বা ফলাসক্তি না থাকায় কর্ম করার কোনো প্রয়োজন নেই, কেননা কর্ম অত্যন্ত নিম্নমানের বিষয়। তাই কর্মত্যাগে তাদের আসক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং অবশেষে মোহবশতঃ তারা বিহিত কর্ম ত্যাগ করে আলস্য ও প্রমাদের বশীভূত হয়ে যায়। তাই ভগবান উপরোক্ত বাক্য দ্বারা জ্ঞানীর জন্য এই কথা বলেছেন যে তাঁকে স্বয়ং অনাসক্তভাবে কর্মের সর্ব আচরণ করে সকলের কাছে এমন এক আদর্শ রাখা উচিত, যাতে কারো বিহিত কর্মে কখনোও অশ্রদ্ধা বা অরুচি না হয় এবং তারা ক্রমে নিষ্কামভাব এবং কর্তৃত্ববোধরহিত হয়ে বিধিপূর্বক কর্মের আচরণ করে নিজ মনুষ্য-জন্ম সফল করতে প্রয়াসী হয়।

সম্বন্ধ—এইভাবে দুটি শ্লোকে জ্ঞানীদের লোকসংগ্রহকে লক্ষ্যে রেখে শাস্ত্রবিহিত কর্ম করার প্রেরণা দিয়ে, এবার দুটি শ্লোকে কর্মাসক্ত জনসাধারণের থেকে সাংখ্যযোগীর বিশিষ্টতা প্রতিপাদন করছেন—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে॥ ২৭

বাস্তবে সমস্ত কর্ম সর্বপ্রকারে প্রকৃতির গুণের দ্বারাই সম্পন্ন হয়, কিন্তু যার অন্তঃকরণ অহংকারে মোহিত হয়ে রয়েছে, সেই অজ্ঞ ব্যক্তি মনে করে 'আমি কর্তা' ॥ ২৭

প্রশ্ন— সমস্ত কর্ম সর্বপ্রকারে প্রকৃতির গুণের দ্বারা সম্পন্ন হয়, এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর— প্রকৃতি হতে উৎপন্ন সত্ত্ব-রজ-তম—এই তিনগুণই বুদ্ধি, অহংকার, মন, আকাশ ইত্যাদি পাঁচ সূক্ষ্ম মহাভূত, শ্রোত্র ইত্যাদি দশ ইন্দ্রিয় এবং শব্দাদি পাঁচ বিষয়—এই তেইশ তত্ত্বের রূপে পরিণত হয়। এসবই প্রকৃতির গুণ এবং এদের মধ্যে অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদির বিষয়সমূহ গ্রহণ করা—অর্থাৎ বুদ্ধিকে কোনো বিষয়ে স্থির করা, মনকে কোনো বিষয় নিয়ে মনন করা, কানের শব্দ শোনা, ত্বকের কোনো বস্তুকে স্পর্শ করা, চোখের কোনো রূপ দর্শন করা, রসনার কোনো রস আস্বাদন করা, নাকের কোনো ঘ্রাণ গ্রহণ করা, বাণীর শব্দ উচ্চারণ করা, হাতে কোনো বস্তু গ্রহণ করা, পায়ে গমন করা, পায়ু ও উপস্থ দিয়ে মল-মূত্র ত্যাগ করা— এসবই কর্ম। তাই উপরোক্ত বাক্য দ্বারা ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, জগতে যেভাবে এবং যা কিছু ক্রিয়া হয়ে থাকে, তা সর্বপ্রকারে উপরোক্ত গুণাদির দ্বারাই করা হয়ে থাকে, নির্গুণ-নিরাকার আত্মার বস্তুতঃ তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন—'**অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা**' কীরূপ মানুষের বাচক ?

উত্তর—প্রকৃতির কার্যরূপ উপরোক্ত বুদ্ধি, অহংকার, মন, মহাভূত, ইন্দ্রিয়াদি ও বিষয়—এই তেইশ তত্ত্বের সংঘাতরূপ শরীরে যে অহং-অভিমান, তাতে যে দৃঢ় আত্মভাব থাকে—তার নাম অহংকার। এই অনাদিসিদ্ধ অহংকারে যার অন্তঃকরণ অত্যন্ত মোহগ্রস্ত হয়ে থাকে, যার বিবেকশক্তি লুপ্ত হয়েছে এবং সেইজন্য যে আত্ম-অনাত্ম বস্তুর প্রকৃত বিবেচনার মাধ্যমে নিজেকে শরীরের থেকে ভিন্ন শুদ্ধ আত্মা বা পরমাত্মার সনাতন অংশ বলে মনে করে না—সেই অজ্ঞানী ব্যক্তিদের বাচক এই '**অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা**' পদটি। তাই মনে রাখতে হবে যে আসক্তিরহিত বিবেকশীল কর্মযোগের সাধনকারী সাধকের বাচক এই '**অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা**' পদটি নয়। তাঁরা তো অহংকার বিনাশের চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকেন।

প্রশ্ন—উপরোক্ত অজ্ঞানী ব্যক্তি 'আমি কর্তা' এরূপ মনে করেন, এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথার অভিপ্রায় এই যে, বাস্তবে আত্মার কর্মের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকলেও অজ্ঞ ব্যক্তি তেইশ তত্ত্বের এই সংঘাতে আত্মাভিমান করে তার দ্বারা কৃত কর্মগুলির সঙ্গে নিজ সম্বন্ধ স্থাপন করে নিজেকে ঐ কর্মের কর্তা মনে করে—অর্থাৎ আমি ঠিক করছি, আমি সঙ্কল্প করছি, আমি শুনছি, দেখছি, খাচ্ছি, শুচ্ছি, চলছি ইত্যাদি ভাবে প্রত্যেক কর্মকে নিজের করা বলে মনে করে। সেইজন্য তার কর্মদ্বারা বন্ধন হয় এবং তাকে সেই কর্মের ফল ভোগ করার জন্য বারংবার জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারচক্রে আবর্তিত হতে হয়।

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥ ২৮

কিন্তু হে মহাবাহো ! গুণবিভাগ ও কর্মবিভাগের তত্ত্ব জানেন যে জ্ঞানযোগী, তিনি গুণই গুণেতে আবর্তিত হচ্ছে, এরূপ জেনে আসক্ত হন না ॥ ২৮

প্রশ্ন—'তু' পদটি প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—সাতাশতম শ্লোকে বর্ণিত অজ্ঞব্যক্তির স্থিতির সঙ্গে জ্ঞানযোগীর স্থিতির অত্যন্ত পার্থক্য আছে, তা দেখাবার জন্যই 'তু' পদটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—গুণবিভাগ এবং কর্মবিভাগ কী এবং ঐ দুটির তত্ত্ব জানা কাকে বলে ?

উত্তর—সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিন গুণাদির কার্যরূপে যে তেইশতত্ত্ব বিদ্যমান, যার বর্ণনা আগের

শ্লোকের ব্যাখ্যায় করা হয়েছে, সেই তত্ত্বের সমাহারকে গুণবিভাগ বলা হয়। মনে রাখতে হবে যে, অন্তঃকরণে যে সাত্ত্বিক, তামসিক ও রাজসিক ভাব থাকে—যার সম্বন্ধে কর্মে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই তিন পার্থক্য মানা হয় এবং যার ফলে অমুক ব্যক্তি সাত্ত্বিক, অমুক রাজসিক বা তামসিক—এরূপ বলা হয়, এই সকল গুণবৃত্তিসমূহও গুণবিভাগের অন্তর্গত।

উপরোক্ত গুণবিভাগ দ্বারা যে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া করা হয়, যার বর্ণনা আগের শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যে ক্রিয়াসমূহে কর্তৃত্বাভিমান ও আসক্তি থাকার ফলে মানুষ আবদ্ধ হয়, সেই সব ক্রিয়াকেই বলা হয় কর্মবিভাগ। উপরোক্ত গুণবিভাগ ও কর্মবিভাগ হল প্রকৃতিরই বিস্তার। সুতরাং এই সমস্তই জড়, ক্ষণিক, বিনাশশীল এবং বিকারশীল, মায়াময়—স্বপ্নের ন্যায় যথার্থ সত্তা ছাড়াই দৃষ্টমান। এই গুণবিভাগ এবং কর্মবিভাগ থেকে আত্মা সম্পূর্ণভাবে পৃথক। আত্মার সঙ্গে এর কোনো প্রকারের সম্বন্ধ নেই ; কেননা আত্মা সর্বতোভাবে নির্গুণ, নিরাকার, নির্বিকার, নিত্য শুদ্ধ, মুক্ত ও জ্ঞানস্বরূপ—এই তত্ত্বটি সঠিকভাবে জেনে নেওয়াই হল গুণবিভাগ ও কর্মবিভাগের তত্ত্বকে জানা।

প্রশ্ন—'গুণবিভাগ' ও 'কর্মবিভাগে'র তত্ত্ব জানা জ্ঞানযোগী সম্পূর্ণ গুণই গুণে আবর্তিত হচ্ছে, এরূপ জেনে তাতে আসক্ত হন না—এই কথাটির কী তাৎপর্য ?

উত্তর—এর তাৎপর্য হল, উপরোক্ত প্রকারে গুণবিভাগ ও কর্মবিভাগের তত্ত্ব জানা সাংখ্যযোগী মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও শরীর দ্বারা সম্পাদিত প্রতিটি ক্রিয়াতে মনে করেন যে গুণাদির কার্যরূপ মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি করণ (যন্ত্র) গুণাদির কার্যরূপে নিজ নিজ বিষয়ে ব্যাপৃত আছে, তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। সেইজন্য তিনি কোনো কর্মে বা কর্মফলরূপে ভোগে আসক্ত হন না অর্থাৎ কোনো কর্মে বা তার ফলে নিজের কোনোরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করেন না। সেগুলিকে অনিত্য, জড়, বিকারশীল এবং ক্ষণভঙ্গুর ও নিজেকে সদাই নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, নির্বিকার, অকর্তা ও সর্বতোভাবে আসক্তিহীন মনে করেন। পঞ্চম অধ্যায়ের অষ্টম ও নবম শ্লোকে এবং চতুর্দশ অধ্যায়ের উনিশতম শ্লোকেও এই কথা বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ—এইভাবে কর্মাসক্ত ব্যক্তিদের এবং সাংখ্যযোগীর অবস্থানের পার্থক্য জানিয়ে ভগবান এবার যথার্থ আত্মতত্ত্ব অনুভবকারী মহাপুরুষের কর্মাসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিদের বিচলিত না করার জন্য প্রেরণা দিচ্ছেন—

প্রকৃতের্গুণসম্মূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ॥ ২৯

প্রকৃতির গুণে মোহগ্রস্ত মানুষ গুণ ও কর্মে আসক্ত হয়ে থাকে, সেই সম্পূর্ণভাবে অবুঝ অজ্ঞ ব্যক্তিদের জ্ঞানী ব্যক্তিগণের বিচলিত করা উচিত নয়॥ ২৯

প্রশ্ন—'প্রকৃতেঃ গুণসম্মূঢ়াঃ' এই বিশেষণ কোন্ শ্রেণীর মানুষদের লক্ষ্য করায় এবং তারা গুণ ও কর্মে আসক্ত থাকে, এই কথাটির কী তাৎপর্য ?

উত্তর—পঁচিশ এবং ছাব্বিশতম শ্লোকে যে কর্মাসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিদের কথা বলা হয়েছে, এখানে '**প্রকৃতেঃ গুণসম্মূঢ়াঃ**' পদটি ইহলোক ও পরলোকের ভোগের কামনায় শ্রদ্ধা ও আসক্তিসহ কর্মে ব্যাপৃত সত্ত্ব মিশ্রিত রজোগুণী সেই সকল সকাম কর্মঠ মানুষদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। কারণ ঈশ্বরলাভের জন্য সাধনরত শুদ্ধ সাত্ত্বিক ব্যক্তি প্রকৃতির গুণে মোহগ্রস্ত হন না এবং নিষিদ্ধ কর্মকারী তামসী মানুষ, শাস্ত্রে শ্রদ্ধা না থাকায় ও বিহিত কর্মে অনুরাগ না থাকায় বিহিত কর্মের পালন করে না। সুতরাং সেই তামসিক ব্যক্তিদের কর্ম থেকে বিচলিত না করার কথা খাটে না, বরং তাদের শাস্ত্রে শ্রদ্ধা করিয়ে নিষিদ্ধ কর্ম ত্যাগ করিয়ে বিহিত কর্ম করার প্রয়োজনীয়তা থাকে।

এই সকাম ব্যক্তিরা গুণ ও কর্মে আসক্ত থাকে—এই কথার ভাবার্থ হল যে, গুণাদিতে মোহিত থাকায় এই সব লোকেদের প্রকৃতির অতীত সুখের কোনো জ্ঞান থাকে না, তারা জাগতিক ভোগকেই সব থেকে বেশি সুখদায়ক বলে মনে করে ; তাই তারা গুণাদির কার্যরূপ ভোগে এবং সেই ভোগপ্রাপ্তির উপায়রূপ কর্মে ব্যাপৃত থাকে—তারা সেই গুণের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কোনো ইচ্ছা বা চেষ্টা করে না।

প্রশ্ন—'**তান্**' পদটির সঙ্গে '**অকৃৎস্নবিদঃ**' এবং '**মন্দান্**' পদের কী ভবার্থ ?

উত্তর—এই তিনটি পদের এই তাৎপর্য যে, উপরোক্ত শ্রেণীর সকাম ব্যক্তি যথার্থ তত্ত্ব না বুঝলেও শাস্ত্রোক্ত কর্মে এবং তার ফলে শ্রদ্ধাযুক্ত হওয়ায় আংশিকভাবে কিছুটা বোঝেন, তাই অধর্মকে ধর্ম এবং ধর্মকে অধর্ম মনে করে ইচ্ছামতো আচরণকারী তামসিক ব্যক্তিদের থেকে এঁরা অনেক ভালো। তাঁরা একেবারে অজ্ঞ নন, অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ; তাই তাঁদের কর্মের ফল ঈশ্বর লাভ না হয়ে বিনাশশীল ভোগের প্রাপ্তি হয়।

প্রশ্ন—'**কৃৎস্নবিৎ**' পদটি কীসের বাচক, তিনি ঐ অজ্ঞ ব্যক্তিদের যেন বিচলিত না করেন, এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—পূর্বোক্ত প্রকারে গুণবিভাগ ও কর্মবিভাগের তত্ত্বকে সম্পূর্ণভাবে বুঝে পরমাত্মার স্বরূপ পূর্ণভাবে যথার্থরূপে অনুভবকারী জ্ঞানী মহাপুরুষের বাচক এই '**কৃৎস্নবিৎ**' পদ। তিনি ঐসব অজ্ঞানীদের যেন বিচলিত না করেন—এই কথার দ্বারা ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, কর্মে ব্যাপৃত অধিকারী সকাম মানুষকে 'কর্ম অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য, কর্ম করে লাভ কী, এই জগৎ মিথ্যা, কর্মমাত্রই বন্ধনের হেতু'—এরূপ উপদেশ দিয়ে শাস্ত্র-বিহিত কর্ম থেকে সরানো বা ঐসব কর্মে তার শ্রদ্ধা ও রুচি কম করানো উচিত নয় ; কারণ তা করলে তাদের পতনের সম্ভাবনা থাকে। তাই শাস্ত্রবিহিত কর্মে নিযুক্ত রেখে তার বিধানকারী শাস্ত্রে ও তার ফলে তাদের বিশ্বাস স্থির রেখে তাদের প্রকৃত তত্ত্ব বোঝানো উচিত। সেই সঙ্গে তাদের মমতা, আসক্তি ও ফলেচ্ছা ত্যাগ করিয়ে শ্রদ্ধা, ধৈর্য ও উৎসাহপূর্বক সাত্ত্বিক কর্ম (১৮।২৩) অথবা সাত্ত্বিক ত্যাগ (১৮।৯) করার রীতি জানানো উচিত, যাতে তারা সহজেই সেই তত্ত্ব ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হয়।

সম্বন্ধ—অর্জুনের প্রার্থনা অনুসারে ভগবান তাঁকে এক নিশ্চিত কল্যাণকারক সাধন বলার উদ্দেশ্যে চতুর্থ শ্লোক থেকে এই পর্যন্ত একথা প্রমাণ করেছেন যে, মানুষ যে কোনো পরিস্থিতিতেই থাকুক না কেন, তাকে তার বর্ণ, আশ্রম, স্বভাব ও পরিস্থিতি অনুযায়ী বিহিত কর্ম করে যেতে হবে। এই কথাটির সমর্থনে ভগবান পূর্বের শ্লোকে ক্রমশঃ নিম্ন লিখিত কথাগুলি বলেছেন—

১) কর্ম না করলে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিরূপ কর্মনিষ্ঠা পাওয়া যায় না (৩।৪)।

২) কর্মত্যাগ করলেই জ্ঞাননিষ্ঠা সিদ্ধ হয় না (৩।৪)।

৩) মানুষ একমুহূর্তও কর্ম না করে থাকতে পারে না (৩।৫)।

৪) বাহ্যতঃ কর্মত্যাগ করে মনে মনে বিষয় চিন্তা করলে মিথ্যাচার করা হয় (৩।৬)।

৫) মন-ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত করে নিষ্কামভাবে কর্ম যারা করে তারা শ্রেষ্ঠ (৩।৭)।

৬) কর্ম না করার থেকে কর্ম করা শ্রেষ্ঠ (৩।৮)।

৭) কর্ম না করলে শরীর নির্বাহ হওয়া সম্ভব নয় (৩।৮)।

৮) যজ্ঞের জন্য করা কর্ম বন্ধনকারক নয়, বরং তা মুক্তির কারণ (৩।৯)।

৯) কর্ম করার জন্য প্রজাপতির নির্দেশ রয়েছে এবং নিঃস্বার্থভাবে তা পালন করলে শ্রেয় লাভ হয় (৩।১০, ১১)।

১০) কর্তব্যপালন না করে যারা ভোগাদি উপভোগ করে তারা চোর (৩।১২)।

১১) কর্তব্যপালন করে শরীর নির্বাহের জন্য যজ্ঞাবশেষ যারা গ্রহণ করে তারা সর্ব পাপ মুক্ত হয় (৩।১৩)।

১২) যারা যজ্ঞাদি না করে শুধু শরীর পালনের জন্য আহার্য প্রস্তুত করে, তারা পাপী (৩।১৩)।

১৩) কর্তব্যকর্ম ত্যাগ করে সৃষ্টি চক্রে বাধাপ্রদানকারী মানুষদের জীবন বৃথা ও পাপময় (৩।১৬)।

১৪) অনাসক্তভাবে কর্ম করলে ঈশ্বর লাভ হয় (৩।১৯)।

১৫) পূর্বকালে জনকাদিও কর্মদ্বারা সিদ্ধিলাভ করেছেন (৩।২০)।

১৬) অন্যান্য লোকেরা শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের অনুকরণ করে, তাই শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের কর্ম করা উচিত (৩।২১)।

১৭) ভগবানের কোনোই কর্তব্য থাকে না, তবুও তিনি লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম করেন (৩।২২)।

১৮) জ্ঞানীর কোনো কর্তব্য থাকে না, তাহলেও তাঁর লোকসংগ্রহার্থে কর্ম করা উচিত (৩।২৫)।

১৯) জ্ঞানীর, নিজের বিহিত কর্ম ত্যাগ করে বা কর্মত্যাগের উপদেশ দিয়ে কোনোভাবে লোকেদের কর্তব্যকর্ম থেকে বিচলিত করা উচিত নয়, বরং নিজে কর্ম করে অপরের দ্বারাও কর্ম করানো উচিত (৩।২৬)।

২০) বিহিত কর্ম স্বরূপতঃ (বাহ্যতঃ) ত্যাগ করার উপদেশ দিয়ে জ্ঞানী মহাপুরুষের কর্মাসক্ত মানুষদের বিচলিত করা উচিত নয় (৩।২৯)।

সম্বন্ধ—এইভাবে কর্মের অবশ্য কর্তব্য প্রতিপাদন করে ভগবান এবার অর্জুন কথিত দ্বিতীয় শ্লোকের প্রার্থনা অনুসারে তাঁকে কল্যাণ প্রাপ্তির ঐকান্তিক এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নিশ্চিত সাধনের কথা বলে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিচ্ছেন—

ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সন্ন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥ ৩০

অন্তর্যামী পরমাত্মা সকলের মধ্যে অবস্থিত, এই জ্ঞানে সমর্পিত চিত্তে সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করে আকাঙ্ক্ষাশূন্য, মমতাবর্জিত ও শোক-তাপরহিত হয়ে তুমি যুদ্ধ করো॥ ৩০

প্রশ্ন—**'অধ্যাত্মচেতসা'** পদে 'চেতস্' শব্দ কিরূপ চিত্তের বাচক এবং 'তার দ্বারা সমস্ত কর্ম ভগবানে অর্পণ করা' কাকে বলে ?

উত্তর—সর্ব অন্তর্যামী পরমেশ্বরের গুণ, প্রভাব ও স্বরূপকে জেনে তাঁর ওপর বিশ্বাস করে, নিরন্তর সর্বত্র তাঁর চিন্তারত চিত্তের বাচক হল **'চেতস্'** শব্দটি। এই প্রকার চিত্তের দ্বারা যে ব্যক্তি ভগবানকে সর্বশক্তিমান, সর্বাধার, সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, সর্বেশ্বর এবং পরম প্রাপ্য, পরম গতি, পরম হিতৈষী, পরম প্রিয়, পরম সুহৃদ ও পরম দয়ালু জেনে নিজের অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদিসহ শরীর ও শরীর কৃত কর্মসমূহ, জগতের সমস্ত পদার্থ ভগবানের জেনে, সেসবে মমতা-আসক্তি ত্যাগ করে ও আমার কিছুই করার শক্তি নেই, ভগবানই সর্বপ্রকারে শক্তি প্রদান করে আমার দ্বারা নিজ ইচ্ছানুযায়ী যথাযোগ্য সমস্ত কর্ম করাচ্ছেন, আমি নিমিত্তমাত্র—এইভাবে নিজেকে সর্বতোভাবে ভগবানের অধীন মনে করে ভগবানের নির্দেশ অনুসারে তাঁর জন্য তাঁরই প্রেরণায়, যেমন তিনি করাবেন, তেমনই সমস্ত কর্ম কাঠপুতুলের মতো করা, সেই কর্ম বা তার ফলে নিজের কোনোপ্রকার মানসিক সম্বন্ধ না রাখা, সবই ভগবানের বলে মনে করা—তাকেই বলা হয় 'অধ্যাত্ম চিত্ত দ্বারা সমস্ত কর্ম ভগবানে সমর্পণ করা'। এইভাবে ভগবানে সমস্ত কর্ম অর্পণ করার কথা দ্বাদশ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের সাতান্নতম ও ছেষট্টিতম শ্লোকেও বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—উপরোক্ত প্রকারে সমস্ত কর্ম ভগবানে অর্পণ করে দিলে আশা, মমতা ও সন্তাপ তো স্বতঃই দূর হয় ; তাহলে এখানে আশা, মমতা ও সন্তাপরহিত হয়ে যুদ্ধ করতে বলার কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—অধ্যাত্মচিত্তের দ্বারা ভগবানে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করে দিলে আশা, মমতা ও সন্তাপ থাকে না—এই ভাবটি স্পষ্ট করার জন্য ভগবান এখানে অর্জুনকে আশা, মমতা ও সন্তাপরহিত হয়ে যুদ্ধ করতে বলেছেন। অভিপ্রায় হল যে, তুমি সমস্ত কর্মের ভার আমার ওপর দিয়ে সর্বপ্রকারে আশা-মমতা, রাগ-দ্বেষ ও হর্ষ-শোক ইত্যাদি বিকাররহিত হয়ে যাও, এইরূপে আমার

নির্দেশানুসারে যুদ্ধ কর। এর দ্বারা বুঝতে হবে যে কর্ম করার সময় বা তার ফলভোগের সময় সাধকের যতক্ষণ ঐ কর্মে বা ভোগে মমতা, আসক্তি বা কামনা থাকে অথবা তার চিত্তে রাগ-দ্বেষ, হর্ষ-বিষাদ ইত্যাদি বিকার থাকে, ততক্ষণ তার সমস্ত কর্ম ভগবানে সমর্পিত হয়নি।

সম্বন্ধ—এইভাবে অর্জুনকে উদ্ধারের নিশ্চিত সাধন জানিয়ে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়ে ভগবান এবার সেই অনুসারে সম্পাদিত কর্মের ফল বর্ণনা করছেন—

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ।। ৩১

যেসব ব্যক্তি দোষদৃষ্টিরহিত ও শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে আমার এই মত সর্বদা অনুসরণ করেন, তাঁরাও সমস্ত কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান।। ৩১

প্রশ্ন—এখানে 'যে'র সঙ্গে '**মানবাঃ**' পদ প্রয়োগের কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—এটির প্রয়োগে ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, এই সাধনা কোনো এক বিশেষ জাতি বা বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। এতে মানুষমাত্রেরই অধিকার। প্রত্যেক বর্ণ, আশ্রম, জাতি বা সমাজের মানুষ উপরোক্ত প্রকারে নিজ কর্তব্য-কর্ম সমর্পণ করে এটি পালন করতে সক্ষম।

প্রশ্ন—'**শ্রদ্ধাবন্তঃ**' এবং '**অনসূয়ন্তঃ**'—এই দুটি পদের মর্মার্থ কী ?

উত্তর—এই পদদুটি প্রয়োগ করে ভগবান দেখিয়েছেন যে, যেসকল ব্যক্তির আমার প্রতি দোষদৃষ্টি থাকে, যারা আমাকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর মনে না করে সাধারণ মানুষ মনে করে এবং যাদের আমার ওপর বিশ্বাস নেই, তারা এই সাধনের অধিকারী নয়। সেই সব ব্যক্তিরাই এটি পালন করতে পারে, যারা আমার প্রতি কোনো প্রকারের দোষদৃষ্টি রাখে না এবং সর্বদা শ্রদ্ধা-ভক্তি করে। সুতরাং যারা এরূপ করতে ইচ্ছুক, তাদের উপরোক্ত গুণসম্পন্ন হওয়া উচিত। তা না হলে এই সাধনের অনুষ্ঠান করা তো দূরের কথা, এটি বোঝাও কঠিন হয়।

প্রশ্ন—'**নিত্যম্**' পদটি '**মতম্**'-এর বিশেষণ না '**অনুতিষ্ঠন্তি**' পদের ?

উত্তর—ভগবানের মত অবশ্যই নিত্য, সুতরাং এটি তার বিশেষণ মনে করলেও কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু এখানে এটি '**অনুতিষ্ঠন্তি**' ক্রিয়ার বিশেষণ মনে করাই বেশি উপযুক্ত মনে হয়। অভিপ্রায় হল যে উপরোক্ত সাধকের সমস্ত কর্ম সর্বদাই ভগবানে সমর্পণ করে নিজের সমস্ত কর্ম তদনুরূপভাবে ভাবিত হয়ে করা উচিত।

প্রশ্ন—এখানে '**অপি**' পদ প্রয়োগ করে 'এরাও সম্পূর্ণ কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে যায়', এই কথাটির কী রহস্য ?

উত্তর—ভগবান এর দ্বারা অর্জুনকে জানাচ্ছেন যে, অন্য ব্যক্তিরাও যখন এই সাধন দ্বারা সমস্ত কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে যায় অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুরূপ কর্ম-বন্ধন থেকে চিরকালের মতো মুক্ত হয়ে পরমকল্যাণ স্বরূপ পরমাত্মাকে লাভ করে, তাহলে তোমার কথা তো বলাই নয়।

সম্বন্ধ—ভগবান এইভাবে তাঁর উপরোক্ত মত অনুসরণের ফল জানিয়ে এবার সেই অনুসারে কাজ না করলে কী ক্ষতি তা জানাচ্ছেন—

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ।। ৩২

কিন্তু যেসব ব্যক্তি আমার ওপর দোষারোপ করে আমার মত অনুযায়ী চলে না, সেই মূর্খদের তুমি সর্বজ্ঞানে মূঢ় এবং পরমার্থ ভ্রষ্ট বলে জানবে।। ৩২

প্রশ্ন—'তু' পদটির কী ভাবার্থ ?

উত্তর—পূর্বশ্লোকে বর্ণিত সাধকদের সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণকারী মানুষদের গতি এই শ্লোকে বলা হয়েছে, এই ভাবের দ্যোতক এখানে 'তু' পদটি।

প্রশ্ন—ভগবানের ওপর দোষারোপ করে ভগবানের মত অনুসারে না চলার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—ভগবানকে সাধারণ মানুষ মনে করে, তাঁকে সেইরূপ ভাবা বা অন্যের মধ্যে প্রচার করা যে 'ইনি নিজে পূজা পাবার জন্য এইরূপ উপদেশ দিচ্ছেন ; সমস্ত কর্ম এঁকে অর্পণ করে দিলেই যে মানুষ কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে—এরূপ কখনও হতে পারে না'—ইত্যাদি এইভাবে ভগবানে দোষারোপ করা এবং এরূপ ভেবে ভগবানের কথা অনুযায়ী মমতা, আসক্তি ও কামনা ত্যাগ না করা, কর্মসমূহ পরমেশ্বরকে অর্পণ না করে নিজ ইচ্ছা অনুসারে কর্মে ব্যাপৃত থাকা ও শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্ম ত্যাগ করা—এসবই হল ভগবানে দোষারোপ করে তাঁর মতানুযায়ী না চলা।

প্রশ্ন—'অচেতসঃ' পদ কোন্ শ্রেণীর মানুষের বাচক, তারা সর্বজ্ঞানে মূঢ় ও ভ্রষ্ট হয়েছে বুঝবে—এই কথাটি বলার অর্থ কী ?

উত্তর—যাদের মন দোষপূর্ণ, যাদের মধ্যে বিবেক-বিচারের অভাব এবং যাদের চিত্ত বশে থাকে না, সেই মূঢ়, তামসিক মানুষদের বাচক হল 'অচেতসঃ' পদটি। তারা সম্পূর্ণ জ্ঞানে মোহগ্রস্ত ও ভ্রষ্ট বলার এই ভাবার্থ যে এরূপ মানুষের বুদ্ধি বিপরীত হয়ে থাকে, এরা লৌকিক ও পারলৌকিক সর্বপ্রকারের সুখসাধনের বিপরীতই ভেবে থাকে। সেইজন্য এরা বিপরীত আচরণে প্রবৃত্ত হয়ে যায়, এর ফলে তাদের ইহলোক ও পরলোকে পতন হয়। এরা তাদের বর্তমান অবস্থা থেকেও ভ্রষ্ট হয় এবং মৃত্যুর পর নিজ কর্মফল ভোগ করার জন্য শুকর-কুকুরাদি হীন যোনিতে জন্ম নেয় অথবা ঘোর নরকে পতিত হয়ে ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করে।

সম্বন্ধ—পূর্ব শ্লোকে বলা হয়েছে যে ভগবানের মতানুসারে যারা না চলে তারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। তাতে প্রশ্ন হতে পারে যে যদি কেউ ভগবানের মতানুসারে কর্ম না করে হঠকারিতাপূর্বক কর্মসমূহ সর্বতোভাবে ত্যাগ করে, তাহলে ক্ষতি কী ? তাই বলছেন—

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি।। ৩৩

সকল প্রাণীই প্রকৃতির দ্বারা চালিত অর্থাৎ নিজ নিজ স্বভাবের বশীভূত হয়ে কর্ম করে। জ্ঞানীও তাঁর প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম করেন। তাহলে এতে কারও হঠকারিতায় কী হবে ? ৩৩

প্রশ্ন—সকল প্রাণী প্রকৃতির দ্বারা চালিত হয়, এই কথাটির কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, সমস্ত নদীর জল যেমন স্বাভাবিকভাবে সমুদ্রের দিকে বয়ে যায়, তার প্রবাহ জোর করে রোধ করা যায় না, তেমনই সমস্ত প্রাণী নিজ নিজ প্রকৃতির অধীন হয়ে প্রকৃতির প্রবাহে প্রকৃতির দ্বারা চালিত হয় ; তাই কোনো মানুষ জোর করে কর্মকে সর্বতোভাবে ত্যাগ করতে পারে না। তবে, যেভাবে নদীর প্রবাহ একদিক থেকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়, তেমনই মানুষ তার উদ্দেশ্য পরিবর্তন করে তার প্রবাহের গতি পরিবর্তন করতে পারে অর্থাৎ রাগ-দ্বেষ ত্যাগ করে সেই কর্মকে ঈশ্বর লাভের সহায়ক করে তুলতে পারে।

প্রশ্ন—'প্রকৃতি' শব্দের এখানে কী অর্থ ?

উত্তর—জন্ম-জন্মান্তরে কৃত কর্মের সংস্কার যা স্বভাবের রূপে প্রকটিত, এখানে সেই স্বভাবের নাম হল

'প্রকৃতি'।

প্রশ্ন—এখানে 'জ্ঞানবান্' শব্দটি কীসের বাচক ?

উত্তর—পরমাত্মার যথার্থ তত্ত্ব যারা জানেন, সেই ঈশ্বরপ্রাপ্ত মহাপুরুষের বাচক এখানে এই 'জ্ঞানবান্' পদটি।

প্রশ্ন—'অপি' পদটি প্রয়োগের কী ভাবার্থ ?

উত্তর—'অপি' পদটি প্রয়োগের দ্বারা এই ভাব দেখানো হয়েছে যে, যখন সমস্ত গুণের অতীত জ্ঞানী ব্যক্তিও নিজ প্রকৃতি অনুসারে কর্ম করেন, তখন যেসব অজ্ঞব্যক্তি প্রকৃতির অধীনে থাকে, তারা কীভাবে প্রকৃতির প্রবাহ হঠতাপূর্বক রোধ করবে ?

প্রশ্ন—যাঁরা ঈশ্বরকে লাভ করেছেন সেই জ্ঞানী মহাপুরুষদের স্বভাবও কি ভিন্ন ভিন্ন হয় ?

উত্তর—অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন হয়, পূর্বের সাধনপ্রণালী এবং প্রারব্ধের ভেদে স্বভাবে পার্থক্য হওয়া অনিবার্য।

প্রশ্ন—জ্ঞানীরও কি পূর্বার্জিত কর্মের সংস্কাররূপ স্বভাবের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ থাকে ? যদি না থাকে তাহলে এই কথার অভিপ্রায় কী যে, জ্ঞানীও তাঁর প্রকৃতি অনুযায়ী কর্মে সচেষ্ট হন ?

উত্তর—বস্তুতঃ জ্ঞানীর কর্ম সংস্কারের সঙ্গে কোনোপ্রকার সম্বন্ধ থাকে না এবং তিনি কোনো প্রকারের কোনো কর্ম করেন না। কিন্তু তাঁর চিত্তে পূর্বার্জিত প্রারব্ধের সংস্কার থাকে, তাই সেই অনুসারে তাঁর বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা প্রারব্ধ ভোগ ও লোকসংগ্রহার্থে কর্তাবিহীনই সব ক্রিয়া হতে থাকে, লোকদৃষ্টিতে সেইসব ক্রিয়াকে জ্ঞানীর ওপর আরোপ করে বলা হয় জ্ঞানীও নিজ প্রকৃতি অনুসারে কর্ম করেন। জ্ঞানীর ক্রিয়াগুলি কর্তৃত্ববিহীন হওয়ায় তা রাগ-দ্বেষ, অহংভাব-মমত্ব বর্জিত হয়, অতএব সেগুলি শুধুমাত্র চেষ্টা, তাঁর সংজ্ঞা 'কর্ম' নয়—এই ভাব দেখানোর জন্য 'চেষ্টতে' ক্রিয়ার প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—জ্ঞানীর অন্তরে কি রাগ-দ্বেষ, হর্ষ-বিষাদাদি বিকার উৎপন্নই হয় না নাকি সেগুলির সঙ্গে তাঁর কোনো সম্বন্ধ থাকে না ? যদি তাঁর অন্তঃকরণের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকায় সেই অন্তঃকরণে বিকার না হয়, তাহলে শম, দম, তিতিক্ষা, দয়া, সন্তোষ ইত্যাদি সদ্গুণও তাঁর মধ্যে থাকা উচিত নয় ?

উত্তর—জ্ঞানীর যখন অন্তঃকরণের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ থাকে না, তখন তার মধ্যে বিকার বা সদ্গুণের সম্বন্ধ কীভাবে থাকবে ? কিন্তু তাঁর অন্তঃকরণ অত্যন্ত পবিত্র হয়ে থাকে ; নিরন্তর পরমাত্মার স্বরূপ চিন্তা করতে করতে যখন অন্তঃকরণের মল, বিক্ষেপ ও আবরণ—এই তিন দোষ দূরীভূত হয়ে যায়, তখনই সাধক ঈশ্বরকে লাভ করেন। সেইজন্য তাঁর অন্তঃকরণে অবিদ্যামূলক অহং-বোধ, মমতা, রাগ-দ্বেষ, হর্ষ-বিষাদ, দম্ভ-কপটাচার, কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহ ইত্যাদি বিকার থাকতে পারে না—তাঁর মধ্যে এসবের সর্বতোভাবে অভাব হয়ে যায়। অতএব জ্ঞানী মহাত্মা ব্যক্তির সেই অত্যন্ত নির্মল এবং পরম পবিত্র অন্তঃকরণে শুধুমাত্র সমতা, সন্তোষ, দয়া, ক্ষমা, নিঃস্পৃহতা, শান্তি ইত্যাদি সদ্গুণের স্বাভাবিক স্ফুরণ হয়ে থাকে এবং সেই অনুসারে লোকসংগ্রহের জন্য তাঁর মন, ইন্দ্রিয় এবং শরীর দ্বারা শাস্ত্রবিহিত কর্ম করা হয়ে থাকে। দুর্গুণ ও দুরাচার তাঁর মধ্যে থাকতে পারে না।

প্রশ্ন—ইতিহাস ও পুরাণের বিভিন্ন প্রসঙ্গে জানা যায় যে, জ্ঞান-সিদ্ধ মহাপুরুষদের চিত্তেও কাম-ক্রোধাদি দুর্গুণের প্রাদুর্ভাব ও ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই অনুসারে ক্রিয়া হয়, সেই বিষয়ে কী বুঝতে হবে ?

উত্তর—উদাহরণের থেকে বিধিবাক্য বলশালী এবং বিধিবাক্য থেকে নিষেধাত্মক বাক্য আরও বলবান, এছাড়া ইতিহাস-পুরাণের কাহিনীতে যেসব প্রসঙ্গ দেখা যায়, তার রহস্য ঠিকভাবে বোঝা কঠিন। তাই এটি মেনে নেওয়া উচিত যে যদি কারো চিত্তে সত্য সত্যই কাম-ক্রোধাদি দুর্গুণ উপস্থিত হয় আর সেই অনুসারে ক্রিয়া হয়, তবে সে ঈশ্বরপ্রাপ্ত জ্ঞানী মহাত্মা নয় ; কারণ শাস্ত্রে কোথাও এরূপ বিধিবাক্য পাওয়া যায় না যার দ্বারা জ্ঞানী মহাত্মার কাম-ক্রোধাদি অবগুণ থাকা প্রমাণ করে, বরং স্থানে স্থানে তার নিষেধের কথাই আছে। গীতাতেও যেসব স্থানে মহাপুরুষদের লক্ষণ বলা হয়েছে, সেখানে রাগ-দ্বেষ, কাম-ক্রোধাদি দুর্গুণ ও দুরাচার না থাকার কথাই বলা হয়েছে (৫।২৬, ২৮ ; ১২।১৭)। তবে লোকসংগ্রহের জন্য প্রয়োজন হলে তিনি সং-এর মতো সাজার চেষ্টা করলে, তা অবশ্য দূষণীয় নয়।

প্রশ্ন—তাহলে এতে কারো হঠকারিতা কী করবে ? এই কথার কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—এর অভিপ্রায় এই যে, কোনো ব্যক্তি হঠকারিতা করে এক মুহূর্তও কর্ম ছাড়া থাকতে পারে না (৩।৫), প্রকৃতি জোর করে তাকে দিয়ে কর্ম করিয়ে নেয় (১৮।৫৯,৬০) ; সুতরাং মানুষের বিহিত কর্ম ত্যাগ করে কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি পাবার আগ্রহ না করে স্বভাব নির্দিষ্ট কর্ম করেই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হবার উপায় করা উচিত। তাতেই মানুষ সফল হতে পারে, বিহিত কর্ম ত্যাগ করলে সেই ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী হয়ে অপরপক্ষে অধিক কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায় ও তার পতন ঘটে।

প্রশ্ন—সকলকেই যদি প্রকৃতি অনুসারে কর্ম করতে হয়, মানুষের যদি কোনোই স্বাধীনতা না থাকে, তবে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধের কী প্রয়োজন ? স্বভাব অনুসারে মানুষকে তো শুভ-অশুভ কর্ম করতেই হবে এবং সেই অনুসারে তার প্রকৃতি গঠিত হবে, এমতাবস্থায় মানুষের উন্নতি কীভাবে সম্ভব ?

উত্তর—রাগ-দ্বেষাদির বশীভূত হয়েই শাস্ত্রবিরুদ্ধ অসৎ কর্ম করা হয় এবং শাস্ত্রবিহিত সৎকর্মের আচরণ হয় শ্রদ্ধা, ভক্তি ইত্যাদি সদ্‌গুণের ফলে। রাগ-দ্বেষ, কাম-ক্রোধ ইত্যাদি বদ্‌গুণ ত্যাগ করায় এবং শ্রদ্ধা-ভক্তি ইত্যাদি সদ্‌গুণ জাগরিত করে তাকে বৃদ্ধি করতে মানুষ স্বাধীন। সুতরাং বদ্‌গুণ পরিত্যাগ করে ভগবান ও শাস্ত্রে শ্রদ্ধা-ভক্তি রেখে ভগবানের প্রসন্নতার জন্য কর্মের আচরণ করা উচিত। এই আদর্শ সামনে রেখে যেসব ব্যক্তি কর্ম করেন, তাদের দ্বারা শুভ কর্মই অনুষ্ঠিত হয়, নিষিদ্ধ কর্ম নয় এবং সেই শুভকর্ম মুক্তিপ্রদ হয়, বন্ধনকারক হয় না। অভিপ্রায় হল যে, কর্ম-ত্যাগে মানুষ স্বাধীন নয়, তাকে কর্ম করতেই হয় ; তবে সদ্‌গুণের আশ্রয় নিয়ে নিজ প্রকৃতিকে শুদ্ধ করতে সকলেই স্বাধীন। তার প্রকৃতিতে (স্বভাবে) যেমন যেমন শুদ্ধভাব হবে, তেমনই তার ক্রিয়াও স্বতঃই বিশুদ্ধ হতে থাকবে। সুতরাং ভগবানের শরণাগত হয়ে নিজের স্বভাব শুদ্ধ করা উচিত। তাতেই উন্নতি হওয়া সম্ভব।

সম্বন্ধ—সকলকেই এইভাবে প্রকৃতি অর্থাৎ তার স্বভাব অনুসারে কর্ম করতে হয়, তাহলে কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি পাবার জন্য মানুষের কী করা উচিত ? সেই জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেছেন—

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ।। ৩৪

প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে রাগ ও দ্বেষ প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। মানুষের এই দুটির বশবর্তী হওয়া উচিত নয়, কারণ এই দুটিই মানুষের কল্যাণপথের বিঘ্নকারী মহাশত্রু ॥ ৩৪

প্রশ্ন—এখানে **'অর্থে'** পদ দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত **'ইন্দ্রিয়স্য'** পদটির দুবার প্রয়োগ করার কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্য ইত্যাদি কর্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ—এইসবগুলি ধর্তব্যে আনার জন্য এবং তাদের মধ্যে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেক বিষয়ে পৃথক পৃথক রাগ-দ্বেষের অবস্থান দেখাবার জন্য এখানে **'অর্থে'** পদ দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত **'ইন্দ্রিয়স্য'** পদটি দুবার প্রয়োগ করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে অন্তঃকরণসহ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের যত ভিন্ন ভিন্ন বিষয় থাকে, যার সঙ্গে ইন্দ্রিয়াদির সংযোগ-বিয়োগ হতে থাকে, সেইসব বিষয়ে রাগ ও দ্বেষ দুই-ই পৃথকভাবে লুকিয়ে থাকে।

প্রশ্ন—এখানে যদি এই অর্থ মনে করা হয় যে, 'ইন্দ্রিয়ের রাগ-দ্বেষ লুকিয়ে থাকে', তাহলে ক্ষতি কী ?

উত্তর—এরূপ ক্লিষ্ট অর্থাৎ তুচ্ছ ধারণা করলেও এই অর্থে শ্লোকটির অর্থ ঠিকভাবে পরিস্ফুট হয় না। কারণ ইন্দ্রিয়াদিও অনেক এবং তার বিষয়ও অনেক, তাহলে একটি ইন্দ্রিয় বিষয়েই একটি ইন্দ্রিয়ের রাগ-দ্বেষ অবস্থিত থাকে, একথা কী করে যুক্তিসঙ্গত হয় ? তাই **'ইন্দ্রিয়স্য-**

ইন্দ্রিয়স্য' অর্থাৎ **'সর্বেন্দ্রিয়াণাম্'**—এই রূপ প্রয়োগ ধরে নিয়ে উপরে বর্ণিত অর্থ মেনে নেওয়া সঠিক মনে হয়।

প্রশ্ন—প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে রাগ ও দ্বেষ উভয়ই কীভাবে লুকিয়ে থাকে এবং তার বশে না হওয়া কাকে বলে ?

উত্তর—যে বস্তু, প্রাণী ও ঘটনাতে মানুষের সুখ প্রতীয়মান হয়, যা তার অনুকূল হয়ে থাকে, তাতে তার আসক্তি জন্মায়—তাকেই বলা হয় 'রাগ'। আর যাতে তার দুঃখবোধ হয়, যা তার প্রতিকূল হয়, তাতে তার দ্বেষ সৃষ্টি হয়। বাস্তবিক কোনো বস্তুতেই সুখ বা দুঃখ নেই, মানুষের চিন্তা অনুসারে একই বস্তু কারো কাছে সুখপ্রদ এবং কারো কাছে দুঃখদায়ক হয়ে ওঠে। একই মানুষের যে বস্তু একসময় সুখপ্রদ প্রতীত হয়, সেই বস্তুই অন্যসময় দুঃখদায়ক বলে মনে হয়। অতএব প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে রাগ-দ্বেষ লুকিয়ে থাকে অর্থাৎ সকল বস্তুতে রাগ ও দ্বেষ দুটিই অবস্থান করে ; কারণ মানুষের যে যে সময় সেগুলির সঙ্গে সংযোগ-বিয়োগ হয়, সেই সময়ই রাগ-দ্বেষের প্রাদুর্ভাব হয়ে থাকে।

অতএব শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্মের আচরণ করা কালে মন ও ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে বিষয়াদির সংযোগ-বিয়োগের সময় কোনো বস্তু, প্রাণী, ক্রিয়া বা ঘটনাকে প্রিয়-অপ্রিয় না ভাবা, সিদ্ধি-অসিদ্ধি, জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি ইত্যাদিতে সমভাবে যুক্ত থাকা, একটুও হর্ষ বা শোকান্বিত না হওয়া—একেই বলা হয় রাগ-দ্বেষের বশীভূত না হওয়া। কারণ রাগ-দ্বেষের বশীভূত হলেই মানুষের সবকিছুতে বিষম বুদ্ধি হয়ে চিত্তে হর্ষ-শোকের বিকার সৃষ্টি হয়। তাই মানুষকে ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে সর্বতোভাবে রাগ-দ্বেষের অতীত হওয়া উচিত।

প্রশ্ন—রাগ ও দ্বেষ—এই দুটি মানুষের কল্যাণপথে বিঘ্নকারক মহাশত্রু হয় কীভাবে ?

উত্তর—মানুষ অজ্ঞতাবশতঃ রাগ-দ্বেষ—এই দুটির বশ হয়ে বিনাশশীল ভোগকে সুখের হেতু মনে করে কল্যাণপথ থেকে ভ্রষ্ট হয়। সাধককে রাগ-দ্বেষ বিভ্রান্ত করে বিষয়ে আবদ্ধ করে এবং তার কল্যাণমার্গে বিঘ্ন উপস্থিত করে মনুষ্যজীবনরূপ অমূল্য ধন হরণ করে নেয়। সেইজন্য সে মনুষ্যজন্মের পরম ফল থেকে বঞ্চিত থেকে যায় এবং রাগ-দ্বেষের বশীভূত হয়ে বিষয়ভোগের জন্য স্বধর্ম-ত্যাগ, পরধর্ম-গ্রহণ ও নানাপ্রকার নিষিদ্ধ কর্মের আচরণ করে ; তার ফলে মৃত্যুর পরও তার দুর্গতি হয়। তাই এদের পরিপন্থী অর্থাৎ সৎ-মার্গে বিঘ্নকারী শত্রু বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এই রাগ-দ্বেষ সাধকের কল্যাণপথে কীভাবে বাধা সৃষ্টি করে ?

উত্তর—যেমন কোনো নির্দিষ্ট পথে যাত্রাকারী পথিককে কোনো বিঘ্ন প্রদানকারী ডাকাত, বন্ধুত্বের ভাব দেখিয়ে, তার সঙ্গী অর্থাৎ চালকের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে তার বিবেকে ভ্রম উৎপন্ন করে তাকে মিথ্যা সুখের প্রলোভন দেখিয়ে বা নিজের কথায় ভুলিয়ে তাকে নির্দিষ্ট স্থানে যেতে না দিয়ে, বিপরীতে কোনো জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে তার সর্বস্ব লুট করে গভীর গর্তে ফেলে দেয় ; তেমনই এই রাগ-দ্বেষ কল্যাণপথে যাত্রাকারী সাধকের সঙ্গে মিলে মিত্রতার ভাব দেখিয়ে তার মন ও ইন্দ্রিয়ে প্রবিষ্ট হয়ে তার বিবেকশক্তি নষ্ট করে ও তাকে জাগতিক বিষয়-ভোগের সুখের প্রলোভন দেখিয়ে পাপাচারে প্রবৃত্ত করে। এতে সাধকের সাধনক্রম নষ্ট হয়ে যায় এবং পাপের ফলস্বরূপ তাকে ঘোর নরকে পড়ে ভয়ানক দুঃখভোগ করতে হয়।

সম্বন্ধ—এখানে অর্জুনের মনে এই প্রশ্নের উদয় হওয়া স্বাভাবিক ছিল যে, এই যুদ্ধরূপ ভয়ানক কর্ম না করে আমি যদি ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবন নির্বাহ করে শান্তিময় কর্মে ব্যাপৃত থাকতে পারতাম তবে সহজেই রাগ-দ্বেষ থেকে মুক্তি পেতাম, তাহলে আপনি কেন আমাকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিচ্ছেন ? তাতে ভগবান বলছেন—

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ॥ ৩৫

উত্তমরূপে আচরিত অন্য ধর্ম থেকে গুণরহিত নিজ ধর্ম অতি উত্তম। নিজ ধর্মে মৃত্যুও কল্যাণদায়ক, কিন্তু পরধর্ম ভয়াবহ ॥ ৩৫

প্রশ্ন—'সু-অনুষ্ঠিতাৎ' বিশেষণের সঙ্গে 'পরধর্মাৎ' পদ কোন্ ধর্মের বাচক এবং তার থেকে গুণরহিত স্বধর্মকে অতি উত্তম বলার অর্থ কী ?

উত্তর—এই বাক্যে পরধর্ম ও স্বধর্মের তুলনা করতে গিয়ে পরধর্মের সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়েছে 'সু-অনুষ্ঠিত বিশেষণটি এবং স্বধর্মের সঙ্গে 'বিগুণ' বিশেষণ। সুতরাং প্রত্যেক বিশেষণে বিরুদ্ধ ভাবের আধিক্য বুঝতে হবে অর্থাৎ পরধর্ম সদ্‌গুণসম্পন্ন এবং 'সু-অনুষ্ঠিত' বলে বুঝতে হবে আর স্বধর্মকে বিগুণ ও ঠিকমতো অনুষ্ঠিত না হওয়ার দোষে দোষযুক্ত বলে বুঝতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্মরণে রাখতে হবে যে বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় ইত্যাদি থেকে ব্রাহ্মণের ধর্মে অহিংসাদি সদ্‌গুণের বাহুল্য থাকে, গৃহস্থের থেকে সন্ন্যাস-আশ্রমের ধর্মে সদ্‌গুণের বাহুল্য থাকে, তেমনই শূদ্রের থেকে বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয়ের কর্ম অধিক গুণযুক্ত। সুতরাং এইভাবে বুঝলে এই ভাব প্রকাশ পায় যে, যে কর্ম গুণযুক্ত এবং যা সুষ্ঠুভাবে পালিত হয়েছে, কিন্তু সেই কর্ম যে করে, তার সেটি বিহিত কর্ম নয়, তা অন্যের বিহিত কর্ম, সেইরূপ কর্মের ক্ষেত্রে এখানে 'স্বনুষ্ঠিতাৎ' বিশেষণের সঙ্গে 'পরধর্মাৎ' পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। সেই পরধর্মের থেকে গুণরহিত স্বধর্মকে অতি উত্তম বলে এই ভাব দেখানো হয়েছে যে, যেমন দেখতে কুরূপ ও গুণহীন হলেও স্ত্রীর যেমন নিজ পতির সেবা করাই কল্যাণপ্রদ, তেমনই আপাতদৃষ্টিতে সদ্‌গুণাদিহীন হলেও এবং অনুষ্ঠানে অঙ্গবৈগুণ্য হলেও যার জন্য যে কর্ম বিহিত, সেটিই তার পক্ষে কল্যাণপ্রদ ; তাহলে সেই স্বধর্ম যদি সর্বগুণসম্পন্ন এবং যথার্থভাবে পালিত হয়, সেই ক্ষেত্রে এ বিষয়ে তো বলারই কিছু থাকে না।

প্রশ্ন—'স্বধর্মঃ' পদটি কোন্ ধর্মের বাচক ?

উত্তর—বর্ণ, আশ্রম, স্বভাব ও পরিস্থিতির জন্য যে মানুষের জন্য যে কর্ম শাস্ত্র নির্দিষ্ট করেছে, তার কাছে সেটিই স্বধর্ম। অভিপ্রায় হল মিথ্যা, কপটাচার, চুরি, হিংসা, ব্যভিচার ইত্যাদি নিষিদ্ধ কর্ম কারো স্বধর্ম নয় এবং কাম্যকর্মও কারোর জন্য অবশ্য কর্তব্য নয়। সেইজন্য সেগুলি কারো স্বধর্মে ধরা যায় না। এতদ্ব্যতীত যে বর্ণ বা আশ্রমের জন্য যে বিশেষ ধর্ম বলা হয়েছে, যাতে সেই বর্ণ-আশ্রম ব্যতীত অন্য বর্ণ-আশ্রমের লোকের কোনোও অধিকার নেই, তা হল সেই সেই বর্ণ-আশ্রমের লোকেদের ভিন্ন ভিন্ন স্বধর্ম। যে কর্মে শুধুমাত্র দ্বিজদের অধিকার বলা হয়েছে, সেই বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞাদি কর্ম দ্বিজদের স্বধর্ম। যে ধর্মে সকল বর্ণ-আশ্রমের নারী-পুরুষের অধিকার থাকে, যেমন—ঈশ্বর ভক্তি, সত্যভাষণ, মাতা-পিতার সেবা, মন ও ইন্দ্রিয় সংযম, ব্রহ্মচর্য পালন, অহিংসা, অস্তেয়, সন্তোষ, দয়া, দান, ক্ষমা, পবিত্রতা ও বিনয় ইত্যাদি এই সাধারণ ধর্মসকল হল সকলেরই স্বধর্ম।

প্রশ্ন—যে লোক সমুদায়ে বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা নেই এবং যারা বৈদিক সনাতন ধর্ম মানে না তাদের জন্য স্বধর্ম ও পরধর্মের ব্যবস্থা কী করে হতে পারে ?

উত্তর—বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা বাস্তবে সমস্ত মনুষ্য-সমাজে হওয়া উচিত এবং বৈদিক সনাতন ধর্মও সকল মানুষের মেনে চলা উচিত। অতএব যে মনুষ্য-সমাজে বর্ণ-আশ্রমের ব্যবস্থা নেই, তাদের জন্য স্বধর্ম ও পরধর্ম নির্ণয় করা কঠিন। তবুও এই সময় ধর্মসংকট উপস্থিত হচ্ছে এবং গীতায় মানুষ মাত্রেরই জন্য উদ্ধারের মার্গ নির্দেশ করা হয়েছে। এই আশয়ের বরুণ এমন মনে করা যেতে পারে যে, যে মানুষের যে জাতি অথবা সমুদায়ে জন্ম হয়, যে মাতা-পিতার রজ-বীর্যে তার শরীর সৃষ্টি হয়, জন্ম থেকে কর্তব্য বোঝার ক্ষমতা আসা পর্যন্ত যে সংস্কারে তার পালন-পোষণ হয় এবং পূর্বজন্মের কর্ম-সংস্কার যেমন হয়, সেই অনুসারে তার স্বভাব তৈরি হয়। সেই স্বভাব অনুযায়ী তার জীবিকা কর্মে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দেখা যায়। সুতরাং যে মানব-সমাজে বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা নেই, সেক্ষেত্রে তার স্বভাব ও পরিস্থিতির সাপেক্ষে যার জন্য যেটি বিহিত কর্ম অর্থাৎ তার ইহলোক ও পরলোকের উন্নতির জন্য কোনো মহাপুরুষ দ্বারা যে কর্ম উপযুক্ত বলে মনে করা হয়, ভালো মনে কর্তব্য ভেবে যার অনুষ্ঠান করা হয়, যা অন্য কারো ধর্ম ও মর্যাদার বাধাস্বরূপ নয় এবং মানুষ মাত্রেরই পক্ষে সাধারণভাবে যা ধর্মযুক্ত, সেটিই তার স্বধর্ম। তার বিপরীত যা অন্যের জন্য বিহিত, তার জন্য বিহিত নয়, সেটি হল পরধর্ম।

প্রশ্ন—'স্বধর্মঃ' পদের সঙ্গে 'বিগুণঃ' বিশেষণ প্রয়োগের কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—'বিগুণঃ' পদটি গুণের অভাবের দ্যোতক।

ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম যুদ্ধ করা, দুষ্টকে দণ্ড প্রদান করা। এই ক্ষত্রিয় ধর্মে অহিংসা, শান্তি ইত্যাদি গুণের অভাব বলে মনে হয়। তেমনি বৈশ্যের 'কৃষি' ইত্যাদি কর্মেও হিংসাদি দোষের বাহুল্য থাকে, তাই ব্রাহ্মণদের শান্তিময় কর্মের থেকে এগুলি বিগুণ অর্থাৎ গুণহীন। শূদ্রের কর্ম, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের থেকেও নিম্নশ্রেণীর। এছাড়া ঐসকল কর্ম পালনে কোনো অংশ বাদ পড়লে তা হল অনুষ্ঠান পালনের ন্যূনতা। উপরোক্ত প্রকারে স্বধর্মে গুণ ও অনুষ্ঠানের ন্যূনতা থাকলেও তা পরধর্মের থেকে কল্যাণপ্রদ। এই ভাব দেখানোর জন্য '**স্বধর্মঃ**'-এর সঙ্গে '**বিগুণঃ**' বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্ন—নিজ ধর্মে মৃত্যুও কল্যাণকারক, এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর— এর দ্বারা বলা হয়েছে যে, স্বধর্ম পালনে যদি কোনোরূপ অন্তরায় না হয় এবং সারাজীবন মানুষ তা পালন করে, তাহলে সে তার ভাব অনুযায়ী স্বর্গ বা মুক্তি লাভ করে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কোনো বাধা এলে সে যদি ধর্মচ্যুত না হয় এবং সেজন্য যদি তার মৃত্যুও হয়, তাহলে সেই মৃত্যু তার কল্যাণকারক হয়ে ওঠে। ইতিহাস ও পুরাণে এরূপ বহু উদাহরণ পাওয়া যায়, যাতে স্বধর্ম পালনের জন্য মৃত্যুপথযাত্রী এবং আমৃত্যু কষ্ট স্বীকারকারীদের কল্যাণের কথা বলা হয়েছে।

রাজা দিলীপ ক্ষাত্রধর্ম পালন করে এক গাভীর পরিবর্তে নিজ দেহ সিংহকে সমর্পণ করে অভীষ্ট লাভ করেছিলেন। রাজা শিবি শরণাগত রক্ষারূপে স্বধর্ম পালন করার জন্য এক কপোতের পরিবর্তে নিজ দেহের মাংস বাজপাখিকে দিয়ে মৃত্যু স্বীকার করেছিলেন, তাতে তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছিল। প্রহ্লাদ ভগবদ্ভক্তিরূপ স্বধর্ম পালন করার জন্য নানাপ্রকার মৃত্যুযন্ত্রণা সহর্ষে স্বীকার করেন ফলতঃ পরম কল্যাণ লাভ করেন। এইরূপ আরও বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। মহাভারতে বলা হয়েছে—

ন জাতু কামান্ন ভয়ান্ন লোভাদ্
ধর্মং ত্যজেজ্জীবিতস্যাপি হেতোঃ।
নিত্যো ধর্মঃ সুখদুঃখে ত্বনিত্যে
জীবো নিত্যো হেতুরস্য ত্বনিত্যঃ॥

(স্বর্গারোহণ ৫।৬৩)

অর্থাৎ 'মানুষের কখনও কাম, ভয়, লোভ বা জীবনরক্ষার জন্যও ধর্মত্যাগ করা উচিত নয় ; কারণ ধর্ম নিত্য, সুখ-দুঃখ অনিত্য এবং জীব নিত্য আর জীবনের হেতু অনিত্য।'

অতএব মৃত্যু-সঙ্কট উপস্থিত হলেও মানুষের হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করা উচিত ; কিন্তু কোনো অবস্থাতেই স্বধর্ম-ত্যাগ করা উচিত নয়। তাতেই তার সর্বপ্রকার মঙ্গল নিহিত।

প্রশ্ন—অপরের ধর্ম ভয় প্রদানকারী, এই কথার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—এর তাৎপর্য হল, অপরের ধর্মপালন সুখদায়ক হলেও তা ভীতিদায়ক হয়। উদাহরণ—শূদ্র এবং বৈশ্য যদি নিজেদের থেকে উচ্চবর্ণের জন্য নির্দিষ্ট ধর্মপালন করতে থাকে তাহলে উচ্চবর্ণের দ্বারা নিজের পূজা করানোয় এবং তাদের বৃত্তিচ্ছেদ করার দোষে তারা পাপভাগী হয়ে ওঠে, তার ফলে তাদের নরক ভোগ করতে হয়। এইরূপ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় যদি নিজেদের থেকে হীনবর্ণের ধর্ম অবলম্বন করে তাহলে তাদের নিজ বর্ণ থেকে পতন হয় এবং ভয়ানক প্রতিকূল পরিস্থিতি ব্যতিত অন্যের বৃত্তিতে জীবন-নির্বাহ করায় সেই বর্ণের বৃত্তিচ্ছেদের পাপের ফলও তাকে ভুগতে হয়। এইভাবে আশ্রম-ধর্ম ও অন্য সব ধর্মের বিষয়ও বুঝে নিতে হবে। অতএব কোনো ব্যক্তিরই তার কল্যাণের জন্য পরধর্ম গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। অপরের ধর্ম যতই গুণসম্পন্ন মনে হোক, সেটি যার ধর্ম, তার জন্যই প্রকৃষ্ট ; অন্যের কাছে তা ভয়প্রদানকারী, কল্যাণকারী নয়।[1]

[1] মনুস্মৃতিতেও এই একই কথা বলা হয়েছে—

'বরং স্বধর্মো বিগুণো ন পারক্যঃ স্বনুষ্ঠিতঃ। পরধর্মেণ জীবন্ হি সদ্যঃ পততি জাতিতঃ॥' (১০।৯৭)

'গুণরহিত হলেও নিজধর্ম শ্রেষ্ঠ, কিন্তু উত্তমরূপে পালন করা পর-ধর্ম শ্রেষ্ঠ নয়। কারণ অন্যের ধর্মে জীবন ধারণকারী ব্যক্তি জাতির থেকে শীঘ্রই পতিত হয়।'

সম্বন্ধ—মানুষের স্বধর্ম-পালনেই কল্যাণ হয়, পরধর্ম পালন এবং নিষিদ্ধ কর্মের আচরণ করায় সর্বপ্রকার ক্ষতি হয়। এই বিষয়টি ভালোভাবে বুঝে নিলেও মানুষ তার ইচ্ছা, বিচার ও ধর্মের বিরুদ্ধ পাপাচারে কেন প্রবৃত্ত হয়—তার কারণ জানার জন্য অর্জুন জিজ্ঞাসা করছেন—

অর্জুন উবাচ

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥ ৩৬

অর্জুন বললেন—হে কৃষ্ণ ! তাহলে মানুষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও কার দ্বারা বলপূর্বক নিয়োজিত হয়ে পাপাচরণ করে ? ৩৬

প্রশ্ন—এই শ্লোকে অর্জুনের প্রশ্নের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভগবান প্রথমে বলেছিলেন যে প্রচেষ্টাশীল বুদ্ধিমান মানুষের মনকেও ইন্দ্রিয়সমূহ সবলে বিচলিত করে (২।৬০)। ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, বুদ্ধিমান, বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি প্রত্যক্ষে ও অনুমানে পাপের ভয়ংকর পরিণাম দেখে মনে মনে বিচার করে তাতে প্রবৃত্ত হওয়া ঠিক নয় বলে মনে করে, সুতরাং সে স্ব ইচ্ছায় পাপকর্ম করে না, তবুও বলপূর্বক রোগীর কুপথ্য খাওয়ার মতো তার দ্বারা পাপকর্ম অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তাই উপরোক্ত প্রশ্ন দ্বারা অর্জুন ভগবানের কাছে এই বিষয়টি ঠিক করে নিতে চাইছেন যে, এই মানুষদের পাপে বলপূর্বক কে নিয়োগ করেন ? স্বয়ং পরমেশ্বরই কি লোকেদের পাপে নিযুক্ত করেন, যার জন্য তারা ঐ কর্ম থেকে নিজেকে রোধ করতে পারে না, নাকি প্রারব্ধের জন্য বাধ্য হয়ে তাদের পাপ করতে হয়, অথবা এর অন্য কোনো কারণ থাকে।

সম্বন্ধ—অর্জুন একথা জিজ্ঞাসা করলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

শ্রীভগবানুবাচ

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥ ৩৭

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—রজোগুণ থেকে উৎপন্ন এই কাম এবং ক্রোধ, এ ভোগের দ্বারা কখনই তৃপ্ত হয় না আর অত্যন্ত পাপকারক—একেই তুমি এই বিষয়ে মহাবৈরী বলে জানবে॥ ৩৭

প্রশ্ন—**'কামঃ'** এবং **'ক্রোধঃ'**—এই দুই পদের সঙ্গে দুবার **'এষঃ'** পদটি প্রয়োগের কী ভাব এবং **'রজোগুণসমুদ্ভবঃ'** বিশেষণের সম্বন্ধ কোন্ পদটির সঙ্গে রয়েছে ?

উত্তর—চৌত্রিশতম শ্লোকে একথা বলা হয়েছিল যে, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে অবস্থিত রাগ ও দ্বেষই মানুষদের সব কিছু হরণকারী ডাকাত ; ঐ দুটিরই স্থূলরূপ হল কাম-ক্রোধ—এটি লক্ষ্য করাবার জন্য এবং এই দুটির মধ্যে **'কাম'**ই প্রধান, কারণ এটি রাগের স্থূলরূপ এবং এর থেকেই ক্রোধ উৎপন্ন হয় (২।৬২)—তা জানানোর জন্য **'কামঃ'** ও **'ক্রোধঃ'** এই পদ দুটির সঙ্গে **'এষঃ'** পদ প্রযুক্ত হয়েছে। কামের উৎপত্তি হয় রাগ (আসক্তি) থেকে, সেইজন্য **'রজোগুণসমুদ্ভবঃ'** বিশেষণটি **'কামঃ'** পদের সঙ্গে সম্পর্কিত।

প্রশ্ন—যদি 'কাম' ও 'ক্রোধ' দুটিই মানুষের শত্রু তাহলে ভগবান প্রথমে দুটির নাম করে পরে শুধু কামকেই শত্রু মনে করতে বললেন কেন ?

উত্তর—প্রথমে বলা হয়েছে যে কামের থেকেই

ক্রোধের উৎপত্তি। অতএব কাম নাশের সঙ্গেই ক্রোধের নাশ আপনিই হয়ে যায়। তাই ভগবান এই প্রকরণে এর পর শুধু 'কাম'-এর কথাই বলেছেন। কিন্তু কেউ যেন না মনে করে যে পাপের কারণ শুধুমাত্র কামই, ক্রোধের তার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই ; তাই প্রকরণের আরম্ভে কামের সঙ্গে ক্রোধকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

প্রশ্ন—কামের উৎপত্তি কী রজোগুণ থেকে হয়, না রাগ (আসক্তি) থেকে ?

উত্তর—রজোগুণ দ্বারা রাগের (আসক্তির) বৃদ্ধি হয় এবং রাগ থেকে রজোগুণের। তাই এই দুটির স্বরূপ একই মানা হয়েছে (১৪।৭)। সেইজন্য দুটিই কামের উৎপত্তির কারণ।

প্রশ্ন—কামকে **'মহাশনঃ'** অর্থাৎ মহাভক্ষক বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা দেখানো হয়েছে যে এই কাম ভোগের দ্বারা কখনো তৃপ্ত হয় না। ঘৃতে যেমন ইন্ধন দিলে অগ্নি আরও বৃদ্ধি পায়, তেমনই মানুষ যত অধিক ভোগ করে ততই তার ভোগতৃষ্ণা বেড়ে চলে। সুতরাং মানুষের কখনো মনে করা উচিত নয় যে ভোগের প্রতি প্রলোভন পোষণ করে আমি সাম ও দান নীতির দ্বারা কামরূপ বৈরীকে জয় করে নেব, এর জন্য তো বরং দণ্ডনীতি প্রয়োগ করা উচিত।

প্রশ্ন—কামকে **'মহাপাপ্মা'** অর্থাৎ মহাপাপী বলার অর্থ কী ?

উত্তর—এর তাৎপর্য হল যে, সমস্ত অনর্থের কারণই হল এই কাম। মানুষকে বিনা ইচ্ছায় পাপে নিযুক্তকারী প্রারব্ধও নয়, ঈশ্বরও নন, কামই মানুষকে নানা প্রকার ভোগে আসক্ত করে, তাকে সবলে পাপে প্রবৃত্ত করায়, তাই সে মহাপাপী।

প্রশ্ন—এই বিষয়ে একে তুমি শত্রু বলে জানবে, এই কথার কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—এর অভিপ্রায় এই যে, যে আমাকে জোর করে এমন অবস্থায় নিয়ে যায়, যার পরিণাম মহাদুঃখ বা মৃত্যু, তাকে নিজের শত্রু বলে বুঝতে হবে এবং যথাসম্ভব অতিশীঘ্র তার বিনাশ করতে হবে। এই 'কাম' মানুষকে তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোর করে পাপে প্রবৃত্ত করে তাকে জন্ম-মৃত্যুরূপ ও নরক-ভোগরূপ মহাদুঃখের ভাগী করে। সুতরাং কল্যাণকামী মানুষের একে মহাশত্রু বলে মনে করা উচিত। ঈশ্বর পরম দয়ালু এবং প্রাণীদের পরম সুহৃদ, তিনি কেন কারোকে পাপে নিযুক্ত করবেন, পূর্বকৃত কর্ম ভোগের নাম প্রারব্ধ, তা কখনো কাউকে পাপে প্রবৃত্ত করাবার শক্তি ধরে না। অতএব পাপে প্রবৃত্তকারী শত্রু 'কাম' ছাড়া আর কেউ নয়।

সম্বন্ধ— পূর্বশ্লোকে সমস্ত অনর্থের মূল এবং মানুষকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাপে প্রবৃত্তকারী শত্রু যে কাম, তা বলা হয়েছে। তাতে প্রশ্ন আসে যে এ কাম মানুষকে কীভাবে পাপে প্রবৃত্ত করে ? তাই এবার তিনটি শ্লোকে ভগবান জানাচ্ছেন যে এটি মানুষের জ্ঞান আচ্ছাদিত করে তাকে অন্ধ করে পাপের গর্তে ধাক্কা দিয়ে ফেলে—

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥ ৩৮

ধূমের দ্বারা অগ্নি, ময়লার দ্বারা দর্পণ এবং জরায়ুর দ্বারা গর্ভ যেমন আবৃত থাকে, তেমনই কাম দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে॥ ৩৮

প্রশ্ন— ধূম, ময়লা ও জরায়ু—এই তিন দৃষ্টান্তে কামের দ্বারা জ্ঞান আবৃত জানিয়ে এখানে কী ভাব প্রকাশিত হয়েছে ?

উত্তর—এর দ্বারা দেখানো হয়েছে যে, কামই মল, বিক্ষেপ ও আবরণ—এই তিনটি দোষের রূপে পরিণত হয়ে মানুষের জ্ঞান আচ্ছাদিত করে রাখে। এখানে ধূমের স্থানে 'বিক্ষেপ' ধরতে হবে। ধূম যেমন চঞ্চল হয়েও অগ্নিকে ঢেকে রাখে, তেমনই 'বিক্ষেপ' চঞ্চল হয়েও জ্ঞানকে ঢেকে রাখে, কারণ একাগ্রতা বিনা অন্তরের জ্ঞানশক্তি প্রকাশিত হতে পারে না, তা দমিত হয়ে থাকে।

ময়লার স্থানে 'মল' দোষ বুঝতে হবে। দর্পণে ময়লা জমে গেলে তাতে যেমন প্রতিবিম্ব দেখা যায় না, তেমনই পাপে অন্তঃকরণ মলিন হলে তাতে বস্তু অথবা কর্তব্যের প্রকৃত স্বরূপ প্রতিফলিত হয় না, তাই মানুষ সঠিকভাবে বিবেচনা করতে পারে না। জরায়ুর স্থানে 'আবরণ' বুঝতে হবে। জরায়ুর দ্বারা যেমন গর্ভ আচ্ছাদিত থাকে, তার কোনো অংশ দেখা যায় না, তেমনই জ্ঞানও আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। যার অন্তর অজ্ঞানের দ্বারা মোহিত থাকে, সেই ব্যক্তি নিদ্রা ও আলস্য সুখে আবদ্ধ হয়ে কোনো কিছুর চিন্তা-ভাবনা করতে প্রবৃত্তই হয় না।

এই কাম মানুষের অন্তরে নানাপ্রকার ভোগের তৃষ্ণা বৃদ্ধি করে তাকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়, নানা পাপ করিয়ে অন্তঃকরণে মলদোষের বৃদ্ধি করে এবং নিদ্রা, আলস্য ও বৃথা কর্মাদিতে সুখবুদ্ধি করিয়ে মানুষকে সর্বতোভাবে বিবেকশূন্য করে দেয়। তাই এখানে কামকে তিন ভাবে জ্ঞান আচ্ছাদনকারী বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে **'তেন'** পদের অর্থ কাম এবং **'ইদম্'** পদের অর্থ জ্ঞান কোন্ আধারে করা হয়েছে ?

উত্তর—এর আগের শ্লোকে কামকে বৈরী জানার জন্য বলা হয়েছে এবং পরবর্তী শ্লোকে ভগবান নিজে কামের দ্বারা জ্ঞান আবৃত জানিয়ে একথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে এই শ্লোকে **'তেন'** সর্বনাম 'কামে'র এবং **'ইদম্'** সর্বনাম 'জ্ঞানে'র বাচক। এই আধারে দুটি পদের উপরিউক্ত অর্থ করা হয়েছে।

সম্বন্ধ—পূর্বশ্লোকে **'তেন'** পদ 'কামে'র এবং **'ইদম্'** পদ 'জ্ঞানে'র বাচক—এই কথাটি স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেছেন এই কাম অগ্নির ন্যায় চির অতৃপ্ত—

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ।। ৩৯

হে কৌন্তেয় ! এই কাম জ্ঞানীদের চিরশত্রু এবং অগ্নির ন্যায় দুষ্পূরণীয়, কখনোই পূর্ণ হবার নয়। এই কাম দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে।। ৩৯

প্রশ্ন—**'অনলেন'** এবং **'দুষ্পূরেণ'** বিশেষণগুলির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—আর কিছু চাই না, এই তৃপ্তিভাবের বাচক **'অলম্'** অব্যয় ; যাতে এটির অভাব থাকে, তাকে **'অনল'** বলা হয়। অগ্নিতে যতই ঘৃত ও ইন্ধন দেওয়া হোক, তার কখনো তাতে তৃপ্তি হয় না ; তাই অগ্নির নাম 'অনল'। যা কোনোভাবেই পূর্ণ হয় না, তাকে বলা হয় 'দুষ্পূর'। তাই এখানে উপরোক্ত বিশেষণ প্রয়োগ করে এই ভাব দেখানো হয়েছে যে এই 'কাম'ও অগ্নির ন্যায় 'অনল' এবং 'দুষ্পূর'। মানুষ যেমন যেমন বিষয়-ভোগ করে থাকে, অগ্নির মতো তার 'কাম'ও বৃদ্ধি পেতে থাকে, তার তৃপ্তি হয় না। রাজা যযাতি বহু ভোগ ভোগার পর শেষকালে বলেছিলেন—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে।।
(শ্রীমদ্ভাগবত ৯।১৯।১৪)

"বিষয় উপভোগের দ্বারা 'কাম' কখনও নিবৃত্ত হয় না, অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় তা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।"

প্রশ্ন—এখানে **'জ্ঞানিনঃ'** পদ কোন্ জ্ঞানীদের বাচক এবং কামকে **'নিত্যবৈরী'** বলার অর্থ কী ?

উত্তর—এখানে **'জ্ঞানিনঃ'** পদটি প্রকৃত জ্ঞান-প্রাপ্তির জন্য সাধনকারী বিবেক সম্পন্ন সাধকদের বাচক। এই কামরূপ শত্রু ঐ সাধকদের অন্তরে বিবেক, বৈরাগ্য ও নিষ্কামভাবকে স্থির থাকতে দেয় না, তাদের সাধনে বাধা উৎপন্ন করে। তাই একে জ্ঞানীদের 'নিত্য বৈরী' বলা হয়। এই কাম প্রকৃতপক্ষে সকলকেই অধোগামী করায় সকলেরই বৈরী ; কিন্তু অবিবেচক মানুষ বিষয়-ভোগের সময় ভোগে সুখবুদ্ধি হওয়ায় ভ্রমবশতঃ একে মিত্র বলে ভেবে নেয় কিন্তু যারা কামকে তত্ত্বতঃ জানেন সেই বিবেকশীল ব্যক্তিগণ একে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিকারক বলে মনে করেন। তাই একে অর্থাৎ কাম (কামনা)কে অবিবেকীদের নিত্যবৈরী না বলে জ্ঞানীদের নিত্যবৈরী

বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে '**কামরূপেণ**' পদটি কোন্ কামের বাচক ?

উত্তর—যে কাম দুর্গুণের শ্রেণীতে ধরা হয়, যা ত্যাগ করার জন্য গীতায় স্থানে স্থানে বলা হয়েছে (২।৭১ ; ৬।২৪), ষোড়শ অধ্যায়ে যাকে নরকের দ্বার বলা হয়েছে (১৬।২১), সেই জাগতিক বিষয় ভোগের কামনারূপ কামের বাচক এখানে '**কামরূপেণ**' পদটি। ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার, তাঁর ধ্যান-ভজন করার বা সাত্ত্বিক কর্ম করার যে শুভ-ইচ্ছা থাকে, তার নাম কাম বা কামনা নয়। সেটি মানুষের কল্যাণের হেতু এবং বিষয়-ভোগ কামনারূপ কামের বিনাশকারী, তা কি করে সাধকের শত্রু হতে পারে ? তাই গীতায় 'কাম' শব্দের অর্থ জাগতিক ইষ্ট-অনিষ্ট ভোগের সংযোগ-বিয়োগের কামনা অথবা ভোগ্য পদার্থকেই বুঝতে হবে। এইভাবে এটিও বুঝতে হবে যে সৌত্রিশতম শ্লোকে বা অন্যত্র কোথাও যে 'রাগ' বা 'সঙ্গ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তাও ভগবদ্-বিষয়ক অনুরাগের বাচক নয়, সেটি কামোৎপাদক ভোগাশক্তির বাচক।

প্রশ্ন—'**জ্ঞানম্**' পদ কোন্ জ্ঞানের বাচক এবং এটি কামের দ্বারা আবৃত বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে '**জ্ঞানম্**' পদ পরমাত্মার প্রকৃত জ্ঞানের বাচক এবং সেটি কামের দ্বারা আবৃত বলে এই ভাব দেখিয়েছেন যে, জরায়ুর দ্বারা আবৃত থাকলেও শিশু যেমন জরায়ু ভেদ করে বাইরে আসতে সক্ষম হয় এবং যেমন অগ্নি প্রজ্বলিত হলে তার আবরণকারী ধোঁয়ার বিনাশ করে, তেমনই যখন কোনো সাধু মহাপুরুষ অথবা শাস্ত্রের উপদেশে পরমাত্মার তত্ত্ব-জ্ঞান জাগরিত হয়, সেই সময় জীব কামদ্বারা আবৃত হলেও কাম নাশ করে স্বয়ং প্রকাশিত হয়ে ওঠে। সুতরাং কাম তার আবৃতকারক হলেও তা সর্বতোভাবে তার থেকে বলহীন।

সম্বন্ধ—এইভাবে কামের দ্বারা জ্ঞান আবৃত বলে এবার তাকে নিবৃত্ত করার উপায় জানানোর উদ্দেশ্যে তার বাসস্থান এবং তার দ্বারা জীবাত্মা কীভাবে মোহগ্রস্ত হয় তার প্রকার জানাচ্ছেন—

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥ ৪০

ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—এইগুলিকে কামের বাসস্থান বলা হয়। এই কামই মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করে জীবাত্মাকে মোহিত করে॥ ৪০

প্রশ্ন—'ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি'—এগুলিকে 'কাম'-এর বাসস্থান বলা হয়, এই কথার কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—এই কথায় এই অভিপ্রায় যে, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় মানুষের বশে না থাকার ফলে 'কাম' তাদের ওপর আধিপত্য করে থাকে। তাই কল্যাণকামী মানুষদের উচিত নিজ মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি থেকে এই কামরূপ শত্রুকে শীঘ্রই দূর করা অথবা তাকে বাধা দিয়ে নষ্ট করে ফেলা, নাহলে সে অন্দরে প্রবেশ করে শত্রুর মতো মনুষ্য-জীবনরূপ অমূল্য ধন নষ্ট করে দেবে।

প্রশ্ন—এই 'কাম' মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই জ্ঞান আচ্ছাদিত করে জীবাত্মাকে মোহিত করে, এই কথাটির কী তাৎপর্য ?

উত্তর—এর তাৎপর্য এই যে, এই 'কাম' মানুষের মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়তে প্রবেশ করে তার বিবেকশক্তি নষ্ট করে দেয় ; যার ফলে মানুষের অধঃপতন হয়। তাই শীঘ্রই সচেতন হওয়া উচিত।

একটি কল্পিত দৃষ্টান্তের সাহায্যে এটি বোঝানো হচ্ছে। চেতনসিংহ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর প্রধান মন্ত্রীর নাম ছিল জ্ঞানসাগর। প্রধান মন্ত্রীর অধীনে এক সহকারী মন্ত্রী ছিলেন, তাঁর নাম ছিল চঞ্চলসিংহ। রাজা তাঁর মন্ত্রী এবং সহকারী মন্ত্রীসহ নিজ রাজধানী মধ্যপুরীতে থাকতেন। রাজ্য দশটি জেলায় বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক জেলায় একজন জেলাধীশ অধিকারী নিযুক্ত ছিলেন। রাজা অত্যন্ত বিচক্ষণ, কর্মপ্রবণ ও সুশীল

ছিলেন। তাঁর রাজ্যে সকলেই সুখী ছিল। রাজ্যে দিনে দিনে উন্নতি হচ্ছিল। এক সময় তাঁর রাজ্যে জগমোহন নামে এক ঠগীদের সর্দার আসে। সে অত্যন্ত কুচক্রী এবং জালিয়াত ছিল, অন্তর বিষে ভরা হলেও তার মুখের কথা ছিল অত্যন্ত মধুর। সে যার সঙ্গে কথা বলত, সেই ব্যক্তি তার কথায় মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেত। সে একজন ব্যবসায়ীর বেশ ধরে এসেছিল এবং জেলাধীশের সঙ্গে দেখা করে তাঁর কাছ থেকে সারারাজ্যে ব্যবসা করার অনুমতি চাইল। সেই ঠগটি জেলাধীশকে অনেক লোভ দেখিয়েছিল। তিনি প্রলুব্ধ হলেও তাঁর আধিকারিকদের বিনা অনুমতিতে কিছু করতে পারলেন না। জালিয়াত ব্যবসায়ী জগমোহনের পরামর্শে তারা সকলে মিলে তাকে তাদের কার্যালয়ের সহকারী মন্ত্রী চঞ্চলসিংহের কাছে নিয়ে যায় ; ঠগ ব্যবসায়ী তাকে খুব প্রলোভন দেখায়, তার ফলে চঞ্চলসিংহও জগমোহনের মিষ্টি বাক্যের ফাঁদে পড়েন। চঞ্চলসিংহ তাকে নিজ উচ্চ অধিকারী জ্ঞানসাগরের কাছে নিয়ে যান। জ্ঞানসাগর বুদ্ধিমান ব্যক্তি হলেও, তাঁর হৃদয়ে একটি দুর্বলতা ছিল। মীমাংসাপূর্বক কোনো স্থির সিদ্ধান্তে যেতে পারতেন না। তাই তিনি তাঁর সহকারী চঞ্চলসিংহ ও দশ জেলাধীশদের কথায় প্রভাবিত হয়ে পড়তেন, ফলে তারাও এই সুযোগের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করত। এবার তিনি চঞ্চলসিংহ ও জেলাধীশদের কথায় বিশ্বাস করে ঠগ ব্যবসায়ীর ফাঁদে পড়ে যান। তিনি তাকে লাইসেন্স দিতে স্বীকার করলেও জানালেন যে মহারাজ চেতনসিংহের অনুমতি ব্যতীত সমগ্র রাজ্যে লাইসেন্স দেওয়া সম্ভব নয়। শেষে ঠগ ব্যবসায়ীর পরামর্শে তিনি তাকে রাজার কাছে নিয়ে গেলেন। ঠগ অত্যন্ত চালাক ব্যক্তি। সে রাজাকে অনেক প্রলোভন দেওয়াতে রাজা প্রলোভিত হয়ে জগমোহনকে তাঁর রাজ্যের সর্বত্র অবাধ ব্যবসা চালাবার এবং বাড়ি-ঘর তৈরি করার অনুমতি প্রদান করেন। জগমোহন জেলা-আধিকারিক এবং দুই মন্ত্রীদের কিছু আদান-প্রদানের মাধ্যমে সন্তুষ্ট করে সমস্ত রাজ্যে তার জাল বিস্তার করে। সমস্ত রাজ্যে যখন তার প্রভাব বিস্তার হয়ে গেল, তখন সে বিনা বাধায় প্রজাদের লুট করতে শুরু করল। জেলা-আধিকারিকদের সঙ্গে মন্ত্রীরা তো লোভে পড়েই ছিলেন, জগমোহন রাজাকেও সেই লুটের ভাগ দিয়ে নিজের বশীভূত করে নিয়েছিল। সে নানা ছল-কৌশলপূর্ণ মিষ্টি বাক্যে রাজা ও বিষয়লোভী সমস্ত আধিকারিকদের বিপথগামী করে তাদের সকলকে শক্তিহীন, অকর্মণ্য ও ভোগ-বিলাসী করে তুলেছিল। এভাবে সে নিঃশব্দে তার বলবৃদ্ধি করে সমস্ত রাজ্যের ওপর তার ক্ষমতা বিস্তার করেছিল এবং ক্রমে রাজার সর্বস্ব হরণ করে শেষে তাঁকে বন্দী করে নজরবন্দী করে রাখে।

এটি এক দৃষ্টান্ত, স্পষ্টভাবে এটি এইভাবে বুঝতে হবে—রাজা চেতনসিংহ 'জীবাত্মা', প্রধানমন্ত্রী জ্ঞানসাগর 'বুদ্ধি', সহকারী মন্ত্রী চঞ্চলসিংহ 'মন', মধ্যপুরী রাজধানী 'হৃদয়'। দশ জেলাধীশ 'দশ-ইন্দ্রিয়', দশ জেলা ইন্দ্রিয়াদির 'দশ স্থান', ঠগের সর্দার জগমোহন 'কাম' অর্থাৎ কামনা। বিষয়ভোগের সুখের প্রলোভনই হল সকলকে লোভ দেখানো। বিষয়ভোগের ফাঁদে ফেলে জীবাত্মাকে সত্যকার সুখের পথ থেকে ভ্রষ্ট করাই হল তাকে লুট করা এবং তার জ্ঞান আবৃত করে তাকে সর্বতোভাবে মোহগ্রস্ত করা এবং মনুষ্য-জীবনের পরম লাভ থেকে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য করাই হল তাকে নজরবন্দী করা।

অভিপ্রায় হল যে এই কল্যাণবিরোধী দুর্জয় শত্রু কাম ; ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে বিষয়ভোগরূপ মিথ্যা সুখের প্রলোভন দেখিয়ে সেগুলির ওপর নিজ অধিকার বিস্তার করে এবং মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়-সুখরূপ লোভের প্রলোভনে জীবাত্মার জ্ঞান আবৃত করে তাকে মোহময় সংসাররূপ বন্দীশালায় আবদ্ধ করে। পরমাত্মা-প্রাপ্তিরূপ বাস্তবিক ধন থেকে বঞ্চিত করে তার অমূল্য জীবন বিনাশ করে দেয়।

সম্বন্ধ—এইভাবে কামরূপ শত্রুর অত্যাচার এবং সে যেখানে লুকিয়ে থেকে অত্যাচার করে, সেই বাসস্থানের পরিচয় করিয়ে ভগবান এবার সেই কামরূপ শত্রুকে বধ করার যুক্তি বলে তাকে বিনাশ করার জন্য অর্জুনকে নির্দেশ দিচ্ছেন—

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্॥ ৪১

সেই জন্য হে অর্জুন ! তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত করে এই জ্ঞান-বিজ্ঞান বিনাশকারী মহাপাপী কামকে সবলে বিনাশ করো॥ ৪১

প্রশ্ন— 'তস্মাৎ' এবং **'আদৌ'**—এই দুটি পদ প্রয়োগ করে ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করার কথা বলার কী তাৎপর্য ?

উত্তর— 'তস্মাৎ' পদটি হেতুবাচক, তার সঙ্গে **'আদৌ'** পদ প্রয়োগ করে ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করার কথা বলে ভগবানের বলার এই তাৎপর্য যে 'কাম'ই সমস্ত অনর্থের মূল, এটি প্রথমে ইন্দ্রিয়তে প্রবিষ্ট হয়ে তার দ্বারা মন-বুদ্ধিকে মোহগ্রস্ত করে জীবাত্মাকে মোহিত করে। এর নিবাসস্থল মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়। তাই প্রথমে ইন্দ্রিয়কে নিজের বশে এনে এই কামরূপ শত্রুকে অবশ্য বিনাশ করতে হয়। এর বাসস্থান বন্ধ করে দিলেই এই কামরূপ শত্রু বধ করা সহজ হয়। তাই প্রথমে ইন্দ্রিয়াদি ও পরে মনকে নিরোধ করা উচিত।

প্রশ্ন—ইন্দ্রিয়াদি কী উপায়ে বশ করা উচিত ?

উত্তর —অভ্যাস ও বৈরাগ্য — এই দুটি উপায়ে ইন্দ্রিয়াদি বশে আনা সম্ভব। এই দুটি উপায়েই মনকে বশীভূত করার জন্য বলা হয়েছে (৬।৩৫)। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগে হওয়া রাজসিক সুখ (১৮।৩৮) এবং নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদজনিত তামসিক সুখকে (১৮।৩৯) বাস্তবে ক্ষণিক, বিনাশশীল এবং দুঃখরূপ মনে করে ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত ভোগে বিরত থাকাই বৈরাগ্য। পরমাত্মার নাম, রূপ, গুণ, চরিত্র ইত্যাদি শ্রবণ, কীর্তন, মনন ইত্যাদিতে এবং নিঃস্বার্থভাবে জনসেবামূলক কাজে ইন্দ্রিয়গুলিকে ব্যাপৃত করা ও ধারণ-শক্তির দ্বারা সেই ক্রিয়াগুলি শাস্ত্রের অনুকূল করে তোলা, তাতে স্বেচ্ছাচারিতার দোষ উৎপন্ন হতে না দেওয়ার চেষ্টা করাই হল অভ্যাস। এই দুটি উপায় দ্বারাই ইন্দ্রিয় ও মনকে বশীভূত করা সম্ভব হয়।

প্রশ্ন —জ্ঞান ও বিজ্ঞান — এখানে এই দুটি শব্দের অর্থ কী এবং কাম এদের বিনাশকারী বলার কী অভিপ্রায় ?

উত্তর —ভগবানের নির্গুণ-নিরাকার তত্ত্বের প্রভাব, মাহাত্ম্য ও রহস্যযুক্ত যথার্থ জ্ঞানকে **'জ্ঞান'** এবং সগুণ-নিরাকার ও দিব্য-সাকার তত্ত্বের লীলা, রহস্য, গুণ, মহত্ত্ব ও প্রভাবযুক্ত যথার্থ জ্ঞানকে **'বিজ্ঞান'** বলা হয়। এই যথার্থ জ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য হৃদয়ে যে আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়, তাকে এই মহাকামরূপ শত্রু নিজ মোহিনী শক্তি দ্বারা নিত্য-নিরন্তর দাবিয়ে রাখে অর্থাৎ সেই আকাঙ্ক্ষা থেকে উৎপন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় বাধাপ্রদান করে, তাই এটি প্রকটিত হতে পারে না। সেইজন্য কামকে এদের বিনাশকারী বলে জানানো হয়েছে। 'নাশ' শব্দের দুটি অর্থ— এক অপ্রকটিত করা আর দুই বস্তুর অভাব সিদ্ধ করা। এখানে অপ্রকটিত করার অর্থেই **'নাশ'** শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে ; কারণ পূর্বশ্লোকেও জ্ঞান কাম দ্বারা আবৃত বলা হয়েছে। জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে সমূলে উৎপাটিত করার ক্ষমতা কামের নেই ; কারণ কামের উৎপত্তি অজ্ঞান থেকে। সুতরাং জ্ঞান-বিজ্ঞান একবার প্রকটিত হলে অজ্ঞান সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তারপরে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিনাশের আর কোনো প্রশ্নই থাকে না।

সম্বন্ধ— পূর্বশ্লোকে ইন্দ্রিয়াদি বশে করে কামরূপ শত্রুকে বিনাশ করার কথা বলা হয়েছে। তাতে আশঙ্কা হতে পারে যে, যখন ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির ওপর কামের অধিকার থাকে এবং সেগুলির দ্বারা কাম জীবাত্মাকে মোহিত করে রাখে, তাহলে এই অবস্থায় জীব ইন্দ্রিয়াদিকে বশ করে কামকে কীভাবে বিনাশ করবে ? এই আশঙ্কা দূর করার জন্য ভগবান আত্মার প্রকৃত স্বরূপ লক্ষ্য করিয়ে আত্মবলের স্মৃতি করিয়েছেন—

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥ ৪২

স্থূলশরীর থেকে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, বলবান এবং সূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয় থেকে মন শ্রেষ্ঠ, মন থেকে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি থেকে যা আরও শ্রেষ্ঠ, সেটিই হল আত্মা॥ ৪২

প্রশ্ন—ইন্দ্রিয়াদিকে স্থূলশরীর থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়, এই কথা কোন্ আধারে মানা হয়ে থাকে?

উত্তর—কঠোপনিষদে শরীরকে রথ এবং ইন্দ্রিয়াদিকে অশ্ব বলা হয়েছে (১।৩।৩-৪); রথের থেকে অশ্ব শ্রেষ্ঠ এবং চেতন, সে রথকে নিজ ইচ্ছানুসারে চালাতে পারে। তেমনই ইন্দ্রিয় স্থূলদেহকে যেখানে খুশী নিয়ে যেতে সক্ষম, অতএব তা স্থূলদেহের থেকে বলবান ও চেতন। স্থূল শরীরকে দেখা যায়, ইন্দ্রিয়কে দেখা যায় না, তাই এটি দেহের থেকে সূক্ষ্ম।

এছাড়াও স্থূল শরীরের থেকে ইন্দ্রিয়াদির শ্রেষ্ঠতা, সূক্ষ্মতা এবং বলবত্তা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়।

প্রশ্ন — কঠোপনিষদে (১।৩।১০-১১) বলা হয়েছে যে ইন্দ্রিয়ের থেকে অর্থ (পঞ্চতন্মাত্রা) শ্রেষ্ঠ, অর্থের (পঞ্চতন্মাত্রা) থেকে মন শ্রেষ্ঠ, মনের থেকে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধির থেকে মহত্তত্ত্ব শ্রেষ্ঠ, সমষ্টি বুদ্ধিরূপ মহত্তত্ত্ব থেকে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ এবং অব্যক্ত থেকে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। পুরুষ থেকে শ্রেষ্ঠ ও সূক্ষ্ম আর কিছুই নেই। এটিই সকলের অন্তিম সীমা ও পরমগতি। কিন্তু এখানে ভগবান অর্থ, মহত্তত্ত্ব ও অব্যক্তকে বাদ দিয়ে বলেছেন, এর অভিপ্রায় কী?

উত্তর—ভগবান এখানে সাররূপে এই প্রকরণের বর্ণনা করেছেন, তাই ঐ তিনটির নাম করা হয়নি; কারণ কাম বিনাশ করার জন্য অর্থ, মহত্তত্ত্ব এবং অব্যক্তের শ্রেষ্ঠত্ব বলার কোনো প্রয়োজন নেই, শুধু আত্মারই মহত্ত্ব দেখানো প্রয়োজন।

প্রশ্ন—কঠোপনিষদে ইন্দ্রিয়াদির থেকে অর্থকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে কেন?

উত্তর—এখানে 'অর্থ' শব্দের অভিপ্রায় হল পঞ্চতন্মাত্রা। তন্মাত্রাগুলি ইন্দ্রিয়াদির থেকে সূক্ষ্ম, তাই তাকে শ্রেষ্ঠ বলা যথার্থ।

প্রশ্ন—ভগবান এখানে ইন্দ্রিয়াদির থেকে মনকে এবং মনের থেকে বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ, সূক্ষ্ম এবং বলবান বলে জানিয়েছেন, কিন্তু অন্য অধ্যায়ে বলেছেন যে 'যত্নশীল বুদ্ধিমান পুরুষের মনকেও প্রমথ স্বভাবসম্পন্ন ইন্দ্রিয়াদি সবলে হরণ করে (২।৬০), একথাও বলেছেন যে বিষয়ভোগে বিচরণশীল ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে মন যেটিতে আকর্ষণ বোধ করে, সেই একটি ইন্দ্রিয়ই মানুষের বুদ্ধি হরণ করে (২।৬৭)। এই কথায় মনের থেকে ইন্দ্রিয়ের প্রাবল্যই সিদ্ধ হয় এবং বুদ্ধির চেয়েও মনের সহায়তায় ইন্দ্রিয়ের প্রাবল্য প্রমাণিত হয়। এইরূপ পূর্বাপরে বিরোধাভাস মনে হয়, এর কী সমাধান?

উত্তর—কঠোপনিষদে রথের দৃষ্টান্ত দ্বারা এটি ভালোভাবে বোঝানো হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে আত্মা রথী, বুদ্ধি তাঁর সারথি, শরীর রথ, মন লাগাম, ইন্দ্রিয়াদি অশ্ব এবং শব্দ ইত্যাদি বিষয় হল পথ[১]। যদিও বস্তুতে রথীর অধীন সারথি, সারথির অধীন লাগাম এবং লাগামের অধীন ঘোড়া এই কথাটি ঠিক, তবুও যার বুদ্ধিরূপ সারথি বিবেকজ্ঞান বর্জিত, যিনি মনরূপ লাগামকে নিয়মানুসারে ধরে রাখেননি, সেই জীবাত্মারূপ রথীর ইন্দ্রিয়রূপ ঘোড়া উচ্ছৃঙ্খল হয়ে দুষ্ট ঘোড়ার ন্যায় তাঁকে সবলে বিপথগামী করে গর্তে নিক্ষেপ

[১]'আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্। আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥' (কঠোপনিষদ ১।৩।৩-৪)
'তুমি আত্মাকে রথী এবং শরীরকে রথ বলে জানবে, বুদ্ধিকে সারথি ও মনকে লাগাম বলে মনে করবে। বিবেচক মানুষ ইন্দ্রিয়াদিকে ঘোড়া বলে থাকেন এবং বিষয়াদিকে পথ এবং শরীর, ইন্দ্রিয় এবং মন দ্বারা যুক্ত আত্মাকে 'ভোক্তা' বলা হয়।

করে।[১] এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জীবাত্মার যতক্ষণ বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়ের ওপর আধিপত্য না হয়, যতক্ষণ সে নিজে সামর্থ্য ভুলে ঐগুলির অধীন থাকে, ততক্ষণ ইন্দ্রিয়াদি, মন ও বুদ্ধিকে ভুল বুঝিয়ে সেইগুলিকেও সবলে অন্য পথে টেনে নিয়ে যায় অর্থাৎ ইন্দ্রিয় প্রথমে মনকে বিষয়-সুখের প্রলোভন দিয়ে তাকে নিজের অনুকূলে আনে, তারপর মন ও ইন্দ্রিয়াদি মিলে বুদ্ধিকে নিজের অনুকূলে নিয়ে আসে, তারপর এগুলি সব এক হয়ে আত্মাকেও নিজেদের অধীন করে নেয় ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়াদির থেকে মন, মনের থেকে বুদ্ধি এবং সবার থেকে আত্মাই বলবান, তাই কঠোপনিষদে বলা হয়েছে যে যার বুদ্ধিরূপ সারথি বিচারশীল, মনরূপ লাগাম যার নিয়মানুসারে নিজ অধীনে থাকে, তার ইন্দ্রিয়রূপ ঘোড়াও শ্রেষ্ঠ ঘোড়াদের মতো বশে থাকে। এরূপ মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সম্পন্ন পবিত্রাত্মা মানুষ সেই পরমপদ লাভ করেন, যেখানে গেলে আর ফিরে আসতে হয় না।[২] গীতাতেও বশীভূত মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত নিজ আত্মাকে মিত্র এবং স্বেচ্ছাচারী মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদিসম্পন্ন ব্যক্তিকে নিজ শত্রুর সমান বলেছেন (৬।৬)। সুতরাং যে ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত হয়নি, তা প্রকৃতপক্ষে মন-বুদ্ধির থেকে বলহীন হলেও প্রবল হয়ে থাকে, এই দৃষ্টিতে অন্য অধ্যায়ে বলা হয়েছে আর এখানে তার যথার্থ অবস্থা বলা হয়েছে। অতএব আগের ও পরের বক্তব্যে কোনো বিরোধ নেই।

প্রশ্ন—এখানে 'পরতঃ' পদের অর্থ 'অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ' বলা হয়েছে, এর অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—কঠোপনিষদে যেখানে এই বিষয় উদ্ধৃত হয়েছে, সেখানে বুদ্ধির থেকে শ্রেষ্ঠ মহত্তত্ত্ব, তার থেকে শ্রেষ্ঠ অব্যক্ত এবং অব্যক্তর থেকেও শ্রেষ্ঠ পুরুষকে বলা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে এটিই হল পরাকাষ্ঠা —শ্রেষ্ঠের অন্তিম সীমা, এর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই[৩]। শ্রুতির তাৎপর্য স্পষ্টভাবে জানানোর জন্য এখানে 'পরতঃ'-এর অর্থ করা হয়েছে 'অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ' বা 'শ্রেষ্ঠতম'। আত্মা সবকিছুর আধার, কারণ, প্রকাশক এবং প্রেরক তথা সূক্ষ্ম, ব্যাপক, শ্রেষ্ঠ ও বলবান হওয়ায় তাকে 'অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ' বলাই উচিত।

প্রশ্ন— এখানে 'কাম'-এর প্রকরণ চলছে। পরের শ্লোকেও কামকে বধ করার জন্য ভগবান বলেছেন। সুতরাং এই শ্লোকে উদ্ধৃত 'সঃ' শব্দটি কামের বাচক মনে করলে ক্ষতি কী ?

উত্তর—এখানে কামকে বধ করার প্রকরণ অবশ্যই

---

[১]যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা। তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ॥
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাশুচিঃ। ন স তৎ পদমাপ্নোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি॥ (কঠোপনিষদ ২।৩।৫-৭)

'কিন্তু যে বুদ্ধিরূপ সারথি সর্বদা অবিবেচক ও অসংযত চিত্তযুক্ত, তার অধীন ইন্দ্রিয়সমূহ তেমন ভাবেই থাকে না, যেমন সারথির অধীন দুষ্ট ঘোড়া।' 'এবং যিনি (বুদ্ধিরূপ সারথি) বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন নন' যাঁর মন নিগৃহীত নয় এবং যিনি সর্বদাই অপবিত্র, তিনি ঐ পদ লাভ করতে সক্ষম হন না, অপরপক্ষে তিনি জগতে গমনাগমন প্রাপ্ত হন।

[২]যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা। তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ। স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে॥ (কঠোপনিষদ ১।৩।৬, ৮)

'কিন্তু যে বুদ্ধিরূপ সারথি বিবেকবান (কুশল) ও সমাহিত চিত্ত, তার অধীন ইন্দ্রিয়গুলি তেমনই থাকে, যেমন সারথির অধীনে থাকে শিক্ষিত ঘোড়া।'

'যিনি জ্ঞানবান, নিগৃহীত মনসম্পন্ন ও সর্বদা পবিত্র থাকেন, তিনি সেই পদলাভ করেন, যেখান থেকে তিনি এই জগতে ফিরে আসেন না অর্থাৎ আর পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না।'

[৩]ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥ (কঠোপনিষদ ১।৩।১০-১১)

'ইন্দ্রিয়াদির থেকে তার অর্থ (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধরূপ তন্মাত্রাগুলি) শ্রেষ্ঠ (সূক্ষ্ম ও বলবান), অর্থ থেকে মন শ্রেষ্ঠ, মন থেকে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি থেকেও মহান আত্মা (মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ সমষ্টি বুদ্ধি) শ্রেষ্ঠ। মহত্তত্ত্ব থেকে অব্যক্ত (মূল প্রকৃতি) শ্রেষ্ঠ এবং অব্যক্ত থেকে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। পুরুষের থেকে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই, সেটিই পরাকাষ্ঠা (অন্তিম সীমা) এবং সেটিই পরম গতি।

আছে, কিন্তু তাকে শ্রেষ্ঠ বলার প্রকরণ নেই। আত্মাতে কামকে বধ করার শক্তি আছে। মানুষ যদি তার আত্মবলকে চিনে নিতে পারে, তাহলে সে বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়াদির ওপর সহজেই পূর্ণ অধিকার স্থাপন করে কামকে বধ করতে সক্ষম, এই কথাটি জানানোর জন্যই এই শ্লোকের অবতারণা করা হয়েছে। যদি ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির থেকে 'কাম' আরও শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয় তাহলে তার দ্বারা কামকে বধ করা অসঙ্গত হয়। তাছাড়াও 'সঃ' পদের অর্থ কাম মনে করলে সেটি কঠোপনিষদের বর্ণনারও বিরুদ্ধ হবে। সুতরাং এখানে 'সঃ' পদটি কামের বাচক নয়, বরং দ্বিতীয় অধ্যায়ে যাকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে **'রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে'** (২।৫৯)—সেই পরতত্ত্বের অর্থাৎ নিত্য শুদ্ধবুদ্ধস্বরূপ পরমাত্মারই বাচক।

সম্বন্ধ—ভগবান এবার আগের শ্লোকের বর্ণনানুসারে আত্মাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে কামরূপ শত্রু বধ করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্।। ৪৩

এই ভাবে বুদ্ধি থেকে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সূক্ষ্ম, বলবান এবং অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ আত্মাকে জেনে এবং বুদ্ধির দ্বারা মনকে বশ করে হে মহাবাহো ! তুমি এই কামরূপ দুর্জয় শত্রুর বিনাশ করো ।। ৪৩

প্রশ্ন—এখানে বুদ্ধি থেকে শ্রেষ্ঠ আত্মাকে মনে করে কামকে বধ করার জন্য বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—অনাদিকাল থেকে মানুষের জ্ঞান অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হয়ে আছে ; তাই জন্য সে নিজ আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হয়ে রয়েছে, স্বয়ং সব থেকে শ্রেষ্ঠ হয়েও নিজশক্তির বিস্মরণ হয়ে কামরূপ শত্রুর বশীভূত হচ্ছে। লোকপ্রসিদ্ধির দ্বারা এবং শাস্ত্রের মাধ্যমে শুনেও লোক আত্মাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মানে না। লোকে আত্মস্বরূপকে যদি ভালোভাবে বুঝে যায়, তাহলে এই রাগ (আসক্তি) রূপ কাম সহজেই নাশ হয়, তাই আত্মস্বরূপকে বুঝতে পারাই তাকে বধ করার প্রধান উপায়। ভগবান সেইজন্য আত্মাকে বুদ্ধির থেকে শ্রেষ্ঠ জানিয়ে কামকে বিনাশ করতে বলেছেন। আত্মতত্ত্ব অত্যন্ত গূঢ়। মহাপুরুষগণ বুঝিয়ে দিলে তবেই কোনো সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তির পক্ষে এটি বোঝা সম্ভব হয়। কঠোপনিষদে বলা আছে যে 'সর্বভূতের মধ্যে নিহিত এই আত্মাকে কেউ প্রত্যক্ষ করতে পারে না, কেবলমাত্র সূক্ষ্মদর্শী পুরুষই অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা একে প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম'[১]।

প্রশ্ন—এখানে 'আত্মানম্'-এর অর্থ মন এবং 'আত্মনা'র অর্থ 'বুদ্ধি' কেন করা হয়েছে ?

উত্তর—শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও জীব— এই সবেরই বাচক আত্মা শব্দ। এগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম ইন্দ্রিয়কে বশ করার জন্য একচল্লিশতম শ্লোকে বলা হয়েছে। শরীর ইন্দ্রিয়ের অন্তর্গত এবং জীবাত্মা স্বয়ং বশকারী। অতএব অবশিষ্ট রইল মন ও বুদ্ধি ; বুদ্ধিকে মনের থেকে বলবান বলা হয়েছে, সুতরাং এর দ্বারা মনকে বশীভূত করা যায়। তাই **'আত্মানম্'** এর অর্থ মন এবং **'আত্মনা'**র অর্থ বুদ্ধি ধরা হয়েছে।

প্রশ্ন—বুদ্ধির দ্বারা মনকে বশীভূত করার কী প্রক্রিয়া ?

উত্তর—ভগবান ষষ্ঠ অধ্যায়ে মনকে বশীভূত করার জন্য অভ্যাস ও বৈরাগ্য—এই দুই উপায় বলেছেন (৬।৩৫)। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে মানুষের স্বাভাবিক রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ থাকে, বিষয়াদির সঙ্গে ইন্দ্রিয়াদির সম্বন্ধ হওয়ার সময় যখনই রাগ-দ্বেষ উপস্থিত হবে তখনই অত্যন্ত সাবধানতা-সহ বুদ্ধির দ্বারা বিচার করে রাগ-দ্বেষের বশীভূত না হওয়ার চেষ্টা করলে আস্তে আস্তে রাগ-দ্বেষ কমতে থাকে। বুদ্ধির দ্বারা বিচার করে ইন্দ্রিয়াদির ভোগে বারংবার দুঃখ ও দোষ দর্শন করিয়ে

[১]এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে। দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।। (কঠোপনিষদ ১।৩।১২)

মনকে তাতে অরুচি উৎপন্ন করাবার নামই বৈরাগ্য। ব্যবহারকালে স্বার্থত্যাগ এবং ধ্যানের সময় মনকে পরমেশ্বরের চিন্তায় সংযুক্ত করা ও মনকে ভোগের প্রবৃত্তি থেকে সরিয়ে পরমেশ্বরের চিন্তায় বারংবার নিযুক্ত করাকে বলা হয় অভ্যাস।

প্রশ্ন—আত্মা যখন স্বয়ং সবথেকে প্রবল, তখন ভগবান বুদ্ধি দ্বারা মনকে বশীভূত করে কামকে বিনাশ করতে কেমন করে বললেন ? আত্মা নিজেই তো কামরূপ মহাশত্রুকে বধ করতে সক্ষম ?

উত্তর— আত্মাতে অবশ্যই অনন্ত বল আছে, সে কামকে বধ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে তার বল পেয়েই সকলে বলীয়ান ও ক্রিয়াশীল হয়। কিন্তু সে তার বলকে (ক্ষমতাকে) ভুলে আছে, যেমন প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট অজ্ঞতাবশতঃ নিজ বল ভুলে গিয়ে তাঁর অপেক্ষা সর্বতোভাবে শক্তিহীন ক্ষুদ্র চাকরদের অধীন হয়ে তাদের মতেই মত দেন, তেমনই আত্মাও নিজেকে বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়াদির অধীন মনে করে তাদের কামপ্রেরিত উচ্ছৃঙ্খলতাপূর্ণ ইচ্ছা অনুযায়ী কাজে মৌন সম্মতি প্রদান করে। এর ফলে তার বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকা '**কাম**' অর্থাৎ কামনা জীবাত্মাকে বিষয়ে প্রলোভিত করে তাকে সংসারে আবদ্ধ করে রাখে। যদি আত্মা নিজ স্বরূপ বুঝে, নিজ শক্তি জেনে বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়কে বশে আনে, তাদের ইচ্ছামতো কাজ করার অনুমতি না দেয় এবং চোরের মতো আত্মগোপনকারী কামকে সবলে দূর করার আদেশ দেয়, তাহলে মন, বুদ্ধি আর ইন্দ্রিয়াদির এমন শক্তি নেই যে তারা ইচ্ছামতন সবকিছু করতে সক্ষম হয়, কামেরও এমন ক্ষমতা নেই যে সে মুহূর্তকালও সেখানে টিকতে পারে। সত্যই এ বড় আশ্চর্যের ব্যাপার যে আত্মা থেকেই অস্তিত্ব, স্ফূর্তি ও শক্তি লাভ করে, তারই বলে বলীয়ান হয়ে এগুলি তাকেই অবদমিত করে ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে যায়। সুতরাং প্রয়োজন হল আত্মা যেন নিজ স্বরূপ এবং নিজের শক্তিকে জেনে বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করে। কাম এগুলিতেই নিবাস করে এবং তার ফলেই এগুলি উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে। এগুলিকে বশীভূত করলে কাম সহজেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অক্রিয় আত্মার জন্য কাম বিনাশের এটিই হল সহজ উপায়। তাই বুদ্ধি দ্বারা মনকে বশীভূত করে কাম অর্থাৎ কামনাকে বিনাশ করার কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—কামরূপ শত্রুকে দুর্জয় বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—বস্তুতঃ কামে কোনো বল নেই। এটি আত্মার বলে বলীয়ান বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়াদিতে স্থান পেয়ে সেখানে অবস্থান করে ও ঐগুলির বলে বলীয়ান হয়ে রয়েছে। যতক্ষণ বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয় নিজ বশে না আসে, ততক্ষণ তাদের সাহায্যে আত্মার শক্তি কাম-এ সঞ্চারিত হতে থাকে। তাই কাম অত্যন্ত প্রবল বলে মনে করা হয় এবং সেইজন্য একে 'দুর্জয়' বলা হয়েছে ; কিন্তু কামের এই দুর্জয় ভাব ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ না আত্মা নিজ স্বরূপ চিনে বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়াদিকে নিজের বশীভূত না করছে।

প্রশ্ন—এখানে কী অভিপ্রায়ে '**মহাবাহো**' সম্বোধন করা হয়েছে ?

উত্তর—'মহাবাহো' শব্দটি দীর্ঘ বাহুবিশিষ্ট বলবানের বাচক। এটি শৌর্যসূচক শব্দ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 'কাম'কে দুর্জয় বলে তাকে বিনাশ করার নির্দেশ দিয়ে অর্জুনকে 'মহাবাহো' নামে সম্বোধিত করে আত্মার অনন্ত বল স্মরণ করিয়ে দিয়ে সেই সঙ্গে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, 'সমস্ত অনন্তাচিন্ত্য-দিব্যশক্তিগুলির অনন্ত ভাণ্ডার আমি—যাঁর শক্তির ক্ষুদ্র অংশ লাভ করে দেবতা ও লোকপাল সমস্ত বিশ্ব প্রতিপালন করেন এবং শক্তির এক কোটির কলাংশ ভাগ লাভ করে জীব অনন্ত শক্তিময় হয়ে ওঠে—সেই স্বয়ং আমি যখন তোমাকে কাম বিনাশে সমর্থ শক্তিসম্পন্ন বলে নির্দেশ দিচ্ছি, তখন কাম যতই দুর্জয় ও দুর্ধর্ষ শত্রু হোক না কেন, তুমি অত্যন্ত সহজেই তাকে বিনাশ করে বিজয় লাভ করতে সক্ষম।' এই অভিপ্রায়ে এই সম্বোধন করা হয়েছে।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
কর্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩॥

——০——

ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ

চতুর্থ অধ্যায়

(জ্ঞানকর্মসন্ন্যাসযোগ)

অধ্যায়ের নাম

এখানে 'জ্ঞান' শব্দ পরমার্থ-জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের, 'কর্ম' শব্দ কর্মযোগ অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত যোগমার্গের এবং 'সন্ন্যাস' শব্দ সাংখ্যযোগ অর্থাৎ জ্ঞানমার্গের বাচক ; বিবেকজ্ঞান ও শাস্ত্রজ্ঞানও 'জ্ঞান' শব্দের অন্তর্গত। এই চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান তাঁর অবতার গ্রহণের রহস্য ও তত্ত্বসহ কর্মযোগ ও সন্ন্যাসযোগের এবং সবকিছুর ফলস্বরূপ পরমাত্মার তত্ত্বের যে প্রকৃত জ্ঞান, তার বর্ণনা করেছেন ! তাই এই অধ্যায়ের নাম রাখা হয়েছে 'জ্ঞানকর্মসন্ন্যাসযোগ'।

সংক্ষিপ্ত অধ্যায়-সার

এই অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে কর্মযোগের পরম্পরা জানিয়ে তৃতীয় শ্লোকে তার প্রশংসা করা হয়েছে। চতুর্থ শ্লোকে অর্জুন ভগবানের কাছে জন্মবিষয়ক প্রশ্ন করেছেন, পঞ্চমে ভগবান নিজের ও অর্জুনের বহু জন্ম হওয়ার কথা এবং 'সেসব আমি জানি, তুমি জানো না', বলে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টমে নিজ অবতারত্বের রহস্য, তত্ত্ব, সময় ও নিমিত্তের বর্ণনা করেছেন। নবম ও দশমে ভগবানের জন্ম-কর্ম দিব্য বলে বোঝার এবং ভগবানের আশ্রিত হওয়ার ফল যে ঈশ্বরলাভ তা বলেছেন। একাদশে ভগবান তাঁর ভজনকারীদের তেমনভাবেই ভজনা করার কথা বলেছেন। দ্বাদশে অন্য দেবতাদের উপাসনার লৌকিক ফল শীঘ্রপ্রাপ্ত হওয়ার বর্ণনা করেছেন। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশে ভগবান নিজে সমস্ত জগতের কর্তা হলেও তাঁকে বস্তুত অকর্তা জেনে তাঁর কর্মের দিব্যতা ও তা জানার ফল কর্ম দ্বারা আবদ্ধ না হওয়া জানিয়ে পঞ্চদশ শ্লোকে ভূতকালীন মুমুক্ষুদের উদাহরণ দিয়ে অর্জুনকে নিষ্কামভাবে কর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন। ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ পর্যন্ত কর্মের রহস্য বলার অঙ্গীকার করে কর্মের তত্ত্বকে দুর্বিজ্ঞেয় এবং তা জানা আবশ্যক বলে, কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম যাঁরা দেখেন তাঁদের প্রশংসা করেছেন। উনিশ থেকে তেইশতম শ্লোকে কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম দর্শনকারী মহাপুরুষদের এবং সাধকদের ভিন্ন-ভিন্ন লক্ষণ এবং আচরণের বর্ণনা করে তাঁদের প্রশংসা করেছেন। চব্বিশ থেকে ত্রিশতম শ্লোকে ব্রহ্মযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ এবং অভেদ দর্শনরূপ যজ্ঞাদির বর্ণনা করে সমস্ত যজ্ঞকর্তাদের যজ্ঞবেত্তা ও নিষ্পাপ বলেছেন। একত্রিশতমতে সেই যজ্ঞশেষ অনুভবকারীদের সনাতন ব্রহ্মপ্রাপ্তি হওয়ার এবং যারা যজ্ঞ করে না তাদের উভয় লোকে সুখ না হওয়ার কথা বলা হয়েছে। বত্রিশতমতে উপরোক্ত প্রকারে সমস্ত যজ্ঞগুলি ক্রিয়াদ্বারা সম্পাদিত হওয়ার যোগ্য জানিয়ে তেত্রিশতমতে দ্রব্যময় যজ্ঞের থেকে জ্ঞান যজ্ঞকে উত্তম বলেছেন। চৌত্রিশ ও পঁয়ত্রিশতমতে অর্জুনকে জ্ঞানী মহাত্মাদের কাছে গিয়ে তত্ত্বজ্ঞান শেখার কথা বলে তত্ত্বজ্ঞানের প্রশংসা করেছেন। ছত্রিশতমতে জ্ঞাননৌকা দ্বারা পাপসমুদ্র পার হওয়ার কথা বলেছেন। সাঁইত্রিশতমতে জ্ঞান অগ্নির ন্যায় কর্মকে ভস্ম করে বলে জানিয়েছেন। আটত্রিশতমতে জ্ঞানের মহাপবিত্রতার বর্ণনা করে শুদ্ধান্তঃকরণ কর্মযোগীদের স্বতঃই তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তির কথা বলেছেন। উনচল্লিশতমতে শ্রদ্ধাদি গুণে যুক্ত পুরুষ জ্ঞানপ্রাপ্তির অধিকারী এবং জ্ঞানের পরম ফল শান্তি জানিয়ে চল্লিশতম শ্লোকে অজ্ঞ ও অশ্রদ্ধাসম্পন্ন সংশয়াত্মা পুরুষের নিন্দা করে একচল্লিশতমতে সংশয়রহিত কর্মযোগীকে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কথা বলেছেন এবং বিয়াল্লিশতমতে অর্জুনকে জ্ঞান খড়্গের সাহায্যে অজ্ঞতাজনিত সংশয় সর্বতোভাবে বিনাশ করে কর্মযোগে দৃঢ় থাকার জন্য আজ্ঞা দিয়ে নির্দেশপূর্বক যুদ্ধ করবার প্রেরণা দিয়ে এই অধ্যায়ের উপসংহার করেছেন।

সম্বন্ধ—তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোক থেকে উনত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত ভগবান বহু প্রকারে বিহিত কর্মাচরণের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করে ত্রিশতম শ্লোকে অর্জুনকে ভক্তিপ্রধান কর্মযোগের বিধি দ্বারা মমতা, আসক্তি ও কামনা সর্বতোভাবে ত্যাগ করে ভগবদর্পণ বুদ্ধি দ্বারা কর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর একত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত ঐ সিদ্ধান্ত অনুসারে যারা কর্ম করে তাদের প্রশংসা এবং যারা সেরূপ করে না তাদের নিন্দা করে রাগ-দ্বেষের

বশীভূত না হতে বলেছেন এবং স্বধর্মপালনের ওপর জোর দিয়েছেন । পরে ছত্রিশতম শ্লোকে অর্জুনের জিজ্ঞাসায় সাঁইত্রিশতম থেকে অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত কামই সমস্ত অনর্থের হেতু জানিয়ে বুদ্ধিপূর্বক ইন্দ্রিয় ও মনকে বশীভূত করে কামকে বধ করার নির্দেশ দিয়েছেন ; কিন্তু কর্মযোগের তত্ত্ব অত্যন্ত গহন, তাই এবার ভগবান পুনরায় তার সম্পর্কে নানাকথা বলার উদ্দেশ্যে তারই প্রকরণ আরম্ভ করতে গিয়ে তিনটি শ্লোকে সেই কর্মযোগের পরম্পরা জানিয়ে সেটির অনাদিত্ব প্রমাণ করে তার প্রশংসা করেছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্ ।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন— আমি এই অবিনাশী যোগ সূর্যকে বলেছিলাম ; সূর্য তাঁর পুত্র বৈবস্বত মনুকে এবং মনু তাঁর পুত্র রাজা ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন ॥১॥

প্রশ্ন—এখানে **'ইমম্'** বিশেষণের সঙ্গে **'যোগম্'** পদ কোন্ যোগের বাচক—কর্মযোগ না সাংখ্যযোগের ?

উত্তর—দ্বিতীয় অধ্যায়ের উনচল্লিশতম শ্লোকে কর্মযোগের বর্ণনা আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত করে ভগবান ঐ অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত কর্মযোগ ভালোভাবে প্রতিপাদন করেছেন । তার পরে তৃতীয় অধ্যায়ে অর্জুনের জিজ্ঞাসার উত্তরে কর্ম করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বহু যুক্তি দেখিয়ে ত্রিশতম শ্লোকে তাঁকে ভক্তিপূর্বক কর্মযোগ অনুযায়ী যুদ্ধ করতে নির্দেশ দেন এবং তাতে মনকে বশে রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন জানিয়ে অধ্যায়ের শেষেও বুদ্ধি দ্বারা মনকে বশীভূত করে কামরূপ শত্রু বধ করতে বলেছেন ।

তাতে মনে হয় যে তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত বিভিন্নভাবে প্রায়শঃ কর্মযোগেরই প্রতিপাদন করা হয়েছে এবং **'ইমম্'** পদটি যার প্রকরণ চলছে, তারই বাচক হওয়া উচিত । অতএব বুঝতে হবে যে এখানে **'ইমম্'** বিশেষণের সঙ্গে **'যোগম্'** পদ 'কর্মযোগে'রই বাচক ।

এতদ্ব্যতীত এই যোগের পরম্পরা বলতে গিয়ে ভগবান এখানে **'সূর্য'** এবং **'মনু'** প্রমুখের নামের উল্লেখ করেছেন, তাঁরা সকলে গৃহস্থ এবং কর্মযোগী ছিলেন এবং পরে এই অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে ভূতকালীন মুমুক্ষুদের উদাহরণ দিয়েও ভগবান অর্জুনকে কর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন । অতএব এখানে **'ইমম্'** বিশেষণের সঙ্গে **'যোগম্'** পদটি কর্মযোগেরই বাচক মেনে নেওয়া উপযুক্ত মনে হয় ।

প্রশ্ন— তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে ভগবান **'আত্মানম্ আত্মনা সংস্তভ্য'** —আত্মার দ্বারা আত্মাকে নিরুদ্ধ করে —এই কথার দ্বারা যেন সমাধিস্থ হতে বলেছেন এবং **'যুজ্ সমাধৌ'**-এর অনুসারে 'যোগ' শব্দের অর্থও সমাধি হয় ; সুতরাং এখানে যোগের অর্থ মন-ইন্দ্রিয়াদি সংযম করে সমাধিস্থ হওয়া মেনে নিলে ক্ষতি কী ?

উত্তর—ওখানে ভগবান আত্মার দ্বারা আত্মাকে নিরুদ্ধ করে অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা মনকে বশ করে কামরূপ দুর্জয় শত্রুকে নাশ করার নির্দেশ দিয়েছেন । কর্মযোগে নিষ্কাম ভাবই মুখ্য, তা কাম (কামনা) নাশ করলেই সিদ্ধ হতে পারে । মন ও ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত করা কর্মযোগীর পক্ষে পরম আবশ্যক মানা হয় (২।৬৪) । সুতরাং বুদ্ধির দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়কে বশ করা ও কামকে নাশ করা —এসব কর্মযোগেরই অঙ্গ ।

উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর অনুসারে ওখানে ভগবানের বক্তব্য ছিল কর্মযোগের সাধন করার জন্যই, তাই এখানে যোগের অর্থ হঠযোগ বা সমাধিযোগ মনে না করে কর্মযোগই মানা উচিত ।

প্রশ্ন—এই যোগ আমি সূর্যকে বলেছিলাম, সূর্য মনুকে বলেছিলেন এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন —এখানে এই কথাটি বলার উদ্দেশ্য কী ?

উত্তর—মনে হয় এই যোগের পরম্পরা জানাবার জন্য এবং এই যোগ সর্বপ্রথম ইহলোকে ক্ষত্রিয়েরা প্রাপ্ত করেছিলেন—এটি জানাবার জন্য এবং কর্মযোগের অনাদিত্ব প্রমাণ করার জন্যই ভগবান এই কথাগুলি বলেছিলেন।

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ॥ ২

হে পরন্তপ অর্জুন ! এইভাবে পরম্পরা ক্রমে এই যোগ রাজর্ষিগণ জেনেছিলেন ; কিন্তু তারপর দীর্ঘকাল ধরে পৃথিবী থেকে এই যোগ লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে ॥২॥

প্রশ্ন—এই ভাবে পরম্পরা ক্রমে এই যোগ রাজর্ষিগণ জেনেছিলেন, এই কথাটির কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—এর অভিপ্রায় এই যে, একে অপরের থেকে শিক্ষা লাভ করে বংশানুক্রমিক ভাবে শ্রেষ্ঠ রাজাগণ এই কর্মযোগের আচরণ করেছিলেন ; সেই সময় এর রহস্য বোঝা অত্যন্ত সহজ ছিল, কিন্তু এখন আর তা নেই।

প্রশ্ন—'রাজর্ষি' কাকে বলা হয় ?

উত্তর—যিনি রাজা এবং ঋষি দুই-ই অর্থাৎ যিনি রাজা হয়েও বেদমন্ত্রের অর্থের তত্ত্ব জানেন, তাঁকেই 'রাজর্ষি' বলা হয়।

প্রশ্ন—এই যোগ রাজর্ষিগণ জেনেছিলেন, এই বক্তব্যের অভিপ্রায় কি এই যে অন্য কেউ এটি জানেনি ?

উত্তর—সে কথা নয়, কারণ এটি অন্যকে জানানোতে নিষেধ করা হয়নি। তবে এটা ঠিক যে কর্মযোগের তত্ত্ব উপলব্ধিতে রাজর্ষিগণের প্রাধান্য মানা হয়েছে ; তাই ইতিহাসে দেখা যায় যে অন্য ব্যক্তিরাও রাজর্ষিগণের কাছেই কর্মযোগের তত্ত্ব শিক্ষালাভ করতেন। সুতরাং এখানে ভগবানের বলার এই উদ্দেশ্য মনে হয় যে রাজাগণ প্রথম থেকেই এই কর্মযোগের অনুষ্ঠান করে আসছেন। তুমিও রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেছ, তাই তোমারও এতে অধিকার আছে এবং এটি তোমার পক্ষে সহজসাধ্য হবে।

প্রশ্ন—দীর্ঘকাল ধরে এই যোগ ইহলোকে লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে, এই কথাটির রহস্য কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান দেখিয়েছেন যে, যতদিন এই পরম্পরা চলে আসছিল, ততদিন পৃথিবীতে এই কর্মযোগের প্রচার ছিল। তারপর যেমনই লোকেদের মধ্যে ভোগাসক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে, তেমনই কর্মযোগের অধিকারীদের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে ; এই ভাবে হ্রাস হতে হতে শেষকালে কর্মযোগের সেই কল্যাণকর পরম্পরা নষ্ট হয়ে গেছে। তাই তার তত্ত্ব বোঝাবার ও ধারণ করার মতো লোক ইহলোকে বহুকাল আগেই যেন লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে।

প্রশ্ন—প্রথম শ্লোকে তো **'যোগম্'**-এর সঙ্গে **'অব্যয়ম্'** বিশেষণ ব্যবহার করে এই যোগকে অবিনাশী বলা হয়েছে এবং এখানে বলেছেন যে সেটি নষ্ট হয়ে গেছে, এই পরস্পর বিরোধী কথার অর্থ কী ? যদি এটি অবিনাশী হয়, তাহলে তার বিনাশ হওয়া উচিত নয় আর যদি বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তবে সেটি অবিনাশী হয় কী করে ?

উত্তর—পরমাত্মা প্রাপ্তির সাধনরূপ কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদি যত প্রকার সাধন আছে—সবই নিত্য ; এগুলি কখনও অনিত্য হয় না। পরমেশ্বর যখন নিত্য, তখন তাঁর প্রাপ্তির জন্য তাঁরই স্থির করা অনাদি নিয়ম কখনও অনিত্য হতে পারে না। যখনই জগতের উদ্ভব হয়, ভগবানের সমস্ত নিয়মও সেই সঙ্গে তখনই প্রকটিত হয়ে যায়। যখন জগতে প্রলয় হয়, তখন সমস্ত নিয়মও লয়প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু তার অভাব কখনও হয় না। এইভাবে এই কর্মযোগের অনাদিত্ব প্রমাণ করার জন্য আগের শ্লোকে একে অবিনাশী বলা হয়েছে। তাই এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে সেই যোগ বহুকাল আগে নষ্ট হয়ে গেছে—এর অর্থ এই বুঝতে হবে যে, বহুকাল ধরে এই পৃথিবীতে এর তত্ত্ব বোঝার মতো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির দেখা পাওয়া যায় না। এই জন্য সেটি অপ্রকাশিত হয়ে গেছে, ইহলোকে তা অন্তর্ধান করেছে, এমন নয় যে তার অভাব হয়েছে, কারণ সৎ বস্তুর কখনও অভাব হয় না ; পূর্বশ্লোকের বক্তব্য অনুযায়ী সৃষ্টির আদিতে ভগবান হতে এর উদ্ভব হয়, মধ্য কালে নানাকারণবশতঃ এর কখনও অপ্রকাশ, কখনও প্রকাশ, কখনও বিকাশ ঘটে। এইভাবে নানারূপ হয়ে এটি প্রলয়ের সময় অখিল জগতের ভগবানেই বিলীন হয়ে যায়। একেই বিনাশ বা অদৃশ্য হওয়া বলে ; বাস্তবে এটি অবিনাশী, অতএব এর কখনও বিনাশ হয় না।

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩

তুমি আমার ভক্ত ও প্রিয় সখা, তাই এই পুরাতন যোগ আজ আমি তোমাকে বললাম ; কারণ এটি অতি উত্তম রহস্য অর্থাৎ গোপন রাখার বিষয় ॥৩॥

প্রশ্ন—তুমি আমার ভক্ত ও সখা, এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—এই কথার দ্বারা ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে, তুমি আমার চিরকালের অনুগত ভক্ত এবং প্রিয় সখা । তাই তোমার কাছে অত্যন্ত গোপনীয় বিষয়ও প্রকাশ করে দিচ্ছি, সব মানুষের কাছে এই রহস্য প্রকাশ করা যায় না ।

প্রশ্ন—সেই পুরাতন যোগ আজ আমি তোমাকে বলছি, এই বাক্যের কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—এই বাক্যে 'সঃ এব' এবং 'পুরাতনঃ' — এই পদগুলির প্রয়োগ দ্বারা এই যোগের অনাদিত্ব প্রমাণ করা হয়েছে । 'তে' পদ দ্বারা অর্জুনের অধিকার নিরূপণ করা হয়েছে এবং 'অদ্য' পদ দ্বারা এই যোগের উপদেশের সময় বলা হয়েছে । অর্থাৎ যে যোগের কথা আমি আগে সূর্যকে বলেছিলাম এবং যার পরম্পরা অনাদি কাল থেকে চলে আসছে, সেই পুরাতন যোগ, তোমাকে অত্যন্ত ব্যাকুল ও শরণাগত জেনে তোমার শোক নিবৃত্তিপূর্বক কল্যাণ প্রাপ্তি করাবার জন্য এই যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তোমাকে বলছি । শরণাগতির সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃস্থলের ব্যাকুলতাপূর্ণ জিজ্ঞাসাও এমন এক সাধনা যা মানুষকে পরম অধিকারী করে তোলে । তুমি আজ তোমার সেই অধিকার সত্য সত্যই প্রমাণ করে দিয়েছ (২।৭) ; এর আগে কখনো এমন হয়নি, তাই জন্যই আমি এখন তোমার কাছে এই রহস্য উদ্ঘাটিত করলাম ।

প্রশ্ন—এটি অতীব উত্তম রহস্য, এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে, এই যোগ সর্বপ্রকার দুঃখ ও বন্ধন থেকে মুক্ত করে পরমানন্দস্বরূপ আমাকে—পরমেশ্বরকে, সহজেই প্রাপ্ত করিয়ে দেয়, তাই এটি অত্যন্ত উত্তম এবং অত্যন্ত গোপনীয় । এছাড়া এর আরও একটি ভাবার্থ এই যে, নিজেকে সূর্যাদির প্রতি এই যোগের উপদেশপ্রদানকারী বলে এবং এই যোগই আমি তোমাকে বলেছি, তুমি আমার ভক্ত—একথা বলে, আমি যে বাস্তবিক আমার ঈশ্বর-ভাব প্রকটিত করছি—এ হল অত্যন্ত গোপনীয় বিষয়। অতএব অনধিকারীর কাছে এবিষয় কখনো প্রকাশ করা উচিত নয় ।

সম্বন্ধ— উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা মানুষের মনে স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন হতে পারে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তো এই দ্বাপরযুগে প্রকটিত হয়েছেন আর সূর্যদেব, মনু ইক্ষ্বাকু তো বহু আগে প্রকট হয়েছেন ; তবে শ্রীকৃষ্ণ কী করে এই যোগের উপদেশ সূর্যকে দিয়েছিলেন ? তাই এর সমাধানের সঙ্গেই ভগবানের অবতার-তত্ত্ব ভালোভাবে বোঝার জন্য অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—

অর্জুন উবাচ

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪

অর্জুন বললেন—আপনার জন্ম তো এখন—এই যুগে আর সূর্যের জন্ম তো বহু পূর্বে অর্থাৎ কল্পের আদিতে হয়েছে । তাহলে আমি একথা কী করে বুঝব যে আপনিই কল্পের আদিতে এই যোগের কথা সূর্যকে বলেছিলেন ? ৪

প্রশ্ন—এই শ্লোকে অর্জুনের প্রশ্নের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যদিও অর্জুন আগে থেকেই জানতেন যে শ্রীকৃষ্ণ কোনো সাধারণ মানুষ নন, তিনি দিব্য মানবরূপে প্রকাশিত সর্বশক্তিমান পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা, কারণ অর্জুন রাজসূয় যজ্ঞের সময় ভীষ্মের কাছে ভগবানের মহিমা শুনেছিলেন (মহাভারত, সভাপর্ব ৩৮।২৩।২৯) এবং অন্য ঋষিদের কাছেও এই বিষয়ে অনেক কথা শুনে নিয়েছেন। সেই জন্যই বনবাসকালে তিনি নিজে ভগবানের সঙ্গে তাঁর মহত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছিলেন (মহাভারত, বনপর্ব ১২।১১-৪৩)। তাছাড়া শিশুপাল প্রভৃতিদের বধ করায় এবং আরও নানা ঘটনাতে ভগবানের অদ্ভুত প্রভাবও তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও ভগবানের স্বমুখ থেকে তাঁর অবতার রহস্য শোনবার এবং সর্বসাধারণের মনে আসা জিজ্ঞাসা দূর করার জন্য অর্জুন এই প্রশ্ন করেছেন। অর্জুনের জিজ্ঞাসার অর্থ হল এই যে, আপনি কিছু কাল আগে কয়েক বৎসর পূর্বে শ্রীবসুদেবের গৃহে জন্মগ্রহণ করেছেন, একথা প্রায় সকলেই জানে এবং সূর্যের উৎপত্তি সৃষ্টির আদিতে—অদিতির গর্ভে হয়েছিল, সেই অবস্থায় এর রহস্য না বুঝে এরূপ অসম্ভব কথা কী করে মানা সম্ভব যে আপনি এই যোগ সৃষ্টির আদিতে সূর্যকে বলেছিলেন ? এবং তখন থেকে এটির পরম্পরা শুরু হয়েছে ! অতএব কৃপা করে এর রহস্য বুঝিয়ে আমাকে কৃতার্থ করুন।

সম্বন্ধ—অর্জুনের এরূপ জিজ্ঞাসায় ভগবান তাঁর অবতার-তত্ত্বের রহস্য বোঝাবার জন্য নিজের সর্বজ্ঞতা প্রকট করে বলেছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥ ৫

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে পরন্তপ অর্জুন ! আমার এবং তোমার বহুজন্ম হয়েছে ; সে সব তুমি জানো না, কিন্তু আমি জানি ॥ ৫

প্রশ্ন—আমার ও তোমার বহুবার জন্ম হয়েছে, এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে, আমি ও তুমি এখনই জন্মেছি, আগে ছিলাম না—এমন নয়। আমরা অনাদি ও নিত্য। আমার নিত্য স্বরূপ তো আছেই ; এতদ্ব্যতীত আমি মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ এবং বামন প্রভৃতি নানারূপে আগে প্রকটিত হয়েছি। আমার এই বসুদেবের গৃহে জন্মগ্রহণ করা এখনকার হলেও, এর আগেও আমার বিভিন্ন রূপে প্রকাশ হওয়া, অসংখ্য পুরুষকে নানাপ্রকার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তাই আমি যে বলেছি, এই যোগ আমিই প্রথমে সূর্যকে বলেছিলাম, এতে তোমার কোনো আশ্চর্য এবং অসম্ভব বলে মানা উচিত নয়। এর অভিপ্রায় এটিই বোঝা উচিত যে কল্পের আদিতে আমি নারায়ণরূপে সূর্যকে এই যোগ বলেছিলাম।

প্রশ্ন—তাদের সকলকে তুমি জান না, কিন্তু আমি জানি—এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—এই কথাটির দ্বারা ভগবান তাঁর সর্বজ্ঞতা এবং জীবেদের অল্পজ্ঞতার দিক দর্শন করিয়েছেন। অর্থ হলে যে আমি কি কি কারণে কোন্ কোন্ রূপে প্রকটিত হয়ে কোন্ কোন্ সময়ে কি কি লীলা করেছি, সর্বজ্ঞ না হওয়ায় তুমি সেসব জানো না ; আমার এবং তোমার পূর্বজন্মের স্মৃতি তুমি বিস্মরণ হয়েছ, তাই তুমি এইরূপ প্রশ্ন করছ, কিন্তু জগতের কোনো ঘটনাই আমার কাছে লুক্কায়িত নেই ; অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবই আমার কাছে বর্তমান। আমি সকল জীব এবং তাদের সকল বিষয় ভালোভাবে জানি (৭।২৬), কারণ আমি সর্বজ্ঞ। সুতরাং আমি যে বলছি, আমিই কল্পের আদিতে এই যোগ-উপদেশ সূর্যকে দিয়েছিলাম, এ বিষয়ে তোমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকা উচিত নয়।

সম্বন্ধ—ভগবানের মুখ থেকে এই কথা শুনে অর্থাৎ 'এখন পর্যন্ত আমার অনেক জন্ম হয়েছে'—জানার ইচ্ছা হয় যে আপনার জন্ম কীভাবে হয় এবং আপনার জন্ম নেওয়ার সঙ্গে অন্য লোকের জন্ম নেওয়ার কী পার্থক্য। সেই কথাটি বোঝাবার জন্য ভগবান তাঁর জন্মের তত্ত্ব বলছেন—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্ ।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬

আমি জন্মরহিত, অবিনাশী স্বরূপ এবং সর্বপ্রাণীর ঈশ্বর হওয়া সত্ত্বেও নিজ প্রকৃতিকে অধীন করে নিজ যোগমায়ার দ্বারা প্রকটিত হই ॥ ৬

প্রশ্ন—'অজঃ', 'অব্যয়াত্মা' এবং 'ভূতানামীশ্বরঃ'—এই পদগুলির সঙ্গে 'অপি' এবং 'সন্' প্রয়োগ করে এখানে কী ভাব দেখানো হয়েছে?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান দেখিয়েছেন যে, যদিও আমি জন্মরহিত এবং অবিনাশী—প্রকৃতপক্ষে আমার কখনও জন্ম বা বিনাশ হয় না, তা সত্ত্বেও আমি সাধারণ মানুষের মতো জন্ম নিই এবং বিনাশপ্রাপ্ত হই বলে প্রতীয়মান হই। অভিপ্রায় হল যে, আমার অবতার-তত্ত্ব যারা বোঝে না, সেই সব ব্যক্তি, যখন আমি মৎস, কূর্ম, বরাহ, মানুষ ইত্যাদিরূপে প্রকটিত হই, তখন তারা মনে করে আমার জন্ম হয়েছে আবার আমি যখন অন্তর্ধান করি, তারা মনে করে আমার বিনাশপ্রাপ্তি হয়েছে। আমি যখন সেই সেই রূপে দিব্য লীলা করি, তখন তারা আমাকে তাদের মতো সাধারণ মানুষ মনে করে আমায় তিরস্কার করে (৯।১১)। সেসব বেচারী বুঝতে পারে না যে ইনিই সর্বশক্তিমান সর্বেশ্বর, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা এবং জগতের কল্যাণের নিমিত্ত এই রূপে প্রকটিত হয়ে লীলা করছেন ; কারণ আমি সেই সময় যোগমায়ার অন্তরালে লুকিয়ে থাকি (৭।২৫)।

প্রশ্ন—এখানে 'স্বাম্' বিশেষণের সঙ্গে 'প্রকৃতিম্' পদ কার এবং 'আত্মমায়য়া' কীসের বাচক, এই দুটিতে কী পার্থক্য?

উত্তর—ভগবানের শক্তিরূপ যে মূল প্রকৃতি, যার বর্ণনা নবম অধ্যায়ের সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকে করা হয়েছে এবং যাকে চতুর্দশ অধ্যায়ে 'মহদ্‌ব্রহ্ম' বলা হয়েছে, সেই 'মূল প্রকৃতি'র বাচক এখানে 'স্বাম্' বিশেষণের সঙ্গে 'প্রকৃতিম্' পদটি। ভগবান তাঁর যে যোগশক্তির দ্বারা সমস্ত জগৎ ধারণ করে আছেন, যে অসাধারণ শক্তি দ্বারা তিনি নানাপ্রকার রূপ ধারণ করে লোকের সামনে প্রকটিত হন, যাঁর আবরণে লুকিয়ে থাকার জন্য লোক তাঁকে চিনতে পারে না, সপ্তম অধ্যায়ের পঁচিশতম শ্লোকে যাকে 'যোগমায়া' বলে অভিহিত করা হয়েছে—তারই বাচক এই 'আত্মমায়য়া' পদটি। 'মূলপ্রকৃতি' কে অধীন করে নিজ যোগশক্তির দ্বারাই ভগবান অবতীর্ণ হন।

মূলপ্রকৃতি জগৎ উৎপন্নকারী, আর ভগবানের এই যোগমায়া তাঁর অত্যন্ত প্রভাবশালী, ঐশ্বর্যময় শক্তি। এই হল দুটির মধ্যে পার্থক্য।

প্রশ্ন—আমি নিজ প্রকৃতিকে অধীন করে নিজ যোগমায়া দ্বারা প্রকটিত হই, এই কথাটির কী অভিপ্রায়?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান সাধারণ জীবের থেকে তাঁর জন্মের বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। অভিপ্রায় হল যে, জীব যেমন প্রকৃতির বশীভূত হয়ে নিজ নিজ কর্মানুসারে উচ্চ-নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ও সুখ-দুঃখ ভোগ করে, আমার জন্ম সেরূপ নয়। আমি নিজ প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হয়ে নিজেই যোগমায়া দ্বারা সময়-সময়ে দিব্য লীলা করার জন্য আবশ্যক মতো রূপ ধারণ করি ; আমার সেই জন্ম স্বতন্ত্র ও দিব্য হয়ে থাকে, জীবদের মতো আমি কর্মে পরাধীন নই।

প্রশ্ন—সাধারণ জীবেদের জন্ম-মরণে এবং ভগবানের প্রকটিত হওয়া ও অন্তর্ধান করায় কী পার্থক্য?

উত্তর—সাধারণ জীবদের জন্ম ও মৃত্যু তাদের কর্ম অনুসারে হয়, ইচ্ছানুযায়ী নয়। তাদের মাতৃগর্ভে থেকে কষ্ট ভোগ করতে হয়। জন্মের সময় তাদের মাতৃযোনির মাধ্যমে সশরীরে বাইরে আসতে হয়। তারপর ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে শরীর নাশ হলে মৃত্যুলাভ করে এবং

পুনরায় কর্মানুসারে দ্বিতীয় যোনিতে জন্ম গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু ভগবানের প্রকটিত হওয়া ও অন্তর্ধান করা এর থেকে অত্যন্ত বিশিষ্টতাপূর্ণ হয় এবং তা তাঁর ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে ; ইনি যখন চাইবেন, যেখানে চাইবেন, যে রূপে প্রকটিত হতে চান এবং অন্তর্ধানও করতে পারেন ; এক মুহূর্তে ছোট থেকে বড়ো হয়ে যান আবার বড়ো থেকে ছোট, ইচ্ছানুসারে রূপ পরিবর্তন করতে পারেন। তার কারণ হল তিনি প্রকৃতির দ্বারা আবদ্ধ নন, প্রকৃতিই তাঁর ইচ্ছা পালন করে। তাই তিনি একাদশ অধ্যায়ে অর্জুনের প্রার্থনায় যেমন বিশ্বরূপ ধারণ করেছিলেন, তেমনই তা সম্বরণ করে চতুর্ভুজরূপে প্রকটিত হলেন, তারপর মনুষ্যরূপে দর্শন দিলেন—এতে যেমন কেবল এক রূপে প্রকটিত হওয়া ও অন্য রূপকে লুকিয়ে ফেলা, জন্ম-মৃত্যু নেই—তেমনই ভগবানের যে কোনো রূপে প্রকটিত এবং অন্তর্হিত হওয়ায় জন্ম-মরণ নেই, এ সবই লীলামাত্র।

প্রশ্ন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম তো মাতা দেবকীর গর্ভে সাধারণ মানুষের মতোই হয়েছিল, তাহলে সাধারণ লোকের জন্ম আর ভগবানের প্রকট হওয়াতে পার্থক্য কী ?

উত্তর—তেমন কথা নয়। শ্রীমদ্ভাগবতের সেই প্রকরণ দেখলে এই জিজ্ঞাসার স্বতঃই সমাধান হয়ে যাবে। ওখানে বলা হয়েছে যে, সেই সময় মাতা দেবকী তাঁর সামনে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ দিব্য দেবরূপে প্রকটিত ভগবানকে দেখেন এবং তাঁর স্তুতি করেন। তরপর মাতা দেবকীর প্রার্থনায় ভগবান শিশুরূপ ধারণ করেন।[১] সুতরাং তাঁর জন্ম সাধারণ মানুষের ন্যায় মাতা দেবকীর গর্ভে হয়নি, তিনি নিজেই প্রকটিত হয়েছিলেন। জন্মধারণের লীলা করার জন্যই এমন ভাব দেখিয়েছিলেন যেন সাধারণ মানুষের মতো ভগবান দশমাস ধরে মাতা দেবকীর গর্ভে ছিলেন এবং সময়মতো জন্মগ্রহণ করলেন।

সম্বন্ধ—ভগবানের শ্রীমুখ থেকে এইভাবে তাঁর জন্মবৃত্তান্ত শুনে প্রশ্ন হতে পারে যে, আপনি কোন্ কোন্ সময়ে এবং কি কি কারণে এইরূপ অবতার রূপ ধারণ করেন। তাতে ভগবান দুটি শ্লোকে নিজের অবতরণের সময়, কারণ ও উদ্দেশ্য জানাচ্ছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭

হে ভারত ! যখনই ধর্মের হানি এবং অধর্মের বৃদ্ধি হয়, তখনই আমি নিজেকে সৃষ্টি করি অর্থাৎ সাকার দেহ ধারণ করে লোকের সামনে প্রকটিত হই ॥ ৭

প্রশ্ন—'যদা' পদটি দুবার প্রয়োগ করার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—ভগবানের অবতারত্ব গ্রহণের কোনো নিশ্চিত সময় নেই যে অমুক যুগে, অমুক বছরে, অমুক মাসে, অমুক দিনে ভগবান প্রকটিত হবেন ; এবং এমন নিয়মও নেই যে এক যুগে কতবার কিরূপে ভগবান প্রকটিত হবেন। এই কথাটি স্পষ্ট করে বলার জন্য এই স্থানে 'যদা' পদটি দুবার ব্যবহৃত হয়েছে। অভিপ্রায় হল, ধর্মের হ্রাস এবং অধর্মের বৃদ্ধির ফলে যখন যেসময় ভগবান তাঁর প্রকট হওয়া প্রয়োজন মনে করেন, তখনই

---

[১] উপসংহর বিশ্বাত্মন্নদো রূপমলৌকিকম্। শঙ্খচক্রগদাপদ্মশ্রিয়া জুষ্টং চতুর্ভুজম্॥

'হে বিশ্বাত্মন্ ! শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শোভাযুক্ত চতুর্ভুজসম্পন্ন আপনার অলৌকিক দিব্যরূপকে এবার সংহরণ করুন।'

* * * *

ইত্যুক্ত্বাসীদ্ধরিস্তূষ্ণীং ভগবানাত্মমায়য়া। পিত্রোঃ সম্পশ্যতোঃ সদ্যো বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩।৩০, ৪৬)

'এই কথা বলে ভগবান শ্রীহরি চুপ করে গেলেন এবং মাতা পিতার সামনেই দেখতে দেখতে তিনি তাঁর মায়ার সাহায্যে তৎক্ষণাৎ এক সাধারণ শিশুর মতো হয়ে গেলেন।'

প্রকটিত হন।

প্রশ্ন—সেই ধর্মের হানি এবং পাপের বৃদ্ধি কীভাবে হয়, যার জন্য ভগবান অবতার রূপ ধারণ করেন?

উত্তর—কিরূপ ধর্ম-হানি ও পাপ-বৃদ্ধি হলে ভগবান অবতাররূপ গ্রহণ করেন, তা বাস্তবে ভগবানই জানেন, মানুষ এর ঠিকমতো নির্ণয় করতে পারে না। তবে অনুমানে বলা যায় যে যখন ঋষিকল্প, ধার্মিক, ঈশ্বর প্রেমী, সদাচারী পুরুষ এবং নিরপরাধ, নির্বল প্রাণীদের ওপর বলবান ও দুরাচারী মানুষদের অত্যাচার বৃদ্ধি পায় এবং লোকেদের মধ্যে সদ্‌গুণ ও সদাচার হ্রাস পেয়ে দুর্গুণ দুরাচার ছড়িয়ে পড়ে, এটাই হল ধর্মের হ্রাস ও অধর্ম বৃদ্ধির স্বরূপ। সত্যযুগে হিরণ্যকশিপুর শাসনে যখন দুর্গুণ ও দুরাচারের বৃদ্ধি হয়েছিল, নিরপরাধ ব্যক্তিদের কষ্ট দেওয়া হচ্ছিল, লোকেদের ধ্যান, জপ, তপ, পূজা-পাঠ, যজ্ঞ, দান ইত্যাদি শুভকর্ম এবং উপাসনা সবলে বন্ধ করা হয়েছিল, দেবতাদের মারধোর করে তাঁদের স্থান থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল, প্রহ্লাদের ন্যায় ভক্তকে বিনা অপরাধে নানাপ্রকারে কষ্ট দেওয়া হয়েছিল, সেই সময় ভগবান নৃসিংহরূপ ধারণ করেছিলেন এবং ভক্ত প্রহ্লাদকে উদ্ধার করে ধর্ম-স্থাপন করেছিলেন। অন্যান্য অবতারেও এইরূপ বৃত্তান্ত পাওয়া যায়।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮

সাধুব্যক্তিদের রক্ষা করার জন্য, পাপীদের বিনাশের জন্য এবং ভালোভাবে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য, আমি যুগে যুগে অবতাররূপে প্রকটিত হই ॥ ৮

প্রশ্ন—'সাধু' শব্দটি এখানে কীরূপ মানুষদের বাচক এবং তাদের পরিত্রাণ বা উদ্ধার করা কাকে বলে?

উত্তর—যে ব্যক্তি অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ইত্যাদি সমস্ত সাধারণ ধর্মের এবং যজ্ঞ, দান, তপ এবং অধ্যয়ন, প্রজ্ঞাপালন ইত্যাদি নিজ নিজ বর্ণাশ্রম ধর্ম ঠিকমতো পালন করেন; অপরের মঙ্গল করাই যাঁর স্বভাব; যিনি সদ্‌গুণাদির ভাণ্ডার এবং সদাচারী, শ্রদ্ধা ও প্রেমসহকারে ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, প্রভাব, লীলা-শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ ইত্যাদি করেন—সেই ভক্ত মানুষদের বাচক এখানে 'সাধু' শব্দটি। এরূপ ব্যক্তিদের ওপর যেসব দুষ্ট-দুরাচারীরা ভীষণ অত্যাচার করে—সেই অত্যাচারীদের কবল থেকে এই সাধু-ব্যক্তিদের মুক্ত করা, তাঁদের উত্তম গতি প্রদান করা, নিজ দর্শনাদির দ্বারা তাঁদের সঞ্চিত সমস্ত পাপ সমূলে বিনাশ করে তাঁদের পরম কল্যাণ করা, নিজ দিব্য লীলা বিস্তার করে শ্রবণ, মনন, চিন্তন ও কীর্তনাদির দ্বারা সহজে তাঁদের উদ্ধারের পথ প্রশস্ত করা ইত্যাদি সব বিষয়ই সাধু পুরুষদের পরিত্রাণ অর্থাৎ উদ্ধার করার অন্তর্গত।

প্রশ্ন—এখানে **'দুষ্কৃতাম্'** কীরূপ মানুষদের বাচক, এদের বিনাশ করা কীরূপ?

উত্তর—যে ব্যক্তি নিরপরাধ, সদাচারী ও ভগবানের ভক্তদের ওপর অত্যাচার করে, যে ব্যক্তি ছল, কপট, চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি দুর্গুণ-দুরাচারের খনি, যে নানাভাবে অন্যায় করে ধন সংগ্রহ করে, সে নাস্তিক; ভগবান এবং বেদ-শাস্ত্রাদির বিরোধ করাই যার স্বভাব—এরূপ আসুরী স্বভাবসম্পন্ন দুষ্ট ব্যক্তিদের বাচক হল এই **'দুষ্কৃতম্'** পদটি। এরূপ দুষ্ট প্রকৃতির দুরাচারী মানুষদের কুস্বভাব থেকে মুক্ত করার জন্য বা তাদের পাপ থেকে মুক্ত করার জন্য তাদের যে কোনো প্রকারের দণ্ড প্রদান, যুদ্ধের দ্বারা বা অন্য কোনো প্রকারে তাদের এই শরীর থেকে সম্পর্ক-ছেদ করা ইত্যাদি সকল ব্যাপারই তাদের বিনাশ করার অন্তর্গত।

প্রশ্ন—ভগবান তো পরম দয়ালু; তিনি তাঁদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাঁদের স্বভাব শুদ্ধ করতে পারেন না? তাঁদের এই রূপ দণ্ড কেন দেন?

উত্তর—তাঁদের দণ্ডপ্রদান এবং মৃত্যু প্রদান করাতেও (আসুরী শরীর থেকে তাদের সম্পর্ক ছেদ করাতেও) ভগবানের দয়াভাব পূর্ণ থাকে, কারণ ঐ দণ্ড

এবং মৃত্যুর দ্বারাও ভগবান তাদের পাপের বিনাশই করে থাকেন। ভগবানের দণ্ড-বিধানের সম্বন্ধে কখনো একথা মনে করা উচিত নয় যে তার মধ্যে ভগবানের দয়ালুভাবের সামান্যতমও ঘাটতি বা ন্যূনতা আছে। যেমন নিজ সন্তানের হাত, পা বা অঙ্গের কোনো স্থানে ফোড়া হলে মা-বাবা প্রথমে ঔষধ প্রয়োগ করেন ; কিন্তু যখন বুঝতে পারেন যে শুধু ঔষধ প্রয়োগে এটি ভালো হবে না, দেরী হলে সর্বাঙ্গে বিষ ছড়িয়ে পড়বে তখন তাঁরা অন্য অঙ্গ ঠিক রাখার জন্য সেই দূষিত হাত বা পা অপারেশান করিয়ে নেন, প্রয়োজন হলে তা বাদও দিয়ে দেন। তেমনই ভগবানও দুষ্টের দুষ্টামি দূর করার জন্য প্রথমে নীতি অনুযায়ী দুর্যোধনকে বোঝাবার মতো বোঝাতে চেষ্টা করেন, শাস্তির ভয়ও দেখান ; কিন্তু তাতে যখন কাজ হয় না, তার দুষ্টামি আরও বৃদ্ধি পায়, তখন তাকে দণ্ড দিয়ে বা মেরে ফেলে তার পাপের ফল ভোগ করান অথবা যার পূর্বসঞ্চিত কর্ম ভালো থাকে, কিন্তু কোনো বিশেষ কারণে বা কুসঙ্গে পড়ে এই জন্মে দুরাচারী হয়ে উঠেছে, তাকে নিজ হাতে বধ করে মুক্ত করে দেন। এই সকল ক্রিয়াতেই তাঁর পরিপূর্ণ দয়া থাকে।

প্রশ্ন—ধর্মের স্থাপনা করা বলতে কী বুঝায় ?

উত্তর—নিজে শাস্ত্রানুকূল আচরণ করে, বিভিন্ন প্রকারে ধর্মের মহত্ত্ব দেখিয়ে এবং লোকেদের মর্মস্পর্শী অপ্রতিম প্রভাবশালী বাক্যের দ্বারা উপদেশ-আদেশ দিয়ে সকলের অন্তরে বেদ, শাস্ত্র, পরলোক, মহাপুরুষ ও ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা উৎপন্ন করানো এবং সদ্গুণ, সদাচারে বিশ্বাস ও ভালোবাসা উৎপন্ন করে লোকেদের এই সবে দৃঢ়তাপূর্ণ ধারণা করানো ইত্যাদি সবই ধর্ম স্থাপনার অন্তর্গত।

প্রশ্ন—সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্টের সংহার ও ধর্ম স্থাপন—একসঙ্গে এই তিনটির প্রয়োজন হলেই ভগবান অবতীর্ণ হন নাকি কোনো একটি বা দুটি কারণেও হতে পারেন ?

উত্তর—এমন কোনো নিয়ম নেই যে তিনটি কারণ একসঙ্গে উপস্থিত হলেই ভগবান অবতার রূপ ধারণ করবেন ; কোনো একটি বা দুটি উদ্দেশ্য পূরণের জন্যও ভগবান অবতীর্ণ হতে পারেন।

প্রশ্ন—ভগবান তো সর্বশক্তিমান, তিনি অবতার রূপ ধারণ না করেও তো এই সব কাজ করতে পারেন ; তাহলে অবতারের কী প্রয়োজন ?

উত্তর—একথা সর্বতোভাবে সত্য যে ভগবান অবতার গ্রহণ না করেও অনায়াসে এসব করতে পারেন এবং করেনও, কিন্তু লোকেদের ওপর বিশেষ দয়া করে তাঁর দর্শন, স্পর্শ ও বক্তব্যের দ্বারা লোকেদের সহজে উদ্ধার হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য এবং তাঁর প্রেমিক ভক্তদের তাঁর দিব্য লীলা আস্বাদন করাবার জন্য ভগবান সাকার রূপে প্রকটিত হন। সেই অবতারের মধ্যে ধারণ করা রূপ ও তাঁর গুণ, প্রভাব, নাম, মাহাত্ম্য, এবং দিব্য কর্মাদি শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ করে লোক সহজেই সংসার-সমুদ্র পার হতে পারে। এই কাজ অবতার ব্যতীত হওয়া সম্ভব নয়।

প্রশ্ন—আমি যুগে যুগে প্রকটিত হই, এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান দেখিয়েছেন যে আমি প্রত্যেক যুগে যখনই যুগধর্ম থেকে অধিক মাত্রায় ধর্মের হানি হয়, তখনই প্রয়োজন অনুযায়ী বারংবার আমি প্রকটিত হই ; এক যুগে যে একবারই প্রকট হই—এমন কোনো নিয়ম নেই।

সম্বন্ধ—এই ভাবে ভগবান তাঁর দিব্য জন্মের সময়, হেতু ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করে এবার সেই জন্মগুলির এবং তাতে তত্ত্বতঃ তাঁর কর্মের দিব্যতা সম্বন্ধে জানার ফল জানাচ্ছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥ ৯

হে অর্জুন! আমার জন্ম ও কর্ম দিব্য অর্থাৎ নির্মল ও অলৌকিক—এইভাবে যে মানুষ আমাকে তত্ত্বতঃ জেনে যান, তিনি দেহত্যাগ করে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না। তিনি আমাকেই লাভ করেন ॥ ৯

প্রশ্ন—ভগবানের জন্ম দিব্য, এই কথা তত্ত্বতঃ জানা কেমন ?

উত্তর—সর্বশক্তিমান পূর্ণব্রহ্ম পরমেশ্বর বাস্তবে জন্ম ও মৃত্যুর সর্বতোভাবে অতীত। তাঁর জন্ম জীবেদের মতো নয়। তিনি তাঁর ভক্তদের অনুগ্রহ করে তাঁর দিব্য লীলার দ্বারা তাদের মন নিজের দিকে আকর্ষিত করার জন্য দর্শন, স্পর্শ এবং বাণীর দ্বারা তাদের সুখী করার জন্য, জগতে নিজ দিব্য কীর্তি বিস্তার করে তাঁর শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ দ্বারা লোকেদের পাপনাশ করার জন্য এবং জগতের পাপাচারীদের বিনাশ করে ধর্মের স্থাপন করার জন্য জন্মধারণের লীলা করে থাকেন। তাঁর এই জন্ম নির্দোষ ও অলৌকিক, জগতের কল্যাণের নিমিত্ত ভগবান এইভাবে মনুষ্য প্রভৃতি রূপে জগতে প্রকটিত হন ; তাঁর সেই বিগ্রহ প্রাকৃত উপাদান দ্বারা সৃষ্ট হয় না। সেই বিগ্রহ দিব্য, চিন্ময়, প্রকাশমান, শুদ্ধ ও অলৌকিক হয়ে থাকে, তাঁর জন্মের কারণ কোনো গুণ বা কর্ম সংস্কার দ্বারা হয় না। তিনি মায়ার বশ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন না। তিনি নিজ প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হয়ে যোগশক্তি দ্বারা মনুষ্যাদিরূপে শুধুমাত্র লোকেদের দয়া করার জন্যই প্রকটিত হন—এই বিষয় ভালোভাবে বুঝে নেওয়া অর্থাৎ এতে বিন্দুমাত্রও অসম্ভব ব্যাপার ও বিপরীত চিন্তা না করে পূর্ণ বিশ্বাস করা এবং সাকাররূপ প্রকটিত ভগবানকে সাধারণ মানুষ মনে না করে সর্বশক্তিমান, সর্বেশ্বর, সর্বান্তর্যামী, সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দঘন পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা বলে মনে করাই হল ভগবানের জন্মকে তত্ত্বতঃ দিব্য বলে মানা। এই অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে এই কথাই বোঝানো হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ের চব্বিশতম ও পঁচিশতম শ্লোকে এবং নবম অধ্যায়ের একাদশ ও দ্বাদশ শ্লোকে এই তত্ত্ব না বুঝে ভগবানকে সাধারণ মানুষ বলে মনে করা ব্যক্তিদের নিন্দা করা হয়েছে এবং দশম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে যারা এই তত্ত্ব বুঝেছেন তাঁদের প্রশংসা করা হয়েছে।

যে ব্যক্তি ভগবানের জন্মের দিব্যতা এইভাবে তত্ত্বতঃ বুঝে যান, তাঁর পক্ষে ভগবানের বিরহ এক মুহূর্তের জন্যও অসহ্য হয়ে ওঠে। ভগবানে পরম শ্রদ্ধা এবং অনন্য প্রেম থাকায় সেই ব্যক্তি দ্বারা স্বতঃই ভগবানের অনন্যভাবে চিন্তন হতে থাকে।

প্রশ্ন— ভগবানের কর্ম দিব্য, এই কথাটি তত্ত্বতঃ বোঝা মানে কী ?

উত্তর— ভগবান জগৎ-সৃষ্টি ও অবতার লীলা ইত্যাদি যেসব কর্ম করেন, এসবের মধ্যে তাঁর বিন্দুমাত্র স্বার্থ-সম্পর্ক থাকে না। কেবলমাত্র লোকের ওপর অনুগ্রহ করার জন্যই তিনি মনুষ্যরূপ অবতার ধারণ করে নানাবিধ কর্ম করে থাকেন (৩।২২-২৩)। ভগবান নিজ প্রকৃতি দ্বারা সমস্ত কর্ম করেও সেই কর্মের প্রতি তাঁর কর্তৃত্ব-ভাব না থাকায় বাস্তবে তিনি কিছু করেনও না এবং সেসব কর্মে আবদ্ধও হন না। ভগবানের সেই কর্মফলে বিন্দুমাত্রও স্পৃহা থাকে না (৪।১৩-১৪)। ভগবানের সমস্ত কর্ম প্রচেষ্টাই লোকহিতার্থে হয় (৪।৮) ; তাঁর প্রত্যেক কর্মে মানুষের হিতের ভাবনা পূর্ণভাবে থাকে। তিনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু হয়েও সর্বসাধারণের সঙ্গে অভিমানরহিত দয়া ও প্রেমপূর্ণ সম-ব্যবহার করে থাকেন (৯।২৯) ; যে ব্যক্তি যে ভাবে তাঁর ভজনা করে, তিনি নিজেও সেই ভাবেই তাকে ভজনা করেন (৪।১১)। নিজ অনন্যভক্তদের যোগক্ষেম ভগবান স্বয়ং বহন করেন(৯।২২), তাদের দিব্য-জ্ঞান প্রদান করেন (১০।১০-১১) এবং ভক্তিরূপ নৌকায় আসীন ভক্তদের সংসার সমুদ্র থেকে শীঘ্রই উদ্ধার করার জন্য নিজেই তার কর্ণধার হয়ে যান (১২।৭)। এইভাবে ভগবানের সকল কর্ম আসক্তি, অহংকার, কামনাদি দোষ থেকে সর্বতোভাবে বর্জিত, নির্মল, শুদ্ধ ও শুধুমাত্র লোকের কল্যাণ করা এবং নীতি, ধর্ম, শুদ্ধপ্রেম, ভক্তি ইত্যাদি জগতে প্রচার করার জন্যই হয়। এই সব কর্ম করলেও বাস্তবে ভগবানের সেই সব কর্মের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ থাকে না—তিনি সেসব থেকে সর্বতোভাবে অতীত ও অকর্তা—এই কথাগুলি ভালোভাবে বুঝে নেওয়া, এগুলির মধ্যে কোনোপ্রকার বিপরীত চিন্তা না করে পূর্ণ বিশ্বাস রাখাই হল ভগবানের কর্মগুলি তত্ত্বতঃ দিব্য বলে বোঝা।

এই ভাবে জেনে নিলে সেই ব্যক্তিদের কর্মও শুদ্ধ এবং অলৌকিক হয়ে ওঠে অর্থাৎ তখন তারাও সকলের সঙ্গে দয়া, সমতা, ধর্ম, নীতি, বিনয় এবং নিষ্কাম প্রেম-ভাবের আচরণ করেন।

প্রশ্ন—ভগবানের জন্ম-কর্ম উভয়ের দিব্যতা জেনে নিলে তাঁকে পাওয়া যায় নাকি এর মধ্যে একটির দিব্যতার জ্ঞানেও তা হয় ?

উত্তর—উভয়ের মধ্যে কোনো একটির দিব্যতা

জানলেও ঈশ্বর-লাভ হয় (৪।১৪ ; ১০।৩) ; তাহলে দুটির দিব্যতা জেনে গেলে যে তাঁর প্রাপ্তি হবে ; এতে তো বলার কিছু নেই।

প্রশ্ন—যারা এরূপ জেনে যায়, তাদের পুনর্জন্ম হয় না, তারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়—এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—তারা পুনর্জন্ম প্রাপ্ত না হয়ে কোন্ ভাব প্রাপ্ত হয়, তাদের স্থিতি কেমন হয়—এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বলেছেন যে তারা আমাকে (ভগবানকে)-ই প্রাপ্ত হয় এবং যারা ভগবানকে লাভ করে, তাদের আর পুনর্জন্ম হয় না, এটি স্থির সিদ্ধান্ত (৮।১৬)।

প্রশ্ন—এইস্থানে জন্ম-কর্মের দিব্যতা যাঁরা জেনে থাকেন, দেহ-ত্যাগের পর তাঁরা ভগবদ্প্রাপ্তি হন বলা হয়েছে ; তাহলে কি এই জন্মে তাঁরা ভগবানকে পান না ?

উত্তর—এই জন্মে পাওয়া যায় না, সে কথা নয়। তিনি যখনই ভগবানের জন্ম-কর্মের দিব্যতা পূর্ণভাবে জেনে যান, প্রকৃতপক্ষে তখনই তিনি ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে পেয়ে যান ; কিন্তু মৃত্যুর পর তাঁর আর পুনর্জন্ম হয় না, তিনি পরমধামে গমন করেন—এই বিশেষ ভাব বোঝাবার জন্য এখানে এই কথা বলা হয়েছে যে, তিনি দেহ-ত্যাগের পর আমাকেই প্রাপ্ত হন।

সম্বন্ধ—এই ভাবে ভগবানের জন্ম ও কর্মকে তত্ত্বতঃ দিব্য জেনে যাওয়ার যে ফল বলা হয়েছে, তা অনাদি কাল হতে পরম্পরাগত ভাবে চলে আসছে—এই বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য ভগবান বলেছেন—

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০

পূর্বেও যাঁদের আসক্তি, ভয়, ক্রোধ সর্বতোভাবে বর্জন হয়েছে, অনন্য প্রেমপূর্বক যাঁদের আমাতে স্থিতি এবং যাঁরা আমার শরণাপন্ন— এরূপ আমার আশ্রিত বহু ভক্ত জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা পবিত্র হয়ে আমার স্বরূপে স্থিতি লাভ করেছেন ॥ ১০

প্রশ্ন—**'বীতরাগভয়ক্রোধাঃ'** পদটি কীরূপ পুরুষের বাচক আর এখানে এই বিশেষণ প্রয়োগের ভাবার্থ কী ?

উত্তর—আসক্তিকে 'রাগ'বলা হয় ; কোনোরূপ দুঃখের সম্ভাবনায় অন্তঃকরণে যে বিকার উৎপত্তি হয়, তাকে বলা হয় 'ভয়' এবং কেউ কোনো অপকার করলে বা নীতি বিরুদ্ধ বা মনের বিরুদ্ধ কাজ করলে মনে যে উত্তেজনার ভাব হয়, তাকে বলে 'ক্রোধঃ' ; এই তিনটি বিকার যে ব্যক্তির মধ্যে একেবারেই থাকে না, সেসকল ব্যক্তিদের বাচক হল **'বীতরাগভয়ক্রোধাঃ'** পদটি। ভগবানের দিব্য জন্ম ও কর্মের তত্ত্ব জানা ব্যক্তিদের ভগবানে অনন্য প্রেম জন্মায়, তাই ভগবান ব্যতীত অন্য কোনো কিছুতেই তাঁদের আসক্তি থাকে না ; ভগবানের তত্ত্ব জেনে গেলে তাঁদের সর্বত্র ভগবানের প্রত্যক্ষ অনুভব হতে থাকে এবং সর্বত্র ভগবদ্‌বুদ্ধি হওয়ায় তাঁরা সর্বদা সর্বতোভাবে নির্ভয় হয়ে যান ; তাঁদের সঙ্গে যে কেউ যেমন ব্যবহারই করুক না কেন। তাঁরা সে সবই ভগবানের ইচ্ছা বলে মনে করেন এবং জগতের সমস্ত ঘটনাসমূহকে ভগবানের লীলা বলে মনে করেন — সুতরাং কোনো কারণেই তাঁদের অন্তরে ক্রোধরূপ বিকার হয় না। এইভাবে ভগবানের জন্ম ও কর্মের তত্ত্ব জানা ভক্তদের মধ্যে ভগবানের দয়ায় সর্বপ্রকারের দুর্গুণ সর্বতোভাবে দূর হয়ে যায়, এই অর্থে এখানে **'বীতরাগভয়ক্রোধাঃ'** বিশেষণের প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—**'মন্ময়াঃ'**র ভাবার্থ কী ?

উত্তর— ভগবানে অনন্য প্রেম হওয়ায় যাঁরা সর্বত্র একমাত্র ভগবানকেই প্রত্যক্ষ করতে থাকেন, তাঁদের বাচক এই **'মন্ময়াঃ'** পদটি। এই বিশেষণটি প্রয়োগ করে এখানে এই ভাব দেখানো হয়েছে যে ভগবানের জন্ম ও কর্ম দিব্য মনে করে যারা ভগবানকে চিনে নেন, সেই জ্ঞানী ভক্তদের ভগবানে অনন্য প্রেম জন্মায় ; অতএব তাঁরা নিরন্তর ভগবানে তন্ময় হয়ে থাকেন এবং সর্বত্র ভগবানকে প্রত্যক্ষ করে থাকেন।

প্রশ্ন—**'মামুপাশ্রিতাঃ'**র ভাবার্থ কী ?

উত্তর—যাঁরা ভগবানের শরণাগত হন, সর্বতো-

ভাবে তাঁর ওপরে নির্ভর করেন, সর্বদা তাঁতেই সন্তুষ্ট থাকেন, যাঁদের নিজেদের জন্য কোনো কর্তব্যের অবশেষ থাকে না এবং যাঁরা সবই ভগবানের মনে করেন, তাঁর আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে তাঁর সেবার রূপেই সমস্ত কর্ম সম্পাদন করেন, সেইরূপ পুরুষদের বাচক **'মামুপাশ্রিতাঃ'** পদটি। এই বিশেষণ প্রয়োগ করে এখানে এই ভাব দেখানো হয়েছে যে ভগবানের জ্ঞানী ভক্ত সর্বভাবে তাঁর শরণাপন্ন হন, তাঁরা সর্বতোভাবে তাঁর উপরই নির্ভর করে থাকেন এবং শরণাগতির সমস্ত ভাব তাঁদের মধ্যে পূর্ণভাবে বিকশিত হয়।

প্রশ্ন—**'জ্ঞানতপসা'** পদের অর্থ আত্মজ্ঞানরূপ তপস্যা মনে না করে ভগবানের জন্ম-কর্মের জ্ঞান বলে মানার অভিপ্রায় কী এবং সেই জ্ঞানতপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে ভগবানের স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া কাকে বলে ?

উত্তর—এটি সাংখ্যযোগের প্রসঙ্গ নয়, ভক্তির প্রকরণ, পূর্ব শ্লোকে ভগবানের জন্ম-কর্ম দিব্য মনে করার ফল ভগবদ্‌প্রাপ্তি বলা হয়েছে ; সেটি প্রমাণ করার জন্যই এই শ্লোকটি। সেইজন্য এখানে **'জ্ঞানতপসা'** পদে জ্ঞানের অর্থ আত্মজ্ঞান মনে না করে ভগবানের জন্ম-কর্ম দিব্য বলে মনে করাকে জ্ঞান ধরা হয়েছে। এই জ্ঞানরূপ তপস্যার প্রভাবে মানুষের ভগবানে অনন্য প্রেম হয়, তাদের সমস্ত পাপ-তাপ নষ্ট হয়ে যায়, অন্তরের সর্বপ্রকার দুর্গুণ নাশ হয়ে যায় এবং সমস্ত কর্ম ভগবানের কর্মের ন্যায় দিব্য হয়ে ওঠে, তাঁরা কখনো ভগবানের থেকে পৃথক হন না, ভগবান সর্বদাই তাঁদের প্রত্যক্ষে থাকেন—একেই বলা হয়েছে ঐ ভক্তদের জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা পবিত্র হয়ে ভগবানের স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া।

সম্বন্ধ—পূর্বের শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে যারা আমার জন্ম ও কর্মকে দিব্য বলে জেনে নেয়, সেই অনন্য প্রেমিক ভক্তগণ আমাকে লাভ করেন ; তাতে প্রশ্ন হতে পারে যে, তারা আপনাকে কীরূপে এবং কীভাবে প্রাপ্ত হন ? তাই বলেছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥১১

হে অর্জুন ! যে ভক্ত আমাকে যেভাবে ভজনা করেন, আমিও সেইভাবেই তাঁর ভজনা করি ; কারণ সকল মানুষই সর্বতোভাবে আমার পথই অনুসরণ করে ॥১১॥

প্রশ্ন—যে ভক্ত আমাকে যেভাবে ভজনা করেন, আমিও সেইভাবেই তাঁর ভজনা করি—এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথার দ্বারা ভগবানের বলার এই তাৎপর্য যে আমার ভক্তদের ভজনা করার প্রকার ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। নিজ নিজ চিন্তা অনুসারে ভক্তগণ আমার পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপ মেনে থাকেন এবং নিজ নিজ মেনে নেওয়া অনুযায়ী আমার ভজন-স্মরণ করেন, আমিও তাই তাঁদের চিন্তা অনুসারে সেই সেই রূপেই দর্শন দান করি। শ্রীবিষ্ণুরূপের উপাসকদের শ্রীবিষ্ণুরূপে, শ্রীরামরূপের উপাসকদের শ্রীরামরূপে, শ্রীকৃষ্ণরূপের উপাসকদের শ্রীকৃষ্ণরূপে, শ্রীশিবরূপের উপাসকদের শ্রীশিবরূপে, দেবীরূপের উপাসকদের দেবীরূপে এবং নিরাকার সর্বব্যাপীরূপের উপাসকদের নিরাকার সর্বব্যাপী রূপেই প্রকাশিত হই ; এইভাবে যাঁরা মৎস্য, কূর্ম, নৃসিংহ, বামন প্রভৃতি অন্যান্য রূপে উপাসনা করেন—তাঁদের সেই সেই রূপে দর্শন দিয়ে তাঁদের উদ্ধার করে থাকি। এছাড়াও তাঁরা যেরূপে যে ভাবে আমার উপাসনা করেন, আমি তাঁদের প্রতি সেই সেই প্রকার ও সেই সেই ভাবেই অনুসরণ করে থাকি। যিনি আমাকে চিন্তা করেন, আমি তাঁর চিন্তা করি। যিনি আমার জন্য ব্যাকুল হন, আমিও তাঁর জন্য ব্যাকুল হই। যিনি আমার বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারেন না, আমিও তাঁর বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারি না। যিনি তাঁর সর্বস্ব আমাকে অর্পণ করেন, আমিও তাঁকে আমার সর্বস্ব অর্পণ করি। যাঁরা গোপবালকদের ন্যায় আমাকে নিজের সখা মনে করে

আমরা ভজনা করেন, তাঁদের সঙ্গে আমি বন্ধুর মতো ব্যবহার করি। যিনি নন্দ-যশোদার মতো পুত্র মনে করে আমার ভজনা করেন, তাঁর সঙ্গে আমি পুত্রের মতোই আচরণ করে তাঁর কল্যাণ করে থাকি। তেমনই রুক্মিণীর ন্যায় পতি মনে করে ভজনকারীদের সঙ্গে পতির মতো, হনুমানের ন্যায় প্রভু মনে করে ভজনাকারীদের সঙ্গে প্রভুর মতো এবং গোপিনীদের মতো মাধুর্য ভাবে ভজনাকারীদের সঙ্গে প্রিয়তমের মতো ব্যবহার করে তাঁদের কল্যাণ করি এবং তাঁদের আমার দিব্য লীলা রস আস্বাদন করাই।

প্রশ্ন—মানুষ সর্বভাবে আমার পথই অনুসরণ করে, এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—ভগবান এর দ্বারা বলেছেন যে, লোকে আমাকে অনুসরণ করে, তাই যদি আমি এইরূপ প্রেম ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করি তাহলে অন্য লোকেরাও আমায় দেখে এরূপই নিঃস্বার্থভাবে একে অপরের সঙ্গে যথাযোগ্য প্রেম ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করবে। অতএব এই নীতি জগতে প্রচার করার জন্যই আমার এরূপ করা কর্তব্য, কারণ জগতে ধর্মস্থাপন করার জন্যই আমি অবতার-রূপ ধারণ করেছি (৪।৮)।

সম্বন্ধ—যদি এটিই সত্য হয়, তাহলে লোকে ভগবানের ভজনা না করে অন্য দেবতাদের উপাসনা করেন কেন ? তাতে তিনি বলেছেন—

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা ॥১২

এই মনুষ্যলোকে কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষী মানুষ দেবতাগণের পূজা করেন, কারণ কর্মজনিত সিদ্ধি তাঁরা শীঘ্রই লাভ করেন ॥১২॥

প্রশ্ন—'**ইহ মানুষে লোকে**'র কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যজ্ঞাদি কর্মদ্বারা ইন্দ্র প্রমুখ দেবতাদের উপাসনা করার অধিকার মানুষেরই থাকে, অন্য প্রাণীর নয়—এই ভাব দেখাবার জন্য এখানে '**ইহ**' এবং '**মানুষে**'র সঙ্গে '**লোকে**' পদের প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরা দেবতাদের পূজা করেন, কারণ তাঁদের কর্ম হতে উৎপন্ন হওয়া ফলের সিদ্ধি শীঘ্রই পাওয়া যায়—এই বাক্যটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে, যাঁদের সাংসারিক ভোগাসক্তি থাকে ; যাঁরা তাঁদের কৃতকর্মের ফল স্ত্রী, পুত্র, ধন, আবাস, বা মান-মর্যাদারূপে পেতে ইচ্ছুক—তাঁদের বিবেক বুদ্ধি নানাপ্রকার ভোগবাসনাতে আচ্ছাদিত থাকায় তাঁরা আমার উপাসনা না করে, কামনা-পূরণের উদ্দেশ্যে ইন্দ্রাদি দেবতাদের উপাসনা করেন (৭।২০,২১,২২ ; ৯।২৩,২৪) ; কারণ ঐসব দেবতাদের ভজনাকারীগণ তাঁদের কর্মের ফল সত্বর লাভ করেন। দেবতাদের স্বভাব হল তাঁরা প্রায়শঃই একথা ভাবেন না যে, উপাসককে অমুক বস্তু প্রদান করলে তাতে তার প্রকৃত হিত হবে কি না ; তাঁরা কর্মানুষ্ঠানের বিধিবৎ পূর্ণতাই দেখে থাকেন। ঠিকমতো অনুষ্ঠান সিদ্ধ হলে তার যা ফল, যা তাঁদের অধিকারগত থাকে এবং যা সেই কর্মানুষ্ঠানের ফলরূপে বিহিত, তা প্রদান করেন। কিন্তু আমি তা করি না, আমি আমার ভক্তদের হিতাহিত চিন্তা করে তবে তাঁদের ভক্তির ফলের ব্যবস্থা করি। আমার ভক্তগণ যদি সকামভাবেও আমার ভজনা করেন, তা সত্ত্বেও আমি তাঁদের সেই কামনাপূরণ করি যা পূরণ হলে তাঁদের বিষয়ে বৈরাগ্য হয়ে আমার প্রতি প্রেম ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। অতএব সাংসারিক মানুষদের আমার ভক্তির ফল শীঘ্র দেখা যায় না, তাইজন্য সেইসকল মন্দবুদ্ধি মানুষ কর্মের ফল শীঘ্র লাভ করার ইচ্ছায় অন্য দেবতাদের পূজা করে থাকেন।

সম্বন্ধ—নবম শ্লোকে ভগবানের দিব্য জন্ম ও কর্মের তত্ত্বতঃ জানার ফল ভগবানপ্রাপ্তি বলা হয়েছে। তার আগে ভগবানের জন্মের দিব্যতার বিষয় ভালোভাবে বোঝানো হয়েছিল, কিন্তু ভগবানের কর্মের দিব্যতার বিষয় স্পষ্ট হয়নি ; তাই ভগবান এবার দুটি শ্লোকে নিজ জগৎ-সৃষ্টি কর্মে কর্তৃত্ব, বৈষম্য ও স্পৃহার অভাব দেখিয়ে নিজ কর্মের দিব্যতার বিষয় বোঝাচ্ছেন—

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্ ॥১৩

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চার বর্ণসমুদয় গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমি সৃষ্টি করেছি। এই সৃষ্টি কর্মের কর্তা হলেও অবিনাশী, পরমেশ্বররূপ আমাকে তুমি প্রকৃতপক্ষে অকর্তা বলেই জানবে ॥ ১৩

প্রশ্ন—গুণকর্ম কী এবং তার বিভাগ অনুযায়ী ভগবানের দ্বারা চার বর্ণসমূহ রচনা করা হয়েছে, এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—অনাদি কাল হতে জীব জন্ম-জন্মান্তর ধরে যে কর্ম করে আসছে, যার ফলভোগ করা হয়নি, সেই অনুসারে তাদের যথাযোগ্য সত্ত্ব, রজঃ, তমো গুণাদির বেশি-কম হয়ে থাকে। ভগবান জগৎ-সৃষ্টির সময় যখন মানুষ সৃষ্টি করেন, তখন ঐ সব গুণ ও কর্ম অনুযায়ী তাদের ব্রাহ্মণ ইত্যাদি বর্ণে উৎপন্ন করেন। অর্থাৎ যার মধ্যে সত্ত্বগুণের আধিক্য থাকে, তাকে ব্রাহ্মণ করেন, যার মধ্যে সত্ত্বমিশ্রিত রজোগুণের আধিক্য থাকে, তাকে ক্ষত্রিয়, যার মধ্যে তমোমিশ্রিত রজোগুণ অধিক থাকে, তাকে বৈশ্য এবং যার রজোমিশ্রিত তমঃ প্রধান হয় তাকে শূদ্র করে সৃষ্টি করেন। এইভাবে তাঁর রচিত বর্ণাদির জন্য নিজ নিজ স্বভাব অনুসারে পৃথক পৃথক কর্মের বিধানও ভগবানই করেছেন—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ শম-দম কর্মে রত থাকবেন, ক্ষত্রিয়তে শৌর্য-তেজ ইত্যাদি থাকবে, বৈশ্য কৃষি-গোরক্ষা কাজে নিরত থাকবেন এবং শূদ্র সেবাপরায়ণ হবেন, এইভাবে বলা হয়েছে (১৮।৪১-৪৪)। এইভাবে গুণ কর্ম বিভাগ করে ভগবান চতুর্বর্ণের সৃষ্টি করেছেন। জগতে এই ব্যবস্থাই চলে আসছে। যতদিন বর্ণ শুদ্ধি বজায় থাকে, একই বর্ণের নারী-পুরুষের সংযোগে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের নারী পুরুষের সংযোগে বর্ণসঙ্করতা না হয়, ততদিন এই ব্যবস্থায় কোনো অন্তরায়ের সৃষ্টি হয় না। অন্তরায় হলেও বর্ণব্যবস্থা অল্পবিস্তর থেকেই যায়।

এখানে কর্ম ও উপাসনার প্রকরণ। এতে শুধু মানুষেরই অধিকার, তাই এখানে মানুষকে উপলক্ষ্য করে বলা হয়েছে। সুতরাং বুঝতে হবে যে দেবতা, পিতৃগণ ও তির্যক ইত্যাদি প্রাণীর সৃষ্টিও ভগবান জীবের গুণ ও কর্ম অনুসারেই করেন। তাই এই জগৎ-সৃষ্টি কর্মে ভগবানের বিন্দুমাত্র বৈষম্য নেই, এই ভাব দেখাবার জন্য এখানে বলা হয়েছে যে আমি গুণ ও কর্ম অনুসারে চার বর্ণের রচনা ও বিভাগ করেছি।

প্রশ্ন—ব্রাহ্মণাদির কর্মের বিভাগ জন্ম দ্বারা মানা উচিত, না কর্ম দ্বারা ?

উত্তর—যদিও জন্ম ও কর্ম উভয়ই বর্ণের অঙ্গ হওয়ায় বর্ণের পূর্ণতা দুটির দ্বারাই হয়ে থাকে, কিন্তু প্রধানতঃ জন্মেরই হওয়ায় জন্ম থেকেই ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণের বিভাগ মানা উচিত। কারণ দুটির মধ্যে জন্মেরই প্রাধান্য থাকে। যদি মাতাপিতা সমবর্ণের হয় এবং কোনো প্রকারে জন্মে সঙ্করতা না আসে, তাহলে কর্মেও সহজে সঙ্করতা আসে না। কিন্তু সঙ্গদোষ, খাদ্যদোষ, দূষিত শিক্ষা-দীক্ষার কারণে কর্মে কোথাও কোনো ব্যতিক্রম হলেও জন্ম থেকে বর্ণ মেনে চললে বর্ণরক্ষা হতে পারে। তবুও কর্মশুদ্ধির প্রয়োজন কম নয়। সর্বতোভাবে নষ্ট হয়ে গেলে বর্ণরক্ষা করা খুবই কঠিন হয়ে যায়। তাই জীবিকা ও বিবাহ ইত্যাদি প্রয়োজনে জন্মের প্রাধান্য এবং কল্যাণ প্রাপ্তিতে কর্মের প্রাধান্য মানা উচিত। কারণ জাতিতে ব্রাহ্মণ হলেও যদি তার কর্ম ব্রাহ্মণোচিত না হয়, তাহলে তার কল্যাণ হতে পারে না এবং সাধারণ ধর্ম অনুসারে শম-দম ইত্যাদি পালনকারী

এবং সু-আচরণকারী শূদ্রও যদি ব্রাহ্মণোচিত যজ্ঞাদি কর্ম করে এবং তার দ্বারা নিজ জীবিকা-নির্বাহ করে, তাহলে পাপ-ভাগী হয়।

প্রশ্ন—এই সময় যখন বর্ণব্যবস্থা নষ্ট হয়ে গেছে, তখন জন্ম থেকে বর্ণ না মেনে মানুষের আচরণ অনুযায়ী যদি তাদের বর্ণ মানা হয়, তাহলে ক্ষতি কী ?

উত্তর—সেরূপ মেনে নেওয়া উচিত নয়, কারণ প্রথমতঃ বর্ণব্যবস্থায় কিছু শৈথিল্য এলেও তা একেবারে নষ্ট হয়নি। দ্বিতীয়তঃ জীবের কর্মফল ভোগ করবার জন্য ঈশ্বরই তাদের পূর্ব কর্ম অনুসারে বিভিন্ন বর্ণে উৎপন্ন করেন। ঈশ্বরের বিধান পরিবর্তন করার অধিকার মানুষের নেই। তৃতীয়তঃ আচরণ দেখে বর্ণের কল্পনা করাও অসম্ভব। একই মাতা-পিতা থেকে জন্ম নেওয়া বালকদের আচরণে নানা বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। একজন মানুষই সারাদিনে কখনো ব্রাহ্মণের মতো, কখনো শূদ্রের ন্যায় কর্ম করে, এরূপ অবস্থায় বর্ণ স্থির করা কী করে সম্ভব ? আর এমতাবস্থায় কে নীচবর্ণ হতে রাজী হবে। খাওয়া-দাওয়া, বিবাহাদি কর্মে বাধার সৃষ্টি হবে, ফলতঃ কর্মবিপ্লব হবে এবং বর্ণব্যবস্থার স্থিতিতে অত্যন্ত বড়ো বাধা উপস্থিত হবে। সুতরাং শুধুমাত্র কর্ম দ্বারা বর্ণ মানা উচিত নয়।

প্রশ্ন—চতুর্দশ অধ্যায়ে ভগবান সত্ত্বগুণে স্থিত বা সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিতে যাঁরা মৃত্যুবরণ করেন তাঁরা দেবলোক, রাজসিক স্বভাব বা রজোগুণের বৃদ্ধিতে মৃত্যুবরণকারীরা মনুষ্যজন্ম এবং তমোগুণ স্বভাবসম্পন্ন বা তমোগুণের বৃদ্ধিতে মৃত্যুপ্রাপ্তকারীগণ তির্যক জন্ম প্রাপ্ত হন বলে জানিয়েছেন ; তাই এখানে সত্ত্ব প্রধানকে ব্রাহ্মণ, রজঃ প্রধানকে ক্ষত্রিয় ইত্যাদি—এই প্রকার বিভাগ মেনে নিলে ঐ বক্তব্যের সঙ্গে কী বিরুদ্ধতা হয় না ?

উত্তর—প্রকৃতপক্ষে কোনো বিরোধ নেই। রাজসিক স্বভাবসম্পন্ন ও রজোগুণের বৃদ্ধিতে মৃত্যুবরণকারী মনুষ্যজন্ম লাভ করে, তা সত্য। এর দ্বারা মনুষ্যজন্মে রজোগুণের প্রাধান্য সূচিত হয়, কিন্তু রজোগুণ প্রধান মানবজন্মের সকল মানুষ সমগুণবিশিষ্ট হয় না। তাদের মধ্যে গুণের নানাপ্রকার বিভিন্নতা হয়েই থাকে এবং সেই অনুযায়ী যিনি সত্ত্বগুণপ্রধান হন, তিনি ব্রাহ্মণবর্ণে, সত্ত্বমিশ্রিত রজঃপ্রধান ক্ষত্রিয়বর্ণে, তমোমিশ্রিত রজঃপ্রধান বৈশ্যবর্ণে, রজোমিশ্রিত তমোপ্রধান শূদ্রবর্ণে জন্ম হয় এবং সত্ত্ব-রজের বিকাশরহিত কেবল তমোপ্রধানের তার থেকেও নিম্নকোটিতে জন্ম হয়।

প্রশ্ন—নবম অধ্যায়ের দশম শ্লোকে ভগবান তাঁর প্রকৃতিকে সমস্ত জগতের সৃষ্টিকারী বলে জানিয়েছেন আর এখানে স্বয়ং নিজেকে জগৎ রচয়িতা বলেছেন—এতে যে বিরোধ প্রতীয়মান হয়, তার সমাধান কী ?

উত্তর—এতে কোনো বিরোধ নেই। ঐ শ্লোকেও শুধু প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টিকারী বলা হয়নি, কেবল ভগবানের অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করেন—এই কথা বলা হয়েছে। কারণ প্রকৃতি জড় হওয়ায় তাতে ভগবানের সহায়তা ব্যতীত গুণকর্মের বিভাগ করা ও জগৎ সৃষ্টি করার সামর্থ্যই নেই। সুতরাং গীতায় যেখানে প্রকৃতিকে সৃষ্টিকারী বলা হয়েছে, সেখানে বুঝে নিতে হবে যে ভগবানের সকাশে তাঁর অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করে। যেখানে ভগবানকে জগৎ রচয়িতা বলা হয়েছে, সেখানে বুঝে নিতে হবে যে ভগবান নিজে রচনা করেন না, নিজ প্রকৃতির দ্বারাই তিনি রচনা করেন।

প্রশ্ন—জগৎ-সৃষ্টি কর্মের কর্তা হওয়া সত্ত্বেও 'তুমি আমাকে অকর্তাই জানবে' এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবানের কর্মের দিব্যতার ভাব প্রকট করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে ভগবানের কোনো কর্মেই রাগ-দ্বেষ বা কর্তৃত্ব-ভাব থাকে না। তিনি সর্বদাই সেই কর্মগুলি হতে সর্বতোভাবে অতীত, তাঁর সকাশে তাঁর প্রকৃতিই সমস্ত কর্ম করে। তাইজন্য লৌকিক ব্যবহারে ভগবানকে ঐসব কর্মের কর্তা মানা হয় ; কিন্তু ভগবান প্রকৃতপক্ষে সর্বতোভাবে উদাসীন, কর্মের সঙ্গে তাঁর কোনোপ্রকার সম্বন্ধ নেই (৯।৯-১০)—এই ভাবার্থে ভগবান এই কথা বলেছেন। ফলাসক্তি ও কর্তৃত্ববোধবর্জিত জ্ঞানীকেও কর্মের কর্তা বলে মানা হয় না এবং কর্মফলের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক থাকে না, তাহলে এ বিষয়ে ভগবানের সম্বন্ধে বলার আর কী আছে ? তাঁর কর্ম তো সর্বতোভাবেই অলৌকিক হয়ে থাকে।

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে ॥১৪

কর্মফলে আমার স্পৃহা নেই, তাই কর্ম আমাকে বদ্ধ করতে পারে না— এইভাবে যাঁরা আমাকে তত্ত্বতঃ জানেন, তাঁরাও কর্মের দ্বারা আবদ্ধ হন না ॥ ১৪

প্রশ্ন—কর্ম দ্বারা লিপ্ত হওয়া কী ? আর কর্মফলে আমার আসক্তি নেই, তাই কর্ম আমাকে লিপ্ত করে না —এই কথার দ্বারা ভগবানের কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—যেসব মানুষ কর্ম করেন, তাঁদের মধ্যে মমতা, আসক্তি, ফলেচ্ছা ও অহংকার থাকায় তাঁদের কর্ম সংস্কাররূপে তাঁদের অন্তরে সঞ্চিত হয়ে যায় এবং সেই অনুযায়ী তাঁদের পুনর্জন্ম এবং সুখ-দুঃখ প্রাপ্তি হয় —এই হল তাদের কর্ম দ্বারা লিপ্ত বা বদ্ধ হওয়া। এখানে ভগবান উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা এই ভাব দেখিয়েছেন যে, কর্মের ফলরূপ কোনো ভোগে আমার বিন্দুমাত্র আসক্তি নেই—অর্থাৎ আমার কোনো বস্তুরই কিছুই চাহিদা নেই (৩।২২)। আমার দ্বারা যা কিছু কর্ম করা হয়,—সেসব মমতা, আসক্তি, ফলেচ্ছা এবং কর্তৃত্ব-ভাবরহিত শুধুমাত্র লোকহিতার্থেই হয়ে থাকে (৪।৮) ; আমার সেসবের সঙ্গে কোনোই সম্বন্ধ থাকে না। এই জন্য আমার সমস্ত কর্ম দিব্য এবং সেগুলি আমাকে লিপ্ত বা আবদ্ধ করে না।

প্রশ্ন—উপরোক্ত প্রকারে ভগবানকে তত্ত্বতঃ জানা কী এবং যারা এইভাবে ভগবানকে জানেন, তাঁরা কেন কর্মের দ্বারা আবদ্ধ হন না ?

উত্তর—উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী যিনি এটি বুঝে নেন যে জগৎ-সৃষ্টি ইত্যাদি সকল কর্ম করেও ভগবান প্রকৃতপক্ষে অকর্তা—ঐসব কর্মের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্বন্ধ নেই ; তাঁর কর্মে বৈষম্যের লেশমাত্র নেই ; কর্মফলে তাঁর বিন্দুমাত্রও আসক্তি, মমতা বা কামনা নেই ; অতএব তাঁকে এগুলি কর্মবন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে না—এই হল ভগবানকে উপরোক্ত প্রকারে তত্ত্বতঃ জানা। এবং এই ভাবে ভগবানের কর্মরহস্য যথার্থরূপে জেনে যাওয়া মহাত্মার কর্মও ভগবানেরই ন্যায় মমতা, আসক্তি, ফলেচ্ছা ও অহংকার ছাড়া শুধুমাত্র লোক-সংগ্রহার্থেই হয়ে থাকে ; তাই তিনিও কর্ম দ্বারা আবদ্ধ হন না। অতএব বুঝতে হবে যে, যে সব ব্যক্তিদের কর্মে এবং তার ফলে কামনা, মমতা ও আসক্তি থাকে, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে ভগবানের কর্মের দিব্যতাকে জানেন না।

সম্বন্ধ—এইভাবে ভগবান তাঁর কর্মের দিব্যতা ও সেটি তত্ত্বতঃ জানার মহত্ত্ব বলে, এবার মুমুক্ষু ব্যক্তিদের উদাহরণ দিয়ে অর্জুনকে নিষ্কামভাবে কর্ম করার নির্দেশ দিচ্ছেন—

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্ ॥১৫

এইভাবে জেনে পূর্বকালে মুমুক্ষুগণও নিষ্কাম কর্ম করেছেন। সেইজন্য তুমিও পূর্বসূরীদের দ্বারা পরম্পরাগত ভাবে আচরিত কর্ম পালন করো ॥ ১৫

প্রশ্ন—**'মুমুক্ষু'** কাকে বলে এবং পূর্বকালের মুমুক্ষুদের উদাহরণ দিয়ে এই শ্লোকে কী কথা বোঝানো হয়েছে ?

উত্তর—যে ব্যক্তি জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে লাভ করতে চায়, যে সাংসারিক ভোগকে দুঃখময় ও ক্ষণভঙ্গুর ভেবে তাতে বিমুখ হয়েছে এবং যার ইহলোক ও পরলোকের ভোগের আকাঙ্ক্ষা নেই—তাঁকে 'মুমুক্ষু' বলা হয়। অর্জুনও মুমুক্ষু ছিলেন, তিনি কর্মবন্ধনের ভয়ে স্বধর্মরূপ কর্তব্যকর্ম ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন, তাই ভগবান এই শ্লোকে পূর্বকালের মুমুক্ষুদের উদাহরণ দিয়ে একথা বোঝাতে চেয়েছেন যে, কর্ম ছেড়ে দিলেই মানুষ তার

বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না। তাই পূর্বকালের মুমুক্ষুগণও আমার কর্মের দিব্যতার তত্ত্ব জেনে আমারই মতো কর্মে মমতা, আসক্তি, ফলের ইচ্ছা ও অহংকার ত্যাগ করে নিষ্কামভাবে নিজেদের বর্ণাশ্রম অনুসারে আচরণ করেছেন। সুতরাং তুমিও যদি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে চাও, তাহলে তোমারও পূর্বসূরী মুমুক্ষুদের ন্যায় নিষ্কামভাবে স্বধর্মরূপ কর্তব্যকর্ম পালন করা উচিত, তা ত্যাগ করা উচিত নয়।

সম্বন্ধ— ভগবান এইভাবে অর্জুনকে নিষ্কামভাবে কর্ম করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু কর্ম-অকর্মের তত্ত্ব না বুঝে মানুষ নিষ্কামভাবে কর্ম করতে পারে না ; তাই ভগবান এবার মমতা, আসক্তি, ফলেচ্ছা ও অহংকাররহিত দিব্য কর্মগুলির তত্ত্ব ভালোভাবে বোঝাবার জন্য কর্মতত্ত্বের রহস্য এবং মহত্ত্ব প্রকট করাতে গিয়ে তা জানাবার জন্য প্রতিজ্ঞা করছেন—

কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥১৬

কর্ম কী ? অকর্ম কী ? এগুলির নির্ণয় করতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাও মোহগ্রস্ত হয়ে থাকেন। সেইজন্য এই কর্মতত্ত্ব আমি তোমাকে ভালোভাবে বুঝিয়ে বলছি, যা জানলে তুমি অশুভ থেকে অর্থাৎ কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে ॥ ১৬

প্রশ্ন—এখানে **'কবয়ঃ'** কোন্ ব্যক্তিদের বাচক এবং তাদের কর্ম-অকর্মের নির্ণয়ে মোহগ্রস্ত হয়ে যাওয়া কীরূপ ? এই বাক্যে **'অপি'** পদটি প্রয়োগের কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—এখানে 'কবয়ঃ' পদটি শাস্ত্রজ্ঞানী বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের বাচক। শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া দ্বারা কর্মের তত্ত্ব বোঝানো হয়েছে, তা দেখে-শুনেও বুদ্ধিপূর্বক যথার্থ নির্ণয় করতে না পারা যে, অমুক অভিপ্রায়ে করা ঐ কাজটি **'কর্ম'** অথবা **'সেটির ত্যাগ করা কর্ম'** নাকি অমুক ভাবে অমুক কর্মটি করা বা সেই কর্মটি ত্যাগ করা **'অকর্ম'**—এই হচ্ছে তাদের যথার্থ কর্ম- অকর্ম নির্ণয়ে মোহগ্রস্ত হওয়া। এই বাক্যে **'অপি'** পদটি প্রয়োগ করে এই ভাব দেখানো হয়েছে যে, যখন অতি বড় বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাও এই বিষয়ে মোহগ্রস্ত হন, ঠিকমতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না, তখন সাধারণ মানুষদের তো কোনো কথাই নেই। অতএব কর্মের তত্ত্ব অত্যন্তই রহস্যজনক।

প্রশ্ন—এখানে যে কর্মতত্ত্বের বর্ণনা করতে ভগবান প্রতিজ্ঞা করেছেন, এই অধ্যায়ে কোথায় তার বর্ণনা করা হয়েছে ? তা তত্ত্বতঃ জানা কাকে বলে ? তা জানলে কীভাবে কর্মবন্ধন থেকে মুক্তিলাভ হয় ?

উত্তর— উপরোক্ত কর্মতত্ত্বের বর্ণনা এই অধ্যায়ের আঠারো থেকে বত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত করা হয়েছে। সেই বর্ণনা থেকে ঠিকমতো বোঝা যে কীভাবে করা কোন্ কর্ম বা কর্মত্যাগ মানুষের পুনর্জন্মরূপ বন্ধনের কারণ হয় এবং কী ভাবে করা কোন্ কর্ম বা কর্মত্যাগ মানুষের পুনর্জন্মরূপ বন্ধনের কারণ না হয়ে মুক্তির কারণ হয়—এই হল সেটি তত্ত্বতঃ জানা। এই তত্ত্বকে বোঝে যেসব ব্যক্তি তাদের দ্বারা এমন কোনো কর্ম সম্পাদন বা সেটির ত্যাগ সম্ভব নয়, যা তাদের বন্ধনের কারণ হতে পারে ; তাদের সকল কর্তব্যকর্ম মমতা, আসক্তি, ফলেচ্ছা ও অহংকার ব্যতীত শুধুমাত্র ভগবদর্থ বা লোকসংগ্রহার্থেই হয়ে থাকে। এইজন্য উপরোক্ত কর্মতত্ত্ব জেনে মানুষ কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

সম্বন্ধ—মানুষ স্বভাবতঃই এখানে মনে করতে পারে যে, শাস্ত্রবিহিতভাবে করা উপযুক্ত কর্মের নামই কর্ম এবং ক্রিয়াগুলি বাহ্যিকভাবে ত্যাগ করাকেই অকর্ম বলা হয়—এতে মোহগ্রস্ত হওয়া কী এবং এতে কী বুঝতে হবে ? কিন্তু

শুধুমাত্র এটুকু জানলেই বাস্তবিক কর্ম-অকর্ম নির্ণয় করা সম্ভব নয় ; কর্মের তত্ত্ব ভালোভাবে বোঝার প্রয়োজন আছে। সেই ভাব স্পষ্ট করার জন্য ভগবান বলেছেন—

কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ ॥১৭

কর্মের স্বরূপ, অকর্মের স্বরূপ ও বিকর্মের স্বরূপ—সবই জানা উচিত। কারণ কর্মের গতি অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় ॥ ১৭

প্রশ্ন—কর্মের স্বরূপও জানা উচিত—এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—ভগবান এর দ্বারা এই ভাব দেখিয়েছেন যে, মানুষ সাধারণতঃ একথাই জানে যে, শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য-কর্মকেই কর্ম বলা হয় ; কিন্তু শুধুমাত্র এটি জানলেই কর্মের তত্ত্ব জানা যায় না, কারণ তার আচরণে ভাবের পার্থক্য হওয়ায় তার গুণগত পার্থক্য হয়। সুতরাং কোন্ ভাবে, কী প্রকারে করা, কোন্ ক্রিয়ার নাম কর্ম ? এবং কোন্ পরিস্থিতিতে, কোন্ ব্যক্তির, কোন্ শাস্ত্রবিহিত কর্ম, কীরূপে করা উচিত—শাস্ত্রজ্ঞাতা, তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষই এই বিষয় ঠিকমতো জানেন। সুতরাং নিজ অধিকার অনুযায়ী বর্ণ আশ্রমোচিত কর্তব্যকর্মের আচরণ করার জন্য তত্ত্ববেত্তা মহাপুরুষদের কাছ থেকে এই কর্মগুলি বুঝে নেওয়া উচিত এবং তাঁদের প্রেরণা এবং নির্দেশানুসারে সেইমতো আচরণ করা উচিত।

প্রশ্ন—অকর্মের স্বরূপও জানা উচিত, এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান এইভাব দেখিয়েছেন যে, মানুষ সাধারণতঃ এমনই মনে করে যে, মন-বাক্য-শরীর দ্বারা করা ক্রিয়াসমূহ স্বরূপতঃ ত্যাগ করাই অকর্ম বা কর্মরহিত হওয়া ; কিন্তু এটুকু জানলেই অকর্মের প্রকৃত স্বরূপ জানা সম্ভব নয় ; কারণ ভাবের পার্থক্যে এইরূপ অকর্মও কর্ম অথবা বিকর্মরূপে পরিবর্তিত হয় এবং লোকে যাকে কর্ম বলে মনে করে তাও অকর্ম বা বিকর্ম হয়ে ওঠে। সুতরাং কী ভাবে, কী প্রকার করা, কোন্ ক্রিয়া বা সেই ক্রিয়া ত্যাগের নাম অকর্ম এবং কোন্ পরিস্থিতিতে, কোন্ মানুষের, কীরূপ আচরণ করা উচিত, তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষগণই তা ঠিকমতো জানেন। অতএব কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হবার ইচ্ছাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ঐসকল মহাপুরুষদের নিকট এই অকর্মের স্বরূপও ভালোভাবে বুঝে তাঁদের কথানুযায়ী সাধনা করা উচিত।

প্রশ্ন—বিকর্মের স্বরূপও জানা উচিত, এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—ভগবান এর দ্বারা এই ভাব দেখিয়েছেন যে, সাধারণতঃ ছল, কপট, চুরি, ব্যভিচার, হিংসা ইত্যাদি পাপ-কর্মের নামই বিকর্ম—এটিই প্রসিদ্ধ, কিন্তু শুধুমাত্র এটি জানলেই বিকর্মের স্বরূপ ঠিকভাবে জানা যায় না, কারণ শাস্ত্রের তত্ত্ব না জানা অজ্ঞব্যক্তি পুণ্যকেও পাপ মনে করে এবং পাপকে পুণ্য বলে ভাবে। বর্ণ, আশ্রম ও অধিকার ভেদে যে কর্ম একজনের জন্য বিহিত হওয়ায় কর্তব্য (কর্ম), সেটিই অপরের কাছে নিষিদ্ধ হওয়ায় পাপ (বিকর্ম) হয়ে ওঠে। যেমন সকল বর্ণের সেবা করা শূদ্রের বিহিত কর্ম, কিন্তু সেটিই ব্রাহ্মণের কাছে নিষিদ্ধ কর্ম। যেমন দান গ্রহণ করে, বেদাধ্যয়ন করে, যজ্ঞ করিয়ে জীবিকা নির্বাহ করা ব্রাহ্মণের কর্তব্যকর্ম, কিন্তু অন্য বর্ণের কাছে সেটি পাপ। যেমন গৃহস্থের পক্ষে ন্যায়োপার্জিত দ্রব্য সংগ্রহ করা এবং ঋতুকালে নিজ পত্নীগমন করা ধর্ম, কিন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী ও কাঞ্চন দর্শন ও স্পর্শ করাও পাপ। সুতরাং ছল, কপট, চুরি, ব্যভিচার, হিংসা ইত্যাদি যা সর্বসাধারণের জন্য নিষিদ্ধ এবং অধিকার ভেদে যা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিদের জন্য নিষিদ্ধ—সেইসব ত্যাগ করার জন্য বিকর্মের স্বরূপ ভালো ভাবে বুঝে নেওয়া উচিত। তত্ত্ববেত্তা মহাপুরুষগণই এর স্বরূপ ঠিকমতো বলতে সক্ষম।

প্রশ্ন—কর্মের গতি দুর্জ্ঞেয়, এই বক্তব্যে '**হি**' অব্যয় প্রয়োগের কী তাৎপর্য ?

উত্তর—'**হি**' অব্যয় এখানে হেতুবাচক। এর

প্রয়োগ করে উপরোক্ত বাক্য দ্বারা ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে কর্মের তত্ত্ব অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়। কর্ম কী ? অকর্ম কী ? বিকর্ম কাকে বলে ?—সকল মানুষের পক্ষে এর নিরূপণ করা সম্ভব নয় ; যারা বিদ্যা-বুদ্ধিতে সকলের কাছে পণ্ডিত বলে বিবেচ্য, তাঁরাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর নির্ণয় করতে পারেন না। সুতরাং কর্মের তত্ত্ব যাঁরা ভালোভাবে জানেন, সেই মহাপুরুষদের থেকে এর তত্ত্ব জানা আবশ্যক।

সম্বন্ধ—এইভাবে শ্রোতাদের অন্তরে রুচি ও শ্রদ্ধা উৎপন্ন করার জন্য কর্মতত্ত্বকে দুর্জ্ঞেয় এবং তা জানা অত্যন্ত আবশ্যক জানিয়ে এবার প্রতিজ্ঞা অনুসারে ভগবান কর্মের তত্ত্ব বোঝাচ্ছেন—

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।

স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥ ১৮

যে ব্যক্তি কর্মে অকর্ম দেখেন এবং যিনি অকর্মে কর্ম দেখেন, মানুষের মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান, তিনিই যোগযুক্ত ও সর্বকর্মকারী ॥ ১৮

প্রশ্ন—কর্মে অকর্ম দেখা কী ? এই প্রকার দৃষ্টিযুক্ত ব্যক্তি বুদ্ধিমান, যোগী এবং সর্বকর্মকারী কীভাবে হন ?

উত্তর—লোকপ্রসিদ্ধিতে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও শরীরের দ্বারা কৃত সবকিছুরই নাম কর্ম। তার মধ্যে যেগুলি শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্ম, তাকে কর্ম বলা হয় এবং শাস্ত্রনিষিদ্ধ পাপ কর্মগুলিকে বিকর্ম বলা হয়। শাস্ত্রনিষিদ্ধ পাপকর্ম সর্বদা ত্যাজ্য। তাই এখানে তার আলোচনা করা হয়নি।

সুতরাং এখানে শাস্ত্রবিহিত যেসব কর্তব্যকর্ম আছে, তার মধ্যে অকর্ম দেখা কী—তার সম্বন্ধে বিচার করতে হবে। যজ্ঞ, দান, তপ এবং বর্ণাশ্রম অনুসারে জীবিকা ও শরীর-নির্বাহ সম্পর্কীয় যতপ্রকার শাস্ত্রবিহিত কর্ম—সেসবে আসক্তি, ফলেচ্ছা, মমতা ও অহংকার ত্যাগ করলে মানুষ ইহলোকে বা পরলোকে সুখ-দুঃখের ফল ভোগ করার জন্য পুনর্জন্মের হেতু হয় না, বরং তার পূর্বকৃত সমস্ত শুভাশুভ কর্মনাশ হয়ে তাকে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেয়—এই রহস্য বুঝে যাওয়াই কর্মে অকর্ম দেখা। এই ভাবে কর্মে অকর্ম দর্শনকারী ব্যক্তি আসক্তি, ফলেচ্ছা ও মমতা ত্যাগপূর্বকই বিহিত কর্ম যথাযোগ্যভাবে পালন করে। সুতরাং সেই ব্যক্তি কর্ম করলেও কর্মে লিপ্ত হয় না, তাই সে মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান। সে পরমাত্মাকে লাভ করে, তাই সে যোগী এবং তার কোনো কর্তব্যই বাকি থাকে না—সে কৃতকৃত্য হয়ে যায়, সেইজন্য সে সমস্ত কর্মকারী হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন—অকর্মে কর্ম দেখা কী ? এই প্রকার দর্শনকারী ব্যক্তি মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান, যোগী ও সর্বকর্মকারী কীভাবে হন ?

উত্তর—লোকপ্রসিদ্ধিতে মন, বাক্য এবং শরীরের সকল কর্ম ত্যাগ করার নামই অকর্ম ; এই ত্যাগরূপ অকর্মও আসক্তি, ফলেচ্ছা, মমতা ও অহংকারপূর্বক করলে পুনর্জন্মের কারণ হয়ে ওঠে ; শুধু তাই নয়, কর্তব্যকর্মের অবহেলাতে বা দম্ভের সঙ্গে করলে সেটি বিকর্ম (পাপ) রূপে পরিবর্তিত হয়—এই রহস্য বোঝার নামই অকর্মে কর্ম দেখা। এই রহস্য বোঝে যে ব্যক্তি সে কোনো বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম শারীরিক কষ্টের ভয়ে ত্যাগ করে না, রাগ-দ্বেষ-মোহবশতঃ বা মান-মর্যাদা-প্রতিষ্ঠা অথবা অন্য কোনো ফলের আশাতেও ত্যাগ করে না। তাই সে কখনও নিজ কর্তব্য থেকে চ্যুত হয় না এবং কোনোপ্রকার ত্যাগে মমতা, আসক্তি, ফলেচ্ছা বা অহংকারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পুনর্জন্মের ভাগী হয় না। তাই সে মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান পুরুষ। তার পরম পুরুষ পরমেশ্বরের সঙ্গে সংযোগ ঘটে গেছে, তাই সে যোগী এবং তার পক্ষে কোনো কর্তব্য আর বাকি থাকে না, তাই সে সর্বকর্মকারী।

প্রশ্ন—কর্ম অর্থে ক্রিয়মান, বিকর্ম অর্থে বিবিধ প্রকারের সঞ্চিত কর্ম এবং অকর্ম অর্থে প্রারব্ধ কর্ম ধরে নিয়ে কর্মে অকর্ম দেখার যদি এই অর্থ করা হয় যে ক্রিয়মান কর্ম করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে,

ভবিষ্যতে এই কর্মই প্রারব্ধ কর্ম (অকর্ম) হয়ে ফলভোগের রূপে উপস্থিত হবে আর অকর্মে কর্ম দেখার যদি এই অর্থ করা হয় যে প্রারব্ধরূপ ফলভোগের সময় ঐ দুঃখ-ভোগ ইত্যাদি নিজ পূর্বকৃত ক্রিয়মান কর্মেরই ফল মনে করা হবে এবং এইরূপ বুঝে পাপকর্মাদি ত্যাগ করে শাস্ত্রবিহিত কর্মই করতে হবে, তাহলে আপত্তি কীসের ? কারণ সঞ্চিত, ক্রিয়মাণ এবং প্রারব্ধ কর্মের এই তিনটি ভেদ সুপ্রসিদ্ধ।

উত্তর— ঠিক, এরূপ মনে করা অত্যন্ত লাভপ্রদ ও বুদ্ধিমানের কাজ ; কিন্তু এরূপ অর্থ মেনে নিলে **'কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ'**, **'গহনা কর্মণো গতিঃ'**, **'যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ'**, **'স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃত্'**, **'তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ'**, **'নৈব কিঞ্চিৎকরোতি সঃ'** ইত্যাদি কথার সঙ্গতি থাকে না। অতএব এই অর্থ অংশতঃ লাভপ্রদ হলেও প্রকরণ-বিরুদ্ধ।

প্রশ্ন—কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম দেখেন যেসব সাধক তাঁরাও মুক্ত হয়ে যান, নাকি সিদ্ধপুরুষই এইরূপ দেখতে সক্ষম ?

উত্তর—মুক্তপুরুষের যা স্বাভাবিক লক্ষণ, তাই সাধকদের পক্ষে সাধ্য হয়ে থাকে। সুতরাং মুক্তপুরুষরা স্বভাবতঃই এই তত্ত্ব জানেন এবং সাধক তাঁদের উপদেশে সেইরূপ সাধন করলে মুক্ত হয়ে যান। তাই ভগবান বলেছেন যে—'আমি তোমাকে সেই কর্মতত্ত্ব বলব, যা জানলে তুমি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।'

সম্বন্ধ— এইভাবে কর্মে অকর্ম ও অকর্মে কর্ম দর্শনের মহত্ত্ব জানিয়ে এবার পাঁচটি শ্লোকে বিভিন্ন শৈলীদ্বারা উপরোক্ত কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম দর্শনপূর্বক কর্মকারী সিদ্ধ ও সাধক পুরুষদের আসক্তিহীনতা বর্ণনা করে সেই বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন—

যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥ ১৯

যাঁর সমস্ত শাস্ত্রসম্মত কর্ম কামনা ও সংকল্পবর্জিত এবং যাঁর সমস্ত কর্ম জ্ঞানরূপ অগ্নিতে ভস্ম হয়ে গেছে, সেই মহাপুরুষকে জ্ঞানিগণও পণ্ডিত বলেন ॥ ১৯

প্রশ্ন—**'সমারম্ভাঃ'** পদটির অর্থ কী ? তার সঙ্গে **'সর্বে'** বিশেষণ যোগ করার এখানে কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—নিজ নিজ বর্ণাশ্রম ও পরিস্থিতি অনুযায়ী যার জন্য যে যজ্ঞ, দান, তপ এবং জীবিকা ও শরীরনির্বাহের জন্য শাস্ত্রসম্মত কর্তব্যকর্ম বিহিত আছে, সে সবের বাচক এখানে এই **'সমারম্ভাঃ'** পদটি। ক্রিয়ামাত্রকেই আরম্ভ বলা হয়, জ্ঞানীর কর্ম শাস্ত্রনিষিদ্ধ বা ব্যর্থ হয় না—এই ভাব দেখাবার জন্য 'আরম্ভ'-এর সঙ্গে **'সম্'** উপসর্গ প্রয়োগ করা হয়েছে এবং **'সর্বে'** বিশেষণের দ্বারা এই ভাব দেখানো হয়েছে যে সাধনকালে মানুষের সমস্ত কর্ম কামনা ও সংকল্প ছাড়া হয় না, কোনো কোনো কর্মে কামনা ও সংকল্পের সংযুক্তি ঘটেই যায় ; কিন্তু সাধন করতে করতে যিনি সিদ্ধ হয়ে গেছেন, সেই মহাপুরুষের তো সকল কর্ম কামনা ও সংকল্প রহিতই হয় ; তাঁর কোনো কর্মই কামনা, সংকল্পযুক্ত অথবা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ হয় না।

প্রশ্ন—**'কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ'** এই পদে উদ্ধৃত 'কাম' ও 'সংকল্প' শব্দের অর্থ কী এবং এগুলি রহিত কর্ম কোন্‌গুলি ?

উত্তর—স্ত্রী, পুত্র, ধন, মান, মর্যাদা, প্রতিষ্ঠা, আবাস, স্বর্গ-সুখ ইত্যাদি ইহলোক ও পরলোকে যত বিষয় (পদার্থ), তার মধ্যে কোনো কিছু বিন্দুমাত্র আশা করার নাম হল 'কাম' এবং কোনো বিষয়ে মমতা, অহংকার, রাগ-দ্বেষ এবং রমণীয় বুদ্ধির দ্বারা স্মরণ করাকে বলা হয় 'সংকল্প'। কামনা সংকল্পের কার্য এবং সংকল্প তার কারণ। বিষয়াদি স্মরণ করলেই তাতে আসক্তি জন্মে কামনার উৎপত্তি হয় (২।৬২)। যাঁর কর্মে কোনো বস্তুর সংযোগ-বিয়োগের বিন্দুমাত্র কামনা নেই, যাঁর মধ্যে মমতা, অহংকার ও আসক্তির বিন্দুমাত্র লেশ নেই এবং যিনি শুধুমাত্র লোকসংগ্রহার্থে কর্ম করেন—তাঁর সব কর্ম কাম ও সংকল্পরহিত হয়।

প্রশ্ন—উপরোক্ত পদে উদ্ধৃত 'সংকল্প' শব্দের অর্থ যদি স্ফুরণ মাত্র মেনে নেওয়া যায় তাহলে ক্ষতি কী ?

উত্তর—কোনো কর্মই স্ফুরণ ব্যতীত হয় না, স্ফুরণ আগে হয়, তারপর মন, বাক্য ও শরীর দ্বারা কর্ম করা হয়। অন্য কর্মের কথা ছেড়ে দিলেও খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা ইত্যাদি শরীর নির্বাহের কর্মগুলিও স্ফুরণ ছাড়া হয় না ; তাহলে এই শ্লোকে '**সমারম্ভাঃ**' পদের দ্বারা বলা শাস্ত্রবিহিত কর্ম কী করে হওয়া সম্ভব ? সেইজন্য এখানে 'সংকল্পে'র অর্থ শুধুমাত্র স্ফুরণ মেনে নেওয়া উচিত বলে মনে হয় না।

প্রশ্ন—'**জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণম্**' পদে 'জ্ঞানাগ্নি' শব্দটি কীসের বাচক ? এবং তার দ্বারা কর্ম দগ্ধ হয়ে যাওয়া কাকে বলে ?

উত্তর—যে কোনো সাধনের দ্বারা উৎপন্ন পরমাত্মার যথার্থ জ্ঞানের বাচক এই 'জ্ঞানাগ্নি' শব্দটি। অগ্নি যেমন ইন্ধনকে ভস্মীভূত করে, তেমনই জ্ঞানও সমস্ত কর্ম ভস্ম করে দেয় (৪।৩৭)—এইভাবে অগ্নির উপমা দেওয়ার জন্য এখানে 'জ্ঞানাগ্নি' বলা হয়েছে। যেমন অগ্নি দ্বারা দগ্ধ বীজ, নামেই বীজ থাকে, তার অঙ্কুরিত হওয়ার ক্ষমতা থাকে না, তেমনই জ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা সমস্ত কর্মে ফল উৎপন্ন করার শক্তি সর্বতোভাবে বিনষ্ট হয়—একেই বলা হয় জ্ঞানরূপ অগ্নিতে কর্মসমূহ ভস্ম হয়ে যাওয়া।

প্রশ্ন—এখানে '**বুধাঃ**' পদটি কীসের বাচক ? উপরোক্ত ভাবে যে ব্যক্তি 'জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মা' হয়ে গেছেন, তাঁকে তাঁরা '**পণ্ডিত**' বলে থাকেন—এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'বুধাঃ' পদটি এখানে তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মাদের বাচক এবং উপরোক্ত পুরুষদের তাঁরা পণ্ডিত বলে থাকেন—এই কথাটির দ্বারা উপরোক্ত সিদ্ধ যোগীদের বিশেষভাবে প্রশংসা করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, কর্মে মমতা, আসক্তি, অহংকার না থাকা এবং তাতে নিজের কোনোরূপ প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও সেগুলি স্বরূপতঃ ত্যাগ না করে লোকসংগ্রহার্থে সমস্ত শাস্ত্রবিহিত কর্ম বিধিপূর্বক ভালোভাবে করতে থাকা অত্যন্ত ধৈর্য, বীর্য, গাম্ভীর্য এবং বুদ্ধিমত্তার কাজ ; তাই জ্ঞানিগণও তাঁদের পণ্ডিত (তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মা) বলে থাকেন।

ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ।। ২০

যিনি সকল কর্ম ও তার ফলে আসক্তি সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে সংসারের আশ্রয় ত্যাগ করেছেন এবং পরমাত্মাতে নিত্য তৃপ্তি লাভ করেছেন, তিনি উত্তমরূপে কর্ম করলেও প্রকৃতপক্ষে কিছুই করেন না ।। ২০

প্রশ্ন—সমস্ত কর্মে এবং তার ফলে আসক্তি সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করার তাৎপর্য কী ?

উত্তর—যজ্ঞ, দান ও তপ এবং জীবিকা ও শরীর নির্বাহের জন্য যতপ্রকার শাস্ত্রবিহিত কর্ম রয়েছে, সেগুলিতে মানুষের স্বাভাবিক আসক্তি থাকে, যার জন্য সে সেই কর্মগুলি না করে থাকতে পারে না এবং কর্ম করার সময় তাতে এতো জড়িয়ে পড়ে যে ঈশ্বরের স্মৃতি বা অন্য কোনো প্রকারের চিন্তাও থাকে না—ঐরূপ আসক্তি থেকে সর্বতোভাবে রহিত হয়ে যাওয়া, কোনো কর্মে মনকে একটুও আসক্ত হতে না দেওয়া—এটিই হল কর্মে আসক্তি সর্বতোভাবে ত্যাগ করা এবং ঐ কর্ম হতে প্রাপ্ত হওয়া ইহলোক বা পরলোকের যত ভোগ—তাতে বিন্দুমাত্র মমতা, আসক্তি ও কামনা না রাখা—এটিই হল কর্মের ফলে আসক্তি ত্যাগ করা।

প্রশ্ন—এইরূপ আসক্তি ত্যাগ করে 'নিরাশ্রয়' ও 'নিত্যতৃপ্ত' হওয়া কাকে বলে ?

উত্তর—আসক্তি সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে শরীরে অহংকার ও মমতারহিত হয়ে যাওয়া এবং কোনো সাংসারিক বস্তু বা মানুষের আশ্রিত না হওয়া অর্থাৎ অমুক বস্তু বা মানুষের দ্বারাই আমার জীবিকা নির্বাহ হচ্ছে, এটিই আধার, এছাড়া কোনো কাজ হবে না—এই প্রকার ভাবের অভাব হওয়াই 'নিরাশ্রয়' হওয়া। এরূপ হলে মানুষের কোনোপ্রকার সাংসারিক পদার্থের কিছুমাত্র প্রয়োজনীয়তা থাকে না, তিনি পূর্ণকাম হয়ে ওঠেন ; পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মা লাভ করায় তিনি নিরন্তর আনন্দে মগ্ন হয়ে থাকেন, কোনো ঘটনায় তাঁর

অবস্থিতিতে বিন্দুমাত্র তফাৎ হয় না। এটিই হল তাঁর 'নিত্যতৃপ্ত' হয়ে যাওয়া।

প্রশ্ন—'**কর্মণি অভিপ্রবৃত্তঃ অপি ন এব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ**' এই বাক্যে '**অভি**' উপসর্গের এবং '**অপি**' ও '**এব**' অব্যয় প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'**অভি**' উপসর্গের দ্বারা দেখানো হয়েছে যে এরূপ ব্যক্তিও তাঁর বর্ণাশ্রম অনুযায়ী শাস্ত্রবিহিত সকল কর্ম ভালোভাবে সতর্কতা ও বিবেচনাসহ বিস্তারিতভাবে করতে সক্ষম। '**অপি**' অব্যয়ের দ্বারা দেখানো হয়েছে যে মমতা, অহংকার এবং ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত মানুষ কর্মসমূহ বাহ্যিকভাবে ত্যাগ করলেও কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন না, কিন্তু এই নিত্যতৃপ্ত ব্যক্তি সমস্ত কর্ম করেও কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না। '**এব**' অব্যয় দ্বারা এই ভাব দেখানো হয়েছে যে সেই সব কর্মের সঙ্গে তার কোনোপ্রকার সম্পর্ক থাকে না। তাই তিনি সমস্ত কর্ম করলেও বাস্তবে অকর্তাই থাকেন।

এইভাবে একথা স্পষ্ট করা হয়েছে যে কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম দেখেন যে সব মুক্তপুরুষ, তাঁরা পূর্ণকাম হওয়ায় তাঁদের কোনো কর্তব্যই বাকি থাকে না (৩।১৭) ; তাঁদের কোনো বস্তুর, কোনোভাবেই প্রয়োজনীয়তা থাকে না। সুতরাং তিনি যেসব কর্ম করেন বা যে কোনো কর্মে নিরত হন, সবই শাস্ত্রসম্মত এবং লোকসংগ্রহার্থেই করেন, তাই তাঁর কর্ম বাস্তবে 'কর্ম' নয়।

সম্বন্ধ—উপরোক্ত শ্লোকে বলা হয়েছে যে মমতা, আসক্তি, ফলেচ্ছা ও অহংকাররহিত হয়ে শুধুমাত্র লোকসংগ্রহার্থে শাস্ত্রসম্মত যজ্ঞ, দান, তপ ইত্যাদি সর্ব কর্ম করলেও জ্ঞানী ব্যক্তি বাস্তবে কিছুই করেন না। তাই তিনি কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না। তাতে প্রশ্ন হতে পারে যে জ্ঞানীকে আদর্শ মনে করে উপরোক্ত প্রকারে যে সকল কর্ম সম্পাদনকারী সাধক আছেন তারাও নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম ত্যাগ করেন না, নিষ্কামভাবে সর্বপ্রকার শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্ম করতে থাকেন—তাই তারাও কোনোরূপ পাপের ভাগী হন না ; কিন্তু যে সাধক শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ, দান ইত্যাদি কর্মের অনুষ্ঠান না করে কেবলমাত্র শরীর নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় শৌচ-স্নান, খাওয়া-শোওয়া ইত্যাদি কর্মই শুধু করে থাকেন, তারা তো তাহলে পাপের ভাগী হন ? এই আশঙ্কা থেকে নিবৃত্ত করার জন্য ভগবান বলেছেন—

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ২১

যাঁর অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদিসহ শরীর স্ববশে, যিনি সকলপ্রকার ভোগসামগ্রী ত্যাগ করেছেন, সেইরূপ আশারহিত ব্যক্তি শরীর-ধারণের জন কর্ম করলেও কোনোপ্রকার পাপের ভাগী হন না ॥ ২১

প্রশ্ন—'**নিরাশীঃ**', '**যতচিত্তাত্মা**' এবং '**ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ**'—এই তিনটি বিশেষণ প্রয়োগের এখানে কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—যে ব্যক্তির সাংসারিক বস্তুর কোনোপ্রকার প্রয়োজনীয়তা নেই, যিনি কোনো কর্মে বা মানুষের কাছ থেকে কোনোপ্রকার ভোগপ্রাপ্তির আশা বা কামনা করেন না, যিনি সর্বপ্রকার ইচ্ছা, কামনা, বাসনা ইত্যাদি সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করেছেন—তাঁকে '**নিরাশীঃ**' বলা হয় ; যাঁর অন্তঃকরণ ও সমস্ত ইন্দ্রিয়সহ শরীর বশে থাকে—অর্থাৎ যাঁর মন ও ইন্দ্রিয় রাগ-দ্বেষ রহিত হওয়ায় তাঁর ওপর শব্দাদি বিষয়ের কোনোপ্রকার প্রভাব পড়ে না এবং যাঁর শরীরও ইচ্ছামতো স্ববশে থাকে—তিনি গৃহস্থ হন অথবা সন্ন্যাসী, তিনি হলেন '**যতচিত্তাত্মা**'। যাঁর কোনো বস্তুতে মমতা নেই এবং যিনি সমস্ত ভোগ সামগ্রীর সংগ্রহ চিরতরে ত্যাগ করেছেন, সেই সন্ন্যাসী সর্বতোভাবে 'ত্যক্তসর্বপরিগ্রহ'ই হয়ে থাকেন। এতদ্ব্যতীত অন্য কোনো আশ্রমবাসীও যদি উপরোক্ত প্রকারে পরিগ্রহ ত্যাগ করে দেন, তাহলে তিনিও 'ত্যক্তসর্বপরিগ্রহ'।

এই তিনটি বিশেষণ প্রয়োগের দ্বারা এই অর্থ প্রকাশিত হয় যে, যিনি এইরূপ বাহ্য বস্তুতে সম্বন্ধ না রেখে নিরন্তর অন্তরাত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, সেই

সাংখ্যযোগী যজ্ঞ-দানাদি কর্ম না করে শুধু শরীর সম্বন্ধীয় খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি কর্ম করলেও তিনি পাপের ভাগী হন না। কারণ তাঁর সেই ত্যাগ আসক্তি বা ফলেচ্ছায় অথবা অহংকারপূর্বক মোহবশতঃ করা নয় ; সেই ত্যাগ আসক্তি, ফলেচ্ছা এবং অহংকাররহিত হয়ে সর্বতোভাবে শাস্ত্রসম্মত ত্যাগ, সুতরাং তা সর্বপ্রকারে জগতের হিতকারী হয়ে থাকে।

প্রশ্ন—এখানে **'শারীরম্'** এবং **'কেবলম্'** বিশেষণের সঙ্গে 'কর্ম' পদটি কোন্ কর্মের বাচক এবং **'কিল্বিষম্'** পদ কিসের বাচক আর সেটি প্রাপ্ত না হওয়া কী ?

উত্তর—**'শারীরম্'** এবং **'কেবলম্'** বিশেষণের সঙ্গে 'কর্ম' পদটি এখানে শৌচ-স্নান, খাওয়া-শোওয়া ইত্যাদি শুধুমাত্র শরীর নির্বাহের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ক্রিয়াসমূহের বাচক আর 'কিল্বিষম্' পদটি এখানে যজ্ঞ-দান ইত্যাদি বিহিত কর্মত্যাগের ফলে হওয়া প্রত্যবায়—পাপের অর্থাৎ শরীর-নির্বাহের জন্য করা ক্রিয়াগুলিতে হওয়া অনিবার্য 'হিংসা' ইত্যাদি পাপের বাচক। উপরোক্ত পুরুষের যজ্ঞাদি কর্মানুষ্ঠান না করলে প্রত্যবায়রূপ পাপও লাগে না এবং শরীর নির্বাহের জন্য করা ক্রিয়াসমূহে হওয়া পাপের সঙ্গেও তাঁর কোনো সম্বন্ধ থাকে না ; এই হল তাঁর 'কিল্বিষ' প্রাপ্ত না হওয়া।

সম্বন্ধ—উপরোক্ত শ্লোকে একথা প্রমাণ করা হয়েছে যে পরমাত্মা-প্রাপ্ত সিদ্ধ মহাপুরুষদের কর্ম করা বা না করায় কোনো প্রয়োজন থাকে না এবং জ্ঞানযোগের সাধকের গ্রহণ ও ত্যাগ শাস্ত্রসম্মত, আসক্তিরহিত ও মমতারহিত হয় ; অতএব তাঁরা কর্ম করতে থেকে বা কর্ম ত্যাগ করে—সর্ব অবস্থাতেই কর্মবন্ধন হতে সর্বতোভাবে মুক্ত। ভগবান এবার দেখাচ্ছেন যে কর্মে অকর্মদর্শনপূর্বক কর্ম করলে কর্মযোগীও কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না—

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥ ২২

যিনি বিনা ইচ্ছাতেই যা পান তাতে সর্বদা তুষ্ট থাকেন, যিনি হর্ষ-শোক ইত্যাদি দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত এবং সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমজ্ঞানসম্পন্ন, সেই কর্মযোগী (শরীর ধারণের জন্য কর্ম করলেও) তাতে আবদ্ধ হন না ॥ ২২

প্রশ্ন—**'যদৃচ্ছালাভ'** কী এবং তাতে সন্তুষ্ট থাকা কীরূপ ?

উত্তর—অনিচ্ছায় বা পরেচ্ছায় প্রারব্ধ অনুসারে যেসব অনুকূল বা প্রতিকূল পদার্থ প্রাপ্তি হয়, তাকে বলে **'যদৃচ্ছালাভ'** ; এই **'যদৃচ্ছালাভ'**-এ সর্বদাই আনন্দ করা, কোনো অনুকূল পদার্থ প্রাপ্তি হলে তাতে আসক্ত না হওয়া, তা যাতে স্থায়ী হয় বা বৃদ্ধি পায় তা আশা না করা ; অথবা প্রতিকূল প্রাপ্তিতে দ্বেষ না করা, সেটি নষ্ট করার ইচ্ছা না করা এবং দুই-ই প্রারব্ধ বা ভগবানের বিধান মনে করে সর্বদা শান্ত ও প্রসন্নচিত্ত থাকা—একেই বলা হয় **'যদৃচ্ছালাভ'**-এ সর্বদা সন্তুষ্ট থাকা।

প্রশ্ন—**'বিমৎসরঃ'** কথাটির ভাবার্থ কী ? এখানে এটির প্রয়োগ করা হয়েছে কেন ?

উত্তর—বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান, মর্যাদা বা অন্য কোনো বস্তু বা গুণের জন্য অপরের উন্নতি দেখে যে ঈর্ষার ভাব হয়—সেই বিকারকে বলা হয় 'মৎসরতা' ; যার মধ্যে সেই ভাব সর্বতোভাবে দূর হয়েছে, তাকে বলে 'বিমৎসর'। নিজেকে যারা বিদ্বান ও বুদ্ধিমান বলে মনে করে তাদের মধ্যেও ঈর্ষার দোষ লুকিয়ে থাকে ; যার সঙ্গে মানুষের ভালোবাসা হয়, তেমন নিজ বন্ধু ও কুটুম্বগণের প্রতিও ঈর্ষার ভাব হয়ে থাকে। তাই **'বিমৎসরঃ'** বিশেষণ প্রয়োগ করে এখানে কর্মযোগীদের মধ্যে হর্ষ-শোক ইত্যাদি বিকার ব্যতীত ঈর্ষাদোষেরও অভাব দেখানো হয়েছে।

প্রশ্ন—দ্বন্দ্ব থেকে অতীত হওয়া কী ?

উত্তর—হর্ষ-শোক ও রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি বিকার-গুলিকে দ্বন্দ্ব বলা হয়। তাতে সম্বন্ধ না থাকা অর্থাৎ এইরূপ বিকার অন্তরে উৎপন্ন না হওয়াকে বলে তার থেকে অতীত হয়ে যাওয়া।

প্রশ্ন—এখানে সিদ্ধি ও অসিদ্ধির অর্থ কী এবং

তাতে সম থাকা কাকে বলে ?

উত্তর—যজ্ঞ, দান, তপ ইত্যাদি কোনো কর্ম নির্বিঘ্নতার সঙ্গে পূর্ণ হওয়াকে বলে সিদ্ধি ; আর কোনোরূপ বাধা-বিঘ্নের জন্য সেটি পূর্ণ না হওয়াকেই বলা হয় অসিদ্ধি। এইরূপ যে উদ্দেশ্যে কর্ম করা হয়, সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়াই হল সিদ্ধি আর পূর্ণ না হওয়া অসিদ্ধি। এইরূপ সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে ভেদবুদ্ধি না হওয়া অর্থাৎ সিদ্ধিতে আনন্দ ও আসক্তি এবং অসিদ্ধিতে দ্বেষ ও শোক ইত্যাদি না হওয়া, দুটিতেই একপ্রকার ভাব রাখাই সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম থাকা।

প্রশ্ন—এরূপ ব্যক্তি কর্ম করলেও আবদ্ধ হন না। এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—কর্ম করায় মানুষের অধিকার (২।৪৭), কারণ যজ্ঞ (কর্ম)সহিত প্রজা সৃষ্টি করে প্রজাপতি মানুষদের কর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন (৩।১০) ; সুতরাং সেই অনুসারে কর্ম না করলে মানুষ পাপের ভাগী হয় (৩।১৬)। তাছাড়া মানুষ কর্মকে সর্বতোভাবে ত্যাগ করতেও পারে না (৩।৫), নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী সকলকেই কিছু না কিছু কর্ম করতে হয়। সুতরাং এর এই ভাব বুঝতে হবে যে যেমন শুধুমাত্র শরীর সম্পর্কীয় কর্মকারী পরিগ্রহরহিত সাংখ্যযোগী অন্যান্য কর্মের আচরণ না করলেও কর্ম না করার পাপে লিপ্ত হন না, তেমনই কর্মযোগী বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করলেও, তাতে আবদ্ধ হন না।

সম্বন্ধ—এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে উপরোক্ত প্রকারে করা কর্ম বন্ধনের হেতু হয় না, শুধু এই কথা নাকি এর আরও কিছু মহত্ত্ব আছে ? তাতে বলেছেন—

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥ ২৩

যিনি আসক্তি সর্বতোভাবে বর্জন করেছেন, দেহাভিমান ও মমতারহিত হয়েছেন, যাঁর চিত্ত নিরন্তর পরমাত্মার জ্ঞানে স্থিত, এরূপ শুধু যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য যিনি কর্ম করেন তাঁর সমস্ত কর্ম সম্পূর্ণভাবে বিলাশপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ফলদান করে না ॥ ২৩

প্রশ্ন—আসক্তি সর্বতোভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়া কাকে বলে এবং **'গতসঙ্গস্য'** পদটি কীসের বাচক ?

উত্তর—কর্মে বা তার ফলরূপ সমস্ত ভোগে একটুও আসক্তি বা কামনা না রাখা, সেই হল আসক্তি সর্বতোভাবে নষ্ট হওয়া। যার আসক্তি এইরূপ নাশ হয়েছে, সেই কর্মযোগীদের বাচক এখানে **'গতসঙ্গস্য'** পদটি। এই ভাবার্থ কর্মে ও ফলে আসক্তি ত্যাগে এবং সিদ্ধি, অসিদ্ধির সমত্ব দ্বারা আগের শ্লোকে দেখানো হয়েছে।

প্রশ্ন—**'মুক্তস্য'** পদটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—যাঁর অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদির সংঘাতরূপ শরীরে কোনোপ্রকার আত্মাভিমান বা মমত্ববোধ নেই, যিনি দেহাভিমান থেকে চিরতরে মুক্ত হয়ে গেছেন—সেই জ্ঞানযোগীর বাচক এখানে **'মুক্তস্য'** পদটি।

প্রশ্ন—**'জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ'** পদটির কী তাৎপর্য ?

উত্তর—**'জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ'** পদটিও সর্বত্র ব্রহ্মবুদ্ধি হওয়ায় প্রত্যেক ক্রিয়া করার সময় যাঁর চিত্ত নিরন্তর পরমাত্মার জ্ঞানে মগ্ন থাকে, সেরূপ জ্ঞানযোগীর বাচক।

প্রশ্ন—**'যজ্ঞায় আচরতঃ'** এই পদে **'যজ্ঞ'** শব্দ কীসের বাচক ? তার জন্য কর্মের আচরণ করার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—নিজ বর্ণ, আশ্রম, পরিস্থিতি অনুসারে যে ব্যক্তির শাস্ত্রদৃষ্টিতে যা বিহিত কর্তব্যকর্ম, সেটিই হল তার জন্য যজ্ঞ। সেই শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ সম্পাদন করার উদ্দেশ্যেই যে কর্ম করা— অর্থাৎ কোনোপ্রকার স্বার্থের সম্বন্ধ না রেখে শুধু লোকসংগ্রহরূপ যজ্ঞের পরম্পরা সুরক্ষিত রাখার জন্যই যে কর্মের আচরণ করা হয়, তাকে বলে যজ্ঞের জন্য কর্মের আচরণ করা। তৃতীয় অধ্যায়ের নবম শ্লোকে উদ্ধৃত **'যজ্ঞার্থাৎ'** বিশেষণের সঙ্গে **'কর্মণঃ'** পদও এরূপ কর্মেরই বাচক।

প্রশ্ন—**'সমগ্রম্'** বিশেষণের সঙ্গে **'কর্ম'** পদটি

এখানে কোন্ কর্মের বাচক এবং তার বিলীন হওয়ার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—জন্ম-জন্মান্তরে করা যত কর্ম সংস্কাররূপে মানুষের অন্তরে সঞ্চিত থাকে এবং তার দ্বারা উপরোক্ত প্রকারে যত নতুন কর্ম সম্পাদিত হয়, সেই সবের বাচক এখানে **'সমগ্রম্'** বিশেষণের সঙ্গে **'কর্ম'** পদটি ; সে সবের নাশ হওয়া অর্থাৎ তাতে কোনো প্রকার আবদ্ধ করার শক্তি না থাকাই হল সেগুলির বিলীন হয়ে যাওয়া। এর দ্বারা ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে, উপরোক্তভাবে কর্মকারী পুরুষকে সেই কর্ম আবদ্ধ করতে পারে না। শুধু তাই নয়, যেমন খড়ের বোঝায় আগুন দিলে তা সমস্ত খড় পুড়িয়ে ভস্মে পরিণত করে—তেমনই আসক্তি, ফলেচ্ছা, মমতা ও অভিমান ত্যাগরূপ অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে সম্পাদিত কর্ম, পূর্বসঞ্চিত সমস্ত কর্মসহ বিলীন হয়ে যায়, তাই তার কোনো কর্মেই কোনো প্রকার ফল প্রদানের শক্তি থাকে না।

সম্বন্ধ—পূর্বশ্লোকে বলা হয়েছে যে যজ্ঞের জন্য যেসব পুরুষ কর্ম করেন, তাঁদের সমস্ত কর্ম বিলীন হয়ে যায়। সেখানে শুধু অগ্নিতে আহুতি দেওয়াই যজ্ঞ এবং তা সম্পন্ন করার জন্য যে ক্রিয়া করা হয় তাকেই বলা হয় যজ্ঞের জন্য কৃত কর্ম, এটি তা নয় ; বর্ণ, আশ্রম, স্বভাব, পরিস্থিতি অনুযায়ী যার যা কর্তব্য, সেটিই তার জন্য যজ্ঞ এবং সেগুলি পালন করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্রিয়াগুলি নিঃস্বার্থভাবে লোকসংগ্রহার্থে করা, সেটিই হল যজ্ঞার্থে কর্ম করা—এই ভাব সুস্পষ্ট করার জন্য ভগবান এবার সাতটি শ্লোকে বিভিন্ন যোগীর দ্বারা কৃত পরমাত্মা প্রাপ্তির সাধনরূপ শাস্ত্রবিহিত বিভিন্ন কর্তব্যকর্মরূপ যজ্ঞের বর্ণনা করছেন—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা।। ২৪

যে যজ্ঞে অর্পণ, অর্থাৎ শ্রুবাদিও (যাহার দ্বারা হবি অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হয়) ব্রহ্ম, হোম করা দ্রব্যসমূহও ব্রহ্ম, ব্রহ্মরূপ যজ্ঞকর্তার দ্বারা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে আহুতি প্রদানরূপ ক্রিয়াও ব্রহ্ম—সেই ব্রহ্মকর্মে স্থিত যোগীর প্রাপ্ত ফলও ব্রহ্ম ।। ২৪

প্রশ্ন—এই শ্লোকে যজ্ঞের রূপকের মাধ্যমে কী ভাব প্রকাশিত হয়েছে ?

উত্তর—এই শ্লোকে **'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'** (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৩।১৪।১)-এর অনুসারে সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনরূপ সাধনকে যজ্ঞের রূপ দেওয়া হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, কর্তা, কর্ম ও করণ ইত্যাদির পার্থক্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান সমস্ত পদার্থকে ব্রহ্মরূপে দেখার যে অভ্যাস—সেই অভ্যাসরূপ কর্মও পরমাত্মা প্রাপ্তির সাধন হওয়ায়, সেটিও হল যজ্ঞ।

এই যজ্ঞে শ্রুবা, হবি, হবনকারী এবং যজ্ঞরূপ ক্রিয়া ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু নয়, তাঁর দৃষ্টিতে সব কিছুই ব্রহ্ম ; কারণ এরূপ যজ্ঞকারী যোগী যে মন, বুদ্ধি ইত্যাদির দ্বারা সমস্ত জগৎকে ব্রহ্ম বলে বোঝার অভ্যাস করেন, তিনি সেই মন, বুদ্ধি ইত্যাদিকে, নিজেকে, এই অভ্যাসরূপ ক্রিয়াকে এবং অন্য সমস্ত বস্তুকে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু বলে মনে করেন না, সবকিছু ব্রহ্মরূপেই দেখেন ; সেইজন্য সেগুলির মধ্যে তাঁর কোনোপ্রকার ভেদবুদ্ধি থাকে না।

প্রশ্ন—এই রূপকে **'অর্পণম্'** পদটির অর্থ যদি যজ্ঞ করার ক্রিয়া মেনে নেওয়া যায়, তাহলে আপত্তি কীসের ?

উত্তর— **'হুতম্'** পদটি যজ্ঞ রূপ ক্রিয়ার বাচক। অতএব **'অর্পণম্'** পদটিরও এই অর্থ মনে করলে পুনরুক্তি দোষ আসে। নবম অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকেও **'হুতম্'** পদটির অর্থ 'যজ্ঞ ক্রিয়া'ই মানা হয়েছে। সুতরাং যার সাহায্যে কোনো বস্তু অর্পণ করা হয় **'অর্প্যতে অনেন'**—এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'অর্পণম্' পদটির অর্থ যার সাহায্যে ঘৃত ইত্যাদি দ্রব্য অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়, সেইরূপ শ্রুবা ইত্যাদি পাত্র মনে করাই উচিত মনে হয়।

প্রশ্ন—ব্রহ্মকর্মে স্থিত হওয়া কী এবং তার সাহায্যে প্রাপ্ত ফলও ব্রহ্মই হয়, এই কথাটির কী তাৎপর্য ?

উত্তর—নিরন্তর সর্বত্র ব্রহ্মবুদ্ধি করতে থাকা, কারোকে ব্রহ্ম থেকে পৃথক বলে মনে না করা—এই হল ব্রহ্মকর্মে স্থিত হওয়া। এইরূপ সাধনের ফলে নিঃসন্দেহে পরব্রহ্ম পরমাত্মাপ্রাপ্তি হয়, উপরোক্ত সাধনকারী যোগী অন্য ফলের ভাগী হন না—এইভাব দেখানোর জন্য এরূপ বলা হয়েছে যে তাঁর দ্বারা প্রাপ্তিযোগ্য ফলও ব্রহ্মই হয়।

সম্বন্ধ—এইরূপ ব্রহ্মকর্মরূপ যজ্ঞের বর্ণনা করে এবার পরবর্তী শ্লোকে দেবপূজারূপ যজ্ঞের এবং আত্মা-পরমাত্মার অভেদদর্শনরূপ যজ্ঞের বর্ণনা করছেন—

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি।। ২৫

অপর যোগিগণ দেবপূজারূপ যজ্ঞের যথাযথ অনুষ্ঠান করে থাকেন এবং অন্য যোগিগণ পরব্রহ্ম পরমাত্মারূপ অগ্নিতে অভেদদর্শনরূপ যজ্ঞের দ্বারা আত্মরূপ যজ্ঞের আহুতি দেন ।। ২৫

প্রশ্ন—এখানে '**যোগিনঃ**' পদটি কোন্ যোগীদের বাচক এবং তার সঙ্গে '**অপরে**' বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে কেন ?

উত্তর—এখানে '**যোগিনঃ**' পদটি মমতা, আসক্তি ও ফলেচ্ছা ত্যাগ করে শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ কর্মকারী সাধকদের বাচক। এই সাধকদের পূর্বশ্লোকে বর্ণিত ব্রহ্মকর্মকারীদের থেকে পৃথক করার জন্য অর্থাৎ এদের সাধন পূর্বোক্ত সাধন থেকে পৃথক এবং দুটি সাধনের অধিকারী ভিন্ন ভিন্ন হয়, এই কথা স্পষ্ট করার জন্য এখানে '**যোগিনঃ**' পদটির সঙ্গে '**অপরে**' বিশেষণ প্রযুক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন—'**দৈবম্**' বিশেষণের সঙ্গে '**যজ্ঞম্**' পদ কোন্ কর্মের বাচক এবং তার যথাযথ অনুষ্ঠান করা কী ? এই শ্লোকের পূর্বার্ধে ভগবানের কথনের কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—ব্রহ্মা, শিব, শক্তি, গণেশ, সূর্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, বরুণ প্রমুখ যেসকল শাস্ত্রসম্মত দেবতা আছেন—তাঁদের জন্য যজ্ঞ করা, তাঁদের পূজা করা, তাঁদের মন্ত্র জপ করা, তাঁদের নিমিত্তে দান করা এবং ব্রাহ্মণ ভোজন করানো ইত্যাদি সমস্ত কর্মের বাচক এখানে '**দৈবম্**' বিশেষণের সঙ্গে '**যজ্ঞম্**' পদটি এবং নিজ কর্তব্য মনে করে মমতা, আসক্তি ও ফলেচ্ছারহিত হয়ে শুধুমাত্র ঈশ্বর লাভের উদ্দেশ্যে এগুলির শ্রদ্ধাভক্তিপূর্বক শাস্ত্রবিধি অনুসারে পূর্ণভাবে অনুষ্ঠান করাই হল দৈবযজ্ঞের ঠিকমতো অনুষ্ঠান করা। এই শ্লোকের পূর্বার্ধে ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে, যাঁরা এই ভাবে দেবার্চনা করেন, তাঁদের ক্রিয়াও যজ্ঞকর্মের ন্যায় হয়ে যায়।

প্রশ্ন—ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞকে আহুতি দেওয়া কাকে বলে ?

উত্তর—অনাদিসিদ্ধ অজ্ঞতাজনিত কারণে শরীরের উপাধি দ্বারা আত্মা ও পরমাত্মার ভেদ অনাদিকাল থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে ; এই অজ্ঞতাজনিত ভেদ-প্রতীতিকে জ্ঞানাভ্যাসের সাহায্যে দূর করা অর্থাৎ আচার্যের উপদেশ শ্রবণ করে, তত্ত্বজ্ঞানের নিরন্তর মনন ও নিদিধ্যাসন করতে করতে, নিত্য বিজ্ঞানানন্দঘন, গুণাতীত পরব্রহ্ম পরমাত্মাতে অভেদ ভাবের দ্বারা আত্মাকে একীভূত করা—বিলীন করে দেওয়াই হল ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞকে আহুতি দেওয়া। এইরূপ যজ্ঞকারী জ্ঞানযোগীদের দৃষ্টিতে একমাত্র নির্গুণ-নিরাকার সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ম ব্যতীত নিজের বা অন্য কোনো সত্তার কোনো অস্তিত্ব থাকে না। এই ত্রিগুণময় জগৎ-সংসারের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্বন্ধ থাকে না, তাঁর কাছে সংসার পূর্ণরূপে লয় হয়ে যায়।

প্রশ্ন—পূর্বশ্লোকে বর্ণিত ব্রহ্মকর্ম হতে এই অভেদ-দর্শনরূপ যজ্ঞের কী তফাৎ ?

উত্তর—উভয় সাধনই সাংখ্য যোগিগণ করে থাকেন এবং দুটিতেই অগ্নিস্থানীয় হলেন—পরব্রহ্ম, পরমাত্মা ; এইজন্য দুটিই এক বলে প্রতীত হয়, দুটির ফলও অভিন্নভাবে সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মের প্রাপ্তি হওয়ায়

বাস্তবে দুটিতে কোনো পার্থক্য নেই, শুধু সাধন প্রণালীতে পার্থক্য আছে। সেটিকেই স্পষ্ট করার জন্য দুটির বর্ণনা পৃথকভাবে করা হয়েছে। আগের শ্লোকে বর্ণিত সাধনে **'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'** (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৩।১৪।১) এই শ্রুতিবাক্য অনুসারে সর্বত্র ব্রহ্মবুদ্ধি করার বর্ণনা এবং উপরোক্ত সাধনে সমস্ত জগতের সম্বন্ধের অভাব সিদ্ধ করে আত্মা ও পরমাত্মায় অভেদদর্শনের কথা বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ—এইভাবে দৈবযজ্ঞ ও অভেদদর্শনরূপ বর্ণনা করার পর এবার ইন্দ্রিয়সংযমরূপ যজ্ঞের এবং বিষয় আহুতিরূপ যজ্ঞের বর্ণনা করছেন—

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি॥ ২৬

অন্য যোগিগণ শ্রোত্রাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি দেন এবং অপর যোগিগণ শব্দাদি সমস্ত বিষয়কে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি দেন ॥ ২৬

প্রশ্ন—সংযমকে অগ্নি বলার অর্থ কী এবং এতে বহুবচনের প্রয়োগ করা হয়েছে কেন ?

উত্তর—ইন্দ্রিয় সংযমরূপ সাধনকে যজ্ঞের রূপ দেওয়ার জন্য এখানে সংযমকে অগ্নি বলা হয়েছে এবং প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের সংযম পৃথক পৃথক হয়, এই কথাটি স্পষ্ট করার জন্য এখানে বহুবচনের প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়দের আহুতি প্রদান করা কাকে বলে ?

উত্তর—দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে ইন্দ্রিয় অত্যন্ত আলোড়নকারী, সেটি বলপূর্বক সাধকের মন হরণ করে (২।৬০) ; তাই সমস্ত ইন্দ্রিয়কে নিজ বশে আনা—তার স্বেচ্ছাচারিতা দূর করা, তাতে মনকে বিচলিত করার শক্তি থাকতে না দেওয়া এবং তাকে জাগতিক ভোগে প্রবৃত্ত হতে না দেওয়াই ইন্দ্রিয়াদিকে সংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি দেওয়া। তাৎপর্য হল যে চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বককে বশীভূত করে প্রত্যাহার করা—রূপ, শব্দ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ ইত্যাদি বাইরের-ভিতরের বিষয় থেকে বুদ্ধিপূর্বক সেগুলিকে সরিয়ে তা থেকে উপরত হওয়াই হল কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়াদিকে সংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি দেওয়া। এর সুস্পষ্ট ভাব দ্বিতীয় অধ্যায়ে আটান্নতম শ্লোকে কচ্ছপের দৃষ্টান্ত দ্বারা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—তৃতীয় অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে যে ইন্দ্রিয় সংযমকে মিথ্যাচার বলা হয়েছে, সেখানকার ও এখানের ইন্দ্রিয় সংযমে পার্থক্য কী ?

উত্তর—ঐ স্থানে শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়াদি দেখা-শোনা, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি বাহ্যবিষয় রোধ করে নেওয়াকেই সংযম বলা হয়েছিল, ইন্দ্রিয়কে বশ করাকে নয়, কারণ সেখানে মন দ্বারা ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ের চিন্তা করার কথা স্পষ্ট। কিন্তু এখানে তেমন নয়, এক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করাকে 'সংযম' বলা হয়েছে। বশ করা ইন্দ্রিয়তে মনকে বিষয়ে প্রবৃত্ত করার শক্তি থাকে না। তাই যারা ইন্দ্রিয়কে বশীভূত না করেই শুধুমাত্র দম্ভপূর্বক ইন্দ্রিয়-গুলিকে বিষয় থেকে রোধ করে, আর মনে মনে বিষয়ভোগের চিন্তা করতে থাকে তাদের মিথ্যাচারী বলা হয়েছে। আর যারা ঈশ্বর লাভের জন্য ইন্দ্রিয়াদিকে বশীভূত করে মন থেকে বিষয় চিন্তা দূর করে নিরন্তর পরমাত্মার চিন্তাতেই মগ্ন থাকে তাঁদের প্রকৃত সংযমী বলা হয়েছে। এই হল মিথ্যাচারীর সংযমের সঙ্গে যথার্থ সংযমের পার্থক্য।

প্রশ্ন—শ্লোকের উত্তরার্ধে **'ইন্দ্রিয়'** শব্দের সঙ্গে **'অগ্নি'** শব্দের সমাস যুক্ত হয়েছে কেন ? **'ইন্দ্রিয়াগ্নিষু'** পদে বহুবচন প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—আসক্তিরহিত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা নিষ্কামভাবে বিষয়ভোগরূপ সাধনকে যজ্ঞের রূপ দেওয়ার জন্য এখানে 'ইন্দ্রিয়' শব্দের সঙ্গে 'অগ্নি' শব্দের সমাস করা হয়েছে এবং প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনাসক্তভাবে পৃথক পৃথক বিষয় ভোগ করা যায়, এই কথাটি স্পষ্ট করার জন্য এতে বহুবচনের প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—শব্দ ইত্যাদি বিষয়কে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি দেওয়া কী ?

উত্তর—বশীভূত করা এবং রাগ-দ্বেষরহিত ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বর্ণ, আশ্রম ও পরিস্থিতি অনুসারে যোগ্যতা অনুসারে প্রাপ্ত বিষয়াদি গ্রহণ করে সেগুলি ইন্দ্রিয়তে বিলীন করে দেওয়া (২।৬৪) অর্থাৎ সেগুলি ভোগ করার সময় বা অন্য সময় অন্তরে বা ইন্দ্রিয় মধ্যে কোনোপ্রকার বিকার উৎপন্ন করার শক্তি থাকতে না দেওয়াই হল শব্দাদি বিষয়কে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি দেওয়া। অভিপ্রায় হল যে কানে নিন্দা, স্তুতি বা অন্য কোনোপ্রকার অনুকূল প্রতিকূল শব্দ শুনে, চক্ষুর দ্বারা ভালো-মন্দ দৃশ্য দেখে, জিহ্বার দ্বারা ভালো-মন্দ রস গ্রহণ করে—এইভাবে অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেও প্রারব্ধ অনুসারে যোগ্যতা অনুসারে প্রাপ্ত সমস্ত বিষয় অনাসক্তভাবে সেবন করেও অন্তরে সমভাব রাখা, ভেদবুদ্ধি জনিত রাগ-দ্বেষ ও হর্ষ-শোক বিকারাদি উৎপন্ন হতে না দেওয়া। অর্থাৎ ঐসব বিষয়ে মন ও ইন্দ্রিয়কে বিক্ষিপ্ত, বিচলিত করার যে শক্তি থাকে, তা বিনাশ করে সেগুলি ইন্দ্রিয়তেই বিলীন করে দেওয়া—একেই বলা হয় শব্দাদি বিষয়কে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি দেওয়া। কারণ বিষয়ে আসক্তি, সুখ এবং রমণীয় বুদ্ধি না থাকায় সেই বিষয়ভোগ সাধকের ওপর নিজ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, সেগুলি অগ্নিতে ঘাসের মতো নিজেই দগ্ধ হয়ে যায়।

সম্বন্ধ—এবার আত্মসংযমরূপ যজ্ঞের বর্ণনা করছেন—

সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে॥ ২৭

অন্য যোগিগণ ইন্দ্রিয়াদির সমস্ত কর্ম এবং প্রাণের সকল কর্ম জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত আত্মসংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি দেন ॥ ২৭

প্রশ্ন—এখানে 'আত্মসংযমযোগ' কোন্ যোগের বাচক এবং তার সঙ্গে 'অগ্নি' শব্দের সমাস কেন যুক্ত হয়েছে, 'জ্ঞানদীপিতে' বিশেষণের অর্থ কী ?

উত্তর—এখানে 'আত্মসংযমযোগ' সমাধিযোগের বাচক। সেই সমাধিযোগকে যজ্ঞের রূপ দেওয়ার জন্য তার সঙ্গে 'অগ্নি' শব্দের সমাস করা হয়েছে এবং সুষুপ্তি থেকে সমাধির পার্থক্য বোঝাবার জন্য— অর্থাৎ সমাধি-কালে বিবেক-বিজ্ঞান জাগ্রত থাকে, শূন্যতার নাম সমাধি নয়—এই ভাব দেখাতে এবং যজ্ঞের রূপকে এই সমাধিযোগকে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত বলার জন্য 'জ্ঞানদীপিতে' বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—উপরোক্ত সমাধিযোগের স্বরূপ কী ? তাতে ইন্দ্রিয়াদির সমস্ত ক্রিয়া এবং প্রাণের সমস্ত ক্রিয়ার আহুতি দেওয়া কাকে বলে ?

উত্তর—ধ্যানযোগ অর্থাৎ ধ্যেয়তে মন দুই ভাবে নিরোধ করা হয়—এক, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদি নিরোধ করে, তারপর মন ধ্যেয় বস্তুতে নিরোধ করা হয় এবং দ্বিতীয়, প্রথমে মন দ্বারা ধ্যেয়ের চিন্তা করতে করতে ধ্যেয়তে মনের একাগ্রতারূপ ধ্যানাবস্থা হয়। তারপর ধ্যানের গাঢ় অবস্থা হলে ধ্যেয়তে মন নিরুদ্ধ হয় ; একেই বলে সমাধি-অবস্থা। এই সময় প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদির সমস্ত কর্ম স্বতঃই বন্ধ হয়ে যায়। এখানে সেই দ্বিতীয় প্রকারে করা ধ্যানযোগের বর্ণনা করা হয়েছে। তাই পরমাত্মার সগুণ-সাকার বা নির্গুণ-নিরাকার—যে কোনো রূপে নিজ নিজ মেনে নেওয়া ব্রহ্ম চিন্তা অনুযায়ী বিধিপূর্বক মনকে নিরুদ্ধ করাই সমাধিযোগের স্বরূপ।

এইভাবে ধ্যানযোগে মনোনিগ্রহ করে ইন্দ্রিয়াদির দেখা, শোনা, ঘ্রাণ নেওয়া, স্পর্শ করা, আস্বাদন করা, গ্রহণ করা, ত্যাগ করা, কথা বলা, চলা ফেরা ইত্যাদি এবং প্রাণের শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ, নড়া-চড়া ইত্যাদি সমস্ত ক্রিয়াকে বিলীন করে সমাধিস্থ হওয়া—একেই বলা হয় আত্মসংযম-যোগরূপ অগ্নিতে ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সমস্ত ক্রিয়াকে আহুতি দেওয়া।

সম্বন্ধ—এইভাবে সমাধিযোগের সাধনকে যজ্ঞের রূপ দিয়ে এবার পরবর্তী শ্লোকে দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ এবং স্বাধ্যায়রূপ জ্ঞানযজ্ঞ সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে—

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥ ২৮

কোনো কোনো ব্যক্তি দ্রব্যদানরূপ যজ্ঞ করেন, কিছু ব্যক্তি তপস্যারূপ যজ্ঞ করেন, কেহ বা যোগরূপ যজ্ঞ করেন, অনেক অহিংসাদি দৃঢ়ব্রতধারী যত্নশীল পুরুষ স্বাধ্যায়রূপ জ্ঞানযজ্ঞ করে থাকেন॥ ২৮

প্রশ্ন—দ্রব্য সম্বন্ধীয় যজ্ঞ কোন্ ক্রিয়ার বাচক ? এগুলি করার অধিকার কাদের থাকে ? এখানে '**দ্রব্যযজ্ঞাঃ**' পদটি প্রয়োগের কী তাৎপর্য ?

উত্তর—নিজ নিজ বর্ণ ধর্ম অনুসারে ন্যায়তঃ প্রাপ্ত দ্রব্যে মমতা, আসক্তি ও ফলেচ্ছা ত্যাগ করে যথাযোগ্য লোকসেবাতে নিয়োগ করা অর্থাৎ উপরোক্তভাবে কূপ, পুষ্করিণী, মন্দির, ধর্মশালা ইত্যাদি তৈয়ারি করা, ক্ষুধার্ত, অনাথ, রোগী, দুঃখী, অক্ষম, ভিখারি প্রভৃতিকে যথাবশ্যক অন্ন, বস্ত্র, জল, ঔষধ, পুস্তক ইত্যাদি বস্তু দিয়ে সেবা করা ; বিদ্বান, তপস্বী, বেদাধ্যয়নকারী সদাচারী ব্রাহ্মণকে গরু, ভূমি, বস্ত্র, ধন ইত্যাদি পদার্থ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী যথাযোগ্য দান করা—এইভাবে অন্য সব প্রাণীদের সুখী করার উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য দ্রব্য ব্যয় করাকে বলে 'দ্রব্যযজ্ঞ'। এই যজ্ঞ করার অধিকার একমাত্র গৃহস্থেরই থাকে ; কারণ দ্রব্য সংগ্রহ করে পরোপকারের জন্য ব্যয় করার অধিকার সন্ন্যাস বা অন্য আশ্রমে নেই। এখানে ভগবান 'দ্রব্যযজ্ঞ' শব্দ প্রয়োগ করে এই ভাব দেখিয়েছেন যে পরমাত্মার প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে লোকসেবায় দ্রব্য ব্যবহার করার জন্য নিঃস্বার্থভাবে কর্ম করাও যজ্ঞার্থ কর্ম করার অন্তর্গত।

প্রশ্ন—'তপোযজ্ঞ' কোন্ কর্মকে বলা হয় ? এই যজ্ঞে কার অধিকার ?

উত্তর—পরমাত্মা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে, অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদি পবিত্র করার উদ্দেশ্যে মমত্ব, আসক্তি ও ফলেচ্ছা ত্যাগ করে ব্রত-উপবাস করা, ধর্মপালনের জন্য কষ্ট সহ্য করা, মৌন ধারণ করা, অগ্নি ও সূর্যের এবং বায়ুর তেজ সহ্য করা, একটি বা দুটির বেশি বস্ত্রের অধিকার ত্যাগ করা, অন্ন ত্যাগ করা, ফল বা কেবল দুধ খেয়ে শরীর নির্বাহ করা ; বনবাস করা ইত্যাদি শাস্ত্রবিধি অনুসারে তিতিক্ষা-সম্পর্কীয় যেসব ক্রিয়া আছে—সে সবেরই বাচক এই 'তপোযজ্ঞ'। বাণপ্রস্থ আশ্রমবাসীদের তো এতে পূর্ণ অধিকার থাকেই ; অন্য আশ্রমবাসীগণও শাস্ত্রবিধি অনুসারে এর পালন করতে পারেন। নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে সকল আশ্রমবাসীই এর অধিকারী।

প্রশ্ন—এখানে 'যোগযজ্ঞ' শব্দ কোন্ কর্মের বাচক এবং এখানে '**যোগযজ্ঞাঃ**' পদটি প্রয়োগের কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—এখানে 'যোগযজ্ঞ' শব্দটি যে কোন্ কর্মের বাচক, তা একমাত্র ভগবানই জানেন ; কারণ এর বিশেষ কোনো লক্ষণ এখানে বলা হয়নি। কিন্তু অনুমান করা যায় যে, চিত্তবৃত্তি-নিরোধরূপ যে অষ্টাঙ্গযোগ—সম্ভবতঃ তারই বাচক এই 'যোগযজ্ঞ' শব্দটি। সুতরাং এখানে '**যোগযজ্ঞাঃ**' পদটি প্রয়োগের এই ভাব বুঝতে হবে যে বহু সাধক পরমাত্মা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে আসক্তি, ফলেচ্ছা, মমতা ত্যাগ করে এই অষ্টাঙ্গ যোগরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাঁদের সেই যোগসাধনরূপ কর্মও যজ্ঞার্থ কর্মের অন্তর্গত, সুতরাং তাঁদেরও সমস্ত কর্ম বিলীন হয়ে সনাতন ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়।

প্রশ্ন—উপরোক্ত অষ্টাঙ্গযোগের আটটি অঙ্গ কী কী ?

উত্তর—পাতঞ্জলযোগদর্শনে এর বর্ণনা এইভাবে করা হয়েছে—

'যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি' (২।২৯)

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি—যোগের এই আটটি অঙ্গ।

এর মধ্যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার—এই পাঁচটি বহিরঙ্গ এবং ধারণা, ধ্যান, সমাধি—এই তিনটি অন্তরঙ্গ সাধন।

'ত্রয়মেকত্র সংযমঃ।' (যোগদর্শন ৩।৪)

এই তিনের সমুদায়কে সংযম বলে।

'অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহ যমাঃ।'

(যোগদর্শন ২।৩০)

কোনো প্রাণীকে কোনোপ্রকার বিন্দুমাত্র কষ্ট কখনও না দেওয়া (অহিংসা) ; হিতচিন্তায় মিথ্যাবর্জিত প্রিয় শব্দে যথার্থ ভাষণ (সত্য) ; কোনোভাবেই কারো স্বত্ব—অধিকার চুরি না করা বা ছিনিয়ে না নেওয়া (অস্তেয়) ; কায়-মনো-বাক্যে সমস্ত অবস্থায় সদা-সর্বদা সর্ব প্রকার মৈথুন পরিত্যাগ করা (ব্রহ্মচর্য) এবং শরীর নির্বাহের অতিরিক্ত ভোগ্যসামগ্রী কখনও সংগ্রহ না করা (অপরিগ্রহ)—এই পাঁচটিকে **'যম'** বলা হয়।

'শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ'।

(যোগদর্শন ২।৩২)

সর্বপ্রকারে বাহ্য ও অন্তরের পবিত্রতা (শৌচ) ; প্রিয়-অপ্রিয়, সুখ-দুঃখ ইত্যাদিতে সদা-সর্বদা সন্তুষ্ট থাকা (সন্তোষ) ; একাদশী ইত্যাদি ব্রত-উপবাস পালন করা (তপ) ; কল্যাণপ্রদ শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন এবং ঈশ্বরের নাম-গুণ কীর্তন (স্বাধ্যায়) ; সর্বস্ব ঈশ্বরকে অর্পণ করে তাঁর নির্দেশ পালন করা (ঈশ্বর প্রণিধান)—এই পাঁচটির নাম **'নিয়ম'**।

'স্থিরসুখমাসনম্' (যোগদর্শন ২।৪৬)

সুখপূর্বক স্থিরতার সঙ্গে বসাকে বলা হয় **'আসন'**[1]।

'তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসযোর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।' (যোগ. ২।৪৯)

আসনে সিদ্ধ হয়ে শ্বাস ও প্রশ্বাসের গতি রোধ করাকে বলা হয় প্রাণায়াম। বাইরের বায়ুকে ভিতরে প্রবেশ করাকে শ্বাস এবং ভিতরের বায়ুকে বাইরে বার করাকে বলা হয় প্রশ্বাস ; এই দুটিকে রোধ করাকে বলা হয় **'প্রাণায়াম'**।

'বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তির্দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ।' (যোগ. ২।৫০)

দেশ, কাল, সংখ্যা (মাত্রা)র সম্বন্ধে বাহ্য, আভ্যন্তর ও স্তম্ভবৃত্তিসম্পন্ন—এই তিনটি প্রাণায়াম দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হয়ে থাকে।

ভিতরের শ্বাস বাইরে বার করে, বাইরেই রোধ করাকে 'বাহ্য কুম্ভক' বলা হয়। এর নিয়ম এইরূপ—আট বার প্রণব (ওঁ) দ্বারা রেচক করে ষোলো বার বাহ্য কুম্ভক করা এবং পরে চার বার করে পূরক করা—এই ভাবে রেচক-পূরকের সঙ্গে বাহ্য কুম্ভক করার নাম **'বাহ্যবৃত্তি প্রাণায়াম'**।

বাইরের শ্বাসকে ভিতরে টেনে ভিতরে তাকে রোধ করার নাম 'আভ্যন্তর কুম্ভক'। এর নিয়ম হল চার বার প্রণব দ্বারা পূরক করে ষোলো বার আভ্যন্তর কুম্ভক করা। তারপর আট বার রেচক করা। এইভাবে রেচক-পূরকের সঙ্গে ভিতর কুম্ভক করার নাম **'আভ্যন্তরবৃত্তি প্রাণায়াম'**।

বাইরে বা ভিতরে যে কোনো স্থানে সুখসহ প্রাণকে রুদ্ধ করাকে বলা হয় স্তম্ভবৃত্তি প্রাণায়াম। চার বার প্রণব দ্বারা পূরক করে আট বার রেচক করা ; এইভাবে পূরক-রেচক করতে করতে যেখানে প্রাণ রুদ্ধ হয় তাকে বলা হয় **স্তম্ভবৃত্তি প্রাণায়াম**।

এর আরও বহুপ্রকার ভেদ আছে ; যত সংখ্যা এবং যত কাল পূরকে লাগানো সম্ভব, ততই সংখ্যা এবং কাল রেচক ও কুম্ভকে লাগানো যেতে পারে।

প্রাণবায়ুর জন্য নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ বা নাসিকার অভ্যন্তর ভাগের নাম 'আভ্যন্তর দেশ' আর নাসাপুটের বাইরে ষোলো আঙুল পর্যন্ত 'বাহ্য দেশ'। যে সাধক পূরক প্রাণায়াম করার সময় নাভি পর্যন্ত শ্বাস টানেন, তিনি ষোলো আঙুল পর্যন্ত তা বাইরে ত্যাগ করেন ; যিনি হৃদয় পর্যন্ত ভিতরে টানেন, তিনি বারো আঙুল বাইরে ত্যাগ করেন, যিনি কণ্ঠ পর্যন্ত শ্বাস টানেন, তিনি আট আঙুল বাইরে ত্যাগ করেন আর যিনি নাকের ভিতর ওপরের শেষভাগ পর্যন্ত শ্বাস টানেন, তিনি চার আঙুল বাইরে শ্বাস ফেলেন। এতে পূর্ব-পূর্ব থেকে উত্তর-উত্তরদের 'সূক্ষ্ম' এবং পূর্ব-পূর্বদের 'দীর্ঘ' বলে জানতে হবে।

প্রাণায়ামে সংখ্যা ও কালের পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হওয়ায় এর নিয়মে কোনো ব্যতিক্রম হওয়া উচিত নয়। যেমন চার বার প্রণব দ্বারা পূরক করার সময় এক

[1] আসন নানাপ্রকারের। তারমধ্যে আত্মসংযম আকাঙ্ক্ষাকারী পুরুষের জন্য সিদ্ধাসন, পদ্মাসন ও স্বস্তিকাসন—এই তিনটি অত্যন্ত উপযোগী বলে মানা হয়। এর মধ্যে যে কোনো আসনেই—মেরুদণ্ড, মস্তক ও গ্রীবা অবশ্যই সোজা করে রাখতে হবে এবং দৃষ্টি নাসিকাগ্র অথবা ভ্রূকুটির মধ্যস্থলে রাখতে হবে। আলস্য যদি না আসে তাহলে চক্ষু মুদ্রিত করেও বসতে পারা যায়। যে ব্যক্তি যে আসনে সুখসহ দীর্ঘকালধরে বসতে সক্ষম, তাঁর পক্ষে সেই আসনই উত্তম।

সেকেন্ড সময় লাগলে ষোলো বার প্রণব দ্বারা কুম্ভক করার সময় চার সেকেন্ড এবং আট বার প্রণব দ্বারা রেচক করার সময় দু সেকেন্ড সময় লাগা উচিত। মন্ত্র গণনার নাম 'সংখ্যা বা মাত্রা' তাতে যে সময় লাগে তাকে বলা হয় 'কাল'। যদি সহজসাধ্য হয় তাহলে সাধক ওপরে বলা কাল ও মাত্রা দ্বিগুণ, তিনগুণ, চারগুণ অথবা যত ইচ্ছা বাড়াতে পারেন। কাল ও মাত্রার আধিক্য এবং ন্যূনতায় প্রাণায়াম, দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হয়ে থাকে।

'বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ।' (যোগদর্শন ২।৫১)

রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ যেগুলি ইন্দ্রিয়ের বাহ্য বিষয় এবং সংকল্প-বিকল্পাদি যা অন্তঃকরণের বিষয়, তা ত্যাগের দ্বারা—সেগুলি উপেক্ষা করলে প্রাণের যে গতি স্বতঃই অবরুদ্ধ হয়, তাকে বলা হয় **'চতুর্থ প্রাণায়াম'**।

পূর্বসূত্রে বলা প্রাণায়ামে প্রাণের নিরোধে মন সংযম আর এখানে মন ও ইন্দ্রিয়াদির সংযমে প্রাণের সংযম হয়। এখানে প্রাণকে রুদ্ধ করার কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই—যে কোনো স্থানে রুদ্ধ করা সম্ভব, কাল ও সংখ্যারও কোনো বিধান নেই।

'স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ।' (যোগদর্শন ২।৫৪)

নিজ নিজ বিষয়ে সংযোগ রহিত হলে ইন্দ্রিয়ের চিত্তের ন্যায় রূপে অবস্থিত হয়ে যাওয়াকে বলা হয় **'প্রত্যাহার'**।

'দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা'। (যোগদর্শন ৩।১)

চিত্তকে কোনো এক দেশবিশেষে স্থির করার নাম **'ধারণা'**। অর্থাৎ স্থূল-সূক্ষ্ম বা বাহ্য-অভ্যন্তর—কোনো একটি ধ্যেয় স্থানে চিত্তকে বদ্ধ রাখা, স্থির করে দেওয়া বা ব্যাপৃত করাকে ধারণা বলে।

এখানে পরমেশ্বরের বিষয় ; তাই ধ্যান, ধারণা ও সমাধি পরমেশ্বরেরই করা উচিত।

'তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্'। (যোগদর্শন ৩।২)

ঐ পূর্বোক্ত ধ্যেয় বস্তুতে চিত্তবৃত্তির অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের নাম ধ্যান। অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিকে গঙ্গার প্রবাহের ন্যায় বা তৈলধারার মতো অবিচ্ছিন্নরূপে ধ্যেয় বস্তুতে নিয়োজিত করাকেই ধ্যান বলা হয়।

'তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ।' (যোগদর্শন ৩।৩)

যখন শুধুমাত্র ধ্যেয় স্বরূপেরই ভান হয় এবং নিজ স্বরূপের ভান অন্তর্হিত হয়ে যায়, সেই সময় সেই ধ্যানই সমাধিতে পরিণত হয়। ধ্যান করতে করতে যোগীর চিত্ত যখন ধ্যেয়াকারকে প্রাপ্ত হয় এবং তিনি নিজেও ধ্যেয়তে তন্ময়-চিত্ত হয়ে যান, ধ্যেয় ব্যতীত নিজের বলে কোনো জ্ঞান থাকে না—সেই স্থিতির নাম সমাধি।

ধ্যানে ধ্যাতা, ধ্যান, ধ্যেয়—এই ত্রিপুটি থাকে। সমাধিতে কেবল লক্ষ্য বস্তু—ধ্যেয় থাকে অর্থাৎ ধ্যাতা, ধ্যান, ধ্যেয় তিনেরই ঐক্য হয়ে যায়।

প্রশ্ন—সাতাশতম শ্লোকে কথিত আত্মসংযমযোগ-রূপ যজ্ঞে এবং এতে কী পার্থক্য ?

উত্তর—ওখানে ধ্যান-ধারণা-সমাধিরূপ অন্তরঙ্গ সাধনের প্রাধান্য ; যম, নিয়ম, আসন, প্রত্যাহারের নয়। এগুলি স্বতঃই তার মধ্যে এসে যায় এবং এখানে সবকিছুই সাধনার ক্রমে করার কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে 'যোগ' শব্দের দ্বারা কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগকে না নিয়ে অষ্টাঙ্গযোগকে কেন নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর—ভগবদ্‌প্রাপ্তির সাধন হওয়ায় এখানে সকল যজ্ঞই কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ—এই দুটি নিষ্ঠার অন্তর্গত। তাই এখানে 'যোগ' শব্দ দ্বারা প্রধানতঃ শুধু জ্ঞানযোগ বা শুধু কর্মযোগকে নেওয়া যায় না।

প্রশ্ন—'যতয়ঃ' পদটির অর্থ চতুর্থাশ্রমী সন্ন্যাসী না করে প্রযত্নশীল ব্যক্তি করার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—স্বাধ্যায়রূপ জ্ঞানযজ্ঞের অনুষ্ঠান সকল আশ্রমবাসীই করতে পারেন, তাই এখানে **'যতয়ঃ'** পদের অর্থ প্রযত্নশীল করা হয়েছে। একথা অবশ্য ঠিক যে, সন্ন্যাস-আশ্রমে গৃহস্থের ন্যায় নিত্য-নৈমিত্তিক জীবিকা কর্ম করা কর্তব্য নয়, তাই তাঁরা এই অনুষ্ঠান বেশি করে করতে পারেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যেও যাঁরা যত্নশীল, তাঁরাই এরূপ করতে পারেন ; সুতরাং 'যতয়ঃ' পদটির অর্থ এখানে 'প্রযত্নশীল'ই ঠিক বলে মনে হয়। তাছাড়া ব্রহ্মচর্যাশ্রমেও স্বাধ্যায়ের প্রাধান্য আছে, স্বাধ্যায়রূপ জ্ঞানযজ্ঞকারীদের জন্যই 'যতয়ঃ' পদটি প্রযুক্ত হয়েছে ; তাইজন্যও এখানে এর অর্থ সন্ন্যাসী করা হয়নি।

প্রশ্ন—**'সংশিতব্রতাঃ'** পদটির অর্থ কী এবং এটি

'যতয়ঃ' পদের বিশেষণ মনে না করে শ্লোকের পূর্বার্ধে উল্লিখিত তপোযজ্ঞকারীদের থেকে ভিন্ন প্রকার ব্রতকারী পুরুষদের বাচক মনে করলে কী আপত্তি ?

উত্তর—যাঁরা অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহাদি সদাচার পালন করার নিয়ম যথাযথভাবে ধারণ করেছেন ও রাগ-দ্বেষ, অভিমানাদি দোষরহিত, এরূপ ব্যক্তিদের বলা হয় 'সংশিতব্রতাঃ'। 'সংশিতব্রতাঃ' পদে 'যজ্ঞ' শব্দ নেই, তাই এটি ভিন্ন প্রকারের ব্রতযজ্ঞকারীদের বাচক মনে না করে 'যতয়ঃ'র বিশেষণ মেনে নেওয়াই সঠিক বলে মনে হয়।

প্রশ্ন—'স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞ' কোন্ কর্মের বাচক এবং তাকে 'স্বাধ্যায়যজ্ঞ' না বলে 'স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞ' বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যেসব শাস্ত্রে ভগবানের তত্ত্ব, তাঁর গুণ, প্রভাব, চরিত্রের এবং তাঁর সাকার-নিরাকার, সগুণ-নির্গুণ স্বরূপের বর্ণনা থাকে—এরূপ শাস্ত্র অধ্যয়ন, ভগবানের স্তুতিপাঠ, তাঁর নাম ও গুণকীর্তন, বেদ-বেদাঙ্গ অধ্যয়ন —এসবই করাকে বলে স্বাধ্যায়। এরূপ স্বাধ্যায় অর্থজ্ঞানের সঙ্গে করা হলে এবং মমতা, আসক্তি, ফলেচ্ছাবর্জিত হয়ে করা হলে তাকে বলা হয় 'স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞ'। এই পদে স্বাধ্যায়ের সঙ্গে 'জ্ঞান' শব্দের সমাস করে এই ভাব দেখানো হয়েছে যে স্বাধ্যায়রূপ কর্মও জ্ঞানযজ্ঞই, তাই গীতা অধ্যয়নকেও ভগবান 'জ্ঞানযজ্ঞ' নামে অভিহিত করেছেন (১৮।৭০)।

সম্বন্ধ—দ্রব্যযজ্ঞ ইত্যাদি চার প্রকার যজ্ঞের সংক্ষেপে বর্ণনা করে এবার দুটি শ্লোকে প্রাণায়ামরূপ যজ্ঞের বর্ণনা করে সর্বপ্রকারযজ্ঞকারী সাধকদের প্রশংসা করেছেন—

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।। ২৯
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ।। ৩০

অন্যান্য বহু যোগী অপানবায়ুতে প্রাণবায়ু আহুতি দেন, তেমনই কেউ আবার প্রাণবায়ুতে অপানের আহুতি দেন। অন্য বহু নিয়মিত আহারী যোগী প্রাণায়ামপরায়ণ হয়ে প্রাণ ও অপানের গতিরুদ্ধ করে প্রাণকে প্রাণে আহুতি দেন, এই সকল সাধক যোগী যজ্ঞের দ্বারা পাপনাশকারী যজ্ঞসমূহের জ্ঞাতা হন।। ২৯-৩০

প্রশ্ন—এখানে 'জুহ্বতি' ক্রিয়া প্রয়োগের কী ভাবার্থ ?

উত্তর—প্রাণায়ামের সাধনকে যজ্ঞের রূপ প্রদানের জন্য 'জুহ্বতি' ক্রিয়াটি প্রয়োগ করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, প্রাণায়ামরূপী সাধনও যজ্ঞ। সুতরাং মমতা, আসক্তি ও ফলেচ্ছাত্যাগপূর্বক, পরমাত্মার প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে প্রাণায়াম করাও যজ্ঞার্থ কর্ম হওয়ায় এটি মানুষকে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত করে এবং পরমাত্মা প্রাপ্তি করায়।

প্রশ্ন—অপানবায়ুতে প্রাণবায়ুর আহুতি দেওয়ার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—যোগের বিষয় অত্যন্ত দুর্বিজ্ঞেয় এবং রহস্যপূর্ণ। অনুভবী যোগী পুরুষগণই তা জানেন এবং তাঁরাই সঠিকভাবে বোঝাতে সক্ষম। সুতরাং এই বিষয়ে যা কিছু নিবেদন করা হচ্ছে, তা শাস্ত্রদৃষ্টিতে যুক্তি দ্বারা বুঝে নেওয়ার কথাই লেখা হচ্ছে। শাস্ত্রে প্রাণায়ামের বহু বিভিন্নতার কথা বলা আছে ; এদের মধ্যে কাকে লক্ষ্য করে ভগবানের বক্তব্য, তা বস্তুতঃ ভগবানই জানেন। শাস্ত্রে অপানের স্থান গুহ্যদ্বার এবং প্রাণের স্থান হৃদয় বলা হয়েছে। বাইরের বায়ু ভিতরে প্রবেশ করানোকে বলা হয় শ্বাস, এটিকেই অপানের গতি মানা হয় ; কারণ অপানের স্থান অধঃ এবং বাইরের বায়ু ভিতরে প্রবেশের সময় তার গতি শরীরের নীচের দিকে থাকে। তেমনই ভিতরের বায়ু বাইরে বার করাকে বলা হয় প্রশ্বাস। একে প্রাণের গতি মানা হয় ; কারণ প্রাণের স্থান ওপরে এবং ভিতরের বায়ু নাকের দ্বারা বাইরে বার হবার সময় তার গতি শরীরের ওপর দিকে হয়।

উপরোক্ত প্রাণায়ামরূপ যজ্ঞে অপানবায়ু অগ্নি স্থানীয় এবং প্রাণবায়ু হবিঃস্থানীয়। অতএব জানতে হবে যে, যাকে পূরক প্রাণায়াম বলা হয়, সেটিই এখানে অপানবায়ুতে প্রাণবায়ুর আহুতি দেওয়া। কারণ সাধক যখন পূরক প্রাণায়াম করেন, তখন বাইরের বায়ুকে নাসিকা দ্বারা শরীরে নিয়ে যান, তখন সেই বাইরের বায়ু হৃদয়ে স্থিত প্রাণবায়ুকে সঙ্গে নিয়ে নাভি থেকে ওঠা অপানে বিলীন হয়ে যায়। এই সাধনে বারংবার বাইরের বায়ুকে ভিতরে নিয়ে সেখানেই রুদ্ধ করা হয়, তাই একে আভ্যন্তর কুম্ভকও বলা হয়।

প্রশ্ন—প্রাণবায়ুতে অপানবায়ুর আহুতি দেওয়া কাকে বলে ?

উত্তর—এই অন্য প্রাণায়ামরূপ যজ্ঞে অগ্নিস্থানীয় প্রাণবায়ু এবং হবিঃস্থানীয় থাকে অপানবায়ু। সুতরাং বুঝতে হবে যে, যাকে রেচক প্রাণায়াম বলে, সেটিই এখানে প্রাণবায়ুতে অপানবায়ুকে আহুতি দেওয়া। কারণ সাধক যখন রেচক প্রাণায়াম করেন তখন তিনি ভিতরের বায়ু নাসিকা দ্বারা শরীরের বাইরে বের করে রুদ্ধ করেন ; সেই সময় প্রথমে হৃদয়ে স্থিত প্রাণবায়ু বাইরে এসে স্থিত হয় এবং পরে অপানবায়ু এসে তাতে বিলীন হয়। এই সাধনে বারবার ভিতরের বায়ুকে বাইরে এনে সেখানেই রোধ করা হয়, সেইজন্য একে বাহ্য কুম্ভকও বলা হয়।

প্রশ্ন—**'নিয়তাহারাঃ'** বিশেষণের অর্থ কী ?

উত্তর—যিনি যোগশাস্ত্রে বলা নিয়মানুসারে প্রাণায়ামের উপযুক্ত সাত্ত্বিক (১৭।৮) ও পরিমিত ভোজন করেন অর্থাৎ যোগশাস্ত্রের নিয়মের অধিক খান না বা অনাহারেও থাকেন না, এরূপ ব্যক্তিদের বলা হয় **'নিয়তাহারাঃ'**, কারণ উপযুক্ত খাদ্যগ্রহণকারীর যোগই সিদ্ধ হয় (৬।১৭), অধিক ভোজনকারী বা ভোজন ত্যাগকারীর যোগ সিদ্ধ হয় না (৬।১৬)।

প্রশ্ন—**'প্রাণায়ামপরায়ণাঃ'** বিশেষণের অর্থ কী ?

উত্তর—যিনি প্রাণকে নিয়মন করায় অর্থাৎ বারবার প্রাণকে রুদ্ধ করার অভ্যাস করায় তৎপর এবং এটিই পরমাত্মা প্রাপ্তির প্রধান সাধন বলে মনে করেন, সেই ব্যক্তিকে **'প্রাণায়ামপরায়ণাঃ'** বলা হয়।

প্রশ্ন—এখানে **'নিয়তাহারাঃ'** এবং **'প্রাণায়ামপরায়ণাঃ'** এই দুটি বিশেষণের সম্বন্ধ তিন প্রকার প্রাণায়ামকারীদের সঙ্গে না ধরে শুধু প্রাণেতে প্রাণের আহুতি প্রদানকারীদের সঙ্গে ধরার অভিপ্রায় কী ? অন্য সাধকেরা কি নিয়তাহারী এবং প্রাণায়ামপরায়ণ হন না ?

উত্তর—উপরোক্ত প্রাণায়ামরূপ যজ্ঞকারী সকল যোগীকেই নিয়তাহারী ও প্রাণায়ামপরায়ণ বলা যেতে পারে। অতএব এই দুটি বিশেষণের সম্বন্ধ সকলের সঙ্গে মেনে নেওয়ায় বাস্তবে আপত্তিকর নয়, কিন্তু উপরোক্ত শ্লোকে দুটি বিশেষণই তৃতীয় সাধকদের সমীপবর্তী। তাই ব্যাখ্যাতে এই বিশেষণগুলির সম্বন্ধ 'কেবল কুম্ভক' যোগকারীদের সঙ্গেই মানা হয়েছে। কিন্তু ভাবার্থরূপে প্রাণে অপান আহুতি প্রদানকারী ও অপানে প্রাণের আহুতি প্রদানকারী সাধকদের সঙ্গেও এই বিশেষণগুলির সম্পর্ক ধরা যেতে পারে।

প্রশ্ন—ত্রিশতম শ্লোকে 'প্রাণ' শব্দে বহুবচন প্রয়োগ করা হয়েছে কেন ? প্রাণ ও অপানের গতি রুদ্ধ করে প্রাণসমূহকে প্রাণে আহুতি দেওয়া কাকে বলে ?

উত্তর—শরীরের অভ্যন্তরে থাকা বায়ুর পাঁচটি ভাগ মানা হয়—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। এরমধ্যে প্রাণের স্থান হৃদয়, অপানের গুহ্যদ্বার, সমানের নাভি, উদানের কণ্ঠ এবং ব্যানের স্থান সমস্ত শরীরে মানা হয়। বায়ুর এই পাঁচটি ভাগকে 'পঞ্চপ্রাণ'ও বলা হয়। সুতরাং এই পাঁচভাগ বায়ুকে জয় করে এই সবগুলি নিরোধ করার সাধনকে যজ্ঞের রূপ দেবার জন্য প্রাণশব্দে বহুবচন প্রয়োগ করা হয়েছে। এই সাধনাতে অগ্নি এবং আহুতি প্রদান করার দ্রব্য উভয় স্থানে প্রাণকেই রাখা হয়েছে। তাই বুঝতে হবে যে, যে প্রাণায়ামে প্রাণ ও অপান—এই দুটিরই গতি রুদ্ধ করা হয় অর্থাৎ পূরক প্রাণায়ামও করা হয় না এবং রেচকও না, কিন্তু শ্বাস ও প্রশ্বাস বন্ধ করে প্রাণ-অপান ইত্যাদি সমস্ত বায়ুভেদকে নিজ নিজ স্থানে রোধ করা হয়—সেটিকেই এখানে প্রাণ ও অপানের গতি রুদ্ধ করে প্রাণকে প্রাণে আহুতি দেওয়া বলা হয়েছে। এই সাধনায় বাইরের বায়ুকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে রুদ্ধ করা হয় না এবং ভিতরের বায়ুকেও বাইরে এনে রুদ্ধ করা হয় না ; নিজ নিজ স্থানে অবস্থিত পঞ্চবায়ুভেদকে সেখানেই রোধ করা হয়। তাই এটিকে **'কেবল কুম্ভক'** বলে।

প্রশ্ন—উপরোক্ত ত্রিবিধ প্রাণায়ামরূপ যজ্ঞে জপ করা আবশ্যক কি না ? যদি আবশ্যক হয় তাহলে প্রণব

(ওঁ)ই জপ করা উচিত নাকি অন্য নামও জপ করা যায় ?

উত্তর—প্রণব (ওঁ) সচ্চিদানন্দঘন পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মার বাচক (১৭।২৩) ; যে কোনো শুভকর্মের প্রারম্ভে এটি উচ্চারণ করা কর্তব্য মনে করা হয় (১৭।২৪)। তাই এই প্রকরণে যতপ্রকার যজ্ঞের বর্ণনা করা হয়েছে, তার সবগুলিতে ভগবানের নাম অবশ্যই যোগ করা উচিত। একথাও ঠিক যে প্রণবের স্থানে শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীশিব ইত্যাদি যে নামে রুচি ও শ্রদ্ধা থাকে, সেই নামও যোগ করা সম্ভব। কারণ সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মার সকল নামের ফল শ্রদ্ধা অনুসারে লাভপ্রদ হয়ে থাকে। এখানে সব সাধনকে যজ্ঞের রূপ দেওয়া হয়েছে এবং বিনা মন্ত্রের যজ্ঞকে তামসযজ্ঞ মনে করা হয় (১৭।১৩) ; তাইজন্যও মন্ত্রস্থানীয় ভগবদ্ নামের প্রয়োগ পরম আবশ্যক। উপরোক্ত প্রাণায়ামরূপ যজ্ঞে এক, দুই, তিন ইত্যাদি সংখ্যার প্রয়োগে মাত্রা ইত্যাদির জ্ঞান রাখলে মন্ত্রের অভাব থেকে যায় ; তাই সেটি সাত্ত্বিক যজ্ঞ হয় না। সুতরাং বুঝতে হবে যে প্রাণায়ামরূপ যজ্ঞে নামজপ পরম আবশ্যক। সেই সঙ্গে ইষ্ট দেবতার ধ্যানও করতে থাকা উচিত।

প্রশ্ন—উপরোক্ত সকল সাধক যজ্ঞাদি দ্বারা পাপ নাশ করেন এবং যজ্ঞ সম্বন্ধে জানেন, এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—তেইশতম শ্লোকে বলা হয়েছে যে, যজ্ঞের জন্য যাঁরা কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁদের সমগ্র কর্ম বিলীন হয়ে যায়, সেই কথাই এই বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে চব্বিশতম শ্লোক থেকে এই পর্যন্ত যেসব যজ্ঞকারী সাধক পুরুষদের বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁরা সকলেই মমতা, আসক্তি, ফলেচ্ছারহিত হয়ে যজ্ঞার্থে উপরোক্ত সাধনের অনুষ্ঠান করে তার সাহায্যে পূর্বসঞ্চিত কর্ম-সংস্কার রূপ সমস্ত কর্মবিনাশ করে থাকেন, তাই তাঁরা যজ্ঞের তত্ত্ব জানেন। যেসব ব্যক্তি উপরোক্ত সাধনগুলির মধ্যে থেকে তাঁদের পছন্দমতো সাধন সকামভাবে কোনো জাগতিক ফলপ্রাপ্তির আশায় করেন, তাঁরা যদিও যারা যজ্ঞ করে না তাদের থেকে অনেক ভালো, কিন্তু যজ্ঞের তত্ত্ব বুঝে যজ্ঞার্থ কর্ম না করায়, তাঁরা কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হন না।

সম্বন্ধ—এইরূপ যজ্ঞকারী সাধকদের প্রশংসা করে এবার ঐসব যজ্ঞ করলে যে লাভ এবং না করলে যে ক্ষতি হতে পারে তা জানিয়ে ভগবান উপরোক্তভাবে যজ্ঞ করার প্রয়োজনীয়তার প্রতিপাদন করছেন—

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম॥ ৩১

হে কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জুন ! যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত অনুভবকারী যোগিগণ সনাতন পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লাভ করেন। আর যাঁরা যজ্ঞ করেন না, তাঁদের ইহলোকই সুখদায়ক হয় না, তাহলে পরলোকে সুখ হবে কী করে ? ৩১

প্রশ্ন—এখানে যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত কী এবং তা অনুভব করা কাকে বলে ?

উত্তর—লোকপ্রসিদ্ধিতে দেবতাদের নিমিত্তে অগ্নিতে ঘৃত ইত্যাদি পদার্থ আহুতি দেওয়াকে যজ্ঞ বলা হয় এবং তার থেকে উদ্বৃত্ত হওয়া হবিষ্যান্নই যজ্ঞশিষ্ট অমৃত। স্মৃতিকারগণ এইভাবে যে পঞ্চমহাযজ্ঞের বর্ণনা করেছেন, তাতে দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, মানুষ এবং অন্য প্রাণীমাত্রের জন্যই অন্নভাগ করে দেওয়ার পর যে উদ্বৃত্ত অন্ন থাকে, তাকেই বলা হয় যজ্ঞশিষ্ট অমৃত ; কিন্তু এখানে ভগবান উপরোক্ত যজ্ঞের রূপকে পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্য জ্ঞান, সংযম, তপ, যোগ, স্বাধ্যায়, প্রাণায়াম ইত্যাদি এমন সাধনের বর্ণনা করেছেন, যাতে অন্নের সম্বন্ধ নেই। তাই এখানে উপরোক্ত সাধনের অনুষ্ঠান করলে সাধকদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়ে তাতে প্রসাদরূপ যে প্রসন্নতা উপলব্ধি হয় (২।৬৪-৬৫ ; ১৮।৩৬-৩৭), সেটিই হল যজ্ঞ থেকে উদ্বৃত্ত অমৃত, এবং এই অমৃতই হল অমৃতস্বরূপ ঈশ্বরপ্রাপ্তিতে হেতু তথা সেই বিশুদ্ধ ভাব হতে উৎপন্ন সুখে নিত্যতৃপ্ত থাকাই হল সেই

অমৃত অনুভব করা।

প্রশ্ন—উপরোক্ত পরমাত্মা প্রাপ্তির সাধনরূপ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিদের সনাতন পরব্রহ্ম প্রাপ্তি ইহজন্মে হয় না জন্মান্তরে হয় ?

উত্তর—এটি তাঁদের সাধনার অবস্থার ওপর নির্ভর করে। যাঁর সাধনায় ভাবের ন্যূনতা নেই, তাঁর ইহজন্মে অত্যন্ত শীঘ্রই সনাতন পরব্রহ্ম লাভ হয় ; যাঁর সাধনে কোনোপ্রকার ত্রুটি থেকে যায়, তাঁর সেই ত্রুটি পূরণ হলেই ঈশ্বর প্রাপ্তি হয়। কিন্তু তাঁর সাধন কখনো ব্যর্থ হয় না, সকল সাধকদেরই অবশ্যই ঈশ্বর লাভ হয় (৬।৪০)—এই ভাবার্থে এখানে সাধারণভাবে এই কথা বলা হয়েছে যে এঁরা সনাতন পরব্রহ্ম লাভ করেন।

প্রশ্ন—সনাতন পরব্রহ্ম প্রাপ্তিতে সগুণ ব্রহ্মের প্রাপ্তি মানা হয় না নির্গুণের ?

উত্তর—সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্ম দুই নয়, সচ্চিদানন্দঘন পরমেশ্বরই সগুণ ব্রহ্ম এবং তিনিই নির্গুণ ব্রহ্ম। নিজ নিজ চিন্তা অনুসারে এবং মেনে নেওয়া অনুযায়ী সাধকের দৃষ্টিতেই শুধু এই তফাৎ, বাস্তবে কোনো তফাৎ নেই। সনাতন পরব্রহ্ম লাভের পর কোনো পার্থক্য থাকে না।

প্রশ্ন—'অযজ্ঞস্য' পদটি এখানে কোন্ মানুষের বাচক ? তাদের জন্য ইহলোকই সুখদায়ক নয়, তাহলে পরলোক সুখদায়ক হবে কীভাবে—এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যে ব্যক্তি উপরোক্ত যজ্ঞগুলির মধ্যে বা শাস্ত্রে বর্ণিত আরও বিভিন্নপ্রকার যজ্ঞ থেকে যে কোনো যজ্ঞ—কোনো ভাবেই করে না, সেই মনুষ্য জীবনের কর্তব্য পালন না করা ব্যক্তিদের বাচক এই **'অযজ্ঞস্য'** পদটি। তার ইহলোক তো সুখদায়ক নয়—তাহলে পরলোক সুখদায়ক হবে কীভাবে—এই কথার দ্বারা এই তাৎপর্য যে উপরোক্ত সাধনগুলির অধিকার লাভ করেও তা না করার জন্য তারা মুক্তি তো পায়ই না, স্বর্গও পায় না এবং মুক্তির দ্বার স্বরূপ এই মনুষ্যদেহেও কখনও শান্তি পায় না ; কারণ পরমার্থ সাধনহীন ব্যক্তি নিত্যনিরন্তর নানাপ্রকার চিন্তায় জর্জরিত থাকে ; পরে অন্য জন্মে, যা শুধুমাত্র ভোগজন্ম হয়ে থাকে এবং যাতে সত্যকার সুখপ্রাপ্তির কোনো উপায় নেই, তাতে শান্তিলাভ হবে কেমন করে ? মনুষ্যদেহে করা শুভাশুভ কর্মাদির ফলই অন্য জন্মে ভোগ করা হয়। সুতরাং যারা এই মনুষ্যদেহে তাদের কর্তব্য পালন করে না, তারা কোনো জন্মেই সুখলাভ করে না।

প্রশ্ন—ইহলোকে যারা শাস্ত্রবিহিত উত্তম কর্ম করে না এবং শাস্ত্রের বিপরীত কর্ম করে, তাদের জীবনে স্ত্রী, পুত্র, ধন, মান, মর্যাদা, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ইষ্ট বস্তুর প্রাপ্তিরূপ সুখ দেখা যায় ; তাহলে একথা বলার কী অভিপ্রায় যে, যারা যজ্ঞ করে না এই মনুষ্যলোক তাদের জন্য সুখদায়ক নয় ?

উত্তর—উপরোক্ত ইষ্টবস্তুর প্রাপ্তিরূপ সুখ পাওয়াও শাস্ত্রবিহিত শুভ কর্মেরই ফল, পাপ কর্মের নয়। এই প্রাপ্ত সুখকে বর্তমান জন্মে কৃত পাপকর্ম বা শুভকর্ম ত্যাগের ফল বলে মনে করা উচিত নয়। তাছাড়া ঐ সুখ বাস্তবিক সুখ নয়। সুতরাং এখানে ভগবানের বলার অভিপ্রায় হল যে, সাধনরহিত মানুষের এই মনুষ্যদেহেও (যা পরমানন্দ- স্বরূপ পরমাত্মা প্রাপ্তির দ্বার) তার মূর্খতার জন্য সাত্ত্বিক সুখ বা সত্যকার সুখ লাভ হয় না, নানা ভোগবাসনার জন্য তাকে নিরন্তর শোক ও চিন্তার সাগরে নিমগ্ন থাকতে হয়।

প্রশ্ন—পুত্রের মাতা-পিতার সেবা করা, স্ত্রীর পতির সেবা করা, শিষ্যের গুরু সেবা করা এবং এইরূপ শাস্ত্র-বিহিত অন্যান্য শুভকর্ম করা যজ্ঞার্থ কর্মের অন্তর্গত কি না এবং যাঁরা এই কর্মগুলি করেন, তাঁরা সনাতন ব্রহ্ম লাভ করেন কি না ?

উত্তর—উপরোক্ত সকল কর্ম স্বধর্ম-পালনের অন্তর্গত। সুতরাং স্বধর্ম পালনরূপ যজ্ঞের পরম্পরা রক্ষার্থে যখন পরমেশ্বরের নির্দেশে নিঃস্বার্থভাবে করা যুদ্ধ ও কৃষি-বাণিজ্যরূপ কর্মও যজ্ঞের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সেগুলি যাঁরা করেন, তাঁরাও সনাতন ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, তাহলে মাতা-পিতা-গুরুজন, পতিকে পরমেশ্বরের মূর্তি মনে করে অথবা পরমেশ্বরকে ব্যাপ্ত মনে করে, বা তাঁদের সেবা করা নিজ কর্তব্য মনে করে তাঁদের সুখী করার জন্য যে নিঃস্বার্থভাবে সেবা করা হয়, তা যজ্ঞের জন্যই করা কর্ম এবং তার দ্বারাও মানুষ যে সনাতন ব্রহ্মলাভ করে—এতে আর বলার কিছু নেই।

প্রশ্ন— এই প্রকরণে ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞের নামে যেসব বিভিন্ন সাধনের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি জ্ঞানযোগীর

দ্বারা করার উপযোগী না কর্মযোগীর দ্বারা ?

উত্তর—চব্বিশতম শ্লোকে যে '**ব্রহ্মযজ্ঞ**' এবং পঁচিশতম শ্লোকের উত্তরার্ধে যে আত্মা-পরমাত্মার অভেদ-দর্শনরূপ যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে, ঐ দুটির অনুষ্ঠান জ্ঞানযোগীই করতে সক্ষম, কর্মযোগী নয়। সেগুলি ব্যতীত বাকি সব যজ্ঞের অনুষ্ঠান জ্ঞানযোগী ও কর্মযোগী উভয়েই করতে পারেন, এতে উভয়ের জন্য কোনোপ্রকার বাধা নেই।

সম্বন্ধ—ষোড়শ শ্লোকে ভগবান বলেছিলেন যে আমি তোমাকে সেই কর্মতত্ত্ব বলব, যা জানলে তুমি অশুভ থেকে মুক্তিলাভ করবে। সেই প্রতিজ্ঞা অনুসারে অষ্টাদশ শ্লোক থেকে এই শ্লোক পর্যন্ত সেই কর্মতত্ত্ব বর্ণনা করে এবার তার উপসংহার করছেন—

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে॥ ৩২

এইরূপ আরও বহুপ্রকার যজ্ঞের কথা বেদে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। তুমি এসবই মন, ইন্দ্রিয় এবং শারীরিক ক্রিয়ার দ্বারা সম্পন্ন হয় বলে জানবে, এইভাবে তত্ত্বতঃ জেনে এর অনুষ্ঠান করলে সর্বতোভাবে কর্মবন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করবে॥ ৩২

প্রশ্ন—এইরূপ আরও বহুপ্রকার যজ্ঞ বেদবাণীতে বিস্তারিত বলা আছে, এই কথাটির কী তাৎপর্য ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে, আমি তোমাকে যে সাধনরূপ যজ্ঞের কথা বলেছি, এগুলিই কেবল নয়, এছাড়াও আরও প্রতীক উপাসনাদি বহু প্রকারের যজ্ঞ এবং পরমাত্মা প্রাপ্তির সাধন বেদে বলা আছে। অহংকার, মমতা, আসক্তি ও ফলেচ্ছা ত্যাগ করে যে সব সাধক ঐসব অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা সব যজ্ঞার্থ কর্মই করে থাকেন। তাই উপরোক্ত যজ্ঞকারী সাধকদের ন্যায় এঁরাও কর্মবন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে সনাতন পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।

প্রশ্ন—এখানে 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ যদি ব্রহ্মা বা পরমেশ্বর মনে করা হয় এবং সেই অনুসারে যজ্ঞাদি বেদবাণীতে বিস্তৃত না মেনে ব্রহ্মার মুখে বা পরমেশ্বরের মুখে বিস্তৃত মেনে নেওয়া হয়, তাহলে আপত্তি কীসের ? কারণ 'প্রজাপতি ব্রহ্মা যজ্ঞসহিত প্রজা উৎপন্ন করেছেন' এই কথা তৃতীয় অধ্যায়ের দশম শ্লোকে উদ্ধৃত আছে এবং 'পরমেশ্বর ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞের সৃষ্টিকর্তা', এটি সপ্তদশ অধ্যায়ের তেইশতম শ্লোকে বলা হয়েছে।

উত্তর—প্রজাপতি ব্রহ্মার উৎপত্তিও পরমেশ্বর থেকেই হয় ; সেইজন্য ব্রহ্মা থেকে উৎপন্ন বেদ, ব্রাহ্মণ ও যজ্ঞ ইত্যাদি ব্রহ্মা থেকে উৎপন্ন বলা বা পরমেশ্বর থেকে উৎপন্ন বলা দুটি একই। এইরূপ বেদে বিভিন্ন যজ্ঞের বিস্তারিত বর্ণনা আছে, বেদের প্রাকট্য ব্রহ্মা থেকে হয়েছে এবং ব্রহ্মার উৎপত্তি পরমেশ্বর থেকে, তাই যজ্ঞাদি পরমেশ্বর থেকে বা ব্রহ্মা থেকে উৎপন্ন বলা অথবা বেদাদি থেকে উৎপন্ন বলা একই কথা। কিন্তু অন্যত্র যজ্ঞাদি বেদ থেকে উৎপন্ন বলা হয়েছে (৩।১৫) এবং তার বিস্তারিত বর্ণনাও বেদে আছে, তাই 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ বেদ মনে করে যে অর্থ করা হয়েছে, তা ঠিকই মনে হয়।

প্রশ্ন—সেই সবগুলি তুমি মন, ইন্দ্রিয় এবং শরীরের ক্রিয়া দ্বারা সম্পন্ন হওয়া বলে জানবে—এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—এই কথায় ভগবান কর্মের সম্পর্কে তিনটি কথা বুঝে নিতে বলেছেন—

১) এখানে সাধনরূপ যে যজ্ঞের কথা বর্ণিত হয়েছে এবং এছাড়াও কর্তব্যকর্মরূপ যা কিছু যজ্ঞশাস্ত্রে বলা হয়েছে, সে সবই মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরের ক্রিয়া দ্বারাই হয় ; এদের মধ্যে কারো সম্পর্ক শুধু মনের সঙ্গে, কারো মন ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে এবং কারো বা মন, ইন্দ্রিয়, শরীর—সবেরই সঙ্গে। এমন কোনো যজ্ঞ নেই, যার এই তিনটির কোনোটির সঙ্গেই সম্বন্ধ নেই। তাই সাধকের উচিত যে, যে সাধন প্রক্রিয়ায় শরীর, ইন্দ্রিয় ও প্রাণের

ক্রিয়া বা সংকল্প-বিকল্প ইত্যাদি মনের ক্রিয়া ত্যাগ করা হয়, সেই ত্যাগরূপ সাধনকেও কর্মই মনে করা এবং সেগুলিও ফলাকাঙ্ক্ষা, আসক্তি ও মমতাবর্জিত হয়ে করা ; নাহলে সেগুলিও বন্ধনের হেতু হয়ে ওঠে।

২) 'যজ্ঞ' নামে কথিত যতপ্রকার শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্ম ও পরমাত্মাপ্রাপ্তির ভিন্ন ভিন্ন সাধন আছে, সেগুলি প্রকৃতির কার্যরূপ মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরের ক্রিয়া দ্বারাই সংঘটিত হয়। তাই যে কোনো কর্মে বা সাধনে জ্ঞানযোগীর কর্তৃত্বের অভিমান থাকা উচিত নয়।

৩) মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরের চেষ্টারূপ কর্ম বিনা পরমাত্মা প্রাপ্তি বা কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি হতে পারে না (৩।৪) ; কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার যতপ্রকার উপায় বলা হয়েছে, সে সবই মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরের ক্রিয়া দ্বারাই সিদ্ধ হয়। সুতরাং যাঁরা পরমাত্মা প্রাপ্তি ও কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হবার ইচ্ছা করেন, তাঁদের মমতা, অভিমান, ফলেচ্ছা ও আসক্তি ত্যাগ করে কোনো একটি সাধনে অবশ্যই তৎপর হওয়া উচিত।

প্রশ্ন—এইভাবে তত্ত্বতঃ জানলে তুমি কর্মবন্ধন হতে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়ে যাবে, এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, অষ্টাদশ শ্লোক থেকে এ পর্যন্ত আমি তোমাকে যে কর্মতত্ত্ব বলেছি, সেই অনুসারে উপরোক্ত প্রকারে সমস্ত যজ্ঞ তত্ত্বতঃ যথাযথভাবে জেনে নিলে তুমি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে ; কারণ এই তত্ত্ব বুঝে কর্ম করেন যে ব্যক্তি, তাঁর কর্ম বন্ধনকারক হয় না, বরং তা পূর্বসঞ্চিত কর্মও নাশ করে মুক্তিদায়ক হয়ে ওঠে।

সম্বন্ধ—উপরোক্ত প্রকরণে ভগবান বিভিন্ন প্রকারের যজ্ঞের বর্ণনা করেছেন এবং একথাও বলেছেন যে এছাড়া আরও বহুযজ্ঞ বেদ-শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত আছে ; তাই এখানে প্রশ্ন হয় যে ঐ যজ্ঞগুলির মধ্যে কোন্ যজ্ঞটি শ্রেষ্ঠ ? তাতে ভগবান বলেছেন—

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥ ৩৩

হে পরন্তপ অর্জুন ! দ্রব্যময় যজ্ঞের থেকে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, কারণ সমস্ত কর্মই জ্ঞানে সমাপ্ত হয় ॥ ৩৩

প্রশ্ন—এখানে দ্রব্যময় যজ্ঞ কোন্ যজ্ঞের বাচক এবং জ্ঞানযজ্ঞ কী ? দ্রব্যময় যজ্ঞের থেকে জ্ঞানযজ্ঞকে শ্রেষ্ঠ বলার কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—যে যজ্ঞে দ্রব্যের অর্থাৎ জাগতিক বস্তুর প্রাধান্য থাকে, তাকে দ্রব্যযজ্ঞ বলা হয়। সুতরাং অগ্নিতে ঘি, চিনি, দই, দুধ, তিল, যব, চাল, চন্দন, কর্পূর, ধূপ ও সুগন্ধিযুক্ত ঔষধি ইত্যাদি দিয়ে বিধিপূর্বক যজ্ঞ করা, পরোপকারের জন্য কুয়া, সরোবর, পুকুর, ধর্মশালা ইত্যাদি নির্মাণ করা, পঞ্চযজ্ঞ করা ইত্যাদি যতপ্রকার সাংসারিক পদার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত শাস্ত্রবিহিত শুভকর্ম —সেগুলি সবই দ্রব্যময় যজ্ঞের অন্তর্গত। উপরোক্ত সাধনে এগুলি দৈবযজ্ঞ, বিষয় আহুতিরূপ যজ্ঞ ও দ্রব্যযজ্ঞ নামে বর্ণিত। এছাড়া বিবেক, বিচার ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সঙ্গে সম্বন্ধিত সাধনসকল জ্ঞানযজ্ঞের অন্তর্গত। এখানে দ্রব্যময় যজ্ঞ থেকে জ্ঞানযজ্ঞকে শ্রেষ্ঠ জানিয়ে ভগবান এইভাব দেখিয়েছেন যে, কোনো সাধক তাঁর অধিকার অনুযায়ী শাস্ত্রবিহিত অগ্নিহোত্র, ব্রাহ্মণ-ভোজন, দান ইত্যাদি শুভ কর্মের অনুষ্ঠান না করে কেবল আত্মসংযম, শাস্ত্রাধ্যয়ন, তত্ত্ববিচার ও যোগসাধন ইত্যাদি বিবেক-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় শুভ কর্মগুলির মধ্যে কোনো একটিরও অনুষ্ঠান করলে একথা ভাবা উচিত নয় যে সে শুভ কর্মগুলি ত্যাগ করেছে, বরং বুঝতে হবে যে সে তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ কার্য করছে। কারণ দ্রব্যযজ্ঞও মমতা, আসক্তি ও ফলেচ্ছা ত্যাগ করে জ্ঞানপূর্বক করা হলেই মুক্তির কারণ হয়, নাহলে এটি উল্টো হয়ে বন্ধনের হেতু হয়ে যায়। কিন্তু এই প্রকারের সাধনে ব্যাপৃত মানুষ তো স্বরূপতঃই বিষয় ত্যাগ করে এবং তাঁদের কার্যে হিংসা দোষ বস্তুতঃ থাকে না— তাই সেটি উত্তম। যথার্থ জ্ঞান (তত্ত্ব জ্ঞান) প্রাপ্তিতে ভাবের প্রাধান্য থাকে, সাংসারিক বস্তুর প্রাচুর্যের নয়। তাই এখানে দ্রব্যময় যজ্ঞের থেকে

জ্ঞানযজ্ঞকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে **'অখিলম্'** ও **'সর্বম্'** বিশেষণের সঙ্গে **'কর্ম'** পদ কীসের বাচক এবং 'যাবন্মাত্র সম্পূর্ণ কর্ম জ্ঞানেই সমাপ্ত হয়ে যায়' এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—উপরোক্ত প্রকরণে যতপ্রকার সাধনরূপ কর্মের কথা বলা হয়েছে এবং এছাড়া আরও যত শুভ কর্মরূপ যজ্ঞ বেদ-শাস্ত্রে বর্ণিত আছে (৪।৩২), সেসবের বাচক এখানে **'অখিলম্'** এবং **'সর্বম্'** বিশেষণের সঙ্গে **'কর্ম'** পদটি। সুতরাং যাবন্মাত্র সম্পূর্ণ কর্ম জ্ঞানে সমাপ্ত হয়ে যায় এই কথায় ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে এই সমস্ত সাধনের শ্রেষ্ঠতম ফল পরমাত্মার যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত করানো। যে ব্যক্তি যথার্থ জ্ঞানের সাহায্যে পরমাত্মা প্রাপ্ত করেন, তাঁর আর কিছু পাওয়ার বাকি থাকে না।

প্রশ্ন—এই শ্লোকে উদ্ধৃত **'জ্ঞানযজ্ঞ'** এবং **'জ্ঞান'** এই দুটি শব্দের অর্থ এক নাকি পৃথক পৃথক ?

উত্তর—দুটির অর্থ এক নয় ; **'জ্ঞানযজ্ঞ'** শব্দটি হল যথার্থ জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য করা বিবেক, বিচার এবং সংযমপ্রধান সাধনগুলির বাচক এবং **'জ্ঞান'** শব্দটি সমস্ত সাধনার ফলরূপ পরমাত্মার যথার্থ জ্ঞানের (তত্ত্ব জ্ঞানের) বাচক। দুটির অর্থে এই পার্থক্য আছে।

সম্বন্ধ—এইভাবে জ্ঞানযজ্ঞের এবং তার ফলরূপ জ্ঞানের প্রশংসা করে এবার দুটি শ্লোকে ভগবান জ্ঞানলাভ করার জন্য অর্জুনকে নির্দেশ দিয়ে জ্ঞান প্রাপ্তির পথ ও তার ফল বলেছেন—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ ৩৪

সেই জ্ঞান তুমি তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীদের নিকট গিয়ে জেনে নাও ; তাঁদের যথাযথভাবে প্রণাম করে, সেবা করে, কপটতা ত্যাগ করে, সরলতাপূর্বক প্রশ্ন করলে সেই পরমাত্মতত্ত্বদর্শী জ্ঞানী মহাত্মা তোমাকে সেই তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দেবেন ॥ ৩৪

প্রশ্ন—এখানে **'তৎ'** পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—পূর্বশ্লোকে সমস্ত সাধনের ফলরূপ যে তত্ত্বজ্ঞানের প্রশংসা করা হয়েছে এবং যা পরমাত্মার স্বরূপের যথার্থ জ্ঞান, তারই বাচক এখানে 'তৎ' পদটি।

প্রশ্ন—সেই জ্ঞানকে জানার জন্য বলার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—ভগবানের বলার এই তাৎপর্য যে, পরমাত্মার যথার্থ তত্ত্ব না জানলে মানুষ জন্ম-মৃত্যুরূপ কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না, তাই তার তাকে অবশ্য জানা উচিত।

প্রশ্ন—এখানে তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীদের থেকে জ্ঞান জেনে নিতে বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভগবান বারংবার পরমাত্মতত্ত্বের কথা বললেও সেটি না বোঝায় অর্জুনের শ্রদ্ধার কিছু ন্যূনতা ছিল বলে মনে হয়। তাই তাঁর শ্রদ্ধা বাড়াবার জন্য অন্য জ্ঞানীদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণের কথা বলে তিনি অর্জুনকে সতর্ক করে দিচ্ছেন।

প্রশ্ন—**'প্রণিপাত'** কাকে বলে ?

উত্তর—শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে সরলতার সঙ্গে নতজানু হয়ে প্রণাম করাকে 'প্রণিপাত' বলে।

প্রশ্ন—**'সেবা'** কাকে বলা হয় ?

উত্তর—শ্রদ্ধা-ভক্তিসহ মহাপুরুষদের কাছে বাস করা, তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর মানসিক ভাব বুঝে নানা ভাবে তাঁকে সুখী করার চেষ্টা—এ সবই সেবার অন্তর্গত।

প্রশ্ন—**'পরিপ্রশ্ন'** কাকে বলে ?

উত্তর—পরমাত্মার তত্ত্ব জানার ইচ্ছায় শ্রদ্ধা ও ভক্তি ভাবে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করাকে বলা হয় 'পরিপ্রশ্ন'। অর্থাৎ 'আমি কে' ? 'মায়া কী' ? 'পরমাত্মার স্বরূপ কী' ? 'আমার ও পরমাত্মার কী সম্বন্ধ' ? 'বন্ধন কী' ?

'মুক্তি কী' ? 'কীরূপ সাধন করলে পরমাত্মা প্রাপ্তি হয়' ? ইত্যাদি অধ্যাত্মবিষয়ক সমস্ত বিষয় শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সরলতা সহকারে জিজ্ঞাসা করাই 'পরিপ্রশ্ন' ; তর্ক-বিতর্কসহ প্রশ্ন করা 'পরিপ্রশ্ন' নয়।

প্রশ্ন—প্রণাম করলে, সেবা করলে এবং সরলতাপূর্বক প্রশ্ন করলে, তত্ত্বজ্ঞানী তোমাকে জ্ঞানের উপদেশ দেবেন—এই কথাটির অভিপ্রায় কী ? জ্ঞানী ব্যক্তিরা কী এই সব ছাড়া জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করেন না ?

উত্তর—উপরোক্ত কথায় ভগবান জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সরল ভাবের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করেছেন। অভিপ্রায় হল যে, শ্রদ্ধারহিত মানুষকে উপদেশ প্রদান করলে, সেটি তার দ্বারা গৃহীত হয় না ; সেইজন্য মহাপুরুষদের প্রণাম, সেবা এবং আদর-সম্মান প্রদর্শনের প্রয়োজন না থাকলেও, অহংকারপূর্বক, পরীক্ষা করার বুদ্ধি নিয়ে, কপটভাবে প্রশ্নকারীদের নিকট তত্ত্বজ্ঞানসম্বন্ধীয় কথা বলতে সেই জ্ঞানী মহাত্মাদের প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং যার তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা থাকে, তার শ্রদ্ধা-ভক্তিসহ মহাপুরুষদের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করা উচিত। তাঁর যথাযথ সেবা করা এবং সময়মতো তাঁর কাছে পরমাত্মতত্ত্ব বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা। এরূপ করলে গো-বৎসকে দেখে যেমন গাভী-মাতার স্তন্য ভারী হয়ে আসে তার সন্তানের জন্য, তেমনই জ্ঞানী ব্যক্তির হৃদয়েও সেই অধিকারীকে উপদেশ দেবার জন্য জ্ঞানের সমুদ্র উথলে ওঠে। তাই শ্রুতিতেও বলা হয়েছে—

'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।' (মুণ্ডকোপনিষদ্ ১।২।১২)

অর্থাৎ সেই তত্ত্বজ্ঞান জানার জন্য সে (জিজ্ঞাসু সাধক) যথাশক্তি সমিধ (যজ্ঞকাষ্ঠ) উপহার হাতে নিয়ে নিরাভিমান হয়ে বেদ-শাস্ত্রজ্ঞাতা তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মা পুরুষের কাছে গমন করবে।

প্রশ্ন— এখানে 'জ্ঞানিনঃ'-এর সঙ্গে 'তত্ত্বদর্শিনঃ' বিশেষণ প্রয়োগের এবং তাতে বহুবচন প্রয়োগের কী তাৎপর্য ?

উত্তর—'জ্ঞানিনঃ'-এর সঙ্গে 'তত্ত্বদর্শিনঃ' বিশেষণ দিয়ে ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে পরমাত্মার তত্ত্ব যথাযথভাবে জানা বেদবেত্তা জ্ঞানী মহাপুরুষই সেই তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিতে সক্ষম, শুধুমাত্র শাস্ত্রজ্ঞাতা সাধারণ মানুষ নয়। এখানে বহুবচন প্রয়োগ করা হয়েছে জ্ঞানী মহাপুরুষদের সম্মান প্রদর্শনের জন্য, একথা জানাবার জন্য নয় যে বহু তত্ত্বজ্ঞানী একত্র হয়ে তোমাকে জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করবেন।

যজ্ জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি।। ৩৫

যা জানলে তুমি আর এরূপ মোহগ্রস্ত হবে না এবং হে অর্জুন ! যে জ্ঞানের সাহায্যে তুমি সমস্ত ভূতকে নিঃশেষে প্রথমে নিজের মধ্যে এবং পরে সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মারূপী আমার মধ্যে দেখতে সক্ষম হবে ।। ৩৫

প্রশ্ন—এখানে 'যৎ' পদটি কীসের বাচক ? তাকে জানা কী ? 'আর এরূপ মোহপ্রাপ্ত হবে না' এই কথাটির কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—এখানে 'যৎ' পদটি পূর্বশ্লোকে বর্ণিত জ্ঞানী মহাপুরুষদের দ্বারা উপদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞানের বাচক এবং সেই উপদেশ অনুসারে পরমাত্মার স্বরূপকে যথাযথ প্রত্যক্ষ করাই সেই জ্ঞানকে জানা। এবং 'আর এরূপ মোহপ্রাপ্ত হবে না' এই কথায় ভগবান এইভাব দেখিয়েছেন যে, এখন তুমি যেরূপ মোহগ্রস্ত হয়ে শোকে নিমগ্ন হয়েছ (১।২৮-৪৭ ; ২।৬, ৮) মহাপুরুষদের উপদিষ্ট জ্ঞান অনুসারে পরমাত্মার সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হলে তুমি আর এরূপ মোহগ্রস্ত হবে না। যেমন রাত্রিকালে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকা অন্ধকার সূর্যোদয় হলে আর থাকে না, তেমনই পরমাত্মার যথার্থ স্বরূপজ্ঞান হলে, 'আমি কে ?' 'জগৎ-সংসার কী ?' 'মায়া কী ?' 'ব্রহ্ম কী ?' ইত্যাদি জানার বাকি থাকে না। ফলতঃ শরীরকে আত্মা মনে করে তার

সঙ্গে সম্পর্কিত প্রাণী ও পদার্থে মমতা করা, দেহের উৎপত্তি-বিনাশে আত্মার জন্ম-মৃত্যু মনে করে সেগুলির সংযোগ-বিয়োগে সুখী-দুঃখী হওয়া বা অন্য কোনো নিমিত্তে রাগ-দ্বেষ বা হর্ষ-বিলাপ করা ইত্যাদি মোহজনিত বিকার তার মধ্যে বিন্দুমাত্র থাকতে পারে না। জাগতিক সূর্য উদয় হয়ে পরে অস্তও যায় এবং অস্তে গেলে জগৎ পুনরায় অন্ধকারে ঢেকে যায় ; কিন্তু জ্ঞানসূর্য একবার উদয় হলে আর কখনো অস্ত যায় না। পরমাত্মার এই তত্ত্বজ্ঞান নিত্য ও অচল, এর কখনো নাশ হয় না। সেইজন্য পরমাত্মার তত্ত্বজ্ঞান হওয়ার পর মোহের উৎপত্তি হওয়া সম্ভবই নয়। শ্রুতি বলেছেন—

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।।

(ঈশাবাস্যোপনিষদ্ ৭)

অর্থাৎ যখন তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত পুরুষদের কাছে সমস্তপ্রাণী আত্মস্বরূপ হয়ে ওঠে, তখন সেই একত্বদর্শী পুরুষদের কী কোনো শোক আর কোনো মোহ হতে পারে ? অর্থাৎ এসব কিছুই হতে পারে না।

প্রশ্ন—জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত প্রাণীকে নিঃশেষভাবে আত্মার অন্তর্গত দেখার কী অর্থ ?

উত্তর—মহাপুরুষদের কাছ থেকে পরমাত্মার তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ লাভ করে আত্মাকে সর্বব্যাপী, অনন্ত স্বরূপ বলে জানা, সমস্ত প্রাণীতে ভেদ-বুদ্ধির বিনাশ হয়ে সর্বত্র আত্মভাব হওয়া— অর্থাৎ যেমন স্বপ্নোত্থিত মানুষ স্বপ্নের জগৎকে নিজ স্মৃতিমাত্র মনে করে, প্রকৃতপক্ষে নিজের থেকে পৃথক অন্য কোনো সত্তা বলে দেখে না, তেমনই সমস্ত জগৎকে নিজের সঙ্গে অভিন্ন এবং নিজের অন্তর্গত মনে করা অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীকে নিঃশেষে আত্মার অন্তর্গত দেখা (৬।২৯)। এইরূপ আত্মজ্ঞান হলেই মানুষের শোক ও মোহ সর্বতোভাবে দূর হয়ে যায়।

প্রশ্ন—এইরূপ আত্মদর্শন হওয়ার পর সমস্ত প্রাণীকে সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাতে দেখা কাকে বলে ?

উত্তর—সমস্ত প্রাণীকে সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাতে দেখা পূর্বোক্ত আত্মদর্শনরূপ স্থিতির ফল ; একে পরমপদ প্রাপ্তি, নির্বাণ-ব্রহ্মপ্রাপ্তি এবং পরমাত্মাতে প্রবিষ্ট হয়ে যাওয়াও বলা হয়। এই স্থিতিতে উপনীত পুরুষের অহংভাব সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায় ; সেইসময় যোগীর পরমাত্মার সঙ্গে পৃথক অস্তিত্ব থাকে না, শুধুমাত্র সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মই থাকেন। তাঁর সমস্ত প্রাণীকে পরমাত্মাতে স্থিত দেখাও শাস্ত্র-দৃষ্টিতে শুধু কথারই কথা ; কারণ তাঁর কাছে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের কোনো পার্থক্যই থাকে না, তাহলে কে দেখে এবং কাকে দেখে এই অবস্থা সর্বতোভাবে বাক্যের অতীত, তাই বাক্যের সাহায্যে এর শুধুমাত্র সঙ্কেত করা যায়, লোকদৃষ্টিতে সেই জ্ঞানীর যে মন, বুদ্ধি ও শরীর ইত্যাদি থাকে, সেই ভাবকে নিয়ে বলা যায় যে তিনি সমস্ত প্রাণীকেই সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মতেই দেখেন ; কারণ প্রকৃতপক্ষে তাঁর বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জগৎ জলে বরফ, আকাশে মেঘ এবং স্বর্ণে অলংকারের ন্যায় ব্রহ্মরূপই হয়ে ওঠে। কোনো পদার্থ বা প্রাণী ব্রহ্ম থেকে পৃথক থাকে না। ষষ্ঠ অধ্যায়ের সাতাশতম শ্লোকে যে যোগীর **'ব্রহ্মভূত'** হওয়া, উনত্রিশতম শ্লোকে **'যোগযুক্তাত্মা'** এবং সর্বত্র সমদর্শী যোগীর যে সব প্রাণীকে আত্মাতে অবস্থিত দেখা ও সর্বপ্রাণীতে আত্মাকে স্থিত দেখার কথা বলা হয়েছে, তা এখানে **'ব্রহ্মণি আত্মনি'** তে বলা প্রথম অবস্থা এবং ঐ অধ্যায়ের আঠাশতম শ্লোকে যে ব্রহ্ম-সংস্পর্শ রূপ অত্যন্ত সুখপ্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে, তা এখানে **'অথো ময়ি'**তে বলা ঐ প্রথম স্থিতির ফলরূপ দ্বিতীয় স্থিতির কথা। অষ্টাদশ অধ্যায়েও ভগবান জ্ঞানযোগের বর্ণনায় চুয়ান্নতম শ্লোকে যোগীর ব্রহ্মভূত হওয়া বলেছেন এবং পঞ্চান্নতমতে জ্ঞানরূপ পরাভক্তির দ্বারা তার পরমাত্মাতে প্রবিষ্ট হওয়ার কথা বলা হয়েছে। সেই কথাই এখানে উল্লিখিত হয়েছে।

সম্বন্ধ—এইভাবে গুরুজনদের থেকে তত্ত্বজ্ঞান শেখার নিয়ম এবং তার ফল জানিয়ে এবার তার মাহাত্ম্য জানাচ্ছেন—

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥ ৩৬

যদি তুমি সমস্ত পাপী থেকেও বেশি পাপী হও ; তাহলেও তুমি জ্ঞানরূপ নৌকার সাহায্যে নিঃসন্দেহে সেই পাপ সমুদ্র ভালোভাবে অতিক্রম করে যাবে ॥ ৩৬

প্রশ্ন—এই শ্লোকে **'চেৎ'** এবং **'অপি'** পদগুলি প্রয়োগ করার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—এই পদগুলি প্রয়োগ করে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, তুমি বাস্তবে পাপী নও, তুমি দৈবী সম্পদ লক্ষণযুক্ত (১৬।৫) এবং আমার প্রিয় ভক্ত ও সখা (৪।৩) ; তোমার মধ্যে পাপ কী করে থাকবে ? এই জ্ঞানের প্রভাব ও মাহাত্ম্য এমনই যে তুমি যদি অধিক থেকে অধিকতর পাপী হও তাহলেও তুমি এই জ্ঞানরূপ নৌকার সাহায্যে অর্থাৎ পাপ সমুদ্র অনায়াসে পার হতে পারবে। অতি বড় পাপও তোমাকে আবদ্ধ করতে পারবে না।

প্রশ্ন—যার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়নি, সেই অত্যন্ত পাপাত্মা মানুষকে তো জ্ঞানের অধিকারী বলেও মানা সম্ভব নয়, তাহলে সে কীভাবে জ্ঞান নৌকার সাহায্যে মুক্তিলাভ করবে ?

উত্তর—**'চেৎ'** এবং **'অপি'**—পদগুলির প্রয়োগ হওয়ায় এখানে এই আশঙ্কার কোনো সম্ভাবনাই নেই, কারণ ভগবানের এখানে বলার ভাব হল যে পাপী জ্ঞানের অধিকারী হয় না, তাই তার পক্ষে জ্ঞানরূপ নৌকা পাওয়া কঠিন ; তবে আমার কৃপায় বা মহাপুরুষের দয়ায়—কোনো কারণে যদি তার জ্ঞান প্রাপ্তি হয়, তাহলে সে যত বড় পাপীই হোক না কেন, সে তৎক্ষণাৎ পাপ থেকে উদ্ধার লাভ করে।

প্রশ্ন—এখানে পাপ থেকে উদ্ধার পাওয়ার কথা বলার কী তাৎপর্য ; কারণ সকামভাবে করা পুণ্যকর্মও তো মানুষকে আবদ্ধ করে ?

উত্তর—সকামভাবে করা পুণ্যকর্মও বন্ধনের হেতু হয় ; সুতরাং সমস্ত কর্ম বন্ধন থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হলেই সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি লাভ হয়, একথা ঠিক। পুণ্যকর্ম ত্যাগ করায় তো মানুষ স্বাধীনই, যখন ইচ্ছা মানুষ তার ফলত্যাগ করতে পারে, কিন্তু জ্ঞান ব্যতীত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া তার পক্ষে সহজ নয়। তাই পাপ থেকে মুক্ত হওয়া বলা হলে পুণ্যকর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কথা তার অন্তর্গত হয়।

প্রশ্ন—জ্ঞানরূপ নৌকার দ্বারা সম্পূর্ণ পাপসমুদ্র থেকে যথাযথভাবে পার হওয়া কাকে বলে ?

উত্তর—মানুষ যেমন নৌকা করে অগাধ জলরাশি পার করে চলে যায়, তেমনই জ্ঞানে স্থিত হয়ে (জ্ঞানের সাহায্যে) নিজেকে সর্বতোভাবে জগৎ-সংসার থেকে আসক্তি-শূন্য, নির্বিকার, নিত্য, অনন্ত জেনে পূর্বের বহু জন্মের এবং ইহজন্মের কৃত সমস্ত পাপসমুদয়কে যে অতিক্রম করে যাওয়া—অর্থাৎ সমস্ত কর্মবন্ধন থেকে চিরতরে মুক্ত হয়ে যাওয়া, তাকেই বলা হয় জ্ঞানরূপ নৌকার দ্বারা সম্পূর্ণ পাপসাগর যথাযথভাবে অতিক্রম করা।

প্রশ্ন—এই শ্লোকে **'এব'** পদটির কী তাৎপর্য ?

উত্তর—**'এব'** পদটি এখানে নিশ্চয়ের অর্থে ব্যবহৃত। এর ভাব হল যে কাঠের নৌকায় জলরাশি অতিক্রম করা মানুষ, কখনও নৌকা ভেঙে গেলে বা তাতে ছিদ্র হলে অথবা ঝড়-তুফান উঠলে, নৌকার সঙ্গে নিজেও ডুবে যেতে পারে। কিন্তু এই জ্ঞানরূপ নৌকা নিত্য। যে মানুষ এটি অবলম্বন করে, সে নিঃসন্দেহে পাপ থেকে মুক্ত হয়, তার পতনের কোনোই আশঙ্কা থাকে না।

সম্বন্ধ—কোনো দৃষ্টান্ত দ্বারাই পরমার্থবিষয়কে পূর্ণভাবে বোঝানো যায় না, তার এক অংশই মাত্র বোঝানোর উপযোগী হয় ; তাই পূর্বশ্লোকে বলা জ্ঞানের মহত্ত্বকে পুনরায় অগ্নির দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট করেছেন—

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥ ৩৭

কারণ হে অর্জুন! প্রজ্বলিত আগুন যেমন তার ইন্ধনকে ভস্মে পরিণত করে, জ্ঞানরূপ অগ্নিও তেমন সমস্ত কর্মকে ভস্মীভূত করে দেয় ॥ ৩৭

প্রশ্ন—এই শ্লোকে অগ্নির উপমা দিয়ে জ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা সমস্ত কর্ম ভস্মীভূত করে—একথা বলার কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠাদি ইন্ধনসমূহ ভস্মে পরিণত করে তাকে নষ্ট করে দেয়, তেমনই তত্ত্বজ্ঞানরূপ অগ্নিও যত শুভাশুভ কর্ম থাকে, সেগুলি সব—অর্থাৎ তার ফলস্বরূপ সুখ-দুঃখ ভোগাদি ও তার কারণরূপ অবিদ্যা, অহং-মমতা, রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি বিকারসহ সমস্ত কর্মকে বিনাশ করে। শ্রুতিতেও বলা হয়েছে—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্দৃষ্টে পরাবরে॥

(মুণ্ডকোপনিষদ্ ২।২।৮)

অর্থাৎ সেই পরাবর পরমাত্মার সাক্ষাৎ লাভ হলে এই জ্ঞানীর জড়-চেতনের একতারূপ হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয়ে যায়; জড়-দেহে যে অজ্ঞানজনিত দেহাভিমান থাকে, তার এবং সমস্ত সংশয়ের বিনাশ হয়; তারপরে পরমাত্মার স্বরূপ জ্ঞানের বিষয়ে কোনোরূপ কিঞ্চিন্মাত্র সংশয় বা ভ্রম থাকে না এবং সমস্ত কর্ম ফলসহ বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

এই অধ্যায়ের উনিশতম শ্লোকে 'জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণম্' বিশেষণ দ্বারাও এই কথা বলা হয়েছে।

এই জন্ম ও জন্মান্তরে করা সমস্ত কর্ম সংস্কাররূপে মানুষের অন্তরে একত্রিত থাকে, তাকে বলে 'সঞ্চিত কর্ম'। তারমধ্যে যেগুলি বর্তমান জন্মে ফল দিতে প্রস্তুত হয়, তাকে বলে 'প্রারব্ধ কর্ম' এবং বর্তমান সময়ে করা কর্মগুলিকে বলা হয় 'ক্রিয়মাণ'। উপরোক্ত তত্ত্বজ্ঞানরূপ অগ্নি প্রকটিত হলেই সমস্ত পূর্বসঞ্চিত সংস্কার নাশ হয়ে যায়। মন, বুদ্ধি এবং শরীরের থেকে আত্মাকে আসক্তি-শূন্য মনে করায় সেই মন, ইন্দ্রিয় এবং শরীরাদির সঙ্গে প্রারব্ধ ভোগের সম্বন্ধ থাকলেও ঐ ভোগাদির জন্য তার অন্তরে হর্ষ-শোকাদি বিকার হতে পারে না। সেইজন্য সেগুলিও বিনষ্ট হয়ে যায় এবং ক্রিয়মাণ কর্মে কর্তৃত্বাভিমান, মমতা, আসক্তি ও বাসনা না থাকায় তার সংস্কার সৃষ্টি হয় না; তাই সেই কর্ম বাস্তবে কর্ম নয়।

এইভাবে তার সমস্ত কর্ম বিনাশ হয়ে যায় এবং যখন কর্মই নষ্ট হয়ে যায় তখন তার ফল আর কী করে হবে ? এবং সঞ্চিত সংস্কার ব্যতিরেকে তার মধ্যে রাগ-দ্বেষ, হর্ষ-শোক ইত্যাদি বিকার হওয়াই বা কীভাবে সম্ভব ? সুতরাং তার সমস্ত বিকার ও সমস্ত কর্মফলও কর্মের সঙ্গেই নষ্ট হয়ে যায়।

সম্বন্ধ—এইভাবে চৌত্রিশতম শ্লোক থেকে এ পর্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষদের সেবা ইত্যাদি করে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত করার জন্য বলে ভগবান তার ফল বর্ণনা করে সেটির মাহাত্ম্য বলেছেন। এতে প্রশ্ন হতে পারে যে এই তত্ত্বজ্ঞান জ্ঞানী-মহাত্মাদের থেকে শুনে বিধিপূর্বক মনন ও নিদিধ্যাসনাদি জ্ঞানযোগের সাধন দ্বারাই প্রাপ্ত করা যায় নাকি এটি প্রাপ্তির জন্য পথও আছে; তাইজন্য পরবর্তী শ্লোকে পুনরায় সেই জ্ঞানের মহিমা প্রকট করে ভগবান কর্মযোগের দ্বারা সেই জ্ঞান নিজে নিজেই প্রাপ্ত হওয়ার কথা বলেছেন—

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥ ৩৮

এই জগতে নিঃসন্দেহে জ্ঞানের মতো পবিত্রকারী আর কিছুই নেই। সেই জ্ঞান বহুকাল ধরে কর্মযোগে চিত্ত শুদ্ধ হলে মানুষ স্বয়ংই নিজের মধ্যে আত্মাতে লাভ করেন ॥ ৩৮

প্রশ্ন—এই জগতে জ্ঞানের ন্যায় পবিত্রকরী নিঃসন্দেহে কিছু নেই, এই বাক্যটির কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—এই বাক্যের দ্বারা বলা হয়েছে যে এই জগতে যজ্ঞ, দান, তপ, সেবা-পূজা, ব্রত-উপবাস, প্রাণায়াম, শম-দম, সংযম ও জপ-ধ্যান ইত্যাদি যতপ্রকার সাধন এবং গঙ্গা, যমুনা, ত্রিবেণী ইত্যাদি যত তীর্থ মানুষের পাপনাশ করে তাকে পবিত্র করে, তাদের মধ্যে কেউই এই জ্ঞানের সমকক্ষ হতে পারে না ; কারণ এগুলি সব এই তত্ত্বজ্ঞানের সাধন এবং এই জ্ঞান ঐ সবের ফল (সাধ্য) ; এগুলি সব জ্ঞানের উৎপত্তির সহায়ক পবিত্র বলে মানা হয়। তার ফলে মানুষ পরমাত্মার যথার্থ স্বরূপকে ভালোভাবে জেনে নেয়। তার মধ্যে মিথ্যা, ছল, কপট, চুরি ইত্যাদি পাপের, রাগ-দ্বেষ, হর্ষ-শোক, অহং-মমতা ইত্যাদি সমস্ত বিকার ও অজ্ঞানের লেশমাত্র না থাকায় সে পরম পবিত্র হয়ে ওঠে। তার মন, ইন্দ্রিয় এবং শরীরও অত্যন্ত পবিত্র হয়ে যায়। এইজন্য শ্রদ্ধাসহকারে সেই মহাপুরুষকে দর্শন, স্পর্শ, বন্দনা, চিন্তা ইত্যাদি যারা করেন এবং তাঁর সঙ্গে বার্তালাপ যারা করেন, তাঁরাও পবিত্র হয়ে যান। তাই জগতে পরমাত্মার তত্ত্বজ্ঞানের ন্যায় পবিত্র বস্তু দ্বিতীয় আর কিছু নেই।

প্রশ্ন—'**ইহ**' পদটি প্রয়োগের কী ভাবার্থ ?

উত্তর—'**ইহ**' পদ প্রয়োগে এই ভাবার্থ প্রকাশিত হয় যে, প্রকৃতির কার্যরূপ এই জগতে জ্ঞানের সমান আর কিছু নেই, সর্বশ্রেষ্ঠ পবিত্রকারী হল জ্ঞান। কিন্তু যিনি এই প্রকৃতির সর্বতোভাবে অতীত, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান, সর্বলোক-মহেশ্বর, গুণের সমুদ্র, সগুণ-নির্গুণ, সাকার-নিরাকার-স্বরূপ পরমেশ্বর এই প্রকৃতির অধ্যক্ষ, যাঁর স্বরূপ সাক্ষাৎকারী হওয়াতেই জ্ঞানের পবিত্রতা সিদ্ধ হয়, সেই সকলের সুহৃদ, সর্বাধার পরমাত্মা তো পরম পবিত্র ; তাঁর থেকে জ্ঞানকে আরও বেশি পবিত্র বলা হয়নি। কারণ পরমাত্মার সমকক্ষ অন্য কেউ নয়। তাহলে তাঁর থেকে বড় আর কেউ কী করে হতে পারে ? তাই অর্জুনও বলেছেন—'**পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্**'। (১০।১২) অর্থাৎ আপনি পরব্রহ্ম, পরমধাম এবং পরমপবিত্র, ভীষ্মও বলেছেন—'**পবিত্রাণাং পবিত্রং যো মঙ্গলানাং চ মঙ্গলম্**।' অর্থাৎ এই পরমেশ্বর পবিত্রকারীদের মধ্যে অত্যন্ত পবিত্র এবং কল্যাণের মধ্যেও পরম কল্যাণ স্বরূপ (মহাভারত, অনুশাসনপর্ব ১৪৯।১০)।

প্রশ্ন—'যোগসংসিদ্ধঃ' পদ কীসের বাচক এবং 'তিনি সেই জ্ঞান নিজে নিজেই আত্মাতে লাভ করেন' এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—বহুকাল ধরে কর্মযোগের আচরণ করতে করতে রাগ-দ্বেষ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় যাঁর অন্তঃকরণ স্বচ্ছ, যিনি কর্মযোগে যথাযথভাবে সিদ্ধ হয়েছেন, যাঁর সমস্ত কর্ম মমতা, আসক্তি ও ফলেচ্ছা ব্যতিরেকে ভগবানের নির্দেশানুসারে ভগবানের জন্যই হয়—তার বাচক এই 'যোগসংসিদ্ধঃ' পদটি। অতএব এইরূপ যোগসংসিদ্ধ ব্যক্তি এই জ্ঞান স্বতঃই আত্মাতে লাভ করেন—এই বাক্য দ্বারা এই ভাব বুঝতে হবে যে, যখন তাঁর সাধন নিজ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যায়, সেই ক্ষণেই পরমেশ্বরের অনুগ্রহে তাঁর অন্তরে আপনিই সেই জ্ঞান প্রকাশিত হয়। অভিপ্রায় হল যে সেই জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য তাঁকে অন্য কোনো সাধন করতে হয় না বা জ্ঞান লাভ করার জন্য কোনো জ্ঞানীর কাছে গিয়ে বাস করতেও হয় না ; অন্য কোনো প্রকার সাধন বা সাহায্য ছাড়াই শুধুমাত্র কর্মযোগের সাধন দ্বারাই তিনি সেই জ্ঞান ভগবদ্-কৃপায় নিজে নিজেই লাভ করেন।

সম্বন্ধ—এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের মহিমা বর্ণনা করে, সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ দ্বারা তার প্রাপ্তির দুটি উপায় বলে, এবার ভগবান ঐ জ্ঞানপ্রাপ্তির পাত্র নিরূপণ করে, সেই জ্ঞানের ফল পরম শান্তি লাভ জানাচ্ছেন—

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি।। ৩৯

জিতেন্দ্রিয়, সাধনপরায়ণ, শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করেন। জ্ঞানলাভ করে তিনি অনতিবিলম্বে, সত্ত্বর ভগবদ্প্রাপ্তিরূপ পরম শান্তি লাভ করেন ।। ৩৯

প্রশ্ন—'**শ্রদ্ধাবান্**' কীরূপ মানুষদের বাচক এবং তিনি জ্ঞানলাভ করেন, এই কথার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—বেদ, শাস্ত্র, ঈশ্বর ও মহাপুরুষদের বচনে এবং পরলোকে যে প্রত্যক্ষের ন্যায় বিশ্বাস এবং সেই সঙ্গে পরম শ্রদ্ধা ও উত্তম চিন্তা থাকে—তাকে বলা হয় শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা যার মধ্যে থাকে, তারই বাচক এই '**শ্রদ্ধাবান্**' পদটি। সুতরাং উপরোক্ত বক্তব্যের ভাব হল যে এরূপ শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিই জ্ঞানী মহাত্মাদের কাছে গিয়ে প্রণাম, সেবা এবং বিনয়সহ প্রশ্নাদির দ্বারা তাঁদের কাছ থেকে উপদেশ লাভ করে জ্ঞানযোগ বা কর্মযোগের সাধন দ্বারা সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারেন ; শ্রদ্ধারহিত মানুষ সেই জ্ঞান প্রাপ্তির উপযুক্ত পাত্র নয়।

প্রশ্ন—বিনা শ্রদ্ধার মানুষও মহাপুরুষদের কাছে গিয়ে প্রণাম, সেবা এবং প্রশ্ন করতে পারেন ; তাহলে জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য শ্রদ্ধাকে প্রাধান্য দেওয়ার কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—বিনা শ্রদ্ধায় মহাত্মাকে পরীক্ষা করার জন্য, নিজের বিজ্ঞতা দেখাবার জন্য, সম্মান পাওয়ার উদ্দেশ্যে বা দম্ভাচরণের জন্যও মানুষ তাঁর কাছে গিয়ে প্রণাম, সেবা ও প্রশ্ন করতে পারে, কিন্তু এতে সে জ্ঞান লাভ করে না ; কারণ শ্রদ্ধাবিহীন হয়ে যজ্ঞ, দান, তপ ইত্যাদি করা সব সাধনই ব্যর্থ হয়ে থাকে বলা হয় (১৭।২৮)। তাই জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য শ্রদ্ধাই প্রধান কারণ। যত বেশি শ্রদ্ধা সহকারে জ্ঞান সাধনের অনুষ্ঠান করা যায়, তত শীঘ্রই সেই শ্রদ্ধা জ্ঞান প্রকট করতে সমর্থ হয়।

প্রশ্ন—জ্ঞান-প্রাপ্তিতে যদি শ্রদ্ধার প্রাধান্য থাকে, তাহলে এখানে শ্রদ্ধাবানের সঙ্গে '**তৎপরঃ**' বিশেষণ প্রয়োগের কী প্রয়োজন ?

উত্তর—সাধনের তৎপরতার জন্য শ্রদ্ধাই কারণ এবং তৎপরতা হল শ্রদ্ধার কষ্টিপাথর। শ্রদ্ধা কম থাকলে সাধনে অকর্মণ্যতা ও আলস্যাদি দোষ এসে যায়, তাই অভ্যাস তৎপরতার সঙ্গে হয় না। শ্রদ্ধার তত্ত্ব না জানা সাধক নিজের সামান্য শ্রদ্ধাকেই অনেক বলে মনে করে ; কিন্তু তাতে কার্যসিদ্ধি হয় না, তখন সেই সাধক নিজ সাধনের তৎপরতাতে ত্রুটির দিকে নজর না দিয়ে মনে করে যে শ্রদ্ধা হলেও ভগবদ্-প্রাপ্তি হয় না। কিন্তু এরূপ মনে করা ভুল। প্রকৃত কথা হল যে সাধনে যত শ্রদ্ধা থাকে, ততই তৎপরতার বৃদ্ধি হয়। যেমন কোনো ব্যক্তির অর্থে ভালোবাসা থাকে, সে ব্যবসা করে। যদি তার এই বিশ্বাস থাকে যে এই ব্যবসাতে আমার অর্থলাভ হবে, তাহলে সে তাতে এতো তৎপর হয়ে ওঠে যে খাওয়া, শোওয়া, বিশ্রাম করা ইত্যাদির ব্যতিক্রম হলেও এবং শারীরিক ক্লেশ সহ্য করেও সে তাতে কষ্ট বোধ করে না ; বরং ধনবৃদ্ধির ফলে তার চিত্তে প্রসন্নতা বৃদ্ধি পায়। এইরূপ অন্য সব বিষয়েও বিশ্বাসের দ্বারা তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। তাই পরমশান্তি ও পরম আনন্দদায়ক, নিত্য বিজ্ঞানানন্দঘন পরমাত্মা প্রাপ্তির সাক্ষাৎদ্বার যে পরমাত্মার তত্ত্বজ্ঞান, তাতে এবং তার সাধনে শ্রদ্ধা হলে সাধনে অত্যন্ত তৎপরতা আসা অত্যন্ত স্বাভাবিক। সাধনে যদি ন্যূনতা দেখা যায় তাহলে বুঝতে হবে যে শ্রদ্ধাও অবশ্যই কম আছে। এই কথাটি জানাবার জন্য '**শ্রদ্ধাবান্**' এর সঙ্গে '**তৎপরঃ**' বিশেষণ দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন—শ্রদ্ধা ও তৎপরতা দুটি হলে জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য আর কোনো আশঙ্কা তো থাকে না, তাহলে শ্রদ্ধাবানের সঙ্গে অন্য বিশেষণ '**সংযতেন্দ্রিয়ঃ**' কথাটি প্রয়োগের কী প্রয়োজন ?

উত্তর—শ্রদ্ধাসহকারে তীব্র অভ্যাস করলে পাপনাশ এবং সংসারের বিষয়ভোগে বৈরাগ্য হয়ে মনসহ যে ইন্দ্রিয়সংযম হবে পরমাত্মার স্বরূপের যথার্থ জ্ঞান হয়, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু যেসব সাধক এই রহস্য জানেন না তাঁরা অল্প অভ্যাসকেই তীব্র অভ্যাস মনে করেন এবং তাতে কার্যসিদ্ধি না হওয়ায় তাঁরা নিরাশ হয়ে সাধনা ত্যাগ করেন। তাই সাধকদের সাবধান করার জন্য '**সংযতেন্দ্রিয়ঃ**' বিশেষণ প্রয়োগ করে বলা হয়েছে যে, যতক্ষণ ইন্দ্রিয় ও মন নিজ বশে না আসে ততক্ষণ শ্রদ্ধাপূর্বক কোমরবেঁধে উত্তরোত্তর তীব্র অভ্যাস করা উচিত ; কারণ শ্রদ্ধাপূর্বক তীব্র অভ্যাসের কষ্টিপাথরই হল ইন্দ্রিয়সংযম। শ্রদ্ধাপূর্বক যত তীব্র অভ্যাস করা হবে, ততই উত্তরোত্তর ইন্দ্রিয় সংযম হতে থাকবে। সুতরাং ইন্দ্রিয়সংযম যত কম করা হবে, বুঝতে হবে যে সাধনও ততই কম হবে এবং সাধন কম হওয়া মানে শ্রদ্ধাতে ত্রুটি বলে বুঝতে হবে—এই বিষয় জানাবার জন্য '**সংযতেন্দ্রিয়ঃ**' বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—জ্ঞান প্রাপ্ত হলে সাধক অবিলম্বে—তৎক্ষণাৎ

ভগবদ্‌প্রাপ্তিরূপ শান্তিলাভ করে, এই কথাটির কী ভাবার্থ ?

উত্তর— এর দ্বারা দেখানো হয়েছে যে সূর্যোদয়ের মুহূর্তে যেমন অন্ধকার বিনাশ হয়ে সবকিছু প্রত্যক্ষ হয়ে যায়, তেমনই পরমাত্মার তত্ত্বজ্ঞান হলে সেই ক্ষণে অজ্ঞান নাশ হয়ে পরমাত্মার স্বরূপপ্রাপ্তি হয় (৫।১৬)। অভিপ্রায় হল যে অজ্ঞতা এবং তার কার্যরূপ বাসনাদির সঙ্গে রাগ-দ্বেষ, হর্ষ-শোক ইত্যাদি বিকারের ও শুভাশুভ কর্মের অত্যন্ত অভাব, পরমাত্মার তত্ত্বজ্ঞান এবং পরমাত্মার স্বরূপ প্রাপ্তি—এসব একইকালে হয় এবং বিজ্ঞানানন্দঘন পরমাত্মার সাক্ষাৎ প্রাপ্তিকেই এখানে পরমশান্তি নামে বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ—এইভাবে শ্রদ্ধাবানের জ্ঞানলাভ এবং সেই জ্ঞানে পরমশান্তি লাভের কথা বলে এবার শ্রদ্ধা ও বিবেকহীন সংশয়াত্মার নিন্দা করছেন—

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥ ৪০

বিবেকহীন, শ্রদ্ধারহিত, সংশয়াকুল ব্যক্তি পারমার্থিক পথ থেকে অবশ্যই ভ্রষ্ট হয়। এইরূপ সংশয়াত্মা মানুষের ইহলোক নেই, পরলোক নেই, সুখও নেই ॥ ৪০

প্রশ্ন—'অজ্ঞঃ' এবং 'অশ্রদ্দধানঃ' এই দুটি বিশেষণের সঙ্গে 'সংশয়াত্মা' পদ কীরূপ মানুষের বাচক এবং সে পরমার্থ থেকে অবশ্যই ভ্রষ্ট হয়— এই কথার ভাবার্থ কী ?

উত্তর— যার মধ্যে সত্য-অসত্য এবং আত্ম-অনাত্ম-পদার্থ বিবেচনা করার শক্তি নেই, সেইজন্য যে কর্তব্য-অকর্তব্য ইত্যাদি ঠিক করতে পারে না, এরূপ বিবেক-জ্ঞান বর্জিত মানুষের বাচক এই 'অজ্ঞঃ' পদটি ; যার ঈশ্বর ও পরলোকে, তাঁর প্রাপ্তির উপায় জানানো শাস্ত্রে, মহাপুরুষে এবং তাঁর কথিত সাধনে ও তার ফলে শ্রদ্ধা নেই— তার বাচক এই 'অশ্রদ্দধানঃ' পদ। ঈশ্বর ও পরলোক বিষয়ে যে কিছু স্থির করতে পারে না, প্রত্যেক বিষয়ে সংশয়যুক্ত হয়ে থাকে— তার বাচক 'সংশয়াত্মা' পদটি। যে সংশয়াত্মা মানুষের মধ্যে উপরোক্ত অজ্ঞতা ও অশ্রদ্ধা এই দুটি দোষ থাকে তাদের বাচক এখানে 'অজ্ঞঃ' এবং 'অশ্রদ্দধানঃ' এই দুই বিশেষণের সঙ্গে 'সংশয়াত্মা' পদটি। 'সেই ব্যক্তি পরমার্থ থেকে অবশ্যই ভ্রষ্ট হয়ে যায়।' এই কথার দ্বারা এই ভাব দেখানো হয়েছে যে বেদ-শাস্ত্র এবং মহাপুরুষদের বাণী ও তাঁদের প্রদর্শিত সাধনাদি ঠিকমতো বুঝতে না পারায় আর যা কিছু বোঝা যায় তাও বিশ্বাস না হওয়ায় যার নানা বিষয়ে সংশয় হতে থাকে এবং যে কোনোভাবেই নিজ কর্তব্য স্থির করতে পারে না, সর্বাবস্থায় সংশয়ান্বিত হয়ে থাকে, সেই ব্যক্তি নিজ জীবন ব্যর্থ করে, সেই জীবন থেকে পাওয়া পরম লাভ থেকে সে সর্বভাবে বঞ্চিত থেকে যায়। কিন্তু যার মধ্যে প্রত্যেক বিষয় নিজে বিবেচনা করার শক্তি থাকে, যার বেদ-শাস্ত্র ও মহাপুরুষদের বাক্যে শ্রদ্ধা থাকে, সে এইভাবে নষ্ট হয় না, সে তাঁদের সহায়তায় অর্জুনের মতো নিজ সংশয় সম্পূর্ণভাবে বিনাশ করে কর্তব্যপরায়ণ হতে পারে ও কৃতকৃত্য হয়ে মানুষ-জন্ম সফল করতে পারে। যার মধ্যে নিজের বিবেচনা শক্তি নেই, সেই অজ্ঞ মানুষও যদি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে শ্রদ্ধাবশতঃ মহাপুরুষদের কথা অনুসারে সংশয়রহিত হয়ে সাধনপরায়ণ হতে পারে তাহলে তাঁদের কৃপায় তারও কল্যাণ হতে পারে (১৩।২৫)। কিন্তু যে সংশয়যুক্ত ব্যক্তির বিবেচনাশক্তিও নেই, শ্রদ্ধাও নেই তার সংশয়বিনাশের কোনো উপায় থাকে না, তাই যতক্ষণ তার মধ্যে শ্রদ্ধা বা বিবেক জাগ্রত না হয়, তার অবশ্য পতন হয়।

প্রশ্ন—'সংশয়যুক্ত মানুষের জন্য ইহলোক নেই, পরলোকও নেই, সুখও নেই' এই কথাটির কী ভাবার্থ ?

উত্তর— এই কথায় এই ভাব দেখানো হয়েছে যে, সংশয়যুক্ত মানুষ যে শুধু পরমার্থ থেকে ভ্রষ্ট হয় শুধু তাই নয়, মানুষের মধ্যে যতক্ষণ সংশয় বজায় থাকে, সে তা

বিনাশ না করে, ততক্ষণ না ইহলোকে অর্থাৎ মনুষ্যদেহে ধন-ঐশ্বর্য-যশ প্রাপ্তি করে, না পরলোকে অর্থাৎ মৃত্যুর পর স্বর্গাদি লাভ করে এবং না কোনোপ্রকার জাগতিক সুখ ভোগ করে ; কারণ মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো বিষয়ে সংশয়যুক্ত হয়ে থাকে, কোনো কিছু স্থির করতে পারে না, ততক্ষণ সে ঐ বিষয়ে সফলতা লাভ করে না। সুতরাং মানুষকে শ্রদ্ধা ও বিবেক সহকারে এই সংশয় অবশ্য নাশ করা উচিত।

সম্বন্ধ—এইরূপ অবিবেচনা ও অশ্রদ্ধার সঙ্গে সংশয়কে জ্ঞানপ্রাপ্তির বাধক জানিয়ে, এবার বিবেকের সাহায্যে সংশয় নাশ করে কর্মযোগের পালনে অর্জুনের উৎসাহ উৎপন্ন করার জন্য সংশয়রহিত ও বশীভূত অন্তঃকরণসম্পন্ন কর্মযোগীর প্রশংসা করছেন—

যোগসন্ন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়॥ ৪১

হে ধনঞ্জয় ! যিনি কর্মযোগের বিধিতে সমস্ত কর্ম পরমাত্মাতে অর্পণ করেছেন এবং বিবেক দ্বারা সমস্ত সংশয় নাশ করেছেন, এইরূপ বশীভূত অন্তঃকরণসম্পন্ন ব্যক্তিকে কর্ম কখনো আবদ্ধ করতে পারে না ॥ ৪১

প্রশ্ন—'যোগসন্ন্যস্তকর্মাণম্' এই পদে 'যোগ' শব্দের অর্থ জ্ঞানযোগের দ্বারা শাস্ত্রবিহিত সমস্ত কর্ম স্বরূপতঃ করা মনে করলে কী ক্ষতি ?

উত্তর—এটি স্বরূপতঃ কর্মত্যাগের প্রকরণ নয়। এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে 'যোগ দ্বারা কর্মের সন্ন্যাসকারী মানুষকে কর্ম আবদ্ধ করে না', এই কথাটি পরবর্তী শ্লোকে **'তস্মাৎ'** পদ দ্বারা আদর্শ জানিয়ে ভগবান অর্জুনকে যোগে স্থিত হয়ে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই শ্লোকে যদি **'যোগসন্ন্যস্তকর্মাণম্'** পদটিতে স্বরূপতঃ কর্মত্যাগ অর্থটি ভগবানের অভিপ্রেত হত, তাহলে ভগবান একথা বলতেন না। তাই এখানে **'যোগসন্ন্যস্ত-কর্মাণম্'**-এর অর্থ স্বরূপতঃ কর্ম ত্যাগ করা মনে না করে কর্মযোগের দ্বারা সমস্ত কর্মে ও তার ফলে মমতা, আসক্তি ও কামনা সর্বতোভাবে ত্যাগপূর্বক সেই সকলকে পরমাত্মাতে অর্পণ করা ত্যাগী (৩।৩০ ; ৫।১০) বলেই মনে করা উচিত ; কারণ ঐ পদের অর্থ প্রকরণ অনুসারে এরূপই মনে হয়।

প্রশ্ন—'জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্' পদে জ্ঞানশব্দের অর্থ কী ? গীতায় 'জ্ঞান' শব্দ কোন্ কোন্ শ্লোকে কী কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ?

উত্তর—উপরোক্ত পদে **'জ্ঞান'** শব্দটি কোনো বস্তুর স্বরূপ বিবেচনা করে তদ্বিষয়ক সংশয় নাশকারী বিবেক শক্তির বাচক। **'জ্ঞা অববোধনে'** এই ধাত্বর্থের অনুসারে জ্ঞানের অর্থ 'জানা'। সুতরাং গীতার প্রকরণ অনুসারে **'জ্ঞান'** শব্দ নিম্নলিখিত প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ক) দ্বাদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে জ্ঞানের থেকে ধ্যানকে এবং তার থেকেও কর্মফল ত্যাগকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। এইজন্য ওখানে জ্ঞানের অর্থ শাস্ত্র এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের হওয়া বিবেকজ্ঞান।

খ) ত্রয়োদশ অধ্যায়ের সতেরোতম শ্লোকে জ্ঞেয়র বর্ণনায় বিশেষণের রূপে **'জ্ঞান'** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এইজন্য ওখানে জ্ঞানের অর্থ হল পরমেশ্বরের নিত্যবিজ্ঞানানন্দঘন স্বরূপ।

গ) অষ্টাদশ অধ্যায়ের বিয়াল্লিশতম শ্লোকে ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম গণনায় **'জ্ঞান'** শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তার অর্থ শাস্ত্রাদির পঠন-পাঠন মানা হয়েছে।

ঘ) এই অধ্যায়ের ছত্রিশ থেকে উনচল্লিশতম শ্লোক পর্যন্ত উদ্ধৃত সকল 'জ্ঞান' শব্দের অর্থ পরমাত্মার তত্ত্বজ্ঞান ; কারণ তা সমস্ত কর্মকাণ্ড ভস্মকারী, সমস্ত পাপ থেকে উদ্ধারকারী, সব থেকে পবিত্র, যোগসিদ্ধির ফল ও পরমশান্তির কারণ বলা হয়েছে। তেমনই পঞ্চম অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকে পরমাত্মার স্বরূপ সাক্ষাৎকারক এবং চতুর্দশ অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে উত্তম বলার কারণ **'জ্ঞান'**-এর অর্থ তত্ত্ব-জ্ঞান। অন্যত্রও প্রসঙ্গতঃ এরূপই বুঝে নেওয়া উচিত।

ঙ) অষ্টাদশ অধ্যায়ের একুশতম শ্লোকে নানা বস্তু ও জীবদের ভিন্ন ভিন্নভাবে জানার মাধ্যম হওয়ায় 'জ্ঞান' শব্দের অর্থ 'রাজস জ্ঞান'।

চ) ত্রয়োদশ অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে তত্ত্বজ্ঞান-সমূহের সাধনের নাম 'জ্ঞান'।

ছ) তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে 'যোগ' শব্দের সঙ্গে থাকায় 'জ্ঞান' শব্দের অর্থ জ্ঞানযোগ বা সাংখ্যযোগ। এইরূপ অন্যত্রও প্রসঙ্গানুসারে 'জ্ঞান' শব্দ সাংখ্যযোগের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আরও বহুস্থানে প্রসঙ্গানুসারে জ্ঞান শব্দের প্রয়োগ বিভিন্ন অর্থে করা হয়েছে, সেগুলি সেখানেই দেখা উচিত।

প্রশ্ন—'জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্' পদে 'জ্ঞান' শব্দের অর্থ যদি 'তত্ত্বজ্ঞান' মনে করা হয় তাতে ক্ষতি কী?

উত্তর—তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তি হলে সমস্ত সংশয় সমূলে নাশ হয়ে তৎক্ষণাৎ পরমাত্মা প্রাপ্তি হয়, তারপরে পরমাত্মাপ্রাপ্তির জন্য অন্য কোনো সাধনের আর প্রয়োজন থাকে না। তাই এখানে জ্ঞানের অর্থ তত্ত্বজ্ঞান মানা ঠিক নয়; কারণ তত্ত্বজ্ঞান কর্মযোগের ফল এবং এর পরবর্তী শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞতাজনিত সংশয় নাশ করে কর্মযোগে স্থিত হতে বলেছেন। তাই এইস্থানে যে অর্থ করা হয়েছে, তা ঠিক বলেই মনে হয়।

প্রশ্ন—বিবেকজ্ঞান দ্বারা সমস্ত সংশয় নাশ করা কাকে বলে?

উত্তর—ঈশ্বর আছেন কিনা, যদি থাকেন, তাহলে তিনি কেমন? পরলোক আছে কিনা, থাকলে তা কেমন এবং কোথায়, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এগুলি কি আত্মা, না আত্মার থেকে পৃথক, জড় না চেতন, ব্যাপক না একদেশীয়, কর্তা-ভোক্তা জীবাত্মা না প্রকৃতি, আত্মা এক না অনেক, যদি তিনি এক হন, তাহলে কেমন আর অনেক হলেও তা কেমন, জীব স্বাধীন না পরাধীন, যদি পরাধীন হয়, তা কেমন এবং কার অধীন, কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কর্মকে স্বরূপতঃ ত্যাগ করা ঠিক না কর্মযোগ অনুসারে কর্ম করা ঠিক অথবা সাংখ্যযোগ অনুসারে সাধন করা ঠিক—ইত্যাদি যে নানাপ্রকার প্রশ্ন তর্কশীল মানুষের হৃদয়ে জাগ্রত হয়, তারই নাম সংশয়।

এই সমস্ত প্রশ্নগুলি বিবেকজ্ঞানের সাহায্যে বিবেচনা করে এক স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অর্থাৎ কোনো বিষয়ে সংশয়ান্বিত হয়ে না থাকা ও নিজ কর্তব্য নির্ধারণ করা, একেই বলা হয় বিবেকজ্ঞান দ্বারা সমস্ত সংশয় নাশ করে দেওয়া।

প্রশ্ন—'আত্মবন্তম্' পদটির ভাবার্থ কী?

উত্তর—আত্মশব্দবাচ্য ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে অন্তঃকরণের ওপর যার পূর্ণ অধিকার, অর্থাৎ যার মন ও ইন্দ্রিয় বশ করা হয়েছে— নিজ বশে আছে, সেই মানুষের জন্য এখানে 'আত্মবন্তম্' পদটিকে প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—উপরোক্ত বিশেষণ যুক্ত পুরুষকে কর্ম আবদ্ধ করে না, এই কথাটির কী অর্থ?

উত্তর—এর অর্থ এই যে উপরোক্ত পুরুষের শাস্ত্রবিহিত কর্ম মমতা, আসক্তি ও কামনাবর্জিত হয়, তাই জন্য সেই কর্মের আবদ্ধ করার শক্তি থাকে না।

সম্বন্ধ—এইভাবে কর্মযোগীর প্রশংসা করে ভগবান এবার অর্জুনকে কর্মযোগে স্থিত হয়ে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়ে এই অধ্যায়ের উপসংহার করছেন—

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত।। ৪২

অতএব হে ভরতবংশীয় অর্জুন! তুমি হৃদয়স্থিত এই অজ্ঞতাজনিত তোমার সংশয়কে বিবেকজ্ঞানরূপ তরবারির সাহায্যে ছেদন করে সমত্বরূপ কর্মযোগে স্থিত হও এবং যুদ্ধের জন্য উত্থিত হও ।। ৪২

প্রশ্ন—'তস্মাৎ' পদটির এখানে কী তাৎপর্য?

উত্তর—হেতুবাচক 'তস্মাৎ' পদটি প্রয়োগ করে ভগবান অর্জুনকে কর্মযোগে স্থিত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন। অভিপ্রায় হল যে আগের শ্লোকে বর্ণিত কর্মযোগে স্থিত মানুষ কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়, অতএব তোমার তেমনই হওয়া উচিত।

প্রশ্ন—'ভারত' সম্বোধনের কী ভাবার্থ?

উত্তর—'ভারত' সম্বোধনে সম্বোধিত করে ভগবান

রাজর্ষি ভরতের চরিত্র স্মরণ করিয়ে এই ভাব দেখিয়েছেন যে রাজর্ষি ভরত অত্যন্ত কর্মঠ, সাধনপরায়ণ, উৎসাহী পুরুষ ছিলেন। তুমি তাঁর বংশেই জন্মগ্রহণ করেছ, সুতরাং তোমারও তাঁর ন্যায় ধৈর্য, বীর্য ও গাম্ভীর্যপূর্বক নিজ কর্তব্যে তৎপর হওয়া উচিত।

প্রশ্ন—'**এনম্**' পদের সঙ্গে '**সংশয়ম্**' পদটি এখানে কোন্ সংশয়ের বাচক এবং তার সঙ্গে '**অজ্ঞান-সম্ভূতম্**' এবং '**হৃৎস্থম্**' এই বিশেষণগুলি প্রয়োগের কী তাৎপর্য ?

উত্তর—একচল্লিশতম শ্লোকে '**জ্ঞানসংছিন্ন-সংশয়ম্**' পদে যে সংশয়ের উল্লেখ করা হয়েছে এবং যার স্বরূপ ঐ শ্লোকেরই ব্যাখ্যাতে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে—তার বাচক এখানে '**এনম্**' পদের সঙ্গে '**সংশয়ম্**' পদটি। তার সঙ্গে '**অজ্ঞানসম্ভূতম্**' বিশেষণ যোগ করে ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে এই সংশয়ের কারণ হল অবিবেক। সুতরাং বিবেকের সাহায্যে অবিবেকের বিনাশ হলেই তার সঙ্গে সঙ্গে সংশয়ও নাশ হয়ে যায়। '**হৃৎস্থম্**' বিশেষণ দিয়ে ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে এর স্থান হৃদয় অর্থাৎ অন্তঃকরণ। অতএব যার অন্তঃকরণ নিজ বশে থাকে, তার পক্ষে এটি বিনাশ করা সহজ।

প্রশ্ন—অর্জুনকে এই সংশয় ছিন্ন করতে বলার অভিপ্রায় কী ? অর্জুনের অন্তঃকরণেও কি এরূপ সংশয় ছিল ?

উত্তর—যুদ্ধ করা উচিত মনে করেই অর্জুন প্রথমে যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছিলেন যুদ্ধ করারই জন্য। তিনি উভয় সেনার মধ্যস্থলে তাঁর রথ স্থাপন করার জন্য ভগবানকে অনুরোধ করেছিলেন ; তারপর তিনি যখন উভয় সৈন্যদলে উপস্থিত নিজ আত্মীয়-স্বজনকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতে দেখলেন তখন তিনি মোহগ্রস্ত হয়ে চিন্তামগ্ন হয়ে পড়লেন এবং যুদ্ধ করাকে পাপকর্ম বলে মনে করতে লাগলেন (১।২৮-৪৭)। তখন তাঁকে ভগবান যুদ্ধ করতে বললেও (২।৩) তিনি তাঁর কর্তব্য স্থির করতে সক্ষম হলেন না, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বলতে লাগলেন, 'আমি গুরুজনদের সঙ্গে কী করে যুদ্ধ করব' (২।৪) ; 'আমার পক্ষে কোন্ কর্তব্যটি শ্রেষ্ঠ এবং এই যুদ্ধে কে বিজয়লাভ করবে, তা কিছুই জানা নেই' (২।৬) এবং 'আমার জন্য যা কল্যাণের সাধন, আপনি আমাকে সেটি বলুন, আমার চিত্ত মোহগ্রস্ত হয়ে রয়েছে' (২।৭)। এর দ্বারা এই বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় যে অর্জুনের অন্তঃকরণে সংশয় বিদ্যমান ছিল। তাঁর বিবেচনাশক্তি মোহবশতঃ দমিত ছিল ; তাইজন্য তিনি তাঁর কর্তব্য স্থির করতে পারছিলেন না। এতদ্ব্যতীত ষষ্ঠ অধ্যায়ে অর্জুন বলেছিলেন যে আমার সংশয় ছেদন করতে আপনিই সক্ষম (৬।৩৯)। গীতার উপদেশ শুনে নেওয়ার পর তিনি বলেছিলেন যে এবার আমি সন্দেহ-রহিত হয়েছি (১৮।৭৩) এবং ভগবানও স্থানে স্থানে (৮।৭ ; ১২।৮) অর্জুনকে বলেছেন যে, আমি যা কিছু তোমাকে বলছি, তাতে সংশয় নেই ; এতে তুমি কোনো আশঙ্কা কোরো না। এর দ্বারা এও প্রমাণিত হয় যে অর্জুনের হৃদয়ে সংশয় ছিল এবং তারজন্যই তিনি তাঁর স্বধর্মরূপ যুদ্ধ ত্যাগ করতে তৈরি হয়েছিলেন। তাই ভগবান এখানে তাঁর হৃদয়ে স্থিত সংশয় ছেদন করার জন্য বলে এই ভাব দেখিয়েছেন যে, আমি তোমাকে যে নির্দেশ দিচ্ছি, তাতে কোনোরূপ আশঙ্কা না করে তা পালন করার জন্য তোমার প্রস্তুত হওয়া উচিত।

প্রশ্ন—এখানে অর্জুনকে নিজ আত্মার সংশয় ছেদ করার জন্য বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে তুমি আমার ভক্ত এবং সখা, অতএব তোমার উচিত হল যে অন্যের অন্তঃকরণে যদি কোনো আশঙ্কা থাকে তাহলে তাকে বুঝিয়ে তা ছিন্ন করে ফেলা ; কিন্তু তা যদি করতে না পারো, তাহলে অন্ততঃ তোমার নিজ সংশয় তো ছিন্ন অবশ্যই করা উচিত।

প্রশ্ন—যোগে স্থিত হয়ে যাও এবং যুদ্ধার্থে উত্থিত হও, এই কথা বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথার দ্বারা ভগবান অধ্যায়ের উপসংহার করে এই ভাব দেখিয়েছেন যে, আমি তোমাকে যা কিছু বলছি, সে সবই তোমার হিতের জন্য ; অতএব আশঙ্কারহিত হয়ে তুমি আমার কথানুযায়ী কর্মযোগে স্থিত হয়ে তারপর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। এরূপ করলে সর্বপ্রকারে তোমার কল্যাণ হবে।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
জ্ঞানকর্মসন্ন্যাসযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪॥

ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ

পঞ্চম অধ্যায়

(কর্মসন্ন্যাসযোগ)

অধ্যায়ের নাম

এই পঞ্চম অধ্যায়ে কর্মযোগনিষ্ঠা ও সাংখ্যযোগ নিষ্ঠার বর্ণনা আছে, সাংখ্যযোগেরই পর্যায়বাচী শব্দ 'সন্ন্যাস'। তাই এই অধ্যায়ের নাম রাখা হয়েছে '**কর্মসন্ন্যাসযোগ**'।

সংক্ষিপ্ত অধ্যায়-সার

এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে 'সাংখ্যযোগ' ও 'কর্মযোগে'র শ্রেষ্ঠত্বের সম্বন্ধে অর্জুনের প্রশ্ন আছে। দ্বিতীয়তে প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ভগবান সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ দুটিকেই কল্যাণকারক বলে 'কর্মসন্ন্যাসে'র থেকে 'কর্মযোগ'কে শ্রেষ্ঠ বলেছেন, তৃতীয়তে কর্মযোগের মহত্ত্ব বলে চতুর্থ ও পঞ্চমে 'সাংখ্যযোগ' ও 'কর্মযোগ'—উভয়েরই ফল একই হওয়ায়, দুটির ঐক্য প্রতিপাদন করেছেন। ষষ্ঠতে কর্মযোগ ব্যতীত সাংখ্যযোগ সম্পাদন করা কঠিন জানিয়ে কর্মযোগের ফল অবিলম্বেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি বলেছেন। সপ্তমে কর্মযোগীর নির্লিপ্ততা প্রতিপাদন করে অষ্টম ও নবমে সাংখ্যযোগের অকর্তৃত্বভাবের নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর দশম ও একাদশে ভগবদর্পণ বুদ্ধিতে কর্মকারীর এবং কর্মপ্রধান কর্মযোগীর প্রশংসা করে কর্মযোগীদের কর্মকে আত্মশুদ্ধির হেতু বলেছেন। দ্বাদশে কর্মযোগীদের নৈষ্ঠিক শান্তির এবং সকামভাবে কর্মকারীদের বন্ধন প্রাপ্তি হয় বলেছেন। ত্রয়োদশে সাংখ্যযোগীর স্থিতি বলে চতুর্দশ ও পঞ্চদশে পরমেশ্বরকে কর্ম, কর্তৃত্ব ও কর্মের ফল-সংযোগ রচনাকারী নন এবং কারোই পাপ-পুণ্য গ্রহণকারী নন জানিয়ে বলেছেন যে অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আবৃত হওয়াতেই সমস্ত জীব মোহগ্রস্ত হয়ে রয়েছে। ষোড়শে জ্ঞানের মহত্ত্ব বলে সপ্তদশে জ্ঞানযোগের একান্ত সাধনের বর্ণনা করেছেন, পরে অষ্টাদশ থেকে বিশ শ্লোক পর্যন্ত পরব্রহ্ম পরমাত্মাতে নিরন্তর অভিন্নভাবে স্থিত থাকা মহাপুরুষদের সমদৃষ্টি এবং স্থিতির বর্ণনা করে তাঁর পরমগতি প্রাপ্তির কথা বলেছেন। একুশতমতে অক্ষয় আনন্দ প্রাপ্তির সাধন এবং তা প্রাপ্তির কথা বলেছেন। বাইশতমতে ভোগসমূহকে দুঃখের কারণ ও বিনাশশীল বলে, বিবেকী মানুষকে তাতে আসক্ত না হওয়ার কথা বলে তেইশতমতে কাম-ক্রোধের বেগ সহ্য করতে পারা পুরুষকে যোগী ও সুখী বলেছেন। চব্বিশ থেকে ছাব্বিশতম শ্লোকে সাংখ্যযোগীর অন্তিম স্থিতি এবং নির্বাণ ব্রহ্মপ্রাপ্ত জ্ঞানী মহাপুরুষদের লক্ষণ জানিয়ে সাতাশ ও আঠাশতম শ্লোকে ফলসহ ধ্যানযোগের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করেছেন। সবশেষে উনত্রিশতম শ্লোকে ভগবানকে সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা, সর্বলোকমহেশ্বর এবং প্রাণী মাত্রেরই পরম সুহৃদ জানার ফল পরম শান্তি প্রাপ্তি বলে অধ্যায়ের উপসংহার করা হয়েছে।

সম্বন্ধ—তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ হতে অনেক প্রকারে কর্মযোগের প্রশংসা শুনেছেন এবং তা সম্পাদন করার প্রেরণা ও নির্দেশ লাভ করেছেন। সেই সঙ্গে শুনেছেন যে 'কর্মযোগের দ্বারা ভগবদ্স্বরূপের তত্ত্বজ্ঞান স্বতঃই হয়ে যায় (৪।৩৮) ; চতুর্থ অধ্যায়ের শেষেও তিনি ভগবানের কাছ থেকে কর্মযোগ সম্পাদন করার নির্দেশ লাভ করেছিলেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে তিনি ভগবানের শ্রীমুখ থেকেই **'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ'**, **'ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি'**, **'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন'** ইত্যাদি বচন দ্বারা জ্ঞানযোগ অর্থাৎ কর্মসন্ন্যাসেরও প্রশংসা শুনেছিলেন। তাতে অর্জুন স্থির করতে পারেননি এই দুইয়ের মধ্যে তাঁর জন্য কোনটি শ্রেষ্ঠ সাধন। তাই তিনি ভগবানের কাছ থেকে তা স্থির করাবার উদ্দেশ্যে তাঁকে প্রশ্ন করেছেন—

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগং চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥ ১

অর্জুন বললেন—হে কৃষ্ণ ! আপনি কর্মসন্ন্যাস এবং কর্মযোগ উভয়েরই প্রশংসা করছেন ! অতএব এই দুটির মধ্যে যেটি আমার পক্ষে যথাযথভাবে এবং নিশ্চিতরূপে কল্যাণকর সাধন, সেটির কথা বলুন ॥ ১

প্রশ্ন—এখানে **'কৃষ্ণ'** সম্বোধনের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'কৃষ্' ধাতুর অর্থ আকর্ষণ করা, **'ণ'** আনন্দের বাচক। ভগবান নিত্যানন্দস্বরূপ, তাই তিনি সবাইকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে থাকেন, তাই তাঁর নাম **'কৃষ্ণ'**। ভগবানকে এখানে **'কৃষ্ণ'** নামে সম্বোধন করে অর্জুন এই ভাব দেখাতে চেয়েছেন যে, আপনি সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর, সুতরাং আপনি আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সম্পূর্ণ সমর্থ।

প্রশ্ন—এখানে **'কর্ম-সন্ন্যাসের'** অর্থ কি কর্মাদি স্বরূপতঃ ত্যাগ করা ?

উত্তর—চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান কোথাও‌ই কর্মাদি স্বরূপতঃ (বাহ্যতঃ) ত্যাগের প্রশংসা করেননি এবং অর্জুনকেও কর্মত্যাগ করার নির্দেশ দেননি। অপরপক্ষে তিনি নানাস্থানে নিষ্কামভাবে কর্ম করতে বলেছেন (৪।১৫, ৪২)। সুতরাং এখানে কর্ম-সন্ন্যাসের অর্থ কর্মাদি স্বরূপতঃ ত্যাগ করা নয়। কর্ম সন্ন্যাসের অর্থ হল—'সম্পূর্ণ কর্মে কর্তৃত্বাভিমানরহিত হয়ে মনে করতে হবে যে গুণই গুণাদিতে আবর্তিত হচ্ছে, (৩।২৮) এবং নিরন্তর পরমাত্মার স্বরূপে একভাবে স্থিত হয়ে থাকা ও সর্বদা সর্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টি রাখা (৪।২৪)', এখানে এটিই জ্ঞানযোগ—এটিই কর্মসন্ন্যাস। চতুর্থ অধ্যায়ে এইভাবে জ্ঞানযোগের প্রশংসা করা হয়েছে এবং সেইজন্যই অর্জুনের এই প্রশ্ন।

এখানে ভগবান অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে 'সন্ন্যাস' ও 'কর্মযোগ' উভয়কেই কল্যাণকারক বলেছেন এবং চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে এই 'সন্ন্যাস'কে 'সাংখ্য' এবং পুনরায় ষষ্ঠ শ্লোকে একেই 'সন্ন্যাস' বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে এখানে 'কর্ম-সন্ন্যাস'-এর অর্থ সাংখ্যযোগ বা জ্ঞানযোগ, কর্মাদি স্বরূপতঃ ত্যাগ করা নয়। এছাড়া ভগবানের মতে কর্মকে স্বরূপতঃ ত্যাগ করলেই উদ্ধার হয় না (৩।৪) এবং কর্মকে সর্বতোভাবে ত্যাগ করা সম্ভবও নয় (৩।৫ ; ১৮।১১)। সুতরাং এখানে কর্মসন্ন্যাসের অর্থ জ্ঞানযোগ মানা উচিত, কর্মকে স্বরূপতঃ (বাহ্যিকভাবে) ত্যাগ করা নয়।

প্রশ্ন—অর্জুন তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে 'জ্ঞানযোগ' এবং 'কর্মযোগ'—এই দুটির মধ্যে আমাকে একটি সাধনের কথা বলুন যাতে আমি কল্যাণ লাভ করতে পারি। তাহলে তিনি দ্বিতীয়বার সেই প্রশ্ন করলেন কোন্ অভিপ্রায়ে ?

উত্তর—সেখানে (তৃতীয় অধ্যায়ে) অর্জুন 'জ্ঞানযোগ' ও 'কর্মযোগে'র বিষয়ে প্রশ্ন করেননি, সেখানে অর্জুনের প্রশ্নের তাৎপর্য ছিল যে 'আপনার মতে যদি কর্মের থেকে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তাহলে আমাকে ভয়ানক কর্মে কেন নিযুক্ত করছেন ? আপনার কথা আমি স্পষ্ট করে বুঝতে পারছি না, এটি আমার কাছে মিশ্রিত বাক্যের মতো মনে হচ্ছে, অতএব আমাকে একটি বিষয় স্পষ্ট করে বলুন।' কিন্তু এখানে অর্জুনের প্রশ্নটি অন্য। এখানে অর্জুন কর্মের থেকে জ্ঞানকেও শ্রেষ্ঠ মনে করছেন না অথবা ভগবানের কথাও মিশ্রিত বলে মনে করছেন না। অপরপক্ষে নিজেই এই কথা স্বীকার করে জিজ্ঞাসা করছেন—''আপনি 'জ্ঞানযোগ' ও 'কর্মযোগ' উভয়েরই প্রশংসা করছেন এবং দুটিকে ভিন্ন ভিন্ন বলছেন (৩।৩)। এবার আমাকে বলুন উভয়ের মধ্যে কোন্ সাধন আমার কাছে শ্রেয়স্কর ?'' এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে অর্জুন এখানে তৃতীয় অধ্যায়ের প্রশ্নটি দ্বিতীয়বার করেননি।

প্রশ্ন—ভগবান যখন তৃতীয় অধ্যায়ের উনিশতম ও ত্রিশতম শ্লোকগুলিতে এবং চতুর্থ অধ্যায়ের পনেরোতম ও বিয়াল্লিশতম শ্লোকে অর্জুনকে কর্মযোগের অনুষ্ঠানের স্পষ্টরূপে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাহলে তিনি আবার এখানে সেই কথা কেন জিজ্ঞাসা করলেন ?

উত্তর—সে কথা ঠিক। কিন্তু ভগবান চতুর্থ অধ্যায়ের চব্বিশ থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ—উভয় নিষ্ঠার অনুসারে কয়েক প্রকারের সাধন যজ্ঞের নামে বর্ণনা করেছেন এবং সেখানে দ্রব্যময় যজ্ঞের থেকে জ্ঞান যজ্ঞের প্রশংসা করেছেন (৪।৩৩)। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীদের থেকে জ্ঞানের উপদেশ লাভ করার জন্য প্রেরণা ও প্রশংসা করেছেন (৪।৩৪, ৩৫)। পরে একথা স্পষ্ট

করে বলেছেন যে, 'কর্মযোগে পূর্ণভাবে সিদ্ধ হওয়া মানুষ স্বয়ংই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন (৪।৩৮)। এইভাবে দুটি সাধনেরই প্রশংসা শুনে অর্জুন তাঁর নিজের জন্য কোন্‌টি যথার্থ হবে তা স্থির করতে পারলেন না। তাই তিনি এখানে ভগবানের নিশ্চিত মত জানার জন্য এরূপ প্রশ্ন করে ঠিকই করেছেন। অর্জুন এখানে ভগবানকে স্পষ্টভাবে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছেন যে আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণ ! আপনিই বলুন, আমার প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ, তত্ত্বজ্ঞানীদের দ্বারা শ্রবণ-মনন ইত্যাদি সাধনপূর্বক 'জ্ঞানযোগ'-এর বিধিতে করা উচিত না কি আসক্তিরহিত হয়ে নিষ্কামভাবে কর্মাদিকে ঈশ্বরে সমর্পণপূর্বক কর্মযোগের বিধিতে করা উচিত।

সম্বন্ধ—ভগবান এবার অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে॥ ২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—কর্মসন্ন্যাস এবং কর্মযোগ—এই দুটিই পরম কল্যাণকর ; কিন্তু উভয়ের মধ্যে কর্মসন্ন্যাসের থেকে কর্মযোগ সহজ হওয়ায় শ্রেষ্ঠ ॥ ২

প্রশ্ন—এখানে '**সন্ন্যাস**' পদের অর্থ কী ?

উত্তর—'**সম্**' উপসর্গের অর্থ '**সম্যক্ প্রকারে**' এবং '**ন্যাস**'-এর অর্থ 'ত্যাগ'। এইভাবে পূর্ণত্যাগকেই বলা হয় সন্ন্যাস। এখানে কায়-মনো-বাক্যের দ্বারা হওয়া সমস্ত ক্রিয়ায় কর্তৃত্বাভিমান এবং শরীর ও সমস্ত জগতে অহং-মমতা পূর্ণভাবে ত্যাগই 'সন্ন্যাস' শব্দের অর্থ। গীতায় 'সন্ন্যাস' ও 'সন্ন্যাসী' শব্দগুলি প্রসঙ্গানুসারে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও কর্মকে ভগবদ্ অর্পণ করাকে 'সন্ন্যাস' বলা হয়েছে (৩।৩০ ; ১২।৬ ; ১৮।৫৭) আবার কোথাও কাম্যকর্মাদি ত্যাগকে (১৮।২) ; কোথাও মন দ্বারা কর্মত্যাগকে (৫।১৩) আবার কোথাও কর্মযোগকে (৬।২) ; কোনো ক্ষেত্রে কর্মাদি স্বরূপতঃ ত্যাগ করাকে (৩।৪ ; ১৮।৭) ; তো কোথাও সাংখ্যযোগ অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠাকে (৫।৬ ; ১৮।৪৯) সন্ন্যাস বলা হয়েছে। এইরূপ কোথাও কর্মযোগীকে সন্ন্যাসী (৬।১, ১৮।১২) এবং 'সন্ন্যাস যোগযুক্তাত্মা' (৯।২৮) বলা হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে গীতায় 'সন্ন্যাস' শব্দটি সর্বত্র একই অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। প্রকরণ অনুসারে তার অর্থ ভিন্ন ভিন্ন। এখানে সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগের তুলনাত্মক আলোচনা আছে। ভগবান চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে 'সন্ন্যাস'কেই 'সাংখ্য' বলে যথাযথভাবে স্পষ্টীকরণ করে দিয়েছেন। সুতরাং এখানে '**সন্ন্যাস**' শব্দের অর্থ '**সাংখ্যযোগ**' মেনে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন—ভগবানের 'সন্ন্যাস' (সাংখ্যযোগ) এবং কর্মযোগ—দুটিই কল্যাণকারক বলার এখানে যদি এই অভিপ্রায় মেনে নেওয়া হয় যে এই দুটি সম্মিলিত হয়ে কল্যাণরূপ ফল প্রদান করে, তাহলে আপত্তি কীসের ?

উত্তর—সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ—এই দুটি সাধনের সম্পাদন এক কালে একই ব্যক্তির দ্বারা সম্ভব নয়। কারণ কর্মযোগী সাধনকালে কর্ম, কর্মফল, পরমাত্মাকে ও নিজেকে ভিন্ন ভিন্ন মনে করে কর্মফল ও আসক্তি ত্যাগ করে ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম করেন (৩।৩০ ; ৫।১০ ; ৯।২৭-২৮ ; ১২।১০ ; ১৮।৫৬-৫৭)। আর সাংখ্যযোগী মায়া দ্বারা উৎপন্ন সম্পূর্ণ গুণই গুণাদিতে আবর্তিত হচ্ছে (৩।২৮) অথবা ইন্দ্রিয়াদিই ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ে আবর্তিত হচ্ছে (৫।৮-৯) এরূপ মনে করে মন, ইন্দ্রিয় এবং শরীর দ্বারা হওয়া সম্পূর্ণ ক্রিয়াতে কর্তৃত্বাভিমান রহিত হয়ে কেবল সর্বব্যাপী সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার স্বরূপে অভিন্নভাবে অবস্থিত থাকেন। কর্মযোগী নিজেকে কর্মসমূহের কর্তা বলে মনে করেন (৫।১১), সাংখ্যযোগী কর্তা বলে মানেন না (৫।৮-৯)। কর্মযোগী তাঁর কর্মসমূহ ভগবানে অর্পণ করেন

(৯।২৭-২৮), সাংখ্যযোগী মন ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সংঘটিত হওয়া অহংবর্জিত ক্রিয়াগুলিকে কর্ম বলেই মনে করেন না (১৮।১৭)। কর্মযোগী পরমাত্মাকে নিজের থেকে পৃথক মনে করেন (১২।৬-৭), সাংখ্যযোগী নিজেকে সর্বদা পরমাত্মা থেকে অভিন্ন মনে করেন (১৮।২০), কর্মযোগী প্রকৃতি ও প্রকৃতির পদার্থসমূহের অস্তিত্ব স্বীকার করেন (১৮।৬১), সাংখ্যযোগী এক ব্রহ্ম ব্যতীত কারো অস্তিত্ব মানেন না (১৩।৩০)। কর্মযোগী কর্মফল এবং কর্মের অস্তিত্ব মানেন ; সাংখ্যযোগী ব্রহ্ম থেকে পৃথক কর্ম বা তার ফলের অস্তিত্ব এবং তার সঙ্গে তাঁর নিজের কোনো সম্পর্ক—কোনোটাই মানেন না। এইরূপ দুটি সাধন-প্রণালী এবং ধারণায় পূর্ব ও পশ্চিমের ন্যায় বিশাল পার্থক্য। এরূপ অবস্থায় দুটি নিষ্ঠার সাধন একজন ব্যক্তির দ্বারা একই কালে করা সম্ভব নয়। এছাড়া, যদি দুটি সাধন যুক্তভাবে কল্যাণকারক হত, তাহলে অর্জুনের এই প্রশ্নই উঠত না যে এদুটির মধ্যে যেটি সুনিশ্চিত কল্যাণকারক সাধন, সেটি আমাকে বলুন এবং ভগবানও একথা বলতেন না যে কর্ম-সন্ন্যাসের থেকে কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ এবং সাংখ্যযোগিগণ যে স্থান প্রাপ্ত হন, কর্মযোগীও তা পেয়ে থাকেন। অতএব এটাই মানা উচিত যে দুটি নিষ্ঠাই পৃথক। যদিও দুটিরই একই ফল যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা পরম কল্যাণস্বরূপ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত করা, তবুও অধিকারীভেদে সাধনে সহজ হওয়ায় অর্জুনের জন্য সাংখ্যযোগের থেকে কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ।

প্রশ্ন—যখন সন্ন্যাস (জ্ঞানযোগ) ও কর্মযোগ —উভয়ই পৃথকভাবে স্বতন্ত্ররূপে পরমকল্যাণকারক, তাহলে ভগবান এখানে সাংখ্যযোগের থেকে কর্মযোগকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন কেন ?

উত্তর—কর্মযোগী কর্ম করলেও সর্বদাই সন্ন্যাসী, তিনি সহজে, অনায়াসে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান (৫।৩)। তিনি শীঘ্রই পরমাত্মাকে লাভ করেন (৫।৬)। প্রত্যেক অবস্থায় ভগবান তাঁকে রক্ষা করেন (৯।২২) এবং কর্মযোগের অল্প সাধনও জন্ম-মৃত্যুরূপ মহাভয় থেকে উদ্ধার করে (২।৪০)। কিন্তু জ্ঞানযোগীর সাধন ক্লেশকর হয় (১২।৫), প্রথমে কর্মযোগের সাধন না করলে তা সফল হওয়াও কঠিন (৫।৬)। এই সব কারণে জ্ঞানযোগের থেকে কর্মযোগকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ— সাংখ্যযোগের থেকে কর্মযোগকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। এবার সেই বিষয় প্রমাণিত করার জন্য পরের শ্লোকে কর্মযোগীর প্রশংসা করছেন—

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥ ৩

হে অর্জুন ! যে ব্যক্তি কারো প্রতি দ্বেষ করেন না এবং কোনো কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন না, সেই নিষ্কাম কর্মযোগীকে সদা-সন্ন্যাসী বলেই জানবে। কারণ রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ-দ্বন্দ্বরহিত পুরুষ অনায়াসে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান ॥ ৩

প্রশ্ন—এখানে 'কর্মযোগী'কে 'নিত্য-সন্ন্যাসী' বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—কর্মযোগী কারোকে দ্বেষ করেন না এবং কোনো বস্তুর আকাঙ্ক্ষাও করেন না, তিনি দ্বন্দ্ব থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়ে যান। যিনি রাগ-দ্বেষরহিত, তিনিই সত্যকার সন্ন্যাসী, কারণ তাঁর সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করারও প্রয়োজন নেই এবং সাংখ্যযোগের আশ্রয় গ্রহণের প্রয়োজন নেই। সুতরাং এখানে কর্মযোগীকে 'নিত্যসন্ন্যাসী' বলে ভগবান তাঁর মহত্ত্ব প্রকট করেছেন যে সমস্ত কর্ম করেও তিনি সর্বদাই সন্ন্যাসী এবং অতি সহজেই তিনি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান।

প্রশ্ন—কর্মযোগী কী করে সুখপূর্বক কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হন ?

উত্তর—মানুষের কল্যাণপথে বিঘ্নপ্রদানকারী অত্যন্ত প্রবল শত্রু হল রাগ (আসক্তি) ও দ্বেষ। এগুলির জন্যই মানুষ কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়। কর্মযোগী এগুলি-

রহিত হয়ে ভগবদর্থ কর্ম করেন, তাই তিনি ভগবানের দয়ার প্রভাবে অনায়াসেই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হন।

প্রশ্ন—বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া কাকে বলে ?

উত্তর—অজ্ঞতামূলক শুভাশুভ কর্ম ও তার ফলই বন্ধন। এর দ্বারা বন্ধন হওয়ার জন্যই জীব বারংবার জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হতে থাকে। এই জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার থেকে চিরতরে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হওয়াই হল বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া।

সম্বন্ধ—সাধনে সহজ হওয়ায় সাংখ্যযোগের থেকে কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করে ভগবান দ্বিতীয় শ্লোকে উভয় নিষ্ঠার যে একই ফল—পরম কল্যাণ তা বলেছেন, সেই অনুসারে পরের দুটি শ্লোকে দুটি নিষ্ঠার ফলে ঐক্য প্রতিপাদন করছেন—

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্॥ ৪

মূর্খ ব্যক্তিগণ উপরোক্ত সন্ন্যাস ও কর্মযোগকে পৃথক পৃথক ফলপ্রদানকারী বলে থাকে, পণ্ডিতেরা তা বলেন না ; কারণ দুটির মধ্যে একটিতে সম্যক্‌ভাবে স্থিত হলে সাধক উভয়েরই ফলস্বরূপ সেই পরমাত্মাকে লাভ করেন॥ ৪

প্রশ্ন—'সাংখ্যযোগ' ও 'কর্মযোগ'কে যারা ভিন্ন বলেন, তাঁরা ছেলেমানুষ অর্থাৎ মূর্খ—এই কথাতে ভগবানের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'সাংখ্যযোগ' ও 'কর্মযোগ' উভয়ই পরমার্থতত্ত্বের যথার্থ জ্ঞান করিয়ে পরমপদরূপ কল্যাণ প্রাপ্তির হেতু হয়। এইরূপ উভয়ের ফল এক হলেও যাঁরা কর্মযোগের এক ফল ও সাংখ্যযোগের অন্য ফল কল্পনা করে দুটি সাধনকে পৃথক বলে মনে করেন, তাঁরা ছেলেমানুষ (অপরিপক্ব বুদ্ধি)। কারণ দুটির সাধন প্রণালীতে পার্থক্য থাকলেও ফলে ঐক্য থাকায় প্রকৃতপক্ষে উভয়ে ঐক্য বিরাজ করে।

প্রশ্ন—কর্মযোগে পরমার্থ জ্ঞানের দ্বারা পরমপদ প্রাপ্তিরূপ ফল বলা যথার্থ, কারণ আমি তাঁকে সেই বুদ্ধিযোগ প্রদান করছি, যার সাহায্যে তিনি আমাকে লাভ করতে পারেন (১০।১০) ; তাঁকে দয়া করার জন্যই আমি জ্ঞানরূপ দীপের সহায়তায় তাঁর অন্ধকার বিনাশ করি (১০।১১) ; কর্মযোগের সাহায্যে শুদ্ধ হৃদয় হয়ে স্বতঃই সেই জ্ঞান প্রাপ্ত করেন (৪।৩৮), ইত্যাদি ভগবানের বক্তব্যে এটি প্রমাণিত হয়। কিন্তু সাংখ্যযোগ তো স্বয়ংই তত্ত্বজ্ঞান। তার ফল তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভ হওয়া কী করে মানা সম্ভব ?

উত্তর—'সাংখ্যযোগ' পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞানের নাম নয়, এটি তত্ত্বজ্ঞানীদের থেকে শোনা উপদেশ অনুসারে পালিত সাধনের নাম। কারণ ত্রয়োদশ অধ্যায়ের চব্বিশতম শ্লোকে ধ্যানযোগ, সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ এই তিনটি আত্ম-দর্শনের পৃথক পৃথক সাধন বলা হয়েছে। সুতরাং সাংখ্যযোগের ফল পরমার্থ জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তি বলা ঠিকই হয়েছে। ভগবান অষ্টাদশ অধ্যায়ে উনপঞ্চাশতম শ্লোকের থেকে পঞ্চান্নতম শ্লোক পর্যন্ত জ্ঞাননিষ্ঠার বর্ণনা করে ব্রহ্মভূত হওয়ার পর অর্থাৎ ব্রহ্মে অভিন্নভাবে স্থিতিরূপ সাংখ্যযোগ লাভ করার পর তার ফল তত্ত্ব-জ্ঞানরূপ পরাভক্তি এবং তার দ্বারা পরমাত্মার স্বরূপকে যথার্থভাবে জেনে তাতে প্রবিষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন। এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে সাংখ্যযোগের সাধন দ্বারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান হয় এবং তখনই মোক্ষলাভ হয়।

প্রশ্ন—'পণ্ডিত' শব্দের অর্থ কী ?

উত্তর—পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞানরূপ বুদ্ধিকে বলা হয় পণ্ডা আর যাতে এটি থাকে, তাকে বলা হয় 'পণ্ডিত'। সুতরাং প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী সিদ্ধ মহাপুরুষের নাম 'পণ্ডিত'।

প্রশ্ন—একই নিষ্ঠায় সম্পূর্ণভাবে স্থিত পুরুষ দুটির ফল কীভাবে প্রাপ্ত করেন ?

উত্তর—উভয় নিষ্ঠার ফলই এক এবং সেটি হল পরমার্থজ্ঞানের দ্বারা পরমাত্মা প্রাপ্তি। সুতরাং বলা যায় যে

একটিতে পূর্ণভাবে স্থিত ব্যক্তি উভয়ের ফলই লাভ করেন। যদি কর্মযোগের ফল সাংখ্যযোগ হত এবং সাংখ্যযোগের ফল পরমাত্ম-সাক্ষাৎকাররূপ মোক্ষ লাভ হত তাহলে দুটিতে ফলভেদ হওয়ায় এরূপ বলা ঠিক হত না। কারণ তা মনে করলে সাংখ্যযোগের পরিপক্ব অবস্থায় স্থিত ব্যক্তি কর্মযোগের ফলস্বরূপ সাংখ্যযোগে তো প্রথম থেকেই স্থিত রয়েছে, তবে তিনি কর্মযোগের কী ফল প্রাপ্ত করবেন ? আর কর্মযোগে স্থিত ব্যক্তি যদি সাংখ্যযোগে স্থিত হয়েই পরমাত্মাকে লাভ করেন তাহলে তিনি সাংখ্যযোগের ফল সাংখ্যযোগের দ্বারাই লাভ করেন, সেক্ষেত্রে এটি বলা কী করে সার্থক হয় যে একই নিষ্ঠায় যথাযথভাবে স্থিত ব্যক্তি উভয়ের ফল লাভ করে থাকেন। সুতরাং এটিই প্রতীয়মান হয় যে দুটি নিষ্ঠা পৃথক এবং দুটির ফলই এক। এইভাবে মেনে নিলেই ভগবানের এই বচন সার্থক হয় যে উভয়ের মধ্যে কোনো একটি নিষ্ঠাতে যথাযথভাবে স্থিত ব্যক্তি উভয়ের ফল লাভ করেন। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের চব্বিশতম শ্লোকেও ভগবান দুটিকেই আত্মসাক্ষাৎকারের পৃথক সাধন বলে মেনে নিয়েছেন।

প্রশ্ন—প্রথম শ্লোকে অর্জুন কর্মসন্ন্যাস ও কর্মযোগের নামে প্রশ্ন করেছিলেন এবং দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবানও সেইভাবে উভয়কেই কল্যাণকারক বলে উত্তর দিয়েছিলেন, আবার সেই প্রকরণে এখানে 'সাংখ্য' ও 'যোগ'-এর নামে উভয়ের ফলের ঐক্য বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'কর্মসন্ন্যাস'-এর অর্থ কর্মকে স্বরূপতঃ ত্যাগ করা এবং কর্মযোগের অর্থ 'যেমন তেমন ভাবে কর্ম করতে থাকা' মনে করে লোকে যাতে ভুল না করে, তাই ঐ দুটি শব্দান্তর দ্বারা বর্ণনা করে ভগবান স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে কর্মসন্ন্যাসের অর্থ হল—'সাংখ্য' এবং কর্মযোগের অর্থ—সিদ্ধি ও অসিদ্ধির সমত্বরূপ 'যোগ' (২।৪৮)। সুতরাং অন্য শব্দ প্রয়োগ করে ভগবান এখানে কোনো নতুন কথা বলেননি।

প্রশ্ন—এখানে 'অপি' শব্দের দ্বারা কী ভাব প্রকাশিত হয় ?

উত্তর—উভয় সাধনই যথাযথভাবে করলে তা ফলপ্রদানে সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র এবং সক্ষম, এখানে 'অপি' এই কথারই দ্যোতক।

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।। ৫

জ্ঞানযোগী যে পরমধাম লাভ করেন, কর্মযোগীও সেই ধাম প্রাপ্ত হন। তাই যিনি জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগকে ফলরূপে অভিন্ন দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী ॥ ৫

প্রশ্ন—সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ যখন দুটি সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র পথ এবং উভয়ের সাধন প্রণালীতেও পূর্ব ও পশ্চিমের ন্যায় পরস্পর পার্থক্য থাকে (যেমন অন্য শ্লোকের ব্যাখ্যাতে বলা হয়েছে।) তাহলে উভয় প্রকারের সাধকদের একই ফল কী করে লাভ হতে পারে ?

উত্তর—যেমন কোনো ব্যক্তির যদি ভারতবর্ষ থেকে আমেরিকায় যেতে হয়, তাহলে তিনি ঠিক পথ ধরে পূর্ব থেকে পূর্ব দিকে যেতে থাকেন, তাহলে তিনি আমেরিকাতে পৌঁছে যাবেন আবার যদি তিনি শুধু পশ্চিম ধরে যেতে থাকেন, তাহলেও আমেরিকায় পৌঁছে যাবেন। তেমনই সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগের সাধন প্রণালীতে পরস্পর পার্থক্য থাকলেও যে ব্যক্তি কোনো একটি সাধনে দৃঢ়তা সহকারে লেগে থাকেন, তিনি উভয় সাধন প্রণালীর চরম লক্ষ্য সেই পরমাত্মাকে লাভ করবেন।

সম্বন্ধ—সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগের ফলের ঐক্য জানিয়ে এবার কর্মযোগের সাধনবিষয়ক বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট করছেন—

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম নচিরেণাধিগচ্ছতি॥ ৬

কিন্তু হে অর্জুন ! নিষ্কাম কর্মযোগ বিনা সন্ন্যাস অর্থাৎ মন, ইন্দ্রিয় এবং শরীর দ্বারা করা সমস্ত কর্মে কর্তৃত্ব ত্যাগ করা কঠিন এবং ভগবৎস্বরূপ মননকারী নিষ্কাম কর্মযোগী পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে শীঘ্রই লাভ করেন ॥ ৬

প্রশ্ন—'তু' কথাটির এখানে অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে 'তু' হল এই বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক যে সন্ন্যাস (সাংখ্যযোগ) এবং কর্মযোগের ফল এক হলেও কর্মযোগের থেকে সাংখ্যযোগ সাধন করা কঠিন।

প্রশ্ন—ভগবান এখানে অর্জুনকে **'মহাবাহো'** সম্বোধন করে কী বলতে চেয়েছেন ?

উত্তর—যার বাহু মহান, তাকে 'মহাবাহু' বলা হয়। ভাই এবং মিত্রকেও 'বাহু' বলা হয়। সুতরাং ভগবান এই সম্বোধনে এই ভাব দেখিয়ে অর্জুনকে উৎসাহিত করেছেন যে তোমার ভাই মহান ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির এবং মিত্র সাক্ষাৎ পরমেশ্বর আমি, তাহলে তোমার চিন্তা কীসের ? তোমার জন্য তো সবকিছুই অত্যন্ত সুগম।

প্রশ্ন—সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ দুটিই যখন পৃথক পথ তখন একথা এখানে কী করে বলা হয় যে কর্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস লাভ করা কঠিন ?

উত্তর—পৃথক সাধন হলেও দুটিতে যে সহজ ও কঠিন—এই পার্থক্য আছে, সেটি স্পষ্ট করার জন্যই ভগবান এরূপ বলেছেন। মনে করুন, একজন মুমুক্ষু ব্যক্তি মনে করেন যে, সমস্ত দৃশ্যজগৎ স্বপ্ন সদৃশ মিথ্যা, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। এই সমস্ত প্রপঞ্চ মায়া দ্বারা সেই ব্রহ্মে আরোপিত। বস্তুতঃ তার কোনো অস্তিত্বই নেই, কিন্তু তাঁর অন্তঃকরণ শুদ্ধ নয়, তাতে রাগ-দ্বেষ, কাম-ক্রোধাদি দোষ বর্তমান। তিনি যদি অন্তঃকরণ শুদ্ধির কোনো চেষ্টা না করে কেবল নিজের মনে করার ওপর নির্ভর করে সাংখ্যযোগের সাধনে ব্যাপৃত হন তাহলে তাঁর দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক থেকে ত্রিশতম পর্যন্ত এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের ঊনপঞ্চাশতম শ্লোক থেকে পঞ্চান্নতম শ্লোক পর্যন্ত কথিত 'সাংখ্যনিষ্ঠা' সহজে প্রাপ্তি হবে না। কারণ শরীরে যতক্ষণ অহংভাব থাকে, ভোগাদিতে মমতা এবং অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থায় রাগ-দ্বেষ বর্তমান থাকে, ততক্ষণ জ্ঞাননিষ্ঠার সাধন হওয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণ কর্মে কর্তৃত্বাভিমান রহিত হয়ে নিরন্তর সচ্চিদানন্দঘন নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের স্বরূপে অভিন্নভাবে অবস্থান করা তো দূরের কথা, এটি বোঝাও কঠিন হয়ে থাকে। এতদ্ব্যতীত অন্তঃকরণ অশুদ্ধ হওয়ায় মোহবশতঃ জগতের নিয়ন্ত্রণকর্তা ও কর্মফলদাতা ভগবানে এবং স্বর্গ-নরকাদি কর্মফলে বিশ্বাস না থাকায় তাঁর পরিশ্রম-সাধ্য শুভকর্মসমূহ ত্যাগ করা ও বিষয়াসক্তি ইত্যাদি দোষের জন্য পাপময় ভোগে আবদ্ধ হয়ে কল্যাণপথ থেকে ভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং এইরূপ ধারণাযুক্ত মানুষের জন্য—যাঁরা সাংখ্যযোগকেই পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারের উপায় বলে মনে করেন, তাদের ক্ষেত্রে পরম আবশ্যক হল সাংখ্য যোগের সাধনে ব্যাপৃত হওয়ার আগে নিষ্কামভাবে যজ্ঞ, দান, তপ ইত্যাদি শুভকর্মাদির আচরণ করে নিজ অন্তঃ-করণকে রাগ-দ্বেষাদি দোষরহিত করে পরিশুদ্ধ করে নেওয়া, তাহলেই তাদের সাংখ্যযোগের সাধন নির্বিঘ্নতার সঙ্গে হওয়া সম্ভব এবং তখনই তাঁরা সাফল্য লাভ করতে পারবেন। এখানে এই অভিপ্রায়েই কর্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস লাভ কঠিন বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে **'মুনিঃ'** বিশেষণের সঙ্গে **'যোগযুক্তঃ'** কেন প্রয়োগ করা হয়েছে এবং তিনি পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে শীঘ্রই কী করে লাভ করেন ?

উত্তর—যিনি সবই ভগবানের মনে করে সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমভাব রেখে, আসক্তি ও ফলেচ্ছা ত্যাগ করে ভগবদাজ্ঞানুসারে সমস্ত কর্তব্যকর্ম করেন ও শ্রদ্ধা-ভক্তি সহ, নামগুণ ও প্রভাবসহ শ্রীভগবানের স্বরূপ চিন্তা করেন, সেই ভক্তিযুক্ত কর্মযোগীর জন্য **'মুনিঃ'** বিশেষণের সঙ্গে **'যোগযুক্তঃ'** শব্দটি প্রযোজ্য হয়েছে। এরূপ কর্মযোগী ভগবানের দয়ায় পরমার্থ জ্ঞানের দ্বারা শীঘ্রই পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লাভ করেন।

প্রশ্ন—এখানে **'মুনিঃ'** পদটির অর্থ বাক্‌সংযমী বা

জিতেন্দ্রিয় সাধক বলে মেনে নিলে আপত্তি কীসের ?

উত্তর—ভগবানের স্বরূপ চিন্তনকারী কর্মযোগী বাক্‌সংযমী ও জিতেন্দ্রিয় তো হবেই থাকেন, এতে আপত্তির কী আছে ?

প্রশ্ন—'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ সগুণ পরমেশ্বর না নির্গুণ পরমাত্মা ?

উত্তর—সগুণ ও নির্গুণ পরমাত্মা প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন নয়। একই পরমপুরুষের দুই স্বরূপ। অতএব এটিই জানতে হবে যে 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ সগুণ পরমেশ্বর এবং নির্গুণ পরমাত্মা, উভয়ই।

সম্বন্ধ—এখন উপরোক্ত কর্মযোগীর লক্ষণাদি বর্ণনা করে তাঁর কর্মে লিপ্ত না হওয়ার কথা বলেছেন—

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে॥ ৭

যাঁর মন বশীভূত, যিনি জিতেন্দ্রিয় ও বিশুদ্ধ চিত্ত, সর্বপ্রাণীর আত্মারূপ পরমাত্মাই যাঁর আত্মস্বরূপ, এরূপ নিষ্কাম কর্মযোগী কর্ম করলেও লিপ্ত হন না ॥ ৭

প্রশ্ন—'যোগযুক্তঃ' সঙ্গে '**বিজিতাত্মা**', '**জিতেন্দ্রিয়ঃ**' এবং '**বিশুদ্ধাত্মা**' এই বিশেষণগুলি কী অভিপ্রায়ে ব্যবহৃত ?

উত্তর—সাধকের মন এবং ইন্দ্রিয়গুলি যদি বশে না থাকে তাহলে সেগুলি স্বাভাবিকভাবে বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় এবং চিত্তে যতক্ষণ রাগ-দ্বেষাদি মল থাকে, ততক্ষণ সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাব রাখা কঠিন। সুতরাং মন ও ইন্দ্রিয়াদি যতক্ষণ পুরোপুরি বশীভূত না হয় এবং অন্তঃকরণ সম্পূর্ণভাবে শুদ্ধ না হয় ততক্ষণ সাধককে প্রকৃত কর্মযোগী বলা যায় না। তাই এখানে উপরোক্ত বিশেষণ প্রয়োগের দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, যাঁর মধ্যে এরূপ সংযম আছে, তিনিই পূর্ণ কর্মযোগী এবং তিনিই শীঘ্র ব্রহ্মলাভ করেন।

প্রশ্ন—'**সর্বভূতাত্মভূতাত্মা**' এই পদটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ব্রহ্মা থেকে স্তম্ব পর্যন্ত সমস্ত প্রাণীর আত্মরূপ এক পরমেশ্বরই যাঁর আত্মা অর্থাৎ অন্তর্যামী, যিনি তাঁর (অন্তর্যামীর) প্রেরণা অনুসারে সমস্ত কর্ম করেন এবং ভগবান ব্যতীত শরীর, মন, বুদ্ধি বা অন্য কোনো বস্তুতে যাঁর মমত্ববোধ নেই, তিনিই '**সর্বভূতাত্মভূতাত্মা**'।

প্রশ্ন—এখানে কোন্ হেতুতে '**অপি**' প্রয়োগ করা হয়েছে ?

উত্তর—সাংখ্যযোগী নিজেকে কোনো কর্মেরই কর্তা বলে মনে করেন না ; তাঁর মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সমস্ত কর্ম হতে থাকলেও তিনি মনে করেন যে 'আমি কিছুই করি না, গুণই গুণাদিতে আবর্তিত হচ্ছে, এগুলির সঙ্গে আমার কোনোরূপ সম্বন্ধ নেই।' তাই তাঁর কর্মে লিপ্ত না হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু নিজেকে কর্তা মনে করেন যে কর্মযোগী, তিনিও ভগবানের নির্দেশানুসারে ও ভগবানের জন্য সব কর্ম করেও ফলেচ্ছা এবং আসক্তি না থাকায়, কর্মে আবদ্ধ হন না। এটিই তাঁর বিশেষত্ব। এই অভিপ্রায়ে '**অপি**' শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে।

সম্বন্ধ—দ্বিতীয় শ্লোকে সূত্ররূপে কর্মযোগ ও সাংখ্যযোগের ফলে ঐক্য বলে সাংখ্যযোগের থেকে সহজ হওয়ায় কর্মযোগকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন। পরে তৃতীয় শ্লোকে কর্মযোগীর প্রশংসা করে, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে উভয় ফলের ঐক্য ও স্বতন্ত্রতা যথাযথভাবে প্রতিপাদন করেছেন। তারপর ষষ্ঠ শ্লোকের পূর্বার্ধে কর্মযোগ ব্যতীত সাংখ্যযোগ সম্পাদন করা কঠিন জানিয়ে উত্তরার্ধে কর্মযোগের সুগমতা প্রতিপাদন করে সপ্তম শ্লোকে কর্মযোগীর লক্ষণ জানিয়েছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দুটি সাধনের ফল এক হলেও দুটি সাধন পরস্পর পৃথক। অতএব উভয়ের স্বরূপ জানার ইচ্ছা হওয়ায় ভগবান প্রথম, অষ্টম ও নবম শ্লোকে সাংখ্যযোগীর ব্যবহারকালীন সাধনের স্বরূপ জানাচ্ছেন—

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্ অশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্।। ৮
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্ উন্মিষন্ নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্।। ৯

তত্ত্বদর্শী সাংখ্যযোগী দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা, নিঃশ্বাস গ্রহণ, কথোপকথন, মল-মূত্রাদি ত্যাগ, গ্রহণ, চক্ষুর উন্মেষ ও নিমেষ ইত্যাদি কার্যে ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয় প্রবর্তিত—এরূপ ধারণা করেন। তিনি নিশ্চিতভাবে জানেন যে তিনি কিছুই করেন না ।। ৮-৯

প্রশ্ন—এখানে 'তত্ত্ববিৎ' এবং 'যুক্তঃ' এই দুটি বিশেষণ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী?

উত্তর—সম্পূর্ণ দৃশ্য-প্রপঞ্চ ক্ষণভঙ্গুর এবং অনিত্য হওয়ায় মৃগ-তৃষ্ণার জল বা স্বপ্নের জগতের ন্যায় মায়াময়, কেবলমাত্র সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মই সত্য। তাঁতেই এই সমস্ত প্রপঞ্চ মায়া দ্বারা অধ্যারোপিত—এইভাবে নিত্য-অনিত্য বস্তুর তত্ত্ব বুঝে যে ব্যক্তি নিরন্তর নির্গুণ-নিরাকার সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্ম পরমাত্মাতে অভিন্নভাবে স্থিত হন, তিনিই '**তত্ত্ববিৎ**' এবং '**যুক্ত**'। সাংখ্যযোগের সাধকের এরূপই হওয়া উচিত। এটি বোঝাবার জন্যই এই দুটি বিশেষণ দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি সব ক্রিয়াগুলি করতে থাকলেও আমি কিছুই করি না, এই কথার ভাবার্থ কী?

উত্তর—স্বপ্নোত্থিত মানুষ যেমন মনে করে যে স্বপ্নকালে স্বপ্নের শরীর, মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা আমার যে ক্রিয়াগুলি হওয়া প্রতীয়মান হচ্ছিল, বাস্তবে সেই ক্রিয়াগুলির কোনো অস্তিত্ব এবং তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কও নেই ; তেমনই তত্ত্ব বুঝে নিয়ে নির্বিকার, অক্রিয় পরমাত্মাতে অভিন্নভাবে স্থিত থাকা সাংখ্যযোগীরও জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, প্রাণ-মন ইত্যাদির দ্বারা লোকদৃষ্টিতে দেখা-শোনা ইত্যাদি সমস্ত ক্রিয়াগুলি করার সময় মনে করতে হবে যে এইসব মায়াময় মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ই নিজ নিজ মায়াময় বিষয়ে প্রবর্তিত হচ্ছে। বাস্তবে কিছুই হচ্ছে না এবং এদের সঙ্গে আমার কোনোরূপ সম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন—তাহলে তো রাগ-দ্বেষ ও কাম-ক্রোধাদি দোষযুক্ত হয়েও নিজধারণা অনুসারে নিজেকে যে সাংখ্যযোগী ভেবে নিয়েছে, সেও বলতে পারে আমার মন-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা কিছু ভালো-মন্দ ক্রিয়া হচ্ছে, তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। এই অবস্থায় প্রকৃত সাংখ্যযোগীকে কী করে চেনা যাবে?

উত্তর—শুধুমাত্র মুখের কথায় কেউ সাংখ্যযোগী হয়ে যায় না বা কর্ম থেকেও তার সম্পর্ক ছেদ হয় না। বাস্তবিক সাংখ্যযোগীর জ্ঞানে সমস্ত প্রপঞ্চ স্বপ্নের ন্যায় মায়াময় হয়ে থাকে। তাই তাঁর কোনো বস্তুতে বিন্দুমাত্র আসক্তি থাকে না। তাঁর মধ্যে রাগ-দ্বেষের সর্বতোভাবে বিনাশ হয়ে থাকে এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার ইত্যাদি দোষ তাঁর মধ্যে একটুও থাকে না। এরূপ অবস্থায় নিষিদ্ধাচরণের কোনো হেতু না থাকায় তাঁর বিশুদ্ধ মন ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা কিছু কর্মপ্রচেষ্টা হয়, তা সবই শাস্ত্রানুকূল ও লোকহিতের জন্যই হয়ে থাকে। প্রকৃত সাংখ্যযোগীর এই হল পরিচয়। নিজের মধ্যে যতক্ষণ রাগ-দ্বেষ ও কাম-ক্রোধের বিন্দুমাত্রও অস্তিত্ব আছে বলে মনে হবে, সাংখ্যযোগী সাধকের ততক্ষণ নিজের সাধনে ত্রুটি আছে বলে বুঝতে হবে।

প্রশ্ন—সাংখ্যযোগী শরীর নির্বাহের জন্যই শুধুমাত্র খাওয়া-শোওয়া ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ক্রিয়া করে থাকেন নাকি বর্ণাশ্রম অনুসারে শাস্ত্রানুকূল সকল কর্ম করেন?

উত্তর—তেমন বিশেষ কোনো নিয়ম নেই। বর্ণ, আশ্রম, প্রকৃতি, প্রারব্ধ, সঙ্গ, অভ্যাসের পার্থক্য থাকায় সকল সাংখ্যযোগীর কর্ম একপ্রকার হয় না। এখানে '**পশ্যন্**', '**শৃণ্বন্**', '**স্পৃশন্**', '**জিঘ্রন্**', ও '**অশ্নন্**' এই পাঁচটি পদের দ্বারা চোখ-কান-ত্বক-নাসিকা-রসনা—এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সমস্ত ক্রিয়াগুলি ক্রমান্বয়ে বলা

হয়েছে। '**গচ্ছন্**', '**গৃহ্ণন্**' ও '**প্রলপন্**' দ্বারা পা-হাত ও বাক্য এবং '**বিসৃজন্**' দ্বারা উপস্থ ও গুহ্য, এইভাবে পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে। '**শ্বসন্**' পদটি প্রাণ-অপানাদি পঞ্চপ্রাণের ক্রিয়ার বোধক। তেমনই '**উন্মিষন্**', '**নিমিষন্**' পদ কূর্ম ইত্যাদি পঞ্চ বায়ুভেদের ক্রিয়াসমূহের বোধক এবং '**স্বপন্**' পদ অন্তঃকরণের ক্রিয়ার বোধক। এইরূপ সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও চিত্তের ক্রিয়াসমূহের উল্লেখ হওয়ায় সাংখ্যযোগীর দ্বারা তাঁর বর্ণ, আশ্রম, প্রকৃতি, প্রারব্ধ ও সঙ্গ অনুসারে শরীর নির্বাহ এবং লোকোপকারার্থ, শাস্ত্রানুকূল খাওয়া-শোওয়া, ব্যাপার, উপদেশ, লেখা-পড়া, শোনা, চিন্তা করা ইত্যাদি সকল ক্রিয়াই সম্ভব হতে পারে।

প্রশ্ন—তৃতীয় অধ্যায়ের আঠাশতম শ্লোকে বলা হয়েছে যে 'গুণই গুণাদিতে আবর্তিত হয়' এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ঊনত্রিশতম শ্লোকে 'সমস্ত কর্ম প্রকৃতি দ্বারা করা হয়ে থাকে' বলা হয়েছে আর এখানে বলা হয়েছে যে 'ইন্দ্রিয়াদিই ইন্দ্রিয়াদির অর্থে আবর্তিত হয়'—এই তিন প্রকার বর্ণনার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—ইন্দ্রিয় এবং তার সমস্ত বিষয় সত্ত্ব, রজ, তম—এই তিন গুণের কার্য এবং তিন গুণ প্রকৃতির কার্য। সুতরাং সব কর্ম প্রকৃতির দ্বারা কৃত বলা হোক বা গুণাদি গুণেতে আবর্তিত হয় অথবা ইন্দ্রিয়াদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে আবর্তিত হয় বলা হোক, সবই এক ব্যাপার। সিদ্ধান্তের পুষ্টির জন্যই প্রসঙ্গানুসারে এক কথাই তিন প্রকারে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ ও মন সম্বন্ধীয় ক্রিয়াসমূহের বর্ণনা করেও শুধুমাত্র এরূপ মেনে নেওয়ার জন্য কেন বলা হয়েছে যে 'ইন্দ্রিয়াদিই ইন্দ্রিয়ের অর্থে আবর্তন করে'?

উত্তর—ক্রিয়াসমূহে ইন্দ্রিয়াদিরই প্রাধান্য। প্রাণকেও ইন্দ্রিয়াদির নামেই বর্ণনা করা হয়েছে এবং মনও আভ্যন্তর করণ হওয়ায় সেটিও ইন্দ্রিয়ই। এই রূপ 'ইন্দ্রিয়' শব্দে সবকিছুর সমাবেশ হয়, সুতরাং এরূপ বলায় কোনো আপত্তি নেই।

প্রশ্ন—এখানে '**এব**' পদটি কী উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয়েছে?

উত্তর—কর্মে কর্তৃত্বের সর্বতোভাবে অভাব বলার জন্য এখানে '**এব**' পদটি প্রয়োগ করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে সাংখ্যযোগী কখনো কোনোভাবে নিজেকে কর্তা বলে মনে করেন না।

সম্বন্ধ—এই ভাবে সাংখ্যযোগীর সাধনের স্বরূপ জানিয়ে এবার দশম ও একাদশ শ্লোকে ফলসহ কর্মযোগীদের সাধনের স্বরূপ বলেছেন—

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ ১০

যে ব্যক্তি সমস্ত কর্ম পরমাত্মায় অর্পণপূর্বক আসক্তি ত্যাগ করে কর্ম করেন, সেই ব্যক্তি জলে পদ্মপত্রের ন্যায় পাপে লিপ্ত হন না॥ ১০

প্রশ্ন—সম্পূর্ণ কর্ম পরমাত্মাকে অর্পণ করা কাকে বলে?

উত্তর—ঈশ্বরে ভক্তি, দেবতার পূজা, মাতা-পিতা-গুরুজনদের সেবা, যজ্ঞ, দান, তপ এবং বর্ণাশ্রম অনুকূল অর্থোপার্জন সম্বন্ধীয়, খাওয়াদাওয়া ইত্যাদি শরীর নির্বাহের যতপ্রকার শাস্ত্রবিহিত কর্ম, সেই সব কর্মে মমতা আসক্তি সর্বতোভাবে ত্যাগ করে, সবই ভগবানের মনে করে, তাঁরই জন্য, তাঁরই নির্দেশে, ইচ্ছানুসারে, তিনি যেমন করাবেন তেমনই কাঠপুতুলের মতো করা—একেই বলে পরমাত্মাতে সব কিছু অর্পণ করা।

প্রশ্ন—আসক্তি ত্যাগ করে কর্ম করা কিরূপ?

উত্তর—স্ত্রী, পুত্র, ধন, গৃহ ইত্যাদি ভোগের সমস্ত সামগ্রীতে, স্বর্গ ইত্যাদি লোকে, শরীরে, সমস্ত ক্রিয়াতে এবং মান, মর্যাদা, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদিতে সর্বপ্রকারে আসক্তি ত্যাগ করে উপরোক্ত প্রকারে কর্ম করাকে আসক্তি ত্যাগ

করে কর্ম করা বলা হয়।

প্রশ্ন—কর্মযোগী তো শাস্ত্রবিহিত সৎকর্মই করেন, তিনি পাপকর্ম তো করেন না আর পাপকর্ম না করলে পাপে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কাও থাকে না, তাহলে একথা কেন বলা হল যে তিনি পাপে লিপ্ত হন না ?

উত্তর—বিহিত কর্মও সর্বতোভাবে নির্দোষ হয় না, কর্মমাত্রেই হিংসাসম্পর্কিত কিছু না কিছু পাপ হয়েই যায়। তাই ভগবান **'সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ'** (১৮।৪৮) বলে কর্মের আরম্ভকে অর্থাৎ কর্মমাত্রই দোষযুক্ত বলেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি ফলকামনা এবং আসক্তির বশীভূত হয়ে ভোগ ও আরামের জন্য কর্ম করেন, তিনি পাপ হতে কখনো রক্ষা পেতে পারেন না। কামনা এবং আসক্তিই মানুষের বন্ধনের হেতু, তাই যাঁর মধ্যে কামনা ও আসক্তির লেশমাত্র নেই, সেই ব্যক্তি কর্ম করলেও পাপের দ্বারা লিপ্ত হয় না—একথা সর্বাংশে সত্য।

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥ ১১

নিষ্কাম কর্মযোগী ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং শরীরের প্রতি মমত্ববুদ্ধিরহিত হয়ে আসক্তি ত্যাগ করে চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম করেন ॥ ১১

প্রশ্ন—এখানে **'কেবলৈঃ'** এই বিশেষণটির অভিপ্রায় কী ? এর সম্বন্ধ কি শুধু ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে না কি মন, বুদ্ধি এবং শরীরের সঙ্গেও ?

উত্তর—এখানে **'কেবলৈঃ'** বিশেষণটি মমত্ব না থাকার দ্যোতক এবং এখানে ইন্দ্রিয়াদির বিশেষণের রূপে প্রযুক্ত হয়েছে। কিন্তু মন, বুদ্ধি এবং শরীরের সঙ্গেও এর সম্বন্ধ ধরে নেওয়া উচিত। অভিপ্রায় হল যে কর্মযোগী মন, বুদ্ধি, শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিতে মমত্ববোধ রাখেন না ; তিনি এই সবগুলি ভগবানের বস্তু বলেই মনে করেন এবং লৌকিক স্বার্থরহিত হয়ে নিষ্কামভাবে ভগবানের প্রেরণা অনুসারে, যেমন তিনি করান তেমন ভাবেই, সমস্ত কর্তব্যকর্ম করে থাকেন।

প্রশ্ন— সর্বকর্ম ব্রহ্মে অর্পণ করে অনাসক্তভাবে আচরণ করার কথা ভগবান দশম শ্লোকে তো বলেই দিয়েছেন, তাহলে আর একবার সেই আসক্তি ত্যাগের কথা কি প্রয়োজনে বলেছেন ?

উত্তর—ভগবান কর্মাদি ব্রহ্মে অর্পণ করা ও আসক্তি ত্যাগ করার কথা অবশ্যই বলেছিলেন ; কিন্তু এটি ভক্তি-প্রধান কর্মযোগীর বর্ণনা। যেমন এই অধ্যায়ের অষ্টম ও নবম শ্লোকে সাংখ্যযোগীর মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, প্রাণ এবং শরীর দ্বারা হওয়া সমস্ত ক্রিয়া কী ভাবে এবং কী প্রকারে হয়— তা বলা হয়েছে, তেমনই কর্মপ্রধান কর্মযোগীর ক্রিয়াগুলি কী ভাবে এবং কী প্রকারে হয়—এই বিষয়টি বোঝাবার জন্য ভগবান বলেছেন যে ; কর্মযোগী মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এবং শরীরে ও তার দ্বারা হওয়া কোনো কর্মে মমতা ও আসক্তি না রেখে অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্যই কর্ম করেন। এইরূপ কর্মপ্রধান কর্মযোগীর কর্মের ভাব ও প্রকার জানাবার জন্যই এখানে পুনরায় আসক্তি ত্যাগের কথা বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ—এইভাবে ভক্তিপ্রধান কর্মযোগী পাপে লিপ্ত হন না এবং কর্মপ্রধান কর্মযোগীর চিত্ত শুদ্ধ হয়ে যায়, একথা শুনলে প্রশ্ন আসে যে কর্মযোগের চিত্তশুদ্ধিরূপ মাত্র এটুকুই ফল, নাকি এছাড়াও অতিরিক্ত বিশেষ কোনো ফল আছে ? এবং এইভাবে কর্ম না করে সকামভাবে শুভকর্ম করলে কী ক্ষতি ? তাই এবার সেই কথা স্পষ্টভাবে বোঝাবার জন্য ভগবান বলেছেন—

যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥ ১২

নিষ্কাম কর্মযোগী কর্মফল ত্যাগ করে ভগবদ্ প্রাপ্তিরূপ অবিচল শান্তি লাভ করেন এবং সকামব্যক্তি কামনার জন্য ফলে আসক্ত হয়ে বদ্ধদশা প্রাপ্ত হন ॥ ১২

প্রশ্ন—অষ্টম শ্লোকে 'যুক্ত' শব্দের অর্থ সাংখ্যযোগী করা হয়েছে। তাহলে এখানে সেই 'যুক্ত' শব্দের অর্থ কর্মযোগী কী করে করা হল ?

উত্তর—শব্দের অর্থ প্রকরণ অনুসারে হয়। গীতায় 'যুক্ত' শব্দের প্রয়োগও প্রসঙ্গানুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে হয়েছে। 'যুক্ত' শব্দটি 'যুজ্' ধাতু থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ হল যোগ করা। দ্বিতীয় অধ্যায়ের একষট্টিতম শ্লোকে 'যুক্ত' শব্দ 'সংযমী' অর্থে ব্যবহৃত, ষষ্ঠ অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে ভগবদ্প্রাপ্ত 'তত্ত্বজ্ঞানী'র অর্থে, সতেরোতম শ্লোকে আহার-বিহারের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় 'ঔচিত্যে'র অর্থে এবং আঠারোতম শ্লোকে 'ধ্যানযোগী'র অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে, সপ্তম অধ্যায়ের বাইশতম শ্লোকে সেটিই শ্রদ্ধার সঙ্গে হওয়ায় সংযোগের বাচক বলে মানা হয়। এইরূপ এই অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে এটি সাংখ্যযোগীর অর্থে ব্যবহৃত। সেখানে সমস্ত ইন্দ্রিয় নিজ নিজ বিষয়ে আবর্তিত হচ্ছে, এরূপ মনে করে নিজেকে কর্তৃত্বরহিত মেনে নেওয়া তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিকে 'যুক্ত' বলা হয়েছে ; তাই সেখানে এর অর্থ সাংখ্যযোগী মেনে নেওয়াই ঠিক। কিন্তু এখানে 'যুক্ত' শব্দ সব কর্মফল ত্যাগকারীর জন্যই ব্যবহৃত, সুতরাং এখানে এর অর্থ 'কর্মযোগী' মনে করাই যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন—এখানে 'নৈষ্ঠিকী শান্তি'র অর্থ 'ভগবদ্‌প্রাপ্তি রূপ শান্তি' কীভাবে করা হল ?

উত্তর—'নৈষ্ঠিকী' শব্দের অর্থ 'নিষ্ঠার দ্বারা উৎপন্ন হওয়া' হয়। সেই অনুসারে কর্মযোগনিষ্ঠা দ্বারা সিদ্ধ হওয়া ভগবদ্প্রাপ্তিরূপ শান্তিকে 'নৈষ্ঠিক শান্তি' বলা যথার্থ হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে 'অযুক্ত' শব্দের অর্থ প্রমাদী, অলস এবং অকর্মণ্য না করে 'সকামপুরুষ' কেন করা হয়েছে ?

উত্তর—কামনার জন্য ফলে আসক্ত হওয়া পুরুষের বাচক হওয়ায় এখানে 'অযুক্ত' শব্দের অর্থ সকাম পুরুষ মনে করাই ঠিক।

প্রশ্ন—এখানে 'বন্ধনে'র অভিপ্রায় কী ?

উত্তর— সকামভাবে করা কর্মের ফলস্বরূপ দেব-মনুষ্য জন্মে বারংবার ফিরে আসাকেই বন্ধন বলা হয়।

সম্বন্ধ—এখানে বলা হয়েছে যে 'কর্মযোগী' কর্মফলে আবদ্ধ না হয়ে পরমাত্মা প্রাপ্তিরূপ শান্তিলাভ করেন এবং 'সকাম পুরুষ' ফলে আসক্ত হয়ে জন্ম-মৃত্যু-রূপ বন্ধনে আবদ্ধ হন, কিন্তু সাংখ্যযোগীর কথা বলা হয়নি। তাই এবার সাংখ্যযোগীর স্থিতি জানাচ্ছেন—

সর্বকর্মাণি মনসা সন্ন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ ন কারয়ন্॥ ১৩

বশীভূত অন্তঃকরণযুক্ত সাংখ্যযোগের আচরণকারী পুরুষ, কর্ম না করে বা না করিয়ে নবদ্বারযুক্ত দেহে সমস্ত কর্ম মনে মনে ত্যাগ করে আনন্দপূর্বক সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার স্বরূপে স্থিত থাকেন ॥ ১৩

প্রশ্ন—সাংখ্যযোগী যখন শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণকে মায়াময় বলে বুঝতে পারেন, এগুলির সঙ্গে তাঁর কোনোই সম্বন্ধ নেই, তখন তাঁকে 'দেহী' ও 'বশী' বলা হয়েছে কেন ?

উত্তর—যদিও সাংখ্যযোগীর নিজ দৃষ্টিতে শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ থাকে না ; তিনি সর্বদা সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাতেই অভিন্নভাবে অবস্থান করেন ; কিন্তু লোকদৃষ্টিতে তাঁকে তো দেহধারীরূপেই দেখা যায়। তাই তাঁকে 'দেহী' বলা হয়েছে। এইরূপ চতুর্দশ অধ্যায়ের বিশতম শ্লোকে গুণাতীতের বর্ণনাতেও 'দেহী' শব্দ উদ্ধৃত হয়েছে। এবং লোকদৃষ্টিতে তাঁর মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়াদির কর্মপ্রচেষ্টা

নিয়মিতরূপে শাস্ত্রানুকূল এবং লোকসংগ্রহের উপযুক্ত হয় ; তাই তাঁকে '**বশী**' বলা হয়।

প্রশ্ন—এখানে '**এব**' পদটি কোন্ ভাবের দ্যোতক ?

উত্তর—সাংখ্যযোগীর শরীর ও ইন্দ্রিয়তে অহংভাব না থাকায় তাঁর দ্বারা যে কর্ম সংঘটিত হয়, তিনি তার কর্তা হন না এবং মমত্ব না থাকায় তিনি তার করানোর কর্তাও হন না। সুতরাং '**ন কুর্বন্**' এবং '**ন কারয়ন্**'-এর সঙ্গে '**এব**' প্রয়োগ করে এই ভাব দেখানো হয়েছে যে সাংখ্যযোগীর অহং-মমত্ববোধ সর্বতোভাবে লুপ্ত হওয়ায় তিনি কোনোপ্রকারেই শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ইত্যাদির দ্বারা হওয়া কর্মের কারণও হন না বা করানোর কর্তাও হন না।

প্রশ্ন—এখানে '**নবদ্বারে পুরে আস্তে**' অর্থাৎ 'নটি দ্বারসম্পন্ন শরীররূপ পুরে বাস করে' এরূপ অন্বয় না করে '**নবদ্বারে পুরে সর্বকর্মাণি মনসা সন্ন্যস্য**' অর্থাৎ 'নটি দ্বারসম্পন্ন দেহরূপ পুরে সব কর্ম মন থেকে ত্যাগ করে' এইরূপ অন্বয় করা হয়েছে কেন ?

উত্তর—নবদ্বারসম্পন্ন দেহরূপ পুরে থাকা প্রতিপাদন করা সাংখ্যযোগীর জন্য কোনো মহত্ত্বের বিষয় নয়, বরং তা তাঁর স্থিতির বিরুদ্ধ। দেহরূপ পুরে তো সাধারণ মানুষও অবস্থান করে, এতে মহত্ত্বের কী আছে ? বরং দেহরূপ পুরে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি প্রাকৃতিক বস্তুতে কর্মাদি ত্যাগ প্রতিপাদন করলে সাংখ্যযোগীর বিশেষ মহত্ত্ব প্রকটিত হয় ; কারণ সাংখ্যযোগীই এমন করতে পারেন, সাধারণ মানুষ নয়। সুতরাং যে অন্বয় করা হয়েছে, তা ঠিকই আছে।

প্রশ্ন—এখানে ইন্দ্রিয়াদির কর্মগুলিকে ইন্দ্রিয়াদিতে ত্যাগের কথা না বলে নবদ্বারসম্পন্ন শরীরে ত্যাগের কথা বলা হয়েছে কেন ?

উত্তর—দুটি চোখ, দুটি কান, দুই নাসা গহ্বর ও একটি মুখ, এই সাতটি ওপরের দ্বার তথা উপস্থ এবং গুহ্য, এই দুটি নীচের দ্বার—ইন্দ্রিয়াদির গোলকরূপ এই নটি দ্বারের সঙ্কেত করায় এখানে প্রকৃতপক্ষে সব ইন্দ্রিয়াদির কর্মগুলিই ইন্দ্রিয়তে ত্যাগের জন্য বলা হয়েছে। কারণ ইন্দ্রিয়াদির সমস্ত কর্মেরই আধার হল শরীর। সুতরাং শরীরে ত্যাগের জন্য বলা কোনো অন্য ব্যাপার নয়। যে বিষয় অষ্টম ও নবম শ্লোকে বলা হয়েছে, তাই এখানেও বলা হয়েছে। শুধু শব্দেরই যা পার্থক্য। ঐখানে ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়ার নাম বলা হয়েছে, এখানে তার স্থানের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। শুধু এটুকুই তফাৎ, ভাবে কোনো পার্থক্য নেই।

প্রশ্ন—এখানে মন থেকে কর্মগুলি ত্যাগ করতে বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—সবকর্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ করলে মানুষের শরীর যাত্রাও চলে না। তাই মনের দ্বারা বিবেক-বুদ্ধির সাহায্যে কর্তৃত্ব-কারয়িতৃত্ব ত্যাগ করাই সাংখ্যযোগীর ত্যাগ, এই ভাবটি স্পষ্ট করার জন্য মনের দ্বারা ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—শ্লোকার্থে বলা হয়েছে—তিনি 'সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার স্বরূপে অবস্থান করেন' কিন্তু মূল শ্লোকে এমন কোনো কথা নেই ; তাহলে ওপর থেকে এই বাক্যটি অর্থের মধ্যে কেন যোগ করা হল ?

উত্তর—'**আস্তে**'—অবস্থান করে, এই ক্রিয়ার আধারের আবশ্যকতা আছে। মূল শ্লোকে তার উপযুক্ত শব্দ না থাকায় ভাবের দ্বারা অধ্যাহার করে নেওয়াই উচিত। এটি সাংখ্যযোগীর প্রকরণ এবং সাংখ্যযোগী প্রকৃতপক্ষে সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার স্বরূপেই সুখে অবস্থান করতে পারেন, অন্যত্র নয়। তাই এই বাক্যটি ওপর থেকে যোগ করা হয়েছে।

সম্বন্ধ—আত্মা যখন প্রকৃতপক্ষে কর্মকারী নয় এবং ইন্দ্রিয়াদিতে কর্মের প্রেরণাও দেয় না, তাহলে সব মানুষ নিজেকে কেন কর্মসমূহের কর্তা বলে মনে করে এবং তারা কর্মফলের ভাগী কেন হয়—

ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে॥ ১৪

পরমেশ্বর মানুষের কর্তৃত্ব, কর্ম বা কর্মফল প্রাপ্তি সৃষ্টি করেন না, স্বভাবই আবর্তিত হয় ॥ ১৪

প্রশ্ন—এখানে '**প্রভু**' পদ কীসের বাচক ? মানুষের কর্তৃত্ব, কর্ম এবং কর্মফল প্রাপ্তির সৃষ্টি সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর করেন না। এই কথাটির কী তাৎপর্য ?

উত্তর—সমস্ত বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারকারী সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের বাচক এই '**প্রভু**' পদটি। কারণ শাস্ত্রের যেখানে যেখানে পরমেশ্বরকে জগৎ-সৃষ্টি কর্মের কর্তা বলা হয়েছে, সেখানে সগুণ পরমেশ্বরের প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে।

পরমেশ্বর মানুষের কর্তৃত্ব সৃষ্টি করেন না, এই কথাটির তাৎপর্য হল যে, মানুষের কর্মে যে কর্তৃত্বভাব থাকে, তা ভগবানের সৃষ্ট নয়। অজ্ঞ মানুষ অহংকার-বশতঃ নিজেকে তার কর্তা মনে করে (৩।২৭)। মানুষের কর্ম ভগবান নির্দিষ্ট করেন না, এই কথাটির অর্থ হল যে, অমুক শুভ বা অশুভ কর্ম অমুক মানুষকে করতে হবে, ভগবান এরূপ বিধান সৃষ্টি করেন না, কারণ ভগবান যদি এই বিধান তৈরি করতেন, তবে বিধি-নিষেধ-শাস্ত্রই ব্যর্থ হয়ে যেত এবং তার কোনো সার্থকতাই থাকত না। কর্মফলের সংযোগ সৃষ্টিও ভগবান করেন না, এই কথাটির অর্থ হল যে মানুষ অজ্ঞতাবশতঃ কর্মের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। কেউ আসক্তিবশতঃ তার কর্তা হয়ে আবার কেউ কর্মফলে আসক্ত হয়ে কর্মের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ স্থাপন করে।

ভগবান যদি এই তিনটির সৃষ্টি করতেন, তাহলে মানুষ কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতেই পারত না, তার উদ্ধার পাওয়ার আর কোনো উপায়ই থাকত না। সুতরাং সাধক ব্যক্তির উচিত কর্মের কর্তৃত্ব পূর্বোক্ত প্রকারে প্রকৃতিকে অর্পণ করে (৫।৮-৯) অথবা ভগবানে অর্পণ করে (৫।১০) বা কর্মের ফল ও আসক্তি ত্যাগ করে (৫।১২) কর্ম থেকে নিজ সম্পর্ক-ছেদ করে নেওয়া (৪।২০)। এই তাৎপর্য বোঝানোর জন্য বলা হয়েছে যে পরমেশ্বর মানুষের কর্তৃত্ব, কর্ম এবং কর্মফল সৃষ্টি করেন না।

প্রশ্ন—স্বভাবই আবর্তিত হয় এক্ষেত্রে এরূপ বলার সার্থকতা কী ?

উত্তর—আত্মার সঙ্গে কর্তৃত্ব, কর্ম এবং কর্মফলের বাস্তবে কোনো সম্বন্ধ নেই এবং পরমেশ্বরও কারও কর্তৃত্ব ইত্যাদি তৈরি করেন না তাহলে বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা যা সব দেখছি সেসব কী ?—এই জিজ্ঞাসার উত্তরে একথা বলা হয়েছে যে সত্ত্বঃ, রজ, তম—তিন গুণ, রাগ-দ্বেষাদি সমস্ত বিকার, শুভ-অশুভ কর্ম এবং তার সংস্কার, এই সব রূপে পরিণত প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাবই সব কিছু করে। প্রাকৃত জীবের সঙ্গে এর অনাদিসিদ্ধ সংযোগ। এরজন্যই তার মধ্যে কর্তৃত্বভাব উৎপন্ন হয় অর্থাৎ অহংকারে মোহিত হয়ে সে নিজেকে তার কর্তা মনে করে (৩।২৭) ফলে কর্ম ও কর্মফলের সঙ্গে তার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে যায় এবং সে তাতে আবদ্ধ হয়ে যায়। বাস্তবে আত্মার এর সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই, এই হল এর অভিপ্রায়।

সম্বন্ধ—যে সাধক সমস্ত কর্ম এবং কর্মফল ভগবানে সমর্পণ করে তা হতে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ করে নেন, তাঁর শুভ-অশুভ কর্মফলের ভাগী কি ভগবান হন ? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেছেন—

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥ ১৫

সর্বব্যাপী পরমেশ্বর পরমাত্মা কারো পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না, কিন্তু অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকায় মানুষ মোহগ্রস্ত হয়॥ ১৫

প্রশ্ন—এখানে '**বিভুঃ**' পদটি কীসের বাচক এবং তিনি কারো পাপ-পুণ্য গ্রহণ করেন না, এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'**বিভুঃ**' পদটি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত (১৩।১৭ ; ১৫।১৫ ; ১৮।৬১) এবং সমস্ত জগৎকে নিজ সংকল্প দ্বারা সঞ্চালনকারী, সর্বশক্তিমান, সগুণ নিরাকার পরমেশ্বরের বাচক। তিনি কারও পাপ-পুণ্য গ্রহণ করেন না, এই কথায় এই দেখানো হয়েছে যে, যদিও সমস্ত কর্ম তাঁরই শক্তির দ্বারা মানুষ করে থাকে, সবাইকে শক্তি, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি মানুষের কর্মানুসারে

তিনিই প্রদান করেন, তবুও তিনি তাদের দ্বারা করা কর্ম গ্রহণ করেন না, অর্থাৎ সেই কর্মফলের ভাগী হন না।

প্রশ্ন—এই অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে এবং নবম অধ্যায়ের চব্বিশতম শ্লোকে ভগবান স্বয়ং বলেছেন যে সম্পূর্ণ যজ্ঞ ও তপের ভোক্তা আমিই। তাহলে এখানে কী করে একথা বলা হল যে ভগবান কারো শুভকর্মও গ্রহণ করেন না ?

উত্তর—সমস্ত জগৎ সগুণ পরমেশ্বরের স্বরূপ। তাই দেবতাদের রূপে ভগবানই সব যজ্ঞের ভোক্তা। কিন্তু তা হলেও ভগবান বাস্তবে কর্ম ও কর্মফল থেকে সর্বতোভাবে সম্বন্ধরহিত। এই ভাবটি স্পষ্ট করার জন্যই এই কথা বলা হয়েছে যে ভগবান কারো পাপ-পুণ্য গ্রহণ করেন না। অভিপ্রায় হল যে দেব, মানুষ ইত্যাদি রূপে সমস্ত যজ্ঞের তিনি ভোক্তা হলেও এবং ভক্ত দ্বারা অর্পণ করা বস্তু ও ক্রিয়াদি স্বীকার করলেও ঐসব থেকে তিনি সেই রূপেই সম্বন্ধরহিত, যেমন জন্মগ্রহণ করেও ভগবান অজ (৪।৬), জগৎ-সৃষ্টিরূপ কাজ করেও তিনি অকর্তাই থাকেন (৪।১৩)। সুতরাং এখানে এটি বলা যুক্তিযুক্ত যে ভগবান কারো শুভকর্ম গ্রহণ করেন না।

প্রশ্ন—অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান আবৃত আছে, তাতে জীব মোহগ্রস্ত হয়ে রয়েছে, এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে যদি মানুষের এবং পরমেশ্বরের কর্মে এবং তার ফলে সম্বন্ধ না থাকে তাহলে জগতে যেসব মানুষ মনে করে যে 'অমুক কাজটি আমি করেছি', 'এটি আমার কাজ', 'এর ফল আমি পাব', তাহলে এসব কী ? এই প্রশ্নের নিরাকরণ করার জন্য বলেছেন অনাদিসিদ্ধ অজ্ঞান দ্বারা সমস্ত জীবের প্রকৃত জ্ঞান আবৃত আছে। তাই তারা নিজের এবং পরমেশ্বরের স্বরূপ ও কর্মের তত্ত্ব না জানায় নিজের মধ্যে এবং ঈশ্বরে কর্তা, কর্ম ও কর্মফলের সম্বন্ধ কল্পনা করে মোহগ্রস্ত হয়ে থাকে।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্॥ ১৬

কিন্তু যাঁদের আত্মজ্ঞান দ্বারা অন্তঃকরণের অজ্ঞান বিনষ্ট হয়েছে তাঁদের সেই জ্ঞান সূর্যের ন্যায় সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাকে প্রকাশিত করে ॥ ১৬

প্রশ্ন—এখানে 'তু' শব্দটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—পঞ্চদশ শ্লোকে এই কথা বলা হয়েছে যে অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান আবৃত হওয়ায় সব মানুষ মোহগ্রস্ত হয়ে রয়েছে। এখানে সেই সাধারণ মানুষদের থেকে আত্মতত্ত্ব জ্ঞানী মহাপুরুষদের পৃথক করার জন্য 'তু' শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে 'অজ্ঞানম্'-এর সঙ্গে 'তৎ' শব্দ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—পঞ্চদশ শ্লোকে যে অজ্ঞানের বর্ণনা করা হয়েছে, যে অজ্ঞানের দ্বারা অনাদিকাল হতে সমস্ত জীবের জ্ঞান আবৃত, যে জন্য মোহগ্রস্ত মানুষেরা আত্মা ও পরমাত্মার যথার্থ স্বরূপকে জানতে পারে না, সেই অজ্ঞানের কথা এখানে বলা হয়েছে। এই বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য অজ্ঞানের সঙ্গে 'তৎ' বিশেষণ দেওয়া হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, যেসব ব্যক্তির সেই অনাদিসিদ্ধ অজ্ঞান পরমাত্মার যথার্থ জ্ঞানের সাহায্যে বিনাশ করা হয়েছে, তাঁরা মোহগ্রস্ত হন না।

প্রশ্ন—এখানে সূর্যের দৃষ্টান্ত দেওয়ার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর— সূর্য যেমন অন্ধকারকে সর্বতোভাবে নাশ করে দৃশ্যবস্তু মাত্রকেই প্রকাশিত করে, তেমনই প্রকৃত জ্ঞানও অজ্ঞানকে সর্বতোভাবে বিনাশ করে পরমাত্মার স্বরূপকে যথাযথভাবে প্রকাশিত করে। যিনি যথার্থ জ্ঞান লাভ করেন, তিনি কখনও, কোনো অবস্থাতেই মোহগ্রস্ত হন না।

সম্বন্ধ—যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা পরমাত্মাপ্রাপ্তি হয়। সংক্ষেপে এই কথা বলে এবার দ্বাবিংশতম শ্লোক পর্যন্ত জ্ঞান-যোগ দ্বারা পরমাত্মাকে লাভ করার সাধন ও পরমাত্মাপ্রাপ্ত সিদ্ধপুরুষদের লক্ষণ, আচরণ, মহত্ত্ব ও স্থিতির বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে প্রথমে জ্ঞানযোগের একান্ত সাধন দ্বারা পরমাত্মা প্রাপ্তির কথা বলেছেন—

তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥ ১৭

যাঁদের মন সেইরূপ হয়, যাঁদের বুদ্ধি সেইমতো হয় এবং সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মায় যাঁরা একীভাবে অবস্থান করেন, সেই তৎপরায়ণ ব্যক্তিগণ জ্ঞানের দ্বারা পাপরহিত হয়ে অপুনরাবৃত্তি অর্থাৎ পরমগতি লাভ করেন ॥ ১৭

প্রশ্ন—মনের সেইরূপ হওয়া কী এবং সাংখ্যযোগ অনুসারে কীরূপ অভ্যাস করলে মন তদ্রূপ হয় ?

উত্তর—সাংখ্যযোগ (জ্ঞানযোগ) অভ্যাসকারীর উচিত আচার্য ও শাস্ত্রের উপদেশ দ্বারা সমস্ত বিশ্বকে মায়াময় এবং সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাকেই একমাত্র সত্যবস্তু মনে করে, সমস্ত অনাত্মবস্তুর চিন্তা পরিত্যাগ করে, মনকে পরমাত্মার স্বরূপে নিশ্চলরূপে স্থিত করার জন্য তাঁর আনন্দময় স্বরূপ চিন্তা করা। বারংবার আনন্দের আবৃত্তি করতে করতে এরূপ ধারণা করবে যে পূর্ণ আনন্দ, অপার আনন্দ, শান্ত আনন্দ, ঘন আনন্দ, অচল আনন্দ, ধ্রুব আনন্দ, নিত্য আনন্দ, বোধস্বরূপ আনন্দ, জ্ঞানস্বরূপ আনন্দ, পরম আনন্দ, মহান আনন্দ, অনন্ত আনন্দ, সম আনন্দ, অচিন্ত্য আনন্দ, চিন্ময় আনন্দ, একমাত্র আনন্দই সর্বত্র পরিপূর্ণ, আনন্দ ব্যতীত অন্য কোনো বস্তুই নেই—এইভাবে নিরন্তর মনন করতে করতে সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মায় মনের অভিন্নভাবে নিশ্চল হয়ে যাওয়াই মনের তদ্রূপ হওয়া।

প্রশ্ন—বুদ্ধির তদ্রূপ হওয়া কী এবং মন তদ্রূপ হওয়ার পর কীরূপ অভ্যাসের দ্বারা বুদ্ধি তদ্রূপ হয় ?

উত্তর—উপরোক্ত প্রকারে মন তদ্রূপ হলে বুদ্ধিতে সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার স্বরূপ প্রত্যক্ষের ন্যায় নিশ্চয় হয়ে যায়, সেই নিশ্চয় অনুসারে নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করতে করতে যে বুদ্ধির ভিন্ন অস্তিত্ব না থেকে তা সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাতে একাকার হয়ে যায়, তাকেই বলা হয় বুদ্ধির তদ্রূপ হয়ে যাওয়া।

প্রশ্ন—'**তন্নিষ্ঠা**' অর্থাৎ সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাতে একীভাবে স্থিতি কোন্ অবস্থার নাম এবং মন ও বুদ্ধি —দুয়েরই তদ্রূপ হওয়ার পরের স্থিতি কীরূপ ?

উত্তর—মন ও বুদ্ধি যতক্ষণ উপরোক্ত প্রকারে পরমাত্মাতে একাকার না হয়ে যায়, ততক্ষণ সাংখ্যযোগীর পরমাত্মাতে অভিন্ন ভাবে স্থিতি হয় না ; কারণ মন ও বুদ্ধি আত্মা ও পরমাত্মার ভেদ-ভ্রমের প্রধান কারণ। অতএব উপরোক্ত প্রকারে মন-বুদ্ধি পরমাত্মাতে একাকার হওয়ার পর সাধকের দৃষ্টিতে আত্মা ও পরমাত্মার ভেদভ্রম নাশ হওয়া এবং ধ্যাতা, ধ্যান এবং ধ্যেয়র ত্রিপুটির অভাব হয়ে কেবলমাত্র সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মারই থেকে যাওয়া—এটিই সাংখ্যযোগীর তন্নিষ্ঠ হওয়া অর্থাৎ পরমাত্মাতে একীভাবে স্থিত হওয়া।

প্রশ্ন—'**তৎপরায়ণাঃ**' পদটি কীসের বাচক ?

উত্তর—উপরোক্ত প্রকারে আত্মা এবং পরমাত্মার ভেদভ্রমের বিনাশ হলে যখন সাংখ্যযোগীর সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাতে অভিন্নভাবে নিশ্চল স্থিতিলাভ হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কারো অস্তিত্ব থাকে না। তার মন, বুদ্ধি, প্রাণ ইত্যাদি সব কিছু পরমাত্মরূপ হয়ে যায়। এভাবে সাক্ষাৎ অপরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার একত্ব লাভকারী পুরুষদের বাচক '**তৎপরায়ণাঃ**' পদটি।

প্রশ্ন—এখানে '**তৎ**' শব্দের অর্থ সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা কী করে করা হল ?

উত্তর—আগের শ্লোকে '**পরম্**'-এর সঙ্গে '**তৎ**' বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানে প্রকৃত জ্ঞান দ্বারা যে পরমতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তার সঙ্গে এই শ্লোকের '**তৎ**' শব্দের সম্বন্ধ আছে। অতএব প্রকরণ অনুসারে এর অর্থ 'সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা' করা যথাযথ হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে 'জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ' পদে উদ্ধৃত 'জ্ঞান' শব্দ কোন্ জ্ঞানের বাচক ? 'কল্মষ' শব্দ এবং 'নির্ধূত' শব্দের অর্থ কী ?

উত্তর—ষোড়শ শ্লোকে যে জ্ঞানকে অজ্ঞানের নাশক ও পরমাত্মার প্রকাশক বলা হয়েছে, সেই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের বাচক এখানে 'জ্ঞান' শব্দটি। শুভাশুভ কর্ম ও রাগ-দ্বেষাদি অবগুণ এবং বিক্ষেপ ও আবরণ এই সবেরই বাচক 'কল্মষ' শব্দটি, কারণ এগুলি সব আত্মার বন্ধনের হেতু হওয়ায় 'কল্মষ' অর্থাৎ পাপ। 'নির্ধূত' শব্দের অর্থ এইসব সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হওয়া। অভিপ্রায় হল যে উপরোক্ত প্রকার সাধন দ্বারা প্রাপ্ত যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা যাঁর মল, বিক্ষেপ ও আবরণরূপ সমস্ত পাপ পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়েছে, যাঁর মধ্যে পাপের লেশমাত্র নেই, সর্বতোভাবে পাপমুক্ত হয়েছেন, তাঁকেই বলা হয় 'জ্ঞাননির্ধূতকল্মষা'।

প্রশ্ন—এখানে 'অপুনরাবৃত্তি প্রাপ্ত হওয়া' কী ?

উত্তর—যে পদ প্রাপ্ত হলে যোগী আর ফিরে আসেন না, যাকে ষোড়শ শ্লোকে **'তৎপরম্'** নামে বলা হয়েছে, গীতায় যার বর্ণনা কোথাও 'অক্ষয় সুখ', কোথাও 'নির্বাণ ব্রহ্ম', কোথাও 'উত্তম সুখ', কোথাও 'পরমগতি', কোথাও 'পরমধাম', কোথাও 'অব্যয়পদ', কোথাও 'দিব্যপরমপুরুষ' নামে বলা হয়েছে, সেই যথার্থ জ্ঞানের ফলস্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়াই অপুনরাবৃত্তি প্রাপ্ত হওয়া।

সম্বন্ধ—পরমাত্মা প্রাপ্তির সাধন বলে এবার পরমাত্মপ্রাপ্ত সিদ্ধ ব্যক্তিদের সমভাবের বর্ণনা করছেন—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ ১৮

এই ব্রহ্মজ্ঞানিগণ বিদ্যা ও বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণে, গো, হস্তী, কুকুর এবং চণ্ডালেও সমদর্শী হন ॥ ১৮

প্রশ্ন—এখানে **'পণ্ডিতাঃ'** পদটি কোন্ পুরুষদের বাচক ?

উত্তর—**'পণ্ডিতাঃ'** পদটি তত্ত্বজ্ঞানী সিদ্ধ মহাত্মা পুরুষদের বাচক।

প্রশ্ন—বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে ও গো, হাতী, কুকুর এবং চণ্ডালে সমদর্শনের ভাবার্থ কী ?

উত্তর—তত্ত্বজ্ঞানী সিদ্ধপুরুষদের বিষমভাব সর্বতোভাবে নষ্ট হয়ে যায়। তাঁদের দৃষ্টিতে এক সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কারো অস্তিত্ব থাকে না, তাই তাঁর সর্বত্র সমভাব হয়ে যায়। এই বিষয়টি বোঝাবার জন্য মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, নিম্নতম চণ্ডাল এবং পশুদের মধ্যে উত্তম গো, মধ্যম হাতি এবং নিম্নতম কুকুরের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে এবং তাদের সমত্বের দিগ্‌দর্শন করানো হয়েছে। সকলকেই এই পাঁচপ্রাণীর সঙ্গে বিষম ব্যবহার করতে হয়। যেমন গাভীর দুধ পান করা হয়, কিন্তু কুকুরের দুধ কেউ পান করে না। তেমনই হাতিতে চড়া যায়, কুকুরের ওপর নয়। যেসব বস্তু পশুদের শরীর-নির্বাহের জন্য উপযুক্ত, তা মানুষদের উপযুক্ত নয়। শাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের পূজা-অর্চনাদি করার নির্দেশ দেওয়া আছে, চণ্ডালের জন্য নয়। তাই এদের উদাহরণ দিয়ে ভগবান বোঝাতে চেয়েছেন যে যার মধ্যে ব্যবহারিক বিষম-ভাব অনিবার্য, তাতেও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সমভাবই থাকে। কখনো কোনো কারণে কোথাও তাঁর মধ্যে বিষমভাব থাকে না।

প্রশ্ন—সর্বত্র সমভাব থাকায় জ্ঞানী ব্যক্তি কি সকলের সঙ্গে একপ্রকার ব্যবহারই করে থাকেন ?

উত্তর—তেমন কোনো কথা নেই। কেউই সকলের সঙ্গে একপ্রকার ব্যবহার করতে পারেন না। শাস্ত্রানুসারে ন্যায়যুক্ত ব্যবহারের পার্থক্য তো সকলের সঙ্গেই রাখা উচিত। জ্ঞানী ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য হল যে তাঁরা লোকদৃষ্টিতে ব্যবহারে যথাযোগ্য প্রয়োজনীয় পার্থক্য বজায় রাখেন—ব্রাহ্মণের সঙ্গে ব্রাহ্মণোচিত, চণ্ডালের সঙ্গে চণ্ডালোচিত, এইরূপ গো, হাতি, কুকুর ইত্যাদির সঙ্গে যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করেন ; কিন্তু এরূপ করলেও তাঁর প্রেম ও পরমাত্মভাব সবার ওপরে সমানই থাকে।

মানুষ যেমন নিজ মস্তক, হাত, পা ইত্যাদি অঙ্গের সঙ্গেও ব্যবহারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইত্যাদির

ন্যায় পার্থক্য বজায় রাখে, যে কাজ মাথা ও মুখের দ্বারা হয়, তা হাত-পায়ের দ্বারা হয় না। যে কাজ হাত-পায়ের, তা মাথার দ্বারা হয় না, সর্বঅঙ্গের আদর, মান এবং শৌচাদিতেও পার্থক্য রাখে, তবুও তাতে আত্মভাব —আপনভাব সমান হওয়ায় সে সকল অঙ্গের সুখ-দুঃখের অনুভব সমানভাবেই করে এবং সমস্ত শরীরে সদ্ভাবও একই প্রকার থাকে, প্রেম ও আত্মভাবের দৃষ্টিতে কোথাও বিষমভাব থাকে না। তেমনই তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষের সর্বত্র সমদৃষ্টি হওয়ায় লোকদৃষ্টিতে তাঁর ব্যবহারে যথাযোগ্য পার্থক্য থাকলেও তাঁর আত্মভাব ও প্রেম সর্বত্র সমভাবে থাকে। তাই কোন অঙ্গে আঘাত লাগলে বা তার সম্ভাবনা হলে মানুষ যেমন তার প্রতিকারের চেষ্টা করে, তেমনই তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষও ব্যবহারকালে কোনো জীব বা জীবসমুদায়ের বিপদ উপস্থিত হলে বিনা ভেদভাবে তার প্রতিকারের জন্য যথাযোগ্য চেষ্টা করেন।

সম্বন্ধ—এইভাবে তত্ত্বজ্ঞানীর সমভাবের বর্ণনা করে এবার সমভাবকে ব্রহ্মের স্বরূপ বলে তাতে অবস্থানকারী মহাপুরুষদের মহিমা বর্ণনা করছেন—

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥ ১৯

যাঁদের মন সমভাবে স্থিত, তাঁরা জীবিত অবস্থাতেই সংসার জয় করেছেন ; কারণ সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা নির্দোষ ও সম, তাই তাঁরা সেই পরমাত্মাতে অবস্থান করেন ॥ ১৯

প্রশ্ন—যাঁদের মন সমত্বে স্থিত, তাঁরা এই সংসারকে জয় করেছেন, এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথার দ্বারা ভগবান বলতে চেয়েছেন যে যাঁদের মন উপরোক্ত প্রকারে সমত্বে স্থিত হয়েছে অর্থাৎ যাঁদের সমবুদ্ধি হয়েছে, তাঁরা এই বর্তমান জীবনে সংসার জয় করেছেন ; তাঁরা চিরকালের মতো জন্ম-মৃত্যু থেকে মুক্তি পেয়ে জীবন্মুক্ত হয়ে গেছেন। লোকদৃষ্টিতে শরীর ধারণ করে থাকলেও বাস্তবে শরীরের সঙ্গে তাঁদের কোনো সম্বন্ধই থাকে না।

প্রশ্ন—ব্রহ্মকে 'নির্দোষ' এবং 'সম' বলার অভিপ্রায় কী এবং 'হি' ও 'তস্মাৎ'-এর প্রয়োগ করা হয়েছে কেন ?

উত্তর—সত্ত্বঃ, রজ, তম—এই তিনগুণ সর্বপ্রকার দোষপূর্ণ এবং সমস্ত জগৎ তিন গুণের কার্য হওয়ায় দোষময়। এই গুণাদির সম্বন্ধেই বিষমভাব অর্থাৎ রাগ-দ্বেষ-মোহ ইত্যাদি সমস্ত অপগুণের প্রাদুর্ভাব হয়। 'ব্রহ্ম' নামে কথিত সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা এই তিনগুণের সর্বতোভাবে অতীত। তাই তিনি 'নির্দোষ' এবং 'সম'। তত্ত্বজ্ঞানীও এইরূপ তিনগুণের অতীত হয়ে যান। তাই তাঁর রাগ, দ্বেষ, মোহ, মমতা, অহংকার ইত্যাদি সব অপগুণ এবং বিষমভাবের চিরতরে বিনাশ হয়ে তাঁর সমভাবে স্থিতি হয়। 'হি' এবং 'তস্মাৎ' এই হেতুবাচক শব্দ প্রয়োগের অভিপ্রায় হল যে সমভাব ব্রহ্মেরই স্বরূপ ; সেইজন্য যাঁর মন সমভাবে স্থিত, তিনি ব্রহ্মেই অবস্থান করেন। যদিও লোকে তাঁকে এই ত্রিগুণময় সংসারে ও শরীরে অবস্থিত দেখে থাকে, তবুও তাঁর স্থিতি সমভাবে হওয়ায় বাস্তবে তাঁর এই ত্রিগুণময় সংসার ও শরীরের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই ; তাঁর স্থিতি ব্রহ্মেই থাকে।

প্রশ্ন—তমোগুণ ও রজোগুণকে তো সমস্ত দোষের ভাণ্ডার বলাই উচিত, কারণ গীতায় স্থানে স্থানে ভগবান এগুলিকে সমস্ত অনর্থের হেতু বলে ত্যাগ করার জন্য বলেছেন ; কিন্তু সত্ত্বগুণ তো ভগবদ্প্রাপ্তির সহায়ক, সেটিকে রজ ও তমের সঙ্গে এক করে দেখে তাকেও সমস্ত দোষের ভাণ্ডার বলা হল কেন ?

উত্তর—যদিও রজ ও তমের থেকে সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ ও মানুষের উন্নতির সহায়কও, তবুও অহংকারযুক্ত সুখ এবং জ্ঞানের সম্বন্ধে ভগবান এটিকেও বন্ধনের কারণ বলেছেন (১৪।৬)। বস্তুতঃ তিন গুণের থেকে সম্বন্ধ মুক্ত না হলে সাধক পুরোপুরি নির্দোষ হন না এবং তাঁর স্থিতি সম্পূর্ণভাবে সমভাবাপন্ন হয় না। তাই এখানে গুণাতীতের প্রসঙ্গে সত্ত্বগুণকেও দোষযুক্ত বলা অনুচিত নয়।

সম্বন্ধ—এবার নির্গুণ নিরাকার সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মপ্রাপ্ত সমদর্শী সিদ্ধ ব্যক্তিদের লক্ষণ জানাচ্ছেন—

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসম্মূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥ ২০

যে ব্যক্তি প্রিয়বস্তু লাভে হর্ষিত হন না এবং অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হলে উদ্বিগ্ন হন না ; সেই স্থিরবুদ্ধি, সংশয়রহিত, ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্ম পরমাত্মাতে নিত্য স্থিত॥ ২০

প্রশ্ন—প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তুর প্রাপ্তিতে হর্ষিত ও উদ্বিগ্ন না হওয়ার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যেসব পদার্থ মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও শরীরের অনুকূল হয়, লোকে সেগুলিকে 'প্রিয়' বলে। অজ্ঞ ব্যক্তিদের এইসব অনুকূল পদার্থে আসক্তি থাকে, তাই তারা সেগুলি পেলে আনন্দিত হয়। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীদের অবস্থিতি সমভাবে হওয়ায় তাঁর কোনো বস্তুতে কিছুমাত্র আসক্তি থাকে না ; তাই তাঁর যখন প্রারব্ধানুসারে কোনো অনুকূল বস্তু প্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ তাঁর মন, বুদ্ধি ও শরীরের সঙ্গে কোনো প্রিয়বস্তুর সংযোগ হয় তখন তিনি হর্ষিত হন না। কারণ মন, ইন্দ্রিয়, শরীর ইত্যাদিতে তাঁর অহং, মমতা ও আসক্তি বিন্দুমাত্র থাকে না। তেমনই যেসব পদার্থ মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও শরীরের প্রতিকূল হয় লোকে তাকে 'অপ্রিয়' বলে থাকে। অজ্ঞ ব্যক্তিদের ঐসব পদার্থে 'দ্বেষ' হয়, তাই তারা ঐসব বস্তু প্রাপ্তিতে ভয় পেয়ে যায় এবং অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করে। কিন্তু জ্ঞানী পুরুষে দ্বেষের অভাব হয়ে যায় ; তাই তাঁর মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরের সঙ্গে অত্যন্ত প্রতিকূল পদার্থের সংযোগ হলেও তিনি উদ্বিগ্ন বা দুঃখিত হন না।

প্রশ্ন— এখানে '**স্থিরবুদ্ধিঃ**' বিশেষণের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর অভিপ্রায় হল যে, তত্ত্বজ্ঞানী সিদ্ধ-পুরুষের দৃষ্টিতে একমাত্র ব্রহ্ম ব্যতীত জগতে আর কোনো কিছুর অস্তিত্বই থাকে না। তাই তাঁর বুদ্ধি সর্বদা স্থির থাকে। লোকদৃষ্টিতে নানাপ্রকার মান-অপমান, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি প্রাপ্ত হলেও কোনো কারণেই তাঁর বুদ্ধি ব্রহ্মের স্থিতি থেকে কখনো বিচলিত হয় না ; তিনি প্রত্যেক অবস্থায় সর্বদা সেই সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মেই অচলভাবে অবস্থান করেন।

প্রশ্ন—'**অসম্মূঢ়ঃ**' বলার তাৎপর্য কী ?

উত্তর—জ্ঞানী ব্যক্তির চিত্তে সংশয়, ভ্রম ও মোহের লেশমাত্র থাকে না। তাঁর সম্পূর্ণ সংশয় অজ্ঞানসহ চিরতরে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

প্রশ্ন—'**ব্রহ্মবিৎ**'-এর কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ম-তত্ত্ব তিনি যথাযথভাবে জেনে নেন ; 'ব্রহ্ম' কী, 'জগৎ' কী, 'ব্রহ্ম' ও 'জগতের' কী সম্বন্ধ, 'আত্মা' ও 'পরমাত্মা' কী, 'জীব' ও 'ঈশ্বরের' পার্থক্য কী ইত্যাদি ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয় কোনো কিছু জানতেই তাঁর বাকি থাকে না। ব্রহ্মের স্বরূপ তাঁর প্রত্যক্ষ গোচর হয়। তাই তাঁকে '**ব্রহ্মবিৎ**' বলা হয়।

প্রশ্ন—'**ব্রহ্মণি স্থিতঃ**' কথাটি বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এরূপ ব্যক্তি জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থাতেই সর্বদা ব্রহ্মে অবস্থান করেন। অর্থাৎ কখনো, কোনো অবস্থাতেই তাঁর স্থিতি শরীরে হয় না। ব্রহ্মের সঙ্গে তাঁর ঐক্য হয়ে যাওয়ায় কখনও কোনো কারণে তাঁর ব্রহ্ম থেকে বিচ্যুতি হয় না। তাঁর স্থিতি সর্বদা একই থাকে। তাই তাঁকে '**ব্রহ্মণি স্থিতঃ**' বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ—এইভাবে ব্রহ্মে স্থিত ব্যক্তির লক্ষণ বলা হয়েছে ; এবার সেই স্থিতি লাভ করার সাধন ও তার ফলের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেছেন—

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে॥ ২১

বাহ্য বিষয়ে অনাসক্ত পুরুষ আত্মায় যে শাশ্বত আনন্দ আছে তা লাভ করেন, তারপর সেই সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্ম পরমাত্মার ধ্যানরূপ যোগে অভিন্নভাবে স্থিত হয়ে অক্ষয় আনন্দ অনুভব করেন ॥ ২১

প্রশ্ন—'**বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা**' কোন্ পুরুষের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে ?

উত্তর—রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ ইত্যাদি যেগুলি ইন্দ্রিয়াদির বিষয়, তাদের 'বাহ্য-স্পর্শ' বলা হয় ; যে ব্যক্তি বিবেকপূর্বক নিজের মন থেকে আসক্তি চিরতরে দূর করে দিয়েছেন, যাঁর সমস্ত ভোগে পূর্ণ বৈরাগ্য, তাঁকে '**বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা**' অর্থাৎ বাহ্যিক বিষয়ে আসক্তি-রহিত অন্তঃকরণযুক্ত বলা হয়।

প্রশ্ন—আত্মায় স্থিত আনন্দ প্রাপ্তি করার কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—'**আত্মা**' শব্দটি এখানে অন্তঃকরণের বাচক। সেই অন্তঃকরণে সর্বব্যাপী সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার নিত্য ও সতত ধ্যানের দ্বারা উৎপন্ন সাত্ত্বিক আনন্দ অনুভব করতে থাকাই সেই আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া।

ইন্দ্রিয় ভোগকেই সুখরূপ বলে মানা মানুষদের এই ধ্যানজনিত সুখ লাভ হয় না। বস্তুতঃ বাহ্যিক ভোগে সুখ নেই ; শুধু সুখের আভাসমাত্রই থাকে। তার থেকে বৈরাগ্য সুখ অনেক দামী এবং বৈরাগ্য সুখের থেকে উপরতির সুখ আরও অনেক উচ্চ। কিন্তু পরমাত্মার ধ্যানে অটল স্থিতি লাভ হলে যে সুখ লাভ হয়, তা এগুলির থেকে আরও শ্রেষ্ঠ। এরূপ সুখ লাভ করাকে আত্মাতে স্থিত আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে '**ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা**' কাকে বলা হয়েছে এবং 'সঃ'-এর প্রয়োগ করে কাকে সঙ্কেত করা হয়েছে ?

উত্তর—উপরোক্ত প্রকারে যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের সমস্ত বিষয়ে আসক্তিরহিত হয়ে উপরত হয়েছেন ও পরমাত্মার ধ্যানের অটল স্থিতি থেকে উৎপন্ন মহাসুখ অনুভব করেন, তাঁকে '**ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা**' অর্থাৎ পরব্রহ্ম পরমাত্মার ধ্যানরূপ যোগে অভেদভাবে স্থিত বলা হয়। প্রথমে বলা দুটি লক্ষণের সঙ্গে এই '**ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা**'র ঐক্যের সংকেত করার জন্য '**সঃ**'-এর প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—অক্ষয় আনন্দ কী এবং তা অনুভব করার কী মর্মার্থ ?

উত্তর—সদা একরসে স্থিত পরমানন্দস্বরূপ অবিনাশী পরমাত্মাই 'অক্ষয় সুখ'। নিত্যনিরন্তর ধ্যান করতে করতে যিনি সেই পরমাত্মাকে অভিন্নভাবে প্রত্যক্ষ করেন, তিনিই তা অনুভব করেন।

এই সুখের কাছে কোনো সুখেরই তুলনা হয় না। সাংসারিক ভোগে যে সুখ প্রতীয়মান হয়, তা সর্বতোভাবে নগণ্য ও ক্ষণিক। তার থেকে বৈরাগ্য ও উপরতির সুখ ধ্যানজনিত সুখের হেতু হওয়ায় অধিক স্থায়ী এবং 'ধ্যানজনিত সুখ' পরমাত্মার সাক্ষাৎ প্রাপ্তির হেতু হওয়ায় তার থেকে অধিক স্থায়ী হয় ; কিন্তু সাধন-কালের এই সুখকে কোনোভাবেই অক্ষয় বলা যায় না ; 'অক্ষয় আনন্দ' একমাত্র পরমাত্মার সাক্ষাৎ স্বরূপ।

সম্বন্ধ—এইরূপ ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ে আসক্তি ত্যাগকে পরমাত্মা প্রাপ্তির হেতু জানিয়ে এবার এই শ্লোকে ইন্দ্রিয়াদির ভোগকে দুঃখের কারণ এবং অনিত্য জানিয়ে ভগবান তাতে আসক্তিরহিত হওয়ার জন্য সংকেত করেছেন—

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥ ২২

ভোগ যদিও বিষয়ী ব্যক্তিদের কাছে সুখরূপে ভাসিত হয়, কিন্তু আসলে তা দুঃখেরই হেতু । এর আদি-অন্ত আছে অর্থাৎ অনিত্য। সেইজন্য হে অর্জুন ! বুদ্ধিমান বিবেকবান ব্যক্তি তাতে রত হন না ॥ ২২

প্রশ্ন—ইন্দ্রিয় ও বিষয়াদি সংযোগে প্রাপ্ত হওয়া ভোগ দুঃখেরই হেতু, এই কথার কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—পতঙ্গ যেমন অজ্ঞানবশতঃ পরিণাম না বুঝে আগুনকে সুখের কারণ ভেবে সেটি পাবার জন্য উড়ে উড়ে তার দিকে যায় এবং তাতে পড়ে প্রচণ্ড তাপে দগ্ধ হয়ে যায়, তেমনই অজ্ঞ ব্যক্তি ভোগকে সুখের কারণ ভেবে, ভোগে আসক্ত হয়ে, সেগুলি ভোগ করার চেষ্টা করে এবং পরিণামে মহাদুঃখ পায়। বিষয়কে সুখের কারণ মনে করে তা ভোগ করার জন্য মানুষের আসক্তি বৃদ্ধি পায়, আসক্তির থেকে কাম-ক্রোধাদি অনর্থের উৎপত্তি হয় এবং তার থেকে নানাপ্রকার দুর্গুণ-দুরাচার এসে তাকে চতুর্দিকে ঘিরে ধরে। পরিণামে তার জীবন পাপময় হয়ে ওঠে এবং ফলে তাকে ইহলোক ও পরলোকে নানাপ্রকার ভয়ানক তাপ ও যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

বিষয়ভোগের সময় মানুষ ভ্রমবশতঃ যে স্ত্রী-প্রসঙ্গাদি ভোগকে সুখের কারণ মনে করে, সেটিই পরিণামে তার বল, বীর্য, আয়ু এবং মন, বুদ্ধি, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদির শক্তি ক্ষয় করে আর শাস্ত্রবিরুদ্ধ হলে তো পরলোকে ভীষণ নরকযন্ত্রণা ভোগে বাধ্য করে ভয়ংকর দুঃখের কারণ হয়।

এছাড়াও আরও একটি কথা হল, অজ্ঞান ব্যক্তি যখন অন্যের কাছে নিজের থেকে অধিক ভোগ-সামগ্রী দেখে, তখন তার মনে ঈর্ষার আগুন প্রজ্বলিত হয় এবং সে তাতে জ্বলতে থাকে।

সুখরূপ মনে করে ভোগ করা বিষয় কখনো প্রারব্ধবশতঃ নষ্ট হয়ে গেলে তার সংস্কার বারবার স্মৃতিতে এসে মানুষকে শোকাচ্ছন্ন করে এবং তাতে সে কাঁদে এবং অনুতাপ করে। এই সব বিষয় বিচার করলে প্রমাণিত হয় যে বিষয়ের সংযোগে প্রাপ্ত ভোগ প্রকৃতপক্ষে দুঃখেরই কারণ, তাতে সুখের লেশমাত্র নেই। অজ্ঞতাবশতঃ ভ্রমের দ্বারাই এটি সুখরূপ বলে প্রতীত হয়। তাই ভগবান তাকে 'কেবল দুঃখেরই হেতু' বলেছেন।

প্রশ্ন—ভোগাদিকে 'আদি-অন্ত সম্পন্ন' বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ইন্দ্রিয়াদির ভোগকে স্বপ্ন বা বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় অনিত্য ও ক্ষণভঙ্গুর বলার জন্যই তিনি এটিকে বলেছেন 'আদি-অন্তসম্পন্ন'। এতে প্রকৃতপক্ষে সুখ নেই-ই ; কিন্তু যদি অজ্ঞানবশতঃ সুখরূপ প্রতীত হওয়ায় কেউ এটিকে আংশিকরূপে সুখের কারণ বলে মনে করে, তাহলে সে সুখও নিত্য নয়, তা ক্ষণিকই। কারণ যে বস্তু নিজেই অনিত্য, তাতে নিত্যসুখ পাওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ের চোদ্দোতম শ্লোকেও ভগবান ইন্দ্রিয়াদির বিষয়গুলিকে উৎপত্তি বিনাশশীল হওয়ায় অনিত্য বলেছেন।

প্রশ্ন—ভগবান অর্জুনকে এখানে **'কৌন্তেয়'** সম্বোধন করে কী সূচিত করেছেন ?

উত্তর—অর্জুনের মাতা কুন্তীদেবী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, সংযমশীল, বিবেকবতী ও বিষয়ভোগে অনাসক্ত ছিলেন ; নারী হয়েও তিনি সারা জীবন বৈরাগ্যযুক্ত ধর্মাচরণ ও ভগবদ্ভক্তিতে সময় কাটিয়েছেন। তাই এই সম্বোধনে ভগবান অর্জুনকে মাতা কুন্তীর মহত্ত্ব স্মরণ করিয়ে সূচিত করেছেন যে, 'অর্জুন ! তুমি সেই ধর্মশীলা কুন্তীদেবীর পুত্র, তোমার পক্ষে তো এই বিষয়ে আসক্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই।'

প্রশ্ন—অজ্ঞ ব্যক্তি বিষয়-ভোগে রমণ করে এবং বিবেকবান পুরুষ তাতে রমণ করেন না, এর কারণ কী ?

উত্তর—বিষয়ভোগ প্রকৃতপক্ষে অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর এবং দুঃখরূপ, কিন্তু বিবেকহীন অজ্ঞ ব্যক্তি এই বিষয় না জেনে-বুঝে তাতে রমণ করে এবং নানাপ্রকার কষ্টভোগ করে ; কিন্তু বুদ্ধিমান বিবেকী পুরুষ তার অনিত্যতা এবং ক্ষণভঙ্গুরতা নিয়ে বিচার করে তাকে কাম-ক্রোধ, পাপ-তাপ ইত্যাদির হেতু মনে করেন, এগুলির প্রতি আসক্তি ত্যাগকে অক্ষয়-সুখের কারণ বলে মনে করেন, তাই তিনি তাতে রমণ করেন না।

সম্বন্ধ—বিষয়ভোগকে কাম-ক্রোধের নিমিত্তে দুঃখের হেতু জানিয়ে এবার মনুষ্য-শরীরের মহত্ত্ব দেখিয়ে ভগবান কাম-ক্রোধাদি দুর্জয় শত্রুর ওপর বিজয় লাভকারী ব্যক্তির প্রশংসা করেছেন—

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥ ২৩

যে সাধক দেহত্যাগ করার আগেই কাম-ক্রোধ থেকে উৎপন্ন হওয়া বেগ সহ্য করতে সক্ষম হন, তিনিই যোগী এবং তিনিই সুখী॥ ২৩

প্রশ্ন—এখানে '**ইহ**' এবং '**এব**' এই অব্যয়গুলির প্রয়োগ কী অভিপ্রায়ে করা হয়েছে ?

উত্তর—এই দুটি মানুষের শরীরের মহত্ত্ব প্রকট করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। দেবাদি জন্মে বিলাসিতা ও ভোগের প্রাচুর্য থাকে, তির্যক যোনিতে জড়ত্বের বিশেষত্ব থাকে ; সুতরাং ঐসব জন্মে কাম-ক্রোধ জয় করার সাধনা করা সম্ভব নয়। '**ইহ**' এবং '**এব**'র প্রয়োগ করে ভগবান যেন সতর্ক করে বলেছেন যে শরীর বিনাশের আগেই এই মনুষ্যদেহে সাধনে তৎপর হয়ে কাম-ক্রোধের বেগ শান্তিপূর্বক সহ্য করার শক্তি অর্জন করে নেওয়া উচিত। অসতর্কতাবশতঃ যদি এই দুর্লভ মনুষ্যজীবন বিষয়ভোগেই কেটে যায় তাহলে পরে মাথা চাপড়ে অনুতাপ করতে হবে।

কেনোপনিষদে বলা হয়েছে—

'**ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ**'। (২।৫)

অর্থাৎ 'এই মনুষ্যশরীরেই যদি ভগবানকে জেনে নেওয়া যায়, তাহলে খুব ভালো, কিন্তু এই শরীরে যদি না জানা যায় তাহলে অত্যন্ত ক্ষতি হয়।'

প্রশ্ন—'**প্রাক্শরীরবিমোক্ষণাৎ**'-কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে, শরীর বিনাশশীল, এর বিয়োগ নিশ্চিত এবং এও জানা নেই যে এটি কোন্ ক্ষণে বিনাশপ্রাপ্ত হবে। তাই মৃত্যুকাল উপস্থিত হওয়ার আগেই কাম-ক্রোধের ওপর বিজয় লাভ করে নেওয়া উচিত। সেই সঙ্গে সাধন করে এমন শক্তিলাভ করা উচিত যাতে বারংবার ভয়ানক আক্রমণকারী এই কাম-ক্রোধ মহাশত্রু তাদের বেগ উৎপন্ন করে জীবনে কখনো বিচলিত করতে সক্ষম না হয়। যেমন সমুদ্রে সমস্ত নদীর জল তাদের বেগসহ বিলীন হয়ে যায়, তেমনই এই কাম-ক্রোধাদি শত্রু নিজ বেগসহ বিলীন হয়ে বিনষ্ট হয়ে যায়—এরূপ প্রচেষ্টা করা উচিত।

প্রশ্ন—কাম-ক্রোধ থেকে উৎপন্ন হওয়া বেগ কী এবং তা সহ্য করতে সমর্থ হওয়া কাকে বলে ?

উত্তর—(পুরুষের জন্য) নারী, (নারীর জন্য) পুরুষ, (উভয়ের জন্য) পুত্র, ধন, আবাস বা স্বর্গাদি যা কিছু মন ও ইন্দ্রিয়ের দেখা-শোনার বিষয়, তাতে আসক্তিবশতঃ সেগুলি পাওয়ার যে ইচ্ছা হয়, তার নাম 'কাম' এবং তারজন্য চিত্তে যে নানাপ্রকার সংকল্প-বিকল্পের প্রবাহ হয়, তা হল কাম থেকে উৎপন্ন 'বেগ'। ঐরূপ মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির প্রতিকূল বিষয় লাভ হলে অথবা ইষ্ট-প্রাপ্তির ইচ্ছাপূরণে বাধা উপস্থিত হলে সেই স্থিতির জন্য ভূত পদার্থ বা জীবেদের প্রতি দ্বেষভাব উৎপন্ন হয়ে চিত্তে যে 'উত্তেজনা'র ভাব আসে, তার নাম 'ক্রোধ'। সেই ক্রোধের কারণে হওয়া নানাপ্রকার সংকল্প-বিকল্পের যে প্রবাহ তা হল ক্রোধ হতে উৎপন্ন হওয়া বেগ। এই কাম-ক্রোধের বেগ শান্তিপূর্বক সহ্য করার শক্তি অর্থাৎ এগুলি কার্যরূপে পরিণত হতে না দেওয়ার শক্তি অর্জন করা হল এগুলি সহ্য করতে সমর্থ হওয়া।

প্রশ্ন—এখানে '**যুক্তঃ**' বিশেষণ কার উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয়েছে ?

উত্তর—বারংবার আক্রমণ করেও কাম-ক্রোধ শত্রু যাকে বিচলিত করতে পারে না—এইভাবে যে কাম-ক্রোধের বেগ সহ্য করতে সক্ষম, সেই মন-ইন্দ্রিয়াদি বশীভূতকারী সাংখ্যযোগের সাধক পুরুষদের জন্য '**যুক্তঃ**' বিশেষণ প্রযুক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন—এরূপ ব্যক্তিকে '**সুখী**' বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—জগতে সকল ব্যক্তিই সুখ চায়, কিন্তু বাস্তবিক সুখ কী এবং কীভাবে পাওয়া যায়, এই কথা না জানায়, তারা ভ্রমবশতঃ ভোগকেই সুখ বলে মনে করে, তাকেই কামনা করে এবং সেগুলিই পাওয়ায় জন্য চেষ্টা করে। তাতে বাধা সৃষ্টি হলে মানুষ ক্রোধের বশ হয়ে যায়। কিন্তু নিয়ম হল যে কাম-ক্রোধের বশীভূত মানুষ কখনো সুখী হতে পারে না। যে ব্যক্তি কামনার বশ, সে

স্ত্রী-পুত্র, ধন-মান প্রাপ্তির জন্য আর যে ক্রোধের বশ, সে অপরের অনিষ্ট করার জন্য নানাপ্রকার দুষ্কর্ম ও পাপে প্রবৃত্ত হয়। পরিণামে তারা ইহলোকে রোগ, শোক, অপমান, অপযশ, আকুলতা, ভয়, অশান্তি, উদ্বেগ ও নানাপ্রকার তাপ এবং পরলোকে নরক ও পশু-পক্ষী, কৃমি-কীটাদি জন্মে নানাপ্রকার কষ্ট ভোগ করে (১৬।১৮, ১৯, ২০)। এইভাবে তারা সুখ না পেয়ে সর্বদা দুঃখই পায়। কিন্তু যেসব ব্যক্তি ভোগকে দুঃখের হেতু ও ক্ষণভঙ্গুর জেনে কাম-ক্রোধাদি শত্রুর ওপর জয় লাভ করেছেন এবং যাঁরা ঐসব দোষ থেকে পূর্ণরূপে মুক্তি পেয়েছেন, তাঁরা সর্বদা সুখী থাকেন। সেইজন্যই এরূপ পুরুষকে 'সুখী' বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে 'নরঃ' পদটির প্রয়োগ করা হয়েছে কেন?

উত্তর—সত্যিকারের 'নর' তিনিই, যিনি কাম-ক্রোধাদি দুর্গুণ জয় করে ভোগে বৈরাগ্যবান ও উপরত হয়ে সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাকে লাভ করেছেন। 'নর' শব্দটি প্রকৃতপক্ষে এমনই মানুষের বাচক—তা তিনি নারীই হোন বা পুরুষ। অজ্ঞান মোহিত মানুষ আসক্তিবশতঃ আপাত রমণীয় বিষয়ের প্রলোভনে আবদ্ধ হয়ে পরমাত্মাকে ভুলে যায় এবং কাম-ক্রোধের বশীভূত হয়ে নীচ পশু ও পিশাচদের মতো আহার, নিদ্রা, মৈথুন এবং কলহে প্রবৃত্ত থাকে। সে 'নর' নয়, সে তো পশুর থেকেও নীচ লেজ ও শিংবিহীন অশোভন নিষ্কর্মা ও জগৎকে দুঃখপ্রদানকারী জন্তুবিশেষ। যাঁর ঈশ্বরলাভ হয়েছে এরূপ সত্যকার 'নরে'র গুণ ও আচরণকে লক্ষ্য করে যে সাধক কাম-ক্রোধাদি শত্রুকে জয় করেন, তিনিও 'নর' পদবাচ্য। এই ভাবার্থেই এখানে 'নর' শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন—যিনি কাম-ক্রোধ জয় করেছেন এবং যাকে 'যুক্ত' ও 'সুখী' বলা হয়েছে সেই ব্যক্তিকে সাধক বলে মানা উচিত কেন? তাঁকে সিদ্ধ মনে করলে ক্ষতি কী?

উত্তর—শুধুমাত্র কাম-ক্রোধ জয় করলেই কেউ সিদ্ধ হয়ে যান না (১৬।২২)। সিদ্ধের মধ্যে কাম-ক্রোধের লেশও থাকে না। এই অধ্যায়ের ছাব্বিশতম শ্লোকে ভগবান এই কথা বলেছেন। তাই তাঁকে এখানে শুধু 'সুখী' বলা হয়েছে। যদি তিনি অক্ষয় সুখ লাভ করে সিদ্ধপুরুষ হতেন তাহলে তাঁর জন্য 'পরম সুখী' অথবা অন্য কোনো বিশেষ বিশেষণ দেওয়া হত। অতএব একুশতম শ্লোকের পূর্বার্ধে পরমাত্মার ধ্যানে যে সাত্ত্বিক সুখ হয় এখানে কথিত পুরুষেরও সেই সাত্ত্বিক সুখ লাভের কথা বলা হয়েছে। তাই এই শ্লোকে বর্ণিত পুরুষকে সাধক বলেই মনে করা উচিত।

সম্বন্ধ—উপরোক্ত প্রকারে বাহ্য বিষয়ভোগকে ক্ষণস্থায়ী এবং দুঃখের কারণ জেনে ও আসক্তি ত্যাগ করে যিনি কাম- ক্রোধ জয় করেছেন, এবার সেই সাংখ্যযোগীর অবস্থানের ফলসহ বর্ণনা করা হচ্ছে—

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥ ২৪

যে যোগী অন্তরাত্মাতেই সুখযুক্ত, আত্মারাম এবং আত্মাতেই জ্ঞানযুক্ত ; সেই সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্ম পরমাত্মার সঙ্গে একীভূত সাংখ্যযোগী নির্বাণ ব্রহ্ম লাভ করেন॥ ২৪

প্রশ্ন—'অন্তঃসুখঃ'-এর ভাবার্থ কী?

উত্তর—এখানে 'অন্তঃ' শব্দটি সমগ্র জগতের অন্তঃস্থিত পরমাত্মার বাচক, অন্তঃকরণের নয়। এর অভিপ্রায় হল যে, যে ব্যক্তি বাহ্যবিষয়ভোগরূপ জাগতিক সুখকে স্বপ্নের ন্যায় অনিত্য মনে করায় তাকে সুখ মনে করেন না কিন্তু এই সবের অন্তঃস্থিত পরম আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাতেই 'সুখ' মনে করেন, তিনিই 'অন্তঃসুখঃ' অর্থাৎ পরমাত্মাতেই সুখযুক্ত।

প্রশ্ন—'অন্তরারামঃ' বলার অর্থ কী?

উত্তর—যে ব্যক্তি বাহ্যবিষয় ভোগে অস্তিত্ব ও সুখবুদ্ধি না থাকায় তাতে রমণ করেন না, এই সবে আসক্তিরহিত হয়ে শুধু পরমাত্মাতেই রমণ করেন অর্থাৎ

পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মাকেই নিরন্তর অভিন্নভাবে চিন্তা করেন, তাঁকে **'অন্তরারাম'** বলা হয়।

প্রশ্ন—**'অন্তর্জ্যোতিঃ'**র অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—পরমাত্মা সমস্ত জ্যোতিসমূহেরও পরম জ্যোতি (১৩।১৭)। সমগ্র জগৎ তাঁর আলোতে আলোকিত। যে ব্যক্তি নিরন্তর অভিন্নভাবে এরূপ পরম জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার অনুভব করেন ও তাতে অবস্থান করেন, যাঁর দৃষ্টিতে এক বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কোনো বাহ্য দৃশ্যবস্তুর ভিন্ন অস্তিত্বই থাকে না, তিনিই **'অন্তর্জ্যোতিঃ'**।

যাদের দৃষ্টিতে এই সমস্ত জগৎ সত্য বলে প্রতীত হয়, নিদ্রামগ্ন হয়ে স্বপ্ন দেখার মতো যারা অজ্ঞানের বশবর্তী হয়ে দৃশ্য জগতেরই চিন্তা করতে থাকে, তারা 'অন্তর্জ্যোতিঃ' নয়, কারণ পরম জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা তাঁদের কাছে অদৃশ্য।

প্রশ্ন—এখানে **'এব'**র অর্থ কী এবং কোন্ শব্দের সঙ্গে তার সম্বন্ধ করা হয়েছে ?

উত্তর—এখানে **'এব'** অন্যের ব্যাবৃত্তিকারী। এর সম্বন্ধ **'অন্তঃসুখঃ'**, **'অন্তরারামঃ'**, **'অন্তর্জ্যোতিঃ'**—এই তিনটির সঙ্গেই। অভিপ্রায় হল যে বাহ্যদৃশ্য প্রপঞ্চের সঙ্গে যোগীর কোনোরূপ সম্বন্ধ নেই ; কারণ তিনি পরমাত্মাতেই সুখ, রতি এবং জ্ঞান অনুভব করেন।

প্রশ্ন—**'ব্রহ্মভূতঃ'**-পদের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—**'ব্রহ্মভূতঃ'** পদটি এখানে সাংখ্যযোগীর বিশেষণ। সাংখ্যযোগ সাধনকারী যোগী অহংকার, মমতা ও কাম-ক্রোধাদি সমস্ত অবগুণ ত্যাগ করে নিরন্তর অভিন্নভাবে পরমাত্মার চিন্তা করতে করতে যখন ব্রহ্মরূপ প্রাপ্ত হন, যখন তাঁর ব্রহ্মের সঙ্গে একটুও পার্থক্য থাকে না, এইরূপ অন্তিম স্থিতিপ্রাপ্ত সাংখ্যযোগীকে 'ব্রহ্মভূত' বলা হয়।

প্রশ্ন—**'ব্রহ্মনির্বাণম্'** পদটি কীসের বাচক এবং তাঁর প্রাপ্তির কী তাৎপর্য ?

উত্তর—**'ব্রহ্মনির্বাণম্'** পদ সচ্চিদানন্দঘন, নির্গুণ, নিরাকার, নির্বিকল্প এবং প্রশান্ত পরমাত্মার বাচক এবং অভিন্নভাবে প্রত্যক্ষ হওয়াই তার প্রাপ্তি। 'ব্রহ্মভূত' শব্দের দ্বারা সাংখ্যযোগীর যে অন্তিম অবস্থার নির্দেশ করা হয়েছে, এ তারই ফল ! শ্রুতিতেও বলা হয়েছে—**'ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি'** (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৪।৬) অর্থাৎ 'তিনি ব্রহ্ম হয়েই ব্রহ্মকে লাভ করেন।' একেই পরম শান্তি প্রাপ্তি, অক্ষয় সুখ প্রাপ্তি, ব্রহ্মপ্রাপ্তি, মোক্ষপ্রাপ্তি ও পরমগতি প্রাপ্তি বলা হয়।

সম্বন্ধ—এইভাবে যিনি পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লাভ করেছেন, সেই ব্যক্তির লক্ষণ দুটি শ্লোকে জানাচ্ছেন।

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ॥ ২৫

যাঁর সর্বপাপ নাশ হয়েছে, সমস্ত সংশয় জ্ঞান দ্বারা ছিন্ন হয়েছে, যিনি সর্বপ্রাণীর হিতে রত, সংযত চিত্ত ও নিশ্চলভাবে পরমাত্মাতে স্থিত, সেই ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ ব্রহ্ম নির্বাণ লাভ করেন॥ ২৫

প্রশ্ন—এখানে **'ক্ষীণকল্মষাঃ'** বিশেষণ ব্যবহারের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ইহজন্ম ও জন্মান্তরে কৃত কর্মের সংস্কার, রাগ-দ্বেষাদি দোষ ও তার বৃত্তিপুঞ্জ, যা মানুষের চিত্তে একত্রিত হয়ে থাকে, বন্ধনের হেতু হওয়ায় সবই **'কল্মষ'** অর্থাৎ পাপ। পরমাত্মার সাক্ষাৎলাভ হলে এইসব বিনাশপ্রাপ্ত হয়। তখন সেই ব্যক্তির হৃদয়ে দোষের লেশমাত্র থাকে না। এইরূপ **'মল'** তথা **'দোষ'**-এর অভাব দেখানোর জন্য **'ক্ষীণকল্মষাঃ'** বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রশ্ন—**'ছিন্নদ্বৈধাঃ'** বিশেষণের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'দ্বৈধ' শব্দ সংশয় বা দ্বিধার বাচক, এর কারণ—অজ্ঞান। পরমাত্মার স্বরূপের যথার্থ জ্ঞান হলে সম্পূর্ণ সংশয় অজ্ঞানসহ স্বতঃই বিনষ্ট হয়ে যায়। পরমাত্মাপ্রাপ্ত এরূপ ব্যক্তির নির্মল অন্তরে বিন্দুমাত্র বিক্ষেপ ও আবরণরূপ দোষ থাকে না। সেই ভাবটি দেখাবার জন্য এখানে **'ছিন্নদ্বৈধাঃ'** বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—'**যতাত্মানঃ**' পদটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—যাঁর মন বশীভূত হয়ে চঞ্চলতা ইত্যাদি দোষ থেকে চিরতরে মুক্ত হয়ে পরমাত্মার স্বরূপে তদ্রূপ হয়—তাঁকেই বলা হয় '**যতাত্মা**'।

প্রশ্ন—'**সর্বভূতহিতে রতাঃ**' বিশেষণ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—পরমাত্মার অপরোক্ষ জ্ঞান হওয়ার পর আপন-পরের পার্থক্য থাকে না, তখন তাঁর সর্বপ্রাণীতে আত্মবুদ্ধি হয়ে যায়। তাই অজ্ঞ ব্যক্তি যেমন নিজ শরীরকে আত্মা মনে করে তার মঙ্গল কামনায় ব্যাপৃত থাকে, তেমনই জ্ঞানী মহাপুরুষ সবের মধ্যে সমভাবে আত্মবুদ্ধি হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে সবার হিতে ব্যাপৃত থাকেন। এই ভাবটি দেখাবার জন্য '**সর্বভূতহিতে রতাঃ**' বিশেষণটি প্রযুক্ত হয়েছে।

এই কথাটিও লোকদৃষ্টিতে কেবল জ্ঞানীর আদর্শ ব্যবহারের দিগ্‌দর্শন করাবার জন্যই বলা। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানীর সিদ্ধান্তে এক ব্রহ্ম ব্যতীত সর্বভূতের পৃথক অস্তিত্বই থাকে না এবং তিনি নিজেকে সর্বভূতের হিতে রত বলেও মনে করেন না।

প্রশ্ন—এখানে '**ঋষয়ঃ**' পদটির অর্থ '**ব্রহ্মবেত্তা**' হল কীভাবে ?

উত্তর—গত্যার্থক '**ঋষ্**' ধাতুর ভাবার্থ জ্ঞান বা তত্ত্বার্থ-দর্শন। সেই অনুসারে প্রকৃত তত্ত্ব যথাযথভাবে যাঁরা বোঝেন তাঁদের 'ঋষি' বলা হয়। অতএব এখানে 'ঋষি'র অর্থ ব্রহ্মবেত্তা মানাই ঠিক। '**ক্ষীণকল্মষাঃ**', '**ছিন্নদ্বৈধাঃ**' এবং '**যতাত্মানঃ**' বিশেষণও এই অর্থ সমর্থন করে।

শ্রুতি বলেছেন—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

(মুণ্ডক উপনিষদ্ ২।২।৮)

অর্থাৎ '**পরাবরস্বরূপ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হলে জ্ঞানীপুরুষের হৃদয়গ্রন্থি খুলে যায়, সম্পূর্ণ সংশয় দূর হয় এবং সমস্ত কর্মের ক্ষয় হয়।**'

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্॥ ২৬

কাম-ক্রোধ মুক্ত, সংযতচিত্ত, পরব্রহ্ম পরমাত্মার সাক্ষাৎকারী জ্ঞানী পুরুষের সর্বদিকে শান্ত পরব্রহ্ম বিরাজিত॥ ২৬

প্রশ্ন—কাম-ক্রোধরহিত বলার অভিপ্রায় কী ? জ্ঞানী-মহাত্মার মন ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কাম-ক্রোধের কোনো ক্রিয়াই কি হয় না ?

উত্তর—জ্ঞানী মহাপুরুষদের অন্তঃকরণ সর্বতোভাবে পরিশুদ্ধ হয়ে যায়, তাই তাঁদের মধ্যে কাম-ক্রোধের বিকার লেশমাত্র থাকে না। এরূপ মহাত্মাদের মন ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা কিছু ক্রিয়া হয়, সেসবই স্বাভাবিকভাবে অপরের হিতার্থেই হয়ে থাকে। ব্যবহারকালে প্রয়োজনানুসারে তাঁদের মন ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যদি শাস্ত্রমতো কাম ও ক্রোধের ব্যবহার করা হয় তবে তা নাটকের অভিনয়-কারীর ব্যবহারের মতো শুধুমাত্র লোকসংগ্রহের জন্য লীলামাত্র বলে বুঝতে হবে।

প্রশ্ন—এখানে '**যতি**' শব্দের অর্থ কী ?

উত্তর—মল, বিক্ষেপ ও আবরণ—এই তিনটি দোষ জ্ঞানের মহাপ্রতিবন্ধকস্বরূপ। জ্ঞানীদের মধ্যে এই তিন দোষের অভাব থাকে। এখানে '**কামক্রোধবিযুক্তানাম্**' দ্বারা মলদোষের, '**যতচেতসাম্**' দ্বারা বিক্ষেপদোষের এবং '**বিদিতাত্মনাম্**' দ্বারা আবরণদোষের সর্বতোভাবে অভাব দেখিয়ে পরমাত্মার যথার্থ জ্ঞান লাভের কথা বলা হয়েছে। তাই '**যতি**' শব্দের অর্থ এখানে সাংখ্যযোগের দ্বারা ঈশ্বরপ্রাপ্ত আত্মসংযমী তত্ত্বজ্ঞানী মানা উচিত।

প্রশ্ন—জ্ঞানী ব্যক্তির সর্বদিকে প্রশান্ত পরব্রহ্ম পরিপূর্ণরূপে বিরাজিত, এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ঈশ্বরপ্রাপ্ত জ্ঞানী মহাপুরুষদের অনুভবে ওপর-নীচে, বাইরে-ভেতরে, এখানে-ওখানে সর্বত্র নিত্য-নিরন্তর এক বিজ্ঞানানন্দঘন পরব্রহ্ম পরমাত্মাই

বিদ্যমান। এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কোনো পদার্থের অস্তিত্বই নেই, সেই অভিপ্রায়েই বলা হয়েছে যে তাঁর জন্য সর্বদিকেই পরমাত্মা পরিপূর্ণরূপে অবস্থিত।

সম্বন্ধ—কর্মযোগ ও সাংখ্যযোগ—উভয় সাধন দ্বারা ঈশ্বর লাভ এবং ঈশ্বরপ্রাপ্ত পুরুষদের লক্ষণ বলা হয়েছে। উক্ত উভয় প্রকারের সাধকদের জন্যই বৈরাগ্যপূর্বক মন-ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করে ধ্যানযোগের সাধন করা উপযোগী হয় ; তাই এবার সংক্ষেপে ফলসহ ধ্যানযোগের বর্ণনা করেছেন—

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥ ২৭
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥ ২৮

বাহ্য বিষয়ভোগের চিন্তা না করে তাকে বাইরেই ত্যাগ করে, চোখের দৃষ্টি ভ্রূ-মধ্যে স্থাপন করে, নাসিকার মধ্যে বিচরণশীল প্রাণ ও অপানবায়ুকে সম করে এবং ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সংযতপূর্বক ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধশূন্য হয়ে যে মোক্ষপরায়ণ মুনি সর্বদা বিচরণ করেন, তিনি সর্বদাই মুক্ত॥ ২৭-২৮

প্রশ্ন—বাহ্য বিষয় বাইরে ত্যাগ করার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—বাহ্য বিষয়ের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ অনাদিকাল থেকে চলে আসছে এবং তার চিত্তে তার অসংখ্য চিত্র (সংস্কার) ভরপুর হয়ে থাকে। বিষয়াদিতে সুখবুদ্ধি এবং রমণীয় বুদ্ধি থাকায় মানুষ অনবরত বিষয় চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে এবং পূর্বসঞ্চিত সংস্কার মাঝে মাঝে জাগ্রত হয়ে তার মনে আসক্তি ও কামনা জাগিয়ে তোলে তাই কোনোসময় তাঁর চিত্ত শান্ত থাকে না। এমনকি তিনি কখনো বাহ্যতঃ বিষয় ত্যাগ করে একান্তে ধ্যানে বসলেও, সেই সময়ও বিষয়-সংস্কার তাকে উত্যক্ত করে, তাই তিনি পরমাত্মার ধ্যান করতে পারেন না। এর প্রধান কারণ হল— নিরন্তর বিষয় চিন্তা করা। এই বিষয় চিন্তা ততক্ষণ বন্ধ হয় না যতক্ষণ তাঁর মধ্যে বিষয়ের প্রতি সুখবুদ্ধি বজায় থাকে। তাই ভগবান এখানে বলেছেন যে বিবেক ও বৈরাগ্যের সাহায্যে বাহ্য বিষয়সমূহকে ক্ষণভঙ্গুর, অনিত্য, দুঃখময় এবং দুঃখের কারণ ভেবে তার সংস্কাররূপ সমস্ত চিত্র অন্তঃকরণ থেকে দূর করা উচিত, তাদের স্মৃতি সর্বতোভাবে নষ্ট করে দেওয়া উচিত ; তাহলেই চিত্ত সুস্থির ও প্রশান্ত হবে।

প্রশ্ন—চোখের দৃষ্টি ভ্রূকুটির মধ্যে স্থাপন করতে বলা হয়েছে কেন ?

উত্তর—চক্ষু দ্বারা চতুর্দিকে দেখতে থাকলে ধ্যানে স্বাভাবিকভাবে বিঘ্ন-বিক্ষেপ হয় এবং তা বন্ধ করলে আলস্য ও নিদ্রার বশীভূত হওয়ার ভয় থাকে, তাই একথা বলা হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত যোগশাস্ত্র সম্বন্ধীয় কারণও আছে। বলা হয় ভ্রূকুটির মধ্যে দ্বিদল আজ্ঞাচক্র আছে। তার কাছেই থাকে সপ্তকোশ, তার অন্তিম কোশের নাম 'উন্মনী', সেখানে পৌঁছলে জীবের পুনরাবৃত্তি হয় না। তাই যোগিগণ আজ্ঞাচক্রে দৃষ্টি স্থির করে থাকেন।

প্রশ্ন — এখানে **'প্রাণাপানৌ'** প্রাণ এবং অপান বায়ুর সঙ্গে **'নাসাভ্যন্তরচারিণৌ'** বিশেষণ ব্যবহারের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—প্রাণ ও অপানের গতিকে সম করবার কথা এখানে বলা হয়েছে, তার গতি রুদ্ধ করার জন্য নয়। তাই জন্যই **'নাসাভ্যন্তরচারিণৌ'** বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্ন—প্রাণ ও অপানকে সম করা কী এবং কীভাবে সম করা উচিত ?

উত্তর—প্রাণ ও অপানের স্বাভাবিক গতি বিষম, তা কখনো বাম নাসিকায় বিচরণ করে, কখনো দক্ষিণ নাসিকায়। বামে চলাকে ইড়া নাড়ীতে আর দক্ষিণে

চলাকে বলা হয় পিঙ্গলা নাড়ীতে চলা। এরূপ অবস্থায় মানুষের চিত্ত চঞ্চল থাকে। এইভাবে বিষম বিচরণশীল প্রাণ ও অপানের গতি উভয় নাসিকায় সমভাবে করে দেওয়াই হল তাকে সম করা। এটি হল সুষুম্নাতে চলা। সুষুম্না নাড়ীতে চলার সময় প্রাণ ও অপানের গতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও শান্ত থাকে। তখন মনের চঞ্চলতা ও অশান্তি আপনিই নষ্ট হয়ে যায় এবং সে সহজেই পরমাত্মার ধ্যানে ব্যাপৃত হয়ে যায়।

প্রাণ ও অপানকে সম করার জন্য প্রথমে বাম নাসিকার দ্বারা অপানবায়ুকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে প্রাণবায়ুকে দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা বার করতে হয়। তারপর অপান বায়ুকে দক্ষিণ নাসিকা দিয়ে ভিতরে নিয়ে প্রাণবায়ুকে বাম নাসিকা দ্বারা বার করতে হয়। এইভাবে প্রাণ ও অপানকে সম করার অভ্যাসের সময় পরমাত্মার নাম জপ করতে থাকা এবং বায়ুকে বাইরে বার করা এবং ভিতরে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ঠিক সমান সময় লাগানো উচিত এবং তার গতি সমান ও সূক্ষ্ম করতে থাকা উচিত। এইরূপ অনবরত অভ্যাস করতে করতে যখন উভয়ের গতি সম, শান্ত ও সূক্ষ্ম হয়ে যাবে, নাসিকার বাইরে ও ভিতরে কণ্ঠাদি স্থানেও তার স্পর্শ অনুভূত না হবে, তখন বুঝতে হবে প্রাণ ও অপান সম এবং সূক্ষ্ম হয়ে গেছে।

প্রশ্ন—ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে জেতার স্বরূপ কী ? তাদের কী করে এবং কেন জেতা উচিত ?

উত্তর—ইন্দ্রিয়াদি যখন, যেখানে খুশী স্বচ্ছন্দে চলে যায়, মন সর্বদা চঞ্চল থাকে এবং নিজের স্বভাব ছাড়তে চায় না আর বুদ্ধি কোনো পরম সিদ্ধান্তে অটল থাকে না—এই হল এগুলির স্বাধীন বা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাওয়া। বিবেক এবং বৈরাগ্যপূর্ণ অভ্যাসের সাহায্যে এগুলিকে সুশৃঙ্খল, আজ্ঞাকারী ও অন্তর্মুখী বা ভগবদ্‌নিষ্ঠ করে তোলাই হল এগুলিকে জয় করা। এরূপ করলে ইন্দ্রিয়াদি স্বচ্ছন্দে বিষয়ে রমণ না করে, আমাদের ইচ্ছানুসারে আমরা যেখানে বলব, সেখানেই নিশ্চল হয়ে থাকবে, মন আমাদের ইচ্ছানুসারে একাগ্র হয়ে যাবে এবং বুদ্ধি এক ইষ্ট সিদ্ধান্তে অচল ও অটল হয়ে থাকবে। এরূপ মনে করা হয় এবং একথা ঠিকই যে ইন্দ্রিয়ের ওপর বিজয় প্রাপ্ত করলে প্রত্যাহার (ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহের সংযত হওয়া), মনকে বশ করার পর ধারণা (চিত্তকে একস্থানে স্থির করা) ও বুদ্ধিকে নিজ অধীন করার পর (বুদ্ধিকে একই সিদ্ধান্তে অচল রাখা) ধ্যান সহজ হয়ে যায়। তাই ধ্যানযোগে এই তিনটিকে বশ করা অত্যন্ত আবশ্যক।

প্রশ্ন—'**মোক্ষপরায়ণঃ**' পদটি কীসের বাচক ?

উত্তর—যাকে পরমাত্মার প্রাপ্তি, পরমগতি, পরমপদের প্রাপ্তি বা মুক্তি বলা হয়, তারই নাম মোক্ষ। এই অবস্থা বাক্য ও মনের অতীত। এটাই বলা যেতে পারে যে, এই স্থিতিতে মানুষ চিরতরে সমস্ত কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অনন্ত ও অদ্বিতীয় পরম কল্যাণস্বরূপ হয়ে যায়। এই মোক্ষ বা পরমাত্মার প্রাপ্তির জন্য যে ব্যক্তি তার ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে তন্ময় করে দিয়েছে, যে নিত্যনিরন্তর পরমাত্মা প্রাপ্তির প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে, যার একমাত্র উদ্দেশ্য পরমাত্মাকেই লাভ করা এবং যে পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কোনো বস্তুকেই প্রাপ্তি করার যোগ্য মনে করে না, তাকেই বলা হয় '**মোক্ষপরায়ণ**'।

প্রশ্ন—এখানে '**মুনিঃ**' পদটি কী জন্য এসেছে ?

উত্তর—মননশীলকে 'মুনি' বলা হয়। যে ব্যক্তি ধ্যানের সময়ের মতো ব্যবহারের সময়ও—পরমাত্মার সর্বব্যাপকতার দৃঢ় সিদ্ধান্ত হওয়ায়—সর্বদা পরমাত্মারই মনন করতে থাকেন, তিনিই 'মুনি'।

প্রশ্ন—'**বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ**' এই বিশেষণের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—কোনো কিছুর অভাব হলে ইচ্ছা হয় ; ভয় আসে—অনিষ্টের আশঙ্কা থেকে, ক্রোধ হয়—কামনায় বিঘ্ন এলে বা মনের অনুকূল কাজ না হলে। উপরোক্ত প্রকারে ধ্যানযোগের সাধন করতে করতে যে ব্যক্তি সিদ্ধ হয়ে যান, তাঁর সর্বদা, সর্বত্র এবং সর্বতোভাবে পরমেশ্বরের অনুভব হয়, তিনি কখনো পরমেশ্বরের অভাব অনুভব করেন না। তাহলে তাঁর কীসের ইচ্ছা হবে ? যখন একমাত্র পরমেশ্বর ব্যতীত আর কিছু নেই-ই এবং নিত্য, সত্য, সনাতন, অনন্ত, অবিনাশী পরমাত্মার স্বরূপ হতে তাঁর কখনো কোনো বিচ্যুতি হয় না, তখন অনিষ্টের আশঙ্কাজনিত ভয়ই বা হবে কেন ? পরমাত্মার নিত্য এবং পূর্ণ প্রাপ্তি হওয়ায় যখন কোনো কামনা বা বাসনা থাকে না, তখন ক্রোধই বা কেন আর কার ওপর হবে ? সুতরাং এই অবস্থায় তার অন্তঃকরণে জাগ্রতে বা স্বপ্নে, কখনো কোনো অবস্থাতেই, কোনোপ্রকার ইচ্ছাও

উৎপন্ন হয় না, কোনো ঘটনাতে কোনোপ্রকার ভয়ও হয় না এবং কোনো অবস্থাতেই ক্রোধও উৎপন্ন হয় না।

প্রশ্ন—এখানে **'এব'** কী অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে এবং এরূপ ব্যক্তি 'সর্বদা মুক্তই হয়ে থাকেন' এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'এব' এই অব্যয়টি সিদ্ধান্তের বোধক। যে মহাপুরুষ উপরোক্ত সাধন দ্বারা ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ হতে সর্বতোভাবে রহিত হয়েছেন, তিনি ধ্যানকালে বা ব্যবহারকালে, শরীর থাকাকালীন বা শরীর ত্যাগ হলে, সকল অবস্থাতেই সর্বদা মুক্ত —সংসার-বন্ধন থেকে সর্বদার জন্য সর্বতোভাবে মুক্ত হয়ে পরমাত্মাকে লাভ করেছেন— এতে কোনোপ্রকার সন্দেহ নেই।

সম্বন্ধ—অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ভগবান কর্মযোগ ও সাংখ্যযোগের স্বরূপ প্রতিপাদন করে দুই সাধন দ্বারা পরমাত্মার প্রাপ্তি ও সিদ্ধ পুরুষদের লক্ষণ বলেছেন। পরে উভয় নিষ্ঠার জন্য উপযোগী হওয়ায় ধ্যানযোগেরও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করেছেন। এবার যেসব ব্যক্তি এইভাবে মন, ইন্দ্রিয়কে জয় করে কর্মযোগ, সাংখ্যযোগ বা ধ্যানযোগের সাধন করতে নিজেকে সমর্থ মনে করেন না, সেই সাধকদের জন্য সহজে ঈশ্বর লাভের উপায় রূপে সংক্ষেপে ভক্তিযোগের বর্ণনা করছেন—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥ ২৯

আমার ভক্ত আমাকে সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সকল প্রাণীর সুহৃদ অর্থাৎ স্বার্থরহিত দয়ালু ও প্রেমিক, এইরূপ তত্ত্বতঃ জেনে শান্তিলাভ করেন ॥ ২৯

প্রশ্ন—'যজ্ঞ' ও 'তপ' দ্বারা কী বোঝা উচিত, ভগবান তার ভোক্তা কীরূপে এবং তাঁকে ভোক্তা জেনে মানুষ শান্তি পায় কী করে ?

উত্তর—অহিংসা, সত্য ইত্যাদি ধর্মপালন, দেবতা, ব্রাহ্মণ, মাতা-পিতা আদি গুরুজনদের সেবা-পূজা, দীন-দুঃখী, গরীব-পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিদের স্নেহ ও আদরযুক্ত সেবা এবং তাদের দুঃখনাশের জন্য করা উপযুক্ত সাধন ও যজ্ঞ-দান ইত্যাদি যত শুভকর্ম থাকে, এ সবেরই সমাবেশ 'যজ্ঞ' ও 'তপ' শব্দতে বুঝতে হবে। ভগবান সকলের আত্মা (১০।২০) ; অতএব দেবতা, ব্রাহ্মণ, দীন-দুঃখী প্রভৃতি রূপে অবস্থিত হয়ে ভগবানই সমস্ত সেবা-পূজা গ্রহণ করেন। তাই তিনিই সমস্ত যজ্ঞ ও তপের ভোক্তা (৯।২৪)। ভগবানের তত্ত্ব ও প্রভাব না জানার ফলে মানুষ যাঁর সেবা-পূজা করে, সেই দেব-মানুষদেরই যজ্ঞ ও সেবাদির ভোক্তা বলে মনে করে, তাইজন্য সে অল্প ও বিনাশশীল ফলভোগী হয় (৭।২৩)। তাঁর প্রকৃত শান্তি মেলে না। কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবানের তত্ত্ব ও প্রভাব জানেন, তিনি সবার মধ্যে আত্মরূপে বিরাজমান ভগবানকেই দেখে থাকেন। এইরূপ প্রাণীমাত্রে ভগবদ্‌বুদ্ধি হওয়ায় যখন তিনি তাদের সেবা করেন, তখন তার এই অনুভব হয়ে থাকে যে, আমি দেবতা-ব্রাহ্মণ বা দীন-দুঃখীর রূপে আমার পরম পূজনীয়, পরম প্রেমাস্পদ সর্বব্যাপী শ্রীভগবানেরই সেবা করছি।

মানুষ যাঁকে কিছুটা শ্রেষ্ঠ ও সম্মানীয় মনে করে, যাঁতে কিছুটা শ্রদ্ধাভক্তি হয়, যাঁর প্রতি কিছু আন্তরিক সত্যকার প্রেম থাকে, তাঁর সেবায় তিনি অত্যন্ত আনন্দ ও বিলক্ষণ শান্তিলাভ করেন। পিতৃভক্ত পুত্র তাঁর পিতাকে, স্নেহময়ী মা তাঁর সন্তানকে এবং প্রেমময়ী সাধ্বী পত্নী তাঁর স্বামীকে সেবা করায় কখনো কি ক্লান্ত হন ? প্রকৃত শিষ্য বা অনুগামী ব্যক্তি কি তাঁদের শ্রদ্ধেয় গুরু বা পথপ্রদর্শক মহাত্মার সেবা থেকে কোনো কারণে সরে যেতে চান ? যে ব্যক্তি বা নারী যার জন্য গৌরব, প্রভাব বা প্রেমের পাত্র হন, তাঁর সেবার জন্য তাঁর মনে ক্ষণে ক্ষণে নতুন উৎসাহের ঢেউ উথলে ওঠে। তাঁর মনে হয় যে, এঁর যত সেবা করি তা সবই অতি অল্প, নগণ্য। তিনি এই সেবার দ্বারা মনে করেন না যে আমি এঁর উপকার করছি ; তাঁর

মনে সেবা করার জন্য কোনো অহংকার উৎপন্ন হয় না, বরং এই সেবার সুযোগ পেয়ে তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করেন আর যত সেবা করেন, ততই তার মধ্যে বিনয় ও নম্রতা বৃদ্ধি পায়। তিনি সেব্যকে কৃতার্থ করছেন বলে কখনই মনে করেন না, বরং তার মনে সর্বক্ষণ এই ভয় থাকে যে উনি না আমাকে এই সেবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করেন। তিনি এইজন্য এরূপ করে থাকেন, কারণ এর দ্বারা তাঁর চিত্তে অপূর্ব শান্তির অনুভব হয় ; কিন্তু এই শান্তি তাঁকে সেবার থেকে দূরে সরায় না, কারণ তাঁর চিত্ত এই আনন্দরসে পরিপূর্ণ হয়ে উথলে ওঠে এবং তিনি এই আনন্দে ডুবে না গিয়ে উত্তরোত্তর আরও সেবাই করতে চান।

যখন জাগতিক গৌরব, প্রভাব ও প্রেমের কারণে সেবা এতো খাঁটি, নিবেদিত প্রাণ, এতো শান্তিপ্রদ হয় তখন ভগবানের যে ভক্ত সকলের মধ্যে অখিল জগতের পরমপূজ্য, দেবাদিদেব, সর্বশক্তিমান, পরম গৌরব এবং অচিন্ত প্রভাবের নিত্যধাম তাঁর পরম প্রিয়তম ভগবানকে চিনে নিয়ে নিজ বিশুদ্ধ সেবাবৃত্তিতে অন্তরস্থিত বিশ্বাস এবং অনুপম প্রেমের নিরন্তর প্রবহমান পবিত্র ও সুধাময়ী মধুর ধারায় সিক্ত হয়ে তাঁর পূজা করেন, তখন তাঁর মধ্যে কতটা এবং কেমন আনন্দ ও কীরূপ দিব্য শান্তি প্রাপ্তি হয়—একথা কেউ প্রকাশ করতে পারেন না। ভগবদ্‌কৃপায় যাঁর এরূপ সৌভাগ্য প্রাপ্তি হয়, তিনিই প্রকৃতপক্ষে এটি অনুভব করতে সক্ষম হন।

প্রশ্ন—ভগবানকে **'সর্বলোকমহেশ্বর'** বলে জানা কীরূপ এবং যাঁরা এরূপ মনে করেন, তাঁরা কীভাবে শান্তি পান ?

উত্তর—ইন্দ্র, বরুণ, কুবের, যমরাজ ইত্যাদি যত লোকপাল আছেন, বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে নিজ নিজ ব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রণকারী যত ঈশ্বর আছেন, ভগবান তাঁদের সকলের প্রভু ও মহান ঈশ্বর। তাই শ্রুতিতে বলা আছে —**'তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্'**। 'সেই ঈশ্বরদেরও পরম মহেশ্বরকে' (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৬।৭)। যিনি নিজ অনির্বচনীয় মায়াশক্তি দ্বারা তাঁর লীলাদ্বারাই সম্পূর্ণ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার করার সময় সকলকে যথাযোগ্য নিয়ন্ত্রণে রাখেন এবং এরূপ করার সময়ও তিনি সবার ওপরেই থাকেন। এইভাবে ভগবানকে সর্বশক্তিমান, সর্বনিয়ন্তা, সর্বাধ্যক্ষ ও সর্বেশ্বরেশ্বর বলে মনে করাই তাঁকে **'সর্বলোকমহেশ্বর'** ভাবা।

এইরূপ চিন্তাযুক্ত ভক্ত ভগবানের মহা প্রভাব ও রহস্যে অভিজ্ঞ হওয়ায় একক্ষণও তাঁকে ভুলতে পারেন না। তিনি সর্বদা নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁকে অনন্য ভাবে চিন্তা করেন। শান্তিতে বাধাপ্রদানকারী কাম-ক্রোধাদি শত্রু তাঁর কাছেও যেতে পারে না। তাঁর দৃষ্টিতে ভগবানের থেকে বড় আর কেউই হতে পারে না। তাই তিনি তাঁর চিন্তায় ব্যাপৃত হয়ে নিত্য-নিরন্তর পরম শান্তি ও আনন্দের মহাসাগরে ডুবে থাকেন।

প্রশ্ন—ভগবান কী প্রকারে সব প্রাণীদের সুহৃদ এবং তাঁকে সুহৃদ জানলে কীভাবে শান্তি পাওয়া যায় ?

উত্তর—সমস্ত বিশ্বে এমন কোনো বস্তু নেই যা ভগবানের অপ্রাপ্ত এবং যার জন্য ভগবানের কোথাও কারো সঙ্গে স্বার্থের সম্পর্ক আছে। ভগবান সদাসর্বদা সর্বপ্রকারে পূর্ণকাম (৩।২২) ; তবুও দয়াময় স্বরূপ হওয়ায় তিনি স্বাভাবিকভাবে সবার ওপর অনুগ্রহ করে সকলের হিতের ব্যবস্থা করেন এবং বারংবার অবতীর্ণ হয়ে নানাপ্রকার এমন বিচিত্র চরিত্র-লীলা করেন, যার গান করে মানুষ উদ্ধার পেয়ে যায়। তাঁর প্রত্যেক ক্রিয়ায় জগতের হিত নিহিত থাকে। ভগবান যাঁকে মারেন বা দণ্ড প্রদান করেন তাঁর ওপরও দয়াই করে থাকেন, কারণ তাঁর কোনো বিধানই দয়া বা প্রেমবর্জিত হয় না। তাই ভগবান সর্বপ্রাণীর সুহৃদ্।

লোকে এই রহস্য বুঝতে পারে না, তাই তাঁরা লৌকিক দৃষ্টিতে ইষ্ট-অনিষ্ট প্রাপ্তিতে সুখী ও দুঃখী হতে থাকে এবং তাই তারা শান্তি পায় না। যে ব্যক্তি এই ব্যাপার জেনে যান এবং বিশ্বাস করেন যে, ভগবান আমার অহৈতুক প্রেমী, তিনি যা কিছু করেন, আমার মঙ্গলের জন্যই করে থাকেন, তিনি প্রত্যেক অবস্থায় যা কিছুই ঘটুক, সেগুলিতে দয়াময় পরমেশ্বরের প্রেম ও দয়ার মঙ্গলবিধান ভরা আছে জেনে সর্বদাই প্রসন্ন থাকেন। তাই তিনি অটল শান্তি লাভ করেন। তাঁর শান্তিতে কোনোপ্রকার বাধা উপস্থিত হওয়ার কোনো কারণ থাকে না।

জগতে যদি কোনো সাধারণ মানুষের প্রতি কোনো শক্তিশালী উচ্চপদস্থ অধিকারী বা রাজা-মহারাজার বন্ধুত্ব হয় এবং সেই ব্যক্তি যদি এই কথা জেনে যান যে সেই শ্রেষ্ঠ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি আমার প্রকৃত মঙ্গল চান এবং আমাকে রক্ষা করতে প্রস্তুত, তাহলে—যদিও উচ্চপদস্থ অধিকারী বা রাজা-মহারাজা সর্বতোভাবে স্বার্থরহিত হন না, সর্বশক্তিমানও হন না এবং সকলের প্রভুও হন না, তাহলেও তিনি নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে করে একপ্রকার নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হয়ে আনন্দে মগ্ন হয়ে যান। আর যদি সর্বশক্তিমান, সর্বলোকমহেশ্বর, সর্বনিয়ন্তা, সর্বান্তর্যামী, সর্বদর্শী, অনন্ত অচিন্ত্য গুণের সমুদ্র, পরম প্রেমী, পরমেশ্বর নিজেকে আমাদের সুহৃদ বলেন এবং আমরা এই কথা বিশ্বাস করে তাঁকে নিজেদের সুহৃদ বলে মেনে নিই, তবে আমাদের কত অলৌকিক আনন্দ ও কীরূপ অপূর্ব শান্তি লাভ হবে ? তার অনুমান করাও কঠিন।

প্রশ্ন—এইভাবে যিনি ভগবানকে যজ্ঞ-তপের ভোক্তা, সমস্ত লোকের মহেশ্বর এবং সমস্ত প্রাণীদের সুহৃদ—এই তিন লক্ষণ দ্বারা যুক্ত বলে জানেন, তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হন, নাকি এর মধ্যে কোনো একটিতে যুক্ত বলে যাঁরা জানেন, তাঁরাও শান্তি পান ?

উত্তর—ভগবানকে এর মধ্যে কোনো একটি লক্ষণে যুক্ত জানে যাঁরা, তাঁরাও শান্তি লাভ করেন, আর তিন লক্ষণযুক্ত বলে যাঁরা জানেন, তাঁদের আর কথা কী ? কারণ যিনি কোনো একটি লক্ষণকে যথাযথভাবে বুঝে নেন, তিনি অনন্যভাবে ভজন না করে থাকতে পারেন না। ভজনের প্রভাবে তাঁর ওপর ভগবদ্‌কৃপা বর্ষিত হতে থাকে এবং ভগবদ্‌কৃপায় তিনি অতি শীঘ্রই ভগবানের স্বরূপ, প্রভাব, তত্ত্ব ও গুণাদি জেনে পূর্ণ শান্তি লাভ করেন।

আহা ! সেই সময় কত আনন্দ ও কত শান্তি লাভ হবে, যখন মানুষ জানবে যে 'সমস্ত দেবগণ ও মহর্ষি দ্বারা পূজিত ভগবান, যিনি সকল যজ্ঞ-তপের একমাত্র ভোক্তা এবং সমস্ত ঈশ্বর ও অখিল ব্রহ্মাণ্ডের পরম মহেশ্বর, তিনি আমার পরম প্রেমী মিত্র। কোথায় ক্ষুদ্রতম ও নগণ্য আমি, আর কোথায় নিজ অনন্ত অচিন্ত্য মহিমাতে নিত্য স্থিত মহান মহেশ্বর ভগবান ! আহা ! আমার থেকে বেশি সৌভাগ্যশালী আর কে হবে ?' সেই সময় তিনি হৃদয়ের কী অপূর্ব কৃতজ্ঞতা নিয়ে, কী পবিত্র ভাবধারায় সিক্ত হয়ে, কী আনন্দ সাগরে ডুবে ভগবানের পবিত্র চরণে চিরকালের মতো লুটিয়ে পড়বেন।

প্রশ্ন—ভগবান সকল যজ্ঞ ও তপের ভোক্তা, সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সর্বপ্রাণীর পরম সুহৃদ্‌—এই কথাটি বোঝার উপায় কী ? কোন্ সাধন দ্বারা মানুষ এইভাবে ভগবানের স্বরূপ, প্রভাব, তত্ত্ব এবং গুণাদি ভালোভাবে জেনে তাঁর অনন্য ভক্ত হতে পারে ?

উত্তর—শ্রদ্ধা ও প্রেমের সঙ্গে মহাপুরুষদের সঙ্গ, সৎ শাস্ত্রের শ্রবণ-মনন এবং ভগবানের শরণাগত হয়ে অত্যন্ত উৎসুকতার সঙ্গে তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে তাঁর দয়াতে মানুষ ভগবানের স্বরূপ, প্রভাব, তত্ত্ব ও গুণাদি জেনে তাঁর অনন্য ভক্ত হতে পারে।

প্রশ্ন—এখানে 'মাম্' পদের দ্বারা ভগবান তাঁর কোন্ স্বরূপ লক্ষ্য করিয়েছেন ?

উত্তর—যে পরমেশ্বর অজ, অবিনাশী ও সমস্ত প্রাণীর মহান ঈশ্বর হয়েও নানাসময়ে নিজ প্রকৃতি স্বীকার করে লীলা করার জন্য যোগমায়া দ্বারা জগতে অবতীর্ণ হন এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়ে অর্জুনকে উপদেশ প্রদান করছেন, সেই নির্গুণ, সগুণ, নিরাকার, সাকার ও অব্যক্ত-ব্যক্ত স্বরূপ, সর্বরূপ, পরব্রহ্ম পরমাত্মা, সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী, সর্বাধার ও সর্বলোক-মহেশ্বর সমগ্র পরমেশ্বরকে লক্ষ্য করে 'মাম্' পদটি প্রযুক্ত হয়েছে।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে কর্মসন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

———o———

ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ

ষষ্ঠ অধ্যায়
(আত্মসংযমযোগ)

অধ্যায়ের নাম

'কর্মযোগ' ও 'সাংখ্যযোগ'—উভয়তেই উপযোগী হওয়ায় এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগের যথাযথভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ধ্যানযোগে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সংযম করা পরম আবশ্যক। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—এই সবগুলিকে 'আত্মা' নামেও বলা হয় এবং এই অধ্যায়ে এগুলির সংযমের বিশেষ বর্ণনা আছে, তাই এই অধ্যায়ের নাম রাখা হয়েছে **'আত্মসংযমযোগ'**।

সংক্ষিপ্ত অধ্যায়-সার

এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে কর্মযোগীর প্রশংসা করা হয়েছে। দ্বিতীয়তে 'সন্ন্যাস' এবং 'কর্মযোগে'র ঐক্য প্রতিপাদন করে, তৃতীয়তে কর্মযোগের সাধনের বর্ণনা আছে। চতুর্থতে যোগারূঢ় পুরুষের লক্ষণ জানিয়ে, পঞ্চমে মানুষকে যোগারূঢ়াবস্থা প্রাপ্ত করার জন্য উৎসাহিত করে তার কর্তব্য নিরূপণ করে দিয়েছেন। ষষ্ঠতে 'নিজেই নিজের মিত্র এবং নিজেই নিজের শত্রু', পূর্বোক্ত এই রহস্যের ব্যাখ্যা দিয়ে, সপ্তমে শরীর-মন-ইন্দ্রিয়াদি জয় করার ফল জানিয়েছেন। অষ্টম ও নবমে পরমাত্মা-প্রাপ্ত ব্যক্তির লক্ষণ ও মহত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। দশমে ধ্যানযোগের জন্য প্রেরণা দিয়ে একাদশ থেকে চতুর্দশ পর্যন্ত ক্রমশঃ স্থান, আসন ও ধ্যানযোগের বিধির নিরূপণ করেছেন। পঞ্চদশে ধ্যানযোগের ফল জানিয়ে, ষোল ও সতেরোতে ধ্যানযোগের উপযুক্ত আহার-বিহার-শয়নের নিয়ম ও তার ফল বলেছেন। অষ্টাদশে ধ্যানযোগের অন্তিম স্থিতিপ্রাপ্ত পুরুষের লক্ষণ জানিয়ে, উনিশতমতে প্রদীপের দৃষ্টান্ত দ্বারা যোগীর চিত্তস্থিতি বর্ণনা করেছেন। এরপর বিশ থেকে বাইশতম পর্যন্ত ধ্যানযোগের দ্বারা পরমাত্মা প্রাপ্ত পুরুষের স্থিতির বর্ণনা করে, তেইশতমতে সেই স্থিতির নাম যোগ জানিয়ে, তা প্রাপ্ত করার জন্য প্রেরণা দিয়েছেন। চব্বিশ এবং পঁচিশতমতে অভেদরূপে পরমাত্মার ধ্যানযোগের সাধন প্রণালী জানিয়ে, ছাব্বিশতমতে বিষয়ে বিচরণশীল মনকে বারংবার আকর্ষণ করে পরমাত্মাতে স্থিত করার প্রেরণা দেওয়া হয়েছে। সাতাশ ও আঠাশতমতে ধ্যানযোগের ফলস্বরূপ 'আত্যন্তিক সুখ'-এর প্রাপ্তি বলা হয়েছে। উনত্রিশতমতে সাংখ্যযোগীর ব্যবহারকালের স্থিতি জানিয়ে, ত্রিশতমতে ভক্তিযোগ সাধনকারী যোগীর অন্তিম স্থিতি এবং তাঁর সর্বত্র ভগবদ্দর্শনের বর্ণনা করা হয়েছে। একত্রিশতমতে ভক্তি দ্বারা ঈশ্বর প্রাপ্ত ও বত্রিশতমতে সাংখ্যযোগ দ্বারা ঈশ্বরপ্রাপ্ত ব্যক্তির লক্ষণ ও মহত্ত্বের নিরূপণ করা হয়েছে। তেত্রিশতমতে অর্জুন মনের চঞ্চলতার জন্য সমত্বযোগের স্থিরতা কঠিন জানিয়ে চৌত্রিশতমতে মন নিগ্রহ করাও অত্যন্ত কঠিন বলেছেন। পঁয়ত্রিশতমতে ভগবান অর্জুনের বক্তব্য মেনে নিয়ে মন নিগ্রহের উপায় জানিয়েছেন। ছত্রিশতমতে মন বশীভূত না করলে যোগের দুষ্প্রাপ্যতা জানিয়ে এবং বশীভূত করলে তাতে সাফল্যের কথা বলা হয়েছে। এরপর সাঁইত্রিশ-আটত্রিশতমতে যোগভ্রষ্টের গতির সম্বন্ধে অর্জুনের প্রশ্ন এবং উনচল্লিশতমতে অর্জুন সংশয়-নিবারণের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন। তারপর চল্লিশতম থেকে পঁয়তাল্লিশতম পর্যন্ত অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান ক্রমশঃ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিদের দুর্গতি না হওয়ার, স্বর্গলোকে যাওয়ার, পবিত্র ধনবানের গৃহে জন্ম নেওয়ার, বৈরাগ্যবান যোগভ্রষ্টদের জ্ঞানবান যোগীদের গৃহে জন্ম-গ্রহণের এবং পূর্বজন্মের বুদ্ধিসংযোগ অনায়াসে প্রাপ্ত করার, পবিত্র ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণকারী যোগভ্রষ্টেরও পূর্বাভ্যাসের বলে ভগবানের দিকে আকর্ষিত হওয়ার, যোগ জিজ্ঞাসার মহত্ত্বের এবং শেষকালে যোগীদের কুলে জন্ম-গ্রহণকারী যোগভ্রষ্টের পরমগতি লাভের বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর ছেচল্লিশতমতে যোগীর মহিমা বলে অর্জুনকে যোগী হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং সাতচল্লিশতমতে সব যোগীর মধ্যে অনন্য প্রেমে শ্রদ্ধাপূর্বক ভগবানের ভজনকারী যোগীর প্রশংসা করে অধ্যায়ের উপসংহার করেছেন।

সম্বন্ধ—পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জুন 'কর্মসন্ন্যাস' (সাংখ্যযোগ) ও 'কর্মযোগ' এই দুটির মধ্যে কোন্ একটি সাধন তার জন্য নিশ্চিতভাবে কল্যাণপ্রদ—তা বলার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন। তাতে ভগবান উভয় সাধনকেই কল্যাণপ্রদ বলে জানিয়ে, দুটিই ফলে সমান লাভপ্রদ জানিয়ে সাধনায় সহজ হওয়ার জন্য 'কর্মসন্ন্যাস'-এর থেকে 'কর্মযোগ'-কে শ্রেষ্ঠ বলেছেন। তারপর উভয় সাধনের স্বরূপ, বিধি এবং ফলের যথাযথ নিরূপণ করে দুয়ের জন্যই অত্যন্ত উপযোগী এবং ঈশ্বর লাভের অন্যতম উপায়রূপে সংক্ষেপে ধ্যানযোগেরও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোন্ সাধনমার্গের পালন করা উচিত—এই কথা অর্জুনকে স্পষ্টভাবে বলেননি এবং ধ্যানযোগেরও সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়নি। তাই এবার ধ্যানযোগের খুঁটিনাটিসহ বিস্তৃত বর্ণনা করার জন্য ষষ্ঠ অধ্যায় আরম্ভ করেছেন এবং সর্বপ্রথম অর্জুনকে ভক্তিযুক্ত কর্মযোগে প্রবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে কর্মযোগের প্রশংসাপূর্বক প্রকরণ আরম্ভ করছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥ ১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—যিনি কর্মফলের আশ্রয় না নিয়ে কর্তব্য-কর্ম করেন তিনিই সন্ন্যাসী এবং যোগী আর যিনি কেবল যাগযজ্ঞাদি বৈদিক অগ্নি ও লোকহিতকর ক্রিয়াদি ত্যাগ করেছেন তিনি যোগী বা সন্ন্যাসী নন আবার কেবলমাত্র ক্রিয়াদি যিনি ত্যাগ করেছেন তিনিও যোগী নন ॥ ১

প্রশ্ন—এখানে কর্মফলের আশ্রয় ত্যাগের কথা বলা হয়েছে, আসক্তি ত্যাগের কোনো কথা এখানে উদ্ধৃত হয়নি, এর কারণ কী?

উত্তর—যে ব্যক্তির ভোগে বা কর্মে আসক্তি থাকে, তিনি কর্মফলের আশ্রয় সর্বতোভাবে ত্যাগ করতে পারেনই না। আসক্তি থাকলে স্বাভাবিকভাবে কর্মফলের কামনা হয়। সুতরাং যিনি কর্মফলের আসক্তি ত্যাগ করেছেন, বুঝতে হবে তাঁর আসক্তিও ত্যাগ হয়েছে। সব ক্ষেত্রেই সকল শব্দের প্রয়োগ করা যায় না। অতএব এরূপ স্থলে ঐ বিষয়ে অন্যস্থানে উদ্ধৃত কথার অধ্যাহার করে নেওয়া উচিত। যেখানে ফলত্যাগের কথা বলা হয় কিন্তু আসক্তি ত্যাগের আলোচনা থাকে না (২।৫১, ১৮।১১), সেখানে আসক্তি ত্যাগের কথাও বুঝে নিতে হবে। এইরূপ যেখানে আসক্তি ত্যাগের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু ফলত্যাগের কথা বলা নেই (৩।১৯, ৬।৪), সেখানে ফলত্যাগের কথাও বুঝে নিতে হবে।

প্রশ্ন—কর্মফলের আশ্রয় ত্যাগ করার ভাবার্থ কী?

উত্তর—স্ত্রী, পুত্র, ধন, মান, মর্যাদা ইত্যাদি ইহলোকের ও পরলোকের যত ভোগ আছে, সেই সবই 'কর্মফলের' অন্তর্গত ধরে নেওয়া উচিত। সাধারণ ব্যক্তি যা কিছু কর্ম করে, সেসব কোনো না কোনো ফলের আশ্রয় নিয়েই করে। তাই সেই কর্ম বারংবার তাঁদের জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত করে। সুতরাং ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত ভোগকে অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর এবং দুঃখের হেতু মনে করে, সমস্ত কর্মে মমতা, আসক্তি এবং ফলেচ্ছা ত্যাগ করাই হল কর্মফলের আশ্রয় ত্যাগ করা।

প্রশ্ন—কোন্ কর্ম করার উপযুক্ত এবং তা কেমন করে করা উচিত?

উত্তর—নিজ নিজ বর্ণাশ্রম অনুসারে যতপ্রকার শাস্ত্রবিহিত নিত্য-নৈমিত্তিক যজ্ঞ, দান, তপ, শরীর-নির্বাহ, লোকসেবা ইত্যাদির জন্য করা শুভ কর্ম থাকে, সে সবই করার উপযুক্ত কর্ম। সেই সব কর্ম যথাবিধি, যথাযোগ্য আলস্যরহিত হয়ে, নিজ শক্তি অনুযায়ী কর্তব্যবুদ্ধির দ্বারা উৎসাহপূর্বক সর্বদা করে যাওয়া উচিত।

প্রশ্ন—উপরোক্ত পুরুষ সন্ন্যাসী আবার যোগীও, এই কথার ভাবার্থ কী?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে এরূপ কর্মযোগী ব্যক্তি সমস্ত সংকল্পের ত্যাগী হন এবং সেই যথার্থ জ্ঞান লাভ করেন, যা সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ উভয় নিষ্ঠারই চরম ফল, তাই তাঁকে **'সন্ন্যাসিত্ব'** ও

'যোগীত্ব' উভয় গুণযুক্ত মানা হয়।

প্রশ্ন—'ন নিরগ্নিঃ' কথাটির কী তাৎপর্য ?

উত্তর—অগ্নি ত্যাগ করে সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণকারী পুরুষকে 'নিরগ্নি' বলা হয়। এখানে **'ন নিরগ্নিঃ'** বলে ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে যিনি অগ্নি ত্যাগ করে সন্ন্যাস আশ্রম তো গ্রহণ করেছেন, কিন্তু জ্ঞানযোগের (সাংখ্যযোগের) লক্ষণ দ্বারা যুক্ত নন, তিনি প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসী নন। কারণ তিনি শুধু অগ্নিকেই ত্যাগ করেছেন, সমস্ত ক্রিয়াতে কর্তৃত্বের অহংকার ত্যাগ ও মমতা, আসক্তি ও দেহাভিমান ত্যাগ করেননি।

প্রশ্ন—'ন চ অক্রিয়ঃ' কথাটির কী ভাবার্থ ?

উত্তর—সমস্ত ক্রিয়া সর্বতোভাবে ত্যাগ করে 'ধ্যানস্থ' হওয়া ব্যক্তিকে 'অক্রিয়' বলা হয়। এখানে **'ন চ অক্রিয়ঃ'** দ্বারা ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে, যিনি সব ক্রিয়া ত্যাগ করে ধ্যানে বসলেও, যাঁর অন্তরে অহংভাব, মমতা, রাগ-দ্বেষ, কামনা ও নানা দোষ বর্তমান, তিনিও বাস্তবে যোগী নন ; কারণ তিনি শুধুমাত্র বাহ্য ক্রিয়াই ত্যাগ করেছেন। মমতা, অহংকার, আসক্তি, কামনা ও ক্রোধ ইত্যাদি ত্যাগ করেননি।

প্রশ্ন—যে ব্যক্তি অগ্নিকে সর্বতোভাবে ত্যাগ করেছেন ও সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেছেন এবং যাঁর মধ্যে জ্ঞানযোগের (সাংখ্যযোগের) সমস্ত লক্ষণ (৫।৮, ৯, ১৩, ২৪, ২৫, ২৬ অনুসারে) যথাযথভাবে প্রকটিত হয়েছে, তিনি কি সন্ন্যাসী নন ?

উত্তর—কেন নয় ? এরূপ মহাপুরুষই তো আদর্শ সন্ন্যাসী। এইরূপ সন্ন্যাসী মহাত্মাদের মহত্ত্ব প্রকট করার জন্যই তো, যাঁদের মধ্যে জ্ঞানযোগ লক্ষণের বিকাশ হয়, সেই অন্য আশ্রমবাসীদেরও সন্ন্যাসী বলে প্রশংসা করা হয়। তাছাড়া তাঁদের সন্ন্যাসী বলার আর অর্থ বা কী হতে পারে ?

প্রশ্ন—এইরূপ সমস্ত ক্রিয়া ত্যাগ করে যে ব্যক্তি নিরন্তর ধ্যানস্থ থাকেন ও যাঁর অন্তরে মমতা, রাগ-দ্বেষ, কাম, ক্রোধ চিরতরে দূর হয়ে গেছে, সেই সর্ব সংকল্পের সন্ন্যাসীও কি যোগী নন ?

উত্তর—এরূপ সর্বসংকল্প ত্যাগী মহাত্মাই তো আদর্শ যোগী।

সম্বন্ধ—প্রথম শ্লোকে ভগবান কর্মফলের আশ্রয় না নিয়ে কর্মরত ব্যক্তিদের সন্ন্যাসী ও যোগী বলেছেন। তাতে প্রশ্ন হতে পারে যে 'সন্ন্যাস' ও 'যোগ'—দুটির স্থিতি যদি ভিন্ন ভিন্ন হয় তাহলে উপরোক্ত সাধক উভয় স্থিতিসম্পন্ন হবেন কীভাবে ? এই আশঙ্কা দূর করার জন্য দ্বিতীয় শ্লোকে 'সন্ন্যাস' ও 'যোগে'র ঐক্য প্রতিপাদন করেছেন—

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসন্ন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥ ২

হে অর্জুন ! যাকে সন্ন্যাস বলা হয়, তাকেই তুমি যোগ বলে জানবে। কারণ সংকল্প ত্যাগ না করলে কেউই যোগী হতে পারে না॥ ২

প্রশ্ন—যাকে 'সন্ন্যাস' বলা হয়, তাকেই তুমি যোগ বলে জানবে, এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে 'সন্ন্যাস' শব্দের অর্থ হল শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন দ্বারা হওয়া সমস্ত ক্রিয়াসমূহে কর্তৃত্ব ভাব দূর করে কেবল পরমাত্মাতেই অভিন্নভাবে স্থিত হওয়া, এই হল সাংখ্যযোগের পরাকাষ্ঠা। 'যোগ' শব্দের অর্থ হল মমতা, আসক্তি ও কামনার ত্যাগ দ্বারা হওয়া 'কর্মযোগে'র পরাকাষ্ঠারূপ নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধি। দুটিতেই সর্বতোভাবে সংকল্প দূর হয় এবং সাংখ্যযোগী যে পরব্রহ্ম পরমাত্মা লাভ করেন, কর্মযোগীও তাঁকেই লাভ করেন। এইরূপ দুয়েতেই সমস্ত সংকল্প ত্যাগ ও দুয়েতেই একই ফল হয় ; তাই এরূপ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে 'সংকল্পে'র অর্থ কী এবং তার 'সন্ন্যাস' বলতে কী বুঝায় ?

উত্তর—মমতা ও রাগ-দ্বেষযুক্ত সাংসারিক পদার্থের চিন্তায় যুক্ত যে অন্তঃকরণের বৃত্তি, তাকে সংকল্প বলা হয়। এই প্রকার বৃত্তি চিরতরে বিনাশ করাকেই 'সন্ন্যাস' বলে।

প্রশ্ন—সংকল্প যারা ত্যাগ করে না, তারা কেউই যোগী হতে পারে না, এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—সংকল্প পূর্ণভাবে ত্যাগ না হলে পরমাত্মার সঙ্গে চিত্তের পূর্ণ সংযোগ হয় না, তাই সকল সাধন-মার্গেই সংকল্প ত্যাগ প্রয়োজন। কোনো একজন সাধক নির্জনস্থানে আসন-প্রাণায়ামের সাহায্যে পরমাত্মার ধ্যান অভ্যাস করেন, দ্বিতীয়জন নিষ্কামভাবে সদা-সর্বদা কেবল ভগবানের জন্যই ভগবদ্ নির্দেশানুসারে কর্ম করার চেষ্টা করেন, তৃতীয়জন সময় সময়ে ধ্যানের অভ্যাসও করেন আর নিষ্কামভাবে কর্মও করেন—এদের মধ্যে কোনো সাধকই যতক্ষণ সংকল্প চিরতরে ত্যাগ না করেন, তাঁকে যোগারূঢ় বা যোগী বলা যায় না। সাধক তখনই যোগারূঢ় হন, যখন তিনি সমস্ত কর্মে ও বিষয়ে আসক্তিরহিত হয়ে সম্পূর্ণ সংকল্প ত্যাগ করেন।

সাংখ্যযোগীও প্রকৃতপক্ষে তখনই সত্যকার সন্ন্যাসী হতে পারেন, যখন তাঁর চিত্তে সংকল্পের লেশমাত্র না থাকে। তাই শ্লোকের পূর্বার্ধে উভয়কেই এক মনে করার কথা বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ—কর্মযোগীর প্রশংসা করে এবার তার সাধন জানাচ্ছেন।

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥ ৩

যোগারূঢ় হতে ইচ্ছুক মননশীল ব্যক্তির পক্ষে যোগলাভের জন্য নিষ্কামভাবে কর্ম করাই হল কারণ এবং যোগারূঢ় হলে তাঁর যে সর্বসংকল্পের অভাব হয়, সেটিই হয় তাঁর কল্যাণের হেতু॥ ৩

প্রশ্ন—এখানে **'মুনেঃ'** পদটির দ্বারা কীরূপ পুরুষকে লক্ষ্য করা হয়েছে ?

উত্তর—**'মুনেঃ'** পদটি এখানে বিশেষভাবে সেই পুরুষের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত, যিনি পরমাত্মাপ্রাপ্তির হেতুরূপ যোগারূঢ়-অবস্থা লাভ করতে ইচ্ছুক। সুতরাং স্বভাবতঃই এতে পরমাত্মার স্বরূপ চিন্তনকারী মননশীল সাধককে ধরা উচিত।

প্রশ্ন—যোগারূঢ় অবস্থা লাভে কোন্ কর্ম হেতু হয় ?

উত্তর—বর্ণ, আশ্রম ও নিজ স্থিতির অনুকূল যত প্রকার শাস্ত্রবিহিত কর্ম থাকে, ফল ও আসক্তি ত্যাগ করে সেগুলি করলে, সে সবই যোগারূঢ় অবস্থা লাভে হেতু হতে পারে।

প্রশ্ন—যোগারূঢ় অবস্থার প্রাপ্তিতে কর্মকে কেন হেতু বলা হয়েছে ? কর্ম ত্যাগ করে একান্তে ধ্যানের অভ্যাস করলেও তো যোগারূঢ় অবস্থা লাভ হতে পারে ?

উত্তর—একান্তে পরমাত্মার ধ্যানের অভ্যাস করাও তো একপ্রকার কর্মই। এইরূপ ধ্যানাভ্যাসকারী সাধকেরও শৌচ, স্নান, খাওয়া-দাওয়া, শরীর-নির্বাহের উপযুক্ত কর্মগুলি তো করতেই হয়। তাই নিজ বর্ণ, আশ্রম, অধিকার ও পরিস্থিতির অনুকূল যখন যে কর্তব্য-কর্ম উপস্থিত হয়, ফল ও আসক্তি ত্যাগ করে তা সমাধা করা যোগারূঢ় অবস্থা প্রাপ্তির হেতু—এ কথা যথার্থ। তাই তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকেও বলা হয়েছে যে, কর্ম আরম্ভ না করে মানুষ নৈষ্কর্ম্য অর্থাৎ যোগারূঢ় অবস্থা লাভ করতে পারে না।

প্রশ্ন—এখানে **'শমঃ'** পদের অর্থ ক্রিয়াগুলিকে স্বরূপতঃ ত্যাগ মনে না করে সর্ব সংকল্পের অভাব কেন মনে করা হল ?

উত্তর—দ্বিতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে সংকল্প ত্যাগের প্রকরণ আছে। **'শমঃ'** পদের অর্থও মনকে বশ করে শান্ত করা। অষ্টাদশ অধ্যায়ের বিয়াল্লিশতম শ্লোকেও **'শম'** শব্দ এই অর্থেই প্রয়োগ করা হয়েছে। মন বশীভূত হয়ে শান্ত হলেই সংকল্প চিরতরে নাশ হয়। তাছাড়া কর্মকে স্বরূপতঃ ত্যাগ করাও যায় না। তাই এখানে **'শমঃ'**-র অর্থ সর্বসংকল্পের অভাব মানাই যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন—যোগারূঢ় পুরুষের **'শম'**-কে কর্মের কারণ মনে করলে ক্ষতি কী ?

উত্তর—'শম' শব্দ সর্বসংকল্পের অভাবরূপ শান্তির বাচক। তাই সেটি কর্মের কারণ হতে পারে না। যোগারূঢ় ব্যক্তির দ্বারা যা কিছু কর্ম হয়, তাতে তাঁর এবং লোকের প্রারব্ধই কারণ হয়ে থাকে। সুতরাং 'শম'-কে কর্মের হেতু মনে করা যুক্তিসংগত নয়। তাকে পরমাত্মা প্রাপ্তির হেতু মনে করাই ঠিক।

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে 'যোগারূঢ়' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তার লক্ষণ জানার আকাঙ্ক্ষা হওয়ায় যোগারূঢ় পুরুষের লক্ষণ জানাচ্ছেন—

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্জতে।
সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥ ৪

যখন সর্বসংকল্পত্যাগী পুরুষ ইন্দ্রিয়াদি ভোগে আসক্ত হন না এবং কর্মেও আসক্ত হন না, তখন তাঁকে যোগারূঢ় বলা হয়॥ ৪

প্রশ্ন—এখানে শুধু ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ে এবং কর্মে আসক্তি ত্যাগের কথা বলা হয়েছে, কামনা ত্যাগের কথা বলা হয়নি। এর কারণ কী ?

উত্তর—আসক্তি থেকেই কামনা উৎপন্ন হয় (২।৬২)। যদি বিষয়ে এবং কর্মে আসক্তি না থাকে তাহলে স্বতঃই কামনার অভাব হয়ে যায়। কারণ ব্যতীত কার্য হতেই পারে না। তাই আসক্তির অভাবে কামনার অভাবও বুঝে নিতে হবে।

প্রশ্ন—'**সর্বসংকল্পসন্ন্যাস**'-এর অর্থ কী ? সমস্ত সংকল্প ত্যাগ হওয়ার পর কোনো বিষয় গ্রহণ বা কর্ম সম্পাদন কী করে সম্ভব ?

উত্তর—এখানে সংকল্প ত্যাগের অর্থ স্ফুরণ-মাত্রেরই সর্বতোভাবে ত্যাগ নয়, এরূপ মনে করলে যোগারূঢ় অবস্থার বর্ণনাও অসম্ভব হয়ে যাবে। যে সেই অবস্থা লাভ করেনি সে তো তার তত্ত্বই জানে না ; এবং যিনি লাভ করেছেন তিনি তা বলতে পারেন না। তাহলে কে বর্ণনা করবে ? তাছাড়া চতুর্থ অধ্যায়ের উনিশতম শ্লোকে ভগবান স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, 'যে মহাপুরুষের সমস্ত কর্ম কামনা ও সংকল্প ব্যতীত যথাযথভাবে হয়ে থাকে তাঁকে পণ্ডিত বলা হয়।' আর ওখানে যে মহাপুরুষের এইরূপ প্রশংসা করা হয়েছে, তিনি যোগারূঢ় নন—একথা বলা যায় না। এই অবস্থায় মানা যায় না যে সংকল্পরহিত ব্যক্তির দ্বারা কর্ম হয় না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সংকল্পত্যাগের অর্থ স্ফুরণ বা বৃত্তিমাত্রই ত্যাগ করা নয়। মমতা, আসক্তি ও দ্বেষপূর্বক যে সাংসারিক বিষয়াদির চিন্তা করা হয়, তাকে সংকল্প বলে। এরূপ সংকল্প পূর্ণভাবে ত্যাগ করাই হল 'সর্বসংকল্পত্যাগ'। এরূপ ত্যাগে কর্ম সুচারুভাবে সম্পাদন হওয়ার পথে কোনো বাধা হয় না। যার বুদ্ধিতে ভগবান ব্যতীত কারো স্থিতি নেই, তাঁর দ্বারা ভগবদ্-বুদ্ধিতে যে বিষয়গুলি ত্যাগ বা গ্রহণ করা হয়, তাকে সংকল্পজনিত বলা যায় না। এরূপ ত্যাগ ও গ্রহণরূপ কর্ম তো গুনীমহাত্মাদের দ্বারাও হতে পারে। এরূপ মহাত্মাদের জন্যই ভগবান বলেছেন যে, 'তিনি সর্বপ্রকারে আবর্তিত হলেও আমার মধ্যেই আবর্তিত হন' (৬।৩১)।

প্রশ্ন—মানুষ ভোগপ্রাপ্তির জন্যই কর্ম করে এবং তাতে আসক্ত হয়। সুতরাং শব্দ ইত্যাদি বিষয়ে আসক্তির অভাব বলাই যথেষ্ট ছিল, কর্মে আসক্তির অভাব বলার কী প্রয়োজন ?

উত্তর—ভোগে আসক্তি ত্যাগ হলেও কর্মে আসক্তি থাকা সম্ভব, কারণ যার কোনো ফল নেই, সেরূপ ব্যর্থ কর্মতেও প্রমাদী মানুষের আসক্তি দেখা যায়। সুতরাং আসক্তির সর্বতোভাবে অভাব দেখানোর জন্য এরূপ বলা যথার্থ।

সম্বন্ধ—পরমপদ প্রাপ্তির হেতুরূপ যোগারূঢ়-অবস্থার বর্ণনা করে এবার তা অর্জনের জন্য উৎসাহিত করে ভগবান মানুষের কর্তব্য বলেছেন—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥ ৫

নিজের দ্বারাই নিজেকে সংসার থেকে উদ্ধার করবে এবং নিজেকে কখনও অধোগতির পথে যেতে দেবে না ; কারণ মানুষ নিজেই নিজের বন্ধু ও নিজেই নিজের শত্রু ॥ ৫

প্রশ্ন—নিজের দ্বারা নিজেকে উদ্ধার করা কাকে বলে ? এবং নিজেকে অধোগতিতে ফেলা কী ?

উত্তর—জীব অজ্ঞতার বশ হয়ে অনাদিকাল থেকে এই দুঃখময় সংসার-সাগরে আবর্তিত হয় এবং নানাপ্রকার উচ্চ-নীচ যোনীতে জন্ম নিয়ে বহুপ্রকার ভয়ানক কষ্ট সহ্য করতে থাকে। জীবের এই দীন দশা দেখে দয়াময় ভগবান তাকে সাধনোপযোগী দেবদুর্লভ মনুষ্য-শরীর প্রদান করে এক সুন্দর সুযোগ দিয়ে থাকেন, যাতে সে ইচ্ছা করলে সাধনার দ্বারা একজন্মেই সংসার-সমুদ্র থেকে মুক্তিলাভ করে সহজেই পরমানন্দ স্বরূপ পরমাত্মাকে লাভ করতে পারে। তাই মানুষের উচিত এই মানব জীবনের দুর্লভ সুযোগ ব্যর্থ হতে না দেওয়া এবং কর্মযোগ, সাংখ্যযোগ ও ভক্তিযোগ প্রভৃতি যে কোনো সাধনে ব্যাপৃত হয়ে নিজ জন্মকে সফল করে তোলা। একেই বলা হয় নিজের দ্বারা নিজেকে উদ্ধার করা।

অপরপক্ষে রাগ-দ্বেষ, কাম-ক্রোধ এবং লোভ-মোহ ইত্যাদি দোষে আবদ্ধ হয়ে নানাপ্রকার দুষ্কর্ম করা ও তার ফলস্বরূপ মনুষ্যদেহের পরমফল ঈশ্বর-লাভ থেকে বঞ্চিত হয়ে পুনরায় শূকর-কুকুর জন্ম গ্রহণ করে নিজেকে অধোগতিতে নিয়ে যাওয়া। একেই বলা হয় নিজেই নিজেকে অধোগতিতে ফেলা। উপনিষদে এরূপ ব্যক্তিদের আত্মঘাতী বলে তাদের দুর্গতির বর্ণনা করা হয়েছে।[১]

এখানে ভগবান নিজের সাহায্যে নিজেকে উদ্ধার করার কথা বলে জীবকে এই বলে আশ্বাস দিয়েছেন যে, 'তুমি মনে কোরো না যে তোমার প্রারব্ধ-খারাপ, তোমার তাই উন্নতিই হবে না। তোমার উত্থান-পতন প্রারব্ধের অধীন নয়, তা তোমারই হাতে। সাধনা করো আর নিজেকে অবনতির গহ্বর থেকে বার করে উন্নতির শিখরে নিয়ে যাও।' সুতরাং মানুষকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সদা-সর্বদা নিজের উত্থানের, বর্তমান স্থিতির থেকে ওপরে ওঠার, রাগ-দ্বেষ, কাম-ক্রোধ, ভোগ, আলস্য, প্রমাদ ও পাপাচার সর্বতোভাবে ত্যাগ করে শম, দম, তিতিক্ষা, বিবেক, বৈরাগ্য ইত্যাদি সদ্‌গুণ সংগ্রহ করে, বিষয়-চিন্তা ত্যাগ করে শ্রদ্ধা ও প্রেমসহ ভগবদ্‌চিন্তা করা ও ভজন-ধ্যান ও সেবা-সৎসঙ্গের দ্বারা ভগবানকে লাভ করার সাধনায় রত হওয়া উচিত। যতক্ষণ ঈশ্বর লাভ না হয় ততক্ষণ এক মুহূর্তের জন্যও পিছু হটা বা থেমে যাওয়া উচিত নয়। ভগবৎকৃপার বলের ওপর ধৈর্য, বীরত্ব ও দৃঢ়নিশ্চয়তার সঙ্গে নিজেকে স্থির রেখে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া উচিত।

মানুষ নিজ স্বভাব ও কর্ম যত বেশি সংশোধন করতে পারবে ততই সে উন্নত হবে। স্বভাব ও কর্মের শুধরানোতেই উন্নতি এবং উত্থান ; অপরপক্ষে বিপরীত স্বভাব ও কর্মে দোষের বৃদ্ধি হল অবনতি বা পতন।

প্রশ্ন—মানুষ নিজেই নিজের বন্ধু এবং নিজেই নিজের শত্রু, এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—ভগবান এর দ্বারা এই ভাব দেখিয়েছেন যে, মানুষ সাংসারিক সম্পর্কের ফলে আসক্তিবশত যাদের মিত্র মনে করে, বন্ধনের হেতু হওয়ায় তারা প্রকৃতপক্ষে মিত্রই নয়। সাধু, মহাত্মা এবং নিঃস্বার্থ সাধক, যাঁরা বন্ধন মুক্তিতে সহায়ক হন, তাঁরাই সত্যকার বন্ধু, কিন্তু তাঁদের এই সাহায্য মানুষ তখনই পায়, যখন প্রথমেই সে নিজে মন থেকে তাঁকে শ্রদ্ধা করে ও ভালোবাসে, তাঁকে প্রকৃত বন্ধু বলে মনে করে তাঁর নির্দিষ্ট করা পথ ধরে চলে। এই দৃষ্টিতে বিচার করলে এটিই প্রমাণ হয় যে, মানুষ নিজেই

[১]অসুর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাঁস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥ (ঈশোপনিষদ্ ৩)

'এই কুকুর-শূকরাদি জন্ম তথা নরকরূপ অসুরসম্বন্ধীয় লোক অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আবৃত। যে কেউই আত্মা হননকারী হোক, সে মৃত্যুর পর সেই আসুরলোকই প্রাপ্ত হয়।'

নিজের বন্ধু। এইভাবে এটিও নিশ্চিত যে মানুষ যখন নিজের মনে কাউকে শত্রু বলে ভাবে, তখনই তার ক্ষতি হয়। নাহলে কোনো ব্যক্তিই কারো কোনোপ্রকার পারমার্থিক ক্ষতি করতে পারে না। তাই শত্রুও প্রকৃতপক্ষে সে নিজেই। বাস্তবে যে নিজের উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করে, সে নিজেই নিজের বন্ধু আর যে তার বিপরীত কর্ম করে, সে নিজের শত্রু। তাই নিজে ছাড়া অন্য কেউই নিজের বন্ধু বা শত্রু হতে পারে না।

সম্বন্ধ—একথা বলা হয়েছে যে মানুষ নিজেই নিজের বন্ধু এবং নিজেই নিজের শত্রু। সেটি স্পষ্ট করার জন্য বলা হয়েছে যে কোন্ লক্ষণযুক্ত মানুষ নিজেই নিজের মিত্র এবং কোন্ লক্ষণযুক্ত মানুষ নিজেই নিজের শত্রু।

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ।। ৬

যে জীবাত্মার দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়াদিসহ শরীর বশীভূত হয়েছে, সেই জীবাত্মা নিজেই নিজের বন্ধু এবং যে জীবাত্মার দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়াদিসহ শরীর বশীভূত হয়নি, সেই জীবাত্মা নিজেই নিজের শত্রু রূপে আবর্তিত হয় ।। ৬

প্রশ্ন—মন ও ইন্দ্রিয়াদিসহ শরীরকে জয় করা কাকে বলে ? তাকে কীভাবে জয় করা যায় ? জয় করা শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের লক্ষণ কী ? এগুলি জয় করে যে মানুষ সে কী করে নিজেই নিজের বন্ধু হয় ?

উত্তর—শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনকে ঠিকভাবে নিজ বশে করাই হল এদের জয় করা। বিবেকপূর্বক অভ্যাস ও বৈরাগ্যের সাহায্যে এগুলি বশ করা যায়। ঈশ্বর লাভের জন্য মানুষ যে সাধনায় নিজ শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনকে নিযুক্ত করতে চায়, তাতে যখন সেগুলি অনায়াসে নিযুক্ত হয় এবং তার লক্ষ্যের বিপরীত মার্গের প্রতি দৃষ্টিপাতও করে না, তখনই বুঝতে হবে যে সেগুলি বশীভূত হয়েছে। যে ব্যক্তির শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন বশীভূত হয়, সে অনায়াসেই সংসার-সমুদ্র থেকে নিজেকে উদ্ধার করে নেয় এবং পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে লাভ করে কৃতার্থ হয়ে যায় ; তাই সে নিজে নিজের মিত্র।

প্রশ্ন—যার শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন জয় করা হয়নি, তাকে 'অনাত্মা' বলার অভিপ্রায় কী ? এবং তার শত্রুর ন্যায় শত্রুতার আচরণের কী তাৎপর্য ?

উত্তর—শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন—এই সবগুলির নাম আত্মা। এগুলি যার নিজের বশে নয়, উচ্ছৃঙ্খল এবং যথেচ্ছ বিষয়ে বিচরণ করে এবং যে ব্যক্তি এই সবগুলি নিজ লক্ষ্যের অনুকূল ইচ্ছানুসারে কল্যাণের সাধনে নিয়োগ করতে পারে না, তাকে 'অনাত্মা' বলা হয়—সে আত্মবান নয়।

এরূপ মানুষ নিজে মন, ইন্দ্রিয়াদির বশ হয়ে কুপথ্যকারী রোগীর ন্যায় নিজেই কল্যাণসাধনের বিপরীত আচরণ করে। সে অহংকার, মমতা, রাগ-দ্বেষ, কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহ ইত্যাদির কারণে প্রমাদ, আলস্য ও বিষয়ভোগে আবদ্ধ হয়ে পাপকর্মের কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ হয়। শত্রু যেমন কারোকে সুখের পথ থেকে বঞ্চিত করে দুঃখ ভোগ করতে বাধ্য করে, তেমনই সে তার শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনকে কল্যাণের সাধনে নিয়োগ না করে ভোগে ব্যাপৃত করে এবং নিজেকে বারংবার নরকে নিয়ে গিয়ে নানাপ্রকার জন্ম পরিভ্রমণ করে অনন্তকাল ধরে ভীষণ দুঃখ ভোগ করতে বাধ্য হয়। যদিও নিজের প্রতি কারো দ্বেষ না থাকায় প্রকৃতপক্ষে কেউই নিজের ক্ষতি চায় না, তবুও অজ্ঞানে মোহিত হয়ে মানুষ আসক্তিবশতঃ দুঃখকে সুখ ও অহিতকে হিত মনে করে নিজ প্রকৃত কল্যাণের বিপরীত আচরণ করতে থাকে—এই বিষয় বোঝানোর জন্য এরূপ বলা হয়েছে যে সে শত্রুর ন্যায় শত্রুতার আচরণ করে।

সম্বন্ধ—যিনি মন ও ইন্দ্রিয়সহ শরীরকে জয় করেছেন, তিনি কেন নিজেই নিজের মিত্র, এই বিষয় স্পষ্ট করার জন্য এবার শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনরূপ আত্মাকে বশ করার ফল জানাচ্ছেন—

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ॥ ৭

শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ এবং মান-অপমানে যাঁর চিত্ত পূর্ণরূপে শান্ত সেরূপ স্বাধীন-চিত্ত ব্যক্তি সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মায় সম্যকভাবে অবস্থান করেন অর্থাৎ তাঁদের জ্ঞানে পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কিছুই থাকে না॥ ৭

প্রশ্ন—শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ ও মান-অপমানে চিত্ত-বৃত্তি শান্ত রাখা কী ?

উত্তর—এখানে শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ এবং মান-অপমান শব্দ উপলক্ষণ রূপে ব্যবহৃত। সুতরাং এই প্রসঙ্গে শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত সাংসারিক পদার্থের, ভাবের এবং ঘটনাসমূহের সমাবেশ বুঝতে হবে। কোনো অনুকূল বা প্রতিকূল পদার্থ, ভাব, ব্যক্তি বা ঘটনার সংযোগ বা বিয়োগ হলে অন্তঃকরণে রাগ-দ্বেষ, হর্ষ-শোক, ইচ্ছা, ভয়, ঈর্ষা, অসূয়া, কাম, ক্রোধ ও বিক্ষেপ ইত্যাদি কোনো প্রকার বিকার যেন না হয় ; সর্বাবস্থায় সর্বদা চিত্ত যেন সম ও শান্ত থাকে ; একেই বলা হয় 'শীতোষ্ণ, সুখ-দুঃখ ও মানাপমানে চিত্তবৃত্তি শান্ত রাখা'।

প্রশ্ন—**'জিতাত্মনঃ'** পদের অর্থ কী ? এটির প্রয়োগ করা হয়েছে কেন ?

উত্তর—শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনকে যিনি সম্পূর্ণভাবে নিজের বশে করেছেন, তাঁর নাম 'জিতাত্মা' ; এরূপ ব্যক্তি সদা-সর্বদা সর্বাবস্থাতে প্রশান্ত ও নির্বিকার থাকতে পারেন এবং সংসার-সমুদ্র থেকে নিজেকে উদ্ধার করে পরমাত্মাকে লাভ করতে পারেন ; তাই তিনি নিজে নিজের মিত্র। এই ভাব দেখানোর জন্য এখানে **'জিতাত্মনঃ'** পদটির প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে **'পরমাত্মা'** পদ কীসের বাচক এবং **'সমাহিতঃ'** পদের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—**'পরমাত্মা'** পদ সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্মের বাচক এবং **'সমাহিতঃ'** পদ দ্বারা দেখানো হয়েছে যে উপরোক্ত লক্ষণযুক্ত পুরুষের কাছে পরমাত্মা সদা-সর্বদা ও সর্বত্র প্রত্যক্ষভাবে পরিপূর্ণ রয়েছেন।

সম্বন্ধ—বলা হয়েছে মন-ইন্দ্রিয়সহ শরীরকে বশে করার ফল পরমাত্মা প্রাপ্তি। সুতরাং পরমাত্মা প্রাপ্ত ব্যক্তির লক্ষণ জানার ইচ্ছা হওয়ায় এবার দুটি শ্লোক দ্বারা তাঁর লক্ষণ বর্ণনা করে তাঁর প্রশংসা করেছেন—

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ॥ ৮

যাঁর চিত্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত, যিনি বিকাররহিত এবং জিতেন্দ্রিয়, যাঁর কাছে মৃত্তিকা, প্রস্তর এবং স্বর্ণ সমতুলা, তিনিই যোগযুক্ত অর্থাৎ ঈশ্বর লাভ করেছেন বলে বুঝতে হবে॥ ৮

প্রশ্ন—এখানে **'জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা'** পদ দ্বারা কোন্ পুরুষকে লক্ষ্য করা হয়েছে ?

উত্তর—পরমাত্মার নির্গুণ-নিরাকার তত্ত্বের প্রভাব ও মাহাত্ম্য ইত্যাদির রহস্যসহ প্রকৃত জ্ঞানকে 'জ্ঞান' এবং সগুণ নিরাকার ও সাকার তত্ত্বের লীলা, রহস্য, মহত্ত্ব, গুণ ও প্রভাব ইত্যাদির যথার্থ জ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' বলা হয়। যে ব্যক্তির পরমাত্মার নির্গুণ-সগুণ, নিরাকার-সাকার তত্ত্বের যথাযথ জ্ঞান হয়েছে, যাঁর অন্তঃকরণ উপরোক্ত দুটি তত্ত্বের যথার্থ জ্ঞানে ভালোমতো তৃপ্ত হয়েছে, যাঁর আর কোনো কিছু জানার বাকি নেই, তিনিই 'জ্ঞান-

বিজ্ঞান তৃপ্তাত্মা'।

প্রশ্ন—এখানে '**কূটস্থ**' পদের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—স্বর্ণ-ব্যবসায়ী বা লৌহ-ব্যবসায়ীর কাছে লোহার যে 'নিহাই' থাকে তাকে বলা হয় 'কূট'। তার ওপর সোনা-রূপা, লোহা ইত্যাদি রেখে হাতুড়ি দিয়ে মারা হয়, সেইসময় তার ওপর বারংবার ভীষণ আঘাত করা হয়, তবুও সেটি ভাঙে না বা নড়ে না, অচল অবস্থাতেই থাকে। এইরূপ যে ব্যক্তি নানাপ্রকার ভীষণরকম দুঃখ উপস্থিত হলেও তাঁর অবস্থান থেকে একটুও বিচলিত হন না, যাঁর চিত্তে বিন্দুমাত্র বিকার উৎপন্ন হয় না, সদাসর্বদা অচলভাবে পরমাত্মার স্বরূপে স্থিত থাকেন, তাঁকে বলা হয় 'কূটস্থ'।

প্রশ্ন—'**বিজিতেন্দ্রিয়ঃ**' কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—জগতের সমস্ত বিষয় মায়াময় ও ক্ষণস্থায়ী বুঝে নেওয়ায় যাঁর কোনো বিষয়ে বিন্দুমাত্র আসক্তি নেই এবং তাইজন্য যাঁর ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ে কোনো রস না পেয়ে বিষয়াদি থেকে নিবৃত্ত হয়েছে এবং লোক সংগ্রহার্থে যিনি ইচ্ছানুসারে ইন্দ্রিয়াদিকে ঔচিত্য অনুসারে ব্যবহার করেন, স্বেচ্ছাপূর্বক সেগুলি কোথাও ধাবিত হয় না এবং মনে কোনো ক্ষোভও উৎপন্ন করে না—এইরূপ যাঁর ইন্দ্রিয় নিজের অধীন, সেই ব্যক্তিই '**বিজিতেন্দ্রিয়**'।

প্রশ্ন—'**সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ**' কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—মাটি, পাথর, সোনা ইত্যাদি সমস্ত পদার্থে পরমাত্ম-বুদ্ধি হওয়ায় যাঁর কাছে তিনটি সমান হয়ে গেছে ; যিনি অজ্ঞদের ন্যায় স্বর্ণে আসক্ত হন না এবং মাটি, পাথর ইত্যাদিতে দ্বেষ করেন না, সব কিছুর প্রতিই যাঁর সমদৃষ্টি, তিনি '**সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চন**'।

সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু ।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে।। ৯

সুহৃদ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, ধর্মাত্মা এবং পাপীদের ওপর যাঁরা সমভাব রাখেন, তাঁরাই অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ ।। ৯

প্রশ্ন—'সুহৃদ্' ও 'মিত্র'-তে পার্থক্য কী ?

উত্তর—সম্বন্ধ ও উপকার ইত্যাদির অপেক্ষা না করে বিনা কারণে স্বভাবতঃই প্রেমী ও হিতকারীকে 'সুহৃদ্' বলা হয় এবং পরস্পর প্রেম এবং একে অপরের হিতকারীকে 'মিত্র' বলা হয়।

প্রশ্ন—'অরি' (শত্রু) এবং 'দ্বেষ্য' (দ্বেষপাত্র)-তে কী পার্থক্য ?

উত্তর—কোনো কারণে মন্দ কিছু করার ইচ্ছা বা চেষ্টাকারীকে 'বৈরী' বলে এবং স্বভাবের দ্বারা প্রতিকূল আচরণ করার জন্য যে দ্বেষের পাত্র, তাকে 'দ্বেষ্য' বলা হয়।

প্রশ্ন—'মধ্যস্থ' এবং 'উদাসীন'-এ তফাৎ কী ?

উত্তর—পরস্পর বিবাদকারীদের মধ্যে মিলন করার চেষ্টা করেন যাঁরা এবং পক্ষপাতিত্ব ছেড়ে তাদের হিতার্থে যিনি ন্যায় করেন তাঁকে 'মধ্যস্থ' বলা হয় এবং যিনি এসবের কোনো কিছুতেই সম্বন্ধ রাখেন না, তাঁকে বলা হয় 'উদাসীন'।

প্রশ্ন—এখানে 'অপি' কথাটির কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—সুহৃদ, মিত্র, উদাসীন, মধ্যস্থ এবং সাধু-সদাচারী পুরুষদের সঙ্গে ও নিজ আত্মীয়দের সঙ্গে প্রেম হওয়া স্বাভাবিক। তেমনই বৈরী, দ্বেষ্য ও পাপীদের প্রতি দ্বেষ ও ঘৃণা হওয়া স্বাভাবিক। বিবেকশীল মানুষের মধ্যেও এই সব লোকের প্রতি স্বাভাবিকভাবে রাগ-দ্বেষ দেখা যায়। এরূপ পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ স্বভাবসম্পন্ন মানুষদের প্রতি রাগ-দ্বেষ ও ভেদ-বুদ্ধি না থাকা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, এসবেও যাঁর সমভাব থাকে, তাঁর যে অন্যত্রও সমভাব থাকবে, তা আর বলার নয়। এই ভাব দেখাবার জন্যই 'অপি' কথাটির প্রয়োগ হয়েছে।

প্রশ্ন—'**সমবুদ্ধিঃ**' কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—সর্বত্র পরমাত্ম-বুদ্ধি হয়ে যাওয়ায় যে উপরোক্ত অত্যন্ত বিশিষ্ট স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তির উপরে মিত্র, বৈরী, সাধু, পাপী ইত্যাদির আচরণ, স্বভাব ও ব্যবহারের পার্থক্যে কোনো প্রকারের প্রভাব পড়ে না, যাঁর বুদ্ধিতে কখনও কোনো পরিস্থিতিতে, কোনো কারণেই ভেদভাব আসে না, তিনিই '**সমবুদ্ধি**' বলে জানতে হবে।

সম্বন্ধ—ষষ্ঠ শ্লোকে বলা হয়েছে যে যিনি শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনরূপ আত্মাকে জয় করেছেন, তিনি নিজেই নিজের মিত্র। পরে সপ্তম শ্লোকে সেই 'জিতাত্মা' পুরুষের ঈশ্বর লাভ হওয়া এবং অষ্টম ও নবম শ্লোকে ঈশ্বরপ্রাপ্ত পুরুষের লক্ষণ জানিয়ে তাঁদের প্রশংসা করেছেন। এতে প্রশ্ন হতে পারে যে জিতাত্মা পুরুষের ঈশ্বর লাভের জন্য কী করা উচিত, কোন্ সাধনের দ্বারা পরমাত্মাকে শীঘ্রই লাভ করা যায় ? সেইজন্য এবার ধ্যানযোগের প্রকরণ আরম্ভ করেছেন—

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥ ১০

মন ও ইন্দ্রিয়সহ যিনি শরীরকে বশে রাখেন, যিনি আকাঙ্ক্ষারহিত ও সঞ্চয়বৃত্তিরহিত, তিনি নির্জনস্থানে একাকী অবস্থান করে নিরন্তর পরমাত্মার ধ্যানে নিজেকে নিযুক্ত রাখবেন ॥ ১০

প্রশ্ন—'**নিরাশীঃ**'র অর্থ কী ?

উত্তর—যিনি ইহলোক ও পরলোকের ভোগ্য পদার্থে কোনো অবস্থাতে বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা বা আশা পোষণ করেন না, তিনিই '**নিরাশীঃ**'।

প্রশ্ন—'**অপরিগ্রহঃ**' কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভোগসামগ্রী সংগ্রহের নাম পরিগ্রহ, যিনি তা থেকে রহিত ; তাঁকে বলা হয় 'অপরিগ্রহ'। তিনি যদি গৃহস্থ হন, তাহলে যেন কোনো বস্তু মমতাপূর্বক সংগ্রহ না করেন আর যদি ব্রহ্মচারী, বাণপ্রস্থী বা সন্ন্যাসী হন তাহলে স্বরূপতঃ কোনোপ্রকার শাস্ত্রপ্রতিকূল দ্রব্যাদি সংগ্রহ না করেন। এরূপ ব্যক্তি যে কোনো আশ্রমেরই হন, তিনি '**অপরিগ্রহ**'।

প্রশ্ন—এখানে '**যোগী**' পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—ভগবান এখানে ধ্যানযোগে ব্যাপৃত হতে বলেছেন ; সুতরাং 'যোগী' ধ্যানযোগের অধিকারীর বাচক, সিদ্ধযোগীর নয়।

প্রশ্ন—এখানে '**একাকী**' বিশেষণটি কেন ব্যবহৃত হয়েছে ?

উত্তর—বহু মানুষের সমাগমে ধ্যানের অভ্যাস করা অত্যন্ত কঠিন, একজনও দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকলে কথাবার্তায় ধ্যানে বাধা এসে পড়ে। সুতরাং একা থেকে ধ্যানাভ্যাস করা উচিত। তাই এখানে '**একাকী**' বিশেষণ দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন—একান্ত স্থানে অবস্থান করার কথা বলার কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—বন, পর্বত, গুহা ইত্যাদি একান্ত স্থানই ধ্যানের পক্ষে উপযুক্ত। যেখানে বহুলোক যাতায়াত করে, সেরূপ স্থানে ধ্যানযোগের সাধন করা সম্ভব নয়। তাই একথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে '**আত্মা**' শব্দ কীসের বাচক এবং তাকে পরমাত্মাতে লাগানো কী ?

উত্তর—এখানে '**আত্মা**' শব্দ মন-বুদ্ধিরূপ অন্তঃকরণের বাচক এবং মন, বুদ্ধিকে পরমাত্মাতে তন্ময় করে দেওয়াই তাকে পরমাত্মাতে ব্যাপৃত করা।

প্রশ্ন—'**সততম্**' কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'**সততম্**' পদ '**যুঞ্জীত**' ক্রিয়ার বিশেষণ এবং নিরন্তরের বাচক। এর অভিপ্রায় হল যে ধ্যান করার সময় কোনো বাধা আসতে না দেওয়া। এইভাবে নিরন্তর পরমাত্মার ধ্যান করা উচিত, যাতে ধ্যানের প্রবাহ খণ্ডিত না হয়।

সম্বন্ধ—জিতাত্মা ব্যক্তিকে ধ্যানযোগের সাধন করতে বলা হয়েছে। এবার সেই ধ্যানযোগের বিস্তারিত বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রথমেই স্থান ও আসনের বর্ণনা করছেন—

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্॥ ১১

পবিত্রস্থানে এবং যা অতি উঁচু বা অতি নীচু নয়, তার ওপর ক্রমশঃ কুশ, মৃগচর্ম এবং বস্ত্র পেতে আসন স্থাপন করবেন ॥ ১১

প্রশ্ন—'**শুচৌ দেশে**' কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—ধ্যানযোগের সাধন করার জন্য, এরূপ স্থান হওয়া উচিত যা স্বভাবতঃই শুদ্ধ এবং ঝেড়ে, মুছে, ধুয়ে পরিষ্কার করে স্বচ্ছ ও নির্মল করা হয়েছে। গঙ্গা-যমুনা বা অন্য কোনো নদীর ধার, পর্বত-গুহা, দেবালয়, তীর্থস্থান অথবা বাগান ইত্যাদি যা সহজে পাওয়া যায় এবং স্বচ্ছ, পবিত্র, নির্জন হয়—ধ্যানযোগের জন্য সাধকদের এমনই কোনো এক স্থান নির্বাচন করা উচিত।

প্রশ্ন—এখানে '**আসনম্**' পদ কীসের বাচক এবং তার সঙ্গে '**নাত্যুচ্ছ্রিতম্**', '**নাতিনীচম্**' ও '**চৈলাজিনকুশোত্তরম্**'—এই তিনটি বিশেষণ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—কাঠ বা পাথরের চৌকি, মানুষ যার ওপর স্থিরভাবে বসতে পারে, তাকে আসন বলা হয়। সেই আসন যদি অতি উচ্চ হয়, তবে ধ্যানের সময় বিঘ্নরূপে আলস্য বা নিদ্রা এলে তার থেকে পড়ে আঘাত পাবার সম্ভাবনা থাকে ; আর অত্যন্ত নীচু হলে জমির ঠাণ্ডা-গরম বা কীট-পতঙ্গাদির জন্য বিঘ্ন হওয়ার ভয় থাকে, তাই '**নাত্যুচ্ছ্রিতম্**' এবং '**নাতিনীচম্**' বিশেষণ দিয়ে বলা হয়েছে যে আসন যেন অতি উঁচু বা অতি নীচু না হয়। কাঠ বা পাথরের আসন শক্ত হয়, তাতে বসলে পায়ে কষ্ট হতে পারে ; তাই '**চৈলাজিনকুশোত্তরম্**' বিশেষণ দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে তার ওপর প্রথমে কুশ, পরে মৃগচর্ম, তারপর কাপড় বিছিয়ে কোমল করা উচিত। মৃগচর্মের[১] নীচে কুশ থাকলে তা শীঘ্র খারাপ হবে না এবং ওপরে কাপড় থাকলে মৃগের লোম শরীরে লাগবে না। তাই তিনটি পাতবার বিধান দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন—'**আত্মনঃ**' কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—উপরোক্ত আসনটি নিজেরই হওয়া উচিত। ধ্যানযোগের সাধন করার জন্য অন্য কারো আসনে বসা উচিত নয়।

প্রশ্ন—'**স্থিরং প্রতিষ্ঠাপ্য**' কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—কাঠ বা পাথর নির্মিত আসনটি মাটির ওপর ঠিকভাবে বসানো উচিত যাতে সেটি এদিক-ওদিকে হেলে না পড়ে, কারণ সেটি এদিক-ওদিক করলে বা পিছলে পড়লে সাধনে বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

সম্বন্ধ—পবিত্র স্থানে আসন স্থাপন করার পর ধ্যানযোগের সাধকের কী করা উচিত তা বলছেন—

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥ ১২

সেই আসনে বসে চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযম করে মনকে একাগ্র করে, অন্তরের শুদ্ধির জন্য যোগ অভ্যাস করবেন ॥ ১২

---

[১]স্বাভাবিক মৃত্যুপ্রাপ্ত মৃগের চর্ম হওয়া উচিত, বধ করা মৃগের চর্ম ব্যবহার করা উচিত নয়। হিংসা দ্বারা প্রাপ্ত চর্ম সাধনে সহায়ক হয় না।

প্রশ্ন—এখানে আসনে বসার কোনো বিশেষ প্রকার না জানিয়ে সাধারণভাবে বসতে বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ধ্যানযোগের সাধনের জন্য বসায় যে নিয়মের প্রয়োজন, পরের শ্লোকে তা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। তা পালনপূর্বক যে সাধক স্বস্তিক, সিদ্ধ বা পদ্ম ইত্যাদি আসনগুলির মধ্যে যে কোনো একটি আসনে সুখপূর্বক বেশিক্ষণ স্থিরভাবে বসতে পারবেন, সেটিই তাঁর পক্ষে উপযুক্ত। তাই এখানে কোনো বিশেষ আসনের নাম না করে সাধারণভাবে বসার কথাই বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—'যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ' কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—চিত্ত শব্দ অন্তঃকরণের বোধক। মন ও বুদ্ধির দ্বারা যে জাগতিক বিষয়ের চিন্তা ও নিশ্চয় করা হয়, তা সর্বতোভাবে ত্যাগ করে, তাতে উপরত হওয়াকে অন্তঃকরণের ক্রিয়া বশে করা বলা হয়। 'ইন্দ্রিয়' শব্দটি শ্রোত্রাদি দশ ইন্দ্রিয়ের বোধক। এই সবগুলিকে শোনা, দেখা ইত্যাদি থেকে উপরত করাই হল ঐ ক্রিয়াগুলিকে বশে আনা।

প্রশ্ন—মনকে একাগ্র করা কাকে বলে ?

উত্তর—ধ্যেয় বস্তুতে মনের বৃত্তিগুলিকে ঠিকমতো নিযুক্ত করাই হল তাকে একাগ্র করা। এই প্রকরণ অনুসারে পরমাত্মাই ধ্যেয় বস্তু। সুতরাং এখানে তাঁতেই মন নিবিষ্ট করতে বলা হয়েছে। চতুর্দশ শ্লোকে **'মচ্চিত্তঃ'** বিশেষণ দিয়ে ভগবান এই কথাটি স্পষ্ট করেছেন।

প্রশ্ন—অন্তঃকরণের শুদ্ধির জন্য ধ্যানযোগের অভ্যাস করা উচিত, এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর অভিপ্রায় হল যে, ধ্যানযোগের অভ্যাসের উদ্দেশ্য কোনো প্রকার সাংসারিক সিদ্ধি বা ঐশ্বর্য প্রাপ্তির জন্য হওয়া উচিত নয়। একমাত্র পরমাত্মা-প্রাপ্তির জন্যই অন্তঃকরণে স্থিত রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি অবগুণ ও পাপ-বিক্ষেপ এবং অজ্ঞান নাশ করার জন্য ধ্যানযোগের অভ্যাস করা উচিত।

প্রশ্ন—যোগের অভ্যাস বলার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—উপরোক্ত ভাবে আসনে বসে, অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া বশে রেখে, মনকে পরমেশ্বরের দিকে নিবিষ্ট করে নিরন্তর অবিচ্ছিন্নভাবে পরমাত্মারই চিন্তা করতে থাকা—এই হল 'যোগে'র অভ্যাস করা।

সম্বন্ধ—ওপরের শ্লোকে আসনে বসে ধ্যানযোগের সাধন করতে বলা হয়েছে। এবার সেটিকে স্পষ্ট করার জন্য আসনে কীভাবে বসা উচিত, সাধকের ভাব কীরূপ হওয়া উচিত, তাঁর কী কী নিয়ম পালন করা উচিত ও কী প্রকারে কার ধ্যান করা উচিত ইত্যাদি বিষয় দুটি শ্লোকে বলা হচ্ছে—

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সম্প্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥ ১৩

মেরুদণ্ড, মস্তক, গ্রীবা সমান ও নিশ্চলভাবে স্থির[১] করে নিজ নাসিকার অগ্রভাগে চোখ রেখে, অন্য কোনো দিকে না তাকিয়ে— ॥ ১৩

প্রশ্ন—মেরুদণ্ড, মস্তক ও গ্রীবা 'সম' ও 'অচল' ভাবে ধারণ করার কী অর্থ ?

উত্তর—জঙ্ঘার ওপর এবং গলার নীচের স্থানকে মেরুদণ্ড বলা হয়, গলাকে বলা হয় 'গ্রীবা' এবং তার ওপরের অঙ্গের নাম মস্তক। কোমর বা পেটের আগে পিছনে বা ডাইনে-বাঁয়ে না ঝোঁকা অর্থাৎ মেরুদণ্ডের হাড় সোজা রাখা, গলাকেও কোনোদিকে না ঘোরানো, মাথাও স্থির রাখা—এইভাবে তিনটিকে একসূত্রে সোজা রেখে একটুও এদিক-ওদিক করতে না দেওয়া, এটিই হল এই সবকে 'সম' এবং 'অচল' ভাবে ধারণ করা।

প্রশ্ন—মেরুদণ্ড ইত্যাদিকে অচলভাবে রাখতে বলে

[১]'স্থিরসুখমাসনম্' (যোগদর্শন ২।৪৬)—বেশিক্ষণ সুখপূর্বক স্থির হয়ে যাতে বসা যায়, তাকে আসন বলে।

আবার স্থির করার জন্য কেন বলা হয়েছে ? এতে কোনো নতুন কথা আছে কি ?

উত্তর—মেরুদণ্ড, মস্তক, গ্রীবা সম ও অচল রাখলেও হাত-পা ইত্যাদি অন্য অঙ্গ তো নড়তে পারে, তাই স্থির হতে বলা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে ধ্যানের সময় হাত-পা কে যে কোনো আসনের নিয়মানুসারে রাখা যেতে পারে, কিন্তু সেগুলিকে অবশ্যই 'স্থির' রাখতে হবে। ধ্যানের সময় কোনো অঙ্গ নড়ানো উচিত নয়। অতএব সব অঙ্গ অচল রেখে সর্বপ্রকারে স্থির থাকা উচিত।

প্রশ্ন—'নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থির করে অন্য দিকে না দেখে' এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—দৃষ্টিকে নিজের নাকের ডগায় স্থির রাখা উচিত। চক্ষু বন্ধ করা উচিত নয় এবং এদিক-ওদিক অন্য কোনো অঙ্গ বা বস্তুও দেখা উচিত নয়। নাকের ডগাতেও মন দিয়ে দেখা উচিত নয় ; বিক্ষেপ বা নিদ্রা যাতে না হয়, তাই দৃষ্টিকে সেখানে নিবদ্ধ রাখতে হয়। মনকে তো পরমেশ্বরে নিবিষ্ট করতে হয়, নাকের ডগায় নয়।

প্রশ্ন—ভগবান এইরূপ আসন করে বসতে বলেছেন কেন ?

উত্তর—ধ্যানযোগের সাধনে নিদ্রা, আলস্য, বিক্ষেপ এবং শীত-গ্রীষ্মের দ্বন্দ্বকে বিঘ্ন মনে করা হয়। এই দোষগুলি থেকে রক্ষা পাওয়ার এটি অত্যন্ত উত্তম উপায়। মেরুদণ্ড, মস্তক, গ্রীবা সোজা করে, চোখ খুলে রাখলে আলস্য বা নিদ্রার আক্রমণ হবে না। নাকের ডগায় দৃষ্টি রেখে এদিক-ওদিক অন্য বস্তু না দেখলে বাহ্য বিক্ষেপের সম্ভাবনা নেই। আসনে দৃঢ়ভাবে আসীন হওয়ায় শীত-গ্রীষ্ম থেকেও ভয়ের কারণ থাকে না। তাই ধ্যানযোগ সাধন করার সময় এই প্রকার আসন করে বসা অত্যন্ত উপযোগী। তাই ভগবান একথা বলেছেন।

প্রশ্ন—এই তিনটি শ্লোকে আসনের যে বিধি বলা হয়েছে, তা সগুণ পরমেশ্বরের ধ্যানের জন্য না কি নির্গুণ ব্রহ্মের ?

উত্তর—ধ্যান সগুণ পরমেশ্বরের হোক বা নির্গুণ ব্রহ্মের, তা হল রুচি ও অধিকার ভেদের কথা। আসনের এই বিধি সকলের জন্যই প্রযোজ্য।

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥ ১৪

ব্রহ্মচর্যের ব্রতে স্থিত, ভয়রহিত, প্রশান্তচিত্ত যোগী সতর্কতার সঙ্গে মনকে সংযম করে মদ্‌গতচিত্ত ও মৎপরায়ণ হয়ে অবস্থান করবেন ॥ ১৪

প্রশ্ন—এখানে ব্রহ্মচর্যের ব্রতে স্থিত হওয়ার কী অর্থ ?

উত্তর—ব্রহ্মচর্যের তাত্ত্বিক অর্থ অন্য হলেও, তার প্রধান একটি অর্থ বীর্যধারণ এবং এখানে বীর্যধারণ অর্থই প্রসঙ্গানুকূল। মানুষের শরীরে বীর্য এমন এক অমূল্য বস্তু, যা ভালোভাবে সংরক্ষণ না করলে শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক—কোনো প্রকার শক্তি অর্জন হয় না এবং তার সঞ্চয়ও হয় না। তাই আর্যসংস্কৃতির চারটি আশ্রমের মধ্যে ব্রহ্মচর্য সর্বপ্রথম আশ্রম, যা অন্য তিনটি আশ্রমের মূল। ব্রহ্মচর্য আশ্রমে ব্রহ্মচারীর জন্য নানা নিয়মকানুন থাকে, যা পালন করলে বীর্যধারণের পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক হয়। ব্রহ্মচর্য পালনের সাহায্যে যদি যথার্থ বীর্য ধারণ হয়, তাহলে ঐ বীর্যের দ্বারা দেহের অভ্যন্তরে এমন এক বিশেষ বিদ্যুৎ-শক্তির উৎপন্ন হয়, তা এমনই তীব্র হয় যে তার ফলে মন ও প্রাণের গতি স্বতঃই স্থির হয়ে চিত্তের একতান প্রবাহ ধ্যেয় বস্তুর দিকে স্বাভাবিকভাবে গতিশীল হয়। এই একতানের নামই ধ্যান।

আজকাল চেষ্টা করলেও যে লোকে ধ্যান করতে পারে না, তাদের চিত্ত ধ্যেয় বস্তুতে নিবিষ্ট হয় না, তার অন্যতম প্রধান কারণ হল যে তারা বীর্যধারণ করেনি। যদিও বিবাহ হলে নিজ পত্নীর সঙ্গে সংযমপূর্ণ জীবন কাটানোও ব্রহ্মচর্য এবং এটিতেও ধ্যানে অত্যন্ত সাহায্য

হয় ; কিন্তু যিনি আগে থেকেই ব্রহ্মচারীর নিয়ম সুচারু-ভাবে পালন করে আসছেন এবং ধ্যানযোগের সাধনার সময় পর্যন্ত যাঁর শুক্র বাহ্যরূপে স্খলন হয়নি, তাঁর অত্যন্ত শীঘ্র এবং সুবিধাপূর্বক ধ্যানযোগে সফলতা পাওয়া সম্ভব হয়।

মনুস্মৃতি ইত্যাদি গ্রন্থে ও অন্যান্য শাস্ত্রে ব্রহ্মচারীর জন্য পালনীয় ব্রতের অত্যন্ত সুন্দর বিধান আছে, তার প্রধান হল—'ব্রহ্মচারী নিত্যস্নান করবে, কোনো ক্রিম জাতীয় বস্তু দিয়ে মালিশ করবে না, সুরমা লাগাবে না, তেল লাগাবে না, কোনো সুগন্ধ বস্তু ব্যবহার করবে না, ফুলের অলংকার পরবে না, নৃত্য-গীতাদি করবে না, জুতা-ছাতা ব্যবহার করবে না, পালঙ্কে শোবে না, জুয়া খেলবে না, নারীদের দিকে তাকাবে না, নারী-সম্পর্কীয় আলোচনা করবে না, নিয়মিত সহজ খাদ্য গ্রহণ করবে, কোমল বস্ত্র পরবে না, দেবতা, ঋষি ও গুরু পূজা-সেবা করবে, বিবাদ করবে না, কারো নিন্দা করবে না, সত্য কথা বলবে, কারোকে তিরস্কার করবে না, পূর্ণরূপে অহিংসাব্রত পালন করবে, কাম-ক্রোধ-লোভ চিরতরে পরিহার করবে, একাকী শয়ন করবে, কখনো বীর্যপাত হতে দেবে না, এই সব ব্রত যথাযথভাবে পালন করবে। এগুলি ব্রহ্মচারীর ব্রত। ভগবান এখানে 'ব্রহ্মচারী ব্রত'-এর কথা বলে আশ্রমধর্মের দিকেও ইঙ্গিত করেছেন। যেসব অন্য আশ্রমবাসী ধ্যানযোগের সাধন করেন, তাঁদের জন্যও বীর্যধারণ বা বীর্যসংরক্ষণ অত্যন্ত আবশ্যক এবং বীর্যধারণের উপরোক্ত নিয়ম অত্যন্ত সহায়ক। এটিই হল ব্রহ্মচারীর ব্রত এবং দৃঢ়তাপূর্বক এটি পালন করা হল তাতেই অবস্থিত হওয়া।

প্রশ্ন—'বিগতভীঃ' কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—পরমাত্মা সর্বত্র বিরাজিত, ধ্যানযোগী পরমাত্মার ধ্যান করে তাঁকে পেতে চান, তাহলে তাঁর কিসের ভয় ? সুতরাং ধ্যান করার সময় সাধককে নির্ভয় থাকতে হয়। মনে একটুও ভয় থাকলে একান্ত ও নির্জন স্থানে স্বাভাবিকভাবে চিত্তে বিক্ষেপ আসে। তাই সাধকের তখন মনে দৃঢ় প্রত্যয় ধারণ করা উচিত যে পরমাত্মা সর্বশক্তিমান ও সর্বব্যাপী হওয়ায় এখানেও সর্বদা অবস্থিত আছেন, তিনি থাকতে কোনো ভয় নেই। যদি কখনো প্রারব্ধবশতঃ ধ্যান করাকালীন মৃত্যু হয়, তাহলে তাতেও পরিণামে পরম কল্যাণই হবে। সত্যকার ধ্যানযোগী এই বিশ্বাসে দৃঢ় থাকেন, তাই তাঁকে **'বিগতভীঃ'** বলা হয়।

প্রশ্ন—'প্রশান্তাত্মা' কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ধ্যানের সময় মন থেকে রাগ-দ্বেষ, হর্ষ-শোক ও কাম-ক্রোধ ইত্যাদি দূষিত বৃত্তিসমূহ ও জাগতিক সংকল্প-বিকল্প সর্বতোভাবে দূর করে দেওয়া উচিত। বৈরাগ্যের সাহায্যে মনকে সর্বতোভাবে নির্মল ও শান্ত করে ধ্যানযোগের সাধন করা উচিত। এটি লক্ষ্য করাবার জন্য **'প্রশান্তাত্মা'** বিশেষণ দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন—'যুক্তঃ' বিশেষণের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ধ্যান করার সময় সাধককে নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ ইত্যাদি বিঘ্ন থেকে রক্ষার জন্য খুব সাবধানে থাকা উচিত। তা না করলে মন ও ইন্দ্রিয় তাকে বোকা বানিয়ে নানাপ্রকার বাধা সৃষ্টি করতে পারে। সেই কথা বোঝাবার জন্য **'যুক্তঃ'** বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—মনকে রোধ করা বলতে কী বুঝায় ?

উত্তর—মন এক স্থানে থাকতে চায় না, এবং রোধ করলেও সবলে অন্য বিষয়ে ধাবিত হওয়া মনের স্বভাব। মনকে যথাযথভাবে রোধ না করলে ধ্যানযোগের সাধন সম্ভব হয় না। তাই ধ্যান করার সময় মনকে বাহ্য বিষয় থেকে ঠিকমতো সরিয়ে নিয়ে তাকে নিজ লক্ষ্যে পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ করে ভগবানে তন্ময় করে রাখাই হল মনকে রোধ করা।

প্রশ্ন—'মচ্চিত্তঃ' কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—চিত্তকে ধ্যেয় বস্তুতে অখণ্ডরূপে প্রবাহিত করা বৃত্তির নাম ধ্যান। সেই ধ্যেয় বস্তু কী হওয়া উচিত, তা বলার জন্য ভগবান বলেছেন যে তুমি তোমার চিত্ত আমাতে নিবিষ্ট করো। যে বস্তুতে প্রেম থাকে, চিত্ত সহজেই তাতে নিবিষ্ট হয় ; তাই ধ্যানযোগীর উচিত পরম হিতৈষী, পরম সুহৃদ, পরম প্রেমাস্পদ পরমেশ্বরের গুণ, প্রভাব, তত্ত্ব ও রহস্য জেনে, সমস্ত জগৎ থেকে প্রেম সরিয়ে এনে একমাত্র তাঁকেই নিজের ধ্যেয় করবেন এবং অনন্যভাবে চিত্তকে তাঁতেই নিবিষ্ট করার অভ্যাস করবেন।

প্রশ্ন—ভগবৎপরায়ণ হওয়ার অর্থ কী ?

উত্তর—যিনি পরমেশ্বরকে নিজ ধ্যেয় করে তাঁর

ধ্যানে চিত্ত নিবেশ করতে চান, তিনি তাঁর পরায়ণ হবেনই। অতএব '**মৎপরঃ**' পদের দ্বারা ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে ধ্যানযোগের সাধকের উচিত যে তিনি আমাকে (ভগবানকে)ই পরম গতি, পরম ধ্যেয়, পরম আশ্রয় ও পরম মহেশ্বর ও সব থেকে প্রিয় প্রেমাস্পদ মনে করে নিরন্তর যেন আমার আশ্রিত থাকেন এবং আমাকেই তাঁর একমাত্র পরম রক্ষক, সহায়ক, প্রভু ও জীবন, প্রাণ, সর্বস্ব মনে করে আমার প্রত্যেক বিধানে সন্তুষ্ট থাকেন। একেই বলা হয় 'ভগবানের পরায়ণ হওয়া'।

প্রশ্ন—এই শ্লোকে উল্লিখিত ধ্যান সগুণ পরমেশ্বরের নাকি নির্গুণ ব্রহ্মের ? ঐ ধ্যান ভেদভাবে করতে বলা হয়েছে না কি অভেদভাবে ?

উত্তর—এই শ্লোকে '**মচ্চিত্তঃ**' এবং '**মৎপরঃ**' পদদুটির প্রয়োগ করা হয়েছে। সুতরাং এখানে নির্গুণ ব্রহ্মের অর্থাৎ অভেদভাবে ধ্যানের কথা নেই। তাই বুঝতে হবে যে, এখানে উপাস্য ও উপাসকের ভেদ রেখে সগুণ পরমেশ্বরের ধ্যানের রীতি বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে সগুণের ধ্যানের নিয়ম বলা হয়েছে, তাতো ঠিক ; কিন্তু এই সগুণ-ধ্যান সর্বশক্তিমান সর্বাধার পরমেশ্বরের নিরাকার রূপের নাকি ভগবান শ্রীশংকর, শ্রীবিষ্ণু, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি সাকার রূপের মধ্যে কোনো একজনের ?

উত্তর—ভগবানের গুণ, প্রভাব, তত্ত্ব এবং রহস্য[১] জেনে মানুষ তার রুচি, স্বভাব এবং অধিকার অনুযায়ী যে রূপে সহজে মন লাগাতে পারে, সে সেই রূপের ধ্যান করতে পারে। কারণ ভগবান এক এবং সব রূপই তাঁর। অতএব এমন কল্পনা করা উচিত নয় যে এখানে কোনো বিশেষ রূপের ধ্যান করতে বলা হয়েছে।

এবার এখানে সাধকের জ্ঞাতার্থে ধ্যানের কিছু স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে।

ধ্যানস্থ ভগবান শ্রীশংকরের ধ্যান

হিমালয়ের গৌরীশংকর শিখরে সর্বতোভাবে একান্ত দেশে ভগবান শিব পদ্মাসনে ধ্যানে বিরাজিত। তাঁর গৌরবর্ণ দেহ, তাতে ঈষৎ রক্তিমাভা। তাঁর দেহের উপরিভাগ নিশ্চল, সোজা এবং সমুন্নত। বিশাল কপালে ভস্মের সুন্দর ত্রিপুণ্ড্র শোভিত, পিঙ্গলবর্ণের জটাজুট চূড়া করে সর্প দিয়ে উঁচু করে বাঁধা। দুটি কানে রুদ্রাক্ষের মালা। পরণে মৃগচর্মের শ্যামলতা নীলকণ্ঠের প্রভায় আরও ঘনীভূত হচ্ছে। তাঁর ত্রিনেত্রের দৃষ্টি নাসিকার অগ্রভাগে স্থির এবং সেই নীচের দিকে তাকানো স্থির নিস্পন্দ চোখ থেকে উজ্জ্বল জ্যোতি এদিক-সেদিকে স্ফুরিত হচ্ছে। দুই হাত কোলের ওপর, মনে হচ্ছে যেন পদ্মফুল ফুটে আছে। তিনি সমাধি অবস্থায় দেহস্থিত বায়ুকে নিরুদ্ধ করে রেখেছেন, যা দেখে মনে হয় যেন জলপূর্ণ, আড়ম্বররহিত বর্ষণোন্মুখ মেঘ অথবা তরঙ্গহীন প্রশান্ত মহাসাগর বা নির্বাত দেশে অবস্থিত নিশ্চল জ্যোতির্ময় প্রদীপ অবস্থান করছে।

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান

নিজ হৃদয়কমলে অথবা নিজের সামনে কিছু উচ্চ জমিতে অবস্থিত এক রক্তবর্ণের সহস্রদল কমলের ওপর ভগবান শ্রীবিষ্ণু সুশোভিত। নীলমেঘের ন্যায় মনোহর নীলবর্ণ, সর্বাঙ্গ পরম সুন্দর ও নানাপ্রকার অলংকারে বিভূষিত। শ্রীঅঙ্গ থেকে দিব্য গন্ধ বার হচ্ছে। অতি শান্ত

[১]বস্তুতঃ ভগবানের গুণ, প্রভাব, তত্ত্ব ও রহস্যের ক্ষেত্রে একথা বলা যায় না যে তিনি এই এতোটুকুই। এই সম্পর্কে যা কিছু বলা যায়, তা সবই সূর্যকে প্রদীপ দেখানোর মতো। তবুও তাঁর গুণাদির যৎকিঞ্চিৎ স্মরণ, শ্রবণ ও কীর্তন মানুষকে পবিত্রতম করে তোলে, তাই শাস্ত্রকারগণ তাঁর গুণাদি বর্ণনা করেছেন। সেই শাস্ত্রাদির আধারে তাঁর গুণগুলিকে এইরূপ ভাবা উচিত—

অনন্ত ও অসীম এবং অত্যন্ত বিশিষ্ট সমতা, শান্তি, দয়া, প্রেম, ক্ষমা, মাধুর্য, বাৎসল্য, গাম্ভীর্য, উদারতা, সুহৃদতা ইত্যাদি ভগবানের 'গুণ'। সম্পূর্ণ বল, ঐশ্বর্য, তেজ, শক্তি, সামর্থ্য এবং অসম্ভবকে সম্ভব করা ইত্যাদি ভগবানের 'প্রভাব'। যেমন পরমাণু, বাষ্প, মেঘ, জলকণা ইত্যাদি সবই জল, তেমনই সগুণ-নির্গুণ, সাকার-নিরাকার, ব্যক্ত-অব্যক্ত, জড়-চেতন, স্থাবর-জঙ্গম, সৎ-অসৎ ইত্যাদি যা কিছু আছে এবং যা এর অতীত, সে সবই ভগবান, এ হল 'তত্ত্ব'। ভগবানের দর্শন, ভাষণ, স্পর্শ, চিন্তা, কীর্তন, পূজা, বন্দনা ও স্তব ইত্যাদির দ্বারা পাপীও পরম পবিত্র হয়ে যায় ; অজ, অবিনাশী, সর্বলোকমহেশ্বর, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সর্বত্র সমভাবে স্থিত ভগবানই দিব্য অবতার দেহ ধারণ করে প্রকটিত হন এবং তাঁর দিব্য গুণ, প্রভাব, তত্ত্ব ইত্যাদি বস্তুতঃ এতো অচিন্ত্য, অসীম এবং দিব্য যে তাঁকে তিনি ব্যতীত অন্য কেউই জানতে পারে না। এই হল তাঁর 'রহস্য'।

ও অত্যন্ত সুন্দর মুখ-কমল, সুদীর্ঘ মনোহর চার বাহু, অত্যন্ত সুন্দর রমণীয় গ্রীবা, পরম সুন্দর কপোল, মুখমণ্ডল মনোহর মৃদুহাস্যে সুশোভিত, রক্তবর্ণ ওষ্ঠ, অতি সুন্দর উচ্চ নাসিকা, দুই কাণে মকরাকৃতি কুণ্ডল দোদুল্যমান, মনোহর চিবুক। পদ্মের মতো বিশাল প্রফুল্ল নেত্র, তার থেকে স্বাভাবিকভাবে দয়া, প্রেম, শান্তি, সমতা, জ্ঞান, আনন্দ ও প্রকাশের অজস্র ধারা বহমান। উন্নত স্কন্ধ। মেঘ-শ্যাম, নীলপদ্মবর্ণ শরীরে সুবর্ণবর্ণের পীতবসন শোভমান। শ্রীমতী লক্ষ্মীর নিবাসস্থান বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন বিদ্যমান। ওপরের ডান হাতে উজ্জ্বল কিরণযুক্ত সুন্দর চক্র, নীচের হাতে কৌমোদের গদা, ওপরের বাম হাতে সুন্দর শ্বেত বিশাল বিজয়ী পাঞ্চজন্য শঙ্খ এবং নীচের হাতে সুন্দর রক্তবর্ণ পদ্ম সুশোভিত। গলায় রত্ন হার, হৃদয়ের ওপর তুলসীযুক্ত বনমালা, বৈজয়ন্তীমালা ও কৌস্তুভমণি বিভূষিত। চরণে রত্নমণ্ডিত নূপুর ও মস্তকে দেদীপ্যমান কিরীট। বিশাল, উন্নত ও প্রকাশমান ললাটে মনোহর ঊর্ধ্বপুণ্ড্র তিলক, হাতে রত্নের বালা, কোমরে রত্নমণ্ডিত কোমরবন্ধনী, বাহুতে বাজুবন্দ ও হাতের আঙুলগুলিতে রত্নখচিত আংটি সুশোভিত। কালো কোঁকড়ানো চুল অত্যন্ত সুন্দর। চারদিকে কোটি সূর্যের সমান শান্ত, শীতল আলো ছেয়ে আছে এবং তাতে যেন প্রেম ও আনন্দের অপার সাগর বয়ে চলেছে।

ভগবান শ্রীরামের ধ্যান

অত্যন্ত সুন্দর মণিরত্নময় রাজসিংহাসন, তার ওপরে সীতাসহ শ্রীরাম বিরাজিত। নবদূর্বাদলসম শ্যামবর্ণ, কমলদলের ন্যায় বিশাল নেত্র, অতি সুন্দর মুখমণ্ডল, বিশাল কপালে ঊর্ধ্বপুণ্ড্র তিলক, কালো কুঞ্চিত কেশ। মস্তকে সূর্যসম প্রকাশযুক্ত মুকুট শোভা পাচ্ছে, মুনিমনমোহন মহালাবণ্যময় কান্তি, দিব্য অঙ্গে পীতাম্বর বিরাজিত। গলায় রত্নহার ও দিব্যপুষ্পের মালা, চন্দনচর্চিত দেহ। ধনুর্বাণ হাতে, লাল ঠোঁট তাতে মৃদুহাস্য বিরাজিত। বাঁদিকে শ্রীমতী সীতা, উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণ দেহ, নীলবর্ণ শাড়ী পরিহিতা, হাতে রক্তকমল, দিব্য অলংকারে সর্ব অঙ্গ বিভূষিত। এ এক অতি অপূর্ব মনোরম দৃশ্য।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান (১)

বৃন্দাবনে যমুনা নদীতীর অশোক বৃক্ষের নব-পত্রে সুশোভিত কালিন্দীকুঞ্জে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখাদের সঙ্গে বিরাজমান, নবীন মেঘের ন্যায় শ্যাম আভাযুক্ত নীল বর্ণ। শ্যামদেহে স্বর্ণবর্ণের পীত বস্ত্র দেখে মনে হয় যেন শ্যাম ঘনঘটায় ইন্দ্রধনু শোভিত। গলায় সুন্দর বনমালা, তার থেকে পুষ্প ও তুলসীর সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। হৃদয়ে বৈজয়ন্তী মালা সুশোভিত। সুন্দর কালো কুঞ্চিত কেশ, কপালে এসে পড়েছে। অতি রমণীয় ত্রিভুবন-মোহন-মুখারবিন্দ, অতি মধুর হাস্যে শোভমান। মস্তকে ময়ূর পুচ্ছের মুকুট পরিহিত। কানে কুণ্ডল, সুন্দর কপোল কুণ্ডল প্রকাশে সুউজ্জ্বল, সর্ব অঙ্গে সুন্দর শ্রী ঝরে পড়ছে। কর্ণে কনেরফুলে প্রস্তুত কুণ্ডল রয়েছে। অদ্ভুত ধাতু এবং নানা বিচিত্র নবীন পল্লবে তাঁর দেহ সজ্জিত। বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন, গলায় কৌস্তুভমণি, লাল ঠোঁট দুটি বড় কোমল ও সুন্দর। বিশাল কমল নয়ন, তার থেকে আনন্দ ও প্রেমের বিদ্যুৎ ধারা নির্গত হয়ে সকলকে নিজের দিকে আকর্ষণ করছে, যার জন্য সবার হৃদয়ে আনন্দ ও প্রেমের সমুদ্র বয়ে চলেছে। মনোহর ত্রিভঙ্গরূপে দণ্ডায়মান, নিজের চঞ্চল, কোমল আঙুলগুলি বাঁশীর ছিদ্রে দিয়ে অত্যন্ত মধুর সুরে বাজাচ্ছেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান (২)

কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গন। চতুর্দিকে বীরেরা যুদ্ধের জন্য যথাযোগ্য স্থানে দণ্ডায়মান। সেখানে অর্জুনের পরম তেজোময় বিশাল রথ, তার বিশাল ধ্বজায় চাঁদ ও তারা চমকিত হচ্ছে। ধ্বজার ওপর মহাবীর হনুমান বিরাজমান। অনেক পতাকা উড়ছে। রথের অগ্রভাগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান। তাঁর নীল শ্যামবর্ণ দেহ, বীরবেশ, কবচ পরিহিত, দেহে পীত বসন ধারণ করেছেন, মুখমণ্ডল অত্যন্ত শান্ত। জ্ঞানের পরম দীপ্তিতে সর্ব অঙ্গ উদ্ভাসিত। বিশাল রক্তাভ নয়ন থেকে জ্ঞানের জ্যোতি বার হচ্ছে। এক হাতে ঘোড়ার লাগাম, অন্য হাত জ্ঞানমুদ্রায় সুশোভিত। অত্যন্ত শান্তি ও ধৈর্যসহকারে অর্জুনকে গীতার মহান উপদেশ প্রদান করছেন। ঠোঁটে মৃদু হাসি, নেত্র দ্বারা সংকেতে অর্জুনের প্রশ্নের সমাধান করছেন।

সম্বন্ধ—উপরোক্ত প্রকারে করা ধ্যানযোগের ফল জানাচ্ছেন—

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি॥ ১৫

সংযতচিত্ত যোগী এইভাবে আত্মাকে নিরন্তর পরমেশ্বররূপ আমাতে সমাহিত করলে আমাতে অবস্থিত পরমানন্দের পরাকাষ্ঠারূপ শান্তি প্রাপ্ত হন ॥ ১৫

প্রশ্ন—এখানে '**যোগী**'র সঙ্গে '**নিয়তমানসঃ**' বিশেষণ ব্যবহারের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যার মন—অন্তঃকরণ ভালোভাবে বশীভূত হয়েছে, তাকে বলা হয় 'নিয়তমানস'। এরূপ সাধকই উপরোক্ত প্রকারে ধ্যানযোগের সাধন করতে সক্ষম, এই কথা বোঝাবার জন্য '**যোগী**'র সঙ্গে '**নিয়তমানসঃ**' বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—এইভাবে আত্মাকে নিরন্তর পরমেশ্বরের স্বরূপে লাগানো কাকে বলে ?

উত্তর—উপরোক্ত প্রকারে মন-বুদ্ধির দ্বারা নিরন্তর তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে ভগবানের স্বরূপ চিন্তা করা এবং তাতে অটলভাবে তন্ময় হয়ে যাওয়াই হল আত্মাকে পরমেশ্বরের স্বরূপে সমাহিত করা।

প্রশ্ন—'আমাতে অবস্থানকারী পরমানন্দের পরাকাষ্ঠারূপ শান্তি লাভ করে' এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এ হল সেই শান্তির বর্ণনা যাকে নৈষ্ঠিকী শান্তি (৫।১২), শাশ্বতী শান্তি (৯।৩১) ও পরাশান্তি (৫।১২) বলা হয়, একেই পরমেশ্বর প্রাপ্তি, পরম দিব্য পুরুষ প্রাপ্তি, পরম গতির প্রাপ্তি ইত্যাদি নামে বর্ণনা করা হয়। এই শান্তি অদ্বিতীয় অনন্ত আনন্দের অবধি এবং এটি পরম দয়ালু, পরম সুহৃদ, আনন্দ নিধি, আনন্দ স্বরূপ ভগবানে নিত্য-নিরন্তর অচল এবং অটলভাবে নিবাস করে। ধ্যানযোগের সাধক এই শান্তি লাভ করেন।

সম্বন্ধ—ধ্যানযোগের প্রকার ও ফল বলা হয়েছে ; এবার ধ্যানযোগের জন্য উপযোগী, আহার, বিহার ও শয়নাদির নিয়ম কী প্রকার হওয়া উচিত এ জানার আকাঙ্ক্ষায় ভগবান দুটি শ্লোকে তা বলেছেন—

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতি স্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন॥ ১৬

হে অর্জুন ! এই যোগ, যাঁরা অত্যধিক আহার করেন অথবা যাঁরা একান্ত অনাহারী, যাঁরা অতিশয় নিদ্রালু, অথবা অত্যন্ত জাগরণশীল, তাঁদের দ্বারা সিদ্ধ হয় না ॥ ১৬

প্রশ্ন—এখানে '**যোগ**' শব্দ কীসের বাচক ?

উত্তর—ঈশ্বর লাভের যে কয়টি উপায় আছে, তার সবকটিকেই '**যোগ**' বলে। কিন্তু এখানে 'ধ্যানযোগে'র প্রসঙ্গ, তাই এখানে '**যোগ**' শব্দটি সেই 'ধ্যানযোগে'র বাচক বলে বুঝতে হবে—যা সমস্ত দুঃখের সর্বতোভাবে নাশ করে পরমানন্দ ও পরম শান্তির সমুদ্র পরমেশ্বরকে লাভ করিয়ে দেয়।

প্রশ্ন—অতি আহারকারী এবং একেবারে অনাহারীদের ধ্যানযোগ কেন সিদ্ধ হয় না ?

উত্তর—জোর করে বেশি খেলে নিদ্রা ও আলস্য বৃদ্ধি পায় ; সেইসঙ্গে হজম শক্তির বেশি খেলে, পেটে যাওয়া অন্ন নানাপ্রকার রোগ উৎপন্ন করে। এর বিপরীত যে অন্নত্যাগ করে উপবাস করতে থাকে, তার ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মনের শক্তি অত্যন্ত হ্রাস হয়ে যায় ; ফলে সে আসনে স্থিরভাবে বসতেও পারে না এবং পরমেশ্বরের স্বরূপে মনও লাগাতে পারে না। এইভাবে ধ্যানে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। সেইজন্য ধ্যানযোগীর প্রয়োজনের অধিক এবং হজম শক্তির বেশি আহার করা উচিত নয় আবার

একেবারে অনাহারেও থাকা উচিত নয়।

প্রশ্ন—অতিশয় নিদ্রালু এবং সদা জাগ্রত থাকা ব্যক্তির ধ্যানযোগ সিদ্ধ হয় না, এর কী কারণ ?

উত্তর—উপযুক্ত মাত্রায় নিদ্রা গেলে তাতে ক্লান্তি দূর হয়ে শরীরে তাজাভাব আসে ; কিন্তু সেই নিদ্রাই যদি প্রয়োজনের অধিক হয়ে যায়, তাতে তমোগুণ বৃদ্ধি পায়, অনবরত আলস্য ঘিরে থাকে এবং স্থির হয়ে বসতে কষ্ট হয়। তাছাড়া অধিক নিদ্রাতে মানব-জীবনের অমূল্য সময় তো নষ্ট হয়ই। সেইরূপ সর্বদা জাগ্রত থাকলে ক্লান্তি বিরাজ করে, কখনও তাজাভাব আসে না। শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, শিথিল হয়ে যায়, শরীরে নানাপ্রকার ব্যাধি উৎপন্ন হয় ও সবসময় নিদ্রা ও আলস্য বিঘ্ন ঘটায়। এইভাবে বেশি ঘুমানো ও বেশি জেগে থাকা, দুটিই ধ্যানযোগের সাধনায় বিঘ্নদায়ক। সুতরাং ধ্যানযোগীর যাতে শরীর সুস্থ থাকে ও ধ্যানযোগের সাধনে বিঘ্ন উপস্থিত না হয়—সেই উদ্দেশ্যে নিজ শারীরিক স্থিতি, প্রকৃতি, স্বাস্থ্য ও অবস্থার দিকে নজর রেখে অধিক নিদ্রা বা অধিক জাগরণশীল হওয়া উচিত নয়।

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥ ১৭

দুঃখনাশক এই যোগ নিয়মিত আহার-বিহারকারী, কর্মে যথাযোগ্য চেষ্টাকারী এবং নিয়মিত নিদ্রা ও জাগরণশীলেরই সিদ্ধ হয় ॥ ১৭

প্রশ্ন—যুক্ত আহার-বিহারকারী কাদের বলা হয় ?

উত্তর—খাদ্যাদি বস্তুর নাম আহার এবং চলা-ফেরার ক্রিয়াকে বলা হয় বিহার। এই দুটি যার যথাযথভাবে ও উচিত পরিমাণে হয়, তাকে বলা হয় যুক্ত আহার-বিহারকারী। খাওয়া-দাওয়ার বস্তু এমন হওয়া উচিত যা নিজ বর্ণ, আশ্রমধর্ম অনুসারে সত্য ও ন্যায়পথে উপার্জিত, শাস্ত্রানুকূল, সাত্ত্বিক হয় (১৭।৮), রজোগুণ ও তমোগুণ বৃদ্ধিকারী না হয়, পবিত্র হয়, নিজ প্রকৃতি, স্থিতি, রুচির প্রতিকূল না হয় এবং যোগসাধনে হিতকর ও আবশ্যক হয়। তেমনই ঘোরাফেরা ততটাই করা উচিত যতটা নিজের জন্য প্রয়োজন ও হিতকর হয়।

এরূপ নিয়মিত ও উচিত আহার-বিহার দ্বারা শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পায় এবং তাতে নির্মলতা, প্রসন্নতা ও চৈতন্যের বৃদ্ধি হয়, যাতে ধ্যানযোগ সহজে সিদ্ধ হয়।

প্রশ্ন—কর্মে 'যুক্ত চেষ্টা' করার ভাবার্থ কী ?

উত্তর—বর্ণ, আশ্রম, অবস্থা, অবস্থিতি ও পরিবেশ ইত্যাদি অনুসারে যার জন্য শাস্ত্রে যে কর্তব্যকর্ম বলা হয়েছে, তারই নাম কর্ম। সেই কর্ম শাস্ত্রোচিতভাবে এবং উচিত মাত্রায় যথাযোগ্য করাই কর্মে যথোপযুক্ত চেষ্টা করা। যেমন ঈশ্বর-ভক্তি, দেবপূজা, দীন-দুঃখীর সেবা, মাতা-পিতা, আচার্য প্রমুখ গুরুজনদের পূজা, যজ্ঞ, দান, তপ ও জীবিকা সম্বন্ধীয় কর্ম অর্থাৎ শিক্ষা, পঠন-পাঠন, ব্যবসায়াদি কর্ম এবং শৌচ-স্নানাদি ক্রিয়া—এ সকল কর্ম করা উচিত, যা শাস্ত্রবিহিত, সাধুসম্মত, কারো অহিতকারী নয়, স্বাবলম্বনের সহায়ক, কারোকে কষ্টপ্রদানকারী নয়, কারো ওপর ভার প্রদানকারী নয় এবং যা ধ্যানযোগের সহায়ক। এই কর্মের পরিমাণও ততটাই হওয়া উচিত, যাতে ন্যায়পূর্বক শরীর-নির্বাহ হতে পারে এবং ধ্যানযোগের জন্যও প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যেতে পারে। এরূপ হলে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন সুস্থ থাকে এবং ধ্যানযোগ সহজেই সিদ্ধ হয়।

প্রশ্ন—যুক্ত নিদ্রা ও জাগরণ কী ?

উত্তর—দিবসকালে জেগে থাকা, রাত্রিকালে প্রথম ও শেষপ্রহরে[১] জাগা আর মধ্যের দুই প্রহরে নিদ্রা—সাধারণতঃ একেই নিদ্রা-জাগরণ মানা হয়। তবুও এমন নিয়ম নেই যে সকলকেই এর মধ্যে ৬ ঘণ্টা নিদ্রা যেতেই হবে। ধ্যানযোগীর নিজ প্রকৃতি ও শরীরের স্থিতির

[১]তিন ঘণ্টা সময়কে এক 'প্রহর' বলা হয়।

অনুকূল ব্যবস্থা করা উচিত। রাত্রে চার-পাঁচ ঘণ্টা শুলেই যদি নিদ্রা সম্পূর্ণ হয়, ধ্যানের সময় নিদ্রা বা আলস্য না আসে ও স্বাস্থ্যে কোনো গণ্ডগোল না হয় তাহলে ছঘণ্টা না ঘুমিয়ে পাঁচ বা চার ঘণ্টা নিদ্রা যাওয়া উচিত।

'যুক্ত' শব্দের এই ভাবার্থ যে ; আহার-বিহার, কর্ম, নিদ্রা, জাগরণ যেন শাস্ত্রের প্রতিকূল না হয় এবং ততটুকু মাত্রাতে হয় যা তার প্রকৃতি, স্বাস্থ্য ও রুচির উপযুক্ত ও আবশ্যক হয়।

প্রশ্ন—'যোগ'-এর সঙ্গে **'দুঃখহা'** বিশেষণ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'ধ্যানযোগ' সিদ্ধ হলে ধ্যানযোগীর পরমানন্দ ও পরম শান্তির অনন্ত সাগর পরমেশ্বর প্রাপ্তি হয়, যাতে তাঁর সম্পূর্ণ দুঃখ কারণসহ চিরতরে বিনষ্ট হয়ে যায়। তখন তাঁকে আর কখনও ভ্রমবশতঃ জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার-দুঃখের সম্মুখীন হতে হয় না বা তাঁর কখনও স্বপ্নেও চিন্তা, শোক, ভয়, উদ্বেগ ইত্যাদি হয় না। তিনি চিরতরে আনন্দের মহাপ্রশান্তসাগরে নিমগ্ন হন। সমূলে সম্পূর্ণরূপে দুঃখের নাশ হওয়ার ফলনির্দেশ করার জন্যই 'যোগ'-এর সঙ্গে **'দুঃখহা'** বিশেষণ প্রযুক্ত হয়েছে।

সম্বন্ধ—ধ্যানযোগের উপযোগী আহার-বিহার ইত্যাদি নিয়মের বর্ণনা করার পর, এবার নির্গুণ-নিরাকারের ধ্যানযোগীর অন্তিম অবস্থার লক্ষণ জানাচ্ছেন—

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা।। ১৮

একান্ত বশীভূত চিত্ত যখন পরমাত্মাতে যথাযথভাবে অবস্থান করে, তখন ভোগে সম্পূর্ণ আকাঙ্ক্ষারহিত সেই পুরুষকে যোগযুক্ত বলা হয় ।। ১৮

প্রশ্ন—'চিত্তম্'-এর সঙ্গে 'বিনিয়তম্' বিশেষণ দেওয়ার প্রয়োজন কী ? তার পরমাত্মাতে যথাযথভাবে অবস্থান করা কাকে বলে ?

উত্তর—ভালোভাবে বশীভূত চিত্তই পরমাত্মাতে অটলভাবে স্থিত হতে পারে, এই কথা বোঝাবার জন্য **'বিনিয়তম্'** বিশেষণ প্রযুক্ত হয়েছে। এরূপ চিত্তের প্রমাদ ও আলস্য, বিক্ষেপ থেকে চিরতরে রহিত হয়ে একমাত্র পরমাত্মাতেই নিশ্চলভাবে স্থিত হওয়া—এক পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কোনো বস্তুর কিছুমাত্র স্মৃতি না থাকা—এই হল তার পরমাত্মাতে যথাযথভাবে স্থিত হওয়া।

প্রশ্ন—সম্পূর্ণ ভোগে স্পৃহারহিত হওয়া কাকে বলে ?

উত্তর—পরমশান্তি ও পরমানন্দের মহাসমুদ্র একমাত্র পরমাত্মাতেই অনন্য স্থিতি হওয়ায় এবং ইহলোক ও পরলোকের অনিত্য, ক্ষণিক ও বিনাশশীল সমস্ত ভোগে সর্বতোভাবে বৈরাগ্য হওয়ায় কোনো জাগতিক বস্তুতে বিন্দুমাত্র প্রয়োজন বা আকাঙ্ক্ষা না থাকা—একেই বলা হয় সম্পূর্ণ ভোগে স্পৃহারহিত হওয়া।

প্রশ্ন—'যুক্তঃ' পদটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে **'যুক্ত'** পদ ধ্যানযোগের পূর্ণ স্থিতির বোধক। অভিপ্রায় হল যে সাধন করতে করতে যোগীর মধ্যে যখন উপরোক্ত দুটি লক্ষণ ভালোমতো প্রকটিত হয়, তখন বুঝতে হবে যে সেই ধ্যানযোগীর অন্তিম স্থিতি লাভ হয়েছে।

সম্বন্ধ—বশীভূত চিত্ত ধ্যানকালে যখন একমাত্র পরমাত্মাতেই অচলভাবে স্থিত হয়, তখন তাঁর চিত্তের কীরূপ অবস্থা হয়, তা জানার আকাঙ্ক্ষা হওয়ায় বলেছেন—

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥ ১৯

যেমন বায়ুবিহীন (স্পন্দনরহিত) স্থানে প্রদীপ চঞ্চল হয় না, তেমনই পরমাত্মার ধ্যানে সংযতচিত্ত যোগীর চিত্তের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে ॥ ১৯

প্রশ্ন—এখানে 'দীপ' শব্দ কিসের বাচক এবং নিশ্চলতার ভাব দেখানোর জন্য পর্বতাদি অচল পদার্থের উপমা না দিয়ে সংযতচিত্তের ক্ষেত্রে প্রদীপের উদাহরণ দেওয়ার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে 'দীপ' শব্দটি প্রজ্বলিত দীপশিখার বাচক। পর্বতাদি পদার্থ প্রকাশহীন এবং স্বভাবতঃ অচল, তাই তাদের সঙ্গে চিত্তের সমানভাব নেই। কিন্তু প্রদীপ চিত্তের ন্যায় প্রকাশমান ও চঞ্চল, তাই তার সঙ্গে মনের সমানভাব আছে। যেমন গতিশীল বায়ুর স্পর্শ না হলে দীপশিখা নড়ে-চড়ে না, তেমনই বশীভূত চিত্তও ধ্যানকালে সর্বভাবে সুরক্ষিত হয়ে চঞ্চল হয় না। সেটিও দীপশিখার ন্যায় সমভাবে অবিচল প্রকাশিত হতে থাকে। তাই পর্বতাদি প্রকাশরহিত অচল পদার্থের উদাহরণ না দিয়ে প্রদীপের উপমা দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন—চিত্তের সঙ্গে 'যত' শব্দ যুক্ত না করে কেবল 'চিত্তস্য' বললেও একই অর্থ হতে পারত ; তাহলে 'যতচিত্তস্য' পদটি প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—বিজিতচিত্তই এইভাবে পরমাত্মার স্বরূপে অচলভাবে স্থির থাকতে পারে, বশীভূত না হলে থাকতে পারে না—এই কথা বোঝাবার জন্য এখানে 'যত' শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে।

সম্বন্ধ—এইভাবে ধ্যানযোগের অন্তিম স্থিতিপ্রাপ্ত পুরুষের এবং তাঁর জয় করা চিত্তের লক্ষণ বলার পর, এবার তিনটি শ্লোকে ধ্যানযোগের সাহায্যে সচ্চিদানন্দ পরমাত্মাকে লাভ করা ব্যক্তির স্থিতি বর্ণনা করেছেন—

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০

যোগ অভ্যাসের দ্বারা নিরুদ্ধ চিত্ত যে অবস্থায় নিবৃত্ত হয় এবং যে অবস্থায় পরমাত্মার ধ্যানের ফলে শুদ্ধ, সূক্ষ্ম বুদ্ধির সাহায্যে পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করে যোগী পরমাত্মাতে পরিতুষ্ট হন ॥ ২০

প্রশ্ন—'যোগসেবা' শব্দ কীসের বাচক এবং যোগসেবার দ্বারা হওয়া 'নিরুদ্ধ' চিত্তের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ধ্যানযোগের অভ্যাসের নাম 'যোগসেবা'। সেই ধ্যানযোগের অভ্যাস করতে করতে চিত্ত যখন একমাত্র পরমাত্মাতেই ভালোভাবে স্থিত হয়, তখন তাকে বলা হয় 'নিরুদ্ধ'।

প্রশ্ন—এইভাবে পরমাত্মার স্বরূপে নিরুদ্ধ হওয়া, চিত্তের নিবৃত্ত হওয়া বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যোগীর চিত্ত যখন পরমাত্মার স্বরূপে সর্বপ্রকারে নিরুদ্ধ হয়ে যায়, তখন তাঁর চিত্ত সংসার থেকে পুরোপুরি নিবৃত্ত হয়ে যায়, তাঁর চিত্তে তখন সংসারের জন্য আর কোনো স্থানই থাকে না। যদিও লোকদৃষ্টিতে তাঁর চিত্ত সমাধির সময়ে সংসারে নিবৃত্ত ও ব্যবহারকালে সংসারের চিন্তা করছেন বলে প্রতীত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর সংসারের সঙ্গে কোনো প্রকার সম্বন্ধ থাকে না—এই হল সর্বদার জন্য তাঁর চিত্তের নিবৃত্ত হওয়া।

প্রশ্ন—এখানে 'যত্র' পদটি কীসের বাচক ?

উত্তর—যে অবস্থায় ধ্যানযোগের সাধকের পরমাত্মার সঙ্গে সংযোগ ঘটে, অর্থাৎ তাঁর পরমাত্মার প্রত্যক্ষ দর্শন হয় ও সংসার থেকে তাঁর সম্বন্ধ চিরতরে দূর হয় এবং তেইশতম শ্লোকে ভগবান যার নাম

'যোগ' বলেছেন, সেই অবস্থাবিশেষের বাচক এই 'যত্র' পদটি।

প্রশ্ন—এখানে 'এব'র কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—'এব'র প্রয়োগ এখানে পরমাত্মদর্শনজনিত আনন্দের অতিরিক্ত অন্য জাগতিক সন্তোষের হেতু নিরাকরণ করার জন্য করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে পরমানন্দ এবং পরমশান্তির সমুদ্র পরমাত্মার সাক্ষাৎলাভ হলে যোগী সদাসর্বদা সেই আনন্দে মগ্ন থাকেন, তাঁর কোনও প্রকারের সাংসারিক সুখের কিছুমাত্রও প্রয়োজনীয়তা থাকে না।

প্রশ্ন—যে ধ্যানে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হয়, সেই ধ্যানের অভ্যাস কী করে করা উচিত ?

উত্তর—পূর্ব কথানুসারে একান্ত স্থানে আসনে বসে মনের সমস্ত সংকল্প ত্যাগ করে এইভাবে ধারণা করা উচিত—

এক বিজ্ঞান—আনন্দঘন পূর্ণব্রহ্মই বিরাজিত। তিনি ব্যতীত কোনো বস্তু নেই-ই, একমাত্র তিনিই পরিপূর্ণ। তাঁর এই জ্ঞানও তাঁরই, কারণ তিনি জ্ঞানস্বরূপ। তিনি সনাতন, নির্বিকার, অসীম, অপার, অনন্ত, অবিকল ও অনবদ্য। মন, বুদ্ধি, অহংকার, দ্রষ্টা, দর্শন, দৃশ্য ইত্যাদি যা কিছু আছে, সব সেই ব্রহ্মাতেই আরোপিত এবং বস্তুতঃ ব্রহ্মস্বরূপই। তিনি আনন্দময় এবং অবর্ণনীয়। তাঁর সেই আনন্দময় স্বরূপও আনন্দময়। তিনি আনন্দ-স্বরূপ পূর্ণ, নিত্য, সনাতন, অজ, অবিনাশী, পরম, চরম, সৎ, চেতন, বিজ্ঞানময়, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব, অনাময়, বোধময়, অনন্ত ও শান্ত। এইভাবে তাঁর আনন্দ-স্বরূপ চিন্তা করে বারংবার এরূপ দৃঢ় ধারণা করতে থাকা উচিত যে সেই আনন্দস্বরূপের অতিরিক্ত আর কিছুই নেই। যদি কোনো সংকল্প জাগ্রত হয়, তাহলে তা আনন্দময় থেকেই উত্থিত এবং তা আনন্দময় মনে করে আনন্দময়েই বিলীন হয় মনে করা উচিত। এইরূপ ধারণা করতে করতে যখন সব সংকল্প আনন্দময় বোধস্বরূপ পরমাত্মাতে বিলীন হয়ে যায় ও এক আনন্দঘন পরমাত্মার অতিরিক্ত কোনো সংকল্পেরই অস্তিত্ব না থাকে, তখন সাধকের আনন্দময় পরমাত্মাতে অচল স্থিতি হয়ে যায়। এইরূপ নিত্য-নিয়মিত ধ্যান করতে করতে নিজের এবং সংসারের সমস্ত অস্তিত্ব যখন ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যায়, যখন সব কিছুই পরমানন্দ এবং পরমশান্তিস্বরূপ ব্রহ্ম হয়ে ওঠে, তখন সেই কালে সাধকের সহজেই পরমাত্মার বাস্তবিক সাক্ষাৎকার হয়ে যায়।

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥ ২১

ইন্দ্রিয়াদির অতীত, কেবল শুদ্ধ ও সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণযোগ্য যে অনন্ত আনন্দ আছে, এই অবস্থায় যোগী তা অনুভব করেন এবং সেই অবস্থায় স্থিত যোগী কখনই আর পরমাত্মস্বরূপ থেকে বিচলিত হন না॥ ২১

প্রশ্ন—এখানে সুখের সঙ্গে **'আত্যন্তিকম্'** **'অতীন্দ্রিয়ম্'** ও **'বুদ্ধিগ্রাহ্যম্'** বিশেষণ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—অষ্টাদশ অধ্যায়ের ছত্রিশতম থেকে উনচল্লিশতম শ্লোক পর্যন্ত যে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, তিন প্রকারের সুখের বর্ণনা আছে, তার থেকে এই পরমাত্মস্বরূপ সুখের অত্যন্ত বিশিষ্টতা দেখাবার জন্যই উপরোক্ত বিশেষণ দেওয়া হয়েছে। পরমাত্মস্বরূপ সুখ সাংসারিক সুখের ন্যায় ক্ষণিক, বিনাশশীল, দুঃখের হেতু ও দুঃখমিশ্রিত হয় না। তা সাত্ত্বিক সুখের থেকেও মহান ও বিশিষ্ট, সর্বদা একরস ও নিত্য ; কারণ তা পরমাত্মারই স্বরূপ, তাঁর থেকে পৃথক অন্য কোনো পদার্থ নেই। এটি লক্ষ্য করানোর জন্য **'আত্যন্তিকম্'** বিশেষণ প্রযুক্ত হয়েছে। এই সুখ বিষয়জনিত রাজস সুখের ন্যায় ইন্দ্রিয়ভোগ্য নয়। সেই ইন্দ্রিয়াতীত পরব্রহ্ম পরমাত্মাকেই এখানে সুখের নামে অভিহিত করা হয়েছে—এই ভাব দেখাবার জন্য **'অতীন্দ্রিয়ম্'** বিশেষণ দেওয়া হয়েছে। সেই সুখ স্বয়ংই নিত্য জ্ঞানস্বরূপ। মায়ার

সীমা থেকে সর্বতোভাবে অতীত হওয়ায় বুদ্ধি এখান পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, তবুও যেমন নির্মল স্বচ্ছদর্পণে আকাশের প্রতিবিম্ব পড়ে, তেমনই ভজন-ধ্যান ও বিবেক-বৈরাগ্যের অভ্যাসে অচল, সূক্ষ্ম ও শুদ্ধ বুদ্ধিতে সেই সুখের প্রতিবিম্ব পড়ে। তাই তাকে বুদ্ধিগ্রাহ্য বলা হয়েছে।

পরমাত্মার ধ্যানের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া সাত্ত্বিক সুখও ইন্দ্রিয়াদির অতীত, বুদ্ধিগ্রাহ্য ও অক্ষয় সুখের হেতু হওয়ায় অন্য সাংসারিক সুখের থেকে অত্যন্ত বিশিষ্ট। কিন্তু তা শুধু ধ্যানের সময়ই থাকে, সর্বদা একরস থাকে না এবং তা চিত্তেরই এক বিশেষ অবস্থা হয়, তাই তাকে 'আত্যন্তিক' বা 'অক্ষয় সুখ' বলা যায় না। পরমাত্মার স্বরূপভূত এই সুখ সেই ধ্যানজনিত সুখেরই ফল। অতএব এটি তার থেকে অত্যন্ত বিশিষ্ট। এইরূপ তিনটি বিশেষণ প্রয়োগ করে এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে, সাত্ত্বিক সুখের ন্যায় এই সুখ অনুভবে আসার নয়। এটি ধ্যাতা, ধ্যান ও ধ্যেয়ের ঐক্য হলে স্বতঃই প্রকটিত হওয়া পরমাত্মার স্বরূপ।

প্রশ্ন—'তত্ত্ব হতে বিচলিত না হওয়া'র তাৎপর্য কী এবং এখানে **'এব'** কথাটির প্রয়োগ কী অভিপ্রায়ে করা হয়েছে ?

উত্তর—'তত্ত্ব' শব্দটি পরমাত্মার স্বরূপের বাচক এবং তার থেকে কখনো পৃথক না হওয়াই—বিচলিত না হওয়া। **'এব'** দ্বারা এই ভাব পরিস্ফুট হয়েছে যে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হলে যোগীর তাতে চিরকালের মতো অটল স্থিতি হয়ে যায় এবং সে আর কখনো কোনো অবস্থাতেই, কোনো কারণে, পরমাত্মা থেকে বিচ্যুত হয় না।

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥ ২২

পরমাত্মার প্রাপ্তিরূপ লাভ প্রাপ্ত করে অন্য কিছুকে যোগী তার থেকে বেশি লাভজনক মনে করেন না এবং পরমাত্মপ্রাপ্তিরূপ সেই অবস্থায় স্থিত হয়ে মহাদুঃখেও বিচলিত হন না॥ ২২

প্রশ্ন—এখানে **'যম্'** পদ কীসের বাচক এবং তা প্রাপ্ত করার পর অন্য কোনো লাভকে তার অধিক বলে মনে করেন না, এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—পরবর্তী শ্লোকে যে দুঃখ সংযোগ-বিয়োগের কথা বলা হয়েছে, সেই যোগের নামে কথিত পরমাত্ম-সাক্ষাৎকাররূপ অবস্থাবিশেষের বাচক এই **'যম্'** পদটি। এই অবস্থায় যোগীর পরমানন্দ এবং পরমশান্তির নিধান ঈশ্বর লাভ হলে তিনি পূর্ণকাম হয়ে যান। তার দৃষ্টিতে ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত ভোগ, ত্রিলোকের রাজ্য ও ঐশ্বর্য, বিশ্বব্যাপী মান-মর্যাদা ইত্যাদি যত সাংসারিক সুখের বস্তু থাকে, সে সবই ক্ষণভঙ্গুর, অনিত্য, নীরস, হেয়, তুচ্ছ ও নগণ্য হয়ে যায়। তাই তিনি জগতের কোনো বস্তুই প্রাপ্ত করার যোগ্য মনে করেন না, অতএব ততোধিক মনে করার প্রশ্নই ওঠে না।

প্রশ্ন— অত্যন্ত বড় দুঃখেও বিচলিত হন না, এর ভাবার্থ কী ?

উত্তর—ঈশ্বরপ্রাপ্ত যোগীর যেমন বড় বড় ভোগ ও ঐশ্বর্য রসহীন এবং তুচ্ছ মনে হয় আর তিনি সেগুলি পাবার আকাঙ্ক্ষাও করেন না, প্রাপ্ত না হলে বা নষ্ট হয়ে গেলেও যেমন তিনি পরোয়া করেন না, নিজ স্থিতি থেকে একটুও বিচলিত হন না, তেমনই মহাদুঃখ প্রাপ্তিতেও তিনি অবিচলিত থাকেন। এখানে **'দুঃখেন'**র সঙ্গে **'গুরুণা'** বিশেষণ দিয়ে এবং **'অপি'** প্রয়োগ করে ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে সাধারণ দুঃখের তো কোনো ব্যাপার নেই, তা তো ধৈর্যশীল, তিতিক্ষু ব্যক্তিও সহ্য করতে পারে, কিন্তু এই স্থিতিপ্রাপ্ত যোগী অত্যন্ত ভয়ানক, অসহনীয় দুঃখেও নিজ স্থিতিতে সর্বদা অটল, অচল থাকেন। অস্ত্রের আঘাতে অঙ্গচ্ছেদ হওয়া, অত্যন্ত দুঃসহ গরম-শীত, বর্ষার সম্মুখীন হওয়া, অতি দুঃসহ রোগজনিত পীড়া, প্রিয় থেকে প্রিয় ব্যক্তির হঠাৎ বিয়োগ

এবং সংসারে অকারণে মহাঅপমান, তিরস্কার, নিন্দা ইত্যাদি যত মহাদুঃখের কারণ থাকে সব একসঙ্গে উপস্থিত হলেও তাঁকে তাঁর স্থিতি থেকে বিচলিত করতে পারে না। এর কারণ হল যে, পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হলে সেই যোগীর আর এই দেহের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকে না ; তা শুধু লোকদৃষ্টিতে তাঁর শরীর বলে মনে করা হয়। প্রারব্ধ অনুসারে তাঁর শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের সঙ্গে জাগতিক বস্তুর সংযোগ-বিয়োগ হয়ে থাকে—শীত-গ্রীষ্ম, মান-অপমান, স্তুতি-নিন্দা ইত্যাদি অনুকূল ও প্রতিকূল ভোগপদার্থের প্রাপ্তি ও বিনাশ হতে পারে ; কিন্তু সুখ-দুঃখের কোনো ভোক্তা না থাকায় তাঁর চিত্তে কখনো কোনো অবস্থাতে, কোনো নিমিত্তবশতঃ কোনোপ্রকার বিন্দুমাত্র বিকার হতে পারে না। পরমাত্মাতে তাঁর নিত্য অটলস্থিতি একই প্রকার থাকে।

সম্বন্ধ—কুড়ি, একুশ এবং বাইশতম শ্লোকে পরমাত্মার প্রাপ্তিরূপ যে স্থিতির মহত্ত্ব ও লক্ষণাদির বর্ণনা করা হয়েছে, এবার সেই স্থিতির নাম বলে তা লাভ করার জন্য প্রেরণা দিচ্ছেন—

তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা॥ ২৩

যা দুঃখরূপ সংসারের সংযোগরহিত, তাকেই বলা হয় যোগ, এটি জানা চাই। এই যোগ অধৈর্য না হয়ে অর্থাৎ ধৈর্য ও উৎসাহযুক্ত চিত্তে নিশ্চয়পূর্বক করা কর্তব্য ॥ ২৩

প্রশ্ন—দুঃখরূপ সংসারের সংযোগরহিত স্থিতি কী ? সেই স্থিতিপ্রাপ্ত যোগী কি সদা ধ্যানযোগে অবস্থান করেন ? তাঁর শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ দ্বারা জগতের কাজ হয় না ?

উত্তর—দুঃখরূপ সংসার থেকে চিরতরে সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়াই তাঁর সংযোগরহিত হওয়া। সেই অবস্থায় যোগীর শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন দ্বারা চলা, ফেরা, দেখা, শোনা বা মনন ও নিশ্চয় করা ইত্যাদি কার্য যে হয় না—তা নয়। তাঁর শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি দ্বারা প্রারব্ধানুসারে সকল কর্মই হয় ; কিন্তু তাঁর জ্ঞানে একমাত্র পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কিছু না থাকায় তাঁর সেই কর্মের সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে কোনো সম্বন্ধ থাকে না। তাঁর এই স্থিতি ধ্যানকালে ও ব্যুত্থানকালে সর্বদা একইভাবে থাকে।

প্রশ্ন—এখানে শুধু **'দুঃখবিয়োগম্'** বললেই কাজ হত, তাহলে **'দুঃখসংযোগবিয়োগম্'** বলে 'সংযোগ' শব্দটি অধিকন্তু জুড়ে দেবার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ অর্থাৎ দৃশ্যপ্রপঞ্চের সঙ্গে আত্মার যে অজ্ঞতাজনিত অনাদি সম্বন্ধ, সেটিই বারংবার জন্ম-মৃত্যুরূপ দুঃখপ্রাপ্তির মূল কারণ। তার বিনাশ হলেই দুঃখ চিরতরে দূর হয়ে যায়—এটি বোঝাবার জন্যই 'সংযোগ' শব্দটির প্রয়োগ করা হয়েছে।

পাতঞ্জল যোগদর্শনেও বলা হয়েছে—**'হেয়ং দুঃখমনাগতম্'** (২।১৬) 'ভবিষ্যতে প্রাপ্ত হওয়া জন্ম-মৃত্যুরূপ মহা-দুঃখের নাম 'হেয়'। **'দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয় হেতুঃ'** (২।১৭)। 'দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের সংযোগই হেয়র কারণ।' **'তস্য হেতুরবিদ্যা'** (২।২৪)। 'সেই সংযোগের কারণ অজ্ঞান।' **'তদভাবাৎ-সংযোগাভাবো হানং তদ্ দৃশেঃ কৈবল্যম্'** (২।২৫)। সেই (অবিদ্যার) অভাব (বিনাশ) দ্বারা দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগেরও অভাব (বিনাশ) হয় ; তারই নাম 'হান' (হেয়র ত্যাগ) এবং সেটিই দ্রষ্টার কৈবল্যরূপ স্থিতি।

প্রশ্ন—এখানে **'তম্'**-এর সঙ্গে 'যোগসংজ্ঞিতম্' বিশেষণ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—উপরের তিনটি শ্লোকে পরমাত্মার প্রাপ্তিরূপ যে অবস্থার মহত্ত্ব ও লক্ষণাদির বর্ণনা করা হয়েছে, তার নাম 'যোগ'—এই ভাব বোঝাবার জন্য **'তম্'**-এর সঙ্গে **'যোগসংজ্ঞিতম্'** বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে **'বিদ্যাৎ'** কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—**'বিদ্যাৎ'** কথাটির অভিপ্রায় হল যে

'যত্রোপরমতে চিত্তম্' (৬।২০) থেকে এই পর্যন্ত যে স্থিতির বর্ণনা করা হয়েছে, তা লাভ করার জন্য সিদ্ধ মহাত্মা পুরুষদের কাছে গিয়ে এবং শাস্ত্র অভ্যাস করে তার স্বরূপ, মহত্ত্ব ও সাধনের নিয়ম ভালোভাবে জানা উচিত।

প্রশ্ন—'অনির্বিণ্ণচেতসা' কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—সাধনের ফল প্রত্যক্ষ না হওয়ায় কিছু সাধন করার পর মনে যখন এরূপ ভাব আসে যে 'জানি না এই কাজ কতদিনে সম্পূর্ণ হবে, আমার দ্বারা করা সম্ভব কিনা'—একেই বলা হয় 'নির্বিণ্ণতা' অর্থাৎ সাধনের থেকে মন উঠে যাওয়া। এরূপ ভাবরহিত যে ধৈর্য ও উৎসাহযুক্ত চিত্ত হয়, তাকে বলা হয় 'অনির্বিণ্ণচেতসা' সুতরাং এর ভাবার্থ হল যে, সাধকের নিজ চিত্ত থেকে নির্বিণ্ণতা দোষ চিরতরে দূর করে দেওয়া উচিত। যোগসাধনায় অরুচি উৎপন্নকারী এবং ধৈর্য ও উৎসাহ কম করে দেয় যে ভাব, তা মনে আসতে দেওয়া উচিত নয়, তারপর সেই নিশ্চয়যুক্ত হয়ে সাধন করা উচিত।

প্রশ্ন—এখানে দৃঢ় নিশ্চয়যুক্ত হয়ে যোগসাধন করা উচিত, কথাটির ভবার্থ কী ?

উত্তর—'দৃঢ় নিশ্চয়' এখানে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার বাচক। অভিপ্রায় হল যে, যোগীর যোগসাধনায়, তার বিধানকারী শাস্ত্রে, আচার্যে এবং যোগসাধনের ফলে পূর্ণরূপে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রাখা উচিত এবং যোগসাধনকেই নিজ জীবনের প্রধান কর্তব্য মনে করে এবং পরমাত্মার প্রাপ্তিরূপ যোগসিদ্ধিকেই ধ্যেয় করে দৃঢ়তাপূর্বক তৎপরতার সঙ্গে তার সাধনে সংলগ্ন হয়ে যাওয়া উচিত।

সম্বন্ধ—ঈশ্বরপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্থিতিকে বলা হয় 'যোগ', একথা বলে তা প্রাপ্ত করাকে নিশ্চিত কর্তব্য বলা হয়েছে ; এবার দুটি শ্লোকে সেই স্থিতি প্রাপ্তির জন্য অভেদরূপে পরমাত্মার ধ্যানযোগের সাধন করার রীতি জানাচ্ছেন—

সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥ ২৪

সংকল্প থেকে উৎপন্ন সমস্ত কামনা নিঃশেষে ত্যাগ করে মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে সমস্ত বিষয় থেকে ভালোভাবে নিবৃত্ত করে—॥ ২৪

প্রশ্ন—এখানে কামনাগুলিকে সংকল্পজাত বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের বাষট্টিতম শ্লোকে বলা হয়েছে কামনার উৎপত্তি আসক্তি থেকে। এই পার্থক্যের কারণ কী ?

উত্তর—ওখানে সংকল্প থেকে আসক্তির এবং আসক্তি থেকে কামনার উৎপত্তি বলা হয়েছে। তাই সেখানেও মূল কারণ সংকল্পই। সুতরাং সেখানের এবং এখানের বক্তব্যে কোনোই পার্থক্য নেই।

প্রশ্ন—সমস্ত কামনা কী কী ? এবং তাকে নিঃশেষে ত্যাগ করা বলতে কী বুঝায় ?

উত্তর—ইহলোক ও পরলোকের ভোগের যতপ্রকার তীব্র, মধ্য বা মন্দ কামনা আছে, এখানে 'সর্বান্ কামান্' বাক্যটি সেই সবের বোধক। স্পৃহা, ইচ্ছা, তৃষ্ণা, আশা, বাসনা ইত্যাদি সবই কামনার নামান্তর ভেদ মাত্র এবং সেই কামনার উৎপত্তি সংকল্প থেকে হয় বলা হয়েছে, তাই 'আসক্তি'ও এটির অন্তর্গত।

সমস্ত কামনা নিঃশেষে ত্যাগ করার অর্থ হল—কোনো ভোগেই কোনো ভাবেই বিন্দুমাত্র বাসনা, আসক্তি, স্পৃহা, ইচ্ছা, লালসা, আশা বা তৃষ্ণা থাকতে না দেওয়া। বাসন থেকে ঘি বার করে নিলেও তাতে যেমন ঘিয়ের চকচকে ভাব থেকে যায় বা কৌটো থেকে কর্পূর, কেশর বা কস্তুরী বার করে নিলেও যেমন কৌটোতে গন্ধ থেকে যায়, তেমনই কামনা ত্যাগ করলেও তার সূক্ষ্ম অংশ বাকি থেকে যায়। সেই বাকি সূক্ষ্ম অংশও ত্যাগ করা অর্থাৎ কামনার নিঃশেষে ত্যাগ করা।

প্রশ্ন—মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে ভালোভাবে নিবৃত্ত

করার অর্থ কী ?

উত্তর— ইন্দ্রিয়ের স্বভাবই হল বিষয়াদিতে বিচরণ করা। কিন্তু সে কোনো বিষয়কে গ্রহণ করতে তখনই সক্ষম হয়, যখন মন তাকে সঙ্গ দেয়। মন যদি দুর্বল হয় তখন সে তাকে জোর করে নিজের দিকে আকর্ষণ করে রাখে। কিন্তু নির্মল এবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির সাহায্যে মনকে যখন একাগ্র করা যায়, তখন মনের সাহায্য না পাওয়ায় সে বিষয়-বিচরণে অসমর্থ হয়ে পড়ে। তাই একাদশ থেকে ত্রয়োদশতম শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে ধ্যানযোগের সাধনের জন্য আসনে উপবেশন করে যোগীর উচিত বিবেক ও বৈরাগ্যের সাহায্যে মনের দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণ বাহ্যবিষয় থেকে সর্বপ্রকারে চিরতরে সরিয়ে নেওয়া, কোনো ইন্দ্রিয়কে, কোনো বিষয়ে বিন্দুমাত্র যেতে না দিয়ে সেগুলি সর্বতোভাবে অন্তর্মুখী করে রাখা। একেই বলা হয় মনের দ্বারা ইন্দ্রিয় সমুদয়কে যথাযথভাবে নিবৃত্ত করা।

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ ২৫

ক্রমশঃ অভ্যাস করতে করতে নিবৃত্ত হবে এবং ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা মনকে পরমাত্মায় স্থাপন করে পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কিছুই চিন্তা করবে না ॥ ২৫

প্রশ্ন— ক্রমে ক্রমে নিবৃত্ত হওয়া ও ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা মনকে পরমাত্মায় স্থাপন করা কাকে বলে ?

উত্তর—আগের শ্লোকে মনের সাহায্যে ইন্দ্রিয়-সমূহকে বাহ্যবিষয় থেকে সর্বতোভাবে সরিয়ে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু মন যতক্ষণ বিষয়াদির চিন্তা করে, ততক্ষণ তা পরমাত্মাতে ভালোভাবে একাগ্র হতে পারে না বা ইন্দ্রিয়সমূহকেও যথাযথভাবে বিষয় থেকে নিবৃত্ত করতে পারে না। মনের অনাদিকালের অভ্যাস বিষয়চিন্তা করা, তাকে চির-অভ্যস্ত বিষয়-চিন্তা থেকে সরিয়ে পরমাত্মাতে স্থাপন করতে হয়। মনের স্বভাব হল তার যে বস্তুতে নিযুক্ত হবার অভ্যাস হয়ে যায়, তাতেই সে তদাকার হয়ে যায়, সহজে তার থেকে সরানো যায় না। তাকে সরানোর উপায় হল—আগের অভ্যাসের বিরুদ্ধে নতুনভাবে তীব্র অভ্যাস করা এবং তা থেকে কখনো না সরে গিয়ে, লক্ষ্যে দৃঢ়তার সঙ্গে অটল থেকে ধৈর্যশীল বুদ্ধির দ্বারা মনকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নতুন অভ্যাসে প্রতিষ্ঠিত করা। ধৈর্য ত্যাগ করলে বা শীঘ্র চেষ্টা করলে কাজ হয় না। বুদ্ধি যদি দৃঢ় থাকে এবং অভ্যাস বজায় থাকে, তাহলে কিছু সময়ের মধ্যেই মন আগের বিষয় থেকে নিবৃত্ত হয়ে নতুন বিষয়ে তদাকার হয়ে যাবে ; তখন তা আর সেইভাবে সরে যাবে না, যেমন এখন সে পূর্বের অভ্যাস থেকে সরে না। তাই ভগবান ক্রমে ক্রমে নিবৃত্ত হতে এবং ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা মনকে পরমাত্মাতে স্থির করার জন্য বলে এই ভাব দেখিয়েছেন যে, ছোট্ট শিশু যেমন হাতে কাঁচি বা ছুরি নিলে মা তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এবং প্রয়োজন হলে বকে-ধমকে তার হাত থেকে কাঁচি বা ছুরি ছিনিয়ে নেন, তেমনই বিবেক ও বৈরাগ্যযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা মনকে সাংসারিক ভোগের অনিত্যতা ক্ষণভঙ্গুরতা বুঝিয়ে এবং ভোগে আবদ্ধ হলে বন্ধন ও নরক যন্ত্রণার ভয় দেখিয়ে তাকে বিষয়চিন্তা থেকে সর্বতোভাবে নিবৃত্ত করা উচিত। একেই বলে ক্রমশঃ নিবৃত্ত হওয়া।

মন যে পর্যন্ত বিষয়চিন্তা সর্বতোভাবে ত্যাগ না করে সেই পর্যন্ত সাধকের উচিত, প্রতিদিন আসনে বসে প্রথমে ইন্দ্রিয়াদিকে বাহ্যবিষয় থেকে সরিয়ে এনে বুদ্ধির সাহায্যে মন থেকে ক্রমশঃ বিষয়চিন্তা দূর করতে সচেষ্ট হওয়া। সঙ্গে সঙ্গে ধৈর্যশীল বুদ্ধির দ্বারা মনকে পরমাত্মাতে সংলগ্ন করা উচিত। পরমাত্মার তত্ত্ব ও রহস্য না জানায় বুদ্ধিতে স্বাভাবিকভাবেই আসক্তি, সংশয় ও ভ্রম থাকে, তাই বুদ্ধি স্থির হয় না এবং ধৈর্যশীলও হয় না। এই বুদ্ধি নিজ প্রভাব বিস্তার করে মনকে পরমাত্মার ধ্যানে স্থির হয়ে থাকতে দেয় না। কিন্তু সৎসঙ্গ দ্বারা পরমাত্মার তত্ত্ব ও

রহস্য বুঝে বুদ্ধি যখন স্থির হয়ে যায়, তখন সে দৃশ্যবস্তুকে বিষয় না করে পরমাত্মাতেই রমণ করে। তখন তার কাছে একমাত্র পরমাত্মা ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। তখন সে তার মনকে ঠিকভাবে বিষয় থেকে সরিয়ে পরমাত্মার চিন্তায় নিযুক্ত করে ক্রমশঃ তাকে তদাকার করে তোলে। একেই বলা হয় ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা মনকে পরমাত্মাতে স্থাপন করা।

প্রশ্ন—পরমাত্মা ব্যতীত আর কিছুই চিন্তা করবে না—কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—মন যতক্ষণ পরমাত্মাতে নিরুদ্ধ হয়ে সর্বতোভাবে তদ্রূপ না হয় অর্থাৎ যতক্ষণ ঈশ্বর লাভ না হয়, ততক্ষণ মনের ধ্যেয় বস্তুতে (পরমাত্মাতে) নিরন্তর ব্যাপৃত থাকা নিশ্চিত নয়। তাই তীব্র অভ্যাস করা প্রয়োজন। সুতরাং এখানে ভগবানের এই ভাব প্রতীত হয় যে, সাধক যখন ধ্যানে বসবেন এবং অভ্যাসের দ্বারা যখন তাঁর মন পরমাত্মাতে স্থির হয়ে যাবে, তখন তাঁকে সাবধান থাকতে হবে যেন মন এক মুহূর্তের জন্যও পরমাত্মা থেকে চ্যুত হয়ে অন্য বিষয়ে যেতে না পারে। সাধকের এই সতর্কতা অভ্যাস দৃঢ় করাতে অত্যন্ত সহায়ক হয়। প্রতিদিন অভ্যাস করতে করতে যেমনই অভ্যাস বৃদ্ধি পাবে, তেমনই মনকে আরও সাবধানতার সঙ্গে কোথাও যেতে না দিয়ে বিশেষরূপে, বিশেষ সময় ধরে পরমাত্মাতে স্থির করে রাখবে।

প্রশ্ন—ধ্যানের সময় মনকে পরমাত্মার স্বরূপে কীভাবে স্থাপন করা যায় ?

উত্তর—পূর্বে বর্ণিত উপায়ে অভ্যাসরত সাধক একান্তে বসে ধ্যানের সময় মনকে সর্বতোভাবে নির্বিষয় করে একমাত্র পরমাত্মার স্বরূপে স্থাপন করার চেষ্টা করবে। মনে যে কোনো বস্তুর আভাস আসে, তাকে কল্পনামাত্র জেনে অবিলম্বে ত্যাগ করবে। এইভাবে চিত্তে স্ফুরিত বস্তুমাত্র ত্যাগ করে ক্রমশঃ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির অস্তিত্বও ত্যাগ করবে। সবকিছু ত্যাগ করতে করতে যখন সমস্ত দৃশ্য পদার্থ চিত্ত থেকে দূর হবে, তখন সকল অভাবের নিশ্চয়কারী একমাত্র বৃত্তি অবশিষ্ট থাকবে। এই বৃত্তি শুভ ও শুদ্ধ, কিন্তু দৃঢ় ধারণার সাহায্যে একেও অতিক্রম করতে হবে অথবা সমস্ত দৃশ্য-প্রপঞ্চের অভাব হলে এটি স্বতঃই শান্ত হয়ে যাবে ; এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে, সেটিই অচিন্ত্য তত্ত্ব। সেটি কেবল এবং সমস্ত উপাধিরহিত একাকী পরিপূর্ণ তত্ত্ব। তাকে কেউ বর্ণনা করতেও পারে না, চিন্তা করতেও পারে না। সুতরাং এইভাবে দৃশ্য-প্রপঞ্চ এবং শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও অহংকারের নাশ করে, বিনাশকারী বৃত্তিরও বিনাশ করে অচিন্ত্য তত্ত্বে স্থিত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত।

সম্বন্ধ—মনকে পরমাত্মাতে স্থির করে পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কিছু চিন্তা না করার কথা বলা হয়েছে ; কিন্তু যদি কোনো সাধকের চিত্ত পূর্বাভ্যাসবশতঃ জোর করে বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়, তাহলে কী করা উচিত, সেই জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেছেন—

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥ ২৬

এই অস্থির চঞ্চল মন যে যে শব্দাদি বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়, সেই সেই বিষয় থেকে সরিয়ে বারংবার তাকে পরমাত্মাতেই স্থিত করবেন ॥ ২৬

প্রশ্ন—এই শ্লোকটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—মন অত্যন্ত অস্থির ও চঞ্চল, এটি সহজে কোথাও স্থির হতে চায় না। নতুন অভ্যাস করলে সেটি বারবার সেখান থেকে সরে যায়। সাধক অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে মনকে পরমাত্মাতে স্থিত করতে সচেষ্ট হন। তিনি মনে করেন মন পরমাত্মাতে স্থিত হয়েছে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তিনি লক্ষ্য করেন যে মন কোথায় কত দূরে চলে গেছে তার হদিস নেই। তাই পূর্বের শ্লোকে বলা হয়েছে যে সাধকের সতর্ক থাকা উচিত এবং পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কোনো চিন্তা মনে আনতে দিতে নেই ; কিন্তু সতর্ক

থাকতে থাকতেও সামান্য সুযোগ পেলেই মনটি বেরিয়ে পালিয়ে যায়, এমনই পাল্লায় যে কিছুক্ষণ তো জানাই যায় না সে কখন কোথায় গেল। পরমাত্মাকে ছেড়ে বিষয়ের দিকে যাওয়ার আসল কারণ তো অজ্ঞতা, যার দ্বারা মোহগ্রস্ত হয়ে আনন্দ ও শান্তির অনন্ত সমুদ্র, সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাকে ছেড়ে অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর এবং দুঃখজনক বিষয়াদিতে সত্বর ছুটে গিয়ে মন তাতে রমণ করে। কিন্তু এটির চেয়ে অত্যন্ত গৌণ হলেও সাধনের দৃষ্টিতে প্রধান কারণ হল—'বিষয়-চিন্তার চিরকালীন অভ্যাস।' তাই ভগবান বলেছেন যে ধ্যানের সময় সাধক যখনই বুঝতে পারবেন যে মন অন্য বিষয়ে চলে গেছে, তখনই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে দৃঢ়তাসহ, কোনো ছাড় না দিয়ে তাকে তৎক্ষণাৎ ধরে এনে পরমাত্মাতে স্থিত করবেন। এইভাবে মনকে বারংবার বিষয় থেকে সরিয়ে এনে পরমাত্মাতে স্থিত করার অভ্যাস করবে। মন যতই অনুনয়-বিনয় করুক, যতই তোশামোদ করুক, যতই ভয়, লোভ, ভালোবাসা দেখাক, তাতে কর্ণপাত করবে না। একটু অসতর্ক হলেই, তার উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় মনের কথা শুনে তাকে সামান্য সময়ের জন্যও বিষয় চিন্তা করায় ছাড় দেওয়া যেন রোগীকে মোহবশতঃ কুপথ্য দেওয়া বা শিশুর হাতে ছুরি-কাঁচি দিয়ে তাকে মৃত্যুর মুখে সঁপে দেওয়ার সমান হয়। সাবধানতাই সাধনা। সাধক যদি এই অবস্থায় অসাবধান ও অশক্ত হয়ে পড়েন, তাহলে তাঁর ধ্যানযোগ সফল হয় না। সুতরাং তাঁকে খুব সাবধানে থাকতে হবে এবং মনকে বারংবার বিষয় থেকে সরিয়ে পরমাত্মাতে স্থিত করতে হবে।

প্রশ্ন—আগের শ্লোকে এবং এখানে, দুটিতেই 'আত্মা' শব্দের অর্থ 'পরমাত্মা' করা হয়েছে, এর কারণ কী ?

উত্তর—এটি আত্মা ও পরমাত্মার অভেদের প্রকরণ। এই বিষয় স্পষ্ট করার জন্য 'আত্মা' শব্দের অর্থ 'পরমাত্মা' করা হয়েছে।

সম্বন্ধ—চিত্তকে সব দিক থেকে সরিয়ে এক পরমাত্মাতেই স্থির করলে কী হবে, তাতে বলেছেন—

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥ ২৭

কারণ প্রশান্তচিত্ত, পাপরহিত এবং রজোগুণবৃত্তিশূন্য যোগী সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পরম আনন্দ লাভ করেন ॥ ২৭

প্রশ্ন—'**প্রশান্তমনসম্**' পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—বিবেক ও বৈরাগ্যের প্রভাবে বিষয়-চিন্তা ত্যাগ করে, চঞ্চলতা ও বিক্ষেপরহিত হয়ে যাঁর চিত্ত সর্বতোভাবে স্থির ও সুপ্রসন্ন হয়েছে এবং এর ফলস্বরূপ যাঁর পরমাত্মার স্বরূপে অচল স্থিতি লাভ হয়েছে, সেই যোগীকে বলে '**প্রশান্তমনাঃ**'।

প্রশ্ন—'**অকল্মষম্**' কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—মানুষকে অধোগতিতে নিয়ে যায় যে তমোগুণ এবং তমোগুণের কার্যরূপ প্রমাদ, আলস্য, অতি নিদ্রা, মোহ, দুর্গুণ, দুরাচার ইত্যাদি যতপ্রকার 'মল' রূপ দোষ আছে, সবগুলিকেই '**কল্মষ**' শব্দের অন্তর্গত ধরতে হবে। এই '**কল্মষ**' অর্থাৎ পাপ হতে যিনি সর্বতোভাবে রহিত, তিনিই '**অকল্মষ**'।

প্রশ্ন—এখানে '**অকল্মষম্**' পদের অর্থ যদি 'পাপ-কর্ম ও সকাম পুণ্যকর্ম' দুটি থেকেই রহিত বলে মনে করা হয়, তাহলে ক্ষতি কী ?

উত্তর—সকাম পুণ্যকর্মাদির নাশ '**শান্তরজসম্**' পদের অন্তর্গত, তাই '**অকল্মষম্**' পদের দ্বারা কেবল পাপকর্মের বিনাশ মনে করতে হবে।

প্রশ্ন—'**শান্তরজসম্**' পদটি কীসের বাচক ?

উত্তর—আসক্তি, স্পৃহা, কামনা, লোভ, তৃষ্ণা, সকাম কর্ম—এ সবই রজোগুণ থেকে উৎপন্ন হয় (১৪।৭, ১২) এবং এগুলি রজোগুণকে বাড়িয়ে তোলে। সুতরাং যে ব্যক্তি এই সব থেকে রহিত,

তারই বাচক **'শান্তরজসম্'** পদ। চাঞ্চল্যরূপ বিক্ষেপও রজোগুণের কাজ, কিন্তু তার বর্ণনা **'প্রশান্তমনসম্'** পদে এসেছে। তাই সেটি এখানে পুনর্বার বলা হয়নি।

প্রশ্ন—'ব্রহ্মভূতম্' পদের অর্থ কী ?

উত্তর—আমি দেহ নই, সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ম—এই রূপ অভ্যাস করতে করতে সাধকের সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাতে দৃঢ় স্থিতি লাভ হয়। এইরূপ অভিন্নভাবে ব্রহ্মে স্থিত পুরুষকে ব্রহ্মভূত বলা হয়।

প্রশ্ন—'ব্রহ্মভূতম্' পদটি সাধকের বাচক না সিদ্ধ পুরুষের ?

উত্তর—'ব্রহ্মভূতম্' পদটি উচ্চ শ্রেণীর অভেদ মার্গীয় সাধকের বাচক। এরূপ সাধকের রজোগুণ ও তমোগুণ শান্ত হয়ে গেলেও, তিনি সর্বতোভাবে গুণাদির অতীত হননি। নিজ দৃষ্টিতে তিনি ব্রহ্মের স্বরূপে স্থিত হলেও, বস্তুতঃ ব্রহ্মকে লাভ করেননি। এইভাবে ব্রহ্মের স্বরূপে দৃঢ় স্থিতি হলে শীঘ্রই তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে ব্রহ্মলাভ হয়। সেইজন্য পরবর্তী শ্লোকে এই স্থিতির ফল **'আত্যন্তিক সুখ প্রাপ্তি'** বলা হয়েছে। এই **'আত্যন্তিক সুখ প্রাপ্তি'**ই ব্রহ্ম প্রাপ্তি। পঞ্চম অধ্যায়ের চব্বিশতম শ্লোকেও এই অর্থে **'ব্রহ্মভূতঃ'** পদ ব্যবহৃত এবং সেখানে তার ফল **'নির্বাণ ব্রহ্ম প্রাপ্তি'** বলা হয়েছে। অষ্টাদশ অধ্যায়ের চুয়ান্নতম শ্লোকেও 'ব্রহ্মভূত' ব্যক্তিকে পরাভক্তি (তত্ত্বজ্ঞান)-এর প্রাপ্তি বলে তার ফলে পরমাত্মার প্রাপ্তি বলা হয়েছে (১৮।৫৫)। সুতরাং এখানে **'ব্রহ্মভূতম্'** পদটি সিদ্ধ পুরুষের বাচক নয়।

প্রশ্ন—'উত্তম সুখের প্রাপ্তি' কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—তমোগুণ ও রজোগুণের অতীত শুদ্ধ সত্ত্বে স্থিত সাধকের নিত্য বিজ্ঞানানন্দঘন পরমাত্মার ধ্যানে অভিন্নভাবে স্থিতি হলে তাঁর যে ধ্যানজনিত সাত্ত্বিক আনন্দ প্রাপ্তি হয়, তাকেই এখানে 'উত্তম সুখ' বলা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ের একুশতম শ্লোকের পূর্বার্ধে যাকে 'সুখ' বলা হয়েছে ও চব্বিশতম শ্লোকে যাকে 'অন্তঃসুখ' বলা হয়েছে, এখানে 'উত্তম সুখ' তারই পর্যায়বাচী।

সম্বন্ধ—পরমাত্মাকে যাঁরা অভেদরূপে ধ্যান করেন সেই ব্রহ্মভূত যোগীর স্থিতি জানিয়ে, এবার তার ফল জানাচ্ছেন—

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮

সেই পাপরহিত যোগী এইভাবে নিরন্তর আত্মাকে পরমাত্মায় সমাহিত করে সুখপূর্বক পরব্রহ্ম, পরমাত্মাকে লাভ করে অনন্ত আনন্দ অনুভব করেন ॥ ২৮

প্রশ্ন—'বিগতকল্মষঃ' বিশেষণের সঙ্গে এখানে 'যোগী' শব্দ কীসের বাচক ?

উত্তর—আগের শ্লোকে **'অকল্মষম্'**-এর যে অর্থ করা হয়েছে, সেই একই অর্থ হল **'বিগতকল্মষঃ'**এর। এরূপ পাপরহিত উচ্চশ্রেণীর সাধক, যিনি অভেদভাবে পরমাত্মার স্বরূপের ধ্যান করেন, তাঁকেই এখানে **'যোগী'** বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—আত্মাকে এইভাবে নিরন্তর পরমাত্মাতে সমাহিত করার কী ভাবার্থ ?

উত্তর—আগের পঁচিশতম শ্লোকে কথিত রীতিতে দৃশ্যচিন্তা থেকে রহিত হয়ে দৃঢ়সিদ্ধান্তপূর্বক সাধকের নিরন্তর অভেদরূপে পরমাত্মাতে স্থিত হওয়া অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ হয়ে যাওয়াই হল উপরোক্ত প্রকারে আত্মাকে পরমাত্মাতে স্থিত করা।

প্রশ্ন—দ্বাদশ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে পরমাত্মার প্রাপ্তিরূপ নির্গুণবিষয়ক গতি দুঃখপূর্বক প্রাপ্ত হয় বলা হয়েছে এবং এখানে বলা হয়েছে যে 'অব্যক্ত পরব্রহ্ম-প্রাপ্তি অনায়াসে লাভ করা যায়' এর কারণ কী ?

উত্তর—যার 'আমি দেহ' এরূপ দেহাভিমান থাকে, তার পক্ষে অব্যক্ত-বিষয়ক গতি লাভ করা সত্যই

অত্যন্ত কঠিন, দ্বাদশ অধ্যায়ে **'দেহবদ্ভিঃ'** শব্দ দ্বারা দেহাভিমানীকে লক্ষ্য করেই একথা বলা হয়েছে। কিন্তু এখানের সাধকের জন্য পূর্বশ্লোকে 'ব্রহ্মভূত' হওয়ার কথা বলে ভগবান স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে সাংখ্যযোগের সাধক যখন দেহাভিমানরহিত হয়ে ব্রহ্মে স্থিত হন, যখন সাধকের দেহাভিমান থাকে না— তখন তাঁর ব্রহ্ম-স্বরূপে অভেদরূপে স্থিতি লাভ হয় এবং তাঁর অনায়াসে ব্রহ্মলাভ হয়। অতএব অধিকারভেদে দু-জায়গার বক্তব্যই সর্বতোভাবে সঠিক।

প্রশ্ন—পরব্রহ্ম পরমাত্মার প্রাপ্তিরূপ অনন্ত আনন্দ অনুভব করেন—এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—জগতে যত প্রকার বড় সুখ আছে বলে মনে করা হয়, প্রকৃতপক্ষে তাতে সত্যকার কোনো সুখ নেই। কারণ তার মধ্যে কোনোটিই এমন নয় ; যা সর্বমহান এবং সর্বদা একভাবে বিরাজমান। তাই শ্রুতিতে বলা হয়েছে—

যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।

(ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৭।২৩।১)

'যা ভূমা (মহত্তম অখণ্ড), তাই সুখ, অল্পে সুখ নেই। ভূমাই সুখ এবং ভূমাকেই বিশেষভাবে জানার চেষ্টা করা উচিত।'

'অল্প' ও **'ভূমা'** কী তা জানাতে গিয়ে শ্রুতিতে আরও বলা হয়েছে—

যত্র নান্যৎপশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমাহথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পং যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্যম্।

(ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৭।২৪।১)

'যেখানে অন্য কিছু দেখা যায় না, অন্য কিছু শোনা যায় না, অন্যকে জানা যায় না, সেটিই হল ভূমা আর যেখানে অন্যকে দেখা যায়, অন্যকে শোনা যায়, অন্যকে জানা যায়, তা অল্প। যা ভূমা, তা অমৃত এবং যা অল্প, তা মরণশীল (নশ্বর)।'

যা আজ আছে আর কাল নষ্ট হয়ে যাবে, তাতে যথার্থ সুখ নেই। কিন্তু যদি তার কিয়দংশে সুখ মানা যায় তাহলে সেটিও অত্যন্তই তুচ্ছ এবং নগণ্য। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সুখের তুলনাত্মক বিচার করে বলেছেন—সমস্ত পৃথিবীর সাম্রাজ্য, ইহলোকের পূর্ণ ঐশ্বর্য এবং স্ত্রী, পুত্র, ধন, জমি, স্বাস্থ্য, সম্মান, কীর্তি ইত্যাদি সমস্ত ভোগ্য পদার্থ যিনি প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি মানুষের মধ্যে সব থেকে বেশি সুখী ; কারণ মানুষের এটিই পরম আনন্দ। তার থেকে শতগুণ পিতৃলোকের আনন্দ, তার থেকে শতগুণ গন্ধর্বলোকের আনন্দ, তার থেকেও শতগুণ নিজ কর্মফলের দ্বারা দেবতা হওয়া লোকেদের আনন্দ, তার থেকে শতগুণ আজান[১] দেবতাদের আনন্দ, তার থেকে শতগুণ প্রজাপতিলোকের আনন্দ এবং তার থেকে শতগুণ ব্রহ্মলোকের আনন্দ। সেটিই হল পাপরহিত অকাম শ্রোত্রিয়ের পরম আনন্দ। কারণ তৃষ্ণারহিত শ্রোত্রিয়ই প্রত্যক্ষ ব্রহ্মলোক (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৩।৩৩)। যিনি ব্রহ্মের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি তো সেই অনন্ত, অসীম, অচিন্ত্য, আনন্দ প্রাপ্ত করেছেন, যার কোনো কিছুর সঙ্গেই তুলনা হয় না। এরূপ সেই নিরতিশয় আনন্দ পরব্রহ্ম পরমাত্মাপ্রাপ্ত পুরুষ তাঁরই স্বরূপ প্রাপ্ত হন। এই কথাটির দ্বারা সেই অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়েছে।

এই অনন্ত আনন্দময় আনন্দকে একুশতম শ্লোকে 'আত্যন্তিক সুখ' এবং পঞ্চম অধ্যায়ের একুশতম শ্লোকে 'অক্ষয় সুখ' বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ—এইরূপ অভেদভাবে সাধনকারী সাংখ্যযোগীর ধ্যানের এবং তার ফলের বর্ণনা করে এবার সেই সাধকের ব্যবহারকালের স্থিতির বর্ণনা করেছেন—

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥ ২৯

[১]যাঁরা কল্পের প্রারম্ভে থেকে সেই কল্পের শেষ পর্যন্ত দেবতা পদে অধিষ্ঠিত থাকেন তাঁদের বলা হয় 'আজান দেবতা'।

সর্বব্যাপী অনন্ত চেতনে একত্বভাবযুক্ত তথা সর্বত্র সমদর্শনকারী যোগী নিজ আত্মাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে নিজ আত্মায় দর্শন করেন।। ২৯।।

প্রশ্ন—'**যোগযুক্তাত্মা**' পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—সচ্চিদানন্দ, নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্মে যাঁর অভিন্নভাবে স্থিতিলাভ হয়েছে, তেমনই ব্রহ্মভূত যোগীর বাচক এখানে '**যোগযুক্তাত্মা**' পদটি। এর বর্ণনা পঞ্চম অধ্যায়ের একুশতম শ্লোকে '**ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা**' নামে এবং পঞ্চমের চব্বিশতমতে, ষষ্ঠের সাতাশতমতে, অষ্টাদশের চুয়ান্নতম শ্লোকে 'ব্রহ্মভূত' নামে করা হয়েছে।

প্রশ্ন—এরূপ যোগীর সর্বত্র সমভাবে দেখা কীরূপ ?

উত্তর—পঞ্চম অধ্যায়ের অষ্টাদশ এবং এই অধ্যায়ের বত্রিশতম শ্লোকে জ্ঞানী মহাত্মার সমদর্শনের বর্ণনা করা হয়েছে, তদনুরূপ এই যোগী সকলের সঙ্গে শাস্ত্রানুকূল যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করে নিত্য-নিরন্তর সবার মধ্যে নিজ স্বরূপভূত একই অখণ্ড চেতন আত্মাকে দর্শন করেন। একেই বলা হয় তাঁর সর্বত্র সমভাবে দর্শন করা।

প্রশ্ন—আত্মাকে সর্বভূতে অবস্থিত এবং সর্বভূতকে আত্মাতে কল্পিত দেখা কীরূপ ?

উত্তর—এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্ম পরমাত্মাই সত্য তত্ত্ব, তিনি ব্যতীত এই সম্পূর্ণ জগৎ কিছুই নয়। এই রহস্য যথাযথভাবে জেনে তাঁতে অভিন্নভাবে স্থিত হয়ে যিনি স্বপ্নের দৃশ্যবর্গে স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষের ন্যায় সম্পূর্ণ চরাচরের প্রাণীতে এক অদ্বিতীয় আত্মাকেই অধিষ্ঠানরূপে পরিপূর্ণ দেখেন অর্থাৎ 'এক অদ্বিতীয় আত্মাই এই সবের রূপে প্রতীয়মান, বাস্তবে তিনি ব্যতীত অন্য কিছুই নেই।' এই বিষয়টি যথার্থভাবে অনুভব করাই হল সম্পূর্ণ ভূতে আত্মাকে দর্শন করা। এইভাবে যিনি সমস্ত চরাচরের প্রাণীকে আত্মাতে কল্পিত দেখেন, অর্থাৎ যেমন স্বপ্নোত্থিত মানুষ স্বপ্নের জগৎকে বা নানাপ্রকার কল্পনাকারী মানুষ কল্পিত দৃশ্যকে নিজেরই সংকল্পের আধারে নিজের মধ্যে দেখে, তেমনই দেখা—সমস্ত ভূতকে আত্মাতে কল্পিতরূপে দেখা। এই ভাব স্পষ্ট করার জন্য ভগবান আত্মার সঙ্গে '**সর্বভূতস্থম্**' বিশেষণ দিয়ে আত্মাকে ভূতাদিতে অবস্থিত দেখার কথা বলেছেন, কিন্তু ভূতাদিকে আত্মাতে স্থিত দেখার কথা না বলে, কেবল দেখার কথা বলেছেন।

সম্বন্ধ—এইভাবে সাংখ্যযোগের সাধনকারী যোগীর এবং তার সর্বত্র সমদর্শনরূপ অন্তিম স্থিতির বর্ণনা করার পর, এবার ভক্তিযোগের সাধনকারী যোগীর অন্তিম স্থিতি এবং তাঁর সর্বত্র ভগবদ্দর্শনের বর্ণনা করছেন—

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।। ৩০

যে ব্যক্তি সর্বভূতে আত্মারূপে আমাকে (বাসুদেবকে) দেখেন এবং সর্বভূতকে আমার (বাসুদেবের) মধ্যে দেখেন তাঁর কাছে আমি অদৃশ্য হই না এবং তিনিও আমার কাছে অদৃশ্য হন না।। ৩০

প্রশ্ন—সর্বভূতে বাসুদেবকে এবং বাসুদেবে সর্বভূতকে দেখা কী ?

উত্তর—যেমন মেঘেতে আকাশ এবং আকাশে মেঘ থাকে, তেমনই সর্বভূতে ভগবান বাসুদেব এবং বাসুদেবে সর্বভূত বিদ্যমান—এইরূপ অনুভব করাই এরূপ দেখা।

প্রশ্ন—এরূপ দেখা কার্য-কারণের দৃষ্টিতে নাকি ব্যাপ্য-ব্যাপকের অথবা আধেয়-আধারের দৃষ্টিতে হয় ?

উত্তর—সর্বভাবেই এরূপ দেখা যেতে পারে ; কারণ

[১]এই বিষয়ে ঈশোপনিষদের মন্ত্র হল—

যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি। সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।। (মন্ত্র ৬)

'কিন্তু যিনি সমস্ত প্রাণীদের আত্মাতে এবং সমস্ত প্রাণীর মধ্যে আত্মাকেই দেখে থাকেন, তিনি আর কাউকেও ঘৃণা করেন না।'

মেঘেতে আকাশের ন্যায় ভগবান বাসুদেবই এই সমগ্র চরাচর জগতের মহাকারণ, তিনি সর্বস্থানে ব্যাপ্ত এবং তিনিই একমাত্র আধার।

প্রশ্ন—সেই পরমেশ্বর আকাশের ন্যায় সমগ্র চরাচর জগতের মহাকারণ কীভাবে এবং সর্বব্যাপী ও সর্বাধার কীভাবে ?

উত্তর—**'আকাশাদ্বায়ুঃ', 'বায়োরগ্নিঃ', 'অগ্নেরাপঃ'** (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ২।১)—এই শ্রুতি অনুসারে আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জলরূপ মেঘের উৎপত্তি হয়। আকাশ পঞ্চভূতাদির প্রথম এবং এইসবের কারণ। এর উৎপত্তির মূল কারণ পরম্পরাগত প্রকৃতি, প্রকৃতিই পরমেশ্বরের অধ্যক্ষতায় সব কিছু সৃষ্টি করে ; এই প্রকৃতি পরমেশ্বরের এক শক্তিবিশেষ, তাই এটিও পরমেশ্বরের থেকে পৃথক নয়। এই দৃষ্টিতে সমস্ত চরাচর জগৎ তার থেকেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং তিনিই এর মহাকারণ। ভগবান নিজেও বলেছেন—

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে। (১০।৮)

'আমি সকলের উৎপন্নকারী, আমার মধ্যেই সব আবর্তিত হয়।'

এইরূপ, যেমন মেঘের সর্বাংশে আকাশ পরিপূর্ণ—ব্যাপ্ত, তেমনই সমস্ত চরাচর জগতে পরমেশ্বর ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। **'ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা'** (৯।৪)। 'নিরাকার পরমাত্মরূপ আমার দ্বারা সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত।'

আকাশ যেমন মেঘের আধার, আকাশ ছাড়া মেঘ কোথায় থাকবে ? শুধু মেঘই কেন—বায়ু, অগ্নি, জল ইত্যাদি কোনো ভূতই আকাশের আশ্রয় বিনা থাকতে পারে না। তেমনই এই সমগ্র চরাচর বিশ্বের একমাত্র পরমাধার হলেন পরমেশ্বর (১০।৪২)।

প্রশ্ন—সমস্ত জগতে ভগবানের সাকার রূপকে এবং ভগবানের সাকার রূপে সমগ্র জগৎকে কীভাবে দেখা যায় ?

উত্তর—যেভাবে একজন চতুর বহুরূপধারী ব্যক্তি নানাপ্রকার বেশ ধারণ করে আসে আর যারা সেই বহুরূপীকে এবং তার চালচলনের সঙ্গে পরিচিত, তারা তাকে যে কোনো রূপেই চিনে নেয়, তেমনই সমগ্র জগতে যতপ্রকার রূপ আছে, সে সবই শ্রীভগবানের রূপ। আমরা সেগুলিকে চিনতে পারি না, তাই তাঁদের ভগবানের থেকে পৃথক ভেবে ভয় পাই, সঙ্কোচ বোধ করি এবং তাঁদের সেবা করতে চাই না। যাঁরা সমস্ত জগতের সর্বপ্রাণীতে তাঁর মূর্তি চিনে নেয়, তাঁরা বেশ-ভূষা আলাদা হওয়ায় বাহ্যতঃ ব্যবহারে পার্থক্য রাখলেও হৃদয় দিয়ে তাঁরই পূজা করেন। আমাদের পিতা বা প্রিয়তম বন্ধু যে কোনো রূপে আসুন, আমরা যদি তাঁকে চিনে নিই তাহলে তাঁর সেবা-যত্নের কোনো ত্রুটি করি কি ? তাই গোস্বামী তুলসীদাস বলেছেন—

সীয় রামময় সব জগ জানী।
করউঁ প্রনাম জোরি জুগ পানী॥

শ্রীবলদেব যেমন ব্রজে বাছুর, গোপ বালক এবং তাঁর সমস্ত সামগ্রীতে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেছেন[1] এবং

---

[1]ব্রজের কথা। একদিন যমুনা তীরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখাদের সঙ্গে আহার করতে করতে খেলা করছিলেন। কোমরে বাঁশী গুঁজে, বাঁ বগলে শিঙা এবং বেত নিয়ে, আঙুলে লেবুর আচার নিয়ে হাতে মাখন-মাখা ভাত নিয়ে সকলের মধ্যে দাঁড়িয়ে হাসির কথা বলে নিজে হাসছিলেন এবং সব সখাকে হাসাচ্ছিলেন। গোপবালকেরা সকলে প্রেম-ভোজনে তন্ময় হয়েছিল। এদিকে গো-বৎসগুলি দূরে চলে গিয়েছিল। ভগবান তখন তাদের খোঁজার জন্য হাতে খাবার নিয়েই দৌড় দিলেন। ব্রহ্মা এই দৃশ্য দেখে মোহিত হয়ে যান। তিনি গো-বৎস ও বালকদের হরণ করে নেন। ব্রহ্মার এই কাজ বুঝে গোপবালক এবং গো-বৎসের মাতাদের খুশি করার জন্য এবং ব্রহ্মাকে ঠকাবার জন্য ভগবান স্বয়ং ঐভাবে গো-বৎসা এবং বালকদের বেশে প্রকট হন। গো-বৎসা এবং বালকদের যেমন শরীর, হাত-পা, শিং, বাঁশী, বসন-ভূষণ, স্বভাব-গুণ, আকার-অবস্থা এবং নাম ইত্যাদি ছিল, যার যেমন আহার-বিহার ছিল, তেমনই হয়ে সর্বভুবন 'হরিময়'—এই কথাটি সার্থক করে তোলেন।

শ্রীবলদেব প্রথমে কিছু বুঝতে পারলেন না, তারপর তিনি যখন দেখলেন গোপবালকের মাতাদের নিজ সন্তানদের ওপর আগের চেয়ে বেশি স্নেহ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং যে গোবৎসেরা দুধ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল, তাদের ওপরও গাভী মাতার স্নেহ বৃদ্ধি পেয়েছে, তখন তাঁর সন্দেহ হল এবং তিনি ভালোভাবে তাদের দিকে দৃষ্টি দিলেন। তখন তিনি দেখলেন যে সব গোবৎস, তাদের রক্ষাকারী গোপবালক ও অন্য সব সামগ্রী প্রত্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণরূপ এবং তিনি অবাক হয়ে গেলেন।

পরে শ্রীব্রহ্মাও সকলকে শ্রীকৃষ্ণরূপে দেখেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করে তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন (শ্রীমদ্ভাগবত স্কন্ধ ১০, অধ্যায় ১৩)।

যেমন ব্রজগোপীগণ তাঁদের প্রেমচক্ষু দ্বারা সর্বদা ও সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতেন[১], তেমনই ভক্তেরও সর্বত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, রাম, বিষ্ণু, শংকর, শক্তি আদি যার যিনি ইষ্টদেব, সর্বত্রই সেই রূপ দর্শন করা উচিত। একেই বলে ভগবানের সাকাররূপ সমস্ত জগতে দর্শন করা।

এইরূপ, অর্জুন যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্যশরীরে[২], মাতা যশোদা বালকরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখে[৩], ভক্ত কাকভূশণ্ডি ভগবান শ্রীরামের উদরে[৪] সমস্ত বিশ্বকে দেখেছিলেন, তেমনই ভগবানের যে কোনো স্বরূপের অন্তর্গত সমগ্র বিশ্বকে দেখা উচিত। এটিই হল ভগবানের সগুণরূপে সমগ্র জগৎকে দর্শন করা।

প্রশ্ন—তার কাছে আমি অদৃশ্য হই না এবং সে-ও আমার কাছে অদৃশ্য হয় না, এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—প্রথম প্রশ্নের উত্তর অনুসারে যিনি সমগ্র জগতে ভগবানকে এবং ভগবানে সমস্ত জগৎকে দেখেন, তাঁর দৃষ্টি থেকে ভগবান কখনো অন্তর্হিত হন না এবং তিনিও ভগবানের দৃষ্টি থেকে কখনো অদৃশ্য হন

---

[১]জিত দেখৌ তিত স্যামমঈ হৈ।

স্যাম কুঞ্জ বন জমুনা স্যামা, স্যাম গগন ঘন ঘটা ছঈ হৈ॥
সব রঙ্গনমে স্যাম ভরো হৈ, লোগ কহত যহ বাত নঈ হৈ।
হৌঁ বৌরী, কৈ লোগন হী কী স্যাম পুতরিয়া বদল গঈ হৈ॥
চন্দ্রসার রবিসার স্যাম হৈ, মৃগমদ স্যাম কাম বিজঈ হৈ।
নীলকণ্ঠকো কণ্ঠ স্যাম হৈ, মনহুঁ স্যামতা বেল বঈ হৈ॥
শ্রুতিকো অচ্ছর স্যাম দেখিয়ত, দীপ সিখা পর স্যামতঈ হৈ।
নর দেবনকী কৌন কথা হৈ ? অলখ ব্রহ্মছবি স্যামমঈ হৈ॥

[২]গীতা একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

[৩]ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছোটবেলায় তাঁর বিচিত্র বাল্যলীলায় মাতা যশোদা এবং ব্রজবাসীজনদের অনুপম সুখপ্রদান করতেন। একদিন তিনি মাটি খেয়ে ফেলেন। মা ডেকে বললেন—'কেন রে দুষ্টু ! লুকিয়ে মাটি কেন খেলি ?' ভগবান মুখ খুলিয়ে বললেন—'মা ! তোমার বিশ্বাস না হলে আমার মুখ দেখ !' যশোদা দেখে চমকিত হলেন। ভগবানের ছোট্ট মুখ-গহ্বরে সর্ব চরাচর জীব, আকাশ, দশদিক্, পর্বত, দ্বীপ, সমুদ্র, পৃথিবী, বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র, তারা, ইন্দ্রিয়াদি দেবগণ, ইন্দ্রিয়, মন, শব্দাদি বিষয়, মায়ার তিন গুণ, জীব, তাদের বিচিত্র শরীর ও সমস্ত ব্রজমণ্ডলকে দেখলেন। যশোদা ভাবলেন—'আমি স্বপ্ন দেখছি না তো ?' শেষে ভয় পেয়ে প্রণাম করে তাঁর শরণাগত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন পুনরায় তাঁর মোহিনী মায়া ছড়িয়ে দিলেন, মায়ের স্নেহ উথলে উঠল, তিনি শ্যামলালকে কোলে তুলে আদর করতে লাগলেন। (শ্রীমদ্ভাগবত, স্কন্ধ ১০, অধ্যায় ৮)

[৪]শ্রীকাকভূশণ্ডি ভগবান শ্রীরামের বাল্যলীলার আনন্দ উপভোগ করছিলেন। একদিন বালকরূপী শ্রীরাম হামাগুড়ি দিয়ে কাকভূশণ্ডিকে ধরতে দৌড়লেন। তিনি উড়ে যাচ্ছিলেন, ভগবান তাঁকে ধরার জন্য হাত বাড়ালেন। কাকভূশণ্ডি উড়ে গিয়ে ব্রহ্মলোকে পৌঁছলেন, সেখানে গিয়েও পিছনে শ্রীরামের হাত দেখতে পেলেন, তাঁদের মধ্যে দু-আঙুলের পার্থক্য ছিল। যতক্ষণ তাঁর ওড়ার ক্ষমতা ছিল, তিনি উড়লেন আর শ্রীরামের হাতও দু-আঙুল দূরত্বে পিছনে থাকছিল। তখন ভূশণ্ডি ভয় পেয়ে চোখ বন্ধ করলেন এবং চোখ খুলে দেখলেন তিনি অবধ পুরীতে রয়েছেন। শ্রীরাম হাসলেন, তিনি হাসতেই ভূশণ্ডি তাঁর মুখে প্রবেশ করলেন। তার পরের বর্ণনা তাঁরই বাণীতে শুনুন—

উদর মাঝ সুনু অণ্ডজ রায়া। দেখেউঁ বহু ব্রহ্মাণ্ড নিকায়া॥
অতি বিচিত্র তহঁ লোক অনেকা। রচনা অধিক এক তে একা॥
কোটিন্হ চতুরানন গৌরীসা। অগনিত উডগন রবি রজনীসা॥
অগনিত লোকপাল জম কালা। অগনিত ভূধর ভূমি বিসালা॥
সাগর সরি সর বিপিন অপারা। নানা ভাঁতি সৃষ্টি বিস্তারা॥
সুর মুনি সিদ্ধ নাগ নর কিন্নর। চারি প্রকার জীব সচরাচর॥

জো নহিঁ দেখা নহিঁ সুনা জো মনহূঁ ন সমাই॥
সো সব অদ্ভুত দেখেউঁ বরনি কবনি বিধি জাই।
এক এক ব্রহ্মাণ্ড মহুঁ রহউঁ বরষ সত এক।
এহি বিধি দেখত ফিরউঁ মৈঁ অণ্ড কটাহ অনেক॥

না। অভিপ্রায় হল এই যে সৌন্দর্য, মাধুর্য, ঐশ্বর্য, ঔদার্য ইত্যাদির অনন্ত সমুদ্র, রসময়, আনন্দময় ভগবানের দেবদুর্লভ সচ্চিদানন্দ স্বরূপের সাক্ষাৎ দর্শন লাভের পর ভক্ত ও ভগবানের সংযোগ চিরতরে অবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

প্রশ্ন—ভগবানের সগুণ সাকার স্বরূপ দর্শনের সাধন আরম্ভ কীভাবে করা উচিত ? সেই সাধনের অন্তিম স্থিতি কেমন হয় ?

উত্তর—সর্বপ্রথম কথা হল—সগুণ সাকার স্বরূপে শ্রদ্ধা হওয়া। সগুণ সাকার স্বরূপের উপাসককে স্থির করতে হয় যে 'আমার ইষ্টদেব সর্বশক্তিমান এবং সবার ওপরে ; তিনি নির্গুণ-সগুণ সব কিছু।' সাধক যদি তাঁর ইষ্টের থেকে অন্য কোনো স্বরূপকে উচ্চ বলে মনে করেন, তাহলে তাঁর ইষ্টের উপাসনায় সর্বোচ্চ ফল লাভ হয় না। তারপর ভগবানের যে স্বরূপে নিজ ইষ্টবুদ্ধি দৃঢ় হয়, নিজ মনের অনুকূল সেই ইষ্টের কোনো মূর্তি বা পট সামনে রেখে এবং তাতে প্রত্যক্ষ ও চেতন-বুদ্ধি করে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও প্রেমের সঙ্গে তাঁর বিধিবৎ পূজা করা উচিত এবং স্তব-প্রার্থনা, ধ্যানাদির দ্বারা উত্তরোত্তর প্রেম বৃদ্ধি করা উচিত। পূজার সময় দৃঢ় শ্রদ্ধার দ্বারা সাধকের মনে করা উচিত যে ভগবানের মূর্তি কোনো জড় মূর্তি নয়, তিনি চলা-ফেরা করা, খাওয়া-দাওয়া-কথা-বলা চেতনস্বরূপ সাক্ষাৎ ভগবান। সাধকের শ্রদ্ধা যদি সত্য হয়, তাহলে সেই বিগ্রহই তাঁর জন্য ভগবানের অর্চাবতার হয়ে যায় এবং নানাপ্রকারে নিজ ভক্তবৎসলতার প্রত্যক্ষ পরিচয় দিয়ে সাধকের জীবন সফল ও আনন্দময় করে তোলেন[1]। তারপর ভগবদ্‌কৃপায় তাঁর নিজ ইষ্টেরও প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ সম্ভব হতে পারে। দর্শনের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। সাধকের উৎকণ্ঠা এবং ভগবদ্‌কৃপার ওপর নির্ভরতা যেমন ও যে পরিমাণে হয়, সেই অনুসারে সত্বর বা বিলম্বে তাঁর দর্শন লাভ সম্ভব। প্রত্যক্ষ দর্শনের পর, যখন ইচ্ছা সর্বত্র সর্বদা ভগবদ্দর্শন হওয়া সম্ভব। ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন হলে সাধকের স্থিতি

লোক লোক প্রতি ভিন্ন বিধাতা। ভিন্ন বিষ্ণু সিব মনু দিসিত্রাতা॥
নর গন্ধর্ব ভূত বেতালা। কিন্নর নিসিচর পসু খগ ব্যালা॥
দেব দনুজ গন নানা জাতী। সকল জীব তহঁ আনহিঁ ভাঁতী॥
মহি সরি সাগর সর গিরি নানা। সব প্রপঞ্চ তহঁ আনই আনা॥
অণ্ডকোস প্রতি প্রতি নিজ রূপা। দেখেউঁ জিনস অনেক অনূপা॥
অবধপুরী প্রতি ভুবন নিনারী। সরজূ ভিন্ন ভিন্ন নর নারী॥
দসরথ কৌসল্যা সুনু তাতা। বিবিধ রূপ ভরতাদিক ভ্রাতা॥
প্রতি ব্রহ্মাণ্ড রাম অবতারা। দেখউঁ বালবিনোদ অপারা॥

ভিন্ন ভিন্ন মৈঁ দীখ সবু অতি বিচিত্র হরিজান।
অগনিত ভুবন ফিরেউঁ প্রভু রাম ন দেখেউঁ আন॥
সোই সিসুপন সোই সোভা সোই কৃপাল রঘুবীর।
ভুবন ভুবন দেখত ফিরউঁ প্রেরিত মোহ সমীর॥

ভ্রমত মোহি ব্রহ্মাণ্ড অনেকা। বীতে মনহুঁ কল্প সত একা॥
ফিরত ফিরত নিজ আশ্রম আয়উঁ। তহঁ পুনি রহি কছু কাল গবাঁয়উঁ॥
নিজ প্রভু জন্ম অবধ সুনি পায়উঁ। নির্ভর প্রেম হরষি উঠি ধায়উঁ॥
দেখউঁ জন্ম মহোৎসব জাঈ। জেহি বিধি প্রথম কহা মৈঁ গাঈ॥
রাম উদর দেখেউঁ জগ নানা। দেখত বনই ন জাই বখানা॥
তহঁ পুনি দেখেউঁ রাম সুজানা। মায়াপতি কৃপাল ভগবানা॥
করউঁ বিচার বহোরি বহোরী। মোহ কলিল ব্যাপিত মতি মোরী॥
উভয় ঘরী মহঁ মৈঁ সব দেখা। ভয়উঁ ভ্রমিত মন মোহ বিসেষা॥

দেখি কৃপাল বিকল মোহি বিহঁসে তব রঘুবীর।
বিহঁসতহীঁ মুখ বাহের আয়উঁ সুনু মতিধীর॥

[1] মীরাবাঈ আদি মধ্যযুগের ভক্তদের জীবনে এইরূপ অর্চাবতার হয়েছিল।

কীরূপ হয়, তা তিনিই বলতে পারেন, যিনি দর্শন লাভ করেছেন, অন্যের পক্ষে কিছুই বলা সম্ভব নয়।

সাকার ভগবানের দর্শন সর্বত্র যাতে হয়—তার জন্য যে সাধন করা হয়, তার একটি প্রণালী হল, যে স্বরূপে নিজ ইষ্টভাব থাকে, তাঁর বিগ্রহ বা ছবিতে উপরোক্ত প্রকারে পূজা তো করতেই হয়, সেই সঙ্গে প্রত্যহ নিয়ম করে একান্তে তাঁর ধ্যানাভ্যাস করে চিত্তে তাঁর স্বরূপের দৃঢ় ধারণা করে নেওয়া উচিত। কিছু ধারণা হয়ে গেলে একান্তে বসে, চোখ খুলে আকাশে মানসিক মূর্তি রচনা করে তাঁকে দেখার অভ্যাস করতে হয়। ভগবদ্‌কৃপার আশ্রয় নিয়ে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও স্থিরতার সঙ্গে বারংবার এরূপ অভ্যাস করলে কিছুদিন পর আকাশে ইষ্টের সর্বাঙ্গপূর্ণ হাস্যমুখ, কথাবলা মূর্তি দেখা যাবে। এটি অভ্যাস-সাধ্য ব্যাপার। চিত্তে নিজ ইষ্টস্বরূপের মূর্তি তৈরি করার অভ্যাস সিদ্ধ হলে যখন কখনো ঐ স্বরূপের অনন্য চিন্তা হবে, সাধক তখনই যেখানে চাইবেন সেখানেই চোখের সামনে ইষ্টের স্বরূপ প্রকটিত দেখতে পাবেন। এই অভ্যাস দৃঢ় হয়ে গেলে চলা-ফেরার সময় বৃক্ষ, পশু, মানুষ, পক্ষী ইত্যাদি যেসব পদার্থ দেখা যায়, মনের সাহায্যে তাদের স্বরূপ সরিয়ে সেই স্থানে ইষ্টমূর্তির দৃঢ় ধারণা করা উচিত। এরূপ করতে করতে এমন হতে পারে যে সাধক প্রতিটি বস্তুতে, সেই বস্তুর স্থানে নিজ ইষ্টের মানসিক মূর্তি অনায়াসেই দর্শন করতে পারবেন। তারপর ভগবদ্‌কৃপায় তাঁর ভগবানের প্রকৃত দর্শনও লাভ হতে পারে যার ফলে তিনি প্রত্যক্ষ ও যথার্থরূপে সর্বত্র ভগবানকে দেখতে পাবেন।

সম্বন্ধ—সর্বত্র ভগবদ্দর্শন দ্বারা ভগবদ্‌সাক্ষাৎকারের কথা বলে সেই ভগবদ্‌প্রাপ্ত পুরুষের লক্ষণ ও মহত্ত্ব নিরূপণ করেছেন।

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে॥ ৩১

যে ব্যক্তি একীভাবে স্থিত হয়ে সর্বভূতে আত্মারূপে স্থিত আমাকে (সচ্চিদানন্দঘন বাসুদেবকে) ভজনা করেন, সেই যোগী সর্বপ্রকার ব্যবহার করলেও, আমাতেই অবস্থান করেন॥ ৩১

প্রশ্ন—একীভাবে স্থিত হওয়া কী ?

উত্তর—সর্বদা এবং সর্বত্র নিজের একমাত্র ইষ্টদেব ভগবানের ধ্যান করতে করতে সাধক নিজ ভিন্ন স্থিতি সর্বতোভাবে ভুলে এতো তন্ময় হয়ে যান যে তাঁর জ্ঞানে এক ভগবান ব্যতীত অন্য কিছুই থাকে না। ভগবদ্‌প্রাপ্তি-রূপ এই স্থিতিকে ভগবানে একীভাবে স্থিত হওয়া বলে।

প্রশ্ন—সর্বভূতে স্থিত ভগবানকে ভজনা করার অর্থ কী ?

উত্তর—যেমন বাষ্প, মেঘ, কুয়াশা, জলবিন্দু, বরফ ইত্যাদিতে সর্বত্রই জল থাকে, তেমন সমস্ত চরাচর বিশ্বে এক ভগবানই পরিপূর্ণ—এইরূপ জানা ও প্রত্যক্ষ দেখাই সর্বভূতে স্থিত ভগবানকে ভজনা করা। এইরূপ ভজনাকারী ব্যক্তিকে ভগবান সর্বোত্তম মহাত্মা বলেছেন (৭।১৯)।

প্রশ্ন—সেই যোগী সর্ব প্রকার ব্যবহার করলেও, আমাতেই অবস্থান করেন, এই কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—যে ব্যক্তি ভগবান শ্রীবাসুদেবকে লাভ করেছেন, তিনি প্রত্যক্ষরূপে সব কিছুতেই বাসুদেবকে দর্শন করেন। সেই অবস্থায় সেই ভক্তের শরীর, বচন ও মনের দ্বারা যা কিছু ক্রিয়া হয়, তাঁর দৃষ্টিতে সব একমাত্র ভগবানের সঙ্গেই হয়। তিনি কাউকে সেবা করলে, ভগবানেরই সেবা করেন, কাউকে মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করলে, তা ভগবানকেই তুষ্ট করেন, কাউকে দেখলে, তিনি ভগবানকেই দর্শন করেন, কারো সঙ্গে কোথাও গেলে তিনি ভগবানের সঙ্গেই ভগবানের কাছে যান। এই ভাবে তিনি যা কিছু করেন, সব ভগবানেই এবং ভগবানের সঙ্গেই করেন। তাই বলা হয়েছে যে তিনি সর্বপ্রকারে ব্যবহার করলেও, ভগবানেই অবস্থান করেন।

প্রশ্ন—সবই ভগবান, এইরূপ অনুভব হলে তাঁর দ্বারা লোকোচিত যথাযোগ্য ব্যবহার কিরূপে হওয়া সম্ভব ?

উত্তর—ছুরি, কাঁচি, কড়াই, তার, হাতুড়ি,

তরোয়াল, বাণ ইত্যাদিতে লোহার প্রত্যক্ষ অনুভব হলেও যেমন সেই সবের দ্বারা যথোচিত ব্যবহার করা হয়, তেমনই ভগবদ্প্রাপ্ত ভক্তের দ্বারা সর্বত্র এবং সবকিছুতে ভগবানকে দেখেও সকলের সঙ্গে শাস্ত্রানুকূল যথাযোগ্য ব্যবহার করা সম্ভবপর হতে পারে। অবশ্যই সাধারণ মানুষের এবং তাঁর ব্যবহারে অত্যন্ত মহত্ত্বের পার্থক্য থাকে। সাধারণ মানুষের দ্বারা অন্যের সঙ্গে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার হলেও অপরের প্রতি ভগবদ্বুদ্ধি না হয়ে পরবুদ্ধি হওয়ায় এবং ক্ষুদ্র-বৃহৎ নিজের কিছু না কিছু স্বার্থ থাকায় তাঁর দ্বারা অপরের ক্ষতিকারক ব্যবহার হওয়াও সম্ভব ; কিন্তু সর্বত্র সবকিছুতে ভগবদ্দর্শন হতে থাকায় সেই ভক্তের দ্বারা স্বাভাবিক ভাবে সকলের হিতই হয়ে থাকে। তাঁর দ্বারা এমন কোনো কার্য কোনো অবস্থাতেই হতে পারে না, যাতে কারো কিছুমাত্র অহিত হয়[১]।

প্রশ্ন—এখানে ভগবানে সর্বভাবে অবস্থান করে ইত্যাদি বাক্যের যদি এই অর্থ মেনে নেওয়া হয় যে 'তিনি ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য, সব কিছু করেও আমাতেই অবস্থান করেন' তাহলে আপত্তি কীসের ?

উত্তর—এই অর্থ মেনে নেওয়া যায় না, কারণ ভগবদ্প্রাপ্ত এরূপ মহাত্মা ব্যক্তির দ্বারা পাপকর্ম হতেই পারে না। ভগবান স্পষ্ট বলেছেন যে, 'সমস্ত অনর্থের মূল কারণ মহাপাপী কাম' (৩।৩৭) এবং 'এই কামনার উৎপত্তি হয় আসক্তি থেকে' (২।৬২), এবং 'পরমাত্মার সাক্ষাৎ লাভের পর এই রসরূপ আসক্তি চিরতরে নাশ হয়' (২।৫৯)। এরূপ অবস্থায় ঈশ্বরপ্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা নিষিদ্ধ কর্ম (পাপ) হওয়া সম্ভব নয়। এতদ্ব্যতীত ভগবানের এই বচন অনুসারে 'শ্রেষ্ঠ পুরুষ (জ্ঞানী) যেমন আচরণ করেন, অন্যান্য ব্যক্তিও তা অনুসরণ করে' (৩।২১), তাতে জ্ঞানীর ওপর স্বাভাবিকভাবেই একটি দায়িত্ব বর্তায়, সেইজন্যও তাঁর দ্বারা পাপকর্ম হওয়া সম্ভব নয়।

সম্বন্ধ—এইভাবে ভক্তিযোগ দ্বারা ঈশ্বরপ্রাপ্ত পুরুষের মহত্ত্ব প্রতিপাদন করে এবার সাংখ্যযোগ দ্বারা ঈশ্বরপ্রাপ্ত পুরুষের সমদর্শন ও মহত্ত্বের প্রতিপাদন করেছেন—

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥ ৩২

হে অর্জুন ! যে যোগী সকল প্রাণীর সুখ ও দুঃখকে নিজের সুখ ও দুঃখ বলে অনুভব করেন, সেই যোগীকে পরম শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়॥ ৩২

প্রশ্ন—নিজের ন্যায় সমস্ত ভূতে সম দেখা কাকে বলে ?

উত্তর—মানুষ যেমন নিজের সর্ব অঙ্গে নিজ আত্মাকে সমভাবে দেখে, তেমনই সর্ব চরাচর জগতে নিজেকে সমভাবে দেখাকে নিজের ন্যায় সম্পূর্ণ ভূতে সম দেখা বলা হয়।

প্রশ্ন—সম্পূর্ণ চরাচর জগতের সুখ-দুঃখকে নিজের মতো সম দেখা কাকে বলে ?

উত্তর—যেরূপ নিজ সর্ব অঙ্গে আত্মভাব সমান হওয়ায় মানুষ সেই সকলের সুখ-দুঃখ সমানভাবে দেখে, তেমনই সর্ব চরাচর জগতে আত্মভাব সমান হওয়ায় যিনি তাতে প্রতীয়মান সুখ-দুঃখকে সমভাবে দেখেন, তাকেই নিজের ন্যায় সবার দুঃখ ও সুখ সমভাবে দেখা বলা হয়। অভিপ্রায় হল যে সর্বত্র সমদৃষ্টি হওয়ায় সমগ্র বিরাট বিশ্ব তাঁর স্বরূপ হয়ে ওঠে। জগতে তার জন্য পর বলে কিছু থাকে না। তাই মানুষ যেমন নিজেকে কোনোভাবেই দুঃখ দিতে চায় না এবং স্বাভাবিকভাবে সর্বক্ষণ সুখলাভের আশায় অনবরত চেষ্টা করে থাকে এবং তাতে সে কখনো নিজেকে কৃপা করছে মনে করে কৃতজ্ঞতা চায় না, উপকারকারী বলে মনে করে না আর নিজেকে কর্তব্য-পরায়ণ মনে করে অভিমানও করে না। সে নিজের সুখের জন্য চেষ্টা এই কারণে করে যে, সে তা না করে থাকতে

[১] উমা জে রাম চরন রত বিগত কাম মদ ক্রোধ। নিজ প্রভুময় দেখহিঁ জগত কেহি সন করহিঁ বিরোধ॥

পারে না, এই হল তার সহজ স্বভাব ; ঠিক তেমনই সেই যোগীও সমস্ত বিশ্বকে কখনো কোনোপ্রকার বিন্দুমাত্র দুঃখ না দিয়ে সর্বদা জগতের মঙ্গলের জন্য তাঁর সহজ-স্বভাবের দ্বারাই চেষ্টা করে থাকেন।

(পাশ্চাত্য জগতে সমগ্র বিশ্বের মানুষকে নিজেদের পরস্পরকে ভাই বলে মনে করার এই 'বিশ্ব-বন্ধুত্বের' সিদ্ধান্ত একটি ভালো আদর্শ এবং প্রকৃতই এটি উচ্চ সিদ্ধান্ত। কিন্তু ভাই-ভাইয়ে স্বার্থের সম্পর্কে কোনো না কোনো ভাবে বিবাদের আশঙ্কা থেকেই যায় ; কিন্তু যেখানে আত্মভাব থাকে—এই ভাব যে 'ঐ ব্যক্তিও আমিই' সেখানে স্বার্থভাব থাকে না এবং স্বার্থভাবের অভাবে পরস্পর বিবাদের কোনো আশঙ্কা থাকে না। এইজন্য পাশ্চাত্য জগতের বিদ্বান ব্যক্তিরা এখন গীতার শিক্ষাকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়ে থাকেন।)

প্রশ্ন—এরূপ ঈশ্বরপ্রাপ্ত যোগী মহাপুরুষের সমস্ত চরাচর জগতের সুখ-দুঃখের বাস্তব অনুভব হয় নাকি শুধু প্রতীতিমাত্র হয়ে থাকে ?

উত্তর—একে অনুভবও বলা যায় না, প্রতীতিও নয়। তাঁর দৃষ্টিতে যখন একমাত্র সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কোনো বস্তুর অস্তিত্বই থাকে না, তখন অনুভব কীসের হবে ? আর শুধু যদি প্রতীতিমাত্রই হত তাহলে তাঁর দুঃখ না দেওয়া এবং সুখী করার চেষ্টা হত কীভাবে ? সুতরাং সেই সময় বস্তুতঃ তাঁর ভাব ও দৃষ্টি কেমন হয়, তা তিনিই জানেন। বাক্যের সাহায্যে তাঁর ভাব ও দৃষ্টিকোণ ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। তবুও বোঝবার জন্য বলা যেতে পারে যে তাঁর পরমাত্মা ব্যতীত কোনো বস্তুর কখনো অনুভব হয় না, লোকদৃষ্টিতে তা প্রতীতিমাত্র হয়, তবুও তাঁর কার্য অতি উত্তম, সুশৃঙ্খল এবং সুব্যবস্থিত হয়ে থাকে।

প্রশ্ন—যদি বাস্তবে অনুভব না হয়, তাহলে লোকদৃষ্টিতে প্রতীত হওয়া দুঃখের নিবৃত্তির জন্য তিনি কী করে চেষ্টা করেন ?

উত্তর—এই হল তাঁর বৈশিষ্ট্য। উত্তম থেকে উত্তমভাবে হলেও তাঁর কাছে ঐ কার্যের যথার্থ অস্তিত্বও নেই এবং তাঁর কাছে সেসবের কোনো প্রয়োজনও থাকে না। তবুও স্থূলরূপে বোঝার জন্য এরূপ বলা যেতে পারে যে, ছোট শিশুরা যেমন খেলার সময় তুচ্ছ নগণ্য পাথর, মাটির ঢেলা নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে এবং অজ্ঞতাবশতঃ একে অপরকে আঘাত করে দুঃখ পায়। বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাদের এই কলহ-বিবাদকে তুচ্ছ জেনেও মধ্যস্থতা করে আলাদা আলাদা ভাবে তাদের কথা শুনে ও বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাদের দুঃখ দূর করার জন্য বুদ্ধিপূর্বক চেষ্টা করে, তেমনই ঈশ্বরপ্রাপ্ত যোগীপুরুষও দুঃখাভিভূত বিশ্বের দুঃখনিবৃত্তির জন্য চেষ্টা করে থাকেন। যে মহাপুরুষের জগতের ধন, মান, মর্যাদা, প্রতিষ্ঠা, কীর্তি ইত্যাদি কোনো বস্তুতে কিছুই প্রয়োজন থাকে না, যাঁর দৃষ্টিতে কিছু প্রাপ্ত করা বাকি থাকে না এবং প্রকৃতপক্ষে যাঁর কাছে এক পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কারো অস্তিত্বই নেই, তাঁর অকল্পনীয় স্থিতি কোনো দৃষ্টান্ত দ্বারা বোঝানো অসম্ভব ; তাঁর জন্য কোনো লৌকিক দৃষ্টান্ত পূর্ণাংশে প্রযোজ্য হয় না। দৃষ্টান্ত তো কোনো এক অংশ-বিশেষকে লক্ষ্য করাবার জন্যই দেওয়া হয়।

প্রশ্ন—'যোগী'র সঙ্গে 'পরমঃ' বিশেষণ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'পরমঃ' বিশেষণ দিয়ে ভগবান জানাচ্ছেন যে এখানে যে 'যোগী'র বর্ণনা রয়েছে, তিনি সাধক নন, 'সিদ্ধ' যোগী। স্মরণ রাখতে হবে যে ঈশ্বরপ্রাপ্ত পুরুষের—তা তিনি যে কোনো মার্গের দ্বারাই তাঁকে পেয়ে থাকুন—'সমতা' অর্থাৎ সমত্ব অত্যন্ত আবশ্যক। ভগবান যেখানেই ঈশ্বরপ্রাপ্ত পুরুষের বর্ণনা করেছেন, সেখানেই 'সমতা'-কে প্রধান স্থান দিয়েছেন। কোনো ব্যক্তির মধ্যে অন্যান্য বহু গুণ থাকলেও যদি 'সমতা' না থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে তাঁর এখনও ঈশ্বর লাভ হয়নি ; কারণ সমতা ব্যতীত রাগ-দ্বেষের আত্যন্তিক অভাব ও সম্পূর্ণ প্রাণীর মধ্যে সহজ সৌহার্দ্য ভাব থাকতে পারে না। যিনি 'সমতা' প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনিই ঈশ্বরপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ যোগী।

সম্বন্ধ—ভগবানের সমতা-সম্বন্ধীয় উপদেশ শুনে মনের চঞ্চলতাবশতঃ অর্জুন তাতে তাঁর অচলস্থিতি হওয়া খুবই কঠিন মনে করে বলছেন—

অর্জুন উবাচ

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্॥ ৩৩

অর্জুন বললেন— হে মধুসূদন ! যে সমতারূপ যোগের কথা আপনি বললেন, মন চঞ্চল হওয়ায় আমি তার নিত্য-স্থিতি দেখতে পাচ্ছি না॥ ৩৩

প্রশ্ন—'অয়ং যোগঃ' দ্বারা কোন্ যোগের কথা বলা হয়েছে ?

উত্তর—কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, ধ্যানযোগ বা জ্ঞানযোগ ইত্যাদি সাধনগুলির পরাকাষ্ঠারূপ সমতাকেই এখানে 'যোগ' বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এই 'যোগ' দ্বারা এখানে 'ধ্যানযোগ' কেন মানা সম্ভব নয়, কারণ মনের চঞ্চলতা তো ধ্যানযোগেরই বাধক ?

উত্তর—আঠাশতম শ্লোক পর্যন্ত প্রকরণকে দেখলে ধ্যানযোগ মনে করাই ঠিক, কিন্তু একত্রিশ ও বত্রিশতম শ্লোকগুলিতে ঈশ্বরপ্রাপ্ত পুরুষদের ব্যবহারকালীন অবস্থার বর্ণনা রয়েছে এবং অর্জুনের প্রশ্ন 'সমত্ব'-কে লক্ষ্য করে করা হয়েছে, তাই এখানে যোগের অর্থ 'সমত্ব যোগ' ধরা হয়েছে।

প্রশ্ন—'সমতা'র স্থির স্থিতিতে মনের চঞ্চলতাকে বাধক মানা হয়েছে কেন ?

উত্তর—চিত্তের বিক্ষেপকে 'চঞ্চলতা' বলে, বিক্ষেপের প্রধান কারণ রাগ-দ্বেষ, আর যেখানে রাগ-দ্বেষ থাকে, সেখানে 'সমতা' থাকতে পারে না। কারণ 'রাগ-দ্বেষ'-এর সঙ্গে 'সমতা'র অত্যন্ত বিরোধ। তাই 'সমতা'র স্থিতিতে মনের চঞ্চলতাকে বাধক মানা হয়েছে।

সম্বন্ধ—সমত্বযোগে মনের চঞ্চলতা বাধক জানিয়ে এবার অর্জুন মনের নিগ্রহকে অত্যন্ত কঠিন বলে জানাচ্ছেন—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥ ৩৪

কারণ হে কৃষ্ণ ! এই মন অত্যন্ত চঞ্চল, বিক্ষোভকারী, অত্যন্ত দৃঢ় ও বলবান। তাই একে বশে রাখা আমি বায়ুর গতিরোধ করার মতো দুষ্কর বলে মনে করি॥ ৩৪

প্রশ্ন—পূর্বের শ্লোকে অর্জুন চঞ্চলতার কথা বলেছেন, এখানে পুনরায় সেকথা বলার কারণ কী ?

উত্তর—ওখানে অর্জুন সমত্ব যোগের স্থির স্থিতিতে মনের চঞ্চলতাকে বাধক বলেছিলেন, তাতে স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে বলা যেত যে 'মনকে বশ করো, চঞ্চলতা দূর হয়ে যাবে' ; কিন্তু অর্জুন মনে করেছিলেন মনকে বশ করা অত্যন্ত কঠিন, তাই তিনি এখানে পুনরায় মনের চঞ্চলতার কথা বলেছেন।

প্রশ্ন—'মন'-এর সঙ্গে '**প্রমাথি**' বিশেষণ ব্যবহারের কারণ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা অর্জুন বলেছেন যে মন প্রদীপের শিখার ন্যায় চঞ্চল তো বটেই, কিন্তু অত্যন্ত বিক্ষোভকারীও। দুধ ও দধিকে যেমন মন্থন দণ্ড বিক্ষুব্ধ করে দেয়, তেমনই মনও শরীর এবং ইন্দ্রিয়সমূহকেও বিক্ষুব্ধ করে তোলে।

প্রশ্ন—দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষাটতম শ্লোকে ইন্দ্রিয়াদিকে প্রমথনশীল বলা হয়েছে, এখানে মনকে বলা হয়েছে। এর কারণ কী ?

উত্তর—বিষয়াদির আসক্তি দ্বারা দুটিই একে অপরকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে এবং দুটি একত্র হয়ে বুদ্ধিকেও ক্ষুব্ধ করে (২।৬৭)। তাই দুটিকে 'প্রমাথী' বলা হয়।

প্রশ্ন—মনকে '**বলবৎ**' কেন বলা হয়েছে ?

উত্তর—এইজন্য বলা হয়েছে যে এটি স্থির না থেকে সর্বদা এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায় এবং শরীর ও ইন্দ্রিয়কেও বিক্ষুব্ধ করে তোলে, সেই সঙ্গে এটি উন্মত্ত হাতির ন্যায় অত্যন্ত শক্তিশালীও। অত্যন্ত পরাক্রমশালী হাতির ওপর বারংবার অঙ্কুশের আঘাত করলেও যেমন তার ওপর তার কোনো প্রভাব পড়ে না, হাতি ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে থাকে, তেমনই বিবেকরূপ অঙ্কুশের প্রহার করলেও এই শক্তিশালী মন বিষয়াদির গভীর অরণ্য থেকে বার হতে চায় না।

প্রশ্ন—মনকে দৃঢ় বলার অর্থ কী ?

উত্তর—এই চঞ্চল, বিক্ষুব্ধ, বলবান মন অত্যন্ত দৃঢ়। এটি যে বিষয়ে রমণ করে, তাকে এতো দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে যে তার সঙ্গে তদাকার হয়ে যায়। তাই এটিকে 'দৃঢ়' বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—মনকে বশে করা আমি বায়ুকে রুদ্ধ করার মতো অত্যন্ত দুষ্কর বলে মনে করি—অর্জুনের এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা অর্জুন বলেছেন যে, যা এতোই চঞ্চল ও দুর্ধর্ষ, সেই মনকে রোধ করা আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। এই কথার সমর্থনে তিনি বায়ুর উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে শরীরে যেমন সর্বক্ষণ চলা শ্বাসরূপ বায়ুপ্রবাহ হঠকারিতা, বিচার, বিবেক, বল ইত্যাদি সাধনার দ্বারা রুদ্ধ করা অত্যন্ত কঠিন, তেমনই আমি এই বিষয়ে নিরন্তর বিচরণকারী, চঞ্চল, প্রমথনশীল, বলবান ও দৃঢ় মনকে রোধ করাও অত্যন্ত কঠিন বলে মনে করি।

প্রশ্ন—'কৃষ্ণ' সম্বোধন করার অর্থ কী ?

উত্তর—ভক্তদের চিত্ত নিজের দিকে আকর্ষণ করার জন্য ভগবানের আরেক নাম '**কৃষ্ণ**'। অর্জুন যেন এই সম্বোধনের দ্বারা প্রার্থনা করছেন যে 'হে ভগবন্ ! আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল, আমি নিজের শক্তির দ্বারা একে বশীভূত করা অত্যন্ত কঠিন বলে মনে করি আর আপনার স্বাভাবিক গুণ হল মনকে নিজের দিকে আকর্ষিত করা। আপনার পক্ষে এ অত্যন্ত সহজ কাজ। সুতরাং কৃপা করে আমার মনকেও আপনার দিকে আকৃষ্ট করে নিন !'

সম্বন্ধ—মনোনিগ্রহের সম্বন্ধে অর্জুনের কথা মেনে নিয়ে ভগবান মনকে বশীভূত করার উপায় জানাচ্ছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।। ৩৫[১]

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে মহাবাহো ! নিঃসন্দেহে মন চঞ্চল এবং তাকে বশে রাখা কঠিন ; কিন্তু হে কুন্তিপুত্র ! অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা একে বশ করা যায় ।। ৩৫

প্রশ্ন—নিঃসন্দেহে মন চঞ্চল এবং তাকে বশ করা কঠিন—ভগবানের এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান অর্জুনের বক্তব্য সমর্থন করে মনের চাঞ্চল্য এবং তার নিগ্রহের কাঠিন্য স্বীকার করেছেন।

প্রশ্ন—এখানে 'তু' কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—যদিও মনকে বশে করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা একে সহজেই বশ করা সম্ভব। এটি দেখাবার ও আশ্বাস দেবার জন্য এখানে 'তু' শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন—'অভ্যাস' কাকে বলে ?

উত্তর—মনকে কোনো বিষয়ে তদাকার করার জন্য, তাকে অন্য বিষয় থেকে সরিয়ে বারংবার ঐ বিষয়ে লাগাবার জন্য যে চেষ্টা, তাকে বলা হয় অভ্যাস। এই

[১] ঠিক এই বিষয়ের সূত্র পাতঞ্জল যোগদর্শনেও আছে—

'অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ' (১।১২)। 'অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়।'

প্রসঙ্গ পরমাত্মাতে মন নিবিষ্ট করার, অতএব পরমাত্মাকে লক্ষ্য করে চিত্ত-বৃত্তির প্রবাহ বারংবার তাঁর দিকে নিযুক্ত করাই হল 'অভ্যাস'।[1]

প্রশ্ন—চিত্তবৃত্তিগুলি পরমাত্মাতে নিবিষ্ট করার অভ্যাস কীরূপে করা উচিত ?

উত্তর—পরমাত্মাই সবার ওপরে, সর্বশক্তিমান, সর্বেশ্বর ও সবথেকে বড় একমাত্র পরমাত্মতত্ত্ব এবং তাঁকে প্রাপ্ত করাই জীবনের পরম লক্ষ্য—এই বিষয়ে দৃঢ় ধারণা করে অভ্যাস করা উচিত। অভ্যাসের নানা প্রকার শাস্ত্রে বলা হয়েছে।

তার মধ্যে কয়েকটি হল—

১) শ্রদ্ধা ও ভক্তির দ্বারা ধৈর্যশীল বুদ্ধির সাহায্যে মনকে বারংবার সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মে নিযুক্ত করার অভ্যাস করা (৬।২৬)।

২) মন যেখানে যায়, সেখানেই সর্বশক্তিমান নিজ ইষ্টদেব পরমেশ্বরের স্বরূপ চিন্তা করা।

৩) ভগবানের মানস পূজার অভ্যাস করা।

৪) বাক্য, শ্বাস, নাড়ী, কণ্ঠ এবং মন ইত্যাদির কোনো একটির দ্বারা রাম, কৃষ্ণ, শিব, বিষ্ণু, সূর্য, শক্তি আদি যে কোনো নিজ পরম ইষ্টের নাম পরম প্রেম ও শ্রদ্ধাসহকারে পরব্রহ্ম পরমাত্মারই নাম মনে করে নিষ্কামভাবে নিরন্তর তা জপ করা।

৫) শাস্ত্রাদিতে ভগবৎ-সম্বন্ধীয় উপদেশাদি শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহ বারংবার মনন করা এবং সেই অনুসারে চেষ্টা করা।

৬) ঈশ্বরপ্রাপ্ত মহাত্মা ব্যক্তিদের সঙ্গ করে তাঁদের অমৃতময় বাণী শ্রদ্ধাপূর্বক শোনা এবং তদনুসারে চলার চেষ্টা করা (১৩।২৫)।

৭) মনের চাঞ্চল্য নাশ হয়ে তা যেন ভগবানে নিবিষ্ট হয়, তার জন্য সত্যকার হৃদয়ে কাতরভাবে বারংবার ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা।

এছাড়াও আরও নানা প্রকার আছে। কিন্তু এটি স্মরণ রাখতে হবে যে, অভ্যাস তখনই সফল হয়, যখন তা অত্যন্ত প্রেমপূর্বক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসসহ অবিচ্ছিন্নভাবে এবং দীর্ঘ সময় ধরে করা হবে[2]। আজ একটি সাধনায় মন লাগাবার চেষ্টা করা হল, কাল অন্য চেষ্টা, কিছু দিন পর অন্য কিছু করা শুরু হল, কোথাওই বিশ্বাস নেই ; আজ করেছে, কাল করেনি, দু-চার দিন পরে আবার করে, পুনরায় ছেড়ে দিয়েছে ; অথবা কিছু দিন পর মন উঠে গেছে, ধৈর্য চলে গেছে এবং তা ত্যাগ করে দিয়েছে। এইরূপ অভ্যাসে সাফল্য পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন—বৈরাগ্যের স্বরূপ কী ?

উত্তর—ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত পদার্থে যখন আসক্তি ও কামনা সম্পূর্ণভাবে নাশ হয়, তখন তাকে 'বৈরাগ্য' বলে[3]। বৈরাগ্যবান ব্যক্তির চিত্তে সুখ বা দুঃখ কিছুতেই কোনো বিশেষ বিকার হয় না। তিনি এই অচল, অটল আভ্যন্তরিক অনাসক্তি বা পূর্ণ বৈরাগ্য লাভ করেন, যা কোনো অবস্থাতেই তাঁর চিত্তকে কোনো দিকে আকর্ষণ করতে পারে না।

প্রশ্ন—বৈরাগ্য কীভাবে হতে পারে ?

উত্তর—বৈরাগ্যের অনেক প্রকার সাধন আছে, তার মধ্যে কিছু হল—

---

[1] 'তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ' (১।১৩)। তাতে স্থিতির জন্য প্রযত্ন করার নাম হল অভ্যাস।

[2] 'স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ।' (যোগদর্শন ১।১৪)।

'কিন্তু সেই অভ্যাস দীর্ঘ সময় ধরে, নিরন্তর ও সৎকারপূর্বক সেবন করলে দৃঢ়ভূমি হয়।'

[3] মহর্ষি পতঞ্জলির যোগদর্শনেও বৈরাগ্য সম্বন্ধে তদনুরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে—

'দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্।' (১।১৫)

'স্ত্রী, ধন, ভবন, মান-মর্যাদা ইত্যাদি ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত বিষয়ে তৃষ্ণারহিত হয়ে চিত্তের যে বশীকার-অবস্থা হয়, তার নাম 'বৈরাগ্য'।

'তৎপরং পুরুষখ্যাতের্গুণবৈতৃষ্ণ্যম্।' (১।১৬)

'প্রকৃতি থেকে অত্যন্ত অলৌকিক পুরুষের জ্ঞানে তিনগুণের তৃষ্ণার যে অভাব হয়ে যায়, তাকেই বলা হয় পরবৈরাগ্য বা সর্বোত্তম বৈরাগ্য।'

১) সাংসারিক পদার্থে বিচার-বিবেচনাপূর্বক রমণীয়তা, প্রেম ও সুখের অভাব দেখা।

২) সেগুলিকে জন্ম-মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ইত্যাদি দুঃখ-দোষযুক্ত, অনিত্য ও ভয়দায়ক বলে মনে করা।

৩) জগৎ ও ভগবানের প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণকারী সৎ-শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করা।

৪) পরম বৈরাগ্যবান ব্যক্তির সঙ্গ করা, সঙ্গের অভাবে তাঁর বৈরাগ্যপূর্ণ চিত্র ও চরিত্রের স্মরণ-মনন করা।

৫) জগতের বিশাল ভগ্ন প্রাসাদগুলি, জনবিরল নগরাদি ও গ্রামসমূহের পরিত্যক্ত বসতিগুলি দেখে জগৎকে ক্ষণস্থায়ী বলে জানা।

৬) একমাত্র ব্রহ্মকেই অখণ্ড, অদ্বিতীয় অস্তিত্ব বোধ করে অন্য সবকিছুর ভিন্ন অস্তিত্বের অভাব বোধ করা।

৭) অধিকারী ব্যক্তিদের দ্বারা কথিত ভগবানের অনির্বচনীয় গুণ, প্রভাব, তত্ত্ব, প্রেম, রহস্য এবং তাঁর লীলা-চরিত্রের ও দিব্য সৌন্দর্য-মাধুর্যের কথা বারংবার শ্রবণ করা, তাঁকে জানা ও তাঁর ওপর পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে মুগ্ধ হওয়া।

এইরূপ আরও বহু সাধন আছে।

প্রশ্ন—মনকে বশে করার জন্য অভ্যাস ও বৈরাগ্য দুটি সাধনেরই কি প্রয়োজনীয়তা আছে, না কি একটির দ্বারাই মন বশীভূত হতে পারে ?

উত্তর—দুটিরই প্রয়োজনীয়তা আছে। 'অভ্যাস' চিত্ত নদীর ধারাকে ভগবানের দিকে নিয়ে যাওয়ার সুন্দর পথ আর 'বৈরাগ্য' তার বিষয়াভিমুখী প্রবাহের গতিরুদ্ধ করার বাঁধ।

কিন্তু একথা স্মরণ রাখতে হবে যে এই দুটি একে অপরের সহায়ক। অভ্যাসের দ্বারা বৈরাগ্য বৃদ্ধি পায় এবং বৈরাগ্যের দ্বারা অভ্যাস বাড়ে। অতএব ভালোভাবে একটিরও আশ্রয় গ্রহণ করলে মন বশীভূত হতে পারে।

প্রশ্ন—এখানে অর্জুনকে **'মহাবাহো'** সম্বোধন কেন করা হয়েছে ?

উত্তর—অর্জুন বিশ্ববিখ্যাত বীর ছিলেন। দেব, দানব, মানুষ—সকল শ্রেণীর মহাযোদ্ধাদের অর্জুন তাঁর বাহুবলে পরাস্ত করেছিলেন। এখানে ভগবান তাঁর সেই বীরত্ব স্মরণ করিয়ে তাঁকে যেন উৎসাহিত করেছেন যে 'তোমার মতো অতুল পরাক্রমী বীরের পক্ষে মনকে এতো শক্তিশালী মনে করে তাতে ভয় পেয়ে, উৎসাহ ত্যাগ করা উচিত নয়। সাহসে ভর করো, তুমি তাকে জয় করতে পারবে।'

সম্বন্ধ—ভগবান মনকে বশ করার উপায় বলেছেন। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, মনকে বশ না করলে ক্ষতি কী ? তাতে ভগবান বলেছেন—

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥ ৩৬

যাঁরা সংযতচিত্ত নন, এরূপ ব্যক্তিদের দ্বারা এই যোগ দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু যত্নশীল বশীভূত চিত্ত ব্যক্তিরা সাধনার দ্বারা এই যোগ সহজেই প্রাপ্ত হতে পারেন—এই আমার মত ॥ ৩৬

প্রশ্ন—যেসব ব্যক্তি মনকে বশে করতে পারেন না, তাঁদের পক্ষে এই সমত্বযোগ লাভ করা কঠিন কেন ?

উত্তর—যিনি অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা তাঁর মনকে বশ করেন না, তাঁর মনের ওপর রাগ-দ্বেষ অধিকার করে থাকে এবং রাগ-দ্বেষের প্রেরণাতে তিনি বাঁদরের মতো সংসারে মাতামাতি করেন। যখন মন ভোগাদিতে অত্যন্ত আসক্ত হয়ে যায়, তখন তাঁর বুদ্ধিও বহুশাখাবিশিষ্ট ও অস্থির হয়ে ওঠে (২।৪১-৪৪)। এমতাবস্থায় তিনি কীভাবে 'সমত্বযোগ' প্রাপ্ত করবেন ? তাই জন্য একথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—মন বশীভূত হলে তার লক্ষণ কী হয় ?

উত্তর—মন বশে হলে তার চাঞ্চল্য, বিক্ষুব্ধতা,

বলবত্তা ও ভীষণ আগ্রহভাব দূর হয়ে যায়। সহজ, সরল, শান্ত, অনুগত শিষ্যের ন্যায় তা এত আজ্ঞাবহ হয়ে ওঠে যে একে যখন, যেখানে, যতক্ষণ খুশি নিবিষ্ট করে রাখা সম্ভব হয়। তখন মন কোথাও নিবিষ্ট হতে চঞ্চলতা প্রকাশ করে না, বা ইন্দ্রিয়াদির কথামতো পথভ্রষ্ট হয় না, নিজ ইচ্ছায় সরে যায় না, উবে যায় না বা উপদ্রব করে না। অত্যন্ত শান্তির সঙ্গে ইষ্ট বস্তুতে এতো তন্ময় হয়ে যায় যে সহজে বোঝা যায় না এর পৃথক কোনো অস্তিত্ব আছে, না নেই। বাস্তবে এই হল মনকে বশে আনা।

প্রশ্ন—'তু' কথাটি প্রয়োগের ভাবার্থ কী ?

উত্তর—মনকে বশ করেন না যে ব্যক্তি তাঁদের থেকে মনবশকারীদের বৈশিষ্ট্য দেখাবার জন্য 'তু'পদটি প্রযুক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন—যাঁরা মনকে বশ করে নিয়েছেন তাঁদের 'প্রযত্নশীল' হতে বলার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—মন বশীভূত হওয়ার পরও যদি যত্ন না করা হয়—সেই মনকে সম্পূর্ণভাবে পরমাত্মাতে সংলগ্ন করার তীব্র সাধন না করা হয় ; তবে তার দ্বারা সমত্বযোগের প্রাপ্তি আপনাআপনি হয় না। তাই 'প্রযত্নে'র প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ করার জন্যই এরূপ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—মন বশীভূত হলে সমত্বরূপ যোগ প্রাপ্তির সাধন কী ?

উত্তর—অনেক সাধন আছে, তার মধ্যে কয়েকটি এরূপ—

(১) কামনা এবং সমস্ত বিষয় ত্যাগ করে বিবেক ও বৈরাগ্যযুক্ত, পবিত্র, স্থির ও পরমাত্মমুখী বুদ্ধির দ্বারা মনকে নিত্য-নিরন্তর বিজ্ঞানানন্দঘন পরমাত্মার স্বরূপে ন্যস্ত করে পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কোনো কিছুই চিন্তা না করা (৬।২৫)।

(২) সর্ব চরাচর জগতের বাইরে-ভিতরে, ওপরে-নীচে, সর্বত্র একমাত্র সর্বব্যাপক নিত্য বিজ্ঞানানন্দঘন পরমাত্মাকেই পরিপূর্ণ দেখা, নিজেকে সহ সমস্ত দৃশ্য-প্রপঞ্চকেও পরমাত্মার স্বরূপই বোঝা এবং যেমন আকাশে অবস্থিত মেঘের ওপর, নীচে, বাইরে, ভিতরে একমাত্র আকাশই পরিপূর্ণ থাকে এবং ঐ আকাশই তার উপাদান কারণ, তেমনই নিজে-সহ এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে সর্বদিকে পরমাত্মার দ্বারা ওতপ্রোত এবং পরমাত্মারই স্বরূপ মনে করা (১৩।১৫)।

৩) শরীর, ইন্দ্রিয় এবং মন দ্বারা জগতে যা কিছু ক্রিয়া হয়, সেসব গুণাদির দ্বারাই হয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি নিজ নিজ বিষয়েই আবর্তিত হয়, এরূপ মনে করে নিজেকে ঐসব ক্রিয়াগুলি থেকে সর্বতোভাবে পৃথক দ্রষ্টা—সাক্ষী ভাবা এবং নিত্য বিজ্ঞানানন্দঘন পরমাত্মাতে অভিন্নভাবে স্থিত হয়ে সমষ্টিবুদ্ধি দ্বারা সেই নিরাকার অনন্ত চেতনস্বরূপের অন্তর্গত সংকল্পের আধারে স্থিত দৃশ্যবর্গকে ক্ষণভঙ্গুর দেখা (৫।৮-৯, ১৪।১৯)।

৪) ভগবানের শ্রীরাম, কৃষ্ণ, শিব, বিষ্ণু, সূর্য, শক্তি বা বিশ্বরূপ ইত্যাদি যে কোনো স্বরূপকে সর্বোপরি, সর্বান্তর্যামী, সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান এবং পরম দয়ালু, প্রেমাস্পদ পরমাত্মারই স্বরূপ মনে করে নিজ রুচি অনুযায়ী তাঁর চিত্রপট বা বিগ্রহ স্থাপন করে অথবা মনের দ্বারা নিজ হৃদয়ে বা বাইরে, ভগবানের প্রত্যক্ষ রূপ স্থির করে, অতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে নিরন্তর তাঁতে মন লাগানো ও পত্র-পুষ্প-ফলাদির দ্বারা অথবা অন্যান্য যথোচিতভাবে তাঁর সেবা-পূজা করা এবং তাঁর নাম জপ করা।

৫) সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাব রেখে, আসক্তি ও ফলেচ্ছা ত্যাগ করে শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য-কর্মের আচরণ করা (২।৪৮)।

৬) শ্রদ্ধাভক্তিসহ সব কিছু ভগবানের মনে করে কেবল ভগবানের জন্যই যজ্ঞ, দান, তপ ও সেবা ইত্যাদি শাস্ত্রোক্ত কর্মের পালন করা (১২।১০)।

৭) সম্পূর্ণ কর্ম এবং নিজেকে ভগবানে অর্পণ করে, মমতা ও আসক্তিরহিত হয়ে নিরন্তর ভগবানকে স্মরণ করে কাঠপুতুলের মতো ; ভগবান যেমনভাবে যা করাবেন, প্রসন্নতা সহকারে তা করতে থাকা (১৮।৫৭)।

এছাড়াও আরও বহু সাধন আছে এবং যে সাধনগুলি মন বশ করার জন্য বলা হয়েছে, মন বশীভূত হওয়ার পর, শ্রদ্ধা ও প্রেম সহকারে ঈশ্বরপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সেগুলি করতে থাকলে তার দ্বারা সমত্বযোগ প্রাপ্তি করা সম্ভব হয়।

সম্বন্ধ— যোগসিদ্ধির জন্য মনকে বশে করা পরম আবশ্যক বলা হয়েছে। এতে প্রশ্ন আসতে পারে যে যাঁর মন বশে নেই, কিন্তু যোগে শ্রদ্ধা হওয়ায় যিনি ঈশ্বর লাভের জন্য সাধন করেন, মৃত্যুর পর তাঁর কী গতি হয় ? তাই অর্জুন জিজ্ঞাসা করছেন—

অর্জুন উবাচ

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি।। ৩৭

অর্জুন বললেন—হে কৃষ্ণ ! যিনি যোগে শ্রদ্ধা রাখেন, কিন্তু সংযমী নন, সেই জন্য অন্তিম সময়ে যাঁর মন যোগ থেকে বিচলিত হয়ে যায়—এরূপ সাধক যোগসিদ্ধ না হয়ে অর্থাৎ ভগবদ্ সাক্ষাৎকার লাভ না করে কীরূপ গতি লাভ করেন ? ৩৭

প্রশ্ন—এখানে '**অযতিঃ**'র অর্থ 'প্রযত্নরহিত' না করে 'অসংযমী' কেন বলা হয়েছে ?

উত্তর—আগের শ্লোকে বলা হয়েছে যে, যাঁর মন বশে নেই, সেই 'অসংযতাত্মা'র জন্য যোগপ্রাপ্ত করা কঠিন। সেই কথাটিই অর্জুনের এই প্রশ্নের মূল। এতদ্ব্যতীত শ্রদ্ধালু ব্যক্তি দ্বারা চেষ্টা না করার প্রশ্ন ওঠে না ; তেমনই বশীভূত মনের বিচলিত হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে না। এই সব কারণে 'চেষ্টা না করার' অর্থ না করে 'যার মন জয় করা হয়নি' এরূপ সাধককে লক্ষ্য করে 'অসংযমী' অর্থ করা হয়েছে।

প্রশ্ন— এখানে 'যোগ' শব্দ কীসের বাচক, এবং যোগ থেকে মনের বিচলিত হওয়া কাকে বলে ? শ্রদ্ধাযুক্ত মানুষের মনের সেই যোগ থেকে বিচলিত হওয়ার কারণ কী ?

উত্তর—এখানে 'যোগ' শব্দ ঈশ্বর লাভের উদ্দেশ্যে কৃত সাংখ্যযোগ, ভক্তিযোগ, ধ্যানযোগ, কর্মযোগ প্রভৃতি সকল সাধন দ্বারা অর্জিত সমভাবের দ্যোতক। শরীর থেকে প্রাণ বিয়োগের সময় যে সমভাব থেকে বা পরমাত্মার স্বরূপ থেকে মন বিচলিত হয়, একেই বলা হয় মনের যোগ থেকে বিচলিত হয়ে যাওয়া। মনের চাঞ্চল্য, আসক্তি, কামনা, শারীরিক পীড়া ও অচৈতন্যতা ইত্যাদি নানাকারণে মন বিচলিত হতে পারে।

প্রশ্ন—'**যোগসংসিদ্ধিম্**' পদ কোন্ সিদ্ধির বাচক এবং তা প্রাপ্ত না হওয়া বলতে কী বুঝায় ?

উত্তর—সর্বপ্রকার যোগের পরিণামস্বরূপ সমভাবের ফল যে ঈশ্বরলাভ, তার বাচক এই 'যোগসংসিদ্ধিম্' পদটি এবং মৃত্যুকালে সমভাবরূপ যোগের থেকে অথবা ভগবানের স্বরূপ থেকে মন বিচলিত হওয়ার জন্য ঈশ্বর সাক্ষাৎকার না হওয়াই হল তাঁকে প্রাপ্ত না হওয়া।

প্রশ্ন—এখানে 'যোগ থেকে বিচলিত হওয়া'র অর্থ মৃত্যুর সময় সমত্ব থেকে বিচলিত হওয়া মনে না করে যদি অর্জুনের প্রশ্নের এই অভিপ্রায় মানা হয় যে, 'যে সাধক কর্মযোগ, ধ্যানযোগ ইত্যাদির সাধন করতে করতে সেই সাধন ত্যাগ করে বিষয়ভোগে ব্যাপৃত হন, তাঁর কী গতি হয় ?' তাহলে কী ক্ষতি ?

উত্তর— অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ভগবান মৃত্যুর পরের গতির বর্ণনা করেছেন এবং সেই সাধকের অন্য জন্মপ্রাপ্তির কথা বলেছেন, এর দ্বারা স্পষ্ট হয় যে এখানে অর্জুনের প্রশ্ন ছিল মৃত্যুকালের সম্বন্ধেই। তাছাড়া 'গতি' শব্দটি প্রায়শঃ মৃত্যুর পরের পরিণামেরই সূচক, এর দ্বারাও এখানে মৃত্যুকালের প্রকরণ মনে করাই উচিত বলে মনে হয়।

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি।। ৩৮

হে মহাবাহো ! তিনি কি ঈশ্বরপ্রাপ্তির পথে বিভ্রান্ত এবং নিরাশ্রয় হয়ে ছিন্ন মেঘখণ্ডের ন্যায় উভয় পথ

থেকে ভ্রষ্ট হয়ে নষ্ট-ভ্রষ্ট হন না তো ? ৩৮

প্রশ্ন—ভগবদ্‌প্রাপ্তির পথে মোহিত হওয়া এবং আশ্রয়রহিত হওয়া কাকে বলে ?

উত্তর—মনের চাঞ্চল্য ও বিবেক-বৈরাগ্যের ন্যূনতার ফলে ভগবদ্‌প্রাপ্তির সাধন থেকে মনের বিচলিত হওয়া এবং তার ফলে পরমাত্মার প্রাপ্তি না হওয়া ও ফলকামনা ত্যাগ করার দরুন শুভকর্মের ফলরূপ স্বর্গলোক না লাভ করাই হল সেই পুরুষের ঈশ্বরলাভের পথে মোহগ্রস্ত এবং আশ্রয়রহিত হওয়া।

প্রশ্ন—ছিন্নভিন্ন মেঘের মতো উভয় ভ্রষ্ট হয়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ার অর্থ কী ?

উত্তর—এখানে অর্জুনের অভিপ্রায় হল এই যে, সারাজীবন ফলেচ্ছা ত্যাগ করে কর্ম করলে তার তো স্বর্গাদি ভোগ লাভ হয় না এবং অন্তকালে পরমাত্মার সাধন থেকে মন বিচলিত হওয়ায় ভগবদ্‌প্রাপ্তিও হয় না। সুতরাং যেমন মেঘের একটি অংশ পৃথক্ হয়ে পুনরায় অন্য মেঘের সঙ্গে সংযুক্ত না হওয়ায় নষ্টভ্রষ্ট হয়ে যায়, তেমনই এই সাধক স্বর্গলোক ও পরমাত্মা—উভয় লাভ থেকে বঞ্চিত হয়ে নষ্ট হয়ে যান না তো, অর্থাৎ তাঁর অধোগতি হয় না তো ?

সম্বন্ধ—এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করে, অর্জুন এবার তা নিবৃত্তির জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন—

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে।। ৩৯

হে কৃষ্ণ ! আমার এই সংশয় আপনিই সম্পূর্ণরূপে দূর করতে সক্ষম ; কারণ আপনি ছাড়া অন্য কেউ এই সংশয় দূর করতে পারবে না ॥ ৩৯

প্রশ্ন—অর্জুনের এই কথার স্পষ্টীকরণ করুন।

উত্তর—অর্জুন এখানে মৃত্যুর পরের গতি জানতে চেয়েছেন। এ এক রহস্য, যার উদ্‌ঘাটন বুদ্ধি ও তর্কের সাহায্যে কেউ করতে পারে না। এটি তাঁর পক্ষেই জানা সম্ভব যিনি কর্মের সমস্ত পরিণাম, সৃষ্টির সম্পূর্ণ নিয়ম ও সমস্ত লোকাদির রহস্যের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে পরিচিত। লোকলোকান্তরের দেবতা, সর্বত্র বিচরণ করতে সক্ষম ঋষি-মুনি ও তপস্বী এবং বিভিন্ন লোকের ঘটনাবলী দেখতে ও জানতে সক্ষম যোগী কিছু অংশে এটি জানেন ; কিন্তু তাঁদের জ্ঞানও সীমাবদ্ধ হয়। একমাত্র শ্রীভগবানই এর পূর্ণ রহস্য জানেন। অর্জুন প্রথম থেকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব জানতেন। আর ভগবান এর পূর্বেই চতুর্থ অধ্যায়ে নিজেকে 'জন্মগুলির জ্ঞাতা' (৪।৫), 'অজ, অবিনাশী ও সর্বভূতের ঈশ্বর' (৪।৬), 'গুণকর্মানুসারে সকলের সৃষ্টিকারী' (৪।১৩) এবং পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে নিজেকে 'সর্বলোকের মহেশ্বর' বলেছেন, এর দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্বে অর্জুনের বিশ্বাস আরও বর্ধিত হয়। তাই তিনি বলেছেন যে, 'আপনি ব্যতীত আর কেউ নেই যিনি আমার এই সংশয় সম্পূর্ণভাবে বিনাশ করতে সক্ষম। এই সন্দেহ সমূলে নাশ করতে আপনিই যোগ্য পুরুষ'—ভগবানে তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস প্রকটিত করে প্রার্থনা করছেন যে, আপনি সর্বান্তর্যামী, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সমস্ত মর্যাদার নির্মাতা এবং নিয়ন্ত্রণকর্তা সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত জীবদের সমস্ত গতির রহস্য আপনি সম্পূর্ণভাবে জানেন এবং সমগ্র লোক-লোকান্তরে ত্রিকালে যা হবে সেই সমস্ত ঘটনাই আপনার কাছে সর্বদাই প্রত্যক্ষ। এমতাবস্থায় যোগভ্রষ্ট পুরুষদের গতি বর্ণনা করা আপনার কাছে অত্যন্ত সহজ। আপনি যখন এখানে উপস্থিত তখন আমি আর কাকে জিজ্ঞাসা করব আর প্রকৃতপক্ষে আপনি ছাড়া এই রহস্য আর কে বলতে পারেন ? সুতরাং কৃপা করে আপনিই এই রহস্য উন্মুক্ত করে আমার সংশয়জাল ছেদন করুন।

সম্বন্ধ—অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে সেই যোগভ্রষ্ট সাধক উভয় ভ্রষ্ট হয়ে নষ্টভ্রষ্ট হন না তো ? তাই, ভগবান এবার তার উত্তরে বলছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।। ৪০

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে পার্থ ! সেই ব্যক্তির ইহলোক বা পরলোকে কোথাও বিনাশ নেই, কারণ হে বৎস ! ঈশ্বর লাভের জন্য যাঁরা কর্ম করেন, তাঁরা কখনো দুর্গতি প্রাপ্ত হন না।। ৪০

প্রশ্ন—যোগভ্রষ্ট সাধকের ইহলোক বা পরলোকে কোথাও বিনাশ হয় না, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—বর্তমান অবস্থা থেকে পতন হওয়াই বিনাশ হওয়া। সুতরাং মৃত্যুর পর পুনরায় তার জন্ম যদি এই মনুষ্যলোকে হয়, তাহলে এখানেও তাঁর আগের স্থিতি থেকে পতন হয় না, উত্থানই হয়। আর যদি স্বর্গাদি অন্য লোকে জন্ম হয়, তবে সেখানেও পতন হয় না, উত্থানই হয়। এইজন্য তাঁর ইহলোক বা পরলোকে কোথাওই বিনাশ হয় না, বলা হয়েছে। তিনি যেখানে থাকেন, সেখান থেকেই পরমাত্মার পথে এগিয়ে চলেন। এর দ্বারা ভগবান অর্জুনের উভয়-ভ্রষ্ট বিষয়ক প্রশ্নের সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছেন। অভিপ্রায় হল যে তিনি ইহলোক বা পরলোকের ভোগেও বঞ্চিত থাকেন না এবং যোগসিদ্ধিরূপ পরমাত্মপ্রাপ্তিতেও বঞ্চিত থাকেন না।

প্রশ্ন—'**হি**' অব্যয় এখানে কী অর্থে ব্যবহৃত এবং তার সঙ্গে 'কল্যাণের জন্য সাধনকারী কোনো মানুষেরই দুর্গতি হয় না' কথাটি বলার অর্থ কী ?

উত্তর—'হি' অব্যয় এখানে হেতুবাচক এবং তার সঙ্গে উপরোক্ত কথার দ্বারা ভগবান সাধকদের এই আশ্বাস দিয়েছেন যে, যে সাধক নিজ শক্তি অনুসারে শ্রদ্ধাপূর্বক কল্যাণের সাধনে রত রয়েছেন, তাঁর কোনো কারণে কখনোই শূকর, কুকুর, কীট-পতঙ্গাদি নীচ যোনি প্রাপ্তি বা কুম্ভীপাক ইত্যাদি নরক প্রাপ্তি হতে পারে না।

প্রশ্ন—ঈশ্বর লাভের জন্য যাঁরা কর্ম করেন, সেই পুরুষেরা কখনো দুর্গতি প্রাপ্ত হন না—এরূপ বলা হলেও, তা কতদূর সম্ভব ; কারণ মানুষের পূর্বকৃত পাপ তো থাকেই। তার ফলস্বরূপ মৃত্যুর পর তো তাঁদের দুর্গতি হতে পারে ?

উত্তর—পূর্বকৃত পাপ থাকলেও ভগবদ্‌প্রাপ্তির জন্য অর্থাৎ আত্মোদ্ধার করার জন্য যাঁরা কর্ম করেন তাঁদের কারো দুর্গতি হয় না, একথা ঠিক। মনে করুন এক ব্যক্তি ঋণী ; তার কাউকে টাকা দিতে হবে, কিন্তু সে প্রবঞ্চক নয়। তার যা কিছু ছিল, সে সর্বস্ব তার মহাজনকে দিয়ে দিয়েছে এবং যা উপার্জন করে তা-ও শুদ্ধ মনে দিয়ে থাকে এবং দিতে চায়, এই অবস্থায় দয়ালু মহাজন তাকে কয়েদ করে না। যতক্ষণ তার নীতি ঠিক থাকে, তাকে সুযোগ দিয়ে থাকে। ভগবানও এইভাবে ঈশ্বর লাভের জন্য সাধনকারী ব্যক্তির শুদ্ধ চিন্তা দেখে তাঁর পাপের শাস্তি মুলতুবি করে তাঁকে সাধন করে সব বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ দিয়ে থাকেন। যখন সাধারণ মহাজনই ঋণীকে ঋণশোধ করার জন্য সুযোগ দিয়ে থাকে তখন পরম দয়ালু ভগবান যে সাধককে এই সুযোগ দেবেন—এতে আশ্চর্যের কী আছে ?

প্রশ্ন—রাজা ভরত তো আত্মোদ্ধারের জন্য সাধনা করছিলেন তা সত্ত্বেও মৃত্যুর পর তিনি হরিণ-জন্ম লাভ করেছিলেন—পুরাণে একথা জানা যায়। সুতরাং যদি এমনই নিয়ম হয় যে কল্যাণের জন্য সাধনকারী ব্যক্তির মৃত্যুর পর দুর্গতি হয় না, তাহলে ভরতের এই দশা হল কেন ?

উত্তর—ভরত যে মস্ত বড় সাধক ছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু দয়াপরবশ হয়ে মোহবশতঃ এক হরিণ শিশুতে তিনি আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই মৃত্যুকালে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তিনি হরিণ শিশুরই চিন্তা করছিলেন, সেইজন্য তিনি হরিণ-জন্ম লাভ করেন ; কারণ নিয়ম হল মৃত্যুকালে যার চিন্তা থাকে, মানুষ তা অবশ্যই প্রাপ্ত হয় (৮।৬)। তাঁর পরিণাম এটাই হওয়ার ছিল, কিন্তু ভরতের পশুজন্ম লাভ হলেও তা দুর্গতি মনে

করা যাবে না ; কারণ পশুজন্মেও তাঁর পূর্বজন্মের কথা স্মরণ ছিল এবং তিনি মোহ, আসক্তি ত্যাগ করে বড় বড় সাধকদের মতো বিবেকসম্পন্ন ছিলেন এবং শুষ্ক পাতা খেয়ে সংযমশীল পবিত্র জীবন যাপন করে পরের জন্মেই ব্রাহ্মণ শরীর লাভ করে পূর্বাভ্যাসের সাহায্যে (৬।৪৪) শীঘ্রই পরমগতি প্রাপ্ত হন। এর দ্বারা উপরোক্ত সিদ্ধান্তে কোনো বাধা আসে না। এই ঘটনা দ্বারা এই শিক্ষাই গ্রহণ করা উচিত যে ঈশ্বর লাভের লক্ষ্য থেকে যেন কখনো সরে আসা না হয়।

প্রশ্ন—জগতে এমন বহু লোক দেখা যায়, যাঁরা কল্যাণের জন্য সৎসঙ্গ, ভজন-সাধনও করেন, আবার পাপকর্মও করেন, তাঁদের কী গতি হয় ?

উত্তর—তাঁদেরও দুর্গতি হয় না ; কারণ যাঁর শাস্ত্রে এবং মহাপুরুষে শ্রদ্ধা থাকে, তাঁর এই কথায় পূর্ণ বিশ্বাস হয়ে যায় যে পাপের ফলস্বরূপ ভয়ানক দুঃখ এবং ঘোর নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। তাই তাঁরা স্বভাবদোষে হওয়া পাপ থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে থাকেন। সেই সঙ্গে ভজন-ধ্যানের অভ্যাস চলতে থাকায় তাঁদের অন্তঃকরণও শুদ্ধ হতে থাকে। এরূপাবস্থায় তাঁদের দ্বারা জেনে-বুঝে পাপ করার কোনো বিশেষ কারণ থাকে না। সুতরাং স্বভাববশতঃ যদি কেউ পাপাচারী হন তাহলে সৎসঙ্গ এবং ভজন-ধ্যানের প্রভাবে তিনিও পাপাচার থেকে মুক্ত হয়ে শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়ে ওঠেন। তাঁর ক্রমশঃ উত্থানই হয়, পতন হতে পারে না (৯।৩০-৩১)।

প্রশ্ন—'তাত' সম্বোধনের এখানে কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—'তাত' সম্বোধন দ্বারা ভগবান এখানে অর্জুনকে আশ্বস্ত করেছেন এই বলে যে 'তুমি আমার পরম প্রিয় সখা এবং ভক্ত, তাহলে তোমার কীসের ভয় ? যখন আমাকে পাবার জন্য যাঁরা সাধন করেন, তাঁদেরও দুর্গতি হয় না, তাঁরা উত্তমগতি লাভ করেন, তখন তোমার তো কথাই নেই !'

সম্বন্ধ—যোগভ্রষ্ট পুরুষের দুর্গতি হয় না, কিন্তু তাঁদের কী গতি হয় ? সে কথা জানার ইচ্ছা হওয়ায় ভগবান বলছেন—

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥ ৪১

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যাত্মাগণের প্রাপ্যলোক অর্থাৎ স্বর্গাদি উত্তমলোক লাভ করে তাতে বহুদিন বাস করে পুনরায় সদাচারসম্পন্ন ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন॥ ৪১

প্রশ্ন—**'যোগভ্রষ্ট'** কাকে বলে ?

উত্তর—জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, ধ্যানযোগ ও কর্ম-যোগাদির সাধনকারী যে ব্যক্তি মল, বিক্ষেপাদি দোষে বা বিষয়াসক্ত অথবা রোগাদির কারণে শেষকালে লক্ষ্য থেকে বিচলিত হয়ে যান, তাঁকে 'যোগভ্রষ্ট' বলা হয়।

প্রশ্ন—এখানে বলা হয়েছে যে যোগভ্রষ্ট পুরুষ পুণ্যবানেদের লোক প্রাপ্ত হন এবং শ্রীমানদের গৃহে জন্ম নেন। এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে তিনি নরকাদি লোক ও নীচজন্ম প্রাপ্ত হন না, কিন্তু পুণ্যবানেদের স্বর্গাদি লোকে ও ধনীদের গৃহে ভোগের আধিক্য থাকে, সেইজন্য ভোগে আসক্ত হয়ে ভোগাদি লাভের জন্য তাঁর পাপকর্মে প্রবৃত্ত হবার সম্ভাবনা থাকে, আর যদি তা হয়, তাহলে এই দুই গতিই পরিণামে তাঁর পতনের হেতু হয়, সুতরাং প্রকারান্তরে একে তো দুর্গতিই বলা যায় ?

উত্তর—মৃত্যুলোকের থেকে ওপরে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যত লোক আছে, সে সবই পুণ্যবানেদের লোক। তাদের মধ্যে যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি যোগরূপ মহাপুণ্যপ্রভাবে এরূপ লোকে যান না, যেখানে তিনি ভোগে আবদ্ধ হয়ে দুর্গতি প্রাপ্ত হবেন এবং এরূপ অপবিত্র (হীনগুণ ও হীন আচরণকারী) ধনীর গৃহেও জন্ম নেন না, যা তাঁর দুর্গতির হেতু হতে পারে। তাই **'শ্রীমতাম্'**-এর সঙ্গে **'শুচীনাম্'** বিশেষণ দিয়ে পবিত্র, শুদ্ধ, শ্রেষ্ঠগুণ ও বিশুদ্ধ আচরণযুক্ত ধনীদের গৃহে জন্ম নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এটি প্রকারান্তরে দুর্গতি নয়।

প্রশ্ন—অনেক বছর ধরে পুণ্যবানদের লোকে থাকার হেতু কী ?

উত্তর—ভোগে আসক্তিই ঐ লোকে বহুবর্ষ ধরে থাকার কারণ ; কারণ কর্ম ও তার ফলে মমতা ও আসক্তি থাকাই কর্মফলের হেতু হওয়া (২।৪৭)। সুতরাং যে সাধকের অন্তরে যতটুকু আসক্তি লুকিয়ে থাকে, ততটা সময় পর্যন্ত তাঁকে তাঁর শুভকর্মের ফলভোগ করার জন্য সেখানে থাকতে হয়—যাঁর আসক্তি বেশি হয়, তিনি অপেক্ষাকৃত বেশি সময় সেখানে থাকেন আর যাঁর আসক্তি কম হয়, তিনি কম সময় থাকেন। যাঁর ভোগাসক্তি থাকে না, সেই বৈরাগ্যবান যোগভ্রষ্ট সেখানে না গিয়ে সোজা যোগীদের কুলে জন্মগ্রহণ করেন।

সম্বন্ধ—সাধারণ যোগভ্রষ্ট পুরুষদের গতি জানিয়ে এবার আসক্তিরহিত উচ্চ শ্রেণীর যোগভ্রষ্ট পুরুষদের বিশেষ গতির বর্ণনা করছেন—

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্।। ৪২

অথবা যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি সেইসকল লোকে না গিয়ে জ্ঞানবান যোগীর কুলে জন্মগ্রহণ করেন। এরূপ জন্ম জগতে নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুর্লভ ।। ৪২

প্রশ্ন—**'অথবা'** শব্দটি কীসের জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে ?

উত্তর—যোগভ্রষ্ট পুরুষদের মধ্যে যাঁদের মনে বিষয়াসক্তি থাকে, তাঁরা স্বর্গাদি লোক ও পবিত্র ধনীর গৃহে জন্ম নেন ; কিন্তু যিনি বৈরাগ্যবান পুরুষ, তাঁকে কোনো লোকেও যেতে হয় না বা ধনীগৃহেও জন্ম নিতে হয় না। তিনি সোজা জ্ঞানবান সিদ্ধ যোগীর গৃহে জন্ম নেন। পূর্ববর্ণিত যোগ ভ্রষ্ট ব্যক্তিদের থেকে পৃথক করার জন্যই তাঁদের জন্য **'অথবা'** প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—সব যোগভ্রষ্টদেরই তো স্বর্গাদি পুণ্যলোক প্রাপ্ত হওয়া উচিত। সেখানকার সুখভোগ করার পর তাঁদের মধ্যে থেকে কেউ পবিত্র ধনীগৃহে জন্ম নেন এবং কেউ আবার যোগীদের গৃহে। **'অথবা'** দ্বারা যদি এই ভাব মনে করা হয়, তাতে আপত্তি কী ?

উত্তর—এরূপ মনে করা উচিত নয়। কারণ যে পুরুষদের ভোগে যথার্থ বৈরাগ্য থাকে, তাঁদের জন্য স্বর্গাদি লোকে গিয়ে বহু বছর ধরে সেখানে বাস করা ও ভোগ করা তো দণ্ড সদৃশই। এইভাবে ভগবদ্প্রাপ্তিতে দেরি হওয়া বৈরাগ্যের ফল হতে পারে না। তাই উপরোক্ত অর্থ মানাই সঠিক।

প্রশ্ন—যোগীদের কুলে এরূপ বৈরাগ্যশালী পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে এইসব যোগী অবশ্যই গৃহস্থ হন, কারণ গৃহস্থাশ্রমেই জন্ম হয়। **'ধীমতাম্'**-এর অর্থ করতে গিয়ে এরূপ যোগীদের জ্ঞানী বলা হয়েছে। গৃহস্থেরাও কি জ্ঞানী হতে পারেন ?

উত্তর—ভগবদ্‌তত্ত্বের প্রকৃত জ্ঞান সকল আশ্রমেই হওয়া সম্ভব। গীতায় এই বিষয়টি ভালোভাবে প্রমাণিত (৩।২০ ; ৪।১৯ ; ১৮।৫৬) হয়েছে। অন্যান্য শাস্ত্রেও এর বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। মহর্ষি বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাস, জনক, অশ্বপতি ও রেক্ক প্রমুখ মহাপুরুষগণ গৃহস্থাশ্রমে থেকেই জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

প্রশ্ন—**'যোগিনাম্'** পদে উক্ত যোগী শব্দের অর্থ 'জ্ঞানবান' যোগী না মেনে 'সাধক যোগী' মেনে নিলে আপত্তি কীসের ?

উত্তর—এরূপ মেনে নিলে **'ধীমতাম্'** শব্দটি ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাছাড়া ভগবান **'দুর্লভতরম্'** পদেও জানিয়েছেন যে এরূপ জন্ম পবিত্র শ্রীমানদের গৃহের থেকেও অত্যন্ত দুর্লভ। সুতরাং এখানে **'ধীমতাম্'** বিশেষণযুক্ত **'যোগিনাম্'** পদে উদ্ধৃত 'যোগী' শব্দের অর্থ 'জ্ঞানবান সিদ্ধ যোগী' মনে করাই ঠিক।

প্রশ্ন—যোগীদের কুলে হওয়া জন্মকে অত্যন্ত দুর্লভ বলা হয়েছে কেন ?

উত্তর—পরমার্থ সাধন (যোগসাধন) এর যত

সুবিধা যোগীকুলে জন্ম নিলে পাওয়া যায়, তত স্বর্গে, শ্রীমানদের গৃহে বা অন্যত্র কোথাওই পাওয়া যায় না। যোগীদের কুলে অনুকূল পরিবেশের প্রভাবে মানুষ প্রারম্ভিক জীবনেই যোগসাধনে ব্যাপৃত হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানীদের কুলে জন্ম নেওয়া ব্যক্তি অজ্ঞ হয়ে থাকে না, শ্রুতিতে এ সিদ্ধান্ত প্রমাণিত[১]। যদি মহাত্মা ব্যক্তিদের মহিমা ও প্রভাবের দৃষ্টিতে দেখা যায় তাহলে মহাত্মাদের কুলে জন্ম হলে তো বলারই কিছু নেই, মহাত্মাদের সঙ্গই দুর্লভ, অগম্য এবং অমোঘ মানা হয়[২]। তাই এরূপ জন্মকে দুর্লভ বলাই সঠিক।

সম্বন্ধ—যোগীকুলে জন্মগ্রহণকারী যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির সেই জন্মের পরিস্থিতি সম্বন্ধে জানাচ্ছেন—

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥ ৪৩

সেই দেহে পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে মোক্ষপর বুদ্ধি লাভ করেন। তারপর হে কুরুনন্দন ! তার প্রভাবে পুনরায় পরমাত্মলাভের জন্য তিনি পূর্বাপেক্ষা তীব্রভাবে চেষ্টা করেন ॥ ৪৩

প্রশ্ন—এখানে 'তত্র' পদটি শুধু যোগীকুলে জন্মেরই নির্দেশ করাচ্ছে, না কি পবিত্র শ্রীমান এবং জ্ঞানবান যোগী—উভয়ের গৃহে জন্মের ?

উত্তর—আগের শ্লোকেই যোগীকুলের বর্ণনা করা হয়েছে এবং ঐ কুলে জন্মালে দেবাদি শরীরেরও ব্যবধান নেই। সুতরাং এখানে 'তত্র' দ্বারা যোগীকুলের নির্দেশ মেনে নেওয়াই উচিত।

প্রশ্ন—তাহলে কি পবিত্র শ্রীমানদের গৃহে জন্ম নেওয়া সাধক 'বুদ্ধিসংযোগ' লাভ করেন না ?

উত্তর—তাঁরাও পূর্বাভ্যাসের প্রভাবে বিষয় ভোগ থেকে সরে গিয়ে ভগবানের দিকে আকর্ষিত হন—একথা পূর্বের শ্লোকে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—আগের শরীরে সংগ্রহ করা 'বুদ্ধির সংযোগ' প্রাপ্ত হওয়া কী ?

উত্তর—কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, ধ্যানযোগ, জ্ঞানযোগ ইত্যাদি সাধনের মধ্যে যে কোনো সাধন দ্বারা যত 'সমভাব' পূর্বজন্মে প্রাপ্তি হয়েছে, ইহজন্মে তার অনায়াসে জাগ্রত হওয়াই 'বুদ্ধির সংযোগ' প্রাপ্ত করা।

প্রশ্ন—'ততঃ' পদটির এখানে কী অর্থ ?

উত্তর—'ততঃ' পদ প্রয়োগের দ্বারা বলা হয়েছে যে, যোগীকুলে জন্ম হওয়া এবং সেখানে পূর্বসংস্কারের সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ায় সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুনরায় অনায়াসে যোগসাধনায় ব্যাপৃত হন।

সম্বন্ধ—এবার পবিত্র শ্রীমানদের গৃহে জন্ম নেওয়া যোগভ্রষ্ট পুরুষের পরিস্থিতির বর্ণনা করে যোগকে জানার ইচ্ছার মহত্ত্ব জানাচ্ছেন—

পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে॥ ৪৪

[১]নাস্যাব্রহ্মবিৎকুলে ভবতি। তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি। (মুণ্ডক উপনিষদ্ ৩।২।৯)
'ব্রহ্মবিদ্-এর কুলে কোনো পুরুষই অব্রহ্মবিৎ হন না, তিনি শোক এবং পাপ হতে মুক্ত হয়ে যান। হৃদয় গ্রন্থি থেকে মুক্ত হয়ে অমর হয়ে যান অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু থেকে চিরতরে রেহাই পেয়ে যান।'

[২]মহৎসঙ্গস্তু দুর্লভোঽগম্যোঽমোঘশ্চ। (নারদভক্তিসূত্র ৩৯)
'কিন্তু মহাত্মাদের সঙ্গ দুর্লভ, অগম্য এবং অমোঘ।'

তিনি (শ্রীসম্পন্ন সদাচারী ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণকারী) যোগভ্রষ্ট হয়েও পূর্বজন্মের অভ্যাসবশে ভগবানে আকৃষ্ট হন। সমবুদ্ধিরূপ যোগের জিজ্ঞাসু ব্যক্তিও বেদে-বর্ণিত সকাম কর্মের ফলকে অতিক্রম করেন ॥ ৪৪

প্রশ্ন—এখানে 'সঃ'-এর দ্বারা শ্রীমানদের গৃহে জন্ম নেওয়া যোগভ্রষ্টকে কেন ধরা হয়েছে ?

উত্তর—যোগীকুলে জন্ম নেওয়া বৈরাগ্যবান পুরুষদের ভোগের বশ হওয়ার কোনো আশঙ্কা থাকতে পারে না, তাই তাদের জন্য '**অবশঃ অপি**' এই পদটির প্রয়োগ উচিত বলে মনে হয় না। এতদ্ব্যতীত যোগীকুলে অনায়াসে সৎসঙ্গ লাভ হওয়ায়, তারজন্য একমাত্র পূর্বাভ্যাসকেই ভগবানের প্রতি আকর্ষিত হওয়ার হেতু বলাও ঠিক নয়। সুতরাং এই বর্ণনা শ্রীমানদের গৃহে জন্মগ্রহণকারী যোগভ্রষ্ট পুরুষদের সম্পর্কেই মানা উচিত।

প্রশ্ন—এখানে '**অবশঃ**'র সঙ্গে '**অপি**' প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে, যদিও সদাচারী পবিত্র ধনবানদের গৃহ সাধারণ ধনীদের গৃহের মতো ভোগে আবদ্ধকারী হয় না, কিন্তু সেখানেও যদি কোনো কারণে যোগভ্রষ্ট পুরুষ স্ত্রী, পুত্র, ধন, মান-মর্যাদা ইত্যাদি ভোগের বশীভূত হন, তাহলেও পূর্বজন্মের অভ্যাসের প্রভাবে তিনি ভগবদ্‌প্রাপ্তির সাধনে ব্যাপৃত হয়ে যান।

প্রশ্ন—'**পূর্বাভ্যাসেন**' পদের সঙ্গে '**এব**' শব্দ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভোগাদির বশীভূত ব্যক্তিকে বিষয়জাল থেকে মুক্ত করে ভগবানের দিকে আকর্ষিত করায় পূর্ব-জন্মের অভ্যাসের সংস্কারই প্রধান কারণ ; সেইজন্যই '**পূর্বাভ্যাসেন**' পদটির সঙ্গে '**এব**' শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন—'**জিজ্ঞাসুঃ**'র সঙ্গে '**অপি**' শব্দটি প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'সমবুদ্ধিরূপ যোগে'র প্রশংসা করার জন্য এখানে '**অপি**' শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, যিনি যোগের জিজ্ঞাসু, যোগে শ্রদ্ধা রাখেন এবং তা লাভ করার চেষ্টা করেন, তিনিও বেদোক্ত সকাম কর্মের ফলস্বরূপ ইহলোক ও পরলোকের ভোগজনিত সুখ অতিক্রম করেন, তাহলে জন্মজন্মান্তর ধরে যোগাভ্যাসকারী যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিদের সম্বন্ধে বলার কী থাকতে পারে।

সম্বন্ধ—এইরূপ শ্রীমানদের গৃহে জন্মগ্রহণকারী যোগভ্রষ্টের গতির বর্ণনা করে এবং যোগজিজ্ঞাসুর মহিমা জানিয়ে এবার যোগীদের কুলে জন্মগ্রহণকারী যোগভ্রষ্টের গতির পুনরায় প্রতিপাদন করেছেন—

প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ৪৫

কিন্তু যত্নপূর্বক অভ্যাসকারী যোগী বিগত বহুজন্মের সাধন সঞ্চিত সংস্কারের প্রভাবে এই জন্মেই পাপরহিত হয়ে যান এবং তৎকালেই পরমগতি লাভ করেন ॥ ৪৫

প্রশ্ন—এখানে '**তু**' কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—শ্রীমানদের গৃহে জন্মগ্রহণকারী ও যোগ-জিজ্ঞাসুদের থেকেও যোগীকুলে জন্মগ্রহণকারী যোগভ্রষ্ট পুরুষের পরবর্তী গতির বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপনের জন্য '**তু**' পদের প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—'**যোগী**'-র সঙ্গে '**প্রযত্নাদ্ যতমানঃ**' বিশেষণ দেওয়ার কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—তেতাল্লিশতম শ্লোকে জানানো হয়েছে যে যোগীকুলে জন্মগ্রহণকারী যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি তথায় যোগসিদ্ধির জন্য অধিক যত্নশীল হয়। এই শ্লোকে সেই ব্যক্তির পরমগতি লাভের ফল বলা হয়েছে—এই কথাটি স্পষ্ট করার জন্য এখানে '**যোগী**' শব্দের সঙ্গে '**প্রযত্নাদ্ যতমানঃ**' বিশেষণ দেওয়া হয়েছে। কেননা প্রযত্নের ফল সেখানে বলা হয়নি, সেটি এখানে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—'**অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ**' বলার কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—তেতাল্লিশতম শ্লোকে জানানো হয়েছে যে

যোগীকুলে জন্মগ্রহণকারী যোগভ্রষ্ট পুরুষ পূর্বজন্মে কৃত যোগাভ্যাসের সংস্কার লাভ করেন, এখানে সেই বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য **'অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ'** বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে পূর্বের অনেক জন্মে করা অভ্যাস এবং ইহজন্মের অভ্যাস—উভয়ই তাঁকে যোগসিদ্ধি প্রাপ্তি করানোর অর্থাৎ সাধনের পরাকাষ্ঠা পর্যন্ত পৌঁছানোর কারণ হয়। কেননা পূর্বসংস্কারের বলেই তিনি বিশেষ যত্নের সঙ্গে ইহজন্মে সাধনের অভ্যাস করে সাধনের পরাকাষ্ঠা লাভ করেন।

প্রশ্ন—**'সংশুদ্ধকিল্বিষঃ'**-এর ভাবার্থ কী ?

উত্তর—যাঁর সমস্ত পাপ সর্বতোভাবে ধৌত হয়ে গেছে, তাঁকে বলা হয় **'সংশুদ্ধকিল্বিষঃ'**। এর তাৎপর্য হল, এইরূপ অভ্যাসকারী যোগীর পাপের লেশমাত্র থাকে না।

প্রশ্ন—**'ততঃ'** কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—**'ততঃ'** পদটি এখানে তৎপশ্চাতের অর্থে ব্যবহৃত। এর প্রয়োগ করে এই ভাব দেখানো হয়েছে যে সাধনের পরাকাষ্ঠারূপ সংসিদ্ধি প্রাপ্ত হলে তৎকালই পরমগতি প্রাপ্তি হয়, একটুও বিলম্ব হয় না।

প্রশ্ন—'পরমগতি' প্রাপ্তি কাকে বলে ?

উত্তর—পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লাভ করাই হল পরমগতি প্রাপ্তি হওয়া ; একেই পরমপদ প্রাপ্তি, পরমধাম প্রাপ্তি এবং নৈষ্ঠিকী শান্তি প্রাপ্তিও বলা হয়।

সম্বন্ধ—যোগভ্রষ্টের গতির বিষয় সম্পূর্ণ করে, ভগবান এবার যোগীর মহিমা বলতে গিয়ে অর্জুনকে যোগী হওয়ার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন।

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন॥ ৪৬

যোগী তপস্বিগণের থেকে শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের থেকেও শ্রেষ্ঠ এবং সকাম কর্মানুষ্ঠান-কারিগণের থেকেও শ্রেষ্ঠ। অতএব হে অর্জুন ! তুমি যোগী হও॥ ৪৬

প্রশ্ন—**'তপস্বী'** শব্দ এখানে কীসের বাচক ?

উত্তর—সকামভাবে ধর্মপালনের জন্য ইন্দ্রিয়-সংযমপূর্বক ক্রিয়াসমূহ এবং বিষয় ভোগাদি ত্যাগ করে যিনি মন, ইন্দ্রিয় এবং শরীর-সম্বন্ধীয় সমস্ত কষ্ট সহ্য করেন, তাকেই 'তপ' বলা হয় এবং যিনি তা করেন তাঁকে এখানে তপস্বী বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে 'জ্ঞানী' বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে 'জ্ঞানী' শব্দটি ভগবৎপ্রাপ্ত তত্ত্ব-জ্ঞানী ব্যক্তির বাচকও নয় এবং ঈশ্বর লাভের জন্য জ্ঞানযোগের সাধনকারী জ্ঞানযোগীরও বাচক নয়। এখানে 'জ্ঞানী' কথাটি কেবল শাস্ত্র ও আচার্যের উপদেশানুসারে বিবেক-বুদ্ধিপূর্বক সমস্ত পদার্থের যথার্থ জ্ঞানসম্পন্ন শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষের বাচক।

প্রশ্ন—এখানে **'কর্মী'** কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যজ্ঞ, দান, পূজা, সেবা ইত্যাদি শাস্ত্রবিহিত শুভকর্মগুলি স্ত্রী, পুত্র, ধন এবং স্বর্গাদি প্রাপ্তির জন্য সকামভাবে যাঁরা করেন তাঁদের এখানে 'কর্মী' বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—তপস্যাকারী এবং শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পাদন-কারীও সকামভাবের দ্বারা যুক্ত ; তাহলে তাঁদেরও কর্মীর অন্তর্গত মনে করা উচিত ছিল ; কিন্তু তা না মেনে তাঁদের তা থেকে আলাদা কেন করা হয়েছে ?

উত্তর—এখানে 'কর্মী' কথাটির প্রয়োগ এতো ব্যাপক অর্থে করা হয়নি। সকামভাবে যজ্ঞ-দানাদি শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াকারীদের কর্মী বলা হয়। এতে ক্রিয়ার বাহুল্য থাকে। তপস্বীর মধ্যে ক্রিয়ার বাহুল্য নেই, মন ও ইন্দ্রিয়ের সংযমের প্রাধান্য থাকে এবং শাস্ত্রজ্ঞানীর মধ্যে শাস্ত্রীয় বৌদ্ধিক আলোচনার প্রাধান্য থাকে। ভগবান এই বৈশিষ্ট্যকে স্মরণে রেখেই কর্মীর মধ্যে তপস্বী ও শাস্ত্রজ্ঞানীকে অন্তর্ভুক্ত না করে তাঁদের পৃথকভাবে নির্দেশ করেছেন।

প্রশ্ন—এই শ্লোকে 'যোগী' শব্দের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ, ভক্তিযোগ এবং

কর্মযোগ ইত্যাদি যে কোনো সাধন দ্বারা সাধনের পরাকাষ্ঠারূপ 'সমত্বযোগ' লাভকারী পুরুষকে এখানে 'যোগী' বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ—এই দুটি নিষ্ঠাই মানা হয়েছে ; তাহলে ভক্তিযোগ, ধ্যানযোগ কি এর থেকে পৃথক ?

উত্তর—ভক্তিযোগ কর্মযোগেরই অন্তর্গত। যেখানে ভক্তিপ্রধান কর্ম হয়, সেখানে তাকে ভক্তিযোগ এবং যেখানে কর্মপ্রধান, সেখানে তাকে কর্মযোগ বলা হয়। ধ্যানযোগ দুটি নিষ্ঠারই সহায়ক সাধন। সেটি অভেদ-বুদ্ধি দ্বারা করলে জ্ঞানযোগে এবং ভেদ-বুদ্ধিতে করা হলে কর্মযোগের সহায়ক হয়।

সম্বন্ধ—পূর্বশ্লোকে যোগীকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে ভগবান অর্জুনকে যোগী হতে বলেছেন। কিন্তু জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ ইত্যাদি সাধনের মধ্যে অর্জুনের কোন্ সাধন করা উচিত ? সেই কথাটি স্পষ্টভাবে বলেননি। সুতরাং এবার ভগবান তাঁর প্রতি অনন্য প্রেমযুক্ত ভক্ত যোগীর প্রশংসা করে অর্জুনকে নিজের দিকে আকর্ষণ করছেন—

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ ৪৭

সকল যোগীর মধ্যে যিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে মদ্গতচিত্তে নিরন্তর আমার ভজনা করেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী, এই আমার মত॥ ৪৭

প্রশ্ন—এখানে **'যোগিনাম্'** পদের সঙ্গে **'অপি'**র প্রয়োগ এবং **'সর্বেষাম্'** এই বিশেষণ ব্যবহারের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—চতুর্থ অধ্যায়ের চব্বিশ থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত ঈশ্বর লাভের যতপ্রকার সাধন যজ্ঞের নামে বলা হয়েছে, তা ছাড়াও ভগবদ্প্রাপ্তির আরও যেসব সাধন এখন পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে, সেই সবের পরাকাষ্ঠার নাম 'যোগ' হওয়ায় বিভিন্ন সাধনকারী বহুপ্রকারের 'যোগী' হতে পারেন। সেই সব প্রকারের যোগীদের লক্ষ্য করানোর উদ্দেশ্যে এখানে **'যোগিনাম্'** পদের সঙ্গে **'অপি'** পদ প্রয়োগ করে **'সর্বেষাম্'** বিশেষণ প্রযুক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন—**'শ্রদ্ধাবান্'** ব্যক্তির লক্ষণ কী ?

উত্তর—যিনি ভগবানের অস্তিত্বে, তাঁর অবতার-রূপে, তাঁর বাক্যে, তাঁর অচিন্ত্য-অনন্ত দিব্য গুণাদিতে তথা তাঁর নাম, লীলা এবং মহিমা, শক্তি, প্রভাব ও ঐশ্বর্য ইত্যাদিতে প্রত্যক্ষের ন্যায় পূর্ণ ও অটল বিশ্বাস রাখেন, তাঁকে বলা হয় **'শ্রদ্ধাবান্'**।

প্রশ্ন—**'মদ্গতেন'** বিশেষণের সঙ্গে **'অন্তরাত্মা'** পদটি কীসের বাচক ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান দেখিয়েছেন যে, আমাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বগুণাধার, সর্বশক্তিমান ও সর্বোত্তম প্রিয় জেনে যিনি আমার প্রতি অনন্য প্রেম পোষণ করেন এবং এইজন্য যাঁর মন-বুদ্ধিরূপ অন্তঃকরণ অচল, অটল ও অনন্যভাবে আমাতে স্থিত হয়েছে, সেই অন্তঃকরণকে 'মদ্গত অন্তরাত্মা' বা আমাতে সংযুক্ত অন্তরাত্মা বলা হয়।

প্রশ্ন—এখানে অনন্য প্রেমে ভগবানে স্থিত হওয়া মন-বুদ্ধিকেই 'মদ্গত-অন্তরাত্মা' বলা হয়েছে কেন ? ভয় ও দ্বেষ ইত্যাদি কারণেও তো মন-বুদ্ধি ভগবানে সংযুক্ত হতে পারে ?

উত্তর—তা পারে এবং যে কোনো কারণেই মন-বুদ্ধি পরমাত্মাতে সংযুক্ত হওয়ার ফল পরম কল্যাণ-কারকই হয়ে থাকে। কিন্তু এখানকার প্রসঙ্গ প্রেমপূর্বক ভগবানে মন সংলগ্ন করার ; ভয় ও দ্বেষপূর্বক নয়। কারণ ভয় ও দ্বেষের জন্য যাঁর মন-বুদ্ধি ভগবানে সংলগ্ন হয়, তাঁকে শ্রদ্ধাবানও বলা যায় না বা পরম যোগীও মানা যায় না। এর পর সপ্তম অধ্যায়ের আরম্ভেই ভগবান

'**ময্যাসক্তমনাঃ**' বলে অনন্য প্রেমেরই সঙ্কেত দিয়েছেন। এতদ্ব্যতীত গীতায় স্থানে স্থানে (৭।১৭ ; ৯।১৪ ; ১০।১০) প্রেমপূর্বক ভগবানে মন-বুদ্ধি নিবেশ করার প্রশংসা করা হয়েছে। সুতরাং এখানেও সেটিই মানা উচিত।

প্রশ্ন—এখানে '**মাম্**' পদটি ভগবানের সগুণরূপের বাচক না নির্গুণের ?

উত্তর—এখানে '**মাম্**' পদটি নিরতিশয় জ্ঞান, শক্তি, ঐশ্বর্য, বীর্য ও তেজ ইত্যাদি পরম আশ্রয়, সৌন্দর্য, মাধুর্য ও ঔদার্যের অনন্ত সমুদ্র, পরম দয়ালু, পরম সুহৃদ্, পরম প্রেমী, দিব্য অচিন্ত্যানন্দ স্বরূপ, নিত্য, সত্য, অজ ও অবিনাশী, সর্বান্তর্যামী, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সর্বদিব্য-গুণালঙ্কৃত, সর্বাত্মা, অচিন্ত্য, মহত্ত্ব দ্বারা মহিমান্বিত, অনুপম লীলাকারী, লীলামাত্রে প্রকৃতি দ্বারা সম্পূর্ণ জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারকারী এবং রসসাগর, রসময়, আনন্দকন্দ, সগুণ-নির্গুণরূপ সমগ্র ব্রহ্ম পুরুষোত্তমের বাচক।

প্রশ্ন—এখানে '**ভজতে**' এই ক্রিয়াপদটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—সর্বপ্রকারে এবং সর্বভাবে নিজের মন-বুদ্ধিকে ভগবানে নিবিষ্ট করে পরম শ্রদ্ধা ও প্রেমের সঙ্গে, চলা-ফেরা, ওঠা-বসা, পান-ভোজন, শয়ন-জাগরণ, প্রত্যেক ক্রিয়ার সময় বা একান্তে অবস্থান কালে নিরন্তর শ্রীভগবানের ভজন-ধ্যান করা হল 'ভজতে' কথাটির অর্থ।

প্রশ্ন—তাকে আমি পরম শ্রেষ্ঠ বলে মান্য করি —ভগবানের এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর— শ্রীভগবান এখানে তাঁর প্রেমিক ভক্তদের মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে বলতে চেয়েছেন যে, যদিও আমার কাছে তপস্বী, জ্ঞানী, কর্মী ইত্যাদি সকলেই প্রিয় এবং এর মধ্যে সেই যোগী সবথেকে প্রিয় যিনি আমাকে পাবার জন্য সাধন করেন, কিন্তু যিনি আমার সমগ্ররূপ জেনে আমাকেই অনন্যভাবে প্রেম করেন, কেবলমাত্র আমাকেই পরম প্রেমাস্পদ মেনে নিয়ে, কোনো কিছুর আশা-আকাঙ্ক্ষা বা পরোয়া না করে তাঁর অন্তরাত্মাকে দিন-রাত আমাতেই নিবিষ্ট করে রাখেন, মাতৃপরায়ণ শিশুর ন্যায় যিনি আমা ব্যতীত আর কিছুই জানেন না তিনি তো আমার হৃদয়ের পরম ধন। অপত্যস্নেহে যাঁর হৃদয় পরিপূর্ণ, যাঁর দিন-রাত নিজ প্রিয় শিশুর দিকে তাকিয়ে থাকতেই নিত্যনতুন আনন্দ লাভ হয়, এরূপ বাৎসল্য-স্নেহপূর্ণ অনন্ত মাতাদের হৃদয় আমার যে অচিন্ত্য-অনন্ত প্রেমময় হৃদয় সাগরের একটি ফোঁটারও সমকক্ষ নয়, সেইরূপ হৃদয় নিয়ে আমি তার দিকে তাকিয়ে থাকি এবং তার প্রতিটি উদ্যোগ আমাকে অপার আনন্দ ও সুখ প্রদান করে। অনাদিকাল থেকে সমস্ত বিশ্ব-সংসার যতপ্রকার এবং যেসব আনন্দ উপভোগ করেছে, সেসব আমার আনন্দ সাগরের একটি ফোঁটারও সমকক্ষ নয়। এরূপ অনন্ত আনন্দের অপার সাগর হয়েও আমি নিজে সেই 'মদ্গতান্তরাত্মা' ভক্তের চেষ্টা লক্ষ্য করে পরম আনন্দ লাভ করে থাকি। তাঁর কী প্রশংসা করব ? তিনি তো আমার নিজেরই, আমারই। তাঁর থেকে বেশি প্রিয়তম আমার আর কে হতে পারে ? যিনি আমার প্রিয়তম, তিনিই তো শ্রেষ্ঠ, তাই আমার মনে তিনিই সর্বোত্তম ভক্ত এবং তিনিই সর্বোত্তম যোগী।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
আত্মসংযমযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।। ৬।।

ॐ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ

সপ্তম অধ্যায়

(জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ)

ষট্‌কের স্পষ্টীকরণ

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়গুলির মধ্যে যদিও কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগের ক্রমে ছটি করে অধ্যায় নিয়ে তিনটি ষট্‌ক মানা হয়, কিন্তু এর অভিপ্রায় এই নয় যে এই ষট্‌কগুলিতে কেবল একটি যোগেরই বর্ণনা রয়েছে এবং অন্য যোগের আলোচনা নেই। যে ষট্‌কে যে যোগের বর্ণনার প্রাধান্য আছে, সেই অনুসারে তার নাম রাখা হয়েছে।

প্রথম ষট্‌কের প্রথম অধ্যায় প্রস্তাবনারূপে আছে, এর মধ্যে কোনো যোগের বিষয় নেই। দ্বিতীয়তে এগারো থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত সাংখ্যযোগ (জ্ঞানযোগ)-এর বিষয়, এরপর উনচল্লিশ থেকে তৃতীয় অধ্যায়ের শেষপর্যন্ত কর্মযোগেরই বিস্তৃত বর্ণনা আছে। চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের মিলিত বর্ণনা এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রধানতঃ ধ্যানযোগের বর্ণনা আছে ; সেই সঙ্গে প্রসঙ্গানুসারে কর্মযোগ ইত্যাদিরও বর্ণনা করা হয়েছে। এইরূপ যদিও এই ষট্‌কে সকল বিষয় মিশ্রিত আছে, তবুও অন্য দুটি ষট্‌কের থেকে এতে কর্মযোগের বর্ণনা বেশি আছে। সেই দৃষ্টিতে এটিকে কর্মযোগপ্রধান ষট্‌ক মানা হয়।

সপ্তম অধ্যায় থেকে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত মধ্যের ষট্‌কে প্রসঙ্গবশতঃ কোথাও কোথাও অন্য বিষয়ের আলোচনা থাকলেও এই ষট্‌কে প্রধানতঃ ভক্তিযোগের বিশদ বর্ণনাই আছে ; তাই এই ষট্‌ককে ভক্তিপ্রধান মানাই উচিত।

শেষ ষট্‌কের ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায় স্পষ্টতঃই জ্ঞানযোগের প্রকরণ। পঞ্চদশে ভক্তিযোগের বর্ণনা আছে ; ষোড়শে দৈবাসুর সম্পত্তির ব্যাখ্যা, সপ্তদশে শ্রদ্ধা, ভোজন, যজ্ঞ, দান, তপ ইত্যাদির নিরূপণ এবং অষ্টাদশে গীতার উপসংহার হওয়ায় এতে কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান—তিন যোগেরই বর্ণনা রয়েছে ও শেষে শরণাগতি-প্রধান ভক্তিযোগে উপদেশের পর্যবসান করা হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও একথা মানতেই হবে যে জ্ঞানযোগের যত বর্ণনা এই শেষ ষট্‌কে করা হয়েছে, তা প্রথম ও দ্বিতীয় ষট্‌কে নেই। তাই এটিকে জ্ঞানযোগপ্রধান বলা যেতে পারে।

অধ্যায়ের নাম

পরমাত্মার নির্গুণ নিরাকার তত্ত্বের প্রভাব, মাহাত্ম্য ইত্যাদি রহস্য পূর্ণরূপে জানার নাম 'জ্ঞান' এবং সগুণ-নিরাকার ও সাকার তত্ত্বের লীলা, রহস্য, মহত্ত্ব, গুণ, প্রভাব ইত্যাদির পূর্ণ জ্ঞানের নাম 'বিজ্ঞান'। এই জ্ঞান ও বিজ্ঞান-সহ ভগবানের স্বরূপকে জানাই হল সমগ্র ভগবানকে জানা। এই অধ্যায়ে এই সমগ্র ভগবানের স্বরূপ, তাঁকে জানার অধিকারীগণের এবং সাধনের বর্ণনা আছে। তাই এই অধ্যায়ের নাম রাখা হয়েছে **'জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ'** ।

সংক্ষিপ্ত অধ্যায়-সার

এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে সমগ্র রূপের বর্ণনা শোনার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন ; দ্বিতীয়তে বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের বর্ণনা করার প্রতিজ্ঞা করে তার প্রশংসা করে তৃতীয়তে তত্ত্বতঃ ভগবৎস্বরূপ জানার দুর্লভতা প্রতিপাদন করেছেন। চতুর্থ ও পঞ্চমে নিজ পরা-অপরা প্রকৃতির স্বরূপ জানিয়ে, ষষ্ঠতে উভয় প্রকৃতিকে সমস্ত ভূতাদির কারণ ও নিজেকে সেসবের মহাকারণ বলে জানিয়েছেন। সপ্তমে সমস্ত জগৎকে নিজেরই স্বরূপ জানিয়ে মালার দৃষ্টান্ত দিয়ে সাররূপে নিজের ব্যাপকতা জানিয়েছেন। পরে অষ্টম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত নিজ সর্বব্যাপকতা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। ত্রয়োদশে নিজেকে (ভগবানকে) তত্ত্বতঃ না জানার কারণ নিরূপণ করে চতুর্দশে নিজ মায়ার অত্যন্ত দুস্তরতার বর্ণনা করে তার থেকে পার হওয়ার উপায় জানিয়েছেন। পঞ্চদশে পাপাত্মা মূঢ় মানুষ দ্বারা ভজনা না করার কথা বলে ষোড়শে তাঁর চার প্রকার

পুণ্যাত্মা ভক্তদের কথা বলেছেন। সপ্তদশে জ্ঞানীভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করে, অষ্টাদশে সকল ভক্তকে উদার ও জ্ঞানীকে নিজের আত্মা বলেছেন। উনিশতমতে জ্ঞানীভক্তের দুর্লভতা বর্ণনা করেছেন। বিশতমতে অন্য দেবোপাসকদের কথা বলে একুশতমতে অন্য দেবতাতে শ্রদ্ধা স্থির করার ও বাইশতমতে তাঁদের উপাসনার ফল নিরূপণ করা হয়েছে। তেইশতমতে অন্য দেবতাদের উপাসনার ফলকে বিনাশশীল বলে তাঁর উপাসনার প্রাপ্তিরূপ মহাফলের কথা বলা হয়েছে। চব্বিশ ও পঁচিশতমতে তাঁর গুণ, প্রভাব, স্বরূপ না জানার কারণ বর্ণনা করে ছাব্বিশতমতে বলা হয়েছে যে, আমি সকলকে জানি, কিন্তু আমাকে কেউ জানে না। সাতাশতমতে না জানার কারণ বলে আঠাশতমতে তাঁকে ভজনাকারী দৃঢ়ব্রতী শ্রেষ্ঠ ভক্তদের লক্ষণাদি বর্ণনা করেছেন। তারপর উনত্রিশতমতে ভগবানের আশ্রয় নিয়ে যত্নকারীদের ব্রহ্মপ্রাপ্তি হওয়ার কথা বলে ত্রিশতম শ্লোকে নিজ সমগ্র স্বরূপ জানার মহিমা নিরূপণ করে অধ্যায়ের উপসংহার করেছেন।

সম্বন্ধ—ষষ্ঠ অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে—'অন্তরাত্মাকে আমাতে নিবিষ্ট করে যিনি শ্রদ্ধা ও প্রেম-সহ আমার ভজনা করেন, তিনি সর্বপ্রকার যোগীর মধ্যে উত্তম যোগী।' কিন্তু মানুষ যতক্ষণ ভগবানের স্বরূপ, গুণ ও প্রভাব জানতে না পারে ততক্ষণ তার দ্বারা অন্তরের সঙ্গে নিরন্তর ভজন হওয়া অত্যন্ত কঠিন ; সেই সঙ্গে ভজনের প্রকার জানাও প্রয়োজন। তাই ভগবান এবার তাঁর গুণ, প্রভাবের সঙ্গে সমগ্র স্বরূপের ও বিবিধ প্রকারের ভক্তিযোগের বর্ণনা করার জন্য সপ্তম অধ্যায় আরম্ভ করছেন এবং সর্ব প্রথমে দুটি শ্লোকে অর্জুনকে সেটি সাবধানে শোনার জন্য প্রেরণা দিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা বলার জন্য প্রতিজ্ঞা করছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥ ১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে পার্থ ! একনিষ্ঠ ভক্তির দ্বারা আমাতে আসক্ত চিত্ত, মৎপরায়ণ এবং যোগযুক্ত হয়ে যেভাবে তুমি বিভূতি, বল ও ঐশ্বর্যগুণে যুক্ত সকলের আত্মরূপ আমাকে নিঃসংশয়ে জানতে পারবে, তা শোনো॥ ১

প্রশ্ন—'**ময্যাসক্তমনাঃ**' কাকে বলা হয়েছে ?

উত্তর—ইহলোক বা পরলোকের কোনো ভোগের প্রতি যাঁর বিন্দুমাত্র আসক্তি নেই এবং যাঁর মন সবদিক থেকে সরে গিয়ে একমাত্র পরম প্রেমাস্পদ সর্বগুণ-সম্পন্ন পরমেশ্বরে এতো বেশি আসক্ত হয়েছে যে জল বিনা মাছ যেমন ভীষণ ব্যাকুল হয়ে পড়ে, তেমনই যিনি এক মুহূর্তও ভগবানের বিয়োগ ও বিস্মরণ সহ্য করতে পারেন না, তাঁকে ভগবান '**ময্যাসক্তমনাঃ**' বলেছেন।

প্রশ্ন—'**মদাশ্রয়ঃ**' কাকে বলা হয় ?

উত্তর—যে ব্যক্তি জগতের সমস্ত আশ্রয় ত্যাগ করে সমস্ত আশা-ভরসার থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র ভগবানের ওপরই নির্ভর করে থাকেন এবং সর্বশক্তিমান ভগবানকেই পরম আশ্রয় ও পরমগতি জেনে একমাত্র তাঁর ওপর ভরসা করে চিরকালের মতো নিশ্চিন্ত হয়ে যান, তাঁকেই ভগবান '**মদাশ্রয়ঃ**' বলেছেন।

প্রশ্ন—'**যোগং যুঞ্জন্**'-এর অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এটি ভক্তিযোগের প্রকরণ। সুতরাং মন ও বুদ্ধিকে অচলভাবে ভগবানে স্থির করে নিত্য-নিরন্তর শ্রদ্ধা-প্রেমপূর্বক তাঁর চিন্তা করাই হল '**যোগং যুঞ্জন্**'-এর অভিপ্রায়।

প্রশ্ন—সমগ্র ভগবানকে সংশয়রহিত ভাবে জানার কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—ভগবান এটুকু বা ঐটুকু নন ; অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড তাঁতে ওতপ্রোত, সব তাঁরই স্বরূপ। এই ব্রহ্মাণ্ডে বা এর অতীত যা কিছু আছে, সব তাঁতেই অবস্থিত। তিনি নিত্য, সত্য, সনাতন, তিনি সর্বগুণ-সম্পন্ন, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, সর্বাধার ও সর্বরূপ এবং নিজেই নিজের যোগমায়া দ্বারা জগৎরূপে প্রকটিত হন।

বস্তুতঃ তিনি ছাড়া আর কিছু নেই-ই ; ব্যক্ত-অব্যক্ত, সগুণ-নির্গুণ সবই তিনি। এইভাবে সেই ভগবানের স্বরূপকে অভ্রান্ত ও অসন্দিগ্ধরূপে জেনে নেওয়াই হল সমগ্র ভগবানকে সংশয়রহিত ভাবে জানা।

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্ জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥ ২

আমি তোমাকে বিজ্ঞানসহ তত্ত্বজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে বলছি, যা জানলে ইহলোকে আর কিছুই জানবার বাকি থাকে না॥ ২

প্রশ্ন—এখানে '**জ্ঞান**' ও '**বিজ্ঞান**' কীসের বাচক ?

উত্তর—ভগবানের নির্গুণ নিরাকার তত্ত্বের যে প্রভাব, মাহাত্ম্য ও রহস্যসহ যথার্থ জ্ঞান, তাকে 'জ্ঞান' বলা হয়। তেমনই তাঁর সগুণ নিরাকার এবং দিব্য সাকার তত্ত্বের লীলা, রহস্য, গুণ, মহত্ত্ব ও প্রভাবসহ যথার্থ জ্ঞানকে বলা হয় '**বিজ্ঞান**'।

প্রশ্ন—এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বর্ণনা এই অধ্যায়ে কোথায় করা হয়েছে ?

উত্তর—এই অধ্যায়ে যা কিছু উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তার সমস্তই জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভের সাধনরূপ। তাই যেমন ত্রয়োদশ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোক থেকে একাদশতম পর্যন্ত জ্ঞানের সাধনকে 'জ্ঞান' বলা হয়েছে, তেমনই এই সমস্ত অধ্যায়কেই, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপদেশে পূর্ণ হওয়ায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানরূপ বলেই জানতে হবে।

প্রশ্ন—যে বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের কথা বলা হচ্ছে তা জেনে নিলে জগতে কিছু জানার বাকি থাকে না, এ কথা কী করে বলা হল ?

উত্তর—জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাহায্যে ভগবানের সমগ্র স্বরূপ ভালোভাবে উপলব্ধি হয়ে যায়। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তো সমগ্র-রূপের এক ক্ষুদ্র অংশমাত্র। মানুষ যখন ভগবানের সমগ্ররূপকে জেনে যায়, তখন স্বাভাবিকভাবেই তার আর কিছু জানার বাকি থাকে না। দশম অধ্যায়ের শেষে ভগবান স্বয়ং বলেছেন যে 'হে অর্জুন ! তোমার অধিক জানার প্রয়োজন কী ? আমি আমার তেজের একাংশের দ্বারা এই সমগ্র বিশ্বকে ধারণ করে অবস্থান করছি।' তাই এখানে এই কথা বলা সঠিকই হয়েছে।

সম্বন্ধ—নিজ সমগ্ররূপের জ্ঞান-বিজ্ঞান জানাবার প্রতিজ্ঞা করে এবার ভগবান তাঁর সেই স্বরূপকে তত্ত্বতঃ জানার দুর্লভতা প্রতিপাদন করছেন—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ ৩

হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কোনো একজন আমাকে লাভ করার জন্য চেষ্টা করেন, আর সেই যত্নকারীদের মধ্যে কোনও একজন আমার পরায়ণ হয়ে আমাকে তত্ত্বতঃ জানতে পারেন॥ ৩

প্রশ্ন—এখানে '**মনুষ্য**' শব্দটি প্রয়োগের ভাবার্থ কী ?

উত্তর—'মনুষ্য' শব্দ প্রয়োগের একটি অভিপ্রায় হল যে, মনুষ্যজন্ম অতি দুর্লভ, ভগবানের অত্যন্ত কৃপায় তা লাভ হয় ; কারণ এতে সকলেরই ভগবদ্প্রাপ্তির জন্য সাধন করার জন্মসিদ্ধ অধিকার থাকে। জাতি, বর্ণ, আশ্রম ও দেশের বিভিন্নতায় কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। এছাড়া আর একটি অভিপ্রায় হল যে মনুষ্যেতর যত প্রাণী আছে, তাদের নতুন কর্ম করার অধিকার নেই ; সুতরাং কোনো প্রাণী ভগবদ্প্রাপ্তির জন্য সাধন করতে পারে না। পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি প্রাণীর সাধনা করার শক্তি বা যোগ্যতাই নেই। দেবাদি জন্মে শক্তি থাকলেও তাঁদের

ভোগের আধিক্য ও বিশেষ করে অধিকার না হওয়ায় তাঁরা সাধন করতে পারেন না। তির্যক বা দেবাদি জন্মে কারো যদি পরমাত্মার জ্ঞান লাভ হয় তাহলে তাতে ভগবানের বা মহাপুরুষদের বিশেষ দয়ার প্রভাব ও মহত্ত্ব বলে জানতে হবে।

প্রশ্ন—হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কোনো একজনই ভগবদ্প্রাপ্তির জন্য সাধন করেন, এর কারণ কী ?

উত্তর—ভগবদ্‌কৃপার ফলস্বরূপ মনুষ্যদেহ লাভ হলেও জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কারের ফলে ভোগে অত্যন্ত আসক্তি ও ভগবানে শ্রদ্ধা-প্রেমের অভাব থাকায় অধিকাংশ মানুষ এই পথের দিকে মুখই ফেরায় না। যাঁর পূর্ব সংস্কার শুভ হয়, ভগবান, মহাপুরুষ ও শাস্ত্রে যাঁর কিছু শ্রদ্ধা-ভক্তি থাকে এবং পূর্বকৃত পুণ্যের দ্বারা ও ভগবদ্‌কৃপায় যিনি সৎপুরুষের সঙ্গ প্রাপ্ত হন, হাজার হাজার মানুষের মধ্যে এমন কেউ কেউ হয়তো এই পথে প্রবৃত্ত হয়ে চেষ্টা করেন।

প্রশ্ন—ভগবদ্প্রাপ্তির জন্য প্রযত্নশীল ব্যক্তিদের মধ্যে কোনো একজনই ভগবানকে তত্ত্বতঃ জানতে পারেন, এর কারণ কী ? সকলেই কেন জানতে পারে না ?

উত্তর—এর কারণ হল যে, পূর্ব সংস্কার, শ্রদ্ধা, প্রীতি, সৎসঙ্গ ও চেষ্টার তারতম্যতে সকলের সাধন একপ্রকার হয় না। অহংকার, মমতা, কামনা, আসক্তি ও সঙ্গ-দোষাদির কারণে নানাপ্রকার বিঘ্নও আসে। তাই অত্যন্ত কম ব্যক্তিই এরূপ দেখা যায় যাঁর শ্রদ্ধা-ভক্তি ও সাধনা পূর্ণ হয় এবং তার ফলস্বরূপ এই জন্মেই তিনি ভগবানকে লাভ করেন।

প্রশ্ন—যত্নকারীদের সঙ্গে 'সিদ্ধ' বিশেষণ দেওয়ার কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—এর এই অভিপ্রায় বুঝতে হবে যে, বিষয়াসক্ত, ভোগে নিমজ্জিত মানুষদের তুলনায় যারা পরমাত্মা প্রাপ্তিরূপ পরমসিদ্ধির জন্য প্রযত্ন করে, তাঁরাও সিদ্ধ সমতুল্য।

সম্বন্ধ—ভগবান এই পর্যন্ত নিজ সমগ্র স্বরূপের জ্ঞান-বিজ্ঞান বলার প্রতিজ্ঞা এবং তার প্রশংসা করেছেন। এবার জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রকরণ আরম্ভ করতে গিয়ে প্রথমে নিজের 'অপরা' ও 'পরা' প্রকৃতির স্বরূপ জানাচ্ছেন—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ ৪
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥ ৫

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহংকার—এই হল আটভাগে বিভক্ত আমার অপরা প্রকৃতি অর্থাৎ এইগুলি আমার জড় প্রকৃতি এবং হে মহাবাহো ! এছাড়া অন্য প্রকৃতি যার দ্বারা এই সম্পূর্ণ জগৎ ধৃত আছে, তাকে আমার জীবরূপা পরা অর্থাৎ চেতন প্রকৃতি বলে জানবে॥ ৪-৫

প্রশ্ন—এখানে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ-দ্বারা কী বোঝা উচিত ?

উত্তর—স্থূল ভূতাদি এবং শব্দাদি পাঁচ বিষয়াদির কারণরূপ যে সূক্ষ্ম পঞ্চমহাভূত—সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রে যাকে পঞ্চতন্মাত্রা বলা হয়, সেই পাঁচটিকে এখানে 'পৃথিবী' ইত্যাদি নামে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে মন, বুদ্ধি ও অহংকারের দ্বারা কী বোঝা উচিত ?

উত্তর—মন, বুদ্ধি ও অহংকার—এই তিনটি অন্তঃকরণেরই ভিন্নতা ; সুতরাং এর দ্বারা 'সমষ্টি অন্তঃকরণ' বোঝা উচিত।

প্রশ্ন—ত্রয়োদশ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে অব্যক্ত

প্রকৃতির কার্য (ভাগ) তেইশটি বলা হয়েছে, সেই অনুসারে প্রকৃতিকে তেইশটি ভাগে বিভক্ত বলা উচিত ছিল ; তাহলে এখানে তাকে শুধু আট ভাগে বিভক্ত বলা হয়েছে কেন ?

উত্তর—শব্দাদি পাঁচবিষয় সূক্ষ্ম পঞ্চ-মহাভূতাদির এবং দশ ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণের কার্য। তাই সেই পনেরোটি ভাগ এই আট ভাগেরই অন্তর্ভুক্ত। সেইভাবে ওগুলিকে তেইশ ভাগে এবং এইভাবে আটভাগে ভাগ করা একই ব্যাপার।

প্রশ্ন—এই প্রকৃতির 'অপরা' নাম রাখা হয়েছে কেন ?

উত্তর— ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান যে অব্যক্ত মূল প্রকৃতির তেইশটি কার্যের কথা বলেছেন, সেগুলিকেই এখানে আটভাগে বিভক্ত বলেছেন। এই 'অপরা প্রকৃতি' জ্ঞেয় ও জড় হওয়ায় তা জ্ঞাতা চেতন জীবরূপা 'পরা প্রকৃতি' হতে সর্বতোভাবে ভিন্ন ও নিকৃষ্ট ; এটিই জগতের কারণরূপ এবং এর দ্বারাই জীবের বন্ধন হয়। তাই এর নাম 'অপরা'।

প্রশ্ন — জীবরূপ চেতনতত্ত্ব তো পুংলিঙ্গ, এখানে 'প্রকৃতি' নামে তাকে স্ত্রীলিঙ্গ বলা হয়েছে কেন ?

উত্তর— প্রকৃতপক্ষে জীবাত্মাতে নারী-পুরুষ বা নপুংসকের পার্থক্য নেই—সেটি দেখাবার জন্যই সেই একই চেতনতত্ত্বকে কোথাও পুংলিঙ্গ 'পুরুষ' (১৫।১৬) এবং 'ক্ষেত্রজ্ঞ' (১৩।১) এবং কোথাও নপুংসক 'অধ্যাত্ম' (৭।২৯, ৮।৩) বলা হয়েছে। তাকেই এখানে স্ত্রীলিঙ্গে 'পরা প্রকৃতি' বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে 'জগৎ' শব্দ কীসের বাচক ? এবং তা জীবরূপা পরা প্রকৃতির দ্বারা ধারণ করা হয়, এরূপ বলা হয়েছে কেন ?

উত্তর—সমস্ত জীবের শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও ভোগ্যবস্তু সকল এবং ভোগস্থানময় এই সমগ্র ব্যক্ত প্রকৃতির নাম জগৎ। যেহেতু এই জগৎরূপ জড় তত্ত্ব সেই চেতন তত্ত্ব দ্বারা ব্যাপ্ত অতএব সেই একে ধারণ করে রেখেছে ; কারণ সে এর থেকে সর্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ এবং সূক্ষ্ম। চেতনের সংযোগ বিনা এই জগতের উৎপত্তি, বিকাশ এবং চালিত হওয়া অসম্ভব। তাই এইরূপ বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ—পরা এবং অপরা প্রকৃতির স্বরূপ জানিয়ে, ভগবান এবার বলছেন যে এই দুই প্রকৃতিই চরাচরের সমস্ত ভূতাদির কারণ এবং আমি এই দুই প্রকৃতিসহ সমস্ত জগতের মহাকারণ—

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥ ৬

হে অর্জুন ! তুমি জেনো যে এই সর্বভূত (জড় ও চেতন) উভয় প্রকৃতির সংযোগে উৎপন্ন এবং আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়রূপ অর্থাৎ সমস্ত জগতের মূল কারণ॥ ৬

প্রশ্ন—এখানে 'সর্বাণি' বিশেষণের সঙ্গে 'ভূতানি' পদ কীসের বাচক ? এবং পরা ও অপরা—এই দুই প্রকৃতি তাঁর যোনি কীভাবে ?

উত্তর— স্থাবর-জঙ্গম অর্থাৎ অচর-চর যত ছোট-বড় সজীব প্রাণী আছে, 'ভূতানি' পদটি এখানে সেই সবের বাচক। সমস্ত সজীব প্রাণীর উৎপত্তি, স্থিতি ও বৃদ্ধি এই 'অপরা' (জড়) ও 'পরা' (চেতন) প্রকৃতির সংযোগেই হয়। তাই তাদের উৎপত্তিতে এই দুটিই কারণ। এই কথা ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ছাব্বিশতম শ্লোকে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের নামে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—'সম্পূর্ণ জগৎ' কীসের বাচক ? ভগবান যে নিজেকে তার প্রভব ও প্রলয় বলেছেন, তার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই জড়-চেতন ও চরাচর সমগ্র বিশ্বের বাচক হল 'জগৎ' শব্দটি ; এর উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় ভগবান থেকেই এবং ভগবানেই হয়। যেমন মেঘ আকাশ থেকে উৎপন্ন হয়ে আকাশেই থাকে এবং আকাশেই বিলীন হয়ে যায়, আকাশই তার একমাত্র কারণ ও আধার, তেমনই এই সমগ্র বিশ্ব ভগবানের থেকেই উৎপন্ন হয়ে তাঁতেই স্থিত হয় ও ভগবানেই বিলীন হয়ে যায়। ভগবানই এর একমাত্র মহাকারণ ও পরম আধার। এই বিষয়টি নবম অধ্যায়ের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকেও

স্পষ্ট করা হয়েছে। এখানে স্মরণে রাখতে হবে যে ভগবান আকাশের ন্যায় জড় বা বিকারী নন। শুধু বোঝাবার জন্যই উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। বস্তুতঃ ভগবানের এই জগৎ-রূপে প্রকটিত হওয়া তাঁর লীলামাত্র।

সম্বন্ধ—ভগবানই এইরূপ সমস্ত বিশ্বের পরমকারণ ও পরমাধার, তাহলে স্বভাবতই এটি ভগবানের স্বরূপ এবং তাঁর দ্বারাই ব্যাপ্ত। এই বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য ভগবান বলছেন—

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥ ৭

হে ধনঞ্জয় ! আমা অপেক্ষা অন্য কোনো পরম কারণ নেই। এই সমগ্র জগৎ, সূত্রে যেমন মণিসমূহ গাঁথা থাকে, তেমনই আমাতে গাঁথা রয়েছে॥ ৭

প্রশ্ন—আমা ভিন্ন অন্য কোনো পরম কারণ নেই, এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে, মহাকাশ যেমন মেঘের কারণ ও আধার আর তার কার্য মেঘ সেই মহাকাশেরই স্বরূপ, বাস্তবে মেঘ নিজ কারণ থেকে পৃথক বস্তু নয় ; তেমনই পরমাত্মা এই জগতের কারণ ও আধার হওয়ায় এই জগৎও তাঁরই স্বরূপ, তাঁকে ছাড়া অন্য বস্তু নেই। সুতরাং পরা-অপরা প্রকৃতি সর্বভূতের কারণ হয়েও সকলের পরম কারণ হলেন পরমাত্মা, অন্য কেউ নয়।

প্রশ্ন—সূত্রে মণিসমূহের ন্যায় এই জগৎ ভগবানে কীভাবে গাঁথা রয়েছে ?

উত্তর—যেমন সূত্রের দ্বারা মণি (সুতোর গাঁট) তৈরি করে সেই মণিগুলিতে সূত্র পরিয়ে মালা তৈরি করলে যেমন সেই পরানো সূত্রে এবং মণিতে শুধুমাত্র সূত্রই ব্যাপ্ত থাকে, তেমনই এই জগৎ সংসার সবই ভগবানে গ্রথিত রয়েছে, অর্থাৎ তিনিই সবকিছুতে ওতপ্রোত হয়ে রয়েছেন।

সম্বন্ধ—সুতো এবং সুতোর মণিসমূহের দৃষ্টান্তে ভগবান তাঁর সর্বরূপতা ও সর্বব্যাপকতা প্রমাণ করেছেন। এবার ভগবান পরবর্তী চারটি শ্লোকে এটিই ভালোভাবে স্পষ্ট করার জন্য সেইসব প্রধান বস্তুসমূহের নাম করেছেন, যাতে এই বিশ্বের স্থিতি ; এবং সাররূপে সেই সবই তাঁর মধ্যে ওতপ্রোত বলে জানিয়েছেন—

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু॥ ৮

হে অর্জুন ! আমি জলে রস, চন্দ্র ও সূর্যে জ্যোতি, চার বেদের ওঁ-কার, আকাশে শব্দ এবং মানুষের মধ্যে পুরুষকাররূপে বিরাজ করি॥ ৮

প্রশ্ন—এই শ্লোকটির স্পষ্টীকরণ করুন।

উত্তর—যে তত্ত্ব যার আধার এবং যাতে ব্যাপ্ত, সেটিই তার জীবন ও স্বরূপ এবং তাকেই তার সার বলা হয়। সেই অনুসারে ভগবান বলেছেন—হে অর্জুন ! জলের সার রস-তত্ত্ব আমি, চন্দ্র-সূর্যের সার প্রকাশ-তত্ত্ব আমি, সমস্ত বেদের সার প্রণব-তত্ত্ব 'ওঁ' আমি ; আকাশের সার শব্দ-তত্ত্ব আমি এবং পুরুষদের সার পৌরুষ-তত্ত্বও আমি।

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥ ৯

আমি পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধ, অগ্নিতে তেজ এবং সর্বভূতে জীবন ও তপস্বীদের তপ॥ ৯

প্রশ্ন—এই শ্লোকটির তাৎপর্য কী?

উত্তর—আগের শ্লোক অনুসারেই ভগবান এখানেও প্রত্যেক বস্তুর সাররূপে তাঁর ব্যাপকতা ও আধারত্ব দেখিয়ে বলেছেন যে পৃথিবীর সার গন্ধ-তত্ত্ব, অগ্নির সার তেজ-তত্ত্ব, সমস্ত প্রাণীর সার জীবন-তত্ত্ব ও তপস্বীদের সার তপ-তত্ত্বও তিনিই।

প্রশ্ন—এখানে 'গন্ধঃ'র সঙ্গে 'পুণ্যঃ' বিশেষণ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী?

উত্তর—এর দ্বারা দেখানো হয়েছে যে, এখানে 'গন্ধ' শব্দটি বিষয়রূপ গন্ধের লক্ষ্য নয়, পৃথিবীর কারণরূপ গন্ধ তন্মাত্রার লক্ষ্য। এইরূপ অর্থ রস ও শব্দতেও বুঝে নিতে হবে।

প্রশ্ন—'সর্বভূত' শব্দ কীসের বাচক এবং 'জীবন' শব্দের অভিপ্রায় কী?

উত্তর—'সর্বভূত' শব্দ সমগ্র চরাচর সজীব প্রাণীর বাচক এবং জীবন-তত্ত্ব সেই প্রাণশক্তির নাম, যার দ্বারা সমস্ত সজীব প্রাণী অনুপ্রাণিত এবং যার প্রভাবে তারা নির্জীব পদার্থ থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্॥ ১০

হে অর্জুন! সকল প্রাণীর সনাতন বীজ আমাকেই জানবে, বুদ্ধিমানের বুদ্ধি এবং তেজস্বিগণের তেজও আমি॥ ১০

প্রশ্ন—এখানে 'সনাতন বীজ' কাকে বলা হয়েছে এবং ভগবান সেটিকে নিজের স্বরূপ বলেছেন কেন?

উত্তর—যা সর্বদা থাকে, যাঁর কখনো নাশ হয় না, তাকে সনাতন বলা হয়। ভগবানই সমস্ত চরাচর প্রাণীদের পরম আধার এবং তাঁর থেকেই সব উৎপন্ন হয়। অতএব তিনিই সকলের 'সনাতন বীজ' এবং তাই এরূপ বলা হয়েছে। নবম অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে একেই 'অবিনাশী বীজ' এবং দশমের উনচল্লিশতমতে 'সর্বপ্রাণীর বীজ' বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—বুদ্ধিমানেদের বুদ্ধি এবং তেজস্বীদের তেজ আমি, এই কথার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—সমস্ত পদার্থের নিশ্চয়কারী, মন-ইন্দ্রিয়াদি নিজ বশীভূত করে তাদের সঞ্চালনকারী, অন্তরের যে পরিশুদ্ধ বোধময়ী শক্তি আছে, তাকে বুদ্ধি বলা হয়; যার মধ্যে এই বুদ্ধি বেশি থাকে, তাকে বুদ্ধিমান বলা হয়। এই বুদ্ধিশক্তি ভগবানের অপরা প্রকৃতিরই অংশ, তাই ভগবান বলেছেন যে, বুদ্ধিমানদের সার বুদ্ধি-তত্ত্ব আমিই। এইভাবে সব লোকের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী শক্তিবিশেষকে বলা হয় তেজস; এই তেজস্তত্ত্ব যাতে বিশেষভাবে থাকে, তাকে 'তেজস্বী' বলা হয়। এই তেজও ভগবানের অপরা প্রকৃতিরই এক অংশ, তাই ভগবান এই দুটিকে তাঁর স্বরূপ বলেছেন।

বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জিতম্।
ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ॥ ১১

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি বলবানদের কামরাগবর্জিত বল অর্থাৎ সামর্থ্য এবং সর্বভূতে ধর্ম ও শাস্ত্রের অনুকূল কাম॥ ১১

প্রশ্ন—এই শ্লোকটির স্পষ্টীকরণ করুন।

উত্তর—যে বলে কামনা, রাগ, অহংকার ও ক্রোধ সংযুক্ত থাকে, তা হল আসুরিক বল। এরূপ বলের বর্ণনা আসুরী সম্পদের অন্তর্গত করা হয়েছে (১৬।১৮) এবং সেটি ত্যাগ করতে বলা হয়েছে (১৮।৫৩)। ধর্মবিরুদ্ধ কামও এইরূপ আসুরী সম্পদের প্রধান গুণ হওয়ায় সমস্ত

অনর্থের মূল (৩।৩৭), নরকের দ্বার এবং ত্যাজ্য (১৬।২১)। কাম-রাগযুক্ত 'বল' এবং ধর্মবিরুদ্ধ 'কাম'-এর থেকে বিশিষ্ট বিশুদ্ধ 'বল' এবং বিশুদ্ধ 'কাম'ই উপাদেয়। ভগবান 'ভরতর্ষভ' সম্বোধন দ্বারা এই ইঙ্গিত করেছেন যে 'তুমি ভরতবংশের শ্রেষ্ঠ মানুষ ; তোমার মধ্যে এই আসুরিক 'বল'ও নেই এবং অধর্মমূলক দূষিত 'কাম'ও নেই। তোমার মধ্যে আছে কামনা ও আসক্তিরহিত বিশুদ্ধ বল এবং ধর্মের অবিরুদ্ধ বিশুদ্ধ 'কাম'।' বলশালীদের এরূপ শুদ্ধ বল-তত্ত্ব এবং প্রাণীদের এই বিশুদ্ধ কাম-তত্ত্বও আমিই।

সম্বন্ধ—এইরূপ প্রধান প্রধান বস্তুতে স্বরূপতঃ নিজ ব্যাপকতা জানিয়ে প্রকারান্তরে ভগবান সমস্ত জগতে তাঁর সর্বব্যাপকতা ও সর্বস্বরূপতা প্রমাণ করে, এবার নিজেকেই ত্রিগুণময় জগতের মূলকারণ জানিয়ে এই প্রসঙ্গের উপসংহার করছেন।

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥ ১২

প্রাণিগণের যে সকল ভাব সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণ থেকে উৎপন্ন হয়, তা সবই 'আমা হতে উৎপন্ন' বলে জানবে, কিন্তু বাস্তবে আমি সেগুলিতে নেই এবং সেগুলিও আমাতে নেই॥ ১২

প্রশ্ন—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব কীসের বাচক এবং সেই সবকে 'ভগবানের থেকে হওয়া' বলতে কী বোঝায় ?

উত্তর—মন, বুদ্ধি, অহংকার, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়াদির বিষয়, তন্মাত্রা, মহাভূত এবং সমস্ত গুণ-দোষ ও কর্ম ইত্যাদি যত প্রকার ভাব, সবই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাবের অন্তর্গত। এই সব পদার্থের বিকাশ ও বিস্তার ভগবানের 'অপরা প্রকৃতি' থেকেই হয়। সেই প্রকৃতি ভগবানেরই, সুতরাং ভগবানের থেকে পৃথক নয়। তাঁরই লীলা-সংকেতে প্রকৃতির দ্বারা সবকিছুর সৃজন, বিস্তার এবং উপসংহার হয়ে থাকে—এইরূপ জেনে নেওয়াই সেই সবগুলি 'ভগবানের থেকে হওয়া' বোঝায়।

প্রশ্ন—উপরোক্ত সমস্ত ত্রিগুণময় ভাব যদি ভগবানের থেকেই হয় তাহলে তিনি আমাতে এবং আমি তাতে নেই, এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যেমন আকাশে উৎপন্ন হওয়া মেঘের কারণ ও আধার আকাশ, কিন্তু আকাশ তা থেকে সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত। মেঘ সর্বদা আকাশে থাকে না এবং অনিত্য হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে তার স্থির অস্তিত্বও নেই ; কিন্তু মেঘ না থাকলেও আকাশ সর্বদা বিরাজমান থাকে। যেখানে মেঘ নেই, সেখানেও আকাশ থাকে, কারণ তা মেঘের আশ্রিত নয়। বস্তুতঃ মেঘও আকাশ থেকে পৃথক নয়, তার মধ্যে থেকেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে মেঘের পৃথক অস্তিত্ব না থাকায়, তা কখনো মেঘে নেই, তা তো সর্বদা নিজেই নিজের মধ্যেই স্থিত। এইরূপ যদিও ভগবানও সমস্ত ত্রিগুণময় ভাবের কারণ ও আধার তবুও বাস্তবে ঐ গুণগুলি ভগবানে নেই এবং ভগবানও সেসবে নেই। ভগবান সর্বথা ও সর্বদা গুণাতীত এবং নিত্য নিজেতেই স্থিত। তাই তিনি বলেছেন যে, 'ঐগুলিতে আমি নেই এবং আমাতে ঐগুলি নেই।' নবম অধ্যায়ের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে এর স্পষ্টীকরণ দেখা উচিত।

সম্বন্ধ—ভগবানের বলার তাৎপর্য হল, সমস্ত জগৎ তাঁর স্বরূপ এবং তাঁর দ্বারাই ব্যাপ্ত। এখানে এই প্রশ্ন আসে যে এইরূপ সর্বত্র পরিপূর্ণ ও অত্যন্ত নিকটে হওয়া সত্ত্বেও লোকে কেন ভগবানকে চিনতে পারে না ? তাই ভগবান বলেছেন—

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥ ১৩

গুণের কার্যরূপ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক— এই তিন প্রকারের ভাব দ্বারা এই সমস্ত জগতের প্রাণীসমূহ মোহিত হয়ে আছে ; তাই এই ত্রিগুণের অতীত অবিনাশী আমাকে তারা জানতে পারে না ॥ ১৩

প্রশ্ন—গুণাদির কার্যরূপ এই তিনপ্রকার ভাব দ্বারা এই সমস্ত জগৎ মোহগ্রস্ত হয়ে আছে—এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—আগের শ্লোকে যে ভাবের বর্ণনা করা হয়েছে, এখানে সেই ত্রিবিধ ভাবের দ্বারা জগতের মোহিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। **'ত্রিভিঃ'** এবং **'গুণময়ৈঃ'** বিশেষণ দ্বারা দেখানো হয়েছে যে এই সব ভাব (পদার্থ) তিন গুণানুসারে তিন ভাগে বিভক্ত এবং গুণাদিরই বিকার। **'জগৎ'** শব্দ দ্বারা সমস্ত সজীব প্রাণীকে লক্ষ্য করানো হয়েছে, কারণ নির্জীব পদার্থের মোহিত হওয়ার কথা বলা যেতে পারে না। অতএব ভগবানের কথার অভিপ্রায় এই মনে হয় যে 'জগতের সমস্ত দেহাভিমানী প্রাণী—এমনকি মানুষও—নিজ নিজ স্বভাব, প্রকৃতি ও বিচার অনুসারে, অনিত্য ও দুঃখপূর্ণ এই ত্রিগুণময় ভাবকেই নিত্য ও সুখের হেতু মনে করে এর কল্পিত রমণীয়তা ও সুখাকর্ষণের শুধুমাত্র ওপরের চাকচিক্যে জীবনের পরম লক্ষ্য বিস্মৃত হয়ে ভগবানের গুণ, প্রভাব, তত্ত্ব, স্বরূপ ও রহস্যের চিন্তা এবং জ্ঞান থেকে বিমুখ হয়ে বিপরীত চিন্তা ও ভাবনা করে তাঁকে অশ্রদ্ধা করে। তিন গুণের বিকারে মোহগ্রস্ত থাকায় তাদের বিবেকদৃষ্টি এতোটা স্থূল হয়ে যায় যে তারা বিষয় সংগ্রহ ও ভোগ ব্যতীত জীবনের অন্য কোনো কর্তব্য বা লক্ষ্য বোঝে না।

প্রশ্ন—তিন গুণের অতীত অবিনাশী আমাকে জানে না—এই কথার ভাবার্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান দেখিয়েছেন যে, সেই বিষয়-বিমোহিত মানুষের বিবেকদৃষ্টি ত্রিগুণের বিনাশশীল রাজ্যের বাইরে যায় না ; তাই তারা এই সবের সর্বতোভাবে অতীত, অবিনাশী আমাকে জানতে পারে না।

পঞ্চদশ অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকেও ভগবান নিজেকে ক্ষর পুরুষের থেকে সর্বতোভাবে অতীত বলেছেন। সেখানে **'ক্ষর'** পুরুষের নামে যে তত্ত্বের বর্ণনা আছে, সেটিই এই প্রকরণে 'অপরা প্রকৃতি' ও 'ত্রিগুণময়ভাব' নামে বলা হয়েছে। সেখানে যাকে **'অক্ষর পুরুষ'** বলা হয়েছে, এখানে সেই তত্ত্বকে 'পরা প্রকৃতি' ও মোহিত হওয়া 'প্রাণীসমূহ' বলা হয়েছে। সেখানে যাকে **'পুরুষোত্তম'** বলা হয়েছে, এখানে তাকে **'মাম্'** পদে বর্ণনা করা হয়েছে। এরূপে ভগবানকে পুরুষোত্তম বলে না জানাই হল গুণাদির অতীত ও অবিনাশীকে না জানা।

সম্বন্ধ—ভগবান বলেছেন সমস্ত জগৎ ত্রিগুণময় ভাবে মোহিত। এই কথা শুনে অর্জুনের জানার ইচ্ছা হল যে এর থেকে মুক্তি পাবার কোনো উপায় আছে কিনা ? অন্তর্যামী দয়াময় ভগবান সে কথা বুঝে এবার তাঁর দুস্তর মায়ার কথা বলে তার থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় জানাচ্ছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ১৪

কারণ আমার এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া অত্যন্ত দুস্তর, কিন্তু যাঁরা নিরন্তর শুধু আমারই ভজনা করেন, তাঁরাই এই দুস্তর মায়া অতিক্রম করতে সক্ষম হন, অর্থাৎ সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হন ॥ ১৪

প্রশ্ন—মায়ার সঙ্গে **'এষা'**, **'দৈবী'**, **'গুণময়ী'** এবং **'দুরত্যয়া'** বিশেষণ দেওয়ার এবং একে **'মম'** (আমার) বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—**'এষা'** পদটি প্রত্যক্ষ বস্তুর নির্দেশক এবং প্রকৃতি কার্যরূপেই প্রত্যক্ষ। এর দ্বারা বুঝতে হবে যে, আগের শ্লোকে যে প্রকৃতিকে ত্রিগুণময় ভাবের নামে কার্যরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, তাকেই এখানে 'মায়া' নামে বলা হয়েছে। গুণ ও গুণাদির কার্যরূপ এই সমস্ত দৃশ্য-প্রপঞ্চ এই মায়াতেই অবস্থিত, তাই একে 'গুণময়ী' বলা হয়। এই মায়া বাজীগর বা দানবদের মায়ার ন্যায়

সাধারণ নয়, এটি ভগবানের নিজ অনন্যসাধারণ অত্যন্ত বিচিত্র শক্তি, তাই একে **'দৈবী'** বলা হয়। শেষকালে ভগবান এই দৈবী মায়াকে আমার (মম) বলে এবং একে **'দুরত্যয়া'** বলে জানাচ্ছেন যে, আমি এর প্রভু, আমার শরণ না নিয়ে মানুষ এই মায়া থেকে সহজে পার পায় না, তাই এটি অত্যন্তই দুস্তর।

প্রশ্ন—যিনি নিরন্তর শুধু আমারই ভজনা করেন —এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—যিনি একমাত্র ভগবানকেই তাঁর পরম আশ্রয়, পরম গতি, পরম প্রিয় ও পরম প্রাপ্য মনে করেন ও সবই ভগবানের বা ভগবানের জন্যই—এরূপ মনে করে যিনি শরীর, স্ত্রী, পুত্র, ধন, গৃহ, কীর্তি ইত্যাদিতে মমত্ব ও আসক্তি ত্যাগ করে, সেই সবকে তাঁরই পূজার সামগ্রী করেন ও ভগবান রচিত বিধানে সর্বদা সন্তুষ্ট থেকে, ভগবানের নির্দেশ পালনে তৎপর থাকেন এবং ভগবানের স্মরণপরায়ণ হয়ে নিজেকে সর্বপ্রকারে নিরন্তর ভগবানে নিবিষ্ট রাখেন, সেই ব্যক্তিকেই নিরন্তর ভগবদ্-ভজনকারী বলে মনে করা হয়। এরই নাম অনন্য শরণাগতি। এই প্রকার শরণাগত ভক্তই মায়া থেকে উদ্ধার লাভ করেন।

প্রশ্ন—মায়া থেকে উদ্ধার পাওয়া কাকে বলে ?

উত্তর—কার্য ও কারণরূপ অপরা প্রকৃতির নামই মায়া। মায়াপতি পরমেশ্বরের শরণাগত হয়ে তাঁর কৃপায় এই মায়া-রহস্য পূর্ণরূপে জেনে এর সম্বন্ধ থেকে চিরতরে মুক্ত হওয়া এবং মায়াতীত পরমেশ্বরকে লাভ করাই হল মায়া থেকে মুক্তি লাভ করা।

সম্বন্ধ—ভগবান মায়ার দুস্তরতা দেখিয়ে তাঁর ভজন করলে তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার কথা জানিয়েছেন। তাতে প্রশ্ন হতে পারে যে, যখন এই ব্যাপার, তখন সকলে নিরন্তর আপনার ভজন করে না কেন ? তাতে ভগবান বলেছেন—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ ১৫

মায়া দ্বারা যাঁদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে, এরূপ আসুর স্বভাবযুক্ত নরাধম, নীচ, কুকর্মকারী মূঢ়ব্যক্তিরা আমাকে ভজনা করেন না॥ ১৫

প্রশ্ন—এই শ্লোকটির স্পষ্টীকরণ করুন।

উত্তর—ভগবান বলেছেন যে, যে ব্যক্তি জন্ম-জন্মান্তর ধরে পাপ করে আসছে এবং এই জন্মেও জেনে শুনে পাপেই প্রবৃত্ত রয়েছে, এরূপ দুষ্কৃতকারী পাপীরা, যারা 'প্রকৃতি কী, পুরুষ কী, ভগবান কী এবং ভগবানের সঙ্গে জীবের ও জীবের সঙ্গে ভগবানের কী সম্পর্ক ?' এসব কথা জানা তো দূরের কথা, যারা এও জানে না বা জানতে চায় না যে মনুষ্যজন্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ করা এবং ভজনই মানুষের প্রধান কর্তব্য, এরূপ অবিবেকী মূঢ় ব্যক্তি, যাদের চিন্তাধারা ও কর্ম নীচ—বিষয়াসক্তি, প্রমাদ, আলস্যের আধিক্যে যারা কেবল বিষয়ভোগে জীবন নষ্ট করে থাকে এবং তা লাভ করার উদ্দেশ্যে নিরন্তর নিন্দিত, নীচ কর্মে ব্যাপৃত থাকে, সেই 'নরাধম' নীচ ব্যক্তি এবং মায়ার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে—বিপরীত চিন্তা ও অশ্রদ্ধার আধিক্যে যাদের বিবেক নষ্ট-ভ্রষ্ট হয়েছে ; যারা বেদ, শাস্ত্র, গুরু পরম্পরার সদুপদেশ, ঈশ্বর, কর্মফল এবং পুনর্জন্মে বিশ্বাস না করে মিথ্যা তর্ক ও নাস্তিকতাবাদে আবদ্ধ থেকে অপরের অনিষ্ট করে, এরূপ অবিবেচক মূঢ় মনুষ্য এবং এইসব দুর্গুণের সঙ্গে সঙ্গে যারা দম্ভ, দর্প, অভিমান, কঠোরতা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি আসুরী ভাবের আশ্রয় নিয়েছে—এরূপ আসুরী প্রকৃতির মূঢ় ব্যক্তিরা কখনো আমার ভজনা করে না।

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে পাপাত্মা আসুরী প্রকৃতিসম্পন্ন মূঢ় ব্যক্তিরা আমার ভজনা করে না। এখানে প্রশ্ন জাগে যে তাহলে কী ধরনের মানুষ আপনার ভজনা করে ? ভগবান তার উত্তরে বলেছেন—

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ ১৬

হে ভরতকুল শ্রেষ্ঠ অর্জুন ! উত্তম কর্মকারী অর্থার্থী, আর্ত, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী—এই চারপ্রকার পুণ্যকর্মা ভক্ত আমার ভজনা করেন॥ ১৬

প্রশ্ন—'সুকৃতিনঃ' পদের অর্থ কী ? এটি কীসের বিশেষণ ?

উত্তর—জন্ম-জন্মান্তর ধরে শুভ কর্ম করতে করতে যাঁর স্বভাব সংশোধিত হয়ে শুভ কর্মশীল হয়েছে এবং পূর্বসংস্কারের বলে অথবা সৎসঙ্গের প্রভাবে যিনি ইহজন্মেও ভগবদ্ নির্দেশানুসারে শুভ কর্মই করে থাকেন—সেই শুভকর্মকারীদের 'সুকৃতি' বলা হয়। শুভকর্মের দ্বারা ভগবানের প্রভাব ও মহত্ত্বের জ্ঞান হয়ে ভগবানে বিশ্বাস বৃদ্ধি পায় এবং বিশ্বাস হলে ভজন হয়। এর দ্বারা সূচিত হয় যে 'সুকৃতিনঃ' বিশেষণের সম্বন্ধ চার প্রকারের ভক্তের সঙ্গে অর্থাৎ ভগবানকে বিশ্বাস করে যাঁরা ভজনা করেন, সেই সব ভক্তই 'সুকৃতী' হয়ে থাকেন, তাঁদের ভজনার হেতু যাই হোক না কেন!

প্রশ্ন—অর্থার্থী ভক্তের লক্ষণ কী ?

উত্তর—স্ত্রী, পুত্র, ধন, মান-মর্যাদা, প্রতিষ্ঠা, স্বর্গ-সুখ ইত্যাদি ইহলোক ও পরলোকের ভোগে যাঁর মনে এক বা বহু কামনা থাকে, কিন্তু কামনা পূরণের জন্য যিনি শুধুমাত্র ভগবানের ওপরেই নির্ভর করেন এবং তার জন্য যিনি শ্রদ্ধা, বিশ্বাসসহ ভগবানের ভজনা করেন, তিনিই অর্থার্থী ভক্ত।

সুগ্রীব, বিভীষণ প্রভৃতি ভক্তদের অর্থার্থী মানা হয়, এঁদের মধ্যে প্রধানতঃ ধ্রুবের নাম নেওয়া হয়।

স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র উত্তানপাদের সুনীতি ও সুরুচি নামক দুই রানি ছিল। সুনীতির পুত্র ছিলেন ধ্রুব এবং সুরুচির পুত্র উত্তম। রাজা উত্তানপাদ সুরুচিকে বেশি ভালোবাসতেন। একদিন বালক ধ্রুব এসে যখন পিতার কোলে বসলেন তখন সুরুচি তাঁকে তিরস্কার করে কোল থেকে নামিয়ে বললেন, 'তুমি অভাগা, যেহেতু তোমার জন্ম সুনীতির গর্ভে হয়েছে, রাজসিংহাসনে বসতে গেলে আমার গর্ভে জন্মাতে হত। যাও, শ্রীহরির আরাধনা করো ; তাহলেই তোমার মনোবাসনা সফল হবে।' বিমাতার ভর্ৎসনাপূর্ণ ব্যবহারে ধ্রুব অত্যন্ত দুঃখিত হলেন, তিনি কাঁদতে কাঁদতে তাঁর মা সুনীতির কাছে গিয়ে সব জানালেন। সুনীতি বললেন—'পুত্র ! তোমার মা সুরুচি ঠিকই বলেছেন। ভগবানের আরাধনা না করলে তোমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হবে না।' মাতার কথা শুনে রাজ্যপ্রাপ্তির আশায় বালক ধ্রুব ভগবানের ভজনা করার জন্য গৃহ হতে বার হলেন। পথে শ্রীনারদের সঙ্গে দেখা, তিনি তাঁকে গৃহে ফেরাবার চেষ্টা করলেন, রাজ্য দেবার কথা বললেন ; কিন্তু ধ্রুব নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন। তখন তিনি ধ্রুবকে '**ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়**' এই দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্র এবং চতুর্ভুজ ভগবান বিষ্ণুর ধ্যানের উপদেশ দিয়ে আশীর্বাদ করলেন।

ধ্রুব যমুনাতটে মধুবনে গিয়ে তপস্যা করতে লাগলেন। তাঁর তপ ভঙ্গ করার জন্য নানাপ্রকার ভয় ও লোভের কারণ প্রদর্শন করা হল, কিন্তু তিনি তপস্যায় অটল থাকলেন। ভগবান তখন তাঁর একনিষ্ঠ ভক্তিতে প্রসন্ন হয়ে দর্শন দিলেন। দেবর্ষি নারদের কাছে সংবাদ পেয়ে রাজা উত্তানপাদ তাঁর পুত্র উত্তম ও দুই রানিকে নিয়ে তাঁকে আনতে গেলেন। তপোমূর্তি ধ্রুব তাঁদের সঙ্গে পথে মিলিত হলেন। রাজা হাতি থেকে নেমে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর অত্যন্ত সমারোহের সঙ্গে তাঁকে হাতিতে করে নগরে নিয়ে গেলেন। শেষে রাজা ধ্রুবকে রাজ্য সমর্পণ করে বাণপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন—আর্ত ভক্তের লক্ষণ কী ?

উত্তর—যিনি শারীরিক বা মানসিক শোক, বিপদ, শত্রুভয়, রোগ, অপমান, চোর, ডাকাত ও আততায়ী বা হিংস্র জন্তুর আক্রমণে ভয় পেয়ে তা থেকে মুক্তি লাভের জন্য পূর্ণ বিশ্বাসসহ শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে ভগবানের ভজন করেন, তিনিই আর্ত ভক্ত।

আর্ত ভক্তদের মধ্যে গজরাজ, জরাসন্ধের বন্দী রাজাগণ প্রভৃতি অনেককে ধরা হয় ; কিন্তু মুখ্যতঃ সতী দ্রৌপদীর নাম নেওয়া হয়।

দ্রৌপদী ছিলেন রাজা দ্রুপদের কন্যা, তিনি যজ্ঞবেদী থেকে জন্মেছিলেন। তাঁর গাত্রবর্ণ অতি সুন্দর শ্যামল রঙের ছিল, তাই তাঁকে 'কৃষ্ণা' বলা হত। দ্রৌপদী

অত্যন্ত গুণবতী, পতিব্রতা, আদর্শ গৃহিণী এবং ভগবানের যথার্থ ভক্ত ছিলেন। দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ-ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দঘন পরমেশ্বর বলে মনে করতেন, ভগবানও তাঁর কাছে নিজের অন্তরঙ্গ লীলাগুলি লুকিয়ে রাখতেন না। যে বৃন্দাবনের পবিত্র গোপী-প্রেমের দিব্যকথা গোপ-নারীদের পতি-পুত্ররাও জানতেন না, দ্রৌপদী সেইসব লীলার কথা জানতেন ; তাই চীর-হরণের সময় দ্রৌপদী ভগবানকে 'গোপী-জনপ্রিয়' বলে ডেকেছিলেন।

দুষ্ট দুঃশাসন যখন দুর্যোধনের নির্দেশে একবস্ত্র পরিহিতা দ্রৌপদীকে সভায় এনে সবলে তাঁর বস্ত্র আকর্ষণ করলেন, তখন কারো কাছে কোনো সাহায্য না পেয়ে দ্রৌপদী নিজেকে অসহায় ভেবে তাঁর পরম সহায়ক, পরম বন্ধু, পরমাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে স্মরণ করা মাত্রই ভগবান নিশ্চয়ই আসবেন, তাঁর কাতর আহ্বান শুনে তিনি থাকতে পারবেন না। দ্রৌপদী ভগবানকে স্মরণ করে বললেন—

গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয়।
কৌরবৈঃ পরিভূতাং মাং কিং ন জানাসি কেশব॥
হে নাথ হে রমানাথ ব্রজনাথার্তিনাশন।
কৌরবার্ণবমগ্নাং মামুদ্ধরস্ব জনার্দন॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বভাবন।
প্রপন্নাং পাহি গোবিন্দ কুরুমধ্যেঽবসীদতীম্॥

(মহাভারত, সভাপর্ব, ৬৮)

'হে গোবিন্দ ! হে দ্বারকাবাসী ! হে শ্রীকৃষ্ণ ! হে গোপীজনপ্রিয় ! হে কেশব ! তুমি কি জানতে পারছ না যে কৌরবরা আমার অপমান করছে ? হে নাথ ! হে লক্ষ্মীনাথ ! হে ব্রজনাথ ! হে দুঃখনাশন ! হে জনার্দন ! কৌরব-সাগরে নিমজ্জমান আমাকে রক্ষা করো। হে কৃষ্ণ ! হে কৃষ্ণ ! হে মহাযোগী ! হে বিশ্বাত্মন্ ! হে বিশ্বভাবন্ ! হে গোবিন্দ ! কৌরবের হাতে নিগৃহীতা আমাকে—এই শরণাগত দুঃখিনীকে রক্ষা করো।'

দ্রৌপদীর আহ্বান শুনেই জগদীশ্বর ভগবানের হৃদয় দ্রবীভূত হয়ে যায় এবং তিনি **'ত্যক্ত্বা শয্যাসনং পদ্ভ্যাং কৃপালুঃ কৃপয়াভ্যগাৎ।'**

'কৃপালু ভগবান কৃপাপরবশ হয়ে শয্যা ত্যাগ করে পায়ে হেঁটেই চললেন।' কৌরবদের দানবিক সভায় ভগবান বস্ত্রাবতার হয়ে উঠলেন ! দ্রৌপদীর এক বস্ত্র থেকে দ্বিতীয়, দ্বিতীয় থেকে তৃতীয়— এই ভাবে বিভিন্ন রঙের বস্ত্র বার হতে লাগল, সেখানে বস্ত্ররাশি জমা হল। ঠিক সময়মতো প্রিয় বন্ধু এসে দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করলেন, দুঃশাসন ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে মাটিতে বসে পড়লেন।

প্রশ্ন—জিজ্ঞাসু ভক্তের লক্ষণ কী ?

উত্তর— অর্থ, স্ত্রী, পুত্র, গৃহাদি বস্তু এবং রোগ-সংকটের পরোয়া না করে শুধুমাত্র পরমাত্মতত্ত্ব জানার আকাঙ্ক্ষায় যিনি একনিষ্ঠ হয়ে ভগবানে ভক্তি করেন (১৪।২৬), সেই কল্যাণকামী ভক্তকে জিজ্ঞাসু বলা হয়।

জিজ্ঞাসু ভক্তদের মধ্যে পরীক্ষিৎ প্রমুখ অনেকের নাম আছে, কিন্তু উদ্ধবের নাম বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায় থেকে ত্রিশ অধ্যায় পর্যন্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে দিব্যজ্ঞানের উপদেশ দিয়েছেন, যা উদ্ধবগীতা নামে প্রসিদ্ধ।

প্রশ্ন—জ্ঞানী ভক্তের লক্ষণ কী ?

উত্তর—যিনি ঈশ্বরকে লাভ করেছেন, যাঁর দৃষ্টিতে একমাত্র পরমাত্মাই বিরাজিত—পরমাত্মা ব্যতীত আর কিছুই নেই এবং এইরূপে ঈশ্বর লাভ হয়ে যাওয়ায় যাঁর সমস্ত কামনা সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হয়েছে এবং এই অবস্থায় যিনি সহজ স্বাভাবিকভাবেই পরমাত্মার ভজনা করেন, তিনিই জ্ঞানী (১২।১৩-১৯)। নবম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শ্লোকে এবং দশম অধ্যায়ের তৃতীয় ও পঞ্চদশ অধ্যায়ের উনিশতম শ্লোকে যার বর্ণনা আছে, সেই নিষ্কাম অনন্য প্রেমিক সাধক ভক্তও জ্ঞানী ভক্তদের অন্তর্গত।

জ্ঞানীদের মধ্যে শুকদেব, সনকাদি, নারদ ও ভীষ্ম প্রমুখ প্রসিদ্ধ। বালক প্রহ্লাদকেও জ্ঞানী ভক্ত বলা হয়, যিনি মাতৃগর্ভে থাকাকালীনই দেবর্ষি নারদের উপদেশ প্রাপ্ত করেছিলেন। তিনি দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর পুত্র ছিলেন। হিরণ্যকশিপু ভগবানকে হিংসা করতেন আর প্রহ্লাদ ছিলেন ভগবানের ভক্ত। তাই হিরণ্যকশিপু তাঁকে অত্যন্ত কষ্ট দিয়েছিলেন, সাপের কামড় খাইয়েছিলেন, হাতির পদদলিত করেছিলেন, বাড়ির ছাদ থেকে নীচে ফেলে দিয়েছিলেন, সমুদ্রে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন, আগুনে ফেলেছিলেন এবং গুরুরাও তাঁকে মারবার চেষ্টা করেছিলেন ; কিন্তু ভগবান তাঁকে রক্ষা করে যাচ্ছিলেন।

তাঁর জন্য ভগবান নৃসিংহদেবের রূপে প্রকটিত হয়ে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। কোনো ভয়ে ভীত না হওয়া প্রহ্লাদের জ্ঞানস্থিতির লক্ষণ ; কিন্তু গুরুগৃহে ইনি বালকাবস্থায় তাঁর সহপাঠীদের যে দিব্য উপদেশ দিয়েছিলেন, তার দ্বারাও এঁর জ্ঞানী হওয়া প্রমাণিত হয়। ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণে এঁর সুন্দর কাহিনী পড়া উচিত।

প্রশ্ন—এখানে 'চ' প্রয়োগ করে কী জানানো হয়েছে ?

উত্তর— 'চ' প্রয়োগ করে ভগবান অর্থার্থী, আর্ত এবং জিজ্ঞাসু ভক্তদের থেকে জ্ঞানী ভক্তের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছেন। সতেরো, আঠারো ও উনিশতম শ্লোকে যে জ্ঞানীর মহিমা বলা হয়েছে, তারই সংকেত 'চ' দ্বারা এখানে সূত্ররূপে করেছেন।

প্রশ্ন—চার প্রকার ভক্তদের মধ্যে একের থেকে দ্বিতীয় উত্তম কে এবং কেন ?

উত্তর—ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে, যে কোনো ভাবে ভগবানের ভজনাকারীগণ সকলেই উত্তম। তাই এই শ্লোকে ভগবান চারজনকেই 'সুকৃতী' ও অষ্টাদশ শ্লোকে 'উদার' বলেছেন। কিন্তু এখানের বর্ণনানুসারে অপেক্ষাকৃত তারতম্য দ্বারা দেখলে প্রতীত হয় যে 'অর্থার্থী'র থেকে 'আর্ত' উত্তম, 'আর্তে'র থেকে 'জিজ্ঞাসু' এবং 'জিজ্ঞাসু'র থেকে 'জ্ঞানী' উত্তম। কারণ 'অর্থার্থী' জাগতিক ভোগকে সুখের হেতু মনে করে তার কামনায় ভগবানের ভজনা করে, তাঁরা ভগবানের প্রভাব পূর্ণতঃ জানেন না, তাই ভগবানে তাঁদের পূর্ণ প্রেম হয় না, ফলে তাঁরা ভোগের আকাঙ্ক্ষা করেন। আর্তভক্ত সুখভোগের জন্য ভগবানের কাছে কখনো কিছু চান না, যদিও এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে অর্থার্থীর থেকে ভগবানে তাঁদের প্রেম অধিক, তবুও তাঁদের প্রেম দৈহিক সুখ ও মান-মর্যাদাতে কিছুটা বিভাজিত, তাই এঁরা ঘোর সংকটগ্রস্ত হলে বা অপমানিত হলে তার থেকে বাঁচার জন্য ভগবানের শরণাগত হন। জিজ্ঞাসু ভক্ত ভোগসুখও চান না এবং লৌকিক বিপদেও ভয় পান না, তাঁরা শুধু ভগবানের তত্ত্বই জানতে চান। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে জাগতিক ভোগে তাঁরা আসক্ত না হলেও মুক্তির কামনা তাঁদের মধ্যে বিরাজ করে, তাই তাঁদের প্রেমও 'অর্থার্থী' ও 'আর্ত'র থেকে বিশিষ্ট ও বেশি হলেও 'জ্ঞানী'র থেকে কমই। কিন্তু 'সমগ্র ভগবানের' স্বরূপতত্ত্ব জানা জ্ঞানী ভক্ত কোনো কিছুর অপেক্ষা ব্যতীতই স্বাভাবিকভাবে ভগবানকে নিষ্কাম প্রেমভাবের সহিত নিত্য-নিরন্তর ভজনা করেন। অতএব তিনিই সর্বোত্তম।

প্রশ্ন—ভগবান এখানে অর্জুনকে 'ভরতর্ষভ' নামে সম্বোধন করেছেন। এর কারণ কী ?

উত্তর—অর্জুনকে 'ভরতবংশীয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ' বলে ভগবান জানাচ্ছেন যে 'তুমি সুকৃতীশালী ; সুতরাং তুমি তো আমার ভজনা করছই।'

সম্বন্ধ—চার প্রকার ভক্তদের কথা বলে এবার ভগবান জ্ঞানীভক্তের প্রেমের প্রশংসা ও অন্যান্য ভক্তদের থেকে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করছেন—

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥ ১৭

এঁদের মধ্যে আমাতে একীভাবে স্থিত অনন্য প্রেমভক্তিসম্পন্ন একনিষ্ঠ জ্ঞানী ভক্ত অতি শ্রেষ্ঠ ; কারণ আমাকে তত্ত্বতঃ জানা জ্ঞানীর নিকট আমি অত্যন্ত প্রিয় এবং সেই জ্ঞানীও আমার অতীব প্রিয়॥ ১৭

প্রশ্ন—জ্ঞানীর সঙ্গে যে 'নিত্যযুক্তঃ' ও 'একভক্তিঃ' বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে, তার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—সংসার, শরীর ও নিজেকে সর্বতোভাবে বিস্মৃত হয়ে যিনি অনন্যভাবে নিত্য-নিরন্তর শুধু ভগবানেই অবস্থিত, তাঁকে নিত্যযুক্ত বলা হয় ; আর যিনি ভগবানেই অহৈতুক ও অবিরল প্রেম করেন, তাকে 'একভক্তি' বলা হয়। ভগবানের তত্ত্বজানা জ্ঞানী ভক্তের মধ্যে এই দুটি বিষয় পূর্ণভাবে থাকে, তাই এই বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় এবং জ্ঞানী আমার অতীব প্রিয়—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যিনি ভগবানের প্রকৃত তত্ত্ব ও রহস্য

সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করেছেন, যিনি সর্বত্র, সবসময় ও সবকিছু ভগবৎস্বরূপই দেখেন, যাঁর দৃষ্টিতে একমাত্র ভগবান ব্যতীত আর কিছুই নেই, ভগবানকেই একমাত্র পরম শ্রেষ্ঠ ও পরম প্রিয়তম জেনে, যাঁর মন-বুদ্ধি সমস্ত আসক্তি ও আকাঙ্ক্ষারহিত হয়ে একমাত্র ভগবানেই তল্লীন হয়ে থাকে—এইপ্রকারে অনন্য প্রেমে যিনি ভগবানের ভক্তি করেন, ভগবান তাঁর কত প্রিয়, তা কে বলতে পারে ? যিনি ইহলোক ও পরলোকের অত্যন্ত প্রিয়, সুখপ্রদ ও জাগতিক মানুষের দৃষ্টিতে অতি দুর্লভ বলে মানা ভোগ ও সুখের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ভগবানের জন্য ত্যাগ করেছেন, তাঁর দৃষ্টিতে ভগবানের মহত্ত্ব কত এবং ভগবান তাঁর কত প্রিয়—অন্য কেউ তার কল্পনাও করতে পারবে না। তাই ভগবান বলেছেন যে 'তাঁদের কাছে আমি অত্যন্ত প্রিয়'। আর ভগবান যাঁর অতি প্রিয় তিনি তো ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় হবেনই। কারণ প্রথমতঃ ভগবান স্বাভাবিকভাবেই প্রেমস্বরূপ[১]—এমনকি সেই প্রেম-রস সমুদ্রের থেকে প্রেমের বিন্দু লাভ করে জগতে সকলেই সুখী হয়। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর এই ঘোষণা যে, 'যে আমাকে যেভাবে ভজনা করে, তাকে আমি সেই ভাবেই ভজনা করি'—অতএব ভগবান তাঁকে যে অত্যন্ত প্রেম করেন, তাতে আর আশ্চর্য কী ? তাই ভগবান বলেছেন যে সে আমার অত্যন্ত প্রিয়।

এই শ্লোকে ভগবানের গুণ, প্রভাব, রহস্য ও তত্ত্বকে যথাযথভাবে জ্ঞাত ঈশ্বরপ্রাপ্ত প্রেমিক ভক্তদের প্রেমের এবং উচ্চকোটির অনন্য প্রেমিক সাধক ভক্তদের প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে তাঁদের প্রশংসা করা হয়েছে।

সম্বন্ধ—ভগবান জ্ঞানী ভক্তকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও অত্যন্ত প্রিয় বলেছেন। এতে আশঙ্কা হতে পারে যে অন্য ভক্তরা কি শ্রেষ্ঠ ও প্রিয় নয় ? তাতে ভগবান বলেছেন—

উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥ ১৮

এঁরা সকলেই মহান, কিন্তু জ্ঞানী সাক্ষাৎ আমার আত্মস্বরূপ—এটিই আমার মত ; কারণ সেই মদ্গত মন-বুদ্ধিসম্পন্ন জ্ঞানীভক্ত অতি উত্তম গতিস্বরূপ আমাতেই অবস্থান করেন॥ ১৮

প্রশ্ন—এঁরা সকলেই মহান, এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে যে চারপ্রকার ভক্তের প্রসঙ্গ রয়েছে, তার মধ্যে জ্ঞানীর আর কথা কী ; অর্থার্থী, আর্ত, জিজ্ঞাসু ভক্তও সর্বতোভাবে একনিষ্ঠ, তাঁদের ভগবানের প্রতি দৃঢ় ও পরম বিশ্বাস থাকে। তাঁরা এই বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে ভগবান সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বেশ্বর, পরম দয়ালু ও পরম সুহৃদ ; আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা একমাত্র তিনিই পূরণ করতে সক্ষম। এরূপ জেনে এবং মেনে এঁরা অন্য সব আশ্রয় ত্যাগ করে নিজেদের জীবনকে ভগবানেরই ভজন-স্মরণ, পূজা-সেবায় ব্যাপৃত রাখেন। তাঁদের কোনো কাজই এমন হয় না, যা ভগবৎ-বিশ্বাসে বিন্দুমাত্র ন্যূনতা আনতে পারে। যদিও তাঁদের কামনার সর্বতোভাবে বিনাশ হয়নি, কিন্তু তাঁরা তা পূরণ করতে চান একমাত্র ভগবানের দ্বারাই। যেমন কোনো পতিব্রতা নারী নিজের জন্য কিছু চাইলে তা তিনি চান তাঁর একমাত্র প্রিয়তম পতির কাছ থেকেই ; এজন্য তিনি অন্য কারো দিকে তাকানও না, অন্য কাউকে বিশ্বাসও করেন না এবং জানেনও না। তেমনই এই ভক্তও একমাত্র ভগবানের ওপরই ভরসা রাখেন। তাই ভগবান বলেছেন যে এঁরা সবাই মহান (শ্রেষ্ঠ)। তাই তেইশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন—'আমার ভক্ত যেভাবেই আমার ভজনা করুন, শেষকালে তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন।' নবম অধ্যায়েও ভগবানের ভক্তির এরূপ ফলের কথাই বলা হয়েছে (৯।২৫)।

প্রশ্ন—এখানে 'তু' প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

[১]রসো বৈ সঃ। রসꣳ হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ২।৭)
'তিনি রসই, সেই পুরুষ এই রস লাভ করেই আনন্দসাগর হয়ে ওঠেন।'

উত্তর— চার প্রকারের ভক্তই উত্তম ও ভগবানের প্রিয়। কিন্তু এরমধ্যে প্রথম তিনটির থেকে জ্ঞানীর মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য আছে, তা লক্ষ্য করে 'তু' প্রযুক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন—জ্ঞানী তো আমারই স্বরূপ, এই আমার মত—এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—ভগবান এখানে দেখিয়েছেন যে, জ্ঞানী ভক্ত ও তাঁর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, ভক্তও যেমন, আমিও তেমন। আমিও যেমন, ভক্তও তেমন।

প্রশ্ন—'যুক্তাত্মা' শব্দটির অর্থ কী ? তার অতি উত্তম গতিস্বরূপ ভগবানে যথাযথভাবে স্থিত হওয়া কী ?

উত্তর—যার মন-বুদ্ধি ভালোভাবে ভগবানে তন্ময় হয়ে গেছে, তাকে বলা হয় 'যুক্তাত্মা'। আর এরূপ ব্যক্তির একমাত্র ভগবানকেই সর্বোত্তম ও পরম গতি মনে করে নিত্য-নিরন্তর তাঁতে একীভাবে অবস্থিত হওয়াই অর্থাৎ তাঁকে প্রাপ্ত করাই হল অতি উত্তম গতিস্বরূপ ভগবানে ভালোভাবে স্থিত হওয়া।

সম্বন্ধ—এবার সেই জ্ঞানী ভক্তের দুর্লভতা জানাবার জন্য ভগবান বলছেন—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ ১৯

বহু জন্মের পর শেষ জন্মে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত পুরুষ 'সবকিছুই বাসুদেব'—এরূপ জেনে আমার ভজনা করেন, এরূপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ॥ ১৯

প্রশ্ন—এখানে **'বহূনাং জন্মনামন্তে'** কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যে জন্মে মানুষ ভগবানের জ্ঞানী ভক্ত হন, সেটি তাঁর বহু জন্মের শেষ জন্ম। কারণ ভগবানকে এভাবে তত্ত্বতঃ জানার পর তাঁর আর পুনর্জন্ম হয় না ; সেটিই হয় তাঁর অন্তিম জন্ম।

প্রশ্ন—এর যদি এই অর্থ মানা হয় যে বহুজন্ম সকামভাবে ভগবানে ভক্তি করার পর মানুষ ভগবানের ঐকান্তিক জ্ঞানী ভক্ত হন, তাহলে ক্ষতি কী ?

উত্তর—এরূপ মেনে নিলে ভগবানের অর্থার্থী, আর্ত ও জিজ্ঞাসু ভক্তদের বহু জন্ম অনিবার্য হয়ে যায়। কিন্তু ভগবান স্থানে স্থানে তাঁর সবপ্রকারের ভক্তদের তাঁকে লাভের কথা বলেছেন (৭।২৩ ; ৯।২৫) এবং সেখানে কোথাও বহুজন্মের শর্ত দেননি। অবশ্যই শ্রদ্ধা ও প্রেমের অভাবে সাধন শিথিল হলে অনেক জন্ম হতে পারে, কিন্তু যদি শ্রদ্ধা ও প্রেমের মাত্রা বৃদ্ধি পায় ও সাধনায় তীব্রতা থাকে, তাহলে এক জন্মেই ঈশ্বর লাভ সম্ভব হতে পারে। এতে কালের কোনো নিয়ম নেই।

প্রশ্ন—এখানে **'জ্ঞানবান্'** শব্দটির প্রয়োগ করা হয়েছে কেন ?

উত্তর—ভগবান এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে বিজ্ঞান-সহ যে জ্ঞান জানার প্রশংসা করেছিলেন, যে প্রেমিক ভক্ত সেই বিজ্ঞানসহ জ্ঞান লাভ করেছেন ও তৃতীয় শ্লোকে যাঁর জন্য বলা হয়েছে যে কোনো একজনই আমাকে তত্ত্বতঃ জানেন, তাঁর জন্যই এখানে **'জ্ঞানবান্'** শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। তাই অষ্টাদশ শ্লোকে ভগবান তাঁকে নিজের স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

প্রশ্ন— সব কিছু বাসুদেবই—এই ভাবে ভগবানের ভজনা করা কী ?

উত্তর—সমস্ত জগৎ ভগবান বাসুদেবেরই স্বরূপ, বাসুদেব ব্যতীত আর কিছুই নেই, এই তত্ত্ব প্রত্যক্ষ ও অটলভাবে অনুভব হওয়া এবং তাঁতে নিত্যস্থিত থাকা—এটাই সব কিছু বাসুদেব, এইভাবে ভগবানের ভজনা করা।

প্রশ্ন—সেই মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ—এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর অভিপ্রায় হল যে জগতে প্রথমতঃ লোকেদের ভজনে রুচিই থাকে না, হাজার হাজার ব্যক্তির মধ্যে কারো কিছু মতি হলেও সে নিজ স্বভাববশতঃ শিথিল প্রযত্ন হয়ে ভজন ছেড়ে দেয়। কেউ যদি বিশেষ চেষ্টাও করে, তাহলে তারও শ্রদ্ধা-ভক্তির অভাবে কামনার প্রবাহ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তাই সেও

ভগবানকে তত্ত্বতঃ জানতে পারে না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে জগতে ভগবানকে তত্ত্বতঃ জানা মহাপুরুষ অত্যন্ত বিরল। অতএব এটাই বুঝতে হবে যে এই প্রকারের মহাত্মা অত্যন্তই দুর্লভ।

কেউ যদি এরূপ মহাত্মার সাক্ষাৎ পান, তাহলে সেটি তাঁর অত্যন্ত সৌভাগ্য বলে জানতে হবে। দেবর্ষি নারদ বলেছেন—

'মহৎসঙ্গস্তু দুর্লভোঽগম্যোঽমোঘশ্চ।' (নারদ ভক্তিসূত্র ৩৯)

'মহাপুরুষদের সঙ্গ দুর্লভ, অগম্য এবং অমোঘ।'

সম্বন্ধ—পঞ্চদশ শ্লোকে আসুরী প্রকৃতির দুষ্কৃতকারী লোকেদের ভগবানকে ভজনা না করার এবং ষোড়শ থেকে ঊনবিংশ পর্যন্ত সুকৃতী পুরুষদের দ্বারা ভগবানকে ভজনা করার কথা বলা হয়েছে। ভগবান এবার তাঁদের কথা বলেছেন, যাঁরা সুকৃতী হয়েও কামনার বশে নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে অন্য দেবতাদের উপাসনা করেন—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥ ২০

বিভিন্ন ভোগের কামনায় যাঁদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে, তাঁরা নিজ নিজ স্বভাবের বশীভূত হয়ে সেই সেই নিয়ম পালন করে অন্যান্য দেবতার পূজা করেন অর্থাৎ উপাসনা করেন॥ ২০

প্রশ্ন—এখানে 'সেই' শব্দটি দুবার প্রয়োগ করার অভিপ্রায় কী এবং কামনার দ্বারা জ্ঞান অপহরণ হওয়া কাকে বলে?

উত্তর—'সেই' শব্দটি দুবার প্রয়োগ করে দেখানো হয়েছে যে, সকলের কামনা একপ্রকার হয় না। ভোগ কামনার মোহে মানুষের এই বিবেক থাকে না যে 'আমি কে, আমার কর্তব্য কী, ঈশ্বর ও জীবের কী সম্বন্ধ, মনুষ্য জন্ম কেন লাভ হয়েছিল, অন্য শরীর থেকে এর বিশেষত্ব কী? এবং ভোগে আবদ্ধ না হয়ে ভজন করলেই নিজের কল্যাণ।' এই ভাবে এই বিবেক শক্তির বিমোহিত হওয়াই হল কামনার দ্বারা জ্ঞান অপহৃত হওয়া।

প্রশ্ন—পঞ্চদশ শ্লোকে যাকে **'মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ'** বলা হয়েছে, তাতে এবং এখানে যাকে **'তৈঃ তৈঃ কামৈঃ হৃতজ্ঞানাঃ'** বলা হয়েছে, তাতে কী পার্থক্য?

উত্তর—পঞ্চদশ শ্লোকে যার বর্ণনা আছে, তাকে ভগবান পাপাত্মা, মূঢ়, নরাধম এবং আসুর স্বভাব বলে জানিয়েছেন ; এরা আসুরী প্রকৃতি হওয়ায় তমঃপ্রধান এবং নরকের ভাগী (১৬।১৬, ১৯)। এবং এখানে বিভিন্ন কামনায় যাদের জ্ঞান অপহৃত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তারা দেবতাদের পূজনকারী ভক্ত, শ্রদ্ধালু এবং দেবলোকের ভাগী (৭।২৩, ৯।২৫), এঁদের রজোমিশ্রিত সাত্ত্বিক মানা হয়েছে ; সুতরাং দুইয়েতে অত্যন্ত বেশি পার্থক্য।

প্রশ্ন—'নিজ স্বভাব' কীসের বাচক আর 'তার দ্বারা প্রেরিত হওয়া' কী?

উত্তর—জন্ম-জন্মান্তরের কর্মের দ্বারা সংস্কারের সঞ্চয় হয় এবং সেই সংস্কারসমূহ থেকে যে প্রকৃতি তৈরি হয় তাকে 'স্বভাব' বলা হয়। প্রত্যেক জীবের স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন হয়। সেই স্বভাব অনুসারে তাদের অন্তরে ভিন্ন ভিন্ন দেবতাদের পূজা করার ভিন্ন ভিন্ন ইচ্ছা উৎপন্ন হয়, তাকেই 'তার থেকে প্রেরিত হওয়া' বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—সেই সেই নিয়ম ধারণ করে অন্য দেবতাদের ভজনা করা কী?

উত্তর—সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, ইন্দ্র, মরুৎ, যমরাজ, বরুণ প্রমুখ শাস্ত্রোক্ত দেবতাদের ভগবানের থেকে পৃথক মনে করে যে দেবতার, যে উদ্দেশ্যে করা উপাসনাতে জপ, ধ্যান, পূজা, প্রণাম, ন্যাস, যজ্ঞ, ব্রত, উপবাস ইত্যাদি যে সব বিভিন্ন নিয়ম, সেই সেই নিয়ম ধারণ করে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে তা ভালোভাবে পালন করে সেই দেবতাদের আরাধনা করাই হল সেই সেই নিয়ম ধারণ করে অন্য দেবতাদের ভজনা করা। কামনা ও ইষ্টদেবের ভিন্নতা অনুসারে পূজার নিয়মেও পার্থক্য থাকে, তাই 'সেই' শব্দটি দুবার ব্যবহৃত হয়েছে।

সেই সঙ্গে আর একটি ব্যাপার হল—ভগবানের

থেকে পৃথক ভেবে তাঁদের পূজা করলেই তা অন্য দেবতার পূজা হয়। যদি দেবতাদেরও ভগবানেরই স্বরূপ মনে করে, ভগবানের নির্দেশানুসারে নিষ্কামভাবে বা ভগবানের প্রীত্যর্থে তাঁদের পূজা করা যায় তাহলে তা অন্য দেবতাদের পূজা না হয়ে ভগবানেরই পূজা হয়ে ওঠে এবং তার ফলও হয় ঈশ্বর লাভ।

সম্বন্ধ—এবার দুটি শ্লোকে দেবোপাসকগণ তাঁদের উপাসনার ফল কীভাবে পান ও কী ফল পান, তার বর্ণনা করছেন—

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥ ২১

যে যে সকাম ভক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে যে যে দেবতাকে অর্চনা করেন, সেই সেই ভক্তের শ্রদ্ধা আমি সেই সেই দেবতাতেই দৃঢ় করে দিই॥ ২১

প্রশ্ন—'**ভক্তঃ**' পদের সঙ্গে '**যঃ**' এবং '**তনুম্**'-এর সঙ্গে '**যাম্**' পদটি দুবার প্রয়োগ করার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'**যঃ**' দুবার প্রয়োগ করে ভক্তদের এবং '**যাম্**' দুবার প্রয়োগ করে দেবতাদের বহুত্ব দেখিয়েছেন। অভিপ্রায় হল যে সকাম ভক্তও বহুপ্রকারের হয় এবং তাঁদের নিজ-নিজ কামনা ও প্রকৃতি ভেদে তাঁদের ইষ্টদেবতাও পৃথক পৃথক হয়।

প্রশ্ন—দেবতার স্বরূপকে শ্রদ্ধাপূর্বক পূজন করতে চায়—এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—দেবতাদের অস্তিত্বে, তাঁদের প্রভাব এবং গুণে, পূজার প্রকার এবং তার ফলে পূর্ণ বিশ্বাস করে শ্রদ্ধাপূর্বক যে দেবতার যেমন মূর্তির বিধান থাকে, তেমনই ধাতু, কাঠ, মাটি, পাথর ইত্যাদির মূর্তি বা চিত্রপট বিধিপূর্বক স্থাপন করে অথবা মনে মনে মানসিক মূর্তি নির্মাণ করে যে মন্ত্রের যত সংখ্যার জপপূর্বক যে সামগ্রী দ্বারা যেমন যেমন পূজার বিধান থাকে, সেই মন্ত্রের তত সংখ্যা জপ করে সেই সামগ্রী দ্বারা ঐ বিধানে পূজা করা, দেবতাদের জন্য অগ্নিতে আহুতি দিয়ে যজ্ঞ করা, ধ্যান করা, সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি প্রত্যক্ষ দেবতাদের পূজা করা এবং এঁদের সকলকে যথাবিধি নমস্কার করা—এই হল 'দেবতাদের স্বরূপকে শ্রদ্ধাসহ পূজা করা।'

প্রশ্ন—'**তাম্**' পদের '**শ্রদ্ধাম্**'-এর সঙ্গে সম্বন্ধ না করে একে '**তনুম্**' (দেবতার স্বরূপ)-এর বোধক কেন মানা হয়েছে ?

উত্তর—পূর্বার্ধে যে '**যাং যাম্**' পদগুলির '**তনুম্**' (দেবতার স্বরূপ)-এর সঙ্গে সম্বন্ধ, তার সঙ্গে একান্বয় করার জন্য '**তাম্**'-কেও '**তনুম্**'-এরই বোধক মানা উচিত বলে মনে হয়। শ্রদ্ধার সঙ্গে তার সম্বন্ধ মানা হলেও ভাবে কোনো পার্থক্য হয় না। কারণ এরূপ মেনে নিলেও সেই শ্রদ্ধাকে দেবতাবিষয়ক মানতে হবে।

প্রশ্ন—এখানে '**এব**'র অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'**এব**'র প্রয়োগ করে ভগবান দেখিয়েছেন যে, যে ভক্ত যে দেবতার পূজা করতে চান, তাঁর শ্রদ্ধাকে আমি সেই ইষ্টদেবতায় স্থির করে দিই।

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥ ২২

সেই ভক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে সেই দেবতার আরাধনা করেন এবং সেই দেবতার কাছ থেকে নিঃসন্দেহে আমারই বিহিত কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হন॥ ২২

প্রশ্ন—এই শ্লোকে ভগবানের বক্তব্যের অভিপ্রায় কী?

উত্তর—এখানে ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, আমার দ্বারা স্থাপিত ঐ শ্রদ্ধা দ্বারা যুক্ত হয়ে তিনি যথাবিধি ঐ দেবতার পূজা করেন এবং সেই উপাসনার ফলস্বরূপ উক্ত দেবতার দ্বারা তিনি সেই ইচ্ছিত ফললাভ করেন, যা আমি পূর্বেই নির্ধারিত করে রেখেছি। আমার বিধানের থেকে বেশি বা কম ফলপ্রদান করার সামর্থ্য দেবতাগণের নেই। অভিপ্রায় হল যে দেবতাদের অবস্থান হল কোনো বড় রাজ্যে আইন অনুসারে কর্মে নিযুক্ত বিভিন্ন বিভাগের সরকারি অফিসারদের মতন। তাঁরা কাউকে তার কাজের পরিবর্তে কিছু দিতে চাইলে, ততটাই দিতে পারেন, যতটা আইন অনুসারে তার কাজের জন্য পাওয়ার এবং যতটা অফিসারের দেওয়ার অধিকার আছে।

প্রশ্ন—এই শ্লোকে 'হিতান্' পদকে 'কামান্'-এর বিশেষণ মনে করে যদি এই অর্থ করা হয় যে তাঁরা 'হিতকর' ভোগ প্রদান করেন, তাহলে ক্ষতি কী?

উত্তর—এরূপ অর্থ করা উচিত বলে মনে হয় না, কারণ 'কাম' শব্দবাচ্য ভোগপদার্থ প্রকৃতপক্ষে কারো জন্যই হিতকর হয় না।

সম্বন্ধ—এবার উপরোক্ত সেই দেবতাদের উপাসনার ফলকে বিনাশশীল বলে ভগবদ্ উপাসনার ফলের মহত্ত্ব প্রতিপাদন করছেন—

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি।। ২৩

কিন্তু সেই অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদের সেই ফল হয় বিনাশশীল। দেবতাদের পূজকগণ দেবতাদের লাভ করেন এবং আমার ভক্তগণ যে ভাবেই আমার ভজনা করুক, তাঁরা আমাকেই লাভ করেন ।। ২৩

প্রশ্ন—পঞ্চদশ শ্লোকে যাদের মূঢ় বলা হয়েছে, তাঁদের এবং এই দেবতাদের উপাসনাকারী 'অল্পবুদ্ধি' মানুষদের মধ্যে পার্থক্য কী? এঁদের 'অল্পবুদ্ধি' বলার তাৎপর্য কী?

উত্তর—পঞ্চদশ শ্লোকে ভগবৎ ভক্তিহীন পাপাচরণকারী নরাধমদের আসুর স্বভাবযুক্ত ও মূঢ় বলা হয়েছে। এখানে পাপাচরণরহিত ও শাস্ত্রবিধি দ্বারা দেবতাদের উপাসনাকারী হওয়ায় তাদের থেকে এই শ্রেণীর মানুষ অনেক শ্রেষ্ঠ এবং যদিও তাঁরা আসুরিক ভাব প্রাপ্ত ও সর্বতোভাবে মূঢ়ও নন; কিন্তু কামনার বশ হয়ে অন্য দেবতাদের ভগবানের থেকে পৃথক মনে করে তাঁরা ভোগ্য বস্তুর জন্য দেবতাদের উপাসনা করেন, তাই তাঁরা ভক্তদের থেকে নিম্নশ্রেণীর ও 'অল্পবুদ্ধি'। যদি এঁরা অল্পবুদ্ধি না হতেন তাহলে অবশ্যই বুঝতেন যে সমস্ত দেবতার রূপে ভগবানই সকল পূজা এবং আহুতি গ্রহণ করেন এবং ভগবানই সকলের একমাত্র অধীশ্বর (৫।২৯; ৯।২৪)। বুদ্ধির এই অল্পতার জন্যই তাঁরা এতো পরিশ্রমে সম্পাদিত যজ্ঞাদি বিশাল কর্মের অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও বিনাশশীল ফল লাভ করেন। তাঁরা যদি বুদ্ধিমান হতেন তবে ভগবানের প্রভাব বুঝে ভগবানের উপাসনার জন্যই এই পরিশ্রম করতেন অথবা সমস্ত দেবতাকে ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন মনে করে ভগবদ্-প্রীত্যর্থে তাঁর উপাসনা করতেন, তাহলে এই পরিশ্রমেই, তাঁরা সেই মহান্ ও দুর্লভ ফললাভ করে কৃতকৃত্য হয়ে যেতেন। এই ভাব দেখানোর জন্য এঁদের অল্পবুদ্ধি বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—দেবতাদের লাভ করা মানে কী? দেবতাদের পূজাকারী সকল ভক্তই কি তাঁকে লাভ করেন? দেবোপাসনার ফলকে অন্তবৎ বলা হয়েছে কেন?

উত্তর—যে দেবতাদের উপাসনা করা হয়, তাঁদের লোকে পৌঁছে দেবতাদের সামীপ্য, সারূপ্য ও সেখানকার ভোগ প্রাপ্ত করাই হল দেবতাদের লাভ করা। দেবোপাসনার সব থেকে বড় ফল এটাই, কিন্তু সব দেবোপাসকেরা এই ফলও মেলে না। বহুলোক—যাঁরা স্ত্রী, পুত্র, অর্থ, মান-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি তুচ্ছ ও ক্ষণিক ভোগের জন্য উপাসনা করেন—নিজ নিজ কামনা

অনুযায়ী সেই ভোগ লাভ করেই সন্তুষ্ট থাকেন। কিছু লোক, যাঁদের দেবতাতে বিশেষ শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাওয়ায় ভোগের চেয়ে দেবতাতে অধিক প্রীতিবশতঃ উপাসনা করেন এবং মৃত্যুকালে যাঁদের সেই দেবতার স্মৃতি মনে জাগে, তাঁরা দেবলোকে গমন করেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, এই সব দেবতা, তাঁদের থেকে প্রাপ্ত ভোগ ও তাঁদের লোক—এ সবই বিনাশশীল। তাই ঐ ফলকে **'অন্তবৎ'** বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—ভগবানকে লাভ করা মানে কী ? ভগবানের আর্ত ইত্যাদি ভক্তেরা ভগবানকে কীভাবে লাভ করেন এবং এই বাক্যে 'অপি'র প্রয়োগে কী ভাব প্রদর্শিত হয়েছে ?

উত্তর—ভগবানের নিত্য দিব্য পরমধামে নিরন্তর ভগবানের নিকট নিবাস করা অথবা অভেদভাবে ভগবানের সঙ্গে একত্ব অনুভব করা, উভয়েরই নাম **'ভগবদ্‌প্রাপ্তি'**। ভগবানের জ্ঞানী ভক্তদের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ জগৎই ভগবানের স্বরূপ, সুতরাং তাঁদের জন্য ভগবান নিত্য প্রাপ্ত, তাঁদের বিষয়ে কিছু বলারই নেই। জিজ্ঞাসু ভক্ত ভগবানকে তত্ত্বতঃ জানতে চান, তাই তাঁদেরও ভগবানের তত্ত্বজ্ঞান হওয়া মাত্র ঈশ্বরলাভ হয়। বাকি রইল অর্থার্থী ও আর্ত। তাঁরাও ভগবানের দয়ায় তাঁকে লাভ করেন। ভগবান পরম দয়ালু ও পরম সুহৃদ। যে ভাবে ভক্তের কল্যাণ হয়, যেভাবে ভক্ত শীঘ্র তাঁর নিকট পৌঁছতে পারেন, ভগবান তাই করে থাকেন। যে কামনার পূর্তিতে বা যে সংকট নিবারণে ভক্তের অনিষ্ট হয়, মোহবশতঃ ভক্ত চাইলেও ভগবান সেই কামনা পূরণ বা সংকট নিবারণ করেন না আর যার পূর্তিতে তাঁর প্রতি ভক্তের প্রেম ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়, সেটি তিনি পূর্ণ করেন। সুতরাং ভগবানের ভক্ত কামনা পূরণের সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তীকালে ভগবানকেও লাভ করেন। এইজন্যই এই শ্লোকে **'অপি'** শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

ভগবানের স্বভাবই এমন যে, যে একবার যে কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে ভক্তিপূর্বক ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে নেয়, পরে যদি সে তা ভাঙতেও চায়, তাহলে ভগবান তা ভাঙতে দেন না। ভগবানের ভক্তির মহিমা এমনই যে, ভক্তকে তার ইচ্ছিত বস্তু প্রদান করে অথবা সেই বস্তুর দ্বারা পরিণামে ক্ষতি হলে, তা প্রদান না করেও ভক্তি নষ্ট হয় না। সেটি তার মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে এবং সময় হলেই সেটি তাকে ভগবানের দিকে আকর্ষণ করে নিয়ে যায়। একবার কোনো কারণে ভক্তিলাভ হলে বহু জন্ম ব্যতীত হলেও তা তাকে ছাড়ে না, যতক্ষণ না সেটি তাকে ভগবানকে লাভ করিয়ে দেয়। আর ঈশ্বর লাভ হলে তো ভক্তি ত্যাগ হওয়ার প্রশ্নই থাকে না ; তখন ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানে ঐক্য হয়ে যায়।

সম্বন্ধ—ভগবান যখন এতো প্রেমিক ও দয়াসাগর যে, যে কোনো প্রকারে ভজনাকারীকে নিজ স্বরূপ প্রাপ্ত করিয়ে দেন, তাহলে সকলেই কেন তাঁর ভজনা করেন না ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন—

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্‌॥ ২৪

বুদ্ধিহীন ব্যক্তি আমার সর্বোৎকৃষ্ট অবিনাশী পরম ভাব না জেনে মন ও ইন্দ্রিয়ের অতীত সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাস্বরূপ আমাকে মানুষের ন্যায় ব্যক্তিভাবসম্পন্ন বলে মনে করে॥ ২৪

প্রশ্ন—এখানে **'অবুদ্ধয়ঃ'** পদ কীরূপ মানুষের বাচক এবং ভগবানের 'অনুত্তম অবিনাশী পরমভাব না জানা' কী ?

উত্তর—ভগবানের গুণ, প্রভাব, নাম, স্বরূপ ও লীলা ইত্যাদিতে যাঁর বিশ্বাস নেই এবং যাঁর মোহাবৃত ও বিষয়বিমোহিত বুদ্ধি তর্কজালে সমাচ্ছন্ন, সেই **'বুদ্ধিহীন'** মানুষ। তার জন্যই **'অবুদ্ধয়ঃ'** পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। এরূপ লোকের কিছুতেই বোধগম্য হয় না যে সমগ্র পৃথিবী ভগবানেরই দ্বিবিধ প্রকৃতির বিস্তার এবং ঐ দুই প্রকৃতির পরমাধার হওয়ায় ভগবানই সর্বোত্তম, তাঁর থেকে উত্তম আর কেউ নেই। তাঁর অচিন্ত্য, অকথনীয় স্বরূপ, স্বভাব, মহত্ত্ব ও অপ্রতিমগুণ মন ও বাক্যের দ্বারা যথার্থরূপে বলা

বা বোঝানো যায় না। তাঁর অনন্ত দয়া এবং শরণাগত-বৎসলতার জন্য জগতের প্রাণীদের তাঁর শরণাগতির আশ্রয় প্রদানের জন্যই ভগবান তাঁর অজ, অবিনাশী ও মহেশ্বর-স্বভাব এবং সামর্থ্য-সহ নানা স্বরূপে প্রকটিত হন এবং নিজ অলৌকিক লীলা দ্বারা জগতের প্রাণীদের পরমানন্দের মহাপ্রশান্ত মহাসাগরে ডুবিয়ে রাখেন। এটিই হল ভগবানের সেই নিত্য, অনুত্তম এবং পরম ভাব এবং তা বুঝতে না পারাই হল 'তাঁর অনুত্তম অবিনাশী পরম-ভাবকে না বোঝা'।

প্রশ্ন—আমাকে অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত বলে মানে, এই বাক্যের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভগবানের নির্গুণ-সগুণ—উভয় রূপই নিত্য ও দিব্য। তিনি তাঁর অচিন্ত্য ও অলৌকিক দিব্য স্বরূপ, স্বভাব, প্রভাব ও গুণাদির জন্যই মনুষ্য ইত্যাদি রূপে অবতাররূপ ধারণ করেন। মনুষ্য ইত্যাদি রূপে তাঁর প্রাদুর্ভাব হওয়াই হল জন্মগ্রহণ করা এবং অন্তর্ধান হওয়াই হল পরমধামে গমন করা। অন্য প্রাণীদের মতো দেহ-সংযোগ-বিয়োগ রূপ জন্ম-মৃত্যু ভগবানের হয় না। এই রহস্য না জানায় বুদ্ধিহীন মানুষ মনে করে যে, অন্য প্রাণীরা যেমন জন্মের আগে অব্যক্ত থাকে, অর্থাৎ তাদের কোনো অস্তিত্ব থাকে না, জন্মগ্রহণ করে ব্যক্ত হয় ; তেমনই শ্রীকৃষ্ণও জন্মের আগে ছিলেন না, এখন বসুদেবের গৃহে জন্মগ্রহণ করে ব্যক্ত হয়েছেন। অন্য মানুষে ও তাঁতে পার্থক্য কী ? অর্থাৎ কোনোই তফাৎ নেই। এই ভাব দেখানোর জন্যই বলেছেন যে বুদ্ধিহীন মানুষ আমাকে অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত হওয়া বলে মানেন।

প্রশ্ন—যদি এই অর্থ ধরা হয় যে 'বুদ্ধিহীন' মানুষ আমার ন্যায় অব্যক্তকে অর্থাৎ নির্গুণ-নিরাকার পরমেশ্বরকে সগুণ-সাকার মানুষ রূপে প্রকটিত হওয়া বলে মনে করেন, তাহলে ক্ষতি কী ?

উত্তর—এখানে এই অর্থ মানা উপযুক্ত বলে মনে হয় না, কারণ ভগবানের নির্গুণ-সগুণ, নিরাকার-সাকার সকল স্বরূপই শাস্ত্রসম্মত। স্বয়ং ভগবান বলেছেন যে 'আমি অজ, অবিনাশী পরমেশ্বরই নিজ প্রকৃতিকে স্বীকার করে সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্টদের বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য সময়-সময়ে প্রকটিত হই' (৪।৬-৭-৮)। তাই তাদের বুদ্ধিহীন মনে করলে ভগবানের এই বক্তব্যের বিরোধিতা করা হয় এবং অবতারবাদের খণ্ডন করা হয়, যা কোনো প্রকারেই গীতার মান্য নয়।

প্রশ্ন—যদি এর এরূপ অর্থ মানা হয় যে 'বুদ্ধিহীন মানুষ' আমাকে '**ব্যক্তিমাপন্নম্**' অর্থাৎ মনুষ্যরূপে প্রত্যক্ষ প্রকটিত সগুণ-সাকার পরমেশ্বরকে অব্যক্ত অর্থাৎ নির্গুণ-নিরাকার বলে মনে করে, তাহলে ক্ষতি কী ?

উত্তর—এই অর্থও উপযুক্ত নয় ; কারণ যে পরমেশ্বর সগুণ-সাকাররূপে প্রকটিত, তিনি নির্গুণ-নিরাকারও। তাই যে ব্যক্তি এই যথার্থ তত্ত্বকে বোঝেন, তাঁকে বুদ্ধিহীন কী করে মনে করা যায়। ভগবান স্বয়ং বলেছেন যে আমার অব্যক্ত (নিরাকার) স্বরূপ দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত (৯।৪)। অতএব যে অর্থ করা হয়েছে, তা ঠিকই মনে হয়।

সম্বন্ধ—এইরূপ মানুষরূপে প্রকটিত সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরকে লোকে সাধারণ মানুষ মনে করে কেন ? তাতে বলেছেন—

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢোঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥ ২৫

নিজ যোগমায়া দ্বারা আবৃত বলে আমি সকলের কাছে প্রকাশিত হই না, তাই এই সব মূঢ় ব্যক্তি আমাকে জন্মরহিত অবিনাশী পরমেশ্বর বলে জানতে পারে না অর্থাৎ তারা আমাকে জন্ম-মরণশীল বলে মনে করে॥ ২৫

প্রশ্ন—'যোগমায়া' শব্দ কীসের বাচক ? ভগবানের তাতে সমাবৃত হওয়া কী ?

উত্তর—চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে ভগবান যাকে 'আত্মমায়া' বলেছেন, যে যোগশক্তির দ্বারা ভগবান

দিব্য গুণের সঙ্গে স্বয়ং মনুষ্যাদি রূপে প্রকটিত হয়েও লোকদৃষ্টিতে জন্ম-ধারণকারী সাধারণ মানুষ বলেই প্রতীত হন, সেই মায়াশক্তির নাম 'যোগমায়া'। ভগবান যখন মনুষ্যাদিরূপে অবতীর্ণ হন তখন বহুরূপীরা যেমন অন্য কোনো বেশ ধরে লোকের সামনে উপস্থিত হয় এবং নিজের প্রকৃত রূপ লুকিয়ে রাখে, তেমনই তিনিও চারদিকে নিজের যোগমায়ার প্রভাব বিস্তারিত করে স্বয়ং তার দ্বারা আবৃত থাকেন ; এই হল তাঁর যোগমায়ার দ্বারা আবৃত হওয়া।

প্রশ্ন—'আমি সকলের দৃষ্টিগোচর হই না' এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা এই ভাব দেখানো হয়েছে যে ভগবান তাঁর যোগমায়ার দ্বারা আবৃত থাকেন, সাধারণ মানুষের দৃষ্টি সেই মায়ার আবরণ ভেদ করতে পারে না। এইজন্য অধিকাংশ মানুষ তাঁকে নিজেদের মতো সাধারণ মানুষ মনে করে। অতএব ভগবান সকলের কাছে প্রত্যক্ষ হন না। যাঁরা ভগবানের প্রেমিক ভক্ত এবং তাঁর গুণ, প্রভাব, স্বরূপ ও লীলাতে পূর্ণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রাখেন, যাঁদের ভগবান তাঁর পরিচয় দিতে চান, শুধু তাঁদের কাছেই তিনি প্রত্যক্ষ হন।

প্রশ্ন—জীব যে মায়া দ্বারা আবৃত সে কথা ঠিক, কিন্তু ভগবানের মায়া দ্বারা আবৃত হওয়া কী করে মানা সম্ভব ?

উত্তর—যেমন বলা হয় সূর্য মেঘে ঢাকা আছে ; কিন্তু বাস্তবে সূর্য ঢেকে যায় না, লোকের দৃষ্টিতেই মেঘের আবরণ হয়। যদি সূর্য বাস্তবিক ঢেকে যেত, তবে ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও তা প্রকাশিত হত না। তেমনই ভগবান প্রকৃতপক্ষে মায়া দ্বারা আবৃত হন না ; তিনি যদি আবৃত হতেন তবে কোনো ভক্তই তাঁর প্রকৃত দর্শন পেত না। সেই ক্ষেত্রে কেবল অজ্ঞদের জন্যই তাঁকে আবৃত কেন বলা হত ? প্রকৃতপক্ষে সূর্যের উদাহরণও ভগবানের ক্ষেত্রে খাটে না। কারণ অনন্তের সঙ্গে কোনো পার্থিব বস্তুরই তুলনা হতে পারে না। লোকেদের বোঝাবার জন্যই এরূপ বলা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন—এখানে '**অয়ম্**' ও '**মূঢ়ঃ**' বিশেষণের সঙ্গে যে '**লোকঃ**' পদ ব্যবহৃত হয়েছে, তা কীসের বাচক ? এটি পঞ্চদশ শ্লোকে যে আসুরী প্রকৃতিসম্পন্ন মূঢ়দের বর্ণনা আছে, তাদের বাচক নাকি বিশতম শ্লোকে যাদের জ্ঞান কামনার দ্বারা অপহৃত বলা হয়েছে, সেই অন্য দেবতাদের উপাসকদের ?

উত্তর—এখানে '**অয়ম্**' বিশেষণে প্রতীত হয় যে '**লোকঃ**' পদের প্রয়োগ শুধু ভগবানের ভক্তগণ ব্যতীত বাকি পাপী, পুণ্যাত্মা—সকল শ্রেণীর সাধারণ অজ্ঞ মনুষ্য-সমুদায়ের জন্য করা হয়েছে, কোনো এক শ্রেণী বিশেষের জন্য নয়।

প্রশ্ন—'অজ্ঞ জন-সমুদায় জন্মরহিত অবিনাশী পরমেশ্বর আমাকে জানে না' এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে এই ভাব পরিস্ফুট হয়েছে যে, শ্রদ্ধা ও প্রেমের অভাবের জন্য ভগবানের গুণ, প্রভাব, স্বরূপ, লীলা, রহস্য ও মহিমা না জেনে সাধারণ অজ্ঞ মানুষ এই ভ্রমের বশবর্তী হয় যে শ্রীকৃষ্ণও আমাদের ন্যায় মানুষ এবং তিনি আমাদের মতেই জন্মান ও মৃত্যুবরণ করেন। তাঁরা একথা বুঝতে পারেন না যে তিনি জন্ম-মৃত্যুর অতীত নিত্য, সত্য, বিজ্ঞানানন্দঘন সাক্ষাৎ পরমেশ্বর।

সম্বন্ধ—ভগবান নিজেকে যোগমায়া দ্বারা আবৃত বলেছেন। এতে যেন কেউ মনে না করে যে যেমন ভারী পর্দার অন্তরালে থাকা ব্যক্তিকে বাইরের কেউ দেখতে পায় না এবং তিনিও বাইরের লোককে দেখতে পান না, তেমনই লোকে ভগবানকে না জানার ফলে তিনিও লোকেদের জানেন না—তাইজন্য এবং সেইসঙ্গে যোগমায়া যে তাঁরই অধীন এবং তাঁরই শক্তিবিশেষ, সেটি তাঁর দিব্য জ্ঞানকে আবৃত করতে পারে না, তা জানাবার জন্য ভগবান বলেছেন—

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন॥ ২৬

হে অর্জুন ! অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ—তিনকালের এই ভূতসমূহকে আমি জানি, কিন্তু শ্রদ্ধা-ভক্তিশূন্য কোনো ব্যক্তি আমাকে জানতে পারে না॥ ২৬

প্রশ্ন— '**ভূতানি**' পদটি এখানে কীসের বাচক এবং 'অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—তিনকালের প্রাণী-সমূহকে আমি জানি' এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—দেবতা, মানুষ, পশু ও কীট-পতঙ্গসহ চরাচরের যত প্রাণী আছে, সেই সবের বাচক '**ভূতানি**' পদটি। ভগবান বলেছেন যে এরা সব এখন থেকে পূর্বের অনন্ত কল্প-কল্পান্তরে কখন কী-কী যোনিতে কীভাবে উৎপন্ন হয়ে কীভাবে ছিল এবং এরা কি কি করেছিল ও বর্তমান কল্পে কে, কোথায়, কীভাবে জন্ম নিয়ে কী করছে এবং ভবিষ্যৎকালে কে, কোথায়, কীভাবে থাকবে, সে সব বিষয় আমি জানি।

এই বক্তব্যও লোকদৃষ্টিতেই ; কারণ ভগবানের কাছে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কোনো পার্থক্য নেই। তাঁর অখণ্ড জ্ঞান-স্বরূপে সবই সদা-সর্বদা প্রত্যক্ষ। তাঁর কাছে সবই সদা বর্তমান। বস্তুতঃ সমস্ত কালের আশ্রয় মহাকাল তো তিনিই, তাই তাঁর অগোচর কিছুই নেই।

প্রশ্ন—এখানে '**তু**' প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর— জীবের থেকে ভগবানের অত্যন্ত বৈশিষ্ট্য দেখাবার জন্য '**তু**' প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন — '**কশ্চন**' পদ কীসের বাচক এবং ব্যাখ্যায় তার সঙ্গে '**শ্রদ্ধা-ভক্তিরহিত পুরুষ**' এই বিশেষণ জুড়ে দেওয়ার অর্থ কী ?

উত্তর—এই অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে 'কোনো একজন আমাকে তত্ত্বতঃ জানেন' এবং এই অধ্যায়ের ত্রিশতম শ্লোকেও বলেছেন —'অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞসহ আমাকে জানেন।' এছাড়া একাদশ অধ্যায়ের চুয়ান্নতম শ্লোকেও ভগবান বলেছেন যে—'অনন্য ভক্তি দ্বারা মানুষ আমাকে তত্ত্বতঃ জানতে পারে, আমাকে দেখতে পারে এবং আমাতে প্রবেশও করতে পারে।' তাই এখানে বুঝতে হবে যে ভগবানের ভক্তগণ ছাড়া যে সকল সাধারণ মূঢ় ব্যক্তি আছেন, তাঁরা কেউ ভগবানকে জানতে পারেন না। '**কশ্চন**' পদ এই সব মানুষদেরই লক্ষ্য করায় এবং এই ভাব স্পষ্ট করার জন্য অর্থে '**শ্রদ্ধা-ভক্তিরহিত পুরুষ**' বিশেষণ প্রযুক্ত হয়েছে। পরের শ্লোকে রাগ-দ্বেষজনিত দ্বন্দ্ব-মোহকেই না জানার কারণ বলেছেন, এর দ্বারাও এটাই প্রমাণিত হয় যে রাগ-দ্বেষরহিত ভক্তগণই ভগবানকে জানতে সক্ষম।

সম্বন্ধ—শ্রদ্ধা-ভক্তিরহিত মূঢ় ব্যক্তিরা কেউই ভগবানকে জানেন না, এর কারণ কী ? এই কথা বলার জন্য ভগবান বলেছেন—

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ॥ ২৭

হে ভরতবংশীয় অর্জুন ! জগতে ইচ্ছা-দ্বেষ থেকে উৎপন্ন সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বরূপ মোহ দ্বারা সমস্ত প্রাণী অত্যন্ত অজ্ঞতা প্রাপ্ত হয়ে রয়েছে॥ ২৭

প্রশ্ন— '**ইচ্ছা-দ্বেষ**' শব্দ কীসের বাচক এবং এর থেকে উৎপন্ন হওয়া দ্বন্দ্বরূপ মোহ কী ?

উত্তর — ভগবান যেটিকে মানুষের কল্যাণমার্গে বিঘ্ন প্রদানকারী শত্রু (পরিপন্থী) বলেছেন (৩।৩৪) এবং কাম-ক্রোধের নামে (৩।৩৭) যাঁকে পাপের হেতু ও মানুষের বৈরী বলেছেন—সেই রাগ-দ্বেষকে এখানে '**ইচ্ছা**' ও '**দ্বেষ**' নামে বর্ণনা করেছেন। এই '**ইচ্ছা-দ্বেষ**' থেকে যে হর্ষ- শোক ও সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব উৎপন্ন হয়, তা এই জীবের অজ্ঞতা দৃঢ় করার কারণ হয় ; তাকেই বলা হয় '**দ্বন্দ্বরূপ মোহ**'।

প্রশ্ন—'**সর্বভূতানি**' পদ কীসের বাচক এবং তাদের মোহিত হওয়া কী ?

উত্তর— প্রকৃত শ্রদ্ধাভক্তির সঙ্গে ভগবানের ভজনাকারী ভক্তদের বাদ দিয়ে বাকি সব জন-সমুদায়ের বাচক এই '**সর্বভূতানি**' পদ। তাঁদের ইচ্ছা-দ্বেষ-জনিত হর্ষ-শোক ও সুখ-দুঃখাদিরূপ মোহের বশ হয়ে নিজ জীবনের পরম উদ্দেশ্য ভুলে ভগবানের ভজন-স্মরণের কথা মনে না রাখা এবং দুঃখ ও ভয় উৎপন্নকারী বিনাশশীল এবং ক্ষণভঙ্গুর ভোগকেই সুখের হেতু মনে করে তারই সংগ্রহ ও ভোগের চেষ্টায় নিজ অমূল্য জীবন নষ্ট করতে থাকা—এই হল তাদের মোহিত হওয়া।

সম্বন্ধ—'ভূতানি'র সঙ্গে 'সর্ব' শব্দের প্রয়োগ হওয়ায় ভ্রম হতে পারে যে সকল প্রাণী দ্বন্দ্বমোহে মোহিত হচ্ছে, কেউই তার থেকে রক্ষা পায়নি, সুতরাং সেই ভ্রম দূর করার জন্য ভগবান বলেছেন—

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥ ২৮

কিন্তু নিষ্কামভাবে শ্রেষ্ঠ কর্মের আচরণকারী যে পুরুষদের পাপ দূর হয়েছে, তাঁরা রাগ-দ্বেষজনিত দ্বন্দ্বমোহ থেকে মুক্ত হয়ে দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে আমার ভজনা করেন॥ ২৮

প্রশ্ন—এখানে 'তু' প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—সাধারণ জনমানবের থেকে ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্তদের বিশেষত্ব দেখাবার জন্য এখানে 'তু' প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—নিষ্কামভাবের দ্বারা শ্রেষ্ঠ কর্মের আচরণকারী যে পুরুষের পাপ দূর হয়েছে—এই কথা কোন্ ব্যক্তিদের জন্য বলা হয়েছে ?

উত্তর—যাঁরা জন্ম-জন্মান্তর থেকে শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ, দান ও তপাদি শ্রেষ্ঠ কর্ম ও ভগবানে ভক্তি করে আসছেন এবং পূর্বসংস্কার ও উত্তম সঙ্গপ্রভাবে যাঁরা এই জন্মেও নিষ্কামভাবে শ্রেষ্ঠ কর্মের আচরণ ও ভগবানের ভজনা করেন, নিজ দুর্গুণ-দুরাচারাদি সমস্ত দোষ চিরতরে বিনাশপ্রাপ্ত হওয়ায় যাদের অন্তর পবিত্র হয়েছে—সেই ব্যক্তিদের জন্য এই কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—দ্বন্দ্বমোহ থেকে মুক্ত হওয়া কাকে বলে ?

উত্তর—রাগ-দ্বেষ থেকে উৎপন্ন হওয়া সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ ইত্যাদি দ্বন্দ্বের সমস্তরূপ মোহ থেকে চিরতরে রহিত হয়ে যাওয়া, অর্থাৎ জাগতিক সুখ-দুঃখের সঙ্গে সংযোগ-বিয়োগ হলে কখনো, কোনো অবস্থায়, চিত্তে কোনোপ্রকার বিকার উদ্ভব না হওয়াকে দ্বন্দ্বমোহ থেকে মুক্ত হওয়া বলা হয়।

প্রশ্ন—'দৃঢ়ব্রতাঃ'র অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যিনি অতি বড় প্রলোভন এবং বাধা-বিঘ্ন এলেও কারো কোনো পরোয়া না করে ভজনের বলে সব কিছুকে অবদমিত করে নিজ শ্রদ্ধা-ভক্তিপূর্ণ চিন্তাধারা ও নিয়মে অত্যন্ত দৃঢ়তাসহ অটলভাবে থাকেন, বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না, সেই দৃঢ়নিশ্চয়সম্পন্ন ভক্তদের 'দৃঢ়ব্রতা' বলা হয়।

প্রশ্ন—ভগবানকে সর্বপ্রকারে ভজনা করা কাকে বলে ?

উত্তর—ভগবানকেই সর্বব্যাপী, সর্বাধার, সর্বশক্তিমান, সবার আত্মা ও পরম পুরুষোত্তম জেনে নিজের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শ্রদ্ধাভক্তিপূর্বক তাঁর সেবায় নিয়োজিত করা অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা তাঁর তত্ত্বের নিশ্চয়, মনের দ্বারা তাঁর গুণ, প্রভাব, স্বরূপ ও লীলা-রহস্য চিন্তা, বাণীর দ্বারা তাঁর নাম-গুণাদি কীর্তন, মস্তকের দ্বারা সভক্তি প্রণাম, হস্ত দ্বারা তাঁর পূজা ও দীন-দুঃখীরূপে তাঁর সেবা, চক্ষু দ্বারা তাঁর বিগ্রহ দর্শন, নিজ পদে হেঁটে তাঁর মন্দির ও তীর্থ গমন ও নিজ সমস্ত বস্তু নিঃশেষে শুধুমাত্র তাঁকেই অর্পণ করে সর্বপ্রকারে শুধু তাঁর হয়ে থাকা—এই হল সর্বপ্রকারে তাঁর ভজনা করা।

সম্বন্ধ—এবার ভগবানের ভজনাকারীদের ভজনের প্রকার জানাচ্ছেন—

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্॥ ২৯

যাঁরা আমার শরণাগত হয়ে জরা-মরণ থেকে মুক্তিলাভের জন্য যত্ন করেন, তাঁরা সনাতন ব্রহ্ম, সমগ্র অধ্যাত্ম এবং সম্পূর্ণ কর্ম অবগত হন॥ ২৯

প্রশ্ন—জরা-মৃত্যু থেকে মুক্তিলাভের জন্য ভগবানের শরণাগত হয়ে 'যত্ন করা' কী ?

উত্তর—যতক্ষণ জন্ম থেকে মুক্তিলাভ না হয়, ততক্ষণ বৃদ্ধাবস্থা ও মৃত্যু থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব।

জন্ম থেকে মুক্তি তখনই পাওয়া যায়, যখন জীব অজ্ঞতাজনিত কর্মবন্ধন থেকে চিরতরে মুক্ত হয়ে ভগবানকে লাভ করে। সর্ব কামনা ত্যাগ করে দৃঢ় নিশ্চয়ের সঙ্গে ভগবানকে নিত্য-নিরন্তর ভজনা করলেই ঈশ্বর লাভ হয়। আর এরূপ ভজনা মানুষের দ্বারা তখনই হয় যখন তিনি সৎসঙ্গের আশ্রয় নিয়ে পাপ হতে বিমুক্ত হয়ে আসুর ভাব সর্বতোভাবে ত্যাগ করেন। ভগবান এই অধ্যায়ে বলেছেন—'আসুর স্বভাবসম্পন্ন নীচ ও পাপী মূঢ় ব্যক্তি আমার ভজনা করে না' (৭।১৫) ; তাই সাতাশতম শ্লোকেও ভগবানকে না জানার কারণ বলতে গিয়ে বলেছেন যে, 'রাগ-দ্বেষজনিত সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বের মোহে পড়ে জীব সর্বদা অজ্ঞানে ডুবে থাকে।' এরূপ মানুষের মন নানাপ্রকার ভোগ-কামনায় ভরে থাকে, তাঁদের মনে অন্যান্য সব কামনার বিনাশ হয়ে জন্ম-মৃত্যু থেকে মুক্তি পাবার ইচ্ছাই হয় না। তাই আঠাশতম শ্লোকে ভগবানকে পূর্ণরূপে জানার অধিকারীকে স্থির করতে গিয়ে তাঁকে 'পাপরহিত, পুণ্যকর্মা, সুখ-দুঃখ দ্বন্দ্বমুক্ত ও দৃঢ়নিশ্চয় হয়ে ভগবানের ভজনাকারী' বলা হয়েছে। এরূপ নিষ্পাপ হৃদয় ব্যক্তির মনেই এই শুভ কামনা জাগ্রত হয় যে আমি জন্ম-মৃত্যু-চক্র থেকে মুক্তি লাভ করে কী করে অতি সত্বর পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে জানতে ও লাভ করতে পারব! তাই ভগবান বলেছেন যে, 'যিনি জগতের সমস্ত বিষয়ের আশ্রয় ত্যাগ করে দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে শুধু আমারই আশ্রয় নিয়ে নিরন্তর আমাতেই মন-বুদ্ধি নিবেশ করে রাখেন, তিনিই আমার শরণাগত হয়ে মুক্তিলাভের জন্য যত্ন করে থাকেন।'

প্রশ্ন—'তৎ' বিশেষণের সঙ্গে 'ব্রহ্ম' পদ কীসের বাচক ? 'কৃৎস্ন' বিশেষণের সঙ্গে 'অধ্যাত্ম' পদ কীসের বাচক ? 'অখিল' বিশেষণের সঙ্গে 'কর্ম' পদ কীসের বাচক ? এবং এসব জানার অর্থ কী ?

উত্তর—'তৎ' বিশেষণের সঙ্গে 'ব্রহ্ম' পদ দ্বারা নির্গুণ, নিরাকার সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে নির্দেশ করা হয়েছে। উক্ত পরব্রহ্ম পরমাত্মার তত্ত্বকে যথাযথভাবে অনুভব করে তাঁকে সাক্ষাৎ লাভ করাই হল তাঁকে জানা। এই অধ্যায়ে যে তত্ত্বকে ভগবান 'পরা প্রকৃতি' নামে বর্ণনা করেছেন এবং পঞ্চদশ অধ্যায়ে যাকে 'অক্ষর' বলা হয়েছে, সেই সমস্ত 'জীব সমুদায়'-এর বাচক 'কৃৎস্ন' বিশেষণের সঙ্গে 'অধ্যাত্ম' পদটি এবং এক সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাই জীবাদির রূপে অনেক আকার বলে প্রতীয়মান হন। প্রকৃতপক্ষে জীবসমুদায়রূপ সম্পূর্ণ 'অধ্যাত্ম' সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা থেকে পৃথক নয় ; এই তত্ত্বকে জেনে নেওয়াই হল তাঁকে জানা ; এবং যার দ্বারা সমস্ত প্রাণীর এবং সমগ্র কর্মপ্রচেষ্টার উৎপত্তি হয়, ভগবানের সেই আদি সংকল্পরূপ 'বিসর্গ'-এর নাম 'কর্ম' (এর বিশেষ আলোচনা অষ্টম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় করা হয়েছে) এবং ভগবানের সংকল্প হওয়ায় এই সব কর্ম ভগবানের থেকে অভিন্নই, এই প্রকার জানাই হল 'অখিল কর্ম'-কে জানা।

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞং চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ।। ৩০

যাঁরা অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সঙ্গে (সকলের আত্মারূপে) আমাকে জানেন, সেসব সমাহিত চিত্ত ব্যক্তি মৃত্যুকালেও আমাকে জানেন অর্থাৎ আমাকে লাভ করেন।। ৩০

প্রশ্ন—'অধিভূত', 'অধিদৈব' ও 'অধিযজ্ঞ' শব্দ কোন্ কোন্ তত্ত্বের বাচক এবং এই সবের সঙ্গে সমগ্র ভগবানকে জানা কীরূপ ?

উত্তর—এই অধ্যায়ে ভগবান যাকে 'অপরা প্রকৃতি' ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে যাকে 'ক্ষর পুরুষ' বলে জানিয়েছেন, সেই বিনাশশীল সমস্ত জড়বর্গের নাম 'অধিভূত'। অষ্টম অধ্যায়ে যাঁকে 'ব্রহ্মা' বলা হয়েছে, সেই সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভের নাম 'অধিদৈব' এবং নবম অধ্যায়ের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে যার বর্ণনা করা হয়েছে, সেই সমস্ত প্রাণীদের অন্তঃকরণে অন্তর্যামীরূপে ব্যাপ্ত হয়ে থাকা

ভগবানের অব্যক্তস্বরূপের নাম 'অধিযজ্ঞ'।

ঊনত্রিংশতম শ্লোকে বর্ণিত 'ব্রহ্ম', জীবসমুদায়রূপ 'অধ্যাত্ম', ভগবানের আদি সংকল্পরূপ 'কর্ম' ও উপরিউক্ত জড়বর্গরূপ 'অধিভূত', হিরণ্যগর্ভরূপ 'অধিদৈব' এবং অন্তর্যামীরূপ 'অধিযজ্ঞ'—সব এক ভগবানেরই স্বরূপ। এই হল ভগবানের সমগ্র রূপ। অধ্যায়ের প্রারম্ভে ভগবান এই সমগ্ররূপ জানিয়ে দেবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। পরে আবার সপ্তম শ্লোকে 'আমা ভিন্ন অন্য কেউই পরম কারণ নয়', দ্বাদশ শ্লোকে 'সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব সব আমা হতেই হয়' এবং উনিশতম শ্লোকে 'সব কিছু বাসুদেবই' বলে এই সমগ্রের বর্ণনা করেছেন। এখানেও উপযুক্ত শব্দসমূহের দ্বারা এরই বর্ণনা করে অধ্যায়ের উপসংহার করা হয়েছে। এই সমগ্রকে জেনে নেওয়া অর্থাৎ যেমন পরমাণু, বাষ্প, মেঘ, ধোঁয়া, জল ও বরফ সবই জলস্বরূপ, তেমনই ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম, অধিভূত, অধিদৈব ও অধি-যজ্ঞ—সব কিছুই বাসুদেব। এইভাবে যথার্থরূপে অনুভব করে নেওয়াই হল সমগ্র ব্রহ্মকে অথবা ভগবানকে জানা।

প্রশ্ন—'প্রয়াণকালে'র সঙ্গে 'অপি' প্রয়োগের এখানে অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি **'বাসুদেবঃ সর্বমিতি'** অনুসারে উপরিউক্ত প্রকারে সমগ্ররূপ আমাকে আগেই জেনে নেয়, তার জন্য আর বলার কিছু বাকি থাকে না। এমনকি যিনি অন্তকালেও আমার সমগ্ররূপকে জেনে নেন, তিনিও আমাকে যথার্থ ভাবেই জানেন, অর্থাৎ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে ব্রাহ্মীস্থিতির মহিমা বলার সময়ও এই প্রকার **'অপি'**র প্রয়োগ করা হয়েছে।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

—o—

ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ

অষ্টম অধ্যায়

(অক্ষরব্রহ্মযোগ)

অধ্যায়ের নাম 'অক্ষর' এবং 'ব্রহ্ম' দুটি শব্দ ভগবানের সগুণ ও নির্গুণ—উভয় স্বরূপেরই বাচক (৮।৩,১১,২১,২৪) এবং ভগবানের নাম 'ওঁ', তাকেও 'অক্ষর' এবং 'ব্রহ্ম' বলা হয় (৮।১৩)। এই অধ্যায়ে ভগবানের সগুণ-নির্গুণ রূপের ও ওঁ-কারের বর্ণনা আছে, তাই এই অধ্যায়ের নাম রাখা হয়েছে **'অক্ষরব্রহ্মযোগ'**।

সংক্ষিপ্ত অধ্যায়-সার এই অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম বিষয়ক অর্জুনের সাতটি প্রশ্ন আছে, পরে তৃতীয় থেকে পঞ্চম পর্যন্ত ভগবান সাতটি প্রশ্নের সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে ষষ্ঠতে অন্তকালের চিন্তার মহত্ত্ব দেখিয়ে সপ্তমে অর্জুনকে নিরন্তর তাঁকে চিন্তা করার নির্দেশ দিয়েছেন। অষ্টম থেকে দশম পর্যন্ত যোগবিধির দ্বারা ভক্তিপূর্বক ভগবানের সগুণ-নিরাকার স্বরূপের চিন্তা করে প্রাণত্যাগ করার প্রকার ও তার ফলের বর্ণনা করেছেন। একাদশ থেকে ত্রয়োদশ পর্যন্ত পরমাত্মার নির্গুণ স্বরূপের প্রশংসা করে অন্তকালে যোগধারণার বিধিতে নির্গুণ ব্রহ্মের জপ-ধ্যানের প্রকার ও তার ফলের বর্ণনা করে চতুর্দশে ভগবান তাঁর প্রাপ্তির সহজ উপায়রূপে অনন্য প্রেমপূর্বক নিরন্তর তাঁকে চিন্তা করার কথা বলেছেন। পঞ্চদশে ও ষোড়শে ভগবৎপ্রাপ্তির দ্বারা পুনর্জন্ম না হওয়া এবং অন্য সমস্ত লোককে পুনরাবৃত্তিশীল বলে সপ্তদশ থেকে উনবিংশতি শ্লোক পর্যন্ত ব্রহ্মার রাত-দিনের পরিমাণ জানিয়ে সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি ও প্রলয়ের বর্ণনা করেছেন। বিশতমতে এক অব্যক্তের অতীত অন্য সনাতন অব্যক্তের প্রতিপাদন করে, একবিংশ ও দ্বাবিংশতম শ্লোকে তাকে 'অক্ষর', 'পরমগতি', 'পরমধাম' এবং 'পরমপুরুষ'—এই নামগুলির দ্বারা প্রতিপাদন করে সেই পরম পুরুষ প্রাপ্তির উপায় অনন্যভক্তি বলা হয়েছে। তারপর তেইশতম থেকে ছাব্বিশতম পর্যন্ত শুক্ল ও কৃষ্ণগতির ফলসহ বর্ণনা করে সাতাশতমতে ঐ দুই গতি সম্বন্ধে অবহিত যোগীদের প্রশংসা করে অর্জুনকে যোগী হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং আঠাশতম শ্লোকে এই অধ্যায়ে বর্ণিত তত্ত্বকে জানার ফল জানিয়ে অধ্যায়ের উপসংহার করা হয়েছে।

সম্বন্ধ—সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম থেকে তৃতীয় শ্লোক পর্যন্ত ভগবান তাঁর সমগ্ররূপের তত্ত্ব শোনার জন্য অর্জুনকে সতর্ক করে, সেটি বলার প্রতিজ্ঞা ও সেই তত্ত্বের জ্ঞাতার প্রশংসা করেছেন। পরে সাতাশতম শ্লোক পর্যন্ত বিভিন্নভাবে সেই তত্ত্বকে বুঝিয়ে সেটি না জানার কারণও যথাযথভাবে বুঝিয়েছেন এবং শেষে ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম, অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞসহ ভগবানের সমগ্ররূপকে জ্ঞাত ভক্তের মহিমা বর্ণনা করে সেই অধ্যায়ের উপসংহার করেছেন। উনত্রিশ এবং ত্রিশতম শ্লোকে বর্ণিত ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম, অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ—এই ছটির এবং প্রয়াণকালে ভগবানকে জানার রহস্য যথাযথভাবে না বোঝায় এই অষ্টম অধ্যায়ের আরম্ভেই প্রথম দুটি শ্লোকে অর্জুন উপরোক্ত সাতটি বিষয় বোঝার জন্য ভগবানের কাছে সাতটি প্রশ্ন করেছেন—

অর্জুন উবাচ

কিং তদ্ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে॥ ১

অর্জুন বললেন—হে পুরুষোত্তম ! ব্রহ্ম কী ? অধ্যাত্ম কী ? কর্ম কী ? অধিভূত এবং অধিদৈবই বা কাকে বলে ? ১

প্রশ্ন—সেই '**ব্রহ্ম**' কী ?' অর্জুনের এই প্রশ্নের কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—'**ব্রহ্ম**' শব্দ বেদ, ব্রহ্মা, নির্গুণ পরমাত্মা, প্রকৃতি ও ওঁ-কার ইত্যাদি বিভিন্ন 'তত্ত্ব' বর্ণনা করার জন্য ব্যবহৃত হয় ; অতএব তার মধ্যে এখানে 'ব্রহ্ম' শব্দ কাকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, তা জানার জন্য অর্জুন প্রশ্ন করেছেন।

প্রশ্ন—'**অধ্যাত্ম**' কী ? এই প্রশ্নের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, জীব ও পরমাত্মা ইত্যাদি অনেকের ক্ষেত্রে '**অধ্যাত্ম**' প্রযুক্ত হয়। তারমধ্যে এখানে '**অধ্যাত্ম**' নামে ভগবান কার কথা বলেছেন ? তা জানার জন্যই অর্জুনের এই প্রশ্ন।

প্রশ্ন—'**কর্ম**' কী ? এই প্রশ্নের কী তাৎপর্য ?

উত্তর—'**কর্ম**' শব্দটি এখানে যজ্ঞ-দান ইত্যাদি শুভ কর্মের বাচক নাকি ক্রিয়ামাত্রের ? অথবা প্রারব্ধ আদি কর্মের বাচক নাকি ঈশ্বরের জগৎ-সৃষ্টিরূপ কর্মের ? এই বিষয়টি স্পষ্ট জানার উদ্দেশ্যে এই প্রশ্ন করা হয়েছে।

প্রশ্ন—'**অধিভূত**' নামে কী বলা হয়েছে ? এই প্রশ্নের কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—'**অধিভূত**' শব্দটির অর্থ এখানে পঞ্চ-মহাভূত নাকি সমস্ত প্রাণিবর্গ অথবা সমস্ত দৃশ্যজগৎ নাকি এটি অন্য কোনো তত্ত্বের বাচক ? এই বিষয় জানার জন্য এরূপ প্রশ্ন করা হয়েছে।

প্রশ্ন—'**অধিদৈব**' কাকে বলা হয় ? এই প্রশ্নের কী মর্মার্থ ?

উত্তর—'**অধিদৈব**' শব্দের দ্বারা এখানে কোনো অধিষ্ঠাত্রী-দেবতাবিশেষকে লক্ষ্য করা হয়েছে অথবা অদৃষ্ট, হিরণ্যগর্ভ, জীব কিংবা অন্য কাউকে ? এটি জানার জন্যই প্রশ্ন করা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে '**পুরুষোত্তম**' সম্বোধন করার কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—'**পুরুষোত্তম**' সম্বোধন দ্বারা অর্জুন জানাচ্ছেন যে 'আপনি সমস্ত পুরুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সকলের অধিষ্ঠাতা ও সর্বাধার। সুতরাং আপনি এইসব প্রশ্নের যেমন সঠিক উত্তর দিতে পারবেন, অন্য কারো পক্ষে তা সম্ভব নয়।'

অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ॥ ২

হে মধুসূদন ! এই দেহে অধিযজ্ঞ কে এবং তিনি কীভাবে অবস্থিত ? অন্তকালে সমাহিত চিত্ত পুরুষেরা আপনাকে কীরূপে জানতে পারেন ? ॥ ২

প্রশ্ন—এখানে 'অধিযজ্ঞে'র বিষয়ে অর্জুনের প্রশ্নের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'**অধিযজ্ঞ**' শব্দ যজ্ঞের কোনো অধিষ্ঠাত্রী-দেবতাবিশেষের বাচক অথবা অন্তর্যামী পরমেশ্বর বা অন্য কারোর ? এই '**অধিযজ্ঞ**' মনুষ্য ইত্যাদি সমস্ত প্রাণীর শরীরে কীভাবে অবস্থান করে এবং তাঁর 'অধিযজ্ঞ' নাম কেন ? এই সব বিষয় জানার জন্য অর্জুন এই প্রশ্ন করেছেন।

প্রশ্ন—'**নিয়তাত্মভিঃ**' কথাটির অভিপ্রায় কী ? অন্তকালে আপনাকে কীরূপে জানতে পারা যায় ? এই প্রশ্নের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভগবান সপ্তম অধ্যায়ের ত্রিশতম শ্লোকে '**যুক্তচেতসঃ**' পদটি যে পুরুষদের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেছেন, তাঁদের লক্ষ্য করেই অর্জুন এখানে '**নিয়তাত্মভিঃ**' পদ প্রয়োগ করে জিজ্ঞাসা করছেন যে, '**যুক্তচেতসঃ**' পদের দ্বারা যে ব্যক্তিদের কথা আপনি বলেছেন, সেই ব্যক্তিরা অন্তকালে তাঁদের চিত্ত কীভাবে আপনাতে নিবেশ করে আপনাকে জানতে পারেন ? অর্থাৎ তাঁরা প্রাণায়াম, জপ, চিন্তা, ধ্যান বা সমাধি ইত্যাদি কোন্ সাধনা দ্বারা আপনার প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেন ? এই বিষয় জানার জন্য অর্জুন এই প্রশ্ন করেছেন।

সম্বন্ধ—অর্জুনের সাতটি প্রশ্নের মধ্যে ভগবান প্রথমে ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম ও কর্মবিষয়ে তিনটি প্রশ্নের উত্তর পরবর্তী

শ্লোকে ক্রমশঃ সংক্ষেপে দিয়েছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ॥ ৩

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—পরম অক্ষর হল 'ব্রহ্ম', নিজ-স্বরূপ অর্থাৎ জীবাত্মাকে বলা হয় 'অধ্যাত্ম' এবং প্রাণীদের ভাব উৎপন্নকারী যে ত্যাগ, তাকে বলা হয় 'কর্ম'॥ ৩

প্রশ্ন—পরম অক্ষর হল 'ব্রহ্ম', এই কথার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—অক্ষরের সঙ্গে পরম বিশেষণ যোগ করে ভগবান বলেছেন যে সপ্তম অধ্যায়ের ঊনত্রিশতম শ্লোকে প্রযুক্ত 'ব্রহ্ম' শব্দ নির্গুণ, নিরাকার সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার বাচক ; বেদ, ব্রহ্মা ও প্রকৃতি ইত্যাদির নয়। যা সব থেকে শ্রেষ্ঠ ও সূক্ষ্ম, তাকেই 'পরম' বলা হয়। 'ব্রহ্ম' ও 'অক্ষর' নামে যে সব তত্ত্বের নির্দেশ করা হয়, সেই সবের মধ্যে সবার থেকে শ্রেষ্ঠ ও অতীত হলেন একমাত্র সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্ম পরমাত্মা। অতএব 'পরম অক্ষর' দ্বারা এখানে সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লক্ষ্য করা হয়েছে। এই পরম ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান প্রকৃতপক্ষে একই তত্ত্ব।

প্রশ্ন—স্বভাব হল 'অধ্যাত্ম'—এর তাৎপর্য কী?

উত্তর—**'স্বো ভাবঃ স্বভাবঃ'** এই ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী নিজ ভাবেরই নাম স্বভাব। জীবরূপা ভগবানের চেতন পরাপ্রকৃতিরূপ আত্মতত্ত্বই যখন আত্ম-শব্দ বাচ্য দেহ, ইন্দ্রিয়, মন-বুদ্ধিরূপ অপরা প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হয়, তখন তাকে 'অধ্যাত্ম' বলা হয়। তাই সপ্তম অধ্যায়ের ঊনত্রিশতম শ্লোকে ভগবান 'কৃৎস্ন' বিশেষণের সঙ্গে যে 'অধ্যাত্ম' শব্দের প্রয়োগ করেছেন, তার অর্থ 'চেতন-জীবসমষ্টি' বুঝতে হবে। ভগবানের অংশরূপা চেতন পরা প্রকৃতি প্রকৃতপক্ষে ভগবানের থেকে অভিন্ন হওয়ায় সেই 'অধ্যাত্ম' নামক সম্পূর্ণ জীবসমুদায়ও যথার্থই ভগবানের থেকে অভিন্ন ও তাঁরই স্বরূপ।

প্রশ্ন—প্রাণীদের ভাব উৎপন্নকারী বিসর্গ—'ত্যাগ'ই কর্ম বলা হয়েছে, এ কথার তাৎপর্য কী?

উত্তর—'ভূত' শব্দ জগতের প্রাণীদের বাচক। এই ভূতাদির ভাবের উদ্ভব ও অভ্যুদয় যে ত্যাগের দ্বারা হয়, যা সৃষ্টি-স্থিতির আধার, সেই 'ত্যাগে'র নামই কর্ম। মহাপ্রলয়ে বিশ্বের সকল প্রাণী নিজ নিজ কর্ম-সংস্কারের সঙ্গে ভগবানে বিলীন হয়ে যায়। আবার সৃষ্টির আদিতে ভগবান যখন সংকল্প করেন যে 'এক আমি বহুরূপে প্রকাশিত হব', তখন পুনরায় তাঁদের উৎপত্তি হয়। ভগবানের এই 'আদি সংকল্প'ই অচেতন প্রকৃতিরূপ যোনিতে চেতনরূপ বীজ স্থাপন করে। এই হল জড়-চেতনের সংযোগ। এই হল মহাবিসর্জন এবং এই বিসর্জন বা ত্যাগকেই বলা হয় 'বিসর্গ'। এর দ্বারাই প্রাণীদের বিভিন্ন ভাবের উদ্ভব হয়। তাই ভগবান বলেছেন—**'সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত' (১৪।৩)।** 'সেই জড়-চেতনের সংযোগে সব প্রাণীর উৎপত্তি হয়।' এটাই হল প্রাণীদের ভাবের উদ্ভব। সুতরাং এখানে বুঝতে হবে যে ভগবানের যে আদি সঙ্কল্পের দ্বারা সমস্ত প্রাণীর উদ্ভব ও অভ্যুদয় হয়, তারই নাম 'বিসর্গ'। এবং ভগবানের এই বিসর্গরূপ মহান কর্ম থেকেই জড়-অক্রিয় প্রকৃতি স্পন্দিত হয়ে ক্রিয়াশীল হয় এবং তাঁর দ্বারাই মহাপ্রলয় পর্যন্ত বিশ্বে অনন্ত কর্মের অখণ্ড ধারা প্রবাহিত হয়। তাই এই 'বিসর্গে'র নামই 'কর্ম'। সপ্তম অধ্যায়ের ঊনত্রিশতম শ্লোকে ভগবান একে 'অখিল কর্ম' বলেছেন। ভগবানের এই ভূতাদি ভাবের উদ্ভবকারী মহান 'বিসর্জন'ই এক মহান সমষ্টি-যজ্ঞ। এই মহাযজ্ঞের থেকে বিবিধ লৌকিক যজ্ঞাদির উদ্ভাবনা হয়েছে এবং সেই যজ্ঞে যে আহুতি প্রদান করা হয়, তার নামও 'বিসর্গ' রাখা হয়েছে। সেই যজ্ঞ থেকেও প্রজার উৎপত্তি হয়। মনুস্মৃতিতে বলা আছে—

অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥

(৩।৭৬)

অর্থাৎ 'বেদোক্ত বিধি দ্বারা অগ্নিতে দেওয়া আহুতি সূর্যে স্থিত হয়, সূর্য থেকে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি থেকে অন্ন এবং

অন্ন থেকে প্রজা সৃষ্টি হয়।'

এই 'কর্ম' অর্থাৎ বিসর্গ-ই হল প্রকৃতপক্ষে ভগবানেরই আদি সংকল্প, তাই এটিও ভগবানের থেকে অভিন্ন।

সম্বন্ধ—ভগবান এবার অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর ক্রমশঃ দিয়েছেন—

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর॥ ৪

উৎপত্তি ও বিনাশশীল সমস্ত বস্তুই অধিভূত ; হিরণ্ময় পুরুষই অধিদৈব এবং হে নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন ! এই দেহে আমি, বাসুদেবই হলাম অন্তর্যামীরূপে অধিযজ্ঞ॥ ৪

প্রশ্ন—'ক্ষরভাব' অধিভূত, এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—অপরা প্রকৃতি ও তার পরিণামে উৎপন্ন যে বিনাশশীল তত্ত্ব, যা প্রতি মুহূর্তে ক্ষয় হয়ে যায়, তার নাম **'ক্ষরভাব'**। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে একেই 'ক্ষেত্র' (শরীর) নামে এবং পঞ্চদশ অধ্যায়ে একেই 'ক্ষর' পুরুষ নামে বলা হয়েছে। এই 'ক্ষরভাব' শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার, প্রাণী ও বিষয়াদি রূপে প্রত্যক্ষ হচ্ছে এবং তা জীবেদের আশ্রিত অর্থাৎ জীবরূপা চেতন পরা প্রকৃতি একে ধারণ করে রেখেছে ; এর নাম 'অধিভূত'। সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান অপরা প্রকৃতিকেও নিজেরই প্রকৃতি বলেছেন। তাই এই 'ক্ষরভাব'ও ভগবানেরই। অতএব এটিও তাঁর থেকে অভিন্ন। ভগবান নিজেই বলেছেন যে 'সৎ-অসৎ সবই আমি' (৯।১৯)।

প্রশ্ন—'হিরণ্ময় পুরুষ' কাকে বলা হয় এবং তিনি **'অধিদৈব'** কীভাবে ?

উত্তর—'পুরুষ' শব্দটি এখানে 'প্রথম পুরুষ'-এর বাচক ; একেই সূত্রাত্মা, হিরণ্যগর্ভ, প্রজাপতি বা ব্রহ্মা বলা হয়। জড়-চেতনাত্মক সমগ্র বিশ্বের ইনিই প্রাণ-পুরুষ। সমস্ত দেবতা এঁরই অঙ্গ, ইনিই সকলের অধিষ্ঠাতা, অধিপতি এবং উৎপাদক, তাই এঁর নাম **'অধিদৈব'**। স্বয়ং ভগবানই অধিদৈবরূপে প্রকটিত হন। তাই ইনিও তাঁর থেকে অভিন্নই।

প্রশ্ন—এই দেহে আমিই **'অধিযজ্ঞ'**—এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—অর্জুন দুটি বিষয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন—**'অধিযজ্ঞ'** কে ? এবং তিনি এই শরীরে কীভাবে আছেন ? দুটি প্রশ্নের উত্তর ভগবান এক সঙ্গেই দিয়েছেন। ভগবানই সব যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু (৫।২৯ ; ৯।২৪) এবং সমস্ত ফলের বিধানও তিনিই করেন (৭।২২), তাই তিনি বলেছেন যে 'অধিযজ্ঞ আমিই স্বয়ং।' এখানে 'এব'র প্রয়োগ দ্বারা এই ভাব বুঝতে হবে যে 'অধিভূত' এবং 'অধিদৈব'ও আমা থেকে ভিন্ন নয়। ভগবান একথা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে 'অধিযজ্ঞ' আমি ; কিন্তু এই অধিযজ্ঞ শরীরে কীভাবে থাকে, তার উত্তরে ভগবান 'এই শরীরে' (**অত্র দেহে**) এটুকুই মাত্র ইঙ্গিত দিয়েছেন। অন্তর্যামী ব্যাপক স্বরূপই দেহে বিরাজ করে, তাই শ্লোকের অর্থে 'অন্তর্যামী' শব্দ দিয়ে স্পষ্ট করা হয়েছে। ভগবান ব্যাপক—অন্তর্যামী রূপে সবার অন্তরে বিরাজিত, তাই ভগবান এই অধ্যায়ের অষ্টম ও দশম শ্লোকে 'দিব্য পুরুষ' এবং বিংশতম শ্লোকে 'সনাতন অব্যক্ত' বলে বাইশতম শ্লোকে তার ব্যাপকতা ও সর্বাধারতার বর্ণনা করেছেন। নবম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকেও অব্যক্তরূপের ব্যাপকতা দেখানো হয়েছে। এখানে ভগবান তাঁর সেই অব্যক্ত সূক্ষ্ম ও ব্যাপক স্বরূপকে 'অধিযজ্ঞ' বলেছেন এবং তার সঙ্গে নিজের অভিন্নতা প্রকট করার জন্য 'আমিই অধিযজ্ঞ', এই স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন।

প্রশ্ন—'দেহভৃতাং বর' এই সম্বোধনের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে ভগবান অর্জুনকে **'দেহভৃতাং বর'** (দেহধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) বলে জানাতে চেয়েছেন যে, তুমি আমার ভক্ত, তাই আমার কথা ইঙ্গিতেই বুঝতে সক্ষম ; সুতরাং 'আমিই অধিযজ্ঞ' এই সঙ্কেতের মাধ্যমে তোমার জানা উচিত যে, 'এসব কিছুই আমি'। তোমার পক্ষে এটি বোঝা কোনো বিরাট ব্যাপার নয়।

সম্বন্ধ—এরূপে অর্জুনের ছটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ভগবান এবার অন্তকাল সম্পর্কীয় সপ্তম প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন—

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ ৫

যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে আমাকে স্মরণ করতঃ দেহত্যাগ করেন, তিনি আমাকেই লাভ করেন—এতে কোনোই সংশয় নেই॥ ৫

প্রশ্ন—এখানে '**অন্তকালে**' পদটির সঙ্গে '**চ**' প্রয়োগ করার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে 'চ' অব্যয় '**অপি**'র অর্থে প্রযুক্ত। এর দ্বারা মৃত্যুকালীন সময়ের বিশেষ তাৎপর্য প্রকট করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ভগবানের বলার অর্থ হল যে, যিনি সদা-সর্বদা তাঁকে অনন্য ভাবে চিন্তা করেন, তাঁর তো কথাই নেই, কিন্তু যিনি এই মনুষ্যজন্মের অন্তিম সময়ে অর্থাৎ মৃত্যুকালেও তাঁকে চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করেন, তিনিও তাঁকে লাভ করেন।

প্রশ্ন—'**মাম্**' পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—ভগবান যে সমগ্ররূপের বর্ণনা করার কথা সপ্তম অধ্যায়ের ত্রিশতম শ্লোকে বলার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, '**মাম্**' পদটি এখানে সেই সমগ্রের বাচক। সমগ্রের মধ্যে ভগবানের সকল স্বরূপই অন্তর্গত, তাই যদি কেউ কোনো এক বিশেষ স্বরূপকে ভগবদ্বুদ্ধিতে স্মরণ করেন, তবে সেটিও ভগবানকেই স্মরণ করা হয় এবং ভগবানের বিভিন্ন অবতারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নাম, গুণ, প্রভাব ও লীলাচরিত্র ইত্যাদিও ভগবানের স্মৃতি হওয়ার কারণ হয়। সুতরাং তাঁদের স্মরণ করলে তাও সাথে-সাথেই স্বতঃই ভগবানের স্মৃতি হয়ে যায়। অতএব নাম, গুণ, প্রভাব ও লীলাচরিত্র ইত্যাদি স্মরণ করাও ভগবানকেই স্মরণ করা বুঝায়।

প্রশ্ন—'**এব**'র অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে '**মাম্**' ও '**স্মরন্**'-এর মধ্যে '**এব**' পদ দিয়ে ভগবান জানাচ্ছেন যে তিনি (ভক্ত) মাতা-পিতা, ভাই-বন্ধু, স্ত্রী-পুত্র, ধন-সম্পদ, মান-মর্যাদা ও স্বর্গাদি কোনো কিছু স্মরণ না করে শুধু আমাকেই স্মরণ করেন।

স্মরণ চিত্তের দ্বারা হয় এবং '**এব**' পদ দ্বারা অন্য স্মরণের সর্বতোভাবে অভাব দেখিয়ে এটাই জানাচ্ছেন যে তাঁর চিত্ত শুধুমাত্র ভগবানেই নিবিষ্ট থাকে।

প্রশ্ন—এখানে '**মদ্ভাব**' প্রাপ্তির অভিপ্রায় কী ? সাযুজ্যাদি মুক্তিযোগের দ্বারা যে কোনো মুক্তি, নাকি নির্গুণ ব্রহ্মের প্রাপ্তি ?

উত্তর—এটি সাধকের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে, তাঁর যেমন ইচ্ছা সেই অনুসারে তিনি ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হন। প্রশ্নের সকল কথাই ভগবদ্ভাবের অন্তর্গত।

প্রশ্ন—এতে কোনোই সংশয় নেই—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই বাক্যের দ্বারা এই ভাব দেখানো হয়েছে যে মৃত্যুকালে ভগবদ্স্মরণকারী ব্যক্তির যে কোনো দেশে (স্থানে) বা যে কোনো কালেই মৃত্যু হোক না কেন এবং তাঁর পূর্বের আচরণ যেমনই হয়ে থাকুক কেন, তিনি নিঃসন্দেহে ঈশ্বরকে লাভ করেন। এতে কোনোপ্রকারের সন্দেহ নেই।

সম্বন্ধ—এখানে বলা হয়েছে যে, ভগবানকে স্মরণ করতঃ প্রয়াণকারী ব্যক্তি ভগবানকেই লাভ করেন। তাতে প্রশ্ন হতে পারে যে শুধু ভগবানের স্মরণের ক্ষেত্রেই এই বিশেষ নিয়ম, নাকি অন্যান্য যে কারও স্মরণের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে ? তাতে বলেছেন—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥ ৬

হে কৌন্তেয় ! মানুষ মৃত্যুকালে যে যে ভাব (যাকেই) স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করেন সেই সেই ভাবই তিনি প্রাপ্ত হন ; কারণ তিনি সর্বদা সেই ভাবেই ভাবিত থাকেন। ॥ ৬

প্রশ্ন—এখানে **'ভাব'** শব্দ কীসের বাচক এবং তাকে স্মরণ করা কী ?

উত্তর—ঈশ্বর, দেবতা, মানুষ, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ, গৃহ, জমি ইত্যাদি যত চেতন ও জড় পদার্থ আছে, সেগুলি সবই 'ভাব'-এর অন্তর্গত। মৃত্যুকালে যে কোনো পদার্থের চিন্তা করাই হল তাকে স্মরণ করা।

প্রশ্ন—**'অন্তকাল'** কোন্ সময়কে বলা হয় ?

উত্তর—যে অন্তিম ক্ষণে এই স্থূল দেহ থেকে প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধিসহ জীবাত্মার বিয়োগ হয়, সেই ক্ষণকে **'অন্তকাল'** বলে।

প্রশ্ন—ত্রয়োদশ অধ্যায়ের একুশতম শ্লোকে ও চতুর্দশ অধ্যায়ের চোদ্দো, পঞ্চদশ ও অষ্টাদশ শ্লোকে ভগবান সত্ত্ব-রজ-তম—এই তিন গুণদিকে ভালো-মন্দ জন্মপ্রাপ্তির হেতু বলে জানিয়েছেন আর এখানে অন্ত-কালের স্মরণকে কারণ মানা হয়েছে—এ কেমন কথা ?

উত্তর—মানুষ যেসব কর্ম করে, তা সংস্কাররূপে তার হৃদয়ে অঙ্কিত হয়ে থাকে। এইরূপ অসংখ্য কর্ম-সংস্কার তার হৃদয়ে সঞ্চিত থাকে ; এই সংস্কার অনুযায়ী যে সময় যেমন সহযোগী নিমিত্ত পাওয়া যায়, তেমনই বৃত্তি ও স্মৃতি হয়। সাত্ত্বিক কর্মের আধিক্যে যখন সাত্ত্বিক সংস্কার বৃদ্ধি পায়, সেই সময় মানুষ সত্ত্বগুণ প্রধান হয়ে ওঠে, সেই অনুসারে স্মৃতিও সাত্ত্বিক হয়। এইরূপ রাজসিক-তামসিক কর্মের আধিক্যে রাজসিক-তামসিক সংস্কার বৃদ্ধি পেলে, মানুষ রজোগুণ ও তমোগুণপ্রধান হয়ে যায় এবং সেই অনুযায়ী তার স্মৃতি হয়। এইরূপ কর্ম, গুণ ও স্মৃতি—এই তিনের ঐক্য হওয়ার কারণে এর মধ্যে কোনো একটিকেও ভাবী জন্মের কারণ বললে তাতে দোষের কিছু নেই, কারণ বস্তুতঃ সব একই ব্যাপার।

প্রশ্ন—মৃত্যুকালে দেবতা, মানুষ, পশু, বৃক্ষ ইত্যাদি সজীব পদার্থ স্মরণ করতে করতে মৃত্যু হলে, মৃত ব্যক্তি ঐ সব জন্ম লাভ করে, সেকথা ঠিক ; কিন্তু যে ব্যক্তি, জমি, বাড়ি ইত্যাদি নির্জীব জড় পদার্থ চিন্তা করতে করতে মারা যায়, সে কীভাবে তা প্রাপ্ত হয় ?

উত্তর—জমি, বাড়ি ইত্যাদি চিন্তা করতে করতে মৃত্যু হলে নিজ গুণ ও কর্মানুসারে ভালো-মন্দ জন্ম লাভ হয় এবং সেই জন্মে মৃত্যুকালের অন্তিম বাসনা অনুসারে জমি-বাড়ি ইত্যাদি জড় পদার্থ প্রাপ্তি হয়। তাৎপর্য হল, তিনি যে জন্মই লাভ করুন, সেই জন্মে তাঁর স্মরণ করা জমি, বাড়ি ইত্যাদির সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ হয়ে যাবে। যেমন বাড়ির মালিক বাড়িটিকে তাঁর নিজের মনে করেন, তেমনই তাতে বাসা করে থাকা ইঁদুর, পাখি, পিঁপড়ে ইত্যাদি জীবও তাকে নিজেরই মনে করে ; সুতরাং বুঝতে হবে যে প্রত্যেক জন্মে প্রকারান্তরে প্রত্যেক জড় বস্তুর প্রাপ্তি হতে পারে।

প্রশ্ন—'সদা তদ্ভাবভাবিতঃ'র অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—মানুষ মৃত্যুকালে যে ভাব স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করেন, তিনি সেই ভাব প্রাপ্ত হন—এই সিদ্ধান্ত সঠিক। কিন্তু মৃত্যুকালে কোন্ ভাব কেন স্মরণ হয়, তা বলার জন্যই ভগবান **'সদা তদ্ভাবভাবিতঃ'** কথাটি বলেছেন। অর্থাৎ মৃত্যুকালে প্রায়শঃ সেই ভাব স্মরণ হয়, যে ভাবে চিত্ত সর্বদা ভাবিত থাকে। যেমন বৈদ্যগণ কোনো ঔষধে বারংবার কোনো রসায়নের প্রয়োগ দ্বারা সেটি তদনুরূপ পরিবর্তিত করেন তেমনই পূর্বসংস্কার, সঙ্গ, পরিবেশ, আসক্তি, কামনা, ভয় ও অধ্যয়ন ইত্যাদির প্রভাবে মানুষ যে বিষয় বারবার চিন্তা করে, সে তাতেই ভাবিত হয়ে যায়। 'সদা' শব্দের দ্বারা ভগবান নিরন্তরের নির্দেশ করেছেন। অভিপ্রায় হল যে, জীবনে সদা-সর্বদা বারবার দীর্ঘকাল ধরে যে ভাবনার অধিক চিন্তা করা হয়, তার দৃঢ় অভ্যাস হয়ে যায়। এই দৃঢ় অভ্যাসই 'সদা তদ্ভাব দ্বারা ভাবিত' হওয়া এবং নিয়ম হল যে, যে ভাবের অভ্যাস দৃঢ় হয়, মৃত্যুকালে প্রায়শঃ সেই ভাব অনায়াসে স্মরণ হয়।

প্রশ্ন—সকলেরই কি সারাজীবন অধিক চিন্তা করা বিষয় (ভাব) মৃত্যুকালে স্মরণ হয় ?

উত্তর—অধিকাংশেরই তো তাই হয়, তবে কোথাও কোথাও মহাত্মা জড়ভরতের ন্যায় মৃত্যুর নিকটবর্তী সময়ে করা হরিণ-শিশুর চিন্তার ন্যায় স্বল্পকালীন চিন্তাও পুরানো অভ্যাস অবদমন করে দৃঢ়ভাবে প্রকাশ

পায় এবং সেটি স্মরণে এসে পড়ে।

প্রশ্ন—'**তদ্ভাবভাবিতঃ**' পদের অন্বয় অন্যভাবে করে যদি এই অর্থ ধরা হয় যে, মানুষ মৃত্যুকালে যে যে ভাব স্মরণ করে দেহত্যাগ করে, নিরন্তর সেই ভাবে ভাবিত হতে হতে, তাই প্রাপ্ত হয়, তাহলে ক্ষতি কী ?

উত্তর—এতে ক্ষতির কোনো কথাই নেই। এর দ্বারা তো একথাই স্পষ্ট হয়ে যায় যে মানুষ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তৎক্ষণাৎ সেকালে স্মরণ করা ভাব পূর্ণতঃ প্রাপ্ত হয় না। মৃত্যুর পর সূক্ষ্মরূপে হৃদয়ে অঙ্কিত সেই ভাবে ভাবিত হতে হতে নির্দিষ্ট সময়েই সেই ভাব পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হয়। যেমন, কোনো মানুষের ছবি তোলার সময় যে মুহূর্তে ছবি তোলা হয়, সেই মুহূর্তে সেই মানুষটি যেভাবে স্থিত হয়, তার ছবিও সেই ভাবেই ওঠে ; তেমনই মৃত্যুকালে মানুষ যেমন চিন্তা করে, তেমনই রূপের ছবি তার অন্তরে অঙ্কিত হয়ে যায়। তারপর ছবির ন্যায় অন্য সহযোগী পদার্থের সাহায্যে সেই ভাবে ভাবিত হয়ে যথাসময়ে তা স্থূলরূপে বিকশিত হয়।

এখানে অন্তঃকরণ হল ক্যামেরার প্লেট, তাতে হওয়া স্মরণই প্রতিবিম্ব এবং অন্য সূক্ষ্ম শরীর প্রাপ্তিই ছবি তোলা ; অতএব ক্যামেরাম্যান যেমন সকলকে সাবধান করে এবং তার কথা না শুনে এদিক-ওদিক নড়লে যেমন ছবি খারাপ হয়ে যায়, তেমনই সম্পূর্ণ প্রাণীর চিত্র গ্রহণকারী ভগবান মানুষকে সতর্ক করছেন যে, 'তোমার ছবি তোলার সময় সন্নিকট, ঠিক নেই কখন শেষ মুহূর্ত এসে যাবে ; অতএব তুমি সাবধান হয়ে যাও, তা নাহলে ছবি খারাপ হয়ে যাবে।' এখানে সর্বক্ষণ পরমাত্মার স্বরূপ চিন্তা করাই হল সাবধান হওয়া এবং তাঁকে ছেড়ে অন্য কারো চিন্তা করাই হল নিজের ছবি খারাপ করা।

সম্বন্ধ—অন্তকালে যাকে স্মরণ করতে করতে মানুষ মরে, তাকেই প্রাপ্ত হয় ; এবং অন্তকালে প্রায়শঃ তারই ভাব স্মরণ হয়, যাকে জীবনে বেশি স্মরণ করা হয়। অতএব ভগবদ্প্রাপ্তিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের অন্তকালে ভগবানকে স্মরণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন এবং অন্তকাল হঠাৎ কখন আসবে, তারও ঠিক নেই ; অতএব এখন ভগবান নিরন্তর তাঁর ভজনা করতে করতেই অর্জুনকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিচ্ছেন—

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্ ॥ ৭

অতএব হে অর্জুন ! তুমি সর্বসময় আমাকে স্মরণ করো এবং যুদ্ধও করো। আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করলে তুমি আমাকেই লাভ করবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই ॥ ৭

প্রশ্ন—এখানে '**তস্মাৎ**' পদটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—উপরোক্ত দুটি শ্লোকে কথিত অর্থের সঙ্গে এই শ্লোকের সম্পর্ক দেখাবার জন্য এখানে '**তস্মাৎ**' পদটির প্রয়োগ করা হয়েছে। অর্থাৎ এই মনুষ্যদেহ ক্ষণভঙ্গুর, কালের কোনো ভরসা নেই এবং যার চিন্তা বেশি হয়, সেই ভাব অন্তকালে স্মরণ হয়। যদি নিরন্তর ভগবানের স্মরণ না হয় এবং বিষয়ভোগ স্মরণ করতে করতেই শরীর ত্যাগ হয়, তাহলে ভগবদ্প্রাপ্তির দ্বার স্বরূপ এই মনুষ্যজীবন ব্যর্থ হয়ে যায়। তাই নিরন্তর ভগবদ্স্মরণ করা উচিত।

প্রশ্ন—এখানে ভগবান অর্জুনকে সর্বসময় তাঁকে স্মরণ করতে বলেছেন, তা তো ঠিক আছে, কিন্তু যুদ্ধ করতে বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—অর্জুন ছিলেন ক্ষত্রিয়, ধর্মানুসারে তিনি যুদ্ধ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। ধর্মযুদ্ধ ক্ষত্রিয়দের কাছে বর্ণ ধর্ম, তাই এখানে 'যুদ্ধ' শব্দটি বর্ণাশ্রমধর্ম পালনের জন্য করা সকল ক্রিয়ার উপলক্ষণ বলে জানতে হবে। ভগবানের আদেশ মনে করে নিষ্কামভাবে বর্ণাশ্রম ধর্মপালন করার জন্য যে কর্ম করা হয়, তাতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়। এছাড়া কর্তব্য-কর্ম আচরণের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদনকারী আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ কারণ তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ থেকে ত্রিংশতম শ্লোক পর্যন্ত বলা হয়েছে,

সেগুলি নিয়ে বিচার করলেও প্রমাণিত হয় যে মানুষের বর্ণাশ্রমধর্ম অনুযায়ী কর্তব্য-কর্ম অবশ্যই করা উচিত। এই ভাব দেখাবার জন্যই এখানে যুদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে 'চ' প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'চ' প্রয়োগ করে ভগবান যুদ্ধকে গৌণ এবং স্মরণকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাৎপর্য হল যে, যুদ্ধাদি বর্ণধর্মের কর্ম তো প্রয়োজনে এবং বিধান অনুসারে নির্দিষ্ট সময়েই করা হয় এবং তা সেই ভাবেই করা উচিত, কিন্তু ভগবানের স্মরণ তো মানুষের সর্ব সময়, সর্ব অবস্থায় অবশ্যই করা উচিত।

প্রশ্ন—ভগবানের নিরন্তর চিন্তা এবং যুদ্ধাদি বর্ণ ধর্মের কর্ম, দুটি একসঙ্গে কীভাবে করা সম্ভব ?

উত্তর—হওয়া সম্ভব ; সাধকের চিন্তা, রুচি ও অধিকার অনুসারে এর বিভিন্ন যুক্তি আছে। যিনি ভগবানের গুণ ও প্রভাব যথাযথভাবে জ্ঞাত অনন্যপ্রেমী ভক্ত, যিনি সমগ্র বিশ্ব ভগবানের দ্বারাই রচিত ও ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন ও তাঁর ক্রীড়াস্থল বলে মনে করেন, প্রহ্লাদ ও গোপীদের ন্যায় প্রত্যেক পরমাণুতে যাঁর ভগবানের দর্শন প্রত্যক্ষের মতো হতে থাকে, সুতরাং তাঁর পক্ষে তো সর্বক্ষণ ভগবদ্স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য কর্ম করা অত্যন্ত সহজ ব্যাপার হয়। যাঁর বিষয় ভোগে বৈরাগ্য হয়ে ভগবানে মুখ্যরূপে প্রেম হয়েছে, যিনি নিষ্কামভাবে শুধু ভগবানের নির্দেশ মনে করে ভগবানের জন্যই বর্ণ ধর্ম অনুসারে কর্ম করেন, তিনিও নিরন্তর ভগবানকে স্মরণ করে অন্যান্য কর্ম সম্পন্ন করতে পারেন। নর্তকী যেমন নিজের পায়ের দিকে খেয়াল রেখেই বাঁশে চড়ে নানাপ্রকার খেলা দেখায় ; অথবা মোটরগাড়ির চালক যেমন গাড়ির হ্যান্ডেলে হাত রেখে গাড়ি চালায় এবং সেই সঙ্গে লোকের সঙ্গে কথাও বলে আবার বিপদ যাতে না হয় সেইজন্য রাস্তার দিকেও নজর রাখে, তেমনই সর্বদা ভগবানকে স্মরণে রেখে বর্ণাশ্রমের সব কাজও সুচারুভাবে করা সম্ভব।

প্রশ্ন—মন-বুদ্ধি ভগবানে সমর্পণ করা কাকে বলে ?

উত্তর—বুদ্ধির দ্বারা ভগবানের গুণ, প্রভাব, স্বরূপ, রহস্য ও তত্ত্ব বুঝে নিয়ে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে অটল সিদ্ধান্তে স্থিত থাকা এবং মনে মনে অনন্য শ্রদ্ধা-প্রেমসহ গুণ, প্রভাবের সঙ্গে ভগবানের চিন্তা সর্বক্ষণ করতে থাকা—একেই বলা হয় মন-বুদ্ধি ভগবানে সমর্পণ করে দেওয়া। ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষেও '**মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা**' পদ দ্বারা এই কথাই বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ—পঞ্চম শ্লোকে ভগবানের চিন্তা-মনন করা কালে মৃত্যুপ্রাপ্ত মানুষের গতির বর্ণনা করে সংক্ষেপে অর্জুনের সপ্তম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে, এবার সেই প্রশ্নেরই বিস্তারিত উত্তর দেবার জন্য অভ্যাসযোগের দ্বারা মনকে বশ করে ভগবানের 'অধিযজ্ঞ' রূপের অর্থাৎ সগুণ নিরাকার দিব্য অব্যক্তরূপের চিন্তনকারী যোগীদের অন্তকালীন গতি তিনটি শ্লোকের মাধ্যমে বর্ণনা করছেন—

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্॥ ৮

হে পার্থ ! পরমেশ্বরের ধ্যানে অভ্যাসরূপ যোগে যুক্ত হয়ে অনন্যগামী চিত্তে নিরন্তর চিন্তামগ্ন পুরুষ, জ্যোতির্ময় পরম দিব্যপুরুষকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকেই লাভ করেন ॥ ৮

প্রশ্ন—এখানে '**অভ্যাসযোগ**' শব্দ কীসের বাচক এবং চিত্তের সেই অভ্যাসযোগে যুক্ত হওয়া কাকে বলে ?

উত্তর—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা এবং ধ্যানের অভ্যাসের নাম '**অভ্যাসযোগ**'। এই অভ্যাসযোগের দ্বারা যথাযথভাবে যে চিত্ত বশীভূত হয়ে নিরন্তর অভ্যাসেই নিবিষ্ট থাকে, তাকে 'অভ্যাসযোগযুক্ত' বলা হয়।

প্রশ্ন—কীরূপ চিত্তকে '**নান্যগামী**' বলে জানতে হবে ?

উত্তর—যে চিত্ত কোনো বিশেষ পদার্থে ব্যাপৃত

থাকায় মুহূর্তের জন্যও সেই চিন্তা ত্যাগ করে অন্য পদার্থের চিন্তা করে না—যেখানে ব্যাপৃত থাকে, সেখানেই নিরন্তর একনিষ্ঠ হয়ে থাকে, সেই চিত্তকে **'নান্যগামী'** অর্থাৎ অন্যদিকে অ-গমনকারী বলা হয়। এখানে পরমেশ্বরের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হওয়ায় একথা বুঝতে হবে যে সেই চিত্ত পরমেশ্বরেই একনিষ্ঠ হয়ে ব্যাপৃত থাকে।

প্রশ্ন—অনুচিন্তন করা কাকে বলে ?

উত্তর— অভ্যাসে নিবিষ্ট হওয়া এবং অন্যদিকে বিক্ষিপ্ত না হওয়া চিত্তের দ্বারা পরমেশ্বরের নিরাকার স্বরূপের যে সর্বদা ধ্যান করতে থাকা, তাকেই 'অনুচিন্তন' বলা হয়।

প্রশ্ন—এখানে **'পরমম্'** ও **'দিব্যম্'** বিশেষণের সঙ্গে **'পুরুষম্'** এই পদটির কেন প্রয়োগ করা হয়েছে এবং তাঁকে লাভ করার কী অর্থ ?

উত্তর—এই অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে যাকে 'অধিযজ্ঞ' বলা হয়েছে এবং বাইশতম শ্লোকে যাকে 'পরম পুরুষ' বলা হয়েছে, ভগবানের সেই সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকারী সগুণ নিরাকার সর্বব্যাপী অব্যক্ত জ্ঞান স্বরূপকে এখানে 'দিব্য-পরম-পুরুষ' নামে বলা হয়েছে। তাঁর চিন্তা করতে-করতে তাঁকে যথার্থরূপ জেনে তাঁর সঙ্গে তদ্রূপ হয়ে যাওয়াই হল তাঁকে লাভ করা।

সম্বন্ধ—দিব্যপুরুষের প্রাপ্তির কথা বলে এবার তাঁর স্বরূপ জানাচ্ছেন—

কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥ ৯

যিনি সর্বজ্ঞ, সনাতন, সকলের নিয়ন্তা এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, সকলের ধারণ-পোষণকারী, অচিন্ত্য-স্বরূপ, সূর্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ এবং অবিদ্যার অতীত শুদ্ধ সচ্চিদানন্দঘন পরমেশ্বরকে স্মরণ করেন॥ ৯

প্রশ্ন—এই শ্লোকটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—পরম দিব্যপুরুষের মহত্ত্ব প্রতিপাদন করতে গিয়ে ভগবান বলেছেন যে, সেই পরমাত্মা সর্বদা সব কিছু জানেন। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—কোনো জগতেরই এমন কোনো প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ বিষয় নেই, যা তিনি সঠিকভাবে না জানেন ; তাই তিনি সর্বজ্ঞ **(কবিম্)**। তিনি সকলের আদি ; তাঁর আগে কেউ ছিল না, হয়নি এবং তাঁর কোনো কারণই নেই ; তিনিই সকলের কারণ ও সব থেকে পুরাতন ; তাই তিনি সনাতন **(পুরাণম্)**। তিনি সবার প্রভু, সর্বশক্তিমান এবং সর্বান্তর্যামী ; তিনিই সকলের নিয়ন্ত্রণকর্তা এবং সকলের শুভাশুভ কর্মফলের যথাযোগ্য বিভাগকারী ; তাই তিনি সকলের নিয়ন্তা **(অনুশাসিতারম্)**। এতো সামর্থ্যশালী হয়েও তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ; যত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব আছে তিনি তার থেকেও অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং সবকিছুতে সর্বদা ব্যাপ্ত, এই জন্য সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বুদ্ধিই তাঁকে অনুভব করে ; তাই তিনি সূক্ষ্মতম **(অণোরণীয়াংসম্)**। এত সূক্ষ্ম হলেও তিনিই সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আধার, তিনিই সকলকে ধারণ, পালন ও পোষণ করেন ; তাই তিনি ধাতা **(সর্বস্য ধাতারম্)**। সর্বদা সবকিছুতে ব্যাপ্ত ও সকলের ধারণ-পোষণে ব্যাপৃত থাকলেও তিনি সবকিছুর থেকে এতো ঊর্ধ্বে ও এতো অতীন্দ্রিয় যে মনের দ্বারা তাঁর স্বরূপের যথার্থ চিন্তা করা সম্ভব নয় ; মন ও বুদ্ধিতে যে চিন্তা ও বিচার করার শক্তি আসে, তার মূল স্রোতও তিনিই—এগুলি তাঁরই জীবনধারা নিয়ে জীবিত ও কার্যশীল থাকে ; তিনি সর্বক্ষণ সকলকে দেখেন ও শক্তিসঞ্চার করতে থাকেন কিন্তু এসকল তাঁকে দেখতে পায় না ; তাই তিনি অচিন্ত্যস্বরূপ **(অচিন্ত্যরূপম্)**। অচিন্ত্য হলেও তিনি প্রকাশময় এবং সদা-সর্বদা সকলকে প্রকাশ করে থাকেন। সূর্য যেমন স্বপ্রকাশস্বরূপ এবং নিজ প্রকাশ দ্বারা সমস্ত জগৎকে প্রকাশিত করে, তেমনই সেই স্বপ্রকাশ পরমপুরুষ তাঁর অখণ্ড জ্ঞানময় দিব্য জ্যোতির দ্বারা সদা-সর্বদা সব কিছু প্রকাশিত করেন ; তাই তিনি সূর্যসদৃশ নিত্য চেতন প্রকাশরূপ **(আদিত্যবর্ণম্)**। এরূপ দিব্য, নিত্য ও অনন্ত জ্ঞানময় প্রকাশই যাঁর স্বরূপ, তাঁর মধ্যে অবিদ্যা বা অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের কল্পনাই করা যায় না ; সূর্য যেমন কখনো অন্ধকারকে দেখেইনি, তেমনই

তাঁর স্বরূপও সদা-সর্বদা অজ্ঞানতম থেকে রহিত ; এমনকি ঘোর রাত্রির অত্যন্ত অন্ধকারও যেমন সূর্যের পূর্বাভাসেই নষ্ট হয়ে যায় ; তেমনই ঘোর বিষয়ী ব্যক্তির অজ্ঞানও তাঁর বিজ্ঞানময় প্রকাশের উজ্জ্বল আলোয় নষ্ট হয়ে যায় ; তাই তিনি অবিদ্যার থেকে অত্যন্ত অতীত (**তমসঃ পরস্তাৎ**)। এরূপ শুদ্ধ সচ্চিদানন্দঘন পরমেশ্বর পুরুষকে সদা স্মরণ করা উচিত।[১]

প্রশ্ন— ভগবানের উপরোক্ত স্বরূপ যখন অচিন্ত্য, মন-বুদ্ধির দ্বারা তাঁকে চিন্তা করাই যায় না, তখন তাঁকে স্মরণ করার কথা আসে কীভাবে ?

উত্তর—একথা সত্য যে অচিন্ত্য-স্বরূপের যথার্থ উপলব্ধি মন-বুদ্ধির দ্বারা হতে পারে না। কিন্তু তার যে লক্ষণ এখানে বলা হয়েছে, সেই লক্ষণ দ্বারা তিনি যুক্ত মনে করে তাঁকে বারংবার স্মরণ ও মনন করা সম্ভব এবং ঐরূপ স্মরণ ও মননই তাঁর স্বরূপ উপলব্ধির প্রকৃত হেতু হয়। তাই তাঁকে স্মরণ করার কথা বলা হয়েছে, যা সর্বতোভাবে যথার্থ।

সম্বন্ধ—পরম দিব্যপুরুষের স্বরূপ জানিয়ে এবার সাধনের বিধি ও ফল জানাচ্ছেন—

প্রয়াণকালে মনসাচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্‌॥ ১০

সেই ভক্তিমান ব্যক্তি অন্তিমকালেও যোগবলের দ্বারা ভ্রূযুগলের মধ্যে প্রাণকে ভালোভাবে স্থাপন করে, একাগ্র মনে তাঁকে স্মরণ করে সেই দিব্যস্বরূপ পরমপুরুষ পরমাত্মাকেই লাভ করেন॥ ১০

প্রশ্ন—এখানে '**ভক্ত্যা যুক্তঃ**' কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'**ভক্ত্যা যুক্তঃ**'র অর্থ ভক্তির দ্বারা যুক্ত। ভগবদ্‌বিষয়ে অনুরাগকে বলা হয় ভক্তি। যার মধ্যে ভক্তি হয়, সেই ভক্তিযুক্ত হয়। অনুরাগ বা প্রেম কোনো না কোনো প্রেমাস্পদের প্রতি হয়ে থাকে। অতএব বুঝতে হবে যে এইস্থানে নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্মের অহংগ্রহ উপাসনার অর্থাৎ জ্ঞানযোগের প্রসঙ্গ আলোচ্য নয়, উপাস্য-উপাসকভাব সমন্বিত ভক্তির প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।

প্রশ্ন—যোগবল কী ? ভ্রূযুগলের মধ্যস্থান কোন্‌টি এবং প্রাণকে ভালোভাবে স্থাপনা করা কাকে বলে এবং তা কীরূপে করা যায় ?

উত্তর—অষ্টম শ্লোকে কথিত অভ্যাসযোগ (অষ্টাঙ্গযোগ)-কেই 'যোগ' বলা হয়েছে। যোগাভ্যাস দ্বারা অর্জিত যথাযোগ্য প্রাণসঞ্চালন ও প্রাণনিরোধের যে সামর্থ্য, তাকে বলা হয় 'যোগবল'। উভয় ভ্রূর মধ্যস্থলে যোগশাস্ত্রজ্ঞাত ব্যক্তিগণ যেখানে 'আজ্ঞাচক্র' অবস্থানের কথা বলেন, সেটিই ভ্রূর মধ্যস্থল। বলা হয় যে এই আজ্ঞাচক্র দ্বিদল। এতে ত্রিকোণ যোনি থাকে। অগ্নি, সূর্য ও চন্দ্র এই ত্রিকোণে একত্রিত হয়। অভিজ্ঞ যোগী ব্যক্তি মহাপ্রয়াণের সময় যোগবলে প্রাণকে এখানে স্থিররূপে নিরুদ্ধ করেন। একেই বলা হয় ভালোভাবে প্রাণ স্থাপন করা। এইভাবে আজ্ঞাচক্রে প্রাণ নিরোধ করা সাধন সাপেক্ষ। এই আজ্ঞাচক্রের কাছে সপ্তকোশ থাকে, যাদের নাম—ইন্দু, বোধিনী, নাদ, অর্ধচন্দ্রিকা, মহানাদ, (সোমসূর্যাগ্নিরূপিণি) কলা ও উন্মনী ; প্রাণের মাধ্যমে উন্মনী কোশে পৌঁছে গেলে জীব পরমপুরুষকে লাভ করেন, পরে আর তাঁকে পরাধীন হয়ে জন্ম নিতে হয় না। হয় তিনি আর জন্মান না অথবা জন্ম নিলেও লোকের উপকারার্থে স্বেচ্ছায় বা ভগবদ্-ইচ্ছায় জন্মগ্রহণ করেন।

[১]শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে একইরকম মন্ত্র আছে—

'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥' (৩।৮)

'সেই পুরুষ যিনি সূর্যের ন্যায় প্রকাশস্বরূপ, মহান এবং অজ্ঞানান্ধকার থেকে অতীত, তাঁকে আমি জানি। তাঁকে জানলেই অধিকারী ব্যক্তি মৃত্যুকে লঙ্ঘন করেন। পরমাত্মাকে লাভ করার অন্য কোনো পথ নেই।'

এই সাধনের প্রণালী কোনো অনুভবী যোগী মহাত্মার দ্বারাই জানা সম্ভব। শুধু বই পড়ে এই যোগসাধনা করা উচিত নয়, তাতে লাভের বদলে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি।

প্রশ্ন—'অচল মন'-এর লক্ষণ কী ?

উত্তর—অষ্টম শ্লোকে যে অর্থে মনকে 'নান্যগামী' বলা হয়েছে, এখানে সেই অর্থেই 'অচল' বলা হয়েছে। অর্থ হল যে, যে মন ধ্যেয় বস্তুতে স্থিত হয়ে সেখান থেকে একটুও সরে যায় না, তাকে অচল বলা হয় (৬।১৯)।

প্রশ্ন—'পরম দিব্যপুরুষ'-এর লক্ষণ কী ?

উত্তর—পরম দিব্যপুরুষের লক্ষণাদির বর্ণনা অষ্টম ও নবম শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

সম্বন্ধ—পঞ্চম শ্লোকে ভগবানের চিন্তা করতে করতে মৃত্যুগামী সাধারণ মানুষের গতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে, তারপর অষ্টম থেকে দশম শ্লোক পর্যন্ত ভগবানের 'অধিযজ্ঞ' নামক সগুণ-নিরাকার দিব্য অব্যক্ত স্বরূপের চিন্তনকারী যোগীদের অন্তকালীন গতির সম্বন্ধে বলা হয়েছে, এবার একাদশ থেকে ত্রয়োদশতম শ্লোক পর্যন্ত পরম অক্ষর নির্গুণ-নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনাকারী যোগীদের মৃত্যুকালীন গতির বর্ণনার উপক্রমে প্রথমেই সেই অক্ষর ব্রহ্মের প্রশংসা করে তাঁকে জানাবার শপথ করছেন—

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে॥ ১১

বেদার্থজ্ঞগণ যাঁকে অক্ষরপুরুষ বলে বর্ণনা করেন, আসক্তিরহিত যোগিগণ যাঁকে লাভ করেন, ব্রহ্মচারিগণ যাঁকে লাভ করার আকাঙ্ক্ষায় ব্রহ্মচর্য পালন করেন, সেই পরমপদ লাভের উপায় আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলছি॥ ১১

প্রশ্ন—'বেদবিদঃ' পদটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—যার দ্বারা পরমাত্মার জ্ঞান হয়, তাকে বেদ বলা হয় ; এই বেদ এখন চারটি সংহিতা এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ভাগের রূপে প্রাপ্ত। বেদের প্রাণ ও আধার হল পরব্রহ্ম পরমাত্মা। এটিই বেদের তাৎপর্য (১৫।১৫)। যিনি সেই তাৎপর্য জানেন এবং জেনে তা লাভ করার জন্য অবিরত সাধনা করেন ও শেষে লাভ করেন, সেই জ্ঞানী মহাত্মা পুরুষই বেদবিদ অর্থাৎ বেদের প্রকৃত জ্ঞাতা।

প্রশ্ন—'বেদজ্ঞ ব্যক্তি যাঁকে অবিনাশী বলেন'—এই বাক্যটির অর্থ কী ?

উত্তর—'যৎ' পদ দ্বারা সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্মকে নির্দেশ করা হয়েছে। এখানে এর তাৎপর্য হল যে, বেদজ্ঞ জ্ঞানী মহাত্মা পুরুষই সেই ব্রহ্মের বিষয়ে কিছু বলতে সক্ষম, এতে অন্য কারো অধিকার নেই। সেই মহাত্মা বলেন যে, তিনি 'অক্ষর' অর্থাৎ এটি এমন এক মহান তত্ত্ব, যার কোনো অবস্থায় কখনো কোনো রূপে ক্ষয় হয় না ; ইনি সর্বদা অবিনশ্বর, একরস ও একরূপে বিরাজমান। দ্বাদশ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে যে অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনার বর্ণনা আছে, এখানেও তাঁরই প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে।

প্রশ্ন—'বীতরাগাঃ' বিশেষণের সঙ্গে 'যতয়ঃ' পদটি কীসের বাচক ?

উত্তর—যাঁর আসক্তির চিরতরে বিনাশ হয়েছে, তিনি 'বীতরাগ' এবং এরূপ বীতরাগ, তীব্র বৈরাগ্যবান, ঈশ্বর লাভের পাত্র, ব্রহ্মস্থিত এবং উচ্চ শ্রেণীর সাধনসম্পন্ন যে সন্ন্যাসী মহাত্মা, তাঁরই বাচক এখানে 'যতয়ঃ' পদটি।

প্রশ্ন—'যৎ বিশন্তি' কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর শব্দার্থ হল, যাতে প্রবেশ করে। অর্থাৎ এখানে 'যৎ' পদ সেই সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, উপরোক্ত সাধন করতে-করতে সাধনের শেষ সীমায় পৌঁছে যতিরা অভেদভাবে যাতে প্রবেশ করেন। এখানে এটা স্মরণ রাখা উচিত যে এই প্রবেশের অর্থ 'কোনো ব্যক্তি বাইরে থেকে কোনো ঘরে প্রবেশ করেছে', এমন নয়। নিজ স্বরূপ হওয়ায় পরমাত্মা তো নিত্যই প্রাপ্ত, এই নিত্যপ্রাপ্ত তত্ত্বতে যে অপ্রাপ্তির ভ্রম হয়—সেই অবিদ্যারূপ ভ্রম দূর হওয়াই

হল তাঁতে প্রবেশ করা।

প্রশ্ন—'যাঁকে লাভের জন্য ব্রহ্মচর্য পালন করে' এই বাক্যের অর্থ কী ?

উত্তর—'যৎ' পদটি সেই ব্রহ্মের বাচক, যাঁর সম্বন্ধে বেদবিদ ব্যক্তিরা উপদেশ দেন এবং 'বীতরাগ যতি' যাঁতে অভেদভাবে প্রবেশ করেন। এখানে এই বক্তব্যের এই ভাবার্থ যে সেই ব্রহ্ম লাভ করার জন্য ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করেন। 'ব্রহ্মচর্যে'র প্রকৃত অর্থ ব্রহ্মে অথবা ব্রহ্মমার্গে বিচরণ করা—যে সাধন দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব, তদনুরূপ আচরণ করা। এরূপ সাধন-সকলই ব্রহ্মচারীর ব্রত[১] যা ব্রহ্মচর্য-আশ্রমে আশ্রম-ধর্মরূপে অবশ্য পালনীয় এবং সাধারণতঃ অবস্থা ভেদ অনুসারে সকল সাধকের যথাশক্তি তা অবশ্যই পালন করা উচিত।

ব্রহ্মচর্যের প্রধান তত্ত্ব—বিন্দুর (বীর্যের) সংরক্ষণ ও সংশোধন। এর দ্বারা বাসনার বিনাশে ব্রহ্মলাভে অত্যন্ত সহায়তা পাওয়া যায়। ঊর্ধ্বরেতা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীদের বীর্য কোনো অবস্থাতেই অধোমুখী হয় না, তাই তাঁরা অনায়াসে ব্রহ্মমার্গে এগিয়ে চলেন। এঁদের নিম্ন স্তরে যাঁরা, তাঁদের বিন্দু অধোগামী হলেও তাঁরা কায়-মনো-বাক্যে মৈথুন সর্বতোভাবে ত্যাগ করে তার সংরক্ষণ করেন। এও একপ্রকারের ব্রহ্মচর্য। তাই গরুড়পুরাণে বলা হয়েছে—

কর্মণা মনসা বাচা সর্বাবস্থাসু সর্বদা।
সর্বত্র মৈথুনত্যাগো ব্রহ্মচর্যং প্রচক্ষতে॥

(পু.খং,আ.কা.অ. ২৩৮।৬)

'সর্বস্থানে সবপ্রকারের স্থিতিতে সর্বদা মন-বাক্য ও কর্মের দ্বারা মৈথুন ত্যাগ করাকে ব্রহ্মচর্য বলা হয়।'

আশ্রমব্যবস্থার লক্ষ্যও হল ব্রহ্ম লাভ। সর্বপ্রথম আশ্রম হল ব্রহ্মচর্য। তাতে বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে ব্রহ্মচর্য নিয়ম পালন আবশ্যক। তাই বলা হয়েছে যে ব্রহ্মের ইচ্ছাসম্পন্ন ব্যক্তি (ব্রহ্মচারী) ব্রহ্মচর্যের আচরণ করেন।

প্রশ্ন—'সেই পদ আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলব', এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই বাক্যের দ্বারা ভগবান এই প্রতিজ্ঞা করেছেন যে উপরোক্ত বাক্যে যে পরব্রহ্ম পরমাত্মার নির্দেশ করা হয়েছে, সেই ব্রহ্ম কী এবং অন্তকালে কীরূপ সাধন করলে মানুষ তাঁকে লাভ করে—এ কথা আমি সংক্ষেপে তোমাকে জানাব[২]।

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে যে বিষয় বর্ণনা করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এবার দুটি শ্লোকে তারই বর্ণনা করছেন।

সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥ ১২
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥ ১৩

সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার সংযত করে ও মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করে, প্রাণকে মস্তকে স্থাপন করে পরমাত্মারূপ যোগে স্থিত হয়ে যে ব্যক্তি 'ওঁ' এই এক অক্ষর ব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করতঃ এবং তার অর্থস্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্মরূপে আমাকে স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করেন, তিনি পরম গতি লাভ করেন ॥ ১২-১৩

---

[১] ষষ্ঠ অধ্যায়ের চতুর্দশ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

[২] কঠোপনিষদেও এইপ্রকার মন্ত্র আছে—

সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥ (১।২।১৫)

সমগ্র বেদ যে পদের বর্ণনা করে, সমস্ত তপকে যার প্রাপ্তির সাধন বলা হয় এবং যাকে পাওয়ার জন্য ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য পালন করেন, আমি সংক্ষেপে সেই পদের কথা তোমাকে জানাচ্ছি—সেই পদ হল 'ওঁ'।

প্রশ্ন—এখানে সব দ্বার নিরুদ্ধ করার অর্থ কী ?

উত্তর—শ্রোত্রাদি পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্যাদি পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়—এই দশ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় গ্রহণ করা হয়, তাই এদের 'দ্বার' বলা হয়। তাছাড়া এদের থাকার জায়গা (স্থান)-কেও 'দ্বার' বলা হয়। এই ইন্দ্রিয়াদিকে বাহ্য বিষয় থেকে সরিয়ে অর্থাৎ দেখা-শোনা ইত্যাদি সমস্ত ক্রিয়া বন্ধ করে, সেই সঙ্গে ইন্দ্রিয়াদির প্রকাশের মাধ্যম-গুলিকেও রুদ্ধ করে ইন্দ্রিয়াদির বৃত্তিসমূহ অন্তর্মুখ করে নেওয়াই হল সর্বদ্বার সংযম করা। যোগশাস্ত্রে একেই বলা হয় 'প্রত্যাহার'।

প্রশ্ন—এখানে 'হৃদ্‌দেশ' কোন্ স্থানের নাম এবং মনকে 'হৃদ্‌দেশে' স্থির করার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—নাভি এবং কণ্ঠ—এই দুটির মধ্যবর্তী স্থান—যাকে হৃদয়কমলও বলা হয় এবং যাকে মন ও প্রাণের নিবাসস্থান বলেও মানা হয়, সেটি হল 'হৃদ্‌দেশ'। এদিক-সেদিক বিচরণকারী মনকে সংকল্প-বিকল্পরহিত করে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করাই হল তাকে হৃদ্‌দেশে স্থির করা।

প্রশ্ন—প্রাণকে মস্তকে স্থাপন করতে বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করে প্রাণকে ঊর্ধ্বগামী নাড়ীর দ্বারা হৃদয় থেকে ওপরে উঠিয়ে মস্তকে স্থাপন করতে বলা হয়েছে, এরূপ করলে প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে মনও সেখানে গিয়ে স্থিত হয়।

প্রশ্ন—যোগধারণাতে স্থিত থাকা কী ? এবং '**যোগধারণাম্**'-এর সঙ্গে '**আত্মনঃ**' পদ ব্যবহারের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—উপরোক্ত প্রকারে ইন্দ্রিয়াদি সংযম ও মন-প্রাণের মস্তকে যথাযথভাবে নিশ্চল হয়ে যাওয়াই হল যোগধারণায় স্থিত থাকা। '**আত্মনঃ**' পদের লক্ষ্য হল, এটি পরমাত্মার সঙ্গে সম্বন্ধিত যোগধারণার বিষয়, অন্য দেবতাদি-বিষয়ক চিন্তা বা প্রকৃতির চিন্তার সঙ্গে সম্পর্কিত ধারণার বিষয় নয়।

প্রশ্ন—এখানে ওঁ-কারকে '**একাক্ষর**' কী করে বলা হল ? এবং একে '**ব্রহ্ম**' বলার তাৎপর্য কী ?

উত্তর—দশম অধ্যায়ের পঁচিশতম শ্লোকেও ওঁ-কারকে 'এক অক্ষর' বলা হয়েছে (**গিরামস্ম্যেকম্ অক্ষরম্**)। এছাড়া এটি অদ্বিতীয় অবিনাশী পরব্রহ্ম পরমাত্মার নাম, নাম এবং নামীতে বাস্তবে অভেদ মানা হয় ; তাইজন্যও ওঁ-কারকে 'একাক্ষর' ও 'ব্রহ্ম' বলা সঠিক। কঠোপনিষদেও বলা আছে—

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥

(১।২।১৬)

'এই অক্ষরই ব্রহ্ম, অক্ষরই পরম ; এই অক্ষরকে জেনেই যে যা চায়, সে তা-ই লাভ করে।'

প্রশ্ন—বাক্যাদি ইন্দ্রিয় এবং মন নিরুদ্ধ হলে আর প্রাণ মস্তকে স্থাপিত হলে ওঁ-কার উচ্চারণ করা কীভাবে সম্ভব হবে ?

উত্তর—এখানে বাক্যের দ্বারা উচ্চারণ করার কথা বলা হয়নি। উচ্চারণ করার অর্থ মন দ্বারা উচ্চারণ করা।

প্রশ্ন—এখানে '**মাম্**' পদ কীসের বাচক আর তাঁকে স্মরণ করা কী ?

উত্তর—জ্ঞানযোগীর অন্তকালের প্রসঙ্গ হওয়ায় এখানে '**মাম্**' পদটি সচ্চিদানন্দঘন নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্মের বাচক। চতুর্থ শ্লোকে 'এই দেহে অধিযজ্ঞ আমিই' এই কথায় ভগবান যেভাবে অধিযজ্ঞের সঙ্গে নিজের ঐক্য দেখিয়েছেন, সেই প্রকারে এখানে 'ব্রহ্মে'র সঙ্গে নিজের ঐক্য দেখাবার জন্য '**মাম্**' পদের প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—মনে মনে ওঁ-কার উচ্চারণ এবং তার অর্থ-স্বরূপ ব্রহ্মচিন্তা—উভয় কাজ একসঙ্গে কীভাবে হতে পারে ?

উত্তর—মনের দ্বারা উভয় কাজ অবশ্যই একসঙ্গে করা সম্ভব। পরমাত্মার নাম 'ওঁ' মনে মনে উচ্চারণ করতঃ সেই সঙ্গে ব্রহ্মচিন্তা করায় কোনো বাধা নেই। মনে মনে নাম উচ্চারণ তো নামীর চিন্তায় বরং সহায়ক হয়। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন যে 'ধ্যানের সময়ে সবিতর্ক সমাধি পর্যন্ত শব্দ, অর্থ ও তদ্বিষয়ক জ্ঞানের বিকল্প মনে থাকে' (যোগদর্শন ১।৪১)। সুতরাং যাঁকে চিন্তা করা হয় তাঁর বাচক নাম মনের সংকল্পে থাকাই স্বাভাবিক। মহর্ষি পতঞ্জলি এ-ও বলেছেন যে—

'তস্য বাচক প্রণবঃ। তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।'

(যোগদর্শন ১।২৭।২৮)

'তাঁর নাম প্রণব (ওঁ)। সেই ওঁ জপ করার সময়

তার অর্থরূপে পরমাত্মার চিন্তা করা উচিত।'

প্রশ্ন—এখানে পরমগতি লাভের কী তাৎপর্য ?

উত্তর—নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্মকে অভেদ-ভাবে লাভ করা ; পরমগতি লাভ করা—একেই চিরকালের মতো ইহলোকের যাতায়াত থেকে মুক্তি পাওয়া, মুক্তিলাভ করা, মোক্ষলাভ করা অথবা 'নির্বাণ ব্রহ্ম' লাভ করা বলা হয়।

প্রশ্ন—অষ্টম থেকে দশম শ্লোক পর্যন্ত সগুণ-নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনার প্রকরণ এবং একাদশ থেকে ত্রয়োদশ পর্যন্ত নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার প্রকরণ ধরা হয়েছে। এই ভাবে এখানে ভিন্ন ভিন্ন দুটি প্রকরণ মানা হয়েছে কেন ? ছটি শ্লোকের যদি একই প্রকরণ মেনে নেওয়া হয়, তাতে ক্ষতি কী ?

উত্তর—অষ্টম থেকে দশম শ্লোক পর্যন্ত বর্ণনাতে উপাস্য পরমপুরুষকে সর্বজ্ঞ, সকলের নিয়ন্তা, সকলের ধারক, পোষক ও সূর্যের ন্যায় স্বয়ং প্রকাশরূপ বলা হয়েছে। এ সবই সর্বব্যাপী ভগবানের দিব্য গুণ। কিন্তু একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শ্লোক পর্যন্ত বর্ণনায় একটিও এমন বিশেষণ দেওয়া হয়নি, যাতে এখানে নির্গুণ-নিরাকারের প্রসঙ্গ মেনে নিলে বিন্দুমাত্র আপত্তি হতে পারে! তাছাড়া, ঐ প্রকরণে উপাসককে 'ভক্তিযুক্ত' বলা হয়েছে, যা ভেদ উপাসনার দ্যোতক এবং তার ফল দিব্য পরমপুরুষ (সগুণ পরমেশ্বর)-এর প্রাপ্তি বলা হয়েছে। এখানে অভেদ-উপাসনার বর্ণনা হওয়ায় উপাসকের জন্য কোনো বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়নি এবং এর ফলও পরম গতি (নির্গুণ ব্রহ্ম) লাভ বলা হয়েছে। এছাড়া, একাদশ শ্লোকে নতুন প্রকরণ আরম্ভ করার প্রতিজ্ঞাও করেছিলেন। তাই দুটি প্রকরণকে এক মেনে নিলে যোগবিষয়ক বর্ণনার পুনরুক্তির দোষও এসে যায়। এই সব কারণে প্রতীত হয় যে এই ছটি শ্লোকের প্রকরণ এক নয় ; দুটি ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণ।

সম্বন্ধ—এইভাবে নিরাকার-সগুণ পরমেশ্বরের এবং নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক যোগীদের মৃত্যুকালীন গতির প্রকার ও ফল বলা হয়েছে ; অন্তকালে এইরূপ সাধন এই সব পুরুষই করতে পারেন, যাঁরা প্রথম থেকেই যোগের অভ্যাস করে মনকে নিজের অধীন করে নিয়েছেন। সাধারণ মানুষের দ্বারা মৃত্যুকালে এরূপ সগুণ-নিরাকার ও নির্গুণ-নিরাকারের সাধনা করা অত্যন্ত কঠিন, অতএব সহজে পরমেশ্বর প্রাপ্তির উপায় জানার ইচ্ছা হওয়ায় ভগবান এবার তাঁর নিত্য নিরন্তর স্মরণ করাকে তাঁর প্রাপ্তির সহজ উপায় বলে জানাচ্ছেন—

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ ১৪

হে অর্জুন ! যে ব্যক্তি অনন্য চিত্তে আমাকে সদা-সর্বদা স্মরণ করেন, সেই নিত্য-নিরন্তর স্মরণশীল যোগীর কাছে আমি সহজলভ্য, অর্থাৎ তিনি সহজেই আমাকে লাভ করেন॥ ১৪

প্রশ্ন—এখানে 'অনন্যচেতাঃ' কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—যাঁর চিত্ত অন্য কোনো বস্তুর দিকে না গিয়ে নিরন্তর অনন্য প্রেমসহ শুধুমাত্র পরম প্রেমী পরমেশ্বরেই নিবিষ্ট থাকে, তাঁকে 'অনন্যচেতাঃ' বলা হয়।

প্রশ্ন—এখানে 'সততম্' ও 'নিত্যশঃ' এই পদদুটি প্রয়োগের তাৎপর্য কী ?

উত্তর—'সততম্' পদে বলা হয়েছে যে এক মুহূর্তের জন্যও বিরত না হয়ে নিরন্তর স্মরণ করতে থাকা এবং 'নিত্যশঃ' পদের দ্বারা সূচিত করা হয়েছে যে এরূপ নিরন্তর স্মরণ সর্বদা হতেই থাকবে, এতে যেন একদিনের জন্যও বিরতি না হয়। এইরূপ দুটি পদ প্রয়োগ করে ভগবান সারা জীবনব্যাপী নিত্য-নিরন্তর স্মরণ করতে বলেছেন—এই ভাব বুঝতে হবে।

প্রশ্ন—এখানে 'মাম্' পদ কীসের বাচক এবং তাঁকে স্মরণ করা কী ?

উত্তর—এটি নিত্য প্রেমপূর্বক স্মরণ করার প্রসঙ্গ এবং এতে 'তস্য', 'অহম্' ইত্যাদি ভেদ-উপাসনাসূচক পদের প্রয়োগ করা হয়েছে। সুতরাং এখানে 'মাম্' পদ সগুণ-সাকার পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাচক। কিন্তু

যাঁরা শ্রীবিষ্ণু এবং শ্রীরাম বা ভগবানের অন্যরূপ মানেন, তাঁদের জন্য সেই রূপও **'মাম্'**-এরই বাচক। পরম প্রেম এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে নিরন্তর ভগবানের স্বরূপ অথবা তাঁর নাম, গুণ, প্রভাব ও লীলা ইত্যাদি চিন্তা করতে থাকাই হল তাঁকে স্মরণ করা।

প্রশ্ন—এরূপ ভক্তের জন্য ভগবান সুলভ কেন ?

উত্তর—অনন্যভাবে ভগবদ্চিন্তনকারী প্রেমিক ভক্ত যখন ভগবানের বিয়োগ সহ্য করতে পারেন না, তখন **'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'** (৪।১১) অনুসারে ভগবানেরও তাঁর বিয়োগ অসহ্য হয় ; এবং ভগবান যখন স্বয়ং মিলিত হবার জন্য ইচ্ছা করেন, তখন অসাধ্য কিছু থাকে না। এই কারণে এরূপ ভক্তের জন্য ভগবানকে সুলভ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—নিত্য-নিরন্তর স্মরণকারী ভক্তের কাছে ভগবান সুলভ, এতো মেনে নেওয়া হল, কিন্তু ভগবানের নিত্য-নিরন্তর স্মরণ কী সহজে হতে পারে ?

উত্তর—যাঁর ভগবানে এবং ভগবদ্প্রাপ্ত মহাপুরুষে পরম শ্রদ্ধা ও প্রেম থাকে, যাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে নিত্য-নিরন্তর চিন্তা করলে ভগবানকে পাওয়া সহজ, তাঁর পক্ষে তো ভগবৎকৃপায় সর্বসময় ভগবানকে স্মরণ করা সহজ। অবশ্য, যার মধ্যে শ্রদ্ধা-প্রেমের অভাব থাকে, যে ভগবানের গুণ-প্রভাব জানে না এবং যার মহৎ সঙ্গ লাভের সৌভাগ্য হয়নি, তার পক্ষে সর্বদা ভগবৎচিন্তা হওয়া কঠিন।

সম্বন্ধ—ভগবানের সদা-সর্বদা চিন্তা দ্বারা সাধকের ভগবদ্প্রাপ্তির সুলভত্ব প্রতিপাদন করেছেন, এবার তাঁর পুনর্জন্ম না হওয়ার কথা বলে জানাচ্ছেন যে ভগবদ্প্রাপ্ত মহাপুরুষদের ভগবানের সঙ্গে কখনও বিচ্ছেদ হয় না—

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥ ১৫

পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত মহাত্মাগণ আমাকে লাভ করে পুনরায় দুঃখের আলয় (দুঃখালয়), ক্ষণভঙ্গুর সংসারে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন না॥ ১৫

প্রশ্ন —'পরমসিদ্ধি' কী এবং 'মহাত্মা' শব্দের প্রয়োগ কী জন্য করা হয়েছে ?

উত্তর—অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও প্রেমসহ নিত্য-নিরন্তর ভজন-ধ্যানের সাধন করতে করতে যখন সাধনার সেই পরাকাষ্ঠারূপ স্থিতি লাভ হয়, যা প্রাপ্ত হলে আর কোনো সাধনার বাকি থাকে না এবং তৎক্ষণাৎই তাঁর ভগবানের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার হয়—সেই পরাকাষ্ঠার স্থিতিকে বলা হয় 'পরমসিদ্ধি' ; এবং ভগবানের যে ভক্ত এই পরমসিদ্ধি লাভ করেন, সেই জ্ঞানী ভক্তকে 'মহাত্মা' বলা হয়।

প্রশ্ন—'পুনর্জন্ম' কী এবং একে 'দুঃখের ঘর' এবং 'অশাশ্বত' (ক্ষণভঙ্গুর) বলা হয়েছে কেন ?

উত্তর—জীব যতক্ষণ ভগবানকে লাভ না করে, ততক্ষণ কর্মবশতঃ তাকে এক জন্ম থেকে অন্য জন্ম গ্রহণ করতে হয়। তাই মৃত্যুর পর কর্মপরবশ হয়ে দেবতা, মানুষ, পশু, পক্ষী ইত্যাদি যে কোনো রূপে জন্ম নেওয়াকেই পুনর্জন্ম বলা হয়, আর সমস্ত জন্মই হল দুঃখপূর্ণ ও অনিত্য, জীবনের অনিত্যতার প্রমাণ হল মৃত্যু ; কিন্তু জীবনে যে সব বস্তুর সঙ্গে সংযোগ হয়, সেগুলির মধ্যে কোনো বস্তুই এমন নেই, যা সর্বদা একভাবে থাকে এবং যার সঙ্গে সর্বদা সংযোগ বজায় থাকে। যে বস্তুকে আজ সুখপ্রদ বলে মনে হচ্ছে, কাল তারই রূপান্তর হলে বা তার সম্বন্ধে নিজের ভাব পরিবর্তিত হলে, সেটিই দুঃখপ্রদ হয়ে ওঠে। মানুষ যাকে জীবনে সুখপ্রদ বলে মনে করে, সেই বস্তুর যখন বিনাশ হয় বা তাকে ছেড়ে যখন মৃত্যুবরণ করতে হয়, তখন সেটিও দুঃখদায়ক হয়ে ওঠে। তার সাথে সাথে প্রত্যেক বস্তু বা স্থিতির অভাব বোধ বা তার বিনাশের আশঙ্কা তো সর্বদা দুঃখপ্রদায়ক হয়েই থাকে। সুখরূপে প্রতীত হওয়া বস্তুসামগ্রী সংগ্রহ ও ভোগে আসক্তিবশতঃ যে পাপ করা হয়, তার পরিণামেও নানাপ্রকার কষ্ট ও নরক-যন্ত্রণা প্রাপ্তি হয়। এইভাবে পুনর্জন্ম গর্ভ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কেবল

দুঃখপূর্ণ বলে তাকে দুঃখের ঘর বলা হয়েছে এবং কোনো জন্মেই কিংবা ঐ জন্মেও প্রাপ্ত ভোগের সংযোগ সর্বদা না থাকায় তাকে অশাশ্বত বা ক্ষণভঙ্গুর বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—উপরোক্ত মহাত্মা পুরুষদের পুনর্জন্ম হয় না কেন ?

উত্তর—অনন্য প্রেমিক ভক্তগণ ভগবানকে লাভ করেন, তাই তাঁদের পুনর্জন্ম হয় না। নিয়ম হল যে একবার যাঁর সমস্ত সুখের অনন্ত সাগর, সবকিছুর পরমাধার, পরম আশ্রয়, পরমাত্মা, পরমপুরুষ ভগবানের প্রাপ্তি হয়ে যায়, তাঁর আর কখনো কোনো পরিস্থিতিতে ভগবানের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় না। তাই ভগবদ্প্রাপ্তির পর জগতে পুনরায় জন্ম নিতে হয় না, এরূপ বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ—ভগবদ্প্রাপ্ত মহাপুরুষদের জন্ম হয় না, এই কথায় প্রমাণিত হয় যে অন্য জীবেদের পুনর্জন্ম হয়। তাই জিজ্ঞাসা জাগে যে কোন্ লোক পর্যন্ত পৌঁছানো জীবকে ফিরে আসতে হয়। তাতে ভগবান বলছেন—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ১৬

হে অর্জুন ! পৃথিবী থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোকই পুনরাবর্তনশীল, কিন্তু হে কৌন্তেয় ! আমাকে লাভ করলে আর পুনর্জন্ম হয় না ; কারণ আমি কালাতীত এবং এই সমস্ত লোক কালের অধীন হওয়ায় অনিত্য ॥ ১৬

প্রশ্ন—এখানে **'ব্রহ্মলোক'** শব্দ কোন্ লোকের বাচক, **'আ'** অব্যয় প্রয়োগের অভিপ্রায় কী এবং **'লোকাঃ'** পদটি কোন্ কোন্ লোকের ইঙ্গিত বহন করে ?

উত্তর—যে চতুর্মুখ ব্রহ্মা সৃষ্টির আদিতে ভগবানের নাভিকমল থেকে উৎপন্ন হয়ে সমস্ত জগৎ রচনা করেন, যাঁকে প্রজাপতি, হিরণ্যগর্ভ এবং সূত্রাত্মাও বলা হয় এবং এই অধ্যায়ে যাঁকে বলা হয়েছে 'অধিদৈব' (৮।৪), তিনি যে ঊর্ধ্বলোকে নিবাস করেন, তাকে বলা হয় **'ব্রহ্মলোক'**। এই **'লোকাঃ'** পদটি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন লোকপালদের স্থানবিশেষ **'ভূঃ'**, **'ভুবঃ'**, **'স্বঃ'** প্রভৃতি সমস্ত লোকগুলিকে লক্ষ্য করায়। **'আ'** অব্যয় প্রয়োগের দ্বারা উপরোক্ত ব্রহ্মলোকের সঙ্গে তার নিম্নস্থ যত ভিন্ন ভিন্ন লোক আছে, সে সবগুলিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন—কোন্ লোকগুলিকে **'পুনরাবর্তী'** বলা হয় ?

উত্তর—বারংবার বিনাশ হওয়া এবং উৎপন্ন হওয়া যার স্বভাব এবং যাতে নিবাসকারী প্রাণীদের মুক্ত হওয়া নিশ্চিত নয়, সেই লোকগুলিকে বলা হয় **'পুনরাবর্তী'**।

সম্বন্ধ—ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সব লোককেই পুনরাবর্তী বলা হয়েছে, কিন্তু তারা পুনরাবর্তী কী করে হয়—এই প্রশ্নে ভগবান এবার ব্রহ্মার দিন-রাতের সীমা বর্ণনা করে সমস্ত লোকের অনিত্যতা প্রমাণ করছেন—

সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ॥ ১৭

ব্রহ্মার একদিন সহস্র চতুর্যুগব্যাপী এবং এক রাত্রিও সহস্র চতুর্যুগব্যাপী হয়। যে ব্যক্তি এ বিষয় তত্ত্বতঃ জানেন, সেই যোগী ব্যক্তিই কালের তত্ত্ব জানেন ॥ ১৭

প্রশ্ন—**'সহস্রযুগ'** কত সময়ের বাচক এবং ঐ সময়কে যে ব্রহ্মার দিবা-রাত্রের পরিমাণ বলা হয়েছে—তার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে 'যুগ' শব্দ 'দিব্যযুগের' বাচক—যা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—চার যুগের সময় একত্রিত করলে হয়। এটি দেবতাদের যুগ, তাই একে 'দিব্যযুগ'

বলা হয়। দেবতাদের সময়ের পরিমাণ আমাদের সময়ের পরিমাণের থেকে তিন শত ষাটগুণ বেশি মানা হয়। অর্থাৎ আমাদের এক বৎসর দেবতাদের চব্বিশ ঘণ্টার একদিন-রাত, আমাদের ত্রিশ বৎসর দেবতাদের এক মাস আর আমাদের তিন শত ষাট বৎসর তাঁদের এক দিব্য বৎসর হয়। এরূপ বারো হাজার দিব্য বর্ষে এক দিব্য যুগ হয়। একে 'মহাযুগ' ও 'চতুর্যুগী'ও বলা হয়। এই সংখ্যা যোগ করলে আমাদের ৪৩, ২০, ০০০ বৎসর হয়। দিব্য বর্ষের হিসাবে বারোশত দিব্য বর্ষ আমাদের কলিযুগ, চব্বিশ শততে দ্বাপর, ছত্রিশ শততে ত্রেতা এবং আটচল্লিশ শতবর্ষে সত্যযুগ হয়, সব মিলিয়ে ১২০০০ বৎসর হয়। এ হল একটি দিব্যযুগ। এরূপ হাজার দিব্য যুগে ব্রহ্মার একদিন হয় এবং ততটা যুগেই এক রাত্রি হয়। এটিকে অন্যভাবে স্পষ্ট করা হচ্ছে। আমাদের যুগের সময় পরিমাণ এইরূপ—

কলিযুগ— ৪, ৩২০০০ বৎসর
দ্বাপরযুগ— ৮, ৬৪০০০ বৎসর (কলিযুগের দ্বিগুণ)
ত্রেতাযুগ— ১২, ৯৬০০০ বৎসর (কলিযুগের তিনগুণ)
সত্যযুগ— ১৭, ২৮০০০ বৎসর (কলিযুগের চর্তুগুণ)

যোগফল— ৪৩, ২০০০০ বৎসর

এই একটি দিব্য যুগ। এরূপ হাজার দিব্য যুগে অর্থাৎ আমাদের ৪, ৩২, ০০, ০০, ০০০ (চার শত বত্রিশ কোটি) বর্ষে ব্রহ্মার একদিন হয় এবং এতটা বড়োই তাঁর রাত্রি হয়।

মনুস্মৃতির প্রথম অধ্যায়ে চৌষট্টি থেকে তিয়াত্তরতম শ্লোক পর্যন্ত এই বিষয়ের বিশদ বর্ণনা আছে। ব্রহ্মার দিনকে 'কল্প' বা 'সর্গ' এবং রাত্রিকে 'প্রলয়' বলা হয়। এরূপ ত্রিশ দিন-রাতে ব্রহ্মার এক মাস, বারো মাসে এক বৎসর ও শতবর্ষে ব্রহ্মার পূর্ণায়ু হয়। ব্রহ্মার দিন-রাত্রির পরিমাণ জানিয়ে ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে এইরূপ ব্রহ্মার জীবন ও তাঁর লোকও সীমিত অর্থাৎ কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ, তাই তিনিও অনিত্য এবং যখন তিনিও অনিত্য তখন তাঁর অধীনস্থ লোক এবং তাতে অবস্থানকারী প্রাণীদের শরীরও যে অনিত্য হবে, এতে আর বলার কী আছে?

প্রশ্ন— যাঁরা ব্রহ্মার দিনরাতের পরিমাণ জানেন, তাঁরা কালের তত্ত্ব জানেন—এই কথার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—ব্রহ্মার দিন-রাতের সীমা জানলে মানুষের ব্রহ্মালোক ও তাঁর অন্তর্বর্তী সমস্ত লোকের অনিত্যতা সম্বন্ধে জ্ঞান হয়ে যায়। তখন তিনি যথাযথভাবে বুঝতে পারেন যে, যখন লোকই অনিত্য, তখন সেখানকার ভোগ তো অনিত্য ও বিনাশশীল হবেই। আর যে বস্তু অনিত্য ও বিনাশশীল, তা কখনো স্থায়ী সুখ দিতে পারে না। অতএব ইহলোক ও পরলোকের ভোগে আসক্ত হয়ে তাকে লাভ করার চেষ্টা করা এবং মনুষ্য জীবনকে প্রমাদে নিযুক্ত করে তাকে বৃথা নষ্ট করা অত্যন্ত মূর্খতা। মনুষ্য জীবনের অবধি অতি অল্প (৯।৩৩)। সুতরাং প্রেমপূর্বক নিরন্তর ভগবানের চিন্তা করে অতি শীঘ্র তাঁকে লাভ করাই হল বুদ্ধিমানের কাজ এবং তাতেই মনুষ্য জীবনের সাফল্য। যিনি এইভাবে বোঝেন, তিনিই দিন-রাত্রিরূপ কালের তত্ত্ব জেনে তাঁর জীবনের অমূল্য সময়কে সদুপযোগ করে লাভবান হন।

সম্বন্ধ—ব্রহ্মার দিন-রাত্রির পরিমাণ জানিয়ে এবার সেই দিন-রাতের আরম্ভে বারংবার প্রাণী সমুদয়ের উৎপত্তি ও প্রলয়ের বর্ণনা করে তাদের অনিত্যতার কথা বলছেন।

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে।। ১৮

সমস্ত চরাচর প্রাণিসমুদয় ব্রহ্মার দিবাগমে অব্যক্ত থেকে অর্থাৎ ব্রহ্মার সূক্ষ্মশরীর থেকে উৎপন্ন হয় এবং ব্রহ্মার রাত্রি সমাগমে তাঁর অব্যক্ত শরীরেই লয়প্রাপ্ত হয় ॥ ১৮

প্রশ্ন—এখানে '**সর্বাঃ**' বিশেষণের সঙ্গে '**ব্যক্তয়ঃ**' পদ কীসের বাচক?

উত্তর—যে বস্তু ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা জানা সম্ভব, তার নাম 'ব্যক্তি'। ভূত-প্রাণীদের জানা সম্ভব; সুতরাং দেবতা, মানুষ, পিতৃপুরুষ, পশু-পক্ষী ইত্যাদি যত ব্যক্তরূপে স্থিত দেহধারী প্রাণী রয়েছে—সে সবেরই বাচক

হল এখানে 'সর্বাঃ' বিশেষণের সঙ্গে 'ব্যক্তয়ঃ' পদটি।

প্রশ্ন—'অব্যক্ত' শব্দটি কীসের লক্ষ্য এবং ব্রহ্মার দিনের আগমনে সেই অব্যক্ত থেকে ব্যক্তিদের উৎপন্ন হওয়া কীরূপ ?

উত্তর—প্রকৃতির যে সূক্ষ্ম পরিমাণ, যাকে ব্রহ্মার সূক্ষ্ম শরীরও বলা হয় তথা স্থূল পঞ্চমহাভূতাদির উৎপন্ন হওয়ায় পূর্বের যে স্থিতি, সেই সূক্ষ্ম অপরা প্রকৃতিকে এখানে 'অব্যক্ত' বলা হয়েছে।

ব্রহ্মার দিনের আগমনে অর্থাৎ ব্রহ্মা যখন তাঁর নিদ্রাবস্থা ত্যাগ করে জাগ্রত অবস্থা স্বীকার করেন, তখন সেই সূক্ষ্ম প্রকৃতিতে বিকার উৎপন্ন হয় এবং তা স্থূলরূপে পরিণত হয়, সেই স্থূলরূপে পরিণত প্রকৃতির সঙ্গে সকল প্রাণীর নিজ নিজ কর্মানুসারে বিভিন্নরূপে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই হল অব্যক্ত থেকে ব্যক্তিদের উৎপন্ন হওয়া।

প্রশ্ন—রাত্রির আগম (আগমন) কী ? সেই সময় অব্যক্ত থেকে উৎপন্ন সব ব্যক্তি পুনরায় তাতেই লীন হয়ে যায়, এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এক হাজার দিব্য যুগ পার হলে যে সময় ব্রহ্মা জাগ্রত-অবস্থা ত্যাগ করে সুষুপ্তি-অবস্থা স্বীকার করেন, সেই প্রথম ক্ষণটির নাম ব্রহ্মার রাত্রির আগম।

সেই সময় স্থূলরূপে পরিণত প্রকৃতি সূক্ষ্ম অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং সমস্ত দেহধারী প্রাণী ভিন্ন ভিন্ন স্থূলদেহ রহিত হয়ে প্রকৃতির সূক্ষ্ম অবস্থায় স্থিত হয়ে যায়। এই হল অব্যক্ততে সমস্ত ব্যক্তির লয় হওয়া। আত্মা অজ ও অবিনাশী, তাই প্রকৃতপক্ষে তার উৎপত্তি ও লয় হয় না। অতএব এখানে বুঝতে হবে যে প্রকৃতিতে স্থিত প্রাণী-সমুদায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রকৃতির সূক্ষ্ম অংশের স্থূলরূপে পরিণত হওয়াই তার উৎপত্তি এবং সেই স্থূলের পুনরায় সূক্ষ্মরূপে লয় হয়ে যাওয়াই সেই প্রাণীদের লয় হওয়া।

প্রশ্ন—এখানে যে 'অব্যক্ত'-কে 'সূক্ষ্ম প্রকৃতি' বলা হয়েছে, তাকে এবং নবম অধ্যায়ের সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকে যে প্রকৃতির বর্ণনা আছে, উভয়ের মধ্যে পরস্পরে কী পার্থক্য ?

উত্তর—স্বরূপতঃ কোনো পার্থক্য নেই, একই প্রকৃতির অবস্থাভেদে দুই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে এই শ্লোকে 'অব্যক্ত' নামে সেই অপরা প্রকৃতির বর্ণনা আছে, যাকে সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে আট ভাগে বিভক্ত বলা হয়েছে এবং নবম অধ্যায়ের সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকে সেই মূল প্রকৃতির বর্ণনা আছে যা তাঁর অনির্বচনীয়রূপে স্থিত এবং যা আট ভাগে বিভক্ত হয়নি। এই মূল প্রকৃতিই যখন কারণ অবস্থা থেকে সূক্ষ্ম অবস্থায় পরিণত হয়, তখন তাকে আটভাগে বিভক্ত অপরা প্রকৃতির নামে বলা হয়।

সম্বন্ধ—যদিও ব্রহ্মার রাত্রির আরম্ভে সমস্ত প্রাণী অব্যক্তে লীন হয়ে যায়, তবুও যতক্ষণ তারা পরমপুরুষ পরমাত্মাকে লাভ না করে, ততক্ষণ তারা পুনঃ পুনঃ জন্মচক্র থেকে রেহাই পায় না, তাদের আসা-যাওয়ার চক্রেই ঘুরতে হয়। এটি স্পষ্ট করার জন্য ভগবান বলেছেন—

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥ ১৯

হে পার্থ ! প্রকৃতির বশবর্তী সেই প্রাণীসমুদায় পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়ে ব্রহ্মার রাত্রিসমাগমে লীন হয় এবং দিবাগমে পুনরায় উৎপন্ন হয় ॥ ১৯

প্রশ্ন—'ভূতগ্রামঃ' পদটি এখানে কীসের বাচক এবং তার সঙ্গে 'সঃ', 'এব' ও 'অয়ম্' পদগুলি ব্যবহারের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'ভূতগ্রামঃ' পদ এখানে সমগ্র চরাচরের প্রাণীদের বাচক ; তার সঙ্গে 'সঃ', 'এব' ও 'অয়ম্' পদ প্রয়োগ করে এই ভাব দেখানো হয়েছে যে, যেসব প্রাণী ব্রহ্মার রাত্রি আগমনে অব্যক্তে লীন হয়ে যায়—পূর্বশ্লোকে যাদের 'সর্বাঃ ব্যক্তয়ঃ' নামে উল্লেখ করা হয়েছে, তারাই ব্রহ্মার দিবারম্ভে পুনরায় উৎপন্ন হয়। অব্যক্তে লীন হয়ে যাওয়ায় এরা মুক্ত হয় না বা এদের ভিন্ন অস্তিত্বও মেটে

না। তাই ব্রহ্মার রাত্রিকালের সমাপন হতেই এরা সব পুনরায় নিজ নিজ গুণ ও কর্মানুসারে যথাযোগ্য স্থূলদেহ লাভ করে প্রকটিত হয়। ভগবান বলেছেন যে কল্প-কল্পান্তর ধরে যারা এইরূপ বারংবার অব্যক্তে লীন ও পুনরায় তার থেকে প্রকট হতে থাকে, তোমার প্রত্যক্ষ গোচরে আসা এই স্থাবর-জঙ্গম প্রাণীসমুদায় তারাই ; কেউ নতুন করে উৎপন্ন হয়নি।

প্রশ্ন—'**ভূত্বা**' পদটি দুবার প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান এই ভাব প্রকট করেছেন যে, এইভাবে এই প্রাণীসমুদায় অনাদিকাল থেকে উৎপন্ন হয়ে হয়ে লীন হয়ে যাচ্ছে। ব্রহ্মার আয়ুর শতবৎসর পূর্ণ হলে ব্রহ্মার শরীরও যখন মূল প্রকৃতিতে লীন হয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে সব প্রাণীসমূহও তাঁতে লীন হয়ে যায় (৯।৭) তখনও এই চক্রের অন্ত হয় না। এগুলি তার পরেও ঐভাবে পুনরায় উৎপন্ন হতে থাকে (৯।৮)। প্রাণীরা যতক্ষণ ঈশ্বর লাভ না করে, ততক্ষণ তারা বারংবার এইভাবে উৎপন্ন হতে হতে প্রকৃতিতে লীন হতে থাকবে।

প্রশ্ন—'**অবশঃ**' পদটির অর্থ কী ?

উত্তর—'**অবশঃ**' পদটি '**ভূতগ্রামঃ**'র বিশেষণ। যে অন্য কারো অধীন, স্বাধীন নয়, তাকে অবশ বা পরবশ বা পরাধীন বলা হয়। এই অব্যক্ত থেকে উৎপন্ন এবং পুনরায় অব্যক্তেই লীন হওয়া সমস্ত প্রাণী নিজ নিজ স্বভাবের বশ অর্থাৎ অনাদিসিদ্ধ বিভিন্ন গুণ ও কর্ম অনুসারে যে এদের সকলের বিভিন্ন প্রকৃতি হয়, সেই প্রকৃতি ও স্বভাবের বশ হওয়ার জন্যই এদের বার বার জন্ম ও মৃত্যু হয়। তাই ত্রয়োদশ অধ্যায়ের একুশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে 'প্রকৃতিতে স্থিত পুরুষই প্রকৃতিজনিত গুণাদি অর্থাৎ সুখ-দুঃখ ভোগ করে এবং প্রকৃতির সঙ্গই তার ভালো-মন্দ জন্মগ্রহণের কারণ হয়।' এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যে জীব প্রকৃতিকে অতিক্রম করে সেই পারে পৌঁছে পরমাত্মাকে লাভ করে, তার পুনর্জন্ম হয় না।

প্রশ্ন—স্বভাবের অধীন সমস্ত ভূত-প্রাণী—যারা বারবার উৎপন্ন হয়, তাদের নিজ নিজ গুণ ও কর্ম অনুসারে ঠিক-ঠিক ব্যবস্থামতো কে উৎপন্ন করে ? প্রকৃতি, পরমেশ্বর, ব্রহ্মা না কী অন্য কেউ ?

উত্তর—এখানে ব্রহ্মার দিন-রাতের প্রসঙ্গ হওয়ায় এই কথাই বুঝাতে হবে যে ব্রহ্মাই সমস্ত প্রাণীদের তাদের গুণ-কর্মানুসারে শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত করে বার বার উৎপন্ন করেন। মহাপ্রলয়ের পর ব্রহ্মার যখন উৎপত্তি হয় না, সেই সময় স্বয়ং ভগবান সৃষ্টির রচনা করেন ; কিন্তু ব্রহ্মা উৎপন্ন হওয়ার পর ব্রহ্মাই সকলকে রচনা করেন।

নবম অধ্যায়ে (শ্লোক ৭-১০) এবং চতুর্দশ অধ্যায়ে (শ্লোক ৩, ৪) সৃষ্টি রচনার যে প্রসঙ্গ, তা মহাপ্রলয়ের পরে মহাসর্গের আদিকালের এবং এখানকার বর্ণনা ব্রহ্মার রাত্রির (প্রলয়ের) পর ব্রহ্মার দিনের (সর্গের) আরম্ভের সময়ের।

সম্বন্ধ—ব্রহ্মার রাত্রির আরম্ভে যে অব্যক্তে সমস্ত প্রাণী লীন হয়ে যায় এবং দিনের আরম্ভ হতেই যার থেকে উৎপন্ন হয়, সেই অব্যক্ত সর্বশ্রেষ্ঠ ? না কি তার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ আছেন ? সেই প্রশ্নে বলছেন—

পরস্তস্মাৎ তু ভাবোহন্যোহব্যক্তোহব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥ ২০

সেই অব্যক্তের সর্বতোভাবে অতীত এবং পৃথক অলৌকিক যে সনাতন অব্যক্ত ভাব আছে, সেই পরম দিব্যপুরুষ সমস্ত ভূত-প্রাণী বিনষ্ট হলেও বিনষ্ট হন না॥ ২০

প্রশ্ন—এখানে '**তস্মাৎ**' বিশেষণের সঙ্গে '**অব্যক্তাৎ**' পদ কোন্ 'অব্যক্ত' পদার্থের বাচক ? তার থেকে পৃথক '**অব্যক্তভাব**' কী ? এবং তাকে '**পরঃ**', '**অন্যঃ**' এবং '**সনাতনঃ**' বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—অষ্টাদশ শ্লোকে যে 'অব্যক্তে' সমস্ত ব্যক্তির (প্রাণীদের) লয় হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেই বস্তুর

বাচক এখানে 'তস্মাৎ' বিশেষণের সঙ্গে 'অব্যক্তাৎ' পদটি। তার থেকে পৃথক অন্য 'অব্যক্তভাব' (তত্ত্ব) হল সেটি যাকে এই অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে 'অধিযজ্ঞ' নামে, নবম শ্লোকে 'কবি', 'পুরাণ' ইত্যাদি নামে, অষ্টম ও দশম শ্লোকে 'পরম দিব্যপুরুষ' নামে, বাইশতম শ্লোকে 'পরমপুরুষ' নামে এবং নবম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে 'অব্যক্ত মূর্তি' নামে বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্বোক্ত 'অব্যক্ত' থেকে এই 'অব্যক্ত'-কে 'অতীত' ও 'অন্য' বলে তার থেকে এর শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য জানানো হয়েছে। অর্থাৎ দুটি বস্তুর স্বরূপ 'অব্যক্ত' হলেও দুটি এক জাতীয় বস্তু নয়। সেই প্রথম 'অব্যক্ত' জড়, বিনাশশীল এবং জ্ঞেয়, কিন্তু দ্বিতীয়টি চেতন, অবিনাশী এবং জ্ঞাতা। সেই সঙ্গে ইনি তার প্রভু, সঞ্চালক এবং অধিষ্ঠাতা, তাই ইনি তার থেকে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট। অনাদি ও অনন্ত হওয়ায় এঁকে বলা হয় 'সনাতন'।

প্রশ্ন—'এই সনাতন অব্যক্ত সব প্রাণীর বিনাশ হলেও বিনষ্ট হয় না'—এই বাক্যে সব প্রাণীর দ্বারা কাকে লক্ষ্য করা হয়েছে? তাদের বিনাশ হওয়া এবং সেই সময় সেই সনাতন অব্যক্তের বিনাশ না হওয়ার প্রকৃত অর্থ কী?

উত্তর—ব্রহ্মা থেকে শুরু করে ব্রহ্মার দিন-রাত্রিতে উৎপন্ন এবং বিলীন হওয়া নিজ নিজ মন, ইন্দ্রিয়, শরীর, ভোগ্যবস্তু ও বাসস্থানসহ যত রকমের চরাচর প্রাণী আছে, 'সর্ব ভূতে' (প্রাণী)র দ্বারা এখানে সে সবকেই লক্ষ্য করানো হয়েছে। মহাপ্রলয়ের সময় স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর থেকে রহিত হয়ে যারা এই অব্যাকৃত মায়া নামক মূল প্রকৃতিতে লীন হয়ে যায়, সেটিই হল তাদের বিনাশ। সেই সময়ও সেই প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা সনাতন অব্যক্ত পরম দিব্যপুরুষ পরমেশ্বর প্রকৃতি-সহ সেই সমস্ত জীবকে নিজের মধ্যে লীন করে নিজ মহিমাতে স্থিত থাকেন, এই হল সমস্ত ভূত (প্রাণী) বিনাশপ্রাপ্ত হলেও তাঁর বিনাশ না হওয়া।

সম্বন্ধ—অষ্টম ও দশম শ্লোকে অধিযজ্ঞের উপাসনার ফল পরম দিব্যপুরুষ প্রাপ্তি, ত্রয়োদশ শ্লোকে পরম অক্ষর নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনার ফল পরমগতি প্রাপ্তি ও চতুর্দশ শ্লোকে সগুণ-সাকার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার ফল ঈশ্বর লাভ বলে জানিয়েছেন। এর দ্বারা তিনটির মধ্যে যেন কোনোপ্রকার ভিন্নতার ভ্রম না হয়ে যায়, সেই উদ্দেশ্যে এবার সকলের ঐক্য প্রতিপাদন করে তাঁকে প্রাপ্তির পর পুনর্জন্ম না হওয়ার কথা জানিয়েছেন—

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ ২১

যা 'অব্যক্ত অক্ষর' নামে কথিত, সেই অক্ষর নামক অব্যক্ত ভাবকেই পরমগতি বলা হয় এবং যে সনাতন অব্যক্ত ভাব প্রাপ্ত হলে মানুষকে আর ফিরে আসতে হয় না, সেটিই হল আমার পরম ধাম ॥ ২১

প্রশ্ন—এখানে 'অব্যক্তঃ' এবং 'অক্ষরঃ' পদ কীসের বাচক?

উত্তর—পূর্বশ্লোকে যাকে 'সনাতন অব্যক্তভাব' নামে এবং অষ্টম ও দশম শ্লোকে 'পরম দিব্যপুরুষ' নামে বলা হয়েছে, সেই অধিযজ্ঞ পুরুষের বাচক হল এখানে 'অব্যক্তঃ' এবং 'অক্ষরঃ' পদ।

প্রশ্ন—'পরম গতি' শব্দ কীসের বাচক?

উত্তর—এখানে 'পরম' বিশেষণ প্রয়োগের এই তাৎপর্য যে, যে মুক্তি সর্বোত্তম প্রাপ্য বস্তু, যা লাভ করলে আর কিছু পাওয়ার বাকি থাকে না এবং যা লাভ হলে সমস্ত দুঃখের চিরতরে বিনাশ হয়, তার নাম 'পরম গতি'। তাই যে নির্গুণ-নিরাকার পরমাত্মাকে 'পরম অক্ষর' ও 'ব্রহ্ম' বলা হয়, সেই সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মেরই বাচক হল 'পরম গতি' পদ (৮।১৩)।

প্রশ্ন—এখানে 'পরম ধাম' শব্দ কীসের বাচক এবং তার সঙ্গে অব্যক্ত অক্ষর ও পরমগতির ঐক্য করার এবং যাকে লাভ করলে আর ফিরে আসতে হয় না—এই কথার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—ভগবানের যে নিত্যধাম, সেটিও সচ্চিদানন্দময়, দিব্য, চেতন ও ভগবানেরই স্বরূপ হওয়ায়

বাস্তবে ভগবানের সঙ্গে অভিন্নই ; সুতরাং এখানে 'পরম ধাম' শব্দ ভগবানের নিত্য ধাম, তাঁর স্বরূপ এবং ভগবদ্ভাব—এই সবেরই বাচক। অভিপ্রায় হল যে ভগবানের নিত্য ধামের, ভগবদ্ভাবের ও ভগবানের স্বরূপ লাভে বাস্তবিক কোনো পার্থক্য নেই। এই রূপ অব্যক্ত অক্ষর প্রাপ্তিতে ও পরমগতির প্রাপ্তিতেও বস্তুতঃ কোনো পার্থক্য নেই। এই কথা বোঝাবার জন্যই বলা হয়েছে যে, যা লাভ হলে মানুষ আর ফিরে আসে না, সেটিই আমার পরম ধাম ; তাকে অব্যক্ত, অক্ষর এবং পরম গতিও বলা হয়। সাধনার ভেদে সাধকদের দৃষ্টিতে ফলের পার্থক্য থাকে। সেইজন্য একে ভিন্ন ভিন্ন নামে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বস্তুগত কোনো পার্থক্য না হওয়ায় এখানে তাদের সকলের ঐক্য সম্পাদন করা হয়েছে।

সম্বন্ধ—এইভাবে সনাতন অব্যক্ত পুরুষের পরমগতি ও পরমধামের সঙ্গে ঐক্য দেখিয়ে, এবার সেই সনাতন অব্যক্ত পরমপুরুষকে লাভের উপায় জানাচ্ছেন—

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্॥ ২২

হে পার্থ ! সর্বভূত যে পরমাত্মার অন্তর্গত এবং যে সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার দ্বারা এই জগৎ পরিপূর্ণ, সেই সনাতন অব্যক্ত পরম পুরুষকে অনন্যা ভক্তির দ্বারাই লাভ করা যায়॥ ২২

প্রশ্ন—'সর্বভূত যে পরমাত্মার অন্তর্গত' এবং 'যে পরমাত্মার দ্বারা এই জগৎ পরিপূর্ণ' —এই দুটি বাক্যের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—প্রথম বাক্যটির তাৎপর্য হল যে, যেমন বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী—এই চারটি আকাশের অন্তর্গত, আকাশই তাদের একমাত্র কারণ ও আধার, তেমনই সমস্ত চরাচর প্রাণী অর্থাৎ সমগ্র জগৎ পরমেশ্বরেরই অন্তর্গত, পরমেশ্বর হতেই উৎপন্ন এবং পরমেশ্বরের আধারেই স্থিত। অন্য ভাবে একথা বুঝতে হবে যে, যেমন বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী—এই সবে আকাশ পরিপূর্ণ, তেমনই এই সমগ্র জগৎ অব্যক্ত পরমেশ্বরে পরিপূর্ণ। এই কথাই নবম অধ্যায়ের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

প্রশ্ন—'পরঃ পুরুষঃ' কীসের বাচক ?

উত্তর—এখানে 'পরঃ পুরুষঃ' সর্বব্যাপী 'অধিযজ্ঞ'-এর বাচক। এই অধ্যায়ের অষ্টম, নবম ও দশম শ্লোকে যে সগুণ-নিরাকারের উপাসনার প্রকরণ আছে ও বিংশতম শ্লোকে যে অব্যক্ত পুরুষের কথা বলা হয়েছে, এই প্রকরণও হল তাঁর উপাসনার। সেই পরমেশ্বরে সমস্ত প্রাণীর স্থিতি এবং তিনিই সবেতে ব্যাপ্ত বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—অষ্টম থেকে দশম শ্লোক পর্যন্ত এই অব্যক্ত পুরুষের উপাসনার প্রকরণ রয়েছে, তাহলে সেটি এখানে দ্বিতীয়বার বলার তাৎপর্য কী ?

উত্তর—যদিও উভয় স্থানেই অব্যক্ত পুরুষেরই উপাসনার বর্ণনা আছে—তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু পার্থক্য হল এই যে পূর্বের অষ্টম, নবম ও দশম শ্লোকে তো যোগীপুরুষ দ্বারা লভ্য শুধু অন্তকালীন সাধনের ফলসহ বর্ণনা আছে আর এখানে সর্বসাধারণের জন্য সদা-সর্বদা করতে পারা অনন্য ভক্তির এবং তার দ্বারা সেই পরমাত্মা লাভের বর্ণনা আছে। এই অভিপ্রায়ে ঐ উপাসনার প্রকরণ এখানে পুনরায় বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—'অনন্যভক্তি' কাকে বলা হয় এবং তার দ্বারা পরম পুরুষকে লাভ করা কাকে বলে ?

উত্তর—সর্বাধার, সর্বান্তর্যামী, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরেই সবকিছু সমর্পণ করে তাঁর বিধানে সদা পরম সন্তুষ্ট থাকা ও সর্বপ্রকারে অনন্য প্রেমপূর্বক নিত্য-নিরন্তর তাঁকে স্মরণ করাই হল অনন্যভক্তি। এই অনন্যভক্তির দ্বারা সাধক তাঁর উপাস্যদেব পরমেশ্বরের গুণ, স্বভাব এবং তত্ত্বকে ভালোভাবে জেনে তাতে তন্ময় হয়ে যান এবং শীঘ্রই তাঁর সাক্ষাৎলাভ করে কৃতকৃত্য হয়ে যান। এই হল সাধকের সেই পরমেশ্বরকে লাভ করা।

সম্বন্ধ—অর্জুনের সপ্তম প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ভগবান অন্তকালে কীভাবে মানুষ পরমাত্মাকে লাভ করে, একথা ভালোভাবে বুঝিয়েছেন। প্রসঙ্গবশতঃ একথাও বলেছেন যে ভগবৎপ্রাপ্তি না হলে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত পৌঁছেও জীব আসা-যাওয়ার চক্র থেকে মুক্তি পায় না। কিন্তু ওখানে একথা বলা হয়নি যে, যিনি ফিরে না আসার লোক লাভ করেন, তিনি কীভাবে সেখানে যান এবং যিনি ফিরে আসার লোক লাভ করেন, তিনি কীভাবে সেখানে গমন করেন। সুতরাং সেই দুটি পথের বর্ণনা করার জন্য ভগবান এবার প্রস্তাবনা করছেন—

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ॥ ২৩

হে অর্জুন ! যে কালে শরীর ত্যাগ করলে যোগিগণ মোক্ষ প্রাপ্ত হন এবং যে কালে শরীর ত্যাগ করলে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন, সেই দুই কাল অর্থাৎ পথের কথা তোমাকে বলব॥ ২৩

প্রশ্ন—এখানে 'কাল' শব্দ কীসের বাচক ?

উত্তর—এখানে 'কাল' শব্দ সেই পথের বাচক, যাতে কালাভিমানী ভিন্ন ভিন্ন দেবতাদের নিজ নিজ সীমা পর্যন্ত অধিকার থাকে।

প্রশ্ন—এখানে 'কাল' শব্দের অর্থ সময় মনে করলে ক্ষতি কী ?

উত্তর—ছাব্বিশতম শ্লোকে একে 'শুক্ল' ও 'কৃষ্ণ' দুপ্রকার 'গতি'র নামে এবং সাতাশতম শ্লোকে 'সৃতি' নামে বলা হয়েছে। এই দুটি শব্দই মার্গের বাচক। এছাড়া **'অগ্নিঃ'**, **'জ্যোতিঃ'** ও **'ধূমঃ'** পদও সময়বাচক নয়। অতএব চব্বিশ ও পঁচিশতম শ্লোকে উদ্ধৃত 'তত্র' পদের অর্থ 'সময়' মনে করা ঠিক নয়। তাই এখানে 'কাল' শব্দের অর্থ কালাভিমানী দেবতাদের সঙ্গে সম্বন্ধিত 'মার্গ' মানাই ঠিক।

প্রশ্ন—যদি একথা ঠিক হয় তাহলে জগতে লোকে দিন, শুক্লপক্ষ এবং উত্তরায়ণের সময় মৃত্যুকে ভালো মনে করে কেন ?

উত্তর—লোকেদের মনে করাও একপ্রকার ঠিক, কারণ সেই সময় সেই সেই কালাভিমানী দেবতাদের সঙ্গে তার তখনই সম্বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং সেই সময় মৃত্যুপ্রাপ্ত যোগী তাঁর গন্তব্যস্থানে শীঘ্র ও সহজেই পৌঁছে যান। কিন্তু এর দ্বারা একথা ধরে নেওয়া উচিত নয় যে রাত্রে মৃত্যুপ্রাপ্ত ও কৃষ্ণপক্ষে এবং দক্ষিণায়নের ছমাসে মৃত্যুপথযাত্রী অর্চিমার্গে গমন করেন না। বরং বুঝতে হবে যে, যে সময়েই মৃত্যু হোক, তিনি যে পথে যাওয়ার অধিকারী, সেই পথেই যাবেন। তবে একথা ঠিক যে, যদি অর্চিমার্গের অধিকারী রাত্রে মারা যান, তাহলে তাঁর দিনের অভিমানী দেবতার সঙ্গে সম্পর্ক দিনের উদয় হলেই হবে, এর মধ্যবর্তী সময়ে তিনি **'অগ্নিঃ'**-র অভিমানী দেবতার অধিকারে থাকবেন। যদি কৃষ্ণপক্ষে মৃত্যুবরণ করেন, তবে তাঁর শুক্লপক্ষাভিমানী দেবতার সঙ্গে সম্বন্ধ শুক্লপক্ষ এলেই হবে, এর মধ্যবর্তী সময়ে তিনি দিনের অভিমানী দেবতার অধিকারে থাকবেন। তেমনই যদি দক্ষিণায়নে মৃত্যুবরণ করেন, তাহলে তার উত্তরায়ণাভিমানী দেবতার সঙ্গে সম্পর্ক উত্তরায়ণের সময় এলেই হবে, এর মধ্যের সময়ে তিনি শুক্লপক্ষাভিমানী দেবতার অধিকারে থাকবেন। এই রূপ দক্ষিণায়ণ মার্গের অধিকারীর বিষয়ও বুঝে নিতে হবে।

প্রশ্ন—এখানে **'যোগিনঃ'** পদটি প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—**'যোগিনঃ'** পদ প্রয়োগের দ্বারা এই কথা বুঝতে হবে যে, সাধারণ মানুষ—যারা ইহলোকে এক জন্ম থেকে অন্য জন্ম গ্রহণ করে বা নরকাদিতে যায়, এখানে তাদের গতির বর্ণনা করা হয়নি। এখানে যে 'শুক্ল' ও 'কৃষ্ণ' দুটি মার্গের বর্ণনার প্রকরণ রয়েছে, সেটিতে যজ্ঞ, দান, তপ ইত্যাদি শুভকর্ম ও উপাসনাকারী শ্রেষ্ঠ পুরুষদের গতির বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন—**'প্রয়াতাঃ'** পদটির অভিপ্রায় কী ? ভগবান এখানে **'বক্ষ্যামি'** পদ দ্বারা কী বলার প্রতিজ্ঞা করেছেন ?

উত্তর—**'প্রয়াতাঃ'** পদটি গমনকারীদের বাচক। যাঁরা অন্তকালে দেহত্যাগ করে উচ্চলোকে যান, তাঁদের বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে এর প্রয়োগ করা হয়েছে। যে পথে গমন করলে মানুষ আর ফিরে আসে না এবং যে পথে

গেলে ফিরে আসে, সেই দুটি পথের পার্থক্য কী, সেই দুটি পথ কী কী এবং সেই পথ দুটির ওপর কাদের অধিকার—'বক্ষ্যামি' পদের দ্বারা ভগবান এই সব বিষয় জানাবার জন্য অঙ্গীকার করেছেন।

সম্বন্ধ—পূর্বশ্লোকে যে দুটি পথের বর্ণনা করার প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে, তার মধ্যে যে পথে গেলে সাধক ফিরে আসেন না, প্রথমে তার বর্ণনা করা হচ্ছে—

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ।। ২৪

যে মার্গে জ্যোতির্ময় অগ্নির অধিপতি দেবতা, দিনের অধিপতি দেবতা, শুক্লপক্ষের অধিপতি দেবতা এবং উত্তরায়ণের ছয়মাসের অধিপতি দেবতা থাকেন, সেই মার্গে মৃত্যু হলে ব্রহ্মবিদ যোগিগণ উপরোক্ত দেবতাদের দ্বারা ক্রমশঃ নীত হয়ে ব্রহ্মকে লাভ করেন।। ২৪

প্রশ্ন—'জ্যোতিঃ' এবং **'অগ্নিঃ'**—এই দুটি পদ কোন্ দেবতার বাচক এবং সেই দেবতার স্বরূপ কী ? উক্ত মার্গে তাঁর কতটা অধিকার এবং তিনি এই বিষয়ে কী করেন ?

উত্তর—এখানে **'জ্যোতিঃ'** পদটি **'অগ্নিঃ'**র বিশেষণ এবং **'অগ্নি'** পদটি অগ্নি-অধিপতি দেবতার বাচক। উপনিষদে এই দেবতাকে **'অর্চিঃ'** বলা হয়েছে। এঁর স্বরূপ দিব্য প্রকাশময়, পৃথিবীর ওপর সমুদ্রসহ সমস্ত দেশে এঁর অধিকার এবং উত্তরায়ণ মার্গে যাওয়া অধিকারীর সঙ্গে দিনের অধিপতি দেবতার সম্বন্ধ করিয়ে দেওয়া হল এঁর কাজ। উত্তরায়ণ মার্গে গমনকারী যে উপাসক রাত্রে দেহত্যাগ করেন, তাঁকে ইনি সারারাত নিজ অধিকারে রেখে দিনের উদয় হলে দিনের অধিপতি দেবতার অধীন করে দেন এবং যিনি দিনে দেহত্যাগ করেন, তাকে তৎক্ষণাৎ দিনের অধিপতি দেবতাকে সমর্পণ করেন।

প্রশ্ন—'অহঃ' পদ কোন্ দেবতার বাচক, তাঁর স্বরূপ কী ? তাঁর অধিকার কতখানি এবং তিনি এই বিষয়ে কী করেন ?

উত্তর—'অহঃ' পদটি দিনের অধিপতি দেবতার বাচক, এঁর স্বরূপ অগ্নি-অধিপতি দেবতার থেকে অত্যন্ত বেশি দিব্য-প্রকাশময়। যে পর্যন্ত পৃথিবীর সীমা আছে অর্থাৎ যতদূর পর্যন্ত আকাশে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে, সেই পর্যন্ত এর অধিকার এবং উত্তরায়ণ মার্গে যাওয়া উপাসকদের শুক্লপক্ষের অধিপতি দেবতার সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়ে দেওয়াই এঁর কাজ। অভিপ্রায় হল যে উপাসক যদি কৃষ্ণপক্ষে মারা যান, তাহলে শুক্লপক্ষ আসা পর্যন্ত তাঁকে ইনি নিজ অধিকারে রাখেন আর যদি শুক্লপক্ষে মারা যান, তাহলে তখনই নিজ সীমায় নিয়ে গিয়ে তাঁকে শুক্লপক্ষের অধিপতি দেবতার অধীন করে দেন।

প্রশ্ন—এখানে **'শুক্লঃ'** পদ কোন্ দেবতার বাচক, তাঁর স্বরূপ কী, তাঁর অধিকার কত পর্যন্ত এবং কাজ কী ?

উত্তর—পূর্বের মতো **'শুক্লঃ'** পদও শুক্ল-পক্ষাধিপতি দেবতারই বাচক। এঁর স্বরূপ দিনের অধিপতি দেবতার থেকেও বেশি দিব্য-প্রকাশময়। পৃথিবীর সীমার বাইরে অন্তরীক্ষলোকে—যে লোকে পনেরো দিনে দিন আর তত সময় ধরেই রাত্রি হয়, সেই পর্যন্ত এঁর অধিকার। উত্তরায়ণ মার্গ দ্বারা গমনকারী অধিকারীদের নিজ সীমা থেকে পার করে উত্তরায়ণের অধিপতি দেবতার অধীন করে দেওয়াই এঁর কাজ। ইনিও পূর্বের মতো যদি দক্ষিণায়নে কোনো সাধক এঁর অধিকারে আসেন তাহলে তাঁকে নিজ অধিকারে রেখে এবং যদি উত্তরায়ণে আসেন তাহলে তৎক্ষণাৎ নিজ সীমা পার করিয়ে উত্তরায়ণ-অধিপতি দেবতার অধিকারে সমর্পণ করেন।

প্রশ্ন—'ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্' পদ কোন্ দেবতার বাচক ? তাঁর স্বরূপ কী ? তাঁর কতটা অধিকার এবং কাজ কী ?

উত্তর—যে ছয়মাস সূর্য উত্তর দিকে চলতে থাকে, সেই ছয় মাসকে উত্তরায়ণ বলে। সেই উত্তরায়ণ-কালাধিপতি দেবতার বাচক এখানে **'ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্'** পদ। এর স্বরূপ শুক্লপক্ষাধিপতি দেবতার থেকে বেশি দিব্য-প্রকাশময়। অন্তরীক্ষ লোকের ওপর যে

লোকে ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত্রি হয়, সেই পর্যন্ত এর অধিকার এবং উত্তরায়ণ মার্গ থেকে পরমধামে যাওয়া অধিকারীদের নিজ সীমা পার করে উপনিষদে বর্ণিত (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৪।১৫।৫ ; এবং ৫।১০। ১ ; ২ ; বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৬।২।১৫) সংবৎসরের অধিপতি দেবতার কাছে পৌঁছে দেওয়া এঁর কাজ। সেখান থেকে সংবৎসরের অধিপতি দেবতা তাঁকে সূর্যলোকে পৌঁছে দেন। সেখান থেকে ক্রমশঃ আদিত্যাধিপতি দেবতা, চন্দ্রাধিপতি দেবতার অধিকারে পৌঁছে দেন এবং তিনি বিদ্যুৎ-অধিপতি দেবতার অধিকারে পৌঁছে দেন। তারপর সেখানে ভগবানের পরমধাম থেকে ভগবানের পার্ষদ এসে তাঁকে পরমধামে নিয়ে যান এবং তখন তাঁর ভগবানের সঙ্গে মিলন হয়।

মনে রাখতে হবে যে এই বর্ণনায় ব্যবহৃত 'চন্দ্র' শব্দটি আমাদের দেখা চন্দ্রলোকের এবং তার অধিপতি দেবতার বাচক নয়।

প্রশ্ন—এখানে **'ব্রহ্মবিদঃ'** পদ কীরূপ মানুষের বাচক ?

উত্তর—এখানে **'ব্রহ্মবিদঃ'** পদ নির্গুণ ব্রহ্মের তত্ত্ব অথবা শাস্ত্র ও আচার্যের উপদেশানুসার সগুণ পরমেশ্বরের গুণ, প্রভাব, তত্ত্ব ও স্বরূপের শ্রদ্ধাপূর্বক পরোক্ষভাবে জ্ঞাত উপাসকদের অথবা নিষ্কামভাবে কর্মসম্পাদনকারী কর্মযোগীদের বাচক। এখানের **'ব্রহ্মবিদঃ'** পদ পরব্রহ্ম পরমাত্মা প্রাপ্ত জ্ঞানী মহাত্মাদের বাচক নয়, কারণ তাঁদের জন্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার বর্ণনা উপযুক্ত নয়। শ্রুতিতেও বলা হয়েছে যে—**'ন তস্য প্রাণা হ্যুৎক্রামন্তি'** (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৪।৬) **'অত্রৈব সমবলীয়ন্তে'** (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৩।২।১১), **'ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি'** (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৪।৬) অর্থাৎ তাঁর প্রাণের উৎক্রমণ হয় না, দেহ থেকে নির্গত হয়ে প্রাণ অন্যত্র যায় না, এখানেই লীন হয়ে যায়, তিনি ব্রহ্ম হয়েই ব্রহ্মকে লাভ করেন।' যিনি সগুণ পরমাত্মার সাক্ষাৎপ্রাপ্ত হয়েছেন, সেই ভক্ত উপরোক্ত মার্গ দ্বারা ভগবানের পরমধামে যেতে পারেন অথবা ভগবানের স্বরূপে লীনও হতে পারেন। এটি তাঁর রুচির উপর নির্ভর করে।

প্রশ্ন—এখানে 'ব্রহ্ম' শব্দ কীসের বাচক ? তাঁকে লাভ করা কাকে বলে ?

উত্তর—'ব্রহ্ম' শব্দ এখানে সগুণ পরমেশ্বরের বাচক। তাঁর কখনও বিনাশ না হওয়া নিত্য ধাম, যাকে সত্যলোক, পরমধাম, সাকেতলোক, গোলোক, বৈকুণ্ঠলোক এবং ব্রহ্মলোকও বলা হয়, সেখানে পৌঁছে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করাই হল তাঁকে লাভ করা। এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে এই ব্রহ্মলোক কিন্তু এই অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকে বর্ণিত পুনরাবর্তনশীল ব্রহ্মলোক নয়।

সম্বন্ধ—এইভাবে ফিরে না আসার পথের বর্ণনা করে এবার যে পথে গেলে সাধক ফিরে আসেন, তার বর্ণনা করছেন—

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে॥ ২৫

যে মার্গে ধূমাধিপতি দেবতা, রাত্রির অধিপতি দেবতা এবং কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়ণের ছমাসের অধিপতি দেবতা থাকেন, সেই মার্গে মৃত্যু হলে সকাম কর্মযোগী উপরিউক্ত দেবগণের দ্বারা ক্রমশঃ নীত হয়ে চন্দ্রজ্যোতি প্রাপ্ত হয়ে স্বর্গে নিজ পুণ্যকর্মের ফল ভোগ করে পুনরাগমন করেন॥ ২৫

প্রশ্ন—**'ধূমঃ'** পদ কোন্ দেবতার বাচক ? তাঁর স্বরূপ কেমন, তাঁর অধিকার কতটা এবং তাঁর কাজ কী ?

উত্তর—এখানে **'ধূমঃ'** পদ ধূমাধিপতি দেবতার অর্থাৎ অন্ধকারের অধিপতি দেবতার বাচক। তাঁর স্বরূপ অন্ধকারময়। অগ্নি-অধিপতি দেবতার ন্যায় পৃথিবীর ওপর সমুদ্র-সহ সমস্ত দেশে এঁর অধিকার এবং দক্ষিণায়ণ মার্গে যাওয়া সাধকদের রাত্রি-অধিপতি দেবতার কাছে পৌঁছানো এঁর কাজ। দক্ষিণায়ণ মার্গে গমনশীল যে সাধকের দিনে মৃত্যু হয়, তাঁকে তিনি সারাদিন নিজ অধিকারে রেখে রাত্রির প্রারম্ভেই রাত্রি-

অধিপতি দেবতার কাছে সমর্পণ করেন এবং যিনি রাত্রে মারা যান, তাকে তখনই রাত্রি-অধিপতি দেবতার অধীন করে দেন।

প্রশ্ন—'**রাত্রিঃ**' পদ কীসের বাচক, তাঁর স্বরূপ কেমন, অধিকার কতটা, এবং কাজ কী?

উত্তর—এখানে '**রাত্রিঃ**' পদও রাত্রি-অধিপতি দেবতার বাচক বলে বুঝতে হবে। এঁর স্বরূপ অন্ধকারময়। দিনের অধিপতি দেবতার ন্যায় এঁর অধিকারও পৃথ্বীলোকের সীমা পর্যন্ত। পার্থক্য এই যে পৃথিবীতে যখন যেখানে দিন থাকে, সেখানে দিনের-অধিপতি দেবতার অধিকার থাকে এবং যেখানে যখন রাত্রি থাকে, সেখানে রাত্রির-অধিপতি দেবতার অধিকার থাকে। দক্ষিণায়ন-মার্গে গমনশীল সাধকদের পৃথিবীর সীমা পার করে অন্তরীক্ষে কৃষ্ণপক্ষের অধিপতি দেবতার অধীন করা এঁর কাজ। সেই সাধক যদি শুক্লপক্ষে মারা যান, তাহলে তাঁকে কৃষ্ণপক্ষ আসা পর্যন্ত নিজ অধিকারে রাখেন আর যদি কৃষ্ণপক্ষে মারা যান, তবে তখনই নিজ অধিকার থেকে পার করিয়ে কৃষ্ণপক্ষাধিপতি দেবতার অধীন করে দেন।

প্রশ্ন—এখানে '**কৃষ্ণঃ**' পদ কীসের বাচক? তাঁর স্বরূপ কেমন, তাঁর অধিকার কতটা পর্যন্ত এবং কাজ কী?

উত্তর—কৃষ্ণপক্ষাধিপতি দেবতার বাচক এখানে '**কৃষ্ণঃ**' পদটি। এঁর স্বরূপও অন্ধকারময় হয়। পৃথিবী-মণ্ডলের সীমার বাইরে অন্তরীক্ষলোকে, যেখানে পনেরোটি দিনের সমান একটি দিন ও পনেরোটি রাত্রির সমান একটি রাত্রি হয়, সেই পর্যন্ত এঁর অধিকার। পার্থক্য এই যে ইহলোকে যখন যেখানে শুক্লপক্ষ থাকে, সেখানে শুক্লাধিপতি দেবতার অধিকার থাকে এবং যেখানে কৃষ্ণপক্ষ থাকে, সেখানে কৃষ্ণপক্ষাধিপতি দেবতার অধিকার থাকে। দক্ষিণায়ন মার্গের থেকে স্বর্গগামী সাধকদের দক্ষিণায়নাধিপতি দেবতার অধীন করে দেওয়া এঁর কাজ। দক্ষিণায়ন মার্গের যে সাধক উত্তরায়ণের সময় এঁর অধিকারে আসেন, তাঁকে তিনি দক্ষিণায়ন আসা পর্যন্ত নিজ অধিকারে রেখে এবং যিনি দক্ষিণায়নে আসেন তাঁকে তখনই তিনি নিজ অধিকার থেকে পার করিয়ে দক্ষিণায়নাধিপতি দেবতার কাছে পৌঁছে দেন।

প্রশ্ন—এখানে '**ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্**' পদ কীসের বাচক এবং তাঁর স্বরূপ কেমন, কোথা পর্যন্ত তাঁর অধিকার এবং কাজ কী?

উত্তর—সূর্য যে ছয়মাস ধরে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করে, তাকে ষাণ্মাসিক দক্ষিণায়ন বলে। তার অধিপতি দেবতার বাচক এখানে '**দক্ষিণায়নম্**' পদটি। এর স্বরূপও অন্ধকারময়। অন্তরীক্ষলোকের ওপর যে লোকে ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত্রি হয়, সেই পর্যন্ত এঁর অধিকার। পার্থক্য এই যে উত্তরায়ণের ছয় মাসে সেটির অধিপতি দেবতার সেখানে অধিকার থাকে এবং দক্ষিণায়নের ছয় মাস, এঁর অধিকার থাকে। দক্ষিণায়ন-মার্গে স্বর্গগমনকারী সাধকদের নিজ অধিকার থেকে পার করে উপনিষদে বর্ণিত পিতৃলোকাধিপতি দেবতার অধিকারে পৌঁছে দেওয়া এঁর কাজ। সেখান থেকে পিতৃলোকাধিপতি দেবতা সাধককে আকাশাধিপতি দেবতার কাছে এবং সেই আকাশাধিপতি দেবতা চন্দ্র-লোকে পৌঁছে দেন (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৫।১০।৪ ; বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৬।২।১৬)। এখানে চন্দ্রলোক উপলক্ষ্যমাত্র ; সুতরাং ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যত পুনরাবর্তনশীল লোক আছে, চন্দ্রলোক দ্বারা সে সব বুঝে নিতে হবে।

মনে রাখতে হবে যে উপনিষদে বর্ণিত এই পিতৃলোক সেই পিতৃলোক নয় যা অন্তরীক্ষের অন্তর্গত এবং যেখানে পনেরো দিনের একটি দিন এবং তত সময়েরই এক রাত্রি হয়।

প্রশ্ন—দক্ষিণায়ন-মার্গে গমনকারীদের 'যোগী' বলা হয়েছে কেন?

উত্তর—স্বর্গাদির জন্য পুণ্যকর্মকারী ব্যক্তিও তাঁর ঐহিক ভোগের প্রবৃত্তির নিরোধ করেন, সেই দৃষ্টিতে তাঁকেও 'যোগী' বলা উচিত। তাছাড়া যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিও এই মার্গে স্বর্গগমন করে, সেখানে কিছুদিন নিবাস করে ফিরে আসেন। তাঁরাও এই পথগামীদের অন্তর্গত। সুতরাং তাঁদের যোগী বলাই সমীচীন। এখানে 'যোগী' শব্দ প্রয়োগ করে দেখানো হয়েছে যে এই পথ পাপ কর্মকারী তামসিক ব্যক্তিদের জন্য নয় বরং উচ্চলোক প্রাপ্তির অধিকারী শাস্ত্রীয় কর্মকারী পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট (২।৪২, ৪৩, ৪৪ এবং ৯।২০, ২১ ইত্যাদি)।

প্রশ্ন—দক্ষিণায়ন-মার্গ দ্বারা গমনকারী সাধকদের

প্রাপ্ত হওয়া চন্দ্রের জ্যোতি কী ? এবং তাকে লাভ করা কীরূপ ?

উত্তর—চন্দ্রলোকে তার অধিপতি দেবতার স্বরূপ শীতল প্রকাশময়। তার মতো প্রকাশময় স্বরূপের নাম 'জ্যোতি' এবং তেমনই স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া চন্দ্রের জ্যোতি প্রাপ্ত হওয়া। সেখানে গমনকারী সাধক ঐলোকে শীতল প্রকাশময় দিব্য দেবশরীর লাভ করে নিজ পুণ্যকর্মের ফলস্বরূপ দিব্যভোগ ভোগ করেন।

প্রশ্ন—সেই চন্দ্র-জ্যোতি প্রাপ্ত হয়ে ফিরে আসা কেমন এবং সেই সাধক সেখান থেকে কোন্ মার্গ দিয়ে কীভাবে ফিরে আসেন ?

উত্তর—সেখানে থাকার নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে ইহলোকে ফিরে আসাই সেখান থেকে আসা। যে কর্মের ফলস্বরূপ স্বর্গ ও সেখানের ফলভোগ হয়, সেই ভোগ সমাপ্ত হলে যখন তা ক্ষীণ হয়ে যায়, তখন প্রাণীকে বাধ্য হয়ে ফিরে আসতে হয়। সে চন্দ্রলোক থেকে আকাশে আসে, সেখান থেকে বায়ুরূপ হয়ে পরে ধূমের আকারে পরিণত হয়, ধূম থেকে বাদলে আসে, বাদল থেকে মেঘরূপ হয়, তারপর জলরূপে পৃথিবীতে বর্ষিত হয় এবং শস্যাদিতে যেমন—গম, তিল, যব ইত্যাদি বীজে বা বৃক্ষাদিতে প্রবেশ করে। তার দ্বারা পুরুষের বীর্যে প্রবিষ্ট হয়ে নারীর গর্ভে প্রোথিত হয় এবং নিজ নিজ কর্মানুসারে তদনুরূপ জন্ম লাভ করে (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৫।১০।৫, ৬, ৭ ; বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৬।২।১৬)।

সম্বন্ধ—এইভাবে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন—দুটি মার্গের বর্ণনা করে এবার ঐ দুটিকে সনাতন মার্গ বলে এই বিষয়ের উপসংহার করছেন—

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ততে পুনঃ॥ ২৬

কারণ জগতে এই দুটি পথ—শুক্ল ও কৃষ্ণ অর্থাৎ দেবযান ও পিতৃযানকে সনাতন পথ বলা হয়, এর মধ্যে একটিতে পুনর্জন্ম হয় না অর্থাৎ পরমগতি লাভ হয় এবং অন্যটিতে পুনরাগমন করতে হয় অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু প্রাপ্তি হয়॥ ২৬

প্রশ্ন—এখানে 'জগতঃ' পদ কীসের বাচক এবং দুটি গতির সঙ্গে তার সম্বন্ধ কী ? এই দুটি পথকে শাশ্বত বলার কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—এখানে 'জগতঃ' পদটি উপর-নীচের লোকে বিচরণকারী সমস্ত চরাচর প্রাণীর বাচক, কারণ সকল প্রাণী অধিকার অনুসারে দুটি পথের দ্বারা গমন করতে পারে। চুরাশী লক্ষ জন্মে ঘুরতে ঘুরতে কখনো না কখনো ভগবান দয়া করে জীবকে মনুষ্যদেহ প্রদান করে তাকে নিজের ও দেবলোকে যাওয়ার সুযোগ প্রদান করেন। সেই সময় যদি সে জীবনের সদ্ব্যবহার করে তাহলে দুটির মধ্যে কোনো একটি পথ দিয়ে অবশ্যই গন্তব্যস্থান প্রাপ্ত করতে পারে। সুতরাং প্রকারান্তরে প্রাণীমাত্রের সঙ্গেই এই দুটি পথের সম্বন্ধ আছে। এই পথ সর্বদাই সমস্ত প্রাণীর জন্য এবং চিরকাল থাকবে। তাই একে 'শাশ্বত' বলা হয়। যদিও মহাপ্রলয়ে সমস্ত লোক যখন ভগবানে লীন হয়ে যায়, তখন এই মার্গ এবং এর দেবতাও লীন হয়ে যান, তথাপি যখন পুনরায় সৃষ্টি হয়, তখন পূর্বের ন্যায় এর পুনঃ নির্মাণ হয়। তাই একে 'শাশ্বত' বলায় কোনো আপত্তি নেই।

প্রশ্ন—এই পথের 'শুক্ল' ও 'কৃষ্ণ' নাম রাখার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—পরমেশ্বরের পরমধামে যাবার যে পথ, তা প্রকাশময়—দিব্য। তার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও প্রকাশময় এবং সেখানে গমনকারীদের অন্তরেও সদাই জ্ঞানের প্রকাশ থাকে ; তাই এই পথের নাম রাখা হয়েছে 'শুক্ল'। এবং যা ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত দেবলোকে যাওয়ার পথ, তা শুক্লমার্গের থেকে অন্ধকার যুক্ত। তার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও অন্ধকারস্বরূপ এবং তাতে গমনকারী লোকও অজ্ঞানে মোহিত হয়ে থাকে। তাই সেই পথের নাম 'কৃষ্ণ' রাখা হয়েছে।

প্রশ্ন—'অনাবৃত্তি' শব্দ কীসের বাচক, এখানে সেটি প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—যেখানে গেলে সাধকের পুনরাগমন হয় না,

যা ভগবানের পরম ধাম, তারই বাচক এখানে 'অনাবৃত্তি' শব্দ। চব্বিশতম শ্লোকে শুক্লমার্গ দিয়ে গমনকারীদের ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে। ওখানে গেলে মানুষের পুনর্জন্ম হয় না, তাই তাকে অনাবৃত্তিও বলা হয়—এই বিষয় স্পষ্ট করার জন্য এখানে পুনরায় 'অনাবৃত্তি' শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—'পুনঃ আবর্ততে' কথাটির ভাব কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান কৃষ্ণমার্গের দ্বারা প্রাপ্ত সকল লোক পুনরাবৃত্তিশীল বলে জানিয়েছেন। ভাব হল কৃষ্ণমার্গে গমনকারী মানুষ যে যে লোক প্রাপ্ত হয়, সে সব লোকই বিনাশশীল। তাই এই মার্গে যাওয়া মানুষদের পুনরায় মৃত্যুলোকে ফিরে আসতে হয়।

সম্বন্ধ—এবার ঐ দুটি মার্গ সম্বন্ধে জ্ঞাত যোগীদের প্রশংসা করে অর্জুনকে যোগী হতে বলছেন—

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন॥ ২৭

হে পার্থ ! এই ভাবে তত্ত্বতঃ দুটি পথ জানলে কোনো যোগী মোহগ্রস্ত হন না। সেইজন্য হে অর্জুন ! তুমি সর্বদা সমবুদ্ধিরূপ যোগে যুক্ত হও অর্থাৎ আমাকে লাভের জন্য নিরন্তর সাধনপরায়ণ হও ॥ ২৭

প্রশ্ন—এখানে '**এতে**' বিশেষণের সঙ্গে '**সৃতী**' পদ কীসের বাচক এবং তাকে জানা কী ?

উত্তর—পূর্বশ্লোকে যে দুটি মার্গের বর্ণনা করা হয়েছে, সেই দুই মার্গের বাচক এখানে '**এতে**' বিশেষণের সঙ্গে '**সৃতী**' পদটি। সকামভাবে শুভ কর্ম আচরণ ও দেবোপাসনাকারী পুণ্যাত্মা ব্যক্তি কৃষ্ণমার্গে গমন করে নিজ কর্মানুসারে দেবলোক প্রাপ্ত হন এবং পুণ্য ক্ষয় হয়ে গেলে সেখান থেকে ফিরে আসেন (৯।২০, ২১)। নিষ্কামভাবে কর্ম ও উপাসনাকারী কর্মযোগী এবং কর্তৃত্বাভিমানত্যাগী সাংখ্যযোগী—উভয়েই শুক্লমার্গ দ্বারা ভগবানের পরমধাম লাভ করেন, তাঁদের সেখান থেকে কখনো ফিরে আসতে হয় না—এই কথা শ্রদ্ধাপূর্বক ভালোভাবে বুঝে নেওয়াই হল তত্ত্বতঃ উভয় মার্গ জানা।

প্রশ্ন—এখানে '**যোগী**' পদটি প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ? '**কশ্চন**' বিশেষণ দ্বারা কী ভাব দেখানো হয়েছে এবং তার মোহিত না হওয়া কী ?

উত্তর—কর্মযোগ, ধ্যানযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ ইত্যাদি ঈশ্বর লাভের যত প্রকারের যোগ বলা হয়েছে, সেই অনুসারে প্রয়াসকারী সকল সাধকই হলেন 'যোগী'। তাঁদের মধ্যে যাঁরা উপরোক্ত দুটি পথকে তত্ত্বতঃ জেনে যান, তাঁরাই মোহিত হন না—এই কথা বোঝাবার জন্য '**কশ্চন**' পদটি প্রয়োগ করা হয়েছে। উপরোক্ত যোগসাধনে ব্যাপৃত হয়েও মানুষ এই মার্গ দুটিকে তত্ত্বতঃ না জানায় স্বভাববশতঃ ইহলোক ও পরলোকের ভোগে আসক্ত হয়ে সাধন থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যায়, এই হল তাঁর মোহগ্রস্ত হওয়া। কিন্তু যিনি এই দুই মার্গকে তত্ত্বতঃ জানেন, তিনি ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোকের ভোগকে বিনাশশীল ও তুচ্ছ জেনে কোনো প্রকার ভোগে আসক্ত হন না এবং নিরন্তর পরমেশ্বর প্রাপ্তির সাধনে ব্যাপৃত থাকেন। এই হল তাঁর মোহগ্রস্ত না হওয়া।

প্রশ্ন—এখানে '**তস্মাৎ**' পদ দ্বারা কী জানানো হচ্ছে এবং অর্জুনকে সবসময় যোগযুক্ত হওয়ার জন্য বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে '**তস্মাৎ**' পদ দ্বারা ভগবান এই কথা জানাতে চেয়েছেন যে, ভগবৎপ্রাপ্তির সাধনরূপ যোগেরই এত মহত্ত্ব যে তাতে যুক্ত থাকা যোগী উভয় মার্গের তত্ত্ব ভালোভাবে বুঝে নেওয়ায় কোনোপ্রকার ভোগে আসক্ত হয়ে মোহিত হন না ; অতএব তুমিও সর্বদা যোগযুক্ত হয়ে যাও ; শুধুমাত্র আমার প্রীতির জন্য নিরন্তর ভক্তিপ্রধান কর্মযোগে শ্রদ্ধাসহ তৎপর থাকো। এই অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকেও ভগবান এই নির্দেশ দিয়েছেন, কারণ অর্জুন তার অধিকারী ছিলেন।

এখানে ভগবান অর্জুনকে সর্বকালে যোগযুক্ত হতে বলেছেন, এর ভাবার্থ হল যে মনুষ্যজীবন অতি অল্প সময়ের, কখন যে মৃত্যু হয়, তার ঠিক নেই। যদি নিজ

জীবনের প্রতিটি ক্ষণ সাধনে ব্যাপৃত করে রাখার চেষ্টা না করা হয়, তাহলে সাধন মধ্যপথেই ব্যাহত হবে। আর যদি সাধনহীন অবস্থাতেই মৃত্যু হয় তাহলে যোগভ্রষ্ট হয়ে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হবে। সুতরাং মানুষের ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য নিত্য-নিরন্তর সাধনায় ব্যাপৃত থাকা উচিত।

সম্বন্ধ—ভগবান অর্জুনকে যোগযুক্ত হতে বলেছেন। এবার যোগযুক্ত ব্যক্তির মহিমা এবং এই অধ্যায়ে বর্ণিত রহস্য বুঝে নিয়ে সেই অনুসারে সাধন করার ফল জানিয়ে এই অধ্যায়ের উপসংহার করছেন—

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্॥ ২৮

যোগিগণ এই রহস্য তত্ত্বতঃ জেনে বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, তপস্যা এবং দান ইত্যাদি করায় যে পুণ্যফল বলা হয়েছে, সে-সব নিঃসন্দেহে অতিক্রম করেন এবং সনাতন ব্রহ্মপদ লাভ করেন ॥ ২৮

প্রশ্ন—এখানে **'যোগী'** কীসের বাচক ?

উত্তর—ঈশ্বর লাভের যতপ্রকার সাধন বলা হয়েছে, তার মধ্যে যে কোনো সাধনে শ্রদ্ধাভক্তিসহ নিরন্তর ব্যাপৃত থাকা পুরুষের বাচক হল এখানে 'যোগী' পদটি।

প্রশ্ন—**'ইদম্'** পদ কীসের বাচক ? তাকে তত্ত্বতঃ জানা কী ?

উত্তর—এই অধ্যায়ে বর্ণিত সমগ্র উপদেশের বাচক হল **'ইদম্'** পদটি। এবং এখানে প্রদত্ত সমগ্র শিক্ষা অর্থাৎ ভগবানের সগুণ-নির্গুণ এবং সাকার-নিরাকার স্বরূপের উপাসনা, ভগবানের গুণ, প্রভাব এবং মাহাত্ম্য তথা কী রূপ সাধন করলে মানুষ ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে, কোথায় গেলে পুনরায় ফিরে আসতে হয় এবং কোথায় পৌঁছলে পুনর্জন্ম হয় না—প্রভৃতি যে সকল কথা এখানে বলা হয়েছে, সে সকল যথাযথভাবে উপলব্ধি করা হল তাকে তত্ত্বতঃ জানা।

প্রশ্ন—এখানে 'বেদ', 'যজ্ঞ', 'তপ', ও 'দান' শব্দ কীসের বাচক ? তার পুণ্যফল কী এবং তাকে উল্লঙ্ঘন করা কী ?

উত্তর—এখানে 'বেদ' শব্দ অঙ্গ-সহ চতুর্বেদ এবং তার অনুকূল সমস্ত শাস্ত্রের, **'যজ্ঞ'** শব্দটি শাস্ত্রবিহিত পূজা, হোম ইত্যাদি সর্বপ্রকার যজ্ঞের ; 'তপ'—ব্রত, উপবাস, ইন্দ্রিয়-সংযম, স্বধর্মপালন ইত্যাদি সর্বপ্রকার শাস্ত্রবিহিত তপ এবং 'দান'—অন্নদান, বিদ্যাদান, ভূমিদান ইত্যাদি সর্বপ্রকার শাস্ত্রবিহিত দান এবং পরোপকারের বাচক। শ্রদ্ধাভক্তিপূর্বক সকামভাবে বেদ-শাস্ত্রের স্বাধ্যায় ও যজ্ঞ, দান, তপ ইত্যাদি শুভকর্মের অনুষ্ঠান করলে যে পুণ্য-সঞ্চয় হয় সেই পুণ্যের ফলস্বরূপ যে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন দেবলোকের এবং সেখানের ভোগের প্রাপ্তিরূপ ফল বেদশাস্ত্রে বলা আছে সেই গুলিই পুণ্যফল। যারা ঐ সব লোকের এবং সেই সকল ভোগকে ক্ষণভঙ্গুর এবং অনিত্য মনে করে তাতে আসক্ত হয় না এবং তার থেকে সর্বতোভাবে উপরত হয়, সেই হল সেগুলিকে উল্লঙ্ঘন করা।

প্রশ্ন—**'আদ্যম্'** এবং **'পরম্'** বিশেষণের সঙ্গে **'স্থানম্'** পদ কীসের বাচক এবং তাকে প্রাপ্ত হওয়া কী ?

উত্তর—এই অধ্যায়ে যা ভগবানের পরমধামের নামে বলা হয়েছে, যেখানে গেলে মানুষ আর এই সংসারচক্রে ফিরে আসে না, যা সকলের আদি, সবের অতীত এবং শ্রেষ্ঠ, তারই বাচক এখানে **'পরম্'** ও **'আদ্যম্'** বিশেষণের সঙ্গে **'স্থানম্'** পদটি ; তাকে তত্ত্বতঃ জেনে তাতে একাত্ম হওয়াই হল তাকে প্রাপ্ত করা। একেই পরমগতির প্রাপ্তি, দিব্যপুরুষের প্রাপ্তি, পরমপদের প্রাপ্তি ও ভগবদ্ভাবের প্রাপ্তিও বলা হয়।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
অক্ষরব্রহ্মযোগো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮॥

———o———

ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ

নবম অধ্যায়
(রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগ)

অধ্যায়ের নাম এই অধ্যায়ে ভগবান যে উপদেশ দিয়েছেন, তাকে তিনি সমস্ত বিদ্যার এবং সমস্ত গোপনীয় ভাবের রাজা বলেছেন। তাই এই অধ্যায়ের নাম রাখা হয়েছে **'রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগ'**।

সংক্ষিপ্ত অধ্যায়-সার এই অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে অর্জুনকে পুনরায় বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের উপদেশ দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করে তার মাহাত্ম্য বলেছেন, তৃতীয়তে সেই উপদেশের প্রতি অশ্রদ্ধাকারীদের জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারচক্রের প্রাপ্তির কথা বলেছেন। চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ পর্যন্ত ভগবানের নিরাকার রূপের ব্যাপকতা ও নির্লিপ্ততার বর্ণনা করে ভগবানের ঈশ্বরীয় যোগশক্তির দিগ্দর্শন করিয়ে বায়ু ও আকাশের দৃষ্টান্ত দিয়ে সেই স্বরূপে সমস্ত প্রাণীর স্থিতি জানিয়েছেন। তারপর সপ্তম থেকে দশম পর্যন্ত মহাপ্রলয়ের সময় সমস্ত প্রাণীর ভগবানের প্রকৃতিতে লয় হওয়া এবং কল্পের আরম্ভে পুনরায় ভগবানের সকাশ থেকে প্রকৃতি দ্বারা তাঁদের রচিত হওয়া এবং এই সব কর্ম করেও ভগবানের তাতে নির্লিপ্ত থাকার কথা বলা হয়েছে। একাদশ ও দ্বাদশে ভগবানের প্রভাব না জানায় তাঁর তিরস্কারকারীদের নিন্দা করে ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশে ভগবানের প্রভাব সম্বন্ধে জ্ঞাত অনন্য ভক্তদের ভজনের প্রকার বলা হয়েছে। পঞ্চদশে অভেদভাবে জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা ব্রহ্মের উপাসক জ্ঞানযোগীদের এবং বিশ্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসকদের বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর ষোড়শ থেকে ঊনবিংশ পর্যন্ত ভগবান তাঁর গুণ, প্রভাব ও বিভূতিসহ স্বরূপের বর্ণনা করে কার্য-কারণরূপ সমস্ত জগৎকে তাঁর স্বরূপ বলে জানিয়েছেন। কুড়ি ও একুশতম শ্লোকে স্বর্গভোগের জন্য যজ্ঞাদি কর্মকারীদের পুনরাগমনের বর্ণনা করে বাইশতমতে নিষ্কামভাবে নিত্য-নিরন্তর চিন্তনকারী তাঁর ভক্তদের যোগক্ষেম নিজে বহন করার প্রতিজ্ঞা করেছেন। তেইশতম থেকে পঁচিশতম পর্যন্ত অন্য দেবতাদের উপাসনাকেও প্রকারান্তরে অবিধিপূর্বক তাঁরই উপাসনা বলে এবং ভগবানকে তত্ত্বতঃ না জানার কথা বলে তার ফলে সেইসব দেবতাদের লাভ করা এবং তাঁর উপাসনার ফল তাঁকে (ভগবানকে) প্রাপ্তি বলে জানিয়েছেন। ছাব্বিশতমতে ভগবদ্ভক্তির সুগমতা দেখিয়ে সাতাশতমতে অর্জুনকে সর্ব কর্ম ভগবানে অর্পণ করতে বলেছেন এবং আঠাশতমতে তার ফল তাঁকে প্রাপ্তি বলে জানিয়েছেন। ঊনত্রিশতমতে নিজের সমত্ব বর্ণনা করে ত্রিশতম ও একত্রিশতমতে দুরাচারী হওয়া সত্ত্বেও অনন্য ভক্তের ভগবদ্ভজনের মহত্ত্ব দেখিয়েছেন। বত্রিশতমতে তাঁর শরণাগতির দ্বারা নারী, বৈশ্য, শূদ্র ও চণ্ডালদেরও পরম গতিরূপ ফলের প্রাপ্তি হয় বলে জানিয়েছেন। তেত্রিশতম ও চৌত্রিশতমতে পুণ্যশীল ব্রাহ্মণ এবং রাজর্ষি ভক্তজনেদের প্রশংসা করে শরীরকে অনিত্য বলে জানিয়ে অর্জুনকে তাঁর শরণাগত হবার জন্য বলে অঙ্গসহ শরণাগতির স্বরূপ নিরূপণ করে অধ্যায়ের উপসংহার করেছেন।

সম্বন্ধ—সপ্তম অধ্যায়ের প্রারম্ভে ভগবান বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের বর্ণনা করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। সেই অনুসারে ঐ বিষয়ে বর্ণনা করে শেষে ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম, অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞের সঙ্গে ভগবানকে জানার এবং অন্তকালে ভগবৎচিন্তনের কথা বলেছিলেন—তাতে অষ্টম অধ্যায়ে অর্জুন সেই কথার বিশ্লেষণ এবং অন্তকালের উপাসনার বিষয় বোঝার জন্য সাতটি প্রশ্ন করেছিলেন। তার মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে ভগবান ছয়টি প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে দিয়েছিলেন কিন্তু সপ্তম প্রশ্নের উত্তরে যে উপদেশ আরম্ভ করেছিলেন তাতে অষ্টম অধ্যায় সম্পূর্ণ হয়। এইরূপ সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের বর্ণনা সম্পূর্ণ না হওয়ায় সেই বিষয় ভালোভাবে বোঝানোর উদ্দেশ্যে ভগবান নবম

অধ্যায়টি শুরু করেছেন। সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত উপদেশের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখাবার জন্য প্রথম শ্লোকে পুনরায় সেই বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের বর্ণনা করার অঙ্গীকার করছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥ ১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—তুমি দোষদৃষ্টিরহিত, তাই তোমাকে এই পরম গোপনীয় বিজ্ঞানসহ জ্ঞান পুনরায় ভালোভাবে বলছি, যা জানলে তুমি এই দুঃখরূপ সংসার থেকে মুক্ত হয়ে যাবে॥ ১

প্রশ্ন—**'অনসূয়বে'** পদের অর্থ কী এবং এখানে অর্জুনকে 'অনসূয়ু' বলার কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—গুণীদের গুণ না দেখা, গুণাদিতে দোষ-দর্শন, তাঁদের প্রতি নিন্দা এবং মিথ্যা দোষারোপ করাকে বলা হয় 'অসূয়া'। যাঁর স্বভাবে এই 'অসূয়া' দোষ একেবারেই থাকে না, তাকে 'অনসূয়ু' বলা হয়।[১] ভগবান এখানে অর্জুনকে 'অনসূয়ু' সম্বোধন করে এই ভাব দেখিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি আমাতে শ্রদ্ধা রাখে এবং অসূয়া দোষরহিত, সে-ই এই অধ্যায়ে প্রদত্ত উপদেশের অধিকারী। অপরপক্ষে আমাতে দোষদৃষ্টি রাখা অশ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তি এই উপদেশের যোগ্য পাত্র নয়। অষ্টাদশ অধ্যায়ের সাতষট্টিতম শ্লোকে ভগবান স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, 'যিনি আমাতে দোষদৃষ্টি রাখেন, তাঁর গীতাশাস্ত্রের উপদেশ শোনা উচিত নয়।'

প্রশ্ন—এখানে **'ইদম্'** পদ কীসের বাচক ? এবং যা বলার প্রতিজ্ঞা করেছেন, সেই বিজ্ঞানসহ জ্ঞান কী ?

উত্তর—সপ্তম, অষ্টম এবং এই নবম অধ্যায়ে প্রভাব ও মহত্ত্বাদির রহস্যসহ যে নির্গুণ-নিরাকার তত্ত্বের এবং লীলা, রহস্য, মহত্ত্ব ও প্রভাব ইত্যাদি সহ সগুণ-নিরাকার এবং সাকার-তত্ত্বের ও তাঁকে উপলব্ধি করানো উপদেশের বর্ণনা করা হয়েছে, সেই সবের বাচক এখানে **'ইদম্'** পদটি এবং সেটিই বিজ্ঞানসহ জ্ঞান।

প্রশ্ন—একে **'গুহ্যতমম্'** বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—জগতে ও শাস্ত্রে যতপ্রকার গুপ্ত রাখার যোগ্য রহস্যের বিষয় মনে করা হয়, তার মধ্যে সমগ্ররূপ ভগবান পুরুষোত্তমের তত্ত্ব, প্রেম, গুণ, প্রভাব, বিভূতি, মহত্ত্ব ইত্যাদিসহ তাঁর শরণাগতির স্বরূপ সব থেকে বেশি গোপনীয় বিষয়, এই ভাব দেখাবার জন্য একে 'গুহ্যতম' বলা হয়েছে। পঞ্চদশ অধ্যায়ের বিশতম ও অষ্টাদশ অধ্যায়ের চৌষট্টিতম শ্লোকেও এইরূপ বর্ণনাকে ভগবান 'গুহ্যতম' বলেছেন।

প্রশ্ন—এখানে 'অশুভ' শব্দ কীসের বাচক, তার থেকে মুক্ত হওয়া কী ?

উত্তর—সমস্ত দুঃখের, তার হেতুভূত কর্মের, দুর্গুণের, জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার বন্ধনের এবং এই সবের কারণরূপ অজ্ঞানের বাচক এখানে 'অশুভ' শব্দ। এই সব থেকে চিরকালের জন্য সম্পূর্ণভাবে মুক্তি পাওয়া এবং পরমানন্দস্বরূপ পরমেশ্বরকে লাভ করাই হল 'অশুভ থেকে মুক্তিলাভ' করা।

সম্বন্ধ—ভগবান যে বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের উপদেশ করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সেই উপদেশের প্রতি শ্রদ্ধা, প্রেম, শোনার আগ্রহ এবং সেই উপদেশানুসারে আচরণ করায় অত্যধিক উৎসাহ উৎপন্ন করার জন্য ভগবান এবার তার যথার্থ মাহাত্ম্য শোনাচ্ছেন—

[১]ন গুণান্ গুণিনো হন্তি স্তৌতি মন্দগুণানপি। নান্যদোষেষু রমতে সানসূয়া প্রকীর্তিতা॥ (অত্রিস্মৃতি ৩৪)

যিনি গুণবানদের গুণ খণ্ডন করেন না, অল্প গুণীদেরও প্রশংসা করেন এবং অপরের দোষ দেখে খুশি হন না, এরূপ মানুষের ঐ ভাবকে বলা হয় অনসূয়া।

अजामिल-उद्धार

Redemption of Ajāmila
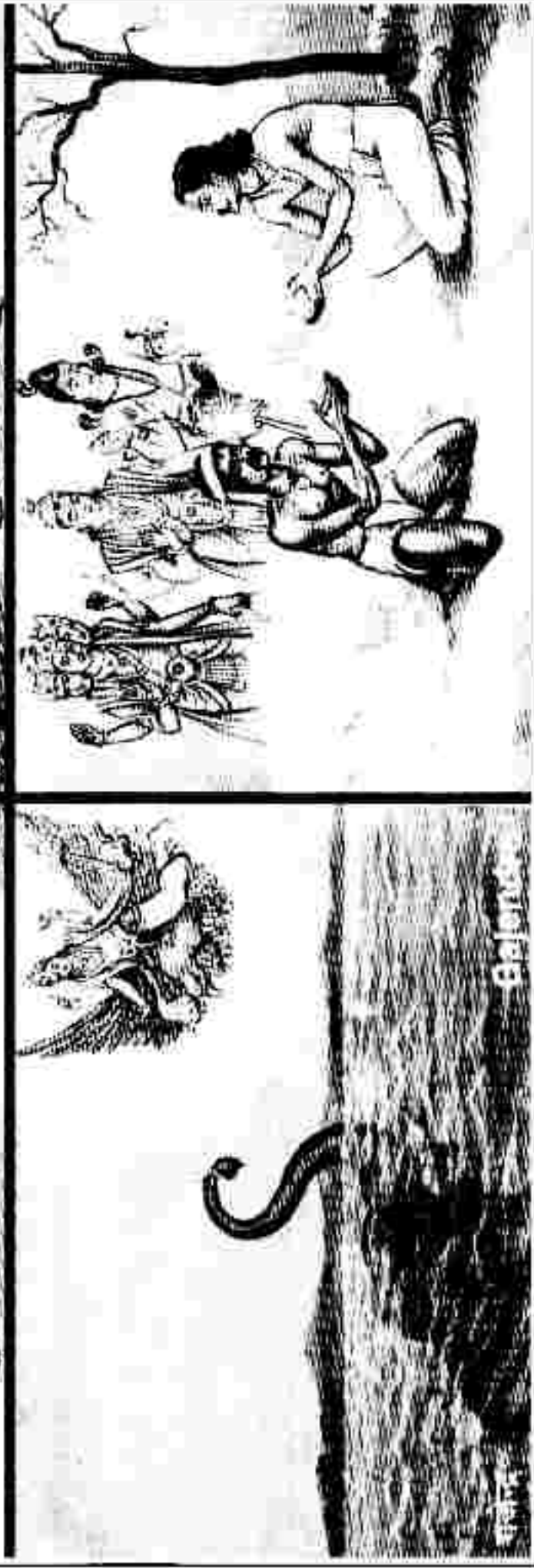
पत्र, पुष्प, फल, जलका ग्रहण

Trifle offerings accepted

भगवान् वेदव्यास

Bhagavān Vedavyāsa

भगवान्‌का विश्वरूपदर्शन

Lord shows his cosmic body
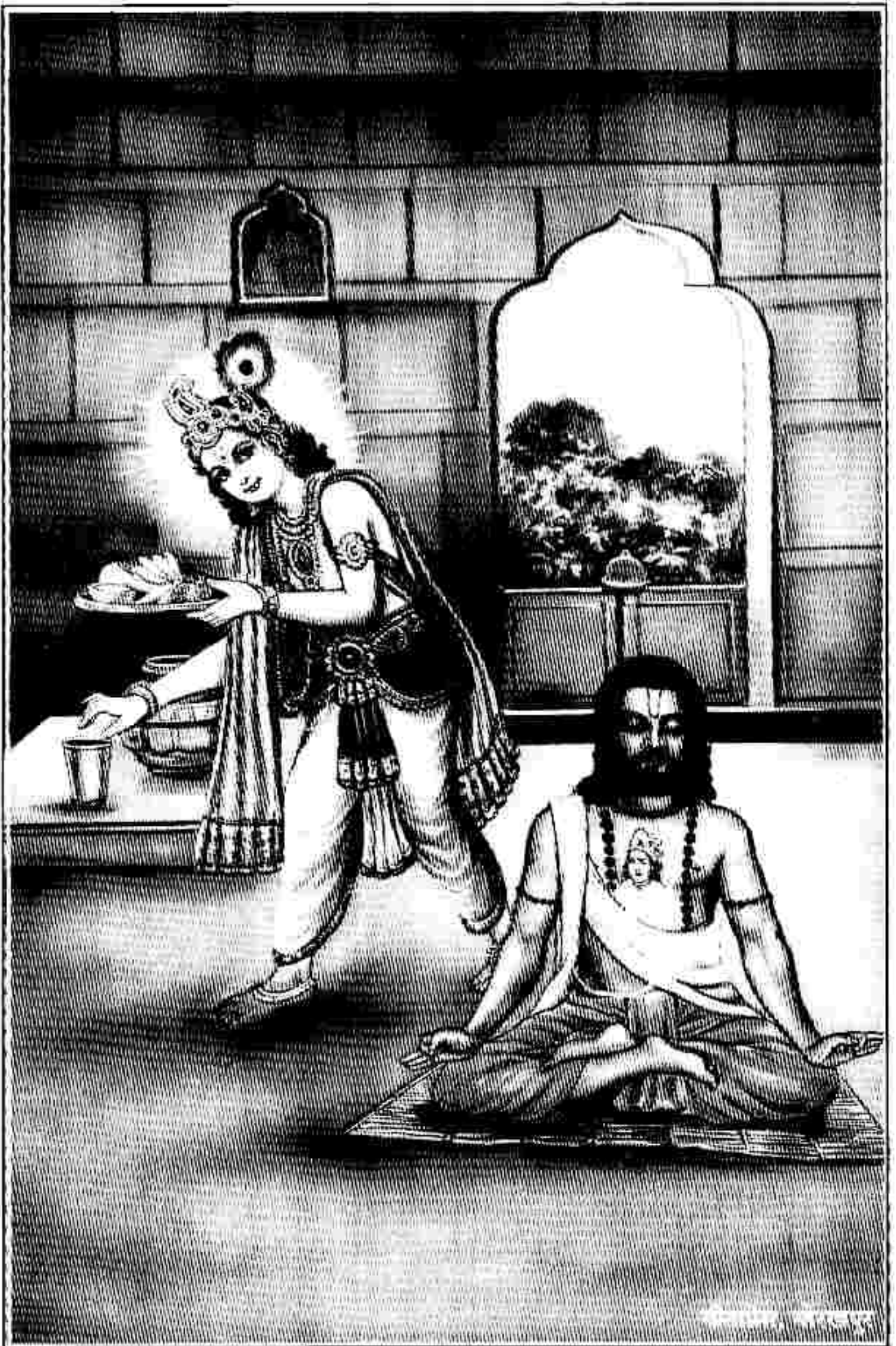
योगक्षेमं वहाम्यहम्   **Yogakṣemaṁ Vahāmyaham**
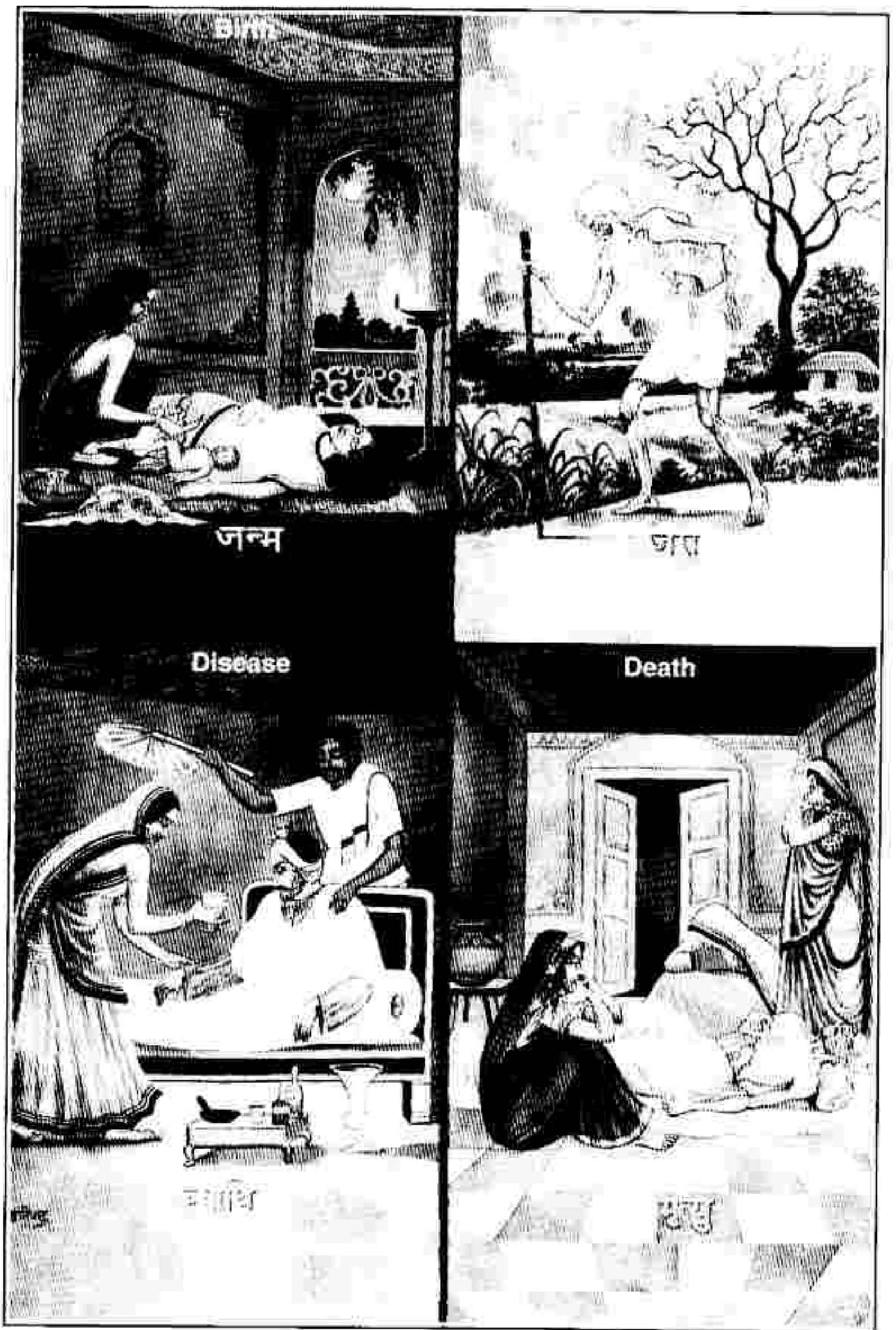
चार अवस्थाएँ

Four stages

संसार-वृक्ष Universe—a tree

अनन्य शरणागति

Surrender unreserved

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্ ॥ ২

এই বিজ্ঞানসহ জ্ঞান সমস্ত বিদ্যা এবং সর্বগোপনীয় বিষয়ের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, এটি অত্যন্ত পবিত্র, উৎকৃষ্ট, সাক্ষাৎ ফলপ্রদ, ধর্মযুক্ত, সহজসাধ্য এবং অবিনাশী ॥ ২

প্রশ্ন—এই শ্লোকে উল্লিখিত **'ইদম্'** পদ কীসের বাচক, একে **'রাজবিদ্যা'** এবং **'রাজগুহ্য'** বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—পূর্বশ্লোকে বিজ্ঞানসহ যে জ্ঞানের কথা বলার প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল, তারই বাচক এখানে **'ইদম্'** পদটি। জগতে যত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বিদ্যা আছে, এটি তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ; যিনি এই বিদ্যা যথার্থভাবে অনুভব করেছেন, তাঁর আর কিছু জানার বাকি থাকে না। তাই একে রাজবিদ্যা অর্থাৎ সর্ববিদ্যার রাজা বলা হয়। এতে ভগবানের সগুণ-নির্গুণ এবং সাকার-নিরাকার স্বরূপের তত্ত্ব, তাঁর গুণ, প্রভাব ও মহত্ত্বের, তাঁর উপাসনাবিধির এবং তার ফলের যথাযথ নির্দেশ করা হয়েছে। এছাড়া এতে ভগবান নিজের সমস্ত রহস্য উন্মুক্ত করে এই তত্ত্ব বুঝিয়েছেন যে, আমি যে শ্রীকৃষ্ণরূপে তোমার সামনে বিরাজমান, সেই আমিই এই সমগ্র জগতের কর্তা, হর্তা, সর্বাধার, সর্বশক্তিমান, পরব্রহ্ম পরমেশ্বর ও সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম। তুমি সর্বপ্রকারে আমার শরণাগত হও। এইরূপ পরম গোপনীয় রহস্যের কথা অর্জুনের ন্যায় দোষদৃষ্টিরহিত পরম শ্রদ্ধাবান ভক্তের কাছেই বলা সম্ভব, সকলের কাছে নয়। তাই একে রাজগুহ্য অর্থাৎ সমস্ত গোপনীয়তার রাজা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—একে **'পবিত্র'** ও **'উত্তম'** বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই উপদেশ এতো পবিত্রকারী যে, যদি শ্রদ্ধাপূর্বক কেউ এই উপদেশ শ্রবণ-মনন ও সেই অনুসারে আচরণ করেন, তবে এটি তার সমস্ত পাপ ও দোষ সমূলে বিনাশ করে তাঁকে চিরকালের মতো পরম বিশুদ্ধ করে তোলে। তাই একে 'পবিত্র' বলা হয়। জগতে যত উত্তম বস্তু আছে, এটি তাদের সবার থেকে শ্রেষ্ঠ ; তাই একে 'উত্তম' বলা হয়।

প্রশ্ন—এর জন্য **'প্রত্যক্ষাবগমম্'** এবং **'ধর্ম্যম্'** বিশেষণ দেওয়ার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—বিজ্ঞানসহ এই জ্ঞানের ফল শ্রাদ্ধাদি কর্মের ন্যায় অদৃষ্ট নয়। সাধক যেমন যেমন এর দিকে অগ্রসর হন, তেমন তেমনই তাঁর দুর্গুণ, দুরাচার ও দুঃখের নাশ হয়ে, তাঁর পরম শান্তি ও পরম সুখ প্রত্যক্ষ অনুভূত হতে থাকে ; যাঁর এটি পূর্ণরূপে উপলব্ধি হয়ে যায়, তিনি সত্বরই পরমসুখ ও পরম শান্তির সমুদ্র, পরম প্রেমিক, পরম দয়ালু ও সকলের সুহৃদ্, সাক্ষাৎ ভগবানকে তখনই লাভ করেন। তাই এটি 'প্রত্যক্ষাবগম'। বর্ণ ও আশ্রম ইত্যাদির যত বিভিন্ন ধর্মের কথা বলা হয়েছে, এগুলি সেসবের অবিরোধী এবং স্বাভাবিকভাবে পরম ধর্মময় হওয়ায়, সেগুলির থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই এটি 'ধর্ম্য'।

প্রশ্ন—একে **'অব্যয়ম্'** এবং **'কর্তুং সুসুখম্'** বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—সকামকর্ম যেমন ফল প্রদান করে সমাপ্ত হয়ে যায় এবং সাংসারিক বিদ্যা যেমন একবার পড়ার পর, বারংবার অভ্যাস না করলে নষ্ট হয়ে যায়—ভগবানের এই জ্ঞান-বিজ্ঞান কিন্তু সেভাবে নষ্ট হয় না। যে ব্যক্তি এটি একবার যথাযথভাবে লাভ করে নেয়, সে আর কখনো কোনো অবস্থাতেই একে বিস্মৃত হয় না। তাছাড়া এর ফলও অবিনাশী ; তাই একে 'অব্যয়' বলা হয়। আবার কেউ যাতে না মনে করে যে, এটি যখন এতো মহত্ত্বপূর্ণ, তাহলে সেই অনুসারে আচরণ করে একে লাভ করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, তাই ভগবান এখানে **'কর্তুং সুসুখম্'** পদ দ্বারা বলেছেন যে এই সাধন অত্যন্তই সহজ। অভিপ্রায় হল যে এই অধ্যায়ে প্রদত্ত উপদেশানুসারে ভগবানের শরণাগতি লাভ করা অত্যন্ত সহজ, কারণ এতে কোনো বাহ্য আয়োজনেরও প্রয়োজনীয়তা থাকে না এবং কোনো কষ্টও করতে হয় না। সিদ্ধ হওয়ার পরের কথা প্রসঙ্গে বলার কী আছে, সাধনার প্রারম্ভেই সাধক এতে শান্তি ও সুখ অনুভব করে থাকেন।

সম্বন্ধ—বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের যখন এমনই মহিমা এবং এর সাধনও এতো সহজ, তাহলে সব মানুষই কেন এটি ধারণ করে না ? এই প্রশ্নে অশ্রদ্ধাকেই এর প্রধান কারণ জানিয়ে ভগবান এবার অশ্রদ্ধাকারী মানুষদের নিন্দা করছেন—

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি॥ ৩

হে পরন্তপ ! উপরোক্ত ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি আমাকে লাভ না করে মৃত্যুময় সংসারচক্রে ভ্রমণ করতে থাকে॥ ৩

প্রশ্ন—'**অস্য**' বিশেষণের সঙ্গে '**ধর্মস্য**' পদ কোন্ ধর্মের বাচক, তাতে শ্রদ্ধা না করা কী ?

উত্তর—আগের শ্লোকে যে বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের মাহাত্ম্য বলা হয়েছে এবং পূর্বের অধ্যায়ে যার বর্ণনা আছে, তারই বাচক এখানে '**অস্য**' বিশেষণের সঙ্গে '**ধর্মস্য**' পদটি। এই প্রসঙ্গে বর্ণিত ভগবানের স্বরূপ, প্রভাব, গুণ ও মহত্ত্বকে, তাঁর প্রাপ্তির উপায়কে এবং তার ফলকে সত্য মনে না করে তাকে অসম্ভব ও বিপরীত বলে ভাবা এবং তাকে শুধুমাত্র রোচক উক্তি মনে করা ইত্যাদি যে বিশ্বাসবিরুদ্ধ ভাবনা—সেগুলিই হল তাঁতে শ্রদ্ধা না করা।

প্রশ্ন—'**অশ্রদ্দধানাঃ**' পদ কোন্ শ্রেণীর মানুষদের বাচক ?

উত্তর—যারা ভগবানের স্বরূপ, গুণ, প্রভাব এবং মহত্ত্ব ইত্যাদিতে বিশ্বাস না রেখে উপরোক্ত ভক্তির কোনো সাধন করে না এবং নিজেদের দুর্লভ মনুষ্য জীবনকে ভোগ ও তার প্রাপ্তির বিবিধ উপায়েই বার্থ নষ্ট করে, তার বাচক এই '**অশ্রদ্দধানাঃ**' পদটি।

প্রশ্ন—শ্রদ্ধারহিত মানুষ আমাকে লাভ না করে মৃত্যুরূপ সংসার-চক্রে ভ্রমণ করে—এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর অভিপ্রায় হল, চুরাশী লক্ষ জন্মে আবর্তন কালে কখনো ভগবদ্‌কৃপায় জীব এই সংসারচক্র থেকে মুক্তি পেয়ে পরমেশ্বরকে লাভ করার জন্য মনুষ্যদেহ লাভ করে। ভগবদ্প্রাপ্তির অধিকারী এরূপ দুর্লভ মনুষ্যদেহ পেয়েও যারা ভগবৎ বচনে শ্রদ্ধা না রেখে ভজন-ধ্যান ইত্যাদি সাধন করে না, তারা ভগবানকে লাভ না করে সেই জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারচক্রে পূর্বের ন্যায় আবর্তিত হতে থাকে।

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে ভগবান যে বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের উপদেশ দেবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এবং যার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছিলেন, এবার সেটির বর্ণনার উপক্রমে তিনি প্রথমেই দুটি শ্লোকে প্রভাবসহ তাঁর অব্যক্তস্বরূপের বর্ণনা করেছেন—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥ ৪

আমার নিরাকার পরমাত্মরূপ দ্বারা এই সমগ্র জগৎ, জলের দ্বারা বরফের ন্যায়, পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে এবং সমস্ত প্রাণী আমাতেই অবস্থিত, কিন্তু বাস্তবে আমি সেগুলিতে স্থিত নই॥ ৪

প্রশ্ন—'**অব্যক্তমূর্তিনা**' পদ দ্বারা ভগবানের কোন্ স্বরূপ লক্ষ্য করা হয়েছে ?

উত্তর—অষ্টম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে যাঁকে '**অধিযজ্ঞ**', অষ্টম ও দশম শ্লোকে '**পরম দিব্যপুরুষ**', নবম শ্লোকে '**কবি**', '**পুরাণ**' ইত্যাদি, কুড়ি ও একুশতম শ্লোকে '**অব্যক্ত অক্ষর**' ও বাইশতম শ্লোকে ভক্তি দ্বারা প্রাপ্য '**পরম পুরুষ**' বলেছেন, সেই সর্বব্যাপী সগুণ-নিরাকার স্বরূপকে লক্ষ্য করে এখানে '**অব্যক্তমূর্তিনা**'

পদটির প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—'ইদম্' ও 'সর্বম্' বিশেষণের সঙ্গে 'জগৎ' পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—এই বিশেষণগুলির সঙ্গে 'জগৎ' পদ এখানে সম্পূর্ণ জড়-চেতন পদার্থসহ এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের বাচক।

প্রশ্ন—অব্যক্তমূর্তি ভগবানের দ্বারা সমগ্র জগৎ কীরূপে ব্যাপ্ত ?

উত্তর—যেমন আকাশের দ্বারা বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী ; স্বর্ণের দ্বারা অলংকার ও মৃত্তিকা দ্বারা প্রস্তুত বাসনে মৃত্তিকা ব্যাপ্ত থাকে, তেমনই এই সমগ্র জগৎ এটির সৃষ্টিকারী সগুণ পরমেশ্বরের নিরাকাররূপের দ্বারা ব্যাপ্ত। শ্রুতি বলেছেন—

ঈশা বাস্যমিদঁ সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

(ঈশোপনিষদ্ ১)

'এই জগতে যা কিছু জড়-চেতন পদার্থ সমুদায় আছে, তা সবই ঈশ্বর দ্বারা ব্যাপ্ত'।

প্রশ্ন—'সর্বভূতানি' পদ কীসের বাচক এবং এই সব ভূতকে (প্রাণীকে) ভগবানে স্থিত বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে 'ভূতানি' পদটি সমস্ত শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও তাদের বিষয় এবং নিবাসস্থান সহ সমস্ত চরাচর প্রাণীর বাচক। ভগবানই নিজ প্রকৃতিকে স্বীকার করে সমস্ত জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় সম্পন্ন করেন ; তিনিই তাঁর একাংশে এই সমস্ত জগৎ ধারণ করে রেখেছেন (১০।৪২), তিনিই সকলের একমাত্র গতি, ভর্তা, নিবাসস্থান, আশ্রয়, প্রভব, প্রলয়, স্থান ও নিধান (৯।১৮)। এই প্রকার সকলের স্থিতি ভগবানেরই অধীন। তাই সব প্রাণীকে ভগবানে স্থিত বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—যদি সমস্ত জগৎ ভগবান দ্বারা পরিপূর্ণ, তাহলে 'আমি ঐসব প্রাণীতে অবস্থিত নই'—এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—মেঘে আকাশের ন্যায় সমস্ত জগতের অণু-অণুতে পরিব্যাপ্ত হয়েও ভগবান তার থেকে সর্বতোভাবে অতীত ও সম্বন্ধরহিত। সমস্ত জগৎ বিনাশপ্রাপ্ত হলেও অর্থাৎ মেঘের বিনাশের পরে আকাশের ন্যায় ভগবান একই ভাবে বিরাজ করেন। জগৎ নাশ হলে ভগবানের নাশ হয় না এবং যেখানে এই জগতের অস্তিত্বই নেই, সেখানেও ভগবান স্বমহিমায় স্থিত। এই ভাব দেখাবার জন্যই ভগবান বলেছেন যে, বাস্তবে আমি ঐ প্রাণীগুলিতে স্থিত নই। অর্থাৎ আমি নিত্য নিজের মধ্যেই নিজে স্থিত রয়েছি।

প্রশ্ন—'আমি ঐ ভূতাদিতে স্থিত নই' ভগবানের এই কথার যদি নিম্নলিখিত ভাব মানা হয়, তাহলে আপত্তি কী ?

যেমন স্বপ্নে এই সব জীব ও পদার্থ স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তির অভ্যন্তরে হওয়ায় সেই ব্যক্তি সেগুলির মধ্যে সীমিত হয়ে স্থিত নন, সেগুলির বাইরেও থাকেন, তেমনই সমগ্র জগৎ ভগবানের এক অংশে স্থিত হওয়ায় ভগবান তার মধ্যে সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়েও তার মধ্যে সীমিত নন।

দ্বিতীয়তঃ, যেমন স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তির কাছে স্বপ্নের সব পদার্থ স্বপ্নাবস্থায় প্রত্যক্ষ বলে মনে হলেও স্বপ্নের ক্রিয়ার ও পদার্থের সঙ্গে বস্তুতঃ তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই—তিনি স্বপ্নের সৃষ্টি থেকে সর্বতোভাবে অতীত ও সম্বন্ধরহিত ; সেই ব্যক্তি স্বপ্নের আগেও ছিলেন, স্বপ্ন দেখার সময়ও ছিলেন এবং স্বপ্নের বিনাশ হলেও থাকবেন—তেমনই ভগবান সর্বদা বিরাজমান। সমগ্র জগৎ বিনাশ হলেও তাঁর বিনাশ হয় না। এমনকি যেখানে জগৎ নেই, সেখানেও তিনি নিজ মহিমাতে স্থিত। এইভাবে তার থেকে সর্বতোভাবে অতীত ও নির্লিপ্ত হওয়ায় তিনি তাতে স্থিত নয়।

তৃতীয়তঃ, স্বপ্নের সব পদার্থ যেমন প্রকৃতপক্ষে স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষের থেকে অভিন্ন ও তার স্বরূপ হওয়ায় তিনি তার মধ্যে নেই, বরং তিনি তিনিই, তেমনই সমস্ত জগৎও ভগবানের থেকে অভিন্ন এবং তাঁর স্বরূপই হওয়ায় তিনি তার মধ্যে স্থিত নন, তিনি তিনিই অর্থাৎ সবই তিনি স্বয়ং।

এইরূপে জগতের আধার এবং তা থেকে সর্বতোভাবে অতীত হওয়ায় এবং জগৎ তাঁরই স্বরূপ হওয়ায়, তিনি জগতে স্থিত নন। তাই ভগবান এখানে এই ভাব দেখিয়েছেন যে, আমি জগতের অণু অণুতে ব্যাপ্ত হয়েও বস্তুতঃ তাতে নেই— বরং নিজের মহিমাতেই অটলভাবে স্থিত।

উত্তর—কোনো আপত্তি নেই। অভেদজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই ভাবও ঠিক। কিন্তু এখানে তার প্রসঙ্গ নয়।

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ।। ৫

ভূত (প্রাণি)গণ আমাতে অবস্থিত নয় ; কিন্তু তুমি আমার ঈশ্বরীয় যোগশক্তি অবলোকন করো যে, এই ভূতসমূহের ধারক, পোষক ও সৃষ্টিকারী হয়েও আমার স্বরূপ বাস্তবে ভূতগণে স্থিত নয়।। ৫

প্রশ্ন—পূর্বশ্লোকে ভগবান সব প্রাণীকে নিজের মধ্যে অবস্থিত বলেছেন এবং এই শ্লোকে বলছেন যে এই সব প্রাণী আমাতে অবস্থিত নয়। এই বিরুদ্ধ উক্তির এখানে কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—এখানে এই বিরুদ্ধ উক্তি প্রয়োগ করে এবং সেই সঙ্গে অর্জুনকে তাঁর ঐশ্বরিক যোগশক্তি দেখতে বলে ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে, 'অর্জুন ! তুমি আমার অসাধারণ যোগশক্তি দেখো ! এ কি আশ্চর্য যে আকাশে মেঘের ন্যায় সমগ্র জগৎ আমাতে স্থিতও আবার স্থিত নয়ও। মেঘের আধার আকাশ কিন্তু মেঘ সর্বদা তাতে থাকে না। প্রকৃতপক্ষে অনিত্য হওয়ায় তার স্থির অস্তিত্বও নেই। সুতরাং তা আকাশে নেই। তেমনই এই সমগ্র জগৎ আমারই যোগশক্তির দ্বারা উৎপন্ন এবং আমিই এর আধার, তাই সব প্রাণীই আমাতে স্থিত ; কিন্তু এরূপ হলেও আমি এগুলির থেকে সর্বতোভাবে অতীত, এরা সর্বদা আমাতে থাকে না এবং এদের আমা ভিন্ন অস্তিত্ব নেই, তাই এসব আমাতে স্থিত নয়। অতএব যতক্ষণ মানুষের দৃষ্টিতে জগৎ বিরাজমান, ততক্ষণ সবকিছু আমাতেই আছে, আমা ভিন্ন জগতের আর কোনো দ্বিতীয় আধার নেই। যখন আমি প্রত্যক্ষভূত হই, তখন তার দৃষ্টিতে একমাত্র আমি ব্যতীত, অন্য কোনো বস্তু থাকে না, সেই সময় আমাতে এই জগৎ নেই।

প্রশ্ন— এই বিরুদ্ধ উক্তির দ্বারা ভগবানের নিম্ন-লিখিত অভিপ্রায় মেনে নিলে কী ক্ষতি ?

এই বিরুদ্ধ উক্তির দ্বারা ভগবান তাঁর পূর্ব-কথিত সিদ্ধান্তকেই সমর্থন জানাচ্ছেন। যখন স্বপ্নের জগতের ন্যায় সমগ্র জগৎ ভগবানের সংকল্পের আধারে অবস্থিত, বস্তুতঃ ভগবানের থেকে পৃথক কোনো অস্তিত্বই নেই, তখন একথা বলা ঠিক যে এসব প্রাণী আমাতে নেই। তাহলে এই সমগ্র জগৎ দৃশ্যমান হয় কীভাবে, এর রহস্য কী, এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য ভগবান বলেছেন 'হে অর্জুন ! এ আমার অসাধারণ যোগশক্তির ফল, দেখো ! কীরূপ আশ্চর্য ! সমগ্র জগৎ আমাতেই দর্শিত হয়, বস্তুতঃ আমি ছাড়া আর কিছুই নেই।' অভিপ্রায় হল যে যতদিন মানুষের দৃষ্টিতে জগৎ থাকে, ততদিন সব কিছু আমাতেই অবস্থিত, আমি ব্যতীত এই জগতের অন্য কোনো আধারই নেই। প্রকৃতপক্ষে আমিই সব, আমাকে ছাড়া অন্য কিছুই নেই। সাধক যখন আমাকে প্রত্যক্ষ করেন, তখন তার এই বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় ; তখন তাঁর দৃষ্টিতে আমি ভিন্ন আর কোনো বস্তুই থাকে না। তাই এই সব প্রাণী বস্তুতঃ আমাতে অবস্থিত নয়।

উত্তর—কোনো দোষ নেই। অভেদজ্ঞানের দৃষ্টিতে এ কথা ঠিকই। কিন্তু এখানে তার প্রসঙ্গ নয়।

প্রশ্ন—'ঐশ্বরম্' ও 'যোগম্' পদ কীসের বাচক ? এবং তা দেখতে বলে ভগবান এই শ্লোকে কোন্ বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে বলেছেন ?

উত্তর—সকলের উৎপাদক, সবেতে ব্যাপ্ত থেকে এবং সকলের ধারণ-পোষণ করেও সবের থেকে সর্বদা নির্লিপ্ত থাকার যে অদ্ভুত প্রভাবময় শক্তি, যা ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কারোর হতে পারে না, তাকেই এখানে **'ঐশ্বরম্ যোগম্'**—এই পদ দ্বারা প্রতিপাদন করা হয়েছে। এই দুটি শ্লোকে কথিত সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে ভগবান অর্জুনকে তাঁর **'ঈশ্বরীয় যোগ'** দেখতে বলেছেন।

প্রশ্ন—'ভূতভৃৎ' এবং 'ভূতভাবনঃ'—এই দুটি পদের অভিপ্রায় কী ? **'মম আত্মা'** পদ কীসের বাচক এবং **'ভূতস্থঃ ন'** কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যিনি প্রাণীদের ভরণ পোষণ করেন, তাঁকে 'ভূতভৃৎ' বলা হয় এবং যিনি ভূতেদের (প্রাণিদের) উৎপন্ন করেন, তাঁকে 'ভূতভাবন' বলা হয়। **'মম আত্মা'**র দ্বারা ভগবানের সগুণ নিরাকার স্বরূপ নির্দেশ করা হয়েছে। তাৎপর্য হল যে ভগবানের এই সগুণ নিরাকার স্বরূপ থেকেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও

তার ধারণ-পোষণ হয় ; তাই তাকে 'ভূতভাবন' এবং 'ভূতভৃৎ' বলা হয়। এত কিছু হলেও ভগবান যে বাস্তবে এই সমগ্র জগতের অতীত, সেটি দেখাবার জন্য 'ভূতস্থঃ ন' (তিনি ভূতাদিতে স্থিত নন) বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ—পূর্বশ্লোকে ভগবান সমস্ত ভূত (প্রাণী)-কে তাঁর অব্যক্তরূপের দ্বারা ব্যাপ্ত ও তাতে স্থিত বলেছেন। সুতরাং সেই বিষয়টি স্পষ্টরূপে জানার আগ্রহ হওয়ায় এবার দৃষ্টান্ত সহযোগে ভগবান তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন—

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্।
তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥ ৬

যেমন আকাশ হতে উৎপন্ন সর্বত্র বিচরণকারী মহাবায়ু সর্বদা আকাশেই অবস্থান করে, তেমনই আমার সংকল্প থেকে উৎপন্ন হওয়ায় সমস্ত ভূত আমাতেই অবস্থিত বলে জানবে॥ ৬

প্রশ্ন—এখানে বায়ুকে **'সর্বত্রগ'** ও **'মহান'** বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভূতপ্রাণীদের সঙ্গে বায়ুর সাদৃশ্য দেখাবার জন্য তাকে 'সর্বত্রগ' ও 'মহান' বলা হয়েছে। অর্থাৎ বায়ু যেমন সর্বত্র বিচরণ করে থাকে, তেমনই সর্বভূত প্রাণীও নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করে এবং বায়ু যেমন 'মহান' অর্থাৎ অতি বিস্তৃত, তেমনই ভূতপ্রাণীও বহু বিস্তারসম্পন্ন হয়।

প্রশ্ন—এখানে **'নিত্যম্'** পদ প্রয়োগ করে বায়ুকে সদা আকাশে স্থিত বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—বায়ু আকাশ থেকে উৎপন্ন হয়, আকাশেই স্থিত এবং আকাশেই লীন হয়ে যায়—এই ভাব দেখাবার জন্য **'নিত্যম্'** পদের প্রয়োগ করা হয়েছে। অর্থাৎ সর্বাবস্থায় এবং সর্বসময় আকাশই হল বায়ুর আধার।

প্রশ্ন—বায়ু যেমন আকাশে স্থিত, তেমনই সর্বভূত আমাতে স্থিত—এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—আকাশের ন্যায় ভগবানকে সম, নিরাকার, অকর্তা, অনন্ত, আসক্তিহীন এবং নির্বিকার ও বায়ুর ন্যায় সমগ্র চরাচর প্রাণী ভগবানের থেকেই উৎপন্ন, তাঁতেই স্থিত এবং তাঁর মধ্যেই লীন হবে—এটা বোঝানোর জন্য একথা বলা হয়েছে। যেমন বায়ুর উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় আকাশেই হওয়ায় তার কখনো কোনো অবস্থাতে আকাশ থেকে আলাদা থাকা সম্ভব নয়, বায়ু সর্বদা আকাশেই অবস্থান করে এবং তা সত্ত্বেও আকাশের কিন্তু বায়ুর এবং তার আসা-যাওয়ার সঙ্গে কোনোই সম্বন্ধ নেই, সে সর্বদাই তার অতীত, তেমনই সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় ভগবানের সংকল্পের ফলে হওয়ায় সমস্ত ভূত-প্রাণী-সমূহ সদা ভগবানেই অবস্থান করে ; তবুও ভগবান সেই প্রাণীসমূহের সর্বতোভাবে অতীত এবং তিনি সর্বদাই সর্বপ্রকারের বিকার থেকে রহিত।

সম্বন্ধ—বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান এই পর্যন্ত প্রভাবসহ তাঁর নিরাকার স্বরূপের তত্ত্ব বোঝাবার জন্য নিজের ব্যাপকতা, আসক্তিহীনতা, নির্বিকারতা প্রতিপাদন করেছেন। এবার তাঁর ভূতভাবন স্বরূপ স্পষ্টভাবে জানাতে জগৎ-সৃষ্টির কর্ম-তত্ত্ব বোঝাবার জন্য প্রথম দুটি শ্লোকে কল্পের অন্তে সর্বভূতের প্রলয় ও কল্পের আদিতে তাদের উৎপত্তির প্রকার জানাচ্ছেন—

সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥ ৭

হে অর্জুন ! কল্পের শেষে সমস্ত প্রাণী আমার প্রকৃতিতে বিলীন হয় এবং কল্পের আরম্ভে আমি পুনরায় তাদের সৃষ্টি করি॥ ৭

প্রশ্ন—'কল্পক্ষয়' কোন্ সময়ের বাচক ?

উত্তর—ব্রহ্মার এক দিনকে 'কল্প' বলা হয় আর ততটাই বড় তাঁর রাত্রি। এই অহোরাত্রের হিসাবে ব্রহ্মার যখন শত বৎসর পূর্ণ হয়ে ব্রহ্মার আয়ু শেষ হয়ে যায়, সেই কালের বাচক এই **'কল্পক্ষয়'** পদটি ; সেটিই কল্পের শেষ। একেই বলা হয় **'মহাপ্রলয়'**।

প্রশ্ন—'সর্বভূতানি' পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, সমস্ত ভোগ্যবস্তু ও বাসস্থানসহ চরাচর প্রাণীদের বাচক হল **'সর্বভূতানি'** পদটি।

প্রশ্ন—'প্রকৃতিম্' পদ কীসের বাচক ? তার সঙ্গে **'মামিকাম্'** বিশেষণ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ? সেই প্রকৃতিকে প্রাপ্ত করা কীরূপ ?

উত্তর— সমস্ত জগতের কারণভূত যে মূলপ্রকৃতি, যাকে চতুর্দশ অধ্যায়ের তৃতীয়-চতুর্থ শ্লোকে **'মহদ্ব্রহ্ম'** বলা হয়েছে এবং যাকে অব্যাকৃত বা প্রধানও বলা হয়, তার বাচক হল এখানে **'প্রকৃতিম্'** পদটি। এই প্রকৃতি ভগবানের শক্তি, এই বিষয়টি লক্ষ্য করানোর জন্য এর সঙ্গে **'মামিকাম্'** বিশেষণ দেওয়া হয়েছে। কল্পের অন্তে সমস্ত শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, ভোগসামগ্রী ও লোকাদি সহ সমস্ত প্রাণীর প্রকৃতিতে লয় হওয়া— অর্থাৎ তাদের গুণ-কর্মাদির সংস্কার-সমুদয়রূপ কারণ-শরীর-সহ মূল প্রকৃতিতে বিলীন হয়ে যাওয়াই 'সর্বভূতের প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হওয়া' বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—অষ্টম অধ্যায়ের আঠারো ও উনিশতম শ্লোকে যে 'অব্যক্ত' দ্বারা সর্বভূতের উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে এবং যাতে সবকিছু লয় হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেই 'অব্যক্ত'তে এবং এই প্রকৃতিতে কী পার্থক্য ? ওখানকার লয় ও এখানকার লয়ে কী তফাৎ ?

উত্তর—ওখানে 'অব্যক্ত' শব্দ প্রকৃতির নিরাকার — সূক্ষ্ম স্বরূপের বাচক, মূল প্রকৃতির নয়। তাতে সমস্ত ভূত 'সূক্ষ্ম-শরীরের' সঙ্গে লীন হয়, এবং এখানে 'কারণ শরীরে'র সঙ্গে লীন হয়। ওখানে ব্রহ্মা লীন হন না, তিনি শয়ন করেন ; কিন্তু এখানে স্বয়ং ব্রহ্মাও লীন হয়ে যান। এইরূপ ওখানকার প্রলয়ে এবং এখানকার মহাপ্রলয়ে অনেক পার্থক্য রয়েছে।

প্রশ্ন—সপ্তম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে ভগবান সমস্ত জগতের **'প্রলয়'** স্বয়ং নিজেকে বলে জানিয়েছেন এবং এখানে সব প্রকৃতিতে লীন হওয়া বলেছেন, এই দুটির মধ্যে কোন্ কথাটি ঠিক ?

উত্তর—দুটিই ঠিক। বস্তুতঃ উভয় স্থানে এক কথাই বলা হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছিল যে প্রকৃতি ভগবানের শক্তি এবং শক্তি কখনো শক্তিমান থেকে আলাদা হয় না। অতএব প্রকৃতিতে লয় হওয়া হল ভগবানেই লয় হওয়া। তাই এইখানে প্রকৃতিতে লীন হওয়া বলা হয়েছে এবং প্রকৃতি ভগবানেরই এবং তা ভগবানেই অবস্থিত, তাই ভগবানই সমস্ত জগতের প্রলয়স্থান। এইভাবে দুটির অভিপ্রায় একই।

প্রশ্ন—'কল্পাদি' শব্দ কোন্ সময়ের বাচক এবং সেই সময় ভগবানের সর্ব ভূতের সৃষ্টি করা কীরূপ ?

উত্তর—কল্পের শেষ হওয়ার পর অর্থাৎ ব্রহ্মার শত-বৎসর পূর্ণ হলে যখন পুনরায় জীবেদের কর্মফল ভোগ করানোর জন্য ভগবানের জগৎ সৃষ্টি করার ইচ্ছা হয়, সেই কালের বাচক হল 'কল্পাদি' শব্দ। একে মহাসর্গের আদিও বলা হয়। ঐ সময় সর্বভূতের উৎপত্তির জন্য ভগবানের নিজ সংকল্প দ্বারা হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকে তাঁর লোক-সহ উৎপন্ন করা হল তাঁর সর্বভূতের সৃষ্টি করা।

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥ ৮

নিজ প্রকৃতিকে বশীভূত করে নিজ নিজ স্বভাবের বশীভূত এই ভূতসমুদায়কে আমি বারংবার তাদের কর্ম অনুযায়ী সৃষ্টি করি॥ ৮

প্রশ্ন—'**স্বাম্**' বিশেষণের সঙ্গে '**প্রকৃতিম্**' পদ কীসের বাচক ? ভগবানের তা অঙ্গীকার (স্বীকার) করা কীরূপ ?

উত্তর—আগের শ্লোকে সর্বভূতের যে মূল প্রকৃতিতে লয় হবার কথা বলা হয়েছে, তারই বাচক এখানে '**স্বাম্**' বিশেষণের সঙ্গে '**প্রকৃতিম্**' পদটি। জগৎ সৃষ্টির জন্য ভগবানকে শক্তিরূপে নিজের মধ্যে স্থিত যে প্রকৃতিকে স্মরণ করা হয়, তাই হল তাঁকে স্বীকার করা।

প্রশ্ন—'**ইমম্**' এবং '**কৃৎস্নম্**' বিশেষণের সঙ্গে '**ভূতগ্রামম্**' পদ কীসের বাচক এবং তার স্বভাবের বশে বশীভূত হওয়া কীরূপ ?

উত্তর—প্রথমে '**সর্বভূতানি**' নামে যার বর্ণনা করা হয়েছে, সেই সমগ্র ভূতসমুদায়ের বাচক হল '**ইমম্**' ও '**কৃৎস্নম্**' বিশেষণের সঙ্গে '**ভূতগ্রামম্**' পদটি। ঐ ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীদের যে নিজ-নিজ গুণ ও কর্মানুসারে স্বভাব নির্মিত হয়, সেটিই তাদের প্রকৃতি। ভগবানের প্রকৃতি সমষ্টি প্রকৃতি এবং জীবেদের প্রকৃতি তাঁর এক অংশভূত ব্যষ্টি-প্রকৃতি। সেই ব্যষ্টি প্রকৃতির বন্ধনে পড়ে থাকাই হল তাদের নিজ নিজ স্বভাবের বশে বশীভূত হওয়া।

যে ব্যক্তি ভগবানের শরণ গ্রহণ করে ঐ প্রকৃতির বন্ধন ছেদন করেন, তিনি তার বশে থাকেন না (৭।১৪), তিনি প্রকৃতির অতীত ভগবানের কাছে পৌঁছে ভগবানকে লাভ করেন।

প্রশ্ন—এখানে '**পুনঃ**' পদের দুবার প্রয়োগ করার ও '**বিসৃজামি**' পদটি প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'**পুনঃ**' পদটি দুবার প্রয়োগ করে ও '**বিসৃজামি**' পদ দ্বারা ভগবান দেখিয়েছেন যে, জীব যতক্ষণ নিজ প্রকৃতির বশীভূত থাকে, ততক্ষণ আমি তাকে বারংবার এইভাবে প্রত্যেক কল্পের আদিতে তার ভিন্ন ভিন্ন গুণকর্ম অনুসারে তাকে নানা যোনিতে উৎপন্ন করে থাকি।

সম্বন্ধ—এইরূপ জগৎ-সৃষ্টির সমস্ত কর্ম করেও কেন সেইসব কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না, এখন এই তত্ত্ব বোঝানোর জন্য ভগবান বলেছেন—

ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু॥ ৯

হে ধনঞ্জয় ! অনাসক্ত এবং উদাসীন সদৃশ অবস্থান করায় আমাকে, সেই সকল কর্ম আবদ্ধ করতে পারে না॥ ৯

প্রশ্ন—'ঐ কর্মাদি'র দ্বারা কোন্ কর্মগুলিকে লক্ষ্য করা হয়েছে এবং তাতে ভগবানের 'অনাসক্ত ও উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করা' কী ?

উত্তর—সমগ্র জগতের উৎপত্তি, পালন ও সংহার আদির জন্য ভগবান যত প্রচেষ্টা করেন, যা পূর্ব শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে, 'ঐ কর্মাদি'-র দ্বারা এখানে সেই সব কর্মপ্রচেষ্টাই লক্ষ্য। ভগবানের ঐসব কর্মে বা তার ফলে কোনোরূপ আসক্ত না হওয়া হল 'অনাসক্ত থাকা' এবং ভগবানের অধ্যক্ষতা বা অধিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকৃতির দ্বারা প্রাণিগণের গুণ-কর্মানুসারে তাদের উৎপত্তি আদির চেষ্টায় তাঁর কর্তৃত্বাভিমানশূণ্যতা তথা পক্ষপাতশূন্য হয়ে নির্লিপ্ত থাকা হল তাঁর সেই সকল কর্মে 'উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করা'।

প্রশ্ন—ভগবান যে নিজেকে 'আসক্তিরহিত' (অনাসক্ত) এবং 'উদাসীনের ন্যায় স্থিত' বলেছেন এবং বলেছেন যে এই সব কর্ম আমাকে আবদ্ধ করে না, এর অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান বলতে চেয়েছেন যে কর্ম এবং তার ফলে আসক্ত না হয়ে এবং তাতে কর্তৃত্বাভিমান এবং পক্ষপাত বর্জিত হওয়ার জন্যই এই সব কর্ম আমার বন্ধনকারক হয় না।

অন্য সকলের জন্যও জন্ম-মৃত্যু, হর্ষ-বিষাদ ও সুখ-দুঃখাদি কর্মফলরূপ বন্ধন থেকে মুক্ত হবার এটিই সহজ উপায়। যে ব্যক্তি এই তত্ত্ব জেনে এইভাবে কর্তৃত্বাভিমান ও ফলাসক্তিরহিত হয়ে কর্ম করেন, তিনিও অনায়াসে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান।

সম্বন্ধ—'উদাসীনবদাসীনম্' এই পদের দ্বারা ভগবান যে কর্তৃত্বাভিমানের অভাব দেখিয়েছেন, সেটিই স্পষ্ট করার জন্য এবারে বলছেন—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে॥ ১০

হে কৌন্তেয় ! আমার অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি এই সমগ্র চরাচর জগৎ সৃষ্টি করে এবং এই জন্যই জগৎ-চক্র আবর্তিত হয় ॥ ১০

প্রশ্ন—'ময়া' পদের সঙ্গে '**অধ্যক্ষেণ**' বিশেষণ প্রয়োগের তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এটির প্রয়োগে ভগবানের এই তাৎপর্য যে, জগৎ-সৃষ্টি করার সময় আমি শুধু নিজ প্রকৃতির অস্তিত্ব-স্ফূর্তি প্রদানকারী অধিষ্ঠাতা রূপে অবস্থান করি এবং আমার অধ্যক্ষতায় অস্তিত্ব ও স্ফূর্তি লাভ করে আমার প্রকৃতিই জগৎ-সৃষ্টি ইত্যাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করে।

প্রশ্ন—ভগবানের অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি সচরাচর জগৎকে কীভাবে উৎপন্ন করেন ?

উত্তর—কৃষক যে ভাবে তার অধ্যক্ষতায় পৃথিবীর সঙ্গে স্বয়ং বীজের সম্বন্ধ করায় এবং তারপর পৃথিবী সেই বীজ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন গাছ উৎপন্ন করে, তেমনই ভগবান তাঁর অধ্যক্ষতায় চেতনসমূহরূপ বীজের সঙ্গে প্রকৃতিরূপ ভূমির সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়ে দেন (১৪।৩)। এইভাবে জড়-চেতনের সংযোগ হওয়ার পর এই প্রকৃতি সমগ্র চরাচর জগৎকে কর্মানুসারে বিভিন্ন যোনিতে উৎপন্ন করে।

শুধু বোঝাবার জন্যই এই দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, বস্তুতঃ ভগবানের ক্ষেত্রে এই উদাহরণ পুরোপুরি প্রযোজ্য হয় না—কারণ কৃষক অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তি এবং একদেশীয়, সে নিজ শক্তি দিয়ে জমি থেকে কিছু করতে পারে না। কিন্তু ভগবান সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও সর্বব্যাপী এবং তাঁরই শক্তি ও অস্তিত্ব-স্ফূর্তি লাভ করে প্রকৃতি সমগ্র জগৎ উৎপন্ন করে।

প্রশ্ন—এই হেতুতেই সংসার-চক্র আবর্তিত হয়, এর অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবানের বক্তব্য হল, ভগবানের অধ্যক্ষতা ও প্রকৃতির কর্তৃত্ব—এই দুটির দ্বারা চরাচরসহ সমগ্র জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার ইত্যাদি সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে।

প্রশ্ন—চতুর্দশ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে এবং এই অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে 'আমি এই ভূতপ্রাণিদের ভিন্ন ভিন্ন রূপে সৃষ্টি করি' আর এই শ্লোকে বলেছেন যে, 'চরাচর প্রাণীসহ সমস্ত জগৎ প্রকৃতি সৃষ্টি করে।' এই দুপ্রকারের বর্ণনার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভগবান যেখানে নিজেকে জগতের সৃষ্টিকর্তা বলেছেন, সেখানে একথা বুঝে নিতে হবে যে ভগবান প্রকৃতপক্ষে নিজে কিছু করেন না, তিনি তাঁর শক্তি প্রকৃতিকে অঙ্গীকার করে তার দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন এবং যেখানে প্রকৃতিকে জগৎ-সৃষ্টিকারী বলা হয়েছে, সেখানে সেই সঙ্গে একথাও বুঝে নিতে হবে যে, ভগবানের অধ্যক্ষতায়, তাঁর থেকে অস্তিত্ব (সত্তা) ও স্ফূর্তি লাভ করেই প্রকৃতি সবকিছু রচনা করে। যতক্ষণ প্রকৃতি ভগবানের সহায়তা না পায়, ততক্ষণ সেই জড় প্রকৃতি কিছুই করতে সক্ষম নয়। তাই অষ্টম শ্লোকে বলা হয়েছে যে 'আমি নিজ প্রকৃতিকে স্বীকার (অঙ্গীকার) করে জগৎ-সৃষ্টি করি' এবং এই শ্লোকে বলেছেন যে 'আমার অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি জগৎ-সৃষ্টি করে।' প্রকৃতপক্ষে দুপ্রকারের যুক্তির মাধ্যমে একই তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে।

সম্বন্ধ—নিজ প্রতিজ্ঞা অনুসারে বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শ্লোক পর্যন্ত প্রভাব সহ সগুণ-নিরাকার স্বরূপের তত্ত্ব স্পষ্ট করেছেন। তারপর সপ্তম থেকে দশম শ্লোক পর্যন্ত জগৎ-সৃষ্টি আদি সকল কর্মে নিজের অনাসক্তি ও নির্বিকারত্ব দেখিয়ে সেই কর্মগুলির দিব্যতার তত্ত্ব বলেছেন। এবার নিজ সগুণ-সাকার

রূপের মহত্ত্ব, ভক্তির প্রকার, গুণ ও প্রভাবের তত্ত্ব বোঝাবার জন্য প্রথম দুটি শ্লোকে তাঁর প্রভাব না জানা আসুর-প্রকৃতির মানুষদের নিন্দা করেছেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ ১১

আমার পরমভাবকে না জেনে মূঢ় মনুষ্য-দেহধারীগণ, সর্বভূতের মহেশ্বর আমাকে অবজ্ঞা করে অর্থাৎ নিজ যোগমায়ার দ্বারা সংসারের উদ্ধারের জন্য মনুষ্যরূপে বিচরণশীল পরমেশ্বরকে (আমাকে), সাধারণ মানুষ বলে মনে করে॥ ১১

প্রশ্ন—'পরম্' বিশেষণের সঙ্গে 'ভাবম্' পদ কীসের বাচক এবং তাঁকে না জানা কী?

উত্তর—চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শ্লোক পর্যন্ত ভগবানের যে 'সর্বব্যাপকত্ব' ইত্যাদি প্রভাবের বর্ণনা করা হয়েছে —যাকে 'ঈশ্বর যোগ' বলা হয় এবং সপ্তম অধ্যায়ের চব্বিশতম শ্লোকে যে 'পরমভাব'কে না জানার কথা বলেছেন, ভগবানের সেই সর্বোত্তম প্রভাবেরই বাচক এই 'পরম্' বিশেষণের সঙ্গে 'ভাবম্' পদটি। সর্বাধার, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান এবং সকলের হর্তা-কর্তা পরমেশ্বরই সব জীবকে অনুগ্রহ করে তাঁর শরণ প্রদান করার জন্য ও ধর্ম-সংস্থাপন, ভক্ত উদ্ধার ইত্যাদি বহু লীলা-কার্য করার জন্য নিজ যোগমায়ার দ্বারা মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন (৪।৬, ৭, ৮)—এই রহস্য না বোঝা ও এতে বিশ্বাস না করাই হল সেই পরম ভাবকে না জানা।

প্রশ্ন—'মূঢ়াঃ' পদ কোন্ শ্রেণীর মানুষদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে এবং তাদের দ্বারা মনুষ্যদেহে অবতীর্ণ ভূতমহেশ্বর ভগবানের অবজ্ঞা করা কী?

উত্তর—পরের শ্লোকে যাদের রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতির আশ্রিত বলা হয়েছে, সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে যা বর্ণিত হয়েছে এবং ষোড়শ অধ্যায়ের চতুর্থ ও সপ্তম থেকে বিশতম শ্লোক পর্যন্ত যাদের বিবিধ লক্ষণ বলা হয়েছে, সেই আসুরীভাবযুক্ত মানুষদের জন্য 'মূঢ়াঃ' পদ প্রযুক্ত হয়েছে। ভগবানের উপরোক্ত প্রভাব না জানায়, ব্রহ্মা থেকে কীট-পতঙ্গ সমস্ত প্রাণীর মহা ঈশ্বর ভগবানকে নিজেরই মতো এক সাধারণ মানুষ ভাবা এবং সেইজন্য তাঁর আদেশাদি পালন না করা ও তাঁর ওপর অবিরাম দোষারোপ করা—এই হল তাঁকে অবজ্ঞা করা[১]।

মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥ ১২

[১]পিতামহ ভীষ্ম, দুর্যোধনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে ব্রহ্মা ও দেবতাদের এক সংবাদ শুনিয়েছিলেন, তার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবের কথা জানা যায়। ব্রহ্মা দেবতাদের সাবধান করে বলেছেন—'সর্ব লোকের মহা ঈশ্বর ভগবান বাসুদেব তোমাদের পূজনীয়। তিনি মহা বীর্যবান, শঙ্খ, চক্র, গদাধারী বাসুদেব, তাঁকে মানুষ মনে করে অবজ্ঞা করবে না। তিনি পরম গুহ্য, পরম পদ, পরম ব্রহ্ম ও পরম যশঃস্বরূপ। তিনিই অক্ষর, অব্যক্ত, সনাতন, পরম তেজ, পরম সুখ ও পরম সত্য। দেবতা, ইন্দ্র, মানুষ—কারোরই এই অমিতপরাক্রমী প্রভু বাসুদেবকে মানুষ ভেবে অনাদর করা উচিত নয়। যেসকল মূঢ়মতি সেই হৃষিকেশকে মানুষ বলে, তারা নরাধম। যারা এই মহাত্মা যোগেশ্বরকে মনুষ্য- দেহধারী ভেবে অনাদর করে ও যারা এই বিশ্বের আত্মা শ্রীবৎস চিহ্নধারী মহাতেজস্বী পদ্মনাভ ভগবানকে জানে না, তারা তামসিক প্রকৃতিসম্পন্ন। যারা এই কৌস্তুভ কিরীটধারী ও মিত্রদের অভয়প্রদানকারী ভগবানকে অপমান করে, তারা অত্যন্ত ভয়ানক নরকে পতিত হয়।

এবং বিদিত্বা তত্ত্বার্থং লোকানামীশ্বরেশ্বরঃ।
বাসুদেবো নমস্কার্যঃ সর্বলোকৈঃ সুরোত্তমাঃ॥ (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ৬৬।২৩)

'হে শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ! এইরূপে তাঁর তাত্ত্বিক স্বরূপ জেনে সর্বলোকের ঈশ্বরেরও ঈশ্বর ভগবান বাসুদেবকে সকলের প্রণাম করা উচিত।'

ব্যর্থ আশা, ব্যর্থ কর্ম ও ব্যর্থ জ্ঞান-সম্পন্ন অবিবেকীগণ রাক্ষসী, আসুরী এবং মোহিনী প্রকৃতিকে ধারণ করে থাকে।। ১২

প্রশ্ন—'মোঘাশাঃ' পদের অর্থ কী ?

উত্তর—যারা ব্যর্থ আশা (কামনা) পোষণ করে, তাদের বলা হয় **'মোঘাশাঃ'**। ভগবানের প্রভাব না জানা আসুরী মানুষ এরূপ অর্থহীন আশা পোষণ করে থাকে, যা কখনো পূর্ণ হয় না (১৬।১০-১২) তাই তাদের **'মোঘাশাঃ'** বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—'মোঘকর্মাণঃ' পদের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যাদের যজ্ঞ, দান, তপ ইত্যাদি সমস্ত কর্ম ব্যর্থ হয়—শাস্ত্রোক্ত ফলপ্রদানকারী না হয়, তাদের **'মোঘকর্মাণঃ'** বলা হয়। ভগবান ও শাস্ত্রে অবিশ্বাসী, বিষয়ী পামর ব্যক্তিরা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে অশ্রদ্ধাপূর্বক ইচ্ছামতো যে যজ্ঞাদি কর্ম করে, সেই কর্মগুলি তাদের ইহলোক বা পরলোকে কোথাও ফলদায়ক হয় না। তাই তাদের **'মোঘকর্মাণঃ'** বলা হয়েছে (১৬।১৭, ২৩ ; ১৭।২৮)।

প্রশ্ন—'মোঘজ্ঞানাঃ' পদের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যাদের জ্ঞান ব্যর্থ, তাত্ত্বিক অর্থ শূন্য এবং যুক্তিশূন্য (১৮।২২), তাদের বলা হয় **'মোঘজ্ঞানাঃ'**। ভগবানের প্রভাব না জানা মানুষ জাগতিক ভোগকে সত্য ও সুখপ্রদ মনে করে তারই পরায়ণ হয়ে থাকে। তারা ভ্রমবশতঃ মনে করে যে এই ভোগকে ভোগ করাই হল পরম সুখ, এর থেকে বড় আর কিছুই নেই (১৬।১১)। সেইজন্য তারা যথার্থ সুখ থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। তাই তাদের **'মোঘজ্ঞানাঃ'** বলা হয়েছে। এইসব ব্যক্তি নিজ জ্ঞানশক্তির অপব্যবহার করে তাকে বৃথাই নষ্ট করে।

প্রশ্ন—'বিচেতসঃ' পদটির কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—যাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত, জগতের বিভিন্ন বস্তুতে আসক্ত থাকায় অস্থির চিত্ত, তাদের বলা হয়েছে **'বিচেতসঃ'**। আসুরী প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের মন প্রতি-মুহূর্ত নানাপ্রকার কল্পনায় মগ্ন থাকে (১৬।১৩-১৬)। তাই তাদের **'বিচেতসঃ'** বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—'রাক্ষসীম্', 'আসুরীম্' ও 'মোহিনীম্'—এই সব বিশেষণের সঙ্গে **'প্রকৃতিম্'** পদটি প্রয়োগের কী তাৎপর্য এবং সেটি ধারণ করে থাকা কী ?

উত্তর—রাক্ষসদের ন্যায় অকারণে দ্বেষ করে অন্যের অনিষ্ট করার ও তাদের কষ্ট দেওয়া যাদের স্বভাব থাকে, তারা হল 'রাক্ষসী প্রকৃতি'। কাম ও লোভের বশে নিজ স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে অপরকে কষ্ট দেওয়া এবং তাদের স্বত্বহরণ করার যে স্বভাব, তাকে বলা হয় 'আসুরী প্রকৃতি'। প্রমাদ ও মোহবশতঃ কোনো প্রাণীকে দুঃখ দেওয়ার যে স্বভাব তাকে বলা হয় 'মোহিনী প্রকৃতি'। এরূপ দুষ্ট স্বভাব ত্যাগ করার কোনো চেষ্টা না করে সেটিকে ভালো মনে করে ধরে রাখাই হল এগুলিকে ধারণ করা। ভগবানের প্রভাব না জানা মানুষ প্রায়শঃ এরূপই করে থাকে, তাই তাদের উক্ত প্রকৃতিসমূহের আশ্রিত বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে **'এব'** প্রয়োগের তাৎপর্য কী ?

উত্তর—**'এব'** দ্বারা এই ভাব দেখানো হয়েছে যে, তারা এরূপ আসুরী স্বভাবেরই আশ্রিত থাকে, দৈবী প্রকৃতির আশ্রয় কখনো গ্রহণ করে না।

সম্বন্ধ—ভগবানের প্রভাব না জানা আসুরী প্রকৃতির মানুষদের নিন্দা করে এবার সগুণরূপ ভক্তির তত্ত্ব অবগত করানোর জন্য ভগবানের প্রভাব জানা, দৈবী প্রকৃতির আশ্রিত, উচ্চ শ্রেণীর অনন্য ভক্তদের লক্ষণ জানাচ্ছেন—

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্।। ১৩

কিন্তু হে কুন্তীপুত্র ! দৈবীপ্রকৃতি আশ্রিত মহাত্মাগণ আমাকে সর্বভূতের (প্রাণীর) সনাতন কারণ এবং অবিনাশী, অক্ষরস্বরূপ জেনে অনন্যচিত্তে নিরন্তর আমার ভজনা করেন।। ১৩

প্রশ্ন—এখানে 'তু' প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—একাদশ ও দ্বাদশ শ্লোকে যে নিম্নশ্রেণীর মূঢ় ও আসুর মানুষদের বর্ণনা করা হয়েছে, তাদের থেকে সর্বতোভাবে বিশিষ্ট উচ্চ শ্রেণীর পুরুষদের এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে—এই ভাব দেখাবার জন্য এখানে 'তু' পদটির প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—'দৈবীম্' বিশেষণের সঙ্গে 'প্রকৃতিম্' পদ কীসের বাচক এবং 'তার আশ্রিত হওয়া' কী ?

উত্তর—দৈব অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধিত এবং তাঁকে লাভ করা যায় যে সাত্ত্বিক গুণ ও আচরণের দ্বারা— ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথম থেকে তৃতীয় শ্লোক পর্যন্ত যা অভয় ইত্যাদি ছাব্বিশটি গুণরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, সেই সবের বাচক হল এখানে 'দৈবীম্' বিশেষণের সঙ্গে 'প্রকৃতিম্' পদটি। সেগুলিকে ভালোভাবে আশ্রয় করে থাকাই হল 'দৈবী প্রকৃতির আশ্রিত হওয়া'।

প্রশ্ন—'মহাত্মানঃ' পদের প্রয়োগ কোন্ শ্রেণীর পুরুষদের জন্য করা হয়েছে ?

উত্তর—যাঁর আত্মা মহান, তাঁকে 'মহাত্মা' বলা হয়। মহান আত্মা তিনিই, যিনি মহান লক্ষ্য অর্থাৎ ঈশ্বর লাভের জন্য সর্বতোভাবে প্রয়াসশীল। তাই এখানে 'মহাত্মানঃ' পদের প্রয়োগ সেই নিষ্কাম অনন্যপ্রেমিক ভগবদ্ভক্তদের জন্য করা হয়েছে, যিনি ভগবৎপ্রেমে সর্বদাই মাতোয়ারা এবং সর্বতোভাবে ঈশ্বরলাভের উপযুক্ত।

প্রশ্ন—এখানে 'মাম্' পদ ভগবানের কোন্ রূপের বাচক এবং তাঁকে 'সর্বভূতের আদি' ও 'অবিনাশী' বলতে কী বোঝায় ?

উত্তর—'মাম্' পদটি এখানে ভগবানের সগুণ পুরুষোত্তমরূপের বাচক। সেই সগুণ পরমেশ্বর হতেই শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, ভোগসামগ্রী ও সম্পূর্ণ লোকাদি সহ সমস্ত চরাচরের প্রাণীর উৎপত্তি, পালন ও সংহার হয়ে থাকে (৭।৬ ; ৯।১৮ ; ১০।২ ; ৪, ৫, ৬, ৮)—এই তত্ত্ব সঠিকভাবে বুঝে নেওয়াই হল ভগবানকে 'সর্ব ভূতের আদি' বলে জানা। ভগবান অজ ও অবিনাশী, শুধুমাত্র অনুগ্রহ করার জন্যই লীলাপূর্বক মনুষ্য আদি রূপে প্রকটিত হন ও অন্তর্হিত হন ; তাঁকেই অক্ষর, অবিনাশী পরব্রহ্ম পরমাত্মা বলা হয় এবং সমস্ত প্রাণীর বিনাশ হলেও তাঁর বিনাশ হয় না (৮।২০)—এই কথা ঠিক ভাবে বোঝাই হল 'ভগবানকে অবিনাশী বলে জানা'।

প্রশ্ন—'অনন্যমনসঃ' পদ কোন্ অবস্থায় পৌঁছানো ভক্তদের বাচক এবং তাঁরা কীভাবে ভগবানের ভজনা করেন ?

উত্তর—যাঁর মন ভগবান ব্যতীত অন্য কোনো বস্তুতে রমণ করে না এবং ভগবানের সঙ্গে মুহূর্ত মাত্রেরও বিচ্ছেদ যাঁর অসহ্য বলে মনে হয়, ভগবানের এইরূপ অনন্য প্রেমিক ভক্তদের বাচক হল এই 'অনন্যমনসঃ' পদটি। এরূপ ভক্ত পরবর্তী শ্লোকে এবং দশম অধ্যায়ের নবম শ্লোকে কথিত প্রকারে নিরন্তর ভগবানের ভজনা করেন।

সম্বন্ধ—এবার পূর্বশ্লোকে বর্ণিত ভগবদ্প্রেমী ভক্তদের ভজনের প্রকার জানাচ্ছেন—

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥ ১৪

এই দৃঢ়ব্রত ভক্তগণ নিত্য আমার নাম ও গুণকীর্তন করে আমাকে লাভের জন্য চেষ্টা করেন এবং আমাকে বারংবার প্রণাম করে সর্বদা আমার ধ্যানে সমাহিত হয়ে অনন্য ভক্তির সঙ্গে আমার ভজনা করেন ॥ ১৪

প্রশ্ন—'দৃঢ়ব্রতাঃ' পদটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যার ব্রত বা সংকল্প দৃঢ়, তাকে বলা হয় 'দৃঢ়ব্রতাঃ'। ভগবানের প্রেমিক ভক্তদের সংকল্প, শ্রদ্ধা, ধারণা ও নিয়ম—সবই অত্যন্ত দৃঢ় হয়। অতি বড় বিপদ এবং প্রবল বিঘ্নও তাঁদের নিজেদের সাধন ও ধারণা থেকে বিচলিত করতে পারে না। তাই তাঁদের 'দৃঢ়ব্রতাঃ'

(দৃঢ় সংকল্পযুক্ত) বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—'**সততম্**' পদটির অভিপ্রায় কী ? এর সম্বন্ধ কি শুধু '**কীর্তয়ন্তঃ**'পদটির সঙ্গে নাকি '**যতন্তঃ**' ও '**নমস্যন্তঃ**'পদ দুটির সঙ্গেও রয়েছে ?

উত্তর—'**সততম্**' পদটি এখানে 'নিত্য-নিরন্তর' কালের বাচক। এর প্রকৃত সম্পর্ক উপাসনার সঙ্গে। কীর্তন-নমস্কার ইত্যাদি সব উপাসনারই অঙ্গ হওয়ায় প্রকারান্তরে এটি সেই সবের সঙ্গেও সম্পর্কিত। অভিপ্রায় হল যে, ভগবানের প্রেমিক ভক্ত কখনো কীর্তনের দ্বারা, কখনো নমস্কারের দ্বারা, কখনো সেবাদি দ্বারা, সদা-সর্বদা ভগবানের চিন্তায় রত থেকে নিরন্তর তাঁর উপাসনায় রত থাকেন।

প্রশ্ন—ভগবানের কীর্তন করা কী ?

উত্তর—ভগবদ্‌কথা, প্রবচন ইত্যাদির মাধ্যমে, ভক্তদের সামনে ভগবানের গুণ, প্রভাব, মহিমা এবং চরিত্র ইত্যাদি বর্ণনা করা ; একাকী অথবা অন্য বহুলোকের সঙ্গে একত্রে, ভগবানকে নিজের সম্মুখে উপস্থিত মনে করে রাম, কৃষ্ণ, গোবিন্দ, হরি, নারায়ণ, বাসুদেব, কেশব, মাধব, শিব ইত্যাদি তাঁর পবিত্র নামের জপ অথবা উচ্চস্বরে কীর্তন করা ; ভগবানের গুণ, প্রভাব ও মহিমা চরিত্র ইত্যাদি শ্রদ্ধা ও প্রেমপূর্বক ধীরে ধীরে বা জোরে, দাঁড়িয়ে বা বসে, নৃত্য-বাদ্য-সহ অথবা বিনা নৃত্য-বাদ্য, গান গেয়ে বা দিব্য স্তোত্র ও সুন্দর পদের দ্বারা ভগবানের স্তুতি প্রার্থনা করা ইত্যাদি ভগবৎ-নাম-গুণগান সম্বন্ধীয় সকল কার্যই কীর্তনের অন্তর্গত।

প্রশ্ন—'**যতন্তঃ**' পদটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভগবানের পূজা করা, সকলকে ভগবানের স্বরূপ মনে করে তাদের সেবা করা, ভগবানের ভক্তদের দ্বারা কথিত ভগবানের গুণ, প্রভাব ও চরিত্র ইত্যাদি শোনা, ভগবদ্‌ভক্তির যেসব অঙ্গ অন্য পদে ব্যক্ত করা হয়নি, সেই সব উৎসাহ ও তৎপরতা সহ করতে থাকা—এসবই '**যতন্তঃ**' পদের অন্তর্গত বুঝতে হবে।

প্রশ্ন—ভগবানকে বার বার প্রণাম করার অর্থ কী ?

উত্তর—ভগবানের মন্দিরে গিয়ে শ্রদ্ধা-ভক্তিসহ অর্চিত-বিগ্রহরূপ ভগবানকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করা ; নিজ গৃহে ভগবানের মূর্তি বা চিত্রকে, ভগবানের নামকে, ভগবানের চরণ ও চরণ পাদুকাকে, ভগবানের তত্ত্ব, রহস্য, প্রেম, প্রভাব এবং তাঁর মধুর লীলাসমূহ যাতে বর্ণিত আছে—এরূপ গ্রন্থসমূহকে এবং সবাইকে ভগবানের স্বরূপ মনে করে বা সবার হৃদয়ে ভগবান বিরাজিত—এরূপ জেনে সমস্ত প্রাণীদের যথাযোগ্য বিনয়পূর্বক শ্রদ্ধা-ভক্তি-সহ গদ্‌গদ ভাবে কায়-মনো-বাক্যে নমস্কার করা—'**এই হল ভগবানকে প্রণাম করা**'।

প্রশ্ন—'**নিত্যযুক্তাঃ**' পদটির কী তাৎপর্য ?

উত্তর—যিনি চলা-ফেরা, ওঠা-বসা, শয়ন-জাগরণ, সব কিছুতে এবং একান্তে ধ্যানের সময়ও নিত্য-নিরন্তর ভগবানের চিন্তা করতে থাকেন, তাঁকে বলা হয় '**নিত্যযুক্তাঃ**'।

প্রশ্ন—'**ভক্ত্যা**' পদটির অভিপ্রায় কী ? এবং তার দ্বারা ভগবানের উপাসনা করা কেমন ?

উত্তর—শ্রদ্ধাযুক্ত অনন্য প্রেমের নাম ভক্তি। তাই শ্রদ্ধা ও অনন্য প্রেমের সঙ্গে নিরন্তর উপরোক্ত সাধন করতে থাকাই হল ভক্তি দ্বারা ভগবানের উপাসনা করা।

সম্বন্ধ—ভগবানের গুণ, প্রভাব ইত্যাদি জানা অনন্য প্রেমিক ভক্তদের ভজনের প্রকার জানিয়ে ভগবান এবার তাঁদের থেকে ভিন্ন উপাসকদের উপাসনার প্রকার বলেছেন—

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্‌ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্॥ ১৫

অন্য কোনো কোনো জ্ঞানযোগী জ্ঞানরূপ যজ্ঞের দ্বারা নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্মরূপে অভিন্নভাবে আমার উপাসনা করেন, অন্য সকলে বহুভাবে অবস্থিত আমাকে বিরাট্‌ স্বরূপ পরমেশ্বর ভেবে পৃথক ভাবে আরাধনা করেন॥ ১৫

প্রশ্ন—'**অন্যে**' পদটি কী অভিপ্রায়ে প্রয়োগ করা হয়েছে ?

উত্তর—এখানে '**অন্যে**' পদের প্রয়োগ পূর্বোক্ত ভক্ত শ্রেণী থেকে জ্ঞানযোগীদের পৃথক করার জন্য করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে পূর্বোক্ত ভক্তদের থেকে ভিন্ন যে সকল জ্ঞানযোগী রয়েছেন, তাঁরা পরবর্তী প্রকারে উপাসনা করে থাকেন।

প্রশ্ন—এখানে '**মাম্**' পদের অর্থ নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্ম কেন করা হয়েছে ?

উত্তর—জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্মেরই উপাসনা করা হয় ; এখানে '**মাম্**' পদের প্রয়োগ করে ভগবান সচ্চিদানন্দঘন নির্গুণ ব্রহ্মের সঙ্গে তাঁর অভিন্নতা প্রতিপাদন করেছেন। এই জন্য '**মাম্**'-এর অর্থ নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্ম করা হয়েছে।

প্রশ্ন—জ্ঞানযজ্ঞের স্বরূপ কী ? এবং তার দ্বারা অভিন্নভাবে '**মাম্**' পদের লক্ষ্য নির্গুণ ব্রহ্মের পূজাপূর্বক উপাসনার স্বরূপ কী ?

উত্তর—তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে যে 'জ্ঞানযোগের' বর্ণনা আছে, এখানেও জ্ঞানযোগের একই স্বরূপ। সেই অনুসারে কায়-মন-বাক্যে সমস্ত কর্মে মায়াময় গুণই গুণে আবর্তিত হয়—এরূপ ভেবে কর্তৃত্বাভিমান থেকে রহিত হওয়া ; সম্পূর্ণ দৃশ্যবর্গকে মৃগতৃষ্ণার জলের ন্যায় বা স্বপ্নের জগতের ন্যায় অনিত্য মনে করা, এবং এক সচ্চিদানন্দঘন নির্গুণ-নিরাকার পরব্রহ্ম পরমাত্মার অতিরিক্ত অন্য কারো অস্তিত্ব না মেনে নিরন্তর তাঁরই শ্রবণ-মনন ও নিদিধ্যাসন করে সেই সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মে নিত্য অভিন্নভাবে অবস্থান করার অভ্যাস করতে থাকা—এই হল জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা পূজাপূর্বক তাঁর উপাসনা করা।

প্রশ্ন—'**চ**' প্রয়োগের কী তাৎপর্য ?

উত্তর—উপরোক্ত জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা পূজা করা উপাসনাকারীদের থেকে পৃথক শ্রেণীর উপাসকদের আলাদা করার জনাই এখানে '**চ**' প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—বহু প্রকারে স্থিত ভগবানের বিরাট স্বরূপকে পৃথকভাবে উপাসনা করা কীরূপ ?

উত্তর—সমগ্র বিশ্ব সেই ভগবান থেকেই উৎপন্ন হয়েছে এবং ভগবানই এতে ব্যাপ্ত রয়েছেন। সুতরাং ভগবান স্বয়ংই বিশ্বরূপে স্থিত। তাই চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতা এবং অন্য সকল প্রাণী ভগবানেরই স্বরূপ—এরূপ মনে করে যিনি ঐসকলকে নিজ কর্মদ্বারা যথাযোগ্য নিষ্কামভাবে সেবা পূজা করেন (১৮।৪৬) ; সেটিই হল 'বহু প্রকারে অবস্থিত ভগবানের বিরাটরূপের পৃথক-ভাবে উপাসনা করা'।

সম্বন্ধ—সমগ্র বিশ্বের উপাসনা ভগবানেরই উপাসনা কীভাবে—এটি স্পষ্ট করে বোঝাবার জন্য এবার চারটি শ্লোকে ভগবান এই বিষয় প্রতিপাদন করেছেন যে সমস্ত জগৎ আমারই স্বরূপ—

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥ ১৬

ক্রতু আমি, আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি ওষধি, আমি মন্ত্র, আমিই ঘৃত, অগ্নি আমি এবং হোমরূপ ক্রিয়াও আমিই॥ ১৬

প্রশ্ন—এই শ্লোকের ভাবার্থ কী ?

উত্তর—এই শ্লোকে ভগবানের তাৎপর্য হল, দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে করা যতপ্রকার শ্রৌত-স্মার্ত কর্ম ও তার যত রকম সাধন আছে, সে সবই আমি। শ্রৌত কর্মকে 'ক্রতু' বলা হয়। পঞ্চমহাযজ্ঞাদি স্মার্ত কর্মকে 'যজ্ঞ' বলা হয় এবং পিতৃগণের উদ্দেশে প্রদান করা অন্নকে 'স্বধা' বলা হয়। ভগবান বলেছেন যে এই 'ক্রতু', 'যজ্ঞ' এবং 'স্বধা' আমি এবং এই কর্মগুলির জন্য প্রয়োজনীয় যত রকম বনস্পতি, অন্ন, রোগনাশক জড়ী-বুটি রয়েছে, সেসবও আমিই। যে সকল মন্ত্রের দ্বারা এই সকল কর্ম সম্পন্ন হয় এবং যা বিভিন্ন জপকারীদের দ্বারা বিভিন্ন ভাবপূর্বক জপাদি করা হয়,

সেসকল মন্ত্রও আমি। যজ্ঞের জন্য ঘৃতাদি সামগ্রীর প্রয়োজন হয়, সে সবই আমি ; গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি ইত্যাদি সর্বপ্রকার অগ্নিও আমি এবং যার দ্বারা যজ্ঞকর্ম সমাপ্ত হয়, সেই হোমাদি ক্রিয়াও আমি। অভিপ্রায় হল যে যজ্ঞ, শ্রাদ্ধাদি শাস্ত্রীয় শুভকর্মে প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তু, তৎসম্বন্ধীয় মন্ত্র, যার দ্বারা যজ্ঞাদি করা হয়, সেই অগ্নিষ্ঠান ও মন-বাক্য-শরীর দ্বারা হওয়া তৎবিষয়ক সমস্ত কার্য—এ সবই ভগবানের স্বরূপ। এই কথাটি প্রতিপন্ন করার জন্য প্রত্যেকটির সঙ্গে 'অহম্' পদের প্রয়োগ করা হয়েছে এবং 'এব'র প্রয়োগ করে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে যে ভগবান ব্যতীত অন্য কিছুই নেই ; এইরূপ বিভিন্ন রূপে দেখা সব কিছু ভগবানই, ভগবানের তত্ত্ব না বোঝার জন্যই সব বস্তু তাঁর থেকে পৃথক বলে প্রতীয়মান হয়।

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥ ১৭

এই সমস্ত জগতের ধাতা অর্থাৎ ধারণকারী, কর্মের ফলপ্রদানকারী, পিতা, মাতা, পিতামহ এবং একমাত্র জানার যোগ্য বস্তু আমি। পবিত্র ওঁ-কার, ঋগ্বেদ, সামবেদ এবং যজুর্বেদও আমিই॥ ১৭

প্রশ্ন—'অস্য' বিশেষণের সঙ্গে 'জগতঃ' পদ কীসের বাচক এবং ভগবান তার পিতা, মাতা, ধাতা ও পিতামহ কীভাবে ?

উত্তর—এখানে 'জগতঃ' পদটি চরাচর প্রাণীসহ সমগ্র বিশ্বের বাচক। এই সমগ্র বিশ্ব ভগবান থেকেই উৎপন্ন, ভগবানই এর মহাকারণ। তাই ভগবান নিজেকে এর পিতা-মাতা বলেছেন। ভগবান তাঁর একাংশে সমগ্র জগৎ ধারণ করে আছেন (১০।৪২) এবং তিনি সর্বপ্রকার কর্মফলের যথাযোগ্য বিধান করেন, তাই তিনি নিজেকে এদের 'ধাতা' বলেছেন এবং যে ব্রহ্মা প্রমুখ প্রজাপতিদের দ্বারা জগৎ সৃষ্টি হয়, তাদেরও উৎপন্নকারী হলেন ভগবান ; তাই তিনি নিজেকে এদের 'পিতামহ' বলেছেন।

প্রশ্ন—'বেদ্যম্' পদ কীসের বাচক এবং এখানে ভগবানের নিজেকে 'বেদ্য' বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—জ্ঞাতব্য বস্তুকে 'বেদ্য' বলা হয়। সমস্ত বেদের দ্বারা জ্ঞাতব্য পরমতত্ত্ব একমাত্র ভগবান (১৫।১৫), তাই ভগবান নিজেকে 'বেদ্য' বলেছেন।

প্রশ্ন—'পবিত্র' শব্দের অর্থ কী, ভগবানের নিজেকে পবিত্র বলার কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—যিনি নিজে বিশুদ্ধ এবং সহজেই অপরের পাপনাশ করে তাকে বিশুদ্ধ করে তোলেন, তাঁকে 'পবিত্র' বলা হয়। ভগবান পরম পবিত্র এবং ভগবানের দর্শন, ভাষণ ও স্মরণে মানুষ পরম পবিত্র হয়ে যায়। এতদ্ব্যতীত জগতে জপ, তপ, ব্রত, তীর্থ ইত্যাদি যত প্রকার পবিত্রকারী বস্তু আছে, সেসব ভগবানেরই স্বরূপ এবং তাদের যে পবিত্রকারী শক্তি, তাও ভগবানেরই—এই ভাব দর্শানোর জন্য ভগবান নিজেকে 'পবিত্র' বলেছেন।

প্রশ্ন—ওঁ-কার কাকে বলা হয়, ভগবান এখানে নিজেকে ওঁ-কার বলেছেন কেন ?

উত্তর—ওঁ ভগবানের নাম, একে প্রণবও বলা হয়। অষ্টম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে একে ব্রহ্ম বলা হয়েছে এবং এটি উচ্চারণ করতে বলা হয়েছে। এখানে নাম ও নামীর অভেদ প্রতিপাদন করার জন্যই ভগবান নিজেকে ওঁ-কার বলেছেন।

প্রশ্ন—'ঋক্', 'সাম' ও 'যজুঃ'—এই তিনটি পদ কীসের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এবং এগুলিকে ভগবানের নিজের স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই তিনটি পদ তিন বেদের বাচক। বেদের উদ্ভব ভগবান থেকেই হয়েছে এবং সমস্ত বেদ থেকে ভগবৎজ্ঞান লাভ হয়, তাই সব বেদকেই ভগবান তাঁর স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

প্রশ্ন—এখানে 'চ' এবং 'এব' প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'চ' অব্যয় দ্বারা এই শ্লোকে বর্ণিত সমস্ত

পদার্থের সমাহার করা হয়েছে এবং 'এব' দ্বারা ভগবান ব্যতীত অন্য বস্তুর অস্তিত্বের নিরাকরণ করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে এই শ্লোকে বর্ণিত সকল পদার্থই ভগবানের স্বরূপ, তিনি ছাড়া অন্য কোনো বস্তুই নেই।

গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥ ১৮

প্রাপ্তিযোগ্য পরম ধাম, ভর্তা, সকলের প্রভু, শুভাশুভ দর্শনকারী, সকলের আশ্রয়স্থল, শরণ গ্রহণযোগ্য, প্রত্যুপকারের আশা না করে হিতকারী, সকলের উৎপত্তি-প্রলয়ের হেতু, স্থিতির আধার এবং নিধান এবং অবিনাশী কারণও আমিই॥ ১৮

প্রশ্ন—'গতিঃ' পদের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—প্রাপ্ত করার বস্তুর নাম 'গতি'। সর্বোচ্চ প্রাপ্তিযোগ্য বস্তু হলেন একমাত্র ভগবানই, তাই তিনি নিজেকে 'গতি' বলেছেন। 'পরা গতি', 'পরমা গতি', 'অবিনাশী পদ' ইত্যাদি নামও তাঁরই।

প্রশ্ন—'ভর্তা' পদের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—পালন-পোষণকারীকে 'ভর্তা' বলা হয়। সম্পূর্ণ জগতের রক্ষণ ও পালনকারী হলেন ভগবানই। তাই তিনি নিজেকে 'ভর্তা' বলেছেন।

প্রশ্ন—'প্রভুঃ' পদটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—শাসনকারী স্বামীকে 'প্রভু' বলা হয়। ভগবানই সকলের একমাত্র পরম প্রভু। ইনি ঈশ্বরদের মহা ঈশ্বর, দেবতাদের পরম দেবতা, পতিদের পরম পতি, সমস্ত ভুবনের স্বামী এবং পরম পূজ্য পরমদেব (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৬।৭) ; সূর্য, অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু ও মৃত্যু ইত্যাদি সবাই এঁর ভয়েই নিজ নিজ মর্যাদায় অবস্থিত (কঠোপনিষদ ২।৩।৩) ; তাই ভগবান নিজেকে 'প্রভু' বলেছেন।

প্রশ্ন—'সাক্ষী' পদের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভগবান সমস্ত লোকের, সর্বজীবের এবং তাদের শুভাশুভ সমস্ত কর্মের জ্ঞাতা ও অবলোকনকারী। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে কোথাও, কোনোরূপ এমন কোনো কর্ম নেই, যা ভগবান দেখতে পান না ; তাঁর মতো সর্বজ্ঞ আর কেউই নেই ; তিনি সর্বজ্ঞতার শেষ সীমা, তাই তিনি নিজেকে 'সাক্ষী' বলেছেন।

প্রশ্ন—'নিবাসঃ' পদটির অর্থ কী ?

উত্তর—থাকার জায়গাকে বলা হয় 'নিবাস'। ওঠা-বসা, শয়ন-জাগরণ, চলা-ফেরা, জন্ম-মৃত্যু—সকল অবস্থায় সমস্ত জীব সদা-সর্বদা কেবলমাত্র ভগবানেই নিবাস করে, তাই ভগবান নিজেকে 'নিবাস' বলেছেন।

প্রশ্ন—'শরণম্' পদের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যাঁর শরণ গ্রহণ করা হয় তাঁকে 'শরণম্' বলা হয়। ভগবানের ন্যায় শরণাগতবৎসল, প্রণতপাল ও শরণাগতের দুঃখনাশকারী অন্য কেউ নেই। বাল্মীকি রামায়ণে কথিত আছে—

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্‌ব্রতং মম॥

(৬।১৮।৩৩)

অর্থাৎ একবারও 'আমি তোমার' বলে যে আমার শরণাগত হয় এবং আমার কাছে অভয় আকাঙ্ক্ষা করে, আমি তাকে সর্বভূতের থেকে অভয় দান করি ; এই আমার ব্রত। তাই ভগবান নিজেকে 'শরণ' বলেছেন।

প্রশ্ন—'সুহৃৎ' পদটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—প্রত্যুপকারের আশা না রেখে কোনো কারণ ছাড়াই স্বতঃই হিতাকাঙ্ক্ষী ও হিতকারী, দয়ালু এবং প্রেমিক ব্যক্তিকে 'সুহৃৎ' বলা হয়। ভগবান সকল প্রাণীরই বিনা কারণে উপকারকারী পরম হিতৈষী এবং সকলের অত্যন্ত প্রেমিক, পরম বন্ধু, তাই তিনি নিজেকে 'সুহৃৎ' বলেছেন। পঞ্চম অধ্যায়ের শেষেও ভগবান বলেছেন যে 'আমাকে সকল প্রাণীর সুহৃদ্ জেনে মানুষ পরমশান্তি লাভ করে' (৫।২৯)।

প্রশ্ন—'প্রভবঃ', 'প্রলয়ঃ' ও 'স্থানম্'—এই তিনটি পদের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণকে

'প্রভব', স্থিতির আধারকে 'স্থান' ও প্রলয়ের কারণকে 'প্রলয়' বলে। এই সমগ্র জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় ভগবানেরই সংকল্প দ্বারা হয় ; তাই তিনি নিজেকে 'প্রভব', 'প্রলয়' ও 'স্থান' বলেছেন।

প্রশ্ন—'**নিধানম্**' পদটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যাতে কোনো বস্তু বহুদিন ধরে রাখা হয়, তাকে 'নিধান' বলা হয়। মহাপ্রলয়ে সমস্ত প্রাণীর সঙ্গে অব্যক্ত প্রকৃতি ভগবানেরই কোনো এক অংশে বন্ধক রাখার মত বহু সময় ধরে অক্রিয় অবস্থায় স্থিত থাকে, তাই ভগবান নিজেকে 'নিধান' বলেছেন।

প্রশ্ন—'**অব্যয়ম্**' বিশেষণের সঙ্গে '**বীজম্**' পদটি প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যার কখনো বিনাশ হয় না, তাকে বলা হয় 'অব্যয়'। ভগবান সমগ্র চরাচর ভূত প্রাণীদের অবিনাশী কারণ। সকলের উৎপত্তি তাঁর থেকেই হয়, তিনিই সকলের পরম আধার। তাই তাঁকে 'অব্যয় বীজ' বলা হয়। সপ্তম অধ্যায়ের দশম শ্লোকে তাঁকেই 'সনাতন বীজ' এবং দশম অধ্যায়ের উনচল্লিশতম শ্লোকে 'সর্ব ভূতাদির বীজ' বলেছেন।

প্রশ্ন—এই শ্লোকে ভগবান একবারও '**অহম্**' পদ প্রয়োগ করেননি, এর কারণ কী ?

উত্তর—অন্য শ্লোকে উদ্ধৃত ক্রতু, যজ্ঞ, স্বধা, ঔষধ, মন্ত্র, ঘৃত, স্রুক্, যত্ন ইত্যাদি বহু শব্দ এমন আছে, যা স্বভাবতঃই ভগবানের থেকে পৃথক বস্তুর বাচক। সুতরাং সেই বস্তুগুলিকে নিজ রূপ বলে জানাবার জন্য ভগবান তার সঙ্গে '**অহম্**' পদ প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু এই শ্লোকে যত শব্দ আছে, সে সবই ভগবানের বিশেষণ, তাছাড়া আগের শ্লোকে উদ্ধৃত '**অহম্**'-এর সঙ্গে এই শ্লোকের অন্বয় করা হয়। তাই এতে '**অহম্**' পদ প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা নেই।

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন॥ ১৯

আমিই সূর্যরূপে উত্তাপ দিই, জল আকর্ষণ করে বর্ষণ করি। হে অর্জুন ! আমিই অমৃত ও মৃত্যু এবং সৎ-অসৎও আমিই॥ ১৯

প্রশ্ন—আমিই সূর্যরূপে উত্তাপ দিই, জল আকর্ষণ করে বর্ষণ করি—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথায় ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে নিজ কিরণের সাহায্যে সমস্ত জগৎকে উত্তাপ প্রদান এবং আলোকিত করা এবং সমুদ্র ইত্যাদি স্থান থেকে জল আকর্ষণ করে সঞ্চিত রাখা এবং লোকহিতার্থে মেঘের সাহায্যে যথাসময় যথাযোগ্য বিতরণকারী সূর্যও আমারই স্বরূপ।

প্রশ্ন—'**অমৃতম্**' পদটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যা পান করলে মানুষ মৃত্যুর বশ না হয়ে অমর হয়ে যায়, তাকে অমৃত বলা হয়। দেবলোকের যে অমৃতের কথা বলা হয়, সেই অমৃত পানে যদিও দেবতাদের মরণ লোকের জীবেদের মতো হয় না, এদের থেকে অত্যন্ত বিশেষ হয়, কিন্তু একথা ঠিক নয় যে তা পান করলে বিনাশ হয় না। পরম অমৃত হলেন একমাত্র ভগবানই, যাঁকে লাভ করলে মানুষ চিরতরে মৃত্যু-পাশ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। তাই ভগবান নিজেকে 'অমৃত' বলেছেন এবং মুক্তিকেও তাই 'অমৃত' বলা হয়।

প্রশ্ন—'**মৃত্যুঃ**' পদ কীসের বাচক এবং তাকে ভগবানের নিজস্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—সবার বিনাশকারী 'কাল'-কে 'মৃত্যু' বলা হয়। সৃষ্টিলীলা সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য সর্গ (উৎপত্তি) ও সংহার উভয়েরই পরম প্রয়োজন আছে এবং এই উভয় কাজই লীলাময় ভগবান করে থাকেন, তিনিই যথাসময়ে লোক-সংহার করার জন্য মহাকালরূপ ধারণ করেন। ভগবান স্বয়ং বলেছেন যে 'আমি লোকের ক্ষয় করার জন্য প্রবৃদ্ধ মহাকাল' (১১।৩২)। তাই ভগবান মৃত্যুকে তাঁর স্বরূপ বলেছেন।

প্রশ্ন—'**সৎ**' ও '**অসৎ**' পদ কীসের বাচক এবং

তাকে নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যার কখনো অভাব হয় না, সেই অবিনাশী আত্মাকে 'সৎ' বলা হয় এবং বিনাশশীল অনিত্য বস্তুমাত্রই হল 'অসৎ'। এই দুটিকে পঞ্চদশ অধ্যায়ে 'অক্ষর' ও 'ক্ষর' পুরুষের নামে বলা হয়েছে। এই দুটিই ভগবানের 'পরা' ও 'অপরা' প্রকৃতি এবং এই প্রকৃতি ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন, তাই ভগবান সৎ ও অসৎকে নিজ স্বরূপ বলেছেন।

সম্বন্ধ—ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শ্লোক পর্যন্ত নিজ সগুণ-নির্গুণ এবং বিরাট রূপের উপাসনার বর্ণনা করে ভগবান ঊনবিংশ শ্লোক পর্যন্ত সমস্ত বিশ্ব তাঁর স্বরূপ বলে জানিয়েছেন। সমগ্র বিশ্ব আমারই স্বরূপ হওয়ায় ইন্দ্রাদি অন্য দেবতাদের উপাসনাও প্রকারান্তরে আমারই উপাসনা। কিন্তু এটি না জেনে ফলাসক্তিপূর্বক পৃথক পৃথক ভাব পোষণ করা উপাসনাকারীদের আমার প্রাপ্তি না হয়ে বিনাশশীল ফল লাভ হয়। এই বিষয়টি লক্ষ্য করাবার জন্য এবার দুটি শ্লোকে সেই উপাসনার ফলসহ বর্ণনা করছেন—

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥ ২০

ত্রিবেদে বর্ণিত সকামকর্মকারী, সোমরসপানকারী নিষ্পাপ ব্যক্তিরা আমাকে যজ্ঞের দ্বারা পূজা করে স্বর্গপ্রাপ্তির ইচ্ছা করেন ; এই ব্যক্তিরা তাঁদের পুণ্যের ফলরূপে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়ে দিব্য দেবভোগ উপভোগ করেন ॥ ২০

প্রশ্ন—'ত্রৈবিদ্যাঃ', 'সোমপাঃ' এবং 'পূতপাপাঃ' এই তিনটি পদের কী অর্থ এবং এগুলি কোন্ শ্রেণীর মানুষদের বিশেষণ ?

উত্তর—ঋক্, যজু, সাম—এই তিন বেদকে 'বেদত্রয়ী' অথবা 'ত্রিবিদ্যা' বলা হয়। এই তিন বেদে বর্ণিত নানাপ্রকার যজ্ঞের বিধি এবং তার ফলে শ্রদ্ধা-প্রেম রাখা এবং সেই অনুসারে সকাম কর্মকারী মানুষদের 'ত্রৈবিদ্য' বলা হয়। যজ্ঞে সোমলতার রসপানের যে বিধি বলা হয়েছে, সেই বিধিতে সোমলতার রসপানকারীদের 'সোমপা' বলা হয়। উপরোক্ত বেদোক্ত কর্মাদির বিধিপূর্বক অনুষ্ঠান করলে যাঁর স্বর্গপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধকরূপ পাপ নষ্ট হয়ে গেছে, তাঁকে 'পূতপাপ' বলা হয়। এই তিনটি বিশেষণ সেই মানুষদের জন্য প্রযুক্ত হয়েছে, যাঁরা ভগবানের সর্বরূপতায় অনভিজ্ঞ এবং বেদোক্ত কর্ম-কাণ্ডে প্রেম ও শ্রদ্ধা রেখে পাপকর্ম থেকে বাঁচতে সকামভাবে যজ্ঞাদি কর্মের বিধিপূর্বক অনুষ্ঠান করে থাকেন।

প্রশ্ন—'পূতপাপাঃ' দ্বারা যদি এই অর্থ মেনে নেওয়া হয় যে যাঁর সমস্ত পাপ ধুয়ে গেছে, তিনি 'পূতপাপ', তাহলে ক্ষতি কী ?

উত্তর—পরের শ্লোকে বলা হয়েছে পুণ্যক্ষয় হলে তাঁদের পুনরায় মৃত্যুলোকে ফিরে আসতে হয়। যদি তাঁদের সব পাপই চিরতরে নষ্ট হয়ে যেত তাহলে পুণ্যকর্ম ক্ষয়ের পরে সেই মুহূর্তেই তাঁদের মুক্তি হওয়া উচিত ছিল। যখন পাপ-পুণ্য দুটিরই বিনাশ হয়, তখন জন্মের আর কোনো কারণ থাকে না, সেই অবস্থায় পুনর্জন্মের প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু তাঁদের পুনর্জন্ম হয় ; তাই যে অর্থ করা হয়েছে, সেটিই সঠিক।

প্রশ্ন—এখানে 'মাম্' পদ কীসের বাচক এবং তাঁকে যজ্ঞ দ্বারা পূজা করা কীরূপ ?

উত্তর—এখানে 'মাম্' পদ ভগবানের অঙ্গভূত ইন্দ্রাদি দেবতাদের বাচক। শাস্ত্রবিধি অনুসারে শ্রদ্ধাপূর্বক যজ্ঞ ও পূজাদির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দেবতাদের পূজা করাই হল 'আমাকে যজ্ঞ দ্বারা পূজা করা'। এখানে ভগবানের এই বক্তব্যের তাৎপর্য হল যে, ইন্দ্রাদি দেবতা আমারই অঙ্গভূত হওয়ায়, তাঁদের পূজাও প্রকারান্তরে আমারই পূজা। কিন্তু অজ্ঞতাবশতঃ সকাম ব্যক্তি এই তত্ত্ব বুঝতে পারেন না, তাই তাঁদের আমার প্রাপ্তি হয় না।

প্রশ্ন—'স্বর্গতিম্' পদ কীসের বাচক ? তার জন্য প্রার্থনা করা কী ?

উত্তর—স্বর্গ-প্রাপ্তিকে 'স্বর্গতি' বলা হয়। উপরোক্ত বেদবিহিত কর্মের দ্বারা দেবতাদের পূজা করে তাঁদের কাছে স্বর্গপ্রাপ্তি চাওয়াকেই বলা হয় তার জন্য প্রার্থনা করা।

প্রশ্ন—'**পুণ্যম্**' বিশেষণের সঙ্গে '**সুরেন্দ্রলোকম্**' পদ কোন্ লোককে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে এবং সেখানে দেবতাদের দিব্যভোগ ভোগ করা কী ?

উত্তর—যজ্ঞাদি পুণ্যকর্মের ফলরূপে প্রাপ্ত ইন্দ্রলোক থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যত লোক আছে, সেই সবগুলিকে লক্ষ্য করে এখানে '**পুণ্যম্**' বিশেষণের সঙ্গে '**সুরেন্দ্রলোকম্**' পদের প্রয়োগ করা হয়েছে। সুতরাং '**সুরেন্দ্রলোকম্**' পদ ইন্দ্রলোকের বাচক হলেও এটিকে উপরোক্ত সকল লোকের বাচক বুঝতে হবে। নিজ নিজ পুণ্যকর্ম অনুসারে ঐসব লোকে গিয়ে— যা মনুষ্য লোকে দুর্লভ, সেরূপ তেজোময় এবং বিশিষ্ট দেব-ভোগসমূহকে মন ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা উপভোগ করাই হল 'দেবতাদের দিব্য ভোগ উপভোগ করা'।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ ২১

তাঁরা সেই বিশাল স্বর্গসুখ ভোগ করে পুণ্যক্ষয় হলে মর্ত্যলোকে ফিরে আসেন। এইরূপে স্বর্গের প্রাপ্তিরূপ তিনবেদে কথিত সকাম কর্মের অনুষ্ঠানকারী, ভোগকামনাকারী ব্যক্তিগণ বারংবার ইহলোকে যাতায়াত করেন, অর্থাৎ পুণ্যের প্রভাবে স্বর্গে গমন করেন এবং পুণ্যক্ষয় হলে পুনরায় মর্ত্যলোকে ফিরে আসেন॥ ২১

প্রশ্ন—স্বর্গলোককে বিশাল বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—স্বর্গলোকের বিস্তার, সেখানকার ভোগ্য-বস্তু, ভোগের প্রকার, ভোগ্যবস্তুর সুখের মাত্রা ও উপভোগযোগ্য শারীরিক ও মানসিক শক্তি এবং পরমায়ু ইত্যাদি সবকিছুর বিবিধ প্রকার পরিমাণ মর্ত্যলোকের থেকে অনেক বিশদ ও মহান। তাই একে 'বিশাল' বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—পুণ্যক্ষয় হওয়া এবং মৃত্যুলোক প্রাপ্ত হওয়া কী ?

উত্তর—যে পুণ্যকর্মের ফল উপভোগ করার জন্য জীবের স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, সেই পুণ্যকর্মের ফলভোগ সমাপ্ত হয়ে যাওয়াই হল 'পুণ্যক্ষয় হওয়া' ; এবং সেই স্বর্গবিষয়ক পুণ্যফলের সমাপ্তি হওয়া মাত্রই উদ্বৃত্ত পাপ-পুণ্যের ফল ভোগ করার জন্য পুনর্বার মর্ত্যে ফিরে যাওয়াই হল 'মৃত্যুলোক প্রাপ্ত হওয়া'।

প্রশ্ন—'**ত্রয়ীধর্মম্**' পদ কোন্ ধর্মের বাচক এবং তার আশ্রয় নেওয়া কাকে বলে ?

উত্তর—ঋক্, যজুঃ, সাম—এই তিনটি বেদে যে স্বর্গপ্রাপ্তির উপায় হিসাবে ধর্মের কথা বলা হয়েছে, তার বাচক '**ত্রয়ীধর্মম্**' পদটি। স্বর্গপ্রাপ্তির সাধনরূপ সেই ধর্মের যথাবিধি পালন করা ও স্বর্গ সুখকেই সবার থেকে বেশি প্রাপ্তযোগ্য বস্তু বলে মনে করা হল 'ত্রয়ী ধর্মে'র আশ্রয় গ্রহণ করা।

ভগবানের স্বরূপের তত্ত্ব না জানা সকাম ব্যক্তিরা অনন্যচিত্তে ভগবানের শরণ গ্রহণ করেন না, তাঁরা ভোগকামনার বশীভূত হয়ে উপরোক্ত ধর্মের আশ্রয় নেন। তাইজন্য তাঁদের কর্মের ফল অনিত্য হয় এবং তাঁদের মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বর্গসুখ প্রদানকারী এই ধর্মের আশ্রয় ত্যাগ করে একমাত্র ভগবানেরই শরণাগত হন, তিনি সাক্ষাৎ ভগবানকে লাভ করে সর্ববন্ধন থেকে চিরতরে মুক্তিলাভ করেন। তাই সেই কৃতকৃত্য ব্যক্তিরা আর জগতে জন্মগ্রহণ করেন না।

প্রশ্ন—'**কামকামাঃ**' পদের অর্থ কী ? এটি কোন্ পুরুষদের বিশেষণ এবং 'গতাগত' (পুনরাগমন) প্রাপ্ত হওয়া কী ?

উত্তর—জাগতিক ভোগের নাম 'কাম', সেই ভোগকামনাকারী মানুষদের জন্য '**কামকামাঃ**' পদের প্রয়োগ করা হয়েছে। এটি উপরোক্ত স্বর্গপ্রাপ্তির সাধনরূপ বেদবিহিত সকামকর্ম ও উপাসনার অনুষ্ঠানকারী

ব্যক্তিদের বিশেষণ এবং এরূপ ব্যক্তিদের যে নিজেদের কর্মের ফল ভোগ করার জন্য বারংবার উচ্চ ও নীচ লোকে যাতায়াত করতে হয়, তাকেই বলে 'গতাগত' প্রাপ্ত হওয়া।

সম্বন্ধ—প্রথম দুটি শ্লোকে যজ্ঞ দ্বারা দেবতাদের পূজাকারী সকাম ব্যক্তিদের দেবপূজার ফল পুনরাগমন জানিয়ে ভগবান এবার এতদ্‌ভিন্ন তাঁর অনন্য প্রেমিক নিষ্কাম ভক্তদের উপাসনার ফলস্বরূপ তিনি স্বয়ং তাদের যোগক্ষেম বহন করেন—এ কথা জানাচ্ছেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌॥ ২২

অনন্যচিত্তে যে ভক্তগণ আমাকে সর্বদা নিষ্কামভাবে ভজনা করেন, সেই নিত্য-সমাহিত মুমুক্ষু ব্যক্তিদের যোগক্ষেম আমি স্বয়ং বহন করি॥ ২২

প্রশ্ন—'অনন্যাঃ' পদ কীরূপ ভক্তদের বিশেষণ ?

উত্তর—সম্পূর্ণরূপে জাগতিক ভোগ-বাসনা নিবৃত্ত হয়ে যাঁর শুধু ভগবানেই অটল ও অচল প্রেম-ভক্তি হয়ে যায়, ভগবানের বিরহ যাঁর কাছে অসহ্য হয়, যাঁর ভগবান ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য দেবতা নেই এবং যিনি ভগবানকেই পরম আশ্রয়, পরম গতি ও পরম প্রেমাস্পদ বলে মানেন—এরূপ অনন্যপ্রেমিক একনিষ্ঠ ভক্তদের বিশেষণ হল **'অনন্যাঃ'** পদটি।

প্রশ্ন—এখানে **'মাম্‌'** পদ কীসের বাচক এবং তাঁর 'চিন্তা করে নিষ্কামভাবে ভজনা করা' কাকে বলে ?

উত্তর—এখানে **'মাম্‌'** পদটি সগুণ ভগবান পুরুষোত্তমের বাচক। তাঁর গুণ, প্রভাব, তত্ত্ব ও রহস্য জেনে, চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে, শয়ন-জাগরণে এবং একান্তে সাধন করার সময়, সর্বদা নিরন্তর অবিচ্ছিন্নরূপে তাঁকে চিন্তা করে, তাঁর নির্দেশানুসারে নিষ্কামভাবে তাঁর প্রসন্নতার জন্য চেষ্টা করতে থাকা, এই হল তাঁকে 'চিন্তা করে ভজন করা'।

প্রশ্ন—নিত্য-নিরন্তর চিন্তনকারী ভক্তদের যোগক্ষেম বহন করা কী ?

উত্তর—অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি করাকে বলে 'যোগ' এবং প্রাপ্তবস্তু রক্ষা করাকে বলে 'ক্ষেম'। সুতরাং ভক্ত ভগবানকে লাভ করার জন্য যে সাধনে রত, সেই সাধনকে সর্বপ্রকার বাধাবিঘ্ন থেকে রক্ষা করা ; এবং সাধনের যে ন্যূনতা রয়েছে, তা পূরণ করে স্বয়ং ভগবানকে লাভ করিয়ে দেওয়া—এই হল সেই প্রেমিক ভক্তদের যোগক্ষেম বহন করা। ভক্ত প্রহ্লাদের জীবন এটির সুন্দর উদাহরণ। হিরণ্যকশিপু তাঁর সাধনায় বহু বিঘ্ন উপস্থিত করলেও ভগবান সর্বপ্রকারে তাঁকে রক্ষা করে শেষকালে তাঁকে নিজেকে প্রাপ্ত করিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন—ভগবান সাধন-সম্বন্ধীয় যোগক্ষেম বহন করেন—সে তো ঠিক কথা, কিন্তু তিনি কি জীবন নির্বাহের উপযোগী লৌকিক যোগক্ষেমও বহন করেন ?

উত্তর—যখন সমগ্র বিশ্বের ছোট-বড় অনন্ত জীবেদের ভরণ-পোষণ ভগবানই করেন ; কেউ উপাসনা করুক বা না করুক—এই বিষয়ে লক্ষ্য না করে যখন স্বাভাবিকভাবে পরম সুহৃদের মতো সমগ্র বিশ্বের যোগক্ষেমের সমস্ত ভার ভগবান বহন করেন, তখন অনন্য ভক্তের জীবনভার তিনি বহন করবেন—এ আর বলার কথা কী ? কথা হল যে, যে অনন্য ভক্ত নিত্য-নিরন্তর শুধুমাত্র ভগবানের চিন্তাতেই ব্যাপৃত থাকেন, ভগবান ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ের কিছুমাত্র পরোয়া করেন না—এরূপ নিত্যাভিযুক্ত ভক্তদের সব দেখাশোনা ভগবানই করেন।

মাতৃপরায়ণ ছোট শিশু যেমন শুধু মাকেই জানে, তার কী কী বস্তু ঠিক করে রাখতে হবে, কখন কী কী বস্তুর প্রয়োজন হবে, এসব কথা শিশু কখনো চিন্তা করে না। তার মা'ই এইসব বিষয় খেয়াল করেন, তার কোন্‌ কোন্‌ বস্তু ঠিক করে রাখতে হবে, মা'ই তা ঠিক করেন, তার কখন কী প্রয়োজন, মা সেই সব বস্তু রক্ষা করেন এবং ঠিক সময়ে তার জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুর ব্যবস্থা করেন।

এইরূপ নিত্যাভিযুক্ত অনন্য ভক্তের জীবনে লৌকিক বা পারমার্থিক কী কী বস্তুর রক্ষা করার প্রয়োজন এবং কখন কী কী বস্তুর প্রয়োজন, তার সিদ্ধান্ত ভগবানই নিয়ে থাকেন এবং সেই সব প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা এবং অপ্রাপ্তের প্রাপ্তিও ভগবানই করিয়ে দেন।

যে মাতৃপরায়ণ বালক মাতৃছায়ায় বড় হয়, মা যেমন সেই বাচ্চার বুদ্ধির ওপর নির্ভর না করে, তার প্রকৃত হিত যাতে হয়, তাই করেন—তার থেকেও অনেক বেশি পরিমাণে ভগবানও তাঁর ভক্তের প্রকৃত মঙ্গল যাতে হয়, তাই করে থাকেন। এরূপ ভক্তের কখন কী বস্তুর প্রয়োজন হবে এবং কোন্ কোন্ বস্তু রক্ষা করা প্রয়োজন, তা ভগবানই ঠিক করেন। ভগবানের সিদ্ধান্ত সবই আগাগোড়া কল্যাণপ্রদ হয় এবং ভগবান সব কিছুর রক্ষা ও প্রাপ্তির ভার বহন করেন। লৌকিক-পারমার্থিক বিভাগের কোনো প্রশ্নই নেই ও কোনো বিশেষ বস্তুর প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তিরও প্রশ্ন নেই। যে বস্তু পেলে বা থাকলে মানুষ ভগবানকে ভুলে গিয়ে বিষয়-ভোগে আবদ্ধ হয় এবং যার জন্য তাঁর যোগক্ষেমের ক্ষতি হয়, তা লাভ না করানো এবং তা স্থায়ী না করাও হল যোগক্ষেম বহন করা ; তথা যেসকল বস্তু না থাকলে বা যেগুলি রক্ষা না করলে ভগবানের স্মৃতিতে বাধা উপস্থিত হয় এবং সেইজন্য বাস্তবিক কল্যাণের হেতু হওয়ায় ও কল্যাণের রক্ষায় বাধাদানকারী হওয়ায় সেই বস্তুগুলি প্রাপ্ত করানো ও সুরক্ষিত রাখাই হল প্রকৃত যোগক্ষেম বহন করা।

অনন্য নিত্যাভিযুক্ত ভক্তের প্রকৃত কল্যাণের এবং শুদ্ধ যোগক্ষেমের ভার ভগবান বহন করেন—এর তাৎপর্য হল যে, কোন্ বস্তুর প্রাপ্তিতে ভক্তের কল্যাণ হবে এবং তাঁর জন্য কোন্ বস্তুর সংরক্ষণ প্রয়োজন, সেদিকে লক্ষ্য রেখে ভগবান স্বয়ং তার প্রাপ্তি ও রক্ষা করে থাকেন, তা সেগুলি লৌকিক হোক বা সাধন-সম্বন্ধীয় হোক। এর দ্বারা বোঝা উচিত যে, যে ব্যক্তি ভগবদ্-পরায়ণ হয়ে অনন্যচিত্তে প্রেমসহকারে নিরন্তর তাঁকে স্মরণ করে সব কাজ করেন, অন্য কোনো বিষয়ের কামনা, চিন্তা বা আশা করেন না, তাঁর জীবন-নির্বাহের সমস্ত ভারই ভগবানের ওপর ন্যস্ত থাকে। সেই সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, পরম সুহৃদ ভগবান তাঁর ভক্তের সর্বপ্রকার যোগক্ষেম নির্বাহ করে থাকেন ; এতে তাঁর কখনো ভুল হয় না এবং এর কোনো বিপরীত পরিণামও হতে পারে না। ভগবানের 'যোগক্ষেম' বহন অত্যন্ত সুখ, শান্তি, প্রেম ও আনন্দদায়ক হয় এবং ভক্তকে অতি শীঘ্র ভগবানের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ করানোতে পরম সহায়ক হয় তাই এখানে যোগের অর্থ—ভগবৎ-স্বরূপের প্রাপ্তি এবং ক্ষেমের অর্থ—ভগবদ্ প্রাপ্তির জন্য করা সাধনাদির রক্ষা করা—এরূপ অর্থ করা হয়েছে।

সম্বন্ধ—পূর্বশ্লোকে ভগবান সমগ্র বিশ্বকে তাঁর স্বরূপ বলে জানিয়েছেন, তাহলে আবার যজ্ঞ দ্বারা করা দেবপূজাকে প্রকারান্তরে তাঁরই পূজা বলে তার ফল পুনরাগমন চক্রে পতিত হওয়া এবং নিজ অনন্য ভক্তের উপাসনার ফল তাঁকেই লাভ করা বলেছেন কীভাবে ? এই প্রশ্নে তিনি বলছেন—

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্॥ ২৩

হে অর্জুন ! শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে যদিও সকাম ভক্তগণ অন্য দেবতার পূজা করেন, তাঁরাও প্রকৃতপক্ষে আমাকেই পূজা করে থাকেন, কিন্তু তাঁদের সেই পূজা বিধিপূর্বক নয়, অর্থাৎ তা অজ্ঞতাজনিত॥ ২৩

প্রশ্ন—'**শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ**' কথাটির অভিপ্রায় কী ? এখানে এই বিশেষণ কীসের জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে ?

উত্তর—বেদ-শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত দেবতা, তাঁদের উপাসনা ও স্বর্গাদি প্রাপ্তিরূপ ফলে যাঁদের সশ্রদ্ধ বিশ্বাস থাকে, এখানে তাঁদের '**শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ**' বলা হয়েছে এবং এই বিশেষণ প্রয়োগ দ্বারা এই ভাব দেখানো হয়েছে যে, যাঁরা শ্রদ্ধাবিহীন হয়ে দম্ভসহকারে যজ্ঞ কর্মাদি দ্বারা দেবপূজা করেন, তাঁরা এই শ্রেণীর মধ্যে আসেন না, তাঁরা আসুরী প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন—এরূপ ব্যক্তিদের অন্য দেবতাদের পূজা করা

কীরূপ এবং তাকে ভগবানের 'অবিধিপূর্বক পূজা' বলা হয় কেন?

উত্তর—যে কামনার সিদ্ধির জন্য শাস্ত্রে যে দেবতার পূজার বিধান রয়েছে, সেই দেবতার শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ কর্মের দ্বারা শ্রদ্ধাপূর্বক পূজা করা হল 'অন্য দেবতাদের পূজা করা'। সকল দেবতাই ভগবানের অঙ্গভূত, ভগবানই সকলের প্রভু এবং তিনিই প্রকৃতপক্ষে তাঁদের রূপে প্রকটিত—এই তত্ত্ব না জেনে ঐসব দেবতাদের ভগবানের থেকে পৃথক মনে করে সকামভাবে তাঁদের পূজা করাকে বলা হয় 'অবিধিপূর্বক' পূজা।

প্রশ্ন—অন্য দেবতাদের পূজার দ্বারা ভগবানের বিধিপূর্বক পূজা কীভাবে করা যায় এবং তার ফল কী?

উত্তর—অন্য দেবতাও ভগবানেরই অঙ্গভূত হওয়ায় সব ভগবানেরই স্বরূপ, এরূপ মনে করে ভগবান লাভের জন্য নিষ্কামভাবে সেই সব দেবতাকে শাস্ত্রবিধিসহ শ্রদ্ধাপূর্বক পূজা করা হলে, ঐ দেবতাদের পূজার দ্বারা ভগবানের 'বিধিপূর্বক পূজা করা' হয়; এর ফলও ভগবদ্-প্রাপ্তি।

রাজা রন্তিদেব অতিথি এবং অভ্যাগতদের ভগবদ্-স্বরূপ মনে করে নিজে ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করেও অন্নদান করে নিষ্কামভাবে ভগবানের পূজা করেছিলেন। তার ফলস্বরূপ তাঁর ভগবান লাভ হয়। এইরূপ কোনো মানুষ যিনি দেবতা, গুরু, ব্রাহ্মণ, মাতা-পিতা, অতিথি-অভ্যাগত ইত্যাদি সমস্ত প্রাণীকে ভগবানের স্বরূপ মনে করে ভগবানের প্রসন্নতার জন্য তাঁর নির্দেশানুসারে তাঁদের সকলের সেবা কার্য করেন, তাঁর সেই সেবা বিধিপূর্বক ভগবদ্-সেবা হয় এবং তার ফলে ভগবানের প্রাপ্তি হয়।

এই তত্ত্ব না বুঝে যিনি সকামবুদ্ধিতে শ্রদ্ধা-প্রেমপূর্বক অন্য দেবতাদের সেবা পূজা ইত্যাদি করেন, সেই সেবা-পূজা যদিও ভগবানেরই সেবা-পূজা হয়, কারণ তিনিই সর্ব যজ্ঞের ভোক্তা ও সবার মহেশ্বর এবং ভগবানই সর্বরূপ, তবুও ভাবের ন্যূনতার ফলে তা ভগবানের বিধিপূর্বক সেবারূপে গণ্য হয় না। তাই তার ফলও ভগবদ্-প্রাপ্তি না হয়ে স্বর্গ-প্রাপ্তিই হয়। ভগবৎ-স্বরূপের অনভিজ্ঞতার জন্য ফলে এই বিশাল পার্থক্য হয়ে যায়।

সম্বন্ধ—অন্য দেবতাদের পূজনকারীদের পূজা ভগবানের বিধিপূর্বক পূজা নয়, এই বলে ভগবান এবার ঐরূপ পূজনকারী মানুষ ভগবদ্-প্রাপ্তিরূপ ফল থেকে কেন বঞ্চিত থাকেন, তা স্পষ্টভাবে নিরূপণ করছেন—

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥ ২৪

কারণ আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু; কিন্তু তাঁরা আমাকে পরমেশ্বররূপে তত্ত্বতঃ জানেন না, সেইজন্যই তাঁদের পতন হয় অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয়॥ ২৪

প্রশ্ন—ভগবানই সব যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু কীভাবে?

উত্তর—এই সমগ্র বিশ্ব ভগবানেরই বিরাটরূপ হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞ-পূজা কর্মের ভোক্তারূপে যত দেবতা আছেন, তাঁরা সব ভগবানেরই অঙ্গ, ভগবানই তাঁদের সকলের আত্মা (১০।২০)। সুতরাং ঐ দেবতাদের রূপে ভগবানই সমস্ত যজ্ঞ-কর্মের ভোক্তা। ভগবানই তাঁর যোগশক্তির দ্বারা সমস্ত জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় করে সকলকে উপযুক্ত নিয়মে পরিচালিত করেন; তিনিই ইন্দ্র, বরুণ, যমরাজ, প্রজাপতি প্রমুখ যত লোকপাল ও দেবতা আছেন — তাঁদের সবারই নিয়ন্তা; তাই তিনিই সবার প্রভু অর্থাৎ মহেশ্বর (৫।২৯)।

প্রশ্ন—এখানে 'তু' কথাটির অভিপ্রায় কী?

উত্তর—'তু' কথাটি এখানে 'কিন্তু' অর্থে ব্যবহৃত। অভিপ্রায় হল যে এরূপ হওয়া সত্ত্বেও এঁরা ভগবানের প্রভাব জানেন না, এ তাঁদের কীরূপ অজ্ঞতা!

প্রশ্ন—এখানে 'তে' পদটি কোন্ ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য করে বলা এবং তাঁদের ভগবানকে তত্ত্বতঃ না জানা কীরূপ?

উত্তর—এখানে 'তে' পদটি আগের শ্লোকে বর্ণিত

প্রকারে অন্য দেবতাদের পূজা দ্বারা অবিধিপূর্বক ভগবানের পূজনকারী সকাম ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বলা এবং ষোড়শ থেকে উনিশতম শ্লোক পর্যন্ত ভগবানের গুণ, প্রভাবসহ যে স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে, তাকে না জানায় ভগবানকে সর্বযজ্ঞের ভোক্তা ও সর্বলোকের মহেশ্বর বলে না জানা—এই হল তাঁদের ভগবানকে তত্ত্বতঃ না জানা।

প্রশ্ন—'অতঃ' পদটির অভিপ্রায় কী এবং তার সঙ্গে '**চ্যবন্তি**' ক্রিয়া প্রয়োগ করে কী ভাব দেখানো হয়েছে ?

উত্তর—'**অতঃ**' পদ হেতুবাচক। এর সঙ্গে '**চ্যবন্তি**' ক্রিয়া প্রয়োগের অভিপ্রায় হল যে এইজন্য অর্থাৎ ভগবানকে তত্ত্বতঃ না জানার জন্যই এই ব্যক্তিরা ভগবদ্-প্রাপ্তিরূপ অত্যন্ত উত্তম ফল থেকে বঞ্চিত থেকে স্বর্গপ্রাপ্তিরূপ অল্প ফলের ভাগী হয় এবং পুনরাগমন চক্রে আবর্তিত হতে থাকে।

সম্বন্ধ—ভগবানের ভক্ত পুনর্জন্ম লাভ করেন না এবং অন্য দেবতার উপাসকগণ পুনরাগমন লাভ করেন, এর কারণ কী ? এই প্রশ্নের উত্তরে উপাস্যের স্বরূপ এবং উপাসকের ধারণার জন্য উপাসনার ফলের পার্থক্যের নিয়ম জানাচ্ছেন—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্॥ ২৫

দেবতাদের পূজনকারীগণ দেবগণকে প্রাপ্ত হন, পিতৃপূজনকারীগণ পিতৃগণকে প্রাপ্ত হন, ভূত পূজনকারীগণ ভূতগণকে প্রাপ্ত হন এবং আমার উপাসনাকারীরা আমাকেই লাভ করেন। তাই আমার ভক্তদের পুনর্জন্ম হয় না॥ ২৫

প্রশ্ন—'**দেবব্রতাঃ**' পদ কোন্ ব্যক্তিদের বাচক ? তাঁদের দেবত্ব লাভ করা কী ?

উত্তর—দেবতাদের পূজা করা, তাঁদের পূজার জন্য উল্লিখিত নিয়মাদি পালন করা, তাঁদের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা, মন্ত্র-জপ করা, তাঁদের জন্য ব্রাহ্মণ-ভোজন করানো—ইত্যাদি সবই 'দেবতাদের ব্রত'। অর্থাৎ এই সব নিয়ম পালনকারী ব্যক্তিদের বাচক '**দেবব্রতাঃ**' পদটি। এরূপ ব্যক্তিদের তাঁদের উপাসনার ফলস্বরূপ ঐ দেবতাদের লোক, তাঁদের ন্যায় ভোগ অথবা তাঁদের মতো রূপ প্রাপ্তি হয়—এই হল দেবগণকে প্রাপ্ত হওয়া।

প্রশ্ন—তৃতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে, চতুর্থ অধ্যায়ের পঁচিশতম শ্লোকে বলা হয়েছে যে, দেবপূজা হল কল্যাণের হেতু আর এখানে (২০, ২১, ২৪এ) তার ফল অনিত্য স্বর্গ প্রাপ্তি এবং পুনর্জন্ম চক্রে পতিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, এর কারণ কী ?

উত্তর—তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে নিষ্কামভাবে দেবপূজা করার প্রসঙ্গ রয়েছে, সেইজন্য তার ফল পরম কল্যাণ বলা হয়েছিল ; কারণ নিষ্কামভাবে করা দেবপূজা অন্তঃকরণ শুদ্ধির হেতু হওয়ায় তার ফলে পরম কল্যাণই হয়। কিন্তু এখানে সকামভাবে করা দেবপূজার প্রকরণ চলছে। তাই এর সর্বোচ্চ ফল ঐ দেবতাদের প্রাপ্তি পর্যন্ত বলা হয়েছে। তাঁরা খুব বেশি হলে তাঁদের উপাস্য দেবতাদের আয়ুষ্কাল পর্যন্ত স্বর্গাদিলোকে থাকতে পারেন। সুতরাং তাঁদের পুনর্জন্ম নিশ্চিত।

প্রশ্ন—'**পিতৃব্রতাঃ**' পদ কোন্ ব্যক্তিদের বাচক এবং তাঁদের পিতৃপুরুষ প্রাপ্ত করা কী ?

উত্তর—পিতৃগণের জন্য যথাবিধি শ্রাদ্ধ-তর্পণ করা, তাঁদের জন্য ব্রাহ্মণ ভোজন করানো, হোম করা, জপ করা, পূজা-পাঠ করা এবং তাঁদের জন্য শাস্ত্রে বর্ণিত ব্রত-নিয়ম যথাযথভাবে পালন করা ইত্যাদি হল পিতৃগণের ব্রত (নিয়মাদি) এবং এই সব পালনকারীদের বাচক হল '**পিতৃব্রতাঃ**' পদটি। যে ব্যক্তি সকামভাবে এই ব্রত পালন করেন, তিনি মৃত্যুর পর পিতৃলোকে যান এবং সেখানে গিয়ে সেই পিতৃগণের মতো স্বরূপ প্রাপ্ত করে তাঁদের ন্যায় ভোগ উপভোগ করেন। এই হল পিতৃলোক প্রাপ্ত করা। এঁরাও খুব বেশি হলে দিব্য পিতৃগণের আয়ুষ্কাল পর্যন্ত সেখানে থাকতে পারেন, শেষে এঁদেরও পুনরাগমন হয়।

এখানে দেবতা ও পিতৃগণের পূজার নিষেধ করা

হয়েছে বলে মনে করা উচিত নয়। দেব-পিতৃ-পূজা নিজ নিজ বর্ণাশ্রমের অধিকার অনুসারে সকলের যথাবিধি করা কর্তব্য ; কিন্তু সেই পূজা যদি সকামভাবে হয় তাহলে তা সর্বোচ্চ ফলপ্রদান করে বিনষ্ট হয়ে যায়, আর যদি কর্তব্যবুদ্ধিতে ভগবানের নির্দেশ মেনে বা ভগবৎপূজা মনে করে করা হয় তবে তা ভগবদ্‌প্রাপ্তিরূপ মহাফলের কারণ হয়। তাই বলার তাৎপর্য হল যে দেব-পিতৃ-কর্ম অবশ্যই করতে হবে, কিন্তু তাতে নিষ্কাম-ভাব আনার চেষ্টা করবে।

প্রশ্ন—'ভূতেজ্যাঃ' পদ কোন্ মানুষদের বাচক এবং তাদের ভূত (প্রেতাদি) প্রাপ্তি হওয়া কী ?

উত্তর—যাঁরা প্রেত ও ভূতের পূজা করেন, তাঁদের জন্য হোম-দান ইত্যাদি যা কিছু করেন, তাদের বাচক হল 'ভূতেজ্যাঃ' পদটি। এরূপ ব্যক্তিদের ঐসব ভূত-প্রেতাদির ন্যায় রূপ-ভোগ ইত্যাদি প্রাপ্ত হওয়ার কথা, তাই তাঁদের প্রাপ্তি হয়। ভূত-প্রেতের পূজা তামসিক এবং অনিষ্ট ফলপ্রদানকারী হয়, তাই সেগুলি করা উচিত নয়।

প্রশ্ন—এখানে 'মদ্‌যাজিনঃ' পদ কীসের বাচক এবং তাঁদের ভগবানকে লাভ করা কী ?

উত্তর—যে ব্যক্তি ভগবানের সগুণ নিরাকার অথবা সাকার—যে কোনো রূপের সেবা-পূজা ও ধ্যান-ভজন করেন, সমস্ত কর্ম তাঁকে অর্পণ করেন, তাঁর নাম জপ করেন, গুণকীর্তন শোনেন ও গান করেন এবং এইরূপ ভগবানের ভক্তি-বিষয়ক বিবিধ রকমের সাধন করেন, তাঁদের বাচক হল এই 'মদ্‌যাজিনঃ' পদটি। তাঁদের ভগবানের দিব্যলোকে গমন করা, তাঁর সন্নিকটে থাকা, তাঁর ন্যায় দিব্য রূপ লাভ করা অথবা তাঁতে লীন হয়ে যাওয়া—এই সবই হল ভগবানকে লাভ করা।

প্রশ্ন—এই বাক্যে 'অপি' পদ প্রয়োগের কী তাৎপর্য ?

উত্তর—'অপি' পদ দ্বারা ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে তাঁর (ভগবানের) নিরাকার, সাকার, যে কোনো রূপের নিষ্কামভাবে উপাসনাকারী যে তাঁকেই লাভ করেন—এতে বলার কী আছে, কিন্তু সকামভাবে উপাসনাকারীও তাঁকেই লাভ করেন।

সম্বন্ধ—ভগবানের ভক্তির ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ মহাফল হলেও তার সাধনায় কোনো কাঠিন্য নেই, বরং তার সাধনা অত্যন্তই সহজ—এই বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য ভগবান জানাচ্ছেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।। ২৬

যে ভক্ত আমাকে ভক্তিভাবে পত্র-পুষ্প-ফল-জল ইত্যাদি অর্পণ করেন, সেই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নিষ্কাম প্রেমিক ভক্তের ভক্তিপূর্বক দেওয়া পত্র-পুষ্পাদি আমি সগুণরূপে প্রকট হয়ে প্রীতিসহকারে ভক্ষণ করি ।। ২৬

প্রশ্ন—'যঃ' পদ প্রয়োগের ভাব কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান দেখিয়েছেন যে, যে কোনো বর্ণ, আশ্রম ও জাতির যে কোনো ব্যক্তি পত্র-পুষ্প, ফল, জল ইত্যাদি আমাকে অর্পণ করতে পারে। বল, রূপ, ধন, আয়ু, জাতি, গুণ ও বিদ্যা ইত্যাদির জন্য আমার কারো প্রতি ভেদ-বুদ্ধি নেই ; অবশ্য সেই অর্পণকারীর মনোভাব বিদুর ও শবরীর ন্যায় সর্বতোভাবে শুদ্ধ ও প্রেমপূর্ণ হওয়া উচিত।

প্রশ্ন—পূজার বহুপ্রকার সামগ্রীর মধ্যে শুধু পত্র-পুষ্প-ফল-জলেরই নাম করার অভিপ্রায় কী ? এবং এই সব সামগ্রী ভক্তিপূর্বক ভগবানকে অর্পণ করা কীরূপ ?

উত্তর—এখানে পত্র-পুষ্প-ফল-জলের নাম করে এই ভাব দেখানো হয়েছে যে, এই সকল বস্তু সাধারণ মানুষ কোনো পরিশ্রম, হিংসা ও ব্যয় ছাড়াই অনায়াসে সংগ্রহ করতে পারে এবং ভগবানকে অর্পণ করতে পারে। ভগবান পূর্ণকাম হওয়ায় তাঁর কোনো বস্তুর আকাঙ্ক্ষা নেই, তাঁর শুধু প্রেমেরই প্রয়োজন। 'আমার মতো অতি সাধারণ ব্যক্তির দ্বারা অর্পণ করা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুও ভগবান সহর্ষে গ্রহণ করেন, এ তাঁর কীরূপ মহত্ত্ব !' —এইভাবে ভাবিত হয়ে প্রেমবিহ্বল চিত্তে কোনো বস্তু

ভগবানকে সমর্পণ করাকে বলা হয় ভক্তিপূর্বক ভগবানকে অর্পণ করা।

প্রশ্ন—'**প্রযতাত্মনঃ**' পদটির অর্থ কী এবং এটি প্রয়োগের কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—যাঁর অন্তর শুদ্ধ, তাঁকে '**প্রযতাত্মা**' বলা হয়। এটির প্রয়োগে ভগবানের এই তাৎপর্য যে অর্পণকারীর ভাব যদি শুদ্ধ না হয়, বাহ্যতঃ যত শিষ্টাচারসহ অতি উত্তম বস্তু অর্পণ করা হোক না কেন, আমার কাছে তা কখনো গ্রহণযোগ্য হয় না। আমি দুর্যোধনের আমন্ত্রণ অস্বীকার করে ভাব শুদ্ধ থাকায় বিদুরের গৃহে গিয়ে প্রেমপূর্বক আহার করেছি, সুদামা প্রদত্ত চিঁড়া অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছি, দ্রৌপদীর বাসনে অবশিষ্ট শাকপাতা খেয়ে সমগ্র বিশ্বকে তৃপ্ত করেছি, গজেন্দ্রের অর্পিত 'পুষ্প' আমি স্বয়ং সেখানে গিয়ে গ্রহণ করেছি, শবরীর কুটিরে গিয়ে তাঁর প্রদত্ত '**ফল**' গ্রহণ করেছি এবং রন্তিদেবের '**জল**' স্বীকার করে তাকে কৃতার্থ করেছি। এইভাবে প্রত্যেক ভক্তের প্রেমসহ অর্পণ করা বস্তু আমি সহর্ষে স্বীকার করি।

এই ভক্তদের, বিশেষতঃ এই প্রসঙ্গের সম্পর্কিত ঘটনাসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ক্রমশঃ এইরূপ—

বিদুর

দ্বাদশ বৎসর বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাস পূর্ণ করে পাণ্ডবগণ যখন দুর্যোধনের কাছে তাঁদের রাজ্য ফেরৎ চাইলেন, তখন দুর্যোধন তা ফেরৎ দিতে অস্বীকার করলেন। এরপর পাণ্ডবদের হয়ে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দূত হয়ে কৌরবদের কাছে গেলেন। বাহ্য শিষ্টাচার দেখাবার জন্য দুর্যোধন তাঁর অভ্যর্থনার জন্য খুব বড় আয়োজন করলেন। যখন দুর্যোধন আহারের কথা বললেন, ভগবান তখন তা অস্বীকার করলেন। দুর্যোধন তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে ভগবান জানালেন—'আহার দুরকম পরিস্থিতিতে করা যায়। যেখানে ভালোবাসা আছে, সেখানে যা কিছু পাওয়া যায়, তা খুব আনন্দের সঙ্গে খাওয়া যায়, অথবা যখন খিদের চোটে প্রাণ যায়, তখন যেখানে সেখানে, যেভাবে যা কিছু পাওয়া যায় তাতে পেট ভরাতে হয়। এখানে দুটির কোনোটিই নেই। প্রেম তো আপনার মধ্যে নেইই, আর আমিও ক্ষুধায় মরতে বসিনি'[১]। এই কথা বলে ভগবান বিনা আমন্ত্রণে ভক্ত বিদুরের গৃহে চললেন। পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, বাহ্লীক প্রমুখ বয়োবৃদ্ধ অনেকেই বিদুরের গৃহে গিয়ে ভগবানকে তাঁদের নিজের নিজের গৃহে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন ; কিন্তু ভগবান কারো গৃহে গেলেন না। ভগবান বিদুরের গৃহেই তাঁর অত্যন্ত প্রীতি সহকারে দেওয়া পদার্থ গ্রহণ করে তাঁকে কৃতার্থ করলেন (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব, ৯১) '**দুর্যোধনকী মেওয়া ত্যাগী, সাগ বিদুর ঘর খায়ো**' অর্থাৎ দুর্যোধনের রাজসিক খাদ্যবস্তু ত্যাগ করে বিদুরের ঘরে গিয়ে শাক-পাতার অতি সাধারণ খাবার গ্রহণ করা—একথা খুবই প্রসিদ্ধ।

সুদামা

সুদামা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাল্যসখা ছিলেন। দুজনে উজ্জয়িনীতে সন্দীপনি শিক্ষকমহাশয়ের গৃহে পড়তে যেতেন। সুদামা বেদবিদ্, বিষয়ে নিরাসক্ত, শান্ত এবং জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। বিদ্যালাভ শেষ হলে উভয় সখা নিজ নিজ গৃহে ফিরে যান।

সুদামা ছিলেন অত্যন্ত গরীব। এক সময় এমন হল যে এক নাগাড়ে কয়েক দিন এই ব্রাহ্মণ পরিবার অন্নের মুখ দেখেননি। ক্ষুধার তাড়নায় তাঁদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল, শিশুদের অবস্থা দেখে তাঁদের হৃদয় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। সুদামার ব্রাহ্মণী জানতেন যে দ্বারকাধিপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বামীর সখা। তিনি ভীত-কম্পিত হৃদয়ে তাঁর স্বামীকে সব বলে দ্বারকা যাবার জন্য অনুরোধ করলেন। তিনি তাঁর স্বামীর নিষ্কামভাবের কথা জানতেন, তাই তিনি বললেন—'প্রভো ! আমি জানি ধন-সম্পদের জন্য আপনার বিন্দুমাত্র কামনা নেই, কিন্তু অর্থ বিনা গৃহপালন করা নিতান্তই কঠিন। তাই আমার মনে হয় প্রিয় বন্ধুর কাছে আপনার যাওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন এবং উচিত।'

সুদামা ভাবলেন যে ব্রাহ্মণী দুঃখ-কষ্টে কাতর হয়ে অর্থের জন্য আমাকে শ্রীকৃষ্ণের কাছে পাঠাতে চাইছেন। তিনি এই কাজের জন্য বন্ধুর গৃহে যেতে অত্যন্ত সংকোচ বোধ করলেন। তিনি বললেন—'পাগলি !

[১]সম্প্রীতিভোজ্যান্যন্নানি আপদ্ভোজ্যানি বা পুনঃ। ন চ সম্প্রীয়সে রাজন্ ন চৈবাপদ্গতা বয়ম্ ॥

(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ৯১।২৫)

তুমি কি অর্থের জন্য আমাকে ওখানে পাঠাতে চাও ? ব্রাহ্মণ কি কখনো অর্থের আশা করে ? আমাদের কাজ তো ভগবানের ভজনা করা, ক্ষুধা পেলে কেবল ভিক্ষা চাইতে পারি।'

ব্রাহ্মণী বললেন—'সে তো ঠিক কথা, কিন্তু এখানে ভিক্ষাও ভাগ্যে জোটে না। আমার জীর্ণ পরিধানবস্ত্র আর ক্ষুধায় কাতর বাচ্চাদের তো দেখুন ! আমি অর্থ চাই না। আপনি তাঁর কাছে গিয়ে রাজ্য বা সম্পদ চান, তা আমি ইচ্ছা করি না—এই দীন দশায় আপনি একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ তো করে আসুন।' সুদামা সেখানে যেতে অত্যন্ত ইতস্ততঃ করলেন। কিন্তু শেষে মনে করলেন, ঠিক আছে, এই উপলক্ষ্যে একবার সখা শ্রীকৃষ্ণকে তো দর্শন করে আসি, সেই হবে পরম লাভ। সুদামা যাত্রা স্থির করলেন, কিন্তু খালি হাতে কী করে যাবেন ? তিনি তাঁর পত্নীকে বললেন—'হে কল্যাণী ! ঘরে যদি দেবার মতো কিছু থাকে, তা হলে দাও।' স্বামী তো ঠিকই বলেছেন, কিন্তু সেই বেচারী কী দেবেন ? গৃহে তো অন্নের এক দানাও নেই। ব্রাহ্মণী চুপ করে রইলেন। কিন্তু পরে ভাবলেন যে, কিছু না নিয়ে সুদামা তো যাবেন না, এই ভেবে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে প্রতিবেশীর ঘরে গেলেন। যদিও আশা করেননি, কিন্তু প্রতিবেশিনী দয়া করে তাঁকে চার মুঠো চিঁড়া দিলেন। ব্রাহ্মণী এক টুকরো ছেঁড়া কাপড়ে বেঁধে শ্রীকৃষ্ণকে দেবার জন্য তা তাঁর পতির হাতে দিলেন।

সুদামা দ্বারকায় পৌঁছলেন। লোককে জিজ্ঞাসা করতে করতে তিনি ভগবানের মহলে পৌঁছলেন। নরোত্তম কবি এখানে অতি সুন্দর এক বর্ণনা দিয়েছেন। কবি নরোত্তম লিখেছেন, দ্বারপাল সুদামাকে সমাদর পূর্বক সেখানে বসিয়ে প্রভুকে সংবাদ দিতে গেলেন, সেখানে গিয়ে তিনি বললেন—

সীস পগা ন ঝগা তন পৈ প্রভু !
জানে কো আহি, বসৈ কেহি গামা।
ধোতী ফটী-সী, লটী দুপটী,
অরু পাঁয় উপানহ কী নহিঁ সামা॥
দ্বার খড়ো দ্বিজ দুর্বল, দেখি
রহ্যো চকি সো বসুধা অভিরামা।
পূছত দীনদয়াল কো ধাম,
বতাবত আপনো নাম সুদামা॥

ভগবান 'সুদামা' নাম শুনেই সব কিছু ভুলে ছটফট করে উঠলেন। তাঁর মুকুট সেখানেই পড়ে রইল, পীতাম্বর খুলে গেল, পাদুকা পরতে ভুলে গেলেন। ভগবান দূর থেকেই সুদামার খারাপ অবস্থা দেখতে পেলেন। তিনি বললেন—

ঐসে বিহাল বিবাইন সোঁ,
পগ কন্টক জাল গড়ে পুনি জোয়ে।
হায় ! মহাদুখ পায়ে সখা ! তুম
আয়ে ইতৈ ন, কিতৈ দিন খোয়ে॥
দেখি সুদামা কী দীন দসা,
করুনা করিকে করুনানিধি রোয়ে।
পানী পরাত কো হাথ ছুয়ো নহিঁ,
নৈনন কে জল সো পগ ধোয়ে॥

(নরোত্তম কবি)

গামলার জল নেওয়ার প্রয়োজন হয়নি, প্রভু তাঁর চোখের জলেই সুদামার পা ধুইয়ে দিলেন এবং তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর ভগবান তাঁকে সমাদরসহ মহলে নিয়ে গিয়ে তাঁর দিব্য পালঙ্কে বসালেন। তারপর নিজ হাতে পূজার সামগ্রী সংগ্রহ করে নিজ হাতে তাঁর চরণ ধুইয়ে, নিজে ত্রিলোক-পাপনাশক হয়েও, সেই জল নিজ মস্তকে ধারণ করলেন।

তারপর ভগবান তাঁর প্রিয় মিত্রের দেহে দিব্যগন্ধ-যুক্ত চন্দন, কুঙ্কুম লাগিয়ে, সুগন্ধিত ধূপ-দীপাদিতে পূজা করে তাঁকে ভোজন করালেন। পান-সুপারী দিলেন। ব্রাহ্মণ সুদামার দেহ অত্যন্ত মলিন ও ক্ষীণ ছিল, তিনি একটি ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরেছিলেন। কিন্তু ভগবানের প্রিয় সখা হওয়ায় সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর অবতার রুক্মিণী নিজ সখীদের নিয়ে রত্নদণ্ডযুক্ত চামর হাতে পরম দরিদ্র ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে সেবা-পূজা করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ সুদামার হাত নিজে হাতে নিয়ে ছোটবেলার কথা বলতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরে ভগবান তাঁর প্রিয় মিত্রের দিকে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন—'ভাই ! তুমি আমার জন্য কিছু উপহার এনেছো তো ? ভক্তের প্রেমপূর্বক দেওয়া একটুখানি জিনিসকেই আমি অনেক মনে করি, কারণ আমি প্রেমের ভিখারী। অভক্তের দেওয়া বহু জিনিস আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না।'

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮১।৪)

ভগবান এই কথা বলা সত্ত্বেও সুদামা চিড়ার পুঁটলী ভগবানকে দিতে পারলেন না। তাঁর অতুল রাজ্য-সম্পদ ও বৈভব দেখে সুদামা লজ্জা পেলেন।

তখন সর্ব প্রাণীর অন্তরের কথা যার নখদর্পণে সেই শ্রীহরি ব্রাহ্মণের আসার কারণ বুঝে চিন্তা করলেন যে 'এ আমার নিষ্কাম ভক্ত ও প্রিয় সখা। এ অর্থ কামনায় আগে কখনো আমার ভজনা করেনি, এখনও এর কোনো কামনা নেই। সে নিজ পত্নীর অনুরোধেই আমার কাছে এসেছে, অতএব আমি তাকে সেই (ভোগ ও মোক্ষরূপ) সম্পদ দেব, যা দেবতাদেরও দুর্লভ।'

এই ভেবে ভগবান 'এটা কী ?' বলে সুদামার বগলে লুকানো চিড়ের পুঁটলি জোর করে বার করলেন। পুরানো ছেঁড়া কাপড় জোর করে টানতেই চিড়া সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। ভগবান অত্যন্ত প্রীতিভরে বলতে লাগলেন—

নন্বেতদুপনীতং মে পরমপ্রীণনং সখে।
তর্পয়ন্ত্যঙ্গ মাং বিশ্বমেতে পৃথুকতণ্ডুলাঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮১।৯)

'হে সখা ! আপনার আনা এই চিড়া উপহার আমাকে অত্যন্ত প্রসন্ন করেছে। এই চিড়া আমাকে এবং (আমার সঙ্গে) সমস্ত বিশ্বকে তৃপ্ত করবে।' এই বলে ভগবান সেই ছড়িয়ে পড়া চিড়ে খুঁটে খুঁটে খেতে লাগলেন। ভক্তের প্রীতিপূর্বক আনা উপহার এইভাবে গ্রহণ করে ভগবান তাঁর অতুলনীয় প্রেমের পরিচয় দিলেন।

কিছুদিন অত্যন্ত আনন্দে থেকে সুদামা গৃহে ফিরে এলেন। এদিকে তাঁর গৃহের রূপান্তর হয়ে গিয়েছিল। ভগবানের লীলায় ভগ্নগৃহ স্বর্ণমহলের রূপ ধারণ করেছিল। সুদামা ভগবানের লীলা মনে করে তা মেনে নিলেন। তিনি মনে মনে বললেন—'ধন্য ! আমার সখা এমন যে, যাচক চাইবার আগেই গুপ্তভাবে সব কিছু দিয়ে তার মনোরথ পূর্ণ করেন। কিন্তু আমি অর্থ চাই না, আমি বারবার এই প্রার্থনা করি যেন জন্ম-জন্মান্তরে এই শ্রীকৃষ্ণই আমার সুহৃদ, সখা ও মিত্র হয় এবং আমি তাঁর অনন্য ভক্ত হয়ে থাকি। আমি এই সম্পদ চাই না, আমি যেন প্রত্যেক জন্মে সেই সর্বগুণসম্পন্ন ভগবানের বিশুদ্ধ ভক্তি ও তাঁর ভক্তদের পবিত্র সঙ্গ লাভ করি। তিনি দয়া করেই ধন দান করেন না, কারণ ধন-গর্বে ধনবানের অধঃপতন হয়। তাই তিনি তাঁর অদূরদর্শী ভক্তকে সম্পত্তি, রাজ্য ও ঐশ্বর্য প্রদান করেন না।'

সুদামা আজীবন অনাসক্তভাবে গৃহে বাস করে সর্বসময় ভগবদ্-ভজনেই জীবন কাটিয়েছিলেন।

দ্রৌপদী

পাণ্ডবগণ বনে বাস করে তাঁদের দুঃখের দিন কাটাচ্ছিলেন, কিন্তু দুর্যোধন এবং তার দুষ্ট সহচরেরা বদস্বভাববশতঃ তাঁদের বিনাশের কথাই চিন্তা করছিলেন। দুর্যোধন একবার দুর্বাসা মুনিকে প্রসন্ন করে তাঁর কাছ থেকে এই বর চেয়ে নিয়েছিলেন যে 'আমার ধর্মাত্মা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের সঙ্গে বনে বাস করছেন। একদিন আপনি আপনার দশহাজার শিষ্য নিয়ে ওঁদের ওখানে আতিথ্য গ্রহণ করুন। কিন্তু একটি অনুরোধ যে, ওখানে সকলের আহার হয়ে গেলে যখন যশস্বিনী দ্রৌপদী আহার করে সুখে বিশ্রাম করবে, তখন যাবেন।' দুর্যোধন তাঁর দুষ্ট-সহচরদের পরামর্শে ভাবলেন, দ্রৌপদীর আহার হয়ে গেলে সূর্যের প্রদত্ত পাত্র থেকে সেই দিনের জন্য আর আহার্য পাওয়া যাবে না, তাহলে কোপন স্বভাব দুর্বাসা পাণ্ডবদের অভিশাপ দিয়ে ভস্মীভূত করে ফেলবেন এবং এইভাবে সহজেই কার্য সমাধা হবে। সরল হৃদয় দুর্বাসা দুর্যোধনের এই কপটতা বুঝতে পারেননি, তাই তিনি তাঁর কথা মেনে কাম্যকবনে পাণ্ডবদের ওখানে গেলেন। পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীসহ আহারাদি সমাপ্ত করে বসে কথাবার্তা বলছিলেন। এই সময় দশহাজার শিষ্য সহ দুর্বাসা মুনি সেখানে পৌঁছালেন। যুধিষ্ঠির ভ্রাতাসহ উঠে ঋষিকে স্বাগত জানালেন এবং আহার করতে অনুরোধ জানালেন। দুর্বাসা অনুরোধ মেনে নিয়ে স্নানের জন্য সশিষ্য নদীতে গেলেন। এদিকে দ্রৌপদী অত্যন্ত চিন্তান্বিত হলেন। কিন্তু এই বিপদে তাঁর প্রিয়সখা শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া তাঁর প্রিয়তমা কৃষ্ণাকে আর কে রক্ষা করবেন ? তিনি ভগবানকে স্মরণ করে বললেন—'হে কৃষ্ণ ! হে গোপাল ! হে অশরণ-শরণ ! হে শরণাগতবৎসল ! এবার

এই বিপদ থেকে তুমি রক্ষা করো।'

দুঃশাসনাদহং পূর্বং সভায়াং মোচিতা যথা।
তথৈব সংকটাদস্মান্মামুদ্ধর্তুমিহার্হসি॥

(মহাভারত, বনপর্ব ২৬৩।১৬)

'তুমি কৌরবদের রাজসভায় যেভাবে দুষ্ট দুঃশাসনের হাত থেকে আমাকে ছাড়িয়েছিলে, তেমনই এই বিপদ থেকেও তোমার আমাকে বাঁচাতে হবে।' সেই সময় ভগবান দ্বারকাতে রুক্মিণীর সঙ্গে তাঁর মহলে ছিলেন। দ্রৌপদীর প্রার্থনা শুনেই সেই সঙ্কটমোচন ভক্তবৎসল ভগবান রুক্মিণীকে ছেড়ে অত্যন্ত তীব্র গতিতে দ্রৌপদীর দিকে দৌড়লেন। অচিন্ত্যগতি পরমেশ্বরের আসতে কী সময় লাগে ? তিনি তৎক্ষণাৎ দ্রৌপদীর কাছে পৌঁছে গেলেন। দ্রৌপদী যেন প্রাণ ফিরে পেলেন ! তিনি তাঁকে প্রণাম করে সব বিপদের কথা বললেন। ভগবান বললেন—'এ সব কথা পরে বোলো ! আমার অত্যন্ত ক্ষুধা পেয়েছে ; শীঘ্র কিছু খেতে দাও।' দ্রৌপদী বললেন—'প্রভু ! এই খাবারের সমস্যায় পড়েই আমি তোমাকে স্মরণ করেছি। আমার আহার হয়ে গেছে, এখন ঐ পাত্রে কিছুই নেই।'

ভগবান অত্যন্ত আমোদপ্রিয়, বলতে লাগলেন—

কৃষ্ণে ন নর্মকালোঽয়ং ক্ষুচ্ছ্রমেণাতুরে ময়ি।
শীঘ্রং গচ্ছ মম স্থালীমানয়িত্বা প্রদর্শয়॥

(মহাভারত, বনপর্ব ২৬৩।২৩)

'হে দ্রৌপদী ! এখন আমি ক্ষুধা ও পথশ্রমে ক্লান্ত ; এখন হাসি-ঠাট্টা করার সময় নয়। শীঘ্র যাও আর সূর্যের দেওয়া বাসন এনে আমাকে দেখাও।'

বেচারী দ্রৌপদী আর কি করেন ! পাত্রটি এনে সামনে রাখলেন। ভগবান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে একটুকরো শাক খুঁজে বার করলেন সেই বাসন থেকে। ভগবান বললেন—'তুমি বলছিলে না যে কিছুই নেই ? দেখো, এই শাকের টুকরোতে তো ত্রিভুবন তৃপ্ত হয়ে যাবে।' যজ্ঞভোক্তা ভগবান সেই শাকের টুকরো তুলে মুখে ফেলে বললেন—

বিশ্বাত্মা প্রীয়তাং দেবস্তুষ্টশ্চাস্ত্বিতি যজ্ঞভুক্।

(মহাভারত, বনপর্ব ২৬৩।২৫)

এই শাকের দ্বারা সমগ্র বিশ্বের আত্মা যজ্ঞভোক্তা ভগবান তৃপ্ত হোক ! সেই সঙ্গে সহদেবকে বললেন—'যাও, ঋষিদের আহারের জন্য ডেকে আনো।' ওদিকে নদীতীরে অন্যরকম ঘটনা ঘটে গেল ! সন্ধ্যাহ্নিক করতে করতেই ঋষিদের পেট ফুলে ঢেঁকুর উঠতে লাগল। শিষ্যেরা দুর্বাসাকে বললেন—'মহারাজ ! আমাদের গলা পর্যন্ত পেট ভর্তি হয়ে আছে, ওখানে গিয়ে আমরা খাব কী করে ?' দুর্বাসার অবস্থাও তদনুরূপ, তিনি বললেন—'ভাই ! এখান থেকে শীঘ্র পালাও। পাণ্ডবেরা অত্যন্ত ধর্মাত্মা, বিদ্বান, সদাচারী ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্য ভক্ত ; এঁরা চাইলে আমাদের ভস্ম করে ফেলতে পারেন। আমি এখনও অম্বরীষ-বিষয়ক ঘটনা বিস্মৃত হইনি। শ্রীকৃষ্ণের শরণাগতদের আমি বড় ভয় পাই।' দুর্বাসার কথা শুনে তাঁর শিষ্যেরা যেখানে সেখানে পালিয়ে গেলেন। সহদেব কাউকে খুঁজে পেলেন না।

তখন ভগবান পাণ্ডবদের ও দ্রৌপদীকে বললেন—'এবার তো আমাকে দ্বারকাতে ফিরে যেতে দাও। তোমরা ধর্মাত্মা, যারা নিরন্তর ধর্ম করে তাদের কখনো দুঃখ হয় না—

ধর্মনিত্যাস্তু যে কেচিন্ন তে সীদন্তি কর্হিচিৎ।

(মহাভারত, বনপর্ব ২৬৩।৪৪)

গজরাজ

গজরাজ ত্রিকূট পর্বতে থাকতেন। একদিন তিনি গরমে ব্যাকুল হয়ে বহু শক্তিশালী বড় বড় হস্তী-হস্তিনীদের নিয়ে বরুণদেবের ঋতুমান নামক বাগানে বিস্তৃত সুন্দর সরোবরের তীরে পৌঁছলেন। তাঁরা সরোবরে নেমে সেই অমৃততুল্য জলপান করে হস্তিনী ও ছোট ছোট বাচ্চাদের সঙ্গে খেলতে লাগলেন। সেই সরোবরে এক মহাবলশালী কুমীর থাকত। কুমীর গজরাজের পা কামড়ে ধরল। গজরাজ তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে পা ছাড়াবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুতেই ছাড়াতে পারলেন না। এদিকে কুমীর তাঁকে জলের মধ্যে টানতে লাগল। সঙ্গের হস্তী-হস্তিনীরা শুঁড়ে শুঁড় লাগিয়ে গজরাজকে বাইরে আনতে চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু কিছুতেই তারা সফল হল না। বহুক্ষণ ধরে এই যুদ্ধ চলল, শেষে নিরুপায় গজরাজ কাতর হয়ে ভগবানের শরণাগত হলেন, তিনি বললেন—

যঃ কশ্চনেশো বলিনোঽন্তকোরগাৎ
প্রচণ্ডবেগাদভিধাবতো ভৃশম্।

ভীতং প্রপন্নং পরিপাতি যদ্ভয়া-
মৃত্যুঃ প্রধাবত্যরণং তমীমহি॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ৮।২।৩৩)

'যিনি অত্যন্ত শক্তির সঙ্গে সর্বত্র বিচরণশীল এই প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন মহাবলী করাল কালরূপী সর্পভয়ে ভীত, শরণাগত প্রাণীকে রক্ষা করেন এবং যাঁর ভয়ে মৃত্যুও (প্রাণীদের বধ করার জন্য) ইতস্ততঃ দৌড়ায়—এমন যে কোন্ ঈশ্বর আছেন, আমি তাঁর শরণাগত হই।'

তারপর গজরাজ মনে মনে ভগবানের অতি সুন্দর স্তুতিগান করলেন ; ভগবান ভক্তের ডাক শুনেই ভক্তকে রক্ষা করার জন্য অধীর হয়ে উঠলেন। এখানে কবি অত্যন্ত সুন্দর উক্তি করেছেন—

পর্যঙ্কং বিসৃজন্ গণানগণয়ন্ ভূষামণিং বিস্মর-
ন্নুত্তানোঽপি গদাগদেতি নিগদন্ পদ্মামনালোকয়ন্।
নির্গচ্ছন্নপরিচ্ছদং খগপতিং চারোহমাণোঽবতু
গ্রাহগ্রস্তমতঙ্গপুঙ্গবসমুদ্ধারায় নারায়ণ॥

'কুমীরের গ্রাসে আবদ্ধ গজরাজকে রক্ষা করার জন্য পালঙ্ক ছেড়ে, পার্ষদদের গ্রাহ্য না করে, কৌস্তুভমণির কথা ভুলে গিয়ে, তড়িৎবেগে উঠে 'গদা', 'গদা' বলে লক্ষ্মীদেবীর দিকে নজর না দিয়ে, গরুড়ের খালি পিঠে আরূঢ় হয়ে তৎক্ষণাৎ গমনকারী নারায়ণ আমাকে রক্ষা করুন।'

গরুড়ের পিঠে করে ভগবান সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন। গজেন্দ্র আকাশে গরুড়ের ওপর আসীন ভগবানকে দর্শন করে শুঁড়ে করে একটি পদ্মফুল তুলে অতি কষ্টে আর্তস্বরে বললেন—'হে নারায়ণ, হে সবাকার গুরু ! আপনাকে নমস্কার।'

ভগবান ভক্তের প্রেমপূর্বক প্রদত্ত পদ্মফুলটি স্বীকার করলেন। নিজ সুদর্শন চক্রের দ্বারা কুমীরের মাথা কেটে গজেন্দ্রকে মহা সঙ্কট থেকে তৎক্ষণাৎ রক্ষা করলেন।

শবরী

শবরী ভীলনারী ছিলেন। হীন জাতির মানুষ, কিন্তু তিনি ভগবানের পরম ভক্ত। তিনি তাঁর জীবনের বহু সময় দণ্ডকারণ্যে থেকে গোপনে ঋষিদের সেবায় অতিবাহিত করেছিলেন। যেদিক দিয়ে ঋষিরা স্নানে যেতেন, সেই পথ পরিষ্কার করা, কাঁকর ভরা পথে বালি ছড়ানো, জঙ্গলের কাঠ কেটে আশ্রমে ইন্ধনের জন্য রেখে দেওয়া—এইসব ছিল তাঁর কাজ। মতঙ্গ মুনি তাঁকে কৃপা করেছিলেন। ভগবানের নামের জপ করার উপদেশ দিয়েছিলেন এবং শেষে ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করা কালে বলেছিলেন যে 'ভগবান রাম তোমার কুটিরে পদার্পণ করবেন। তাঁর দর্শন লাভে তুমি কৃতার্থ হবে। ততদিন এখানে থেকে ভজন করো।'

শবরীর ভজনে মন লেগে যায় এবং তিনি ভগবান রামের আগমনের অপেক্ষায় জীবন কাটাতে লাগলেন। যতদিন যেতে লাগল, শবরীর উৎকণ্ঠাও ততই বাড়তে লাগল। তিনি ভাবতে লাগলেন—এবার প্রভুর আসার সময় হয়েছে, তাঁর পায়ে না কাঁটা ফুটে যায়, তিনি তাড়াতাড়ি করে অনেক দূর পর্যন্ত রাস্তা পরিষ্কার করতেন, পথে জল ছিটিয়ে দিতেন, গোবর দিয়ে অঙ্গন পরিষ্কার করে রাখতেন এবং ভগবানের বসার জন্য মাটি-গোবর দিয়ে সুন্দর করে জায়গা তৈরি করে রাখতেন। জঙ্গলে গিয়ে গাছ থেকে ফল পেড়ে চেখে দেখতেন, যে গাছের ফল মিষ্টি, সেই ফল পেড়ে ভগবানকে খাওয়ানোর জন্য তৈরি রাখতেন। দিনের পর দিন যেতে লাগল, প্রত্যহ এভাবে দিন কাটতে লাগল। তিনি যে কত বার রাস্তা ঝাড়ু দিতেন, কত বার পথের দিকে চেয়ে বসে থাকতেন এবং খুঁজে খুঁজে ফল পেড়ে আনতেন, তার কোনো ঠিকানা নেই। শেষে সেই শুভ দিনের আগমন হল, ভগবান তাঁর কুটিরে পদার্পণ করলেন। শবরী ধন্য হয়ে গেলেন। শ্রীরামচরিত-মানসে গোঁসাই মহারাজ লিখেছেন—

সবরী দেখি রাম গৃহঁ আএ।
মুনি কে বচন সমুঝি জিয়ঁ ভাএ॥
সরসিজ লোচন বাহু বিসালা।
জটা মুকুট সির উর বনমালা॥
স্যাম গৌর সুন্দর দোউ ভাঈ।
সবরী পরী চরন লপটাঈ॥
প্রেম মগন মুখ বচন ন আবা।
পুনি পুনি পদ সরোজ সির নাবা॥

শবরী আনন্দ-সাগরে ডুবে গেলেন। প্রেমাবেশে তাঁর বাকরুদ্ধ হয়ে গেল, তিনি বারংবার ভগবানের চরণ কমলে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে লাগলেন। তারপর ভগবানের পূজা করলেন, সামনে ফল রাখলেন। ভগবান শবরীর ভক্তির প্রশংসা করে পূজা স্বীকার করলেন এবং

তাঁর প্রদত্ত ফল প্রেমভরে গ্রহণ করে তাঁকে কৃতার্থ করলেন ! সেই ফলে যে কী অপূর্ব স্বাদ ছিল, তার বর্ণনা করে তুলসীদাস মহারাজ বলেছেন—

ঘর, গুরুগৃহ, প্রিয়-সদন, সাসুরে ভঈ জব জহঁ পহুনাঈ।
তব তহঁ কহি সবরী কে ফলনি কী রুচি মাধুরী ন পাঈ।।[১]

রন্তিদেব

মহারাজ রন্তিদেব ছিলেন সংকৃতি নামক রাজার পুত্র। তিনি অত্যন্ত প্রতাপশালী ও দয়ালু ছিলেন। রন্তিদেব গরিবদের দুঃখ দেখে নিজের সর্বস্ব দান করেছিলেন। তার পর তিনি অত্যন্ত কষ্টে জীবন নির্বাহ করতে লাগলেন। কিন্তু তিনি যা পেতেন, নিজে ক্ষুধার্ত থাকলেও গরিবদের বিলিয়ে দিতেন। এইভাবে রাজা নির্ধন হয়ে সপরিবার কষ্টে জীবন কাটাতে লাগলেন।

এক সময় পুরো আটচল্লিশ দিন, খাদ্য তো দূরের কথা, রাজা পান করার জলও পেলেন না। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর বলহীন রাজার শরীর কাঁপতে লাগল। শেষে উনপঞ্চাশতম দিনের সকালে রাজা ঘি, ক্ষীর, হালুয়া ও জল পেলেন। একনাগাড়ে আটচল্লিশ দিন অনাহারে থাকায় রাজা সপরিবারে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের সকলের শরীর কাঁপছিল।

রন্তিদেব আহার করতে যাচ্ছিলেন, সেইসময় একজন ব্রাহ্মণ অতিথি এসে হাজির হলেন। কোটি টাকার মধ্যে সুনাম অর্জন করার জন্য এক লাখ টাকা দান করা অত্যন্ত সহজ, কিন্তু ক্ষুধার্ত থেকে অন্নদান করা অতি কঠিন কাজ। কিন্তু সর্বত্র হরিকে ব্যাপ্তরূপে দর্শনকারী ভক্ত রন্তিদেব সেই অন্ন সসম্মানে শ্রদ্ধাসহ ব্রাহ্মণরূপ অতিথিকে পরিবেশন করলেন। ব্রাহ্মণ দেবতা আহার করে তৃপ্ত হয়ে চলে গেলেন।

তারপর রাজা উদ্বৃত্ত অন্ন পরিবারের মধ্যে ভাগ করে খেতে উদ্যত হলে এক শূদ্র অতিথি এসে উপস্থিত হলেন। রাজা শ্রীহরিকে স্মরণ করে উদ্বৃত্ত অন্নের থেকে খানিকটা সেই দরিদ্র নারায়ণকে দিলেন। এরমধ্যে কয়েকটি কুকুরসহ আর একজন মানুষ অতিথিরূপে এসে জানালেন —'রাজন্ ! আমার এই কুকুরগুলিসহ আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত, কিছু খাবার দিন।'

হরিভক্ত রাজা তাকেও সৎকার করলেন এবং উদ্বৃত্ত সমস্ত অন্ন কুকুরসহ অতিথিকে সমর্পণ করে প্রণাম জানালেন।

এবার, কেবলমাত্র একজনের পিপাসা দূর হবার মতো জল অবশিষ্ট ছিল—রাজা সেই জল পান করতে যাচ্ছিলেন, অকস্মাৎ তখনই এক চণ্ডাল এসে কাতর স্বরে বলল—'মহারাজ ! আমি অত্যন্ত ক্লান্ত, এই অপবিত্র নীচকে একটু পান করার জল দিন।'

চণ্ডালের আর্তস্বর শুনে এবং তাকে পরিশ্রান্ত দেখে রাজার অত্যন্ত দয়া হল, তিনি তাকে এই অমৃত বচন বললেন—

ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরামষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা।
আর্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজামন্তঃ স্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ।।
ক্ষুত্তৃট্ শ্রমো গাত্রপরিশ্রমশ্চ দৈন্যং ক্লমঃ শোকবিষাদমোহাঃ।
সর্বে নিবৃত্তাঃ কৃপণস্য জন্তোর্জিজীবিষোর্জীবজলার্পণান্মে ।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ৯।২১।১২-১৩)

'আমি পরমাত্মার কাছে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিযুক্ত উত্তম গতি বা মুক্তি চাই না ; আমি শুধু এটাই চাই যে আমি যেন সর্বপ্রাণীর অন্তরে থেকে তাদের দুঃখ ভোগ করি, যাতে তারা দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি পায়।'

জলের অভাবে এই মানুষটির প্রাণ যাবার উপক্রম হয়েছে, সে প্রাণরক্ষার জন্য আমার কাছে দীনভাবে জল চাইছে, জীবন রাখতে ইচ্ছুক এই দীন-হীন প্রাণীকে এই জীবন-রূপী জল দান করায় আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ক্লান্তি, শারীরিক কষ্ট, দীনতা, শোক, মোহ সব দূর হয়ে গেছে।'

একথা বলে দয়ালু রাজা রন্তিদেব নিজে পিপাসায় মৃতপ্রায় হয়েও সেই চণ্ডালকে সমাদর করে প্রসন্নতাপূর্বক তাকে জল পান করালেন।

ফল কামনাকারীদের ফলপ্রদানকারী ত্রিভুবননাথ ভগবান ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশই মহারাজ রন্তিদেবের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য মায়ার সাহায্যে ব্রাহ্মণাদি রূপ ধারণ করে এসেছিলেন। রাজার ধৈর্য ও ভক্তি দেখে তাঁরা অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং নিজেদের প্রকৃতরূপ ধারণ করে রাজাকে দর্শন দিলেন। রাজা তিন দেবতাকে একত্রে প্রত্যক্ষ দর্শন করে প্রণাম করলেন এবং তাঁরা রাজাকে বর

[১]এই উদ্ধৃতি শ্রীরামচরিতমানস ইত্যাদি গ্রন্থসমূহ থেকে আহরিত।

প্রার্থনা করতে বললেও তিনি কোনো বর চাইলেন না। কারণ রাজা আসক্তি ও কামনা ত্যাগ করে তাঁর মন শুধু ভগবান বাসুদেবেই নিবিষ্ট করে রেখেছিলেন এবং পরমাত্মার সঙ্গে তন্ময় হয়ে যাওয়ায় ত্রিগুণময় মায়া তাঁর কাছে স্বপ্নের মতো লীন হয়ে গিয়েছিল ! রন্তিদেবের পরিবারের অন্য সব সদস্যও তাঁর সঙ্গের প্রভাবে নারায়ণ-পরায়ণ হয়ে যোগীদের পরম গতি লাভ করেছিলেন।

প্রশ্ন—'**ভক্ত্যুপহৃতম্**'-এর অর্থ কী ? এই পদটি প্রয়োগের কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—উপরোক্ত পত্র-পুষ্প ইত্যাদি যে কোনো বস্তু প্রেমপূর্বক সমর্পণ করাকে বলা হয় 'ভক্ত্যুপহৃত'। এই প্রয়োগের দ্বারা ভগবান এইভাব দেখিয়েছেন যে, প্রেমবিহীন ভাবে প্রদত্ত বস্তু তিনি স্বীকার করেন না। আর যেখানে প্রেম থাকে এবং যাঁর আমাকে বস্তু অর্পণ করায় এবং আমি সেই বস্তু স্বীকার করায় সত্যকার আনন্দ লাভ হয়, সেখানে সেই ভক্তের অর্পণ করা বস্তু স্বীকার করার কথাই আলাদা। পুণ্যময়ী ব্রজগোপিনীদের গৃহের ন্যায় সেই ভক্তদের গৃহে ঢুকে আমি তাঁদের সামগ্রী ভোগ করি। প্রকৃতপক্ষে আমি প্রেমের কাঙাল, বস্তুর কাঙাল নই !

প্রশ্ন—'**অহম্**' ও '**অশ্নামি**'র ভাব কী ?

উত্তর—এর প্রয়োগে ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে এইরূপ শুদ্ধ ভাবে প্রেমপূর্বক সমর্পণ করা বস্তু আমি স্বয়ং ভক্তের সামনে প্রকটিত হয়ে গ্রহণ করি অর্থাৎ যখন মানুষরূপে অবতীর্ণ হয়ে জগতে বিচরণ করি, তখন সেই রূপে সেখানে পৌঁছে এবং অন্য সময়ে ঐ ভক্তের ইচ্ছানুযায়ী রূপে প্রকট হয়ে তার প্রদত্ত বস্তুর ভোগ গ্রহণ করে তাকে কৃতার্থ করি।

সম্বন্ধ—যদি এমনই হয় তাহলে আমার কী করা উচিত, এই প্রশ্নে ভগবান অর্জুনকে তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে বলছেন—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ২৭

হে অর্জুন ! তুমি যে কর্ম কর, যা আহার কর, যা হোম কর, যা দান কর এবং যে তপস্যা কর, তা সবই আমাকে অর্পণ করো ॥ ২৭

প্রশ্ন—'**যৎ**' পদের সঙ্গে '**করোষি**', '**অশ্নাসি**', '**জুহোষি**', '**দদাসি**' ও '**তপস্যসি**' এই পাঁচটি ক্রিয়াসমূহ প্রয়োগের এখানে অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান সর্বপ্রকার কর্তব্য-কর্মের সমাহার করেছেন। অভিপ্রায় হল যে যজ্ঞ, দান ও তপের অতিরিক্ত জীবিকা-নির্বাহের জন্য করা বর্ণ, আশ্রম ও লোকব্যবহারের কর্ম এবং ভগবদ্-ভজন, ধ্যান ইত্যাদি যত প্রকার শাস্ত্রীয় কর্ম আছে, সে সবের সমাবেশ '**যৎকরোষি**' পদে, শরীর নির্বাহের জন্য পান-ভোজনাদি কর্মকে '**যদশ্নাসি**' পদে, পূজা ও হোম সম্বন্ধীয় সব কর্ম '**যজ্জুহোষি**' পদে, সেবা ও দান সম্পর্কীয় সমস্ত কর্ম '**যদ্দদাসি**' পদে এবং সংযম ও তপ সম্বন্ধীয় সব কর্মের সমাবেশ '**যৎ তপস্যসি**' পদের মাধ্যমে করা হয়েছে (১৭।১৪-১৭)।

প্রশ্ন—উপরোক্ত সমস্ত কর্ম ভগবানকে অর্পণ করা কাকে বলে ?

উত্তর—সাধারণ মানুষের ঐসব কর্মে মমতা ও আসক্তি থাকে এবং তারা সেই সকল কর্মে ফলের আশা করে। অতএব সমস্ত কর্মে ফলের ইচ্ছা, মমতা ও আসক্তি ত্যাগ করা এবং মনে করা যে সমস্ত জগৎ ভগবানের, আমার মন, বুদ্ধি, শরীর তথা ইন্দ্রিয়াদিও ভগবানের, আমি নিজেও তাঁরই, তাই আমার দ্বারা যে সব যজ্ঞকর্ম করা হয়, সেসব ভগবানেরই। পুতুল নাচানো সূত্রধরের মতো ভগবানই সব কিছু আমার দ্বারা করিয়ে নিচ্ছেন এবং তিনিই সর্বরূপে এই সবের ভোক্তা ; আমি তো শুধু নিমিত্তমাত্র—এই মনে করে যিনি ভগবানের আদেশানুসারে কেবল ভগবানের প্রসন্নতার জন্য নিষ্কামভাবে উপরোক্ত কর্ম করেন, তাঁর সেই কর্মই ভগবানকে অর্পিত বলে মনে করা হয়।

প্রশ্ন—প্রথমে অন্য কারো উদ্দেশ্যে করা কর্ম পরে

ভগবানকে অর্পণ করা, কর্ম করতে করতে মাঝখানে ভগবানকে অর্পণ করা, কর্ম শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা ভগবানকে অর্পণ করে দেওয়া অথবা কর্মের ফলই ভগবানকে অর্পণ করা—এই রূপ অর্পণ, বাস্তবে অর্পণ করা কি না ?

উত্তর—এইভাবে করাও ভগবানকেই অর্পণ করা। প্রথমে এমনই হয়। এইরূপ করতে করতেই উপরোক্ত প্রকারে সম্পূর্ণভাবে ভগবদর্পণ হয়ে থাকে।

সম্বন্ধ—এইভাবে সমস্ত কর্ম আপনাকে অর্পণ করলে কী হবে, এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন—

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি।। ২৮

এইভাবে, যাতে সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ করা হয়—এরূপ সন্ন্যাস যোগে যুক্ত হয়ে তুমি শুভাশুভ ফলরূপ কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে এবং তা থেকে মুক্ত হয়ে তুমি আমাকেই লাভ করবে।। ২৮

প্রশ্ন—'**এবম্**' পদের সঙ্গে '**সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা**' বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'**এবম্**' পদ প্রয়োগের ভাব হল যে এখানে 'সন্ন্যাসযোগ' পদ 'সাংখ্যযোগ' অর্থাৎ জ্ঞানযোগের বাচক নয়, কিন্তু পূর্বশ্লোক অনুসারে সমস্ত কর্ম ভগবানকে অর্পণ করে দেওয়াই এখানে '**সন্ন্যাসযোগ**'। তাই এরূপ সন্ন্যাসযোগের সঙ্গে যাঁর আত্মা যুক্ত থাকে, যাঁর মন ও বুদ্ধিতে পূর্বশ্লোকের বক্তব্য অনুযায়ী সমস্ত কর্ম ভগবানে অর্পণ করার ভাব সুদৃঢ় হয়েছে, তাঁকে '**সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা**' বলে জানা উচিত।

প্রশ্ন—শুভাশুভফলরূপ কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া কাকে বলে এবং তার থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানকে লাভ করা কীরূপ ?

উত্তর—ভিন্ন-ভিন্ন শুভাশুভ কর্ম অনুসারে স্বর্গ-নরক, পশু-পক্ষী এবং মনুষ্যাদির লোকে নানাপ্রকার যোনিতে জন্মগ্রহণ করা ও সুখ-দুঃখ ভোগ করা—এই হল শুভাশুভ ফল, একেই কর্মবন্ধন বলা হয় ; কারণ কর্মের ফলভোগ করাই হল কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। উপরোক্ত ভাবে সমস্ত কর্ম ভগবানে অর্পণ করা ব্যক্তি কর্মফলরূপ পুনর্জন্ম এবং সুখ-দুঃখের ভোগ থেকে মুক্ত হয়ে যায়, একেই বলে শুভাশুভ ফলরূপ কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া। মৃত্যুর পর ভগবানের পরমধামে যাওয়া বা এই জন্মেই ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে লাভ করা—এটিই হল কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানকে লাভ করা।

প্রশ্ন—আগের শ্লোকের বক্তব্য অনুসারে ভগবদর্পণ কর্মকারী ব্যক্তি অশুভ কর্ম তো করেন না, তাহলে অশুভ ফল থেকে মুক্ত হওয়ার কথা কীভাবে আসে ?

উত্তর—এইরূপ সাধনায় ব্যাপৃত হওয়ার আগে, পূর্বের অনেক জন্মে এবং এই জন্মেও তার দ্বারা যত অশুভ কর্ম হয়েছে এবং '**সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিব বাবৃতাঃ**' অনুসারে বিহিত কর্ম করায় যে আনুষঙ্গিক দোষ হয়—সে সব থেকেও সকল কর্মকে ভগবদর্পণকারী মানুষ (সাধক) মুক্ত হয়ে যান। এই ভাব পরিস্ফুট করার জন্য শুভ ও অশুভ দুপ্রকার কর্মফল থেকে মুক্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—শুভ কর্মের ফলকে বন্ধনকারক বলা হয়েছে কেন ?

উত্তর—পূর্ব শ্লোকের বক্তব্য অনুসারে যখন সমস্ত শুভকর্ম ভগবানকে অর্পণ করা হয়, তখন তার ফল হল ভগবৎপ্রাপ্তি। কিন্তু সকামভাবে করা শুভকর্ম ইহলোক ও পরলোকে ফলপ্রদানকারী হয়। যে কর্মের ফল ভোগপ্রাপ্তিদায়ক হয়, তা পুনর্জন্ম প্রদানকারী এবং ভোগেচ্ছা ও আসক্তির দ্বারাও আবদ্ধকারী হয়। তাই তার ফলকে বন্ধনকারক বলাই সঠিক। কিন্তু এর দ্বারা মনে করা উচিত নয় যে শুভকর্ম ত্যজনীয়। শুভকর্ম তো করা উচিত, কিন্তু তার কোনো ফলের আশা না করে তা ভগবানে সমর্পণ করা উচিত। এরূপ হলে তার ফল বন্ধনকারক না হয়ে ভগবান লাভের কারণ হয়।

সম্বন্ধ—উপরোক্ত প্রকারে ভগবানে ভক্তি করলে তাঁর প্রাপ্তি হয়, অন্যদের হয় না—এই বক্তব্যে ভগবানে বৈষম্যদোষের আশঙ্কা হতে পারে—অতএব তার নিবারণ করতে গিয়ে ভগবান বলেছেন—

সমোহহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥ ২৯

আমি সর্বভূতে সমানভাবে বিরাজ করি, আমার প্রিয় বা অপ্রিয় কেউ নেই ; কিন্তু যে ভক্ত আমাকে ভক্তি ও প্রেমসহ ভজনা করেন, তিনি আমাতে এবং আমিও তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে প্রকটিত হই॥ ২৯

প্রশ্ন—'আমি সর্বভূতে (প্রাণীতে) সমভাবে বিরাজিত' এবং 'আমার কেউই প্রিয় বা অপ্রিয় নেই'—এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথায় ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে, আমি ব্রহ্মা থেকে স্তম্ভ পর্যন্ত সমস্ত প্রাণীতে অন্তর্যামীরূপে সমানভাবে ব্যাপ্ত থাকি। সুতরাং সবার প্রতি আমার সমভাব থাকে, কারো প্রতি আমার রাগ (আসক্তি) বা দ্বেষ নেই। তাই প্রকৃতপক্ষে কেউই আমার প্রিয় বা অপ্রিয় নয়।

প্রশ্ন—ভক্তি দ্বারা ভগবানের ভজন করা কী এবং 'তাঁরা আমাতে এবং আমিও তাঁদের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে প্রকটিত হই'—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভগবানের সাকার বা নিরাকার—যে কোনো রূপ শ্রদ্ধা ও প্রেমসহ নিরন্তর চিন্তা করা ; তাঁর নাম, গুণ, প্রভাব, মহিমা, লীলা চরিত্র শ্রবণ, মনন, কীর্তন করা, তাঁকে প্রণাম করা ; পত্র-পুষ্পাদি সামগ্রী দ্বারা তাঁকে প্রেমপূর্বক পূজা করা এবং নিজের সমস্ত কর্ম তাঁকে অর্পণ করা ইত্যাদি সকল ক্রিয়ার নাম ভক্তিসহকারে ভগবানের ভজন করা।

যে ব্যক্তি এইভাবে ভগবানকে ভজনা করেন, ভগবানও তাঁকে সেইভাবে ভজনা করেন। তিনি যেমন ভগবানকে ভোলেন না, ভগবানও তাঁকে তেমনই ভোলেন না। এই ভাব দেখাবার জন্য ভগবান তাঁকে নিজের মধ্যে প্রকটিত বলেছেন। ঐসব ভক্তের বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ ভগবদ্প্রেমে পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তাই তাঁদের হৃদয়ে ভগবান সদা-সর্বদা প্রত্যক্ষরূপে প্রকটিত থাকেন। এই ভাব লক্ষ্য করাবার জন্য ভগবান নিজেকে তাঁদের মধ্যে প্রকটিত বলেছেন।

অভিপ্রায় হল যে এই অধ্যায়ের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোক অনুসারে ভগবানের নিরাকাররূপ সমস্ত চরাচর প্রাণীর মধ্যে ব্যাপ্ত এবং সমস্ত চরাচর প্রাণী তাঁর মধ্যে সর্বদা স্থিত হওয়া সত্ত্বেও ভগবানের নিজ ভক্তদের তাঁর হৃদয়ে বিশেষভাবে ধারণ করা এবং তাঁদের হৃদয়ে স্বয়ং নিজে প্রত্যক্ষরূপে নিবাস করা ভক্তদের ভক্তির কারণেই হয়ে থাকে। তাই ভগবান ঋষি দুর্বাসাকে বলেছিলেন—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৯।৪।৬৮)

'সাধু (ভক্ত) আমার হৃদয় এবং আমি তাদের হৃদয়। তিনি আমাকে ছাড়া আর কাউকে জানেন না এবং আমিও তাঁকে ছেড়ে আর কাউকে জানি না।'

যেমন সমভাবে সর্বত্র প্রকাশদাতা সূর্য দর্পণ ইত্যাদি স্বচ্ছ বস্তুতে উজ্জ্বলভাবে প্রতিবিম্বিত হয়, কাষ্ঠ ইত্যাদিতে নয়, কিন্তু তাতে সূর্যের কোনো বৈষম্য নেই, তেমনই ভগবানও ভক্তদের দ্বারা লভ্য, অন্যদের দ্বারা নয়—এতেও তাঁর কোনো বৈষম্য নেই, এ তো ভক্তিরই মহিমা।

সম্বন্ধ—উপাসনাকারীদের মধ্যে ভগবান নিজ সমভাব প্রদর্শিত করে এবার পরবর্তী দুটি শ্লোকে দুরাচারীদেরও শাশ্বত শান্তি লাভ করার কথা ঘোষণা করে তাঁর ভক্তির বিশেষ মহিমা জানাচ্ছেন—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥ ৩০

যদি কোনো অত্যন্ত দুরাচারী ব্যক্তিও অনন্যভাবে আমাকে ভক্তিপূর্বক ভজনা করে, তাকে সাধু বলে

মনে করা উচিত কারণ সে যথার্থ নিশ্চয়সম্পন্ন। অর্থাৎ সে অবিচল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে পরমেশ্বরের ভজনার সমকক্ষ আর কিছুই নেই ॥ ৩০

প্রশ্ন—কী অভিপ্রায়ে **'অপি'** প্রয়োগ করা হয়েছে ?

উত্তর—**'অপি'** প্রয়োগের দ্বারা ভগবান তাঁর সমভাব প্রতিপাদন করেছেন। অর্থাৎ সদাচারী এবং সাধারণ পাপীগণ তো আমার উপাসনা করলে উদ্ধার হয়ে যাবেন—এতে বলার কিছু নেই, কিন্তু উপাসনা দ্বারা অত্যন্ত দুরাচারীও উদ্ধার লাভ করতে সক্ষম।

প্রশ্ন— **'চেত্'** অব্যয়টি এখানে কেন প্রয়োগ করা হয়েছে ?

উত্তর—**'চেত্'** অব্যয় **'যদি'** অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর প্রয়োগ করে ভগবান দেখিয়েছেন যে, প্রায়শঃ দুরাচারী ব্যক্তি বিষয়াদিতে ও পাপে আসক্ত থাকায় প্রেমপূর্বক আমার উপাসনা করে না। তবুও কোনো পূর্ব সংস্কারের জাগৃতি, ভগবদ্‌ভাবময় পরিস্থিতি, শাস্ত্রাধ্যয়ন কিংবা মহাত্মা পুরুষের সংসঙ্গে আমার গুণ, প্রভাব, মহত্ত্ব ও রহস্য শ্রবণ করে যদি কখনও দুরাচারী ব্যক্তির আমার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি জাগে এবং সে আমার উপাসনায় রত হয়, তাহলে সে-ও উদ্ধার হয়ে যায়।

প্রশ্ন—**'সুদুরাচারঃ'** পদ কীরূপ মানুষদের বাচক এবং তাদের **'অনন্যভাক্'** হয়ে ভগবানকে ভজনা করা কীরূপ ?

উত্তর—যার আচরণ অত্যন্ত খারাপ, খাওয়া-দাওয়া, চাল-চলন ভ্রষ্ট, নিজ স্বভাব, আসক্তি ও বদভ্যাসে বিবশ হওয়ায় যে দুরাচার ত্যাগ করতে পারে না, এরূপ মানুষের বাচক এই **'সুদুরাচারঃ'** পদটি। এরূপ মানুষের ভগবানের গুণ, প্রভাব ইত্যাদি শোনা, পড়া বা অন্য কোনো কারণে ভগবানকে সর্বোত্তম বলে বুঝে নেওয়া ও একমাত্র ভগবানকেই আশ্রয় করে অতিশয় শ্রদ্ধা-প্রেমপূর্বক তাঁকে ইষ্টদেব মনে করা—এই হল তাঁর **'অনন্যভাক্'** হওয়া। এইভাবে ভগবানের ভক্ত হয়ে তাঁর স্বরূপের চিন্তা করা, নাম, গুণ, মহিমা ও প্রভাব শ্রবণ, মনন এবং কীর্তন করা, তাঁকে প্রণাম করা, পত্র-পুষ্পাদি বস্তু অর্পণ করে তাঁর পূজা করা এবং নিজের শুভ কর্মাদি ভগবানকে সমর্পণ করা—একেই বলে **'অনন্যভাক্'** হয়ে ভগবানকে ভজনা করা।

প্রশ্ন—এরূপ ব্যক্তিকে **'সাধু'** বলে মেনে নেবার কথা বলে তাকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী বলাতে ভগবানের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান জানাচ্ছেন যে, আমার ভক্ত দুরাচার ত্যাগ করার জন্য সম্পূর্ণভাবে ইচ্ছা ও চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি স্বভাব ও অভ্যাসের বশীভূত হয়ে পূর্ণভাবে দুরাচার ত্যাগ করতে না পারে, তাহলেও তাঁকে দুষ্ট মনে না করে সাধুই মনে করা উচিত। কারণ তিনি দৃঢ়ভাবে স্থির করেছেন যে 'ভগবান পতিত পাবন, সকলের সুহৃদ্, সর্বশক্তিমান, পরম দয়ালু, সর্বজ্ঞ, সকলের প্রভু ও সর্বোত্তম, তাঁর ভজনা করাই মনুষ্য-জীবনের পরম কর্তব্য ; এর দ্বারা সমস্ত পাপ ও পাপবাসনা সমূলে নাশ হয়ে ভগবদ্‌কৃপায় আমার স্বতঃই ভগবান লাভ হবে।' এ অত্যন্ত উত্তম ও সঠিক সিদ্ধান্ত। যিনি এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তিনিই আমার ভক্ত ; এবং আমার ভক্তির প্রতাপে তিনি শীঘ্রই পূর্ণ ধর্মাত্মা হয়ে উঠবেন। সুতরাং তাঁকে পাপী কিংবা দুষ্ট মনে না করে সাধুই মানা উচিত।

প্রশ্ন—সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে 'দুষ্কৃতি (দুরাচারী) ব্যক্তিরা আমার উপাসনা করে না' আর এখানে দুরাচারীর উপাসনার ফল জানাচ্ছেন। ভগবানের এইরূপ কথায় বিরুদ্ধভাব প্রতীত হয়, এর সমাধান কী ?

উত্তর—ওখানে যে দুরাচারীদের বর্ণনা করা হয়েছে, তারা শুধু পাপই করে না ; তাদের ভগবানে বিশ্বাসও নেই, ভগবানকে মানেও না এবং পাপকর্ম থেকেও বাঁচতে চায় না। তাই ঐসব নাস্তিক, মূর্খ ব্যক্তিদের জন্য **'মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ'**, **'নরাধমাঃ'** ও **'আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ'** ইত্যাদি বিশেষণ প্রযুক্ত হয়েছে, কিন্তু এখানে যাদের বর্ণনা করা হয়েছে, তারা পাপ করলেও তার থেকে মুক্তি পাবার জন্য ব্যগ্র। এঁদের ভগবানের গুণ, প্রভাব, স্বরূপ ও নামে ভক্তি থাকে এবং এঁরা দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে স্থির করে নিয়েছেন যে 'একমাত্র পতিতপাবন, পরম দয়ালু পরমেশ্বরই সকলের থেকে পরম শ্রেষ্ঠ। তিনিই আমাদের পরম ইষ্টদেব, তাঁর উপাসনা করাই মনুষ্য-জীবনের পরম কর্তব্য। তাঁর কৃপাতেই আমাদের পাপ সমূলে নাশ হয়ে যাবে এবং আমরা সহজেই তাঁকে লাভ

করতে পারব।' তাইজন্য এঁদের 'সম্যগব্যবসিতঃ' এবং 'অনন্যভাক্' ভক্ত বলা হয়েছে। অতএব এঁদের দ্বারা ভজন হওয়া খুবই স্বাভাবিক। নাস্তিকদের ভগবানে বিশ্বাস থাকে না, তাই তাঁদের দ্বারা ভজন করা সম্ভব হয় না। সুতরাং ভগবানের দুটি বক্তব্যে কোনো বিরোধ নেই। প্রসঙ্গভেদে উভয় বক্তব্যই ঠিক।

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।। ৩১

সেই ব্যক্তি শীঘ্রই ধর্মাত্মা হন এবং শাশ্বত শান্তি লাভ করেন। হে কৌন্তেয় ! তুমি নিশ্চিতরূপে জেনো যে আমার ভক্ত কখনও বিনাশপ্রাপ্ত হয় না।। ৩১

প্রশ্ন—উপরোক্ত প্রকারে ভগবানের ভজনাকারী ভক্তের শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়ে যাওয়া কেমন এবং 'শাশ্বত শান্তি' লাভ কী ?

উত্তর—এই জন্মে অতি সত্বর সর্বপ্রকার দুর্গুণ ও দুরাচারশূন্য হয়ে ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকে বর্ণিত দৈবী সম্পদযুক্ত হওয়া অর্থাৎ ভগবদ্-প্রাপ্তির পাত্র হয়ে ওঠাই শীঘ্র ধর্মাত্মা হওয়া। চিরস্থায়ী যে শান্তি, যে একবার তা লাভ করেছে, তারপর আর কখনও তার অভাব হয় না, যাকে নৈষ্ঠিকী শান্তি (৫।১২), নির্বাণপরমা শান্তি (৬।১৫) ও পরমা শান্তি (১৮।৬২) বলা হয়, পরমেশ্বর প্রাপ্তিরূপ সেই শান্তি লাভ করাই হল 'শাশ্বত শান্তি' লাভ করা।

প্রশ্ন—'প্রতিজানীহি' পদের অর্থ কী এবং এটি প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'প্রতি' উপসর্গের সঙ্গে 'জ্ঞা' ধাতুর দ্বারা গঠিত হয়েছে 'প্রতিজানীহি' পদ। এর অর্থ 'প্রতিজ্ঞা করো' বা 'দৃঢ় সিদ্ধান্ত নাও'। এখানে এর প্রয়োগে ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে, 'অর্জুন ! আমি যে তোমাকে আমার ভক্তির ও ভক্তের এই মহত্ত্বের কথা বলেছি, তাতে তুমি কিঞ্চিৎমাত্রও সংশয় না করে সর্বতোভাবে সত্য বলে জেনো এবং দৃঢ়তা সহকারে ধারণ করো।

প্রশ্ন—'আমার ভক্ত বিনাশপ্রাপ্ত হয় না' এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে 'প্র' উপসর্গের সঙ্গে 'নশ্যতি' ক্রিয়ার ভাবার্থ হল পতন হওয়া। সুতরাং এখানে ভগবানের বলার অভিপ্রায় হল যে আমার ভক্তের ক্রমশঃ উন্নতিই হয়ে থাকে, পতন হয় না। অর্থাৎ তিনি নিজ অবস্থান থেকে কখনো পতিত হন না বা তাঁর নীচ যোনি বা নরকপ্রাপ্তিরূপ দুর্গতিও হয় না ; তিনি পূর্ব বক্তব্য অনুসারে ক্রমশঃ দুর্গুণ-দুরাচার রহিত হয়ে শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়ে ওঠেন এবং পরমশান্তি লাভ করেন।

প্রশ্ন—এরূপ কোনো ভক্তের উদাহরণ আছে কী ?

বিল্বমঙ্গল

উত্তর—অনেক উদাহরণ আছে। বর্তমান সময়ের উদাহরণ হল ভক্তিরসপূর্ণ 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' কাব্যের রচয়িতা শ্রীবিল্বমঙ্গলের। দক্ষিণের কৃষ্ণবেণী নদীতীরে এক গ্রামে রামদাস নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন, বিল্বমঙ্গল ছিলেন তাঁর পুত্র। বিল্বমঙ্গল ছিলেন শিক্ষিত এবং শান্ত, শিষ্ট ও সাধুস্বভাবসম্পন্ন ; কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর কুসঙ্গে পড়ে অত্যন্ত দুরাচারী হয়ে গিয়েছিলেন। বেশ্যাগৃহে পড়ে থাকা এবং দিন-রাত পাপকর্মে লিপ্ত থাকাই ছিল তাঁর কাজ। চিন্তামণি নামক এক বেশ্যার প্রতি তিনি অনুরক্ত ছিলেন, সে নদীর অপর পারে থাকত। পিতার শ্রাদ্ধ থাকায় তিনি দিবাকালে চিন্তামণির ঘরে যেতে পারেননি। দেহ গৃহে থাকলেও, মন ছিল বেশ্যা গৃহে। শ্রাদ্ধের কাজ সমাপ্ত হতে-হতে সন্ধ্যা হয়ে গেল, তিনি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। সকলে বললেন—আজ পিতার শ্রাদ্ধ, আজ যেও না। কিন্তু কে কার কথা শোনে। দৌড়ে নদীতীরে এলেন। ঝড় উঠেছিল, মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হল। মাঝিরা ভয়ে নৌকা নদীর ধারে বেঁধে গাছতলায় আশ্রয় নিয়েছিল। অত্যন্ত ভয়াবহ রাত, বিল্বমঙ্গল মাঝিদের বুঝিয়ে অনেক লোভ দেখালেন ; কিন্তু প্রাণ দিতে কেউ প্রস্তুত নয়। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা তো অন্যরকম, আগু-পিছু চিন্তা না করেই তিনি নদীতে লাফ দিয়ে পড়লেন। কোনো এক নারীর পচা-গলা মৃতদেহ নদীজলে ভেসে যাচ্ছিল, অন্ধকারে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল

না আর বিল্বমঙ্গল সেইসময় কামান্ধ ছিলেন। তিনি কাঠ ভেবে সেটি আঁকড়ে ধরলেন। মড়া বা দুর্গন্ধ কোনো কিছু খেয়াল না করে দৈবযোগে অন্যপারে পৌঁছে গেলেন এবং এক দৌড়ে চিন্তামণির ঘরে গেলেন। ঘরের দরজা বন্ধ ছিল, কিন্তু তার ছট্‌ফটানি ছিল অদ্ভুত রকমের। তিনি দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে ভেতের যেতে চাইলেন, হাত বাড়াতে একটি রেশমের মতো কোমল দড়িতে হাত লাগল—সেটি ছিল এক কাল সর্প, দেওয়ালে তার ফণা, সে নীচের দিকে আটকে ছিল। ভগবানের অনুগ্রহে সাপটি তাঁকে কামড়ায়নি। তিনি গিয়ে চিন্তামণিকে জাগালেন। তাঁকে দেখে চিন্তামণি কেঁপে উঠল, জিজ্ঞাসা করল—এই ভয়ানক রাতে নদী পেরিয়ে বন্ধঘরে কী করে এলে ? বিল্বমঙ্গল কীভাবে কাঠে চড়ে নদীপার হয়ে দড়ির সাহায্যে দেওয়ালে উঠলেন তা জানালেন। বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। চিন্তামণি প্রদীপ হাতে বাইরে এসে দেখল দেওয়ালে এক ভীষণ কাল সর্প ঝুলে আছে এবং নদীতীরে একটি গলিত শবদেহ পড়ে আছে। বিল্বমঙ্গলও দেখলেন এবং দেখে কেঁপে উঠলেন। চিন্তামণি তাঁকে তিরস্কার করে বলল—'তুমি ব্রাহ্মণ ! আরে, আজ তোমার বাবার শ্রাদ্ধ ছিল, তা সত্ত্বেও এক হাড়-মাংসের পুতুলের জন্য তুমি এতো আসক্ত হয়ে পড়েছ যে নিজের সমস্ত ধর্ম-কর্ম জলাঞ্জলি দিয়ে এই ভয়ংকর রাত্রে এক মড়া ও সাপের সাহায্যে এখানে দৌড়ে এসেছ ! তুমি আজ যাকে পরম সুন্দর মনে করে এইভাবে পাগল হচ্ছ, তারও একদিন এই দশা হবে যা তোমার সামনে পচা মড়া হয়ে পড়ে আছে। তোমার এই নীচ বৃত্তিকে ধিক্কার জানাই। আরে ! তুমি যদি এইভাবে ঐ মনোমোহন শ্যামসুন্দরে আসক্ত হতে—যদি তাঁর সাক্ষাৎ পাবার জন্য এরকম ছট্‌ফট করে দৌড়তে তাহলে অবশ্যই তাঁকে লাভ করে কৃতার্থ হয়ে যেতে !

বেশ্যার উপদেশে জাদুর মতো কাজ হল। বিল্বমঙ্গলের হৃদয়তন্ত্রী নতুন সুরে বেজে উঠল। বিবেকের আগুন জ্বলে উঠল, তাতে সমস্ত পাপ জ্বলে ছাই হয়ে গেল। অন্তর শুদ্ধ হতেই ভগবদ্‌-প্রেমের সমুদ্র উথলে উঠল আর চোখ দিয়ে জলের ধারা বইতে লাগল। বিল্বমঙ্গল চিন্তামণির পা জড়িয়ে ধরে বললেন—'মা ! তুমি আজ আমার বিবেক দৃষ্টি খুলে দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করলে।' মনে মনে চিন্তামণিকে গুরু মেনে প্রণাম করলেন। সারারাত চিন্তামণি তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের লীলা সঙ্গীত শোনালেন। বিল্বমঙ্গলের ওপর তার খুব প্রভাব পড়ল। প্রভাত হতেই জগচ্চিন্তামণি শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন হয়ে বিল্বমঙ্গল পাগলের মতো চিন্তামণির ঘর ছেড়ে বার হলেন। তাঁর জীবন-নাটকের ছবি বদলে গেল। বিল্বমঙ্গল কৃষ্ণবেণী নদীতীরে বসবাসকারী মহাত্মা সোমগিরির কাছে গেলেন এবং তাঁর কাছে গোপাল-মন্ত্রের দীক্ষা লাভ করে ভজনে ব্যাপৃত হলেন। তিনি ভগবানের নাম-কীর্তন করে বিচরণ করতে লাগলেন। মনে ভগবানের দর্শনের আশা জেগে উঠল ; কিন্তু তখনও দুরাচারী স্বভাব একেবারে বিনষ্ট হয়নি। বদ্‌অভ্যাসে বিবশ তাঁর মন পুনরায় এক যুবতীর দিকে ধাবিত হল। বিল্বমঙ্গল তার ঘরের দরজায় গিয়ে বসলেন। ঘরের মালিক বাইরে এসে দেখলেন এক মলিনমুখ ব্রাহ্মণ বাইরে বসে আছেন। তিনি তাঁকে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। বিল্বমঙ্গল তাঁকে সব সত্য ঘটনা বললেন এবং জানালেন যে তিনি ঐ যুবতীকে একবার প্রাণ ভরে দেখতে চান। যুবতী সেই সজ্জন ব্যক্তির পত্নী ছিলেন। তিনি ভাবলেন, এতে ক্ষতি কী ? যদি তাঁর স্ত্রীকে দেখলে ব্রাহ্মণ তৃপ্তি পান তো ঠিক আছে ! সাধু স্বভাব শেঠ তাঁর পত্নীকে ডাকতে অন্দরে গেলেন। এদিকে বিল্বমঙ্গলের মন-সমুদ্রে নানাপ্রকার তরঙ্গের তুফান উঠতে লাগল।

বিল্বমঙ্গল ভগবানের ভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর পতন হবে কী করে ? দীনবৎসল ভগবান অজ্ঞানান্ধ বিল্বমঙ্গলকে বিবেক চক্ষু প্রদান করলেন ; তাঁর নিজ অবস্থার সত্যতার জ্ঞান হয়ে গেল, হৃদয় ব্যথায় ভরে গেল এবং কি জানি কি ভেবে তিনি নিকটস্থ বেলগাছ থেকে দুটি কাঁটা ছিঁড়ে আনলেন। এর মধ্যে সেই ব্যক্তি তাঁর ধর্মপত্নীসহ সেখানে এলেন। বিল্বমঙ্গল তাঁকে দেখলেন এবং মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বললেন, 'অভাগী চোখ ! তুমি যদি না থাকতে, তাহলে কি আমার এতো পতন হত ?' এই বলে বিল্বমঙ্গল, হয়তো এটি তার দুর্বলতা বা অন্য কিছু, সেই সময় তিনি ভেবেছিলেন যে ঐ চঞ্চল নেত্র দুটিকে দণ্ড দেওয়াই সমীচীন হবে, তাই তিনি তৎক্ষণাৎ সেই বেল কাঁটা দিয়ে দুটি চক্ষু ফুটো করে

দিলেন। চোখ দিয়ে রক্তের ধারা প্রবাহিত হল। বিল্বমঙ্গল হাসি ও নৃত্যে তুমুল হরিধ্বনি করে আকাশ কাঁপিয়ে তুললেন। সেই ব্যক্তি এবং তাঁর পত্নী অত্যন্ত দুঃখিত হলেন, কিন্তু তাঁরা নিরুপায় ছিলেন। বিল্বমঙ্গলের অবশিষ্ট আসক্তিও দূর হয়ে গেল এবং তিনি সেই অনাথের নাথকে পাবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

পরম প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের বিয়োগ ব্যথায় তাঁর অন্ধ চক্ষু দিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা জল পড়ত। তাঁর ক্ষুধা-তৃষ্ণা বা শয়ন-জাগরণের কোনো হুঁশ ছিল না। 'কৃষ্ণ-কৃষ্ণ' নাম করে চতুর্দিক কাঁপিয়ে বিল্বমঙ্গল গ্রামে গ্রামে, জঙ্গলে জঙ্গলে ভ্রমণ করতে লাগলেন। যে দীনবন্ধুর জন্য জেনেশুনে অন্ধ হয়েছিলেন, যে প্রিয়তমকে পাবার আশায় আরাম-আয়েশ ত্যাগ করেছিলেন—তাঁকে পেতে এতো দেরী—একি সহ্য করা যায় ? এই অবস্থায় প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ কী করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন ? একটি ছোট গোপ বালকের বেশে ভগবান বিল্বমঙ্গলের কাছে এসে তাঁর মনমোহিনী মধুর কণ্ঠস্বরে বললেন, 'সুরদাসজী ! আপনার বোধ হয় খুব খিদে পেয়েছে ? আমি কিছু মিষ্টি এনেছি, জলও এনেছি ; আপনি এটি নিন।' সেই বালকের মধুর স্বরে বিল্বমঙ্গলের প্রাণ মোহিত হয়ে গিয়েছিল, তাঁর হাতের দুর্লভ প্রসাদ পেয়ে তাঁর হৃদয় উথলে উঠল। বিল্বমঙ্গল বালককে জিজ্ঞাসা করলেন —'বাবা ! তোমার ঘর কোথায় ? তোমার নাম কী ? তুমি কী কর ?'

বালক বললেন—'আমার ঘর কাছেই। আমার কোনো নাম ঠিক নেই, যে আমাকে যে নামে ডাকে, আমি সেই নামেই সাড়া দিই, আমি গরু চরাই। আমাকে যে ভালোবাসে, আমিও তাকে ভালোবাসি।' বিল্বমঙ্গল তাঁর মধুর কথাতে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। বালক যেতে যেতে বলে গেলেন —'আমি রোজ এসে আপনাকে আহার করাব।' বিল্বমঙ্গল বললেন—'খুব ভালো কথা, তুমি রোজ এসো।' বালক চলে গেলেন আর সঙ্গে বিল্বমঙ্গলের মনও নিয়ে গেলেন। বালক রোজ এসে তাঁকে আহার করাতেন।

বিল্বমঙ্গল তো জানতে পারেননি যে তিনি যাঁর জন্য ফকির হয়েছেন এবং চোখ অন্ধ করেছেন, এই বালক তিনিই ; কিন্তু এই গোপ বালক তাঁর হৃদয় এতোটাই অধিকার করেছিলেন যে তাঁর অন্য কোনো কথাই আর ভালো লাগত না। বিল্বমঙ্গল একদিন মনে মনে চিন্তা করলেন যে 'সমস্ত বাধা ছেড়ে এখানে এসেছি, এখানে এই নতুন বিপদ এসে হাজির, নারীর মোহ দূর হল তো এই বালকের মোহে আবদ্ধ হলাম।' তিনি একথা যখন ভাবছিলেন, তখনই সেই রসিক বালক তাঁর কাছে এসে বসলেন এবং তাঁর সেই পাগল করা কণ্ঠস্বরে বললেন—'বাবা চুপ করে কী ভাবছেন ? বৃন্দাবন যাবেন ?' বৃন্দাবনের নাম শুনেই বিল্বমঙ্গলের প্রাণ নেচে উঠল, কিন্তু নিজের অক্ষমতার কথা জানিয়ে বললেন—'বাবা, আমি অন্ধ, কী করে বৃন্দাবনে যাব।' বালক বললেন—'এই নাও আমার লাঠি ! আমি এটি ধরে তোমার সঙ্গে যাব।' বিল্বমঙ্গল আনন্দে উৎফুল্ল হলেন, লাঠি ধরে ভগবান ভক্তের আগে আগে চলতে লাগলেন। ধন্য দয়ালুভাব ! ভক্তকে লাঠি ধরে রাস্তা দেখাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর বালক বললেন, 'নাও ! বৃন্দাবনে এসে গেছি, এবার আমি যাচ্ছি।' বিল্বমঙ্গল বালকের হাত ধরে ফেললেন। হাতের স্পর্শ পেয়েই তাঁর শরীরে যেন বিদ্যুৎ বয়ে গেল, সাত্ত্বিক আলোয় সমস্ত দ্বার প্রকাশিত হয়ে গেল। বিল্বমঙ্গল দিব্য-দৃষ্টি লাভ করলেন এবং তিনি দেখলেন যে বালকরূপে সাক্ষাৎ তাঁর শ্যামসুন্দরই বিরাজমান। বিল্বমঙ্গল পুলকিত হয়ে গেলেন, চোখ দিয়ে প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। তিনি ভগবানের হাত আরও জোরে চেপে ধরলেন এবং বললেন— 'এবার চিনে নিয়েছি, অনেক দিন পর ধরতে পেরেছি। প্রভো ! আর ছাড়ব না।' ভগবান বললেন, 'ছাড়বে কি না ?' বিল্বমঙ্গল বললেন— 'না, কখনো না, ত্রিকালেও না।'

ভগবান জোরে ঝট্‌কা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিলেন। আরে, যাঁর বলে বলান্বিত হয়ে মায়া সমগ্র জগৎকে পদদলিত করে রেখেছে, তাঁর বলের কাছে বেচারী অন্ধ বিল্বমঙ্গলের কীই বা করার ছিল, হাত ছাড়াতেই বিল্বমঙ্গল বললেন, 'যাচ্ছেন ! কিন্তু স্মরণ রাখবেন।'

হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াদ্যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে।।

'হে কৃষ্ণ ! তুমি বলপূর্বক আমার থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছ এতে আর আশ্চর্য কী ? আমি তোমার বীরতা

তখনই বুঝব যখন তুমি আমার হৃদয় থেকে চলে যাবে।'

বিল্বমঙ্গল অত্যন্ত দুরাচারী ছিলেন, ভক্ত হয়েছিলেন এবং পতনের কারণ সামনে এলেও তিনি রক্ষা পান এবং শেষকালে ভগবানকে লাভ করে কৃতার্থ হয়ে যান। বৃন্দাবন যাওয়ার সময় তিনি পথে ভাবাবেশে যে মধুর পদ্য রচনা করেন, তার নাম 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত'। তার প্রথম শ্লোকেই তিনি চিন্তামণিকে গুরু বলে তাঁর বন্দনা করেছেন—

চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরির্গুরুর্মে
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবাঞ্ছিখিপিচ্ছমৌলিঃ।
যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু
লীলাস্বয়ংবররসং লভতে জয়শ্রীঃ॥

'আমার মোহ দূরকারী চিন্তামণি বেশ্যা এবং দীক্ষাগুরু সোমগিরির জয় হোক! মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ ধারণকারী আমার শিক্ষাগুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জয় হোক। যাঁর চরণরূপী কল্পবৃক্ষের পাতার শিখরে বিজয়লক্ষ্মী লীলার দ্বারা স্বয়ংবর সুখ লাভ করেন (অর্থাৎ ভক্তদের ইচ্ছা পূর্ণকারী বিজয়লক্ষ্মী সর্বদা যাঁর চরণে নিজ ইচ্ছায় বাস করেন)!'

শ্রীশুকদেবের ন্যায় শ্রীবিল্বমঙ্গলও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধুময় লীলা আস্বাদন করেছিলেন, তাই তাঁর আর এক নাম 'লীলাশুক'।

সম্বন্ধ—এইরূপ নিজের মধ্যে সদাচার ও দুরাচারের কারণে হওয়া বৈষম্যের অভাব দেখিয়ে এবার দুটি শ্লোকে ভগবান জাতিগত ভালো-মন্দে নিজের বৈষম্যের অভাব দেখিয়ে শরণাগতিরূপ ভক্তির মহত্ত্ব প্রতিপাদন করে অর্জুনকে ভজন করার নির্দেশ দিয়েছেন—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥ ৩২

হে অর্জুন! স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র এবং পাপযোনিতে জন্ম চণ্ডালাদি—যে কেউই হোক না কেন, তারাও আমার শরণ গ্রহণ করে পরম গতি লাভ করে॥ ৩২

প্রশ্ন—'পাপযোনয়ঃ' পদ এখানে কীসের বাচক?

উত্তর—পূর্বজন্মের পাপের জন্য চণ্ডাল যোনিতে উৎপন্ন প্রাণীদের 'পাপযোনি' বলা হয়। এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রানুসারে হূণ, ভীল, যবন ইত্যাদি ম্লেচ্ছ জাতির মানুষদেরও 'পাপযোনি' মনে করা হয়। এখানে 'পাপযোনি' পদ এদের সকলেরই বাচক। ভগবানকে ভক্তি করার জন্য কোনো জাতি বা বর্ণের কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। সেখানে একমাত্র শুদ্ধ প্রেমের প্রয়োজনীয়তা থাকে*। এরূপ জাতিদের মধ্যে প্রাচীন এবং আধুনিক কালে ভগবানের অনেক এরূপ মহাভক্ত হয়েছেন, যাঁরা ভক্তির দ্বারা ভগবানকে লাভ করেছেন। এঁদের মধ্যে নিষাদজাতির গুহ প্রভৃতির নাম অত্যন্ত প্রসিদ্ধ।

নিষাদরাজ গুহ

নিষাদজাতির গুহ শৃঙ্গবেরপুরে ভীলেদের রাজা ছিলেন। ভগবান শ্রীরাম যখন সীতাদেবী ও শ্রীলক্ষ্মণসহ বনে এলেন, তখন তাঁরা এঁর আতিথ্য গ্রহণ করেন। ভগবান এঁকে তাঁর সখা মনে করতেন। তাই হীনবর্ণে জন্মগ্রহণ সত্ত্বেও শ্রীভরত তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন।

*(১) নাস্তি তেষু জাতিবিদ্যারূপকুলধনক্রিয়াদিভেদঃ। (নারদভক্তিসূত্র ৭২)

'ভক্তদের মধ্যে জাতি, বিদ্যা, রূপ, কুল, ধন এবং ক্রিয়াদির কোনো পার্থক্য নেই।'

(২) আনিন্দ্যযোন্যধিক্রিয়তে পারম্পর্যাৎ সামান্যবৎ। (শাণ্ডিল্যভক্তিসূত্র ৭৮)

'শাস্ত্রপরম্পরায় অহিংসাদি সাধারণ ধর্মের ন্যায় ভক্তিতেও চণ্ডাল ইত্যাদি সকল নিন্দনীয় মানুষেরই অধিকার থাকে।'

(৩) ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াঽঽত্মা প্রিয়ঃ সতাম্। ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৪।২১)

'হে উদ্ধব! সাধুদের পরমপ্রিয় 'আত্মা' রূপ আমি একমাত্র শ্রদ্ধা-ভক্তি দ্বারাই বশীভূত হই। আমার ভক্তি চণ্ডালরূপে জন্মগ্রহণ করা মানুষকেও পবিত্র করে।'

করত দণ্ডবত দেখি তেহি ভরত লীন্হ উর লাই।
মনহুঁ লখন সন ভেঁট ভই প্রেমু ন হৃদয়ঁ সমাই॥

প্রশ্ন—যদি 'পাপযোনয়ঃ' পদটিকে নারী, বৈশ্য এবং শূদ্রের বিশেষণ মনে করা হয়, তাহলে ক্ষতি কী?

উত্তর—বৈশ্যদের দ্বিজরূপে গণ্য করা হয়। শাস্ত্রে তাঁদের বেদ পাঠ এবং যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম করার পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছে। সুতরাং দ্বিজরূপে বৈশ্যদের 'পাপযোনি' বলা যায় না। তাছাড়া ছান্দোগ্যোপনিষদে যেখানে জীবেদের কর্মানুরূপ গতির বর্ণনা আছে, সেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে—

তদ্য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বাথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরঞ্শ্বযোনিং বা সূকরযোনিং বা চাণ্ডালযোনিং বা॥ (অধ্যায় ৫, খণ্ড ১০ মং ৭)

'সেই সব জীব যারা ইহলোকে রমণীয় আচরণ সম্পন্ন অর্থাৎ পুণ্যাত্মা হন, তাঁরা শীঘ্রই উত্তম যোনি—ব্রাহ্মণ যোনি, ক্ষত্রিয় যোনি অথবা বৈশ্য যোনি লাভ করেন আর যাঁরা এই সংসারে কপূয় (অধম) আচরণ সম্পন্ন অর্থাৎ পাপকর্মা হন, তাঁরা অধম যোনি অর্থাৎ কুকুর, শূকর বা চণ্ডাল জন্ম প্রাপ্ত হন।'

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে বৈশ্যদের 'পাপযোনির' মধ্যে ধরা যাবে না। এখন বাকি থাকে নারীদের কথা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নারীরা নিজ নিজ পতির সঙ্গে যজ্ঞাদি কর্মের অধিকার পেয়ে থাকেন। সেইজন্য তাঁদেরও পাপযোনি বলা যাবে না। এরূপ মেনে নিলে সবচেয়ে বড় সমস্যা তো এই হবে যে ভগবানের ভক্তির দ্বারা চণ্ডালাদিরও পরমগতি লাভের যে কথা উল্লিখিত রয়েছে—যা সর্বশাস্ত্রসম্মত এবং ভক্তির বিশেষ মহত্ত্ব প্রকট করে[১] তার সমাধান হবে কী করে? সুতরাং **'পাপযোনয়ঃ'** পদ নারী, বৈশ্য, শূদ্রের বিশেষণ মনে না করে শূদ্রদের থেকেও হীনজাতির মানুষের বাচক—এমন মনে করাই ঠিক বলে প্রতীয়মান হয়।

নারী, বৈশ্য এবং শূদ্রদের মধ্যেও অনেকে ভক্ত হয়েছেন। উদাহরণস্বরূপে এখানে যজ্ঞপত্নী, সমাধি ও সঞ্জয়ের কথা আলোচনা করা হচ্ছে—

যজ্ঞপত্নী

একবার বৃন্দাবনে কয়েকজন ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে তাঁর সখাগণ তাঁদের কাছে গিয়ে অন্ন চাইলেন। যাজ্ঞিক ঋষিগণ তাঁদের তিরস্কার করে বার করে দিলেন। তখন তাঁরা তাঁদের পত্নীদের কাছে গেলেন। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের নাম শুনেই প্রসন্ন হয়ে আহার-সামগ্রী নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে গেলেন। এক ব্রাহ্মণ তাঁর স্ত্রীকে যাওয়ার অনুমতি না দিয়ে জোর করে ঘরে আটকে রাখলেন। সেই পত্নীর প্রেম এতো বৃদ্ধি পেয়েছিল যে তিনি ভগবানের রূপের কথা শুনে, তাঁর ধ্যান করতে করতে দেহত্যাগ করে সর্বপ্রথম শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করেন (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২৩)।

সমাধি

সমাধি ছিলেন দ্রুমিণ নামে ধনী বৈশ্যের পুত্র। তাঁর স্ত্রী-পুত্রেরা ধনলোভে তাঁকে গৃহ থেকে বার করে

---

[১] কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুল্কসা আভীরকঙ্কা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ২।৪।১৮)

'যাঁর আশ্রিত ভক্তদের আশ্রয় নিয়ে কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুল্কস, আভীর, কংক, যবন ও খস ইত্যাদি অধম জাতির লোক এবং এরা ছাড়া আরও অধম পাপীও শুদ্ধ হয়ে যায়, সেই জগৎপ্রভু ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে প্রণাম।'

ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা
কা জাতির্বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষম্।
কুব্জায়াঃ কমনীয়রূপমধিকং কিং তৎসুদাম্নো ধনং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ॥

'ব্যাধের কোন্ (ভালো) আচরণ ছিল? ধ্রুবের আয়ু কী ছিল? গজেন্দ্র কী বিদ্যায় পারঙ্গম ছিলেন? বিদুর কোন্ উত্তম জাতির ছিলেন? যাদবপতি উগ্রসেনের কী পুরুষার্থ ছিল? কুব্জার এমন কী সুন্দর রূপ ছিল? সুদামার কাছে কোন্ ধন-সম্পদ ছিল? মাধব তো শুধুমাত্র ভক্তির দ্বারাই সন্তুষ্ট হন, গুণাদির দ্বারা নয়, কারণ ভক্তিই তাঁর অত্যন্ত প্রিয়।'

দিয়েছিল। তিনি বনে চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানে সুরথ নামক রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনিও মন্ত্রী, সেনাপতি ও স্বজনদের কাছ থেকে আঘাত পেয়েই বনে চলে এসেছিলেন। দুজনের অবস্থা একই প্রকার ছিল। শেষে দুজনেই সচ্চিদানন্দময়ী ভগবতীর শরণ গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁরা বিষয়াসক্তি ত্যাগ করে ভগবতীর আরাধনা করতে থাকেন। তিন বছর উপাসনা করার পর মাতা ভগবতী দর্শন দিয়ে বর চাইতে বলেন। রাজা সুরথের মনে ভোগের বাসনা অবশিষ্ট ছিল, তাই তিনি ভোগ প্রার্থনা করেন। কিন্তু সমাধির মন ছিল বৈরাগ্যপূর্ণ, তিনি জগতের ক্ষণভঙ্গুরতা ও দুঃখরূপকে জেনেছিলেন, তাই তিনি ভগবৎতত্ত্বের জ্ঞান প্রার্থনা করেন। ভগবতীর কৃপায় তাঁর অজ্ঞান দূর হয়েছিল এবং তিনি ভগবৎতত্ত্বের জ্ঞান লাভ করেছিলেন (মার্কণ্ডেয়পুরাণ ১৮।৯৩ ; ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্র. ৬২।৬৩)।

সঞ্জয়

সঞ্জয় গাবলগণ নামক সূতের পুত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত শান্ত, শিষ্ট, জ্ঞান-বিজ্ঞানবিশিষ্ট, সদাচারী, নির্ভয়, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ধর্মাত্মা, স্পষ্টভাষী এবং শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত এবং তাঁর তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ। অর্জুনের সঙ্গে তাঁর ছোটবেলা থেকে বন্ধুত্ব ছিল। তাই তিনি যখন খুশী অর্জুনের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পারতেন। সঞ্জয় যখন কৌরবদের পক্ষ থেকে প্রস্তাব নিয়ে পাণ্ডবদের কাছে যান, তখন অর্জুন অন্তঃপুরে ছিলেন, সেই সময় সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, দ্রৌপদী এবং সত্যভামাও ছিলেন। সঞ্জয় ফিরে এসে সেখানকার অতি সুন্দর স্পষ্ট বর্ণনা করেন (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ৫৯)।

মহাভারতের যুদ্ধে ভগবান বেদব্যাস এঁকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করেন, যার প্রভাবে ইনি ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের সমগ্র বিবরণ শুনিয়েছিলেন।

মহর্ষি ব্যাস, সঞ্জয়, বিদুর ও ভীষ্ম প্রমুখ সামান্য কয়েকজন এরূপ মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন, যাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত স্বরূপ জানতেন। ধৃতরাষ্ট্রের জিজ্ঞাসার উত্তরে সঞ্জয় বলেছিলেন, 'আমি স্ত্রী-পুত্রের মোহে আবদ্ধ হয়ে অবিদ্যার সেবা করি না, আমি ভগবানকে অর্পণ না করে বৃথা ধর্মের আচরণ করি না এবং শুদ্ধ ভাব ও ভক্তিযোগের দ্বারা জনার্দন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপকে যথার্থভাবে জানি।' ভগবানের স্বরূপ ও পরাক্রম জানিয়ে সঞ্জয় বললেন—'উদারহৃদয় শ্রীবাসুদেবের চক্রের মধ্যভাগ পাঁচ হাত বিস্তারিত, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছানুযায়ী সেটি অনেক বড় হতে পারে। তেজঃপুঞ্জের রূপ এই চক্র সকলের শক্তিসামর্থ্যকে গুড়িয়ে দেবার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত। এটি কৌরবদের সংহারক এবং পাণ্ডবদের প্রিয়তম। মহাবলবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর লীলার দ্বারাই ভয়ানক রাক্ষস নরকাসুর, শম্বরাসুর ও অহংকারী কংস-শিশুপালকে বধ করেছেন ; পরম ঐশ্বর্যশালী, সুন্দর-শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ মনের সংকল্প দ্বারাই পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গকে নিজের বশে রাখতে পারেন। একদিকে সমগ্র জগৎ আর অন্য দিকে একা শ্রীকৃষ্ণ—তবুও শ্রীকৃষ্ণের সামর্থ্য অধিক হবে। তিনি কেবল তাঁর ইচ্ছামাত্র দ্বারা সমগ্র জগৎকে ভস্মীভূত করতে সক্ষম, কিন্তু সমগ্র জগৎ ও সংগঠিত রূপে তাঁকে ভস্ম করতে অক্ষম।

যতঃ সত্যং যতো ধর্মো যতো হ্রীরার্জবং যতঃ।
ততো ভবতি গোবিন্দো যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ॥

(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ৬৮।৯)

যেখানে সত্য, যেখানে ধর্ম, যেখানে ঈশ্বরবিরোধী কাজে লজ্জা এবং যেখানে হৃদয়ের সরলতা থাকে, সেখানেই শ্রীকৃষ্ণ বাস করেন এবং যেখানে শ্রীকৃষ্ণ থাকেন, সেখানে নিঃসন্দেহে বিজয় হয়। সর্বভূতাত্মা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ লীলার দ্বারা পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গের পরিচালনা করেন। এই শ্রীকৃষ্ণই সকলকে মোহগ্রস্ত করে পাণ্ডবদের উপলক্ষ্য করে তোমার অধার্মিক মূর্খ-পুত্রদের ভস্ম করতে চান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজ প্রভাবের দ্বারা কাল-চক্র ও জগৎ-চক্র সর্বদা ঘুরিয়ে থাকেন। আমি সত্য করে বলছি যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই কাল, মৃত্যু এবং স্থাবর-জঙ্গমরূপ জগতের একমাত্র অধীশ্বর। কৃষক যেমন নিজের চাষ করা জমির ফসল (পেকে গেলে) নিজেই কেটে নেয়, তেমনই মহা-যোগেশ্বর (হরি) শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জগতের পালনকর্তা হয়েও নিজে তার সংহার রূপ কর্মও করে থাকেন। তিনি তাঁর মহামায়ার প্রভাবে সকলকে মোহিত করেন কিন্তু যে ব্যক্তি তাঁর শরণ গ্রহণ করেন, তিনি মায়া দ্বারা কখনো মোহগ্রস্ত হন না—

যে তমেব প্রপদ্যন্তে ন তে মুহ্যন্তি মানবাঃ।

(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ৬৮।১৫)

তারপর সঞ্জয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম ও তার অত্যন্ত সুন্দর অর্থ ধৃতরাষ্ট্রকে শোনালেন। মহাভারত যুদ্ধ যাতে না হয় তার জন্য সঞ্জয়ও অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তিনি এটি বন্ধ করতে পারেননি। ধৃতরাষ্ট্র যখন বনে চলে যান, সঞ্জয়ও তাঁর সঙ্গে চলে গিয়েছিলেন।

প্রশ্ন—এখানে দুবার 'অপি' প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—এখানে দুবার 'অপি' প্রয়োগ করে ভগবান উচ্চ-নীচ জাতির জন্য যে বৈষম্য হয়, তাঁর নিজের মধ্যে তার সর্বতোভাবে অভাব দেখিয়েছেন। এখানে ভগবানের বক্তব্যের এই অভিপ্রায় প্রতীত হয় যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের থেকে অপেক্ষাকৃত হীন নারী, বৈশ্য, শূদ্র কিংবা তার থেকেও হীন চণ্ডাল ইত্যাদি যে কেউ হোক, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তাঁদের প্রতি কোনো ভেদবুদ্ধি নেই। তাঁর শরণাগত হয়ে যে কেউই ভজনা করুক, সেই পরমগতি লাভ করবে।

প্রশ্ন—এক্ষেত্রে 'ভগবানের শরণাগত হওয়া' কাকে বলে ?

উত্তর—ভগবানে পূর্ণ বিশ্বাস রেখে চৌত্রিশতম শ্লোকের বক্তব্য অনুযায়ী প্রেমপূর্বক সর্বপ্রকারে ভগবানের শরণাগত হওয়া। অর্থাৎ তাঁর প্রত্যেক বিধানে সর্বদা সন্তুষ্ট থাকা, তাঁর নাম, রূপ, গুণ, লীলা ইত্যাদির নিরন্তর শ্রবণ, কীর্তন ও চিন্তা করতে থাকা, তাঁকেই নিজ গতি, ভর্তা, প্রভু বলে মানা, শ্রদ্ধা-ভক্তিপূর্বক তাঁর পূজা করা, তাঁকে প্রণাম করা, তাঁর নির্দেশ পালন করা ও সমস্ত কর্ম তাঁকে সমর্পণ করা ইত্যাদি হল প্রকারান্তরে ভগবানের শরণ হওয়া।

প্রশ্ন—এই ভাবে ভগবানের শরণাগত হওয়া ভক্তদের 'পরম গতি' লাভ করা কাকে বলে ?

উত্তর—সাক্ষাৎ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়াই পরম গতি প্রাপ্ত হওয়া। অভিপ্রায় হল যে উপরোক্ত প্রকারে ভগবানের শরণ গ্রহণকারী নারী-পুরুষ—যে কোনো জাতিরই হোন না কেন, তাঁর ভগবান লাভ হয়ে যায়।

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্‌॥ ৩৩

পুণ্যশীল ব্রাহ্মণ এবং রাজর্ষি ক্ষত্রিয়গণের আর বলার কী আছে ? তাঁরা যে আমাকে আশ্রয় করলে আমাকেই (পরমগতি) লাভ করবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অতএব তুমি সুখবিহীন, ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্যদেহ লাভ করে নিরন্তর আমারই ভজনা করো॥ ৩৩

প্রশ্ন—'কিম্‌' এবং **'পুনঃ'** প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'কিম্‌' এবং **'পুনঃ'** প্রয়োগ করে ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে যখন উপরোক্ত অত্যন্ত দুরাচারী (৯।৩০) এবং চণ্ডালাদি নীচ জাতির মানুষও (৯।৩২), আমার ভজনা করে পরম গতি লাভ করে, তখন যাঁদের আচার-ব্যবহার ও বর্ণ অত্যন্ত উত্তম, এরূপ আমার ভক্ত পুণ্যশীল ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষিগণ আমার শরণাগত হয়ে যে পরমগতি লাভ করবেন, এতে আর বলার কী আছে ?

প্রশ্ন—'পুণ্যাঃ' পদের অর্থ কী ? এই বিশেষণ শুধু ব্রাহ্মণদের নাকি ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষি—উভয়ের ?

উত্তর—যাঁদের স্বভাব ও আচরণ পবিত্র এবং উত্তম, তাঁদের 'পুণ্য' (পবিত্র) বলা হয়। এই বিশেষণ ব্রাহ্মণদের ; কারণ যিনি রাজা হয়ে ঋষিদের মতো শুদ্ধ স্বভাব এবং উত্তম আচরণসম্পন্ন হন, তাঁকে 'রাজর্ষি' বলা হয়। তাই তাঁর জন্য **'পুণ্যাঃ'** বিশেষণ প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না।

প্রশ্ন—'ভক্তাঃ' পদটি কার সঙ্গে সম্পর্কিত ?

উত্তর—'ভক্তাঃ' পদটি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ের সঙ্গেই সম্পর্কিত। কারণ এখানে ভক্তির জন্যই তাঁদের পরমগতি লাভের কথা বলা হয়েছে।

ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষিদের মধ্যে অগণিত মানুষ ভক্ত হয়েছেন। এঁদের মহিমার দিক্‌দর্শন করাবার জন্য এখানে শুধুমাত্র মহর্ষি সুতীক্ষ্ণ এবং রাজর্ষি অম্বরীষের কথা আলোচনা করা হচ্ছে।

সুতীক্ষ্ণ

মহর্ষি অগস্ত্যের শিষ্য মহর্ষি সুতীক্ষ্ণ দণ্ডকারণ্যে বাস করতেন। তিনি অতি তপস্বী ও তেজস্বী ভক্ত ছিলেন। দুষ্পণ্য নামক এক বৈশ্যের, যিনি তাঁর পাপের জন্য পিশাচ হয়েছিলেন, সুতীক্ষ্ণ তার উদ্ধার করেন (স্কন্দ.ব্রহ্ম.২২)। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের অনন্য ভক্ত ছিলেন। যখন সুতীক্ষ্ণ শুনলেন যে ভগবান শ্রীরঘুনাথ জগজ্জননী শ্রীজানকীসহ এদিকেই আসছেন, তখন তাঁর আনন্দের সীমা রইল না। তিনি নানাপ্রকার মনোবাসনা নিয়ে এগিয়ে চললেন। প্রেমে তিনি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। আমি কে, কোথায় যাচ্ছি, এটা কোন্ দিক, রাস্তা আছে কি না, সব ভুলে গেলেন। কখনো পিছনে এসে আবার এগিয়ে যাচ্ছিলেন, কখনো প্রভুর গুণগান করে নৃত্য করছিলেন। ভগবান শ্রীরাম গাছের আড়াল থেকে ভক্তের এই প্রেমোন্মাদ দশা দেখছিলেন। মুনির এই প্রেমদশা দেখে ভবভয়হারী ভগবান তাঁর হৃদয়ে প্রকটিত হলেন। হৃদয়ে ভগবানের দর্শন লাভ করে সুতীক্ষ্ণ পথের মধ্যে অচল হয়ে বসে পড়লেন। হর্ষোল্লাসে তাঁর শরীর পুলকিত হয়ে উঠল। তখন শ্রীরাম তাঁর কাছে এসে তাঁর প্রেমদশা দেখে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন।

শ্রীরাম মুনিকে নানাভাবে জাগাতে চেষ্টা করলেন ; কিন্তু মুনি ধ্যানস্থ ছিলেন। তিনি প্রভুর ধ্যানের সুখে ডুবে ছিলেন। শ্রীরাম যখন তাঁর হৃদয় থেকে নিজ রূপ সরিয়ে নিলেন, তখন তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। চোখ খুলেই তিনি সামনে সীতাদেবী ও শ্রীলক্ষ্মণসহ শ্যামসুন্দর সুখধাম শ্রীরামকে দেখতে পেলেন। তপস্যার ফল লাভ করে তিনি ধন্য হয়ে গেলেন (শ্রীরামচরিতমানস, অরণ্য কাণ্ড)।

অম্বরীষ

রাজর্ষি অম্বরীষ বৈবস্বত মনুর পৌত্র মহারাজ নাভাগের প্রতাপশালী পুত্র ছিলেন, তিনি ছিলেন চক্রবর্তী সম্রাট। কিন্তু তিনি জানতেন যে এই সমস্ত ঐশ্বর্য স্বপ্নে দেখা পদার্থের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর। তাই তিনি সম্পূর্ণ জীবন পরমাত্মার চরণে অর্পণ করে দিয়েছিলেন। তাঁর মনসহ সমস্ত ইন্দ্রিয় সদাসর্বদা ভগবৎ সেবায় নিয়োজিত থাকত।

কোনো এক সময় রাজা রাণীসহ শ্রীকৃষ্ণের প্রীত্যর্থে এক বছর একাদশী ব্রত পালন করেন। শেষ একাদশীর দ্বিতীয় দিন ভগবানের বিধিমতো পূজা করা হয়ে গিয়েছিল। রাজা পারণ করতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ঋষি দুর্বাসা শিষ্যসহ সেখানে পদার্পণ করলেন। রাজা সর্বপ্রকারে দুর্বাসার আপ্যায়ন করে তাঁকে আহার করার জন্য প্রার্থনা জানালেন। তিনি আহার করতে রাজী হয়ে মধ্যাহ্নের নিত্যকর্ম করার উদ্দেশ্যে যমুনাতীরে গেলেন। দ্বাদশীর সামান্যই বাকি ছিল। দ্বাদশীতে পারণ না করলে ব্রত-ভঙ্গ হয়। রাজা ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে নিয়ম জেনে শ্রীহরির চরণোদকের দ্বারা পারণ করে দুর্বাসাকে আহার করাবার জন্য পথ চেয়ে রইলেন। দুর্বাসা নিত্য ক্রিয়া সেরে রাজমন্দিরে ফিরে এলেন এবং নিজ তপোবলের সাহায্যে রাজার পারণ করে নেওয়ার কথা জেনে ক্রোধান্বিত হয়ে, অম্বরীষের ন্যায় হাত জোড় করে সামনে দাঁড়ানো রাজাকে বললেন — 'আরে ! এই ধনমদে অন্ধ অধম রাজার ধৃষ্টতা ও ধর্মের অনাদর দেখো ! এখন এ শ্রীবিষ্ণুর ভক্ত নয়, এতো নিজেকেই ঈশ্বর মনে করে। আমাকে অতিথির স্থানে নিমন্ত্রণ করে আমাকে আহার না করিয়েই নিজে আহার করে নিয়েছে। এখনই আমি তার ফল দেখাচ্ছি।' এই বলে দুর্বাসা মাথা থেকে একটুকরো জটা ছিঁড়ে জোরে মাটিতে ফেললেন, তার থেকে তখনই কালাগ্নির ন্যায় কৃত্যা নামে এক ভয়ানক রাক্ষসী প্রকটিত হল। সে তার পদাঘাতে পৃথিবী কম্পিত করে তরবারি হাতে নিয়ে রাজার দিকে লাফিয়ে পড়ল। কিন্তু ভগবানে দৃঢ়ভাবে আশ্রিত অম্বরীষ একভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন, তিনি পেছনেও গেলেন না এবং কোনোপ্রকার ভয়ও পেলেন না। যিনি সমস্ত জগতে পরমাত্মা ব্যাপ্ত আছেন বলে জানেন, তাঁর কীসের ভয় এবং কার থেকে ভয় ?

কৃত্যা অম্বরীষের কাছে পৌঁছানোর আগেই ভগবানের সুদর্শন চক্র কৃত্যাকে এমনভাবে ভস্মীভূত করল যেমন প্রচণ্ড দাবানল কুপিত সর্পকে ভস্ম করে দেয়। এবার সুদর্শন চক্র ঋষি দুর্বাসাকে সমুচিত জবাব দেওয়ার জন্য তাঁর পিছনে পিছন ছুটল। দুর্বাসা ঋষি অত্যন্ত ভীত হয়ে প্রাণ নিয়ে দৌড়লেন ; চক্র তাঁর পিছনে চলল। দুর্বাসা দশ দিক ও চোদ্দ ভুবন ছুটে বেড়ালেন, কিন্তু কোথাও থাকার স্থান পেলেন না, কেউ তাঁকে আশ্রয় ও অভয় দিল না। শেষে বেচারী বৈকুণ্ঠে গিয়ে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণ ধরে কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন —'হে প্রভু ! আমি আপনার প্রভাব না জেনে আপনার ভক্তকে

অপমান করেছি, আমাকে সেই অপরাধ থেকে মুক্ত করুন। আপনার নামকীর্তনে নরকের জীবও নরকের কষ্ট থেকে মুক্তি পায়, অতএব আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।'

ভগবান বললেন—'হে ব্রাহ্মণ ! আমি ভক্তের অধীন, স্বাধীন নই। ভক্তেরা আমার অত্যন্ত প্রিয়, আমার হৃদয়ে তাঁদের পূর্ণ অধিকার। যাঁরা আমাকেই তাঁদের পরমগতি বলে মেনে নিয়েছেন সেই আমার পরমভক্ত সৎপুরুষদের সামনে আমি আমার আত্মা ও সম্পূর্ণ শ্রী (অথবা আমার লক্ষ্মী)কেও তুচ্ছ জ্ঞান করি। যে ভক্ত (আমার জন্য) স্ত্রী, পুত্র, ঘর, সংসার, ধন, প্রাণ, ইহলোক, পরলোক সবকিছু ত্যাগ করে শুধু আমারই আশ্রয়ে থাকেন, তাঁকে আমি কী করে ত্যাগ করতে পারি ? পতিব্রতা নারী যেমন তাঁর শুদ্ধ প্রেমের দ্বারা শ্রেষ্ঠ পতিকে বশ করেন, তেমনই আমাতে চিত্ত নিবেশকারী সর্বত্র সমদর্শী ভক্তও তাঁর শুদ্ধ ভক্তির দ্বারা আমাকে তাঁর বশ করে রাখেন। বিনাশশীল স্বর্গাদি লোক তো গণনার মধ্যেই আসে না, আমার সেবা করলে তাঁদের যে চার প্রকার (সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য) মুক্তি লাভ হয়, তাঁরা তা-ও গ্রহণ করেন না ! আমার প্রেমের তুলনায় তাঁরা সেসব তুচ্ছ ভাবেন।'

শেষকালে ভগবান বললেন—'তোমার যদি নিজেকে রক্ষা করতে হয়, তাহলে হে ব্রাহ্মণ ! তোমার কল্যাণ হোক, তুমি সেই মহাভাগ রাজা অম্বরীষের কাছে যাও এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো ; তাহলেই তুমি শান্তি লাভ করবে।' ভগবানের আদেশ পেয়ে ঋষি দুর্বাসা ফিরে গেলেন।

এদিকে ভক্ত শিরোমণি অম্বরীষের বিচিত্র অবস্থা হয়েছিল। যখন থেকে দুর্বাসার পেছনে চক্র তাড়া করেছিল, তখন থেকে রাজর্ষি অম্বরীষ ঋষির দুঃখে দুঃখ পাচ্ছিলেন। তিনি মনে মনে ভাবছিলেন যে, 'ব্রাহ্মণ ক্ষুধার্ত হয়ে চলে গেলেন, আমারই জন্য মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে তাঁকে এতোটা দৌড়তে হচ্ছে ; এই অবস্থায় আমার আহার করার কী অধিকার ?' এই চিন্তা করে রাজা সেই মুহূর্ত থেকে অন্নত্যাগ করলেন এবং জলপান করে কাটাতে লাগলেন। দুর্বাসার ফিরে আসতে পুরো এক বছর কেটে গেল। কিন্তু অম্বরীষ তাঁর ব্রত ভঙ্গ করলেন না।

ঋষি দুর্বাসা এসেই রাজার চরণ ধরলেন। রাজা অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করলেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে সুদর্শনের স্তুতি করে বললেন, 'যদি আমার মনে দুর্বাসার প্রতি একটুও দ্বেষ না থাকে এবং সর্বপ্রাণীর আত্মা শ্রীভগবান আমার ওপর প্রসন্ন থাকেন, তাহলে আপনি শান্ত হয়ে যান এবং ঋষিকে সংকটমুক্ত করুন।' সুদর্শন শান্ত হয়ে গেলেন। দুর্বাসা ভয়রূপ অগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছিলেন, এবার তিনি নিশ্চিন্ত হলেন, তাঁর সর্বাঙ্গে হর্ষ ও কৃতজ্ঞতার চিহ্ন ফুটে উঠল (শ্রীমদ্ভাগবত, নবম স্কন্ধ, অধ্যায় ৪-৫)।

প্রশ্ন—এই সুখরহিত ও ক্ষণভঙ্গুর শরীর লাভ করে তুমি আমারই ভজনা করো—এই বক্তব্যের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—মনুষ্যদেহ অত্যন্ত দুর্লভ। অত্যন্ত পুণ্যবলে, বিশেষ করে ভগবদ্‌কৃপায় এটি পাওয়া যায় এবং এটি পাওয়া যায় শুধুমাত্র ঈশ্বর লাভের জন্য। এই মনুষ্য-জন্ম লাভ করে যিনি ঈশ্বরলাভের জন্য সাধন করেন, তাঁর জীবন সফল হয়। যে এতে সুখ-সন্ধান করে, সে প্রকৃত লাভ থেকে বঞ্চিত থেকে যায়, কারণ এটি সুখরহিত, এতে সুখের লেশমাত্র নেই। যে বিষয়ভোগের সম্পর্ককে মানুষ সুখরূপ বলে মনে করে, তা বারংবার পুনর্জন্ম প্রদানকারী হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে দুঃখরূপই। অতএব এটিকে সুখরূপ মনে না করে তা যে উদ্দেশ্যের জন্য পাওয়া, সেই উদ্দেশ্য অতি শীঘ্র সফল করে নেওয়া উচিত। কারণ এই দেহ ক্ষণভঙ্গুর, কখন যে এর বিনাশ হবে, তা জানা নেই। তাই সাবধান থাকা উচিত। একে সুখরূপ ভেবে বিষয়ে আবদ্ধ হওয়াও উচিত নয় বা এটি নিত্য মনে করে উপাসনাতে বিলম্ব করাও উচিত নয়। যদি নিজের অসতর্কতাতে এটি বৃথাই নষ্ট হয়ে যায় তাহলে অনুতাপ করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। শ্রুতি বলেছেন—

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ। (কেনোপনিষদ্ ২।৫)

'যদি এই মনুষ্যজন্মে পরমাত্মাকে জানা যায়, তাহলে ঠিক আছে আর যদি ইহজন্মে না জানা যায়, তাহলে অত্যন্ত বড় ক্ষতি।'

তাই ভগবান বলেছেন যে এরূপ দেহ লাভ করে নিত্য-নিরন্তর আমার ভজনা করো। এক মুহূর্তও

আমাকে ভুলো না।

প্রশ্ন—'**মাম্**' পদ কীসের বাচক এবং তাঁর ভজনা কী ? ভজনের জন্য নির্দেশ দেওয়ার হেতু কী ?

উত্তর—'**মাম্**' পদটি এখানে সগুণ পরমেশ্বরের বাচক এবং পরের শ্লোকে বলা বিধির দ্বারা ভগবৎপরায়ণ হওয়া অর্থাৎ নিজ মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও শরীর ইত্যাদিকে ভগবানে সমর্পণ করে দেওয়াই হল তাঁর ভজনা করা। ভজনা দ্বারাই শীঘ্র ভগবদ্প্রাপ্তি হয়, ভগবদ্প্রাপ্তিতেই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্যের সাফল্য, সেই জন্যই ভজনা করতে বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে ভগবান তাঁর ভজনের মহত্ত্ব দেখিয়েছেন এবং শেষকালে অর্জুনকে ভজনা করতে বলেছেন। সুতরাং এবার ভগবান তাঁর উপাসনার অর্থাৎ শরণাগতির প্রকার জানিয়ে অধ্যায়ের সমাপ্তি করেছেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ।। ৩৪

তুমি মদ্‌গতচিত্ত হও, আমার ভক্ত হও, আমাকে পূজা করো, কায়মনোবাক্যে আমাকে প্রণাম করো। এইভাবে আত্মাকে আমার সঙ্গে যুক্ত করে আমার পরায়ণ হলে তুমি আমাকেই লাভ করবে।। ৩৪

প্রশ্ন—ভগবৎপরায়ণ হওয়া কী ?

উত্তর—ভগবানই সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বলোক-মহেশ্বর, সর্বাতীত, সর্বময়, নির্গুণ-সগুণ, নিরাকার-সাকার, সৌন্দর্য, মাধুর্য ও ঐশ্বর্যের সমুদ্র এবং পরম প্রেমস্বরূপ—এইভাবে ভগবানের গুণ, প্রভাব, তত্ত্ব এবং রহস্যের যথার্থ পরিচয় লাভ হলে সাধক যখন নিশ্চিত হয়ে যান যে একমাত্র ভগবানই আমার পরম প্রেমাস্পদ, তখন জগতের কোনো বস্তুতে তাঁর বিন্দুমাত্র রমণীয়-বুদ্ধি থাকে না। এমতাবস্থায় জগতের অতি দুর্লভতম ভোগেও তাঁর কোনো আকর্ষণ থাকে না। যখন এরূপ স্থিতি হয়, তখন স্বাভাবিকভাবে তাঁর মন ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত বস্তু থেকে চিরকালের মতো দূরে সরে যায়, আর তিনি অনন্য ও পরমপ্রেম এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে নিরন্তর ভগবদ্‌চিন্তায় ব্যাপৃত থাকেন। ভগবানের এই প্রেমপূর্ণ চিন্তাই তাঁর প্রাণের আধার হয়, তিনি এক মুহূর্তও তাঁর বিস্মৃতি সহ্য করতে পারেন না। যাঁর এরূপ অবস্থা হয় তাঁকে বলা হয় সে ভগবানে মন অর্পণকারী।

প্রশ্ন—ভগবানের ভক্ত হওয়া কী ?

উত্তর—ভগবানই পরমগতি, তিনিই একমাত্র ভর্তা ও প্রভু, তিনিই পরম আশ্রয় এবং পরম আত্মীয় সংরক্ষক, এরূপ মনে করে তাঁর ওপর নির্ভর করা, তাঁর প্রত্যেক বিধানে সর্বদাই সন্তুষ্ট থাকা, তাঁর আদেশের অনুসরণ করা, তাঁর নাম, রূপ, গুণ, প্রভাব, লীলা ইত্যাদি শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণাদিতে নিজ মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়কে নিমগ্ন রাখা, তাঁর প্রীতির জন্য প্রত্যেক কাজ করা—একেই বলা হয় ভগবানের ভক্ত হওয়া।

প্রশ্ন—ভগবানের পূজা করা কী ?

উত্তর—ভগবানের মন্দিরে গিয়ে তাঁর মঙ্গলময় বিগ্রহকে যথাবিধি পূজা করা, সুবিধানুসারে নিজ-নিজ গৃহে ইষ্টরূপ ভগবানের মূর্তি স্থাপন করে বিধিপূর্বক শ্রদ্ধা ও প্রেমসহ তাঁর পূজা করা, নিজ হৃদয়ে বা অন্তরীক্ষে নিজের সামনে ভগবানের মানসিক মূর্তি স্থাপন করে তাঁর মানসিক পূজা করা, তাঁর উপদেশের, তাঁর লীলাভূমি, চিত্র ইত্যাদির আদর-সৎকার করা, তাঁর সেবাকার্যে নিজেকে ব্যাপৃত করে রাখা, নিষ্কামভাবে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান দ্বারা ভগবানের পূজা করা, মাতা-পিতা, ব্রাহ্মণ, সাধু-মহাত্মা ও গুরুজনদের এবং অন্য সমস্ত প্রাণীদের ভগবানেরই স্বরূপ মনে করে বা অন্তর্যামীরূপে ভগবান সবেতে ব্যাপ্ত আছেন মনে করে সকলের যথাযোগ্য পূজা, আদর-সৎকার করা এবং কায়-মনো-বাক্যে সকলকে যথাযোগ্য সুখী করা ও সকলের হিত করার যথার্থ চেষ্টা করা—এসব ক্রিয়াকেই ভগবানের পূজা বলা হয়।

প্রশ্ন—'**মাম্**' পদ কীসের বাচক এবং তাকে নমস্কার করার ভাবার্থ কী ?

উত্তর—যে পরমেশ্বর পরমাত্মার সগুণ, নির্গুণ, সাকার, নিরাকার ইত্যাদি অনেক রূপ, যিনি বিষ্ণুরূপে

সকলকে পালন করেন, ব্রহ্মারূপে সকলকে সৃষ্টি করেন ও রুদ্ররূপে সকলের সংহার করেন ; যে ভগবান যুগে যুগে মৎস্য, কচ্ছপ, বরাহ, নৃসিংহ, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি দিব্যরূপে অবতীর্ণ হয়ে জগতে বিচিত্র লীলা করে থাকেন, যিনি ভক্তদের ইচ্ছানুসার বিভিন্নরূপে প্রকটিত হয়ে তাঁদের নিজ শরণ প্রদান করেন—সেই সমস্ত জগতের কর্তা, হর্তা, বিধাতা, সর্বাধার, সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, সর্বসুহৃদ, সর্বগুণসম্পন্ন, পরম পুরুষোত্তম সমগ্র ভগবানের বাচক এখানে এই **'মাম্'** পদটি।

তাঁর সাকার বা নিরাকার রূপকে, তাঁর মূর্তিকে, চিত্রকে, তাঁর শ্রীচরণ, চরণপাদুকা বা চরণচিহ্নকে, তাঁর তত্ত্ব, রহস্য, প্রেম, প্রভাব এবং তাঁর মধুর মধুর লীলাসমূহ ব্যাখ্যাকারী সৎ শাস্ত্রাদি, মাতা-পিতা, ব্রাহ্মণ, গুরু, সাধু-সন্ন্যাসী ও মহাপুরুষদের এবং বিশ্বের সমস্ত প্রাণীদের তাঁর স্বরূপ মনে করা বা অন্তর্যামীরূপে তিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত জেনে শ্রদ্ধা-ভক্তিসহ কায়-মনো-বাক্যে সকলকে যথাযোগ্য প্রণাম করা—এই হল ভগবানকে নমস্কার করা।

প্রশ্ন—**'আত্মানম্'** পদ কীসের বাচক এবং তাকে উপরোক্ত প্রকারে ভগবানে যুক্ত করার কী রহস্য ?

উত্তর—মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সহ শরীরের বাচক এই **'আত্মা'** পদটি। এই সবগুলি উপরোক্ত ভাবে ভগবানে নিয়োজিত করাই হল আত্মাকে তাঁতে যুক্ত করা।

প্রশ্ন—ভগবানের পরায়ণ হওয়া কী ?

উত্তর—এইভাবে সবকিছু ভগবানে সমর্পণ করে দেওয়া এবং ভগবানকেই পরম প্রাপ্য, পরম গতি, পরম আশ্রয় ও নিজের সর্বস্ব বলে মনে করা। এই হল ভগবানের পরায়ণ হওয়া।

প্রশ্ন—**'এব'** প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ? ভগবানকে লাভ করা কাকে বলে ?

উত্তর—**'এব'** পদ অবধারণের অর্থে ব্যবহৃত। অভিপ্রায় হল যে উপরোক্ত প্রকারে সাধন করে তুমি যে আমাকেই প্রাপ্ত হবে, এতে কেনো সংশয় নেই। এই মনুষ্যদেহেই ভগবানের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার লাভ হওয়া, ভগবানকে তত্ত্বতঃ জেনে তাঁতে প্রবেশ করা অথবা ভগবানের দিব্যলোকে যাওয়া, তাঁর সমীপে থাকা অথবা তাঁর মতো রূপ ইত্যাদি লাভ করা—এ সবকেই ভগবৎপ্রাপ্তি বলা হয়।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

——o——

ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ

দশম অধ্যায়
(বিভূতিযোগ)

অধ্যায়ের নাম — এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ ভগবানের বিভূতির বর্ণনাই আছে, তাই অধ্যায়ের নাম রাখা হয়েছে 'বিভূতিযোগ'।

সংক্ষিপ্ত অধ্যায়-সার — এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ভগবান পুনরায় পরম শ্রেষ্ঠ উপদেশ প্রদানের প্রতিজ্ঞা করে তা শোনার জন্য অর্জুনকে অনুরোধ করেছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয়তে 'যোগ' শব্দবাচ্যে নিজ প্রভাবের বর্ণনা করে তা জানার ফল বলেছেন। চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ পর্যন্ত বিভূতিগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করে সপ্তমে তাঁর বিভূতি ও যোগকে তত্ত্বতঃ জানার ফল উল্লেখ করেছেন। অষ্টম ও নবমে তাঁর বুদ্ধিমান অনন্য প্রেমিক ভক্তদের ভজনের প্রকার বলে দশম ও একাদশ শ্লোকে তার ফল বর্ণনা করেছেন। তারপর দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ পর্যন্ত অর্জুন ভগবানের স্তুতি করে ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ পর্যন্ত পুনরায় বিভূতি এবং যোগশক্তির বিস্তারিত বর্ণনা করার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন। ঊনবিংশতমতে ভগবান তাঁর বিভূতিসমূহের বিস্তারকে অনন্ত জানিয়ে প্রধান প্রধান বিভূতিগুলি বর্ণনা করার প্রতিজ্ঞা করে বিংশতম থেকে ঊনচল্লিশতম পর্যন্ত তার বর্ণনা করেছেন। চল্লিশতমতে নিজ দিব্য বিভূতিসমূহের বিস্তারকে অনন্ত জানিয়ে এই প্রকরণের সমাপ্তি করেছেন। তারপর একচল্লিশতম ও বিয়াল্লিশতম শ্লোকে 'যোগ' শব্দবাচ্যে নিজের প্রভাবের বর্ণনা করে অধ্যায়ের উপসংহার করেছেন।

সম্বন্ধ—সপ্তম অধ্যায় থেকে নবম অধ্যায় পর্যন্ত বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের যে বর্ণনা করা হয়েছে তা অত্যন্ত গভীর হওয়ায় এবার পুনরায় সেই বিষয়টি অন্যভাবে ভালোমতো বোঝাবার জন্য দশম অধ্যায় আরম্ভ করা হয়েছে এবং প্রথম শ্লোকেই ভগবান পূর্বোক্ত বিষয়ের পুনর্বার বর্ণনা করার প্রতিজ্ঞা করছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া॥ ১

শ্রীভগবান বললেন—হে মহাবাহো! তুমি পুনরায় আমার রহস্য ও প্রভাবযুক্ত বাক্য শোনো, তুমি আমার প্রতি অত্যন্ত প্রীতসম্পন্ন হওয়ায় তোমার হিতের জন্য এই কথা পুনরায় বলছি॥ ১

প্রশ্ন—'**ভূয়ঃ**' ও '**এব**' পদগুলির অভিপ্রায় কী?

উত্তর—'**ভূয়ঃ**' পদের অর্থ পুনরায় এবং '**এব**' পদটি এখানে 'অপি'-র অর্থে ব্যবহৃত। এর প্রয়োগে ভগবানের এই তাৎপর্য যে, সপ্তম থেকে নবম অধ্যায় পর্যন্ত তিনি যে বিষয়ের প্রতিপাদন করেছিলেন, প্রকারান্তরে সেই বিষয় আবার বর্ণনা করা হচ্ছে।

প্রশ্ন—'**পরম বচন**'-এর অর্থ কী? এবং তা পুনরায় শোনার জন্য বলার কী অভিপ্রায়?

উত্তর—যে উপদেশ পরম পুরুষ পরমাত্মার পরম গোপনীয় গুণ, প্রভাব ও তত্ত্বের রহস্য উন্মোচন করে এবং যার দ্বারা সেই পরমেশ্বরকে লাভ করা যায়, তাকে '**পরম বচন**' বলা হয়। সুতরাং এই অধ্যায়ে ভগবান তাঁর গুণ, প্রভাব ও তত্ত্বের রহস্য জানাবার জন্য যে উপদেশ দিয়েছেন, সেটিই '**পরম বচন**' এবং তা পুনরায় শোনার জন্য বলে ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে আমার ভক্তির তত্ত্ব অত্যন্তই গভীর; সুতরাং তা বার বার শোনা অত্যন্ত আবশ্যক মনে করে, অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে শ্রদ্ধা ও প্রেমপূর্বক তা শোনা উচিত।

প্রশ্ন—'**প্রীয়মাণায়**' বিশেষণের এবং '**হিতকাম্যয়া**' পদ প্রয়োগ করে ভগবান কী ভাব দেখিয়েছেন ?

উত্তর—'**প্রীয়মাণায়**' বিশেষণ প্রয়োগ করে ভগবান দেখিয়েছেন যে, 'হে অর্জুন ! আমার প্রতি তোমার অত্যন্ত ভালোবাসা আছে, আমার বাক্য তুমি অমৃততুল্য মনে করে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও প্রেমের সঙ্গে শুনে থাকো ; তাই আমি কোনোরূপ সংকোচ বা দ্বিধা না করে, কোনোরকম জিজ্ঞাসা ছাড়াই তোমার কাছে আমার পরম গোপনীয় গুণ, প্রভাব ও তত্ত্বের রহস্য বারংবার উন্মোচন করছি। এ তোমার আমার প্রতি ভালোবাসারই ফল। 'হিতকাম্যয়া' পদটি প্রয়োগের এই তাৎপর্য যে, তোমার ভালোবাসার ফলে আমার হৃদয়ে তোমার জন্য হিতকামনা পূর্ণ হয়ে আছে ; তাই আমি যা কিছু বলছি, স্বাভাবিকভাবে কেবল তোমার মঙ্গলের জন্যই বলছি।

সম্বন্ধ—প্রথম শ্লোকে ভগবান যে বিষয়ে বলার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ; তার বর্ণনা আরম্ভ করতে গিয়ে তিনি প্রথম পাঁচটি শ্লোকে যোগ শব্দবাচ্য প্রভাবের এবং নিজ বিভূতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করেছেন—

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্বশঃ॥ ২

দেবতা বা মহর্ষি কেউই আমার উৎপত্তির কথা বা প্রকট হওয়া সম্বন্ধে জানেন না, কারণ আমি সর্বপ্রকারে দেবতা ও মহর্ষিগণের আদিকারণ ॥ ২

প্রশ্ন—এখানে '**প্রভবম্**' পদের অর্থ কী এবং সকল দেবতা ও মহর্ষিগণও কেউই জানেন না, এই বক্তব্যের কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—ভগবান তাঁর অতুলনীয় প্রভাব দ্বারা জগতের সৃজন, পালন ও সংহার করার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্ররূপে—দুষ্টের বিনাশ, ভক্তের রক্ষা, ধর্মের সংস্থাপন ও নানাপ্রকার অনুপম লীলার সাহায্যে জগতের প্রাণীদের উদ্ধার হেতু রাম, কৃষ্ণ, মৎস্য, কচ্ছপ ইত্যাদি দিব্য অবতাররূপে ভক্তদের দর্শন দিয়ে তাঁদের কৃতার্থ করার জন্য তাঁদের ইচ্ছানুসারে নানারূপে এবং লীলাবৈচিত্র্যের অনন্য ধারা প্রবাহিত করার জন্য সমগ্র বিশ্বের রূপে প্রকট হওয়া—তারই বাচক এই '**প্রভবম্**' পদটি। সেটি দেবগণ ও মহর্ষিগণ জানেন না, এই কথায় ভগবান এই ভাবার্থ প্রকাশ করেছেন যে আমি কোন্ সময়, কী রূপে, কোন্ হেতুতে কীভাবে প্রকটিত হই—এই রহস্য সাধারণ মানুষের আর কী কথা, অতীন্দ্রিয় বিষয় বুঝতে পারদর্শী দেবতা ও মহর্ষিগণও যথার্থরূপে জানেন না।

প্রশ্ন—এখানে '**সুরগণাঃ**' পদ কীসের বাচক এবং '**মহর্ষয়ঃ**' দ্বারা কোন্ মহর্ষিদের লক্ষ্য করানো হয়েছে ?

উত্তর—'**সুরগণাঃ**' পদটি একাদশ রুদ্র, আট বসু, দ্বাদশ আদিত্য, প্রজাপতি, ঊনপঞ্চাশ মরুৎগণ, অশ্বিনীকুমার ও ইন্দ্র প্রমুখ যত শাস্ত্রীয় দেব সমুদায়—এঁদের সকলের বাচক। '**মহর্ষয়ঃ**' পদের দ্বারা এখানে সপ্ত মহর্ষিদের বুঝতে হবে।

প্রশ্ন— দেবতাগণ ও মহর্ষিগণের আমি সর্বপ্রকারে আদিকারণ—এখানে এই বক্তব্যের কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—এই কথায় ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, যে সকল দেবতা ও মহর্ষিগণের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হয়েছে, বাস্তবে তাঁরা আমা হতেই উৎপন্ন হয়েছেন ; তাঁদের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ আমিই এবং তাঁদের যে বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি, তেজ ইত্যাদি প্রভাব—সেসবও তাঁরা আমার থেকেই পান।

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসম্মূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৩

যিনি আমাকে অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, অনাদি এবং সর্বলোকের মহেশ্বর বলে তত্ত্বতঃ জানেন, মনুষ্য

মধ্যে জ্ঞানবান সেই ব্যক্তি সর্বপাপ থেকে মুক্ত হন ॥ ৩

প্রশ্ন—ভগবানকে অজ, অনাদি ও সর্বলোকের মহেশ্বর জানা কী ?

উত্তর—ভগবান তাঁর যোগমায়ায় নানারূপে প্রকটিত হওয়া সত্ত্বেও জন্মরহিত (৪।৬), অন্য জীবেদের ন্যায় তাঁর জন্ম হয় না। তিনি তাঁর ভক্তদের সুখ প্রদানের জন্য এবং ধর্মস্থাপনের জন্য শুধু জন্মধারণের লীলা করেন—এই বিষয়টি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সঙ্গে ঠিকমতো বুঝে নেওয়া এবং এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ না করা—এই হল 'ভগবানকে অজ বলে জানা'। ভগবানই সবাকার আদি অর্থাৎ মহাকারণ ; তাঁর আদি কেউ নেই ; তিনি নিত্য এবং সদাই অবস্থিত ; অন্য পদার্থের মতো কোনো কালবিশেষে তাঁর আরম্ভ হয়নি—এই কথা শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সঙ্গে ভালোভাবে বোঝাই হল 'ভগবানকে অনাদি বলে জানা'। ঈশ্বরবাচ্য যত ইন্দ্র, বরুণ, যম, প্রজাপতি ইত্যাদি লোকপাল আছেন—ভগবান তাঁদের সকলের মহেশ্বর ; তিনিই সবাকার নিয়ন্তা, প্রেরক, হর্তা, কর্তা, সর্বপ্রকারে সকলের ভরণ-পোষণ ও সংরক্ষণকারী সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর—এই কথা শ্রদ্ধা-পূর্বক নিঃসংশয়ে ঠিকভাবে বুঝে নেওয়াই হল 'ভগবানকে সর্বলোকের মহেশ্বর বলে জানা'।

প্রশ্ন—এরূপ পুরুষকে 'মানুষদের মধ্যে অসম্মূঢ়' জানিয়ে 'তিনি সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়ে যান', এর অর্থ কী ?

উত্তর—ভগবানকে উপরোক্ত প্রকারে জন্মরহিত, অনাদি ও লোকমহেশ্বর জানার ফলরূপে এরূপ বলা হয়েছে। অর্থাৎ জগতের সব মানুষের মধ্যে যিনি উপরোক্ত প্রকারে ভগবানের প্রভাব ঠিকভাবে জানেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে ভগবানকে জানেন এবং যিনি ভগবানকে জানেন, তিনিই 'অসম্মূঢ়' ; বাকি সকলেই সম্মূঢ়। এবং যিনি ভগবানকে তত্ত্বতঃ সঠিকভাবে জেনে নেন, তিনি স্বাভাবিকভাবেই তাঁর জীবনের অমূল্য সময় সর্বপ্রকারে নিরন্তর ভগবানের ভজনে নিয়োজিত করেন (১৫।১৯), বিষয়ী ব্যক্তিদের ন্যায় ভোগকে সুখের কারণ ভেবে তাতে আবদ্ধ হন না। তাই তিনি ইহজন্ম ও পূর্বজন্মের সর্বপ্রকার পাপ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়ে সহজেই পরমাত্মাকে লাভ করেন।

বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ং চাভয়মেব চ॥ ৪
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ॥ ৫

নিশ্চয় করার শক্তি, যথার্থ জ্ঞান, অসম্মূঢ়তা, ক্ষমা, সত্য, ইন্দ্রিয়াদি সংযত করা, মনের নিগ্রহ ও সুখ-দুঃখ, উৎপত্তি-প্রলয় এবং ভয়-অভয়, অহিংসা, সমতা, সন্তোষ, তপ, দান, কীর্তি-অকীর্তি—প্রাণীদের এই নানাপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন ভাব আমা থেকেই উৎপন্ন হয় ॥ ৪-৫

প্রশ্ন—'বুদ্ধি', 'জ্ঞান' ও 'অসম্মোহ' এই তিনটি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন কোন্ ভাবের বাচক ?

উত্তর—কর্তব্য-অকর্তব্য, গ্রাহ্য-অগ্রাহ্য ও ভালো-মন্দ ইত্যাদি বিষয়ে নিশ্চয়পূর্বক একটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার বৃত্তিকে বলা হয় 'বুদ্ধি'।

কোনো পদার্থকে যথার্থরূপে জানাকে বলা হয় 'জ্ঞান'। এখানে 'জ্ঞান' শব্দটি সাধারণ জ্ঞান থেকে ভগবানের স্বরূপজ্ঞান পর্যন্ত সর্বপ্রকার জ্ঞানের বাচক।

ভোগাসক্ত মানুষদের নিকট নিত্য ও সুখপ্রদ বলে প্রতীত হওয়া সমস্ত জাগতিক ভোগাদিকে অনিত্য, ক্ষণিক এবং দুঃখমূলক মনে করে তাতে মোহগ্রস্ত না হওয়া—একেই বলা হয় 'অসম্মোহ'।

প্রশ্ন—'ক্ষমা' ও 'সত্য' কীসের বাচক ?

উত্তর—ক্ষতি করতে ইচ্ছা করা, ক্ষতি করা, ধন

হরণ করা, অপমান করা, আঘাত করা, কঠোর বাক্য বলা বা গালি দেওয়া, নিন্দা বা পরচর্চা করা, আগুন লাগানো, বিষ দেওয়া, হত্যা করা, প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষে ক্ষতি করা ইত্যাদি যত প্রকার অপরাধ আছে, এর মধ্যে এক বা একাধিক অপরাধকারী যে কোনো প্রাণী হোক না কেন, তার প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণের সম্পূর্ণ সামর্থ্য থাকলেও, অপরাধকারীর অপরাধের কোনোরূপ প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা সর্বতোভাবে ত্যাগ করা এবং সেই অপরাধের জন্য তার ইহলোক বা পরলোকে—কোথাও যেন কোনো দণ্ড-প্রাপ্তি না হয়—এরূপ মনোভাব থাকাকে বলা হয় 'ক্ষমা'।

ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ দ্বারা যে বিষয় যেভাবে দেখা, শোনা ও অনুভব করা হয়, ঠিক সেই ভাবে অপরকে বোঝাবার উদ্দেশ্যে হিতকর প্রিয় শব্দে তা প্রকট করাই হল 'সত্য'।

প্রশ্ন—'দম' ও 'শম' শব্দ কীসের বাচক ?

উত্তর—বিষয়াদির দিকে ধাবিত ইন্দ্রিয়সকলকে সেখান থেকে ফিরিয়ে নিজের অধীন করে রাখা—তাদের ইচ্ছামতো কাজ করতে না দেওয়াকে 'দম' বলে। এবং মনকে যথাযথভাবে সংযত করে নিজ অধীনে রাখাকে বলা হয় 'শম'।

প্রশ্ন—'সুখ' ও 'দুঃখের' অর্থ কী ?

উত্তর—প্রিয় (অনুকূল) বস্তুর প্রাপ্তিতে এবং অপ্রিয় (প্রতিকূল) বস্তুর বিয়োগে হওয়া সর্বপ্রকার সুখের বাচক হল এই 'সুখ' শব্দ। এইরূপ প্রিয় বিয়োগে এবং অপ্রিয় সংযোগে হওয়া আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক[১]—সর্বপ্রকার দুঃখের বাচক হল এই 'দুঃখ' শব্দ।

প্রশ্ন—'ভব' ও 'অভাব' এবং 'ভয়' ও 'অভয়' শব্দের অর্থ কী ?

উত্তর—সর্গকালে সমগ্র চরাচর জগতের উৎপন্ন হওয়াকে বলা হয় 'ভব', প্রলয়কালে তার লীন হওয়াকে বলা হয় 'অভাব'। কোনো প্রকার ক্ষতি বা মৃত্যুর কারণ উপস্থিত হলে অন্তরে যে ভাব উৎপন্ন হয়, তাকে বলে 'ভয়' এবং সর্বত্র এক পরমাত্মা ব্যাপ্ত আছেন—এরূপ অনুভূতি হলে অথবা অন্য কোনো কারণে সর্বতোভাবে ভয় দূর হয়ে গেলে, তাকে বলে 'অভয়'।

প্রশ্ন—'অহিংসা', 'সমতা', 'তুষ্টি'র পরিভাষা কী ?

উত্তর—কোনো প্রাণীকে কোনো সময়ে, কোনো প্রকারে কায়-মনো-বাক্যে বিন্দুমাত্র কষ্ট না দেওয়ার মনোভাবকে বলা হয় 'অহিংসা'।

সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয়, নিন্দা-স্তুতি, মান-অপমান, শত্রু-মিত্র ইত্যাদি যত ক্রিয়া, পদার্থ ও ঘটনাকে বৈষম্যের হেতু মনে করা হয়, সেই সবে নিরন্তর রাগ-দ্বেষরহিত সমবুদ্ধি থাকার ভাবকে বলা হয় 'সমতা'।

যা কিছু পাওয়া যায়, তাকে প্রারব্ধের ভোগ বা ভগবানের বিধান মনে করে সদা সন্তুষ্ট থাকার ভাবকে বলা হয় 'তুষ্টি'।

প্রশ্ন—তপ, দান, যশ ও অযশ—এই চারটির অর্থ কী ?

উত্তর—স্বধর্ম পালনের জন্য যে কষ্ট সহ্য করা তাকে বলে 'তপ'। নিজ স্বত্ব অপরের হিতের জন্য বিতরণ করাকে বলে 'দান', জগতে কীর্তিলাভকে বলে 'যশ' এবং অপকীর্তির নাম 'অপযশ'।

প্রশ্ন—প্রাণীদের নানাপ্রকার ভাব আমা হতেই হয়, এই বক্তব্যের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথায় ভগবানের এই তাৎপর্য যে, প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন প্রাণীর উপরোক্ত প্রকারের যত রকম বিভিন্ন ভাব হয়ে থাকে, সে-সব তাঁর থেকেই হয়। অর্থাৎ সে সকল ভগবানেরই সহায়তা, শক্তি ও সত্তা থেকেই হয়ে থাকে।

প্রশ্ন—এখানে এই দুটি শ্লোকে সুখ, ভব, অভয় ও যশ—এই চারটি ভাবের বিরোধী ভাব—দুঃখ, অভাব, ভয় ও অপযশের বর্ণনা করা হয়েছে। ক্ষমা, সত্য, দম ও অহিংসা ইত্যাদি ভাবের বিরোধী ভাবের বর্ণনা করা হয়নি, এর কী তাৎপর্য ?

---

[১] মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি প্রাণীদের থেকে হওয়া কষ্টকে 'আধিভৌতিক' ; অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ভূকম্পন, বজ্রপাত এবং অকাল ইত্যাদি দৈবী প্রকোপে হওয়া কষ্টগুলিকে 'আধিদৈবিক' এবং শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তরে কোনোপ্রকার রোগের দ্বারা হওয়া কষ্টকে 'আধ্যাত্মিক' দুঃখ বলা হয়।

উত্তর—দুঃখ, অভাব, ভয় ও অপযশ ইত্যাদি ভাব জীবেদের প্রারব্ধ ভোগ করানোর জন্য উৎপন্ন হয় ; তাই এসবের উদ্ভব কর্মফলদাতা ও জগতের নিয়ন্ত্রাকর্তা ভগবান থেকেই উৎপন্ন হওয়ার কথা যথার্থ। কিন্তু ক্ষমা, সত্য, দম এবং অহিংসা ইত্যাদির বিরোধী ক্রোধ, অসত্য, ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব এবং হিংসা ইত্যাদি দুর্গুণ ও দুরাচার ভগবানের থেকে উৎপন্ন হয় না। বরং গীতাতেই অন্যস্থানে এই দুর্গুণ-দুরাচারের উৎপত্তির মূল কারণ বলা হয়েছে—অজ্ঞতাজনিত 'কাম' (৩।৩৭) এবং এগুলিকে সমূলে ত্যাগ করার জন্য প্রেরণা দেওয়া হয়েছে। তাই এখানে সত্য ইত্যাদি সদ্গুণ ও সদাচারের বিরোধী ভাবের বর্ণনা করা হয়নি।

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ॥ ৬

সাতজন মহর্ষি, তারও পূর্বের সনকাদি চারজন, স্বায়ম্ভুব প্রমুখ চতুর্দশ মনু—এঁরা সকলেই আমার ভাবসম্পন্ন অর্থাৎ আমার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিযুক্ত এবং আমার সংকল্প থেকে জাত। জগতের সমস্ত প্রজাই এঁদের দ্বারা সৃষ্ট॥ ৬

প্রশ্ন—সপ্ত মহর্ষিদের লক্ষণ কী এবং এঁরা কে কে?

উত্তর—সপ্তর্ষিদের লক্ষণ বলতে গিয়ে বলা হয়েছে—

এতান্ ভাবানধীয়ানা যে চৈত ঋষয়ো মতাঃ।
সপ্তৈতে সপ্তভিশ্চৈব গুণৈঃ সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ॥
দীর্ঘায়ুষো মন্ত্রকৃত ঈশ্বরা দিব্যচক্ষুষঃ।
বৃদ্ধাঃ প্রত্যক্ষধর্মাণো গোত্রপ্রবর্তকাশ্চ যে॥

(বায়ুপুরাণ ৬১। ৯৩-৯৪)

অর্থাৎ দেবর্ষিগণের[১] এই (উপরোক্ত) ভাবের যিনি অধ্যয়ন (স্মরণ) করেন, তাঁদের ঋষি মানা হয়। এঁদের মধ্যে যিনি দীর্ঘায়ু, মন্ত্রের স্রষ্টা, ঐশ্বর্যবান, দিব্য দৃষ্টিযুক্ত, গুণবিদ্যা ও আয়ুতে প্রবীণ, ধর্মের প্রত্যক্ষ (সাক্ষাৎকার)কারী ও গোত্রের পরম্পরা চালাতে সক্ষম—এরূপ সপ্তগুণযুক্ত সাত ঋষিকে সপ্তর্ষি বলা হয়।' এঁদের থেকেই প্রজার বিস্তার হয় ও ধর্মব্যবস্থা বজায় থাকে[২]।

এই সপ্তর্ষি প্রত্যেক মন্বন্তরে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকেন। এখানে যে সপ্তর্ষিদের বর্ণনা করা হয়েছে, ভগবান তাঁদের 'মহর্ষি' বলেছেন এবং বলেছেন তাঁরা তাঁর সংকল্প হতে জাত। তাই এখানে তাঁদেরই লক্ষ্য করা হয়েছে, যাঁরা ঋষিদের থেকেও উচ্চস্তরের। মহাভারতের শান্তিপর্বে এরূপ সপ্তর্ষিদের উল্লেখ পাওয়া যায়। সাক্ষাৎ পরমপুণ্য পরমেশ্বর এঁদের বিষয়ে দেবগণসহ ব্রহ্মাকে বলেছেন—

মরীচিরঙ্গিরাশ্চাত্রিঃ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
বসিষ্ঠ ইতি সপ্তৈতে মানসা নির্মিতা হি তে॥
এতে বেদবিদো মুখ্যা বেদাচার্যাশ্চ কল্পিতাঃ।
প্রবৃত্তিধর্মিণশ্চৈব প্রাজাপত্যে চ কল্পিতাঃ॥

(মহাভারত, শান্তিপর্ব ৩৪০।৬৯-৭০)

'মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ—এই সাত মহর্ষি তোমার (ব্রহ্মার) দ্বারা সৃষ্ট অর্থাৎ তোমার মানস-পুত্র। এই সাতজন বেদজ্ঞাতা, এঁদের আমি প্রধান বেদাচার্য করেছি। এঁরা প্রবৃত্তি মার্গের সঞ্চালনকারী এবং (আমার দ্বারাই) প্রজাপতির কর্মে নিযুক্ত।'

এঁরাই এই কল্পের সর্বপ্রথম স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের

[১]দেবর্ষিদের লক্ষণ এই অধ্যায়ের ১২-১৩তম শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য।

[২]এই সপ্তর্ষি প্রকৃতিমার্গী, তাঁদের বিচার ও জীবনের বর্ণনা এইপ্রকার—

ষট্কর্মাভিরতা নিত্যং শালিনো গৃহমেধিনঃ। তুল্যৈর্ব্যবহরন্তি স্ম অদৃষ্টৈঃ কর্মহেতুভিঃ॥
অগ্রাম্যৈর্বর্তয়ন্তি স্ম রসৈশ্চৈব স্বয়ংকৃতৈঃ। কুটুম্বিনঃ ঋদ্ধিমন্তো বাহ্যান্তরনিবাসিনঃ॥
কৃতাদিষু যুগাখ্যেষু সর্বেষ্বেব পুনঃ পুনঃ। বর্ণাশ্রমব্যবস্থানং ক্রিয়তে প্রথমং তু বৈ॥ (বায়ুপুরাণ ৬১।৯৫-৯৭)

সপ্তর্ষি (হরিবংশ ৭।৮, ৯)। অতএব এখানে সপ্তর্ষির দ্বারা এঁদেরই বোঝা উচিত।[১]

প্রশ্ন—এখানে সপ্তমহর্ষির মধ্যে এই বর্তমান মন্বন্তরের বিশ্বামিত্র, জামদগ্নি, ভরদ্বাজ, গৌতম, অত্রি, বশিষ্ঠ ও কাশ্যপ—এই সাতজনকে মেনে নিলে কী ক্ষতি ?

উত্তর— বিশ্বামিত্র ইত্যাদি সপ্তমহর্ষির মধ্যে অত্রি এবং বশিষ্ঠ ব্যতীত অন্য পাঁচজন ভগবানেরও মানসপুত্র নন এবং ব্রহ্মারও মানসপুত্র নন। সুতরাং এখানে এঁদের না মেনে তাঁদের মানাই সঠিক।

প্রশ্ন—'চত্বারঃ পূর্বে'র দ্বারা কাকে মনে করা উচিত ?

উত্তর—সর্বপ্রথমে প্রকট হওয়া সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার—এই চারজনকে ধরে নিতে হবে। এঁরাও ভগবানেরই স্বরূপ এবং ব্রহ্মা তপস্যা করার পর এঁরা স্বেচ্ছায় প্রকটিত হয়েছেন। ব্রহ্মা স্বয়ং বলেছেন—

তপ্তং তপো বিবিধলোকসিসৃক্ষয়া মে
আদৌ সনাৎ স্বতপসঃ স চতুঃসনোঽভূৎ।
প্রাক্কল্পসম্প্লববিনষ্টমিহাত্মতত্ত্বং
সম্যগ্ জগাদ মুনয়ো যদচক্ষতাত্মন্॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ২।৭।৫)

'আমি বিভিন্ন প্রকারে লোকাদি উৎপন্ন করার

'এই মহর্ষিগণ পঠন-পাঠন, যজ্ঞ করা-করানো, দান দেওয়া-নেওয়া, এই ছটি কর্মের সর্বদা আচরণ করেন, ব্রহ্মচারীদের পড়ানোর জন্য গৃহে গুরুকুলের ব্যবস্থা করেন এবং প্রজা উৎপত্তির জন্য স্ত্রী ও অগ্নি গ্রহণ করেন। কর্মজনিত অদৃষ্টের দৃষ্টিতে (অর্থাৎ বর্ণাদিতে) যারা সমকক্ষ, তাঁদের সঙ্গে এঁরা যথাযোগ্য ব্যবহারাদি করেন এবং নিজ রচিত অনিন্দ্য ভোগ্য পদার্থের দ্বারা নির্বাহ করেন। সন্তানাদি, গোধন ও ঐশ্বর্যসম্পন্ন এই সকল মহর্ষি লোকাদির বাইরে ও ভিতরে নিবাসকারী। সত্য, ত্রেতা আদি সকল যুগের প্রারম্ভে এই সকল মহর্ষিগণ পুনঃ পুনঃ বর্ণাশ্রম-ধর্মের ব্যবস্থা প্রবর্তন করে থাকেন।'

[১]এই সাতজনই অত্যন্ত তেজস্বী এবং বুদ্ধিমান প্রজাপতি। প্রজা উৎপন্নকারী হওয়ায় এঁদের 'সপ্ত ব্রহ্মা' বলা হয় (মহাভারত, শান্তিপর্ব ২০৮।৩, ৪, ৫)। এঁদের সংক্ষিপ্ত চরিত্র এইরূপ—

১) **মরীচি**—একে ভগবানের অংশাবতার মানা হয়। এঁর কয়েকজন পত্নী ছিলেন, যার মধ্যে প্রধান দক্ষ-প্রজাপতির কন্যা সম্ভূতি এবং ধর্ম নামক ব্রাহ্মণের কন্যা ধর্মব্রতা। এঁর বহু সন্তান ছিল। মহর্ষি কশ্যপ এঁরই পুত্র। ব্রহ্মা এঁকে পদ্মপুরাণের কিছু অংশ শুনিয়ে ছিলেন। প্রায় সব পুরাণ, মহাভারত ও বেদে এঁর প্রসঙ্গে অনেক কিছু বলা হয়েছে। ব্রহ্মা সর্বপ্রথম ব্রহ্মপুরাণ এঁকেই প্রদান করেছিলেন। ইনি সদা-সর্বদা সৃষ্টির উৎপত্তি ও তার পালনের কাজে ব্যস্ত। এঁর বিস্তারিত চরিত বায়ুপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, পদ্মপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারত ইত্যাদিতে রয়েছে।

২) **অঙ্গিরা**—ইনি অত্যন্ত তেজস্বী মহর্ষি। এঁর কয়েকজন পত্নী ছিলেন, যার মধ্যে প্রধান তিনজন, এঁদের মধ্যে মরীচির কন্যা সুরূপার সঙ্গে বৃহস্পতির, কর্দম ঋষির কন্যা স্বরাটের সঙ্গে গৌতম-বামদেব ইত্যাদি পাঁচপুত্রের, মনুর কন্যা পথ্যার সঙ্গে বিষ্ণু প্রমুখ তিন পুত্রের জন্ম হয়েছিল (বায়ুপুরাণ অ.৬৫) এবং অগ্নির কন্যা আত্রেয়ীর সঙ্গে আঙ্গিরস নামক পুত্রের জন্ম হয়েছিল (ব্রহ্মপুরাণ)। কোনো কোনো গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, বৃহস্পতির জন্ম এঁর শুভানামক পত্নী থেকে হয়েছিল। (মহাভারত)

৩) **অত্রি**— ইনি দক্ষিণ দিকে অবস্থানকারী। বিখ্যাত পতিব্রতা অনসূয়া হলেন এঁরই পত্নী। অনসূয়া ভগবান কপিলদেবের ভগিনী এবং কর্দম-দেবহুতির কন্যা। ভগবান শ্রীরাম বনবাসের সময় এঁর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। অনসূয়া জগজ্জননী সীতাদেবীকে নানাপ্রকার গহনা-কাপড় ও সতীধর্মের মহান উপদেশ প্রদান করেছিলেন।

ব্রহ্মবাদিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহর্ষি অত্রিকে যখন ব্রহ্মা প্রজাবিস্তারের জন্য নির্দেশ দেন, তখন অত্রিদেব পত্নী অনসূয়াকে নিয়ে ঋক্ষনামক পর্বতে গিয়ে তপস্যায় রত হন। তাঁরা দুজনে ভগবানের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। এঁরা কঠোর তপস্যা করেন এবং তপের ফলস্বরূপ ভগবানের প্রত্যক্ষ দর্শন চেয়েছিলেন। তাঁরা জগৎপতি ভগবানের শরণাপন্ন হয়ে অখণ্ডভাবে তাঁর চিন্তা করতে লাগলেন। তাঁদের মস্তক থেকে যোগাগ্নি বার হতে থাকল, যাতে ত্রিলোক দগ্ধ হতে লাগল। তাঁদের তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—তিনজন তাঁদের বরদান করতে প্রকটিত হলেন। ভগবানের তিনস্বরূপ দর্শন করে পত্নীসহ অত্রিমুনি অত্যন্ত কৃতার্থ হয়ে গদগদ স্বরে তাঁদের স্তুতি করতে লাগলেন। ভগবান তাঁদের বর প্রার্থনা করতে বললেন। ব্রহ্মার নির্দেশ ছিল জগৎ সৃষ্টি করার, তাই অত্রি বললেন—'আমি পুত্রের জন্য ভগবানের আরাধনা করেছিলাম এবং তাঁর দর্শন করতে চেয়েছিলাম, আপনারা তিনজনে উপস্থিত হয়েছেন। আপনাদের কথা তো কেউ কল্পনাই করতে পারে না। আপনারা বলুন, আমার ওপর এই কৃপা কেন ?'

ইচ্ছায় সর্বপ্রথম যে তপস্যা করেছিলাম, আমার সেই অখণ্ড তপস্যাতে ভগবান স্বয়ং সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার— এই চার 'সন' নাম রূপে প্রকটিত হন এবং পূর্বকল্পের প্রলয়ের সময় যে আত্মতত্ত্বজ্ঞানের প্রচার এই জগতে লুপ্ত হয়েছিল, তিনি তার যথাযথ উপদেশ প্রদান করেন, যার ফলে এই মুনিগণের হৃদয়ে আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎ লাভ হয়।'

প্রশ্ন— এই শ্লোকে বলা হয়েছে— 'যার সর্বলোকে

অত্রির কথা শুনে তিনজনে মৃদুহাস্যে বললেন— 'ব্রহ্মন্! তোমার সংকল্প সত্য। তুমি যাঁর ধ্যান করছিলে, আমরা তিনজনই সেই— একজনেরই তিনটি স্বরূপ। আমাদের তিনজনের অংশ থেকে তোমার তিনটি পুত্র হবে। তুমি কৃতার্থ হয়েছ।' এই বলে ভগবানের তিন স্বরূপ অন্তর্ধান করলেন। তিনজনে তাঁর কাছে অবতাররূপে জন্ম নিলেন, ভগবান বিষ্ণুর অংশে দত্তাত্রেয়, ব্রহ্মার অংশে চন্দ্র এবং শিবের অংশে দুর্বাসা। ভক্তির এই প্রভাব! যাঁদের ধ্যানেও কল্পনা করা যায় না; তাঁরাই শিশু হয়ে ক্রোড়ে খেলা করতে লাগলেন। (বাল্মীকি রামায়ণ, বনকাণ্ড এবং শ্রীমদ্ভাগবত, স্কন্দ ৪)

৪) **পুলস্ত্য**— ইনি অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ, তপস্বী ও তেজস্বী; যোগবিদ্যার পরম শ্রেষ্ঠ আচার্য এবং পারদর্শী। পরাশর যখন রাক্ষসদের বিনাশ করার জন্য এক বৃহৎ যজ্ঞ করছিলেন, তখন বশিষ্ঠের পরামর্শে পুলস্ত্য তাঁকে যজ্ঞ বন্ধ করতে বলেন। পরাশর পুলস্ত্যের কথা শুনে যজ্ঞ বন্ধ করেন। এতে প্রসন্ন হয়ে পুলস্ত্য তাঁকে এমন আশীর্বাদ করেন, যাতে পরাশরের সমস্ত শাস্ত্রের জ্ঞান হয়ে যায়।

এঁর সন্ধ্যা, প্রতীচী, প্রীতি ও হবির্ভূ নামক পত্নী ছিলেন। এঁদের কয়েকটি পুত্র হয়েছিল। দম্ভোলি, অগস্ত্য এবং প্রসিদ্ধ ঋষি নিদাঘ এঁদের পুত্র। বিশ্রবাও এঁনারই পুত্র—যাঁর থেকে কুবের, রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের জন্ম হয়েছিল। পুরাণ ও মহাভারতের স্থানে স্থানে এঁদের আলোচনা আছে। এঁদের কথা বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, কূর্মপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, বায়ুপুরাণ ও মহাভারতের উদ্যোগপর্বে বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত আছে।

৫) **পুলহ**—ইনি অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী ও জ্ঞানী মহর্ষি। ইনি মহর্ষি সনন্দের কাছ থেকে ঈশ্বরীয় জ্ঞান লাভ করেছিলেন এবং সেই জ্ঞান গৌতমকে প্রদান করেছিলেন। এঁর দক্ষপ্রজাপতির কন্যা ক্ষমা এবং কর্দম ঋষির কন্যা গতির সঙ্গে বহু সন্তান হয়েছিল। কূর্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতে এঁর কথা উল্লিখিত আছে।

৬) **ক্রতু**—ইনিও অত্যন্ত তেজস্বী মহর্ষি। কর্দমঋষির কন্যা ক্রিয়া ও দক্ষকন্যা সন্নতিকে ইনি বিবাহ করেন। এঁর ষাট হাজার বালখিল্য নামক ঋষি জন্মায়। এই ঋষি ভগবান সূর্যের রথের সামনে তাঁর দিকে মুখ করে স্তুতি করতে করতে চলেন। পুরাণে অনেক স্থানে তাঁর কথা আছে। (শ্রীমদ্ভাগবত-চতুর্থ স্কন্ধ, বিষ্ণুপুরাণ-প্রথম অংশ)

৭) **বশিষ্ঠ**—মহর্ষি বশিষ্ঠের তপ, তেজ, ক্ষমা ধর্ম বিশ্ববিদিত। এঁর উৎপত্তির সম্বন্ধে পুরাণে কয়েক প্রকার বর্ণনা পাওয়া যায়, যা কল্পভেদের দৃষ্টিতে সবই ঠিক। বশিষ্ঠের পত্নীর নাম অরুন্ধতী, তিনি অত্যন্ত সাধ্বী এবং পতিব্রতাদের অগ্রগণ্যা। বশিষ্ঠ সূর্যবংশের কুলপুরোহিত ছিলেন। মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামের দর্শন ও সৎসঙ্গের লোভেই ইনি সূর্যবংশের রাজাদের পুরোহিত হওয়া স্বীকার করেন এবং সূর্যবংশের হিতার্থে সর্বক্ষণ চেষ্টা করতেন। ভগবান শ্রীরামকে শিষ্যরূপে পেয়ে ইনি নিজের জীবনকে কৃতকৃত্য মনে করেন।

বলা হয় 'তপস্যা বড় না সৎসঙ্গ'? এই বিষয়ে একবার বিশ্বামিত্রের সঙ্গে এঁর মতভেদ হয়। বশিষ্ঠ বলেছিলেন যে সৎসঙ্গ বড় আর বিশ্বামিত্র বলেছিলেন তপস্যা বড়। শেষে দুজনে মীমাংসা হেতু শেষ-নারায়ণের কাছে গেলেন। এঁদের বিবাদের কারণ শুনে ভগবান শেষ বললেন— 'ভগবন্! আপনারা দেখছেন সমস্ত পৃথিবীর ভার আমার মাথার ওপর। আপনাদের দুজনের মধ্যে কেউ একজন এই ভার কিছুক্ষণের জন্য বহন করলে, আমি ভেবেচিন্তে আপনাদের বিবাদ মেটাতে পারি।' বিশ্বামিত্রের নিজের তপস্যার ওপর খুব বিশ্বাস ছিল; তিনি দশ হাজার বৎসরের তপস্যার ফল দিয়ে পৃথিবীকে ওঠাতে চাইলেন, কিন্তু ওঠাতে পারলেন না। পৃথিবী কাঁপতে লাগল। তখন বশিষ্ঠ তাঁর সৎসঙ্গের অর্ধেক ফল দিয়ে পৃথিবীকে অতি সহজেই উঠিয়ে নিলেন এবং অনেকক্ষণ সেটি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বিশ্বামিত্র ভগবান শেষকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এতো দেরী হয়ে গেল, আপনি এখনও সিদ্ধান্ত শোনালেন না?' তখন ভগবান শেষ হেসে বললেন, 'ঋষিবর! সিদ্ধান্ত তো স্বতঃই হয়ে গেছে। যখন অর্ধেক ক্ষণের সৎসঙ্গের সমকক্ষও দশ হাজার বছরের তপস্যা হতে পারে না, তখন আপনিই ভেবে দেখুন দুটির মধ্যে কে বড়?' সৎসঙ্গের মহিমা জেনে দুই ঋষিই প্রসন্ন হয়ে ফিরে গেলেন।

ঋষি বশিষ্ঠ বসুসম্পন্ন অর্থাৎ অণিমাদি সিদ্ধি দ্বারা যুক্ত এবং গৃহবাসীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাই তাঁর নাম 'বশিষ্ঠ' হয়েছিল। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি শত্রু তাঁর আশ্রমের নিকটও আসতে পারত না। নিজের পূর্ণ সামর্থ্য থাকলেও তিনি শত পুত্রের

প্রজা রয়েছে', কিন্তু 'চত্বারঃ পূর্বে'র অর্থ সনক ইত্যাদি মহর্ষি মেনে নিলে বিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ পায়, কারণ সনকাদির দ্বারা তো কোনো প্রজা সৃষ্টি হয়নি ?

উত্তর—সনকাদিগণ হলেন জ্ঞানপ্রদানকারী নিবৃত্তি ধর্মের প্রবর্তক আচার্য। সুতরাং তাঁদের শিক্ষা গ্রহণকারী তথা নিবৃত্তিমার্গের অনুসরণকারী সকলকেই শিষ্যরূপে তাঁদের প্রজা বলে মনে করা যেতে পারে। অতএব এর মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

প্রশ্ন—'**মনবঃ**' পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—ব্রহ্মার একদিনে চতুর্দশ মনু হয়, প্রত্যেক মনুর অধিকারের অন্তর্গত সময়কে '**মন্বন্তর**' বলা হয়। একাত্তর চতুর্যুগীর কিছু বেশি কালে এক মন্বন্তর হয়। মানব বর্ষ গণনার হিসাবে এক মন্বন্তর ত্রিশ কোটি সাতষট্টি লাখ বিশ হাজার বর্ষ ধরে এবং দিব্য বর্ষ গণনার হিসাবে আট লাখ বাহান্ন হাজার বর্ষ থেকে কিছু বেশি কাল হয় (বিষ্ণুপুরাণ ১।৩)।[১] প্রত্যেক মন্বন্তরে ধর্মব্যবস্থা ও লোক-রক্ষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সপ্তর্ষি প্রকট হয়ে থাকেন। এক মন্বন্তর পার হলে যখন মনু পরিবর্তিত হন, তখন তাঁর সঙ্গে সপ্তর্ষি, দেবতা, ইন্দ্র ও মনুপুত্রও পরিবর্তিত হয়। বর্তমান কল্পের মনুদের নাম হল—স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুস, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষ সাবর্ণি, ব্রহ্ম সাবর্ণি, ধর্ম সাবর্ণি, রুদ্র সাবর্ণি, দেব সাবর্ণি ও ইন্দ্র সাবর্ণি[২]। চোদ্দজন মনুর এক কল্প পার হলে সব

সংহারকারী বিশ্বামিত্রের প্রতি ক্রোধ না করে তাঁর বিন্দুমাত্রও অনিষ্ট করেননি। মহাদেব প্রসন্ন হয়ে বশিষ্ঠ ঋষিকে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য প্রদান করেন। সনাতন ধর্মের মর্ম যথার্থরূপে যাঁরা জ্ঞাত, বশিষ্ঠের নাম তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয়। এঁর জীবনের বিস্তৃত ঘটনাবলী রামায়ণ, মহাভারত, দেবীভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, বায়ুপুরাণ, শিবপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়।

[১] সূর্যসিদ্ধান্তে মন্বন্তর ইত্যাদির যে বর্ণনা আছে, সেই অনুসারে এরূপ বুঝতে হবে—

সৌরমান দ্বারা ৪৩,২০,০০০ বর্ষে অথবা দেবমান দ্বারা ১২,০০০ বর্ষে এক চতুর্যুগী হয়। একে মহাযুগ বলা হয়। এরূপ একাত্তর যুগে এক মন্বন্তর হয়। প্রত্যেক মন্বন্তরের শেষে সত্যযুগের মানের অর্থাৎ ১৭,২৮,০০০ বর্ষের সন্ধ্যা হয়। মন্বন্তর শেষ হলে যখন সন্ধ্যা হয়, তখন সমস্ত পৃথিবী জলে ডুবে যায়। প্রত্যেক কল্পে (ব্রহ্মার একদিনে) চতুর্দশ মন্বন্তর নিজ নিজ সন্ধ্যার মানের সঙ্গে হয়। এছাড়া কল্পের আরম্ভেও এক সত্যযুগের মানকালের সন্ধ্যা হয়। এইরূপ এক কল্পের চোদ্দ মনুর ৭১ চতুর্যুগীর অতিরিক্ত সত্যযুগের মানের ১৫ সন্ধ্যা হয়। ৭১ মহাযুগের মান হিসাবে ১৪ মনুতে ৯৯৪ মহাযুগ হয় এবং সত্যযুগের মানের ১৫ সন্ধ্যার কাল পুরো ৬ মহাযুগের সমান হয়। দুটির যোগ করলে পুরো এক হাজার মহাযুগ বা দিব্যযুগ পার হয়। এই হিসাবে নিম্নলিখিত অঙ্ক বুঝতে হবে—

	সৌরমান বা মানব বর্ষ	দেবমান বা দিব্য বর্ষ
এক চতুর্যুগী (মহাযুগ বা দিব্যযুগ)	৪৩,২০,০০০	১২,০০০
একাত্তর চতুর্যুগী	৩০,৬৭,২০,০০০	৮,৫২,০০০
কল্পের সন্ধি	১৭,২৮,০০০	৪,৮০০
মন্বন্তরের চোদ্দ সন্ধ্যা	২,৪১,৯২,০০০	৬৭,২০০
সন্ধিসহ এক মন্বন্তর	৩০,৮৪,৪৮,০০০	৮,৫৬,৮০০
চোদ্দ সন্ধ্যাসহ চোদ্দ মন্বন্তর	৪,৩১,৮২,৭২,০০০	১,১৯,৯৫,২০০
কল্পের সন্ধিসহ চোদ্দ মন্বন্তর বা এক কল্প	৪,৩২,০০,০০,০০০	১,২০,০০,০০০

ব্রহ্মার দিনই কল্প, তেমনি দীর্ঘ তাঁর রাত্রি। এই অহোরাত্রের মানে ব্রহ্মার আয়ু একশো বছর। একে 'পর' বলা হয়। বর্তমানে ব্রহ্মা তাঁর আয়ুর অর্ধেক ভাগ অর্থাৎ এক পরার্ধ পার করে দ্বিতীয় পরার্ধ কাটাচ্ছেন। এটি তাঁর ৫১তম বর্ষের প্রথম দিন বা কল্প। বর্তমান কল্পের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত স্বায়ম্ভুব আদি ছয় মন্বন্তর নিজ নিজ সন্ধ্যাসহ পার হয়েছেন, কল্পের সন্ধ্যাসমেত সাত সন্ধ্যা পার হয়েছে। বর্তমান সপ্তম বৈবস্বত মন্বন্তরের ২৭তম চতুর্যুগ পার হয়েছে। এখন আঠাশতম চতুর্যুগের কলিযুগের সন্ধ্যা চলছে। (সূর্যসিদ্ধান্ত, মধ্যমাধিকার, শ্লোক ১৫-২৪ দ্রষ্টব্য)

এই ২০৪৫ বিক্রম সম্বৎ পর্যন্ত কলিযুগের ৫০৮৯ বর্ষ পার হয়েছে। কলিযুগের আরম্ভে ৩৬,০০০ বর্ষ সন্ধ্যাকালের মান হয়। এই হিসাবে এখন কলিযুগের সন্ধ্যারই ৩০,৯১১ সৌরবর্ষ পার করা বাকি।

[২] শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের প্রথম, পঞ্চম ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এর বিস্তারিত বর্ণনা পড়া উচিত। বিভিন্ন পুরাণে এঁদের নামের ভেদ পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসারে এখানে এই নাম দেওয়া হয়েছে।

মনুও পরিবর্তিত হন।

প্রশ্ন—এই সপ্ত মহর্ষাদির সঙ্গে **'মদ্ভাবাঃ'** বিশেষণ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এঁরা সকলেই ভগবানে শ্রদ্ধা ও প্রেম করে থাকেন, এই ভাব দেখাবার জন্য এঁদের ক্ষেত্রে **'মদ্ভাবাঃ'** বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্ন—সপ্তর্ষিগণের ও সনকাদির উৎপত্তি তো ব্রহ্মার মন থেকে হয় বলে মানা হয়। তাহলে এখানে ভগবান এঁদের তাঁর মন থেকে উৎপন্ন বললেন কী করে ?

উত্তর—এঁদের ব্রহ্মা থেকে যে উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে, তা বস্তুতঃ ভগবানের থেকেই হয় ; কারণ স্বয়ং ভগবানই জগৎ-সৃষ্টির জন্য ব্রহ্মার রূপ ধারণ করেন। অতএব ব্রহ্মার মন থেকে উৎপন্ন হওয়াদের যদি ভগবান 'নিজ মন থেকে উৎপন্ন হওয়া' বলেন, তো তাতে কোনো বিরোধাভাস হয় না।

সম্বন্ধ—এইভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকে ভগবানের যে যোগ (প্রভাব) ও চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শ্লোক পর্যন্ত তাঁর যে বিভূতিগুলির বর্ণনা করা হয়েছে, তা জানার ফল পরের শ্লোকে বলা হচ্ছে—

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৭

যে ব্যক্তি আমার **এই** পরম **ঐশ্বর্যরূপ বিভূতি এবং যোগশক্তি তত্ত্বতঃ** জানেন, তিনি অচল **ভক্তিযোগে যুক্ত হয়ে যান—এতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই** ॥ ৭

প্রশ্ন—এখানে **'এতাম্'** বিশেষণের সঙ্গে **'বিভূতিম্'** পদ কীসের বাচক এবং 'যোগম্' পদের দ্বারা কী বলা হয়েছে এবং এই দুটিকে তত্ত্বতঃ জানা কীরূপ ?

উত্তর—আগের তিনটি শ্লোকে ভগবান যে বুদ্ধি ইত্যাদি ভাব এবং মহর্ষি আদিকে তাঁর থেকে উৎপন্ন বলে জানিয়েছেন এবং সপ্তম অধ্যায়ে 'জলে আমি রস' (৭।৮) এবং নবম অধ্যায়ে 'আমি ক্রতু', 'আমি যজ্ঞ' (৯।১৬) ইত্যাদি বাক্য দ্বারা যে সব পদার্থ, ভাব ও দেবতা ইত্যাদির বর্ণনা করেছেন—সেই সবের বাচক এখানে **'এতাম্'** বিশেষণের সঙ্গে **'বিভূতিম্'** পদটি।

ভগবানের যে অলৌকিক শক্তি—দেবতা ও মহর্ষিগণও যা পূর্ণরূপে জানেন না (১০।২,৩) ; যার জন্য ভগবান সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাবাদির অভিন্ন-নিমিত্তোপাদান কারণ হয়েও নিজে সর্বদা তাদের থেকে পৃথক থাকেন এবং বলা হয় যে 'এই ভাব ভগবানে নেই এবং ভগবানও তাঁতে নেই' (৭।১২) ; যে শক্তির দ্বারা সমস্ত জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার ইত্যাদি সমস্ত কর্ম করে ভগবান সমস্ত জগৎকে নিয়মে পরিচালিত করেন ; যার জন্য তিনি সমস্ত লোকের মহান ঈশ্বর, সমস্ত প্রাণীর সুহৃদ, সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা, সর্বাধার ও সর্বশক্তিমান ; যে শক্তির দ্বারা ভগবান এই সমগ্র জগৎকে নিজের একাংশে ধারণ করে আছেন (১০।৪২) এবং যুগে-যুগে ইচ্ছানুসারে বিভিন্ন কার্যাদির জন্য নানারূপ ধারণ করেন এবং সব কিছু করেও সমস্ত কর্মে, সম্পূর্ণ জগৎ এবং জন্মাদি সমস্ত বিকার থেকে সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত থাকেন ; নবম অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে যাকে **'ঐশ্বর যোগ'** বলা হয়েছে—সেই অদ্ভুত শক্তির (প্রভাবের) বাচক হল এখানে 'যোগম্' পদটি।

এইরূপ সমস্ত জগৎ ভগবানেরই সৃষ্টি এবং সব তাঁরই একাংশে স্থিত। তাই জগতে যে সব বস্তু শক্তিসম্পন্ন বলে প্রতীত হয়, যেখানে কিছু বিশেষত্ব দেখা যায়, সেটিকে অথবা সমস্ত জগৎকেই ভগবানের বিভূতি অর্থাৎ তাঁর স্বরূপ মনে করা এবং উপরোক্ত প্রকারে ভগবানকে সমস্ত জগতের হর্তা-কর্তা, সর্বশক্তিমান, সর্বেশ্বর, সর্বাধার, পরম দয়ালু, সকলের সুহৃদ্ এবং সর্বান্তর্যামী মনে করা—এই হল 'ভগবানের বিভূতি ও যোগকে তত্ত্বতঃ' জানা।

প্রশ্ন—**'অবিকম্পেন'** বিশেষণের সঙ্গে 'যোগেন' পদ কীসের বাচক এবং তার সঙ্গে যুক্ত হওয়া কেমন ?

উত্তর—ভগবানের যে অনন্যভক্তি (১১।৫৫),

যাকে 'অব্যভিচারিণী ভক্তি' (১৩।১০) ও 'অব্যভিচারী ভক্তিযোগ' (১৪।২৬)ও বলা হয় ; সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে যাকে 'যোগ' নামে বলা হয়েছে এবং নবম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ, চতুর্দশ ও চৌত্রিশতম এবং এই অধ্যায়ের নবম শ্লোকে যাঁর স্বরূপ বলা হয়েছে—সেই 'অবিচল ভক্তিযোগের' বাচক এখানে 'অবিকম্পেন' বিশেষণের সঙ্গে 'যোগেন' পদটি এবং তাতে সংলগ্ন থাকাই হল তার সঙ্গে যুক্ত হওয়া।

সম্বন্ধ—ভগবানের প্রভাব এবং বিভূতির যথার্থ জ্ঞান হলে তার ফলস্বরূপ অবিচল ভক্তিযোগের প্রাপ্তি বলা হয়েছে। এবার দুটি শ্লোকে সেই ভক্তিযোগ লাভের ক্রম জানাচ্ছেন—

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥ ৮

আমি বাসুদেবই সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ এবং আমা হতেই সমস্ত জগৎ প্রবর্তিত হয়—এইরূপ জেনে শ্রদ্ধা ও ভক্তিযুক্ত বুদ্ধিমান ভক্তগণ পরমেশ্বররূপ আমারই নিরন্তর ভজনা করেন॥ ৮

প্রশ্ন—ভগবানকে সম্পূর্ণ জগতের 'প্রভব' জানা কী ?

উত্তর—সমগ্র জগৎ ভগবানের থেকেই উৎপন্ন ; অতএব ভগবানই সমস্ত জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ ; তাই ভগবানই সর্বোত্তম, এরূপ অনুভব করাই হল ভগবানকে সমস্ত জগতের প্রভব বলে জানা।

প্রশ্ন—সম্পূর্ণ জগৎ ভগবানের দ্বারাই প্রবর্তিত হয়—এটি জানা কীরূপ ?

উত্তর—ভগবানের যোগবলেই এই সৃষ্টিচক্র আবর্তিত হয়, তাঁরই শাসন-শক্তি দ্বারা সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, পৃথিবী ইত্যাদি নিয়মপূর্বক চালিত হয় ; তাঁরই শাসনে সমস্ত প্রাণী নিজ নিজ কর্মানুসারে ভালো-মন্দ জন্মধারণ করে নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করে—এইভাবে ভগবানকে সকলের নিয়ন্তা ও প্রবর্তক বলে জানাই হল 'সম্পূর্ণ জগৎ ভগবানের দ্বারা প্রবর্তিত হয়' এটি জানা।

প্রশ্ন—'ভাবসমন্বিতাঃ' বিশেষণের সঙ্গে '**বুধাঃ**' পদ কীরূপ ভক্তদের বাচক ?

উত্তর—যিনি ভগবানের অতিশয় প্রেমে যুক্ত, ভগবানে যাঁর অটল শ্রদ্ধা, যিনি ভগবানের গুণ ও প্রভাবকে যথাযথ বিশ্বাসপূর্বক বোঝেন—ভগবানের সেই বুদ্ধিমান ভক্তদের বাচক হল '**ভাবসমন্বিতাঃ**' বিশেষণের সঙ্গে '**বুধাঃ**' পদটি।

প্রশ্ন—উপরোক্ত প্রকারে জেনে ভগবানকে ভজনা করা কী ?

উত্তর—উপরোক্ত প্রকারে ভগবানকে সম্পূর্ণ জগতের হর্তা-কর্তা এবং প্রবর্তক জেনে পরবর্তী শ্লোকে বলা প্রকারে অতিশয় শ্রদ্ধা ও প্রেমপূর্বক মন, বুদ্ধি এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা নিরন্তর ভগবদ্ স্মরণ ও সেবা করাকেই ভগবানকে ভজনা করা বলা হয়।

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ ৯

নিরন্তর মদ্গতচিত্ত এবং মদ্গতপ্রাণ ভক্তগণ পরস্পর আমার কথা আলোচনা করে নিজেদের মধ্যে আমার গুণ তথা প্রভাবের কথা জানিয়ে এবং প্রভাবসহ আমার কথা কীর্তন করে সন্তোষ লাভ করেন এবং আমার (বাসুদেবের) মধ্যেই নিরন্তর রমণ করেন॥ ৯

প্রশ্ন—'**মচ্চিত্তাঃ**' কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভগবানকেই নিজের পরম প্রেমিক, পরম সুহৃদ, পরম আত্মীয়, পরম গতি ও পরম প্রিয় মনে করায় যাঁর চিত্ত অনন্যভাবে ভগবানে নিবিষ্ট (৮।১৪ ; ৯।২২) ; ভগবান ব্যতীত কোনো বস্তুতে যাঁর প্রীতি, আসক্তি বা রমণীয় বুদ্ধি নেই ; যিনি সদাসর্বদাই

ভগবানের নাম, গুণ, প্রভাব, লীলা ও স্বরূপের চিন্তা করেন এবং শাস্ত্রবিধি অনুসারে কর্ম করাকালীন ওঠা-বসা, শোয়া-জাগা, চলা-ফেরা, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি সকল ব্যবহারাদি করার সময় কখনো ক্ষণমাত্রও ভগবানকে ভোলেন না, এরূপ নিত্য-নিরন্তর তাঁকে চিন্তাকারী ভক্তদের জন্য এখানে ভগবান **'মচ্চিত্তাঃ'** বিশেষণ যোগ করেছেন।

প্রশ্ন—**'মদ্‌গতপ্রাণাঃ'**র ভাব কী ?

উত্তর—যাঁর জীবন ও ইন্দ্রিয়ের সমস্ত প্রচেষ্টা শুধু ভগবানেরই জন্য, ভগবানের ক্ষণমাত্র বিরহও যাঁর অসহ্য মনে হয়, যিনি ভগবানের জন্য প্রাণ ধারণ করেন, খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা, শয়ন-জাগরণ আদি কোনো কার্যেই যার নিজের কোনো প্রয়োজন নেই—সব কিছুই যিনি ভগবানের জন্য করেন, তাঁর জন্য ভগবান এই **'মদ্‌গতপ্রাণাঃ'** কথাটি প্রয়োগ করেছেন।

প্রশ্ন—**'পরস্পরং বোধয়ন্তঃ'** কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—ভগবানে শ্রদ্ধাভক্তি রাখা প্রেমিক ভক্তদের নিজ নিজ অনুভূতি অনুসারে ভগবানের গুণ, প্রভাব, তত্ত্ব, লীলা, মাহাত্ম্য এবং রহস্যকে পরস্পর নানাপ্রকার যুক্তি দ্বারা বোঝাবার যে চেষ্টা, একেই বলা হয় পরস্পর ভগবানের বোধ করানো।

প্রশ্ন—ভগবানের কথা আলোচনা করা কী ?

উত্তর—শ্রদ্ধা-ভক্তিসহ ভগবানের নাম, গুণ, প্রভাব, লীলা ও স্বরূপের কীর্তন ও গান করা, কথা-ব্যাখ্যা দ্বারা তা লোকেদের মধ্যে প্রচার করা এবং তাঁর স্তুতি করা ইত্যাদি সবই হল ভগবানের কথা আলোচনার অন্তর্গত।

প্রশ্ন—উপরোক্ত প্রকারে সব কিছু করে নিত্য সন্তুষ্ট থাকা কী ?

উত্তর—প্রত্যেক ক্রিয়া করার সময় নিরন্তর পরম আনন্দ অনুভব করাই হল 'নিত্য সন্তুষ্ট থাকা'। এই রূপ সন্তুষ্ট থাকা ভক্তের শান্তি, আনন্দ ও সন্তোষের কারণ শুধু ভগবানের নাম, গুণ, প্রভাব, লীলা এবং স্বরূপ ইত্যাদির শ্রবণ, মনন এবং কীর্তন ও পঠন-পাঠন ইত্যাদি দ্বারাই হয়। সাংসারিক বস্তুতে তাঁর আনন্দ ও সন্তোষের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক থাকে না।

প্রশ্ন—উপরোক্ত প্রকারে সব কিছু করতে থেকে ভগবানে নিরন্তর রমণ করা কাকে বলে ?

উত্তর—ভগবানের নাম, গুণ, প্রভাব, লীলা, স্বরূপ, তত্ত্ব ও রহস্যের যথাযোগ্য শ্রবণ, মনন এবং কীর্তন করে এবং তাঁর রুচি, নির্দেশ ও সংকেত অনুসারে কেবল তাঁতে প্রেম হওয়ার জন্য প্রত্যেক ক্রিয়া করতঃ, মনের দ্বারা তাঁকে সদাসর্বদা প্রত্যক্ষবৎ নিজের কাছে মনে করে নিরন্তর প্রেমপূর্বক তাঁর দর্শন, স্পর্শ ও তাঁর সঙ্গে বার্তালাপ ইত্যাদি কাজ করতে থাকা—একেই বলে ভগবানে নিরন্তর রমণ করা।

সম্বন্ধ—উপরোক্ত প্রকারে ভজনকারী ভক্তদের জন্য ভগবান কী করেন, পরবর্তী দুটি শ্লোকে তা জানাচ্ছেন—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ১০

আমার ধ্যানে সর্বদা আসক্ত এবং প্রেমপূর্বক আমাকে ভজনশীল ভক্তদের আমি সেই তত্ত্বজ্ঞানরূপ যোগ প্রদান করি, যাতে তাঁরা আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ১০

প্রশ্ন—**'তেষাম্'** পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—পূর্বের দুটি শ্লোকে **'বুধাঃ'** এবং **'মচ্চিত্তাঃ'** ইত্যাদি পদের দ্বারা যে ভক্তগণের বর্ণনা করা হয়েছে, সেই নিষ্কাম অনন্যপ্রেমী ভক্তদের বাচক হল এখানে **'তেষাম্'** পদটি।

প্রশ্ন—**'সততযুক্তানাম্'** কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—পূর্বশ্লোকে **'মচ্চিত্তাঃ'**, **'মদ্‌গতপ্রাণাঃ'**, **'পরস্পরং মাং বোধয়ন্তঃ'** এবং **'কথয়ন্তঃ'** দ্বারা যে কথা বলা হয়েছে, সেই সবের সমাহার **'সততযুক্তানাম্'** পদে করা হয়েছে।

প্রশ্ন—**'প্রীতিপূর্বকং ভজতাম্'** কথাটির কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—পূর্বশ্লোকে **'নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ'** তে

যে কথা বলা হয়েছে, তার সমাহার এখানে 'প্রীতিপূর্বকম্ ভজতাম্' পদে করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে পূর্ব শ্লোকে ভগবানের যে ভক্তদের বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁরা ভোগ-কামনার জন্য ভগবানের ভজনা করেন না, বরং কোনো প্রকার ফলাকাঙ্ক্ষা না করে কেবল নিষ্কাম অনন্য প্রেমপূর্বক ভাবেই ভগবানকে, এই শ্লোকে কথিত প্রকারে, নিরন্তর ভজনা করেন[১]।

প্রশ্ন—এরূপ ভক্তদের ভগবান বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন—সেটা কী এবং তার দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায় কীরূপে ?

উত্তর—ভক্তদের অন্তঃকরণে ভগবানের প্রভাব ও মহত্ত্বাদির রহস্যসহ নির্গুণ-নিরাকার তত্ত্ব এবং লীলা, রহস্য, মহত্ত্ব ও প্রভাবাদি সহ সগুণ নিরাকার এবং সাকার তত্ত্ব যথার্থরূপে বোঝার যে সামর্থ্য প্রদান করা হয়—সেটিই হল 'বুদ্ধিযোগ প্রদান করা'। ভগবান একেই সপ্তম ও নবম অধ্যায়ে বিজ্ঞান-সহ জ্ঞান বলেছেন এবং এই বুদ্ধিযোগ দ্বারা ভগবানকে প্রত্যক্ষ করাই হল ভগবানকে লাভ করা।

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ ১১

হে অর্জুন ! সেই ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করে আমি তাঁদের অন্তরে থেকে অজ্ঞতাজনিত অন্ধকারকে প্রকাশময় তত্ত্বজ্ঞানরূপ প্রদীপের দ্বারা বিনাশ করি ॥ ১১

প্রশ্ন—সেই ভক্তদের অনুগ্রহ করার জন্য আমি নিজেই তাদের অজ্ঞতাজনিত অন্ধকার বিনাশ করে দিই, এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথায় ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, নিজ ভক্তদের অনুগ্রহ করার জন্য তিনি নিজেই তাঁদের অজ্ঞতাজনিত অন্ধকার বিনাশ করেন, তার জন্য ভক্তদের অন্য কোনো সাধনা করতে হয় না।

প্রশ্ন—'অজ্ঞানজম্' বিশেষণের সঙ্গে 'তমঃ' পদ কীসের বাচক এবং তাকে আমি তাদের আত্মভাবে স্থিত থেকে বিনাশ করি, ভগবানের এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—অনাদিসিদ্ধ অজ্ঞান হতে উৎপন্ন যে আবরণশক্তি—যার কারণে মানুষ ভগবানের গুণ, প্রভাব ও স্বরূপ যথার্থভাবে জানতে পারে না—তার বাচক হল এই 'অজ্ঞানজম্' বিশেষণের সঙ্গে 'তমঃ' পদটি। 'আমি সেই অজ্ঞানকে ভক্তদের আত্মভাবে স্থিত হয়ে বিনাশ করি' এই কথায় ভগবান তাঁর ভক্তির মহিমা ও নিজের মধ্যে বৈষম্য দোষের অভাব দেখিয়েছেন। ভগবানের কথার অভিপ্রায় হল যে 'আমি সকলের হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে সদাসর্বদা বিরাজমান, তা সত্ত্বেও লোকে আমাকে তাদের মধ্যে স্থিত বলে মানে না, এই জন্য আমি তাদের অজ্ঞতাজনিত অন্ধকার নাশ করতে পারি না। কিন্তু আমার প্রেমিক ভক্ত আমাকে তার অন্তর্যামী বুঝে পূর্বশ্লোকে বলা প্রকারে নিরন্তর আমার ভজনা করেন, তাইজন্য আমি তাঁদের অজ্ঞতাজনিত অন্ধকার সহজেই বিনাশ করি'।

প্রশ্ন—'ভাস্বতা' বিশেষণের সঙ্গে 'জ্ঞানদীপেন' পদ কীসের বাচক এবং তার দ্বারা 'অজ্ঞতাজনিত অন্ধকার বিনাশ করা' কী ?

উত্তর—পূর্বশ্লোকে যে বুদ্ধিযোগের কথা বলা হয়েছে ; যার দ্বারা ভগবানের প্রভাব ও মহিমাসহ নির্গুণ-নিরাকার তত্ত্বের এবং লীলা, রহস্য, মহত্ত্ব ও প্রভাব ইত্যাদির সঙ্গে সগুণ-নিরাকার ও সাকারতত্ত্বের স্বরূপ ভালোভাবে জানা যায় ; যাকে সপ্তম ও নবম অধ্যায়ে বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের নামে বর্ণনা করেছেন—এরূপ সংশয়, বিপর্যয় ইত্যাদি দোষরহিত 'দিব্য বোধে'র বাচক এখানে

---

[১]ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্। ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৬।১১।২৫)

'হে সর্বসদ্‌গুণযুক্ত ! আপনাকে ত্যাগ করে আমি স্বর্গের সব থেকে উচ্চলোকেও নিবাস করতে চাই না, ব্রহ্মার পদও চাই না, সমস্ত পৃথিবীর রাজত্বও চাই না, পাতাল লোকের আধিপত্যও চাই না, যোগসিদ্ধিও চাই না—এমন কী, মুক্তিও চাই না।'

'ভাস্বতা' বিশেষণের সঙ্গে 'জ্ঞানদীপেন' পদটি। এর দ্বারা ভক্তগণের অন্তরে ভগবতত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক আবরণ দোষের সর্বথা বিনাশ করাই হল 'অজ্ঞতাজনিত অন্ধকার বিনাশ করা'।

প্রশ্ন— এই জ্ঞানদীপ (বুদ্ধিযোগ) দ্বারা প্রথমে অজ্ঞানের বিনাশ হয় নাকি ভগবানের প্রাপ্তি হয় ?

উত্তর— জ্ঞানদীপ দ্বারা যদিও অজ্ঞানের বিনাশ ও ভগবদ্প্রাপ্তি উভয়ই একসঙ্গে হয়, তবুও যদি পূর্বাপর বিভাগ করা যায় তাহলে বুঝতে হবে যে প্রথমে অজ্ঞান নাশ হয় এবং সেই ক্ষণেই ভগবানের প্রাপ্তি হয়।

সম্বন্ধ— সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে নিজ সমগ্ররূপের জ্ঞান প্রদায়ক যে বিষয়টি শোনার জন্য ভগবান অর্জুনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং দ্বিতীয় শ্লোকে যে বিজ্ঞানসহ জ্ঞানকে পূর্ণভাবে বলার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন— ভগবান তার বর্ণনা সপ্তম অধ্যায়ে করেছেন। তারপর অষ্টম অধ্যায়ে অর্জুনের সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়েও ভগবান সেই বিষয় স্পষ্টীকরণ করেছেন ; কিন্তু সেখানে বলার শৈলী অন্য ছিল, তাই নবম অধ্যায়ের আরম্ভে পুনরায় বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের বর্ণনা করার প্রতিজ্ঞা করে সেই বিষয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গসহ ভালোভাবে বুঝিয়েছেন। তারপর ভিন্ন শৈলীতে পুনরায় সেটি স্পষ্ট করার জন্য দশম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে সেই বিষয়টি পুনরায় বলার প্রতিজ্ঞা করেছেন এবং পাঁচটি শ্লোক দ্বারা নিজ যোগশক্তি ও বিভূতিগুলির বর্ণনা করে সপ্তম শ্লোকে সেগুলি জানার ফল অবিচল ভক্তিযোগ প্রাপ্তি বলে জানিয়েছেন। তারপর অষ্টম ও নবম শ্লোকে ভক্তিযোগের দ্বারা ভগবানের ভজনে ব্যাপৃত ভক্তদের ভাব ও আচরণের বর্ণনা করেছেন। দশম ও একাদশে তার ফল অজ্ঞানজনিত অন্ধকারের বিনাশ এবং যে বুদ্ধিযোগের দ্বারা তাঁকে লাভ করা যায় তা জানিয়ে সেই বুদ্ধিযোগ প্রাপ্তির কথা বলে বিষয়ের উপসংহার করেছেন। এরপর ভগবানের বিভূতি ও যোগকে তত্ত্বতঃ জেনে গেলে সেটি ভগবৎপ্রাপ্তির পরম সহায়ক হবে, একথা বুঝে অর্জুন এবার সাতটি শ্লোকে প্রথমে ভগবানের স্তুতি করে তারপর ভগবানের কাছে তাঁর যোগশক্তি ও বিভূতিসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছেন—

অর্জুন উবাচ

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥ ১২
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে॥ ১৩

অর্জুন বললেন—আপনি পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম এবং পরম পবিত্র, আপনি সর্বব্যাপী, সনাতন, জন্মরহিত, দিব্যপুরুষ ও আদিদেব। সকল ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ এবং অসিত ও দেবল ঋষি এবং মহর্ষি ব্যাসও আপনাকে এভাবেই বর্ণনা করেছেন এবং আপনি নিজেও আমাকে তাই বলেছেন॥ ১২-১৩

প্রশ্ন—আপনি 'পরম ব্রহ্ম', 'পরম ধাম' ও 'পরম পবিত্র'—অর্জুনের এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর— অর্জুনের কথার অভিপ্রায় এই যে, যে নির্গুণ পরমাত্মাকে 'পরম ব্রহ্ম' বলা হয়, তিনি আপনারই স্বরূপ এবং আপনার যে নিত্যধাম তাও সচ্চিদানন্দময় দিব্য এবং আপনার থেকে অভিন্ন হওয়ায় আপনারই স্বরূপ। আপনার নাম, গুণ, প্রভাব, লীলা ও স্বরূপাদি শ্রবণ, মনন ও কীর্তন ইত্যাদি সবাইকে সর্বতোভাবে পরম পবিত্র করে থাকে ; তাই আপনি পরম পবিত্র।

প্রশ্ন— 'সর্বে' বিশেষণের সঙ্গে 'ঋষয়ঃ' পদ কোন্ ঋষিদের বাচক এবং তাঁরা আপনাকে 'সনাতন দিব্য পুরুষ', 'আদিদেব', 'বিভু' এবং 'অজন্মা' বলে

থাকেন—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'**সর্বে**' বিশেষণের সঙ্গে '**ঋষয়ঃ**'[১] পদ এখানে মার্কণ্ডেয়, অঙ্গিরা প্রমুখ সমস্ত ঋষিকুলের বাচক এবং নিজের ধারণার সমর্থনে অর্জুন তাঁদের কথার প্রমাণ দিচ্ছেন। অভিপ্রায় হল যে এঁরা আপনাকে সনাতন—নিত্য একরসে থাকা, ক্ষয়বিনাশরহিত, দিব্য, স্বতঃপ্রকাশ এবং জ্ঞানস্বরূপ, সকলের আদিদেব এবং অজ—উৎপত্তিরূপ বিকাররহিত এবং সর্বব্যাপী বলে থাকেন। সুতরাং আপনি যে 'পরম ব্রহ্ম', 'পরম ধাম' ও 'পরম পবিত্র'—এতে কোনো সন্দেহ নেই।[২]

প্রশ্ন—দেবর্ষির লক্ষণ কী এবং এমন দেবর্ষি কে-কে ?

উত্তর—দেবর্ষির লক্ষণ হল—

দেবলোকপ্রতিষ্ঠাশ্চ জ্ঞেয়া দেবর্ষয়ঃ শুভাঃ॥
দেবর্ষয়স্তথান্যে চ তেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণম্।
ভূতভব্যভবজ্ঞানং সত্যাভিব্যাহৃতং তথা॥
সম্বুদ্ধাস্তু স্বয়ং যে তু সম্বদ্ধা যে চ বৈ স্বয়ম্।
তপসেহ প্রসিদ্ধা যে গর্ভে যৈশ্চ প্রণোদিতম্॥
মন্ত্রব্যাহারিণো যে চ ঐশ্বর্যাৎ সর্বগাশ্চ যে।
ইত্যেতে ঋষিভির্যুক্তা দেবর্ষিজনৃপাস্তু যে॥

(বায়ুপুরাণ ৬১।৮৮, ৯০, ৯১, ৯২)

'দেবলোকে যাঁর নিবাস, তাঁকে শুভ দেবর্ষি বলে জানবে। ইনি ছাড়া এমন অন্য যে আরও দেবর্ষি আছেন, তাঁদের লক্ষণ বলছি। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের জ্ঞান থাকা এবং সর্বপ্রকারে সত্য কথা বলা হল দেবর্ষির লক্ষণ। যিনি নিজে যথাযথ জ্ঞান প্রাপ্ত এবং স্বয়ং স্ব-ইচ্ছায় সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখেন, যিনি নিজ তপস্যার দ্বারা এই জগতে বিখ্যাত, যিনি (প্রহ্লাদ প্রমুখকে) গর্ভেই উপদেশ প্রদান করেন, যিনি মন্ত্রাদির বক্তা এবং যিনি ঐশ্বর্যের (সিদ্ধির) বলে সর্বত্র সর্বলোকে বিনা বাধায় যাতায়াতে সক্ষম এবং যিনি সর্বদা ঋষিগণ পরিবৃত থাকেন, সেই দেবতা, ব্রাহ্মণ ও রাজা—এঁরা সকলেই দেবর্ষি।'

দেবর্ষি অনেক আছেন, যাঁদের মধ্যে কয়েকটি নাম এরূপ—

দেবর্ষী ধর্মপুত্রৌ তু নরনারায়ণাবুভৌ।
বালখিল্যাঃ ক্রতোঃ পুত্রাঃ কর্দমঃ পুলহস্য তু॥
পর্বতো নারদশ্চৈব কশ্যপস্যাত্মজাবুভৌ।
ঋষন্তি দেবান্ যস্মাত্তে তস্মাদ্দেবর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ॥

(বায়ুপুরাণ ৬১।৮৩, ৮৪, ৮৫)

'ধর্মের দুই পুত্র নর ও নারায়ণ, ক্রতুর পুত্র বালখিল্য ঋষি, পুলহর পুত্র কর্দম, পর্বত ও নারদ এবং কাশ্যপের দুই ব্রহ্মবাদী পুত্র অসিত এবং বৎসর—এঁরা যেহেতু দেবতাদের অধীন করে রাখতে পারেন, তাই

---

[১]ঋষীত্যেষ গতৌ ধাতুঃ শ্রুতৌ সত্যে তপস্যথ। এতৎ সন্নিয়তঃ যস্মিন্ ব্রহ্মণা স ঋষিঃ স্মৃতঃ।

গত্যর্থাদৃষতের্ধাতোর্নামনির্বৃত্তিরাদিতঃ। যস্মাদেষ স্বয়ম্ভূতস্তস্মাচ্চ ঋষিতা স্মৃতা॥ (বায়ুপুরাণ ৫৯।৭৯, ৮১)

'ঋষ্' ধাতু গমন (জ্ঞান), শ্রবণ, সত্য ও তপ এই অর্থে প্রযুক্ত হয়। এই সব বিষয় যাঁদের মধ্যে এক সঙ্গে নিশ্চিতরূপে থাকে, ব্রহ্মা তাঁদের নাম 'ঋষি' রেখেছেন। গত্যর্থক 'ঋষ' ধাতু দ্বারাই 'ঋষি' শব্দের নিষ্পত্তি হয়েছে এবং যেহেতু আদিকালে এই ঋষিবর্গ স্বয়ং উৎপন্ন হন, তাই তাঁদের সংজ্ঞা 'ঋষি'।

[২]পরম সত্যবাদী ধর্মমূর্তি পিতামহ ভীষ্ম দুর্যোধনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব জানাতে গিয়ে বলেছিলেন—'ভগবান বাসুদেব সর্বদেবগণের দেবতা এবং সর্বশ্রেষ্ঠ, ইনিই ধর্ম, ধর্মজ্ঞ, বরদ, সর্বকামনাপূর্ণকারী এবং ইনিই কর্তা, কর্ম এবং স্বয়ং প্রভু। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, সন্ধ্যা, দিক্, আকাশ এবং সব নিয়মকে এই জনার্দনই সৃষ্টি করেছেন। এই মহাত্মা অবিনাশী প্রভু ঋষি, তপ ও জগৎ সৃষ্টিকারী প্রজাপতির রচনা করেছেন। সকল প্রাণীর অগ্রজ সঙ্কর্ষণই তাঁরই সৃষ্টি। লোক যাঁকে 'অনন্ত' বলে এবং যিনি পর্বত সহ সমস্ত পৃথিবী ধারণ করে রেখেছেন, সেই শেষনাগও এঁর থেকেই উৎপন্ন ; ইনিই বরাহ, নৃসিংহ, বামন অবতার ধারণকারী। ইনিই সবার মাতা-পিতা, এঁর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই ; ইনিই কেশব, পরম তেজরূপ এবং সর্বলোকের পিতামহ, মুনিগণ এঁকে হৃষিকেশ বলে থাকেন ; ইনিই আচার্য, পিতৃপুরুষ এবং গুরু। এই শ্রীকৃষ্ণ যাঁর ওপর প্রসন্ন হন, তাঁর অক্ষয়লোক প্রাপ্তি হয়। ভয় উপস্থিত হলে যিনি এই ভগবান কেশবের শরণ গ্রহণ করেন এবং তাঁর স্তুতি করেন, সেই ব্যক্তি পরম সুখ প্রাপ্ত হন।' 'যে সব ব্যক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন, তাঁরা কখনো মোহপ্রাপ্ত হন না। মহাভয়ে (সংকটে) ডুবে থাকা ব্যক্তিদেরও ভগবান জনার্দন নিত্য রক্ষা করেন।'

যে চ কৃষ্ণং প্রপদ্যন্তে তে ন মুহ্যন্তি মানবাঃ। ভয়ে মহতি মগ্নাংশ্চ পাতি নিত্যং জনার্দনঃ॥ (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব, ৬৭।২৪)

এঁদের 'দেবর্ষি' বলা হয়।'

প্রশ্ন—দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল এবং ব্যাস কে ? অর্জুন বিশেষভাবে এঁদের নাম কেন করেছেন ? এঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা সম্পর্কে কী বলেছিলেন ?

উত্তর— দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল এবং ব্যাস—এই চারজনই ভগবানের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁর মহাপ্রেমিক ভক্ত এবং পরম জ্ঞানী মহর্ষি[১]। এঁরা সেই সময়ে (কালে) বহু সম্মাননীয় ও মহাসত্যবাদী মহাপুরুষরূপে প্রতিষ্ঠিত, তাই

---

[১]নারদ কয়েকজন আছেন, কিন্তু দেবর্ষি নারদ একজনই। এঁকে ভগবানের 'মন' বলা হয়। ইনি পরম তত্ত্বজ্ঞ, পরম প্রেমিক, ঊর্ধ্বরেতা ব্রহ্মচারী। ইনি ভক্তির প্রধান আচার্য। জগতে এঁর অমিত উপকার রয়েছে। প্রহ্লাদ, ধ্রুব, অম্বরীষাদি মহান ভক্তদের ইনি ভক্তিমার্গে প্রবৃত্ত করেছেন এবং শ্রীমদ্ভাগবত ও বাল্মীকি-রামায়ণের মতো দুটি অমূল্য গ্রন্থও এঁরই কৃপায় জগৎ লাভ করেছে। শুকদেবের ন্যায় মহাজ্ঞানীকেও ইনি উপদেশ দিয়েছেন।

ইনি পূর্বজন্মে দাসীপুত্র ছিলেন। এঁর মাতা মহর্ষিদের এঁটো বাসন মাজতেন। ইনি যখন পাঁচবছরের, এঁর মাতা হঠাৎ মারা যান। তিনি তখন সর্বপ্রকার সাংসারিক বন্ধন মুক্ত হয়ে জঙ্গলে চলে যান এবং এক বৃক্ষতলে বসে ভগবানের স্বরূপ চিন্তা করতে থাকেন। ধ্যান করতে করতে এঁর বৃত্তি একাগ্র হয়ে ওঠে এবং তাঁর হৃদয়ে ভগবান প্রকটিত হন। কিন্তু সামান্য সময়ের জন্য ভগবান তাঁকে নিজ মনোহর রূপ দেখিয়ে অন্তর্ধান করেন। তখন তিনি অস্থির হয়ে মনকে পুনরায় স্থির করে ভগবানের ধ্যান করতে থাকেন। কিন্তু ভগবানের সেইরূপ আর দেখতে পান না। এরমধ্যে আকাশবাণী হয়—'হে দাসীপুত্র ! এই জন্মে তুমি আর আমার দর্শন পাবে না। এই দেহ ত্যাগ করে আমার পার্ষদরূপে তুমি আবার আমাকে লাভ করবে।' ভগবানের এই কথা শুনে ইনি শান্তি পান এবং মৃত্যুর পথ চেয়ে নিঃসঙ্গ হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করতে থাকেন। যথা সময়ে তিনি তাঁর দেহত্যাগ করেন। কল্পের অন্তে তিনি ভগবানের প্রাণে প্রবিষ্ট হন এবং পরে দ্বিতীয় কল্পে দিব্যদেহ ধারণ করে ব্রহ্মার মানসপুত্ররূপে আবার অবতীর্ণ হন ও তখন থেকে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য ব্রত ধারণ করে বীণাবাদন করে ভগবানের গুণগান গেয়ে থাকেন। (শ্রীমদ্ভাগবত, স্কন্ধ ১, অধ্যায় ৬)।

মহাভারত সভাপর্বের পঞ্চম অধ্যায়ে বলা হয়েছে—

'দেবর্ষি নারদ বেদ ও উপনিষদের মর্মজ্ঞ, দেবগণ পূজিত, ইতিহাস-পুরাণ-বিশেষজ্ঞ, অতীত-কল্পের কথা জ্ঞাত, ন্যায় ও ধর্মের তত্ত্বজ্ঞ ; শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, আয়ুর্বেদজ্ঞানীদের মধ্যে অগ্রগণ্য, পরস্পর-বিরুদ্ধ বিবিধ বিধি-বাক্যের সমন্বয় করায় প্রবীণ, প্রভাবশালী বক্তা, নীতিজ্ঞ, মেধাবী, স্মরণশীল, জ্ঞানী, কবি, ভালো-মন্দ বোঝায় চতুর, সমস্ত প্রমাণ দ্বারা বস্তুতত্ত্ব নির্ণয়ে সমর্থ, ন্যায়-বাক্যের দোষ-গুণের জ্ঞাতা, বৃহস্পতির ন্যায় বিদ্বানদের প্রশ্নের সমাধান করতে সক্ষম, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের তত্ত্ব যথার্থরূপে জ্ঞাত, সারা ব্রহ্মাণ্ডে ও ত্রিলোকে সর্বত্র যা কিছু হয়—যোগবলে সব প্রত্যক্ষ দর্শনকারী, সাংখ্য ও যোগবিভাগের জ্ঞাতা, দেব-দৈত্যদের বৈরাগ্যের উপদেশ প্রদানে চতুর, সন্ধি-বিগ্রহ তত্ত্ব জ্ঞাত, কর্তব্যাকর্তব্য বিভাগ করায় দক্ষ, ষাড়গুণ্য-প্রয়োগ বিষয়ে অনুপম, সর্ব শাস্ত্রে প্রবীণ, যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ, সঙ্গীত বিশারদ, ভগবদ্‌ভক্ত, বিদ্যা ও গুণের ভাণ্ডার, সদাচারের আধার, সকলের হিতকারী এবং সর্বত্র গতিসম্পন্ন। উপনিষদ্, পুরাণ ও ইতিহাস এঁর পবিত্র গাথায় পরিপূর্ণ।

• • • •

মহর্ষি অসিত ও দেবল পিতা-পুত্র। এঁদের সম্বন্ধে কূর্মপুরাণে বর্ণনা পাওয়া যায়—

এতানুৎপাদ্য পুত্রাংস্তু প্রজাসন্তানকারণাৎ। কশ্যপঃ পুত্রকামস্তু চচার সুমহত্তপঃ॥
তস্যৈবং তপতোঽত্যর্থং প্রাদুর্ভূতৌ সুতাবিমৌ। বৎসরশ্চাসিতশ্চৈব তাবুভৌ ব্রহ্মবাদিনৌ॥
অসিতস্যৈকপর্ণায়াং ব্রহ্মিষ্ঠঃ সমপদ্যত। নাম্না বৈ দেবলঃ পুত্রো যোগাচার্যো মহাতপাঃ॥ (কূর্মপুরাণ ১৯।১, ২, ৫)

'কশ্যপ মুনি প্রজা বিস্তারের জন্য এই পুত্রদের উৎপন্ন করে আবার পুত্র প্রাপ্তির জন্য তপস্যা করেন। তাঁর একরূপ উগ্র তপস্যায় 'বৎসর' ও 'অসিত' নামে দুই পুত্র জন্মায়। তাঁরা দুজনেই ব্রহ্মবাদী (ব্রহ্মবেত্তা ও ব্রহ্ম উপদেশকারী) ছিলেন। 'অসিতে'র পত্নী একপর্ণার গর্ভে মহাতপস্বী যোগাচার্য 'দেবল' নামক বেদনিষ্পাত পুত্র জন্ম নেন।'

এঁরা দুজনই ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। দেবল ঋষি ভগবান শিবের আরাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এঁরা দুজনেই অত্যন্ত প্রবীণ ও প্রাচীন মহর্ষি। প্রত্যূষ নামক বসুরও দেবল ঋষি নামে পুত্র ছিল। (হরিবংশ ৩।৪৪)

• • • •

শ্রীবেদব্যাসকে ভগবানের অংশাবতার বলে মানা হয়। ইনি দ্বীপে জন্মেছিলেন, তাই তাঁর নাম হয় 'দ্বৈপায়ন' ; দেহ শ্যামবর্ণ, তাই 'কৃষ্ণদ্বৈপায়ন'ও বলা হত এবং বেদবিভাগ করায় লোকে 'বেদব্যাস' বলত। ইনি মহামুনি পরাশরের পুত্র, মাতা

বিশেষ করে এঁদের নাম উল্লিখিত হয়েছে এবং তাঁরা নিত্য ভগবানের মহিমা কীর্তন করে থাকেন। এঁদের জীবনের প্রধান কার্য হল ভগবানের মহিমা বিস্তার করা। মহাভারতেও এঁদের এবং অন্যান্য ঋষি-মহর্ষিদের ভগবানের মহিমা বর্ণনার কিছু প্রসঙ্গ রয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কোন্ ঋষি কী বলেছেন, তা সংক্ষেপে ভীষ্মপর্বে পিতামহ ভীষ্ম স্বয়ংই বর্ণনা করেছেন।[১]

প্রশ্ন — আপনি নিজেও আমাকে বলছেন—এই

সত্যবতী। ইনি জন্ম নিয়েই তপস্যা করতে বনগমন করেন। তিনি ভগবাদ্‌তত্ত্বের পূর্ণ জ্ঞাতা ও অদ্বিতীয় মহাকবি। তিনি জ্ঞানের অসীম, অগাধ সমুদ্র, বিদ্বত্তার পরাকাষ্ঠা এবং কবিত্বের শেষ সীমা। ব্যাসের হৃদয় ও বাণীর বিকাশই সমস্ত জগতের জ্ঞানের প্রকাশ ও অবলম্বন।

ভগবান ব্যাসই ব্রহ্মসূত্রের রচনা করেন। মহাভারত-সদৃশ অলৌকিক গ্রন্থ ভগবান ব্যাসই প্রণয়ন করেন। অষ্টাদশ পুরাণ ও বহু উপপুরাণ ভগবান ব্যাস রচনা করেছেন। ভারতের ইতিহাস এর সাক্ষী। আজ সমগ্র জগৎ ব্যাসদেবের জ্ঞানপ্রসাদে নিজ নিজ কর্তব্যের পথ অনুসন্ধান করছে।

প্রত্যেক দ্বাপরযুগে বেদবিভাগকারী ভিন্ন ভিন্ন ব্যাস প্রকট হয়ে থাকেন। বৈবস্বত মন্বন্তরের এই পরাশরপুত্র শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন আঠাশতম বেদব্যাস। ইনি তাঁর প্রধান শিষ্য পৈলকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ, সুমন্তকে অথর্ববেদ পড়ান এবং সূতজাতির মহাবুদ্ধিমান রোমহর্ষণ মহামুনিকে ইতিহাস ও পুরাণের শিক্ষাদান করেছেন।

[১]দেবর্ষি নারদ বলেছেন —'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র লোকের উৎপন্নকারী ও সমস্ত ভাব জ্ঞাতকারী এবং সাধ্যদের এবং দেবতাদের ঈশ্বরেরও ঈশ্বর।'

মার্কণ্ডেয় মুনি বলেন—'শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞাদির যজ্ঞ, তপাদির তপ এবং অতীত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানরূপ।'

ভৃগু বলেন—'ইনি দেবতাদের দেবতা এবং পরম পুরাতন বিষ্ণু।'

ব্যাস বলেন—'ইনি ইন্দ্রকে ইন্দ্রত্ব প্রদানকারী দেবতাদেরও পরম দেবতা।'

অঙ্গিরা বলেন—'ইনি সব প্রাণিদের রচনাকারী।'

সনৎকুমারাদি বলেন—'এঁর মস্তক দ্বারা আকাশ এবং বাহু দ্বারা পৃথিবী ব্যাপ্ত, ত্রিলোক এঁর পেটে থাকে ; ইনি সনাতন পুরুষ, তপের দ্বারা অন্তর শুদ্ধ হলেই সাধক এঁকে জানতে পারে। আত্মদর্শন দ্বারা তৃপ্ত ঋষিগণের মধ্যেও এঁকে পরমোত্তম মানা হয় এবং যুদ্ধে রণভঙ্গ না দেওয়া রাজর্ষিগণেরও ইনিই পরম গতি।' (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব, ৬৮)

মহাভারত, বনপর্বের দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিমতী দ্রৌপদীর বচন আছে—

অসিত ও দেবল ঋষি বলেছেন—'শ্রীকৃষ্ণই প্রজার পূর্ব সৃষ্টিতে প্রজাপতি ও সমগ্র লোকের একমাত্র রচয়িতা।'

পরশুরাম বলেছেন—'ইনিই বিষ্ণু, এঁকে কেউই পরাজিত করতে পারে না, ইনিই যজ্ঞ, যজ্ঞকারী এবং যজ্ঞের দ্বারা যজনীয়।'

নারদ বলেছেন—'ইনি সাধ্য দেবেদের ও সমস্ত কল্যাণের ঈশ্বরদেরও ঈশ্বর'। 'বালক যেমন নিজ ইচ্ছানুসারে খেলনা নিয়ে খেলা করে, তেমনই শ্রীকৃষ্ণও ব্রহ্মা, শিব এবং ইন্দ্রাদি দেবতাদের নিয়ে খেলা করেন।'

এছাড়া মহাভারতে ভগবান ব্যাস বলেছেন—'সৌরাষ্ট্রদেশে দ্বারকা নামে এক পবিত্র নগরী আছে, তাতে সাক্ষাৎ পুরাণ পুরুষোত্তম মধুসূদন ভগবান বিরাজ করেন। তিনি স্বয়ং সনাতন ধর্মের মূর্তি। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও আত্মজ্ঞানী পুরুষ মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ 'সনাতন ধর্ম' বলে থাকেন। ভগবান গোবিন্দ পবিত্রদের মধ্যে পরম পবিত্র, পুণ্যদের মধ্যে পরম পুণ্য এবং মঙ্গলের মধ্যে পরম মঙ্গল। এই কমললোচন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ত্রিলোকে সনাতন দেবতাগণেরও দেবতা। ইনিই মধুসূদন অক্ষর, ক্ষর, ক্ষেত্রজ্ঞ, পরমেশ্বর এবং অচিন্ত্যমূর্তি।' (মহাভারত, বনপর্ব, ৮।২৪-২৭)

শ্রীমদ্ভাগবতে দেবর্ষি নারদ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন—'হে রাজন্! মানুষদের মধ্যে তোমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান, কারণ লোকাদির পবিত্রকারী মুনিগণ তোমাদের মহলে আগমন করেন এবং মানবচিহ্নধারী সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম গূঢ়রূপে এখানে বিরাজমান। আহা! মহত্মারা যে কৈবল্য নির্বাণ সুখ অনুসন্ধান করেন, শ্রীকৃষ্ণই সেই পরম ব্রহ্ম। ইনি তোমাদের পরম সুহৃদ, মামার ছেলে, পূজ্য, পথপ্রদর্শক এবং গুরু ; তাহলে বল, তোমাদের মতো ভাগ্যবান আর কে আছে?' (৭।১৫।৭৫-৭৬)

কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথায় অর্জুনের এই অভিপ্রায় যে, শুধু উপরোক্ত ঋষিগণই বলেছেন, তা নয় ; আপনি নিজেও আমাকে আপনার অতুলনীয় প্রভাবের কথা বলেছেন (৪।৬ থেকে ৯ পর্যন্ত ; ৫।২৯ ; ৭।৭ থেকে ১২ পর্যন্ত ; ৯।৪ থেকে ১১ এবং ১৬ থেকে ১৯ পর্যন্ত ; এবং ১০।২, ৩, ৮)। সুতরাং আমি যে আপনাকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর মনে করি, তা ঠিকই।

সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ॥ ১৪

হে কেশব ! আমাকে আপনি যা বলছেন, সেসবই আমি সত্য বলে মনে করি। হে ভগবন্ ! আপনার এই আবির্ভাব দেবতা বা দানব কেউই অবগত নয়॥ ১৪

প্রশ্ন—এখানে '**কেশব**' সম্বোধনের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ—এই তিন শক্তিগুলিকে ক্রমশঃ 'ক' 'অ' এবং 'ঈশ' (কেশ) বলা হয় এবং এই তিনটি যাঁর বপু বা স্বরূপ, তাঁকে 'কেশব' বলা হয়। সুতরাং অর্জুন এখানে শ্রীকৃষ্ণকে কেশব বলে এই ভাব দেখিয়েছেন যে, আপনি সমস্ত জগতের উৎপত্তি, পালন ও সংহারকারী সাক্ষাৎ পরমেশ্বর, এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন—এখানে '**এতৎ**' এবং '**যৎ**' পদ ভগবানের কোন্ কথার সংকেত করছে, সে সবকে সত্য মানার অর্থ কী ?

উত্তর—সপ্তম অধ্যায়ের আরম্ভ থেকে এই অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক পর্যন্ত ভগবান স্বমুখে তাঁর যেসকল গুণ, প্রভাব, স্বরূপ, মহিমা, রহস্য ও ঐশ্বর্য ইত্যাদির কথা বলেছেন, যার জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিজেকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর বলে মেনে নেওয়া সিদ্ধ হয়—সেই সমস্ত বক্তব্যের সংকেতকারী '**এতৎ**' এবং '**যৎ**' পদটি ; ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত জগতের হর্তা, কর্তা, সর্বাধার, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান, সকলের আদি, সবাকার নিয়ন্তা, সর্বান্তর্যামী, দেবতাদেরও দেবতা, সচ্চিদানন্দঘন, সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা বলে বোঝা এবং তাঁর উপদেশকে সত্য বলে মনে করা এবং তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ না করা—এই হল ঐসব কথা সত্য বলে মানা।

প্রশ্ন—'**ভগবন্**' সম্বোধনের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে—

ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য ধর্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীরণা॥
(৬।৫।৭৪)

'সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য, সম্পূর্ণ ধর্ম, সম্পূর্ণ যশ, সম্পূর্ণ শ্রী, সম্পূর্ণ জ্ঞান ও সম্পূর্ণ বৈরাগ্য এই ছয়টির নাম 'ভগ'। এই সবগুলি যাঁর মধ্যে থাকে, তাঁকে বলা হয় 'ভগবান'। সেই কথা এখানেও বলা হয়েছে—

উৎপত্তিং প্রলয়ং চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাং চ স বাচ্যো ভগবানিতি॥
(৬।৫।৭৮)

'উৎপত্তি এবং প্রলয়, ভূত প্রাণীদের আসা-যাওয়া এবং বিদ্যা-অবিদ্যাকে যিনি জানেন তাঁকে ভগবান বলা উচিত।' সুতরাং এখানে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে '**ভগবন্**' সম্বোধন করে এই ভাব দেখিয়েছেন যে 'আপনি সর্বৈশ্বর্যসম্পন্ন এবং সর্বজ্ঞ, সাক্ষাৎ পরমেশ্বর—এতে কোনোই সন্দেহ নেই।'

প্রশ্ন—এখানে '**ব্যক্তিম্**' পদ কীসের বাচক এবং দেবতা ও দানবও তাকে জানে না—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার করার জন্য, ধর্মের স্থাপনা এবং ভক্তদের দর্শন দান করে তাদের উদ্ধার করার জন্য, দেবতাদের সংরক্ষণ এবং রাক্ষসদের সংহার ও অন্যান্য বিভিন্ন কারণে ভগবান যে ভিন্ন ভিন্ন লীলাময় রূপ ধারণ করেন, সেই সবের বাচক এখানে '**ব্যক্তিম্**' পদটি। তাঁকে দেবতা ও দানব জানে না—এই কথায় অর্জুনের এই তাৎপর্য যে, মায়া দ্বারা নানারূপ ধারণকারী দানবেরা ও ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়াদি প্রত্যক্ষকারী দেবতারাও আপনার সেই দিব্য লীলাময় রূপ, তা ধারণ করার দিব্য শক্তি এবং যুক্তি, তার নিমিত্তকে এবং তাঁর লীলারহস্যকে জানতে পারে না, তাহলে সাধারণ মানুষের আর কথা কী ?

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে॥ ১৫

হে ভূত (প্রাণী)গণের সৃষ্টিকারী ! হে ভূতেশ ! হে দেবাদিদেব জগৎপতি ! হে পুরুষোত্তম ! আপনি নিজেই নিজেকে জানেন॥ ১৫

প্রশ্ন—'ভূতভাবন', 'ভূতেশ', 'দেবদেব', 'জগৎপতে', 'পুরুষোত্তম'—এই পাঁচটি সম্বোধনের অর্থ কী, এখানে একই সঙ্গে পাঁচটি সম্বোধন প্রয়োগের কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—যিনি সমস্ত প্রাণীদের উৎপন্ন করেন, তাঁকে **'ভূতভাবন'** বলা হয় ; যিনি সমস্ত প্রাণীকে নিয়মে পরিচালিত করেন, সকলের শাসক—তাঁকে **'ভূতেশ'** বলা হয় ; যিনি দেবতাদেরও পূজনীয় দেবতা, তাঁকে **'দেবদেব'** বলা হয়। সমস্ত জগতের পালনকারী প্রভুকে **'জগৎপতি'** বলা হয় এবং যিনি ক্ষর ও অক্ষর উভয়ের থেকে উত্তম তাঁকে বলা হয় **'পুরুষোত্তম'**। অর্জুন এখানে পাঁচটি সম্বোধন প্রয়োগ করে এই ভাব দেখিয়েছেন যে আপনি সমস্ত জগতের উৎপন্নকারী, সকলের নিয়ন্তা, সবাকার পূজনীয়, সকলের পালন-পোষণকারী এবং 'পরা'-'অপরা' প্রকৃতি নামে যে ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ আছেন, তাঁদের থেকে উত্তম সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম ভগবান।

প্রশ্ন—আপনি নিজেই নিজেকে জানেন, এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—অর্জুনের এই কথার অভিপ্রায় এই যে, আপনি সমগ্র জগতের আদি ; আপনার গুণ, প্রভাব, লীলা, মাহাত্ম্য এবং রূপ ইত্যাদি অপরিমিত—তাই আপনার গুণ, প্রভাব, লীলা, মাহাত্ম্য, রহস্য ও স্বরূপ ইত্যাদি কেউই সম্পূর্ণভাবে জানতে পারে না, স্বয়ং আপনিই আপনার প্রভাবাদি জানেন। আপনার এই জানাও তেমন নয়, যেভাবে মানুষ নিজ বুদ্ধি-শক্তির দ্বারা শাস্ত্রাদির সাহায্যে নিজ থেকে ভিন্ন অন্য কোনো দ্বিতীয় বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে জানে ! আপনি স্বয়ংই জ্ঞানস্বরূপ, সুতরাং নিজেই নিজেকে জানেন। আপনাতে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়র কোনো পার্থক্য নেই।

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি॥ ১৬

অতএব যেসব বিভূতি দ্বারা আপনি এইসব লোকে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, একমাত্র আপনিই সেই সব দিব্য বিভূতিগুলি সম্যক্ভাবে বর্ণনা করতে সক্ষম॥ ১৬

প্রশ্ন—'দিব্যাঃ' বিশেষণের সঙ্গে 'আত্মবিভূতয়ঃ' পদ কোন্ বিভূতিগুলির বাচক এবং সেগুলি আপনিই সম্যক্রূপে বর্ণনা করতে সক্ষম—এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—সমগ্র লোকে যেসব পদার্থ তেজ, বল, বিদ্যা, ঐশ্বর্য, গুণ ও শক্তি আদিতে সম্পন্ন, সেসবের বাচক হল এখানে **'দিব্যাঃ'** বিশেষণের সঙ্গে **'আত্মবিভূতয়ঃ'** পদটি। আপনিই তা সম্যক্রূপে বলতে সক্ষম, এই কথাটির অভিপ্রায় হল, এই সব বিভূতি আপনারই—তাই আপনি ব্যতীত অন্য কেউই এটি সম্পূর্ণভাবে জানে না—তাই আপনি ছাড়া অন্য কেউই তা সম্যক্রূপে বর্ণনা করতে পারবে না ; সুতরাং কৃপা করে আপনিই সেগুলির বর্ণনা করুন।

প্রশ্ন—যে বিভূতি দ্বারা আপনি এই সমস্ত লোকে ব্যাপ্ত হয়ে স্থিত আছেন—এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথায় অর্জুনের এই অভিপ্রায় যে, আমি শুধুমাত্র ইহলোকের আপনার দিব্য বিভূতিগুলির বর্ণনা শুনতে চাইছি না ; আমি আপনার সেই সমস্ত বিভূতিগুলির পূর্ণ বর্ণনা শুনতে চাই, যার সাহায্যে আপনি বিভিন্নরূপে স্বর্গ ইত্যাদি সমস্ত লোকে পরিপূর্ণ হয়ে আছেন।

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া॥ ১৭

হে যোগেশ্বর ! আমি কীভাবে নিরন্তর চিন্তা করতঃ আপনাকে জানতে পারব এবং হে ভগবন্ ! আপনাকে আমি কী কী ভাবে চিন্তা করব ? ১৭

প্রশ্ন—এই শ্লোকে অর্জুনের প্রশ্নের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে অর্জুন ভগবানের কাছে দুটি বিষয় জিজ্ঞাসা করেছেন—

(১) শ্রদ্ধা ও প্রেমের সঙ্গে নিরন্তর আপনার চিন্তায় রত থাকতে পারি এবং গুণ, প্রভাবসহ তত্ত্বতঃ আপনাকে ভালোভাবে জানতে পারি—তার জন্য এমন কোনো উপায় বলুন। (২) জড়-চেতন চরাচরে যত পদার্থ আছে, তার মধ্যে কোন্গুলিকে আপনার স্বরূপ মনে করে তাতে চিত্ত নিবেশ করব—এর ব্যাখ্যা করুন। অভিপ্রায় হল যে কোন্ কোন্ পদার্থে কীভাবে নিরন্তর চিন্তায় রত থেকে সহজেই আপনার গুণ, প্রভাব, তত্ত্ব ও রহস্য জানতে পারব—এই সম্পর্কে অর্জুন জিজ্ঞাসা করছেন।

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্॥ ১৮

হে জনার্দন ! আপনার যোগশক্তি এবং বিভূতি সম্বন্ধে আবার বিস্তারিতভাবে বলুন, কারণ আপনার অমৃতময় কথা শুনে আমার তৃপ্তি হচ্ছে না, আমি আরও শুনতে ইচ্ছা করি ॥ ১৮

প্রশ্ন—এখানে 'জনার্দন' সম্বোধনের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—সকল মানুষ তাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর জন্য যাঁর কাছে প্রার্থনা করে, তাঁকে 'জনার্দন' বলা হয়। অর্জুন এখানে ভগবানকে 'জনার্দন' নামে ডেকে এই ভাব দেখিয়েছেন যে সকল মানুষ তাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু চেয়ে থাকে এবং আপনি সবাইকেই সব কিছু দিতে সক্ষম ; সুতরাং আমিও আপনার কাছে যা প্রার্থনা করছি কৃপা করে তা পূর্ণ করুন।

প্রশ্ন—এখানে 'যোগম্' এবং 'বিভূতিম্' পদ কীসের বাচক ? সেই দুটি আবার বিস্তারিতভাবে বলার জন্য প্রার্থনা করার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যে ঈশ্বরীয় শক্তির দ্বারা ভগবান স্বয়ং এই জগৎ রূপে প্রকটিত হয়ে বহুরূপে বিস্তৃত হয়ে থাকেন, সেই শক্তির নাম 'যোগ' এবং সেই বিভিন্ন রূপের বিস্তারকে বলা হয় 'বিভূতি'। এই অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে ভগবান এই দুটি শব্দের প্রয়োগ করেছেন, সেখানে এর অর্থ বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। ঐ শ্লোকে এই দুটি তত্ত্বতঃ জানার ফল অবিচল ভক্তিযোগ প্রাপ্তি বলা হয়েছে। তাই অর্জুন এই 'বিভূতি' ও 'যোগ' দুটির রহস্য ভালোভাবে জানার ইচ্ছায় বারংবার বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন।

প্রশ্ন—এখানে অর্জুনের 'আপনার অমৃতময় কথা শুনতে শুনতে আমার তৃপ্তি হচ্ছে না ?'—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা অর্জুন এই ভাব প্রকাশ করেছেন যে, আপনার বাক্য মাধুর্যে ভরা, তাতে আনন্দের সেই সুধাধারা প্রবাহিত, যা পান করে মন কখনো তৃপ্ত হয় না। এই দিব্য অমৃত যতই পান করা যাক ততই পিপাসা বেড়ে যায়। মনে হয় সেই অমৃতরস পান করতেই থাকি। অতএব ভগবান ! আপনি একথা ভাববেন না যে 'অমুক কথা বলা হয়ে গেছে, অথবা অনেক কিছু বলা হয়েছে, আর কী বলব ?' কেবল, দয়া করে এই অমৃত বর্ষণ করতে থাকুন।

সম্বন্ধ—অর্জুন যোগ ও বিভূতিসমূহ বিস্তারিতভাবে পূর্ণরূপে বর্ণনা করার জন্য প্রার্থনা জানালে, ভগবান প্রথমে

তাঁর বিস্তারের অনন্ততা জানিয়ে তাঁর প্রধান-প্রধান বিভূতিগুলি বর্ণনা করার প্রতিজ্ঞা করছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে॥ ১৯

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! আমার যেসব দিব্য বিভূতি আছে তার মধ্যে প্রধান প্রধানগুলির কথা তোমাকে বলব ; কারণ আমার বিস্তৃত বিভূতির অন্ত নেই॥ ১৯

প্রশ্ন—'**কুরুশ্রেষ্ঠ**' সম্বোধনের অর্থ কী ?

উত্তর—অর্জুনকে '**কুরুশ্রেষ্ঠ**' নাম সম্বোধনে ভগবানের এই অভিপ্রায় যে তুমি কুরুকুলে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাই তুমি আমার বিভূতিগুলি শোনার অধিকারী।

প্রশ্ন—'**দিব্যাঃ**' বিশেষণের সঙ্গে '**আত্মবিভূতয়ঃ**' পদের অর্থ কী এবং প্রধানতঃ সেসবই এখন বলব—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—সমগ্র জগৎ যখন ভগবানের স্বরূপ, তাহলে সকল বস্তুই তাঁর বিভূতি ; কিন্তু সেগুলি সবই দিব্য বিভূতি নয়। সেগুলিকেই দিব্য বিভূতি বলে জানা উচিত, যেসব বস্তু বা প্রাণীতে ভগবানের তেজ, বল, বিদ্যা, ঐশ্বর্য, কান্তি ও শক্তি ইত্যাদির বিশেষ বিকাশ রয়েছে। ভগবান এখানে এরূপ বিভূতির ক্ষেত্রেই বলেছেন যে, আমার এইরকম বিভূতি অনন্ত, সুতরাং সবগুলির সম্পূর্ণ বর্ণনা করা সম্ভব নয়। সেইগুলির মধ্যে যেগুলি প্রধান, এখানে কেবলমাত্র সেগুলিরই বর্ণনা করব।

প্রশ্ন—আমার বিস্তৃত বিভূতির অন্ত নেই—এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান অর্জুনের অষ্টাদশ শ্লোকে বলা সেই কথার উত্তর দিয়েছেন, যেখানে অর্জুন বিস্তারিতভাবে (পূর্ণরূপে) বিভূতিগুলি বর্ণনা করার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। ভগবান বলেছেন যে, আমার সমস্ত বিভূতির বর্ণনা করা সম্ভব নয় ; শুধু তাই নয়, আমার যেসব প্রধান-প্রধান বিভূতি আছে, সেগুলিরও পূর্ণ বর্ণনা করা সম্ভব নয়।[১]

[১] বিশ্বে অনন্ত পদার্থ, ভাব এবং বিভিন্ন জাতির প্রাণীর বিস্তার রয়েছে। এই সবগুলিকে যথাবিধি নিয়ন্ত্রণ ও সঞ্চালন করার জন্য জগৎস্রষ্টা ভগবান অটল নিয়মের দ্বারা বিভিন্ন জাতের পদার্থ, ভাব, জীবের বিভিন্ন সমষ্টি বিভাগ করেছেন এবং সেগুলি ঠিক নিয়মে সৃজন, পালন ও সংহারের কাজ যাতে চলতে থাকে—তার জন্য প্রত্যেক সমষ্টি বিভাগের অধিকারী নিযুক্ত করেছেন। রুদ্র, বসু, ইন্দ্র, আদিত্য, সাধ্য, বিশ্বদেব, মরুৎ, পিতৃদেব, মনু ও সপ্তর্ষি আদি হলেন এইসব অধিকারীদের বিভিন্ন সংজ্ঞা। এঁদের মূর্ত ও অমূর্ত উভয়রূপই মানা হয়। এ সবই ভগবানের বিভূতি।

সর্বে চ দেবা মনবঃ সমস্তাঃ সপ্তর্ষয়ো যে মনুসূনবশ্চ। ইন্দ্রশ্চ যোঽয়ং ত্রিদশেশভূতো বিষ্ণোরশেষাস্তু বিভূতয়স্তাঃ॥

(শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৩।১।৪৬)

'সকল দেবতা, সমস্ত মনু, সপ্তর্ষি এবং মনুর যে সকল পুত্র এবং এই দেবতাদের অধিপতি ইন্দ্র—এ সবই হল ভগবান বিষ্ণুরই বিভূতি।'

এতদ্ব্যতীত সৃষ্টি সঞ্চালনের জন্য প্রজার সমষ্টি-বিভাগ থেকে যথাযোগ্য নির্বাচন করা হয়। এই সমগ্র নির্বাচনে প্রধানতঃ তাঁদেরই নেওয়া হয়, যাঁদের মধ্যে ভগবানের তেজ, শক্তি, বিদ্যা, জ্ঞান ও বল ইত্যাদির বিশেষ বিকাশ থাকে। তাই ভগবান এসবগুলিকেও তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

বায়ুপুরাণের সত্তরতম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে 'মহর্ষি কশ্যপ দ্বারা যখন প্রজা সৃষ্টি হয়েছিল, তখন প্রজাপতি বিভিন্ন বিভাগের প্রজাদের মধ্যে যাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তেজস্বী, তাদের স্থান করে সেই সব জাতির প্রজা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাঁদের সেই জাতির রাজা রূপে নিযুক্ত করেন। চন্দ্রকে নক্ষত্র গ্রহাদির, বৃহস্পতিকে আঙ্গিরসদের, শুক্রাচার্যকে ভার্গবদের, বিষ্ণুকে আদিত্যদের, পাবককে বসুদের, দক্ষকে প্রজাপতিদের, প্রহ্লাদকে দৈত্যদের, ইন্দ্রকে মরুতদের, নারায়ণকে সাধ্যদের, শংকরকে রুদ্রদের, বরুণকে জলের, কুবেরকে যক্ষ ও রাক্ষসদের, শূলপাণিকে ভূত-পিশাচদের, সাগরকে নদীদের, চিত্ররথকে গন্ধর্বদের,

সম্বন্ধ—এবার নিজ প্রতিজ্ঞানুসারে ভগবান বিশতম থেকে উনচল্লিশতম শ্লোক পর্যন্ত তাঁর বিভূতিসমূহ বর্ণনা করছেন।

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥ ২০

হে অর্জুন ! আমিই সর্বভূতের হৃদয়স্থিত সকলের আত্মা এবং সর্বভূতের আদি, মধ্য ও অন্তও আমিই ॥ ২০

প্রশ্ন—'**গুড়াকেশ**' সম্বোধনের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—নিদ্রাকে বলা হয় '**গুড়াকা**'। তার প্রভুকে বলা হয় '**গুড়াকেশ**'। ভগবানের অর্জুনকে '**গুড়াকেশ**' নামে সম্বোধন করার এই অভিপ্রায় যে, তুমি নিদ্রা জয় করেছ। অতএব আমার উপদেশ ধারণ করে অজ্ঞান-নিদ্রাও জয় করতে সক্ষম।

প্রশ্ন—'**সর্বভূতাশয়স্থিতঃ**' বিশেষণের সঙ্গে '**আত্মা**' পদ কীসের বাচক এবং সেই '**আত্মা**' আমি, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে স্থিত যে 'চেতন' সত্তা, যাকে পরা 'প্রকৃতি' এবং 'ক্ষেত্রজ্ঞ'ও বলা হয় (৭।৫ ; ১৩।১), তারই বাচক হল এই '**সর্বভূতাশয়স্থিতঃ**' বিশেষণের সঙ্গে '**আত্মা**' পদটি। তা ভগবানেরই অংশ হওয়ায় (১৫।৭) বস্তুতঃ ভগবৎস্বরূপই (১৩।২)। তাই ভগবান বলেছেন যে 'সেই আত্মা আমিই'।

প্রশ্ন—'**ভূতানাম্**' পদ কীসের বাচক এবং তার আদি, মধ্য ও অন্ত আমি—এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—জগতের সমস্ত দেহধারী প্রাণীদের বাচক হল এই '**ভূতানাম্**' পদ। সমস্ত প্রাণীদের সৃজন, পালন এবং সংহার ভগবান থেকেই হয়। সব প্রাণী ভগবান থেকেই উৎপন্ন হয় ; তাঁতেই স্থিত থাকে এবং প্রলয়কালে তাঁতেই লীন হয়ে যায়। ভগবানই সকলের মূল কারণ এবং আধার—এই ভাবার্থ প্রকাশ হেতু ভগবান নিজেকে ঐ সবের আদি, মধ্য ও অন্ত বলে জানিয়েছেন।

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী॥ ২১

অদিতির দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে আমি বিষ্ণু, জ্যোতিসমূহের মধ্যে আমি কিরণশালী সূর্য, উনপঞ্চাশ বায়ুর মধ্যে আমি মরীচি[1] এবং নক্ষত্রগণের অধিপতি চন্দ্রও আমি ॥ ২১

উচ্চৈঃশ্রবাকে অশ্বদের, সিংহকে পশুদের, ষাঁড়কে চতুষ্পদীদের, গরুড়কে পক্ষীদের, শেষনাগকে সর্পদের, বাসুকিকে নাগেদের, তক্ষককে অন্য জাতের সর্প ও নাগেদের, হিমবানকে পর্বতের, বিপ্রচিত্তিকে দানবদের, বৈবস্বতকে পিতৃদেবের, পর্জন্যকে সাগরের, নদী ও মেঘের, কামদেবকে অপ্সরাদের, সংবৎসরকে ঋতু ও মাসগুলির, সুধামাকে পূর্বের, কেতুমানকে পশ্চিমের এবং বৈবস্বত মনুকে সব মানুষদের রাজা করেছেন। এই সকল অধিকারীদের দ্বারা সমস্ত জগৎ সঞ্চালন ও পালন হয়ে চলেছে।' এখানে এই অধ্যায়ে যে বিভূতিবর্ণনা আছে, তা বহু-অংশে এর সঙ্গে মিলে যায়।

[1]উনপঞ্চাশ মরুতদের নাম হল—সত্ত্বজ্যোতি, আদিত্য, সত্যজ্যোতি, তির্যগ্জ্যোতি, সজ্যোতি, জ্যোতিষ্মান্, হরিত, ঋতজিৎ, সত্যজিৎ, সুষেণ, সেনাজিৎ, সত্যমিত্র, অভিমিত্র, হরিমিত্র, কৃত, সত্য, ধ্রুব, ধর্তা, বিধর্তা, বিধারয়, ধ্বান্ত, ধুনি, উগ্র, ভীম, অভিযু, সাক্ষিপ, ঈদৃক্, অন্যাদৃক্, যাদৃক্, প্রতিকৃৎ, ঋক্, সমিতি, সংরম্ভ, ঈদৃক্ষ, পুরুষ, অন্যাদৃক্ষ, চেতস, সমিতা, সমিদৃক্ষ, প্রতিদৃক্ষ, মরুতি, সরত, দেব, দিশ, যজুঃ, অনুদৃক্, সাম, মানুষ এবং বিশ (বায়ুপুরাণ ৬৭।১২৩ থেকে ১৩০)। গরুড়পুরাণ ও অন্যান্য পুরাণাদিতে কিছু নামের পার্থক্য পাওয়া যায়। কিন্তু 'মরীচি' নাম কোথাও পাওয়া যায় না। তাই 'মরীচি'কে মরুৎ না মেনে সমস্ত মরুৎগণের তেজ বা কিরণ মানা হয়েছে।

দক্ষকন্যা মরুৎবতী থেকে উৎপন্ন পুত্রদেরও মরুৎগণ বলা হয় (হরিবংশ)। ভিন্ন ভিন্ন মন্বন্তরে ভিন্ন ভিন্ন নামে এবং বিভিন্ন প্রকারের পুরাণাদিতে এঁদের উৎপত্তির বর্ণনা পাওয়া যায়।

প্রশ্ন—এখানে 'আদিত্য' শব্দ কীসের বাচক এবং তাঁদের মধ্যে 'বিষ্ণু' আমি—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—অদিতির ধাতা, মিত্র, অর্যমা, শক্র, বরুণ, অংশ, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা এবং বিষ্ণু নামক বারোজন পুত্রকে দ্বাদশ আদিত্য বলা হয়[১]। এঁদের মধ্যে বিষ্ণু হলেন সকলের রাজা ; এবং অন্য সকলের থেকে শ্রেষ্ঠ। তাই ভগবান বিষ্ণুকে তাঁর স্বরূপ বলেছেন।

প্রশ্ন—জ্যোতিসকলের মধ্যে কিরণসম্পন্ন সূর্য আমি, এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, বিদ্যুৎ, অগ্নি ইত্যাদি যতপ্রকার প্রকাশশীল পদার্থ আছে, সেসবের মধ্যে সূর্য প্রধান ; তাই ভগবান সমস্ত জ্যোতির মধ্যে সূর্যকে নিজের স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

প্রশ্ন—'বায়ুদেবতাগণের ''মরীচি'' শব্দবাচ্য তেজ আমিই'—এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—দিতিপুত্র ঊনপঞ্চাশ মরুৎগণ দিতি দেবীর ভগবদ্ ধ্যানরূপ ব্রতের তেজ থেকে উৎপন্ন। সেই তেজের ফলেই গর্ভে এঁদের বিনাশ হয়নি[২]। সেইজন্যই তাঁদের এই তেজকে ভগবান নিজ-স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

প্রশ্ন—'নক্ষত্রাদির অধিপতি চন্দ্র আমিই' এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা ইত্যাদি যে সাতাশটি নক্ষত্র আছে, তাঁদের সকলের স্বামী এবং সম্পূর্ণ নক্ষত্রমণ্ডলের রাজা হওয়ায় চন্দ্র ভগবানের প্রধান বিভূতি। তাই ভগবান চন্দ্রকে এখানে তাঁর স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা॥ ২২

চার বেদের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে মন এবং প্রাণীদেহে চেতনা অর্থাৎ জীবনীশক্তিও আমিই ॥ ২২

---

[১]ধাতা মিত্রোঽর্যমা শক্রো বরুণস্ত্বংশ এব চ। ভগো বিবস্বান্ পূষা চ সবিতা দশমস্তথা॥
একাদশস্তথা ত্বষ্টা দ্বাদশো বিষ্ণুরুচ্যতে। জঘন্যজস্তু সর্বেষামাদিত্যানাং গুণাধিকঃ॥
(মহাভারত, আদিপর্ব ৬৫।১৫-১৬)

[২]কশ্যপের পত্নী দিতির বহু পুত্র নষ্ট হওয়ার পর তিনি তাঁর পতি কশ্যপকে নিজ সেবায় প্রসন্ন করেন। তাঁর সম্যক্ আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে তপস্বীদের শ্রেষ্ঠ কশ্যপ তাঁকে বর দিয়ে সন্তুষ্ট করেন। তখন তিনি ইন্দ্রকে বধ করতে সক্ষম এক অতি তেজস্বী পুত্রের বর প্রার্থনা করেন। মুনিশ্রেষ্ঠ কশ্যপ তাঁকে অভীষ্ট বর প্রদান করেন এবং সেই অত্যুগ্র বর দিতে গিয়ে বলেন—'তুমি যদি নিত্য ভগবানের ধ্যানে তৎপর থেকে নিজ গর্ভকে পবিত্রতা ও সংযমের সঙ্গে শতবর্ষ ধারণ করতে পারো তাহলে তোমার পুত্র ইন্দ্রকে বধ করতে পারবে।' ঐ গর্ভটি নিজের বধের কারণ জেনে দেবরাজ ইন্দ্রও বিনয়পূর্বক দিতির সেবায় উপস্থিত হলেন। তাঁর পবিত্রতায় কখনো কোনো ত্রুটি হলে আমি কিছু করতে পারব, সেই প্রতীক্ষায় ইন্দ্র সর্বক্ষণ সেখানে উপস্থিত থাকতেন। শেষে শত বর্ষের আর সামান্য কিছু যখন বাকি, তখন একদিন দিতি চরণ শুদ্ধি না করেই বিছানায় শুয়ে পড়লেন। তখন তিনি নিদ্রামগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন। সুযোগ পেয়ে ইন্দ্র তখন হাতে বজ্র নিয়ে তাঁর গর্ভে প্রবেশ করে তাঁর মহাগর্ভ সাত টুকরো করে দিলেন। এইভাবে বজ্রপীড়িত হয়ে সেই গর্ভ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগল। ইন্দ্র তাঁদের বারংবার বলতে লাগলেন—'কেঁদো না।' কিন্তু যখন সাত ভাগে বিভক্ত সেই গর্ভ মরল না, তখন ইন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে আবার এক একটিকে সাতটি করে টুকরো করলেন। এইভাবে এক থেকে ঊনপঞ্চাশ টুকরো হয়েও এগুলি জীবিত রইল। তখন ইন্দ্র বুঝলেন যে এরা মরবে না। এরাই অতি বেগবান মরুৎ নামক দেবতা হলেন। ইন্দ্র যে তাঁদের বলেছিলেন—'মা রোদীঃ' (কেঁদো না), তাই এঁদের মরুৎ বলা হয় (বিষ্ণুপুরাণ, প্রথম অংশ, অধ্যায় ২১)।

প্রশ্ন—চার বেদের মধ্যে আমি সামবেদ, এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব—এই চার বেদের মধ্যে সামবেদ অত্যন্ত মধুর সংগীতময় ও পরমেশ্বরের অত্যন্ত রমণীয় স্তুতিতে পূর্ণ ; সুতরাং বেদসমূহের মধ্যে এর প্রাধান্য আছে। তাই ভগবান একে তাঁর স্বরূপ বলেছেন।

প্রশ্ন—দেবগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর— সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু ইত্যাদি যত দেবতা আছেন, তাঁদের সকলের শাসক ও রাজা হওয়ায় ইন্দ্র সবার প্রধান, তাই ভগবান তাঁকে তাঁর স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

প্রশ্ন—ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে আমি মন ; এই কথাটির কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—চক্ষু, কর্ণ, ত্বক্, রসনা, নাসিকা, বাক্, হাত, পা, উপস্থ, পায়ু ও মন—এই এগারোটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন অন্য দশ ইন্দ্রিয়ের প্রভু, প্রেরক, ঐগুলির থেকে সূক্ষ্ম এবং শ্রেষ্ঠ হওয়ায় সর্বপ্রধান। তাই ভগবান তাকে নিজের স্বরূপ বলেছেন।

প্রশ্ন—'ভূতপ্রাণীদের চেতনা আমি' এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—সমস্ত প্রাণীর যে জ্ঞানশক্তি, যার সাহায্যে তাদের সুখ-দুঃখ ও সমস্ত পদার্থের অনুভব হয়, যা অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষ, ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে যার গণনা ক্ষেত্রের বিকারের মধ্যে করা হয়েছে, সেই জ্ঞানশক্তির নাম 'চেতনা'। এটি প্রাণীদের সমস্ত অনুভবের হেতুভূত প্রধান শক্তি, তাই একে ভগবান তাঁর স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্॥ ২৩

একাদশ রুদ্রের মধ্যে আমি শংকর ; যক্ষ এবং রাক্ষসদের মধ্যে আমি ধনাধিপতি কুবের ; অষ্টবসুর মধ্যে আমি অগ্নি এবং উচ্চ গিরিশৃঙ্গের মধ্যে সুমেরু পর্বত আমি ॥ ২৩

প্রশ্ন—একাদশ রুদ্র কে এবং তাদের মধ্যে শংকরকে নিজরূপ বলার অর্থ কী ?

উত্তর—হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দী, রৈবত, মৃগব্যাধ, শর্ব এবং কপালী[১]—এঁদের একাদশ রুদ্র বলা হয়। এঁদের মধ্যে শম্ভু অর্থাৎ শংকর সকলের অধীশ্বর (রাজা), তিনি কল্যাণপ্রদাতা ও কল্যাণরূপ। তাই ভগবান এঁকে তাঁর স্বরূপ বলেছেন।

প্রশ্ন—যক্ষ-রাক্ষসদের মধ্যে ধনপতি কুবেরকে তাঁর স্বরূপ বলার অর্থ কী ?

উত্তর— কুবের[২] যক্ষ-রাক্ষসদের রাজা এবং তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনি ধনাধ্যক্ষের পদারূঢ় প্রসিদ্ধ লোকপাল, তাই ভগবান এঁকে তাঁর স্বরূপ বলেছেন।

প্রশ্ন—অষ্টবসু কারা এবং তাদের মধ্যে পাবক (অগ্নি)কে নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর— ধর, ধ্রুব, সোম, অহঃ, অনিল, অনল,

---

[১]হরশ্চ বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকশ্চাপরাজিতঃ। বৃষাকপিশ্চ শম্ভুশ্চ কপর্দী রৈবতস্তথা॥
মৃগব্যাধশ্চ শর্বশ্চ কপালী চ বিশাম্পতে। একাদশৈতে কথিতা রুদ্রাস্ত্রিভুবনেশ্বরাঃ॥ (হরিবংশ ১।৩।৫১-৫২)

[২]কুবের পুলস্ত্য ঋষির পৌত্র এবং বিশ্রবার পুত্র তথা ভরদ্বাজ কন্যা দেববর্ণিনীর গর্ভে জাত। ইনি দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যার পর ব্রহ্মা এঁর ওপর প্রসন্ন হয়ে বর প্রার্থনা করতে বলেন। তিনি তখন বিশ্বের ধনরক্ষক হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন ব্রহ্মা বলেন, 'আমিও চতুর্থ লোকপাল নিযুক্ত করতে চাই, সুতরাং ইন্দ্র, যম ও বরুণের ন্যায় তুমিও এই পদ গ্রহণ করো।' ব্রহ্মা তাঁকে পুষ্পক বিমান অর্পণ করেন, তখন থেকে ইনিই ধনাধ্যক্ষ। এঁর বিমাতা কৈকসীর গর্ভে রাবণ-বিভীষণ ও কুম্ভকর্ণের জন্ম হয় (বাল্মীকি রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, সর্গ ৩)। নলকুবর এবং মণিগ্রীব, যাঁরা নারদ মুনির অভিশাপে সংলগ্নরূপে অর্জুনবৃক্ষ হয়েছিলেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাঁদের উদ্ধার করেন, তাঁরা ছিলেন কুবেরেরই পুত্র। (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১০)

প্রত্যূষ ও প্রভাস—এই আটজনকে বসু বলা হয়[১]। এঁদের মধ্যে অনল (অগ্নি) বসুদের রাজা এবং দেবতাদের হবি প্রদানকারী। এতদ্ব্যতীত এঁকে ভগবানের মুখ বলা হয়। তাই অগ্নি (পাবক)কে ভগবান তাঁর স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

প্রশ্ন— উচ্চ গিরিশৃঙ্গের মধ্যে আমি সুমেরু পর্বত, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর— সুমেরু পর্বত নক্ষত্র ও দ্বীপগুলির কেন্দ্র, একে সুবর্ণ ও রত্নের ভাণ্ডার বলা হয় ; এর শিখর অন্য পর্বতদের তুলনায় উচ্চ। এইভাবে উচ্চ গিরিশৃঙ্গের পর্বতের মধ্যে প্রধান হওয়ায় সুমেরুকে ভগবান তাঁর স্বরূপ বলেছেন।

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ॥ ২৪

পুরোহিতগণের মধ্যে মুখ্য দেবগুরু বৃহস্পতি আমাকে জানবে। হে পার্থ ! সেনাপতিদের মধ্যে আমি দেবসেনাপতি কার্তিকেয় এবং জলাশয়সমূহের মধ্যে আমি সাগর॥ ২৪

প্রশ্ন—বৃহস্পতিকে নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—বৃহস্পতি[২] দেবরাজ ইন্দ্রের গুরু, দেবতাদের কুলপুরোহিত এবং বিদ্যা-বুদ্ধিতে সর্বশ্রেষ্ঠ তথা জগতের সমস্ত পুরোহিতের মধ্যে প্রধান ও আঙ্গিরসের রাজা বলে মনে করা হয়। তাই ভগবান তাঁকে নিজের স্বরূপ বলেছেন।

প্রশ্ন—স্কন্দ (কার্তিক) কে ? এবং সেনাপতি মধ্যে এঁকে ভগবান তাঁর স্বরূপ কেন বলেছেন ?

উত্তর—স্কন্দের অন্য নাম কার্তিকেয়, এঁর ছয় মুখ ও বারো হাত। ইনি মহাদেবের পুত্র[৩], দেবতাদের সেনাপতি। জগতে সমস্ত সেনাপতিদের প্রধান, তাই ভগবান এঁকে তাঁর স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

প্রশ্ন—জলাশয়গুলির মধ্যে সমুদ্রকে নিজ স্বরূপ বলার কী তাৎপর্য ?

উত্তর— পৃথিবীতে যত জলাশয় আছে, তার মধ্যে সমুদ্র সর্ববৃহৎ[৪] এবং সবার রাজা বলে মানা হয় ; সুতরাং সমুদ্রের প্রাধান্য আছে। তাই সব জলাশয়ের মধ্যে সমুদ্রকে ভগবান তাঁর নিজ স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ॥ ২৫

---

[১]ধরো ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ অহশ্চৈবানিলোঽনলঃ। প্রত্যূষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোঽষ্টৌ প্রকীর্তিতাঃ॥ (মহাভারত, আদিপর্ব ৬৬।১৮)

[২]ইনি মহর্ষি অঙ্গিরার অত্যন্ত প্রতাপশালী পুত্র। স্বারোচিষ মন্বন্তরে বৃহস্পতি সপ্তর্ষিদের মধ্যে প্রধান ছিলেন (হরিবংশ, ৭।১২, মৎস্যপুরাণ ৯।৮)। ইনি অত্যন্ত বিদ্বান। বামন-অবতারে ভগবান সম্পূর্ণরূপে বেদ, ষট্‌শাস্ত্র, স্মৃতি, আগম ইত্যাদি সব এঁর কাছেই শিখেছিলেন (বৃহদ্ধর্মপুরাণ, মধ্য ১৬।৬৯ থেকে ৭৩)। এঁর পুত্র কচ শুক্রাচার্যের কাছে থেকে সঞ্জীবনীর বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন। ইনি দেবরাজ ইন্দ্রের পুরোহিতের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইন্দ্রকে ইনি যে সকল শিক্ষা উপদেশ দিয়েছিলেন, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে মানুষের উদ্ধার হওয়া সম্ভব। মহাভারত শান্তি ও অনুশাসন পর্বে এঁর উপদেশের কথা অধ্যয়ন করা উচিত।

[৩]কোনো কোনো স্থানে এঁকে অগ্নির তেজ থেকে ও দক্ষকন্যা স্বাহার দ্বারা উৎপন্ন বলা হয়েছে (মহাভারত, বনপর্ব ২২৩)। এঁর সম্পর্কে মহাভারত ও পুরাণাদিতে বড়ই আশ্চর্যজনক বর্ণনা রয়েছে।

[৪]'সমুদ্র' কথাটির দ্বারা এখানে 'সমষ্টি সমুদ্র' বোঝা উচিত।

মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু, শব্দের মধ্যে আমি এক অক্ষর ব্রহ্মবাচক ওঁকার। সকল যজ্ঞের মধ্যে আমি জপরূপ যজ্ঞ এবং স্থাবর পদার্থের মধ্যে আমি হিমালয় পর্বত ॥ ২৫

প্রশ্ন—মহর্ষি কারা ? তাঁদের লক্ষণ কী ?

উত্তর—মহর্ষি অনেকে আছেন, তাঁদের লক্ষণ এবং প্রধান দশজনের নাম হল—

ঈশ্বরাঃ স্বয়মুদ্ভূতা মানসা ব্রহ্মণঃ সুতাঃ।
যস্মান্ন হন্যতে মানৈর্মহান্ পরিগতঃ পুরঃ॥
যস্মাদৃষন্তি যে ধীরা মহান্তং সর্বতো গুণৈঃ।
তস্মান্মহর্ষয়ঃ প্রোক্তা বুদ্ধেঃ পরমদর্শিনঃ॥
ভৃগুর্মরীচিরত্রিশ্চ অঙ্গিরাঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
মনুর্দক্ষো বসিষ্ঠশ্চ পুলস্ত্যশ্চেতি তে দশ॥
ব্রহ্মণো মানসা হ্যেত উদ্ভূতাঃ স্বয়মীশ্বরাঃ।
প্রবর্তত ঋষের্যস্মান্ মহানস্তস্মান্মহর্ষয়ঃ॥

(বায়ুপুরাণ ৫৯।৮২-৮৩, ৮৯-৯০)

'ব্রহ্মার এইসকল মানসপুত্র ঐশ্বর্যবান (সিদ্ধি দ্বারা সম্পন্ন) এবং স্বয়ং উৎপন্ন। পরিণামে যাঁর সীমা নেই (অর্থাৎ যিনি অপরিমেয়) এবং সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়েও সামনে (প্রত্যক্ষ) বিরাজিত, তিনিই মহান। যাঁরা বুদ্ধির সীমা অতিক্রম করেন অর্থাৎ ভগবদ্‌প্রাপ্ত মহাপুরুষ তাঁরা সেই মহান (পরমেশ্বর)কে সর্বতোভাবে অবলম্বন করেন, সেই কারণে (**'মহান্তম্ ঋষন্তি ইতি মহর্ষয়ঃ'** এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে) তাঁদের মহর্ষি বলা হয়। ভৃগু, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, মনু, দক্ষ ও বশিষ্ঠ—এই দশজন হলেন মহর্ষি। এঁরা সকলেই ব্রহ্মার মন হতে স্বয়ং উৎপন্ন এবং ঐশ্বর্যবান। যেহেতু ঋষি (ব্রহ্মা) থেকে এই ঋষিদের রূপে স্বয়ং মহান (পরমেশ্বর)ই প্রকটিত হয়েছেন, তাই এঁদের মহর্ষি বলা হয়।

প্রশ্ন—মহর্ষিদের মধ্যে 'ভৃগুকে' নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর— মহর্ষিদের মধ্যে ভৃগুঋষি[1] প্রধান। ইনি ভগবদ্‌ভক্ত, জ্ঞানী এবং অত্যন্ত তেজস্বী ; তাই ভগবান এঁকে তাঁর স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

প্রশ্ন—**'গিরাম্'** পদটির অর্থ কী ? **'একম্ অক্ষরম্'** দ্বারা কী বোঝা উচিত এবং তাকে ভগবানের রূপ বলার কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—কোনো অর্থবোধকারী শব্দকে **'গীঃ'** (বাণী) বলা হয় এবং ওঁ-কার (প্রণব)কে 'এক অক্ষর' বলা হয় (৮।১৩)। যত অর্থবোধক শব্দ আছে, সে সবে প্রণবের প্রাধান্য থাকে, কারণ 'প্রণব' ভগবানের নাম (১৩।২৩)। প্রণব জপ দ্বারা ভগবান লাভ হয়। নাম ও নামীকে অভেদ মানা হয়, তাই ভগবান 'প্রণব'কে নিজ স্বরূপ বলেছেন।

প্রশ্ন—সমস্ত যজ্ঞাদির মধ্যে জপযজ্ঞকে নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—জপযজ্ঞে হিংসার সর্বতোভাবে অভাব থাকে এবং জপযজ্ঞ ভগবানকে প্রত্যক্ষ করায়। মনুস্মৃতিতেও জপযজ্ঞের অনেক প্রশংসা করা হয়েছে[2]। তাই সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে জপযজ্ঞের প্রাধান্য আছে, এই

---

[1]ব্রহ্মার মানসপুত্রদের মধ্যে ভৃগু প্রধান। স্বায়ম্ভুব ও চাক্ষুষ ইত্যাদি কয়েকটি মন্বন্তরে ইনি সপ্তর্ষির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এঁর বংশে বহু ঋষি, মন্ত্রপ্রণেতা ও গোত্রপ্রবর্তক জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মহর্ষিদের মধ্যে এঁর খুব প্রভাব, ইনি দক্ষকন্যা খ্যাতীকে বিবাহ করেন। ইনি ধাতা-বিধাতা নামক দুই পুত্র ও শ্রী নামে একটি কন্যার জনক। 'শ্রী' শ্রীভগবান নারায়ণের পত্নী হন। চ্যবন ঋষিও এঁরই পুত্র। এঁর জ্যোতিষ্মান্, সুকৃতি, হবিষ্মান, তপোধৃতি, নিরুৎসুক ও অতিবাহু নামক পুত্র বিভিন্ন মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। ইনি মহান মন্ত্রপ্রণেতা মহর্ষি। ভগবান বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করে ইনিই তাঁর সাত্ত্বিক ক্ষমার পরীক্ষা নেন। আজও ভগবান বিষ্ণু ভৃগুর চিহ্ন নিজ হৃদয়ে ধারণ করে আছেন। ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, মরীচি, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠ—প্রজা সৃষ্টিকারী হওয়ায় এঁদের 'নব ব্রহ্মা' বলে মানা হয়। প্রায় সব পুরাণে ভৃগুর কথা আলোচিত হয়েছে। হরিবংশ, মৎস্যপুরাণ, শিবপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, দেবী ভাগবত, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, পদ্মপুরাণ, বায়ুপুরাণ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতে ভৃগুর বিস্তৃত আলোচনা আছে।

[2]বিধিযজ্ঞাজ্জপযজ্ঞো বিশিষ্টো দশভির্গুণৈঃ। উপাংশুঃ স্যাচ্ছতগুণঃ সাহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ॥ (মনু ২।৮৫)

'বিধিযজ্ঞ থেকে জপযজ্ঞ দশগুণ, উপাংশুজপ শতগুণ এবং মানসজপ হাজার গুণ শ্রেষ্ঠ বলে বলা হয়েছে।'

ভাবার্থে ভগবান জপযজ্ঞকে নিজ স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

প্রশ্ন—স্থাবর পদার্থের মধ্যে হিমালয়কে নিজ স্বরূপ বলার অর্থ কী ?

উত্তর—স্থির থাকা বস্তুকে স্থাবর বলা হয়। যত পাহাড় আছে, সেসবই অচল হওয়ায় স্থাবর, তাদের মধ্যে হিমালয় সর্বোত্তম। এটি পরম পবিত্র তপোভূমি এবং মুক্তির সহায়ক। ভগবান নর-নারায়ণ এখানেই তপস্যা করেছিলেন। হিমালয় সকল পর্বতের রাজা। তাই ভগবান এঁকে নিজের স্বরূপ বলেছেন।

অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ॥ ২৬

বৃক্ষসমূহের মধ্যে আমি অশ্বত্থ বৃক্ষ, দেবর্ষিদের মধ্যে নারদ, গন্ধর্বগণের মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধপুরুষদের মধ্যে আমি কপিলমুনি॥ ২৬

প্রশ্ন—বৃক্ষদের মধ্যে অশ্বত্থবৃক্ষকে নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—অশ্বত্থ বৃক্ষ[1] সমস্ত বনস্পতির রাজা এবং পূজনীয়। তাই ভগবান একে তাঁর নিজ স্বরূপ বলেছেন।

প্রশ্ন—দেবর্ষি কাকে বলে এবং তাঁদের মধ্যে নারদকে নিজ স্বরূপ বলার অর্থ কী ?

উত্তর—দেবর্ষির লক্ষণ দ্বাদশ, ত্রয়োদশ শ্লোকের টীকায় দেওয়া হয়েছে, সেখানে দ্রষ্টব্য। দেবর্ষিদের মধ্যে নারদ শ্রেষ্ঠ, সেই সঙ্গে তিনি ভগবানের পরম অনন্য ভক্ত, মহাজ্ঞানী ও নিপুণ মন্ত্রদ্রষ্টা। তাই নারদকে ভগবান তাঁর স্বরূপ বলেছেন। নারদ সম্পর্কেও দ্বাদশ, ত্রয়োদশ শ্লোকের টীকা দেখা উচিত।

প্রশ্ন—চিত্ররথ গন্ধর্বকে নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—গন্ধর্ব এক দেবযোনিবিশিষ্ট ; ইঁনি দেবলোকে গীত-বাদ্য ও নাট্যাভিনয় করেন এবং স্বর্গে সবথেকে সুন্দর ও অত্যন্ত রূপবান বলে স্বীকৃত। 'গুহ্যক লোক' থেকে উর্ধ্বে ও 'বিদ্যাধর লোক' থেকে নিম্নে এঁর 'গন্ধর্ব লোক'। দেবতা এবং পিতৃদেবের ন্যায় গন্ধর্বও দুপ্রকারের হয়—মর্ত্য ও দিব্য। যে মানুষ মৃত্যুর পর পুণ্যবলে গন্ধর্বলোক প্রাপ্ত হন, তিনি 'মর্ত্য' এবং যিনি কল্পারম্ভ থেকেই গন্ধর্ব, তাঁকে 'দিব্য' বলা হয়। দিব্য গন্ধর্বদের দুটি শ্রেণী—'মৌনেয়' এবং 'প্রাধেয়'। মহর্ষি কশ্যপের দুই পত্নীর নাম হল—মুনি এবং প্রাধা। এঁদের থেকেই অধিকাংশ অপ্সরা ও গন্ধর্বদের উৎপত্তি হয়। ভীমসেন, উগ্রসেন, সুপর্ণ, বরুণ, গোপতি, ধৃতরাষ্ট্র, সূর্যবর্চা, সত্যবাক্, অর্কপর্ণ, প্রযুত, ভীম, চিত্ররথ, শালিশিরা, পর্জন্য, কলি ও নারদ—এই ষোলোজনকে

---

[1]পুরাণাদিতে অশ্বত্থের বহু মাহাত্ম্য পরিলক্ষিত হয়। স্কন্দপুরাণে আছে—

মূলে বিষ্ণুঃ স্থিতো নিত্যং স্কন্ধে কেশব এব চ।
নারায়ণস্তু শাখাসু পত্রেষু ভগবান্ হরিঃ॥
ফলেঽচ্যুতো ন সন্দেহঃ সর্বদেবৈঃ সমন্বিতঃ।
স এব বিষ্ণুর্দ্রুম এব মূর্তো মহাত্মভিঃ সেবিতপুণ্যমূলঃ।
যস্যাশ্রয়ঃ পাপসহস্রহন্তা ভবেন্নৃণাং কামদুঘো গুণাঢ্যঃ॥

(স্কন্দ. নাগর. ২৪৭।৪১, ৪২, ৪৪)

'অশ্বত্থের মূলে বিষ্ণু, শরীরে কেশব, শাখাতে নারায়ণ, পাতায় ভগবান হরি এবং ফলে সর্ব দেবতাসম্পন্ন অচ্যুত সর্বদা নিবাস করেন—এতে কোনোই সন্দেহ নেই। এই বৃক্ষ মূর্তিমান শ্রীবিষ্ণুস্বরূপ ; মহাত্মা ব্যক্তি এই বৃক্ষের পুণ্যময় মূলের সেবা করেন। গুণাদিযুক্ত এবং কামনা পূর্ণকারী এই বৃক্ষের আশ্রয় মানুষের সহস্র সহস্র পাপের বিনাশ করে।'

এতদ্ব্যতীত আয়ুর্বেদ গ্রন্থেও অশ্বত্থের অত্যন্ত মহিমা আছে—এর পাতা, ফল এবং বাকল—সবই রোগনাশক। রক্তবিকার, কফ, বাত, পিত্ত, দাহ, বমন, শোথ, অরুচি, বিষদোষ, কাশি, বিষম-জ্বর, হেঁচকী, ক্ষত, নাসারোগ, বিসর্প, কৃমি, কুষ্ঠ, ত্বক্-ব্রণ, অগ্নিদগ্ধ ব্রণ, বাগী ইত্যাদি বহু রোগে এটি ব্যবহৃত হয়।

দেব-গন্ধর্ব 'মুনি' থেকে উৎপন্ন হওয়ায় 'মৌনেয়' বলা হয় এবং সিদ্ধ, পূর্ণ, বর্হি, পূর্ণায়ু, ব্রহ্মচারী, রতিগুণ, সুপর্ণ, বিশ্বাবসু, সুচন্দ্র, ভানু, অতিবাহু, হাহা, হুহু, এবং তুম্বুরু—এই চোদ্দজন 'প্রাধা' থেকে উৎপন্ন হওয়ায় 'প্রাধেয়' নামে পরিচিত (মহাভারত, আদি ৬৫)। এদের মধ্যে হাহা, হুহু, বিশ্বাবসু, তুম্বুরু ও চিত্ররথ প্রমুখ প্রধান। এঁদের মধ্যেও চিত্ররথকেই সবার অধিপতি মানা হয়। চিত্ররথ দিব্য সংগীত-বিদ্যায় পারদর্শী ও অত্যন্ত নিপুণ। তাই ভগবান এঁকে তাঁর স্বরূপ বলেছেন। চিত্ররথের বিস্তৃত বর্ণনা অগ্নিপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, মহাভারত-আদিপর্ব এবং বায়ুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়।

প্রশ্ন—সিদ্ধ কাকে বলে এবং সেসবের মধ্যে কপিল মুনিকে নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যিনি সর্বপ্রকারের স্থূল ও সূক্ষ্ম জাগতিক সিদ্ধিপ্রাপ্ত এবং পূর্ণভাবে ধর্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য, বৈরাগ্য ইত্যাদি শ্রেষ্ঠগুণ সম্পন্ন, তাঁকে সিদ্ধ বলা হয়। এমন হাজার হাজার সিদ্ধ আছেন, যাঁদের মধ্যে কপিল সর্বপ্রধান। ভগবান কপিল সাক্ষাৎ ঈশ্বরের অবতার। মহাযোগী কর্দমমুনির পত্নী দেবহূতিকে জ্ঞানপ্রদান করার জন্য তিনি তাঁরই গর্ভে অবতার গ্রহণ করেন। এঁর প্রাকট্যের সময় স্বয়ং ব্রহ্মা আশ্রমে এসে শ্রীদেবহূতিকে বলেন—

অয়ং সিদ্ধগণাধীশঃ সাংখ্যাচার্যৈঃ সুসম্মতঃ।
লোকে কপিল ইত্যাখ্যাং গন্তা তে কীর্তিবর্ধনঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৪।১৯)

"ইনি সিদ্ধগণদের অধীশ্বর এবং সাংখ্যের আচার্যগণ দ্বারা পূজিত হয়ে তোমার কীর্তি বৃদ্ধি করবেন এবং বিশ্বে 'কপিল' নামে প্রসিদ্ধ হবেন।"

ইনি স্বভাবতঃই নিত্যজ্ঞানস্বরূপ, ঐশ্বর্য, ধর্ম ও বৈরাগ্যাদি গুণসম্পন্ন। এঁর সমকক্ষ হওয়ার মতো অন্য কোনো সিদ্ধ নেই, তাহলে এঁর থেকে বড় তো কেউ হতেই পারে না। তাই ভগবান সমস্ত সিদ্ধদের মধ্যে কপিল মুনিকে তাঁর স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্॥ ২৭

অশ্বসমূহের মধ্যে অমৃত-সহ উদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব, গজেন্দ্রগণের মধ্যে ঐরাবত নামক হাতি এবং মনুষ্যগণের মধ্যে আমাকে রাজা বলে জানবে॥ ২৭

প্রশ্ন—অশ্বদের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্বকে নিজের স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—অমৃতের জন্য সমুদ্র মন্থনের সময় অমৃতের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চৈঃশ্রবার উৎপত্তি হয়। সুতরাং এটি চতুর্দশ রত্নের অন্তর্গত এবং সমস্ত অশ্বের রাজা, তাই ভগবান একে তাঁর স্বরূপ বলেছেন।

প্রশ্ন—গজেন্দ্রের মধ্যে ঐরাবত নামক হাতিকে নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—বহু হাতির মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, তাকে গজেন্দ্র বলা হয়। এরূপ গজেন্দ্রর মধ্যে ঐরাবত হাতি, যে ইন্দ্রের বাহন, তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও 'গজ' জাতির রাজা মানা হয়। এর উৎপত্তিও উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়ার ন্যায় সমুদ্রমন্থন থেকেই হয়েছে। তাই ভগবান একে তাঁর স্বরূপ বলেছেন।

প্রশ্ন—মানুষের মধ্যে রাজাকে নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—শাস্ত্রোক্ত লক্ষণযুক্ত ধর্মপরায়ণ রাজা তাঁর প্রজাদের পাপ থেকে রক্ষা করে ধর্মে প্রবৃত্ত করেন ও সকলকে রক্ষা করেন, তাই অন্য ব্যক্তিদের থেকে রাজাকে শ্রেষ্ঠ বলে মানা হয়। সাধারণ মানুষের থেকে এরূপ রাজার মধ্যে ভগবানের শক্তি বেশি থাকে। তাই ভগবান রাজাকে নিজ স্বরূপ বলেছেন।

প্রশ্ন—সাধারণ রাজাদের না ধরে যদি এখানে প্রত্যেক মন্বন্তরে হওয়া মনুদের ধরা যায়, যাঁরা নিজ নিজ সময়ে মানুষদের অধিপতি হন, তাহলে কী আপত্তি ? এই মন্বন্তরে প্রজাপতি ব্রহ্মা বৈবস্বত মনুকে মানুষদের অধিপতি করেছিলেন, এই কথা প্রসিদ্ধ !

মনুষ্যাণামধিপতিং চক্রে বৈবস্বতং মনুম্।

(বায়ুপুরাণ ৭০।১৮)

উত্তর—কোনো আপত্তি নেই, বৈবস্বত মনুকেও 'নরাধিপ' মানা যেতে পারে।

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ।। ২৮

শস্ত্রসমূহের মধ্যে আমি বজ্র, গাভীগণের মধ্যে আমি কামধেনু। শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে সন্তান উৎপাদনের হেতু কাম আমি এবং সর্পগণের মধ্যে সর্পরাজ বাসুকিও আমি।। ২৮

প্রশ্ন—শস্ত্রাদির মধ্যে বজ্রকে নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যতপ্রকার শস্ত্র আছে, তাদের মধ্যে বজ্র অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ ; কারণ বজ্রের মধ্যে দধীচী ঋষির তপস্যা ও সাক্ষাৎ ভগবানের তেজ বিরাজমান এবং তাকে অমোঘ মানা হয় (শ্রীমদ্ভাগবত ৬।১১।১৯-২০), তাই বজ্রকে ভগবান তাঁর স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

প্রশ্ন—দুধপ্রদানকারী গাভীদের মধ্যে কামধেনুকে নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—কামধেনু সমস্ত গাভীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও দিব্য, এটি দেবতা ও মানুষ সকলের সমস্ত কামনা পূর্ণকারী এবং এর উৎপত্তিও সমুদ্রমন্থন থেকে হয়েছিল, তাই ভগবান একে তাঁর নিজ স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

প্রশ্ন—কন্দর্পের সঙ্গে 'প্রজনঃ' বিশেষণ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'কন্দর্পঃ' শব্দ কামদেবের বাচক। এর সঙ্গে 'প্রজনঃ' বিশেষণে ভগবানের এই তাৎপর্য যে, ধর্মানুকূল সন্তান উৎপাদনের উপযোগী যে 'কাম', তা আমারই বিভূতি। এই ভাব সপ্তম অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকেও —কামের সঙ্গে 'ধর্মাবিরুদ্ধঃ' বিশেষণের দ্বারা দেখানো হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, ইন্দ্রিয়ারাম মানুষের দ্বারা বিষয়-সুখের জন্য উপভোগ করা কাম নিকৃষ্ট, তা ধর্মানুকূল নয় ; কিন্তু শাস্ত্রবিধি অনুসারে সন্তান উৎপাদনের জন্য ইন্দ্রিয়জয়ী ব্যক্তির দ্বারা প্রযুক্ত হওয়া কামই ধর্মানুকূল হওয়ায় শ্রেষ্ঠ। অতএব সেটিকে ভগবানের বিভূতির মধ্যে ধরা হয়েছে।

প্রশ্ন—সর্পদের মধ্যে বাসুকীকে তাঁর স্বরূপ বলার অর্থ কী ?

উত্তর—বাসুকি সমস্ত সর্পের রাজা ও ভগবানের ভক্ত হওয়ায় সর্পদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে মানা হয়, তাই ভগবান একে নিজ স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্।। ২৯

নাগগণের মধ্যে আমি শেষনাগ, জলচর প্রাণীদের মধ্যে তাদের অধিপতি আমি বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে পিতৃরাজ অর্যমা এবং শাসনকর্তাদের মধ্যে আমি যমরাজ মৃত্যু।। ২৯

প্রশ্ন—নাগেদের মধ্যে শেষনাগকে নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—শেষনাগ সমস্ত নাগেদের রাজা এবং সহস্র ফণাযুক্ত। ভগবানের শয্যা হয়ে, নিত্য তাঁর সেবায় ব্যাপৃত থেকে তাঁকে সুখপ্রদানকারী, পরমভক্ত এবং বহুবার ভগবানের সঙ্গে অবতাররূপ গ্রহণ করে তাঁর লীলায় সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণকারী, এঁর উৎপত্তিও ভগবানের থেকে বলে মানা হয়[1] তাই এঁকে ভগবান তাঁর স্বরূপ বলেছেন।

প্রশ্ন—জলচর প্রাণীদের অধিপতি বরুণকে তাঁর স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—বরুণ সমস্ত স্থলচর এবং জলদেবতাদের

[1]শেষং চাকল্পয়দ্দেবমনন্তং বিশ্বরূপিণম্। যো ধারয়তি ভূতানি ধরাং চেমাং সপর্বতাম্।। (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ৬৭।১৩)

'এই পরমদেব বিশ্বরূপ অনন্তনামক দেবস্বরূপ শেষনাগকে উৎপন্ন করেন, যিনি পর্বতসহ এই সমগ্র পৃথিবী এবং প্রাণীসমুদায়কে ধারণ করে আছেন।'

অধিপতি, লোকপাল, দেবতা ও ভগবানের ভক্ত হওয়ায় সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত। তাই ভগবান তাঁকে নিজের স্বরূপ বলেছেন।

প্রশ্ন—পিতৃগণের মধ্যে অর্যমাকে নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—কব্যবাহ, অনল, সোম, যম, অর্যমা, অগ্নিষ্বাত্ত ও বর্হিষদ্— এই সাতজন হলেন পিতৃগণ[১]। এঁদের মধ্যে অর্যমা নামক পিতৃদেব সব পিতৃগণের প্রধান হওয়ায় তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানা হয়। তাই ভগবান তাঁকে নিজ স্বরূপ বলেছেন।

প্রশ্ন—শাসনকর্তাদের মধ্যে যমকে নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—মর্ত্য এবং দেব-জগতে যত শাসনকর্তা আছেন, যমরাজ তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এঁর সকল দণ্ড, ন্যায় এবং ধর্মযুক্ত ; হিতপূর্ণ ও পাপনাশক হয়। ইনি ভগবানের জ্ঞানীভক্ত এবং লোকপাল। তাই ভগবান এঁকে তাঁর স্বরূপ বলেছেন।[২]

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্॥ ৩০

দৈত্যগণের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, গণনাকারীদের মধ্যে সময় (কাল), পশুদের মধ্যে আমি সিংহ এবং পক্ষিগণের মধ্যে আমি গরুড় ॥ ৩০

প্রশ্ন—দৈত্যদের মধ্যে প্রহ্লাদকে নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—দিতির বংশধরদের দৈত্য বলা হয়। তাঁদের মধ্যে প্রহ্লাদ উত্তম বলে মানা হয় ; কারণ ইনি সর্বসদ্গুণ-সম্পন্ন, পরম ধর্মাত্মা ও ভগবানে পরম শ্রদ্ধাযুক্ত, নিষ্কাম, অনন্য প্রেমিক ভক্ত ও দৈত্যদের রাজা। তাই

[১]কব্যবাহোঽনলঃ সোমো যমশ্চৈবার্যমা তথা। অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদস্ত্রয়শ্চান্যা হ্যমূর্তয়ঃ॥ (শিবপুরাণ, ধর্ম. ৬৩।২)

কোথাও কোথাও এঁর নামের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, যেমন— সুকাল, আঙ্গিরস, সুস্বধা, সোমপা, বৈরাজ, অগ্নিষ্বাত্ত ও বর্হিষদ্ (হরিবংশ, পূর্ব,অ.১৮)। মন্বন্তর ভেদে নামের ভেদ সম্ভব।

[২]যমরাজের দরবারে কোনোভাবেই কারো সঙ্গে কোনোরূপ পক্ষপাতিত্ব করা হয় না এবং কোনোপ্রকার সুপারিশ, উৎকোচ এবং তোষামদিও চলে না। এঁর নিয়ম এতো কঠোর যে তাতে ছাড়া পাবার কোনো উপায়ই নেই, তাই তাঁকে 'নিয়ন্ত্রকদের মধ্যে সব থেকে শ্রেষ্ঠ' বলে মানা হয়। ইন্দ্র, অগ্নি, নির্ঋতি, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান, ব্রহ্মা, অনন্ত ও যম—এই দশজন দিকপাল আছেন (বৃহদ্ধর্মপুরাণ, উত্তরকাণ্ড ৯)। এঁরা সমষ্টিজগতের সকল দিক্-এর সংরক্ষক।

বলা হয় যে, পুণ্যাত্মা জীব এই যমরাজকে স্বাভাবিক সৌম্যমূর্তিতেই দেখেন আর পাপিরা অত্যন্ত লাল চক্ষু, বিকট দন্ত, বিদ্যুতের মতো জিভ, ভীষণ করালবদন, ভয়ানক আকৃতিযুক্ত, হাতে কালদণ্ডধারী রূপে দেখে থাকে (স্কন্দপুরাণ, কাশীখণ্ড, পূর্ব ৮।৫৫, ৫৬)।

ইনি পরম জ্ঞানী। নচিকেতাকে ইনি আত্মতত্ত্বের জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। কঠোপনিষদ, মহাভারত-অনুশাসনপর্ব ও বরাহপুরাণে নচিকেতার উপাখ্যান রয়েছে। যমরাজ অত্যন্ত ভগবদ্ভক্ত। শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে, বিষ্ণুপুরাণে, তৃতীয় অংশের সপ্তম অধ্যায়ে এবং স্কন্দপুরাণ, কাশীখণ্ড পূর্বার্ধের অষ্টম অধ্যায়ে ইনি তাঁর দূতের সামনে যে ভগবানের এবং ভগবৎনামের মহিমা কীর্তন করেছেন, তা অবশ্য পঠন-যোগ্য।

কিন্তু এঁকেও অপদস্থ করার মতো পুরুষও কদাচিৎ জন্মগ্রহণ করে থাকেন। স্কন্দপুরাণে উল্লিখিত আছে যে, কীর্তিমান নামে এক চক্রবর্তী ভক্ত রাজা ছিলেন। তাঁর সদুপদেশে সমস্ত প্রজা সদাচার ও ভক্তিতে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর পুণ্যবলে রাজ্যে যত জীব ছিল, তাদের সদ্গতি হতে থাকে এবং মৃত্যুগামী সকলেই পরমগতি লাভ করতে থাকে। তাই জীবেদের নরক-গমন বন্ধ হয়ে যায়। এতে যমলোক শূন্য হয়ে যায় ! তখন যমরাজ গিয়ে ব্রহ্মাকে সব ঘটনা বলেন, ব্রহ্মা তাঁকে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কাছে পাঠান। ভগবান বিষ্ণু বলেন—'যতদিন এই ধর্মাত্মা ভক্ত রাজা কীর্তিমান জীবিত আছেন, ততদিন এরূপই হবে ; কিন্তু জগত সর্বদা একভাবে চলে না।' (স্কন্দপুরাণ. বিষ্ণু. বৈ. ১১।১২।১৩)

ভগবান এঁকে তাঁর স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

প্রশ্ন—এখানে 'কাল' শব্দ কীসের বাচক ? একে নিজের স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে 'কাল' শব্দ মুহূর্ত, ঘণ্টা, দিন, পক্ষ, মাস ইত্যাদি নামে অভিহিত করা সময়ের বাচক। এটি গণিতবিদ্যাজ্ঞানীদের গণনার আধার। তাই কালকে ভগবান তাঁর স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

প্রশ্ন—সিংহ তো হিংস্র পশু, ভগবান একে কীভাবে নিজের বিভূতিতে ধরলেন ?

উত্তর—সিংহকে সব পশুদের রাজা মানা হয়। সে সব থেকে বলবান, তেজস্বী, শূরবীর ও সাহসী। তাই ভগবান সিংহকে তাঁর বিভূতির মধ্যে ধরেছেন।

প্রশ্ন—পক্ষিদের মধ্যে গরুড়কে নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—বিনতার পুত্র গরুড় পক্ষিদের রাজা এবং সর্ববৃহৎ হওয়ায় পক্ষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানা হয়, সেই সঙ্গে গরুড় ভগবানের বাহন, তাঁর পরম ভক্ত ও অত্যন্ত পরাক্রমী। তাই গরুড়কে ভগবান তাঁর স্বরূপ বলেছেন।

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী॥ ৩১

আমি পবিত্রকারীদের মধ্যে বায়ু, শস্ত্রধারীদের মধ্যে শ্রীরাম, মৎস্যকুলের মধ্যে আমি মকর (কুমির) এবং নদীসমূহের মধ্যে আমি ভাগীরথী গঙ্গা ॥ ৩১

প্রশ্ন—'পবতাম্' পদের অর্থ যদি বেগবান মনে করা হয়, তাহলে কী সেটি ঠিক হবে না ?

উত্তর—ব্যাকরণের দৃষ্টিতে যদিও 'বেগবান্' অর্থ ঠিক নয় কিন্তু টীকাকারেরা এই অর্থও মেনে নিয়েছেন। বায়ু বেগবানদের (তীব্র গতিতে গমনকারীদের) মধ্যেও সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মানা হয়েছে এবং পবিত্রকারীদের মধ্যেও। সুতরাং দুভাবেই বায়ুর শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে 'রাম' শব্দ কীসের বাচক এবং তাঁকে নিজের স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'রাম' শব্দ দশরথপুত্র ভগবান শ্রীরামের বাচক। তাঁকে নিজ স্বরূপ বলায় ভগবানের এই তাৎপর্য যে ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের লীলা করার জন্য আমিই ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করি। শ্রীরামে এবং আমাতে কোনো পার্থক্য নেই, স্বয়ং আমিই শ্রীরামরূপে অবতীর্ণ হই।

প্রশ্ন—মৎস্যদের মধ্যে মকরকে নিজ বিভূতি বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—মৎস্য যতপ্রকারের হয়, তাদের মধ্যে মকর (কুমির) সব থেকে বড় ও বলবান ; এই বৈশিষ্ট্যের জন্য মৎস্যের মধ্যে মকরকে ভগবান নিজের বিভূতি বলেছেন।

প্রশ্ন—নদী সকলের মধ্যে জাহ্নবী (গঙ্গা)কে নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—জাহ্নবী অর্থাৎ ভাগীরথী গঙ্গা সমস্ত নদীর মধ্যে পরম শ্রেষ্ঠ, এটি শ্রীভগবানের চরণোদক থেকে উৎপন্ন ও পরম পবিত্র[১]। পুরাণ ও ইতিহাসে এর খুব

---

[১]ধাতুঃ কমণ্ডলুজলং তদুরুক্রমস্য পাদাবনেজনপবিত্রতয়া নরেন্দ্র।
স্বর্ধুন্যভূন্নভসি সা পততী নিমার্ষ্টি লোকত্রয়ং ভগবতো বিশদেব কীর্তিঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ৮।২১।৪)

'হে রাজন্! তিনি ব্রহ্মার কমণ্ডলুর জল, ভগবানের চরণ ধৌত করায় পবিত্রতম হয়ে স্বর্গ-গঙ্গা (মন্দাকিনী) হয়েছেন। সেই গঙ্গা ভগবানের নির্মল কীর্তির ন্যায় আকাশ থেকে পৃথিবীতে নেমে এখনও ত্রিলোককে পবিত্র করছেন।'

ন হ্যেতৎ পরমাশ্চর্যং স্বর্ধুন্যা যদিহোদিতম্। অনন্তচরণাম্ভোজপ্রসূতায়া ভবচ্ছিদঃ॥
সন্নিবেশ্য মনো যস্মিঞ্ছ্রদ্ধয়া মুনয়োঽমলাঃ। ত্রৈগুণ্যং দুস্ত্যজং হিত্বা সদ্যো যাতাস্তদাত্মতাম্॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ৯।৯।১৪-১৫)

'যে অনন্ত ভগবানের চরণ-কমলে শ্রদ্ধাসহ ভালোভাবে চিত্ত নিবিষ্ট করে নির্মল হৃদয় মুনিগণ সত্বর দুস্তর ত্রিগুণ প্রপঞ্চ ত্যাগ করে তাঁর স্বরূপ লাভ করেন, সেই চরণ কমল থেকে উৎপন্ন ভব-বন্ধন মুক্তকারী, ভগবতী গঙ্গার যে মাহাত্ম্য বলা হয়েছে, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।'

মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে।

এছাড়া আরও একটি বিশেষত্ব রয়েছে। একবার ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং দ্রবীভূত হয়ে প্রবাহিত হতে থাকেন এবং ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে গিয়ে গঙ্গারূপ ধারণ করেন। এইভাবে সাক্ষাৎ ব্রহ্মদ্রব হওয়ার জন্যও গঙ্গার খুবই মাহাত্ম্য রয়েছে[1] তাই ভগবান গঙ্গাকে তাঁর স্বরূপ বলেছেন।

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহমর্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্॥ ৩২

হে অর্জুন! সমগ্র সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্তও আমি। বিদ্যার মধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা এবং পরস্পর বিবাদকারীদের মধ্যে আমি তর্ক নির্ণায়ক বাদ॥ ৩২

প্রশ্ন—বিংশতম শ্লোকে ভগবান নিজেকে ভূতাদি প্রাণীর আদি, মধ্য ও অন্ত বলে জানিয়েছেন ; এখানে আবার সর্গাদির আদি, মধ্য ও অন্ত বলেছেন। এটি কী পুনরুক্তি নয় ?

উত্তর—পুনরুক্তি নয় ; কারণ ঐস্থানে 'ভূত' শব্দটি চেতন প্রাণীদের বাচক এবং এখানে 'সর্গ' শব্দ জড়-চেতন সমস্ত বস্তুর এবং সমস্ত লোকাদিসহ সমগ্র জগতের বাচক।

প্রশ্ন—সমস্ত বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যাকে নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—সেই বিদ্যাকে অধ্যাত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা বলা হয় যা আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধিত, যা আত্মতত্ত্বকে প্রকাশ করে এবং যার প্রভাবে অনায়াসেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়। জগতে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত যত রকমের বিদ্যা আছে, তা সবই এই বিদ্যার থেকে নিকৃষ্ট ; কারণ তাদের দ্বারা অজ্ঞানের বন্ধন দূর হয় না, বরং আরও দৃঢ় হয়। কিন্তু এই ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা অজ্ঞানের গ্রন্থি চিরকালের মতো খুলে যায় এবং পরমাত্মার স্বরূপের যথার্থ সাক্ষাৎ লাভ হয়। তাই এটি সবথেকে শ্রেষ্ঠ এবং ভগবান সেইজন্যই একে তাঁর স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

প্রশ্ন—বিভূতির মধ্যে 'বাদ'কে বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—শাস্ত্রার্থের তিন স্বরূপ—জল্প, বিতণ্ডা এবং বাদ। উচিত-অনুচিতের বিচার ত্যাগ করে নিজ পক্ষের মণ্ডন ও অপর পক্ষের খণ্ডন করার জন্য যে বাদ-প্রতিবাদ করা হয়, তাকে বলা হয় 'জল্প' ; কেবল অন্য পক্ষের

[1] জগজ্জননী মহেশ্বরী দক্ষকন্যা সতীর দেহত্যাগের পর ভগবান শিব যখন তপস্যায় রত হন, তখন দেবতাগণ জগন্মাতার স্তুতি করেন। মহেশ্বরী প্রকটিত হন। দেবতারা তাঁকে পুনরায় শিবকে বরণ করার জন্য প্রার্থনা করেন। দেবী বলেন—'আমি দুটি রূপে সুমেরু কন্যা মেনকার গর্ভ থেকে শৈলরাজ হিমালয়ের ঘরে প্রকটিত হব।' তারপর তিনি প্রথমে গঙ্গারূপে প্রকটিত হন। দেবতাগণ স্তুতি করতে করতে তাঁকে দেবলোকে নিয়ে যান। সেখানে তিনি মূর্তি ধারণ করে শংকরের সঙ্গে দিব্য কৈলাসধামে পদার্পণ করেন ও ব্রহ্মার প্রার্থনায় নিরাকাররূপে তাঁর কমণ্ডলুতে স্থিত হন (অন্তর্ধানাংশভাগেন স্থিতা ব্রহ্মকমণ্ডলৌ)। ব্রহ্মা কমণ্ডলু করে তাঁকে ব্রহ্মলোকে নিয়ে যান। একবার ভগবান শংকর গঙ্গা-সহ বৈকুণ্ঠে পদার্পণ করেন। সেখানে ভগবান বিষ্ণুর অনুরোধে তিনি গান করেন। তিনি যে রাগিনী গাইতেন, সেই রাগিনী মূর্তিধারণ করে প্রকটিত হতেন। তিনি 'শ্রী' রাগিনী গাইছিলেন, তখন তিনিও প্রকটিত হলেন। সেই রাগিনীতে মুগ্ধ হয়ে রসময় ভগবান নারায়ণ স্বয়ং রসরূপ হয়ে বহে গেলেন। ব্রহ্মা ভাবলেন—'ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন সংগীত ব্রহ্মময় এবং স্বয়ং ব্রহ্ম হরিও এখন দ্রবীভূত হয়ে গেছেন ; অতএব ব্রহ্মময়ী গঙ্গা একে সংবরণ করে নিন।' এই ভেবে তিনি ব্রহ্মদ্রব দ্বারা কমণ্ডলু স্পর্শ করালেন। এরপর যখন ভগবান বিষ্ণু বামন-অবতারে তাঁর সাত্ত্বিক পদদ্বারা সমস্ত জগৎ পরিমাপ করেন, তখন ব্রহ্মা কমণ্ডলুর সেই জল দিয়ে ভগবৎ চরণ ধৌত করান। কমণ্ডলুর জল প্রদান করতেই সেই চরণ সেই স্থানেই স্থির হয়ে যায় এবং ভগবানের অন্তর্ধানের পরও তাঁর দিব্যচরণ সেই স্বর্গ-গঙ্গার সঙ্গে থেকে যায়। তার থেকেই উৎপন্ন গঙ্গাকে মহা তপস্যা করে ভগীরথ তাঁর পূর্বপুরুষদের উদ্ধার করার জন্য এই লোকে আনয়ন করেন। এখানেও শংকর তাঁকে মস্তকে ধারণ করেন। গঙ্গার মাহাত্ম্যের এই অত্যন্ত সুন্দর, উপদেশপ্রদ ও অনুপম কাহিনী সবিস্তারে বৃহদ্ধর্মপুরাণে মধ্যখণ্ডের দ্বাদশ অধ্যায় থেকে আঠাশতম অধ্যায় পর্যন্ত অধ্যয়ন করা উচিত।

খণ্ডন করার জন্য যে বিবাদ করা হয় তাকে বলে 'বিতণ্ডা' এবং যা তত্ত্ব-নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে শুদ্ধ চিত্তে করা হয়, তাকে বলা হয় 'বাদ'। 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা'র দ্বারা দ্বেষ, ক্রোধ, হিংসা এবং অভিমান ইত্যাদি সব উৎপন্ন হয় ; কিন্তু 'বাদ' থেকে সত্যের নির্ণয় এবং কল্যাণ সাধনায় সহায়তা লাভ হয়। 'জল্প' এবং 'বিতণ্ডা' ত্যাজ্য, কিন্তু প্রয়োজন হলে 'বাদ' গ্রাহ্য। এই বিশেষত্বের জন্য ভগবান 'বাদ'কে নিজের বিভূতি বলেছেন।

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ॥ ৩৩

অক্ষরসমূহের মধ্যে আমি 'অ'কার, সমাসসমূহের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব সমাস, আমি (কালেরও কাল) অক্ষয়কাল বা মহাকাল এবং সর্বদিক মুখবিশিষ্ট বিরাট স্বরূপ, সকলের ধারণ-পোষণকারীও আমি॥ ৩৩

প্রশ্ন—অক্ষরসমূহের মধ্যে 'অ'কারকে নিজ স্বরূপ বলার অর্থ কী ?

উত্তর—স্বর ও ব্যঞ্জনে যত অক্ষর আছে, তার মধ্যে 'অ' কার সবের আদি এবং সেটিই সবের মধ্যে ব্যাপ্ত। শ্রুতিতেও বলা হয়েছে—

'অকারো বৈ সর্বা বাক্' (ঐতরেয় ব্রা. পু. ৩।৬)

'সমস্ত বাক্যই অকার'। এই কারণে অকার সর্ব বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাই ভগবান একে নিজ স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

প্রশ্ন—সর্ব প্রকার সমাসের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাসকে নিজ বিভূতি বলার অর্থ কী ?

উত্তর—দ্বন্দ্ব সমাসে দুটি পদের অর্থেরই প্রাধান্য[১] থাকায়, এটি অন্য সমাসের থেকে শ্রেষ্ঠ ; তাই ভগবান একে নিজ বিভূতি বলেছেন।

প্রশ্ন—ত্রিশতম শ্লোকে যে 'কাল'কে ভগবান নিজ-স্বরূপ বলেছেন, তাতে এবং এই শ্লোকে বলা 'কাল'-এ কী পার্থক্য ?

উত্তর—ত্রিশতম শ্লোকে যে 'কাল'-এর বর্ণনা আছে, তা কল্প, যুগ, বর্ষ, অয়ন, মাস, দিন, ঘণ্টা, ক্ষণ ইত্যাদি নামে বলা সময়ের বাচক। এটি প্রকৃতির কার্য, মহাপ্রলয়ে তা থাকে না। তাই এটি 'অক্ষয়' নয়। এই শ্লোকে যে 'কাল'-এর বর্ণনা আছে, তা সনাতন, শাশ্বত, অনাদি, অনন্ত ও নিত্য পরব্রহ্ম পরমাত্মার সাক্ষাৎ স্বরূপ, তাই এর সঙ্গে 'অক্ষয়' বিশেষণ দেওয়া হয়েছে। অতএব ত্রিশতম শ্লোকে বর্ণিত 'কাল'-এর সঙ্গে এর অনেক পার্থক্য রয়েছে। সেটি প্রকৃতির কার্য এবং এটি প্রকৃতি থেকে সর্বতোভাবে অতীত।[২]

প্রশ্ন—সর্বদিকে মুখবিশিষ্ট ধাতা অর্থাৎ সকলের

---

[১]সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে সমাস চার প্রকার—১) অব্যয়ীভাব, ২) তৎপুরুষ, ৩) বহুব্রীহি, ৪) দ্বন্দ্ব। কর্মধারয় ও দ্বিগু—এই দুটি তৎপুরুষের অন্তর্গত। অব্যয়ীভাব সমাসের পূর্ব ও উত্তর—এই দুটি পদের মধ্যে পূর্ব পদের অর্থের প্রাধান্য হয়। যেমন অধিহরি—এটি অব্যয়ীভাব সমাস ; অর্থ হল—'হরৌ' অর্থাৎ হরিতে ; সপ্তমী বিভক্তিই 'অধি' শব্দের অর্থ এবং সেটি ব্যক্ত করাই এর অভীষ্ট। তৎপুরুষ সমাসে উত্তরপদের অর্থের প্রাধান্য হয় ; যেমন—সীতাপতিং বন্দে, এই বাক্যের অন্তর্গত 'সীতাপতি' শব্দে তৎপুরুষ সমাস। এই বাক্যের অর্থ হল—সীতার পতি শ্রীরামকে প্রণাম করি। এখানে সীতা ও পতি—এই দুই পদের মধ্যে 'পতি'পদের অর্থই প্রধান ; কারণ 'সীতাপতি' শব্দে 'শ্রীরাম'কেই বোধ করায়। বহুব্রীহি সমাসে অন্য পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে ; যেমন 'পীতাম্বরঃ' এটি বহুব্রীহি সমাস। এর অর্থ—যাঁর বস্ত্র পীতবর্ণের, সেই ব্যক্তি। এখানে পূর্বপদ 'পীত' এবং উত্তরপদ 'অম্বর'। এতে কোনো পদের অর্থেরই প্রাধান্য নেই, এর দ্বারা যে 'অন্য ব্যক্তি' (ভগবান) রূপ অর্থ ব্যক্ত হয়, তাঁরই প্রাধান্য। দ্বন্দ্ব সমাসে উভয় পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে—যেমন 'রামলক্ষ্মণৌ পশ্য'—রাম ও লক্ষ্মণকে দেখো। এখানে রাম ও লক্ষ্মণ—দুজনকেই দেখা ব্যক্ত হয়েছে ; অতএব দুটি পদের অর্থেরই প্রাধান্য আছে।

[২]কালের তিনটি বিভাগ—

ক) 'সময়' বাচক কাল।

ধারণ-পোষণকারী আমিই, এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথার দ্বারা ভগবান বিরাটের সঙ্গে তাঁর ঐক্য দেখিয়েছেন। অভিপ্রায় হল যে সকলের ধারণ-পোষণকারী যে সর্বব্যাপী বিশ্বরূপ পরমেশ্বর, আমিই তিনি ; আমা ভিন্ন আর অন্য কেউ নেই।

মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা॥ ৩৪

আমি সকলের বিনাশকারী মৃত্যু এবং উদ্ভূতকারীদের উৎপত্তির কারণ। নারীদের মধ্যে কীর্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি এবং ক্ষমা আমি॥ ৩৪

প্রশ্ন—সকলের বিনাশকারী মৃত্যুকে নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর— ভগবানই মৃত্যুরূপ হয়ে সকলকে সংহার করেন। তাই ভগবান এখানে মৃত্যুকে নিজের স্বরূপ বলে জানিয়েছেন। নবম অধ্যায়ের উনিশতম শ্লোকেও বলেছেন যে, 'আমিই মৃত্যু এবং অমৃত'।

প্রশ্ন—নিজেকে উদ্ভূতকারীদের উৎপত্তির কারণ বলার কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—মৃত্যুরূপ হয়ে যেভাবে ভগবান সকলের বিনাশ করেন অর্থাৎ তাদের শরীর থেকে বিচ্ছেদ করান, সেইভাবে ভগবানই তাদের পুনরায় অন্য শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক করিয়ে তাদের উৎপন্ন করান—এই ভাব দেখাবার জন্য ভগবান নিজেকে উদ্ভূতকারীদের উৎপত্তির কারণ বলে জানিয়েছেন।

প্রশ্ন—কীর্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা—এই সাতজন কারা এবং এঁদের ভগবানের বিভূতি বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা প্রসূতির সঙ্গে প্রজাপতি দক্ষের বিবাহ হয়েছিল। তাঁর থেকে চব্বিশটি কন্যা উৎপন্ন হয়। কীর্তি, মেধা, ধৃতি, স্মৃতি, ক্ষমা তাঁদেরই অন্তর্গত। এর মধ্যে কীর্তি, মেধা এবং ধৃতির ধর্মের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল। স্মৃতির অঙ্গিরার সঙ্গে এবং ক্ষমার সঙ্গে মহর্ষি পুলহের বিবাহ হয়েছিল। মহর্ষি ভৃগুর কন্যার নাম শ্রী, ইনি দক্ষকন্যা খ্যাতির গর্ভ থেকে উৎপন্ন হন। ভগবান শ্রীবিষ্ণু এঁর পাণিগ্রহণ করেন। এই সাতজনের নাম যেসকল গুণ নির্দেশ করে—এই সাতজন ঐ বিভিন্ন গুণাদির অধিষ্ঠাত্রীদেবতা এবং তাঁদের জগতের সমস্ত নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে মানা হয়। তাই ভগবান এঁদের তাঁর বিভূতি বলেছেন।

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ॥ ৩৫

গীতযোগ্য শ্রুতির মধ্যে আমি বৃহৎসাম, ছন্দসমূহের মধ্যে গায়ত্রীছন্দ, মাসসমূহের মধ্যে অগ্রহায়ণ এবং ঋতুগুলির মধ্যে আমি বসন্ত॥ ৩৫

খ) 'প্রকৃতি' রূপ কাল। মহাপ্রলয়ের পরে যতক্ষণ প্রকৃতির সাম্যাবস্থা থাকে, সেই হচ্ছে প্রকৃতিরূপী কাল।

গ) নিত্য শাশ্বত বিজ্ঞানানন্দঘন পরমাত্মা।

সময়বাচক স্থূল কালের থেকে বুদ্ধির অগোচর প্রকৃতিরূপ কাল সূক্ষ্ম ও অতীত ; এবং এই প্রকৃতিরূপ কালের থেকেও পরমাত্মারূপ কাল অত্যন্ত সূক্ষ্ম, পরাৎপর ও পরম শ্রেষ্ঠ। বস্তুতঃ পরমাত্মা দেশ-কাল থেকে সর্বতোভাবে রহিত ; কিন্তু যেখানে প্রকৃতি এবং তার কার্যরূপ জগতের বর্ণনা করা হয়, সেখানে সকলকে অস্তিত্ব-স্ফূর্তি প্রদানকারী হওয়ায় ঐ সবের অধিষ্ঠানরূপ বিজ্ঞানানন্দঘন পরমাত্মাই হলেন প্রকৃত 'কাল'। ইনিই 'অক্ষয়'কাল।

প্রশ্ন—সামবেদকে ভগবান তো আগেই নিজ স্বরূপ বলে জানিয়েছেন (১০।২২), আবার এখানে 'বৃহৎসাম'কে নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—সামবেদের 'রথন্তর' ইত্যাদি সামের মধ্যে বৃহৎ সাম[১] ('বৃহৎ' নামক সাম) প্রধান হওয়ায় সর্বশ্রেষ্ঠ, সেইজন্য ভগবান 'বৃহৎসাম'কে নিজ স্বরূপ বলেছেন।

প্রশ্ন—ছন্দগুলির মধ্যে গায়ত্রী ছন্দকে নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—বেদগুলির মধ্যে যতপ্রকার ছন্দোবদ্ধ শ্লোক আছে, সে সবের মধ্যে গায়ত্রীই প্রধান। শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস এবং পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র স্থানে স্থানে গায়ত্রীর মহিমাতে পরিপূর্ণ[২]। গায়ত্রীর এই শ্রেষ্ঠত্বের জন্যই ভগবান একে নিজের স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

প্রশ্ন—মাসগুলির মধ্যে মার্গশীর্ষকে নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—মহাভারতের যুগে মাস গণনা মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ) থেকেই শুরু করা হত (মহাভারত, অনুশাসনপর্ব ১০৬ ও ১০৯)। সুতরাং এটি সব মাসের মধ্যে প্রথম মাস এবং এই মাসে করা ব্রত-উপবাসকে শাস্ত্রে মহান ফলদায়ক বলা হয়েছে[৩]। নবান্ন যজ্ঞও এই মাসে করার বিধান আছে। বাল্মীকিরামায়ণে একে সংবৎসরের ভূষণ বলা হয়েছে। এই প্রকারে অন্যান্য মাসের থেকে এই মাসের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে, তাই ভগবান একে তাঁর নিজ স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

প্রশ্ন—ঋতুসমূহের মধ্যে বসন্ত ঋতুকে নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—সব ঋতুগুলির মধ্যে বসন্ত ঋতু শ্রেষ্ঠ এবং রাজা। এই সময়ে জল ছাড়াই সমস্ত বৃক্ষ সবুজ, সতেজ থাকে এবং নতুন পাতা ও ফুলে সেজে ওঠে। এই সময়ে অধিক গরমও থাকে না, অধিক ঠাণ্ডাও নয়। প্রায় সমস্ত প্রাণীই এই ঋতুতে আনন্দে থাকে। তাই ভগবান এই ঋতুকে তাঁর স্বরূপ বলেছেন।

---

[১]সামবেদে 'বৃহৎ-সাম' এক গীতবিশেষ। এর দ্বারা পরমেশ্বরকে ইন্দ্ররূপে স্তুতি করা হয়েছে। 'অতিরাত্র' যাগে এটিই পৃষ্ঠস্তোত্র।

[২]গায়ত্রীর মহিমার নিম্নলিখিত বচন দ্বারা কিঞ্চিৎ দিগ্দর্শন করানো হচ্ছে—

'গায়ত্রী ছন্দসাং মাতেতি।' (নারায়ণোপনিষদ্ ৩৪)

'গায়ত্রী সমস্ত বেদাদির মাতা।'

সর্ববেদসারভূতা গায়ত্র্যাস্তু সমর্চনা। ব্রহ্মাদয়োঽপি সন্ধ্যায়াং তাং ধ্যায়ন্তি জপন্তি চ।। (দেবীভাগবত ১১।১৬।১৫)

'গায়ত্রীর উপাসনা সমস্ত বেদের সারভূত। ব্রহ্মাদি দেবতাও সন্ধ্যাকালে গায়ত্রীর ধ্যান ও জপ করেন।'

গায়ত্র্যুপাসনা নিত্যা সর্ববেদৈঃ সমীরিতা। যয়া বিনা ত্বধঃপাতো ব্রাহ্মণস্যাস্তি সর্বথা।। (দেবীভাগবত ১২।৮।৮৯)

সমস্ত বেদেই গায়ত্রী উপাসনাকে নিত্য (অনিবার্য) বলা হয়েছে। এই গায়ত্রী উপাসনা ব্যতীত ব্রাহ্মণের সর্বপ্রকারে অধঃপতন হয়।

অভীষ্টং লোকমাপ্নোতি প্রাপ্নুয়াৎ কামমীপ্সিতম্। গায়ত্রী বেদজননী গায়ত্রী পাপনাশিনী।।

গায়ত্র্যাঃ পরমং নাস্তি দিবি চেহ চ পাবনম্। হস্তত্রাণপ্রদা দেবী পততাং নরকার্ণবে।। (শঙ্খস্মৃতি ১২।২৪-২৫)

'(গায়ত্রী উপাসনাকারী দ্বিজ) নিজ অভীষ্ট লোক লাভ করেন, মনোবাঞ্ছিত ভোগ প্রাপ্ত করেন।' 'গায়ত্রী সমস্ত বেদের জননী এবং সম্পূর্ণ পাপবিনাশকারী। স্বর্গলোকে এবং পৃথিবীতে গায়ত্রীর থেকে শ্রেষ্ঠ পবিত্রকারী অন্য কোনো বস্তু নেই। গায়ত্রী দেবী নরক সমুদ্রে পতিতদের হাত ধরে উদ্ধার করেন।'

গায়ত্র্যাস্তু পরং নাস্তি শোধনং পাপকর্মণাম্। মহাব্যাহৃতিসংযুক্তাং প্রণবেন চ সংজপেৎ।। (সংবর্তস্মৃতি ২১৮)

'গায়ত্রীর থেকে বড় পাপকর্মাদির শোধক (প্রায়শ্চিত্ত) অন্য কিছুই নেই। প্রণব (ওঁ-কার)সহ তিন মহাব্যাহৃতির দ্বারা গায়ত্রী মন্ত্র জপ করা উচিত।'

নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ। গায়ত্র্যাস্তু পরং জপ্যং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।। (বৃহদ্যোগিযাজ্ঞবল্ক্য ১০।১০)

'গঙ্গার ন্যায় তীর্থ নেই, শ্রীবিষ্ণুভগবানের থেকে বড় কোনো দেবতা নেই এবং গায়ত্রীর থেকে বড় জপ করার যোগ্য মন্ত্র হয়নি, হবেও না।'

[৩]শুক্লে মার্গশিরে পক্ষে যোষিদ্ভর্তুরনুজ্ঞয়া। আরভেত ব্রতমিদং সার্বকামিকমাদিতঃ।। (শ্রীমদ্ভাগবত ৬।১৯।২)

'সর্বপ্রথম অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষে স্ত্রী নিজ পতির অনুমতি নিয়ে সর্বকামনাপূরণকারী এই পুংসবন-ব্রত পালন করবে।'

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্॥ ৩৬

ছলনাকারীদের মধ্যে আমি দ্যূতক্রীড়া, প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রভাব, বিজয়ীগণের বিজয়, অধ্যবসায়শীল ব্যক্তিদের অধ্যবসায় এবং সাত্ত্বিক পুরুষদের সত্ত্বগুণও আমিই॥ ৩৬

প্রশ্ন—দ্যূত অর্থাৎ জুয়া তো অত্যন্ত খারাপ জিনিস এবং শাস্ত্রেও এর নিষেধ আছে, ভগবান একে কেন তাঁর স্বরূপ বলেছেন ? আর যদি ভগবানের স্বরূপই হয় তাহলে দ্যূতক্রীড়াতে আপত্তি কেন ?

উত্তর—জগতে উত্তম, মধ্যম ও অধম—যতপ্রকার জীব ও পদার্থ আছে, সব কিছুর মধ্যেই ভগবান ব্যাপ্ত এবং ভগবানেরই অস্তিত্ব ও প্রেরণায় সকলে কর্মের চেষ্টা করে। এমন কোনো পদার্থ নেই যা ভগবানের সত্তা ও শক্তি রহিত। এরূপ সর্বপ্রকারের সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক জীব ও পদার্থে যে বিশেষ গুণ, বিশেষ প্রভাব ও বিশেষ চমৎকারিত্ব রয়েছে, তার মধ্যে ভগবানের সত্তা ও শক্তিরই বিশেষ বিকাশ। এই দৃষ্টিতে এখানে ভগবান অত্যন্ত সংক্ষেপে দেবতা, দৈত্য, মানুষ, পশু, পক্ষী, সর্প ইত্যাদি চেতন ; এবং বজ্র, ইন্দ্রিয়, মন, সমুদ্র ইত্যাদি জড় পদার্থের সঙ্গে সঙ্গে জয়, নিশ্চয়, প্রভাব, নীতি, জ্ঞান ইত্যাদি ভাবেরও বর্ণনা করেছেন। অল্পতেই যাতে সব কিছুর বর্ণনা করা যায়, তাই প্রধান-প্রধান সমষ্টি বিভাগগুলির নাম বলেছেন। অভিপ্রায় হল ; যে সব ব্যক্তি, পদার্থ, ক্রিয়া বা ভাব মন দ্বারা চিন্তা করা হয়, সেই সবেতে আমারই চিন্তা করা উচিত। তাই ছলনাকারীদের মধ্যে দ্যূতকে ভগবান নিজের স্বরূপ বলে জানিয়েছেন, একে উত্তম বলে তাতে প্রবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে নয়।

ভগবান তো মহা ক্রূর এবং হিংস্র সিংহ এবং মকর (কুমির)কে এবং সহজেই বিনাশকারী অগ্নি ও সর্বসংহারকারী মৃত্যুকেও নিজ স্বরূপ বলেছেন। এর অর্থও এটা মোটেই নয় যে, যে কোনো মানুষই গিয়ে সিংহ বা কুমিরের সঙ্গে খেলবে, আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়বে বা জেনে শুনে মৃত্যুবরণ করবে। এসবে যে নিষেধ মনে করা হয়, দ্যূত-ক্রীড়াতেও তা প্রযোজ্য।

প্রশ্ন—'প্রভাব', 'বিজয়', 'নিশ্চয়' (সিদ্ধান্ত) ও 'সাত্ত্বিকভাব'কে নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই চারটি গুণই ঈশ্বর লাভে সহায়ক, তাই ভগবান এঁদের তাঁর স্বরূপ বলেছেন। এই চারটিকে নিজ স্বরূপ বলায় ভগবানের এই তাৎপর্য যে, তেজস্বী প্রাণীর যে তেজ বা প্রভাব, তা বাস্তবে আমারই। যে ব্যক্তি তাকে নিজের মনে করে অহংকার করে, সে ভুল করে। এই রূপ বিজয়কারীদের বিজয়, সিদ্ধান্তগ্রহণকারীদের সিদ্ধান্ত ও সাত্ত্বিক ব্যক্তিদের সাত্ত্বিকভাব—এসব গুণও আমারই। এসব নিয়ে অহংকার করা অত্যন্ত মূর্খতা[১]। এতদ্ব্যতীত এই কথার আরও একটি তাৎপর্য হল যে, যেসব বস্তুতে উপরোক্ত গুণ আছে, তাদের মধ্যে ভগবানের তেজের আধিক্য আছে মনে করে সেগুলিকে শ্রেষ্ঠ মানা উচিত।

---

[১]কেন-উপনিষদে এক গাথা আছে—এক সময় স্বর্গের দেবতারা পরমাত্মার প্রতাপে অসুরদের জয় করেছিলেন। দেবতাদের কীর্তি ও মহিমা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। বিজয়োন্মত্ত দেবতারা ভগবানকে ভুলে বলতে থাকেন—'আমাদের জয় হয়েছে, আমরা নিজ পরাক্রম ও বুদ্ধিবলে দৈত্যবধ করেছি, তাই লোকে আমাদের পূজা করে এবং বিজয়গীত গায়।' দেবতাদের অহংকার বিনাশ করে তাঁদের উপকারের জন্য পরমাত্মা ব্রহ্ম নিজ লীলায় এক এমন অদ্ভুতরূপে প্রকট হন, যা দেখে দেবতারা আশ্চর্যান্বিত হয়ে যায়। দেবতারা সেই যক্ষরূপী অদ্ভুত পুরুষের পরিচয় জানার জন্য নিজেদের অগ্রবর্তী অগ্নিদেবকে বললেন, 'হে জাতবেদস্! আমাদের সকলের থেকে আপনি বেশি তেজস্বী, আপনি খোঁজ নিন—এই যক্ষরূপধারী বাস্তবে কে ?' অগ্নি বলেন—'ঠিক আছে, আমি জেনে আসছি।' এই বলে অগ্নি সেখানে গেলেন, কিন্তু তাঁর সমীপে যেতেই তাঁর তেজে এমন সন্ত্রস্ত হলেন যে কিছু বলার সাহস হল না। শেষে সেই যক্ষরূপী ব্রহ্ম অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি কে ?' অগ্নি বললেন—'আমার নাম অগ্নি এবং আমাকে জাতবেদসও বলা হয়।' ব্রহ্ম আবার জিজ্ঞাসা করলেন—'তাতো ঠিক ; কিন্তু হে অগ্নিদেব ! তোমার কীরূপ সামর্থ্য, তুমি কী করতে পার ?' অগ্নি বললেন —'হে যক্ষ ! এই পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে যা কিছু স্থাবর-জঙ্গম পদার্থ আছে, সেই সবগুলিকে আমি জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিতে পারি।'

ব্রহ্ম তাঁর সামনে একটি শুষ্ক তৃণ রেখে বললেন—'এই তৃণকে তুমি জ্বালাও।' অগ্নিদেব নিজ পূর্ণ শক্তিতে তৃণটি জ্বালাবার জন্য সর্বভাবে চেষ্টা করলেন, কিন্তু জ্বালাতে পারলেন না। লজ্জায় তাঁর মাথা নীচু হল এবং শেষে যক্ষকে কিছু না বলে অগ্নি

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ।। ৩৭

বৃষ্ণিবংশীয়দের মধ্যে বাসুদেব অর্থাৎ তোমার সখা আমি, পাণ্ডবদের মধ্যে ধনঞ্জয় অর্থাৎ তুমি, মুনিদের মধ্যে বেদব্যাস এবং কবিদের মধ্যে শুক্রাচার্য (দৈত্যগুরু) আমি।। ৩৭

প্রশ্ন—বৃষ্ণিবংশীয়দের মধ্যে বাসুদেব আমিই, এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথার দ্বারা ভগবান অবতার ও অবতারীর ঐক্য দেখিয়েছেন। বলার তাৎপর্য হল যে আমি অজ, অবিনাশী, সর্বভূতের মহেশ্বর, সর্বশক্তিমান, পূর্ণব্রহ্ম পুরুষোত্তমই এখানে বাসুদেবের পুত্ররূপে লীলা দ্বারা প্রকটিত হয়েছি (৪।৬)। অতএব যে ব্যক্তি আমাকে সাধারণ মানুষ মনে করে, সে অত্যন্ত ভুল করে।

প্রশ্ন—পাণ্ডবদের মধ্যে অর্জুনকে নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী ? পাঁচ পাণ্ডবদের মধ্যে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরই তো সর্বজ্যেষ্ঠ ও ভগবানের ভক্ত ও ধর্মাত্মা ?

উত্তর—যুধিষ্ঠির নিঃসন্দেহে পাণ্ডবদের সর্বজ্যেষ্ঠ, ধর্মাত্মা এবং ভগবানের পরম ভক্ত ছিলেন, তা সত্ত্বেও অর্জুনকেই পাণ্ডবদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মানা হয়। কারণ নর-নারায়ণ অবতারে অর্জুন নর-রূপে ভগবানের সঙ্গে ছিলেন। তাছাড়াও তিনি ভগবানের পরম প্রিয় সখা এবং তাঁর অনন্য প্রেমিক ভক্ত। তাই ভগবান অর্জুনকে তাঁর নিজ স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।[1]

প্রশ্ন—মুনিদের মধ্যে ব্যাসদেবকে নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভগবানের স্বরূপের এবং বেদাদি শাস্ত্রের মননকারীদের 'মুনি' বলা হয়। ভগবান বেদব্যাস সমস্ত বেদের তাৎপর্য যথাযথভাবে চিন্তা করে তার বিভাগ করেন। তিনি মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি বহু শাস্ত্রের

দেবতাদের কাছে ফিরে এলেন এবং জানালেন—'আমি তো যক্ষ কে ? তার কিছুই বুঝলাম না'।

তারপর বায়ুদেব যক্ষের কাছে গেলেন। কিন্তু তাঁরও অগ্নির দশা হল, তিনিও কিছু বলতে পারলেন না। যক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি কে ?' বায়ু বললেন—'আমি বায়ু, আমার নাম ও গুণ প্রসিদ্ধ—আমি গমন ক্রিয়াশীল ও পৃথিবীর গন্ধবহনকারী। অন্তরীক্ষে গমনকারী হওয়ায় আমাকে মাতরিশ্বাও বলে।' যক্ষ বললেন, 'তোমার কী ক্ষমতা ?' বায়ু বললেন—'এই পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে যে সব পদার্থ আছে, আমি সব গ্রহণ করতে পারি (উড়িয়ে নিতে পারি)।' ব্রহ্ম বায়ুর সামনে সেই শুষ্ক তৃণ রেখে বললেন— 'এই তৃণকে ওড়াও।' বায়ু তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়েও তৃণকে নড়াতে পারলেন না। তাতে তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে শীঘ্রই দেবতাদের কাছে গিয়ে তাঁদের বললেন—'হে দেবগণ ! জানি না এই যক্ষ কে ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারলাম না।'

এবার ইন্দ্র যক্ষের কাছে গেলেন। দেবরাজকে অহংকারপূর্ণ দেখে যক্ষরূপী ব্রহ্ম সেখান থেকে অন্তর্ধান করলেন। ইন্দ্রের অহংকার চূর্ণ করার জন্য তাঁর সঙ্গে কথাও বললেননি। এরমধ্যে ইন্দ্র দেখলেন অন্তরীক্ষে অত্যন্ত শোভাযুক্ত এবং উত্তম অলংকারে বিভূষিত হিমবানের কন্যা ভগবতী পার্বতী উমা দণ্ডায়মান। ইন্দ্র বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—'মাতা ! এক্ষুণি যে যক্ষ আমাকে দেখা দিয়ে অন্তর্হিত হলেন, তিনি কে ?' উমা বললেন—'এই যক্ষই সেই সুপ্রসিদ্ধ ব্রহ্ম। হে ইন্দ্র ! ইনিই অসুরদের পরাজিত করেছেন, তোমরা নিমিত্তমাত্র ; ব্রহ্মের বিজয়েই তোমাদের মহিমা বৃদ্ধি পেয়েছে, তাই তোমাদের পূজা করা হচ্ছে। তোমরা যাকে নিজেদের বিজয় ও মহিমা বলে মনে করছ, সে সব তোমাদের মিথ্যা অভিমান ; তা ত্যাগ করো এবং জেনে নাও যে, যা কিছু হচ্ছে, তা শুধুমাত্র এই ব্রহ্মের সত্তার দ্বারাই হচ্ছে।'

উমার কথায় ইন্দ্রের চোখ খুলে গেল ও অহংকার দূর হল। ব্রহ্মের মহাশক্তির পরিচয় পেয়ে ইন্দ্র ফিরে এলেন ও অগ্নি এবং বায়ুকেও ব্রহ্মের উপদেশ দিলেন। অগ্নি এবং বায়ুও ব্রহ্মকে জেনে গেলেন। তাই এই তিন দেবতা সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন। এঁদের মধ্যেও ইন্দ্রকে সর্বশ্রেষ্ঠ মানা হয়। কারণ তিনিই সর্বপ্রথম ব্রহ্মকে জেনেছিলেন।

[1]ভগবান স্বয়ং বলেছেন—

নরস্ত্বমসি দুর্ধর্ষ হরির্নারায়ণো হ্যহম্। কালে লোকমিমং প্রাপ্তৌ নরনারায়ণাবৃষী।।

অনন্যঃ পার্থ মত্তস্ত্বং ত্বত্তশ্চাহং তথৈব চ। নাবয়োরন্তরং শক্যং বেদিতুং ভরতর্ষভ।। (মহাভারত, বনপর্ব ১২।৪৬-৪৭)

'হে দুর্ধর্ষ অর্জুন ! তুমি ভগবান নর এবং আমি স্বয়ং হরিনারায়ণ। আমরা দুজনে এক সময়ে নর ও নারায়ণ ঋষি হয়ে ইহলোকে এসেছিলাম। তাই হে অর্জুন ! তুমি আমার থেকে আলাদা নও এবং সেই মতো আমিও তোমার থেকে পৃথক নই। হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! আমাদের দুজনের মধ্যে কেউ কোনো পার্থক্য করতে সমর্থ নয়।'

রচয়িতা, ভগবানের অংশাবতার এবং সর্বসদ্‌গুণসম্পন্ন। সুতরাং মুনিমণ্ডলের মধ্যে তাঁর প্রাধান্য থাকায় ভগবান তাঁকে নিজ স্বরূপ বলেছেন।

প্রশ্ন—কবিদের মধ্যে শুক্রাচার্যকে নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যিনি পণ্ডিত এবং বুদ্ধিমান, তাঁকে কবি বলা হয়। শুক্রাচার্য ভার্গবদের অধিপতি, সর্ববিদ্যাবিশারদ, সঞ্জীবনী বিদ্যার জ্ঞাতা এবং কবিদের প্রধান, তাই ভগবান এঁকে তাঁর স্বরূপ বলেছেন।[১]

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্॥ ৩৮

আমি দমনকর্তাদের দণ্ড (শক্তি), জয় লাভ ইচ্ছুকদের নীতি, গোপনীয় বিষয়সমূহের মধ্যে মৌন এবং জ্ঞানীদের তত্ত্বজ্ঞান আমিই॥ ৩৮

প্রশ্ন—দমনকারীদের দণ্ডকে নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—দণ্ড (দমন করার শক্তি), ধর্ম্যত্যাগ করে অধর্মে প্রবৃত্ত উচ্ছৃঙ্খল মানুষদের পাপাচার থেকে সরিয়ে সৎকর্মে প্রবৃত্ত করে। মানুষের মন ও ইন্দ্রিয়াদিও এই দমন-শক্তির দ্বারা বশীভূত হয়ে ভগবৎ প্রাপ্তিতে সহায়ক হতে পারে। দমন শক্তির প্রভাবে সমস্ত প্রাণী নিজ নিজ অধিকার পালন করে। তাই যেসব দেবতা, রাজা এবং শাসকগণ ন্যায়পূর্বক দমন (শাসন) করেন, তাঁদের সকলের সেই দমন শক্তিকে ভগবান তাঁর স্বরূপ বলেছেন।

প্রশ্ন—বিজয় আকাঙ্ক্ষাকারীদের নীতিকে নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'নীতি' শব্দটি এখানে ন্যায়ের বাচক। ন্যায়ের দ্বারাই মানুষের যথার্থ বিজয় হয়। যে রাজ্যে নীতি থাকে না, অনীতির প্রচলন হতে থাকে, সে রাজ্য শীঘ্রই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অতএব নীতি অর্থাৎ ন্যায় হল বিজয়ের প্রধান উপায়। তাই জয় লাভে ইচ্ছুকদের নীতিকে ভগবান নিজের স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

প্রশ্ন—মৌনকে নিজ স্বরূপ বলার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—গুপ্ত রাখার যোগ্য যত মনোভাব, তা মৌন দ্বারা (কথা না বললে)ই গুপ্ত রাখা সম্ভব। কথা বন্ধ না করলে তা গুপ্ত রাখা কঠিন। এইরূপ গোপনীয় ভাবের রক্ষক হিসাবে মৌনর প্রাধান্য হওয়ায় মৌনকে ভগবান তাঁর স্বরূপ বলেছেন।

প্রশ্ন—এখানে 'জ্ঞানবতাম্' পদ কোন্ জ্ঞানীদের বাচক ? তাঁদের জ্ঞানকে নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'জ্ঞানবতাম্' পদ পরব্রহ্ম পরমাত্মার স্বরূপের সাক্ষাৎকারী প্রকৃত জ্ঞানীদের বাচক। তাঁদের জ্ঞানই সর্বোত্তম জ্ঞান। তাই তাকে ভগবান পরমাত্মার স্বরূপ বলেছেন। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের সতেরোতম শ্লোকেও ভগবান নিজেকে জ্ঞানস্বরূপ বলেছেন।

যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥ ৩৯

---

[১] মহর্ষি ভৃগুর চ্যবনাদি সাত পুত্রের মধ্যে শুক্র (শুক্রাচার্য) প্রধান। ইনি ভগবান শংকরের আরাধনা করে সঞ্জীবনী বিদ্যা এবং জরামরণরহিত বজ্রের ন্যায় দৃঢ় শরীর লাভ করেছিলেন। ভগবান শংকরের প্রসাদে যোগবিদ্যায় নিপুণ হয়ে ইনি যোগাচার্য পদবী লাভ করেন। ইনি দৈত্যদের পুরোহিত। 'কাব্য' 'কবি' এবং 'উশনা' এঁর অন্য নাম। পিতৃগণের মানসী কন্যা গোকে ইনি বিবাহ করেন। এঁর শণ্ড ও অমর্ক নামে দুই পুত্র, যাঁরা প্রহ্লাদের গুরু ছিলেন। বহু অতিশয় গুহ্য ও দুর্লভ মন্ত্রের ইনি জ্ঞাতা, বহু বিদ্যায় পারদর্শী, মহা বুদ্ধিমান ও পরম নীতিনিপুণ। এঁর 'শুক্রনীতি' সুপ্রসিদ্ধ। বৃহস্পতিপুত্র কচ এঁর কাছ থেকে সঞ্জীবনী বিদ্যা শেখেন। মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, বায়ুপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ ও স্কন্দপুরাণাদিতে এঁর অত্যন্ত বিচিত্র এবং শিক্ষাপ্রদ গাথা রয়েছে।

হে অর্জুন! সকল ভূতপ্রাণীর উৎপত্তির কারণ আমিই ; কারণ স্থাবর-জঙ্গম এমন কোনো প্রাণী নেই যা আমাকে ছাড়া অস্তিত্বলাভ করতে পারে॥ ৩৯

প্রশ্ন—সমগ্র চরাচরের প্রাণীদের বীজ কী ? সেগুলিকে নিজ স্বরূপ বলার কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—ভগবানই সমস্ত চরাচরের ভূতপ্রাণীদের পরম আধার এবং তাঁর থেকেই সকলের উৎপত্তি হয়। অতএব তিনিই সকলের বীজ বা মহাকারণ। তাই সপ্তম অধ্যায়ের দশম শ্লোকে তাঁকে সর্বভূতের 'সনাতন বীজ' এবং নবম অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে 'অবিনাশী বীজ' বলা হয়েছে। তাই ভগবান এখানে তাকে নিজের স্বরূপ বলেছেন।

প্রশ্ন—চরাচরে এমন কোনো প্রাণী নেই, যা আমা হতে রহিত—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান তাঁর সর্বব্যাপকতা এবং সর্বরূপতা দেখিয়েছেন। অভিপ্রায় হল যে, চরাচরে যত প্রাণী আছে তাদের সবার মধ্যে আমি ব্যাপ্ত, কোনো প্রাণীই আমা বিনা নয়। অতএব সমস্ত প্রাণীকে আমার স্বরূপ মনে করে এবং আমি তাদের মধ্যে ব্যাপ্ত মনে করে যেখানে তোমার মন যায়, সেখানেই তুমি আমাকে চিন্তা করতে থাকো। এইভাবে অর্জুনের প্রশ্নের 'কী কী ভাবে আপনাকে চিন্তা করা উচিত (১০।১৭)?'—উত্তরও এর দ্বারা দেওয়া হয়েছে।

সম্বন্ধ—উনিশতম শ্লোকে ভগবান তাঁর দিব্য বিভূতিসমূহ অনন্ত জানিয়ে প্রধানতঃ সেগুলি বর্ণনা করার কথা জানিয়েছিলেন, সেই অনুযায়ী কুড়ি থেকে উনচল্লিশতম শ্লোক পর্যন্ত তার বর্ণনা করেন। এবার পুনরায় নিজ বিভূতিসমূহের অনন্ততা জানিয়ে তার উপসংহার করছেন—

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া॥ ৪০

হে পরন্তপ! আমার দিব্যবিভূতির অন্ত নেই। আমি তোমার জন্য এই সব বিভূতি সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম॥ ৪০

প্রশ্ন—আমার দিব্য বিভূতির অন্ত নেই, এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথায় ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, আমার সাধারণ বিভূতির কথা কী, দিব্য বিভূতি যেগুলি আছে, তারই কোনো সীমা নেই। যেমন জল ও পৃথিবীর পরমাণুগুলি গণনা করা সম্ভব নয়, তেমনই আমার বিভূতিগুলিও গণনা করা সম্ভব নয়। এগুলি এত যে তা কেউ জানতে পারে না এবং বর্ণনা করতেও সক্ষম নয়। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আমার অনন্ত বিভূতি বিরাজমান, কারও পক্ষে তার অন্ত পাওয়া সম্ভব নয়।

প্রশ্ন—এই বিভূতির বিস্তার আমি সংক্ষেপে বলেছি, এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথার দ্বারা ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, আমি আমার দিব্য বিভূতির যে বর্ণনা তোমার কাছে করেছি, তা দিব্য বিভূতিগুলির অংশমাত্রর বর্ণনা, এর পূর্ণ বর্ণনা করা অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং এই বর্ণনার আমি এখানেই উপসংহার করছি।

সম্বন্ধ—অষ্টাদশ শ্লোকে অর্জুন ভগবানের কাছে তাঁর বিভূতি ও যোগশক্তি বর্ণনা করার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, সেই অনুসারে ভগবান তাঁর দিব্য বিভূতিসমূহের বর্ণনা সমাপ্ত করে এবার সংক্ষেপে নিজ যোগ শক্তির বর্ণনা করছেন—

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥ ৪১

যা যা বিভূতি (ঐশ্বর্য)যুক্ত, শ্রীসম্পন্ন ও শক্তিযুক্ত বস্তু, সেসবই তুমি আমার শক্তির এক অংশ থেকে

অভিব্যক্ত বলে জানবে ॥ ৪১

প্রশ্ন—'**যৎ**' '**যৎ**' এবং '**বিভূতিমৎ**', '**শ্রীমৎ**' এবং '**উর্জিতম্**' বিশেষণের সঙ্গে '**সত্ত্বম্**' পদ কীসের বাচক এবং সেগুলিকে ভগবানের তেজের এক অংশের অভিব্যক্তি বলে জানা কী ?

উত্তর—যে প্রাণী বা জড় বস্তু ঐশ্বর্যসম্পন্ন, শোভা ও কান্তি ইত্যাদি গুণে সমৃদ্ধ এবং বল, তেজ, পরাক্রম বা অন্য কোনো প্রকার বৈশিষ্টপূর্ণ—সেই সবের বাচক এখানে উপরোক্ত বিশেষণসহ '**সত্ত্বম্**' পদটি এবং যাতে উপরোক্ত ঐশ্বর্য, শোভা, শক্তি, বল এবং তেজ ইত্যাদি সমগ্ররূপে বা তার মধ্যে কোনো একটিও প্রতীয়মান হয়, সেই প্রত্যেক প্রাণী বা বস্তুকে ভগবানের তেজের অংশ মনে করাই হল তাকে ভগবানের তেজের অংশের অভিব্যক্তি বলে জানা।

অভিপ্রায় হল যে, যেমন বিদ্যুতের শক্তি দ্বারা কোথাও আলোকিত হয়, কোথাও পাখা ঘোরে, কোথাও জল নিষ্কাশিত হয়, কোথাও রেডিওতে দূর-দূরান্তরের গান শোনা যায়—তেমনই বিভিন্ন স্থানে আরও বিভিন্ন প্রকার কাজ হয়ে থাকে, কিন্তু একথা ঠিক যে, যেখানেই এইসব কার্য হয় তা সেই বিদ্যুতের প্রভাবেই কাজ করে, প্রকৃতপক্ষে তা বিদ্যুতের অংশেরই অভিব্যক্তি। তেমনই যে প্রাণী ও বস্তুতে যে কোনো রকমের বিশেষত্ব নজরে আসে, তা ভগবানের প্রভাবেরই অংশের অভিব্যক্তি বলে জানতে হবে।

সম্বন্ধ—এইরূপ প্রধান প্রধান বস্তুসমূহে নিজ যোগশক্তিরূপ তেজের আংশিক অভিব্যক্তির কথা জানিয়ে, ভগবান এবার বলছেন যে, সমস্ত জগৎ আমার যোগশক্তির এক অংশের দ্বারাই ধারণ করা হয়েছে।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ ৪২

অথবা হে অর্জুন ! তোমার এত বিস্তারিত ভাবে জানার প্রয়োজন কী ? আমি এই সমস্ত জগৎ নিজ যোগশক্তির একাংশ মাত্র দ্বারা ধারণ করে আছি ॥ ৪২

প্রশ্ন—এখানে '**অথবা**' শব্দটি প্রয়োগের কী ভাবার্থ ?

উত্তর—'**অথবা**' শব্দটি পক্ষান্তরের বোধক। কুড়িতম থেকে উনচল্লিশতম শ্লোক পর্যন্ত ভগবান তাঁর প্রধান প্রধান বিভূতিগুলির বর্ণনা করেছেন এবং একচল্লিশতম শ্লোকে নিজ তেজের (প্রভাবের) অভিব্যক্তির স্থানের কথা জানিয়ে যে বিষয় বুঝিয়েছেন, তার থেকেও ভিন্ন নিজের বিশেষ প্রভাবের কথা এখানে জানাচ্ছেন—এই ভাবার্থে এখানে '**অথবা**' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—এত বিস্তারিত জানার তোমার কী প্রয়োজন ? এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথাটির দ্বারা ভগবানের এই তাৎপর্য যে, তুমি জিজ্ঞাসা করায় আমি প্রধান প্রধান বিভূতিগুলি তো বর্ণনা করেছি, কিন্তু এটা জানাই যথেষ্ট নয়। আসল কথা, যা আমি এখন তোমাকে বলছি, এটি তুমি ভালোভাবে বুঝে নাও। তারপর সব কিছু তুমি আপনা-আপনিই বুঝে যাবে। তোমার আর কিছু জানার বাকি থাকবে না।

প্রশ্ন—'**ইদম্**' ও '**কৃৎস্নম্**' বিশেষণগুলির সঙ্গে '**জগৎ**' পদ কীসের বাচক ? এবং তাকে ভগবানের যোগ-শক্তির এক অংশ দ্বারা ধারণ করা আছে বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে '**ইদম্**' এবং '**কৃৎস্নম্**' বিশেষণ-গুলির সঙ্গে '**জগৎ**' পদ মন, ইন্দ্রিয় এবং শরীরসহ জগতের সমস্ত প্রাণী ও ভোগসামগ্রী, ভোগস্থান ও সমগ্র লোকসহ ব্রহ্মাণ্ডের বাচক। এই ব্রহ্মাণ্ড ভগবানের কোনো এক অংশে তাঁরই যোগশক্তির দ্বারা ধারণ করা আছে। এই ভাবার্থে ভগবান এই জগতের সমস্ত বিস্তারকে নিজ যোগশক্তির এক অংশ দ্বারা ধারণ করে আছেন বলে জানিয়েছেন।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে বিভূতিযোগ নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

———o———

ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ

একাদশ অধ্যায়

(বিশ্বরূপদর্শনযোগ)

অধ্যায়ের নাম — এই অধ্যায়ে অর্জুনের প্রার্থনায় ভগবান তাঁকে নিজ বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছেন। অধ্যায়ের অধিকাংশ স্থানে শুধু বিশ্বরূপ এবং তার স্তুতিরই প্রকরণ আছে, তাই অধ্যায়ের নাম রাখা হয়েছে **'বিশ্বরূপদর্শনযোগ'**।

সংক্ষিপ্ত অধ্যায়-সার — এই অধ্যায়ের প্রথম থেকে চতুর্থ শ্লোক পর্যন্ত অর্জুন ভগবানের এবং তাঁর উপদেশের প্রশংসা করে বিশ্বরূপ দর্শন করাবার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন। পঞ্চম থেকে অষ্টম পর্যন্ত ভগবান তাঁর মধ্যে দেবতা, মানুষ, পশু, পক্ষী, ইত্যাদি চরাচরের সমস্ত প্রাণী এবং বহু আশ্চর্যপ্রদ দৃশ্যসহ সমগ্র জগৎ দেখার নির্দেশ দিয়ে শেষে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করার কথা বলেছেন। নবমে সঞ্জয় ভগবানের অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাবার কথা বলে, দশম থেকে ত্রয়োদশ পর্যন্ত অর্জুনকে কেমন রূপ দেখিয়েছেন— তা বর্ণনা করেছেন। চতুর্দশে সেই রূপ দেখে অর্জুনের বিস্মিত হবার ও হর্ষান্বিত হয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণাম করার কথা বলেছেন। তারপর পঞ্চদশ থেকে একত্রিশ পর্যন্ত অর্জুন বিশ্বরূপের স্তব, তার প্রভাবের বর্ণনা এবং তাতে দেখানো দৃশ্যসমূহের বর্ণনা করে শেষে ভগবানকে তাঁর প্রকৃত পরিচয় জানাবার জন্য প্রার্থনা করেছেন। বত্রিশ থেকে চৌত্রিশ শ্লোক পর্যন্ত ভগবান নিজেকে লোকাদির বিনাশকারী 'কাল' এবং ভীষ্ম-দ্রোণাদি সমস্ত বীরকে প্রথমেই তিনি বধ করেছেন জানিয়ে অর্জুনকে উৎসাহ প্রদান করে তাঁকে নিমিত্তমাত্র হয়ে যুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছেন। তারপর পঁয়ত্রিশতমতে ভগবানের বচন শুনে আশ্চর্য ও ভীত-সন্ত্রস্ত অর্জুনের বলার প্রকার জানিয়ে ছত্রিশ থেকে ছেচল্লিশ শ্লোক পর্যন্ত অর্জুন দ্বারা ভগবানের স্তুতি, তাঁকে প্রণাম, তাঁর কাছে ক্ষমা-প্রার্থনা এবং দিব্য চতুর্ভুজরূপ দর্শন করানোর জন্য প্রার্থনা করার বর্ণনা আছে। সাতচল্লিশ এবং আটচল্লিশ শ্লোকে ভগবান তাঁর বিশ্বরূপের মহিমা ও তাঁর দর্শনের দুর্লভতার কথা বলে ঊনপঞ্চাশতম শ্লোকে অর্জুনকে আশ্বস্ত করে চতুর্ভুজরূপ দর্শন করার আদেশ দিয়েছেন। পঞ্চাশতমতে সঞ্জয় চতুর্ভুজরূপ দর্শনের পর পুনরায় ভগবানের মনুষ্যরূপের বর্ণনা করেছেন। একান্নতমতে অর্জুন ভগবানের সৌম্য মানবরূপ দর্শন করে সচেতন ও প্রকৃতিস্থ হওয়ার কথা বলেছেন। তারপর বাহান্ন ও তিপ্পান্নতম শ্লোকে ভগবান তাঁর চতুর্ভুজরূপ দর্শন দুর্লভ জানিয়ে চুয়ান্নতমতে অনন্য ভক্তির সাহায্যে এই রূপ দর্শন, জ্ঞানলাভ এবং তাঁকে পাওয়া সহজ বলে জানিয়েছেন। অতঃপর পঞ্চান্নতমতে অনন্যভক্তির স্বরূপ ও তার ফল জানিয়ে অধ্যায়ের উপসংহার করেছেন।

সম্বন্ধ—দশম অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোক পর্যন্ত ভগবান তাঁর বিভূতি ও যোগশক্তি এবং তা জানার মাহাত্ম্য সংক্ষেপে বর্ণনা করে একাদশ শ্লোক পর্যন্ত ভক্তিযোগ এবং তার ফল নিরূপণ করেছেন। এর ফলে দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ শ্লোক পর্যন্ত অর্জুন ভগবানের স্তুতি করে তাঁর কাছে দিব্য বিভূতি এবং যোগশক্তির বিস্তৃত বর্ণনা করার প্রার্থনা জানিয়েছেন। ভগবান তখন চল্লিশতম শ্লোক পর্যন্ত তাঁর বিভূতি বর্ণনা সমাপ্ত করে শেষে যোগশক্তির প্রভাব জানিয়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর একাংশে ধারণ করা আছে বলে অধ্যায় শেষ করেছেন। এই প্রসঙ্গ শুনে অর্জুনের মনে সেই মহান স্বরূপকে (যার এক অংশে সমগ্র জগৎ স্থিত) প্রত্যক্ষ দেখার বাসনা জাগ্রত হয়। তাই এই একাদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে প্রথম চারটি শ্লোকে ভগবানের এবং তাঁর উপদেশের প্রশংসা করে অর্জুন তাঁর কাছে বিশ্বরূপ দেখাবার জন্য প্রার্থনা করছেন—

অর্জুন উবাচ

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যৎ ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম॥ ১

অর্জুন বললেন—হে প্রভু ! আমার ওপর অনুগ্রহ করে আপনি যে পরম গুহ্য অধ্যাত্মতত্ত্ব জানালেন, তাতে আমার মোহ বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে ॥ ১

প্রশ্ন—'**মদনুগ্রহায়**' পদ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—দশম অধ্যায়ের প্রারম্ভে প্রেম সাগর ভগবান বলেছিলেন, 'অর্জুন ! আমার প্রতি তোমার অত্যন্ত প্রেম রয়েছে, তাই আমি তোমার হিতার্থে এই সব বলছি'। এই কথা বলে ভগবান নিজের যে অলৌকিক প্রভাব শুনিয়েছেন, তা শুনে অর্জুনের হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা, সুখ এবং প্রেমের তরঙ্গ উচ্ছলিত হয়ে ওঠে। তিনি ভাবলেন—'আহা ! এই সর্বলোক মহেশ্বর ভগবানের আমার মতো তুচ্ছ মানুষের প্রতি কত কৃপা ! ইনি আমার মতো ক্ষুদ্রকে নিজের প্রেমিক বলে মেনে নিয়েছেন আর আমার কাছে তাঁর মহত্ত্বের কত গোপনীয় বিষয় খোলাখুলি বলেছেন।' এবার অর্জুনের মহর্ষিদের বলা কথা স্মরণ হওয়ায় তিনি পরম বিশ্বাসের সঙ্গে ভগবানের গুণগান করে পুনরায় যোগশক্তি ও বিভূতিসমূহ বিস্তারিতভাবে বলার জন্য প্রেমভরে প্রার্থনা জানালেন—ভগবান তাঁর প্রার্থনা শুনে নিজ বিভূতি এবং যোগসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। অর্জুনের হৃদয়ে ভগবৎকৃপার ছাপ পড়ে গেল। তিনি ভগবৎকৃপার অভূতপূর্ব দর্শন পেয়ে আনন্দে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

যতক্ষণ সাধকের নিজ পুরুষার্থ, সাধন বা নিজের যোগ্যতার যৎকিঞ্চিৎও ভরসা থাকে, ততক্ষণ তিনি ভগবৎকৃপার পরমলাভ থেকে যেন বঞ্চিত থাকেন এবং ভগবৎকৃপার প্রভাবে তিনি সহজেই সাধনের উচ্চস্তরে উন্নীত হতে সফল হন না। কিন্তু যখন ভগবৎকৃপাতেই তাঁর ভগবৎকৃপা লাভের বোধ হয় এবং তিনি প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুভব করেন যে, যা কিছু হচ্ছে, সব ভগবানের অনুগ্রহেই হচ্ছে, তখন তাঁর হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে এবং স্বতঃই অন্তর থেকে বলে ওঠেন—'হে ভগবন্ ! আমি তো কোনো কিছুরই যোগ্য নই, আমি তো অনধিকারী। এসব আপনারই অনুগ্রহের লীলা।' এমনই কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে অর্জুন বলছেন—'ভগবন্ ! আপনি যেসব মহত্ত্ব ও প্রভাবের কথা শোনালেন, আমি তার যোগ্যপাত্র নই। আমাকে অনুগ্রহ করার জন্যই আপনি এই পরম গোপনীয় রহস্য আমাকে শোনালেন।' এটিই '**মদনুগ্রহায়**' পদ প্রয়োগের অভিপ্রায়।

প্রশ্ন— '**পরমম্**', '**গুহ্যম্**', '**অধ্যাত্ম-সংজ্ঞিতম্**'—এই তিনটি বিশেষণের সঙ্গে '**বচঃ**' পদ ভগবানের কোন্ উপদেশের সূচক এবং এই বিশেষণগুলির ভাবার্থ কী ?

উত্তর— দশম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ভগবান যে পরম বাক্য পুনরায় বলার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এবং সেই প্রতিজ্ঞা অনুসারে একাদশ শ্লোক পর্যন্ত ভগবানের যে উপদেশ এবং তারপর অর্জুনের জিজ্ঞাসায় পুনরায় কুড়ি থেকে বিয়াল্লিশতম শ্লোক পর্যন্ত তিনি যেসব বিভূতি ও যোগশক্তির পরিচয় জানিয়েছেন এবং সপ্তম থেকে নবম অধ্যায় পর্যন্ত বিজ্ঞানসহ জ্ঞান জানাবার প্রতিজ্ঞা করে তাঁর গুণ, প্রভাব, ঐশ্বর্য ও স্বরূপের যে তত্ত্ব ও রহস্য বুঝিয়েছেন— সেই সব উপদেশের বাচক হল এই '**পরমম্**', '**গুহ্যম্**' ও '**অধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্**'— এই তিনটি বিশেষণের সঙ্গে '**বচঃ**' পদটি।

যেসব প্রকরণে ভগবান তাঁর গুণ, প্রভাব ও তত্ত্ব নিরূপণ করে অর্জুনকে তাঁর শরণে আসার জন্য প্রেরণা দিয়েছেন এবং স্পষ্টভাবে বলেছেন যে 'আমি শ্রীকৃষ্ণ, যে তোমার সামনে বিরাজমান, সে-ই আমিই সমস্ত জগতের হর্তা-কর্তা, নির্গুণ-সগুণ, নিরাকার-সাকার, মায়াতীত, সর্বশক্তিমান, সর্বাধার, পরমেশ্বর।' ঐ সব প্রকরণকে ভগবান স্বয়ং 'পরম গুহ্য' বলেছেন। তাই এখানে সেই বিশেষণগুলির প্রয়োগ করে অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে, আপনার এই উপদেশ অবশ্যই পরম গোপনীয়।

প্রশ্ন—এখানে '**অয়ম্**' বিশেষণের সঙ্গে '**মোহঃ**' পদটি অর্জুনের কোন্ মোহের বাচক এবং উপরোক্ত

উপদেশের সাহায্যে তার বিনাশ হওয়া কী ?

উত্তর— অর্জুন যে ভগবানের গুণ, প্রভাব, ঐশ্বর্য, রহস্য, স্বরূপকে পূর্ণরূপে জানতেন না—এ ছিল তাঁর মোহ। এখন উপরোক্ত উপদেশের দ্বারা তিনি ভগবানের গুণ, প্রভাব, ঐশ্বর্য, রহস্য ও স্বরূপকে যে কিছুটা অনুধাবন করতে পেরে এটা জানতে পেরেছেন যে শ্রীকৃষ্ণই সাক্ষাৎ পরমেশ্বর— এই হল তাঁর মোহ বিনাশপ্রাপ্ত হওয়া।

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্॥ ২

কারণ হে কমললোচন ! আমি আপনার কাছে ভূত (প্রাণী)গণের উৎপত্তি ও প্রলয় সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে শুনেছি এবং আপনার অক্ষয় মাহাত্ম্যও শুনেছি ॥ ২

প্রশ্ন—আমি আপনার কাছে ভূতাদির উৎপত্তি ও প্রলয় বিস্তারিতভাবে শুনেছি, এই কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এই বাক্যে অর্জুনের অভিপ্রায় হল, আপনার থেকেই সমস্ত জগতের প্রাণীদের উৎপত্তি হয়, আপনিই তাদের পালন করেন এবং আপনাতেই এরা লীন হয়—একথা আমি আপনার কাছ থেকে (সপ্তম অধ্যায় থেকে দশম অধ্যায় পর্যন্ত) বিস্তারিতভাবে বারংবার শুনেছি।

প্রশ্ন— আপনার অবিনাশী মহিমাও শুনেছি, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা অর্জুনের এই ভাব প্রকাশ পেয়েছে যে, আমি যে কেবল ভূতাদির উৎপত্তি ও প্রলয়ের কথাই শুনেছি, তা নয় ; আপনার যে অবিনাশী মহিমা অর্থাৎ আপনি সমস্ত বিশ্বের সৃজন, পালন ও সংহারাদি করেও প্রকৃতপক্ষে অকর্তা, সকলকে নিয়ন্ত্রণ করেও উদাসীন, সর্বব্যাপী হয়েও ঐসব বস্তুসমূহের গুণ-দোষ থেকে সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত, শুভাশুভ কর্মের সুখ-দুঃখরূপ ফলদান করেও নির্দয়তা ও বৈষম্যদোষরহিত, প্রকৃতি, কাল ও সমস্ত লোকপালরূপে প্রকটিত হয়েও সকলের নিয়ন্ত্রণকারী সর্বশক্তিমান ভগবান—এই প্রকার মাহাত্ম্য ও ঐসকল প্রকরণে বারংবার শুনেছি।

এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম॥ ৩

হে পরমেশ্বর ! আপনি যে আত্মতত্ত্ব বলেছেন, তা ঠিকই ; কিন্তু হে পুরুষোত্তম ! আমি আপনার জ্ঞান, ঐশ্বর্য, শক্তি, বল, বীর্য এবং তেজ-যুক্ত ঐশ্বরীয় বিশ্বরূপ দেখতে ইচ্ছা করি ॥ ৩

প্রশ্ন—'পরমেশ্বর' এবং 'পুরুষোত্তম'— এই দুটি সম্বোধনের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'পরমেশ্বর' সম্বোধন দ্বারা অর্জুনের অভিপ্রায় এই যে, আপনি ঈশ্বরেরও মহান ঈশ্বর এবং সর্বসমর্থ ; অতএব আমি আপনার যে ঐশ্বরীয়স্বরূপ দর্শন করতে চাই, তা সহজেই আপনি দর্শন করাতে পারেন। 'পুরুষোত্তম' সম্বোধনের তাৎপর্য এই যে, আপনি ক্ষর ও অক্ষর দুইয়ের থেকেই উত্তম, সাক্ষাৎ (পরমেশ্বর) ভগবান। সুতরাং আমার ওপর দয়া করে আমার ইচ্ছা পূর্ণ করুন।

প্রশ্ন—আপনি নিজেকে যেমন বলেন, তা ঠিক ঐরূপই (যথার্থ)— এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—অর্জুনের এই কথার তাৎপর্য এই যে ; আপনি আপনার গুণ, প্রভাব, তত্ত্ব এবং ঐশ্বর্য বর্ণনা করে নিজের বিষয়ে যা কিছু বলেছেন—তা পূর্ণরূপে সঠিক, তাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন—'ঐশ্বরম্' বিশেষণের সঙ্গে 'রূপম্' পদ কোন্ রূপের বাচক এবং তাকে দেখতে চাই—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—অসীম ও অনন্ত জ্ঞান, শক্তি, বল, বীর্য, তেজ ইত্যাদি ঐশ্বরীয় গুণ এবং প্রভাব যাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখা যায় এবং সমগ্র বিশ্ব যাঁর একাংশে অবস্থিত, একরূপ রূপের বাচক এখানে '**ঐশ্বরম্**' বিশেষণের সঙ্গে '**রূপম্**' পদটি। 'তাকে আমি দেখতে ইচ্ছা করি' এই কথার দ্বারা অর্জুনের এই অভিপ্রায় যে, ঐরকম অদ্ভুত রূপ আমি পূর্বে কখনো দেখিনি ; আপনার মুখে তাঁর বর্ণনা শুনে (১০।৪২) তাঁকে দেখার জন্য আমার মনে অত্যুগ্র ইচ্ছা উৎপন্ন হয়েছে, আমি মনে করি সেই রূপ দর্শন করে আমি কৃতকৃতার্থ হব।

প্রশ্ন—অর্জুনের যদি ভগবানের কথায় পূর্ণ বিশ্বাস, কোনো প্রকার সন্দেহ না থাকে, তাহলে তিনি রূপ দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন কেন ?

উত্তর—যেমন কোনো সত্যবাদী ব্যক্তির কাছে পরশমণি, চিন্তামণি বা অন্য কোনো অনুপম বস্তু থাকলে এবং তিনি তা জানালে, যারা তা শোনে তারা তা পূর্ণভাবে বিশ্বাস করে যে এঁর কাছে সেই বস্তু আছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবুও যদি তারা সেই অনুপম বস্তু পূর্বে কখনো দেখে না থাকলে এবং তাদের মনে সেটি দেখার প্রবল ইচ্ছা হলে সেটি তারা যদি প্রকাশ করে তাহলে তাতে বিশ্বাস কম হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। তেমনই ভগবানের সেই অলৌকিক স্বরূপ অর্জুন কখনো আগে না দেখায়, তাঁর মনে সেটি দর্শন করার ইচ্ছা জাগ্রত হয় এবং তিনি তা প্রকাশ করায়, তাঁর বিশ্বাস কম ছিল— একথা গ্রহণযোগ্য নয়। বরং বিশ্বাস করেছিলেন বলেই দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্॥ ৪

হে প্রভো ! আমাকে যদি সেই বিশ্বরূপ দেখার যোগ্য মনে করেন—তাহলে হে যোগেশ্বর ! আমাকে আপনার সেই অবিনাশী স্বরূপের দর্শন করান ॥ ৪

প্রশ্ন—'**প্রভো**' এবং '**যোগেশ্বর**'—এই দুটি সম্বোধনের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'**প্রভো**' সম্বোধনের দ্বারা অর্জুনের এই অভিপ্রায় যে, আপনি সকলের উৎপত্তি, স্থিতি, প্রলয় এবং অন্তর্যামীরূপে শাসনকারী হওয়ায় সর্বসমর্থ। তাই আমি যদি আপনার ঐরূপ দর্শনের সুযোগ্য অধিকারী না হই, তবে আপনি কৃপাপূর্বক আপনার সামর্থ্য দ্বারা আমাকে সুযোগ্য অধিকারী করতে সক্ষম। 'যোগেশ্বর' বিশেষণের এই ভাবার্থ যে আপনি সমস্ত যোগের প্রভু। অতএব আপনি চাইলে অনায়াসেই আমাকে আপনার সেই রূপ দেখাতে পারেন। সাধারণ যোগীও যখন নানাভাবে নিজের ঐশ্বর্য দেখাতে পারেন, তখন আপনার আর কী কথা ?

প্রশ্ন— 'যদি আমার দ্বারা আপনার সেই রূপ দেখা সম্ভব বলে মনে করেন, তবে তা আমাকে দেখান' —এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথায় অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে, আপনার শ্রীমুখ থেকে আপনার যে প্রভাবের কথা আমি শুনেছি, তা যে সেইরূপই, এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আর একথাও ঠিক যে আপনি যদি সেই স্বরূপ দর্শন আমাকে না করান তাহলে একথা প্রমাণিত হবে না যে আপনার মতো যোগেশ্বরের সেই রূপ দেখবার সামর্থ্য নেই এবং আমার বিশ্বাসও তাতে বিন্দুমাত্র কম হবে না। তবু এটি ঠিক যে, আপনার সেই রূপ দর্শন করার জন্যে আমার মনে প্রবল আগ্রহ হচ্ছে। আপনি তো অন্তর্যামী— বুঝে দেখুন, আমার এই আগ্রহ প্রবল এবং সত্য কিনা। যদি আমার এই আগ্রহ আপনার নিকট সত্য বলে মনে হয়, তাহলে হে প্রভো ! আমি সেই স্বরূপ দর্শনের অবশ্যই অধিকারী। কারণ আপনি বাঞ্ছাকল্পতরু, মনের ইচ্ছা বিচার করেন, অন্য যোগ্যতা দেখেন না। সুতরাং যদি উচিত মনে করেন, তাহলে কৃপা করে আপনার সেই স্বরূপ আমাকে দর্শন করান।

সম্বন্ধ—পরম শ্রদ্ধাযুক্ত ও পরম প্রেমিক অর্জুনের এই প্রার্থনায় তিনটি শ্লোকে ভগবান তাঁর বিশ্বরূপ বর্ণনা করে অর্জুনকে তা দর্শন করার নির্দেশ দিচ্ছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ॥ ৫

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে পার্থ ! এবার তুমি আমার বহুবিধ এবং নানা বর্ণ ও নানা আকৃতিবিশিষ্ট শত শত এবং সহস্র সহস্র অলৌকিক রূপ দর্শন করো॥ ৫

প্রশ্ন—এখানে 'শতশঃ' এবং 'সহস্রশঃ' এই সংখ্যাবাচক দুটি পদ প্রয়োগ করার অর্থ কী ?

উত্তর—এই দুই পদ প্রয়োগ করে ভগবান তাঁর রূপের অসংখ্যতা প্রকট করেছেন। ভগবানের কথার অভিপ্রায় হল যে, আমার এই বিশ্বরূপে একই স্থানে তুমি অসংখ্য রূপ দর্শন করো।

প্রশ্ন—'**নানাবিধানি**' কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—'**নানাবিধানি**' পদ বহু ভিন্নতার বোধক। এটি প্রয়োগ করে ভগবান বিশ্বরূপে প্রদর্শিত রূপগুলির জাতিগত ভিন্নতার বহুত্ব প্রকট করেছেন—অর্থাৎ দেবতা, মানুষ এবং তির্যক্ ইত্যাদি সমস্ত বিশ্বের জীবেদের ভিন্নতা তাঁর মধ্যে দেখার জন্য বলেছেন।

প্রশ্ন—'**নানাবর্ণাকৃতীনি**' কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'বর্ণ' শব্দটি লাল, হলুদ, কালো ইত্যাদি বিভিন্ন রংয়ের এবং 'আকৃতি' শব্দটি অঙ্গের আয়তনের বাচক। যে রূপগুলির বর্ণ ও অঙ্গের গঠন ও আয়তন পৃথক পৃথক এবং নানা প্রকারের তাদের 'নানাবর্ণকৃতি' বলা হয়। তাদের জন্যই '**নানাবর্ণাকৃতীনি**' পদটি প্রয়োগ করা হয়েছে। সুতরাং এই পদ প্রয়োগ করে ভগবানের এই তাৎপর্য যে এই রূপগুলির বর্ণ ও তাদের অঙ্গের গঠনও নানা প্রকারের, এগুলি তুমি দেখো।

প্রশ্ন—'**দিব্যানি**' কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—অলৌকিক ও আশ্চর্যজনক বস্তুকে দিব্য বলা হয়। '**দিব্যানি**' পদ প্রয়োগ করে ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, আমার শরীরে প্রদর্শিত এই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অসংখ্য রূপ সবই দিব্য—আমার অদ্ভুত যোগশক্তির দ্বারা রচিত হওয়ায় অলৌকিক ও আশ্চর্যজনক।

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাশ্চর্যাণি ভারত॥ ৬

হে ভরতবংশীয় অর্জুন ! তুমি আমার মধ্যে দ্বাদশ আদিত্য (অদিতির পুত্র), অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও উনপঞ্চাশ মরুদ্গণ (বায়ু) দর্শন করো এবং আগে যা কখনো দেখোনি, তেমন বহু আশ্চর্যময় রূপ দর্শন করো॥ ৬

প্রশ্ন—আদিত্যাদি, বসুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনীকুমার-দ্বয় ও মরুদ্গণকে দেখার জন্য বলার তাৎপর্য কী ?

উত্তর—উপরোক্ত নামগুলি সব প্রধান প্রধান দেবতাদের বাচক। এঁদের নাম করে ভগবান সমস্ত দেবতাদের তাঁর বিরাটরূপের অন্তর্গত দেখার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে আদিত্য এবং মরুদ্গণের ব্যাখ্যা দশম অধ্যায়ের একুশতম শ্লোকে এবং বসু ও রুদ্রদের তেইশতম শ্লোকে করা হয়েছে। সেইজন্য এখানে তাদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়নি। অশ্বিনীকুমারেরা দুই ভাই দেব-বৈদ্য[১]।

[১]এঁদের দুজনকে সূর্য পত্নী 'সংজ্ঞা' থেকে উৎপন্ন বলে মানা হয় (বিষ্ণুপুরাণ ৩।২।৭, অগ্নিপুরাণ ২৭৩।৪)। কোথাও এঁদের কশ্যপের ঔরসপুত্র ও অদিতির গর্ভে উৎপন্ন (বাল্মীকি রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড ১৪।১৪), আবার কোথাও ব্রহ্মার কর্ণ

প্রশ্ন—'অদৃষ্টপূর্বাণি' এবং 'বহূনি' এই দুটি বিশেষণের সঙ্গে 'আশ্চর্যাণি' পদটির অর্থ কী এবং তাকে দেখতে বলার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—যে দৃশ্য আগে কখনো দেখা যায়নি, তাকে 'অদৃষ্টপূর্ব' বলা হয়। যা অদ্ভুত অর্থাৎ দেখলেই 'বিস্ময়' উৎপন্ন হয়, তাকে 'আশ্চর্য' (আশ্চর্যজনক দৃশ্য) বলা হয়। 'বহূনি' বিশেষণ অধিক সংখ্যার বাচক। এরূপ পূর্বে না দেখা বহু আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখার কথা বলায় ভগবানের এই তাৎপর্য যে, যে দৃশ্য তুমি বা অন্য কেউ আজ পর্যন্ত কখনো দেখোনি, সেই সবও তুমি আমার এই বিরাটরূপের অন্তর্গত দর্শন করো।

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি।। ৭

হে অর্জুন ! আমার এই বিরাট-শরীরের একস্থানে অবস্থিত চরাচর-সহ সমগ্র জগৎ অবলোকন করো এবং আরও যা কিছু তুমি দেখতে চাও, তা-ও দেখো ।। ৭

প্রশ্ন—'গুড়াকেশ' সম্বোধনের তাৎপর্য কী ?

উত্তর—অর্জুনকে এখানে 'গুড়াকেশ' নামে সম্বোধনে ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, তুমি নিদ্রার প্রভু, সুতরাং সাবধানে আমার রূপ যথাযথভাবে দেখো, যেন কোনোপ্রকার সংশয় ও ভ্রম না থাকে।

প্রশ্ন—'অদ্য' পদটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'অদ্য' এখানে 'এখন' শব্দের বাচক। এর দ্বারা ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, তুমি আমার যে রূপ দর্শন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছ, আমি তা দেখাতে একটুও বিলম্ব করছি না, তুমি আগ্রহ দেখাতেই আমি এখনই তা দেখাচ্ছি।

প্রশ্ন—'সচরাচরম্' ও 'কৃৎস্নম্' বিশেষণের সঙ্গে 'জগৎ' পদ কীসের বাচক ? 'ইহ' এবং 'একস্থম্' পদ প্রয়োগ করে ভগবান তাঁর কোন্ শরীরে এবং কোন্ স্থানে সমস্ত জগৎকে দেখতে বলেছেন ?

উত্তর—পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ও দেবতা-মানুষ ইত্যাদি চলা-ফেরা করা প্রাণীদের 'চর' বলা হয় ; এবং পাহাড়, বৃক্ষাদি একস্থানে স্থির থাকা বস্তুকে 'অচর' বলা হয়। এরূপ সমস্ত প্রাণী এবং তাদের শরীর ইন্দ্রিয়, ভোগস্থান এবং ভোগসামগ্রী-সহ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের বাচক হল এই 'কৃৎস্নম্' এবং 'সচরাচরম্' এই দুই বিশেষণের সঙ্গে 'জগৎ' পদটি।

'ইহ' পদ 'দেহে'র বিশেষণ। এর সঙ্গে 'একস্থম্' পদ প্রয়োগে ভগবান এই তাৎপর্য দেখিয়েছেন যে, আমার যে শরীর সারথীরূপে তোমার সামনে রথে আসীন, তুমি দেখো ! সেই শরীরের একাংশে সমগ্র জগৎ স্থিত রয়েছে। দশম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে যে বলেছিলেন, আমি আমার একাংশে এই সমগ্র জগৎ ধারণ করে আছি, সেই কথাটি তিনি এখানে অর্জুনকে প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়েছেন।

প্রশ্ন—তুমি আরও যা কিছু দেখতে চাও, তাও দেখো—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথার দ্বারা ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, এই বর্তমান সমস্ত জগৎ ছাড়াও আমার আরও গুণ, প্রভাব ইত্যাদির দ্যোতক কোনো দৃশ্য, নিজের ও অন্যের জয়-পরাজয়ের দৃশ্য অথবা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কোনো ঘটনাবলি দেখার যদি তোমার ইচ্ছা থাকে, সেসবও তুমি এখনই আমার শরীরের একাংশে প্রত্যক্ষরূপে দেখতে পারো।

হতে উৎপন্ন বলা হয়েছে (বায়ুপুরাণ ৬৫।৫৭)। কল্পভেদে সব বর্ণনাই সঠিক। এঁরা দধ্যঙ্মুনির কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করেছিলেন (ঋগ্বেদ ১।১৭।১১৬।১২ ; দেবী ভাগবত ৭।৩৬)। রাজা শর্যাতির কন্যা এবং চ্যবন মুনির পত্নী সুকন্যার ওপর প্রসন্ন হয়ে এঁরা বৃদ্ধ ও অন্ধ চ্যবনমুনিকে চক্ষু ও নবযৌবন প্রদান করেন (দেবীভাগবত ৭।৪,৫)। মহাভারত, পুরাণ ও রামায়ণে অনেক স্থানে এঁদের গাথা পাওয়া যায়।

সম্বন্ধ—এইভাবে তিনটি শ্লোকে বারংবার তাঁর অদ্ভুত রূপ দেখার নির্দেশ দিলেও যখন অর্জুন ভগবানের রূপ দেখতে সক্ষম হলেন না তখন না দেখার কারণ সম্বন্ধে অবহিত অন্তর্যামী ভগবান অর্জুনকে দিব্যদৃষ্টি প্রদানের ইচ্ছা পোষণ করে বললেন—

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥ ৮

কিন্তু আমাকে তুমি তোমার প্রাকৃত চক্ষুর দ্বারা দেখতে সমর্থ নও ; সেইজন্য আমি তোমাকে দিব্য অর্থাৎ অলৌকিক চক্ষু প্রদান করছি। তার সাহায্যে তুমি আমার ঈশ্বরীয় যোগশক্তি দর্শন করো॥ ৮

প্রশ্ন—এখানে 'তু' পদের সঙ্গে এই কথাটি বলার তাৎপর্য কী যে, তুমি আমাকে তোমার (সাধারণ) চক্ষু দ্বারা দেখতে সমর্থ নও ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, তুমি আমার যোগশক্তিযুক্ত দিব্যস্বরূপ দর্শন করতে চাও, এ অত্যন্ত আনন্দের কথা, আমিও তোমাকে আমার সেই রূপ দেখাতে প্রস্তুত। কিন্তু সখা ! এই সাধারণ চক্ষুর সাহায্যে আমার সেই অলৌকিক রূপ দেখা সম্ভব নয়, তা দেখার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, তা তোমার কাছে নেই।

প্রশ্ন—ভগবান অর্জুনকে যে দিব্য দৃষ্টি দিয়েছিলেন, সেই দিব্যদৃষ্টি কী ?

উত্তর—ভগবান অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য যোগবলে একপ্রকার যোগশক্তি প্রদান করেছিলেন, যার প্রভাবে অর্জুনের মধ্যে অলৌকিক সামর্থ্যের উদ্ভব হয়—সেই দিব্যরূপ দেখার যোগ্যতা লাভ হয়। সেই যোগশক্তির নাম দিব্যদৃষ্টি। এরূপ দিব্যদৃষ্টি মহর্ষি বেদব্যাসও সঞ্জয়কে প্রদান করেছিলেন।

প্রশ্ন—যদি মনে করা হয় যে, ভগবান অর্জুনকে এমন জ্ঞান দিয়েছিলেন, যাতে অর্জুন এই সমগ্র জগৎকে ভগবানের স্বরূপ মনে করতে থাকেন এবং সেই জ্ঞানের নামই এখানে দিব্যদৃষ্টি বলা হয়েছে, তাহলে ক্ষতি কী ?

উত্তর—এখানকার প্রসঙ্গ পড়ে এটা মানা সম্ভব নয় যে জ্ঞানের দ্বারা অর্জুনের এই দৃশ্য জগৎকে ভগবদ্রূপ বলে বুঝে নেওয়াই 'বিশ্বরূপদর্শন' ছিল এবং সেই জ্ঞানই ছিল দিব্যদৃষ্টি। দশম অধ্যায়ের শেষেই তো সমস্ত বিশ্বকে জ্ঞানের দ্বারা ভগবানের একাংশে দেখার জন্য অর্জুনকে বলা হয়েছিল এবং তিনি তা মেনেও নিয়েছিলেন। এভাবে মেনে নেওয়ার পরেও অর্জুন যখন ভগবানের কাছে তাঁর বল, বীর্য, শক্তি ও তেজযুক্ত ঈশ্বরীয় স্বরূপ প্রত্যক্ষরূপে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং ভগবানও তাঁর শ্রীকৃষ্ণরূপের মধ্যে একইস্থানে সমগ্র বিশ্বকে দেখিয়ে দেন, তখন এটা কী করে মানা সম্ভব যে সেটি জ্ঞানের সাহায্যে বোঝানো রূপ ?

তাছাড়া ভগবান যে বিশ্বরূপের বর্ণনা করেছেন, তার দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে অর্জুন ভগবানের যে রূপে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের দৃশ্য ও ভবিষ্যতে ঘটতে যাওয়া যুদ্ধ সম্বন্ধীয় ঘটনাবলি এবং তার পরিণাম দেখছিলেন, তা তাঁর সামনে প্রত্যক্ষ ছিল। তাতে মানতেই হয় যে, যে বিশ্বে অর্জুন নিজেকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন, সেই বিশ্ব ভগবানের শরীরে দেখতে পাওয়া বিশ্বের থেকে পৃথক। যদি তা না হত, তাহলে সেই বিরাটরূপের মধ্যে দৃশ্য জগতের স্বর্গলোক থেকে পৃথিবী পর্যন্ত আকাশ ও সর্বদিকসমূহ ব্যাপ্তরূপে দেখা সম্ভবই হত না। ভগবানের সেই ভয়ানক রূপ দেখে অর্জুন আশ্চর্য, মোহগ্রস্ত, ভীত, সন্তপ্ত এবং তাঁর দিকভ্রমও হয়েছিল ; এর দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে ভগবান শুধু উপদেশ দিয়ে জ্ঞানের দ্বারাই এই দৃশ্য-জগৎকে নিজ স্বরূপ বলে বুঝিয়েছিলেন, তা নয়। তা যদি হত, তাহলে অর্জুনের ভয়, সন্তাপ, মোহ এবং দিকভ্রম ইত্যাদি হওয়ার কোনো কারণ থাকত না।

প্রশ্ন—যদি এমন মানা হয়, যেমন আজকাল রেডিও ইত্যাদি যন্ত্রের সাহায্যে দূরের শব্দ শোনা বা দৃশ্য দেখা যায়, তেমনই ভগবান তাঁকে এমন কোনো যন্ত্র দিয়েছিলেন যাতে অর্জুন একস্থানে থেকে সমগ্র বিশ্বকে বিনাবাধায় দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং সেই যন্ত্রকেই দিব্যদৃষ্টি বলা হয়েছে, তাতে আপত্তি কীসের ?

উত্তর—রেডিও ইত্যাদি যন্ত্র দ্বারা এক কালে, এক স্থানে দূর দেশের সেই শব্দ এবং দৃশ্য শোনা বা দেখা যায়, যা একদেশীয় এবং বর্তমান সময়ে হয়। তার দ্বারা একই যন্ত্রে, একই কালে, একই স্থানে সব দেশের ঘটনাবলি দেখা বা শোনা যায় না। তার দ্বারা লোকেদের মনের কথা প্রত্যক্ষ দেখা যায় না বা ভবিষ্যতে ঘটতে যাওয়া দৃশ্যাবলিও প্রত্যক্ষ করা যায় না। তাছাড়া এখানের প্রসঙ্গে এমন কোনো কথা বলা হয়নি, যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে অর্জুন কোনো যন্ত্রের সাহায্যে ভগবানের বিশ্বরূপ দেখেছিলেন। সুতরাং তা মেনে নেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। অবশ্যই রেডিও ইত্যাদি যন্ত্র আবিষ্কার হওয়ায় যদি আজকালের অবিশ্বাসী মানুষকে কিছুটা বোঝানো যায় যে, যখন রেডিও ইত্যাদি ভৌতিক যন্ত্রের সাহায্যে দূর দেশের ঘটনাবলি দেখা-শোনা যায়, তখন ভগবান প্রদত্ত যোগশক্তি দ্বারা তাঁর বিশ্বরূপ দর্শন এমন আর বড় কথা কী ? অবশ্য এখানে মনে রাখা উচিত যে, এটি ভগবানের কোনো মায়াময় মনোযোগ নয়, যার প্রভাবে অর্জুন না ঘটা দৃশ্যাবলী স্বপ্নের ন্যায় দেখছিলেন। অর্জুন যে স্বরূপ প্রত্যক্ষ করছিলেন, তা প্রত্যক্ষ সত্য ছিল এবং তা দেখার একমাত্র উপায় ছিল—ভগবৎ কৃপায় পাওয়া যোগশক্তিরূপ দিব্য দৃষ্টি।

প্রশ্ন—**'ঐশ্বরম্'** বিশেষণের সঙ্গে **'যোগম্'** পদ কীসের বাচক এবং তা দেখতে বলার তাৎপর্য কী ?

উত্তর—অর্জুন যে রূপদর্শন করেছিলেন, তা ছিল দিব্যরূপ। ভগবান তাঁর অদ্ভুত যোগশক্তির সাহায্যেই তা প্রকটিত করে অর্জুনকে দেখিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর দেখার দ্বারা ভগবানের অদ্ভুত যোগশক্তির দর্শন স্বতঃই হয়ে যায়। তাই এখানে **'ঐশ্বরম্'** বিশেষণের সঙ্গে 'যোগম্' পদ ভগবানের অদ্ভুত যোগশক্তির সঙ্গে তার দ্বারা প্রকট হওয়া ভগবানের বিরাটস্বরূপের বাচক ; এবং সেটি দেখতে বলে ভগবান অর্জুনকে তাঁর বিরাটস্বরূপ দর্শনের মাধ্যমে যোগশক্তি দর্শন করতে বলেছেন।

সম্বন্ধ—অর্জুনকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করে ভগবান যে ভাবে তাঁর দিব্য বিরাটস্বরূপ দেখিয়েছেন, এবার পাঁচটি শ্লোকে সঞ্জয় তার বর্ণনা করছেন—

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্॥ ৯

সঞ্জয় বললেন—হে রাজন্ ! মহাযোগেশ্বর এবং সর্বপাপনাশকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলে অর্জুনকে তাঁর পরম ঐশ্বর্যযুক্ত দিব্যরূপ দেখালেন॥ ৯

প্রশ্ন—সঞ্জয়ের দ্বারা এখানে ভগবানের জন্য **'মহাযোগেশ্বরঃ'** এবং **'হরিঃ'** এই দুটি বিশেষণ প্রয়োগ করার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—যিনি মহান অর্থাৎ অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ যোগেশ্বর তাঁকে 'মহাযোগেশ্বর' এবং সর্বপাপ ও দুঃখহরণকারিকে 'হরি' বলা হয়। এই দুটি বিশেষণ প্রয়োগ করে সঞ্জয় ভগবানের অদ্ভুত শক্তি সামর্থ্যের দিকে লক্ষ্য করিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে সতর্ক করেছেন। তাঁর কথার তাৎপর্য হল যে শ্রীকৃষ্ণ কোনো সাধারণ মানুষ নন ; তিনি অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ যোগেশ্বর এবং সর্বদুঃখ ও পাপনাশকারী সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। অর্জুনকে তিনি যে দিব্য বিশ্বরূপ দেখিয়েছেন, যার বর্ণনা আমি আপনাকে এখন শোনাব, অনেক বড় বড় যোগীও তা দেখাতে পারেন না, একমাত্র পরমেশ্বর স্বয়ংই তা দেখাতে সক্ষম।

প্রশ্ন—**'রূপম্'**-এর সঙ্গে **'পরমম্'** এবং **'ঐশ্বরম্'** এই দুটি বিশেষণ প্রয়োগের তাৎপর্য কী ?

উত্তর—যে পদার্থ শুদ্ধ, শ্রেষ্ঠ এবং অলৌকিক, সেই বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক 'পরম' বিশেষণ পদটি এবং যাতে ঈশ্বরের গুণ, প্রভাব ও তেজ দেখা যায় এবং যা ঈশ্বরের দিব্য যোগশক্তিসম্পন্ন, তাকে 'ঐশ্বর' বলা হয়। ভগবান তাঁর যে বিরাটরূপ অর্জুনকে দেখিয়েছিলেন, তা অলৌকিক, দিব্য, সর্বশ্রেষ্ঠ ও তেজোময় ছিল, তা

সাধারণ জগতের ন্যায় পাঞ্চভৌতিক পদার্থে সৃষ্ট নয়। ভগবান তাঁর পরম প্রিয় ভক্ত অর্জুনকে অনুগ্রহ করে তাঁর অদ্ভুত প্রভাব বোঝানোর জন্য তাঁর অদ্ভুত যোগশক্তির সাহায্যে সেই রূপ প্রকট করে দেখিয়েছিলেন। এই মর্মার্থ জ্ঞাপনের জন্য সঞ্জয় 'রূপম্' শব্দের সঙ্গে এই দুটি বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন।

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্ ।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥ ১০
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্ ।
সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১

সেই বিশ্বরূপ অনেক মুখ ও নেত্রযুক্ত, অসংখ্য অদ্ভুত আকৃতি, বহু দিব্যভূষণ পরিহিত এবং বহু দিব্যঅস্ত্রে সজ্জিত, দিব্যমালা ও দিব্যবস্ত্রে ভূষিত, দিব্যগন্ধে লিপ্ত, সর্বাশ্চর্যযুক্ত, অনন্ত ও সর্বতোমুখ-বিশিষ্ট—সেই বিরাটরূপ পরমদেব পরমেশ্বরকে অর্জুন দর্শন করলেন ॥ ১০-১১

প্রশ্ন—'অনেকবক্ত্রনয়নম্' কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—যাঁর নানাপ্রকার অসংখ্য মুখ ও চক্ষু, সেই রূপকে **'অনেকবক্ত্রনয়ন'** বলা হয়। অর্জুন ভগবানের যে রূপ অবলোকন করেন, তার প্রধান দুই নেত্রকে চন্দ্র ও সূর্য বলা হয় (১১।১৯) ; কিন্তু বিরাট রূপের অন্তর্গত আরও অসংখ্য বিভিন্ন মুখ ও চক্ষু ছিল, তাই ভগবানকে অনেক মুখ ও নয়নযুক্ত বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—'অনেকাদ্ভুতদর্শনম্' কথার অর্থ কী ?

উত্তর—যে দৃশ্য আগে কখনো দেখা হয়নি, যার রূপ অদ্ভুত এবং আশ্চর্যজনক, তাকে 'অদ্ভুতদর্শন' বলা হয়। যে রূপে এরূপ অসংখ্য দর্শন থাকে, তাকে 'অনেকাদ্ভুতদর্শন' বলা হয়। ভগবানের সেই বিরাটরূপে অর্জুন এরূপ অসংখ্য অলৌকিক বিচিত্র দৃশ্য দেখেছিলেন, তাইজন্য এখানে এই বিশেষণ দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন—'অনেকদিব্যাভরণম্' কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—গহনাকে আভরণ বলে। যে গহনা লৌকিক গহনার থেকে বিশিষ্ট, তেজোময় এবং অলৌকিক, তাকে 'দিব্য' বলা হয়। যে রূপ এরূপ অসংখ্য দিব্য আভরণে বিভূষিত, তাকে 'অনেকদিব্যাভরণ' বলা হয়। ভগবানের যে রূপ অর্জুন দেখেছেন, তা নানাপ্রকার অসংখ্য তেজোময় দিব্য আভরণ সমন্বিত ; তাই ভগবানের বর্ণনায় এই বিশেষণ প্রযুক্ত করা হয়েছে।

প্রশ্ন—'দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্'-এর অর্থ কী ?

উত্তর—যার দ্বারা যুদ্ধ করা হয়, সেই অস্ত্রের নাম 'আয়ুধ'। সে আয়ুধ অলৌকিক ও তেজোময়, তাকে 'দিব্য' বলা হয়—যেমন ভগবান বিষ্ণুর চক্র, গদা-ধনুক ইত্যাদি। এইরূপ অসংখ্য দিব্য অস্ত্র ভগবান তাঁর হাতে ধারণ করেছিলেন, তাই তাঁকে 'দিব্যানেকোদ্যতায়ুধ' বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—'দিব্যমাল্যাম্বরধরম্'-এর অর্থ কী ?

উত্তর—যিনি অতি উত্তম তেজোময় অলৌকিক মালা ও বস্ত্র পরিধান করে আছেন, তাঁকে 'দিব্যমাল্যাম্বরধর' বলা হয়। বিশ্বরূপ ভগবান তাঁর গলায় বহু সুন্দর সুন্দর তেজোময় অলৌকিক মালা ধারণ করেছিলেন এবং নানাপ্রকার বহু উত্তম তেজোময় অলৌকিক বস্ত্রে সুসজ্জিত ছিলেন, তাই তাঁর প্রতি এই বিশেষণ প্রযুক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন—'দিব্যগন্ধানুলেপনম্' কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—চন্দন ইত্যাদি যেসব লৌকিক গন্ধ আছে, তার থেকে বিশেষ অলৌকিক গন্ধকে 'দিব্যগন্ধ' বলা হয়। এরূপ দিব্যগন্ধের অনুভব প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা না হয়ে দিব্য ইন্দ্রিয় দ্বারাই করা যায় ; যাঁর সর্বাঙ্গে এরূপ অতি মনোহর দিব্যগন্ধ, তাঁকে 'দিব্যগন্ধানুলেপন' বলা হয়।

প্রশ্ন—'সর্বাশ্চর্যময়ম্' পদের অর্থ কী ?

উত্তর—ভগবানের সেই বিরাটরূপে উপরোক্ত

প্রকারে মুখ, চক্ষু, আভরণ, অস্ত্র, মালা, বসন ও গন্ধ ইত্যাদি সবই আশ্চর্যজনক ছিল, তাই তাকে 'সর্বাশ্চর্যময়' বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—**'অনন্তম্'** কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যার কোনও অন্ত এবং দৈর্ঘ্য-প্রস্থে কোনও সীমা নেই, তাকে বলা হয় 'অনন্ত'। অর্জুন ভগবানের যে বিশ্বরূপ দর্শন করেন, তা দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে এতই বিস্তৃত ছিল যে তার কোনো অন্ত ছিল না, তাই তাকে 'অনন্ত' বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—**'বিশ্বতোমুখম্'**-এর তাৎপর্য কী ?

উত্তর—সর্বদিকে যাঁর মুখ, তাঁকে 'বিশ্বতোমুখ' বলা হয়। ভগবানের বিরাটরূপে দেখতে পাওয়া অসংখ্য মুখ সমস্ত বিশ্বের সর্বদিকে ছিল, তাই তাঁকে 'বিশ্বতোমুখ' বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—**'দেবম্'** পদের অর্থ কী ? এবং এটি প্রয়োগের কী তাৎপর্য ?

উত্তর—যা প্রকাশময় ও পূজ্য, তাঁকে দেব বলা হয়। এখানে 'দেবম্' পদ প্রয়োগে সঞ্জয় এই তাৎপর্য দেখিয়েছেন যে, পরম তেজোময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন উপরোক্ত বিশেষণে যুক্ত দেখেছেন।

সম্বন্ধ—উপরোক্ত বিরাটরূপ পরমদেব পরমেশ্বরের প্রকাশ কেমন ছিল, এবার তার বর্ণনা করা হচ্ছে—

দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ১২

আকাশে সহস্র-সহস্র সূর্য একসঙ্গে উদয় হলে যে প্রকাশ উৎপন্ন হয়, সেই প্রকাশও বিশ্বরূপ পরমাত্মার প্রকাশের সদৃশ কখনো নয় ॥ ১২

প্রশ্ন—ভগবানের প্রকাশের সঙ্গে সহস্র-সহস্র সূর্যের প্রকাশের তুলনা করার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা বিরাটরূপ ভগবানের দিব্য প্রকাশকে নিরুপম বলা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যেমন সহস্র সহস্র নক্ষত্র একত্র উদয় হয়েও সূর্যের সমকক্ষ হতে পারে না, তেমনই কয়েক সহস্র সূর্যও যদি এক সঙ্গে আকাশে উদিত হয়, তাহলে তার প্রকাশও সেই বিরাটরূপ ভগবানের প্রকাশের সমকক্ষ হতে পারে না। তার কারণ হল যে, সূর্যের প্রকাশ অনিত্য, ভৌতিক এবং সীমিত ; কিন্তু বিরাটরূপ ভগবানের প্রকাশ নিত্য, দিব্য, অলৌকিক এবং অপরিমিত।

সম্বন্ধ—ভগবানের সেই প্রকাশময় অদ্ভুত স্বরূপে অর্জুন সমগ্র জগৎকে কীরূপ দেখলেন—এবার তা বলা হচ্ছে—

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥ ১৩

পাণ্ডুপুত্র অর্জুন সেই সময় নানাভাগে বিভক্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে দেবাদিদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরীরের একস্থানে অবস্থিত দেখলেন ॥ ১৩

প্রশ্ন—এখানে **'তদা'** পদ কোন্ সময়ের বাচক ?

উত্তর—ভগবান অর্জুনকে যখন দিব্যদৃষ্টি প্রদান করে নিজ অসাধারণ যোগশক্তির সহিত বিরাটরূপ দেখার জন্য নির্দেশ দিলেন (১১।৮), সেই সময়ের বাচক হল **'তদা'** পদটি।

প্রশ্ন—**'জগৎ'** পদের সঙ্গে **'অনেকধাপ্রবিভক্তম্'** এবং **'কৃৎস্নম্'** বিশেষণ দিয়ে কী লক্ষ্য করা হয়েছে ?

উত্তর—এই বিশেষণগুলি প্রয়োগের এই তাৎপর্য যে, দেবতা-মানুষ, পশু-পক্ষী, কীটপতঙ্গ এবং বৃক্ষাদি

ভোক্তৃবর্গ ; পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ-পাতাল ইত্যাদি ভোগস্থান ও ভোগের উপযুক্ত অসংখ্য সামগ্রীর ভেদে বিভক্ত—এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে অর্জুন ভগবানের শরীরের এক স্থানে দেখলেন, অর্থাৎ এগুলির কোনো একটি অংশ দেখেছেন বা এর সমস্ত ভেদকে বিভিন্নভাবে পৃথক পৃথক না দেখে একত্রিত দেখেছেন— এমন নয়, সমস্ত বিরাট-রূপকে যেমন-কে-তেমন একইভাবে পৃথক পৃথক দেখেছেন।

প্রশ্ন—'একস্থম্' কথাটি প্রয়োগের তাৎপর্য কী ?

উত্তর—দশম অধ্যায়ের শেষে ভগবান একথা বলেছিলেন যে, সম্পূর্ণ জগৎকে আমি একাংশে ধারণ করে অবস্থিত আছি, অর্জুন এখানে সেটিই প্রত্যক্ষ করলেন। এই বিষয় স্পষ্ট করার জন্য **'একস্থম্'** অর্থাৎ 'এক স্থানে স্থিত' পদের প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—'তত্র' পদ কীসের বিশেষণ এবং এর প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'তত্র' পদ পূর্ব বর্ণনার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে এবং এখানে এটি দেবাদিদেব ভগবানের শরীরের বিশেষণ। এটির প্রয়োগ করার এই তাৎপর্য যে দেবতাদেরও দেবতা, সর্বশ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মাদি দেবতাদেরও পূজনীয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপরোক্ত রূপে পাণ্ডুপুত্র অর্জুন সমস্ত জগৎকে একস্থানে অবস্থিত দেখলেন।

সম্বন্ধ—এইভাবে অর্জুন দ্বারা ভগবানের বিরাটরূপ দেখার পর কী হল, এই প্রশ্নে বলা হচ্ছে—

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত॥ ১৪

তারপর বিস্ময়াবিষ্ট এবং রোমাঞ্চিত শরীরে অর্জুন বিশ্বরূপধারী ভগবানকে শ্রদ্ধা-ভক্তিসহ নতমস্তকে প্রণাম করে করজোড়ে বললেন— ॥ ১৪

প্রশ্ন—'ততঃ' পদটির অর্থ কী ?

উত্তর—'ততঃ' পদ 'তৎপশ্চাৎ'এর বাচক। এটি প্রয়োগের এই তাৎপর্য যে অর্জুন যখন ভগবানের উপরোক্ত অদ্ভুত প্রভাবশালী রূপ দর্শন করলেন, তখন তাঁর মধ্যে এরূপ পরিবর্তন হয়েছিল।

প্রশ্ন—'ধনঞ্জয়ঃ'-এর সঙ্গে **'বিস্ময়াবিষ্টঃ'** ও **'হৃষ্টরোমা'** এই দুটি বিশেষণ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—অনেক রাজাকে পরাজিত করে অর্জুন ধন সংগ্রহ করেছিলেন, তাই তাঁর আর এক নাম ছিল **'ধনঞ্জয়'**। এখানে সেই ধনঞ্জয় পদের সঙ্গে **'বিস্ময়াবিষ্টঃ'** এবং **'হৃষ্টরোমা'** এই দুটি বিশেষণ প্রয়োগ করে অর্জুনের হর্ষ ও বিস্ময়ের আধিক্য দেখানো হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, ভগবানের সেই রূপ দেখে অর্জুন এতো আশ্চর্য ও হর্ষান্বিত হয়েছিলেন যে তাঁর সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। তিনি এর আগে ভগবানের এমন ঐশ্বর্যপূর্ণ রূপ কখনো দেখেননি ; তাই এই অলৌকিক রূপ দেখেই তাঁর হৃদয়ে সহসা ভগবানের অপরিমিত প্রভাবের কিছু ছাপ পড়ে, তাঁর কিছু প্রভাব অর্জুন বুঝতে পারেন। এতে তাঁর আনন্দ ও আশ্চর্যের সীমা ছিল না।

প্রশ্ন—'দেবম্' পদ কীসের বাচক এবং **'শিরসা প্রণম্য'** এবং **'কৃতাঞ্জলিঃ'** কথাগুলির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—'দেবম্' পদটি ভগবানের তেজময় বিরাট রূপের বাচক। **'শিরসাপ্রণম্য'** ও **'কৃতাঞ্জলিঃ'** এই দুই পদ প্রয়োগের এই তাৎপর্য যে অর্জুন যখন ভগবানের এই অনন্ত আশ্চর্যময় দৃশ্যযুক্ত পরম প্রকাশময় ও অসীম ঐশ্বর্য সমন্বিত মহাস্বরূপ দেখলেন তখন তিনি তাতে এত প্রভাবিত হলেন যে তাঁর মনে কৃষ্ণের প্রতি পূর্বের যে বন্ধুত্বভাব ছিল, তা সহসা বিলুপ্তপ্রায় হল ; ভগবানের মহিমার কাছে তিনি নিজেকে অতি তুচ্ছ ভাবতে লাগলেন। তাঁর হৃদয়ে ভগবানের প্রতি পূজাভাব জেগে উঠল এবং তার প্রভাবে বিদ্যুতের মতো তীব্র গতিতে তিনি সেই মুহূর্তে ভগবদ্চরণে মস্তক ঠেকান। তারপর হাতজোড় করে অর্জুন অত্যন্ত বিনম্রভাবে শ্রদ্ধাভক্তিসহ ভগবানের স্তব করতে লাগলেন।

সম্বন্ধ—উপরোক্তভাবে হর্ষ ও আশ্চর্যচকিত অর্জুন এবার ভগবানের বিশ্বরূপের দৃশ্যসমূহ বর্ণনা করে সেই বিশ্বরূপের স্তব করছেন।

অর্জুন উবাচ

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥ ১৫

অর্জুন বললেন—হে দেব ! আপনার শরীরে আমি সমস্ত দেবতা ও চরাচরের প্রাণী সমুদয়, কমলাসনে বিরাজিত ব্রহ্মাকে, মহাদেবকে এবং সমস্ত ঋষি ও দিব্য সর্পগণকে দেখছি ॥ ১৫

প্রশ্ন—এখানে 'দেব' সম্বোধনের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভগবানের তেজোময় অদ্ভুত রূপ দেখে অর্জুনের ভগবানের প্রতি যে শ্রদ্ধাভক্তিযুক্ত পূজাভাব হয়েছিল, তা বোঝাবার জন্য এখানে 'দেব' শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—'**তব দেহে**' কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এই দুটি পদের প্রয়োগে অর্জুন এই তাৎপর্য দেখিয়েছেন যে, আপনার দৃশ্যমান এই শরীরে আমি এই সকলকে দেখছি।

প্রশ্ন—অর্জুন জানিয়েছেন যে আমি আপনার শরীরে চরাচরের সমস্ত প্রাণী সমুদয়কে দেখতে পাচ্ছি, তাহলে সমস্ত দেবতাকে দেখতে পাচ্ছি—এই কথা আলাদা করে বলার প্রয়োজন কী ?

উত্তর—জগতের সব প্রাণীর মধ্যে দেবতাদের শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়, তাই তাঁদের কথা পৃথক্‌ভাবে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—ব্রহ্মা এবং শিব তো দেবতার অন্তর্ভুক্ত, তাহলে তাঁদের নাম পৃথক্ ভাবে কেন বলা হয়েছে এবং ব্রহ্মার সঙ্গে '**কমলাসনস্থম্**' বিশেষণ কেন প্রয়োগ করা হয়েছে ?

উত্তর—ব্রহ্মা ও শিব দেবতাগণেরও দেবতা এবং ঈশ্বর শ্রেণীভুক্ত, তাই তাঁদের নাম পৃথকভাবে করা হয়েছে। ব্রহ্মার সঙ্গে '**কমলাসনস্থম্**' বিশেষণ প্রয়োগে অর্জুনের এই অভিপ্রায় যে আমি ভগবান বিষ্ণুর নাভি থেকে নির্গত কমলে বিরাজিত ব্রহ্মাকে দেখছি অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে আপনার বিষ্ণুরূপও আপনার শরীরে দেখছি।

প্রশ্ন—সমস্ত ঋষি এবং দিব্য সর্পদের পৃথকভাবে বলার অর্থ কী ?

উত্তর—মনুষ্যলোকের সব প্রাণীদের থেকে ঋষিদের এবং পাতাল লোকে বাসুকী প্রমুখ দিব্য সর্পদের শ্রেষ্ঠ মানা হয়। তাই তাদের কথা আলাদাভাবে বলা হয়েছে।

এখানে স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতাল— তিন লোকের প্রধান প্রধান ব্যক্তি-সমুদায়ের বর্ণনা করে অর্জুনের কথার এই তাৎপর্য যে আমি ত্রিভুবনাত্মক সমগ্র বিশ্বকে আপনার শরীরে দেখতে পাচ্ছি।

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্বতোহনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥ ১৬

হে বিশ্বপতি ! আপনার অনেক বাহু, অনেক উদর, বহু মুখ এবং বহু নেত্রবিশিষ্ট বিরাট রূপ দেখছি। হে বিশ্বরূপ ! আমি আপনার অন্ত, মধ্য এবং আদিও দেখতে পাচ্ছি না ॥ ১৬

প্রশ্ন—'**বিশ্বেশ্বর**' এবং '**বিশ্বরূপ**' এই দুটি সম্বোধনের তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এই দুটি সম্বোধনে অর্জুনের এই অভিপ্রায় যে, আপনিই এই সমগ্র বিশ্বের হর্তা-কর্তা এবং সকলকে নিজ নিজ কর্মে নিযুক্তকারী, সকলের অধীশ্বর। এই সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতপক্ষে আপনারই স্বরূপ, আপনিই এর নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ।

প্রশ্ন—'**অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রম্**' কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা অর্জুন দেখিয়েছেন যে আপনাকে এখন আমি যে রূপে দেখছি, তার অসংখ্য বাহু, উদর, মুখ ও চক্ষু ; সেগুলি কোনোভাবে গণনা করা যায় না।

প্রশ্ন—'সর্বতঃ অনন্তরূপম্' কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এর দ্বারা অর্জুনের এই অভিপ্রায় যে, আপনাকে আমি এখন সর্বদিকে নানাপ্রকারের পৃথক্ পৃথক্ অগণিত রূপে যুক্ত দেখছি, অর্থাৎ আপনার এই এক দেহেই আমি বহু ভিন্ন ভিন্ন অনন্তরূপ চারদিকে প্রকাশিত দেখছি।

প্রশ্ন—আপনার আদি-মধ্য-অন্ত দেখতে পাচ্ছি না—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথায় অর্জুনের এই অভিপ্রায় যে, আপনার এই বিরাটরূপের কোথাও আমি আদি-অন্ত দেখতে পাচ্ছি না, অর্থাৎ আমি বুঝতে পারছি না যে এটি কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। এইভাবে এর আদি-অন্তের খোঁজ না পাওয়ায় এর মধ্যস্থল কোন্খানে তা-ও বুঝতে পারছি না ; তাই আমি আপনার মধ্যভাগও দেখতে পাচ্ছি না। আমি তো সামনে পেছনে, ডাইনে-বাঁয়ে, ওপর-নীচে-সর্বত্রই সীমারহিতভাবে আপনাকে দেখছি। কোনো দিকেই আপনার কোনো সীমা দেখা যাচ্ছে না।

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্ দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭

আপনাকে আমি কিরীটি (মুকুট), গদা ও চক্রযুক্ত, সর্বদিকে দীপ্তিমান, তেজঃপুঞ্জরূপ, প্রজ্বলিত অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় জ্যোতিসম্পন্ন, দুর্নিরীক্ষ্য এবং সর্বত্র সর্বদিকে অপ্রমেয়স্বরূপ দেখছি ॥ ১৭

প্রশ্ন—'কিরীটিনম্', 'গদিনম্' এবং 'চক্রিণম্' কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যাঁর মস্তকে কিরীট অর্থাৎ অত্যন্ত শোভা ও তেজযুক্ত মুকুট বিরাজমান, তাঁকে 'কিরীটি' বলা হয়, যাঁর হাতে 'গদা', তাঁকে 'গদি' বলে, এবং যিনি চক্রধারী তাঁকে 'চক্রী' বলে। এই তিনটি পদ প্রয়োগের দ্বারা অর্জুনের এই অভিপ্রায় যে আপনার এই অদ্ভুত রূপেও আমি আপনাকে মস্ত তেজোময় মুকুটধারণ করে এবং হাতে গদা ও চক্র নিয়ে দণ্ডায়মান দেখছি।

প্রশ্ন—'সর্বতঃ দীপ্তিমন্তম্' ও 'তেজোরাশিম্' কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যাঁর দিব্য প্রকাশ ওপর-নীচে, বাইরে-ভেতরে সর্বদিকেই প্রসারিত—তাঁকে 'সর্বতো দীপ্তিমান্' বলে। প্রকাশের সমূহকে বলে 'তেজোরাশি'। এই দুটি পদ প্রয়োগে অর্জুনের এই অভিপ্রায় যে আপনার এই বিরাটরূপ আমার কাছে মূর্তিমান তেজপুঞ্জ ও সর্বদিকে পরম প্রকাশযুক্তরূপে প্রকাশিত হচ্ছে।

প্রশ্ন—'সর্বতোদীপ্তিমন্তম্' এবং 'তেজোরাশিম্' —এই বিশেষণ প্রয়োগ করার পর ঐ ভাবের দ্যোতক '**দীপ্তানলার্কদ্যুতিম্**' পদ প্রয়োগের কী প্রয়োজন ?

উত্তর—ভগবানের এই বিরাটরূপ কীরূপ পরম প্রকাশযুক্ত ও মূর্তিমান তেজপুঞ্জ, এই বিষয়টি ঠিকভাবে অনুমান করানোর জন্য অগ্নি ও সূর্যের উপমা দিয়ে '**দীপ্তানলার্কদ্যুতিম্**' পদটি প্রয়োগ করা হয়েছে। এর দ্বারা অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে প্রজ্বলিত অগ্নি ও প্রকাশপুঞ্জ সূর্যের প্রকাশমান তেজের রাশি যেমন, তদনুরূপ আপনার এই বিরাটরূপ তার থেকেও বেশি প্রকাশমান তেজপুঞ্জ। অর্থাৎ অগ্নি ও সূর্যের সেই তেজ তো কোনো একটি স্থান বিশেষে দেখা যায়, কিন্তু আপনার এই বিরাট শরীর সবদিক থেকে তাদের চেয়েও অনন্তগুণ অধিক তেজোময়রূপে দেখা যাচ্ছে।

প্রশ্ন—'দুর্নিরীক্ষ্যম্' কথাটির তাৎপর্য কী ? ভগবানের সেই রূপ যদি দুর্নিরীক্ষ্য ছিল, তাহলে অর্জুন তা কী করে দেখছিলেন ?

উত্তর—অত্যন্ত অদ্ভুত প্রকাশযুক্ত হওয়ায় প্রাকৃত চক্ষু তার সামনে খোলা রাখা যায় না। তাই সর্বসাধারণের জন্য তাকে 'দুর্নিরীক্ষ্য' বলা হয়েছে। ভগবান তো অর্জুনকে ঐরূপ দেখার জন্যই দিব্যদৃষ্টি প্রদান করেছিলেন এবং তার দ্বারাই তিনি দেখছিলেন। এই জন্য অপরের কাছে তা দুর্নিরীক্ষ্য হলেও, অর্জুনের কাছে নয়।

প্রশ্ন—'সমন্তাৎ অপ্রমেয়ম্' কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যা মাপা যায় না বা কোনো ভাবে যার সীমা জানা যায় না, তা হল 'অপ্রমেয়'। যা সব দিকে অপ্রমেয়, তাকে 'সমন্তাৎ অপ্রমেয়' বলা হয়। এর প্রয়োগে অর্জুনের এই অভিপ্রায় যে আপনার গুণ, প্রভাব, শক্তি ও স্বরূপকে কোনো প্রাণী কোনো উপায়েই সম্পূর্ণভাবে জানতে পারবে না।

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥ ১৮

আপনি পরম ব্রহ্ম ও একমাত্র জ্ঞাতব্য। আপনি জগতের পরম আশ্রয় ও সনাতন ধর্মের রক্ষক, আপনিই অবিনাশী সনাতন পুরুষ, এই হল আমার মত ॥ ১৮

প্রশ্ন—'বেদিতব্যম্' এবং 'পরমম্' বিশেষণের সঙ্গে 'অক্ষরম্' পদ কীসের বাচক এবং তার তাৎপর্য কী?

উত্তর—যে জ্ঞাতব্য পরমতত্ত্ব মুমুক্ষু মানুষ জানতে ইচ্ছা করেন, যা জানার জন্য জিজ্ঞাসু সাধক নানাপ্রকার সাধনা করেন, অষ্টম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে যে পরম অক্ষরকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে—সেই পরমতত্ত্বস্বরূপ সচ্চিদানন্দঘন নির্গুণ নিরাকার পরব্রহ্ম পরমাত্মার বাচক হল এখানে 'বেদিতব্যম্' ও 'পরমম্' বিশেষণের সঙ্গে 'অক্ষরম্' পদটি। এর দ্বারা অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে আপনার বিরাটরূপ দেখে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মা নির্গুণ ব্রহ্মও আপনিই।

প্রশ্ন—'নিধানম্' পদটির অর্থ কী এবং ভগবানকে এই জগতের পরম নিধান বলার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—যে স্থানে কোনো বস্তুকে রাখা হয়, সেটিকে ঐ বস্তুর নিধান অথবা আধার (আশ্রয়) বলা হয়। এখানে অর্জুন ভগবানকে এই জগতের নিধান বলার এই অভিপ্রায় যে কারণ ও কার্যসহ এই সম্পূর্ণ জগৎ আপনাতেই অবস্থিত। আপনিই একে ধারণ করে আছেন ; সুতরাং আপনিই এর আশ্রয়।

প্রশ্ন—'শাশ্বতধর্ম' কীসের বাচক এবং ভগবানকে তার 'গোপ্তা' বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যা চিরকাল ধরে চলে আসছে এবং চিরস্থায়ী, সেই সনাতন (বৈদিক) ধর্মকে 'শাশ্বতধর্ম' বলা হয়। ভগবান বারংবার অবতার রূপ গ্রহণ করে সেই ধর্মকে রক্ষা করেন, তাই ভগবানকে অর্জুন 'শাশ্বতধর্ম গোপ্তা' বলেছেন।

প্রশ্ন—'অব্যয়' এবং 'সনাতন' বিশেষণের সঙ্গে 'পুরুষ' শব্দটি প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যার কখনো বিনাশ হয় না, তাকে বলা হয় 'অব্যয়' ; যা চিরকাল থাকে এবং সর্বদা একইভাবে অবস্থান করে তাকে বলা হয় 'সনাতন'। এই দুটি বিশেষণের সঙ্গে 'পুরুষ' শব্দ প্রয়োগ করে অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে, যার কখনো বিনাশ হয় না—এরূপ সমগ্র জগতের হর্তা, কর্তা, সর্বশক্তিমান, সর্ববিকাররহিত, সনাতন পরম পুরুষ সাক্ষাৎ পরমেশ্বর আপনিই।

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্যমনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥ ১৯

আপনাকে আমি আদি-মধ্য-অন্তহীনরূপে দেখছি, আপনি অনন্ত শক্তিসম্পন্ন ও অসংখ্য বাহুবিশিষ্ট, চন্দ্র ও সূর্য আপনার নেত্র, প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় আপনার মুখ এবং নিজ তেজে আপনি এই বিশ্বকে সন্তপ্ত করছেন ॥ ১৯

প্রশ্ন—ষোড়শ শ্লোকে অর্জুন বলেছিলেন যে আমি আপনার আদি-মধ্য ও অন্ত দেখছি না ; আবার এখানে বলেছেন 'আমি আপনাকে আদি-মধ্য ও অন্তরহিত দেখছি' এতে পুনরুক্তির মতো দোষ প্রতীত হচ্ছে, এর তাৎপর্য কী ?

উত্তর—ওখানে অর্জুন ভগবানের বিরাট রূপকে অসীম বলেছিলেন আর এখানে তাঁকে উৎপত্তি ইত্যাদি ছয়বিকাররহিত নিত্য বলে জানিয়েছেন। তাই এটা পুনরুক্তি নয়। এর অর্থ বুঝতে হবে যে, 'আদি' শব্দ উৎপত্তির, 'মধ্য' শব্দ উৎপত্তি ও বিনাশের মধ্যের স্থিতি, বৃদ্ধি, ক্ষয় এবং পরিণাম—এই চার বিকারের এবং 'অন্ত' শব্দ বিনাশরূপ বিকারের বাচক। এই তিনটি যার মধ্যে থাকে না, তাকে বলা হয় '**অনাদিমধ্যান্ত**'। সুতরাং এখানে অর্জুনের বক্তব্যের তাৎপর্য হল যে, আমি আপনাকে সর্বতোভাবে উৎপত্তি ইত্যাদি ছয় বিকারের রহিত দেখছি।

প্রশ্ন—'**অনন্তবীর্যম্**' কথাটির মর্মার্থ কী ?

উত্তর—'বীর্য' শব্দ সামর্থ্য, বল, তেজ ও শক্তি ইত্যাদির বাচক। যার বীর্যের অন্ত নেই, তাঁকে 'অনন্তবীর্য' বলা হয়। এখানে অর্জুনের ভগবানকে 'অনন্তবীর্য' বলার এই তাৎপর্য যে, আপনার বল, বীর্য, সামর্থ্য ও তেজের কোনও সীমা নেই।

প্রশ্ন—'**অনন্তবাহুম্**' কথার অর্থ কী ?

উত্তর—যাঁর বাহুর কোনো সীমা নেই, তাঁকে 'অনন্তবাহু' বলা হয়। এর দ্বারা অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে, আপনার এই বিরাটরূপের মধ্যে আমি যে দিকে তাকাই, সেদিকে আপনার অসংখ্য বাহু দেখতে পাচ্ছি।

প্রশ্ন—'**শশিসূর্যনেত্রম্**' কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এই বক্তব্যে অর্জুনের এই অভিপ্রায় যে, আমি চন্দ্র ও সূর্যকে আপনার দুটি নেত্রস্থানে দেখছি। অভিপ্রায় হল যে আপনার এই বিরাটরূপে আমি সর্বদিকে আপনার অসংখ্য মুখ দেখতে পাচ্ছি ; তার মধ্যে যেটি আপনার প্রধান মুখ, তাতে চক্ষুর জায়গায় আমি চন্দ্র ও সূর্যকে দেখতে পাচ্ছি।

প্রশ্ন—'**দীপ্তহুতাশবক্ত্রম্**' কথার তাৎপর্য কী ?

উত্তর—অগ্নিকে 'হুতাশ' বলে, প্রজ্বলিত অগ্নিকে 'দীপ্তহুতাশ' বলা হয়, যাঁর মুখ প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় প্রকাশমান এবং তেজপূর্ণ, তাঁকে 'দীপ্তহুতাশবক্ত্র' বলা হয়। এর দ্বারা অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে, আপনার প্রধান মুখটি আমি সর্বদিকে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় তেজ ও প্রকাশযুক্ত দেখতে পাচ্ছি।

প্রশ্ন—'নিজ তেজে জগৎকে সন্তপ্ত করতে দেখছি', কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা অর্জুনের অভিপ্রায় হল, আমি এমন দেখতে পাচ্ছি, যেন আপনি আপনার তেজের দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে—যাতে আমি দাঁড়িয়ে আছি—সন্তপ্ত করছেন।

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥ ২০

হে মহাত্মন্ ! স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষ এবং সর্বদিক আপনি পরিব্যাপ্ত করে আছেন। আপনার এই অলৌকিক ও ভয়ংকর রূপ দেখে ত্রিলোক অত্যন্ত ভীত ও ব্যথিত হচ্ছে ॥ ২০

প্রশ্ন—এই শ্লোকের তাৎপর্য কী ?

উত্তর—'মহাত্মন্' শব্দের দ্বারা ভগবানকে সমগ্র বিশ্বের মহান আত্মা সম্বোধন করে অর্জুন বলছেন যে, আপনার এই বিরাটরূপ এতো বিস্তৃত যে স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যের সম্পূর্ণ আকাশ এবং সর্বদিক তার দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। আমি এমন কোনো স্থান দেখছি না, যেখানে আপনার স্বরূপ নেই। সেই সঙ্গে আমি দেখছি যে আপনার এই অলৌকিক ও অত্যন্ত ভয়ংকর রূপ এতো ভয়ানক যে স্বর্গ-মর্ত্য ও অন্তরীক্ষের জীবেরা এটি দেখে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ছে। তাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠেছে।

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ॥ ২১

এই দেবগণ সকলে আপনাতেই প্রবেশ করছেন। কেউ কেউ ভীত হয়ে হাত জোড় করে আপনার গুণগান করছেন এবং মহর্ষি ও সিদ্ধগণ 'কল্যাণ হোক' বলে উত্তম স্তোত্র দ্বারা আপনার স্তব করছেন ॥ ২১

প্রশ্ন—'সুরসঙ্ঘা'র সঙ্গে 'অমী' বিশেষণ দিয়ে 'এঁরাই আপনাতে প্রবেশ করছেন' এই কথা বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'সুরসঙ্ঘা' পদের সঙ্গে পরোক্ষবাচক 'অমী' বিশেষণ দিয়ে অর্জুন যেন বলতে চেয়েছেন যে, আমি যখন স্বর্গলোকে গিয়েছিলাম, তখন সেখানে যে সব দেবতাদের দেখেছিলাম—আজ আমি তাঁদেরই এই বিরাটরূপে প্রবেশ করতে দেখছি।

প্রশ্ন—কতজন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে হাতজোড় করে আপনার গুণগান করছেন, এই কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এই বাক্যে অর্জুনের এই অভিপ্রায় যে, বহু দেবতাকে ভগবানের উগ্ররূপে প্রবেশ করতে দেখে অবশিষ্ট দেবতারা নিজেদের বহুদিন বাঁচার আশা নেই জেনে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে হাত জোড় করে আপনার গুণগান করে আপনাকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করছেন।

প্রশ্ন—'মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ' কীসের বাচক এবং এঁরা 'সকলের কল্যাণ হোক' বলে পুষ্কল স্তোত্র দ্বারা আপনার স্তুতি করছেন, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—মরীচি, অঙ্গিরা, ভৃগু প্রমুখ মহর্ষিগণ এবং জানা-অজানা যত সিদ্ধ আছেন—তাঁদের সকলের বাচক এই 'মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘা' পদটি। এঁরা 'সকলের কল্যাণ হোক' বলে পুষ্কল স্তোত্র দ্বারা আপনার স্তুতি করছেন—এই কথায় অর্জুন যেন বলতে চেয়েছেন যে, আপনার তত্ত্বের প্রকৃত রহস্য জানায় এঁরা আপনার উগ্ররূপ দেখে ভীতসন্ত্রস্ত হননি বরং তাঁরা সমস্ত জগতের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করে নানাপ্রকার সুন্দর ভাবপূর্ণ স্তোত্র দ্বারা শ্রদ্ধা ও প্রেমসহ আপনার স্তব করছেন—আমি এমনই দেখছি।

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে॥ ২২

একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্‌গণ, পিতৃগণ ও গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, সিদ্ধগণ সকলেই—বিস্মিত হয়ে আপনাকে দেখছেন॥ ২২

প্রশ্ন—'রুদ্রাঃ', 'আদিত্যাঃ', 'বসবঃ', 'সাধ্যাঃ', 'বিশ্বে', 'অশ্বিনৌ' এবং 'মরুতঃ'—এঁরা সব পৃথক পৃথক রূপে কোন্ দেবতাদের বাচক ?

উত্তর—একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, উনপঞ্চাশ মরুৎ—এই চার প্রকার দেবতাসমূহের বর্ণনা দশম অধ্যায়ের একুশ ও তেইশতম শ্লোকের ব্যাখ্যায় ও তার টিপ্পনীতে এবং অশ্বিনীকুমারদের সম্বন্ধে বর্ণনা একাদশ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকের টিপ্পনীতে করা হয়েছে—সেখানে দ্রষ্টব্য। মন, অনুমন্তা, প্রাণ, নর, যান, চিত্তি, হয়, নয়, হংস, নারায়ণ, প্রভব ও বিভু—এই বারোজন হলেন সাধ্য দেবতা[১]। ক্রতু, দক্ষ, শ্রব, সত্য, কাল, কাম, ধুনি, কুরুবান্, প্রভবান্ এবং রোচমান—এই দশজন হলেন বিশ্বদেব[২]। আদিত্য এবং রুদ্রাদি হলেন দেবতাদের অষ্টগণ (সমুদায়), তাঁদের মধ্যে সাধ্য ও বিশ্বদেবও হলেন

[১]মনোঽনুমন্তা প্রাণশ্চ নরো যানশ্চ বীর্যবান্।
চিত্তির্হয়ো নয়শ্চৈব হংসো নারায়ণস্তথা॥
প্রভবোঽথ বিভুশ্চৈব সাধ্যা দ্বাদশ জজ্ঞিরে। (বায়ুপুরাণ ৬৬।১৫-১৬)

ধর্ম পত্নী দক্ষকন্যা সাধ্যা হতে এই দ্বাদশ সাধ্য দেবতার উৎপত্তি হয়। স্কন্দপুরাণে এঁদের এরূপ নামান্তর পাওয়া যায়—মন, অনুমন্তা, প্রাণ, নর, অপান, ভক্তি, ভয়, অনঘ, হংস, নারায়ণ, বিভু ও প্রভু। (স্কন্দপুরাণ, প্রভাসখণ্ড ২১।১৭, ১৮) মন্বন্তর ভেদে সবই ঠিক।

[২]বিশ্বদেবাস্তু বিশ্বায়া জজ্ঞিরে দশ বিশ্রুতাঃ।
ক্রতুর্দক্ষঃ শ্রবঃ সত্যঃ কালঃ কামো ধুনিস্তথা।
কুরুবান্ প্রভবাংশ্চৈব রোচমানশ্চ তে দশ॥ (বায়ুপুরাণ ৬৬।৩১-৩২)

ধর্মপত্নী দক্ষকন্যা বিশ্বা হতে এই দশ বিশ্বদেবের উৎপত্তি হয়। কোনো কোনো পুরাণে মন্বন্তর ভেদে এঁদেরও নামান্তর পাওয়া যায়।

দুজন ভিন্ন ভিন্ন গণ (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৭১।২)।

প্রশ্ন—'উষ্মপাঃ' পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—যিনি উষ্ম (গরম) অন্নগ্রহণ করেন, তাঁকে 'উষ্মপাঃ' বলা হয়। মনুস্মৃতির তৃতীয় অধ্যায়ের দুশো সাঁইত্রিশতম শ্লোকে বলা হয়েছে যে পিতৃগণ উষ্ম অন্নই গ্রহণ করেন। তাই এখানে **'উষ্মপাঃ'** পদ পিতৃসমুদায়ের[1] বাচক বলে জানা উচিত।

প্রশ্ন—'গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ' এই পদ কোন্ কোন্ সমুদায়ের বাচক ?

উত্তর— কশ্যপমুনির পত্নী মুনি ও প্রাধা হতে এবং অরিষ্টা থেকে গন্ধর্বদের উৎপত্তি বলে মনে করা হয়, এঁরা রাগ-রাগিণীর জ্ঞানে নিপুণ এবং দেবলোকের বাদ্য-নৃত্যকলায় কুশল। যক্ষদের উৎপত্তি মহর্ষি কশ্যপের খসা নামক পত্নী থেকে বলা হয়েছে। যক্ষেরা ভগবান শংকরের গণেরও অন্তর্ভুক্ত। কুবেরকে এই যক্ষদের এবং উত্তম রাক্ষসদের রাজা বলে মনে করা হয়। দেবতাদের বিরোধী দৈত্য, দানব এবং রাক্ষসদের অসুর বলা হয়। কশ্যপের পত্নী 'দিতি' থেকে উৎপন্ন হওয়াদের 'দৈত্য' এবং 'দনু' থেকে উৎপন্ন হওয়াদের 'দানব' বলে। রাক্ষসদের উৎপত্তি নানা প্রকারে হয়েছে। কপিল প্রমুখ সিদ্ধজনেদের 'সিদ্ধ' বলা হয়। এই সবের বিভিন্ন নানা সমুদায়ের বাচক হল **'গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ'** পদটি।

প্রশ্ন—এরা সকলে বিস্মিত হয়ে আপনাকে দেখছেন, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—অর্জুনের এই কথার অভিপ্রায় এই যে, উপরোক্ত সকল দেবতা, পিতৃগণ, গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুর এবং সিদ্ধগণের বিভিন্ন সমুদায় আশ্চর্যান্বিত হয়ে আপনার এই অদ্ভুত রূপের দিকে চেয়ে আছেন—আমি এরূপ দেখতে পাচ্ছি।

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্॥ ২৩

হে মহাবাহো ! আপনার বহু মুখ, বহু চক্ষু, বহু বাহু, বহু উরু, বহু চরণ, বহু উদর এবং ভয়ানক দন্তযুক্ত বিকট রূপ দেখে সমস্ত লোক অত্যন্ত ভীত হচ্ছে এবং আমিও ভীত হচ্ছি ॥ ২৩

প্রশ্ন—ষোড়শ শ্লোকে অর্জুন বলেছিলেন যে, আমি আপনার বিরাট রূপ অনেক হস্ত, উদর, মুখ ও নেত্রযুক্ত দেখছি ; আবার এই শ্লোকে পুনরায় তার জন্য **'বহুবক্ত্রনেত্রম্'**, **'বহুবাহূরুপাদম্'** এবং **'বহূদরম্'** বিশেষণ দেওয়ার কী প্রয়োজন ?

উত্তর— ষোড়শ শ্লোকে অর্জুন শুধু ঐরূপ দেখার কথাই বলেছিলেন আর এখানে সেটি বাস্তবিক দেখে অন্য সকলের এবং নিজেরও ভীত-ব্যাকুল হওয়ার কথা বলেছেন, সেইজন্যই সেই রূপের পুনরায় বর্ণনা করেছেন।

প্রশ্ন— ত্রিলোকের ব্যথিত হওয়ার কথাও বিশতম শ্লোকে বলেছেন আবার এই শ্লোকে বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—বিশতম শ্লোকে বিরাটরূপের অসীম বিস্তার (দৈর্ঘ্য-প্রস্থ) এবং তার উগ্রতা দেখে শুধু ত্রিলোকের ব্যাকুল হওয়ার কথা বলা হয়েছিল আর এই শ্লোকে অর্জুন তাঁর অনেক হাত, পা, জঙ্ঘা, মুখ, চক্ষু, উদরযুক্ত ও বহু ভয়াল দন্তবিশিষ্ট অত্যন্ত ভয়াল-রূপ দেখে নিজের ভীত-ব্যাকুল হওয়ার কথা বলেছেন ; তাই এখানে পুনরুক্তি হয়নি।

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো॥ ২৪

কারণ হে বিষ্ণো ! আকাশস্পর্শকারী, দেদীপ্যমান, নানাবর্ণবিশিষ্ট, বিস্ফারিত মুখমণ্ডল এবং জাজ্বল্যমান বিশাল চক্ষুবিশিষ্ট আপনাকে দেখে আমি ভীত হয়ে পড়েছি এবং ধৈর্য ও শান্তি পাচ্ছি না ॥ ২৪

[1] পিতৃদের নাম দশম অধ্যায়ের উনত্রিশতম শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে 'বিষ্ণু' সম্বোধনের তাৎপর্য কী ?

উত্তর— অর্জুনের ভগবানকে বিষ্ণু নামে সম্বোধন করার তাৎপর্য এই যে, আপনি সাক্ষাৎ বিষ্ণু, পৃথিবীর ভার লাঘবের জন্য কৃষ্ণরূপে প্রকটিত হয়েছেন। সুতরাং আপনি আমার ব্যাকুলতা দূর করার জন্য এই বিশ্বরূপ সংবরণ করে বিষ্ণুরূপে প্রকটিত হোন।

প্রশ্ন—কুড়িতম শ্লোকে স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যকার আকাশ ভগবান দ্বারা পরিব্যাপ্ত বলে তার অসীম দৈর্ঘ্যের বর্ণনা করেছেন, তাহলে আবার এখানে **'নভঃস্পৃশম্'** বিশেষণ প্রয়োগের প্রয়োজন কী ?

উত্তর— বিশতম শ্লোকে বিরাটরূপের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের বর্ণনা করে ত্রিলোকের ব্যাকুলতার কথা বলেছিলেন ; এই শ্লোকে তার অসীম বিস্তার দেখে অর্জুন তাঁর নিজের ব্যাকুলতা এবং ধৈর্য ও শান্তি নষ্ট হওয়ার বর্ণনা করেছেন, সেই জন্য এখানে **'নভঃস্পৃশম্'** বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রশ্ন—সপ্তদশ শ্লোকে **'দীপ্তিমন্তম্'** বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছিল, আবার এখানে **'দীপ্তম্'** বিশেষণ প্রয়োগের কী প্রয়োজন ?

উত্তর—সেখানে শুধু ভগবানের রূপ দেখার কথাই বলা হয়েছিল আর এখানে তা বাস্তবিক দেখে ধৈর্য ও শান্তি ভঙ্গ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। তাই ঐ রূপের পুনরায় বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন—অর্জুন তাঁর ব্যাকুলতার কথাও তেইশতম শ্লোকে বলেছেন, তাহলে এই শ্লোকে **'প্রব্যথিতান্তরাত্মা'** বিশেষণ প্রয়োগের কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—ওখানে শুধু ব্যাকুল হওয়ার কথাই বলা হয়েছিল। এখানে নিজ অবস্থান যথাযথভাবে বলার জন্য পুনরায় তিনি বলেছেন যে আমি শুধু ব্যাকুলই হইনি, আপনার বিস্ফারিত মুখমণ্ডল এবং প্রজ্বলিত নেত্রযুক্ত এই বিকট রূপ দেখে আমার ধৈর্য ও শান্তি নষ্ট হচ্ছে।

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥ ২৫

বিকট দন্ত দ্বারা বিকৃত এবং প্রলয়কালের অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত আপনার মুখ দেখে আমি দিশাহারা হয়েছি, সুখ পাচ্ছি না। সেইজন্য হে দেবেশ ! হে জগন্নিবাস ! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হোন ॥ ২৫

প্রশ্ন— তেইশতম শ্লোকে ভগবানের বিরাটরূপের বিশেষণ **'বহুদংষ্ট্রাকরালম্'** দিয়েছিলেন, আবার এখানে তাঁর মুখের **'দংষ্ট্রাকরালানি'** বিশেষণ দেওয়ার অর্থ কী ?

উত্তর—ঐস্থানে অর্জুন ঐরূপ দেখে ব্যাকুল হওয়ার কথা বলেছিলেন এবং এখানে দিক্ ভ্রম ও সুখের অভাবের কথা বিশেষভাবে বলেছেন ; তাই সেই বিশেষণ মুখের বর্ণনার সঙ্গে পুনরায় প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন— **'দেবেশ'** এবং **'জগন্নিবাস'**—এই দুটি সম্বোধন প্রয়োগ করে ভগবানকে প্রসন্ন হওয়ার জন্য প্রার্থনা করার তাৎপর্য কী ?

উত্তর— **'দেবেশ'** এবং **'জগন্নিবাস'**—এই দুটি সম্বোধন প্রয়োগে অর্জুনের অভিপ্রায় এই যে, আপনি সমস্ত দেবতার প্রভু, সর্বব্যাপী এবং সমস্ত জগতের পরমাধার—একথা আমি আগেই শুনেছি এবং আমার বিশ্বাস ছিল যে আপনি এমনই। আজ আমি আপনার সেই বিরাটরূপ প্রত্যক্ষ করেছি। এবার আপনার **'দেবেশ'** এবং **'জগন্নিবাস'** হওয়ার বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই। প্রসন্ন করার জন্য প্রার্থনা করার মর্মার্থ হল এই যে, 'প্রভো ! আপনার প্রভাব আমি প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু আপনার এই বিরাটরূপ দেখে আমার অত্যন্ত শোচনীয় দশা হচ্ছে ; আমার সুখ, শান্তি ও ধৈর্য নষ্ট হয়ে গেছে। এমনকি আমি দিক-বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছি। সুতরাং দয়া করে আপনি এই বিরাটরূপ সংবরণ করুন।'

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ॥ ২৬

বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ॥ ২৭

ঐসকল ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ, রাজন্যবর্গসহ এবং পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কর্ণ ও আমাদের পক্ষেরও প্রধান সকল যোদ্ধা সকলেই আপনার দংষ্ট্রাকরাল ভীষণ মুখগহ্বরে সবেগে প্রবেশ করছেন। কারও চূর্ণ হওয়া মাথার টুকরো আপনার দাঁতের ফাঁকে লেগে আছে দেখতে পাচ্ছি॥ ২৬-২৭

প্রশ্ন—'ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ' কথাটির সঙ্গে '**অমী**', '**সর্বে**' এবং '**এব**' এই পদগুলি প্রয়োগের অভিপ্রায় কী?

উত্তর—'**অমী**' পদটি প্রয়োগের এই অভিপ্রায় যে, ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধনাদি যেসব পুত্রদের আমি এখনই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত দেখছিলাম, তাদের সকলকেই আপনার মধ্যে প্রবেশ করে বিনাশ প্রাপ্ত হতে দেখছি। '**সর্বে**' ও '**এব**' দ্বারা বলতে চেয়েছেন যে, এই দুর্যোধনেরা সকলেই আপনার মধ্যে প্রবেশ করছেন, এঁদের একশো জনের মধ্যে একজনকেও জীবিত বলে দেখতে পাচ্ছি না।

প্রশ্ন—'**অবনিপালসঙ্ঘৈঃ**' এবং '**সহ**' পদটির অভিপ্রায় কী?

উত্তর—'অবনিপাল' কথাটি রাজাদের বাচক এবং এরূপ রাজাদের সমূহের বাচক হল '**অবনিপালসঙ্ঘৈঃ**' পদটি। এটি এবং 'সহ' পদ প্রয়োগে অর্জুনের অভিপ্রায় হল, শুধু ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদেরই আমি আপনার মধ্যে প্রবেশ করতে দেখছি না; তাঁদের সঙ্গে আমি অন্যান্য সব রাজন্যবর্গকেও—যাঁরা দুর্যোধনের সাহায্যের জন্য এসেছিলেন—আপনার মধ্যে প্রবিষ্ট হতে দেখছি।

প্রশ্ন—ভীষ্ম ও দ্রোণের নাম পৃথকরূপে বলার তাৎপর্য কী?

উত্তর—পিতামহ ভীষ্ম এবং গুরু দ্রোণ কৌরব সেনার সর্বপ্রধান মহাযোদ্ধা ছিলেন। অর্জুনের মতে এঁদের পরাস্ত করা বা বধ করা অত্যন্ত কঠিন। এখানে ঐ দুজনের নাম করে অর্জুন বলেছেন, 'ভগবন্! অন্যের কথা আর কী বলব; আমি দেখতে পাচ্ছি যে ভীষ্ম ও দ্রোণের ন্যায় মহাযোদ্ধাও আপনার ভীষণ বিকট মুখে প্রবেশ করছেন।'

প্রশ্ন—সূতপুত্রের সঙ্গে '**অসৌ**' বিশেষণ দেওয়ার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—বীরবর কর্ণের এবং অর্জুনের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। তাই তাঁর নামের সঙ্গে '**অসৌ**' বিশেষণ প্রয়োগে অর্জুনের এই অভিপ্রায় যে, নিজ শৌর্যের দর্পে যে কর্ণ সকলকে তুচ্ছ বলে মনে করতেন, তিনিও আজ আপনার বিকট মুখে প্রবেশ করে বিনাশপ্রাপ্ত হচ্ছেন।

প্রশ্ন—'**অপি**' পদ প্রয়োগের তাৎপর্য কী এবং '**সহ**' পদ প্রয়োগ করে '**অস্মদীয়ৈঃ**' ও '**যোধমুখ্যৈঃ**' এই দুটি পদের দ্বারা কী বলা হয়েছে?

উত্তর—'**অপি**' এবং প্রশ্নে ব্যবহৃত অন্যান্য পদগুলি প্রয়োগ করে অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে, শুধু শত্রুপক্ষের বীরেরাই আপনার মধ্যে প্রবেশ করছেন না; আমাদের পক্ষেরও যেসব প্রধান যোদ্ধা আছেন, শত্রুপক্ষের বীরেদের সঙ্গে তাঁদেরও আপনার বিকট মুখে প্রবেশ করতে দেখছি।

প্রশ্ন—'**ত্বরমাণাঃ**' পদটি কীসের বিশেষণ এবং এটি প্রয়োগের কী তাৎপর্য? 'মুখানি'র সঙ্গে '**দংষ্ট্রাকরালানি**' ও '**ভয়ানকানি**' বিশেষণ প্রয়োগের অর্থ কী?

উত্তর—'**ত্বরমাণাঃ**' পদটি পূর্বশ্লোকে বর্ণিত দুপক্ষের সকল যোদ্ধাদের বিশেষণ। '**দংষ্ট্রাকরালানি**' সেই মুখের বিশেষণ যা বড় বড় ভয়ানক দাঁতের জন্য ভীষণ বিকট আকৃতির; এবং '**ভয়ানকানি**' কথার অর্থ হল—যা দেখলেই ভয় উৎপন্ন করে। এখানে এই পদগুলি প্রয়োগ করে অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে, আগের শ্লোকে বর্ণিত উভয় পক্ষের সকল যোদ্ধাদের আমি অত্যন্ত বেগে আপনার বিকট দন্তযুক্ত ভয়ানক মুখে প্রবেশ করতে দেখছি। অর্থাৎ আমি প্রত্যক্ষ দেখছি যে, সকল বীর চারদিক থেকে অতি দ্রুত গতিতে আপনার ভয়ংকর মুখে প্রবেশ করে বিনাশপ্রাপ্ত হচ্ছেন।

প্রশ্ন—আপনার দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে কত চূর্ণিত মস্তকখণ্ড আটকে থাকতে দেখছি, এই কথাটির অভিপ্রায় কী?

উত্তর—এর দ্বারা অর্জুনের অভিপ্রায় হল, এঁদের

সবাইকে শুধু আপনার মুখে প্রবিষ্ট হতেই দেখিনি : তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের এতো খারাপ দশাও দেখছি যে তাঁদের মস্তক চূর্ণ হয়ে গেছে এবং সেই মস্তক চূর্ণ আপনার দাঁতের ফাঁকে বিশ্রীভাবে আটকে রয়েছে।

সম্বন্ধ—উভয় সেনার যোদ্ধাদের অর্জুন কীভাবে ভগবানের বিকট মুখে প্রবিষ্ট হতে দেখছেন, এবার দুটি শ্লোকে তাকে প্রথমে নদীর জলের দৃষ্টান্তে এবং পরে পতঙ্গদের দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্টীকরণ করছেন—

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি॥ ২৮

যেমন নদীগুলির বহু জলপ্রবাহ স্বাভাবিকভাবেই সমুদ্র অভিমুখে যায় অর্থাৎ দ্রুতবেগে সমুদ্রে প্রবেশ করে, তেমনই এই বীরগণও আপনার জ্বলন্ত মুখে প্রবেশ করছেন॥ ২৮

প্রশ্ন—এই শ্লোকে নদীগুলির সমুদ্রে প্রবেশের দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রবেশকারী বীরেদের জন্য **'নরলোকবীরাঃ'** বিশেষণ কী অভিপ্রায়ে দেওয়া হয়েছে এবং মুখের সঙ্গে **'অভিবিজ্বলন্তি'** বিশেষণ প্রয়োগের তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এই শ্লোকে সেই ভীষ্ম-দ্রোণাদি শ্রেষ্ঠ শূরবীরদের প্রবেশ করার বর্ণনা করা হয়েছে, যাঁরা ঈশ্বর লাভের জন্য সাধন করছিলেন এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধেই যাঁদের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল এবং যুদ্ধে মৃত্যুলাভ করে যারা ভগবানকে লাভ করতেন। তাই তাঁদের জন্য **'নরলোকবীরাঃ'** বিশেষণ প্রযুক্ত হয়েছে। এঁরা জাগতিক যুদ্ধে যেমন মহাবীর ছিলেন, তেমনই ভগবৎপ্রাপ্তির সাধনরূপ আধ্যাত্মিক যুদ্ধেও অর্থাৎ অত্যুগ্র দুর্জয় শত্রু 'কাম' আদির সঙ্গেও অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে লড়েছিলেন। তাঁদের প্রবেশে নদী ও সমুদ্রের উপমা দিয়ে অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে, নদীর জল যেমন স্বাভাবিক ভাবে সমুদ্রের দিকে যায় এবং শেষে নিজ নাম-রূপ ত্যাগ করে সমুদ্র হয়ে যায়, তেমনই এই শূরবীর ভক্তেরাও আপনার দিকে মুখ করে তীব্র গতিতে দৌড়চ্ছেন এবং আপনার মধ্যে অভিন্নভাবে প্রবেশ করছেন।

এখানে মুখের সঙ্গে **'অভিবিজ্বলন্তি'** বিশেষণের এই তাৎপর্য যে, সমুদ্রে যেমন সর্বদিকে জলই ভরা থাকে এবং নদীর জল তাতে প্রবেশ করে তার সঙ্গে একত্ব প্রাপ্ত হয়, তেমনই আপনার সব মুখও সর্বদিকে অত্যন্ত জ্যোতির্ময় এবং তাতে প্রবেশকারী শূরবীর ভক্তগণও আপনার মুখের মহাজ্যোতিতে তাঁদের বাহ্যরূপ দগ্ধ করে স্বয়ং জ্যোতির্ময় হয়ে আপনার সঙ্গে একত্ব লাভ করছেন।

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ॥ ২৯

যেমন পতঙ্গ মোহবশে মরণের জন্য বেগে ধাবিত হয়ে জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, তেমনই এই সব লোকও নিজ বিনাশের জন্য অতি বেগে দৌড়ে আপনার মুখগহ্বরে প্রবেশ করছেন॥ ২৯

প্রশ্ন—এই শ্লোকে প্রজ্বলিত অগ্নি ও পতঙ্গের দৃষ্টান্ত দিয়ে ভগবানের মুখবিবরে সকল লোকেদের প্রবেশ করার কথা বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে পূর্বের শ্লোকে কথিত ভক্তগণ ব্যতীত অন্যান্য সেই সমস্ত সাধারণ লোকেদের প্রবেশের বর্ণনা করা হয়েছে, যাঁরা স্বেচ্ছায় যুদ্ধ করতে এসেছেন। তাই জ্বলন্ত অগ্নি ও পতঙ্গের দৃষ্টান্ত দিয়ে অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে, পতঙ্গ যেমন মোহবশে বিনাশ হওয়ার জন্যই স্বেচ্ছায় সবেগে অগ্নিতে প্রবেশ করে, তেমনই এই সব লোকও আপনার প্রভাব না জানায় মোহগ্রস্ত হয়ে এবং নিজেদের বিনাশের জন্যই পতঙ্গের ন্যায় সবেগে আপনার মুখে প্রবেশ করছেন।

সম্বন্ধ—দৃষ্টান্ত দ্বারা উভয় সেনাদের প্রবেশের বর্ণনা করে এবার সেই লোকেদের ভগবান কীভাবে বিনাশ করছেন, তার বর্ণনা করা হচ্ছে—

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো॥ ৩০

আপনি সেই সকল লোকেদের জ্বলন্ত মুখের দ্বারা গ্রাস করে সর্বদিকে জিহ্বা দ্বারা বারংবার লেহন করছেন। হে বিষ্ণো ! আপনার তীব্র প্রভা সমস্ত জগৎকে তেজোরাশিতে পূর্ণ করে তাপিত করছে॥ ৩০

প্রশ্ন—এই শ্লোকের ভাবার্থ কী ?

উত্তর—ভগবানের মহা উগ্ররূপ দেখে ভীতসন্ত্রস্ত অর্জুন অতি ভয়ানক সেই রূপের বর্ণনা করে বলছেন যে, যাঁর মধ্যে থেকে ভয়ানক অগ্নি বেরিয়ে আসছে, আপনি সেই বিকট মুখ দিয়ে সমস্ত লোককে গ্রাস করছেন এবং তার পরেও অতৃপ্তভাবে বারংবার নিজ জিহ্বা দ্বারা মুখ লেহন করছেন। আপনার সেই অতি উগ্র প্রকাশের ভয়ানক তেজে সমস্ত জগৎ অত্যন্ত তাপিত হচ্ছে।

সম্বন্ধ—অর্জুন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে ভগবানের কাছে তাঁর ঐশ্বর্যময় রূপ দেখাবার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, সেই অনুসারে ভগবান তাঁর বিশ্বরূপ অর্জুনকে দেখালেন ; কিন্তু ভগবানের সেই ভয়ানক উগ্র রূপ দেখে অর্জুন অত্যন্ত ভয় পেলেন এবং তাঁর মনে জানার ইচ্ছা জাগ্রত হল যে, এই শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে কে ? আর তিনি এই মহা উগ্র স্বরূপের দ্বারা কী করতে চান ? তাই তিনি ভগবানকে জিজ্ঞাসা করছেন—

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্॥ ৩১

আমাকে বলুন এই উগ্ররূপে কে আপনি ? হে দেবশ্রেষ্ঠ ! আপনাকে প্রণাম করি, আপনি প্রসন্ন হোন। আদিপুরুষ আপনাকে আমি বিশেষভাবে জানতে ইচ্ছা করি, কারণ আপনার কী প্রবৃত্তি তা আমি জানি না॥ ৩১

প্রশ্ন—অর্জুন তো জানতেনই যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যোগশক্তির সাহায্যে অর্জুনকে তাঁর বিশ্বরূপ দেখাচ্ছেন, তাহলে তিনি আবার কেন জিজ্ঞাসা করলেন যে, এই উগ্ররূপধারী আপনি কে ?

উত্তর—অর্জুন একথা জানতেন যে এই উগ্ররূপ শ্রীকৃষ্ণেরই ; কিন্তু এই ভয়ংকর উগ্ররূপ দেখে তাঁর জানার ইচ্ছা হয় যে এই শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে কে ? যিনি এইরূপ ভয়ংকর রূপ ধারণ করতে সক্ষম ! তাই তিনি বলেছেন আপনার ন্যায় আদিপুরুষকে আমি বিশেষভাবে জানতে চাই।

প্রশ্ন—**'দেববর'** সম্বোধনে ভগবানকে নমস্কার করার এবং তাঁকে প্রসন্ন হতে বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—দেবতাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, তাঁকে **'দেববর'** বলা হয়। তাই ভগবানকে **'দেববর'** নামে সম্বোধন করে অর্জুন তাঁর ঈশ্বরত্বকে ব্যক্ত করে তাঁকে নমস্কার করছেন। তাঁর সেই ভয়ানক রূপ দেখে অর্জুন খুবই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। সেইজন্য তাঁকে প্রসন্ন হতে বলার জন্য প্রার্থনা করতে লাগলেন।

প্রশ্ন—আপনার প্রবৃত্তি কী, তা আমি জানি না। এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—অর্জুনের এই রকম বলার অভিপ্রায় হল, এই রূপ এত ভয়ংকর যে, কৌরব পক্ষের এবং আমাদের প্রায় সকল যোদ্ধাদের প্রত্যক্ষভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হতে দেখা যাচ্ছে—আপনি কেন আমাকে এসব দেখাচ্ছেন ? অদূর ভবিষ্যতে আপনি কী করতে চান—তাও আমি জানি না। অতএব আপনি কৃপা করে এই রহস্য উন্মোচন করুন।

সম্বন্ধ—অর্জুনের এরূপ জিজ্ঞাসায় ভগবান তাঁর উগ্ররূপ ধারণ করার কারণ জানিয়ে প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তর দিচ্ছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—আমি লোকবিনাশক প্রবৃদ্ধ কাল, এখন লোকসংহারে প্রবৃত্ত হয়েছি। তুমি যদি যুদ্ধ না করো, তবুও অপরপক্ষের কোনো যোদ্ধাই জীবিত থাকবে না অর্থাৎ এঁদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী ॥ ৩২

প্রশ্ন—আমি লোকবিনাশকারী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কাল, এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথার দ্বারা ভগবান অর্জুনের প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, যাতে অর্জুন জানতে চেয়েছিলেন যে, আপনি কে ? ভগবানের কথার অভিপ্রায় হল যে আমি সমস্ত জগতের সৃজন, পালন ও সংহারকারী সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। অতএব এখন আমাকে তুমি এই সব কিছুর সংহারকারী সাক্ষাৎ কাল বলে জেনো।

প্রশ্ন—এখন আমি এই সব লোকেদের বিনাশ করতে প্রবৃত্ত হয়েছি, এই কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর— এই কথার দ্বারা ভগবান অর্জুনের সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, যাতে অর্জুন বলেছিলেন যে, 'আমি আপনার কী প্রবৃত্তি তা জানি না'। ভগবানের কথার অর্থ এই যে, এখন আমার সকল প্রচেষ্টা হল এইসব লোকেদের বিনাশ করা এবং এই কথা বোঝাবার জন্যই আমি এই বিরাটরূপের মধ্যে তোমাকে সকলের বিনাশের ভয়ংকর দৃশ্য দেখালাম।

প্রশ্ন— প্রতিপক্ষের যেসব সেনা এখানে উপস্থিত, তুমি না থাকলেও এরা থাকবে না, এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথার দ্বারা ভগবান বলতে চেয়েছেন যে গুরু, জেঠা, কাকা, মামা এবং ভাই ইত্যাদি আত্মীয়-স্বজনদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত দেখে তোমার মনে যে কাপুরুষতার ভাব জাগ্রত হয়েছে এবং যার জন্য তুমি যুদ্ধ থেকে বিরত হতে চাইছ— তা ঠিক নয় ; কারণ তুমি যদি এঁদের যুদ্ধে বধ না করো, তাহলেও এঁরা বাঁচবেন না। এঁদের মৃত্যু নিশ্চিত। আমি নিজে যখন এঁদের বধ করতে প্রবৃত্ত হয়েছি, তখন এমন কোনো উপায় নেই, যাতে এঁরা রক্ষা পেতে পারেন। অতএব তোমার যুদ্ধ থেকে বিরত হওয়া উচিত নয়। আমার নির্দেশানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াই তোমার পক্ষে মঙ্গলকর।

প্রশ্ন—অর্জুন তো ভগবানের বিরাটরূপে নিজের এবং শত্রু পক্ষের সকল যোদ্ধাদের বিনাশ হতে দেখেছিলেন, তাহলে ভগবান এখানে শুধু কৌরবপক্ষের যোদ্ধাদের কথা কেন বললেন ?

উত্তর—অর্জুনের পক্ষে নিজ দলের যোদ্ধাদের বধ করা সম্ভব নয়, তাই 'তুমি না মারলেও এরা মরবেই' একথা তাদের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। সেইজন্যই ভগবান এখানে শুধু কৌরবপক্ষের বীরেদের কথাই বলেছেন। তাছাড়া অর্জুনকে উৎসাহ দেবার জন্যও ভগবানের এরূপ বলা যুক্তিসঙ্গত। ভগবান যেন বোঝাতে চেয়েছেন যে, শত্রুপক্ষের যত যোদ্ধা তারা সবাই একপ্রকারে মরেই আছে, এদের মারতে কোনো পরিশ্রম করতে হবে না।

সম্বন্ধ—এইভাবে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ভগবান এবার দুটি শ্লোকে যুদ্ধ করায় সর্বপ্রকার লাভ দেখিয়ে অর্জুনকে উৎসাহিত করে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিচ্ছেন—

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্॥ ৩৩

অতএব তুমি যুদ্ধার্থে ওঠো, যশ প্রাপ্ত করো এবং শত্রু জয় করে ধন-ধান্য সম্পন্ন রাজ্য ভোগ করো।

এই যোদ্ধাদের আমি পূর্বেই বধ করেছি। হে সব্যসাচিন্ ! তুমি কেবল নিমিত্তমাত্র হও ॥ ৩৩

প্রশ্ন—এখানে '**তস্মাৎ**' পদের সঙ্গে '**উত্তিষ্ঠ**' পদটি প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'**তস্মাৎ**'-এর সঙ্গে '**উত্তিষ্ঠ**' পদটি প্রয়োগ করে ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, তুমি যুদ্ধ না করলেও যখন এঁরা জীবিত থাকবেন না, অবশ্যই মরবেন, তখন তোমার যুদ্ধ করাই সর্বপ্রকারে লাভদায়ক। সুতরাং তুমি কোনোমতেই যুদ্ধ থেকে বিরত হয়ো না, উৎসাহের সঙ্গে উঠে দাঁড়াও।

প্রশ্ন—যশ লাভ এবং শত্রু জয় করে সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ করার কথা বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, এই যুদ্ধে তোমার বিজয়লাভ নিশ্চিত, সুতরাং শত্রুজয় করে ধন-ধান্যসম্পন্ন বিশাল রাজ্য উপভোগ করো ও দুর্লভ যশ লাভ করো, এই সুযোগ বৃথা নষ্ট করো না।

প্রশ্ন—'**সব্যসাচিন্**' নামে সম্বোধন করে একথা বলার অভিপ্রায় কী যে, এরা আগেই আমার দ্বারা নিহত হয়েছে, তুমি শুধু নিমিত্ত মাত্র হও ?

উত্তর—যিনি বাম হাতেও বাণ চালাতে পারেন, তাঁকে 'সব্যসাচী' বলা হয়। এখানে অর্জুনকে 'সব্যসাচী' নামে সম্বোধন করে ও নিমিত্তমাত্র হতে বলে ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, তুমি তো উভয় হাতেই বাণ চালাতে নিপুণ, এই শূরবীরদের জয় করা তোমার কাছে এমন কী বড় ব্যাপার। আর এদের তো তোমার মারতেও হবে না, তুমি তো দেখেই নিয়েছ যে এরা সকলে আমার হাতে আগেই মারা পড়েছে ! তোমার তো শুধু নাম-যশ হবে। সুতরাং এখন তুমি এদের বধ করতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ কোরো না। আমি তো মেরেই রেখেছি, তুমি শুধু নিমিত্তমাত্র হও।

নিমিত্তমাত্র হতে বলার আর একটি গূঢ়ার্থ হল যে, এঁদের বধ করলে তোমার কোনোরূপ পাপ হওয়ার সম্ভাবনা নেই ; কারণ তুমি ক্ষাত্রধর্ম অনুসারে কর্তব্যরূপে প্রাপ্ত যুদ্ধে এঁদের মারার জন্য কেবল নিমিত্তরূপে রয়েছ। তাই পাপ তো দূরের কথা, তোমার দ্বারা বরং ক্ষাত্রধর্মপালন হবে। সুতরাং তোমার মনে কোনোরূপ সংশয় না রেখে, অহংকার ও মমত্বরহিত হয়ে উৎসাহপূর্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্॥ ৩৪

দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং বহু যোদ্ধাদের আমি আগেই বধ করেছি, সেই মৃতদেরই তুমি বধ করো, ভয় করো না। তুমি নিশ্চয় যুদ্ধে শত্রু জয় করবে। অতএব যুদ্ধ করো ॥ ৩৪

প্রশ্ন—দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ ও কর্ণ—এই চারজনের নাম পৃথকভাবে বলার অভিপ্রায় কী ? '**অন্যান্**' বিশেষণের সঙ্গে '**যোধবীরান্**' পদে কাদের লক্ষ্য করানো হয়েছে ; এদের সকলকে নিজের দ্বারা নিহত বলে তাদের নিহত করার জন্য বলার তাৎপর্য কী ?

উত্তর—দ্রোণাচার্য ধনুর্বেদ এবং অন্যান্য শস্ত্র প্রয়োগ বিদ্যায় অত্যন্ত পারঙ্গম এবং যুদ্ধকলায় পরম নিপুণ ছিলেন। একথা প্রসিদ্ধ ছিল যে, যতক্ষণ তাঁর হাতে শস্ত্র থাকবে, ততক্ষণ তাঁকে কেউ মারতে পারবে না। তাই অর্জুন তাঁকে অজেয় বলে ভাবতেন এবং গুরু হওয়ার জন্য তাঁকে বধ করা পাপ বলেও মনে করতেন। পিতামহ ভীষ্মের শৌর্য ছিল জগৎপ্রসিদ্ধ। পরশুরামের ন্যায় অজেয় বীরকেও তিনি হারিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে তাঁর পিতা শান্তনু তাঁকে বরদান করেছিলেন যে, তাঁর ইচ্ছা বিনা মৃত্যুও তাঁকে বধ করতে পারবে না। এই সব কারণে অর্জুনের ধারণা ছিল যে পিতামহ ভীষ্মকে জয় করা সহজ কাজ নয়, সেই সঙ্গে নিজ হাতে তিনি পিতামহকে বধ করা পাপ বলেও মনে করতেন। তিনি কয়েকবার বলেওছিলেন আমি এঁকে বধ করতে চাই না।

জয়দ্রথ[1] নিজে বড় বীর ছিলেন এবং ভগবান শংকরের ভক্ত হওয়ায় তাঁর থেকে দুর্লভ বর লাভ করে দুর্জয় হয়েছিলেন। পরে দুর্যোধনের ভগিনী দুঃশলার স্বামী হওয়ায় তিনি পারিবারিক সম্বন্ধে পাণ্ডবদের ভগিনীপতিও ছিলেন। স্বাভাবিক সৌজন্য ও আত্মীয়তার জন্য অর্জুন তাঁকে বধ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

কর্ণকেও অর্জুন তাঁর থেকে কোনোপ্রকার কম বীর মনে করতেন না। জগতে একথা প্রসিদ্ধ ছিল যে অর্জুনের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী কর্ণই। তিনি নিজে অত্যন্ত বড় বীর ছিলেন এবং পরশুরামের কাছে শস্ত্রবিদ্যা আয়ত্ত করেন।

তাই এই চারজনের নাম পৃথক ভাবে নিয়ে এবং **'অন্যান্'** বিশেষণের সঙ্গে **'যোধবীরান্'** পদ দ্বারা এঁরা ছাড়াও ভগদত্ত, ভূরিশ্রবা ও শল্য প্রমুখ যেসব যোদ্ধাদের অর্জুন অত্যন্ত বড় বীর মনে করতেন এবং যাঁদের জয় করা সহজ নয় বলে ভাবতেন, তাঁদের সকলকে নিজের দ্বারা নিহত করা হয়েছে বলে এবং অর্জুনকে তাদের হত করার জন্য নির্দেশ দানে ভগবানের এই অভিপ্রায় প্রকট হয় যে, অর্জুনের কারোকে জয় করা নিয়ে কোনো প্রকার সন্দেহ মনে রাখা উচিত নয়। এঁরা সকলেই আমার দ্বারা নিহত হয়েছেন। সেই সঙ্গে একথাও বলেছেন যে গুরুজনদের বধ করায় যে পাপের আশঙ্কা অর্জুন করছেন, তা-ও ঠিক নয়। কারণ ক্ষাত্রধর্মানুসারে এঁদের বধ করতে তুমি যে নিমিত্ত হবে, তাতে তোমার কোনো পাপ হবে না, বরং ক্ষাত্র-ধর্মেরই পালন হবে। অতএব ওঠো এবং এঁদের জয় করো।

প্রশ্ন—'মা ব্যথিষ্ঠাঃ' কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—ভগবান এর দ্বারা অর্জুনকে এই বলে আশ্বস্ত করেছেন যে, আমার উগ্ররূপ দেখে তুমি যে এতো ভীত ও ব্যথিত হয়েছ, এটা ঠিক নয়। আমি তোমার প্রিয় সেই কৃষ্ণ ! সুতরাং তুমি আমাকে ভয় পেয়ো না এবং সন্তপ্তও হোয়ো না।

প্রশ্ন—তুমি যুদ্ধে নিঃসন্দেহে শত্রু জয় করবে, অতএব যুদ্ধ করো—এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—অর্জুনের মনে যে আশঙ্কা ছিল যে কি জানি যুদ্ধে আমরা জিতব না শত্রুরাই আমাদের জয় করবে (২।৬), সেই আশঙ্কা দূর করতে ভগবান একথা বলেছেন। ভগবানের কথার অভিপ্রায় হল যে যুদ্ধে অবশ্যই তুমি বিজয় লাভ করবে, সুতরাং তোমার উৎসাহপূর্বক যুদ্ধ করা উচিত।

সম্বন্ধ—ভগবানের মুখে এই সব কথা শুনে অর্জুনের কী অবস্থা হল এবং তিনি কী করলেন—এই প্রশ্নে সঞ্জয় বলেছেন—

সঞ্জয় উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য॥ ৩৫

[1]জয়দ্রথ সিন্ধুদেশের রাজা বৃদ্ধক্ষত্রের পুত্র ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের একমাত্র কন্যা দুঃশলার সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। পাণ্ডবদের বনবাসের সময় তাঁদের অনুপস্থিতিতে একবার ইনি দ্রৌপদীকে হরণ করেন। ভীমসেনরা ফিরে এসে একথা শুনে তাঁর অনুসরণ করে দ্রৌপদীকে ছাড়ান এবং এঁকে ধরে আনেন। পরে যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে মাথা মুড়িয়ে জয়দ্রথকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুন যখন সংসপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত, ইনি চক্রব্যূহের প্রবেশ পথে যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেবকে শিবের বরে আটকান, যার জন্য এঁরা অভিমন্যুকে সাহায্য করতে ভেতরে যেতে পারেননি এবং সপ্তমহারথী পরিবৃত হয়ে অভিমন্যু মারা যান। তখন অর্জুন প্রতিজ্ঞা করেন যে, 'কাল সূর্যাস্তের আগে জয়দ্রথকে বধ না করলে আমি অগ্নিতে প্রাণবিসর্জন দেব'। কৌরববীরেরা জয়দ্রথকে রক্ষার খুব চেষ্টা করেন ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে তাঁদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং অর্জুন সূর্যাস্তের আগেই তাঁর মাথা দেহ থেকে আলাদা করে দেন। জয়দ্রথ একটি বর পেয়েছিলেন যে, যে তোমার কাটা মুণ্ড মাটিতে ফেলবে, তার মাথা তৎক্ষণাৎ শতচূর্ণ হয়ে যাবে। তাই ভক্তবৎসল ভগবানের নির্দেশে অর্জুন জয়দ্রথের কাটা মুণ্ড বাণের সাহায্যে উড়িয়ে নিয়ে সমন্ত পঞ্চক তীর্থে আসীন জয়দ্রথের পিতা বৃদ্ধক্ষত্রের কোলে ফেলে দেন এবং তিনি সেই মুণ্ড মাটিতে ফেলতেই তাঁর মাথা শতটুকরো হয়ে যায়। (মহাভারত, দ্রোণপর্ব)

সঞ্জয় বললেন—কেশবের এই কথা শুনে মুকুটধারী অর্জুন কম্পিত দেহে হাত জোড় করে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করলেন এবং অত্যন্ত ভীত হয়ে আবার প্রণাম করে গদ্‌গদ স্বরে বললেন—॥ ৩৫

প্রশ্ন—ভগবানের বচন শুনে অর্জুনের ভীত ও কম্পিত হওয়ার কথা উল্লেখ করার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—সঞ্জয় এর দ্বারা বলতে চেয়েছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সেই ভয়ানক রূপ দেখে অর্জুন এতো ব্যাকুল হয়েছিলেন যে ভগবান এইভাবে আশ্বস্ত করলেও তাঁর ভয় দূর হয়নি ; তাই তিনি ভীতকম্পিত হয়ে ভগবানকে তাঁর রূপ সংবরণ করার জন্য প্রার্থনা করতে লাগলেন।

প্রশ্ন—অর্জুনের নাম 'কিরীটী' হয়েছিল কেন ?

উত্তর—অর্জুনের মাথায় দেবরাজ ইন্দ্র প্রদত্ত সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল দিব্য মুকুট সর্বদা বিরাজ করত, তাই তাঁর আর একটি নাম হয়েছিল 'কিরীটি'[১]।

প্রশ্ন—'কৃতাঞ্জলিঃ' বিশেষণ দিয়ে পুনরায় সেই অর্থের বাচক **'নমস্কৃত্বা'** এবং **'প্রণম্য'** এই দুটি পদ প্রয়োগের তাৎপর্য কী ?

উত্তর—'কৃতাঞ্জলিঃ' বিশেষণ দিয়ে এবং ঐ দুটি পদ প্রয়োগ করে সঞ্জয় বলতে চেয়েছেন যে, ভগবানের অনন্ত ঐশ্বর্যময় রূপ দেখে সেই স্বরূপের প্রতি অর্জুনের অত্যন্ত সম্মান উদ্রেক হয়েছিল এবং তিনি ভয়ও পেয়েছিলেন। তাই তিনি হাত জোড় করে বারংবার ভগবানকে নমস্কার ও প্রণাম করে স্তুতি করতে থাকেন।

প্রশ্ন—'ভূয়ঃ' পদটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'ভূয়ঃ' পদটির দ্বারা দেখানো হয়েছে যে, অর্জুন প্রথমে যেমনভাবে ভগবানের স্তুতি করেছিলেন, ভগবানের বাণী শোনার পর তিনি পুনরায় তেমনভাবেই ভগবানের স্তুতি করতে থাকেন।

প্রশ্ন—'সগদ্‌গদম্' পদটির অর্থ কী এবং এটি কার বিশেষণ ? এখানে এটি কোন্ অভিপ্রায়ে ব্যক্ত হয়েছে ?

উত্তর—'সগদ্‌গদম্' পদটি ক্রিয়াবিশেষণ, এটি অর্জুনের কথা বলার স্বরূপ বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে অর্জুন যখন ভগবানের স্তুতি করছিলেন, তখন বিস্ময় ও ভয়ে তাঁর হৃদয় দ্রবীভূত হয়ে গিয়েছিল, চক্ষু অশ্রুপূর্ণ ও কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাই তাঁর বাক্য জড়িয়ে গিয়েছিল। ফলে কথার উচ্চারণ অস্পষ্ট এবং করুণাপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

সম্বন্ধ—এবার ছত্রিশ থেকে ছেচল্লিশতম শ্লোক পর্যন্ত অর্জুন দ্বারা ভগবানের স্তব, নমস্কার ও ক্ষমা প্রার্থনা বর্ণনা করা হয়েছে, তার মধ্যে প্রথমেই 'স্থানে' পদটি প্রয়োগ করে জগতের আনন্দিত হওয়া ইত্যাদির ঔচিত্য জানিয়েছেন—

অর্জুন উবাচ

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ॥ ৩৬

অর্জুন বললেন—হে হৃষীকেশ ! আপনার মাহাত্ম্য কীর্তনে সমস্ত জগৎ আনন্দিত ও আপনার প্রতি অনুরক্ত হচ্ছে। ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে রাক্ষসেরা চতুর্দিকে পালাচ্ছে এবং সিদ্ধগণ আপনাকে নমস্কার জানাচ্ছেন। এসবই খুব যুক্তিযুক্ত॥ ৩৬

প্রশ্ন—'স্থানে' পদটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'স্থানে' পদটি অব্যয় এবং এটি ঔচিত্যের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ হল যে, আপনার কীর্তনাদিতে জগৎ যে আনন্দিত হচ্ছে, আপনার প্রতি অনুরক্ত হচ্ছে, সেই সঙ্গে রাক্ষসেরা আপনার অদ্ভুত রূপ এবং প্রভাব দেখে ভয়ে নানাদিকে পালাচ্ছে, সিদ্ধগণ

[১]পুরা শক্রেণ মে দত্তং যুধ্যতো দানবর্ষভৈঃ। কিরীটং মূর্ধ্নি সূর্যাভং তেনাহুর্মাং কিরীটিনম্॥

(মহাভারত, বিরাটপর্ব ৪৪।১৭)

বিরাটপুত্র উত্তরকুমারকে অর্জুন বলেছেন—পূর্বে যখন আমি অত ভয়ানক বীর দানবদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলাম, তখন ইন্দ্র প্রসন্ন হয়ে সূর্যের ন্যায় তেজযুক্ত কিরীট আমার মাথায় পরিয়ে দেন, তাই লোকে আমাকে 'কিরীটী' বলে।

সকলে আপনাকে বারংবার নমস্কার জানাচ্ছেন—এ সবই উচিত কাজ, এরূপই হওয়ার ছিল ; কারণ আপনি সাক্ষাৎ পরমেশ্বর।

প্রশ্ন— এখানে '**প্রকীর্ত্যা**' পদটির অর্থ কী ? তার দ্বারা জগৎ আনন্দিত হচ্ছে এবং আপনার প্রতি অনুরক্ত হচ্ছে—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর— 'কীর্তি' শব্দ এখানে কীর্তনের বাচক, তার সঙ্গে 'প্র' উপসর্গ যোগ করে উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করার ভাব প্রকট করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে আপনার নাম, রূপ, গুণ, প্রভাব ও মাহাত্ম্য উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করে জগতের সকল প্রাণী অত্যন্ত প্রসন্ন ও প্রেমে বিহ্বল হচ্ছে।

প্রশ্ন—ভগবানের বিরাটরূপ কি শুধু অর্জুনই দেখছিলেন না কি সমস্ত জগৎ ? যদি সমগ্র জগৎ না দেখে থাকে, তবে সকলের হর্ষিত হওয়ার, অনুরক্ত হওয়ার, রাক্ষসদের পালানোর এবং সিদ্ধগণের নমস্কার করার কথা অর্জুন কী করে বললেন ?

উত্তর—ভগবান প্রদত্ত দিব্যদৃষ্টি দ্বারা শুধু অর্জুনই দেখেছিলেন, সারা জগৎ নয়। জগতের আনন্দিত হওয়া ও অনুরক্ত হওয়া, রাক্ষসদের ভয়ে পালানো, সিদ্ধদেব নমস্কার করা—এ সবই সেই বিরাটরূপের অঙ্গ। অভিপ্রায় হল যে, এই বর্ণনা অর্জুনকে দেখানো বিরাটরূপেরই অন্তর্গত, বাহ্য জগতের নয়। তিনি ভগবানের যে বিরাটরূপ দেখেছিলেন, তার মধ্যেই এই সব দৃশ্য দেখা যাচ্ছিল, তাই জন্য অর্জুন একথা বলেছেন।

সম্বন্ধ— আগের শ্লোকে 'স্থানে' পদটি প্রয়োগ করে সিদ্ধগণের নমস্কার ইত্যাদির ঔচিত্য বলা হয়েছে, এবার চারটি শ্লোকে ভগবানের প্রভাবের বর্ণনা করে সেই কথা সিদ্ধ করে অর্জুনের বারংবার নমস্কার করার মনোভাব ব্যক্ত করা হচ্ছে—

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ॥ ৩৭

হে মহাত্মন্ ! ব্রহ্মারও আদিকর্তা ও সর্বোত্তম আপনাকে সকলে কেনই বা প্রণাম করবে না ? কেননা হে অনন্ত ! হে দেবেশ ! হে জগন্নিবাস ! যা সৎ, অসৎ এবং তারও অতীত অক্ষর অর্থাৎ সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ম, এসবই আপনি ॥ ৩৭

প্রশ্ন— '**মহাত্মন্**', '**অনন্ত**', '**দেবেশ**', এবং '**জগন্নিবাস**'—এই চারটি সম্বোধন প্রয়োগ করে অর্জুন কী বলতে চেয়েছেন ?

উত্তর—এগুলি প্রয়োগ করে অর্জুন নমস্কার ইত্যাদির ঔচিত্য প্রমাণ করেছেন। অভিপ্রায় হল যে, আপনি সমস্ত চরাচর প্রাণীদের মহান আত্মা, অন্তরহিত—আপনার রূপ, গুণ এবং প্রভাব ইত্যাদির সীমা নেই ; আপনি দেবতাদেরও প্রভু এবং সমস্ত জগতের একমাত্র পরমাধার। এই সমগ্র জগৎ আপনাতেই স্থিত এবং আপনি এতে পরিব্যাপ্ত। সুতরাং এঁদের আপনাকে নমস্কার ও প্রণাম করা সর্বপ্রকারে উচিত।

প্রশ্ন—'**গরীয়সে**' এবং '**ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে**' কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—এই দুটি পদের প্রয়োগও নমস্কার ইত্যাদির ঔচিত্য সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে। অর্থাৎ আপনি সবার থেকে বড় ও শ্রেষ্ঠতম ; জগতের তো কথাই নেই, সমস্ত জগৎ সৃষ্টিকারী ব্রহ্মাকেও আপনি সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং সকলের পরম পূজ্য এবং পরম শ্রেষ্ঠ হওয়ায় এঁদের সকলেরই আপনাকে নমস্কার, শ্রদ্ধা করা উচিত।

প্রশ্ন— যিনি 'সৎ', 'অসৎ' এবং তার অতীত '**অক্ষর**'—তা আপনিই, এই কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—যাঁর কখনো অভাব (বিনাশ) হয় না, সেই অবিনাশী আত্মাকে 'সৎ' এবং বিনাশশীল অনিত্য বস্তুকে 'অসৎ' বলা হয় ; এঁদেরই সপ্তম অধ্যায়ে 'পরা' এবং 'অপরা' প্রকৃতি এবং পঞ্চদশ অধ্যায়ে 'অক্ষর' ও 'ক্ষর' পুরুষ বলা হয়েছে। এসবের অতীত হলেন পরম অক্ষর সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মতত্ত্ব। অর্জুন তাঁর নমস্কারের ঔচিত্য প্রমাণ করতে গিয়ে বলেছেন যে এসব আপনারই স্বরূপ। সুতরাং আপনাকে নমস্কার ইত্যাদি জানানো সর্ব প্রকারেই উচিত।

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ।। ৩৮

আপনি আদিদেব এবং সনাতন পুরুষ, আপনি এই জগতের পরম আশ্রয় এবং জ্ঞাতা ও জ্ঞাতব্য, আপনি পরমধাম। হে অনন্তরূপ! আপনার দ্বারাই এই জগৎ পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে।। ৩৮

প্রশ্ন—আপনি আদিদেব ও সনাতন পুরুষ—এই কথার তাৎপর্য কী?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবানের স্তুতি করে অর্জুন বলেছেন যে আপনি সমস্ত দেবতার আদিদেব এবং সর্বদা চিরস্থায়ী সনাতন নিত্য পুরুষ পরমাত্মা।

প্রশ্ন—আপনি এই জগতের পরম আশ্রয়, কথাটির অভিপ্রায় কী?

উত্তর—এর দ্বারা অর্জুন বলেছেন যে, সমগ্র জগৎ প্রলয়কালে আপনার মধ্যেই লীন হয় এবং সর্বদা আপনারই কোনো এক অংশে থাকে; তাই আপনিই এর পরম আশ্রয়।

প্রশ্ন—'**বেত্তা**' পদটির অভিপ্রায় কী?

উত্তর—এর দ্বারা অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে, আপনি এই জগতের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সমস্ত যথার্থ ও পূর্ণরূপে জানেন, সবকিছুর নিত্য দ্রষ্টা; অতএব আপনি সর্বজ্ঞ, আপনার মতো সর্বজ্ঞ কেউ নেই।

প্রশ্ন—'**বেদ্যম্**' পদটির তাৎপর্য কী?

উত্তর—অর্জুনের '**বেদ্যম্**' পদ প্রয়োগের তাৎপর্য এই যে, যা জ্ঞাতব্য, যা জানা মনুষ্যজন্মের পরম উদ্দেশ্য, ত্রয়োদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ থেকে সপ্তদশ শ্লোক পর্যন্ত যে জ্ঞেয় তত্ত্বের বর্ণনা করা হয়েছে—আপনিই সেই সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম পরমেশ্বর।

প্রশ্ন—'**পরম্**' বিশেষণের সঙ্গে '**ধাম**' পদটির অভিপ্রায় কী?

উত্তর—এর দ্বারা অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে, মুক্ত পুরুষদের যে পরমগতি, যা লাভ হলে মানুষের পুনর্জন্ম হয় না, সেই সাক্ষাৎ পরমধাম আপনিই।

প্রশ্ন—'**অনন্তরূপ**' সম্বোধনের তাৎপর্য কী?

উত্তর—যাঁর স্বরূপ অনন্ত অর্থাৎ অসংখ্য, তাঁকে বলা হয় '**অনন্তরূপ**'। তাই এই নামে সম্বোধন করে অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে, আপনার রূপ অসীম ও অগণ্য, কেউ তার পার পায় না।

প্রশ্ন—এই সমগ্র জগৎ আপনার দ্বারা পরিব্যাপ্ত, এই কথাটির অভিপ্রায় কী?

উত্তর—এই কথায় অর্জুনের অভিপ্রায় হল, সমগ্র বিশ্বের প্রতি পরমাণুতে আপনি পরিব্যাপ্ত, জগতের কোনো স্থানই আপনি ছাড়া নেই।

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।। ৩৯

আপনি বায়ু, যমরাজ, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মার পিতাও আপনিই। আপনাকে সহস্রবার প্রণাম করি, পুনরায় প্রণাম করি। আপনাকে বারবার প্রণাম করি।। ৩৯

প্রশ্ন—বায়ু, যমরাজ, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র এবং প্রজাপতি ব্রহ্মাও আপনি—এটি বলার তাৎপর্য কী?

উত্তর—এই কথার দ্বারা অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে, যাঁদের নাম আমি করেছি, তাঁদের সহিত প্রণাম যোগ্য আরও যত দেবতা আছেন—সে সবই আপনার স্বরূপ। সুতরাং আপনিই সর্বভাবে সবার দ্বারা নমস্কার করার যোগ্য।

প্রশ্ন—আপনি '**প্রপিতামহ**' অর্থাৎ ব্রহ্মারও পিতা, এই কথাটির তাৎপর্য কী?

উত্তর—এই কথায় অর্জুনের অভিপ্রায় হল, সমগ্র জগতের উৎপাদনকারী কশ্যপ, প্রজাপতি দক্ষ ও সপ্তর্ষি ইত্যাদির পিতা হওয়ায় ব্রহ্মা সকলের পিতামহ এবং সেই ব্রহ্মারও উৎপন্নকারী আপনি, তাই আপনি সকলের প্রপিতামহ। সেজন্য সর্বতোভাবে আপনাকে নমস্কার করা উচিত।

প্রশ্ন—'**সহস্রকৃত্বঃ**' পদের সঙ্গে বারবার '**নমঃ**' পদ প্রয়োগের তাৎপর্য কী ?

উত্তর—'**সহস্রকৃত্বঃ**' পদটির সঙ্গে বারংবার '**নমঃ**' পদ প্রয়োগ করে দেখানো হয়েছে যে অর্জুন ভগবানের প্রতি সম্মান ও ভয়বশতঃ হাজার বার নমস্কার করেও ক্লান্ত হন না, তিনি তাঁকে ক্রমাগত নমস্কার করতে থাকেন।

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব।
অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ॥ ৪০

হে অনন্ত সামর্থ্যসম্পন্ন ! আপনাকে সামনে থেকে প্রণাম, পেছন থেকে প্রণাম ! হে সর্বাত্মন্ ! সবদিক থেকে আপনাকে প্রণাম। কারণ অনন্ত পরাক্রমশালী আপনি সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত করে আছেন, সুতরাং আপনিই সর্বস্বরূপ ॥ ৪০

প্রশ্ন—'**সর্ব**' সম্বোধন প্রয়োগ করে সামনে-পেছনে এবং সবদিকে নমস্কার করার তাৎপর্য কী ?

উত্তর—অর্জুনের 'সর্ব' নামে সম্বোধন করায় তাৎপর্য হল, আপনি সকলের আত্মা, সর্বব্যাপী ও সর্বরূপ ; সেইজন্য আমি আপনাকে সামনে-পেছনে, ওপরে-নীচে, ডাইনে-বাঁয়ে সর্বদিকে নমস্কার করছি। কারণ এমন কোনো স্থান নেই, যেখানে আপনি নেই। অতএব সর্বত্র অবস্থিত আপনাকে আমি সর্বদিকে প্রণাম করি।

প্রশ্ন—'**অমিতবিক্রমঃ**' কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এই বিশেষণের দ্বারা অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে সাধারণ মানুষের ন্যায় আপনার বিক্রম পরিমিত নয়, আপনি অপরিমিত পরাক্রমশালী, অর্থাৎ আপনি যেরূপ শস্ত্র প্রয়োগের লীলা করতে পারেন, তেমন প্রয়োগ করা কেউ অনুমানই করতে পারে না।

প্রশ্ন—আপনি সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত করে আছেন, তাই আপনি সর্বরূপ—এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—অর্জুন পূর্বে 'সর্ব' নামে ভগবানকে সম্বোধন করেছেন। এখন এই কথায় সেই 'সর্ব' কথাটি প্রমাণিত করছেন। অর্থাৎ আপনি এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত করে রেখেছেন। বিশ্বে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম অণুমাত্র এমন কোনো জায়গা বা বস্তু নেই যাতে আপনি নেই। অতএব সবকিছুই আপনি। প্রকৃতপক্ষে আপনার থেকে পৃথক কোনো জগৎ বা বস্তু নেই। এ আমার দৃঢ় সিদ্ধান্ত।

সম্বন্ধ—এইভাবে ভগবানের স্তুতি ও প্রণাম করে এবার ভগবানের গুণ, রহস্য ও মাহাত্ম্য যথার্থরূপে না জানায় বাক্য ও কর্ম দ্বারা করা অপরাধকে ক্ষমা করার জন্য অর্জুন দুটি শ্লোকে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন।

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥ ৪১
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥ ৪২

আপনার এই মাহাত্ম্য না জেনে, আপনাকে আমার সখা মনে করে প্রেমবশতঃ বা প্রমাদবশতঃ আমি 'হে কৃষ্ণ !' 'হে যাদব !' 'হে সখা !'—এই বলে অবুঝের মতো ডেকেছি ! হে অচ্যুত ! উপহাসছলে আহার, বিহার, আসন এবং শয়নের সময় একা বা অন্য সখাদের সামনে আপনার যে অমর্যাদা করেছি, হে অপ্রমেয়, অচিন্ত্যপ্রভাব স্বরূপ ! সেইসব অপরাধের জন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করুন ॥ ৪১-৪২

প্রশ্ন—'**ইদম্**' বিশেষণের সঙ্গে '**মহিমানম্**' পদটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—বিরাটরূপ দর্শনের সময় অর্জুন ভগবানের যে অতুলনীয়, অপ্রমেয় ঐশ্বর্য, গৌরব, গুণ ও প্রভাব

প্রত্যক্ষ করেছিলেন—তা লক্ষ্য করে **'মহিমানম্'** পদের সঙ্গে **'ইদম্'** বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—'ময়া'র সঙ্গে **'অজানতা'** বিশেষণ প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—'অজানতা' পদ এখানে হেতুগর্ভ বিশেষণ। **'ময়া'**র সঙ্গে এর প্রয়োগ করার অভিপ্রায় হল যে, আপনার যে মাহাত্ম্য আমি এখন প্রত্যক্ষ করেছি, তা যথার্থভাবে না জানায় আমি আপনার সঙ্গে অনুচিত ব্যবহার করেছি। সুতরাং না জেনে করা আমার অপরাধ আপনি ক্ষমা করে দিন।

প্রশ্ন—'সখা ইতি মত্বা', **'প্রণয়েন'** এবং **'প্রমাদাৎ'** এই পদগুলি ব্যবহারের তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এর দ্বারা অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে, আপনার অপ্রতিম এবং অপার মহিমা না জানায় আমি আপনাকে আমার সমকক্ষ মিত্র বলে মনে করেছিলাম। তাই কথাবার্তার সময় আমি কখনো আপনার মহান গৌরব ও সর্বপূজ্য মহত্ত্বের দিকে খেয়াল রাখিনি। সুতরাং প্রেম ও প্রমাদবশতঃ আমার দ্বারা অত্যন্ত ভুল হয়েছে। বড় বড় দেবতা এবং মহর্ষিগণ আপনার যে চরণ বন্দনাকে পরম সৌভাগ্য বলে মনে করেন, সেই আপনার সঙ্গে আমি সমবয়সীর মতো ব্যবহার করেছি। হে দয়ারসাগর ! আপনি দয়া করে আমার সেই সব অপরাধ ক্ষমা করুন।

প্রশ্ন—'প্রসভম্' পদটি প্রয়োগ করে **'হে কৃষ্ণ ! হে যাদব, হে সখে'**—এই পদগুলি প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—প্রেম বা প্রমাদবশতঃ যে অপরাধগুলি নিজের দ্বারা করা হয়েছে বলে মনে করছেন, এখানে উপরোক্ত পদগুলির দ্বারা অর্জুন সেইগুলির বিশদকরণ করছেন। তিনি বলছেন যে, 'হে প্রভো ! কোথায় আপনি আর কোথায় আমি ! কিন্তু আমি এতই মূঢ় যে পরম পূজনীয় পরমেশ্বর আপনাকেও নিজের বন্ধু মনে করেছি ! এবং কোনও সম্মানসূচক সম্বোধন না করে অবুঝের মতো 'কৃষ্ণ', 'যাদব' এবং 'সখা' ইত্যাদি নামে অবহেলাপূর্বক জনসমক্ষে ডেকেছি। আমার এই সকল অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন।

প্রশ্ন—'অচ্যুত' সম্বোধনের তাৎপর্য কী ?

উত্তর—নিজ মহত্ত্ব এবং স্বরূপ থেকে যাঁর কখনো পতন হয় না, তাঁকে বলা হয় 'অচ্যুত'। এখানে অর্জুনের ভগবানকে 'অচ্যুত' নামে সম্বোধন করার এই অভিপ্রায় যে, আমি আমার আচার-আচরণ দ্বারা আপনার যে অপমান করেছি, তা অবশ্যই বড় অপরাধ ; কিন্তু ভগবন্ ! আমার সেই ব্যবহারে বাস্তবিক আপনার কোনো ক্ষতি হতে পারে না। জগতে এমন কোনো কিছুই সম্ভব নয় যা আপনাকে আপনার মহিমা থেকে বিচ্যুত করতে পারে। কারো এমন সামর্থ্য নেই, যে আপনাকে অপমান করে। কারণ আপনি সর্বদাই অচ্যুত।

প্রশ্ন—'যৎ' এবং 'চ' পদ প্রয়োগের তাৎপর্য কী ?

উত্তর—পূর্বের শ্লোকে অর্জুন যে অপরাধের বিশদকরণ করেছেন, এই শ্লোকে তিনি তা ছাড়াও তাঁর অন্যান্য অপরাধের বর্ণনা করেছেন—এই মর্মার্থে পুনরায় **'যৎ'**-এর এবং পূর্বের শ্লোকে বর্ণিত অপরাধসহ এই শ্লোকে বলা সমস্ত অপরাধের সমাহার করার জন্য 'চ' পদটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—'অবহাসার্থম্' কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—প্রেম, প্রমাদ ও বিনোদ—এই তিনটি কারণে মানুষ ব্যবহারকালে কারো মান-অপমানের খেয়াল রাখে না, প্রেমে নিয়ম থাকে না, প্রমাদে ভুল হয় এবং বিনোদকালে বাক্যের যথার্থতা সুরক্ষিত রাখা কঠিন হয়ে যায়। কোনো সম্মাননীয় ব্যক্তির অপমানে এই তিনটি কারণ একত্রে বা পৃথকভাবেও হেতু হতে পারে। এর মধ্যে 'প্রেম' ও 'প্রমাদ'-এর বিষয়ে অর্জুন পূর্বের শ্লোকে বলেছেন। এখানে **'অবহাসার্থম্'** পদে তৃতীয় কারণ 'হাসি-ঠাট্টা'কে লক্ষ্য করিয়েছেন।

প্রশ্ন — 'বিহারশয্যাসনভোজনেষু', **'একঃ'** এবং **'তৎসমক্ষম্'** এই পদগুলি প্রয়োগ করে **'অসৎকৃতোঽসি'** বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা অর্জুন সেই সময়গুলির বর্ণনা করছেন ; যখন তিনি ভগবানকে অপমান করেছেন বলে মনে করছেন। তিনি বলেছেন যে একসঙ্গে চলা-ফেরা, শয়ন করা, উচ্চ-নীচ বা সম আসনে বসা এবং খাওয়া-দাওয়ার সময় আমার দ্বারা আপনার বারংবার যে

অসম্মান করা হয়েছে[১] — তা একান্তেই করা হোক বা সর্বসমক্ষে—আমি এখন তাকে বড় অপরাধ বলে মনে করছি এবং এরূপ প্রতিটি অপরাধের জন্য আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

প্রশ্ন—**'তৎ'** পদ কীসের বাচক এবং **'ত্বাম্'**-এর সঙ্গে **'অপ্রমেয়ম্'** বিশেষণ দিয়ে **'ক্ষাময়ে'** ক্রিয়া প্রয়োগের তাৎপর্য কী ?

উত্তর—একচল্লিশ ও বিয়াল্লিশতম শ্লোকে অর্জুন যে অপরাধগুলির কথা বর্ণনা করেছেন, **'তৎ'** পদ সেইসকল অপরাধের বাচক ; **'ত্বাম্'** পদের সঙ্গে **'অপ্রমেয়ম্'** বিশেষণ দিয়ে **'ক্ষাময়ে'** ক্রিয়া প্রয়োগ করে অর্জুন ভগবানের কাছে ঐ সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করার জন্য প্রার্থনা করেছেন। অর্জুন বলেছেন—'হে প্রভো ! আপনার স্বরূপ এবং মহত্ত্ব অচিন্ত্য। কেউই তা পূর্ণভাবে জানতে পারে না। কারো যদি তার অল্পবিস্তর জ্ঞান হয়, তবে তা হয় আপনারই কৃপায়। এ আপনার পরম অনুগ্রহেরই ফল যে, আমি—যে প্রথমে আপনার প্রভাব জানতাম না ; তাই আপনার অনাদর করতাম—এবার আপনার প্রভাব কিছু কিছু জেনেছি। অবশ্য এমন নয় যে আমি আপনার সমস্ত প্রভাব জানতে পেরেছি। সমস্ত জানা তো দূরের কথা, আমি তো এখনও ততটাও জানতে পারিনি, যতটা আপনি দয়া করে জানাতে চান। কিন্তু যেটুকু বুঝেছি, তাতে আমি ভালোভাবে জেনেছি যে আপনি সর্বশক্তিমান সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। আমি আপনাকে আমার সমান বন্ধু মনে করে আপনার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছি, তার জন্য আমি নিজেকে অপরাধী মনে করছি এবং সেই সমস্ত অপরাধের জন্য আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

সম্বন্ধ—এইভাবে অপরাধ ক্ষমা করার জন্য প্রার্থনা করে এবার দুটি শ্লোকে অর্জুন ভগবানের প্রভাব বর্ণনা করে অপরাধ ক্ষমা করার যোগ্যতা প্রতিপাদন করে ভগবানকে প্রসন্ন হওয়ার জন্য পুনরায় প্রার্থনা করছেন—

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব॥ ৪৩

আপনি এই জগৎ চরাচরের পিতা, গুরুরও গুরু এবং অতি পূজনীয়, হে অনুপম প্রভাবশালী ! ত্রিলোকে আপনার সমকক্ষও আর কেউ নেই, অতএব আপনার থেকে অধিক শ্রেষ্ঠ হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না॥ ৪৩

প্রশ্ন—আপনি এই সমগ্র চরাচরের পিতা, গুরুরও গুরু এবং পূজনীয়—এই কথার তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এই কথায় অর্জুন অপরাধ ক্ষমা করার ঔচিত্য প্রতিপাদন করেছেন। তিনি বলেছেন—'ভগবন্ ! এই সমগ্র জগৎ আপনার থেকেই উৎপন্ন হয়েছে, সুতরাং আপনিই এর পিতা ; জগতে যত বড় বড় দেবতা, মহর্ষি এবং অন্যান্য সমর্থ পুরুষ আছেন—তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় শ্রীব্রহ্মা ; কারণ সর্বপ্রথম তাঁরই প্রাদুর্ভাব হয় এবং তিনিই তাঁর নিত্য জ্ঞানের সাহায্যে সকলকে যথাযোগ্য শিক্ষা প্রদান করে থাকেন। কিন্তু হে প্রভো ! এই ব্রহ্মাও আপনার থেকে উৎপন্ন এবং তাঁর জ্ঞানও আপনার কাছ থেকেই প্রাপ্ত। অতএব হে সর্বেশ্বর ! সবার

---

[১]শ্রীমদ্ভাগবতে অর্জুনের বচন হল—

শয্যাসনাটনবিকত্থনভোজনাদিষ্বৈক্যাদ্ বয়স্য ঋতবানিতি বিপ্রলব্ধঃ।
সখ্যুঃ সখেব পিতৃবত্তনয়স্য সর্বং সেহে মহান্ মহিতয়া কুমতেরঘং মে॥ (১।১৫।১৯)

'ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শোয়া, বসা, ঘুমানো, কথা বলা ও আহারাদি করায় আমার তাঁর সঙ্গে এমন সহজ ভাব হয়ে গিয়েছিল যে আমি কখনো কখনো 'হে বন্ধু ! তুমি অত্যন্ত সত্যবাদী।' এই বলে আক্ষেপও করতাম ; কিন্তু এই মহাত্মা প্রভু নিজের উদারতা অনুসারে আমার ন্যায় কুবুদ্ধি সখার ঐ সমস্ত অপরাধ তেমনভাবেই সহ্য করতেন, যেমনভাবে মিত্র তার মিত্রের অপরাধ বা পিতা তাঁর পুত্রের অপরাধ সহ্য করেন।'

থেকে বড় ; সব বড়র থেকেও বড় ও সকলের একমাত্র মহাগুরু আপনিই। সমস্ত জগৎ যে দেবতাদের এবং মহর্ষিদের পূজা করে, সেই দেবতা ও মহর্ষিগণেরও পরম পূজনীয় এবং নিত্য বন্দনীয় হলেন আপনিই। ব্রহ্মাদি দেবতা ও বশিষ্ঠাদি মহর্ষি যদি ক্ষণকালের জন্যও আপনার প্রত্যক্ষ পূজা বা স্তব করার অবকাশ পান তাহলে নিজেদের মহাভাগ্যবান মনে করেন। অতএব সব পূজনীয়দেরও পরম পূজনীয় আপনি, তাই আমার ন্যায় ক্ষুদ্রের অপরাধ ক্ষমা করা আপনার পক্ষে সর্বপ্রকারে উচিত।

প্রশ্ন—'অপ্রতিমপ্রভাব' সম্বোধনের সঙ্গে 'ত্রিলোকে আপনার সমকক্ষ আর কেউ নেই, তাহলে অধিক শ্রেষ্ঠ কী করে হতে পারে' এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যাঁর প্রভাবের কোনও তুলনা হয় না, তাঁকে 'অপ্রতিমপ্রভাব' বলা হয়। এর প্রয়োগ করে পরবর্তী বাক্যে অর্জুনের এই অভিপ্রায় যে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এমন কেউ নেই, যাঁর সঙ্গে আপনার অচিন্ত্যানন্ত মহাগুণাদির, ঐশ্বর্য ও মহত্ত্বের তুলনা করা যেতে পারে। আপনার সমান, একমাত্র আপনিই। যখন আপনার সমানও আর কেউ নেই, তখন আপনার থেকে বড় কেউ আছে—এতো কল্পনাই করা যায় না। এরূপ অবস্থায়, হে দয়াময় ! আপনি যদি আমার অপরাধ ক্ষমা না করেন, তাহলে কে করবে ?

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্॥ ৪৪

সুতরাং হে প্রভো ! আপনাকে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করে, স্তুতিযোগ্য আপনাকে প্রসন্ন হওয়ার জন্য প্রার্থনা করছি। হে দেব ! পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার এবং পতি যেমন তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর অপরাধ ক্ষমা করেন—তেমনই আপনিও আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন॥ ৪৪

প্রশ্ন—'তস্মাৎ' পদটি প্রয়োগের তাৎপর্য কী ?

উত্তর—পূর্বের শ্লোকে ভগবানের যে মহামহিম গুণাদির বর্ণনা করা হয়েছে, সেই গুণগুলি ভগবানের প্রসন্ন হওয়ার হেতু বলার জন্য **'তস্মাৎ'** পদ প্রযুক্ত হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, আপনি এইরূপ মহত্ত্ব ও প্রভাবযুক্ত, অতএব আমার মনে হয়, আমার মতো দীন শরণাগতের ওপর দয়া করে প্রসন্ন হওয়া তো আপনার স্বভাবগত। তাই আমি সাহস করে আপনার কাছে সবিনয়ে প্রার্থনা জানাচ্ছি যে আপনি আমার ওপর প্রসন্ন হোন।

প্রশ্ন—'ত্বাম্' পদের সঙ্গে **'ঈশম্'** এবং **'ঈড্যম্'** বিশেষণ যোগ করে 'আমি আপনার চরণে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করে, আপনার প্রসন্ন হওয়ার জন্য প্রার্থনা করছি'—এই কথার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—যিনি সকলের নিয়ন্ত্রণকারী প্রভু, তাঁকে **'ঈশ'** বলা হয় এবং যিনি স্তুতির যোগ্য, তাঁকে **'ঈড্য'** বলা হয়। অর্জুনের এই দুই বিশেষণ প্রয়োগের তাৎপর্য এই যে, হে প্রভো ! এই সমস্ত জগতের নিয়ন্ত্রণকারী—এমন কী ইন্দ্র, আদিত্য, বরুণ, কুবের এবং যমরাজ প্রমুখ লোকনিয়ন্তা দেবতাদেরও আপনি নিয়ন্ত্রক, সকলের একমাত্র মহেশ্বর। আপনার গুণগৌরব এবং মহত্ত্ব এতো বিস্তারিত যে সমগ্র জগৎ সদা-সর্বদা আপনার স্তুতিগান করে থাকেন, তবুও তাঁরা তার নাগাল পান না ; সুতরাং আপনি প্রকৃতই স্তুতিযোগ্য। আমার এতো জ্ঞানও নেই এবং এতো বাক্চাতুর্যও নেই যে আপনার স্তব করে আপনাকে প্রসন্ন করতে পারব। আমি অবোধ, কী করে আপনার স্তব করব ? আমি আপনার প্রভাবের কথা বলতে যা কিছু বলব, তা প্রকৃতপক্ষে আপনার প্রভাবের ধারে কাছেও যেতে পারবে না, বরং তা আপনার প্রভাবকে ছোট করে ফেলবে। তাই আমি আমার এই দেহকেই কাষ্ঠবৎ মতো আপনার পদপ্রান্তে লুটিয়ে দিয়ে—আপনাকে সর্বাঙ্গ দ্বারা প্রণাম করে আপনার চরণধূলির প্রসাদেই আপনার প্রসন্নতা লাভ করতে চাই। আপনি কৃপা করে আমার সব অপরাধ দূর করে এই দীনের প্রতি প্রসন্ন হোন।

প্রশ্ন—পিতা-পুত্রের, মিত্র-মিত্রের এবং পতী-পত্নীর উদাহরণ দিয়ে অপরাধ ক্ষমা করতে বলার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—একচল্লিশতম ও বিয়াল্লিশতম শ্লোকে বলা

হয়েছে যে প্রমাদ, বিনোদন ও প্রেম—এই তিনটি কারণে মানুষের দ্বারা অপরাধ সংঘটিত হয়। এখানে অর্জুন উপরোক্ত তিনটি উপমা দিয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন যে তিনটি কারণেই হওয়া আমার অপরাধ আপনার সহ্য করা উচিত। অভিপ্রায় হল যে, যেমন অজ্ঞানতাবশতঃ প্রমাদ-পূর্বক ঘটিত পুত্রের অপরাধ পিতা ক্ষমা করেন, হাসি-ঠাট্টায় করা মিত্রের অপরাধ মিত্র ক্ষমা করেন এবং প্রেমবশতঃ করা প্রিয়তমা পত্নীর অপরাধ পতি ক্ষমা করেন—তেমনই তিন ভাবেই হওয়া আমার সমস্ত অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন।

সম্বন্ধ—এইভাবে ভগবানের কাছে নিজ অপরাধের ক্ষমা-প্রার্থনা করে অর্জুন এবার দুটি শ্লোকে ভগবানের কাছে তাঁর চতুর্ভুজরূপ দর্শন করানোর জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছেন—

অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেবরূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥ ৪৫

আমার পূর্বে না দেখা আপনার এই বিস্ময়কর বিশ্বরূপ দেখে আমি হর্ষান্বিত হচ্ছি, আবার ভয়ে মন ব্যাকুলও হচ্ছে। অতএব আমার অতি প্রিয় আপনার সেই পূর্বরূপই আমাকে দেখান। হে দেবেশ ! হে জগন্নিবাস ! আপনি প্রসন্ন হন ॥ ৪৫

প্রশ্ন—**'অদৃষ্টপূর্বম্'** কথাটির তাৎপর্য কী এবং তা দেখে হর্ষান্বিত হওয়ার সঙ্গে ভয়ে ব্যাকুল হওয়ার কথা বলায় অর্জুনের কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—পূর্বে যে রূপ কখনো দেখা হয়নি, সেই আশ্চর্যজনক রূপকে বলা হয় 'অদৃষ্টপূর্ব'। সুতরাং অর্জুনের কথার অভিপ্রায় হল যে, আপনার এই অলৌকিক রূপে আমি যখন আপনার গুণ, প্রভাব ও ঐশ্বর্যের কথা বিচারপূর্বক চিন্তা করি তখন আমি অত্যন্ত আনন্দিত হই যে, 'আহা ! আমি কী সৌভাগ্যবান, যে সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের আমার মতো তুচ্ছ ব্যক্তির ওপর এতো অনন্ত দয়া এবং এতো অমূল্য প্রেম যে তিনি কৃপা করে আমাকে তাঁর এই অলৌকিক রূপ দেখাচ্ছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে যখন আপনার ভয়ংকর বিকট মূর্তির দিকে আমার দৃষ্টি যায় তখন আমার মন ভয়ে কম্পিত হয় আর আমি ব্যাকুল হয়ে উঠি।'

অর্জুনের এই বক্তব্য যথার্থ। অভিপ্রায় হল, তাই আমি আপনার কাছে বিনীত প্রার্থনা জানাচ্ছি যে, আপনি আপনার এই রূপ শীঘ্রই সংবরণ করুন।

প্রশ্ন—**'এব'** পদের সঙ্গে **'তৎ'** পদ প্রয়োগ করে দেবরূপ দেখাবার জন্য প্রার্থনা করার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—**'তৎ'** পদটি পরোক্ষবাচী। সেই সঙ্গে এটি সেই বস্তুরও বাচক, যা আগে দেখা হয়েছে, কিন্তু এখন প্রত্যক্ষ নয় ; **'এব'** পদটি তার থেকে ভিন্ন রূপ নিবারকরণ করে। সুতরাং অর্জুনের কথার অভিপ্রায় হল যে, বৈকুণ্ঠ-ধামে নিবাসকারী আপনার যে দেবরূপ, আমাকে সেই রূপ দর্শন করান। শুধু 'তৎ' পদ প্রযুক্ত হলে মনে করা যেত যে ভগবানের মনুষ্যাবতার রূপ দেখানোর জন্যই অর্জুন প্রার্থনা জানাচ্ছেন ; কিন্তু রূপের সঙ্গে 'দেব' পদ থাকায় এটি স্পষ্টই মানুষরূপ থেকে পৃথক দেবসম্বন্ধী রূপের বাচক হয়ে যায়।

প্রশ্ন—**'দেবেশ'** এবং **'জগন্নিবাস'** সম্বোধনের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যিনি দেবতাদেরও প্রভু, তাঁকে **'দেবেশ'** বলা হয় এবং যিনি জগতের আধার এবং সর্বব্যাপী, তাঁকে বলা হয় **'জগন্নিবাস'**। এই দুটি সম্বোধন প্রয়োগে অর্জুনের এই অভিপ্রায় যে, আপনি সমস্ত দেবতাদের প্রভু এবং সাক্ষাৎ সর্বাধার সর্বব্যাপী পরমেশ্বর, অতএব আপনিই আপনার সেই দেবরূপ প্রকট করতে সক্ষম।

প্রশ্ন—**'প্রসীদ'** পদটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—**'প্রসীদ'** পদে অর্জুন ভগবানকে প্রসন্ন হতে বলেছেন। অভিপ্রায় হল যে, আপনি শীঘ্রই এই বিকটরূপ সংবরণ করে কৃপা করে আমাকে আপনার চতুর্ভুজ স্বরূপ দেখান।

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে॥ ৪৬

আমি পূর্বের মতো আপনার মুকুটধারী এবং গদা চক্রধারী রূপ দর্শন করতে চাই, তাই হে বিশ্বস্বরূপ! হে সহস্রবাহো! এখন আপনি সেই চতুর্ভুজ রূপে প্রকটিত হন॥ ৪৬

প্রশ্ন—'তথা'র সঙ্গে '**এব**' প্রয়োগের অভিপ্রায় কী?

উত্তর—মহাভারতের যুদ্ধে ভগবান অস্ত্রগ্রহণ না করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এবং অর্জুনের রথে তিনি হাতে চাবুক এবং ঘোড়ার লাগাম নিয়ে বিরাজ করছিলেন। কিন্তু এখন অর্জুন ভগবানের পূর্বের দ্বিভুজরূপ দেখার আগে সেই চতুর্ভুজ রূপ দেখতে চাইছিলেন, যাঁর হাতে গদা-চক্র ইত্যাদি থাকে; সেই অভিপ্রায়ে '**তথা**'র সঙ্গে '**এব**' পদ প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—'**তেন এব**' পদটির অভিপ্রায় কী?

উত্তর—পূর্বশ্লোকে উদ্ধৃত '**তৎ দেবরূপম্ এব**' লক্ষ্য করেই অর্জুন বলেছেন যে আপনি চতুর্ভুজরূপ ধারণ করুন। এখানে '**এব**' পদ দ্বারা একথাও ধ্বনিত হয় যে অর্জুন প্রায় সবসময়ই ভগবানের দ্বিভুজ রূপই দর্শন করতেন, কিন্তু এখানে '**চতুর্ভুজ রূপ**'ই দেখতে চাইছিলেন।

প্রশ্ন— চতুর্ভুজ রূপ শ্রীকৃষ্ণের জন্য বলা হয়েছে, নাকি, দেবরূপ বলায় সেটি শ্রীবিষ্ণুকে লক্ষ্য করায়?

উত্তর— শ্রীবিষ্ণুর জন্যই বলা হয়েছে এবং তার জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণ আছে—

১) চতুর্ভুজ রূপ যদি শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকরূপ হত তাহলে '**গদিনম্**' এবং '**চক্রহস্তম্**' বলার কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকত না; কারণ অর্জুনের কাছে তা সর্বদা প্রত্যক্ষ ছিল এবং সেইজন্য '**চতুর্ভুজ**' বলাও নিষ্প্রয়োজন ছিল; বরং অর্জুনের একথা বলাই যথেষ্ট হত যে, আমি এখনই কিছুক্ষণ আগে যে রূপ দেখছিলাম, তা-ই দেখান।

২) পূর্বের শ্লোকে '**দেবরূপম্**' পদটি উদ্ধৃত হয়েছে, যার অর্থ পরে একান্নতম শ্লোকে উদ্ধৃত '**মানুষরূপম্**' থেকে সর্বতোভাবে পৃথক; এর দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে দেবরূপ দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর কথাই বলা হয়েছে।

৩) পরবর্তী পঞ্চাশতম শ্লোকে উদ্ধৃত '**স্বকং রূপম্**'-এর সঙ্গে '**ভূয়ঃ**' এবং '**সৌম্যবপুঃ**'র সঙ্গে '**পুনঃ**' পদ ব্যবহৃত হওয়াতেও এখানে প্রথমে চতুর্ভুজ এবং পরে দ্বিভুজ মানুষরূপ দেখানোই প্রমাণিত হয়।

৪) পরবর্তী বাহান্নতম শ্লোকে '**সুদুর্দর্শম্**' পদে বলা হয়েছে যে এই রূপ অত্যন্ত দুর্লভ এবং বলা হয়েছে যে, দেবতারাও এইরূপ দেখার জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন। শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ রূপ যদি স্বাভাবিক হত, তাহলে সেটি তো সর্বদাই মানুষদের দৃষ্টিগোচর ছিল, তাহলে দেবতারা আর তা দেখার জন্য আকাঙ্ক্ষা করবেন কেন? যদি এটা বলা হয় যে বিশ্বরূপের জন্য একথা বলা হয়েছে, তবে এরূপ ভয়ানক বিশ্বরূপ দেবতারা কল্পনাও কেন করবেন, যাঁর দাঁতে ভীষ্ম-দ্রোণাদি চূর্ণিত হচ্ছেন? অতএব এই কথা প্রতীত হয় যে দেবতারাও বৈকুণ্ঠবাসী শ্রীবিষ্ণুরূপ দর্শনেরই আকাঙ্ক্ষা করেন।

৫) আটচল্লিশতম শ্লোকে '**ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ**' ইত্যাদির দ্বারা বিরাট রূপের মহিমা গীত হয়েছে, পরে তিপ্পান্নতম শ্লোকে '**নাহং বেদৈর্ন তপসা**' ইত্যাদিতে পুনরায় সেই কথাই বলা হয়েছে। দুটি স্থানেই যদি একই বিরাট রূপের কথা বলা হয়, তাহলে তাতে পুনরুক্তি দোষ আসে; এতেও প্রমাণিত হয় যে মানুষরূপ দেখাবার আগে ভগবান অর্জুনকে চতুর্ভুজ দেবরূপ দেখিয়েছেন এবং তার মহিমা তিপ্পান্নতম শ্লোক বলা হয়েছে।

৬) এই অধ্যায়ের চব্বিশতম এবং ত্রিশতম শ্লোকে অর্জুন '**বিষ্ণো**' পদে ভগবানকে সম্বোধনও করেছেন। এতেও তাঁর বিষ্ণুরূপ দেখার আকাঙ্ক্ষা প্রতীত হয়।

এইসকল কারণে এটাই প্রমাণিত হয় যে, অর্জুন এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ দেখাবার জন্যই প্রার্থনা করছেন।

প্রশ্ন—'**সহস্রবাহো**' এবং '**বিশ্বমূর্তে**' সম্বোধন করে চতুর্ভুজ হওয়ার জন্য বলার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—ভগবান অর্জুনকে যে সহস্রবাহুবিশিষ্ট বিরাটরূপে দর্শন দিয়েছিলেন, সেই রূপ সংবরণ করে চতুর্ভুজরূপে দর্শন দেবার জন্য অর্জুন ভগবানকে এই নামে সম্বোধন করে প্রার্থনা জানাচ্ছেন।

সম্বন্ধ—এবার অর্জুনের প্রার্থনায় পরবর্তী দুটি শ্লোকে ভগবান তাঁর বিশ্বরূপের মহিমা ও দুর্লভতা জানিয়ে ঊনপঞ্চাশতম শ্লোকে অর্জুনকে আশ্বস্ত করে চতুর্ভুজ রূপ দেখার জন্য বলেছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্।। ৪৭

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে অর্জুন ! আমি অনুগ্রহ করে আমার যোগশক্তির প্রভাবে আমার এই পরম তেজোময়, সকলের আদি-অন্তশূন্য ও বিরাট বিশ্বরূপ তোমাকে দেখিয়েছি, যে রূপ তুমি ছাড়া আগে আর কেউ দেখেনি।। ৪৭

প্রশ্ন—'ময়া'র সঙ্গে **'প্রসন্নেন'** বিশেষণ ব্যবহারের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, তোমার ভক্তি এবং প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে তোমার ওপর দয়া করে আমার গুণ, প্রভাব ও তত্ত্ব বোঝাবার জন্য আমি তোমাকে এই অলৌকিক রূপ দেখালাম। এই অবস্থায় তোমার ভয়, দুঃখ বা মোহ উদ্রেকের কোনো কারণ নেই ; তুমি এতো ভয় কেন পাচ্ছ ?

প্রশ্ন—'আত্মযোগাৎ' কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—ভগবানের এই কথার তাৎপর্য এই যে, আমার এই বিরাটরূপ সকলে সব সময় দেখতে পায় না। যখন আমি আমার যোগশক্তির দ্বারা দর্শন করাই, শুধু সেই সময়ই তা সম্ভব। তাও একমাত্র সেই ব্যক্তিই দেখতে পায়, যার দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়েছে ; অন্যরা নয়। সুতরাং এই দিব্যরূপ দর্শন করা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়।

প্রশ্ন—'রূপম্'-এর সঙ্গে **'ইদম্'**, **'পরম্'**, **'তেজোময়ম্'**, **'আদ্যম্'**, **'অনন্তম্'** এবং **'বিশ্বম্'** বিশেষণ ব্যবহারের কী তাৎপর্য ?

উত্তর—এই বিশেষণগুলির দ্বারা ভগবান অর্জুনকে তাঁর অলৌকিক ও অদ্ভুত বিরাট রূপের মহত্ত্ব বোঝাচ্ছেন। তিনি বলেছেন যে আমার এই রূপ অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ও দিব্য, অসীম এবং দিব্য প্রকাশের পুঞ্জ, সকলের উৎপন্নকারী, সবাকার আদি, অসীম রূপে বিস্তৃত, কোনো দিকেই এর কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। তুমি যা দেখতে পাচ্ছ, তা পূর্ণ নয়। এ তো আমার সেই মহান রূপের অংশমাত্র।

প্রশ্ন—ভগবান একথা কী করে বললেন যে, আমার এইরূপ **'তুমি ছাড়া অন্য কেউ আগে দেখেনি'**, কেননা এর আগে তিনি মাতা যশোদাকে নিজের মুখগহ্বরে এবং ভীষ্ম ইত্যাদি বীরদের কৌরব সভায় তাঁর বিরাটরূপ দেখিয়েছিলেন ?

উত্তর—মাতা যশোদাকে নিজ মুখগহ্বরে এবং ভীষ্ম ইত্যাদি বীরদের কৌরব সভায় যে বিরাট রূপ দর্শন করিয়েছিলেন, তার সঙ্গে অর্জুনের দেখা এই বিরাট রূপের অনেক তফাৎ। তিনটির বর্ণনাই ভিন্ন ভিন্ন। ভগবান অর্জুনকে যে রূপ দর্শন করিয়েছিলেন, তাতে ভীষ্ম-দ্রোণ ইত্যাদি যোদ্ধাদের ভগবানের মুখে প্রবেশ করতে দেখা যাচ্ছিল। এরূপ বিরাট রূপ ভগবান আগে কখনো কাউকে দেখাননি। সুতরাং তাঁর কথায় কোনো অসঙ্গতি নেই।

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর।। ৪৮

হে অর্জুন ! ইহজগতে আমার এই বিশ্বরূপ বেদপাঠ বা যজ্ঞের দ্বারা, দান বা ক্রিয়াদির দ্বারা অথবা কঠোর তপস্যার সাহায্যেও কেউ দেখতে সক্ষম নয়। একমাত্র তুমিই এটি দর্শন করতে সক্ষম।। ৪৮

প্রশ্ন—'বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈ', 'দানৈঃ', 'ক্রিয়াভিঃ' এবং 'উগ্রৈঃ তপোভিঃ'—এই পদগুলির এবং এগুলির দ্বারা ভগবানের বিরাটরূপ দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—বেদবেত্তা অধিকারী আচার্যের কাছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সহ বেদ পাঠ করে তা যথাযথ বুঝে নেওয়াকে বলা হয় 'বেদাধ্যয়ন'। যজ্ঞক্রিয়াতে সুনিপুণ যাজ্ঞিক পুরুষদের সেবা করে তাঁর কাছে যজ্ঞবিধি পাঠ করা এবং তাঁরই অধ্যক্ষতায় বিধিবৎ করা যজ্ঞাদি প্রত্যক্ষ দেখে যজ্ঞসম্বন্ধীয় সমস্ত ক্রিয়াকে ভালোভাবে জেনে নেওয়াকে বলা হয় 'যজ্ঞ অধ্যয়ন'।

ধন, সম্পত্তি, অন্ন, জল, বিদ্যা, গাভী, জমি ইত্যাদি যে কোনো নিজস্ব বস্তু অন্যের সুখ ও হিতার্থে প্রসন্ন হৃদয়ে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করাকে বলা হয় 'দান'।

শ্রৌত-স্মার্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান এবং নিজ বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করার জন্য যেসব শাস্ত্রবিহিত কর্ম করা হয়, তাকে বলা হয় 'ক্রিয়া'।

কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদি ব্রত, বিভিন্ন প্রকার কঠোর নিয়ম পালন, মন ও ইন্দ্রিয়াদিকে বিবেক ও বলপূর্বক দমন এবং ধর্মের জন্য শারীরিক বা মানসিক কঠোর ক্লেশ সহ্য করা অথবা শাস্ত্রবিধি অনুসারে করা অন্য নানারূপ তপস্যা—এগুলির নাম 'উগ্রতপ'।

এই সব সাধনা দ্বারাও তাঁর বিরাট রূপ দর্শন অসম্ভব বলে ভগবান ঐ রূপের মহত্ত্ব প্রকটিত করে বলেছেন যে, এইরূপ মহা প্রচেষ্টার দ্বারাও যার দর্শন হতে পারে না, সেই রূপ তুমি আমার প্রসন্নতা ও কৃপা প্রসাদে প্রত্যক্ষ করছ—এ তোমার মহাসৌভাগ্য। এই সময় তোমার কোনোরূপ ভয়, দুঃখ বা মোহ উৎপন্ন হওয়া উচিত নয়।

প্রশ্ন—বিরাট রূপ দর্শন অর্জুন ব্যতীত অন্যের পক্ষে দেখা সম্ভব নয় বলার সময় **'নৃলোকে'** পদটি প্রয়োগ করার তাৎপর্য কী ? এই বিরাটরূপ দর্শন কী অন্য লোকে হওয়া সম্ভব নয় ?

উত্তর—বেদ-যজ্ঞাদি অধ্যয়ন, দান, তপ এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রকার কর্মের অধিকার মনুষ্যলোকেই আছে। মনুষ্য-দেহেই জীব বিভিন্ন প্রকার নতুন কর্ম করে নানাপ্রকার অধিকার লাভ করে। অন্যান্য সব লোক প্রধানতঃ ভোগেরই স্থান। মনুষ্যলোকের এই গুরুত্ব বোঝাবার জন্য এখানে **'নৃলোকে'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, যখন মনুষ্যলোকেই উপযুক্ত সাধনা দ্বারা অন্য কেউ আমার এই রূপ দেখতে সক্ষম নয়, তখন অন্যান্য লোকে এবং কোনও প্রকারের সাধনা ব্যতীত এই রূপ যে কেউ দেখতে পারে না, এতে আর বলার কী আছে ?

প্রশ্ন—'কুরুপ্রবীর' সম্বোধনের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভগবানের এটির প্রয়োগের অভিপ্রায় হল, তুমি কৌরবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর পুরুষ, তোমার মতো বীর পুরুষের এরূপ ভীতসন্ত্রস্ত হওয়া শোভা পায় না ; অতএব তোমার ভয় পাওয়া উচিত নয়।

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্‌মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য॥ ৪৯

আমার এই ভয়ংকর রূপ দেখে তোমার ভীত ও ব্যাকুল হওয়া উচিত নয়, তোমার মূঢ়ভাবও যেন না হয় ; তুমি ভয় ত্যাগ করে প্রসন্ন মনে আমার সেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম সমন্বিত চতুর্ভুজ রূপ আবার দর্শন করো॥ ৪৯

প্রশ্ন—আমার ভয়ংকর রূপ দেখে তোমার ব্যাকুল হওয়া উচিত নয়, এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভগবানের এই কথার অভিপ্রায় এই যে, আমি যে প্রসন্ন হয়ে তোমাকে এরূপ পরম দুর্লভ বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছি, তার জন্য তোমার মনে ব্যাকুলতা ও মূঢ়ভাব কখনো থাকা উচিত নয়। তা সত্ত্বেও যখন এটি দর্শন করে তুমি ব্যথিত ও মোহগ্রস্ত হচ্ছ এবং তুমি চাইছ যে আমি এবার এই স্বরূপ সংবরণ করি, তখন তোমার ইচ্ছানুসারে তোমাকে সুখী করার জন্য আমি এখন তোমার সামনে থেকে সেই রূপ সংবরন করে নিচ্ছি ; তুমি মোহগ্রস্ত হয়ে ভীত-ব্যাকুল হয়ো না।

প্রশ্ন—'ত্বম্'-এর সঙ্গে **'ব্যপেতভীঃ'** এবং

'প্রীতমনাঃ' বিশেষণ প্রয়োগ করার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'ত্বম্'-এর সঙ্গে **'ব্যপেতভীঃ'** এবং **'প্রীতমনাঃ'** বিশেষণ প্রয়োগে ভগবানের অভিপ্রায় হল, যে রূপ দেখে তুমি ভীত ও ব্যাকুল হচ্ছ, তা সংবরণ করে এবার আমি তোমার আকাঙ্ক্ষিত চতুর্ভুজ রূপে প্রকটিত হচ্ছি, সুতরাং তুমি এবার ভয় ত্যাগ করে প্রসন্ন হও।

প্রশ্ন—'রূপম্'-এর সঙ্গে **'তৎ'** এবং **'ইদম্'** বিশেষণ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ? **'পুনঃ'** পদ প্রয়োগ করে ঐ রূপ দেখতে বলার কী তাৎপর্য ?

উত্তর— 'তৎ' ও **'ইদম্'** বিশেষণ প্রয়োগের এই অভিপ্রায় যে, আমি তোমাকে আগে যে চতুর্ভুজ দেবরূপ দর্শন করিয়েছিলাম এবং এখন তুমি যা দর্শন করার জন্য প্রার্থনা করছ ; এবার সেই রূপই তোমার সামনে উপস্থিত। অভিপ্রায় হল যে এখন তোমার সামনে থেকে সেই বিশ্বরূপ অপসারিত হয়ে সেই স্থানে এই চতুর্ভুজ রূপ প্রকটিত হয়েছে, সুতরাং এবার তুমি নির্ভয়ে প্রসন্ন মনে আমার এই চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করো।

'পুনঃ' পদ প্রয়োগের দ্বারা এখানে এটা প্রতীত হয় যে ভগবান অর্জুনকে আগেও তাঁর চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করিয়েছিলেন, পঁয়তাল্লিশ ও ছেচল্লিশতম শ্লোকে অর্জুনের প্রার্থনায় **'তৎ এব'** ও **'তেন এব'** পদগুলির প্রয়োগেও এই কথা স্পষ্ট হয়।

সম্বন্ধ—এইভাবে অর্জুনকে চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করার জন্য নির্দেশ দিয়ে ভগবান কী করলেন, সঞ্জয় এবার ধৃতরাষ্ট্রকে সেই কথা জানাচ্ছেন—

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা॥ ৫০

সঞ্জয় বললেন—ভগবান বাসুদেব অর্জুনকে এই কথা বলে পুনরায় তাঁর সেই চতুর্ভুজ রূপ দেখালেন এবং তারপর শ্রীকৃষ্ণ সৌম্যমূর্তি ধারণ করে ভীতসন্ত্রস্ত অর্জুনকে আশ্বস্ত করলেন ॥ ৫০

প্রশ্ন—**'বাসুদেবঃ'** পদটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ বসুদেবের পুত্ররূপে প্রকটিত হন এবং আত্মরূপে সবার মধ্যে নিবাস করেন। তাই তাঁর নাম বাসুদেব।

প্রশ্ন—**'রূপম্'**-এর সঙ্গে **'স্বকম্'** বিশেষণ প্রয়োগের এবং **'দর্শয়ামাস'** ক্রিয়া প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—**'স্বকং রূপম্'**-এর অর্থ হল নিজের রূপ। এমনি তো বিশ্বরূপও ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই এবং সেটিও তাঁর স্বকীয় এবং ভগবান যে মানুষরূপে সবার সামনে প্রতীয়মান, সেই শ্রীকৃষ্ণরূপও তাঁর স্বকীয়, কিন্তু এখানে **'রূপম্'**-এর সঙ্গে **'স্বকম্'** বিশেষণ প্রয়োগের অভিপ্রায় ঐ দুটি থেকে ভিন্ন কোনো তৃতীয় রূপ লক্ষ্য করাবার জন্য বলে মনে হয়। কারণ বিশ্বরূপ তো অর্জুনের সামনে প্রকট ছিলই, তা দেখে তো তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন ; সুতরাং এখানে তো সেটি দেখাবার কথা কল্পনাই করা যায় না, আর মনুষ্যরূপের জন্য একথা বলার কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকে না যে ভগবান সেটা দেখালেন (**দর্শয়ামাস**) ; কেননা বিশ্বরূপ অপসৃত হওয়ার পর ভগবানের যে স্বাভাবিক মনুষ্যাবতার রূপ, তাতো পূর্বের ন্যায় ঠিক তেমনই অর্জুনের সামনে ছিল, অতএব সেটি দেখাবার জন্য বলার প্রশ্ন ওঠে না, কারণ সেটি তো অর্জুন নিজেই দেখতে পাচ্ছিলেন। সুতরাং এখানে **'স্বকম্'** বিশেষণ এবং **'দর্শয়ামাস'** প্রয়োগের এই তাৎপর্য মনে হয় যে নরলীলার জন্য প্রকটিত সকলের সামনে থাকা মনুষ্যরূপে ও নিজ যোগশক্তির দ্বারা প্রকট করে দেখানো বিশ্বরূপ ব্যতীত বৈকুণ্ঠধামে নিত্যনিবাসকারী ভগবানের যে দিব্য নিজ চতুর্ভুজ রূপ — সেটি দর্শন করার জনাই অর্জুন প্রার্থনা করেছিলেন এবং সেই রূপই ভগবান তাঁকে দেখিয়েছেন।

প্রশ্ন—**'মহাত্মা'** পদের এবং **'সৌম্যবপুঃ'** হয়ে ভীতসন্ত্রস্ত অর্জুনকে সান্ত্বনা প্রদান করলেন, এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যাঁর আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ মহান, তাঁকে বলা হয় মহাত্মা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলের আত্মরূপ, তাই তিনি মহাত্মা। বলার অভিপ্রায় হল যে, অর্জুনকে তাঁর চতুর্ভুজ রূপ দেখাবার পরে মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ **'সৌম্যবপুঃ'** অর্থাৎ পরম শান্ত শ্যামসুন্দর মনুষ্যরূপে প্রকটিত হয়ে ভীত ব্যাকুল অর্জুনকে সান্ত্বনা প্রদান করেন।

সম্বন্ধ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে তাঁর বিশ্বরূপ সংবরণ করে চতুর্ভুজ রূপে দর্শন দেবার পরে যখন স্বাভাবিক মনুষ্যরূপ ধারণ করে অর্জুনকে আশ্বস্ত করেন, অর্জুন তখন সতর্ক হয়ে বললেন—

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥ ৫১

অর্জুন বললেন—হে জনার্দন! আপনার এই শান্ত, সৌম্য মনুষ্যরূপ দেখে এখন আমি প্রসন্নচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হয়েছি এবং নিজ স্বাভাবিক স্থিতি ফিরে পেয়েছি ॥ ৫১

প্রশ্ন—**'রূপম্'**-এর সঙ্গে **'সৌম্যম্'** এবং **'মানুষম্'** বিশেষণ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী?

উত্তর—ভগবানের মনুষ্যরূপ ছিল অত্যন্ত মধুর, সুন্দর এবং শান্ত ; আগের শ্লোকে ভগবানের যে সৌম্যদেহ হওয়ার কথা বলা হয়েছিল, তা মনুষ্যরূপকে লক্ষ্য করেই বলা—সেই বিষয় স্পষ্ট করার জন্য এখানে **'রূপম্'**-এর সঙ্গে **'সৌম্যম্'** ও **'মানুষম্'** এই দুটি বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—**'সচেতাঃ সংবৃত্তঃ'** এবং **'প্রকৃতিং গতঃ'**-র তাৎপর্য কী?

উত্তর—ভগবানের বিরাট রূপ দর্শন করে অর্জুনের মনে ভয়, ব্যথা, মোহ ইত্যাদি বিকার উৎপন্ন হয়েছিল—এই সকল পদ প্রয়োগে সে সবের অভাব দেখানো হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে আপনার এই শ্যামসুন্দর মধুর মানুষরূপ দেখে এখন আমি প্রসন্ন-প্রশান্ত চিত্ত হয়েছি, অর্থাৎ আমার মোহ, ভ্রম ও ভয় দূর হয়েছে এবং আমি আমার বাস্তবিক স্থিতি ফিরে পেয়েছি। অর্থাৎ ভয়, ব্যাকুলতা, কম্প ইত্যাদি নানাপ্রকার বিকার যা আমার মন, ইন্দ্রিয় এবং দেহে উৎপন্ন হয়েছিল—সেসব দূর হওয়ায় আমি এখন আগের মতো সুস্থ হয়েছি।

সম্বন্ধ—অর্জুনের এই কথা শুনে ভগবান এবার দুটি শ্লোকে তাঁর চতুর্ভুজ দেবরূপ দর্শনের দুর্লভতা এবং তার মহিমা বর্ণনা করছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ৫২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—আমার যে চতুর্ভুজ রূপ তুমি দর্শন করেছ তা সুদুর্দর্শ অর্থাৎ তার দর্শন অত্যন্ত দুর্লভ। দেবতাগণও সর্বদা এই রূপের দর্শন আকাঙ্ক্ষা করেন ॥ ৫২

প্রশ্ন—**'রূপম্'**-এর সঙ্গে **'সুদুর্দর্শম্'** এবং **'ইদম্'** বিশেষণ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী?

উত্তর—**'সুদুর্দর্শম্'** বিশেষণের দ্বারা ভগবান তাঁর চতুর্ভুজ দিব্যরূপ দর্শনের দুর্লভতা ও তার মহত্ত্ব জ্ঞাপন করছেন। **'ইদম্'** পদ নিকটবর্তী বস্তুর নির্দেশকারী হওয়ায় এর দ্বারা বিশ্বরূপের পরে দেখানো চতুর্ভুজ রূপের সঙ্কেত দেওয়া হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, আমার যে চতুর্ভুজ—মায়াতীত, দিব্যগুণযুক্ত নিত্য-রূপ তুমি দর্শন করেছ, সেই রূপ দর্শন অত্যন্ত দুর্লভ ; এই রূপ দর্শন তিনিই করতে পারেন, যিনি

আমার অনন্য ভক্ত এবং যাঁর ওপর আমার কৃপার পূর্ণ প্রকাশ হয়।

প্রশ্ন—দেবতারাও সর্বদা এই রূপ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করে থাকেন, এই কথার অভিপ্রায় কী ? এই বাক্যে **'অপি'** পদ প্রয়োগের কী তাৎপর্য ?

উত্তর—এই কথাতেও ভগবান তাঁর চতুর্ভুজ রূপ দর্শনের দুর্লভতা ও তার মহত্ত্বই জ্ঞাপন করেছেন। **'অপি'** পদ প্রয়োগের এই অভিপ্রায় যে দেবতারাও যখন সর্বদা এটি দর্শন করতে চান, কিন্তু সকলে দেখতে পান না, তাহলে মানুষের আর কথা কী ?

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥ ৫৩

তুমি আমার যে চর্তুভুজ রূপের দর্শন লাভ করেছ—তা বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান অথবা যজ্ঞের দ্বারাও সম্ভব নয় ॥ ৫৩

প্রশ্ন—নবম অধ্যায়ের সাতাশতম ও আঠাশতম শ্লোকে বলা হয়েছে যে তুমি যা কিছু যজ্ঞ করো, দান করো ও তপস্যা করো—সব যদি আমাকে অর্পণ করো ; তাহলে তুমি সব কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। সপ্তদশ অধ্যায়ের পঁচিশতম শ্লোকে বলা হয়েছে যে মোক্ষ আকাঙ্ক্ষাকারী পুরুষেরা যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি ফলেচ্ছা ত্যাগ করে করেন ; এর দ্বারা বোঝা যায় যে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা, মুক্তি ও ভগবান লাভের হেতু। কিন্তু এই শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে আমার চতুর্ভুজ রূপ দর্শন, বেদ অধ্যয়ন বা অধ্যাপনার দ্বারাও হয় না বা তপস্যা, দান ও যজ্ঞ দ্বারাও হয় না। সুতরাং এই বিরুদ্ধভাবের সমাধান কী ?

উত্তর—এতে কোনো বিরুদ্ধভাব নেই। কারণ কর্মাদি ভগবানকে অর্পণ করা হল অনন্য ভক্তির অঙ্গ। পঞ্চান্নতম শ্লোকে অনন্য ভক্তির বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান স্বয়ং **'মৎকর্মকৃৎ'** (আমার জন্য যে কর্ম করে) পদ প্রয়োগ করেছেন এবং চুয়ান্নতম শ্লোকে একথা স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন যে, অনন্যভক্তির দ্বারা আমার এই স্বরূপ দেখা, জানা ও লাভ করা সম্ভব। সুতরাং এখানে বুঝতে হবে যে, নিষ্কামভাবে ভগবদর্থ ও ভগবদর্পণ-বুদ্ধিতে করা যজ্ঞ, দান, তপস্যা ইত্যাদি কর্ম ভক্তির অঙ্গ হওয়ায় ভগবদ্প্রাপ্তির হেতু— সকামভাবে করলে নয়। অভিপ্রায় হল যে, উপরোক্ত যজ্ঞাদি ক্রিয়া ভগবৎ দর্শন করানোতে স্বভাবতঃ সমর্থ নয়। প্রেমপূর্বক ভগবানের শরণাগত হয়ে নিষ্কামভাবে কর্ম করলেই ভগবৎকৃপায় ভগবৎদর্শন লাভ হয়।

প্রশ্ন—এখানে **'এবংবিধঃ'** এবং **'মাং যথা দৃষ্টবানসি'** কথার প্রয়োগে যদি একথা মেনে নেওয়া হয় যে, ভগবান যে তাঁর বিশ্বরূপ অর্জুনকে দেখিয়েছিলেন, তারই বিষয়ে 'আমাকে বেদাদি দ্বারা দেখা যায় না' ইত্যাদি কথা ভগবান বলেছেন, তাতে ক্ষতি কী ?

উত্তর—বিশ্বরূপের মহিমাতে আটচল্লিশতম শ্লোকে প্রায় এরূপ পদেরই প্রয়োগ করা হয়েছে ; এই শ্লোকটিকে পুনরায় সেই বিশ্বরূপের মহিমা মনে করলে পুনরুক্তি দোষ আসে।

এতদ্ব্যতীত, ঐ বিশ্বরূপের প্রসঙ্গে তো ভগবান বলেছেন যে, এটি তুমি ব্যতীত অন্য কারো দ্বারা দর্শন করা সম্ভব নয় ; এবং পরের শ্লোকেই তা দেখার জন্য উপায়ও জানিয়েছেন। তাই যা বলা হয়েছে, সেটিই যথার্থ।

সম্বন্ধ—উপরোক্ত উপায়ে যদি আপনার দর্শনলাভ না হয়, তাহলে কোন্ উপায়ে হতে পারে, এরূপ জিজ্ঞাসা হওয়ায় ভগবান বলেছেন—

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥ ৫৪

হে পরন্তপ অর্জুন ! অনন্য ভক্তির দ্বারাই এইভাবে আমাকে জানতে ও চতুর্ভুজ রূপ প্রত্যক্ষ করতে

এবং আমাতে প্রবেশরূপ মোক্ষলাভ করতে ভক্তগণ সমর্থ হন, অন্য উপায়ে নয় ॥ ৫৪

প্রশ্ন—যার সাহায্যে ভগবানের দিব্য চতুর্ভুজ রূপ দেখা সম্ভব, জানা সম্ভব এবং তাঁতে প্রবেশ করা সম্ভব হয়—সেই অনন্য ভক্তি কী ?

উত্তর—শুধুমাত্র ভগবানেই অনন্য প্রেম হওয়া এবং নিজ মন, ইন্দ্রিয়, শরীর ও ধন, জন ইত্যাদি সর্বস্ব ভগবানের মনে করে ভগবানের জন্য ভগবানেরই সেবায় সর্বদা ব্যাপৃত থাকা—এই হল অনন্য ভক্তি, পরবর্তী শ্লোকে অনন্য ভক্তের লক্ষণে এর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

প্রশ্ন—সাংখ্যযোগের দ্বারাও তো পরমাত্মাকে লাভ করার কথা বলা হয়েছে, তাহলে এখানে কেবল অনন্য ভক্তিকেই ভগবানের দর্শনের হেতু বলা হয়েছে কেন ?

উত্তর—সাংখ্যযোগের দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্ম লাভের কথা বলা হয়েছে এবং তা সর্বৈব সত্য। কিন্তু সাংখ্যযোগের দ্বারা সগুণ-সাকার ভগবানের দিব্য চতুর্ভুজ রূপও দর্শন করা যাবে, এমন কথা বলা যাবে না। কারণ সাংখ্যযোগের দ্বারা সাকার রূপে দর্শন প্রদানের জন্য ভগবান বাধ্য নন। এখানকার প্রকরণও সগুণ ভগবানের দর্শনেরই। সুতরাং এক্ষেত্রে শুধুমাত্র অনন্য ভক্তিকেই ভগবৎ দর্শন ইত্যাদির কারণ বলা সর্বতোভাবে উচিত হয়েছে।

সম্বন্ধ—অনন্য ভক্তি দ্বারা ভগবানকে দর্শন করা, জানা এবং অভিন্নভাবে প্রাপ্ত করা সুলভ বলার ফলে অনন্য ভক্তির স্বরূপ জানার আকাঙ্ক্ষা হওয়ায় এবার অনন্য ভক্তের লক্ষণাদি বর্ণনা করা হচ্ছে—

মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫

হে অর্জুন ! যে ব্যক্তি শুধু আমার জন্য সমস্ত কর্ম করেন, আমার পরায়ণ হন, আমার ভক্ত হন, আসক্তিবর্জিত হন এবং সমস্ত প্রাণীতে বৈরীভাব রহিত হন—সেই অনন্য ভক্তিযুক্ত পুরুষ আমাকেই লাভ করেন ॥ ৫৫

প্রশ্ন—'**মৎকর্মকৃৎ**' কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—যে ব্যক্তি স্বার্থ, মমত্ববোধ ও আসক্তি পরিত্যাগ করে, সব কিছু ভগবানের মনে করে নিজেকে নিমিত্তমাত্র মনে করে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা, খাওয়া-দাওয়া, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি সমস্ত শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য-কর্মসমূহ নিষ্কামভাবে ভগবানেরই প্রসন্নতার জন্য ভগবানের নির্দেশ অনুসারে সম্পন্ন করেন—তিনি '**মৎকর্মকৃৎ**' অর্থাৎ ভগবানের জন্য ভগবানের কর্ম করেন বলা হয়।

প্রশ্ন—'**মৎপরমঃ**' কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—যিনি ভগবানকেই পরম আশ্রয়, পরম গতি, একমাত্র শরণ গ্রহণের যোগ্য, সর্বোত্তম, সর্বাধার, সর্বশক্তিমান, সকলের সুহৃদ, পরম আত্মীয় এবং নিজের সর্বস্ব বলে মনে করেন, তাঁর প্রত্যেক বিধানে সর্বদা সুপ্রসন্ন থাকেন—তিনি '**মৎপরমঃ**' অর্থাৎ তাকে ভগবানের পরায়ণ বলা হয়।

প্রশ্ন—'**মদ্ভক্তঃ**' কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—ভগবানে অনন্য প্রেম হওয়ায় যিনি ভগবানেই তন্ময় হয়ে নিত্য-নিরন্তর ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, প্রভাব এবং লীলা ইত্যাদি শ্রবণ, কীর্তন ও মনন ইত্যাদি করতে থাকেন ; ভগবানকে ছাড়া যাঁর একমুহূর্তও মনে শান্তি থাকে না এবং যিনি ভগবানের দর্শন লাভের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠা সহকারে সর্বক্ষণ লালায়িত থাকেন—তাঁকে বলা হয় '**মদ্ভক্তঃ**' অর্থাৎ ভগবানের ভক্ত।

প্রশ্ন—'**সঙ্গবর্জিতঃ**' কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—শরীর, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ধন, আত্মীয়-পরিজন, মান-মর্যাদা ইত্যাদি যত ইহলোক ও পরলোকের ভোগ্য পদার্থ—ঐ সমস্ত জড়-চেতন পদার্থে যাঁর বিন্দুমাত্র আসক্তি নেই ; ভগবান ব্যতীত যাঁর

অন্য কিছুতে প্রেম বা আসক্তি হয় না ; তাঁকে বলা হয় **'সঙ্গবর্জিতঃ'** অর্থাৎ আসক্তিরহিত।

প্রশ্ন—'সর্বভূতেষু নির্বৈরঃ' কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—সমস্ত প্রাণীদের ভগবানেরই স্বরূপ বলে জানা, অথবা সবাকার মধ্যে একমাত্র ভগবানকেই পরিব্যাপ্ত মনে করায়, কেউ কোনো বিপরীত ব্যবহার করলেও যাঁর মনে কোনোপ্রকার বিকার উদয় হয় না ; যাঁর কোনো প্রাণীতে বিন্দুমাত্রও হিংসা-দ্বেষ বা বৈরীভাব নেই— তিনি **'সর্বভূতেষু নির্বৈরঃ'** অর্থাৎ তাঁকে সমস্ত প্রাণীতে বৈরভাব রহিত বলা হয়।

প্রশ্ন— 'যঃ' এবং **'সঃ'** কীসের বাচক এবং তিনি আমাকেই লাভ করেন, এই কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—**'যঃ'** এবং **'সঃ'** পদ উপরোক্ত লক্ষণ-যুক্ত ভগবানের অনন্য ভক্তের বাচক এবং 'তিনি আমাকেই লাভ করেন'—এই কথার মর্মার্থ হল চুয়ান্নতম শ্লোক অনুযায়ী সগুণ ভগবানের প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করা, তাঁকে যথাযথভাবে তত্ত্বতঃ জানা এবং তাঁর মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া। অভিপ্রায় হল যে, যিনি উপরোক্ত লক্ষণযুক্ত ভগবানের অনন্য ভক্ত, তিনি ভগবানকে লাভ করেন।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
বিশ্বরূপদর্শনযোগো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

——o——

ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ

দ্বাদশ অধ্যায়
(ভক্তিযোগ)

অধ্যায়ের নাম

এই দ্বাদশ অধ্যায়ে নানাপ্রকার সাধনাসহ ভগবানের ভক্তির বর্ণনা করে ভগবদ্‌ভক্তদের লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। ভগবানের প্রতি ভক্তিতেই এর উপক্রম এবং উপসংহার করা হয়েছে। কেবলমাত্র তিনটি শ্লোকে জ্ঞান সাধনার বর্ণনা আছে, তাও ভগবদ্‌ভক্তি এবং জ্ঞানযোগের পরস্পর তুলনা করার জন্যই ; তাই এই অধ্যায়ের নাম রাখা হয়েছে **'ভক্তিযোগ'**।

সংক্ষিপ্ত অধ্যায়-সার

এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে সগুণ-সাকার এবং নির্গুণ-নিরাকার উপাসকদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তা জানার জন্য অর্জুন প্রশ্ন করেছেন। দ্বিতীয়তে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ভগবান সগুণ-সাকারের উপাসকদের যুক্ততম (শ্রেষ্ঠ) বলেছেন। তৃতীয়-চতুর্থতে নির্গুণ-নিরাকার পরমাত্মার বিশেষণের বর্ণনা করে সেই উপাসনার ফলও ভগবৎপ্রাপ্তি জানিয়ে পঞ্চমে বলেছেন, দেহাভিমানী ব্যক্তিদের পক্ষে নিরাকারের উপাসনা করা কঠিন। ষষ্ঠ ও সপ্তমে ভগবান বলেছেন যে সমস্ত কর্ম আমাকে অর্পণ করে, অনন্যভাবে নিরন্তর সগুণ পরমেশ্বর অর্থাৎ আমার চিন্তাকারী সেই ভক্তদের আমি স্বয়ং উদ্ধার করি। অষ্টমে ভগবান অর্জুনকে মন-বুদ্ধি তাঁতে অর্পণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং বলেন এর ফল হল তাঁকে লাভ করা। তারপর নবম থেকে একাদশ শ্লোক পর্যন্ত বলেছেন উপরোক্ত সাধনে অপারগ হলে, অভ্যাসযোগের সাধন করতে, তাতেও অসমর্থ হলে ঈশ্বরের জন্য কর্ম করতে এবং তাতেও অসমর্থ হলে সমস্ত কর্মের ফল ত্যাগ করতে বলেছেন। দ্বাদশে কর্মফল ত্যাগকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে তার ফল তৎক্ষণাৎ শান্তি লাভের কথা জানিয়েছেন। এরপর ত্রয়োদশ থেকে ঊনবিংশ পর্যন্ত ভগবান তাঁর প্রিয় জ্ঞানী মহাত্মা ভক্তদের লক্ষণ জানিয়েছেন। বিশতম শ্লোকে জানিয়েছেন যে ঐ সকল জ্ঞানী মহাত্মা ভক্তদের লক্ষণসমূহকে আদর্শ বলে মেনে যেসব ভক্ত শ্রদ্ধাপূর্বক ঐরূপ সাধনা করেন, তাঁরা তাঁর অত্যন্ত প্রিয়।

সম্বন্ধ—দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত ভগবান বিভিন্ন জায়গায় নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ-সাকার পরমেশ্বরের উপাসনার প্রশংসা করেছেন। সপ্তম অধ্যায় থেকে একাদশ অধ্যায় পর্যন্ত বিশেষভাবে সগুণ-সাকার ভগবানের উপাসনার মহত্ত্ব দেখিয়েছেন। আবার পঞ্চম অধ্যায়ে সপ্তদশ থেকে ছাব্বিশতম শ্লোক পর্যন্ত, ষষ্ঠ অধ্যায়ে চব্বিশতম থেকে ঊনত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত, অষ্টম অধ্যায়ে একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শ্লোক পর্যন্ত এবং এছাড়া আরও নানাস্থানে নির্গুণ-নিরাকারের উপাসনারও মহত্ত্ব দেখিয়েছেন। পুনঃ একাদশ অধ্যায়ের শেষে সগুণ-সাকার ভগবানে অনন্য ভক্তির ফল ভগবৎপ্রাপ্তি জানিয়ে 'মৎকর্মকৃৎ' পদে আরম্ভ হওয়া এই অন্তিম শ্লোকে সগুণ-সাকার ভগবানের উপাসনাকারী ভক্তের বিশেষভাবে প্রশংসা করেছেন। তাতে অর্জুনের মনে এই প্রশ্নের উদয় হয় যে নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্মের এবং সগুণ-সাকার ভগবানের উপাসনাকারী, উভয় প্রকার উপাসকদের মধ্যে উত্তম উপাসক কে ? এই জিজ্ঞাসা অনুসারে অর্জুন প্রশ্ন করছেন—

অর্জুন উবাচ

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥ ১

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—হে ভগবান, যে অনন্যপ্রেমী ভক্ত পূর্বোক্ত প্রকারে নিরন্তর আপনার ভজন-ধ্যানে ব্যাপৃত থেকে সগুণরূপ পরমেশ্বর আপনাকে ভজনা করেন এবং অন্য যাঁরা কেবল অবিনাশী সচ্চিদানন্দঘন নিরাকার ব্রহ্মকে অতিশ্রেষ্ঠ ভাব দ্বারা উপাসনা করেন,—এই উভয় প্রকারের উপাসকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগবেত্তা কে ? ১

প্রশ্ন—'**এবম্**' পদের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'**এবম্**' পদ দ্বারা অর্জুন আগের অধ্যায়ের পঞ্চান্নতম শ্লোকে উল্লিখিত অনন্য ভক্তির প্রকার নির্দেশ করেছেন।

প্রশ্ন—'**ত্বাম্**' পদ এখানে কীসের বাচক এবং নিরন্তর ভজনধ্যানে ব্যাপৃত থেকে তাঁর শ্রেষ্ঠ উপাসনা করা কাকে বলে ?

উত্তর—'**ত্বাম্**' পদ যদিও এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাচক, তবুও ভিন্ন ভিন্ন অবতারে ভগবান যতপ্রকার সগুণরূপ ধারণ করেছেন এবং দিব্য ধামে ভগবানের যে সগুণরূপ বিরাজমান—যাকে নিজ নিজ ধারণা অনুসারে লোকে নানা রূপ ও নানা নামে বর্ণনা করে থাকে—এখানে '**ত্বাম্**' পদটি ঐ সবেরই বাচক মানা উচিত ; কারণ সে সবই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অভিন্ন। সেই সগুণ ভগবানের নিরন্তর চিন্তাপূর্বক পরমশ্রদ্ধা ও প্রেমপূর্বক নিষ্কামভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি তাঁর সেবায় নিযুক্ত করা, একেই বলা হয় নিরন্তর ভজন ধ্যানে ব্যাপৃত থেকে তাঁর শ্রেষ্ঠ উপাসনা করা।

প্রশ্ন—'**অক্ষরম্**' বিশেষণের সঙ্গে '**অব্যক্তম্**' পদ এখানে কীসের বাচক ?

উত্তর—'**অক্ষরম্**' বিশেষণের সঙ্গে '**অব্যক্তম্**' পদটি এখানে নির্গুণ-নিরাকার সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মের বাচক। যদিও জীবাত্মাকেও অক্ষর এবং অব্যক্ত বলা যেতে পারে, কিন্তু অর্জুনের প্রশ্নের অভিপ্রায় জীবাত্মার উপাসনা নয় ; কারণ জীবাত্মার উপাসকের সগুণ ভগবানের উপাসকের থেকে উত্তম হওয়া সম্ভব নয় এবং পূর্ব-প্রসঙ্গে ভগবান কোথাও তার উপাসনার বিধানও করেননি।

প্রশ্ন—ঐ উভয় উপাসকদের মধ্যে উত্তম যোগবেত্তা কে ? এই বাক্যটির মর্মার্থ কী ?

উত্তর—এই বাক্যে অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছেন যে, যদিও উপরোক্ত প্রকারে উভয় উপাসনাকারীই শ্রেষ্ঠ—এতে কোনো সন্দেহ নেই, তবুও উভয়ের পরস্পর তুলনা করলে উভয় উপাসকদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এটা বলুন।

সম্বন্ধ—অর্জুনের এইরূপ জিজ্ঞাসায় ভগবান তার উত্তরে সগুণ-সাকার উপাসকদের উত্তম বলে জানাচ্ছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ ২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—আমাতে মন একাগ্র করে নিত্য-নিরন্তর আমার ভজন-ধ্যানে নিযুক্ত থেকে যে ভক্তগণ অতিশয় শ্রদ্ধাসহকারে সগুণ পরমেশ্বররূপী আমার উপাসনা করেন, আমার মতে তাঁরাই অতিশয় শ্রেষ্ঠ যোগী॥ ২

প্রশ্ন—ভগবানে মন একাগ্র করে নিরন্তর তাঁরই ভজন-ধ্যানে ব্যাপৃত থেকে তাঁর উপাসনা করা কী ?

উত্তর—গোপিনীদের ন্যায়[1] সমস্ত কর্ম করার সময় পরম প্রেমাস্পদ, সর্বশক্তিমান, সর্বান্তর্যামী, সমস্ত গুণের

[1] যা দোহনেঽবহননে মথনোপলেপপ্রেঙ্খেঙ্খনার্ভরুদিতোক্ষণমার্জনাদৌ।
গায়ন্তি চৈনমনুরক্তধিয়োঽশ্রুকণ্ঠ্যো ধন্যা ব্রজস্ত্রিয় উরুক্রমচিত্তযানাঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪৪।১৫)

'যাঁরা দুগ্ধ দোহনের সময়, ধানাদি কোটার সময়, দই পাতার সময়, বাচ্চাকে দোলনায় শোয়াবার সময়, ছড়া শোনাবার সময়, ঘর পরিষ্কার করার সময় এবং অন্যান্য গৃহকর্ম করার সময় প্রেমপূর্ণ চিত্তে, অশ্রুপূর্ণ নয়নে গদ্‌গদ বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের নামগান করেন—এইভাবে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণেই চিত্ত অর্পণকারী সেইসব ব্রজবাসিনী গোপরমণীগণ ধন্য।'

আকর ভগবানে মন তন্ময় করে তাঁর গুণ, প্রভাব ও স্বরূপের সদা-সর্বদা প্রেমপূর্বক চিন্তা করতে থাকাই হল মনকে একাগ্র করে নিরন্তর তাঁর ধ্যানে স্থিত হয়ে তাঁর উপাসনা করা।

প্রশ্ন—অতিশয় শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার স্বরূপ কী ? এবং তাতে যুক্ত হওয়া কাকে বলে ?

উত্তর—ভগবানের অস্তিত্বে, তাঁর অবতারাদিতে, বাক্যে, তাঁর শক্তিতে, তাঁর গুণ, প্রভাব, লীলা এবং ঐশ্বর্য ইত্যাদিতে অত্যন্ত সম্মানপূর্বক প্রত্যক্ষের থেকেও যে দৃঢ় বিশ্বাস— সেটিই হল অতিশয় শ্রদ্ধা এবং ভক্ত প্রহ্লাদের ন্যায় সর্ব প্রকারে ভগবানের ওপর নির্ভরশীল হওয়াকে বলা হয় উপরোক্ত প্রকারে তাঁতে শ্রদ্ধাযুক্ত হওয়া।

প্রশ্ন—'আমি তাকে উত্তম যোগবেত্তা বলে মনে করি'—এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই বাক্যে ভগবানের এই অভিপ্রায় যে দুপ্রকার উপাসকদের মধ্যে যিনি সগুণ পরমেশ্বররূপ আমার উপাসক, তাঁকেই আমি উত্তম যোগবেত্তা বলে মনে করি।

সম্বন্ধ—পূর্ব শ্লোকে সগুণ-সাকার পরমেশ্বরের উপাসকদের উত্তম যোগবেত্তা বলে জানিয়েছেন, এতে প্রশ্ন আসে যে, তাহলে নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্মের উপাসকগণ কি উত্তম যোগবেত্তা নন ? তাতে বলেছেন—

যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে।
সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩
সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ॥ ৪

কিন্তু যেসকল পুরুষ ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করে মন-বুদ্ধির অতীত, সর্বব্যাপী অব্যক্ত স্বরূপ, সর্বদা একরস, নিত্য, অচল, নিরাকার, অবিনাশী সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মের নিরন্তর একাত্মভাবে ধ্যানযুক্ত হয়ে উপাসনা করেন, সেই সর্ব প্রাণীর হিতে রত এবং সর্বত্র সমভাবাপন্ন যোগীগণও আমাকেই লাভ করেন॥ ৩-৪

প্রশ্ন—'অচিন্ত্যম্' কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—যা মন-বুদ্ধির বিষয় নয়, তাকে বলা হয় 'অচিন্ত্য'।

প্রশ্ন—'সর্বত্রগম্' কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—যা আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপী, কোনো স্থান যার থেকে রিক্ত নয়, তাকে বলা হয় 'সর্বত্রগ'।

প্রশ্ন—'অনির্দেশ্যম্' কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—যার নির্দেশ করা যায় না—কোনো যুক্তি বা উদাহরণ দ্বারা যার স্বরূপ বলা বা বোঝানো যায় না, তাকে 'অনির্দেশ্য' বলা হয়।

প্রশ্ন—'কূটস্থম্'-এর অর্থ কী ?

উত্তর—যার কখনও কোনো কারণে পরিবর্তন হয় না, যা সর্বদা একভাবে থাকে, তাকে বলা হয় 'কূটস্থ'।

প্রশ্ন—'ধ্রুবম্' কথার অর্থ কী ?

উত্তর—যা নিত্য এবং নিশ্চিত—যার অস্তিত্বে কোনোরূপ সংশয় নেই এবং যার কখনও অভাব হয় না, তাকে 'ধ্রুব' বলা হয়।

প্রশ্ন—'অচলম্'-এর অর্থ কী ?

উত্তর—যা নড়া-চড়া বা চলা-ফেরা ক্রিয়া হতে সর্বতোভাবে রহিত, তাকে বলা হয় 'অচল'।

প্রশ্ন—'অব্যক্তম্'-এর অর্থ কী ?

উত্তর—যা কোনো ইন্দ্রিয়ের বিষয় নয়, অর্থাৎ যাকে ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা জানা সম্ভব নয়, যার কোনো রূপ বা আকৃতি নেই, তাকে বলা হয় 'অব্যক্ত'।

প্রশ্ন—'অক্ষরম্' কথার অর্থ কী ?

উত্তর—যার কখনো কোনো কারণে বিনাশ হয় না, তাকে বলা হয় 'অক্ষর'।

প্রশ্ন—এই সব বিশেষণ প্রয়োগের তাৎপর্য কী ? এবং সেই ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ উপাসনা করা কাকে বলে ?

উত্তর—উপরোক্ত বিশেষণ দ্বারা নির্গুণ-নিরাকার

ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদন করা হয়েছে, এইভাবে সেই পরব্রহ্মের উপরোক্ত স্বরূপ অনুধাবন করে অভিন্নভাবে নিরন্তর ধ্যান করাই হল তাঁর শ্রেষ্ঠ উপাসনা।

প্রশ্ন—**'সর্বভূতহিতে রতাঃ'** কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—**'সর্বভূতহিতে রতাঃ'** পদটির তাৎপর্য হল, অবিবেকী মানুষ যেভাবে নিজ হিতে রত থাকে, সেইরূপ এই নির্গুণ উপাসকদের সমস্ত প্রাণীতে আত্মভাব হওয়ায় তাঁরা সমানভাবে সবার হিতে রত থাকেন।

প্রশ্ন—**'সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ'** কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর অভিপ্রায় হল যে, উপরোক্ত ভাবে নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসকদের কোথাও কোনো ভেদবুদ্ধি থাকে না। সমগ্র জগতে এক ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোনো অস্তিত্ব না থাকায় তাঁর সর্বত্র সমবুদ্ধি হয়ে যায়।

প্রশ্ন—তাঁরা আমাকেই লাভ করেন—এই কথাটির কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—এই কথায় ভগবান ব্রহ্মকে তাঁর থেকে অভিন্ন বলে জানিয়েছেন। অভিপ্রায় হল যে উপরোক্ত উপাসনার ফল যে নির্গুণ ব্রহ্মের প্রাপ্তি, তা বাস্তবিক আমাকেই প্রাপ্ত হওয়া ; কারণ ব্রহ্ম আমা হতে ভিন্ন নন এবং আমিও ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন নই। সেই ব্রহ্ম আমিই, এই ভাবার্থ ভগবান চতুর্দশ অধ্যায়ের সাতাশতম শ্লোকে **'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্'** অর্থাৎ আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, এই কথায় প্রতিপন্ন করেছেন।

প্রশ্ন—উভয়েরই যখন পরমেশ্বর লাভ হয়, তখন দ্বিতীয় শ্লোকে সগুণ-উপাসকদের শ্রেষ্ঠ বলার অর্থ কী ?

উত্তর—একাদশ অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন যে অনন্য ভক্তির দ্বারা মানুষ আমাকে দেখতে, তত্ত্বতঃ জানতে এবং লাভ করতে পারে (১১।৫৪)। এর দ্বারা এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে পরমাত্মাকে তত্ত্বতঃ জানা এবং প্রাপ্ত হওয়া—এই দুটি তো নির্গুণ উপাসকের পক্ষেও সম্ভব ; কিন্তু নির্গুণ উপাসকদের সগুণ রূপে দর্শন দেওয়ার জন্য ভগবান বাধ্য নন ; এবং সগুণ উপাসকদের ভগবদ্দর্শনও হয়ে থাকে—এই হল তাদের বিশেষত্ব।

সম্বন্ধ—এইভাবে নির্গুণ-উপাসনা এবং তার ফলের প্রতিপাদন করে এবার বলছেন দেহাভিমানীদের পক্ষে অব্যক্ত গতি প্রাপ্ত করা কঠিন—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ ৫

সেই সচ্চিদানন্দঘন নিরাকার ব্রহ্মে নিবিষ্ট চিত্ত পুরুষদের সাধনায় বিশেষ ক্লেশ হয় ; কারণ দেহাভিমানীদের দ্বারা অব্যক্ত বিষয়ক গতি লাভ করা কষ্টকর॥ ৫

প্রশ্ন—**'তেষাম্'** পদের সঙ্গে **'অব্যক্তাসক্তচেতসাম্'** পদ কীসের বাচক ? তাঁদের অধিক পরিশ্রম হয়, এই কথার তাৎপর্য কী ?

উত্তর—পূর্ব শ্লোকে যে নির্গুণ উপাসকদের বর্ণনা করা হয়েছে, যাঁদের মন নির্গুণ-নিরাকার সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেই আসক্ত—তাঁদের বাচক হল **'তেষাম্'**-এর সঙ্গে **'অব্যক্তাসক্তচেতসাম্'** পদটি। তাঁদের পরিশ্রম অধিক, ভগবানের এই কথার অভিপ্রায় হল, নির্গুণ ব্রহ্মের তত্ত্ব অত্যন্ত গভীর ; যাঁদের বুদ্ধি শুদ্ধ, স্থির ও সূক্ষ্ম, যাঁদের শরীরের প্রতি মমত্ববোধ থাকে না, তাঁরাই সেটি বুঝতে পারেন, সাধারণ মানুষ তা বুঝতে পারে না। তাই নির্গুণ-উপাসনার সাধনার প্রারম্ভে পরিশ্রম অধিক বোধ হয়।

প্রশ্ন—দেহাভিমানীরা অব্যক্ত বিষয়ক গতি দুঃখপূর্বক লাভ করেন—এই কথাটির মর্মার্থ কী ?

উত্তর—উপরোক্ত কথায় ভগবান পূর্বার্ধে বলা পরিশ্রমের কারণ জানিয়েছেন। অভিপ্রায় হল যে, দেহের প্রতি মমত্ববোধ থাকলে নির্গুণ ব্রহ্মের তত্ত্ব বোঝা অত্যন্ত কঠিন হয়। তাই যাঁর শরীরের প্রতি মমত্ববোধ আছে, তাঁর দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মের তত্ত্ব উপলব্ধি করা খুবই আয়াসসাধ্য হয়।

প্রশ্ন—এখানে অব্যক্তের উপাসনা অধিকতর কষ্টসাধ্য বলা হয়েছে এবং নবম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে

'কর্তুম্', 'সুসুখম্' পদ দ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সহজ জানিয়ে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে অব্যক্তেরই বর্ণনা করা হয়েছে ; সুতরাং দুটি স্থানের বর্ণনাতে বিরোধাভাস প্রতীত হচ্ছে, এর সমাধান কী ?

উত্তর—বিরোধ নেই, কারণ নবম অধ্যায়ে 'জ্ঞান' ও 'বিজ্ঞান' শব্দগুলি সগুণ ভগবানের গুণ, প্রভাব ও তত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য করায়, অতএব সেখানে সগুণ-নিরাকারের উপাসনা সহজসাধ্য বলা হয়েছে। ওখানে চতুর্থ শ্লোকে উদ্ধৃত 'অব্যক্ত' শব্দটি সগুণ-নিরাকারের বাচক, তাই তাঁকে সমস্ত প্রাণীর ধারণ-পোষণকারী, সবেতে পরিব্যাপ্ত এবং প্রকৃতপক্ষে অসঙ্গ হয়েও সকলের সৃষ্টি-পালনকারী ইত্যাদি বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—ষষ্ঠ অধ্যায়ের চব্বিশতম থেকে সাতাশতম শ্লোক পর্যন্ত নির্গুণ উপাসনার প্রকার জানিয়ে আঠাশতম শ্লোকে ঐরূপ সাধনার দ্বারা সুখপূর্বক পরমাত্মপ্রাপ্তিরূপ অত্যন্তানন্দ লাভ হওয়ার কথা বলা হয়েছে, এর সামঞ্জস্য কীভাবে হয় ?

উত্তর—সেখানকার বর্ণনা এরূপ পুরুষদের জন্য প্রযোজ্য যাদের সমস্ত পাপ এবং রজোগুণ, তমোগুণ দূরীভূত হয়েছে, যাঁরা 'ব্রহ্মভূত' অবস্থা লাভ করেছেন অর্থাৎ যাঁরা ব্রহ্মে অভিন্নভাবে স্থিত রয়েছেন ; দেহাভিমানীদের জন্য নয়। সুতরাং তাঁদের সুখপূর্বক ব্রহ্ম লাভের কথা বলা যথার্থ।

প্রশ্ন—নির্গুণ-উপাসকদেরই কি কেবল সাধন-কালে অধিক পরিশ্রম হয়, সগুণ উপাসকদের হয় না ?

উত্তর—সগুণ-উপাসকদের হয় না। কারণ প্রথমত সগুণের উপাসনা সহজ, দ্বিতীয়ত, তাঁরা ভগবানের ওপরই নির্ভর করেন ; তাই স্বয়ং ভগবান তাঁদের সর্ব প্রকারে সাহায্য করেন। এরূপ অবস্থায় তাঁদের পরিশ্রম কী করে হবে ?

সম্বন্ধ—এইভাবে দেহাভিমানীদের পক্ষে নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা পরমাত্মা-প্রাপ্তি কঠিন জানিয়ে এবার দুটি শ্লোকে সগুণ পরমেশ্বরের উপাসনা দ্বারা ঈশ্বরের প্রাপ্তি শীঘ্র ও অনায়াসে হওয়ার কথা বলছেন—

যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥ ৬

কিন্তু আমার পরায়ণ ভক্তজন যাঁরা আমাতে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করে সগুণ-রূপ পরমেশ্বর আমাকেই অনন্য ভক্তিযোগের দ্বারা নিরন্তর চিন্তা ও ভজনা করেন— ॥ ৬

প্রশ্ন—'তু' পদের এখানে কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—'তু' পদটি এখানে নির্গুণ-উপাসকদের থেকে সগুণ উপাসকদের বৈশিষ্ট্য দেখাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্ন—ভগবানের পরায়ণ হওয়া কী ?

উত্তর—ভগবানের ওপর নির্ভর করে নানাপ্রকার দুঃখেও ভক্ত প্রহ্লাদের ন্যায় নির্ভয় ও নির্বিকার থাকা ; সেই সব দুঃখ ভগবান প্রেরিত পুরস্কার মনে করে সুখ-রূপে ভাবা এবং ভগবানকেই পরম প্রেমিক, পরমগতি, পরম সুহৃদ ও সর্বপ্রকার শরণগ্রহণ যোগ্য মনে করে নিজেকে ভগবানে সমর্পণ করে দেওয়া—একেই বলা হয় ভগবানের পরায়ণ হওয়া।

প্রশ্ন—সমস্ত কর্ম ভগবানে সমর্পণ করা কাকে বলে ?

উত্তর—কর্ম সম্পাদনে নিজেকে পরাধীন ভেবে শুধুমাত্র ভগবানের নির্দেশ ও সংকেত অনুসারে কাঠের পুতুলের ন্যায় সমস্ত কর্মে রত থাকা ; সেই সব কর্মে মমতা ও আসক্তি না রাখা এবং তার ফলের সঙ্গেও সম্বন্ধ না রাখা ; শাস্ত্র অনুকূল প্রত্যেক ক্রিয়াতে এরূপ মনোভাব রাখা যে আমি তো নিমিত্তমাত্র, আমার কিছুই করার শক্তি নেই, ভগবানই তাঁর ইচ্ছানুসারে আমার দ্বারা সমস্ত কর্ম করাচ্ছেন—একেই বলা হয় সমস্ত কর্ম ভগবানে সমর্পণ করা।

প্রশ্ন—অনন্য ভক্তিযোগ কী ? এর দ্বারা ভগবানের চিন্তা করে তাঁর উপাসনা করা কীরূপ ?

উত্তর—এক পরমেশ্বর ব্যতীত আমার কেউ নেই, তিনিই আমার সর্বস্ব—এইরূপ মনে করে ভগবানে

স্বার্থরহিত ও অত্যন্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে অনন্যভাবে প্রেম করা —যে প্রেমে স্বার্থ, অভিমান ও ব্যভিচার দোষ লেশমাত্রও থাকে না, যা সর্বতোভাবে পূর্ণ ও অটল এবং ঈশ্বর-ব্যতীত অন্যত্র যা বিন্দুমাত্রও নেই এবং যার কারণে মুহূর্তমাত্রও ভগবানের বিস্মৃতি অসহ্য মনে হয়—সেই অনন্য প্রেমকে 'অনন্য ভক্তিযোগ' বলা হয়। এবং এরূপ ভক্তিযোগ দ্বারা নিরন্তর ভগবৎ চিন্তা করতঃ তাঁরই গুণ, প্রভাব এবং লীলা শ্রবণ-কীর্তন, তাঁর নামোচ্চারণ ও জপ ইত্যাদি করা—একেই বলা হয় অনন্য ভক্তিযোগের দ্বারা ভগবৎ চিন্তা করে তাঁর উপাসনা করা।

তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি নচিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥ ৭

হে অর্জুন! মদ্‌গতচিত্ত সেইসব প্রেমিক ভক্তকে আমি শীঘ্রই মৃত্যুরূপ সংসার-সমুদ্র থেকে উদ্ধার করি ॥ ৭

প্রশ্ন—'তেষাম্' পদের সঙ্গে '**ময্যাবেশিতচেতসাম্**' পদটি কীসের বাচক?

উত্তর—আগের শ্লোকে সর্বতোভাবে মন-বুদ্ধি ভগবানে নিবিষ্টকারী যেসব অনন্য প্রেমিক সগুণ-উপাসকদের বর্ণনা করা হয়েছে, সেই প্রেমিক ভক্তদের বাচক হল এখানে '**তেষাম্**'-এর সঙ্গে '**ময্যাবেশিতচেতসাম্**' পদটি।

প্রশ্ন—'মৃত্যুরূপ সংসার সাগর' কী এবং তার থেকে ভগবানের উপরোক্ত ভক্তকে **শীঘ্রই** উদ্ধার করা কাকে বলে?

উত্তর—এই জগতে সব কিছুই মরণশীল ; এখানে উৎপন্ন হওয়া এমন কোনো বস্তুই নেই, যা এক মুহূর্তের জন্যও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়। সমুদ্রে যেমন অসংখ্য তরঙ্গ ওঠে, তেমনই এই অপার সংসার-সাগরে অনবরত জন্ম-মৃত্যুরূপ তরঙ্গ উঠে থাকে। সমুদ্রের তরঙ্গ যদিও বা গণনা করা যায় ; কিন্তু যতক্ষণ ঈশ্বর লাভ না হয়, ততক্ষণ জীবকে যে কতবার জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হতে হবে, তা গণনা করা যাবে না। তাই একে 'মৃত্যুরূপ সংসার-সাগর' বলা হয়েছে।

উপরোক্ত প্রকারে মন-বুদ্ধি ভগবানে নিবিষ্ট করে যে ভক্ত নিরন্তর ভগবানের উপাসনা করেন, ভগবান তাঁকে তৎক্ষণাৎ জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে চিরকালের মতো মুক্ত করে এখানেই নিজের প্রাপ্তি করিয়ে দেন অথবা মৃত্যুর পর ভক্তকে নিজ পরমধামে নিয়ে যান। যেমন মাঝি নৌকা করে লোককে নদী পার করিয়ে দেয়, তেমনই ভক্তিরূপ নৌকায় অবস্থিত ভক্তকে ভগবান স্বয়ং মাঝি হয়ে তার সমস্ত কষ্ট এবং বাধাবিপত্তি দূর করে অতি শীঘ্রই ভীষণ সংসার সমুদ্র থেকে পার করে নিজ-পরমধামে নিয়ে যান। এই হল ভগবানের উপরোক্ত ভক্তকে মৃত্যুরূপ সংসার থেকে পার করা।

সম্বন্ধ—এইভাবে আগের শ্লোকে নির্গুণ-উপাসনার থেকে সগুণ-উপাসনার সুগমতা প্রতিপাদন করা হয়েছে। তাই ভগবান এবার অর্জুনকে তদনুরূপ মন, বুদ্ধি নিবিষ্ট করে সগুণ-উপাসনা করার নির্দেশ প্রদান করছেন—

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ॥ ৮

আমাতে মন নিবিষ্ট করো, আমাতেই বুদ্ধি নিবিষ্ট করো ; এরূপ করলে তুমি নিশ্চয়ই আমাতেই স্থিতিলাভ করবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই ॥ ৮

প্রশ্ন—বুদ্ধি ও মনকে ভগবানে নিবিষ্ট করা কাকে বলে?

উত্তর—যিনি সমগ্র চরাচর জগৎ ব্যাপ্ত করে সবার হৃদয়ে স্থিত এবং যিনি দয়া, সর্বজ্ঞতা, সুশীলতা ও

সহৃদয়তা ইত্যাদি গুণের সমুদ্র—সেই পরম দিব্য, প্রেমময় এবং আনন্দময়, সর্বশক্তিমান, সর্বোত্তম, শরণ গ্রহণযোগ্য পরমেশ্বরের গুণ, প্রভাব ও লীলার তত্ত্ব এবং রহস্যকে যথাযথভাবে জেনে তাঁর ওপর সদা সর্বদা ও সর্বত্র অটল বিশ্বাস রাখা— একেই বলে ভগবানে বুদ্ধি নিবিষ্ট করা। এইরূপ নিজের পরম প্রেমাস্পদ পুরুষোত্তম ভগবানের অতিরিক্ত অন্য সমস্ত বিষয় থেকে আসক্তি সর্বতোভাবে সরিয়ে মনকে কেবল ভগবানেই সমাহিত করে রাখা এবং নিত্য-নিরন্তর উপরোক্ত প্রকারে তাঁর চিন্তা করতে থাকা—একেই বলা হয় ভগবানে মন নিবিষ্ট করা।

এইভাবে যিনি নিজ মন-বুদ্ধি ভগবানে নিবিষ্ট করেন, তিনি শীঘ্রই ভগবানকে লাভ করেন।

প্রশ্ন—ভগবানে মন-বুদ্ধি নিবিষ্ট করলে মানুষ যদি নিশ্চিতভাবে ভগবানকে লাভ করে, তাহলে সকলে ভগবানে মন-বুদ্ধি নিবিষ্ট করে না কেন ?

উত্তর— গুণ, প্রভাব এবং লীলার তত্ত্ব ও রহস্য ইত্যাদি না জানায় সকলের ভগবানে শ্রদ্ধা-প্রেম হয় না এবং অজ্ঞতাজনিত আসক্তিবশতঃ জাগতিক বিষয়ের চিন্তা হতে থাকে। জগতের অধিকাংশ মানুষেরই এই অবস্থা, তাই সকলে ভগবানে মন-বুদ্ধি নিবিষ্ট করে না।

প্রশ্ন—যে অজ্ঞতাজনিত আসক্তির ফলে মানুষের মধ্যে সাংসারিক ভোগের চিন্তার কু-অভ্যাস রয়েছে, তার থেকে মুক্তিলাভের উপায় কী ?

উত্তর—ভগবানের গুণ, প্রভাব ও লীলার তত্ত্ব এবং রহস্য জানলে এবং মানলে এই কু-অভ্যাস দূর হতে পারে।

প্রশ্ন— ভগবানের গুণ, প্রভাব, লীলার তত্ত্ব এবং রহস্যের জ্ঞান কী করে হতে পারে ?

উত্তর— ভগবানের গুণ, প্রভাব, লীলার তত্ত্ব ও রহস্যের অনুভবকারী মহাপুরুষদের সঙ্গ, তাঁদের গুণ ও আচরণাদির অনুকরণ এবং ভোগ, আলস্য ও প্রমাদ ত্যাগ করে বিশ্বাসপূর্বক তাঁদের প্রদর্শিত পথ তৎপরতার সঙ্গে অনুসরণ করলে তাঁর জ্ঞান হওয়া সম্ভব।

সম্বন্ধ—এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, আমি যদি উপরোক্ত প্রকারে আপনাতে মন-বুদ্ধি নিবিষ্ট করতে না পারি, তাহলে আমার কী করা উচিত। ভগবান তার উত্তরে জানাচ্ছেন—

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥ ৯

তুমি যদি মনকে আমাতে অচলভাবে স্থাপন করতে না পারো, তাহলে হে অর্জুন ! অভ্যাসযোগের দ্বারা আমাকে লাভ করার জন্য চেষ্টা করো ॥ ৯

প্রশ্ন—এই শ্লোকের তাৎপর্য কী ?

উত্তর—ভগবান অর্জুনকে নিমিত্ত করে সমস্ত জগতের হিতার্থে উপদেশ প্রদান করছেন। জগতে সব সাধকের প্রকৃতি (স্বভাব) একপ্রকার হয় না, তাই একই সাধন সকলের পক্ষে উপযোগী হয় না। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সাধনই উপযুক্ত হয়ে থাকে। তাই ভগবান এই শ্লোকে বলেছেন যে যদি তুমি উপরোক্ত প্রকারে আমাতে মন ও বুদ্ধি স্থিরভাবে স্থাপন করতে না পারো, তাহলে তুমি অভ্যাসযোগের সাহায্যে আমাকে পাওয়ার চেষ্ট করো।

প্রশ্ন—অভ্যাসযোগ কাকে বলে এবং তার সাহায্যে ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করা কীরূপ ?

উত্তর— ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য নানাপ্রকার যুক্তি দ্বারা ভগবানে চিত্ত নিবিষ্ট করার যে বারংবার চেষ্টা করা হয়, তাকে 'অভ্যাসযোগ' বলে। ভগবানের যে নাম, রূপ, গুণ ও লীলা ইত্যাদিতে সাধকের শ্রদ্ধা ও প্রেম থাকে—তাতে কেবল তাঁকেই লাভ করার উদ্দেশ্যে বারংবার মনোনিবেশ করার যে চেষ্টা করা হয়, তাকেই বলা হয় অভ্যাসযোগের দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তির চেষ্টা করা।

ভগবানে মনোনিবেশ করার জন্য নানাপ্রকার সাধন শাস্ত্রে বলা আছে, তার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি সাধন সর্বসাধারণের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী বলে মনে হয়—

১) সূর্যের সামনে চক্ষুবন্ধ করলে মনে সর্বত্র সমভাবে যে এক প্রকাশপুঞ্জ প্রতীত হয়, তার থেকেও সহস্রগুণ অধিক প্রকাশপুঞ্জ ভগবৎস্বরূপে আছে— মনে এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করে পরমাত্মার সেই তেজোময় জ্যোতিঃস্বরূপে চিত্ত নিবেশ করার জন্য বারংবার প্রচেষ্টা করা।

২) দেশলাইতে যেমন অগ্নি ব্যাপকভাবে নিহিত থাকে, তেমনই ভগবান সর্বত্র ব্যাপক ভাবে অবস্থিত, এইরূপ মনে করে যে যে স্থানে মন যেতে চায়, সেই সেই স্থানেই গুণ ও প্রভাবসহ সর্বশক্তিমান পরম প্রেমাস্পদ পরমেশ্বরের স্বরূপ প্রেমপূর্বক বারংবার চিন্তা করতে থাকা।

৩) যে যে স্থানে মন যায়, সেই সেই স্থান থেকে মনকে সরিয়ে ভগবান বিষ্ণু, শিব, রাম ও কৃষ্ণ প্রমুখ, যিনি নিজের ইষ্টদেব—তাঁর মানসিক বা ধাতু ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত মূর্তিতে অথবা চিত্রপটে বা তাঁর নাম-জপে, শ্রদ্ধা ও প্রেমসহ পুনঃপুনঃ মনোনিবেশের চেষ্টা করা।

৪) ভ্রমরের গুঞ্জনের মতো অবিচ্ছিন্নভাবে ওঁ-কার ধ্বনি উচ্চারণ করে সেই ধ্বনিতে পরমেশ্বরের স্বরূপ বারংবার চিন্তা করা।

৫) স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের নাম-জপ যাতে নিত্য-নিরন্তর হতে থাকে— তার জন্য যত্নশীল হওয়া।

৬) পরমাত্মার নাম, রূপ, গুণ, চরিত্র ও প্রভাবের রহস্য জানার জন্য তদ্বিষয়ক শাস্ত্রাদি পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন করা।

৭) চতুর্থ অধ্যায়ের উনত্রিশতম শ্লোক অনুসারে প্রাণায়ামের অভ্যাস করা।

এর মধ্যে যে কোনো একটি অভ্যাস (সাধন) যদি শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসের সঙ্গে ঐকান্তিকভাবে করা যায় তাহলে সমস্ত পাপ ও বিঘ্ন ক্রমশঃ নাশ হয়ে শেষে ভগবৎপ্রাপ্তি হয়। তাই অত্যন্ত উৎসাহ এবং তৎপরতার সঙ্গে অভ্যাস করা উচিত। সাধকের স্থিতি, অধিকার এবং সাধনের অগ্রগতির তারতম্যে ফল প্রাপ্তিতে কিছু হের-ফের হতে পারে। সুতরাং শীঘ্র ফল না তা পেলে কঠিন মনে করে, হতাশ হয়ে বা আলস্যের বশীভূত হয়ে অভ্যাস ত্যাগ করতে নেই বা অভ্যাসে কোনোরকম শৈথিল্য আনা উচিত নয়। বরং তা ক্রমাগত বাড়ানোর চেষ্টা করা উচিত।

সম্বন্ধ—এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে আমি যদি এইরূপ অভ্যাসযোগও করতে না পারি, তাহলে আমার কী করা উচিত ? তাতে বলেছেন—

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥ ১০

যদি তুমি এইরূপ অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তাহলে শুধুমাত্র আমার জন্যই কর্ম করো। কারণ আমার জন্যই কর্মে নিরত হলেও তুমি আমার প্রাপ্তিরূপ সিদ্ধি লাভ করবে ॥ ১০

প্রশ্ন—যদি তুমি অভ্যাসেও অসমর্থ হও—কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, যদিও তোমার পক্ষে মনোনিবেশ করা বা উপরোক্ত প্রকারে 'অভ্যাসযোগে'র দ্বারা আমাকে লাভ করা কোনো কঠিন কাজ নয়, তবুও তুমি যদি নিজেকে এতে অসমর্থ মনে করো, তাহলেও চিন্তার কারণ নেই ; তোমাকে আমি তৃতীয় একটি উপায় জানাচ্ছি। স্বভাবের পার্থক্যে বিভিন্ন সাধকদের জন্য বিভিন্ন প্রকারের সাধনই উপযোগী হয়ে থাকে।

প্রশ্ন—'**মৎকর্ম**' শব্দ কোন্ কর্মের বাচক ? এর পরায়ণ হওয়া কী ?

উত্তর— এখানে '**মৎকর্ম**' শব্দ সেই সকল কর্মের বাচক যা শুধুমাত্র ভগবানের জন্যই হয়ে থাকে অথবা যা ভগবৎ-সেবা ও পূজা-বিষয়ক হয়। যে কর্মে নিজের কোনোরূপ স্বার্থ থাকে না, মমত্ব-বোধ ও আসক্তি ইত্যাদির সম্পর্কও থাকে না, তাকেও '**মৎকর্ম**' বলা হয়। একাদশ অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকেও '**মৎকর্মকৃৎ**' পদে '**মৎকর্ম**' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানেও এর ব্যাখ্যা

করা হয়েছে।

একমাত্র ভগবানকেই নিজের পরম আশ্রয় এবং পরমগতি বলে মানা এবং শুধুমাত্র তাঁর প্রসন্নতার জন্যই পরম শ্রদ্ধা ও অনন্য প্রেমের সঙ্গে কায়-মনো-বাক্যে তাঁর সেবা-পূজা ইত্যাদি করা এবং যজ্ঞ-দান-তপাদি শাস্ত্রবিহিত কর্মও নিজ কর্তব্য মনে করে নিরন্তর করতে থাকা—একেই বলা হয় ঐসকল কর্মের পরায়ণ হওয়া।

প্রশ্ন— আমার জন্য কর্ম করেও আমার প্রাপ্তিরূপ সিদ্ধি লাভ করবে—এই বাক্যটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, এইভাবে কর্ম করাও আমাকে পাওয়ার এক স্বতন্ত্র ও সহজ সাধন। ভজন-ধ্যান সাধনকারীরা যেমন আমাকে লাভ করে, তেমনই আমার জন্য যারা কর্ম করে তারাও আমাকে পেতে সক্ষম। অতএব আমার জন্য কর্ম করা পূর্বোক্ত সাধনের থেকে কোনো অংশেই নিম্নশ্রেণীর সাধন নয়।

সম্বন্ধ—এখানে অর্জুনের প্রশ্ন হতে পারে যে যদি উপরোক্ত প্রকারে আমি কর্মও না করতে পারি, তাহলে আমার কী করা উচিত ? তাতে বলেছেন—

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥ ১১

আমার প্রাপ্তিরূপ উপরোক্ত যোগের সাধনা করতেও যদি তুমি অসমর্থ হও, তাহলে মন-বুদ্ধি সংযমপূর্বক সর্বকর্মের ফল ত্যাগ করো ॥ ১১

প্রশ্ন—'যদি আমার প্রাপ্তিরূপ উপরোক্ত যোগের সাধনা করতেও তুমি অসমর্থ হও'—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই বাক্যে ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত ভক্তিযুক্ত কর্মযোগের সাধনা করা তোমার পক্ষে সহজ, কঠিন নয়। তা সত্ত্বেও যদি তুমি তা কঠিন মনে কর, তাহলে আমি তোমাকে এখন অন্য একপ্রকার সাধনের কথা জানাচ্ছি।

প্রশ্ন—'**যতাত্মবান্**' কাকে বলা হয় ? অর্জুনকে 'যতাত্মবান' হওয়ার জন্য বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে 'আত্মা' শব্দটি মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি-সহ শরীরের বাচক। তাই যিনি মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি-সহ শরীরের ওপর প্রাপ্ত করেছেন, তাঁকেই বলা হয় '**যতাত্মবান্**'। মন ও ইন্দ্রিয়াদি যদি বশে না থাকে, তবে সেগুলি জোর করে মানুষকে ভোগে আকৃষ্ট করে ফলে সমস্ত কর্মের ফলরূপে প্রাপ্ত ভোগের কামনা ও আসক্তি ত্যাগ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং 'সর্বকর্মফলত্যাগে'র সাধনায় আত্মসংযমের খুবই প্রয়োজন হওয়ায় এখানে অর্জুনকে '**যতাত্মবান্**' হতে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—ষষ্ঠ থেকে দশম শ্লোক পর্যন্ত কথিত সাধনে কোথাও '**যতাত্মবান্**' হওয়ার কথা বলা হয়নি, এর অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকে অনন্য ভক্তিযোগের সাধকদের বর্ণনা আছে ; বাস্তবিক সেই অনন্যপ্রেমী ভক্তদের সাংসারিক ভোগে আকর্ষণ না থাকায় তাঁদের মন-বুদ্ধি ইত্যাদি স্বাভাবিকভাবে সংসারে অনাসক্ত থাকায় ভগবানেই নিবিষ্ট থাকে। তাই ঐ শ্লোকগুলিতে '**যতাত্মবান্**' হওয়ার কথা বলা হয়নি।

নবম শ্লোকে 'অভ্যাসযোগে'র কথা বলা হয়েছে এবং ভগবানে মন বুদ্ধি নিবিষ্ট করার যতপ্রকার সাধন আছে, সে সবই অভ্যাস যোগের অন্তর্গত—তাই সেখানে '**যতাত্মবান্**' হওয়ার জন্য পৃথকভাবে বলার প্রয়োজন নেই। দশম শ্লোকে ভক্তিযুক্ত কর্মযোগের বর্ণনা আছে, যাতে ভগবানের আশ্রয় রয়েছে এবং সাধকের সমস্ত কর্মও ভগবদর্থেই হয়ে থাকে। অতএব সেখানেও '**যতাত্মবান্**' হওয়ার জন্য পৃথকভাবে বলার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই শ্লোকে যে 'সর্বকর্মফলত্যাগ'-রূপ কর্মযোগের সাধনের কথা বলা হয়েছে, তাতে মন-বুদ্ধি বশে না রাখলে কাজ হবে না ; কারণ বর্ণাশ্রমোচিত সমস্ত ব্যবহারিক কর্ম করাকালীন যদি মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি বশে

না থাকে, তাহলে সাধকের সহজেই ভোগাদিতে মমতা-কামনা-আসক্তি হওয়া সম্ভব এবং সেক্ষেত্রে 'সর্বকর্মফলত্যাগ' রূপ সাধন সফল হতে পারবে না। তাই এখানে 'যতাত্মবান্' পদ প্রয়োগ করে মন-বুদ্ধি ইত্যাদি বশে রাখার জন্য বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে।

প্রশ্ন—'সর্বকর্ম' শব্দ এখানে কোন্ কর্মাদির বাচক এবং সেগুলির ফলত্যাগ করা বলতে কী বুঝায় ?

উত্তর—যজ্ঞ, দান, তপ, সেবা এবং বর্ণাশ্রম অনুসারে জীবিকা ও শরীর-নির্বাহের জন্য করা শাস্ত্রসম্মত সকল কর্মের বাচক হল এই 'সর্বকর্ম' শব্দটি। ঐ কর্মগুলি যথাযোগ্যভাবে পালন করে, ইহলোক ও পরলোকের ভোগপ্রাপ্তিরূপ সেগুলির যা ফল—তাতে মমতা, আসক্তি ও কামনা সর্বতোভাবে ত্যাগ করাই হল সর্বকর্মাদির ফলত্যাগ করা।

এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে মিথ্যা, কপটাচার, নারীসঙ্গ (ব্যভিচার), হিংসা এবং চুরি ইত্যাদি নিষিদ্ধ কর্মগুলি 'সর্বকর্মে'র অন্তর্গত নয়। ভোগে আসক্তি ও ভোগ্য বস্তুর কামনার জন্যই এরূপ পাপকর্ম করা হয় এবং তার ফলস্বরূপ মানুষের সর্বপ্রকারে পতন হয় ; তাই সেগুলি সর্বতোভাবে ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে। যেহেতু ঐসকল কর্মের সর্বতোভাবে নিষেধ করা হয়েছে, অতএব সেগুলির ফলত্যাগের কথা তো আসতেই পারে না।

প্রশ্ন—ভগবান প্রথমে মন-বুদ্ধি তাঁতে নিবেশ করার জন্য বলেছেন, তারপর অভ্যাসযোগের কথা বলেছেন, তদনন্তর মদর্থ (ভগবানের জন্য) কর্মের জন্য বলেছেন, শেষে সর্বকর্মফলত্যাগ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং একটিতে অসমর্থ হলে অন্যটি আচরণ করতে বলেছেন ; ভগবানের এই ধরনের বক্তব্য কি ফলভেদের দৃষ্টিতে, নাকি একটির থেকে অন্যটিকে সহজ বলার জন্য, অথবা অধিকারী ভেদে বলা হয়েছে ?

উত্তর—ফলভেদের দৃষ্টিতে নয়, কারণ সকল সাধনের ফলই এক—ঈশ্বর লাভ ; একটির থেকে অন্যটিকে সহজ বলার জন্যও নয় ; কারণ উপরোক্ত সাধন একে-অপরের অপেক্ষা ক্রমানুযায়ী সহজ নয়। যে সাধন একজনের কাছে সহজ, সেটিই অন্যের পক্ষে কঠিন হতে পারে। এইভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, এই চারটি সাধনার বর্ণনা কেবল অধিকারী ভেদেই করা হয়েছে।

প্রশ্ন—এই চারটি সাধনার মধ্যে কোন্ সাধনা কীরূপ মানুষের জন্য উপযোগী ?

উত্তর—যে ব্যক্তির মধ্যে সগুণ ভগবানের প্রতি প্রেমের প্রাধান্য, যাঁর ভগবানে স্বাভাবিক শ্রদ্ধা, ভগবানের গুণ, প্রভাব, রহস্যের কথা ও লীলার বর্ণনা যাঁর স্বভাবতই প্রিয় লাগে—এরূপ ব্যক্তির জন্য অষ্টম শ্লোকে বর্ণিত সাধন সহজ এবং উপযোগী হয়।

যে ব্যক্তির ভগবানে স্বাভাবিক প্রেম নেই, কিন্তু শ্রদ্ধা থাকায় হঠপূর্বক সাধন করে ভগবানে মনোনিবেশ করতে চায়—এরূপ প্রকৃতির পুরুষের জন্য নবম শ্লোকে বর্ণিত সাধন সহজ ও উপযোগী।

যে ব্যক্তির সগুণ পরমেশ্বরে শ্রদ্ধা থাকে এবং যজ্ঞ, দান, তপ ইত্যাদি কর্মে যার স্বাভাবিক প্রীতি, ভগবানের প্রতিমা ইত্যাদির সেবা-পূজা করার প্রতি যার স্বাভাবিক শ্রদ্ধা—এরূপ ব্যক্তির জন্য দশম শ্লোকে বর্ণিত সাধন সহজ ও উপযোগী।

আর যে ব্যক্তির সগুণ-সাকার ভগবানে স্বাভাবিক প্রেম ও শ্রদ্ধা নেই, যে ঈশ্বরের স্বরূপকে কেবল সর্বব্যাপী নিরাকার বলে মনে করে, ব্যবহারিক এবং লোকহিতকর কর্ম করাতেই যার স্বাভাবিক প্রেম এবং এরূপ কর্মে শ্রদ্ধা ও রুচি অধিক হওয়ায় যার মন নবম শ্লোকে বর্ণিত অভ্যাসযোগেও নিবিষ্ট হয় না—এরূপ ব্যক্তির জন্য এই শ্লোকে বর্ণিত সাধন সহজ ও উপযোগী।

প্রশ্ন—ষষ্ঠ শ্লোক অনুসারে সমস্ত কর্ম ভগবানে অর্পণ করা, দশম শ্লোকানুসারে ভগবানের জন্য ভগবদ্ কর্ম করা এবং এই শ্লোকে সর্বকর্মের ফলত্যাগ করা—এই তিনপ্রকার সাধনের মধ্যে পার্থক্য কী ? তিনটির ফল ভিন্ন ভিন্ন, না এক ?

উত্তর—সর্বকর্ম ভগবানে অর্পণ করা, ভগবানের জন্য সমস্ত কর্ম করা ও সর্বকর্মের ফলত্যাগ করা—এই তিনটিই 'কর্মযোগ' ; এই তিনেরই ফল হল ঈশ্বর প্রাপ্তি ; অতএব ফলে কোনো প্রকারের পার্থক্য নেই। শুধু সাধকের চিন্তাধারা ও তার সাধন-প্রণালীর পার্থক্যে এই ভেদ করা হয়েছে। সমস্ত কর্ম ভগবানে অর্পণ করা এবং ভগবানের জন্য সমস্ত কর্ম করা—এই দুটিতে ভক্তির

প্রাধান্য থাকে ; সর্বকর্মফলত্যাগে শুধুমাত্র ফল-ত্যাগের প্রাধান্য থাকে। এটিই হল এই সাধনগুলির মধ্যে মুখ্য পার্থক্য।

সর্বকর্ম ভগবানে অর্পণকারী ব্যক্তি মনে করেন যে আমি ভগবানের হাতের পুতুল, আমার কিছু করার সামর্থ্য নেই ; আমার মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি যা কিছু আছে— সব ভগবানের এবং ভগবানই তাঁর ইচ্ছানুসারে এদের দ্বারা সমস্ত কর্ম করাচ্ছেন, সেই কর্ম এবং তার ফলের সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ নেই। এইরূপ ভাব পোষণ করায় সেই সাধকের কর্মে এবং তার ফলে বিন্দুমাত্রও রাগ-দ্বেষ থাকে না ; প্রারব্ধানুসারে তাঁর যা কিছু সুখ-দুঃখের ভোগ হয়, সেগুলি ভগবানের প্রসাদ মনে করে সর্বদাই প্রসন্ন থাকেন। সুতরাং তাঁর সবকিছুতে সমভাব হওয়ায় তিনি শীঘ্রই ভগবানকে লাভ করেন।

ভগবদর্থ কর্মকারী মানুষ পূর্বোক্ত সাধকের ন্যায় এটা মনে করেন না যে 'আমি কিছু করি না, ভগবানই আমাকে দিয়ে সবকিছু করিয়ে নিচ্ছেন।' বরং তিনি এটা মনে করেন যে, ভগবান আমার পরম পূজনীয়, পরম প্রেমিক এবং পরম সুহৃদ ; তাঁর সেবা করা ও তাঁর নির্দেশ পালন করাই আমার পরম কর্তব্য। তাই তিনি ভগবানকে সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত মনে করে তাঁর সেবার উদ্দেশ্যে শাস্ত্রে বর্ণিত তাঁর নির্দেশানুসারে যজ্ঞ, দান, তপ এবং বর্ণাশ্রম অনুসারে জীবিকা ও শরীর নির্বাহের সমস্ত কর্ম ও ভগবানের পূজা-সেবা ইত্যাদি কর্মে নিযুক্ত থাকেন। তাঁর প্রত্যেক ক্রিয়া ভগবানের নির্দেশানুসার ও ভগবানেরই সেবার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে (১১।৫৫)। সুতরাং ঐসকল ক্রিয়া এবং তার ফলে তাঁর আসক্তি ও কামনার অভাববশতঃ তিনি শীঘ্রই ভগবানকে লাভ করেন।

শুধু 'সর্বকর্ম ফলত্যাগকারী' ব্যক্তি মনে করেন না যে ভগবান আমার দ্বারা কর্ম করাচ্ছেন এবং এমনও মনে করেন না যে আমি ভগবানের জন্য সব কর্ম করছি। তিনি মনে করেন কর্ম করাতেই মানুষের অধিকার, তার ফলে নয় (২।৪৭ থেকে ৫১ পর্যন্ত) সুতরাং কোনো প্রকারের ফল না চেয়ে কেবল যজ্ঞ, দান, তপ, সেবা এবং বর্ণাশ্রম অনুসারে জীবিকা ও শরীর নির্বাহের জন্য খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি সমস্ত শাস্ত্রবিহিত কর্ম করাই আমার কর্তব্য। অতএব তিনি সমস্ত কর্মের ফলস্বরূপ ইহলোক ও পরলোকের ভোগের প্রতি মমতা, আসক্তি এবং কামনা সর্বতোভাবে ত্যাগ করেন (১৮।৯) ; তার ফলে তাঁর রাগ, দ্বেষ চিরতরে বিনাশ হয়ে তিনি শীঘ্রই ভগবানকে লাভ করেন।

এইভাবে তিনটি সাধনের একই ফল অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তি হলেও সাধকের যোগ্যতা এবং সাধন প্রণালীতে পার্থক্য থাকায় তিন প্রকার সাধনের কথা পৃথক পৃথক বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ—ষষ্ঠ শ্লোক থেকে অষ্টম শ্লোক পর্যন্ত একনিষ্ঠ ধ্যানের ফলসহ বর্ণনা করে নবম থেকে একাদশ শ্লোক পর্যন্ত এক প্রকারের সাধনায় অসমর্থ হলে অন্য প্রকারের সাধনার কথা বলে, শেষে 'সর্বকর্মফলত্যাগ' রূপ সাধনের বর্ণনা করেছেন, এখানে এই প্রশ্ন হতে পারে যে 'কর্মফলত্যাগ' রূপ সাধন পূর্বোক্ত অন্য সাধনাগুলির থেকে নিম্নশ্রেণীর কিনা ; তাই ঐ আশঙ্কা দূর করার জন্য ভগবান পরের শ্লোকে কর্মফলত্যাগের মহত্ত্ব জানাচ্ছেন—

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥ ১২

মর্ম না জেনে শুধুমাত্র অভ্যাস করা থেকে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ; জ্ঞানের থেকে পরমেশ্বরের স্বরূপের ধ্যান শ্রেষ্ঠ ; ধ্যানের থেকে সর্বকর্মের ফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ ; কারণ ত্যাগের দ্বারা তৎকালই পরম শান্তি লাভ হয় ॥ ১২

প্রশ্ন—এখানে 'অভ্যাস' শব্দ কীসের বাচক এবং 'জ্ঞান' শব্দ কীসের বাচক ? অভ্যাসের থেকে জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে 'অভ্যাস' শব্দটি নবম শ্লোকে বর্ণিত অভ্যাসযোগের অন্তর্ভুক্ত কেবলমাত্র অভ্যাসের বাচক অর্থাৎ সকামভাবে প্রাণায়াম, মনোনিগ্রহ, স্তোত্র-পাঠ, বেদ-অধ্যয়ন, ভগবৎ নাম জপ ইত্যাদির জন্য বারংবার প্রচেষ্টা করাকে বলা হয় 'অভ্যাস', যাতে বিবেক-জ্ঞান,

ধ্যান এবং কর্মফল ত্যাগের সর্বতোভাবে অভাব রয়েছে। অভিপ্রায় হল যে নবম শ্লোকে যে যোগ অর্থাৎ নিষ্কামভাব ও বিবেক-জ্ঞানের ফলে যে ভগবৎপ্রাপ্তির ইচ্ছা জাগ্রত হয়, তা এক্ষেত্রে নেই ; কারণ এই দুটি যার অন্তর্গত, সেই অভ্যাসের সঙ্গে জ্ঞানের তুলনা করা এবং তার থেকে অভ্যাসরহিত জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ বলা কখনো সম্ভব নয়।

এইরূপ এখানে 'জ্ঞান' শব্দটিও সৎসঙ্গ ও শাস্ত্র থেকে উৎপন্ন সেই বিবেক জ্ঞানের বাচক, যার দ্বারা মানুষ আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপকে এবং ভগবানের গুণ, প্রভাব, লীলা ইত্যাদিকে হৃদয়ঙ্গম করে এবং সংসার ও ভোগের অনিত্যতা ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক বিষয়েও সচেতন হয় কিন্তু তার সঙ্গে অভ্যাস নেই, ধ্যান নেই এবং কর্ম-ফলেচ্ছার ত্যাগও নেই। কারণ এগুলি যার অর্ন্তগত, সেই জ্ঞানের সঙ্গে অভ্যাস, ধ্যান ও কর্মফল ত্যাগের তুলনামূলক বিচার করা এবং তার থেকে ধ্যানকে ও কর্মফল ত্যাগকে শ্রেষ্ঠ বলা কখনো সম্ভব নয়।

উপরোক্ত অভ্যাস ও জ্ঞান উভয়ই নিজ নিজ স্থানে ভগবৎপ্রাপ্তিতে সহায়ক হয় ; শ্রদ্ধা-ভক্তি ও নিষ্কামভাব সহযোগে দুটির দ্বারাই মানুষ পরমাত্মাকে লাভ করতে সক্ষম। তবুও উভয়ের পরস্পর তুলনা করলে অভ্যাসের থেকে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত হয়। বিবেকহীন অভ্যাস ভগবৎপ্রাপ্তিতে ততটা সহায়ক হতে পারে না, যতটা অভ্যাসহীন বিবেকজ্ঞান হতে পারে ; কারণ এটি ভগবৎপ্রাপ্তির ইচ্ছাকে জাগ্রত করতে সহায়ক হয়। এই কথা জানাবার জন্য এখানে অভ্যাসের থেকে জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে 'ধ্যান' শব্দটি কীসের বাচক এবং তাকে জ্ঞানের থেকে শ্রেষ্ঠ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে 'ধ্যান' শব্দটি ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্লোক পর্যন্ত কথিত ধ্যানযোগের মধ্যে কেবলমাত্র ধ্যানের বাচক অর্থাৎ উপাস্যদেব মনে করে সকামভাবে কেবল মন-বুদ্ধিকে ভগবানের সাকার অথবা নিরাকার—কোনো একটি স্বরূপে স্থির করার বাচক। এতে পূর্বোক্ত বিবেক-জ্ঞান বা ভোগাদি কামনার ত্যাগরূপ নিষ্কামভাব —কোনোটিই থাকে না। অভিপ্রায় হল এই যে, পূর্বোক্ত ধ্যানযোগে সমস্ত কর্ম ভগবানে সমর্পণ করে দেওয়া, ভগবানকেই পরম প্রাপ্তব্য বলে জানা এবং অনন্য প্রেমে ভগবানের ধ্যান করা—এই সব সম্মিলিত ভাব এতে নেই। কারণ ভগবানকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে অনন্য প্রেমপূর্বক নিষ্কামভাবে করা যে ধ্যানযোগ, তাতে বিবেকজ্ঞান এবং কর্মফল ত্যাগ অর্ন্তভুক্ত থাকে। তাই তার সঙ্গে বিবেকজ্ঞানের তুলনা করা ও তার থেকে কর্মফল ত্যাগকে শ্রেষ্ঠ বলা কখনো সম্ভব নয়।

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে কথিত বিবেকজ্ঞান এবং উপরোক্ত ধ্যান— উভয়ই শ্রদ্ধা-প্রেম এবং নিষ্কামভাব-পূর্বক করা হলে পরমাত্মার প্রাপ্তি করিয়ে দেয়, তাই দুটিই ভগবানের প্রাপ্তির সহায়ক। কিন্তু উভয়ের পরস্পর তুলনা করলে ধ্যান ও অভ্যাস রহিত জ্ঞানের থেকে বিবেকরহিত ধ্যানই শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত হয়। কারণ ধ্যান ও অভ্যাস ব্যতীত কেবল বিবেকজ্ঞান ভগবৎপ্রাপ্তিতে ততটা সহায়ক হতে পারে না, যতটা বিবেকজ্ঞান ব্যতীত কেবল ধ্যান হতে পারে। ধ্যানের সাহায্যে চিত্ত স্থির হলে চিত্তের মালিন্য ও চঞ্চলতার বিনাশ হয় ; কিন্তু শুধু বই পড়ে জানলেই তা হয় না। এই বিষয়টি জানানোর জন্য জ্ঞানের থেকে ধ্যানকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—'কর্মফলত্যাগ' কীসের বাচক এবং তাকে ধ্যানের থেকে শ্রেষ্ঠ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর— একাদশ শ্লোকে 'সর্বকর্মফলত্যাগের' যে স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে, তারই বাচক 'কর্মফলত্যাগ'। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে কথিত ধ্যানও পরমাত্মা প্রাপ্তির সহায়ক ; কিন্তু যতক্ষণ মানুষের কামনা ও আসক্তির বিনাশ না হয়, ততক্ষণ সহজে তার পরমাত্মার প্রাপ্তি হয় না। সুতরাং ফলাসক্তি ত্যাগ রহিত ধ্যান পরমাত্মার প্রাপ্তিতে ততটা লাভপ্রদ হয় না, যতটা ধ্যান ব্যতীত সমস্ত কর্মফল ও আসক্তির ত্যাগ দ্বারা হয়।

প্রশ্ন—ত্যাগের দ্বারা তৎকালই শান্তি লাভ হয়, এই কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এই কথায় ভগবানের এই অভিপ্রায় যে কর্মফলরূপ ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত ভোগে মমতা, আসক্তি ও কামনা সর্বতোভাবে ত্যাগ হয়ে গেলে মানুষ তৎকাল পরমেশ্বরকে লাভ করেন, তখন বিলম্বের কোনো কারণ থাকে না। কারণ বিষয়াসক্তিই হল মানুষের বন্ধনকারক, এর বিনাশ হলে ভগবান আর তার কাছে লুকিয়ে থাকতে পারেন না।

এই শ্লোকে অভ্যাসযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ও কর্মযোগের তুলনাত্মক বিবেচনা করা হয়নি ; কারণ ঐ সকল সাধনায় কর্মফলরূপ ভোগের আসক্তির ত্যাগরূপ নিষ্কামভাব অন্তর্গত রয়েছে। সুতরাং তার তুলনামূলক বিচার হতে পারে না। এখানে কর্মফলত্যাগের মহত্ত্ব জ্ঞাপন করার জন্য অভ্যাস, জ্ঞান এবং ধ্যানরূপ সাধন—যা সংসারের ঝামেলা থেকে সরে এসে করা হয় এবং ক্রিয়ার দৃষ্টিতে যা একটির থেকে আরেকটি ক্রমানুসারে সাত্ত্বিক ও নিবৃত্তিপরায়ণ হওয়ায় শ্রেষ্ঠও বটে, তার থেকে কর্মফল ত্যাগকে ভাবের প্রাধান্যের দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, আধ্যাত্মিক উন্নতিতে ক্রিয়ার থেকে ভাবেরই অধিক গুরুত্ব থাকে। বর্ণ-আশ্রম অনুসারে যজ্ঞ, দান, যুদ্ধ, বাণিজ্য, সেবা ইত্যাদি এবং শরীর নির্বাহের কর্মাদি ; প্রাণায়াম, স্তোত্র-পাঠ, বেদ-পাঠ, নাম-জপ ইত্যাদি অভ্যাসজনিত কর্ম ; সৎসঙ্গ ও শাস্ত্রাদির দ্বারা আধ্যাত্মিক বিষয় জানার জন্য জ্ঞানবিষয়ক কর্ম এবং মনস্থির করার জন্য ধ্যানবিষয়ক ক্রিয়া (প্রচেষ্টা)—এগুলি উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ হলেও এর মধ্যে সেটিই শ্রেষ্ঠ যাতে কর্মফল ত্যাগরূপ বৈরাগ্য থাকে ; কারণ সংসারে বৈরাগ্য ও ভগবানে অনন্য প্রেমের দ্বারাই ভগবৎপ্রাপ্তি হয়, অন্যথায় নয়। সুতরাং কর্মফলের ত্যাগই শ্রেষ্ঠ ; তারপর তিনি চাইলে যে কোনো শাস্ত্রসম্মত কর্মই করুন না কেন, তা দেখতে সাধারণ হলেও সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠে।

সম্বন্ধ—উপরোক্ত শ্লোকে ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য ভক্তির অঙ্গীভূত পৃথক্-পৃথক্ সাধনের বর্ণনা করে তার ফলরূপে ভগবৎপ্রাপ্তি বলা হয়েছে ; অতএব ভগবৎপ্রাপ্ত প্রেমিক ভক্তদের লক্ষণ জানার ইচ্ছা হওয়ায় এবার সাতটি শ্লোকে ভগবৎপ্রাপ্ত জ্ঞানী ভক্তদের লক্ষণ বলা হচ্ছে—

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী।। ১৩
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।। ১৪

যে ব্যক্তি সর্বপ্রাণীতে দ্বেষরহিত, স্বার্থপরতারহিত, সর্বপ্রাণীতে প্রেমভাবাপন্ন, হেতুরহিত ভাবেই দয়ালু, মমত্ববুদ্ধিরহিত, নিরহংকার ; সুখে-দুঃখে সমভাবাপন্ন, ক্ষমাশীল অর্থাৎ অপরাধীকেও যিনি অভয় দান করেন, সদাই সন্তুষ্ট, মন-বুদ্ধিসহ যিনি সংযত এবং সদাই আমার প্রতি দৃঢ় নিশ্চয়যুক্ত—এরূপ মন-বুদ্ধি যাঁর আমাতে অর্পিত, সেইরূপ ভক্ত আমার প্রিয় ।। ১৩-১৪

প্রশ্ন—'**সর্বভূতানাম্**' পদ কার সঙ্গে সম্পর্কিত ?

উত্তর—এর সম্পর্ক প্রধানতঃ '**অদ্বেষ্টা**'র সঙ্গে, কিন্তু অনুবৃত্তি দ্বারা এটি '**মৈত্রঃ**' ও '**করুণঃ**'র সঙ্গেও সম্বন্ধযুক্ত। তাৎপর্য হল যে, সমস্ত প্রাণীর প্রতি তাঁর শুধু দ্বেষের অভাবই আছে তা নয়, উপরন্তু তাদের প্রতি তাঁর স্বাভাবিকভাবে হেতুরহিত 'মৈত্রী' এবং 'দয়া'ও আছে।

প্রশ্ন—সিদ্ধ পুরুষের তো সবার প্রতি সমভাব হয়ে যায়, তাহলে তাঁর মধ্যে মৈত্রী ও করুণার বিশেষ ভাব কীভাবে থাকা সম্ভব ?

উত্তর—ভক্তিমার্গের সাধকের মধ্যে প্রথম থেকেই মৈত্রী ও দয়ার ভাব বিশেষভাবে থাকে, তাই সিদ্ধাবস্থায়ও তাঁর স্বভাবে ও ব্যবহারে তা স্বাভাবিকভাবেই বিরাজ করে। এছাড়া যেমন ভগবানে হেতুরহিত অসীম দয়া ও প্রেমাদি থাকে, তদনুরূপ তাঁর সিদ্ধ ভক্তের মধ্যেও এসকল গুণাদি থাকা যুক্তিসঙ্গত।

প্রশ্ন—'**নির্মমঃ**' ও '**নিরহংকারঃ**'—এই দুটি লক্ষণের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই সকল লক্ষণ বর্ণনার অভিপ্রায় হল, ভগবানের জ্ঞানী ভক্তের সর্বত্র সমভাব হয়, তাই তাঁর কিছুতে মমতাও থাকে না এবং কোনোরূপ অহংকারও

থাকে না ; তবুও কোনো প্রয়োজন ছাড়াই তিনি সমস্ত প্রাণীর প্রতি প্রেমভাব রাখেন এবং সকলকে দয়া করেন। এটা হল তাঁর মহত্ত্ব। ভগবানের সাধক ভক্তও দয়া এবং প্রেম প্রদর্শন করতে পারেন, কিন্তু তাঁর মধ্যে মমতা ও অহংকারের সর্বতোভাবে অভাব হয় না।

প্রশ্ন—**'সমদুঃখসুখঃ'** এই পদে উদ্ধৃত 'সুখ-দুঃখ' শব্দটি হর্ষ-শোকের বাচক নাকি অন্য কিছুর, এবং তাতে সমভাবে থাকা কী ?

উত্তর—এখানে 'সুখ-দুঃখ' হর্ষ-শোকের বাচক নয়, কিন্তু হর্ষ-শোকের হেতুর বাচক এবং তা থেকে উৎপন্ন হওয়া বিকারকে বলা হয় হর্ষ-শোক। অজ্ঞ মানুষের সুখে আসক্তি হয়, সেইজন্য সুখপ্রাপ্তিতে তাঁর হর্ষ হয় এবং দুঃখে তাঁর দ্বেষ হয়, তাই দুঃখপ্রাপ্তিতে তাঁর শোক হয় ; কিন্তু জ্ঞানী ভক্তের সুখ ও দুঃখে সমভাব হওয়ায় কোনো অবস্থাতেই তাঁর অন্তঃকরণে হর্ষ-শোকাদি বিকার হয় না। শ্রুতিতেও বলা হয়েছে—**'হর্ষশোকৌ জহাতি'** (কঠোপনিষদ্ ১।২।১২), অর্থাৎ 'জ্ঞানী পুরুষ হর্ষ-শোক সর্বতোভাবে ত্যাগ করেন'। প্রারব্ধ-ভোগ অনুসারে শরীরে রোগ হলে তাঁর পীড়ারূপ দুঃখবোধ হয় এবং শরীর সুস্থ থাকলে তাতে পীড়া না থাকার সুখবোধও হয়, কিন্তু রাগ-দ্বেষ রহিত হওয়ায় তাঁর হর্ষ বা শোক হয় না। তেমনই কোনো অনুকূল বা প্রতিকূল ঘটনার সংযোগ-বিয়োগে কোনোভাবেই তাঁর হর্ষ বা শোক হয় না। এই হল তাঁর সুখ-দুঃখে সম থাকা।

প্রশ্ন—**'ক্ষমাবান্'** অর্থাৎ ক্ষমাশীল কাকে বলা হয় এবং জ্ঞানী ভক্তদের ক্ষমাশীল বলা হয় কেন ?

উত্তর—নিজের প্রতি অপকারকারীর কোনো প্রকার দণ্ডদানের ইচ্ছা না রেখে তাকে যিনি অভয় প্রদান করেন, তাঁকে বলা হয় **'ক্ষমাবান্'** বা ক্ষমাশীল। ভগবানের জ্ঞানী ভক্তদের মধ্যে ক্ষমাভাবও অসীম। সবার প্রতি ভগবদ্‌বুদ্ধি থাকায় তিনি কোনো ঘটনাকেই প্রকৃতপক্ষে কারো অপরাধ মনে করেন না, তাই তিনি তাঁর প্রতি অপরাধকারীকেও কোনোপ্রকারে দণ্ডিত করার মনোভাব রাখেন না। এই ভাব জ্ঞাপন করার জন্য তাঁকে **'ক্ষমাবান্'** বলা হয়েছে। দশম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে ক্ষমার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে **'যোগী'** পদ কীসের বাচক এবং তাঁর নিরন্তর সন্তুষ্ট থাকা কীরূপ ?

উত্তর—ভক্তিযোগের দ্বারা ভগবৎ-প্রাপ্ত জ্ঞানী ভক্তের বাচক হল এই **'যোগী'** পদ। এরূপ ভক্ত পরমানন্দের অক্ষয় ও অনন্ত ভাণ্ডার শ্রীভগবানকে প্রত্যক্ষ করেছেন, সেইজন্য তিনি সর্বদাই সন্তুষ্ট থাকেন। তাঁর কোনো সময়, কোনো অবস্থাতে, সংসারের কোনো বস্তুর অভাবে অসন্তোষ হয় না। তিনি পূর্ণকাম হয়ে যান, অতএব জগতের কোনো ঘটনাতেই তাঁর সন্তোষের অভাব হয় না। এই হল তাঁর সর্বদা সন্তুষ্ট থাকা।

জাগতিক মানুষের সন্তোষ অত্যন্ত ক্ষণিক হয় ; কারণ যে কামনার পূর্তিতে তাঁর সন্তোষ হয়, তাতে সামান্য ন্যূনতা হলেই পুনরায় অসন্তোষ উৎপন্ন হয়। তাই তিনি সর্বদা সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না।

প্রশ্ন—**'যতাত্মা'** কথাটির অর্থ কী ? এটি কেন প্রয়োগ করা হয়েছে ?

উত্তর—যাঁর মন ও ইন্দ্রিয়াদি সহ শরীর জয় করা হয়েছে, তাঁকে **'যতাত্মা'** বলা হয়। ভগবানের জ্ঞানী ভক্তের মন-ইন্দ্রিয়াদি সহ শরীর সর্বদাই তাঁর বশে থাকে। তিনি কখনও মন ও ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হন না, তাই তাঁর মধ্যে কোনো প্রকার দুর্গুণ বা দুরাচারের সম্ভাবনা থাকে না। এটি লক্ষ্য করানোর জন্য এই পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্ন—**'দৃঢ়নিশ্চয়ঃ'** পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—যিনি বুদ্ধির দ্বারা পরমেশ্বরের স্বরূপের যথাযথ স্থির নিশ্চয় করেছেন ; যিনি সর্বত্র ভগবানকে প্রত্যক্ষ অনুভব করেন এবং যাঁর বুদ্ধি গুণ, কর্ম ও দুঃখাদির জন্য পরমাত্মার স্বরূপ থেকে কখনও কোনোভাবে বিচলিত হতে পারে না, তাঁকে **'দৃঢ়নিশ্চয়'** বলা হয়।

প্রশ্ন—ভগবানে মন-বুদ্ধি অর্পণ করা কাকে বলে ?

উত্তর—নিত্য-নিরন্তর মনে মনে ভগবানের স্বরূপ-চিন্তা ও বুদ্ধির দ্বারা তা নিশ্চয় করতে করতে মন এবং বুদ্ধির ভগবানের স্বরূপে চিরকালের মতো তন্ময় হয়ে যাওয়াই হল মন-বুদ্ধিকে ভগবানে 'অর্পণ করা'।

প্রশ্ন—সেই আমার ভক্ত, আমার অতিশয় প্রিয়—এই কথার তাৎপর্য কী ?

উত্তর—যাঁর ভগবানের প্রতি অহৈতুক ও অনন্য প্রেম আছে ; ভগবানের স্বরূপে যাঁর অটল স্থিতি ; যাঁর

কখনও ভগবানের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় না ; যাঁর মন-বুদ্ধি ভগবানে অর্পিত ; ভগবানই যাঁর জীবন, ধন, প্রাণ ও সর্বস্ব ; যিনি ভগবানেরই হাতের পুতুল—এরূপ জ্ঞানী ভক্তকে ভগবান তাঁর প্রিয় ভক্ত বলেছেন।

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥ ১৫

যাঁর দ্বারা কোনো প্রাণী উদ্বেগপ্রাপ্ত হয় না, যিনি কারো দ্বারা উদ্বিগ্ন হন না এবং যিনি হর্ষ, অমর্ষ, ভয় ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত ॥ ১৫

প্রশ্ন—যাঁর দ্বারা কোনো জীব উদ্বেগপ্রাপ্ত হয় না—এর অভিপ্রায় কী ? ভক্ত জেনে-শুনে কাউকে উদ্বিগ্ন করেন না, নাকি তাঁর দ্বারা কারো উদ্বেগ (ক্ষোভ) হয়ই না ?

উত্তর—সর্বত্র ভগবদ্‌বুদ্ধি হওয়ায় ভক্ত জেনে-শুনে কারোকে দুঃখ, সন্তাপ, ভয় ও ক্ষোভ প্রদান করতে পারেন না বরং তাঁর দ্বারা স্বাভাবিকভাবে সকলের সেবা ও পরম-হিতই হয়ে থাকে। সুতরাং তাঁর জন্য কারো কখনও কোনো উদ্বেগ হওয়া উচিত নয়। যদি ভ্রমবশতঃ কারো উদ্বেগ হয়, তাহলে তার নিজ অজ্ঞতাজনিত রাগ, দ্বেষ এবং ঈর্ষাদি দোষই সেই উদ্বেগের প্রধান কারণ, ভগবদ্‌ভক্ত নয়। কারণ যিনি দয়া ও প্রেমের প্রতিমূর্তি এবং অপরের হিত করাই যাঁর স্বভাব—সেই পরম দয়ালু প্রেমিক ভগবদ্‌প্রাপ্ত ভক্ত কারো উদ্বেগের কারণ হতেই পারেন না।

প্রশ্ন—ভক্তের অন্য কোনো প্রাণী থেকে উদ্বেগ হয় না কেন ? তাঁকে কি কোনো প্রাণী দুঃখ দেয়ই না, নাকি দুঃখের কারণ উপস্থিত হলেও তাঁর উদ্বেগ (ক্ষোভ) হয় না ?

উত্তর—ভগবৎ প্রাপ্ত জ্ঞানী ভক্তের সবেতে সমভাব হয়ে যায়, তাই তিনি জেনে-শুনে নিজে এমন কোনো কাজ করেন না, যাতে তাঁর প্রতি কারো দ্বেষ হয়। তাই অন্য ব্যক্তিরাও প্রায়শঃ তাঁকে দুঃখ দিতে চান না। তবুও সর্বতোভাবে একথা বলা যায় না যে, অন্য কোনো প্রাণী তাঁর শারীরিক বা মানসিক পীড়ার কারণ হয় না। সুতরাং এটিই মেনে নেওয়া উচিত যে, জ্ঞানী ভক্তেরও প্রারব্ধ অনুসারে অন্যের ইচ্ছায় দুঃখের কারণ উপস্থিত হতে পারে, কিন্তু তিনি সর্বতোভাবে রাগ দ্বেষ রহিত হওয়ায় বহু বড় বড় দুঃখেও তিনি বিচলিত হন না (৬।২২), তাই জ্ঞানী ভক্ত কোনো প্রাণীর দ্বারাই উদ্বিগ্ন হন না।

প্রশ্ন—ভক্তের উদ্বেগ হয় না, এই কথা এই শ্লোকের পূর্বার্ধে বলা হয়েছে ; তাহলে আবার উত্তরার্ধে পুনরায় উদ্বেগ থেকে মুক্ত হতে বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—পূর্বার্ধে কেবল অন্য প্রাণী থেকে তাঁর উদ্বেগ হয় না, একথাই বলা হয়েছে। এর দ্বারা অপরের ইচ্ছাজনিত উদ্বেগের নিবৃত্তির কথা বলা হল, কিন্তু অনিচ্ছা ও স্বেচ্ছায় প্রাপ্ত ঘটনা ও পদার্থেও তো মানুষের উদ্বেগ হয়, তাই উত্তরার্ধে পুনঃ উদ্বেগ থেকে মুক্ত হওয়ার কথা বলে ভগবান এটাই সিদ্ধ করেছেন যে ভক্তের কখনও কোনোপ্রকারের উদ্বেগ হয় না।

প্রশ্ন—হর্ষ ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত বলাতেও ভক্তের নির্বিকারত্ব সিদ্ধ হয়ে যায়, অতএব পুনরায় অমর্ষ ও ভয় থেকে মুক্ত হওয়ার কথা কেন বলা হয়েছে ?

উত্তর—হর্ষ ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত বলায় নির্বিকারত্ব সিদ্ধ হয় কিন্তু সমস্ত বিকারের সম্পূর্ণ অভাব হওয়া তত স্পষ্ট হয় না। সুতরাং ভক্তের মধ্যে সম্পূর্ণ বিকারের অত্যন্ত অভাব হয়, এই বিষয় স্পষ্ট করার জন্য অমর্ষ ও ভয়েরও অভাবের কথা বলা হয়েছে।

অভিপ্রায় হল যে, বাস্তবে মানুষ তার অভীপ্সিত মান, মর্যাদা এবং ধন ইত্যাদি বস্তু লাভ হলে যেরূপ আনন্দিত হয়, তেমনই নিজের মতো বা নিজের থেকে বেশি বস্তু আদি অন্যেরও প্রাপ্তি হলে তদনুরূপভাবে প্রসন্ন হওয়া উচিত ; কিন্তু প্রায়শঃ তা না হয়ে অজ্ঞতার জন্য লোকের তার পরিবর্তে অমর্ষ হয়, এবং এই অমর্ষ বিবেকবান ব্যক্তির চিত্তেও দেখা যায়। তেমনই ইচ্ছা,

নীতি ও ধর্মবিরুদ্ধ পদার্থের প্রাপ্তিতে উদ্বেগ এবং নীতি ও ধর্মের অনুকূল দুঃখদায়ক পদার্থের প্রাপ্তিতে বা তার সম্ভাবনায় ভয়ের উদ্রেক হয়। অন্যের তো কথাই নেই, বিবেকবানদেরও মৃত্যুভয় হয়। কিন্তু ভগবানের জ্ঞানী ভক্তের সর্বত্র ভগবদ্‌বুদ্ধি হওয়ায় তিনি সমস্ত ক্রিয়া ভগবানের লীলা বলে মনে করেন ; সেইজন্য জ্ঞানী ভক্তের অমর্ষও হয় না, উদ্বেগও হয় না এবং ভয়ও হয় না—এই অভিপ্রায়ে এইরূপ বলা হয়েছে।

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৬

যে ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষাবর্জিত, বাহ্যাভ্যন্তর শুচি, দক্ষ, পক্ষপাতরহিত এবং দুঃখ থেকে মুক্ত—সেই সকল কর্মারম্ভের ত্যাগী আমার ভক্ত আমার প্রিয়॥ ১৬

প্রশ্ন—'আকাঙ্ক্ষা থেকে রহিত' বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—পরমাত্মাকে যিনি লাভ করেছেন, এরূপ ভক্তের কোনো বস্তুর কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকে না ; অতএব তাঁর মধ্যে কোনোপ্রকারের ইচ্ছা, স্পৃহা বা বাসনা থাকে না, তিনি পূর্ণকাম হয়ে যান। এটি লক্ষ্য করাবার জন্য তাঁকে আকাঙ্ক্ষা থেকে রহিত বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—ইচ্ছা বা প্রয়োজন ব্যতীত মানুষের দ্বারা কোনো-প্রকার কর্ম হতে পারে না এবং কর্ম ছাড়া জীবন-নির্বাহ সম্ভব নয়, তাহলে এরূপ ভক্তদের জীবন চলে কী করে ?

উত্তর—ইচ্ছা এবং প্রয়োজন ছাড়াও প্রারব্ধবশতঃ ক্রিয়া (কর্ম) হতে পারে, সুতরাং প্রারব্ধবশতঃ তাঁর জীবনযাত্রা অতিবাহিত হয়। অভিপ্রায় হল যে, তাঁর কায়-মনো-বাক্যে প্রারব্ধ অনুসারে সমস্ত ক্রিয়া (কর্ম) কোনো ইচ্ছা, স্পৃহা ও সংকল্প ব্যতীতই স্বাভাবিকভাবে হতে থাকে (৪।১৯) ; তাই তাঁর জীবন-নির্বাহে কোনো অসুবিধা হয় না।

প্রশ্ন—ভগবানের ভক্ত অন্তরে ও বাহ্যে শুদ্ধ হন, তাঁর এই শুদ্ধির স্বরূপ কী ?

উত্তর—ভগবানের ভক্ত হন পবিত্রতার পরাকাষ্ঠা। তাঁর মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, তাঁর আচরণ ও শরীরাদি এতো পবিত্র হয়ে যায় যে তাঁর সঙ্গে কথা বললে তো কথাই নেই—এমনকি তাঁর দর্শন এবং স্পর্শমাত্রেও অন্যেরা পবিত্র হয়ে ওঠে। এরূপ ভক্ত যেখানে বাস করেন, সেই স্থান পবিত্র হয়ে ওঠে এবং তাঁর সঙ্গের প্রভাবে সেখানকার বায়ুমণ্ডল, জল, স্থল ইত্যাদি সব পবিত্র হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন—'দক্ষ' শব্দের তাৎপর্য কী ?

উত্তর—যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মনুষ্যদেহ লাভ হয়েছে, সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করাই হল যথার্থ বুদ্ধিমানের কাজ। অনন্য ভক্তি দ্বারা পরম প্রেমিক, সবাকার সুহৃদ, সর্বেশ্বর পরমেশ্বরকে লাভ করাই হল মনুষ্যজন্মের প্রধান উদ্দেশ্য। জ্ঞানী ভক্ত ভগবানকে লাভ করেছেন, এই ভাবার্থে তাঁকে 'দক্ষ' (বুদ্ধিমান) বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—পক্ষপাত রহিত হওয়া কী ?

উত্তর—আদালতে সাক্ষী দেবার সময় অথবা পঞ্চায়েত বা ন্যায়কর্তার রূপে কারো বিবাদের বিচার করার সময় বা এইরূপ কোনো পরিস্থিতিতে নিজের কোনো আত্মীয়,পরিজন বা বন্ধুর খাতিরে বা বিদ্বেষপ্রসূত হয়ে অথবা অন্য কোনো কারণে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া, ন্যায়বিরুদ্ধ রায় দেওয়া বা অন্য কোনো ভাবে কারোর অনুচিত লাভ-ক্ষতি করানোর চেষ্টাকে বলা হয় পক্ষপাত। এর থেকে বিরত থাকাকেই বলে পক্ষপাত রহিত হওয়া।

প্রশ্ন—ভগবানের ভক্ত সর্বপ্রকার দুঃখ থেকে মুক্ত, এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—মূলশ্লোকে পদটি হল **'গতব্যথঃ'**। এর দ্বারা ভগবানের এই অভিপ্রায় প্রতীত হয় যে, কোনোপ্রকার দুঃখের কারণ উপস্থিত হলেও ভগবানের ভক্ত তাতে দুঃখী হন না, অর্থাৎ তাঁর অন্তঃকরণে কোনো প্রকারের চিন্তা, দুঃখ বা শোক হয় না। তাৎপর্য হল, শরীরে অসুখ হওয়া, স্ত্রী-পুত্রাদির বিয়োগ হওয়া, গৃহ-ধন ইত্যাদির ক্ষতি হওয়া—ইত্যাদি দুঃখের হেতু তো প্রারব্ধবশতঃ তাঁর জীবনে উপস্থিত হয়, কিন্তু এই সব হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অন্তঃকরণে কোনোপ্রকার বিকার উৎপন্ন হয় না।

প্রশ্ন—'সর্বারম্ভপরিত্যাগী' কথাটির কী তাৎপর্য ?

উত্তর— জগতে যা কিছু হচ্ছে— সবই ভগবানের লীলা, সবই তাঁর মায়াশক্তির খেলা, তিনি যখন যার দ্বারা যা কিছু করাতে চান, তাকে দিয়ে তাই করিয়ে নেন। মানুষ মিথ্যা অহংকার করে যে আমি অমুক কর্ম করি, আমার এরূপ ক্ষমতা ইত্যাদি। কিন্তু ভগবানের ভক্ত এই রহস্য ভালোভাবে উপলব্ধি করেন, তাই তিনি সর্বদা ভগবানের হাতের পুতুল হয়ে থাকেন। ভগবান তাঁকে যখন যেভাবে নাচান, তিনিও প্রসন্নতাসহ সেইভাবেই নাচেন। নিজের অহংকার একটুও রাখেন না এবং নিজে থেকে কিছু করেন না, তাই তিনি লোকদৃষ্টিতে সব কিছু করলেও প্রকৃতপক্ষে কর্তৃত্বাভিমান রহিত হওয়ায় 'সর্বারম্ভ-পরিত্যাগী'ই হন।

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৭

যিনি কখনো হৃষ্ট হন না, কখনো দ্বেষ করেন না, শোক করেন না, কামনা করেন না এবং যিনি শুভ ও অশুভ সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করেছেন—সেই ভক্তিযুক্ত পুরুষ আমার প্রিয় ভক্ত ॥ ১৭

প্রশ্ন—কখনো হৃষ্ট না হওয়া কী এবং এর কী তাৎপর্য ?

উত্তর— অনুকূল বস্তুর প্রাপ্তিতে এবং প্রতিকূলের বিয়োগে প্রাণীরা হৃষ্ট হয়, তাই কোনো বস্তুর সংযোগ-বিয়োগে অন্তঃকরণে হর্ষ-বিকার উৎপন্ন না হওয়াই হল হৃষ্ট না হওয়া। জ্ঞানী ভক্তের হৃদয়ে হর্ষরূপ বিকারের সর্বতোভাবে অভাব দেখানোর জন্যই এখানে এই লক্ষণের বর্ণনা করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, ভক্তের নিকট সর্বশক্তিমান, সর্বাধার, পরম দয়ালু একমাত্র ভগবানই হলেন পরম প্রিয় এবং তিনি চিরকালের জন্য তাঁকে লাভ করেছেন। তাই তিনি সদা-সর্বদা পরমানন্দে অবস্থান করেন। সংসারের কোনো বস্তুতে তাঁর বিন্দুমাত্র রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ থাকে না। তাই লোকদৃষ্টিতে কোনো প্রিয় বস্তুর সংযোগে বা অপ্রিয়ের বিয়োগে তাঁর অন্তঃকরণে কখনও বিন্দুমাত্রও হর্ষের বিকার উৎপন্ন হয় না।

প্রশ্ন—ভগবানের ভক্ত দ্বেষ করেন না, এটি বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর— ভগবানের ভক্ত সমগ্র জগৎকে ভগবানের স্বরূপ মনে করেন, তাই তাঁর কোনো বস্তু বা প্রাণীতে কোনো কারণেই দ্বেষ হতে পারে না। তাঁর অন্তকরণে দ্বেষ-ভাব সদা-সর্বদার জন্য দূর হয়ে যায়।

প্রশ্ন— ভগবানের ভক্ত কখনও শোক করেন না, এর কী তাৎপর্য ?

উত্তর—হর্ষের ন্যায় তাঁর মধ্যে শোকের বিকারও হয় না। প্রতিকূল বস্তুর প্রাপ্তিতে এবং অনুকূলের বিয়োগে প্রাণীদের শোক উৎপন্ন হয়। ভগবদ্‌ভক্তের লীলাময় পরম দয়ালু পরমেশ্বরের দয়াপূর্ণ কোনো বিধানে কখনো প্রতিকূলতা প্রতীত হয় না। ভগবানের লীলার রহস্য অবগত হওয়ায় তিনি সর্বক্ষণ ভগবানের পরমানন্দস্বরূপের অনুভবে মগ্ন থাকেন। সুতরাং তাঁর শোক কী করে হতে পারে ?

আরও একটি কথা—সর্বব্যাপী, সর্বাধার, ভগবানই তাঁর কাছে সর্বোত্তম পরম প্রিয় বস্তু, ভক্তের কখনও তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় না এবং জাগতিক বস্তুর উৎপত্তি-বিনাশে তাঁর কিছুই এসে যায় না। সেইজন্যও যা লোকদৃষ্টিতে প্রিয়, সেইসকল বস্তুর বিয়োগে বা অপ্রিয় বস্তুর সংযোগে তাঁর কোনোরূপ শোক হতে পারে না।

প্রশ্ন—ভগবানের ভক্ত কখনোও কোনো বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করেন না কেন ?

উত্তর—মানুষের মনে যে অনুকূল বস্তুর অভাব অনুভূত হয়, তিনি সেই বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করেন। ভগবানের ভক্ত সাক্ষাৎ ভগবানকে পাওয়াতে তিনি সর্বদাই পরমানন্দ ও পরমশান্তিতে স্থিতি লাভ করে পূর্ণকাম হয়ে যান, তাঁর মনে কখনও কোনো বস্তুরই অভাব অনুভূত হয় না, তাঁর সমস্ত প্রয়োজন চিরতরে দূর হয়ে যায়, তিনি অচল-প্রতিষ্ঠায় স্থিত হয়ে যান ; তাই

তাঁর অন্তঃকরণে সাংসারিক বস্তুর আকাঙ্ক্ষা হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

প্রশ্ন—'শুভাশুভ' পদটি এখানে কোন্ কর্মের বাচক এবং ভগবানের ভক্তকে তার পরিত্যাগী বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যজ্ঞ, দান, তপ ও বর্ণাশ্রম অনুসারে জীবিকা এবং শরীর নির্বাহের জন্য কৃত শাস্ত্রবিহিত কর্মাদির বাচক হল এই 'শুভ' পদটি ; আর ছল-কপট, মিথ্যা, চুরি, হিংসা, ব্যভিচার ইত্যাদি পাপকর্মের বাচক হল 'অশুভ' পদটি। ভগবানের ভক্ত এই দুপ্রকার কর্মেরই ত্যাগী হন ; কারণ তিনি শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন দ্বারা করা সমস্ত শুভ কর্মই ভগবানে সমর্পণ করে দেন। তাতে তাঁর বিন্দুমাত্র মমতা, আসক্তি বা ফলেচ্ছা থাকে না ; তাই ঐসব কর্মকে কর্ম বলে মানা হয় না (৪।২০)। রাগ (আসক্তি)-দ্বেষের অভাব হওয়ায় পাপকর্ম তাঁর দ্বারা হতেই পারে না, তাই তাঁকে 'শুভাশুভ পরিত্যাগী' বলা হয়েছে।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ॥ ১৮

যিনি শত্রু ও মিত্রে, মান-অপমানে সমবুদ্ধিসম্পন্ন, শীত-গ্রীষ্মে এবং সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বে নির্বিকার ও আসক্তিশূন্য—॥ ১৮

প্রশ্ন—ভগবানের ভক্ত তো কোনো প্রাণীতে দ্বেষ করেন না, তাহলে তাঁর শত্রু কী করে হতে পারে ? এই অবস্থায় তিনি শত্রু-মিত্রে সম, একথা বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভক্তের দৃষ্টিতে অবশ্যই তাঁর কোনো শত্রু-মিত্র হয় না, তবুও লোকে নিজ নিজ ধারণা অনুসারে মূর্খতাবশতঃ ভক্তের দ্বারা ক্ষতি হয়েছে মনে করে বা ভক্তের স্বভাব নিজের মনের মতো না হওয়ায় অথবা ঈর্ষাবশতঃ ভক্তে শত্রুভাব আরোপিত করে ; এইভাবে অন্য লোকেরাও নিজ নিজ ধারণা অনুসারে তাঁর প্রতি মিত্রভাব আরোপিত করে। কিন্তু সমগ্র জগতে সর্বত্র ভগবানকে দর্শনকারী ভক্তের সবেতেই সমভাব থাকে। তাঁর দৃষ্টিতে শত্রু-মিত্রের কোনো পার্থক্য থাকে না, তিনি সদা-সর্বদা সকলের সঙ্গে প্রেমপূর্ণ ব্যবহার করেন। সকলকে ভগবানের স্বরূপ মনে করে সমভাবে সকলের সেবা করাই তাঁর স্বভাব হয়ে যায়। যেমন বৃক্ষকে যে কাটে বা যে তাতে জল সেচন করে—দুজনকেই ছায়া, ফল, ফুল ইত্যাদির দ্বারা সেবা প্রদানে বৃক্ষ কোনোপ্রকার ভেদ-ভাব রাখে না, তদনুরূপ ভক্তেরও কারও প্রতি কোনো ভেদ-ভাব থাকে না। ভক্তের সমত্ব বৃক্ষের থেকেও বেশি মহত্ত্বের হয়। তাঁর দৃষ্টিতে পরমেশ্বর ব্যতীত আর কিছু না থাকায় তাঁর মধ্যে ভেদ-ভাবের কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। তাই তাঁকে শত্রু-মিত্রে সম বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—মান-অপমান, শীত-গ্রীষ্ম ও সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বে সম বলার অর্থ কী ?

উত্তর—মান-অপমান, শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখাদি, অনুকূল-প্রতিকূল দ্বন্দ্বের (বিপরীত ভাবের) মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ হওয়ায়, সেইসকলের জ্ঞান হলেও ভগবদ্ভক্তের অন্তরে রাগ-দ্বেষ বা হর্ষ-শোক ইত্যাদি কোনোপ্রকার বিকার বিন্দুমাত্র হয় না। তিনি সর্বদা সমভাবে থাকেন। আনুকূল্যের ইচ্ছা রাখেন না এবং প্রতিকূলতাকে বিদ্বেষ করেন না। কখনও কোনো অবস্থাতেই তিনি নিজ স্থিতি থেকে একটুও বিচলিত হন না। সর্বত্র ভগবদ্দর্শন হওয়ায় তাঁর অন্তঃকরণে বৈষম্যের সর্বতোভাবে অভাব হয়। এই অভিপ্রায়ে তাঁকে সর্বত্র সমভাবে অবস্থানকারী বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—'সঙ্গবিবর্জিতঃ'-এর অর্থ সংসারের সংসর্গ রহিত হওয়া মেনে নিলে ক্ষতি কী ?

উত্তর—সংসারে মানুষের যে আসক্তি (স্নেহ), তাই সমস্ত অনর্থের মূল। মানুষ বাহ্যতঃ সংসারে আসক্তি ত্যাগ করলেও, মনে মনে সেই আসক্তি বজায় থাকলে, এমন ত্যাগে বিশেষ লাভ হয় না। পক্ষান্তরে মনের আসক্তি নষ্ট হলে রাজা জনক প্রমুখের ন্যায় বাহ্যতঃ সবার সঙ্গে মমতা ও আসক্তিরহিত সংসর্গ থাকলেও কোনো ক্ষতি নেই। এরূপ আসক্তির ত্যাগীকেই বাস্তবিক

'সঙ্গবিবর্জিত' বলা হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাতান্নতম শ্লোকেও এই কথা বলা হয়েছে। সুতরাং 'সঙ্গবিবর্জিতঃ'র যে অর্থ করা হয়েছে, সেটিই সঠিক মনে হয়।

প্রশ্ন—ত্রয়োদশ শ্লোকে ভগবান সমস্ত প্রাণীতে ভক্তের মিত্রভাব হওয়ার কথা বলেছেন এবং এখানে সবেতে আসক্তিরহিত হতে বলেছেন। এই দুটি কথা বিরুদ্ধের মতো প্রতীত হচ্ছে, এর সমাধান কী ?

উত্তর— এতে কোনো বিরুদ্ধভাব নেই, ভগবদ্‌ভক্তের সব প্রাণীতে যে মিত্রভাব থাকে—তা আসক্তিরহিত, নির্দোষ এবং বিশুদ্ধ। সাংসারিক মানুষের প্রেম হয় আসক্তিপূর্বক তাই এখানে স্থূলদৃষ্টিতে বিরোধের মতো প্রতীত হয়, বাস্তবে বিরোধ নেই। মৈত্রী হল সদ্‌গুণ এবং তা ভগবানেও থাকে, কিন্তু আসক্তি হল দুর্গুণ এবং সেটি সকল অবগুণের মূল হওয়ায় পরিত্যাজ্য ; এটি তাহলে কী করে ভগবদ্‌ভক্তের মধ্যে থাকতে পারে ?

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥ ১৯

যিনি নিন্দা ও স্তুতিতে সমবুদ্ধিসম্পন্ন, মননশীল, যে কোনো প্রকারে জীবননির্বাহে সদা সন্তুষ্ট, গৃহাদিতে মমতা ও আসক্তিরহিত—এরূপ স্থিরবুদ্ধি ভক্তিমান পুরুষ আমার প্রিয় ॥ ১৯

প্রশ্ন—ভগবানের ভক্তের নিন্দা-স্তুতিকে সমান ভাবা, এই কথা বলার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—ভগবানের ভক্তের নিজ নাম ও শরীরে বিন্দুমাত্র অহংবোধ ও মমত্ব থাকে না। তাই তাঁর স্তুতি করলেও হর্ষ হয় না এবং নিন্দা করলেও শোক হয় না। দুয়েতেই তাঁর সমভাব থাকে। সর্বত্র ভগবদ্‌বুদ্ধি হওয়ায় স্তুতিকারী এবং নিন্দাকারীর প্রতি তাঁর কোনো ভেদবুদ্ধি হয় না। এই হল তাঁর নিন্দা-স্তুতিকে সমান মনে করা।

প্রশ্ন—'**মৌনী**' পদটি কথা না বলা লোকের বাচক, অতএব এখানে তার অর্থ মননশীল করা হয়েছে কেন ?

উত্তর—মানুষ শুধু বাক্য দ্বারাই কথা বলে না, মনে মনেও অনবরত কথা বলতে থাকে। অনবরত বিষয় চিন্তাই হল মনে মনে নিরন্তর কথা বলা। ভক্তের চিত্ত ভগবানে এতো সংলগ্ন হয়ে যায় যে, তাঁর মনে ভগবান ব্যতীত অন্য কারো স্মৃতি থাকে না, তিনি সদা-সর্বদা ভগবানের মনন-চিন্তনেই ব্যাপৃত থাকেন, এটিই হল বাস্তবিক মৌন। কথা বন্ধ করা হয়েছে অথচ মনে মনে বিষয়াদির চিন্তা করা হচ্ছে—একে বলে বাহ্য মৌন। মনকে নির্বিষয় করার জন্য এবং বাক্যকে পরিশুদ্ধ ও সংযত করার উদ্দেশ্যে করা বাহ্য মৌনও লাভদায়ক হয়। কিন্তু এখানে ভগবানের প্রিয় ভক্তদের লক্ষণের বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁদের বাক্য স্বাভাবিকভাবেই পরিশুদ্ধ ও সংযত। তাই এরূপ বলা যায় না যে, তিনি শুধু বাক্যেই মৌন। অপরপক্ষে ঐ ভক্তের বাক্য তো প্রায়শঃ নিরন্তর ভগবানের নাম-গুণাদি কীর্তন হয়ে থাকে, যার ফলে জগতের পরম উপকার হয়। তা ছাড়া ভগবান তাঁর ভক্তির প্রচারও ভক্তের দ্বারা করান। সুতরাং বাক্যে মৌন থাকা ভক্ত ভগবানের প্রিয় হন আর কথা বলা ভক্ত হন না, এমন কল্পনা করা যায় না। অষ্টাদশ অধ্যায়ের আটষট্টিতম ও উনসত্তরতম শ্লোকে ভগবান গীতা প্রচারকারীদের তাঁর সব থেকে প্রিয় কর্মকারী বলেছেন, এই মহৎকাজ বাক্যে মৌন হলে হতে পারে না। এতদ্ব্যতীত সপ্তদশ অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকে মানসিক তপস্যার লক্ষণেও 'মৌন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যদি ভগবানের প্রযুক্ত 'মৌন' শব্দের অর্থ বাক্যের মৌন অভীষ্ট হত, তাহলে তিনি তা বাক্যের তপস্যার প্রসঙ্গে বলতেন ; কিন্তু তিনি তা করেননি, এর দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, মুনিভাবের নামই মৌন এবং যাঁর এই মুনিভাব হয়, তিনিই মৌনী বা মননশীল। মানুষ জোর করেও বাক্যে মৌন ধারণ করতে পারে, তা কোনো বিশেষ মহত্ত্বের বিষয় নয় ; তাই এখানে 'মৌন' শব্দের অর্থ বাক্যের মৌন মনে না করে মননশীলতাই মনে করা উচিত। বাক্যের সংযম তো স্বতঃই এর অন্তর্গত হয়।

প্রশ্ন—'**যেন কেনচিৎ সন্তুষ্টঃ**' কথাটির এখানে অভিপ্রায় কী ? ভগবানের ভক্তের শরীর নির্বাহের জন্য

কি কোনোপ্রকার চেষ্টা করা উচিত নয়—আপনা আপনি যা পাওয়া যায়, তাতেই কি সন্তুষ্ট থাকা উচিত ?

উত্তর—যে ভক্ত অনন্যভাবে ভগবদ্ চিন্তায় মগ্ন থাকেন, যাঁর চিন্তায় অন্য কোনো ভাবের স্ফুরণই হয় না—তাঁর দ্বারা শরীর নির্বাহের জন্য কোনো চেষ্টা না হওয়া এবং ভগবানের তাঁর লৌকিক যোগক্ষেম বহন করা সর্বতোভাবে সুপ্রমাণিত এবং সুসঙ্গত ; কিন্তু এখানে **'যেন কেনচিৎ সন্তুষ্টঃ'** পদটি দ্বারা নিষ্কামভাবে বর্ণাশ্রমানুকূল শরীর-নির্বাহের উপযুক্ত ন্যায়সঙ্গত কর্ম করায় নিষেধ নেই। এরূপ কর্মের দ্বারা প্রারব্ধ অনুসারে ভক্ত যা কিছু লাভ করেন, তাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। এই হল **'যেন কেনচিৎ সন্তুষ্টঃ'** কথাটির তাৎপর্য। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের ভক্তের সাংসারিক বস্তুর লাভ-ক্ষতিতে কোনো সম্বন্ধ থাকে না। তিনি তাঁর পরম ইষ্ট ভগবানকে লাভ করে সদাই সন্তুষ্ট থাকেন। সুতরাং এখানে **'যেন কেনচিৎ সন্তুষ্টঃ'** কথাটির এই অভিপ্রায়ই মনে হয় যে বাহ্যবস্তুর আসা-যাওয়ায় তাঁর দৃষ্টিতে কোনোপ্রকার পার্থক্য হয় না। প্রারব্ধানুসারে সুখ-দুঃখের হেতুভূত যা কিছু বস্তু তিনি লাভ করেন, তিনি তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন।

প্রশ্ন—'অনিকেতঃ' পদটির কী অর্থ মানা উচিত ?

উত্তর—যার নিজের গৃহ নেই, তাকে 'অনিকেত' বলা হয়। ভগবানের যে জ্ঞানী সন্ন্যাসী ভক্ত গৃহস্থ-আশ্রম ত্যাগ করে পূর্ণভাবে গৃহাদি ত্যাগ করেছেন, যাঁর কোনো স্থান-বিশেষে আসক্তি, মমতা বা কোনো প্রকার স্বত্ব নেই, তিনি তো 'অনিকেত' বটেই, তাছাড়া যিনি নিজের সর্বস্ব ভগবানে অর্পণ করে সর্বথা অকিঞ্চন হয়েছেন ; যাঁর ঘর-দ্বার, শরীর, বিদ্যা-বুদ্ধি ইত্যাদি সবই ভগবানের হয়ে গেছে—এক্ষেত্রে তিনি ব্রহ্মচারী হোন বা গৃহস্থ অথবা বাণপ্রস্থী, তাঁকেও 'অনিকেত' বলা হয়। যেমন শরীরে অহংবোধ, মমতা এবং আসক্তি না থাকলে শরীর থাকলেও জ্ঞানীকে বিদেহী বলা হয়—তেমনই যাঁর গৃহে মমতা ও আসক্তি নেই, তিনি গৃহে থেকেও গৃহ-রহিত অর্থাৎ 'অনিকেত'।

প্রশ্ন—ভক্তকে **'স্থিরবুদ্ধি'** বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভক্তের ভগবানের প্রত্যক্ষ দর্শন হওয়ায় তাঁর সম্পূর্ণ সংশয় সমূলে নষ্ট হয়ে যায়, ভগবানে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যায়। তাঁর এই বিশ্বাস অটল ও নিশ্চল হয়। সুতরাং তিনি সাধারণ মানুষের মতো কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ বা ভয় ইত্যাদি বিকারের বশীভূত হয়ে ধর্ম থেকে বা ভগবানের স্বরূপ থেকে কখনও বিচলিত হন না। তাই তাঁকে স্থিরবুদ্ধি বলা হয়েছে। 'স্থিরবুদ্ধি' শব্দের বিশেষ অর্থ বোঝার জন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চান্নতম থেকে বাহাত্তরতম শ্লোক পর্যন্ত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন—ত্রয়োদশ শ্লোক থেকে উনিশতম পর্যন্ত সাতটি শ্লোকে ভগবান তাঁর প্রিয় ভক্তদের লক্ষণ বলতে গিয়ে 'যে আমার ভক্ত, সে আমার প্রিয়', 'যে ব্যক্তি এরূপ ভক্তিমান, সে আমার প্রিয়', 'এরূপ ব্যক্তি আমার প্রিয়' —এইরূপ পৃথকভাবে পাঁচবার বলেছেন, এর তাৎপর্য কী ?

উত্তর—উপরোক্ত সমস্ত লক্ষণই ভগবদ্ভক্তের এবং সবই শাস্ত্রানুকূল ও শ্রেষ্ঠ, কিন্তু স্বভাব ইত্যাদির পার্থক্যে ভক্তের গুণ ও আচরণাদিতে অল্পবিস্তর পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। সকল ভক্তের সব লক্ষণ একে অপরের সঙ্গে মেলে না। এটা অবশ্য ঠিক যে সমতা ও শান্তি সকলের মধ্যে থাকে এবং রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ, হর্ষ-শোকাদি বিকার কারো মধ্যে থাকে না। তাই এই প্রকরণে পুনরুক্তি পাওয়া যায়। ভেবে দেখলে বোঝা যায় যে, এই পাঁচটি বিভাগে কোথাও ভাবে এবং কোথাও শব্দের দ্বারা রাগ-দ্বেষ ও হর্ষ- শোকের অভাব সবের মধ্যেই পাওয়া যায়। প্রথম বিভাগে **'অদ্বেষ্টা'** দ্বারা দ্বেষের, **'নির্মমঃ'** দ্বারা অনুরাগের এবং **'সমদুঃখসুখঃ'** দ্বারা হর্ষ-শোকের অভাব বলা হয়েছে। দ্বিতীয়তে হর্ষ, অমর্ষ, ভয় এবং উদ্বেগের অভাব বলা হয়েছে ; এর দ্বারা রাগ-দ্বেষ এবং হর্ষ-শোকের অভাব স্বতঃই সিদ্ধ হয়ে যায়। তৃতীয়তে **'অনপেক্ষঃ'** দ্বারা অনুরাগের, **'উদাসীনঃ'** দ্বারা দ্বেষের এবং **'গতব্যথঃ'** দ্বারা হর্ষ-শোকের না থাকার কথা বলা হয়েছে। চতুর্থতে **'ন কাঙ্ক্ষতি'** দ্বারা অনুরাগের **'ন দ্বেষ্টি'** দ্বারা দ্বেষের এবং **'ন হৃষ্যতি'** এবং **'ন শোচতি'** দ্বারা হর্ষ-শোকের অভাব বলা হয়েছে। এইরূপ পঞ্চম বিভাগেও **'সঙ্গবিবর্জিতঃ'** ও **'সন্তুষ্টঃ'** দ্বারা রাগ-দ্বেষের, **'শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ'** দ্বারা হর্ষ-শোকের অভাব দেখানো হয়েছে। এই প্রকরণে 'সন্তুষ্টঃ' পদটিও দুবার ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে রাগ-

দ্বেষ এবং হর্ষ-শোকাদি বিকারের অভাব এবং সমতা ও শান্তি সকল সিদ্ধ ভক্তের মধ্যে অবশ্যই বিরাজ করে। অন্যান্য লক্ষণে স্বভাবভেদে কিছু পার্থক্য থাকতে পারে। এই পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিভক্ত করে ভগবান ভক্তদের লক্ষণকে এখানে পাঁচ বার আলাদা আলাদা করে বলেছেন। এর মধ্যে যে কোনো একটি বিভাগ অনুযায়ীও যাঁর মধ্যে সব লক্ষণ পূর্ণ ভাবে থাকে, তিনিই ভগবানের প্রিয় ভক্ত।

প্রশ্ন—এই লক্ষণ সিদ্ধ পুরুষের না সাধকের ?

উত্তর— চিন্তা-ভাবনা করলে মনে হয় এই লক্ষণ সাধকের নয়, বরং ভক্তিযোগের দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্ত সিদ্ধ পুরুষেরই ; কারণ প্রথমতঃ ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় এবং ফল জানানোর পর এই লক্ষণগুলির বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া চতুর্দশ অধ্যায়ের বাইশতম থেকে পঁচিশতম শ্লোক পর্যন্ত ভগবান গুণাতীত তত্ত্বদর্শী মহাত্মার যে লক্ষণ বর্ণনা করেছেন, তার সঙ্গে এগুলি মিলে যায় ; সুতরাং এগুলি সাধকের লক্ষণ হতে পারে না।

প্রশ্ন—এই সবগুলিকে 'ভক্তিযোগের দ্বারা ভগবদ্‌ প্রাপ্ত পুরুষের লক্ষণ' বলার কারণ কী ?

উত্তর—এই অধ্যায়ে ভক্তিযোগের বর্ণনা করা হয়েছে, তাই এর নাম রাখা হয়েছে 'ভক্তিযোগ'। অর্জুনের প্রশ্ন ও ভগবানের উত্তরও উপাসনাবিষয়েই এবং ভগবান **'যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ'**, **'ভক্তিমান্‌ যঃ স মে প্রিয়ঃ'** ইত্যাদি বাক্যও এইজন্য বলেছেন। সুতরাং এখানে একথা বুঝতে হবে যে যাঁরা ভক্তিমার্গের দ্বারা পরম সিদ্ধি লাভ করেছেন, এসব তাঁদেরই লক্ষণ।

প্রশ্ন—কর্মযোগ, ভক্তিযোগ বা জ্ঞানযোগ ইত্যাদি যে কোনো মার্গের দ্বারা পরম সিদ্ধি লাভের পরও কী ঐ সিদ্ধ পুরুষদের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে ?

উত্তর—তাঁদের বাস্তবিক স্থিতি বা অনুভূত পরম-তত্ত্বে কোনো পার্থক্য থাকে না ; কিন্তু স্বভাবের পার্থক্যের জন্য আচরণে কিছু পার্থক্য থাকতে পারে। **'সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি'** (৩।৩৩) এই বক্তব্যের দ্বারাও এটিই প্রমাণিত হয় যে সব জ্ঞানীদের আচরণ ও স্বভাবে জ্ঞানোত্তরকালেও পার্থক্য থাকে।

অহংবোধ, মমতা এবং রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ, হর্ষ-শোক, কাম-ক্রোধাদি অজ্ঞতাজনিত বিকারের অভাব এবং সমতা ও পরম শান্তি—এই সব লক্ষণ তো সবার মধ্যে সমানভাবে পাওয়া যায় ; কিন্তু ভক্তি-মার্গের দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্ত মহাপুরুষের মধ্যে মৈত্রী ও করুণা বিশেষরূপে থাকে। সংসার, শরীর ও কর্মে উপরতি—এগুলি জ্ঞানমার্গের দ্বারা পরম সিদ্ধি (ঈশ্বর) প্রাপ্ত মহাত্মাদের মধ্যে বিশেষরূপে থাকে। এইরূপ মন ও ইন্দ্রিয়াদি সংযমে রেখে অনাসক্তভাবে কর্মে তৎপর থাকা—এসকল লক্ষণ কর্মযোগ দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্ত মহাত্মাদের মধ্যে বিশেষরূপে দেখা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চান্ন থেকে বাহাত্তরতম শ্লোক পর্যন্ত অনেক শ্লোকে কর্মযোগের দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্ত পুরুষের এবং চতুর্দশ অধ্যায়ের বাইশ থেকে পঁচিশতম শ্লোক পর্যন্ত জ্ঞানযোগের দ্বারা ঈশ্বরপ্রাপ্ত গুণাতীত পুরুষের লক্ষণ বলা হয়েছে এবং এখানে তেরো থেকে উনিশতম শ্লোক পর্যন্ত ভক্তিযোগের দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্ত ব্যক্তির লক্ষণ বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ—ভগবৎপ্রাপ্ত সিদ্ধ ভক্তদের লক্ষণ জানিয়ে এবার সেই লক্ষণগুলিকে আদর্শ মনে করে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তা সুষ্ঠুভাবে পালনকারী, পরম শ্রদ্ধাযুক্ত, শরণাগত ভক্তদের প্রশংসা করে তাঁদের নিজের অত্যন্ত প্রিয় জানিয়ে ভগবান এই অধ্যায়ের উপসংহার করছেন—

যে তু ধর্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেহতীব মে প্রিয়াঃ।। ২০

কিন্তু যে সকল শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিরা আমার পরায়ণ হয়ে উক্ত কথিত ধর্মময় অমৃতকে নিষ্কাম প্রেমের সহিত ভক্তিপূর্বক পালন করেন, সেই সকল ভক্ত আমার অত্যন্ত প্রিয় ।। ২০

প্রশ্ন—এখানে 'তু' পদ প্রয়োগের উদ্দেশ্য কী ?

উত্তর — তেরো থেকে উনিশতম শ্লোক পর্যন্ত ভগবৎপ্রাপ্ত সিদ্ধ ভক্তদের লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে এবং এই শ্লোকে সেই সিদ্ধ ভক্তদের থেকে পৃথক উত্তম সাধক ভক্তদের প্রশংসা করা হয়েছে যাঁরা সিদ্ধ ভক্তদের এই লক্ষণগুলিকে আদর্শ মনে করে তা পালন করেন। এই পার্থক্য দেখাবার জন্য 'তু' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্ন—শ্রদ্ধাযুক্ত ভগবৎপরায়ণ পুরুষ কাকে বলা হয় ?

উত্তর—সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান, ভগবানের অবতারাদিতে, বাক্যে এবং তাঁর গুণ, প্রভাব, ঐশ্বর্য ও চরিত্রাদিতে যিনি প্রত্যক্ষের ন্যায় সম্মানপূর্বক বিশ্বাস রাখেন — তিনিই শ্রদ্ধাবান। যাঁরা পরম প্রেমিক ও পরম দয়ালু ভগবানকেই পরম গতি, পরম আশ্রয় এবং নিজ প্রাণের আধার, সর্বস্ব মনে করে তাঁর ওপর নির্ভর করেন এবং তাঁরই কৃত বিধানে প্রসন্ন থাকেন, এমন ব্যক্তিদের বলা হয় ভগবৎপরায়ণ পুরুষ।

প্রশ্ন—উপরোক্ত সাতটি শ্লোকে বর্ণিত ভগবদ্‌-ভক্তদের লক্ষণগুলি এখানে ধর্মময় অমৃতের নামে বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভগবদ্‌ভক্তের উপরোক্ত লক্ষণই বস্তুতঃ মানবধর্মের প্রকৃত স্বরূপ। এই সব পালনের দ্বারাই মনুষ্যজন্ম সার্থক হয়, কারণ এগুলি পালন করলে সাধক চিরতরে মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তিলাভ করেন এবং অমৃতস্বরূপ ভগবানকে লাভ করেন। এই ভাবটি স্পষ্ট করে বোঝাবার জন্য এখানে এই লক্ষণগুলির নাম 'ধর্মময় অমৃত' রাখা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে 'পর্যুপাসতে' কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যথাযথভাবে তৎপর হয়ে নিষ্কামভাবে প্রেমপূর্বক এই উপরোক্ত লক্ষণগুলি শ্রদ্ধাসহকারে সদা-সর্বদা পালন করা, এই হল 'পর্যুপাসতে' কথার অভিপ্রায়।

প্রশ্ন— আগের সাতটি শ্লোকে ভগবৎপ্রাপ্ত সিদ্ধ ভক্তদের লক্ষণগুলি বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান তাঁদের নিজ 'প্রিয় ভক্ত' বলেছেন এবং এই শ্লোকে যাঁরা সিদ্ধ নন, কিন্তু এই লক্ষণগুলির উপাসনাকারী সাধক ভক্ত—তাঁদের 'অতিশয় প্রিয়' বলেছেন, এর রহস্য কী ?

উত্তর—যে সিদ্ধ ভক্তগণ ভগবানকে লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে তো স্বাভাবিকভাবেই উপরোক্ত লক্ষণগুলি থাকে এবং ভগবানের সঙ্গে তাঁদের নিত্য তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ হয়ে যায়। তাই তাঁদের মধ্যে এই সব গুণ থাকা কোনো বড় ব্যাপার নয়। কিন্তু যেসব একনিষ্ঠ সাধক ভক্তদের ভগবানের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়নি তবুও তাঁরা ভগবানে বিশ্বাস করে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে দেহ, মন, ধন, সর্বস্ব ভগবানকে অর্পণ করে তাঁর পরায়ণ হয়েছেন এবং ভগবদ্দর্শনের জন্য নিরন্তর নিষ্কামভাবে প্রেমপূর্বক তাঁর চিন্তায় রত থাকেন ও সর্বদা চেষ্টা করে উপরোক্ত লক্ষণগুলি নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট থাকেন—প্রত্যক্ষ দর্শন না পেয়েও কেবল বিশ্বাসের ওপর তাঁদের এতটা নির্ভর হওয়া নিশ্চয় বিশেষ মহত্ত্বের ব্যাপার। তাই তাঁরা ভগবানের বিশেষ প্রিয় হন। এরূপ প্রেমিক ভক্তদের ভগবান তাঁর নিত্য সঙ্গ প্রদান করে যতক্ষণ সন্তুষ্ট না করেন, ততক্ষণ তিনি এঁদের কাছে ঋণী হয়ে থাকেন— ভগবানের এমনই স্বভাব। সুতরাং ভগবানের এঁদের সিদ্ধ ভক্তদের থেকেও 'অতিশয় প্রিয়' বলা খুবই সঙ্গত।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

———o———

ও শ্রীপরমাত্মনে নমঃ

ত্রয়োদশ অধ্যায়
(ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ)

অধ্যায়ের নাম

'ক্ষেত্র' (শরীর) এবং 'ক্ষেত্রজ্ঞ' (আত্মা) পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। শুধু অজ্ঞতাবশতঃ এই দুটিকে যেন এক বলে প্রতীয়মান হয়। ক্ষেত্র জড়, বিকারশীল, ক্ষণিক এবং বিনাশশীল। ক্ষেত্রজ্ঞ চেতন, জ্ঞানস্বরূপ, নির্বিকার, নিত্য এবং অবিনাশী। এই অধ্যায়ে 'ক্ষেত্র' ও 'ক্ষেত্রজ্ঞে'র স্বরূপ উপরোক্ত প্রকারে ভাগ করা হয়েছে। তাই এই অধ্যায়ের নাম রাখা হয়েছে **'ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ'**।

সংক্ষিপ্ত অধ্যায়-সার

এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ক্ষেত্র (শরীর) এবং ক্ষেত্রজ্ঞ (আত্মা)র লক্ষণ বলা হয়েছে, দ্বিতীয়তে পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার ঐক্য প্রতিপাদন করে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানকেই জ্ঞান বলা হয়েছে। তৃতীয়তে বিকারসহ ক্ষেত্রের স্বরূপ ও স্বভাব ইত্যাদির এবং প্রভাবসহ ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ বর্ণনা করার প্রতিজ্ঞা করে চতুর্থে ঋষি, বেদ এবং ব্রহ্মসূত্রের প্রমাণ দিয়ে পঞ্চম এবং ষষ্ঠে বিকারসহ ক্ষেত্রের স্বরূপ বলা হয়েছে। সপ্তম থেকে একাদশ পর্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভের সাধন হওয়ায় যাকে 'জ্ঞান' বলে অভিহিত করা হয়েছে, তদনুরূপ 'অমানিত্ব' ইত্যাদি কুড়িটি সাত্ত্বিক ভাব ও আচরণাদির বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর দ্বাদশ থেকে সপ্তদশ পর্যন্ত জ্ঞানের দ্বারা জানার যোগ্য পরমাত্মার স্বরূপের বর্ণনা করে অষ্টাদশে এ পর্যন্ত প্রতিপাদিত বিষয়গুলির নাম বলে এই প্রকরণ জানার ফল পরমাত্মার স্বরূপ লাভের কথা বলা হয়েছে। এরপর 'প্রকৃতি' ও 'পুরুষ'-এর নামে প্রকরণ আরম্ভ করে উনিশ থেকে একুশ পর্যন্ত প্রকৃতির স্বরূপ ও কার্যের এবং ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। বাইশে পরমাত্মা ও আত্মার একত্ব প্রতিপাদন করে তেইশে গুণাদি সহ প্রকৃতিকে ও পুরুষকে জানার ফল জানিয়ে চব্বিশ ও পঁচিশে শ্রীভগবান ঈশ্বর-লাভের বিভিন্ন উপায়ের বর্ণনা করেছেন। ছাব্বিশে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে সমগ্র চরাচর প্রাণীদের উৎপত্তি হয়, এই বলে সাতাশতম থেকে ত্রিশতম পর্যন্ত 'পরমাত্মা সমভাবে স্থিত অবিনাশী এবং অকর্তা ও যত কর্ম সংঘটিত হয় সব প্রকৃতির দ্বারাই করা হয়ে থাকে এবং সব কিছু পরমাত্মতত্ত্ব থেকেই বিস্তৃত ও তাঁতেই অবস্থিত' এরূপ উপলব্ধির গুরুত্ব এবং সেই সঙ্গে তার ফলও বর্ণনা করেছেন। একত্রিশ থেকে তেত্রিশতম পর্যন্ত আত্মার প্রভাব বুঝিয়ে তার অকর্তাভাব ও নির্লিপ্ততা দৃষ্টান্তের সাহায্যে নিরূপণ করে শেষে চৌত্রিশতম শ্লোকে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিভাগ জানার ফল ঈশ্বরলাভ জানিয়ে, ভগবান এই অধ্যায়ের উপসংহার করেছেন।

সম্বন্ধ—দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জুন সগুণ ও নির্গুণের উপাসকদের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। তার উত্তর দিতে গিয়ে ভগবান দ্বিতীয় শ্লোকে সংক্ষেপে সগুণ উপাসকদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্লোক পর্যন্ত নির্গুণ উপাসনার স্বরূপ, তার ফল এবং দেহাভিমানীদের জন্য তার সাধন দুষ্কর বলে নিরূপণ করেছেন। তারপর ষষ্ঠ থেকে বিশতম শ্লোক পর্যন্ত সগুণ উপাসনার মহত্ত্ব, ফল, প্রকার ও ভগবদ্ভক্তদের লক্ষণ বর্ণনা করে অধ্যায়ের সমাপ্তি করা হয়েছে ; কিন্তু নির্গুণের তত্ত্ব, মহিমা এবং তার প্রাপ্তির সাধনসমূহ বিস্তারিতভাবে বোঝানো হয়নি। তাই নির্গুণ-নিরাকারের তত্ত্ব অর্থাৎ জ্ঞানযোগের বিষয় যথাযথভাবে বর্ণনা করার জন্য ত্রয়োদশ অধ্যায় উপদিষ্ট হয়েছে। ভগবান এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে প্রথমে ক্ষেত্র (শরীর) এবং ক্ষেত্রজ্ঞ (আত্মা)র লক্ষণ জানাচ্ছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ।। ১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে অর্জুন ! এই শরীরকে 'ক্ষেত্র' বলা হয় ; এবং যিনি এই শরীরকে জানেন, তত্ত্ববিদ জ্ঞানিগণ তাঁকে 'ক্ষেত্রজ্ঞ' নামে অভিহিত করেন ॥ ১

প্রশ্ন—'**শরীরম্**'-এর সঙ্গে '**ইদম্**' পদপ্রয়োগের অভিপ্রায় কী, শরীরকে ক্ষেত্র বলা হয় কেন ?

উত্তর—'**শরীরম্**'-এর সঙ্গে '**ইদম্**' পদ প্রয়োগের এই অভিপ্রায় যে, এই আত্মা দ্বারা এটি অর্থাৎ ক্ষেত্র দেখা এবং জানা যায়, তাই এটি দৃশ্য ও এটি দ্রষ্টারূপ আত্মার থেকে সর্বতোভাব পৃথক। যেমন ক্ষেতে বীজ রোপণ করলে তার ফল যথাযথ সময়ে প্রকটিত হয়, তেমনই এই শরীরে বপন করা কর্ম-সংস্কাররূপ বীজও সময়মতো ফল প্রদান করে। সেইজন্য একে 'ক্ষেত্র' বলা হয়। এছাড়া এটি প্রতিমুহূর্তে ক্ষয় হতে থাকে, সেইজন্যও একে ক্ষেত্র বলা হয় এবং তাই পঞ্চদশ অধ্যায়ে একে 'ক্ষর' পুরুষ বলা হয়েছে। এই অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে সংক্ষেপে এই ক্ষেত্রের স্বরূপ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এই ক্ষেত্রকে যিনি জানেন, তাঁকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান অন্তরাত্মা দ্রষ্টাকে লক্ষ্য করিয়েছেন। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মহাভূত ও ইন্দ্রিয়াদির বিষয়াদি যত প্রকার জ্ঞেয় (জানার যোগ্য) দৃশ্যবর্গ আছে—সেসব জড়, বিনাশশীল এবং পরিবর্তনশীল। চেতন আত্মা সেই জড় দৃশ্যবর্গ থেকে সর্বতোভাবে বৈশিষ্টপূর্ণ। এটি তার জ্ঞাতা, তাতে অনুস্যূত এবং তার অধিপতি। তাই একে '**ক্ষেত্রজ্ঞ**' বলা হয়। এই জ্ঞাতা চেতন আত্মাকে সপ্তম অধ্যায়ে 'পরাপ্রকৃতি' (৭।৫), অষ্টমে 'অধ্যাত্ম' (৮।৩) এবং পঞ্চদশ অধ্যায়ে 'অক্ষর পুরুষ' (১৫।১৬) বলা হয়েছে। এই আত্মতত্ত্ব অত্যন্ত গহন, তাইজন্য ভগবান ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণের দ্বারা কোথাও স্ত্রীবাচক, কোথাও নপুংসকবাচক ও কোথাও পুরুষ বাচক শব্দ প্রয়োগ করে এটিকে বর্ণনা করেছেন। বাস্তবে আত্মা বিকার-রহিত, অলিঙ্গ, নিত্য, নির্বিকার এবং চেতন—জ্ঞানস্বরূপ।

প্রশ্ন—'**তদ্বিদঃ**' কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এই পদে 'তৎ' শব্দের দ্বারা 'ক্ষেত্র' এবং 'ক্ষেত্রজ্ঞ' দুটিই গ্রহণ করা হয়েছে। ঐ দুটি (ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ) কে যাঁরা যথার্থরূপে জানেন, তাঁরা '**তদ্বিদঃ**'। বলার অভিপ্রায় হল যে, তত্ত্ববেত্তা মহাত্মাগণ এই কথা বলেন, অতএব এতে কোনোপ্রকার সংশয়ের অবকাশ নেই।

সম্বন্ধ—এইভাবে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের লক্ষণ জানিয়ে ভগবান এবার ক্ষেত্রজ্ঞ ও পরমাত্মার ঐক্য প্রতিপাদন করে জ্ঞানের লক্ষণ নিরূপণ করছেন—

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম॥ ২

হে অর্জুন ! তুমি সমস্ত ক্ষেত্রের মধ্যে ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীবাত্মারূপে আমাকেই জানবে এবং ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের অর্থাৎ বিকারসহ প্রকৃতি ও পুরুষকে যে পৃথক ভাবে জানা, তাকেই বলে জ্ঞান—এই হল আমার মত॥ ২

প্রশ্ন—সর্ব ক্ষেত্রে 'ক্ষেত্রজ্ঞ' (জীবাত্মা)ও আমাকেই জানবে, এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা আত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য প্রতিপাদন করা হয়েছে। আত্মা এবং পরমাত্মাতে বস্তুতঃ কোনো পার্থক্য নেই, প্রকৃতির সঙ্গ দ্বারাই পার্থক্যের ন্যায় প্রতীত হয় ; তাই দ্বিতীয় অধ্যায়ের চব্বিশতম ও পঁচিশতম শ্লোকে আত্মার স্বরূপ বর্ণনাকালে যে শব্দগুলি প্রয়োগ করা হয়েছে, দ্বাদশ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে নির্গুণ-নিরাকার পরমাত্মার লক্ষণাদি বর্ণনা করার সময়ও প্রায় সেই শব্দগুলিই প্রযুক্ত হয়েছে। ভগবানের বক্তব্যের অভিপ্রায় হল যে, সমস্ত ক্ষেত্রে যে চেতন আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ, তা আমারই অংশ (১৫।৭) হওয়ায় বস্তুতঃ আমার থেকে ভিন্ন নয় ; আমি, পরমাত্মাই জীবাত্মার রূপে বিভিন্ন প্রকারে প্রতীত হই—এই বিষয়টি তুমি ভালোভাবে বুঝে নাও।

প্রশ্ন—এখানে যদি এই অর্থ মেনে নেওয়া হয় যে, সমস্ত ক্ষেত্রে অর্থাৎ শরীরে তুমি ক্ষেত্রজ্ঞ (জীবাত্মা)কে এবং আমাকেও অবস্থিত বলে জানবে, তাতে ক্ষতি কী ?

উত্তর—ভক্তিপ্রধান প্রকরণ হলে ঐরূপ অর্থ মানা যেত ; কিন্তু এখানের প্রকরণটি হল জ্ঞানপ্রধান ; এই প্রকরণে ভক্তির বর্ণনা জ্ঞানের সাধনরূপে এসেছে—তাই এখানে ভক্তির স্থান গৌণ মানা হয়েছে। সুতরাং এখানে অদ্বৈত-পক্ষের ব্যাখ্যাই ঠিক মনে হয়।

প্রশ্ন—'ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যা জ্ঞান, সেটিই প্রকৃত জ্ঞান—এমনই আমার মত' এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর অভিপ্রায় হল—'ক্ষেত্র' হল উৎপত্তি-বিনাশশীল জড়, অনিত্য, জ্ঞেয় (জানার যোগ্য) এবং ক্ষণিক ; এর বিপরীত 'ক্ষেত্রজ্ঞ' (আত্মা) হল নিত্য, চেতন, জ্ঞাতা, নির্বিকার, শুদ্ধ এবং সর্বদা একভাবে স্থিত। অতএব দুটি হল পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, কিন্তু অজ্ঞতার জন্যই দুটিকে একপ্রকার বলে প্রতীয়মান হয়—এই বিষয়টি তত্ত্বতঃ বুঝে নেওয়াই হল প্রকৃত জ্ঞান। এই হল আমার (ভগবানের) মত। এতে কোনোপ্রকার সংশয় বা ভ্রম নেই।

সম্বন্ধ—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পূর্ণ জ্ঞান হয়ে গেলে সংসার-ভ্রম বিনাশ হয় এবং ঈশ্বর লাভ হয়, সুতরাং 'ক্ষেত্র' এবং 'ক্ষেত্রজ্ঞে'র স্বরূপ ইত্যাদি যথাযথ বিভাগপূর্বক বোঝাবার জন্য ভগবান বলছেন—

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎ প্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥ ৩

সেই ক্ষেত্র কী এবং কেমন, তা কিরূপ বিকারসম্পন্ন, কী কারণে এটি হয় এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ কেমন, তাঁর প্রভাব কিরূপ—আমার কাছে সংক্ষেপে এই সব শোনো॥ ৩

প্রশ্ন—**'ক্ষেত্রম্'**-এর সঙ্গে **'তৎ'** বিশেষণ দেওয়ার অর্থ কী, এবং **'যৎ'** পদ দ্বারা ভগবান ক্ষেত্রের কোন্ বিষয়ে স্পষ্টীকরণের ইঙ্গিত করেছেন এবং তা কোন্ শ্লোকে করেছেন ?

উত্তর—**'ক্ষেত্রম্'**-এর সঙ্গে **'তৎ'** বিশেষণ প্রয়োগের এই তাৎপর্য যে, যে শরীররূপ ক্ষেত্রের লক্ষণ প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছে, সেটিরই স্পষ্টীকরণ করার কথা এই শ্লোকে বলা হয়েছে ; **'যৎ'** পদ দ্বারা ভগবান ক্ষেত্রের স্বরূপ জানাবার ইঙ্গিত করেছেন এবং এই অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে সেটি বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—**'যাদৃক্'** পদ দ্বারা ক্ষেত্রের বিষয়ে কী বলার সংকেত করা হয়েছে এবং সেটি কোথায় বলা হয়েছে ?

উত্তর—**'যাদৃক্'** পদে ক্ষেত্রের স্বভাব জানাবার সংকেত করা হয়েছে এবং ছাব্বিশতম ও সাতাশতম শ্লোকে সমস্ত প্রাণীকে উৎপত্তি ও বিনাশশীল বলে জানিয়ে তার বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন—**'যদ্বিকারি'** পদে ক্ষেত্রের বিষয়ে কী বলার সংকেত করা হয়েছে এবং সেটি কোন্ শ্লোকে বলা হয়েছে ?

উত্তর—**'যদ্বিকারি'** পদে ক্ষেত্রের বিকারগুলির বর্ণনা করার সংকেত করা হয়েছে ; সেগুলি ষষ্ঠ শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন—**'যতঃ চ যৎ'** এই পদে ক্ষেত্রের বিষয়ে কী বলার সংকেত করা হয়েছে এবং সেটি কোথায় বলা হয়েছে ?

উত্তর—যে পদার্থগুলির নাম 'ক্ষেত্র', তার মধ্যে কোন্ পদার্থ কীসের থেকে উৎপন্ন হয়েছে—তা বলার সংকেত এই **'যতঃ চ যৎ'** পদে করা হয়েছে এবং তার বর্ণনা উনিশতম শ্লোকের উত্তরার্ধে এবং বিশতম শ্লোকের পূর্বার্ধে করা হয়েছে।

প্রশ্ন—**'সঃ'** পদটি কীসের বাচক এবং **'যঃ'** পদে ভগবান তার বিষয়ে কী বলার সংকেত করেছেন এবং কোথায় করেছেন ?

উত্তর—**'সঃ'** পদটি 'ক্ষেত্রজ্ঞ'-এর বাচক এবং **'যঃ'** পদে তার স্বরূপ বলার ইঙ্গিত করা হয়েছে। পরে তার প্রকৃতি-স্থিত এবং বাস্তবিক—উভয় স্বরূপের বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন উনিশতম শ্লোকে তাকে 'অনাদি', কুড়িতে 'সুখ- দুঃখের ভোক্তা' এবং একুশে 'ভালো-

মন্দ গর্ভে জন্মগ্রহণকারী' বলে প্রকৃতি-স্থিত পুরুষের স্বরূপ বলা হয়েছে এবং বাইশ ও সাতাশ থেকে ত্রিশ শ্লোক পর্যন্ত পরমাত্মার সঙ্গে ঐক্য স্থাপন করে তার প্রকৃত স্বরূপ নিরূপণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—'**যৎ প্রভাবঃ**' পদে ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয়ে কী বলার ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং সেটি কোন্ শ্লোকে বলা হয়েছে ?

উত্তর—'**যৎ প্রভাবঃ**' দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভাব বলার জন্য সংকেত করা হয়েছে এবং সেটি একত্রিশ থেকে তেত্রিশ শ্লোক পর্যন্ত বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ—তৃতীয় শ্লোকে 'ক্ষেত্র' এবং 'ক্ষেত্রজ্ঞ'র যে তত্ত্ব সংক্ষেপে শোনার জন্য ভগবান অর্জুনকে বলেছেন—এবার সেই বিষয়ে ঋষি, বেদ ও ব্রহ্মসূত্রের উক্তির প্রমাণ দিয়ে ভগবান ঋষি, বেদ ও ব্রহ্মসূত্রকে সম্মান জানাচ্ছেন—

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ।। ৪

এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব ঋষিগণ নানাপ্রকারে বলেছেন ও বিবিধ বেদমন্ত্র ইত্যাদির দ্বারাও এটি বিভাগপূর্বক বলা হয়েছে এবং যথাযথভাবে স্থির করে যুক্তিযুক্ত ব্রহ্মসূত্রপদসমূহের দ্বারাও এর বর্ণনা করা হয়েছে।। ৪

প্রশ্ন—'ঋষিদের দ্বারা বহু প্রকারে বলা হয়েছে' এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথার অর্থ হল মন্ত্রদ্রষ্টা এবং শাস্ত্র ও স্মৃতির রচয়িতা ঋষিগণ 'ক্ষেত্র' ও 'ক্ষেত্রজ্ঞে'র স্বরূপ ও তার সঙ্গে সম্বন্ধিত সমস্ত বিষয় নিজ নিজ গ্রন্থে ও পুরাণ-ইতিহাসে নানাভাবে বর্ণনা করে বিস্তারপূর্বক বুঝিয়েছেন ; তারই সার অতি অল্প শব্দে ভগবান বলেছেন।

প্রশ্ন—'**বিবিধৈঃ**' বিশেষণের সঙ্গে '**ছন্দোভিঃ**' পদ কীসের বাচক, এর দ্বারা (সেই তত্ত্ব) পৃথকভাবে বলা হয়েছে—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'**বিবিধৈঃ**' বিশেষণের সঙ্গে '**ছন্দোভিঃ**' পদ ঋক্, যজুঃ, সাম এবং অথর্ব—এই চার বেদের 'সংহিতা' এবং 'ব্রাহ্মণ' দুটি ভাগেরই বাচক, সমস্ত উপনিষদ্ এবং বিভিন্ন শাখাগুলিকেও এর অন্তর্গত বলে জানা উচিত। এই সবের দ্বারা (সেই তত্ত্ব) পৃথকভাবে বলা হয়েছে—এই বক্তব্যের অভিপ্রায় হল যে, যে সিদ্ধান্ত 'ক্ষেত্র' ও 'ক্ষেত্রজ্ঞে'র বিষয়ে ভগবান এখানে সংক্ষেপে উপস্থাপন করেছেন, তার বিস্তারিত বিভাগসহ বর্ণনা তিনি স্থানে স্থানে বহুপ্রকারে করেছেন।

প্রশ্ন—'**বিনিশ্চিতৈঃ**' ও '**হেতুমদ্ভিঃ**' বিশেষণের সঙ্গে '**ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ**' পদ কিসের বাচক এবং এই বক্তব্যের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যা ঠিকমতো স্থির করা হয়েছে এবং সর্বতোভাবে অসন্দিগ্ধ, তাকে '**বিনিশ্চিত**' বলা হয়, এবং যা যুক্তিযুক্ত অর্থাৎ বিভিন্ন যুক্তির দ্বারা স্থির সিদ্ধান্তরূপে স্বীকৃত তাকে '**হেতুমৎ**' বলা হয়। সুতরাং এই দুটি বিশেষণের সঙ্গে এখানে '**ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ**' পদ 'বেদান্তদর্শনে'র যে '**অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা**' ইত্যাদি সূত্ররূপ পদ, তারই বাচক বলে প্রতীত হয়। কারণ উপরোক্ত সব লক্ষণই সেখানকার বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে একরূপ। অতএব এখানে এই কথাটির তাৎপর্য হল যে, শ্রুতি-স্মৃতি ইত্যাদিতে বর্ণিত ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে তত্ত্ব ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন পদে যুক্তিপূর্ণভাবে বোঝানো হয়েছে, তার সার মর্ম ভগবান এখানে সংক্ষেপে বলেছেন।

সম্বন্ধ—এইভাবে ঋষি, বেদ ও ব্রহ্মসূত্রের প্রমাণ দিয়ে ভগবান এবার তৃতীয় শ্লোকে 'যৎ' পদের দ্বারা বলা 'ক্ষেত্রে'র এবং 'যদ্বিকারি' পদে কথিত তার বিকারগুলির বর্ণনা পরবর্তী দুটি শ্লোকে করেছেন—

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥ ৫[১]

পঞ্চ মহাভূত, অহংকার, বুদ্ধি এবং মূল প্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয়, মন এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয় অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ— ॥ ৫

প্রশ্ন— '**মহাভূতানি**' পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—স্থূল ভূতপ্রাণীর এবং শব্দাদি বিষয়ের কারণরূপ যে পঞ্চতন্মাত্রা অর্থাৎ সূক্ষ্ম পঞ্চমহাভূত—সপ্তম অধ্যায়ে যেগুলি '**ভূমিঃ**', '**আপঃ**', '**অনলঃ**', '**বায়ুঃ**' এবং '**খম্**'-এর নামে বর্ণিত হয়েছে—সেই পাঁচটির বাচক হল এই '**মহাভূতানি**' পদ।

প্রশ্ন—'**অহংকারঃ**' পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—এটি 'সমষ্টি' অন্তঃকরণের একটি ভাগ। অহংকারই পঞ্চতন্মাত্রা, মন এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কারণ ও মহত্তত্ত্বের কার্যরূপ। একে 'আমিত্ব'-বোধও বলা হয়। এখানে '**অহংকারঃ**' পদ তারই বাচক।

প্রশ্ন—'**বুদ্ধিঃ**' পদটি এখানে কীসের বাচক ?

উত্তর—যাকে 'মহত্তত্ত্ব' (মহান) এবং সমষ্টিবুদ্ধিও বলা হয়, সেটি সমষ্টি অন্তঃকরণের একটি ভাগ। নিশ্চয়াত্মিকতা বৃত্তিই এর স্বরূপ। এখানে এই '**বুদ্ধিঃ**' পদটি তারই বাচক।

প্রশ্ন—'**অব্যক্তম্**' পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—যে মহত্তত্ত্ব ইত্যাদি সমস্ত পদার্থের কারণরূপা মূল প্রকৃতি, সাংখ্যশাস্ত্রে যাকে 'প্রধান' বলা হয়েছে, চতুর্দশ অধ্যায়ে ভগবান যাকে 'মহদ্ব্রহ্ম' বলেছেন এবং এই অধ্যায়ের উনিশতম শ্লোকে যার 'প্রকৃতি' নাম দেওয়া হয়েছে—তার বাচক হল এই '**অব্যক্তম্**' পদটি।

প্রশ্ন—দশ ইন্দ্রিয় কোন্‌গুলি ?

উত্তর—বাক্, পাণি (হাত), পাদ (পা), উপস্থ ও গুহ্য—এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। এইগুলি একত্রে দশ ইন্দ্রিয়। এই সবগুলির সক্রিয়তার কারণ হল অহংকার।

প্রশ্ন—'**একম্**' পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—সমষ্টি অন্তঃকরণের মনন করার যে শক্তি-বিশেষ, সংকল্প-বিকল্পই যার স্বরূপ—সেই মনের বাচক 'একম্' পদটি ; এটিও অহংকারের কার্যরূপ।

প্রশ্ন—'**পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচরাঃ**' এই পদটির অর্থ কী ?

উত্তর—রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ—যেগুলি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের স্থূল বিষয়, সেগুলিরই বাচক হল এখানে '**পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচরাঃ**' পদটি।

---

[১]এর মতো একই রকমের বর্ণনা সাংখ্যকারিকা ও যোগদর্শনেও দেখা যায়। যেমন—

মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।

ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥ (সাংখ্যকারিকা ৩)

অর্থাৎ মূল প্রকৃতি একটি, তা কারো বিকৃতি (বিকার) নয়। মহত্তত্ত্ব, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্রা (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ তন্মাত্রা)—এই সাত হল প্রকৃতি-বিকৃতি ; অর্থাৎ এই সাতটি পঞ্চভূতাদির কারণ হওয়ায় 'প্রকৃতি' এবং মূল প্রকৃতির কার্য হওয়ায় 'বিকৃতি'ও বটে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মন— এই একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত— এই ষোলোটি শুধু বিকৃতি (বিকার), এগুলি কারো প্রকৃতি অর্থাৎ কারণ নয়। এতে একাদশ ইন্দ্রিয় তো অহংকার ও পঞ্চস্থূল মহাভূত পঞ্চতন্মাত্রার কার্য ; কিন্তু পুরুষ কারো কারণও নয় এবং কার্যও নয়, সে সর্বতোভাবে অসঙ্গ (সঙ্গবর্জিত)।

যোগদর্শনে বলা হয়েছে—'**বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্বাণি।**' (২।১৯) বিশেষ অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, এক মন এবং পঞ্চ স্থূল ভূত ; অবিশেষ অর্থাৎ অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্রা ; লিঙ্গমাত্র অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব এবং অলিঙ্গ অর্থাৎ মূল প্রকৃতি—এই চব্বিশ তত্ত্ব হল গুণাদির অবস্থাবিশেষ ; একেই 'দৃশ্য' বলা হয়।

যোগদর্শনে যাকে 'দৃশ্য' বলা হয়েছে, গীতায় তাকেই 'ক্ষেত্র' বলা হয়েছে।

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সঙ্ঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥ ৬

ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, স্থূলদেহ, চেতনা ও ধৃতি—এইরূপ বিকারসহ এই ক্ষেত্রটি সংক্ষেপে বলা হল॥ ৬

প্রশ্ন—'**ইচ্ছা**' পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—যেসব পদার্থকে মানুষ সুখের হেতু ও দুঃখ-নাশক বলে মনে করে, তা প্রাপ্ত করার যে আসক্তিযুক্ত কামনা—যা বাসনা, তৃষ্ণা, আশা, লালসা, স্পৃহা ইত্যাদি নানা শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয় তারই বাচক হল এখানে '**ইচ্ছা**' পদটি। এটি অন্তঃকরণের বিকার, তাই ক্ষেত্রের বিকারগুলির মধ্যে এটিকে গণ্য করা হয়েছে।

প্রশ্ন—'দ্বেষ' কাকে বলে ?

উত্তর— যে সব পদার্থকে মানুষ দুঃখের হেতু বা সুখের প্রতিবন্ধক মনে করে, তার প্রতি যে বিরুদ্ধভাব জাগ্রত হয়, তাকে বলা হয় দ্বেষ। এর স্থূল রূপ হল শত্রুতা, ঈর্ষা, ঘৃণা এবং ক্রোধ ইত্যাদি। এটিও অন্তঃকরণের বিকার, তাই এটিকে ক্ষেত্রের বিকারের মধ্যে গণ্য করা হয়।

প্রশ্ন—'সুখ' কী বস্তু ?

উত্তর—অনুকূলতার প্রাপ্তি ও প্রতিকূলতার নিবৃত্তিতে অন্তঃকরণে যে প্রসন্নতার উদয় হয়, তাকে বলা হয় সুখ। অন্তঃকরণের বিকার হওয়ায় এটিকেও ক্ষেত্রের বিকারের মধ্যে গণ্য করা হয়।

প্রশ্ন—'দুঃখম্' পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—প্রতিকূলতার প্রাপ্তি ও অনুকূলতার বিনাশে অন্তঃকরণে যে ব্যাকুলতা হয়, যাকে ব্যথাও বলা হয়—তার বাচক হল এই '**দুঃখম্**' পদটি। এটিও অন্তঃকরণের বিকার, তাই এটিকেও ক্ষেত্রের বিকারের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে।

প্রশ্ন—'সংঘাতঃ' পদের অর্থ কী ?

উত্তর—পঞ্চভূতে গঠিত এই যে স্থূলদেহ, মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম শরীর নির্গত হওয়ার পর যেটি সবার সামনে পড়ে থাকে— সেই স্থূল দেহকে বলা হয় সংঘাত। উপরোক্ত পঞ্চভূতের বিকার হওয়ায় এটিকেও ক্ষেত্রের বিকারের মধ্যে গণ্য করা হয়।

প্রশ্ন—'**চেতনা**' পদ কীসের বাচক ?

উত্তর— অন্তঃকরণের যে জ্ঞান-শক্তি, যার দ্বারা সুখ-দুঃখ ও সমস্ত পদার্থ অনুভব করা হয়, দশম অধ্যায়ের বাইশতম শ্লোকে যাকে 'চেতনা' বলা হয়েছে—এখানেও 'চেতনা' পদটি তারই বাচক। অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষ হওয়ায় এটিকেও ক্ষেত্রের বিকারের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে।

প্রশ্ন—'**ধৃতিঃ**' পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—অষ্টাদশ অধ্যায়ের তেত্রিশ, চৌত্রিশ ও পঁয়ত্রিশতম শ্লোকে যে ধারণ শক্তির সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—তিনটি ভাগ করা হয়েছে, যার সাত্ত্বিক অংশকে ষোড়শ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে দৈবী সম্পদের অন্তর্গত 'ধৃতি' নামে বলা হয়েছে—তারই বাচক এখানে 'ধৃতিঃ' পদটি। অন্তঃকরণের বিকার হওয়ায় এটিকেও ক্ষেত্রের বিকারের মধ্যেই গণ্য করা হয়েছে।

প্রশ্ন—এই বিকারগুলির সঙ্গে ক্ষেত্র সংক্ষেপে বলা হয়েছে—কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—কথাটির তাৎপর্য হল যে, এই পর্যন্ত বিকার সহ ক্ষেত্রের সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ পঞ্চম শ্লোকে ক্ষেত্রের স্বরূপ সংক্ষেপে বলা হয়েছে এবং ষষ্ঠতে সংক্ষেপে তার বিকারের বর্ণনা করা হয়েছে।

সম্বন্ধ—এইভাবে ক্ষেত্রের স্বরূপ এবং তার বিকারগুলির বর্ণনা করার পর এখন দ্বিতীয় শ্লোকে কথিত ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান, আমার মতে সেটিই 'জ্ঞান' বলে যে জ্ঞানের কথা বলেছিলেন, সেই জ্ঞান লাভ করার সাধনসমূহকে 'জ্ঞান' নামে পরবর্তী পাঁচটি শ্লোকে বর্ণনা করছেন—

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥ ৭

শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান না থাকা, দাম্ভিকতার অভাব, কোনো প্রাণীকে কোনোভাবে কষ্ট না দেওয়া, ক্ষমা,

মন ও বাক্যে সরলতা, শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে গুরু সেবা, বাহ্যান্তর শুদ্ধি, আত্মসংযম ও অন্তরের স্থৈর্য।। ৭

প্রশ্ন—'অমানিত্বম্'-এর অভিপ্রায় কী ?

উত্তর— নিজেকে শ্রেষ্ঠ, সম্মানীয়, পূজনীয় বা অনেক বড় বলে মনে করা এবং মান-মর্যাদা, প্রতিষ্ঠা-পূজা ইত্যাদি আশা করা ; অথবা বিনা ইচ্ছায় এই সবের প্রাপ্তিতে প্রসন্ন হওয়া—এই হল মানিত্ব। এই সব না হওয়াকে বলা হয় 'অমানিত্ব'। যাঁর মধ্যে 'অমানিত্ব' পূর্ণভাবে এসে যায়—তাঁর মান, মর্যাদা, পূজা এবং প্রতিষ্ঠাতে প্রসন্ন হওয়া তো দূরের কথা, তিনি এইসবের প্রতি বিরক্ত ও নিরপেক্ষ হয়ে যান।

প্রশ্ন—'অদম্ভিত্বম্' কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর— মান, মর্যাদা, পূজা এবং প্রতিষ্ঠার জন্য, অর্থের লোভে বা কাউকে বঞ্চনার অভিপ্রায়ে নিজেকে ধর্মাত্মা, দানশীল, ভগবদ্ভক্ত, জ্ঞানী বা মহাত্মা বলে জাহির করা এবং ধর্মপালন, উদারতা, দান, ভক্তি, যোগসাধনা, ব্রত-উপবাস অথবা অন্য কোনো প্রকার সৎ কার্য না করে তার ঢং করাকে বলা হয় দম্ভিত্ব। এর একেবারে না থাককে বলা হয় 'অদম্ভিত্ব'। যে সাধকের মধ্যে 'অদম্ভিত্ব' পূর্ণভাবে এসে যায়, তাঁর মান-মর্যাদার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা না থাকায় তিনি নিজের সত্যকার ধার্মিক ভাব, সদ্‌-গুণাদি অথবা ভক্তির আচরণও অপরের সামনে প্রকাশ করতে সঙ্কোচ বোধ করেন—সুতরাং যে গুণ তাঁর মধ্যে নেই তা অপরকে দেখানোর কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

প্রশ্ন—'অহিংসা'র অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—কোনো প্রাণীকে কায়-মনো-বাক্যে কোনোপ্রকার কষ্ট দেওয়া—মনে মনেও কারো ক্ষতি চাওয়া ; কারোকে কঠোর বাক্য বলা, অপমান করা, কারো নিন্দা করা বা অন্য কোনোপ্রকার দুঃখদায়ক বা অহিতকারক বাক্য বলা ; কাউকে দেহে আঘাত করা, কষ্ট দেওয়া বা কোনোপ্রকার ক্ষতি করা ইত্যাদি যে হিংসার ভাব—এই সবের সর্বথা অভাবকে বলা হয় **'অহিংসা'**। যে সাধকের মধ্যে এই **'অহিংসা'** ভাব পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়, কারো প্রতি তাঁর বৈরীভাব বা দ্বেষ থাকে না ; তাই তাঁর দ্বারা কখনও কোনো প্রাণীর অহিত হয় না, তাঁর দ্বারা কেউ দুঃখও পায় না এবং তিনি কারো কাছে ভীতিপ্রদও হন না। মহর্ষি পতঞ্জলি এমন কথাও বলেছেন যে তাঁর কাছে থাকা হিংস্র প্রাণীদের মধ্যেও বৈরীভাব থাকে না।[১]

প্রশ্ন—'ক্ষান্তিঃ' কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর— ক্ষমাভাবকে বলা হয় 'ক্ষান্তি'। অপরাধ করলেও অপরাধকারীর প্রতি কোনো প্রকার দণ্ডপ্রদানের মনোভাব না রাখা, তার প্রতি প্রতিশোধ নেওয়া বা অপরাধের পরিবর্তে তার ইহলোক বা পরলোকে দণ্ডপ্রাপ্তি হোক—এরূপ ইচ্ছা না রাখা এবং তার অপরাধকে বস্তুতঃ অপরাধই মনে না করে তাকে সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়াকে বলে 'ক্ষমাভাব'। দশম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

প্রশ্ন—'আর্জবম্' কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর— কায়-মনো-বাক্যের সরলতাকে বলা হয় 'আর্জব'। যে সাধকের মধ্যে এই ভাব পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়, তিনি সকলের সঙ্গে সরল ব্যবহার করেন ; তাঁর মধ্যে কুটিলতার চিরতরে বিনাশ হয়। অর্থাৎ তাঁর ব্যবহারে মার-প্যাঁচ, কপটতা বা বাঁকাভাব একটুও থাকে না। তিনি ভিতরে-বাইরে সর্বদা সমান ও সরল থাকেন।

প্রশ্ন—'আচার্যোপাসনম্' কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—বিদ্যা ও সদুপদেশ প্রদানকারী গুরুকে বলা হয় 'আচার্য'। এরূপ গুরুর কাছে থেকে ভক্তি-শ্রদ্ধাপূর্বক কায়-মনো-বাক্যে সর্বপ্রকারে তাঁকে সুখী করার চেষ্টা করা, নমস্কার করা, তাঁর আদেশ পালন করা এবং তাঁর অনুকূল আচরণ করা ইত্যাদি হল 'আচার্যোপাসন' অর্থাৎ গুরু সেবা।

প্রশ্ন—'শৌচম্' পদের অর্থ কী ?

উত্তর—শুদ্ধিকে বলা হয় 'শৌচ'। সত্যতাপূর্বক শুদ্ধ ব্যবহারে অর্থ শুদ্ধি হয়, সেইভাবে উপার্জিত অর্থে প্রাপ্ত অন্নে আহার শুদ্ধি হয়। যথাযোগ্য শুদ্ধ ব্যবহারে আচরণাদির শুদ্ধি হয় এবং জল-মাটি ইত্যাদির দ্বারা প্রক্ষালন ক্রিয়ায় শরীরের শুদ্ধি হয়। এসব বাহ্যিক শুদ্ধি। রাগ-দ্বেষ এবং ছলনা-কপটতা ইত্যাদি বিকারের নাশ হয়ে অন্তঃকরণ স্বচ্ছ হওয়াকে বলে অন্তরের শুদ্ধি। উভয়

[১]'অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ।' (যোগদর্শন ২।৩৫)

প্রকার শুদ্ধিকেই বলা হয় 'শৌচ'।

প্রশ্ন— 'স্থৈর্য' কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—স্থিরভাবকে বলা হয় **'স্থৈর্য'**। অর্থাৎ অতি বড় বাধা-বিপত্তি, কষ্ট, ভয় বা দুঃখ এলেও বিচলিত না হওয়া এবং কাম-ক্রোধ-ভয়-লোভ ইত্যাদিতে কোনো ভাবেই নিজধর্ম বা কর্তব্য থেকে একটুও বিচ্যুত না হওয়া ; মন ও বুদ্ধিতে কোনোপ্রকার চঞ্চলতা না থাকাকেই বলা হয় 'স্থৈর্য'।

প্রশ্ন— 'আত্মবিনিগ্রহঃ' কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে 'আত্মা' পদটি অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদি সহ শরীরের বাচক। সুতরাং এই সবগুলি যথাযথভাবে নিজ-বশীভূত করাই হল **'আত্মবিনিগ্রহ'**। যে সাধকের মধ্যে আত্মবিনিগ্রহের ভাব পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় —তাঁর মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় তাঁর আজ্ঞাকারী অনুচর হয়ে ওঠে, সেগুলি আর তাঁকে বিষয়ে আবদ্ধ করতে পারে না, নিরন্তর সাধকের ইচ্ছানুসারে সাধনেই নিযুক্ত থাকে।

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৮

ইহলোক ও পরলোকের সর্বপ্রকার ভোগে আসক্তির অভাব, নিরহংকারিতা, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিরূপ দুঃখে বারংবার দোষ বিচার করা॥ ৮

প্রশ্ন— 'ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্' কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—ইহলোক ও পরলোকে যতপ্রকার রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শরূপ বিষয়ক পদার্থ আছে, অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা যা ভোগ করা হয় এবং অজ্ঞতাবশতঃ মানুষ যাকে সুখের হেতু মনে করে, কিন্তু যা প্রকৃতপক্ষে দুঃখের কারণ—সেইগুলিতে প্রীতির চিরতরে অভাব হওয়াকে বলে **'ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্'** অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ে বৈরাগ্য হওয়া।

প্রশ্ন— 'অনহংকার' কাকে বলা হয় ?

উত্তর—মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও শরীর—এই সবে যে **'অহং'** বুদ্ধি হয় অর্থাৎ অজ্ঞানতার জন্য এই অনাত্ম বস্তুগুলিতে যে আত্মবুদ্ধি হয়—সেই দেহাভিমানের সর্বতোভাবে অভাব হওয়াকেই **'অনহংকার'** বলা হয়।

প্রশ্ন— জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধিতে দুঃখ ও দোষকে বারংবার দেখা কী ?

উত্তর— জন্মের কষ্ট সহজ নয় ; প্রথমে অসহায় জীবকে দীর্ঘসময় মাতৃগর্ভে নানাপ্রকার কষ্ট পেতে হয়, তারপর প্রসবের সময় অসহ্য যন্ত্রণাভোগ করতে হয়। নানাপ্রকার গর্ভে বারংবার জন্মগ্রহণ করায় এই জন্ম-দুঃখ পেতে হয়। মৃত্যুকালেও মহাকষ্ট হয়। যে শরীর এবং গৃহে আজীবন মমতা থাকে, তাকেও জোর করে ছেড়ে যেতে হয়। মৃত্যুকালে হতাশার চিহ্ন এবং শারীরিক কষ্ট দেখে সেই সময়ের যন্ত্রণা অনেকটাই অনুমান করা যায়। বৃদ্ধাবস্থার যন্ত্রণাও কম নয়। ইন্দ্রিয়াদি শিথিল ও শক্তিহীন হয়ে যায়, শরীর জীর্ণ হয়ে ওঠে, মনে নিত্য লালসার তরঙ্গ উঠতে থাকে, অসহায় অবস্থা হয়ে যায়। এরূপ অবস্থায় যে কষ্ট হয়, তা অত্যন্ত ভয়ানক। এইরূপ অসুখের কষ্টও অত্যন্ত দুঃখদায়ক হয়। দেহ ক্ষীণ হয়ে যায়, নানাপ্রকার অসহ্য কষ্ট হতে থাকে, অন্যের অধীনে থাকতে হয়। নিরুপায় অবস্থা হয়। এগুলিই হল জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির দুঃখ। এই দুঃখগুলি বারংবার স্মরণ করা ও এর সম্বন্ধে বিচার করাই হল এগুলিতে দুঃখকে দেখা।

জীবসকল তাদের পাপের পরিণামস্বরূপ এই জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি প্রাপ্ত হয় ; সুতরাং এই চারটিই দোষযুক্ত। এ সম্বন্ধে বার বার বিচার করাই হল এতে দোষ দেখা।

এমনিতেই একমাত্র চেতন আত্মা ব্যতীত বস্তুতঃ জগতে এমন কোনো বস্তু নেই, যাতে এই চারটি দোষ নেই। জড় গৃহ একদিন তৈরি হয়, সেটি হল তার জন্ম ; কোথাও ভেঙে-চুরে গেলে, সেটি তার ব্যাধি ; মেরামত করানো হলে চিকিৎসা করা হয়, পুরানো হয়ে গেলে তখন বৃদ্ধাবস্থা এসে যায় ; তখন আর মেরামত করা সম্ভব নয়। তারপর যখন জীর্ণ হয়ে ভেঙে পড়ে, তখন তার মৃত্যু হয়। ছোট বড় সমস্ত জিনিসেরই একই অবস্থা। এইভাবে জগতের প্রত্যেক বস্তুরই জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুকে দেখে এগুলির প্রতি বৈরাগ্য হওয়া উচিত।

অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥ ৯

পুত্র, স্ত্রী, গৃহ, ধনাদিতে আসক্তির অভাব, মমত্বশূন্য এবং প্রিয় ও অপ্রিয় প্রাপ্তিতে সর্বদা চিত্তের সমভাব থাকা॥ ৯

প্রশ্ন—অষ্টম শ্লোকে ইন্দ্রিয়াদির আলোচনায় যে বৈরাগ্যের কথা বলা হয়েছে—পুত্র, স্ত্রী, গৃহ ও ধনাদিতে আসক্তির অভাব তো তারই অন্তর্গত ; তাহলে এখানে আবার সেই কথা বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, শরীর ও ধনাদিতে মানুষের বিশেষ সম্বন্ধ থাকায়, এগুলিতে মানুষের বিশেষ আসক্তি জন্মায়। ইন্দ্রিয়ের শব্দাদি সাধারণ বিষয়ে বৈরাগ্য হলেও এগুলিতে গুপ্তভাবে আসক্তি থেকে যায়, তাই এগুলিতে আসক্তির সর্বতোভাবে অভাব হওয়ার কথা বিশেষভাবে আলাদা করে বলেছেন।

প্রশ্ন—**'অনভিষ্বঙ্গ'** কথাটির অর্থ অহংকারের অভাব না মেনে মমতার অভাব মানা হয়েছে কেন ?

উত্তর—অহংকারের অভাবের কথা পূর্ব শ্লোকে **'অনহংকারঃ'** পদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, তাই এখানে 'অনভিষ্বঙ্গ' কথাটির অর্থ 'মমতার অভাব' করা হয়েছে। মমত্বের জন্যই মানুষের স্ত্রী, পুত্রাদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়। তারজন্য তিনি স্বয়ং তাদের সুখ-দুঃখে, লাভ-ক্ষতিতে সুখী বা দুঃখী হয়ে থাকেন। মমতার অভাব হলেই এরও অভাব হতে পারে, তাই এখানে এর অর্থ মমত্বের অভাবই উপযুক্ত বলে মনে হয়।

প্রশ্ন—ইষ্ট ও অনিষ্টের উপপত্তি কী ? এতে সমচিত্ততা কাকে বলে ?

উত্তর—অনুকূল ব্যক্তি, ক্রিয়া, ঘটনা এবং পদার্থের সংযোগ এবং প্রতিকূলতার বিয়োগ হল সকলের 'ইষ্ট'। তেমনই অনুকূলের বিয়োগ ও প্রতিকূলতার সংযোগ হল 'অনিষ্ট'। এই 'ইষ্ট' ও 'অনিষ্টে'র সঙ্গে সম্বন্ধ হলে হর্ষ-শোক না হওয়া অর্থাৎ অনুকূলের সংযোগ ও প্রতিকূলের বিয়োগে চিত্তে হর্ষ না হওয়া এবং প্রতিকূলের সংযোগ ও অনুকূলের বিয়োগে কোনোপ্রকার শোক, ভয় ও ক্রোধ না হওয়া—সর্বদাই নির্বিকার, একরস ও সম থাকা—একেই বলা হয় 'ইষ্ট ও অনিষ্টের উপপত্তিতে সমচিত্ততা।'

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি॥ ১০

আমাতে অনন্য যোগসহ অব্যভিচারিণী ভক্তি, নির্জনে ও পবিত্র স্থানে থাকার স্বভাব এবং বিষয়াসক্ত মানুষের সংসর্গ ত্যাগ॥ ১০

প্রশ্ন—'অনন্য যোগ' কী এবং তার দ্বারা ভগবানে 'অব্যভিচারিণী ভক্তি' করা কাকে বলে ?

উত্তর—ভগবানই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তিনিই আমার প্রভু, শরণগ্রহণ যোগ্য, পরমগতি, পরম আশ্রয়, মাতা-পিতা, ভাই-বন্ধু, পরম হিতাকাঙ্ক্ষী, পরম আত্মীয় এবং সর্বস্ব ; তিনি ব্যতীত আমার আর কেউ নেই—এইভাবে ভগবানের সঙ্গে যে অনন্য সম্বন্ধ, তাকেই বলা হয় 'অনন্যযোগ'। এইরূপ সম্বন্ধের দ্বারা কেবল ভগবানের প্রতি অটল ও বিশুদ্ধ প্রেম পোষণ করে নিরন্তর ভগবানেরই ভজন, ধ্যান করতে থাকাই হল অনন্য যোগের দ্বারা ভগবানে অব্যভিচারিণী ভক্তি করা।

এইরূপ ভক্তের মধ্যে স্বার্থ বা অভিমানের লেশ থাকে না এবং সংসারের কোনো বস্তুতে তাঁর মমত্ববোধও থাকে না। সংসারের সঙ্গে তাঁর ভগবানের সম্বন্ধেই সম্পর্ক থাকে, কারো সঙ্গে কোনোপ্রকার পৃথক সম্পর্ক থাকে না। তিনি সবই ভগবানের বলে মনে করেন এবং শ্রদ্ধা ও প্রেমসহ নিষ্কামভাবে নিরন্তর ভগবানেরই চিন্তা করে থাকেন। তাঁর সকল ক্রিয়া ভগবানের জন্যই হয়ে থাকে।

প্রশ্ন—কীরূপ স্থানকে 'বিবিক্তদেশ' বলে বুঝতে

হবে এবং সেখানে বসবাস করা কেমন ?

উত্তর—যেখানে কোনোপ্রকার শোর-গোল বা ভীড় নেই ; যেখানে অন্য কেউ থাকে না, যেখানে বাস করলে কারো কোনো আপত্তি বা ক্ষোভ থাকে না, যেখানে কোনোপ্রকার আবর্জনা নেই, বালি-কাঁকর নেই, যেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য সুন্দর, জল-বায়ু-আবহাওয়া নির্মল ও পবিত্র, কোনোপ্রকারের দৈহিক প্রতিকূলতা নেই, হিংস্র প্রাণী ও হিংসার অভাব এবং যে স্থানে স্বাভাবিকভাবে সাত্ত্বিকতার ভাব পূর্ণ থাকে—এরূপ দেবালয়, তপোভূমি, গঙ্গা প্রভৃতি পবিত্র নদীতীরে এবং পবিত্র বন, গিরি-গুহা ইত্যাদি নির্জন একান্ত ও শুদ্ধ দেশকে 'বিবিক্তদেশ' বলা হয় এবং জ্ঞান লাভ করার সাধনার জন্য এরূপ স্থানে বাস করা হল 'বিবিক্ত দেশ' সেবন করা।

প্রশ্ন—'জনসংসদি' কাকে বলে এবং তাতে অনুরক্ত না হওয়া কী ?

উত্তর—এখানে 'জনসংসদি' পদটি 'প্রমাদী' ও 'বিষয়াসক্ত' সাংসারিক মনুষ্য সমুদায়ের বাচক। এরূপ লোকের সঙ্গকে সাধনায় সর্বপ্রকারের প্রতিবন্ধক মনে করে তাদের থেকে পৃথক থাকাই হল তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত না হওয়া। সাধু-মহাত্মা ও সাধক পুরুষদের সঙ্গ তো সাধনের সহায়ক হয় ; সুতরাং তাঁদের সমুদায়ের বাচক রূপে এই 'জনসংসদি' পদটি ধরা উচিত নয়।

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥ ১১

অধ্যাত্মজ্ঞানে নিত্যস্থিতি, তত্ত্বজ্ঞানের অর্থরূপে একমাত্র পরমেশ্বরকে সর্বত্র দর্শন—এই সব হল জ্ঞান এবং এর বিপরীত যা, সেগুলি হল অজ্ঞান—এমনই বলা হয়॥ ১১

প্রশ্ন—'অধ্যাত্মজ্ঞান' কাকে বলে এবং তাতে নিত্য স্থিত থাকা কী ?

উত্তর—আত্মা নিত্য, চেতন, নির্বিকার ও অবিনাশী ; এর থেকে পৃথক যে বিনাশশীল জড়, বিকারী ও পরিবর্তনশীল বস্তু প্রতীত হয়—সেগুলি সব অনাত্মা, তার সঙ্গে আত্মার কোনো সম্বন্ধ নেই—শাস্ত্র ও আচার্যের উপদেশে এইভাবে আত্মতত্ত্বকে যথাযথভাবে বুঝে নেওয়াই হল 'অধ্যাত্মজ্ঞান' এবং বুদ্ধিতে এটি দৃঢ় নিশ্চয় করে মনে মনে সেই আত্মতত্ত্বের নিত্য-নিরন্তর মনন করতে থাকাই হল 'অধ্যাত্মজ্ঞানে নিত্য স্থিত থাকা'।

প্রশ্ন—তত্ত্বজ্ঞানের অর্থ কী এবং তাকে দর্শন করা কাকে বলে ?

উত্তর—তত্ত্বজ্ঞানের অর্থ হল—সচ্চিদানন্দঘন পূর্ণ ব্রহ্ম পরমাত্মা ; কারণ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তাঁর প্রাপ্তি হয়। সেই সচ্চিদানন্দঘন গুণাতীত পরমাত্মার সর্বত্র সমভাবে নিত্য-নিরন্তর ধ্যান করতে থাকাই হল দর্শন করার অর্থ।

প্রশ্ন—এই সব হল জ্ঞান—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'অমানিত্বম্' থেকে 'তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্' পর্যন্ত যার বর্ণনা করা হয়েছে, সে সবই জ্ঞানপ্রাপ্তির সাধন ; তাই তার নামও রাখা হয়েছে 'জ্ঞান'। এর অভিপ্রায় হল, অন্য শ্লোকে যেমন ভগবান বলেছেন যে, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান, আমার মতে সেটিই জ্ঞান—এই কথায় কেউ যেন এমন না মনে করেন যে শরীরের নাম 'ক্ষেত্র' এবং এর মধ্যে স্থিত জ্ঞাতা আত্মার নাম 'ক্ষেত্রজ্ঞ', আমি একথা বুঝে নিয়েছি ; ব্যস, আমার জ্ঞান লাভ হয়ে গেছে ; কিন্তু বাস্তবে প্রকৃত জ্ঞান হল সেটি যা উপরোক্ত কুড়িটি সাধনার দ্বারা ক্ষেত্র- ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ যথার্থভাবে জেনে নিলে হয়। সেই বিষয়টি বোঝাবার জন্য এখানে এই সাধনগুলিকে 'জ্ঞান' নামে বলা হয়েছে। সুতরাং জ্ঞানীর মধ্যে উপরোক্ত গুণাদির সমাবেশ প্রথম থেকেই হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এই সব গুণ সকল সাধকের মধ্যে একই সময়ে থাকা আবশ্যক নয়। অবশ্যই এর মধ্যে যে 'অমানিত্ব', 'অদম্ভিত্ব' ইত্যাদি সকলের উপযোগী নানাগুণ—তা তো সকলের মধ্যেই থাকে। এতদ্ব্যতীত, 'অব্যভিচারিণী ভক্তি', 'একান্তদেশসেবিত্ব', 'অধ্যাত্ম-জ্ঞাননিত্যত্ব', 'তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন' ইত্যাদি নিজ নিজ সাধন শৈলী অনুসারে থাকতে পারে।

প্রশ্ন—যা এর বিপরীত, তা অজ্ঞান — এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর— এর অভিপ্রায় হল, উপরোক্ত অমানিত্ব ইত্যাদি গুণের বিপরীত যে মান-মর্যাদার কামনা, দম্ভ, হিংসা, ক্রোধ, ছলনা-কপটতা, কুটিলতা, দ্রোহ, অপবিত্রতা, অস্থিরতা, লালসা, আসক্তি, অহংকার, মমতা, বিষমতা, অশ্রদ্ধা এবং কুসঙ্গ ইত্যাদি দোষ — এ সবই জন্ম-মৃত্যুর কারণ, অজ্ঞান বৃদ্ধিকারী এবং জীবের পতনের কারণ, তাই এগুলি সবই অজ্ঞান ; সুতরাং সেগুলি সর্বতোভাবে ত্যাগ করা উচিত।

সম্বন্ধ—এইভাবে জ্ঞানের সাধনগুলির 'জ্ঞান'-এর নামে বর্ণনা শোনার পর এই প্রশ্ন হতে পারে যে এই সাধনগুলির দ্বারা প্রাপ্ত 'জ্ঞান' দ্বারা আবার জ্ঞাতব্য বস্তু কী হতে পারে এবং তা জানলে কী হয় ? তার উত্তরে ভগবান এবার জ্ঞাতব্য বস্তুর স্বরূপ বর্ণনা করার প্রতিজ্ঞা করে, তা জানার ফল 'অমৃতত্ব প্রাপ্তি' বলে ছটি শ্লোকে সেই জ্ঞাতব্য পরমাত্মার স্বরূপ বর্ণনা করেছেন—

জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে।। ১২

যা জ্ঞাতব্য এবং যা জেনে মানুষ পরমানন্দ লাভ করে, তা সবিশেষে তোমাকে বলব। সেই অনাদি পরব্রহ্ম সৎ-ও নন, অসৎ-ও নন।। ১২

প্রশ্ন—ভগবান যার বর্ণনা করার প্রতিজ্ঞা করেছেন, সেই **'জ্ঞেয়ম্'** পদটি এখানে কীসের বাচক ?

উত্তর—এখানে **'জ্ঞেয়ম্'** পদটি হল সচ্চিদানন্দঘন নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের বাচক, কারণ এই প্রকরণে স্বয়ং ভগবানই তাকে নির্গুণ ও গুণাদির ভোক্তা বলেছেন।

প্রশ্ন—ঐ জ্ঞেয়কে জানলে যার প্রাপ্তি হয়, সেই 'অমৃত' কী ?

উত্তর—'অমৃত' পদটি এখানে পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মার বাচক। এই কথাটির অভিপ্রায় হল যে, জানার যোগ্য একমাত্র পরব্রহ্ম পরমাত্মার যথার্থ জ্ঞানে মানুষ চিরকালের জন্য জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়। একেই পরমগতি ও পরমপদ প্রাপ্তিও বলা হয়।

প্রশ্ন—**'অনাদিমৎ'** পদের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর— এই অধ্যায়ের ঊনিশতম শ্লোকে ভগবান প্রকৃতি ও জীবাত্মাকে অনাদি বলেছেন। এই দুটির প্রভু হওয়ায় পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমকে **'অনাদিমৎ'** অর্থাৎ অনাদিসম্পন্ন বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—**'পরম্'** বিশেষণের সঙ্গে **'ব্রহ্ম'** পদের অর্থ কী ?

উত্তর—এখানে **'পরম্'** বিশেষণের সঙ্গে **'ব্রহ্ম'** পদের প্রয়োগ করা হয়েছে ; সেই জ্ঞেয় তত্ত্বই নির্গুণ, নিরাকার, সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্ম পরমাত্মা, এইটি বলার উদ্দেশ্যে এখানে **'পরম্'** বিশেষণের সঙ্গে **'ব্রহ্ম'** পদের প্রয়োগ করা হয়েছে। **'ব্রহ্ম'** পদটি বেদ, ব্রহ্মা এবং প্রকৃতির বাচকও হতে পারে ; অতএব জ্ঞেয় তত্ত্বের স্বরূপ তা থেকে বিশিষ্ট, এটি বিশেষভাবে বুঝিয়ে বলার জন্য **'ব্রহ্ম'** পদের সঙ্গে **'পরম্'** বিশেষণ প্রযুক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন—সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে **'সৎ'** এবং **'অসৎ'** বলা যায় না কেন ?

উত্তর—প্রমাণ দ্বারা যে বস্তুকে সিদ্ধ করা যায়, তাকে বলা হয় **'সৎ'**। স্বতঃ প্রমাণ, নিত্য, অবিনাশী পরমাত্মাকে কোনো প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করা যায় না। কারণ পরমাত্মা দ্বারাই সব কিছুর সিদ্ধি হয়, কোনো প্রমাণই পরমাত্মার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। শ্রুতিতেও বলা হয়েছে যে 'সেই জ্ঞাতাকে কী করে জানা যায় ?' তা প্রমাণ দ্বারা জানার যোগ্য বস্তু থেকে অত্যন্ত বিশিষ্ট। তাই পরমাত্মাকে **'সৎ'** বলা যায় না। যে বস্তুর বাস্তবিক অস্তিত্ব থাকে না, তাকে বলা হয় **'অসৎ'**, কিন্তু পরব্রহ্ম পরমাত্মার যে অস্তিত্ব নেই, একথা বলা যায় না। তিনি অবশ্যই আছেন ; এবং তাঁর **'অস্তিত্ব'**-র দরুণ অন্য সব কিছুর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় ; সুতরাং তাঁকে **'অসৎ'** ও বলা যায় না। তাই পরমাত্মা 'সৎ' ও 'অসৎ'—উভয়েরই অতীত।

প্রশ্ন— নবম অধ্যায়ের ঊনিশতম শ্লোকে ভগবান

বলেছেন যে 'সৎ'ও আমি, 'অসৎ'ও আমি আর এখানে বলেছেন যে সেই জানার যোগ্য পরমাত্মাকে 'সৎ'ও বলা যায় না, 'অসৎ'ও না। সুতরাং এই বিরুদ্ধ বাক্যের সমাধান কী ?

উত্তর—প্রকৃতপক্ষে কোনো বিরোধই নেই ; কারণ পরমাত্মার স্বরূপের বর্ণনা যেখানে বিধিসম্মতভাবে করা হয়েছে, সেখানে বোঝানো হয়েছে যে, যা কিছু আছে—সবই ব্রহ্ম ; আর যেখানে নিষেধাত্মক বাক্যে বর্ণনা আছে—সেখানে এরূপ বলা হয়েছে যে তিনি 'এরূপও নয়, ঐরূপও নয়', কিন্তু আছেন অবশ্যই। তাই সেখানে বিধিসম্মত ভাবে বর্ণনা আছে এবং সেইজন্য ভগবানের একথা বলা যে 'সৎ'ও আমি, 'অসৎ'ও আমি, উচিত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মার স্বরূপ বাক্যের দ্বারা, বিধিসম্মত বা নিষেধাত্মক, কোনো ভাবেই বর্ণনীয় নয়। তাঁর বিষয়ে যা কিছু বলা যায়, তা শুধু শাখাচন্দ্র ন্যায় দ্বারা তাঁকে লক্ষ্য করাবার জন্যই, তাঁর সাক্ষাৎ স্বরূপের বর্ণনা বাক্যের দ্বারা করা সম্ভবই নয়। শ্রুতিও বলেছেন—'**যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ**' (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ২।৯) অর্থাৎ 'মন-সহ বাক্য যাকে না পেয়ে ফিরে আসে (সেটিই হল ব্রহ্ম)'। সেই কথাই স্পষ্ট করার জন্য ভগবান এখানে নিষেধাত্মক বাক্যে বলেছেন যে তাকে 'সৎ'ও বলা যায় না 'অসৎ'ও বলা যায় না ; অর্থাৎ যে জ্ঞেয়বস্তুর বর্ণনা করতে চাই, তার বাস্তবিক স্বরূপ তো মন ও বাক্যের অতীত, সুতরাং তার যা কিছু বর্ণনা করা হয়, সেটি তার সমীপবর্তী লক্ষণ বলে বুঝতে হবে।

সম্বন্ধ—এইভাবে জ্ঞেয় তত্ত্বের বর্ণনা করার প্রতিজ্ঞা করে, সেই তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হয়েছে ; কিন্তু সেই জ্ঞেয় তত্ত্ব অত্যন্ত গহন। তাই সাধকদের তার ধারণা করাবার জন্য সেই জ্ঞেয় তত্ত্বের সর্বব্যাপকত্ব লক্ষণাদির দ্বারা পুনরায় তার বিস্তারিত বর্ণনা করছেন—

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ১৩[১]

তাঁর সবদিকে হাত ও পা, সবদিকে চক্ষু, মস্তক, কান ও মুখ। কারণ তিনি সমগ্র জগৎকে ব্যাপ্ত করে বিরাজমান॥ ১৩

প্রশ্ন— তাঁর সবদিকে হাত ও পা, এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথার অভিপ্রায় হল, পরব্রহ্ম পরমাত্মা সর্বদিকে হস্তসম্পন্ন। তাকে যে কোনো বস্তু, যে দিক থেকেই সমর্পণ করা হোক, তিনি সেখান থেকেই সেই বস্তু গ্রহণ করতে সক্ষম। এইরূপ তাঁর পা-ও সর্বদিকে অবস্থিত। ভক্ত যে কোনো দিক থেকে তাঁর চরণে প্রণাম জানান ; তিনি সেখানেই তাঁর প্রণাম গ্রহণ করেন ; কারণ তিনি সর্বশক্তিমান হওয়ায় সর্বত্র তাঁর সর্ব ইন্দ্রিয় কার্যশীল থাকে। তাঁর হস্তেন্দ্রিয়ের গ্রহণ শক্তি এবং পাদেন্দ্রিয়ের চলন শক্তি সর্বত্র বিরাজিত।

প্রশ্ন— সর্ব দিকে চক্ষু, মস্তক, বদনবিশিষ্ট— এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথার দ্বারাও সেই জ্ঞেয় তত্ত্বের সর্বব্যাপকতা স্থাপন করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, তিনি সর্বত্র চক্ষুসম্পন্ন, এমন কোনো স্থান নেই, যা তিনি দেখতে পান না। তাই তাঁর কাছে কিছুই লুক্কায়িত থাকে না। তিনি সর্বত্র মস্তকবিশিষ্ট। যেখানেই তাঁর ভক্ত তাঁকে পূজা করার জন্য পুষ্পাদি তাঁর মাথায় দেয়, সেগুলি ঠিক তাঁর মাথাতেই পড়ে, এমন কোনো স্থান নেই যেখানে তাঁর মস্তক নেই। তিনি সর্বত্র বদনবিশিষ্ট। তাঁর ভক্ত যেখানেই তাঁকে খাদ্যবস্তু সমর্পণ করেন, তিনি সেখানেই সেই বস্তু গ্রহণ করেন। এমন কোনো স্থান নেই, যেখানে তাঁর মুখ নেই অর্থাৎ সেই জ্ঞেয়স্বরূপ পরমাত্মা সবকিছুর সাক্ষী, সব কিছু দর্শন করেন, এবং সকলের পূজা এবং ভোগ স্বীকার করায় শক্তিসম্পন্ন।

[১]এই শ্লোকটি একইভাবে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও আছে (৩।১৬)।

প্রশ্ন—তিনি সর্বত্র কর্ণবিশিষ্ট, এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর— এর দ্বারাও জ্ঞেয়স্বরূপ পরমাত্মার সর্বব্যাপকতারই বর্ণনা করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে এই পরমাত্মা সর্বত্র শ্রবণশক্তিসম্পন্ন। যেখানেই তাঁর ভক্ত তাঁর স্তুতিগান বা প্রার্থনা করেন অথবা কিছু কামনা করেন, সে সবই তিনি ভালোভাবে শুনতে পান।

প্রশ্ন—জগতে তিনি সব কিছু ব্যাপ্ত করে বিরাজিত, এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথার দ্বারাও সেই জ্ঞেয়তত্ত্বের সর্বব্যাপকত্বের সমগ্রতার প্রতিপাদন করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, আকাশ যেমন বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবীর কারণ হওয়ায় সেগুলি ব্যাপ্ত করে স্থিত—তেমনই সেই জ্ঞেয়-স্বরূপ পরমাত্মাও এই সমগ্র চরাচর জীবসমূহসহ সমগ্র জগতের কারণ হওয়ায় সব কিছু ব্যাপ্ত করে স্থিত ; সুতরাং সবকিছু তাঁর দ্বারাই পরিপূর্ণ।

সম্বন্ধ—জ্ঞেয়স্বরূপ পরমাত্মাকে সর্বদিকেই হস্ত-পদ ইত্যাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শক্তিসম্পন্ন বলার পর এবার তাঁর স্বরূপের অলৌকিকত্ব নিরূপণ করছেন—

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥ ১৪

তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ের জ্ঞাতা হয়েও প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ইন্দ্রিয়রহিত এবং অনাসক্ত হয়েও সকলের ধারণ-পোষণকারী, নির্গুণ হয়েও সকল গুণের ভোক্তা॥ ১৪

প্রশ্ন—এই পরমাত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ের জ্ঞাতা হয়েও প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ইন্দ্রিয়রহিত, এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথার অভিপ্রায় হল, সেই জ্ঞেয়স্বরূপ পরমাত্মার সগুণ রূপও অত্যন্ত অদ্ভুত ও অলৌকিক অর্থাৎ ত্রয়োদশ শ্লোকে তাঁকে সর্বত্র হস্ত-পদবিশিষ্ট এবং অন্য সব ইন্দ্রিয়সম্পন্ন বলা হয়েছে, কিন্তু তাতে একথা মনে করা উচিত নয় যে এই জ্ঞেয় পরমাত্মা অন্য জীবেদের মতো হাত-পা ইত্যাদি ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট। তিনি ঐরূপ ইন্দ্রিয়াদি সর্বতোভাবে রহিত হয়েও সর্বত্র ঐসব ইন্দ্রিয়াদির বিষয় গ্রহণ করতে সক্ষম। তাই তাঁকে সর্বত্র সর্বইন্দ্রিয়সম্পন্ন এবং সর্ব-ইন্দ্রিয়রহিত বলা হয়েছে। শ্রুতিতেও বলা হয়েছে—

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
(শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ৩।১৯)

অর্থাৎ 'এই পরমাত্মা হাত-পা ব্যতীতই বেগে চলা-ফেরা করেন এবং গ্রহণ করেন, চক্ষু ব্যতীত দেখেন এবং কর্ণ ছাড়াই শোনেন।' অতএব তাঁর স্বরূপ যে অলৌকিক, এই বর্ণনায় সে কথাই বোঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন—তিনি অনাসক্ত হয়েও সকলের ধারণ-পোষণকারী, এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর— এই কথার অভিপ্রায় হল, জগতে যেমন মাতা-পিতা ও অন্যান্য ব্যক্তিরা আসক্তির বশবর্তী হয়ে যেমন নিজের পরিবারের ধারণ-পোষণ করেন, এই পরব্রহ্ম পরমাত্মা সেইভাবে ধারণ-পোষণকারী নন। তিনি আসক্তিরহিত হয়েই সকলের ধারণ-পোষণ করেন। তাই ভগবানকে সর্বপ্রাণীর সুহৃদ অর্থাৎ বিনা কারণেই হিতকারী বলা হয়েছে (৫।২৯)। অভিপ্রায় হল যে, এই জ্ঞেয়স্বরূপ সর্বব্যাপী পরমাত্মা বাস্তবে আসক্তি দোষ থেকে সর্বতোভাবে রহিত হয়েও প্রকৃতির সম্বন্ধে সকলের ধারণ-পোষণকারী, এই হল তাঁর অলৌকিকত্ব।

প্রশ্ন— তিনি গুণাদির অতীত হয়েও গুণাদির ভোক্তা, এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারাও সেই পরমাত্মার অলৌকিকত্বই প্রতিপাদন করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, এই পরমাত্মা সর্বগুণের ভোক্তা হয়েও অন্য জীবের মতো প্রকৃতির গুণে লিপ্ত নন। তিনি বাস্তবে সর্বতোভাবে গুণাদির অতীত, তা সত্ত্বেও প্রকৃতির সম্বন্ধে সমস্ত গুণের ভোক্তা। এই হল তাঁর অলৌকিকত্ব।

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥ ১৫

তিনি চরাচর সর্বভূতের অন্তরে ও বাইরে এবং স্থাবর ও জঙ্গমেও বিরাজিত। অতি সূক্ষ্ম হওয়ায় তিনি অবিজ্ঞেয়, অতি সমীপেও তিনি এবং অতি দূরেও তিনি॥ ১৫ [১]

প্রশ্ন—সেই জ্ঞেয়স্বরূপ পরমাত্মা সর্ব ভূতপ্রাণীর বাইরে ভিতরে পরিপূর্ণ রয়েছেন কী করে ?

উত্তর— সমুদ্রে অবস্থিত বরফের ডেলাতে যেমন বাইরে ও ভিতরে সর্বত্র জলই ব্যাপ্ত থাকে, তেমনই সমস্ত চরাচরের ভূত প্রাণীর অন্তরে ও বাইরে সেই জ্ঞেয়স্বরূপ পরমাত্মাই পরিপূর্ণ রয়েছেন।

প্রশ্ন—চর এবং অচরও তিনি, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—প্রথমে বলা হয়েছে যে এই পরমাত্মা চরাচর প্রাণীদের অন্তরে ও বাইরে বিরাজিত ; এতে কেউ যেন মনে না করেন যে চরাচর প্রাণী তাঁর থেকে আলাদা। এটি স্পষ্ট করার জন্য বলেছেন যে চরাচর প্রাণীও তিনি। অর্থাৎ বরফের বাইরে ভেতরে যেমন জল থাকে এবং বরফ নিজেও প্রকৃতপক্ষে জল—জল ব্যতীত অন্য কোনো পদার্থ নেই, তেমনই এই সমগ্র চরাচর জগৎ সেই পরমাত্মারই স্বরূপ, তাঁর থেকে পৃথক কিছুই নেই।

প্রশ্ন —সূক্ষ্ম হওয়ায় তিনি অবিজ্ঞেয়, এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—সেই জ্ঞেয়কে সর্বরূপ বলায় প্রশ্ন হতে পারে যে, যদি সব কিছু তিনিই, তাহলে সকলে কেন তাঁকে জানে না ? এতে বলা হচ্ছে, সূর্যের কিরণে স্থিত পরমাণুরূপ জল যেমন সাধারণ মানুষের গোচরীভূত হয় না—তাদের পক্ষে এটি দুর্বিজ্ঞেয়, তেমনই সর্বব্যাপী পরব্রহ্ম পরমাত্মা সেই পরমাণুরূপ জলের থেকেও অত্যন্ত সূক্ষ্ম হওয়ায় সাধারণ মানুষ তাঁকে জানতে পারে না, তাইজন্য তিনি অবিজ্ঞেয়।

প্রশ্ন—তিনি অত্যন্ত নিকটে আবার অত্যন্ত দূরে অবস্থিত, এটি কী করে সম্ভব ?

উত্তর—সমগ্র জগতে এবং তার বাইরে এমন কোনো স্থান নেই যেখানে পরমাত্মা নেই। তাই তিনি অত্যন্ত নিকটেও আবার অত্যন্ত দূরেও ; কারণ মানুষ যাকে দূর ও নিকট মনে করে, সেই সব স্থানেই বিজ্ঞানানন্দঘন পরমাত্মা সর্বদা পরিপূর্ণ। তাই এই তত্ত্ব জানতে আগ্রহী শ্রদ্ধাযুক্ত মানুষের জন্য পরমাত্মা অত্যন্ত নিকটে আর অশ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য বহু দূর।

অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥ ১৬

এই পরমাত্মা আকাশসদৃশ অবিভক্তরূপে পরিপূর্ণ হয়েও চরাচর সমগ্র প্রাণীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্থিত বলে প্রতীত হন। সেই জ্ঞাতব্য পরমাত্মা বিষ্ণুরূপে সকল প্রাণীর ধারণ-পোষণকারী এবং রুদ্ররূপে সংহার কর্তা ও ব্রহ্মারূপে সকলের সৃষ্টিকর্তা॥ ১৬

প্রশ্ন —'অবিভক্ত হয়েও সর্ব প্রাণীতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্থিত'—বাক্যটির অর্থ কী ?

উত্তর—এই বাক্যের দ্বারা সেই জ্ঞেয় পরমাত্মার একত্ব প্রতিপাদন করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে মহাকাশ যেমন প্রকৃতপক্ষে বিভাগরহিত হয়েও বিভিন্ন ঘটের মাধ্যমে বিভক্তের ন্যায় প্রতীত হয় —তেমনই পরমাত্মা বাস্তবে

[১] শ্রুতিতেও বলা আছে—

'তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে। তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥' (ঈশোপনিষদ্ ৫)

অর্থাৎ তিনি গতিশীল আবার গতিহীন, তিনি দূরেও স্থিত আবার নিকটেও স্থিত। তিনি এই সমগ্র জগতের ভিতরেও স্থিত আবার এ-সবের বাহিরেও অবস্থিত।

বিভাগরহিত, তবুও সমস্ত চরাচর প্রাণীতে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে পৃথক-পৃথকভাবে স্থিত বলে প্রতীত হন। কিন্তু এই পার্থক্য কেবল প্রতীতিমাত্র— বাস্তবে পরমাত্মা এক এবং তিনি সর্বত্র পরিপূর্ণ।

প্রশ্ন— '**ভূতভর্তৃ**', '**গ্রসিষ্ণু**' এবং '**প্রভবিষ্ণু**'—এই পদগুলির অর্থ কী এবং এখানে এর প্রয়োগ করার কী অভিপ্রায় ?

উত্তর— সমস্ত প্রাণীর ধারণ-পোষণকারীকে বলা হয় '**ভূতভর্তৃ**' ; সমগ্র জগতের সংহারকারীকে বলা হয় '**গ্রসিষ্ণু**' এবং সকলের উৎপন্নকারীকে বলা হয় '**প্রভবিষ্ণু**'। এই তিনটি পদের প্রয়োগে এখানে এই ভাব পরিস্ফুট হয়েছে যে এই সর্বশক্তিমান জ্ঞেয়স্বরূপ পরমাত্মা সমস্ত চরাচর জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারকারী। তিনিই ব্রহ্মারূপে এই জগৎকে উৎপন্ন করেন, বিষ্ণুরূপে পালন করেন এবং রুদ্ররূপে তিনিই সকলের সংহার করেন। অর্থাৎ এই পরমাত্মাই হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব।

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্॥ ১৭

সেই পরব্রহ্ম জ্যোতিসমূহেরও জ্যোতি এবং মায়ার সম্পূর্ণ অতীত বলে কথিত। সেই পরমাত্মা বোধস্বরূপ, জানার বিষয়, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা লভ্য এবং সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে বিশেষভাবে অধিষ্ঠিত॥ ১৭

প্রশ্ন—সেই পরব্রহ্ম জ্যোতিসমূহেরও জ্যোতি কীভাবে ?

উত্তর—চন্দ্র, সূর্য, বিদ্যুৎ, নক্ষত্র ইত্যাদি সমস্ত বাহ্য জ্যোতি ; বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়াদি সর্বপ্রকার আধ্যাত্মিক জ্যোতি এবং বিভিন্ন লোকাদি এবং বস্তুসমূহের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতারূপ যে দেবজ্যোতিসমূহ—সেই সবেরই প্রকাশক সেই পরমাত্মা। এই সকলের যত প্রকাশক শক্তি, তাও সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মার এক অংশমাত্র। তাই তিনি সমস্ত জ্যোতিসমূহেরও জ্যোতি অর্থাৎ সকলকে প্রকাশ প্রদানকারী, সকলের প্রকাশক। অন্য কেউ তার প্রকাশক নয়।

শ্রুতিতেও বলা হয়েছে—

'**ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥**' (কঠোপনিষদ্ ২।২।১৫ ; শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৬।১৪) অর্থাৎ সেখানে সূর্য অথবা চন্দ্র অথবা নক্ষত্রগণ কেউই আলোকিত করে না। সেখানে বিদ্যুৎও আলো দেয় না, তবে অগ্নির আর কথাই কী। তিনি প্রকাশিত হলেই এই সব আলোকিত হয় এবং তাঁর প্রকাশেই সমস্ত জগৎ প্রকাশিত হয়। গীতায়ও পঞ্চদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে বলা হয়েছে যে 'যে তেজ সূর্যে স্থিত হয়ে সমস্ত জগৎকে প্রকাশিত করে এবং যে তেজ চন্দ্র ও অগ্নিতে স্থিত, সেই তেজকে তুমি আমার তেজ বলে জানবে।'

প্রশ্ন—এখানে '**তমঃ**' পদ কীসের বাচক এবং সেই পরমাত্মাকে তার 'অতীত' বলার অর্থ কী ?

উত্তর—'**তমঃ**' পদটি এখানে অন্ধকার এবং অজ্ঞানের বাচক আর সেই পরমাত্মা হলেন স্বয়ংজ্যোতি ও জ্ঞানস্বরূপ, অন্ধকার ও অজ্ঞান তাঁর কাছে ঘেঁষতে পারে না, তাই পরমাত্মাকে তমোর সম্পূর্ণ অতীত —এগুলির থেকে সর্বতোভাবে রহিত বলা হয়েছে।

প্রশ্ন —'**জ্ঞানম্**' পদ এখানে কীসের বাচক এবং এটি প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—এখানে '**জ্ঞানম্**' পদটি পরমাত্মার স্বরূপের বাচক। এটি প্রয়োগ করার অভিপ্রায় হল যে, সেই পরমাত্মা হলেন চেতন ও বোধস্বরূপ।

প্রশ্ন—তাঁকে এখানে পুনরায় '**জ্ঞেয়**' বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—তাঁকে পুনরায় '**জ্ঞেয়**' বলার অভিপ্রায় হল, যে জ্ঞেয়'র প্রকরণ দ্বাদশ শ্লোকে আরম্ভ করা হয়েছে সেই পরমাত্মার জ্ঞান অর্জন করাই হল এই জগতে মানুষের পরম কর্তব্য কারণ এই জগতে পরমাত্মাই একমাত্র জ্ঞাতব্য। অতএব তাঁর তত্ত্ব জানার জন্য সকলেরই পূর্ণভাবে চেষ্টা করা উচিত, নিজ অমূল্য জীবন জাগতিক ভোগে নষ্ট করা উচিত নয়।

প্রশ্ন—তাঁকে '**জ্ঞানগম্যম্**' বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'জ্ঞেয়ম্' পদে তাঁকে জানা আবশ্যক বলা হয়েছে। এতে প্রশ্ন হতে পারে যে তাঁকে কেমন করে জানা উচিত। তাই বলেছেন যে তিনি জ্ঞানগম্য অর্থাৎ পূর্বোক্ত অমানিত্বাদি জ্ঞানসাধনার দ্বারা প্রাপ্ত তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে তাঁকে জানা যায়। অতএব সেইসকল সাধনা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে সেই পরমাত্মাকে জানা উচিত।

প্রশ্ন—পূর্ব শ্লোকে বলা হয়েছে সেই পরমাত্মা সর্বত্র ব্যাপ্ত, তাহলে এখানে 'হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্' — এই কথার দ্বারা কেবল সকলের হৃদয়ে অবস্থিত বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর — পরমাত্মা সর্বত্র সমানভাবে পরিপূর্ণ বিরাজিত হলেও, হৃদয়ে তাঁর বিশেষ অভিব্যক্তি। সূর্যের আলো যেমন সব জায়গায় সমানরূপে বিস্তৃত থাকলেও দর্পণ ইত্যাদিতে তার প্রতিবিম্বের বিশেষ অভিব্যক্তি হয় এবং সূর্যমুখী আতস কাঁচে তার তেজ প্রত্যক্ষ প্রকট হয়ে অগ্নি উৎপন্ন করে, অন্য পদার্থে সেইরূপ অভিব্যক্তি হয় না, তেমনই হৃদয় হল পরমাত্মার উপলব্ধির স্থান। জ্ঞানীর হৃদয়ে তো তিনি প্রত্যক্ষভাবে প্রকটিত। এই বিষয়টি বোঝাবার জন্যই তিনি সবার হৃদয়ে বিশেষরূপে স্থিত বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ—এইরূপ ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয়'র স্বরূপ সংক্ষেপে বর্ণনা করে এইবার এই প্রকরণকে জানার ফল জানাচ্ছেন—

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥ ১৮

এইভাবে ক্ষেত্র ও জ্ঞান এবং জ্ঞেয় পরমাত্মার স্বরূপ সংক্ষেপে বলা হয়েছে। আমার ভক্ত এই তত্ত্ব জেনে আমার স্বরূপ লাভ করেন॥ ১৮

প্রশ্ন—ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয়'র স্বরূপ এপর্যন্ত কোন্-কোন্ শ্লোকে বলা হয়েছে ?

উত্তর—পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে বিকার-সহ ক্ষেত্রের স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। সপ্তম থেকে একাদশ শ্লোক পর্যন্ত জ্ঞানের নামে জ্ঞানের কুড়িটি সাধন এবং দ্বাদশ থেকে সপ্তদশ শ্লোক পর্যন্ত জ্ঞেয় অর্থাৎ জানার যোগ্য পরমাত্মার স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন—'মদ্ভক্তঃ' পদটি প্রয়োগের অভিপ্রায় কী এবং ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয়কে জানা কী, ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হওয়া মানে কী ?

উত্তর—'মদ্ভক্তঃ' পদটি এখানে ভগবানের ভজন, ধ্যান, নির্দেশপালন এবং পূজা ও সেবা ইত্যাদি ভক্তিসম্পন্ন ভগবদ্ভক্তের বাচক। এটির প্রয়োগে ভগবানের অভিপ্রায় হল, আমার শরণ গ্রহণ করে এই জ্ঞানমার্গ অনুসরণকারী সাধক সহজেই পরমপদ লাভ করতে সক্ষম হয়।

এখানে ক্ষেত্রকে প্রকৃতির একটি বিকাররূপ কার্য, জড়, বিকারগ্রস্ত, অনিত্য ও বিনাশশীল বলে জানা, জ্ঞানের সাধনসমূহ যথাযথভাবে পালন করা এবং তার দ্বারা ভগবানের নির্গুণ ও সগুণরূপ ভালো করে ধারণা করা —এই হল ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয়কে জানা। সেই জ্ঞেয়স্বরূপ পরমাত্মাকে লাভ করাই হল ভগবদ্ভাবকে প্রাপ্ত হওয়া।

সম্বন্ধ—তৃতীয় শ্লোকে ভগবান সংক্ষেপে ক্ষেত্রের বিষয়ে চারটি কথা ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয়ে দুটি কথা অর্জুনকে শুনতে বলেছিলেন, পরে প্রসঙ্গ আরম্ভ করেই ক্ষেত্রের স্বরূপ এবং তার বিকারসমূহের বর্ণনা করে শেষে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব ভালোভাবে জানার জন্য তার সাধনা ও প্রসঙ্গতঃ বিজ্ঞেয় পরমাত্মার স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। এর দ্বারা ক্ষেত্রের বিষয়ে তার স্বভাবের এবং কী কারণে কোন্ কার্য উৎপন্ন হয়, সেই বিষয়ের ও প্রভাবসহ ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপেরও বর্ণনা করা হয়নি। সুতরাং এবার সেইসবের বর্ণনা করার জন্য ভগবান পুনরায় প্রকৃতি ও পুরুষ নামে প্রকরণ আরম্ভ করছেন। এতে প্রথমে প্রকৃতি-পুরুষের অনাদিত্বের প্রতিপাদন করে সমস্ত গুণ ও বিকারগুলি

প্রকৃতিজনিত বলে জানিয়েছেন—

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥ ১৯

প্রকৃতি এবং পুরুষ—উভয়কেই তুমি অনাদি বলে জানবে এবং রাগ-দ্বেষাদি বিকারসমূহ ও ত্রিগুণাত্মক সমস্ত পদার্থ প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন বলে জানবে॥ ১৯

প্রশ্ন—এই শ্লোকে 'প্রকৃতি' শব্দ কীসের বাচক এবং সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে যাকে 'অপরাপ্রকৃতি' নামে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এই অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে যাকে ক্ষেত্রের স্বরূপ বলা হয়েছে, তাতে এবং এই প্রকৃতিতে কী পার্থক্য ?

উত্তর—এখানে 'প্রকৃতি' শব্দ ঈশ্বরের অনাদিসিদ্ধ মূল প্রকৃতির বাচক। চতুর্দশ অধ্যায়ে একেই 'মহদ্ব্রহ্ম' নামে বলা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে অপরা প্রকৃতি নামে এবং এই অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে 'ক্ষেত্র' নামেও এরই বর্ণনা আছে। এদের মধ্যে পার্থক্য হল যে, সেখানে প্রকৃতির কার্য—মন, বুদ্ধি, অহংকার এবং পঞ্চমহাভূতাদিসহ মূল প্রকৃতির বর্ণনা আছে আর এখানে আছে শুধুই 'মূল প্রকৃতি'র বর্ণনা।

প্রশ্ন—'প্রকৃতি' ও 'পুরুষ'—এই দুটিকে অনাদি বলে জানার এবং 'চ' এবং 'এব'—এই দুটি পদ এখানে প্রয়োগ করার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—প্রকৃতি এবং পুরুষ—এই দুটির অনাদিত্ব সমান, এই বিষয়টি লক্ষ্য করানোর জন্য অর্থাৎ উভয়ের ঐক্য প্রতিপাদন করার জন্য 'চ' এবং 'এব'—এই দুটি পদ প্রয়োগ করা হয়েছে। উভয়কে অনাদি জানবে—এই কথা বলার অভিপ্রায় হল যে, জীবের জীবত্ব অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্বন্ধ কোনো হেতুযুক্ত অর্থাৎ আগন্তুক নয়, এটি অনাদি সিদ্ধ এবং একই ভাবে ঈশ্বরের শক্তি এই প্রকৃতিও অনাদিসিদ্ধ—এরূপ বোঝা উচিত।

প্রশ্ন—এখানে **'বিকারান্'** এবং **'গুণান্'** পদ কীসের বাচক ? এই দুটি প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন বলে জানার জন্য বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে ইচ্ছা-দ্বেষ, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি যে বিকারগুলির বর্ণনা করা হয়েছে—সেই সবের বাচক এখানে **'বিকারান্'** পদটি এবং সত্ত্ব, রজ, তম—এই তিনটি গুণ এবং এর থেকে উৎপন্ন সমস্ত জড় পদার্থের বাচক হল **'গুণান্'** পদটি। এই দুটিকে প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন বলে জানার জন্য বলে ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, সত্ত্ব, রজ, তম—এই তিন গুণের নাম প্রকৃতি নয় ; প্রকৃতি অনাদি। তিন গুণ সৃষ্টির আদিতে তার থেকে উৎপন্ন হয় (ভাগবত ২।৫।২২ এবং ১১।২৪।৫)। এই বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য ভগবান চতুর্দশ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই রূপ তিনটি গুণের নাম চিহ্নিত করে তিনটিকে প্রকৃতি হতে উৎপন্ন বলেছেন। এছাড়া তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের চল্লিশতম শ্লোকে ও এই অধ্যায়ের একুশতম শ্লোকেও গুণাদিকে প্রকৃতিজনিত বলেছেন। তৃতীয় অধ্যায়ের সাতাশতম এবং উনত্রিশতম শ্লোকেও প্রকৃতির কার্যরূপেই গুণাদির বর্ণনা করা হয়েছে। তাই সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই তিন গুণই তাদের কার্যসহ প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন বলে জানা উচিত এবং এইভাবে সমস্ত বিকারও প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন বলে বুঝতে হবে।

সম্বন্ধ—তৃতীয় শ্লোকে, কীসের থেকে কী উৎপন্ন হয়েছে, সে কথা জানাবার কথা বলা হয়েছিল, পূর্ব শ্লোকের উত্তরার্ধে তার কিয়দংশ বর্ণনা করা হয়েছে। এবার তারই কিছু অংশ এই শ্লোকের পূর্বার্ধে বলে, পরে এর উত্তরার্ধে এবং একুশতম শ্লোকে প্রকৃতিতে স্থিত পুরুষের স্বরূপ বর্ণনা করা হচ্ছে—

কার্যকরণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥ ২০

কার্য এবং করণকে উৎপন্ন করার হেতু প্রকৃতিকে বলা হয় এবং জীবাত্মাকে সুখ-দুঃখের ভোগে অর্থাৎ ভোক্তৃত্বের হেতু বলা হয়॥ ২০

প্রশ্ন—'কার্য' এবং 'করণ' শব্দ কোন্ কোন্ তত্ত্বের বাচক এবং তাদের কর্তৃত্বে প্রকৃতিকে হেতু বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং পৃথিবী—এই পাঁচটি সূক্ষ্ম মহাভূত ; শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ এবং স্পর্শ—এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়াদির বিষয় ; এই দশটির বাচক হল এখানে 'কার্য' শব্দ। বুদ্ধি, অহংকার এবং মন—এই তিনটি অন্তঃকরণ ; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি, পাদ, উপস্থ, এবং পায়ু—এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় ; এই তেরোটির বাচক হল এই 'করণ' শব্দ। এই তেইশটি তত্ত্ব প্রকৃতি থেকেই উৎপন্ন হয়, প্রকৃতিই এর উপাদান কারণ ; তাই প্রকৃতিকেই এর উৎপত্তির কারণ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এই তেইশটিতে একটি অপর থেকে কীভাবে উৎপন্ন বলে মানা হয় ?

উত্তর—প্রকৃতি থেকে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব থেকে অহংকার, অহংকার থেকে পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূত, মন এবং দশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূত থেকে পাঁচ ইন্দ্রিয়ের শব্দাদি পঞ্চ স্থূল বিষয়ের উৎপত্তি মানা হয়।

সাংখ্যকারিকাতেও বলা হয়েছে—

প্রকৃতের্মহাংস্ততোঽহঙ্কারস্তস্মাদ্‌গণশ্চ ষোড়শকঃ।
তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চ ভূতানি॥

(সাংখ্যকারিকা ২২)

অর্থাৎ 'প্রকৃতি থেকে মহত্তত্ত্ব (সমষ্টি-বুদ্ধি) অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্বের, তার থেকে অহংকারের এবং অহংকার থেকে পঞ্চ তন্মাত্র, এক মন ও দশ ইন্দ্রিয়—এই ষোলোটির উৎপত্তি হয় এবং এই ষোলোটির মধ্যে পঞ্চ তন্মাত্র থেকে পাঁচ স্থূল ভূতাদির উৎপত্তি হয়।' গীতার বর্ণনায় পঞ্চ তন্মাত্রর স্থানে পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূতের নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং পঞ্চ স্থূল ভূতের স্থানে পাঁচ ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ের কথা বলা হয়েছে, এটুকুই পার্থক্য।

প্রশ্ন—কোথাও কোথাও 'কার্যকরণে'র স্থানে 'কার্যকারণ' পাঠও দেখা যায়। সেটি মেনে নিলে 'কার্য' এবং 'কারণ' শব্দগুলি কোন্ কোন্ তত্ত্বের বাচক বলে মানা উচিত ?

উত্তর—'কার্য' ও 'কারণ' পাঠ মেনে নিলে পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়, এক মন এবং পাঁচ ইন্দ্রিয়ের বিষয়—এই ষোলোটির বাচক 'কার্য' শব্দ বলে বোঝা উচিত। কারণ এগুলি সব অন্যের কার্য, কিন্তু স্বয়ং কারো কারণ নয়। বুদ্ধি, অহংকার ও পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূতাদির বাচক রূপে 'কারণ' শব্দকে জানা প্রয়োজন। কারণ বুদ্ধি হল অহংকারের কারণ ; অহংকার মন, ইন্দ্রিয় ও সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূতাদির কারণ এবং সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূত হল পঞ্চ ইন্দ্রিয়াদির বিষয়সমূহের কারণ।

প্রশ্ন—বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত ও মন—অন্তঃকরণের এরূপ চারটি ভাগ অন্যান্য শাস্ত্রে মানা হয়েছে ; তাহলে ভগবান কী করে এখানে শুধু তিনটির বর্ণনা করেছেন ?

উত্তর—ভগবান চিত্ত ও মনকে ভিন্ন তত্ত্ব বলে মনে করেন না, একই তত্ত্বের দুটি নাম বলে মনে করেন। সাংখ্য এবং যোগশাস্ত্রও এরূপ মানেন। তাইজন্য অন্তঃকরণের চারটি ভাগ না করে তিনটি ভাগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—'পুরুষ' শব্দ চেতন আত্মার বাচক এবং আত্মাকে নির্লিপ্ত ও শুদ্ধ মানা হয়েছে ; তাহলে এখানে পুরুষকে সুখদুঃখাদির ভোক্তৃত্বের হেতু বলা হয়েছে কেন ?

উত্তর—প্রকৃতি জড়, তাতে ভোক্তৃত্বের সম্ভাবনা নেই এবং পুরুষ আসক্তিহীন, তাই তার মধ্যেও প্রকৃতপক্ষে ভোক্তৃত্ব নেই। প্রকৃতির সঙ্গ দ্বারাই পুরুষে ভোক্তৃত্ব প্রতীত হয় এবং এই প্রকৃতি-পুরুষের সঙ্গ অনাদি, তাই এখানে পুরুষকে সুখ-দুঃখাদির ভোক্তৃত্বের হেতু অর্থাৎ নিমিত্ত মানা হয়েছে। এই কথা স্পষ্ট করার

জন্য পরবর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে যে 'প্রকৃতিতে স্থিত পুরুষই প্রকৃতিজনিত গুণাদি ভোগ করে'। অতএব প্রকৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত পুরুষে ভোক্তৃত্বের লেশমাত্রও থাকে না।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু।। ২১

প্রকৃতিতে স্থিত হয়েই পুরুষ প্রকৃতিজাত ত্রিগুণাত্মক পদার্থ ভোগ করে এবং এই গুণাদির সঙ্গের জন্যই এই জীবাত্মাকে সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হয়।। ২১

প্রশ্ন—এখানে **'প্রকৃতিজান্'** বিশেষণের সঙ্গে **'গুণান্'** পদ কীসের বাচক এবং **'পুরুষঃ'**-এর সঙ্গে **'প্রকৃতিস্থঃ'** বিশেষণ প্রয়োগ করে তাকে ঐ গুণাদির ভোক্তা বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—প্রকৃতিজনিত সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই তিনটি গুণ এবং তার কার্য—রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ এবং গন্ধরূপ যত সাংসারিক পদার্থ ; এখানে **'প্রকৃতিজান্'** বিশেষণের সঙ্গে **'গুণান্'** পদটি তারই বাচক। **'পুরুষঃ'**-এর সঙ্গে **'প্রকৃতিস্থঃ'** বিশেষণ দিয়ে তাকে ঐ গুণাদির ভোক্তা বলার অভিপ্রায় হল যে, প্রকৃতিজাত স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—এই তিনটি শরীরের মধ্যে কোনো একটি শরীরের সঙ্গে যতক্ষণ এই জীবাত্মার সম্বন্ধ থাকে, ততক্ষণই সে প্রকৃতিতে স্থিত (প্রকৃতিস্থ) বলা হয়, সুতরাং আত্মার যতক্ষণ প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে, ততক্ষণ সে প্রকৃতিজনিত গুণের ভোক্তা। প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ দূর হলে তার আর ভোক্তৃত্ব থাকে না। কারণ বাস্তবে পুরুষের স্বরূপই নিত্য অসঙ্গ।

প্রশ্ন—**'সদসদ্‌যোনি'** শব্দ কোন্ যোনিতে জন্মলাভের বাচক এবং গুণাদির সঙ্গ কী ? এবং সেই সঙ্গ এই জীবাত্মার সদসদ্‌যোনিতে জন্ম নেওয়ার কারণ কীরূপে হয় ?

উত্তর—**'সদসদ্‌যোনি'** শব্দ এখানে ভালো-মন্দ বিভিন্ন যোনিতে জন্মলাভের বাচক। অভিপ্রায় হল যে মানুষ থেকে শুরু করে তার থেকে উচ্চ যত দেবাদি যোনি আছে, সব হল সৎ যোনি এবং মানুষের থেকে নীচে যত যোনি যথা পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি আছে, এগুলি সব অসৎ যোনি। সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই তিনগুণের সঙ্গে জীবের যে অনাদিসিদ্ধ সম্বন্ধ এবং তার কার্যরূপ সাংসারিক পদার্থে যে আসক্তি, সেগুলিই হল গুণাদির সঙ্গ ; যে মানুষের যে গুণে বা তার কার্যরূপ পদার্থে আসক্তি হয়, তার বাসনাও তেমনই হয় এবং সেই বাসনা অনুসারে তার পুনর্জন্ম প্রাপ্তি হয়। তাই এখানে ভালো-মন্দ যোনিতে জন্মলাভে গুণাদির আসক্তিকেই কারণ বলেছেন।

প্রশ্ন—চতুর্থ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে গুণ ও কর্মানুসারে তিনি চারবর্ণের সৃষ্টি করেছেন, অষ্টম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে বলেছেন যে অন্তকালে মানুষ যেমন যেমন ভাব স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, সেটিই পরের জন্মে লাভ করেন ; আর এখানে বলেছেন যে ভালো-মন্দ যোনিতে জন্মগ্রহণের কারণ হল গুণাদির সঙ্গ। এই তিনটির সমন্বয় কীভাবে করা যায় ?

উত্তর—তিনটির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে অসামঞ্জস্যের কোনো ব্যাপার নেই। বিচার করে দেখলে তিনটির মধ্যেই প্রকারান্তরে গুণাদির সঙ্গকে ভালো-মন্দ যোনিতে জন্ম প্রাপ্তির হেতু বলা হয়েছে। (১)—ভগবান চারবর্ণের সৃষ্টি করেন তাদের গুণ ও কর্মানুসারেই। এতে ঐ জীবেদের গুণাদির সঙ্গ স্বাভাবিক ভাবেই হেতু হয়ে থাকে। (২) মানুষ যেমন কর্ম ও সঙ্গ করে, সেই অনুসারে তিনটি গুণের মধ্যে কোনো একটিতে তার বিশেষ আসক্তি জন্মায় এবং সেই কর্মের সংস্কার তৈরি হয় এবং যেমন সংস্কার হয়, তেমনই মৃত্যুকালে স্মৃতি হয় ও সেই স্মৃতি অনুসারেই তার ভালো-মন্দ যোনিতে জন্ম হয়। অতএব এতেও মূলে গুণাদির সঙ্গই হেতু। (৩) এই শ্লোকে তো স্পষ্টই গুণাদির সঙ্গকে কারণ বলা হয়েছে। অতএব তিনটিতেই একই কথা বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ—এইভাবে প্রকৃতিস্থ পুরুষের স্বরূপ বর্ণনা করার পর এবার জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব জানিয়ে আত্মার গুণাতীত স্বরূপের বর্ণনা করছেন।

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ।। ২২

এই দেহে অবস্থিত যে আত্মা তিনিই প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মা। তিনি সাক্ষী হওয়ায় উপদ্রষ্টা, যথার্থ সম্মতি দেওয়ায় অনুমন্তা, সকলের ধারণ-পোষণকারী হওয়ায় ভর্তা, জীবরূপে ভোক্তা, ব্রহ্মাদি সকলের স্বামী হওয়ায় মহেশ্বর এবং শুদ্ধ সচ্চিদানন্দঘন হওয়ায় পরমাত্মা বলে কথিত হন।। ২২

প্রশ্ন—এই দেহে স্থিত আত্মা প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মাই, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথায় ক্ষেত্রজ্ঞের গুণাতীত স্বরূপ নির্দেশ করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, প্রকৃতিজনিত শরীরের উপাধি দ্বারা যে চেতন আত্মা অজ্ঞতাবশতঃ জীব ভাব প্রাপ্ত বলে প্রতীত হয়, সেই ক্ষেত্রজ্ঞ প্রকৃতপক্ষে এই প্রকৃতি থেকে সর্বতোভাবে অতীত পরমাত্মাই ; কারণ সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মাতে এবং ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে বস্তুতঃ কোনোপ্রকার পার্থক্য নেই, শুধুমাত্র শরীররূপ উপাধির দরুণ ভেদ আছে বলে প্রতীয়মান হয়।

প্রশ্ন—এই আত্মাকেই উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর এবং পরমাত্মাও বলা হয়—এই বক্তব্যের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই বক্তব্যের দ্বারা প্রতিপাদন করা হয়েছে যে ভিন্ন-ভিন্ন নিমিত্ত দ্বারা এক পরব্রহ্ম পরমাত্মাকেই ভিন্ন-ভিন্ন নামে সম্বোধন করা হয়। বাস্তবিক ব্রহ্মে কোনো প্রকার ভেদ নেই। অভিপ্রায় হল যে, সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্মই অন্তর্যামীরূপে সকলের শুভাশুভ কর্ম নিরীক্ষণ করেন, তাই তাঁকে বলা হয় 'উপদ্রষ্টা'। তিনিই অন্তর্যামীরূপে সম্মতি প্রার্থনাকারীদের উচিত অনুমতি প্রদান করেন, তাই তাঁকে বলা হয় 'অনুমন্তা'। তিনি আবার বিষ্ণুরূপে সমস্ত জগতের রক্ষণ ও পালন করেন, তাই তাঁকে 'ভর্তা' বলা হয়। তিনিই দেবতাদের রূপে সমস্ত যজ্ঞের হবি এবং সমস্ত প্রাণীর রূপে সমস্ত ভোগ্য গ্রহণ করেন, তাই তাঁকে বলা হয় 'ভোক্তা' ; তিনিই সমস্ত লোকপাল ও দেবতা এমনকি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মারও নিয়ন্ত্রণকারী মহান ঈশ্বর, তাই তাঁকে 'মহেশ্বর' বলা হয় এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি সর্বদাই সর্বতোভাবে সর্বগুণের অতীত, তাই তাঁকে 'পরমাত্মা' বলা হয়। এইরূপ এক পরব্রহ্ম 'পরমাত্মা'ই ভিন্ন ভিন্ন নিমিত্তের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হন, বস্তুতঃ তাঁর মধ্যে কোনো প্রকার ভেদ নেই।

সম্বন্ধ—এইভাবে গুণাদিসহ প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ বর্ণনা করার পর এবার তাঁদের যথাযথ জানার ফল জানাচ্ছেন—

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে।। ২৩

এই ভাবে পুরুষকে এবং গুণসহ প্রকৃতিকে যিনি তত্ত্বতঃ জানেন, তিনি সর্বপ্রকার কর্তব্য-কর্ম করলেও পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না ।। ২৩

প্রশ্ন—পূর্বোক্ত প্রকারে পুরুষকে ও গুণাদিসহ প্রকৃতিকে তত্ত্বতঃ জানা কী ?

উত্তর— এই অধ্যায়ে যেভাবে পুরুষের স্বরূপ ও প্রভাবের বর্ণনা করা হয়েছে, সেই অনুসারে তাঁকে ভালোভাবে জেনে নেওয়া অর্থাৎ যতপ্রকার পৃথক পৃথক ক্ষেত্রজ্ঞ প্রতীত হয় বাস্তবিক সব সেই এক পরব্রহ্ম পরমাত্মারই অভিন্ন স্বরূপ হলেও প্রকৃতির সাহচর্যে তা ভিন্নরূপে প্রতীত হয়। বস্তুতঃ কোনো ভেদ নেই এইটি

জানা এবং সেই পরমাত্মা নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত এবং অবিনাশী ও প্রকৃতি হতে সর্বথা অতীত —এই কথা সংশয়রহিত হয়ে ঠিকভাবে অনুধাবন করা এবং একাত্ম ভাবের দ্বারা সেই সচ্চিদানন্দঘনতে নিত্য স্থিত হওয়াই হল 'পুরুষকে তত্ত্বতঃ জানা'। তিনটি গুণ প্রকৃতি হতেই উৎপন্ন হয়, এই সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতিরই বিষয় এবং তা বিনাশশীল, জড়, ক্ষণভঙ্গুর ও অনিত্য— এই রহস্য অনুধাবন করাই হল 'গুণাদি-সহ প্রকৃতিকে তত্ত্বতঃ জানা'।

প্রশ্ন—'**সর্বথা বর্তমানঃ**'-এর সঙ্গে '**অপি**' পদ প্রয়োগ করার কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—এখানে '**সর্বথা বর্তমানঃ**'-এর সঙ্গে '**অপি**' পদ প্রয়োগ করার এই অভিপ্রায় যে, উপরোক্ত প্রকারে পুরুষকে এবং গুণাদিসহ প্রকৃতিকে যিনি জানেন—তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—যে কোনো বর্ণের হলেও এবং ব্রহ্মচর্যাদি যে কোনো আশ্রমে থাকলেও এবং বর্ণাশ্রম অনুসারে শাস্ত্রের বিধানোক্ত সমস্ত কর্ম যথাযোগ্য ভাবে পালন করলেও বাস্তবে তিনি কিছুই করেন না, তাই তিনি পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না।

প্রশ্ন—এখানে '**সর্বথা বর্তমানঃ**'-এর সঙ্গে '**অপি**' পদ প্রয়োগের দ্বারা একথা যদি মেনে নেওয়া যায় যে, তিনি নিষিদ্ধ কর্ম করলেও পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না, তাহলে ক্ষতি কী ?

উত্তর—আত্মতত্ত্ব বিষয়ে অবগত জ্ঞানীর কাম-ক্রোধাদি দোষের সর্বতোভাবে অভাব হয়ে যাওয়ায় (৫।২৬) তাঁর দ্বারা নিষিদ্ধ কর্ম করা সম্ভবই নয়। তাই জগতে তাঁর আচরণ প্রমাণ স্বরূপ বলে মানা হয় (৩।২১)। সুতরাং এখানে '**সর্বথা বর্তমানঃ**'-এর সঙ্গে '**অপি**' পদ প্রয়োগের এরূপ অর্থ মানা উচিত নয়, কারণ কাম-ক্রোধ ইত্যাদি দোষের জন্যই মানুষের পাপে প্রবৃত্তি হয় ; অর্জুনের জিজ্ঞাসায় ভগবান তৃতীয় অধ্যায়ের সাঁইত্রিশতম শ্লোকে এই কথা স্পষ্টভাবে বলেছেন।

প্রশ্ন—এইরূপ প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত ব্যক্তি কেন পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না ?

উত্তর— প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব জেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষের প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় ; কারণ প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ স্বপ্নবৎ, অবাস্তবিক এবং শুধুমাত্র অজ্ঞতাজনিত বলে মানা হয়। যতক্ষণ প্রকৃতি ও পুরুষের পূর্ণ জ্ঞান না হয়, ততক্ষণ পুরুষের প্রকৃতি ও তার গুণাদির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে এবং ততক্ষণ তাঁর বারংবার নানা যোনিতে জন্ম হয়ে থাকে (১৩।২১)। সুতরাং এটি তত্ত্বতঃ জেনে গেলে পুনর্জন্ম হয় না।

সম্বন্ধ—এইভাবে গুণাদিসহ প্রকৃতি ও পুরুষের জ্ঞানের মহত্ত্ব শুনে এরূপ জ্ঞান কীভাবে হয় তা জানতে ইচ্ছা হতে পারে। তাই এবার দুটি শ্লোকে ভগবান ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর জন্য তত্ত্বজ্ঞানের ভিন্ন-ভিন্ন সাধনসমূহ প্রতিপাদন করছেন—

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে॥ ২৪

সেই পরমাত্মাকে কত ব্যক্তি শুদ্ধবুদ্ধি দ্বারা ধ্যানের সাহায্যে হৃদয়ে দর্শন করেন। অনেক ব্যক্তি জ্ঞানযোগের দ্বারা এবং কেউ বা কর্মযোগের দ্বারা সেই পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন অর্থাৎ লাভ করেন ॥ ২৪

প্রশ্ন—এখানে 'ধ্যান' শব্দ কীসের বাচক এবং তার দ্বারা আত্মার সাহায্যে আত্মাতে আত্মাকে দেখার মানে কী ?

উত্তর— ষষ্ঠ অধ্যায়ের একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শ্লোকে বর্ণিত বিধি অনুসারে শুদ্ধ ও একান্ত স্থানে উপযুক্ত আসনে নিশ্চলভাবে বসে, ইন্দ্রিয়াদিকে বিষয় থেকে প্রত্যাহার করে, মনকে বশীভূত করে এবং এক পরমাত্মা ব্যতীত অন্য সমস্ত কিছু ভুলে নিরন্তর পরমাত্মার চিন্তা করাকে ধ্যান বলে। এইভাবে ধ্যান করলে বুদ্ধি শুদ্ধ হয় এবং সেই বিশুদ্ধ সূক্ষ্মবুদ্ধির দ্বারা হৃদয়ে যে সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্ম পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হয়, সেটিই হল ধ্যানের দ্বারা আত্মার সাহায্যে আত্মাতে আত্মাকে দেখা।

প্রশ্ন—এখানে যে ধ্যানের দ্বারা সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ম প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে—সেই ধ্যান সগুণ পরমেশ্বরের না নির্গুণ ব্রহ্মের, সাকারের না নিরাকারের ? এই ধ্যান ভেদভাবের দ্বারা করা যায়, না অভেদভাবের দ্বারা এবং এর ফলস্বরূপ সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মের প্রাপ্তি ভেদভাবে হয়, না অভেদভাবে ?

উত্তর—এখানে বাইশতম শ্লোকে পরমাত্মা ও আত্মার অভেদত্ব প্রতিপাদন করা হয়েছে এবং সেই অনুসারে পুরুষের স্বরূপ জ্ঞানরূপ ফল প্রাপ্তির বিভিন্ন সাধনার বর্ণনা আছে ; তাই এখানে প্রসঙ্গানুসারে নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্মের অভেদ ধ্যানেরই বর্ণনা করা হয়েছে এবং তার ফল অভিন্নভাবের দ্বারাই পরমাত্মার প্রাপ্তি বলা হয়েছে, কিন্তু ভেদ ভাবের দ্বারা সগুণ-নিরাকারের এবং সগুণ-সাকারের ধ্যানরত সাধকও যদি এইরূপ ফল আকাঙ্ক্ষা করেন তাহলে তাঁরও অভেদ ভাবের দ্বারা নির্গুণ-নিরাকার সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ম প্রাপ্তি হতে পারে।

প্রশ্ন—'সাংখ্যেন' এবং 'যোগেন'—এই দুটি পদ ভিন্ন ভিন্ন দুটি সাধনার বাচক, নাকি একই সাধনের বিশেষ্য-বিশেষণ ? যদি এক সাধনেরই বাচক হয়, তবে কোন্ সাধনের বাচক এবং তার দ্বারা আত্মাকে দর্শন করার মানে কী ?

উত্তর—এখানে **'সাংখ্যেন'** ও **'যোগেন'**—এই দুটি পদ সাংখ্যযোগের বাচক। দ্বিতীয় অধ্যায়ের এগারো থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে এর বর্ণনা করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত পঞ্চম অধ্যায়ের অষ্টম, নবম এবং ত্রয়োদশ শ্লোকে, চতুর্দশ অধ্যায়ের উনিশতম শ্লোকে এবং আরও বিভিন্ন স্থানে প্রসঙ্গানুসারে এর বর্ণনা করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে সমস্ত বস্তুই মৃগতৃষ্ণার জল অথবা স্বপ্নসৃষ্টি সদৃশ মায়ামাত্র ; তাই প্রকৃতির কার্যরূপ সমস্ত গুণ গুণেই আবর্তিত হচ্ছে—এরূপ মনে করে মন, ইন্দ্রিয় ও শরীর দ্বারা হওয়া সমস্ত কর্মে কর্তৃত্বাভিমান রহিত হয়ে যাওয়া এবং সর্বব্যাপী সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাতে একত্ববোধে নিত্য স্থিত থেকে সব কিছুকে এক সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কিছুর ভিন্ন অস্তিত্ব আছে বলে না মনে করা—এই হল 'সাংখ্যযোগ' নামক সাধন। এর দ্বারা আত্মা ও পরমাত্মার অভেদ সম্পর্ক প্রত্যক্ষ করে সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মকে অভিন্নভাবে প্রাপ্ত করাকেই বলা হয় সাংখ্যযোগের দ্বারা আত্মাকে আত্মাতে দর্শন করা।

সাংখ্যযোগের এই সাধনা সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন অধিকারীর দ্বারাই সহজে করা সম্ভব।

প্রশ্ন—সাধন চতুষ্টয় কী ?

উত্তর—বিবেক, বৈরাগ্য, ষট্ সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব—এই হল চারটি সাধন। এই চারটি সাধনের প্রথম সাধন হল—

১. বিবেক

সৎ-অসৎ এবং নিত্য-অনিত্য বস্তু বিবেচনার নাম বিবেক। বিবেক এগুলিকে যথাযথভাবে পৃথক করে দেয়। বিবেকের অর্থ হল প্রকৃত তত্ত্বের অনুভব করা। সর্ব অবস্থায় এবং প্রত্যেক বস্তুতে প্রতিক্ষণ আত্মা ও অনাত্মার বিশ্লেষণ করতে করতে এই বিবেক সিদ্ধ হয়। 'বিবেকে'র যথার্থ উদয় হলে সৎ-অসৎ এবং নিত্য-অনিত্য বস্তুর তফাত দুধ ও জলের তফাতের মতো প্রত্যক্ষ হতে থাকে। এর পর দ্বিতীয় সাধন হল—

২. বৈরাগ্য

বিবেকের দ্বারা সৎ-অসৎ এবং নিত্য-অনিত্য পৃথকীকরণ হয়ে গেলে অসৎ ও অনিত্য থেকে সহজেই অনুরাগ চলে যায়, এরই নাম 'বৈরাগ্য'। মনে ভোগের আকাঙ্ক্ষা রয়ে গেছে আর বাহ্যতঃ সংসারের প্রতি দ্বেষ ও ঘৃণা প্রদর্শন করা হচ্ছে, এটি 'বৈরাগ্য' নয়। বৈরাগ্যে অনুরাগের সর্বতোভাবে অভাব হয়। প্রকৃতপক্ষে আভ্যন্তরিক অনাসক্তিকে বৈরাগ্য বলা হয়। যিনি প্রকৃত বৈরাগ্য প্রাপ্ত হন, সেই পুরুষের চিত্তে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত ভোগে, তৃষ্ণা ও আসক্তির আত্যন্তিক অভাব হয়। তিনি অসৎ ও অনিত্য থেকে প্রত্যাহৃত হয়ে সম্পূর্ণরূপে সৎ ও নিত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। একেই বলে বৈরাগ্য। যতক্ষণ এরূপ বৈরাগ্য না হয়, ততক্ষণ বুঝতে হবে যে বিবেকে ত্রুটি রয়ে গেছে। বিবেকের পূর্ণতা হলে বৈরাগ্য অবশ্যম্ভাবী।

৩. ষট্‌সম্পত্তি

এই বিবেক ও বৈরাগ্যের ফলস্বরূপ সাধক ছয় বিভাগ সম্পন্ন এক পরমসম্পত্তি লাভ করেন, সেটি পুরোপুরি না পাওয়া পর্যন্ত মনে করতে হবে যে বিবেক ও বৈরাগ্যে কিছু ত্রুটি আছে। কারণ বিবেক ও বৈরাগ্য

ভালোভাবে সম্পন্ন হলে সাধকের এই সম্পত্তি প্রাপ্ত করা সহজ হয়। এই সম্পত্তির নাম 'ষট্‌সম্পত্তি', এর ছয়টি বিভাগ হল—

১—শম

মনের পূর্ণরূপে নিগৃহীত, নিশ্চল ও শান্ত হওয়াকেই বলে 'শম'। বিবেক ও বৈরাগ্য প্রাপ্তি হলে মন স্বাভাবিকভাবেই নিশ্চল ও শান্ত হয়ে যায়।

২—দম

ইন্দ্রিয়াদির পূর্ণরূপে নিগৃহীত ও বিষয়াদির রসাস্বাদ থেকে রহিত হওয়াই হল 'দম'।

৩—উপরতি

বিষয় থেকে চিত্তের বিযুক্ত হয়ে যাওয়াই হল উপরতি। মন ও ইন্দ্রিয়ের যখন বিষয়ে রসানুভূতি হয় না, তখন স্বাভাবিকভাবে সাধকের তাতে উপরতি হয়ে যায়। ভোগ্য-পদার্থে এই উপরতি শুধু বাইরে থেকে নয়, ভিতর থেকেও হওয়া উচিত। ভোগসংকল্পের প্রেরণায় ব্রহ্মলোক পর্যন্ত দুর্লভ ভোগেও কখনও প্রবৃত্তি না হওয়া, এরই নাম 'উপরতি'।

৪—তিতিক্ষা

দ্বন্দ্বাদি সহ্য করার নাম 'তিতিক্ষা'। যদিও শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ, মান-অপমান ইত্যাদি সহ্য করাকেও 'তিতিক্ষা' বলা হয় ; কিন্তু বিবেক, বৈরাগ্য, শম-দম-উপরতির পর প্রাপ্ত হওয়া তিতিক্ষা এর থেকে কিছু বৈশিষ্টপূর্ণ হওয়া উচিত। সংসারে কখনও দ্বন্দ্বের বিনাশ হয় না আর কেউ এর থেকে সর্বতোভাবে রক্ষাও পেতে পারে না। কোনোভাবেই একে সহ্য করাও উত্তম ; কিন্তু সর্বোত্তম হল—দ্বন্দ্ব-জগৎ থেকে উচ্চে উঠে, দ্বন্দ্বকে সাক্ষীরূপে দেখা। এই হল প্রকৃত তিতিক্ষা। এরূপ হলে শীত-গ্রীষ্ম এবং মান-অপমান তাকে আর বিচলিত করতে পারে না।

৫—শ্রদ্ধা

আত্মসত্তায় প্রত্যক্ষের ন্যায় অখণ্ড বিশ্বাসকে বলে শ্রদ্ধা। প্রথমে শাস্ত্র, গুরু ও সাধন ইত্যাদিতে শ্রদ্ধা হয় ; তাতে আত্মশ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যতক্ষণ আত্মস্বরূপে পূর্ণ শ্রদ্ধা না হয়, ততক্ষণ একমাত্র নিস্তল, নিরঞ্জন, নিরাকার, নির্গুণ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করে তাতে বুদ্ধির স্থিতি হতে পারে না।

৬—সমাধান

পরমাত্মাতে মন ও বুদ্ধির পূর্ণভাবে সমাহিত হয়ে যাওয়া— অর্জুন যেমন গুরু দ্রোণাচার্যের কাছে পরীক্ষা দেওয়ার সময় বৃক্ষের ওপরে রাখা নকল পাখির কণ্ঠ দেখতে পাচ্ছিলেন, তেমনই মন ও বুদ্ধি দ্বারা নিরন্তর একমাত্র লক্ষ্যবস্তু ব্রহ্মকেই দর্শন করতে থাকা—এই হল সমাধান।

৪. মুমুক্ষুত্ব

এইভাবে যখন বিবেক, বৈরাগ্য এবং ষট্‌সম্পত্তি লাভ হয়, তখন সাধক স্বাভাবিকভাবেই অবিদ্যার বন্ধন থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হতে চান এবং তিনি সর্বদিক থেকে চিত্ত সংযত করে কোনো দিকে না তাকিয়ে একমাত্র পরমাত্মার দিকেই ধাবিত হন। তাঁর এই তীব্র গতিতে অগ্রসর হওয়া অর্থাৎ তীব্র সাধনাই তাঁর পরমাত্মাকে লাভের তীব্রতম আকাঙ্ক্ষার পরিচয় দেয়, একেই বলা হয় মুমুক্ষুত্ব।

প্রশ্ন—'কর্মযোগ' শব্দটি এখানে কোন্ সাধনের বাচক এবং তার দ্বারা আত্মাতে আত্মাকে দর্শন করা কী ?

উত্তর—দ্বিতীয় অধ্যায়ের চল্লিশতম শ্লোক থেকে সেই অধ্যায়ের সমাপ্তি পর্যন্ত ফলসহ যে সাধনের বর্ণনা করা হয়েছে, তার বাচক এখানে 'কর্মযোগ' শব্দটি। অর্থাৎ আসক্তি ও কর্মফল সর্বথা ত্যাগ করে সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমত্ব বজায় রেখে শাস্ত্র অনুসারে নিষ্কামভাবে নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রম অনুসারে সর্বপ্রকার বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করা হল কর্মযোগ। এর দ্বারা যে সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে অভিন্নভাবে লাভ করা, সেটিই হল কর্মযোগের দ্বারা আত্মায় আত্মাকে দর্শন করা।

প্রশ্ন—কর্মযোগের সাধনায় সাধক নিজেকে পরমাত্মা থেকে পৃথক বলে মনে করেন, তাই তাঁর ভিন্ন-ভাবের দ্বারাই ব্রহ্ম প্রাপ্তি হওয়া উচিত ; তাহলে এখানে অভেদভাবে ব্রহ্ম প্রাপ্তির কথা কীভাবে বলা হল ?

উত্তর—সাধনকালে ভেদভাব থাকলেও যে সাধক অভেদবোধকে ফলস্বরূপ লক্ষ্য করেন তাঁর অভেদভাবেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় ; এখানে কোন্ কোন্ সাধনার দ্বারা অভেদভাবে ব্রহ্মজ্ঞান হতে পারে, তারই প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে। তাই এখানে কর্মযোগের দ্বারাও অভিন্নভাবে পরব্রহ্ম পরমাত্মার প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে।

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৫

কিন্তু অন্য যাঁরা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, তাঁরা এভাবে আত্মাকে না জানতে পেরে অন্যের কাছে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের কাছে শুনে সেই অনুসারে উপাসনা করেন। এইরূপ শ্রবণপরায়ণ পুরুষও নিঃসন্দেহে মৃত্যুরূপ সংসার-সাগর অতিক্রম করেন ॥ ২৫

প্রশ্ন—এখানে 'তু' পদ প্রয়োগের তাৎপর্য কী ?

উত্তর—'তু' পদটি এখানে এই বিষয়ের দ্যোতক যে এবার পূর্বোক্ত সাধকদের থেকে বিশিষ্ট অন্য সাধকদের বর্ণনা করা হচ্ছে। এর অভিপ্রায় হল, যেসব ব্যক্তি পূর্বোক্ত সাধন ঠিকমতো বুঝতে পারেন না, তাঁরা কী করে উদ্ধার লাভ করবেন, এই শ্লোকে তারই উত্তর দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন—'**এবম্ অজানন্তঃ**' বিশেষণের সঙ্গে '**অন্যে**' পদটি কীসের বাচক এবং তাঁদের অপরের থেকে শুনে উপাসনা করা কীরূপ ?

উত্তর—বুদ্ধি অল্প থাকায় যাঁরা পূর্বোক্ত ধ্যানযোগ, সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগ—এসবের কোনো সাধনই ঠিকমতো বুঝতে পারেন না, এরূপ সাধকদের বাচক এই '**এবম্ অজানন্তঃ**' বিশেষণের সঙ্গে '**অন্যে**' পদটি।

জবালার পুত্র সত্যকাম ব্রহ্মকে জানার আকাঙ্ক্ষায় গৌতমগোত্রীয় মহর্ষি হারিদ্রুমতের কাছে যান। সেখানে কথাবার্তা বলার পর গুরু চারশত অত্যন্ত দুর্বল এবং কৃশ গাভী পৃথক করে তাঁকে বলেন, 'হে সৌম্য ! তুমি এই গরুদের পেছনে পেছনে যাও।' গুরুর আদেশানুসারে সত্যকাম অত্যন্ত শ্রদ্ধা, উৎসাহ ও হর্ষসহ তাদের বনের দিকে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'এদের আমি এক হাজার সংখ্যা পূর্ণ করে নিয়ে আসব।' তিনি গরুদের তৃণ ও জলপূর্ণ নিরাপদ বনে নিয়ে গেলেন এবং তাদের সংখ্যা এক হাজার হলে ফিরে এলেন। ফল হল যে ফেরবার সময় পথেই তিনি ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে গেলেন (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৪।৪-৯)। এইভাবে তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষের আদেশ লাভ করে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও প্রেমসহকারে সেই অনুসারে আচরণ করাকে বলা হয় অপরের থেকে শুনে উপাসনা করা।

প্রশ্ন—'**শ্রুতিপরায়ণাঃ**' বিশেষণের তাৎপর্য কী ? '**অপি**' পদ প্রয়োগের এখানে কী অর্থ ?

উত্তর—যিনি শ্রবণপরায়ণ হন অর্থাৎ যেমন শোনেন, সেই অনুসারে সাধন করতে শ্রদ্ধা ও প্রেমের সঙ্গে তৎপর হন তাঁকে বলা হয় '**শ্রুতিপরায়ণাঃ**'। '**অপি**' পদ প্রয়োগ করে এখানে এই ভাব দেখানো হয়েছে যে যখন এইরূপ অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি অপরের কাছে শুনেও উপাসনা করে নিঃসন্দেহে মৃত্যুকে অতিক্রম করেন—তাহলে যে সাধক পূর্বোক্ত তিন প্রকার সাধনার মধ্যে কোনো একপ্রকার সাধনা করেন—তিনি যে অতিক্রম করে যাবেনই এতো বলাই বাহুল্য !

প্রশ্ন—এখানে '**মৃত্যুম্**' পদ কীসের বাচক এবং '**অতি**' উপসর্গের সঙ্গে '**তরন্তি**' ক্রিয়া প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—এখানে '**মৃত্যুম্**' পদটি বারংবার জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারের বাচক এবং '**অতি**' উপসর্গের সঙ্গে '**তরন্তি**' ক্রিয়া প্রয়োগ করে এই ভাব প্রকাশিত হয়েছে যে উপরোক্ত প্রকারে সাধনকারী পুরুষ জন্ম-মৃত্যুরূপ দুঃখময় সংসার-সমুদ্র পার হয়ে চিরকালের জন্য সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লাভ করেন ; তাঁর আর পুনর্জন্ম হয় না। অভিপ্রায় হল যে তেইশতম শ্লোকে যে কথা '**ন স ভূয়োঽভিজায়তে**' দ্বারা এবং চব্বিশতম শ্লোকে যে কথা '**আত্মনি আত্মানং পশ্যন্তি**' দ্বারা বলা হয়েছে, সেই কথাই এখানে '**মৃত্যুম্ অতিতরন্তি**' দ্বারা বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ—এইরূপ পরমাত্মসম্বন্ধীয় তত্ত্বজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন সাধনসমূহ প্রতিপাদন করে তৃতীয় শ্লোকে যে 'যাদৃক্' পদ দ্বারা ক্ষেত্রের স্বভাব শোনার জন্য বলা হয়েছিল, এবার সেই অনুসারে ভগবান দুটি শ্লোকে সেই ক্ষেত্রকে উৎপত্তি-বিনাশশীল বলে তার স্বভাবের বর্ণনা করে আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত জ্ঞানীদের প্রশংসা করছেন—

যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥ ২৬

হে অর্জুন! স্থাবর ও জঙ্গম যা কিছু প্রাণী (পদার্থ) উৎপন্ন হয়, সে সবই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে উৎপন্ন হয় বলে তুমি জেনো ॥ ২৬

প্রশ্ন — **'যাবৎ'**, **'কিঞ্চিৎ'** এবং **'স্থাবরজঙ্গমম্'** — এই তিনটি বিশেষণের অভিপ্রায় কী এবং এই তিন বিশেষণে যুক্ত **'সত্ত্বম্'** পদ কীসের বাচক ?

উত্তর— **'যাবৎ'** ও **'কিঞ্চিৎ'**—এই দুটি পদ চরাচরের সম্পূর্ণ জীবেদের বোধক। দেবতা, মানুষ, পশু, পক্ষী ইত্যাদি সচল প্রাণীদের 'জঙ্গম' বলা হয় এবং বৃক্ষ, লতা, পাহাড় ইত্যাদি অচল প্রাণী ও পদার্থকে 'স্থাবর' বলা হয়। তাই এই তিনটি বিশেষণ দ্বারা যুক্ত **'সত্ত্বম্'** পদটি সমস্ত চরাচর প্রাণী সমুদায়ের বাচক।

প্রশ্ন— 'ক্ষেত্র' ও 'ক্ষেত্রজ্ঞ' শব্দ এখানে কীসের বাচক এবং এই দুটির সংযোগ এবং তার দ্বারা সমস্ত প্রাণীসমুদায়ের উৎপত্তি কীভাবে হয় ?

উত্তর —এই অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে যে চব্বিশটি তত্ত্বের সমুদায়কে ক্ষেত্রের স্বরূপ বলা হয়েছে, সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্থ-পঞ্চম শ্লোকে যাকে 'অপরা প্রকৃতি' বলা হয়েছে—সেটিই 'ক্ষেত্র' এবং তাকে যিনি জানেন, সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে যাকে 'পরা প্রকৃতি' বলা হয়েছে —সেই চেতন তত্ত্বই 'ক্ষেত্রজ্ঞ'। তার অর্থাৎ 'প্রকৃতিস্থ' পুরুষের প্রকৃতিগত ভিন্ন ভিন্ন সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরের সঙ্গে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সেটিই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ। এর ফলে যে ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির প্রাণীসমূহ প্রকটিত হয়—সেই হল তাদের উৎপন্ন হওয়া।

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ২৭

যে ব্যক্তি বিনাশশীল সমগ্র চরাচর ভূত প্রাণীর মধ্যে অবিনাশী পরমেশ্বরকে সমভাবে স্থিত দেখে থাকেন, তিনিই যথার্থ দেখেন ॥ ২৭

প্রশ্ন—**'বিনশ্যৎসু'** এবং **'সর্বেষু'**— এই দুটি বিশেষণের সঙ্গে **'ভূতেষু'** পদ কীসের বাচক এবং তার সঙ্গে এই দুটি বিশেষণ প্রয়োগের কী তাৎপর্য ?

উত্তর—বারংবার জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হওয়া যত প্রাণী আছে, বিভিন্ন স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের সংযোগ-বিয়োগের দ্বারা যাদের জন্ম-মৃত্যুশীল মনে করা হয়, সেই সবের বাচক হল **'বিনশ্যৎসু'** ও **'সর্বেষু'** এই দুই বিশেষণের সঙ্গে 'ভূতেষু' পদটি। সমস্ত প্রাণীকে লক্ষ্য করাবার জন্য **'সর্বেষু'** এবং শরীরের সম্বন্ধে তাদের বিনাশশীল বলার জন্য **'বিনশ্যৎসু'** বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে।

এখানে মনে রাখতে হবে যে বিনাশ হওয়া হল শরীরের ধর্ম, আত্মার নয়। আত্মতত্ত্ব নিত্য ও অবিনাশী এবং এটি শরীরের পার্থক্যের দরুণ ভিন্ন-ভিন্ন রূপে প্রতীত হলেও বস্তুতঃ সমস্ত প্রাণীসমুদায়ে সেটি একই। এই শ্লোকে এই কথাই বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে **'পরমেশ্বরম্'** পদটি কীসের বাচক, উপরোক্ত সমস্ত ভূতপ্রাণীতে তাকে বিনাশরহিত ও সমভাবে দর্শন করা কাকে বলে ?

উত্তর—এখানে **'পরমেশ্বরম্'** পদটি প্রকৃতির থেকে সর্বতোভাবে অতীত সেই নির্বিকার চেতনতত্ত্বের বাচক, যার বর্ণনা 'ক্ষেত্রজ্ঞে'র সঙ্গে ঐক্য করে এই অধ্যায়ের বাইশতম শ্লোকে উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর এবং পরমাত্মার নামে করা হয়েছে। যদিও এই পরম-পুরুষ প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধ সচ্চিদানন্দঘন এবং প্রকৃতি থেকে সর্বতোভাবে অতীত, তা সত্ত্বেও প্রকৃতির সঙ্গ দ্বারা এঁকে ক্ষেত্রজ্ঞ ও প্রকৃতিজনিত গুণের ভোক্তা বলা হয়। সুতরাং সমস্ত প্রাণীসমূহের যত শরীর, যে সকল শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় এদের বিনাশশীল বলা হয়, সেই সমস্ত শরীরে তার প্রকৃত স্বরূপভূত একই অবিনাশী

নির্বিকার চেতনতত্ত্বকে, বিনাশশীল মেঘের মধ্যে আকাশের মতো, সমভাবে স্থিত ও নিত্যরূপে দেখা—এই হল 'পরমেশ্বরকে সমস্ত প্রাণীর মধ্যে বিনাশরহিত ও সমভাবে অবস্থিত দেখা'।

প্রশ্ন—এখানে 'যিনি দেখেন, তিনিই যথার্থ দেখেন' এই বাক্যের কী তাৎপর্য ?

উত্তর—এই শ্লোকে আত্মতত্ত্বকে জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি সমস্ত বিকাররহিত— নির্বিকার এবং সম বলা হয়েছে। অতএব এই বাক্যের এই তাৎপর্য যে, যিনি এই নিত্য চেতন এক আত্মতত্ত্বকে এইরূপ নির্বিকার, অবিনাশী এবং অসঙ্গরূপে সর্বত্র সমভাবে স্থিত দেখেন—তিনিই যথার্থ দেখেন। যিনি একে শরীরাদির সঙ্গের দরুণ জন্ম-মরণশীল ও সুখী-দুঃখী বলে মনে করেন, তাঁর দেখা যথার্থ নয়, সুতরাং তিনি দেখলেও ঠিক দেখেন না।

সম্বন্ধ—উপরোক্ত শ্লোকে বলা হয়েছে যে সেই পরমেশ্বরকে যিনি সর্বভূতে বিনাশরহিত ও সমভাবে স্থিত দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী ; এই কথাটির সার্থকতা প্রতিপাদন করে তার ফল পরমগতি প্রাপ্তি বলে জানাচ্ছেন—

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ২৮

একক পরমেশ্বরকে সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখে, তিনি নিজেকে নিজে নাশ (হিংসা) করেন না, তার জন্য তিনি পরমগতি লাভ করেন ॥ ২৮

প্রশ্ন—এখানে **'হি'** পদের কী অর্থ এবং এটি প্রয়োগের তাৎপর্য কী ?

উত্তর—**'হি'** পদটি এখানে হেতু—অর্থে ব্যবহৃত। এটি প্রয়োগের তাৎপর্য হল যে, সমভাবে দর্শনকারী পুরুষ নিজেকে নাশ করেন না এবং তিনি পরমগতি লাভ করেন। তাই তাঁর দেখাই যথার্থ দেখা।

প্রশ্ন—সর্বত্র সমভাবে স্থিত পরমেশ্বরকে সম দেখা কাকে বলে ? এইভাবে দর্শনকারী পুরুষ নিজেই নিজেকে নাশ করেন না, এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এক সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাই সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত, অজ্ঞতাবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন দেহে তার ভিন্নতা প্রতীয়মান হয়—প্রকৃতপক্ষে তাতে কোনোপ্রকার পার্থক্য নেই— এই তত্ত্ব ভালোভাবে জেনে প্রত্যক্ষ করাই হল 'সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত পরমেশ্বরকে সমভাবে দেখা'। যিনি এই তত্ত্ব জানেন না, তাঁর দেখা সম নয়। কারণ তাঁর সবেতে বিষমবুদ্ধি হয় ; তিনি কারোকে তাঁর প্রিয়, হিতৈষী এবং কাউকে অপ্রিয় ও অহিতকারী এবং নিজেকে অপরের থেকে পৃথক, একদেশীয় (পরিচ্ছন্ন) বলে মনে করেন। সুতরাং তিনি শরীরের জন্ম-মৃত্যুকে নিজের জন্ম-মৃত্যু মনে করায় বার বার নানা দেহে জন্ম নিয়ে বারংবার মৃত্যুবরণ করেন। এই হল তাঁর নিজের দ্বারা নিজেকে নাশ করা। কিন্তু যে ব্যক্তি উপরোক্ত প্রকারে এক পরমেশ্বরকেই সমভাবে অবস্থিত দেখেন, তিনি নিজেকেও সেই পরমেশ্বরের থেকে পৃথক বলে মনে করেন না এবং শরীরের সঙ্গেও নিজের কোনো সম্পর্ক মেনে নেন না। তাই তিনি দেহের বিনাশে নিজ বিনাশ দেখেন না এবং সেইজন্য তিনি নিজের দ্বারা নিজের বিনাশ করেন না। অভিপ্রায় হল যে তাঁর স্থিতি সর্বজ্ঞ, অবিনাশী, সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্ম পরমাত্মাতে অভিন্নভাবে হয়ে যায় ; সুতরাং তিনি চিরকালের মতো জন্ম-মৃত্যু হতে মুক্ত হয়ে যান।

প্রশ্ন—'ততঃ' পদটি কোন্ অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং এটি প্রয়োগ করে পরমগতি প্রাপ্ত হবার কথা বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—**'ততঃ'** পদটিও হেতুবোধক। এর প্রয়োগ করে পরমগতি প্রাপ্তি বলার অর্থ হল যে সর্বত্র সমভাবে বিরাজিত সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মে অভিন্নভাবে স্থিত সেই পুরুষ নিজের দ্বারা নিজের বিনাশ করেন না, তাই তিনি চিরতরে জন্ম-মৃত্যু থেকে মুক্ত হয়ে পরমগতি লাভ করেন। যাঁকে পরমপদ নামে অভিহিত করা হয়েছে, যাঁকে প্রাপ্ত হলে পুনরায় ফিরে আসতে হয় না এবং যিনি সমস্ত সাধনার অন্তিম ফল—তাঁকে লাভ করাই 'পরমগতি প্রাপ্ত হওয়া' বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ—এইভাবে নিত্য বিজ্ঞানানন্দঘন আত্মতত্ত্বকে সর্বত্র সমভাবে দেখার মহত্ত্ব ও ফল জানিয়ে এবার পরবর্তী শ্লোকে তাঁকে যাঁরা অকর্তারূপে দেখেন, তাঁদের মহিমা জানাচ্ছেন।

প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি।। ২৯

যে ব্যক্তি সমস্ত কর্ম সর্বপ্রকারে প্রকৃতির দ্বারাই করা হচ্ছে বলে দেখেন এবং আত্মাকে অকর্তারূপে দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী ॥ ২৯

প্রশ্ন—তৃতীয় অধ্যায়ের সাতাশতম, আঠাশতম এবং চতুর্দশ অধ্যায়ের ঊনিশতম শ্লোকে সমস্ত কর্ম গুণাদির দ্বারা সম্পন্ন হয় বলা হয়েছে, পঞ্চম অধ্যায়ের অষ্টম, নবম শ্লোকে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ে আবর্তিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এখানে সকল কর্মকে প্রকৃতি দ্বারা করা হয় বলে দেখতে বলা হয়েছে। এই রূপ তিন প্রকার বর্ণনার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি গুণ প্রকৃতিরই কাজ ; সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি ও মন, বুদ্ধি ইত্যাদি এবং ইন্দ্রিয়াদির বিষয়—এ সবও গুণসমূহের বিস্তার। অতএব ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ে আবর্তিত হওয়া, গুণাদির গুণাদিতে আবর্তিত হওয়া এবং গুণাদির দ্বারা সমস্ত কর্ম করা হয় বলাও প্রকৃতপক্ষে সমস্ত কর্ম প্রকৃতি দ্বারাই করা হয় বলা। এইরূপ সর্বত্রই বস্তুতঃ এক কথাই বলা হয়েছে ; এতে কোনোই পার্থক্য নেই। সর্বস্থানে বলার অভিপ্রায় হল আত্মাতে কর্তৃত্বভাবের অভাব দেখানো।

প্রশ্ন—আত্মাকে অকর্তা দেখা কী এবং যিনি এরূপ দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—আত্মা, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত এবং সর্বপ্রকার বিকাররহিত, প্রকৃতির সঙ্গে তার কোনোপ্রকার সম্বন্ধ নেই। অতএব তিনি কোনো কর্মের কর্তাও নন এবং কর্মফলের ভোক্তাও নন—এই বিষয় অপরোক্ষভাবে অনুভব করাই হল 'আত্মাকে অকর্তা রূপে বোঝা'। যিনি এরূপ দেখেন, তিনিই যথার্থ দ্রষ্টা—এই কথায় তাঁর মহিমা প্রকট করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে যিনি আত্মাকে মন, বুদ্ধি ও শরীরের সম্বন্ধীয় সমস্ত কর্মের কর্তা-ভোক্তা বলে মনে করেন, তাঁর দেখা ভ্রমযুক্ত হওয়ায় তা বেঠিক।

সম্বন্ধ—এইভাবে আত্মাকে অকর্তা মনে করার মহিমা জানিয়ে এবার তাঁর একত্বদর্শনের ফল জানাচ্ছেন—

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা।। ৩০

যে মুহূর্তে এই ব্যক্তি ভূতসমূহের পৃথক-পৃথক ভাবকে এক পরমাত্মাতেই অবস্থিত দেখেন এবং সেই পরমাত্মা থেকেই সমস্ত প্রাণীর বিস্তার দেখেন, সেই মুহূর্তেই তিনি সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মকে লাভ করেন ॥ ৩০

প্রশ্ন—'**ভূতপৃথগ্‌ভাবম্**' পদ কীসের বাচক এবং তাকে একের মধ্যে স্থিত এবং সেই এক থেকে সকলের বিস্তার দর্শন করার মানে কী ?

উত্তর—যে চরাচর সমগ্র প্রাণীদের উৎপত্তি ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ থেকে হয় বলা হয়েছে (১৩।২৬) এবং সমস্ত প্রাণীতে পরমেশ্বরকে সমভাবে দর্শন করতে বলা হয়েছে (১৩।২৭), সেই সমগ্র প্রাণী জগতের নানাত্বের বাচক হল এখানে '**ভূতপৃথগ্‌ভাবম্**' পদটি। স্বপ্ন ভঙ্গ হলে মানুষ যেমন স্বপ্নের মধ্যে দেখা সমস্ত প্রাণীর নানাত্বকে নিজের মধ্যে দেখেন ও মনে করেন যে সেগুলি সবই আমার থেকেই বিস্তার লাভ করেছে, বস্তুতঃ স্বপ্নের সৃষ্টিতে আমি ছাড়া আর কিছুই ছিল না, এক আমিই নিজেকে বহুরূপে দেখছিলাম—তেমনই যিনি সমস্ত প্রাণীকে কেবলমাত্র এক পরমাত্মাতেই অবস্থিত এবং তাঁর থেকেই সব কিছুর বিস্তার দর্শন করেন, তিনিই সঠিক দেখেন এবং এইরূপ দেখাই হল সবকিছুকে একের মধ্যে

স্থিত এবং সেই এক থেকেই সবকিছুর বিস্তার দর্শন করা।

প্রশ্ন—এখানে 'যদা' ও 'তদা' পদ প্রয়োগের তাৎপর্য কী এবং ব্রহ্ম প্রাপ্ত হওয়া কী ?

উত্তর—'যদা' ও 'তদা' পদ কালবাচক অব্যয়। এটি প্রয়োগের এই তাৎপর্য যে, মানুষের যখন এই জ্ঞান হয়ে যায়, তখনই তিনি ব্রহ্মকে লাভ করেন অর্থাৎ ব্রহ্মই হয়ে যান, এতে একটুও দেরী হয় না। এই রূপ সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মের সঙ্গে যে অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়ে যাওয়া—তাকেই বলা হয় পরমগতি প্রাপ্তি, মোক্ষপ্রাপ্তি, আত্যন্তিক সুখপ্রাপ্তি ও পরমশান্তি প্রাপ্তি।

সম্বন্ধ—এইভাবে আত্মাকে সব প্রাণীতে সমভাবে স্থিত, নির্বিকার ও অকর্তা বলার পর প্রশ্ন হতে পারে যে সমস্ত শরীরে থেকেও আত্মা তাদের দোষগুলির থেকে নির্লিপ্ত ও অকর্তা হয়ে কী করে থাকতে পারেন ? এই শঙ্কা নিবারণ করার জন্য ভগবান এবার তৃতীয় শ্লোকে যে 'যৎপ্রভাবশ্চ' পদ দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভাব শোনার ইঙ্গিত করেছিলেন—সেই অনুসারে তিনটি শ্লোক দ্বারা আত্মার প্রভাব বর্ণনা করছেন—

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎপরমাত্মায়মব্যয়ঃ ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥ ৩১

হে অর্জুন ! অনাদি ও নির্গুণ হওয়ায় এই অবিনাশী পরমাত্মা শরীরে অবস্থিত হয়েও প্রকৃতপক্ষে কিছুই করেন না এবং লিপ্তও হন না ॥ ৩১

প্রশ্ন—'অনাদিত্বাৎ' ও 'নির্গুণত্বাৎ'—এই দুই পদের অর্থ কী এবং এই দুটি প্রয়োগ করে এখানে কী ভাব প্রকাশিত হয়েছে ?

উত্তর—যার কোনো আদি অর্থাৎ কারণ নেই এবং কোনো কালেই যার নতুন করে উৎপত্তি হয়নি, যা চিরকালই আছে— তাকে 'অনাদি' বলা হয়। প্রকৃতি এবং তার গুণাদি থেকে যা সর্বতোভাবে অতীত, গুণাদি এবং গুণাদির কার্যের সঙ্গে যার কোনো কালে এবং কোনো অবস্থাতেই প্রকৃতপক্ষে সম্বন্ধ নেই—তাকেই 'নির্গুণ' বলা হয়। সুতরাং এখানে 'অনাদিত্বাৎ' ও 'নির্গুণত্বাৎ'— এই দুটি পদ প্রয়োগের তাৎপর্য হল যে, যার প্রকরণ বলা হচ্ছে, সেই আত্মা হলেন 'অনাদি' ও 'নির্গুণ' ; তাই তিনি অকর্তা, নির্লিপ্ত এবং অব্যয়—জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি ছয় প্রকার বিকার হতে সর্বতোভাবে রহিত।

প্রশ্ন—এখানে 'পরমাত্মা'র সঙ্গে 'অয়ম্' বিশেষণ প্রয়োগ করার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'অয়ম্' পদটি যার প্রকরণ প্রথম থেকে চলছে তাকে নির্দেশ করছে। অতএব এখানে 'পরমাত্মা' শব্দের সঙ্গে 'অয়ম্' বিশেষণ প্রয়োগ করে এই ভাব প্রকাশিত হয়েছে যে সাতাশতম শ্লোকে যাঁকে 'পরমেশ্বর', আঠাশতমতে 'ঈশ্বর', উনত্রিশতমতে 'আত্মা' এবং ত্রিশতমতে 'ব্রহ্ম' বলা হয়েছে—এখানে তাঁকেই 'পরমাত্মা' বলা হয়েছে। অর্থাৎ এই সবগুলির ঐক্য—অভিন্নতা দেখাবার জন্য এখানে 'অয়ম্' পদটি প্রযুক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন—সাতাশতম শ্লোকে পরমেশ্বর, আঠাশতমতে ঈশ্বর, উনত্রিশতমতে আত্মা, ত্রিশতমতে ব্রহ্ম এবং এই শ্লোকে পরমাত্মা— এইভাবে একই তত্ত্ব বলার জন্য এই সব শ্লোকে ভিন্ন ভিন্ন নামের প্রয়োগ করা হয়েছে কেন ?

উত্তর—ভগবান তৃতীয় শ্লোকে অর্জুনকে 'ক্ষেত্রজ্ঞে'র স্বরূপ ও প্রভাব জানাবার ইঙ্গিত করেছিলেন। সেই অনুসারে পরব্রহ্ম পরমাত্মার সঙ্গে ক্ষেত্রজ্ঞের অভিন্নতা প্রতিপাদন করে তাঁর বাস্তবিক স্বরূপ নিরূপণ করার জন্য এখানে পরমাত্মার বাচক বিভিন্ন নামের প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—শরীরে অবস্থিত হয়েও আত্মা কেন কর্তা নয়, এবং তিনি কেন শরীরের সঙ্গে লিপ্ত হন না ?

উত্তর — প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির গুণের সঙ্গে এবং তারই বিস্তারিত রূপ বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরের সঙ্গে আত্মার কোনো সম্বন্ধ নেই, তিনি গুণাদির থেকে সর্বতোভাবে অতীত। যেমন আকাশ মেঘের মধ্যে অবস্থিত হলেও তার কর্তা হয় না এবং তাতে লিপ্তও হয় না, তেমনই আত্মা কর্মসমূহের কর্তা হন না এবং শরীরে লিপ্তও হন না। এই কথাই ভগবান পরবর্তী দুটি শ্লোকে দৃষ্টান্ত সহযোগে বুঝিয়েছেন।

সম্বন্ধ—শরীরে অবস্থিত হলেও আত্মা কেন লিপ্ত হন না ? তার উত্তরে বলেছেন—

যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে।। ৩২

আকাশ যেমন সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়েও অতি সূক্ষ্মতার জন্য কিছুতে লিপ্ত হয় না, তেমনই নির্গুণ হওয়ায় দেহে সর্বত্র স্থিত আত্মা দেহের গুণাদিতে কখনও লিপ্ত হন না ॥ ৩২

প্রশ্ন—এই শ্লোকে আকাশের দৃষ্টান্ত দিয়ে কী বিষয় বোঝানো হয়েছে ?

উত্তর— আকাশের দৃষ্টান্ত দ্বারা আত্মার নির্লিপ্ততা প্রতিপাদন করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, আকাশ যেমন—বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবীতে সর্বত্র সমভাবে ব্যাপ্ত হয়েও এগুলির দোষ-গুণে কোনোভাবেই লিপ্ত হয় না—তেমনই আত্মা এই শরীরে সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়েও অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং গুণাদির সর্বতোভাবে অতীত হওয়ায় বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় এবং শরীরের দোষগুণে কখনও লিপ্ত হন না।

সম্বন্ধ—শরীরে স্থিত হয়েও আত্মা কেন কর্তা নয় ? তার উত্তরে বলেছেন—

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত।। ৩৩

হে অর্জুন ! যেমন একমাত্র সূর্য সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডকে প্রকাশিত করেন, তেমনই এক আত্মা সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করেন।। ৩৩

প্রশ্ন—এই শ্লোকে রবির (সূর্যের) উদাহরণ দিয়ে কী কথা বোঝানো হয়েছে এবং '**রবিঃ**' পদের সঙ্গে '**একঃ**' বিশেষণ প্রয়োগ করার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর— এখানে রবির (সূর্যের) উদাহরণ দিয়ে আত্মাতে অকর্তৃত্বের ও '**রবিঃ**' পদের সঙ্গে '**একঃ**' বিশেষণ প্রয়োগ করে আত্মার অদ্বৈতভাবের প্রতি লক্ষ্য করানো হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে যেমন একই সূর্য সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে প্রকাশিত করে, তেমনই একই আত্মা সমস্ত ক্ষেত্রকে—অর্থাৎ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে বিকারসহ ক্ষেত্রের নামে যার স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে, সেই সমস্ত জড়বর্গকে প্রকাশিত করেন ও সকলকে অস্তিত্ব-স্ফূর্তি প্রদান করেন। ভিন্ন-ভিন্ন অন্তঃকরণের সঙ্গে সম্বন্ধ দ্বারা ভিন্ন-ভিন্ন দেহে তাঁর ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ দেখা যায় ; তা সত্ত্বেও সেই আত্মা সূর্যের ন্যায় সেই সব দেহের কর্মগুলি করেনও না বা করানও না এবং দ্বৈতভাব অথবা বৈষম্য দোষেও যুক্ত হন না। এই অবিনাশী আত্মা সর্ব অবস্থাতে সদা-সর্বদা, শুদ্ধ, বিজ্ঞানস্বরূপ, অকর্তা, নির্বিকার, সম এবং নির্গুণই থাকেন।

সম্বন্ধ—তৃতীয় শ্লোকে ভগবান যে ছটি বিষয় বলার ইঙ্গিত করেছিলেন, তার বর্ণনা করে এবার এই অধ্যায়ে বর্ণিত সমস্ত উপদেশ ভালোভাবে বোঝার ফল পরব্রহ্ম পরমাত্মাপ্রাপ্তি—এটি জানিয়ে অধ্যায়ের উপসংহার করছেন—

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্।। ৩৪

এইরূপ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদ এবং প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্য থেকে মুক্তির উপায় যাঁরা জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা তত্ত্বতঃ উপলব্ধি করেন, সেই মহাত্মাগণ পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন ॥ ৩৪

প্রশ্ন—'জ্ঞানচক্ষুষা' পদের অভিপ্রায় কী ? জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদ জানা কাকে বলে ?

উত্তর—দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবান তাঁর নিজের মতে যাকে 'জ্ঞান' বলেছেন এবং পঞ্চম অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকে যাকে অজ্ঞান বিনাশের কারণ বলেছেন, অমানিত্বাদি সাধনার দ্বারা যাঁর প্রাপ্তি হয়, এখানে **'জ্ঞানচক্ষুষা'** পদ সেই 'তত্ত্বজ্ঞানে'রই বাচক।

সেই জ্ঞানের দ্বারা তত্ত্বতঃ বোধগম্য হয় যে, মহাভূতাদি চব্বিশ তত্ত্বের সমুদায়রূপ সমষ্টি শরীরকে বলা হয় 'ক্ষেত্র' ; সেটি পরিবর্তনশীল, বিনাশশীল, বিকারী, জড়, পরিণামী এবং অনিত্য এবং ক্ষেত্রজ্ঞ হলেন তার জ্ঞাতা, যিনি চেতন, নির্বিকার, অকর্তা, নিত্য, অবিনাশী, অসঙ্গ, শুদ্ধ, জ্ঞানস্বরূপ এবং এক। এইরূপ দুটিতে বৈশিষ্ট্য থাকায় ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্র হতে সর্বতোভাবে ভিন্ন। ক্ষেত্রের সঙ্গে তার যে ঐক্য প্রতীত হয় তা অজ্ঞতাজনিত। বাস্তবে ক্ষেত্রজ্ঞের তার সঙ্গে কোনোই সম্বন্ধ নেই। একেই বলে জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা 'ক্ষেত্র' ও 'ক্ষেত্রজ্ঞের' পার্থক্য জানা।

প্রশ্ন—'ভূতপ্রকৃতিমোক্ষম্' কথাটির অভিপ্রায় কী এবং তাকে জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা জানার মানে কী ?

উত্তর—এখানে 'ভূত' শব্দটি প্রকৃতির কার্যরূপ সমস্ত দৃশ্যবর্গের এবং 'প্রকৃতি' তার কারণের বাচক।

সুতরাং কার্যসমেত প্রকৃতি থেকে সর্বথা মুক্ত হয়ে যাওয়াই হল ভূতপ্রকৃতি মোক্ষ। উপরোক্ত প্রকারে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য জানার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্রজ্ঞের প্রকৃতি থেকে পৃথক হয়ে নিজের প্রকৃত পরমাত্মস্বরূপে অভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া—এই হল কার্যসহিত প্রকৃতি হতে মুক্ত হয়ে যাওয়া।

অভিপ্রায় হল যে, মানুষের যেমন কোনো কারণে স্বপ্নে নিজের জাগ্রত অবস্থার স্মৃতি মনে এলে সে বুঝে যায় যে এটা স্বপ্ন, তখন নিজের প্রকৃত দেহে জেগে ওঠাই তার দুঃখ হতে মুক্তি পাবার উপায়। এই ভাব উদয় হলেই সে জেগে ওঠে। তেমনই জ্ঞানযোগীও ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বৈশিষ্ট্যকে বোঝেন এবং তৎসহ এও উপলব্ধি করেন যে অজ্ঞানবশতঃ ক্ষেত্রকে সত্য বস্তু মনে করার জন্যই যেন তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ প্রতীয়মান হচ্ছে। সুতরাং বাস্তবিক সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মস্বরূপে স্থিত হয়ে যাওয়াই হল এর থেকে মুক্ত হওয়া ; এই হল সেই জ্ঞানযোগীর কার্যসহ প্রকৃতি থেকে মুক্ত হওয়া উপলব্ধি করা।

প্রশ্ন—যিনি এঁকে জানেন, তিনি পরমাত্মাকে লাভ করেন। এই কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এর তাৎপর্য হল, উপরোক্ত তত্ত্বজ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞানসহ সমস্ত দৃশ্যের বিনাশ হয় এবং তখনই তিনি পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লাভ করেন।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ

চতুর্দশ অধ্যায়

(গুণত্রয়বিভাগযোগ)

অধ্যায়ের নাম

এই অধ্যায়ে সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিন গুণের স্বরূপ, তার কার্য, কারণ ও শক্তি তথা এগুলি কীভাবে কোন্ অবস্থায় জীবাত্মাকে কীভাবে আবদ্ধ করে এবং কীভাবে এর থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ পরমপদ লাভ করতে পারে ; এবং এই তিনগুণের অতীত হয়ে ঈশ্বরপ্রাপ্ত মানুষের লক্ষণ কী ?—এইসব ত্রিগুণ-সম্বন্ধীয় বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। সাধনকালে প্রথমে রজ ও তম ত্যাগ করে সত্ত্বগুণ গ্রহণ করা এবং শেষে সবগুণ থেকেই সর্বতোভাবে সম্বন্ধ ত্যাগ করা উচিত, এটি বোঝাবার জন্য বিভাগপূর্বক এই তিন গুণের বর্ণনা করা হয়েছে। তাই এই অধ্যায়ের নাম রাখা হয়েছে **'গুণত্রয়বিভাগযোগ'**।

সংক্ষিপ্ত অধ্যায়-সার

এই অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে পূর্বে কথিত জ্ঞানের মহিমা ও সেটি বলার প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থে প্রকৃতি ও পুরুষের সম্বন্ধ দ্বারা সব প্রাণীর উৎপত্তির প্রকার জানিয়ে পঞ্চমে সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিন গুণকে জীবাত্মার বন্ধনের কারণ বলা হয়েছে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম পর্যন্ত সত্ত্ব ইত্যাদি তিন গুণের স্বরূপ ও তার দ্বারা ক্রমানুসারে জীবাত্মার আবদ্ধ হওয়ার প্রকার ক্রমানুসারে বলা হয়েছে। নবমে জীবাত্মাকে কোন্ গুণ কীসে নিযুক্ত করে—তার ইঙ্গিত করে দশমে অন্য দুটি গুণ অবদমন করে কোনো একটি গুণের বৃদ্ধির প্রকার জানিয়ে এগারো থেকে তেরোতম পর্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনগুণের লক্ষণসমূহ ক্রমানুসারে বলেছেন। চোদ্দো এবং পনেরোতমতে তিন গুণের মধ্যে প্রতিটি গুণের বৃদ্ধির সময় দেহত্যাগকারীর গতির নিরূপণ করে ষোলোতে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—তিনপ্রকারের কর্মগুলির অনুরূপ ফল সম্বন্ধে বলা হয়েছে। সতেরোতমতে জ্ঞানের উৎপত্তিতে সত্ত্বগুণ, লোভের উৎপত্তিতে রজোগুণ এবং প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞানের উৎপত্তিতে তমোগুণই কারণ বলে জানিয়েছেন। আঠারোতমতে তিন গুণের মধ্যে প্রত্যেকটিতে স্থিত জীবাত্মার তার গুণের অনুরূপই গতি হয় বলে জানানো হয়েছে। উনিশ ও বিশতমতে সমস্ত কর্ম গুণাদির দ্বারা করা হয় এবং আত্মাকে সর্বগুণের অতীত ও অকর্তা দেখার এবং তিন গুণের অতীত হওয়ার ফল সম্বন্ধে বলেছেন। একুশতমতে অর্জুন গুণাতীত পুরুষের লক্ষণ, আচরণ এবং গুণাতীত হওয়ার উপায় জিজ্ঞাসা করেছেন ; তার উত্তরে বাইশ থেকে পঁচিশতম পর্যন্ত ভগবান গুণাতীতের লক্ষণ, আচরণাদি এবং ছাব্বিশতমতে গুণাদির অতীত হওয়ার উপায় ও তার ফল বর্ণনা করেছেন। তারপর শেষে সাতাশতম শ্লোকে ব্রহ্ম, অমৃত, অব্যয় ইত্যাদি সবই ভগবৎ-স্বরূপ হওয়ায়, তিনি (ভগবান) নিজেকে এই সবের প্রতিষ্ঠা বলে জানিয়ে অধ্যায়ের উপসংহার করেছেন।

সম্বন্ধ—ত্রয়োদশ অধ্যায়ে 'ক্ষেত্র' ও 'ক্ষেত্রজ্ঞে'র লক্ষণসমূহ নির্দেশ করে ঐ দুইয়ের জ্ঞানকেই জ্ঞান বলেছেন এবং সেই অনুসারে ক্ষেত্রের স্বরূপ, স্বভাব, বিকার এবং তার তত্ত্বাদির উৎপত্তির ক্রম ইত্যাদি ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ এবং তার প্রভাবের বর্ণনা করেছেন। সেখানে উনিশতম শ্লোক থেকে প্রকৃতি-পুরুষের নামে প্রকরণ আরম্ভ করে গুণাদিকে প্রকৃতিজনিত বলেছেন। একুশতম শ্লোকে বলেছেন যে পুরুষের বারংবার ভালোমন্দ যোনিতে জন্মের কারণ হল গুণাদির সঙ্গ। গুণাদির বিভিন্ন স্বরূপ কী, সেগুলি জীবাত্মাকে কীভাবে শরীরে আবদ্ধ করে, কোন্ গুণের সঙ্গবশতঃ কোন্ যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হয়, গুণাদি থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় কী ? গুণাদি থেকে মুক্ত ব্যক্তির লক্ষণ ও আচরণ কেমন হয়—স্বাভাবিকভাবে এই সব বিষয় জানার ইচ্ছা হয় ; তাই এই বিষয় স্পষ্ট করার জন্য চতুর্দশ অধ্যায় আরম্ভ করা হয়েছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বর্ণিত জ্ঞানকেই স্পষ্ট করে চতুর্দশ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বোঝানো হয়েছে, তাই ভগবান প্রথম দুই শ্লোকে সেই জ্ঞানের মহত্ত্ব জানিয়ে সেটি পুনরায় বর্ণনা করার কথা বলছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্ জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ॥ ১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে অতি উত্তম সেই পরম জ্ঞানের কথা আমি আবার বলছি, যা জেনে মুনিগণ এই সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরম সিদ্ধি লাভ করেছেন ॥ ১

প্রশ্ন—এখানে '**জ্ঞানানাম্**' পদটি কোন্ জ্ঞানের বাচক এবং তার মধ্যে ভগবান এখানে কোন্ জ্ঞান বর্ণনা করার কথা বলছেন ; সেই জ্ঞানকে অন্য জ্ঞানের থেকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বলা হয় কেন ?

উত্তর—শ্রুতি, স্মৃতি-পুরাণে বিভিন্ন বিষয় বোঝাবার জন্য যে নানাপ্রকারের বহু উপদেশ আছে, সে সবেরই বাচক এখানে '**জ্ঞানানাম্**' পদটি। তার মধ্যে প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ আলোচনা করে পুরুষের বাস্তবিক স্বরূপ প্রত্যক্ষকারক যে তত্ত্বজ্ঞান, এখানে ভগবান সেই জ্ঞান বর্ণনা করার কথা বলছেন। এই জ্ঞান যেহেতু পরমাত্মার স্বরূপ প্রত্যক্ষকারক এবং জীবাত্মাকে প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত করে, তাই এই জ্ঞানকে অন্যান্য জ্ঞানের থেকে উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ (অত্যন্ত উৎকৃষ্ট) বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে '**ভূয়ঃ**' পদ প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—'**ভূয়ঃ**' পদ প্রয়োগের অর্থ হল, পূর্বে এই জ্ঞানের নিরূপণ করা হয়েছে, কিন্তু এটি অত্যন্ত গহন ও দুর্বিজ্ঞেয় হওয়ায় বোঝা কঠিন ; তাই ভালোভাবে বোঝাবার জন্য প্রকারান্তরে পুনরায় তারই বর্ণনা করা হচ্ছে।

প্রশ্ন—'**মুনয়ঃ**' পদ এখানে কীসের বাচক এবং এঁরা সেই জ্ঞানের অনুভূতিতে যা লাভ করেছিলেন সেই '**পরম সিদ্ধি**' কী ?

উত্তর—'**মুনয়ঃ**' পদটি এখানে জ্ঞানযোগের সাধন দ্বারা পরমগতি প্রাপ্ত জ্ঞানীদের বাচক, এবং যাকে 'পরব্রহ্ম প্রাপ্তি' বলা হয়, যার বর্ণনা 'পরম শান্তি', 'আত্যন্তিক সুখ' ও 'অপুনরাবৃত্তি' ইত্যাদি অনেক নামে করা হয়েছে, যেখানে গেলে আর পুনরাগমন হয় না, সেটিই হল মুনিগণ দ্বারা প্রাপ্ত 'পরম সিদ্ধি'।

প্রশ্ন—'**ইতঃ**' পদ কীসের বাচক এবং এটি প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'**ইতঃ**' পদটি '**জগৎ**'-এর বাচক। এর প্রয়োগ করে দেখানো হয়েছে যে ঐসকল মুনিগণের এই মহা দুঃখময় মৃত্যুরূপ জগৎ-সংসার থেকে চিরকালের মতো সম্বন্ধ ছিন্ন হয়েছে।

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥ ২

এই জ্ঞান আশ্রয় করে আমার স্বরূপপ্রাপ্ত পুরুষ সৃষ্টির আদিতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না এবং প্রলয়কালেও ব্যাকুল হন না (অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু অতিক্রম করেন) ॥ ২

প্রশ্ন—'**জ্ঞানম্**'-এর সঙ্গে '**ইদম্**' বিশেষণ প্রয়োগের অর্থ কী এবং এই জ্ঞানের আশ্রয় নেওয়ার তাৎপর্য কী ?

উত্তর—ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যার বর্ণনা করা হয়েছে এবং এই চতুর্দশ অধ্যায়েও যা বর্ণিত হচ্ছে, এই মহিমা সেই জ্ঞানেরই—এই বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য '**জ্ঞানম্**' পদের সঙ্গে '**ইদম্**' বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে। এই প্রকরণে বর্ণিত জ্ঞান অনুসারে প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ জেনে গুণাদিসহ প্রকৃতি হতে সর্বতোভাবে অতীত হয়ে যাওয়া এবং নির্গুণ নিরাকার সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার স্বরূপে অভিন্নভাবে স্থিত হওয়াই হল এই জ্ঞানের আশ্রয় নেওয়া।

প্রশ্ন—এখানে ভগবানের সাধর্ম্য লাভের অর্থ কী ?

উত্তর—আগের শ্লোকে '**পরাং সিদ্ধিং গতাঃ**' দ্বারা যে কথা বলা হয়েছে, এই শ্লোকে '**মম সাধর্ম্যমাগতাঃ**' দ্বারাও সেই কথাই বলা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে

ভগবানের নির্গুণ রূপ অভেদভাবে প্রাপ্ত হয়ে যাওয়াই হল ভগবানের সাধর্ম্য লাভ করা।

প্রশ্ন— ভগবৎপ্রাপ্ত পুরুষ সৃষ্টির আদিতে পুনরায় উৎপন্ন হন না এবং প্রলয়কালেও ব্যাকুল হন না—এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভগবানের অভিপ্রায় হল যে, এই জ্ঞান, যা এই অধ্যায়সমূহে আলোচিত হচ্ছে, তারই আশ্রয়ে সাধনা করে যেসব ব্যক্তি পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে অভেদ বোধে স্বরূপে উপলব্ধি করেছেন, সেই মুক্ত পুরুষগণ মহাসর্গের আদিতে পুনরায় উৎপন্ন হন না এবং প্রলয়কালেও পীড়িত হন না। বস্তুতঃ সৃষ্টি ও প্রলয়ের সঙ্গে তাঁদের কোনোরূপ সম্বন্ধ থাকে না। কারণ ভালো-মন্দ যোনিতে জন্ম হওয়ার প্রধান কারণ হল গুণাদির সঙ্গ এবং মুক্ত পুরুষ গুণাদি থেকে সর্বতোভাবে অতীত (মুক্ত) হন : তাই তাঁদের আর পুনরাগমন হয় না। যখন উৎপত্তি হয় না, তখন আর বিনাশের প্রশ্নই আসে না।

সম্বন্ধ—এইভাবে জ্ঞানের কথা পুনরায় বলার অঙ্গীকার করে এবং তার মহত্ত্ব নিরূপণ করে ভগবান এবার সেই জ্ঞানের বর্ণনা আরম্ভ করে দুটি শ্লোকে প্রকৃতি ও পুরুষ থেকে সমগ্র জগতের উৎপত্তির কথা বলেছেন—

মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥ ৩

হে অর্জুন ! আমার মহৎ-ব্রহ্মরূপ মূলপ্রকৃতি সমস্ত প্রাণীর যোনি অর্থাৎ গর্ভাধানস্থান এবং আমি সেই স্থানে চেতনরূপ গর্ভস্থাপন করি। সেই জড় ও চেতনের সংযোগেই সর্বভূতের (প্রাণীর) উৎপত্তি হয় ॥ ৩

প্রশ্ন—'**মহৎ**' বিশেষণের সঙ্গে '**ব্রহ্ম**' পদ কীসের বাচক এবং তাকে '**মম**' বলার এবং '**যোনিঃ**' নাম দেওয়ার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—সমস্ত জগতের কারণরূপা যে মূলপ্রকৃতি, যাকে 'অব্যক্ত' এবং 'প্রধান'ও বলা হয়, সেই প্রকৃতির বাচক হল '**মহৎ**' বিশেষণের সঙ্গে '**ব্রহ্ম**' পদ। এর ব্যাখ্যা নবম অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে করা হয়েছে। তাকে '**মম**' (আমার) বলায় ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, আমার সঙ্গে এর সম্বন্ধ অনাদি। '**যোনিঃ**' উপাদান কারণ এবং গর্ভাধানের আধারকে বলা হয়। এখানে একে '**যোনি**' নামে উল্লেখ করায় ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, সমস্ত প্রাণীর বিভিন্ন শরীরের এটিই উপাদান কারণ তথা গর্ভাধানের আধার।

প্রশ্ন—এখানে '**গর্ভম্**' পদ কীসের বাচক এবং তাকে মহদ্ব্রহ্মরূপ প্রকৃতিতে স্থাপন করা মানে কী ?

উত্তর—সপ্তম অধ্যায়ে যাকে 'পরা প্রকৃতি' বলা হয়েছে, সেই চেতনসমূহের বাচক হল '**গর্ভম্**' পদটি। মহাপ্রলয়ের সময় নিজ নিজ সংস্কার-সহ পরমেশ্বরে স্থিত জীবসমুদায়কে যে মহাসর্গের আদিতে প্রকৃতির সঙ্গে বিশেষভাবে সম্বন্ধ স্থাপন করানো, সেটিই হল ঐ চেতনসমুদায়ের গর্ভকে প্রকৃতিরূপ যোনিতে স্থাপন করা।

প্রশ্ন—'**ততঃ**' পদ এবং '**সর্বভূতানাম্**' পদ কীসের বাচক এবং তার উৎপত্তি কী ?

উত্তর—'**ততঃ**' পদটি এখানে ভগবান দ্বারা বর্ণিত সেই জড় ও চেতনের সংযোগের বাচক এবং '**সর্বভূতানাম্**' পদটি হল নিজ নিজ কর্ম সংস্কার অনুসারে দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী ইত্যাদি বিভিন্ন শরীরে উৎপন্ন হওয়া প্রাণীদের বাচক। উপরোক্ত জড়-চেতনের সংযোগে যে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিতে সর্বপ্রাণী সূক্ষ্মরূপে প্রকটিত হয়, সেটিই হল তাদের উৎপত্তি। মহাসর্গের আদিতে উপরোক্ত সংযোগের দ্বারা সর্বপ্রথমে হিরণ্যগর্ভের এবং তারপর অন্যান্য ভূত প্রাণীর উৎপত্তি হয়।

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥ ৪

হে কৌন্তেয় ! নানাপ্রকারের যোনিসমূহে যে সমস্ত মূর্তি অর্থাৎ দেহধারী প্রাণী উৎপন্ন হয়, প্রকৃতি তাদের গর্ভধারণকারী মাতা এবং আমি বীজ স্থাপনকারী পিতা ।। ৪

প্রশ্ন—এখানে **'মূর্তয়ঃ'** পদ কাদের বাচক এবং সমস্ত যোনিতে তাদের উৎপন্ন হওয়া কী ?

উত্তর—**'মূর্তয়ঃ'** পদটি দেবতা, মানুষ, রাক্ষস, পশু, পক্ষী ইত্যাদি নানাপ্রকারের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ও আকৃতিসম্পন্ন শরীরযুক্ত সমস্ত প্রাণীর বাচক ; এবং সেই দেবতা, মানুষ, পশু-পক্ষী ইত্যাদি যোনিতে ঐসব প্রাণীর স্থূলরূপে জন্মগ্রহণ করাই হল তাদের উৎপন্ন হওয়া।

প্রশ্ন— ঐসব মূর্তিদের আমি বীজপ্রদানকারী পিতা এবং মহদ্ব্রহ্ম যোনি তাদের মাতা—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর— এর দ্বারা ভগবান দেখিয়েছেন যে, ঐসব মূর্তির যে স্থূল-সূক্ষ্ম শরীর, সেগুলি সব প্রকৃতির অংশ থেকে গঠিত এবং তাতে যে চেতন আত্মা, তা আমার অংশ। এই দুইয়ের সম্বন্ধের দ্বারা সমস্ত মূর্তি অর্থাৎ দেহধারী প্রাণী প্রকটিত হয়। সুতরাং প্রকৃতি তাদের মাতা এবং আমি তাদের পিতা।

সম্বন্ধ—ত্রয়োদশ অধ্যায়ের একুশতম শ্লোকে বলা হয়েছিল যে গুণাদির সঙ্গের জন্যই জীবেদের ভালো-মন্দ যোনিতে জন্মগ্রহণ হয়। সেই অনুসারে জীবেদের নানা প্রকার যোনিতে জন্ম নেওয়ার কথা চতুর্থ শ্লোক পর্যন্ত বলা হয়েছে, কিন্তু সেখানে গুণাদির কথা বলা হয়নি। তাই গুণ কাকে বলে, গুণের সঙ্গ কী, কোন্ গুণের সঙ্গগুণে ভালো এবং কোন্ গুণের সঙ্গদোষে মন্দ যোনিতে জন্ম হয় ?—এই বিষয় স্পষ্ট করার জন্য এই প্রকরণ আরম্ভ করে ভগবান এবার পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্লোক পর্যন্ত প্রথমে ঐ তিন গুণাদির প্রকৃতি হতে উৎপত্তি এবং তাদের বিভিন্ন নাম বলে তারপর তাদের স্বরূপ এবং তাদের দ্বারা জীবাত্মার বন্ধনের প্রকার পৃথকভাবে ক্রমশঃ বর্ণনা করছেন—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ।। ৫

হে মহাবাহো ! সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন এই তিনগুণ অবিনাশী জীবাত্মাকে শরীরে আবদ্ধ করে ।। ৫

প্রশ্ন—**'সত্ত্বম্'**, **'রজঃ'**, **'তমঃ'**— এই তিন পদ প্রয়োগের এবং গুণাদিকে 'প্রকৃতিসম্ভব' বলার অর্থ কী ?

উত্তর—গুণাদির পার্থক্য, নাম ও সংখ্যা বলার জন্য এখানে **'সত্ত্বম্'**, **'রজঃ'** এবং **'তমঃ'**—এই পদগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, গুণ তিন প্রকার, তাদের নাম সত্ত্ব, রজ ও তম এবং এই তিনটি পরস্পর পৃথক। এদের 'প্রকৃতিসম্ভব' বলার অভিপ্রায় হল যে এই তিনটি গুণ প্রকৃতির কার্য এবং সমস্ত জড় পদার্থ এই তিনেরই বিস্তারিত রূপ।

প্রশ্ন—**'দেহিনম্'** পদ প্রয়োগের এবং তাকে অব্যয় বলার অর্থ কী ? ঐ তিনটি গুণের দ্বারা একে শরীরে আবদ্ধ করার কী অর্থ ?

উত্তর—**'দেহিনম্'** পদ প্রয়োগের এই তাৎপর্য যে, যার শরীরে অহং-ভাব থাকে, তার ওপরেই এই গুণাদির প্রভাব পড়ে ; এবং একে 'অব্যয়' বলে দেখানো হয়েছে যে বাস্তবে স্বরূপতঃ এটি সর্বপ্রকার বিকাররহিত এবং অবিনাশী, সুতরাং তার বন্ধন হতেই পারে না। অনাদিসিদ্ধ অজ্ঞতাবশতঃ তাকে বন্ধনগ্রস্ত বলে মানা হয়েছে। এই তিনটি গুণ নিজ নিজ ভাবানুরূপে শরীরে ও ভোগে অহংভাব, মমত্ব ও আসক্তি উৎপন্ন করায়—এটিই হল ঐ তিনগুণের দ্বারা জীবাত্মাকে শরীরে আবদ্ধ করা। অভিপ্রায় হল যে তিনগুণের দ্বারা উৎপন্ন শরীরে এবং তার সঙ্গে সম্বন্ধিত পদার্থে জীবাত্মার যে অভিমান, আসক্তি ও মমত্ব—তাকেই বলা হয় বন্ধন।

সম্বন্ধ—এবার সত্ত্বগুণের স্বরূপ এবং তার দ্বারা জীবাত্মার বন্ধনের প্রকার জানাচ্ছেন—

তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥ ৬

হে নিষ্পাপ ! এই তিনগুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্মল হওয়ায় প্রকাশশীল এবং বিকাররহিত, তা সুখ ও জ্ঞানের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে জীবাত্মাকে আবদ্ধ করে ॥ ৬

প্রশ্ন—'**নির্মলত্বাৎ**' পদ প্রয়োগের এবং সত্ত্বগুণকে প্রকাশক ও অনাময় বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—সত্ত্বগুণের স্বরূপ সর্বদা নির্মল, তাতে কোনোপ্রকার দোষ থাকে না ; তাই সেটি প্রকাশক ও অনাময়। তার দ্বারা অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ বৃদ্ধি পায়। দুঃখ, বিক্ষেপ, দুর্গুণ এবং দুরাচারের বিনাশ হয়ে শান্তিলাভ হয়। সত্ত্বগুণ যখন বৃদ্ধি পায়, তখন মানুষের মনের চাঞ্চল্য স্বতঃই নাশ হয় এবং তিনি সংসারে বীতরাগ ও উপরত হয়ে সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার ধ্যানে মগ্ন হয়ে যান। সেই সঙ্গে তাঁর চিত্ত ও সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দুঃখ ও আলস্যের বিনাশ হয়ে চেতনাশক্তির বৃদ্ধি হয়। '**নির্মলত্বাৎ**' পদ সত্ত্বগুণের এই সব গুণের বোধক এবং সত্ত্বগুণের এই স্বরূপ জানানোর জন্যই তাকে 'প্রকাশক' ও 'অনাময়' বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—সেই সত্ত্বগুণের এই জীবাত্মাকে সুখ ও জ্ঞানের আসক্তি দ্বারা আবদ্ধ করার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—'সুখ' শব্দ এখানে সেই সাত্ত্বিক সুখের বাচক, অষ্টাদশ অধ্যায়ের ছত্রিশ ও সাঁইত্রিশতম শ্লোকে যার লক্ষণ বলা হয়েছে ; সেই সুখপ্রাপ্তির সময় 'আমি সুখী' এই প্রকার অহংবোধে জীবাত্মার সেই সুখের সঙ্গে যে সম্পর্ক স্থাপন হয়, সেইটি তাকে সাধনপথে অগ্রসর হতে বাধা দেয় এবং জীবন্মুক্ত অবস্থা-প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করে রাখে, সুতরাং একেই বলা হয় সত্ত্বগুণের সুখের আসক্তিতে জীবাত্মাকে আবদ্ধ করা।

'জ্ঞান' বোধশক্তির নাম, তা প্রকট হলে তাতে 'আমি জ্ঞানী', এই যে অহংবোধ হয় তা তাকে গুণাতীত অবস্থা থেকে বঞ্চিত করে রাখে, সুতরাং এটিই হল সত্ত্বগুণের জীবাত্মাকে জ্ঞানের আসক্তিতে আবদ্ধ করা।

প্রশ্ন—'**অনঘ**' সম্বোধনের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—পাপকে বলা হয় 'অঘ'। যার মধ্যে পাপের লেশমাত্র থাকে না, তাকে বলা হয় 'অনঘ'। এখানে অর্জুনকে 'অনঘ' নামে সম্বোধন করে ভগবান দেখিয়েছেন যে, তোমার মধ্যে স্বভাবতঃই পাপের অভাব আছে, সুতরাং তোমার বন্ধনের ভয় নেই।

সম্বন্ধ—এবার রজোগুণের স্বরূপ এবং তার দ্বারা জীবাত্মার বন্ধনের প্রকার জানাচ্ছেন—

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্॥ ৭

হে কৌন্তেয় ! রজোগুণের স্বরূপ হল অনুরাগাত্মক (আসক্তিসম্পন্ন) ; সেটি কামনা এবং আসক্তি হতে উৎপন্ন বলে জানবে। এটি জীবাত্মাকে কর্ম ও তার ফলের আসক্তির দ্বারা আবদ্ধ করে ॥ ৭

প্রশ্ন—রজোগুণকে 'রাগাত্মক' বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—রজোগুণ স্বরূপতঃই অনুরাগ অর্থাৎ আসক্তিরূপে প্রকটিত হয়। 'রাগ' (আসক্তি) হল রজোগুণের স্থূলরূপ, তাই এখানে রজোগুণকে 'রাগাত্মক' বলে জানানো হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে রজোগুণকে 'কামনা' ও 'আসক্তি' থেকে উৎপন্ন বলা হয়েছে কেন, কারণ কামনা তো নিজেই রজোগুণ থেকে উৎপন্ন হয় (৩।৩৭ ; ১৪।১২), সুতরাং রজোগুণকে তার কার্য মানা হবে, না কি কারণ ?

উত্তর—কামনা ও আসক্তির দ্বারা রজোগুণ বৃদ্ধি পায় এবং রজোগুণ থেকে কামনা ও আসক্তি বাড়ে। এদের পরস্পর বীজ ও বৃক্ষের ন্যায় অন্যোন্যাশ্রয় সম্বন্ধ। এর মধ্যে রজোগুণ বীজস্থানীয় এবং কামনা, আসক্তি ইত্যাদি হল বৃক্ষস্থানীয়। বীজ বৃক্ষ থেকেই উৎপন্ন হয়, তা সত্ত্বেও বৃক্ষের কারণও বীজ-ই। এই বিষয় স্পষ্ট করার জন্য কোথাও রজোগুণ থেকে কামনাদির উৎপত্তি আবার

কোথাও কামনা ইত্যাদি থেকে রজোগুণের উৎপত্তি বলা হয়েছে। এখানে '**তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্**' পদেরও দুটি অর্থ হয়। তৃষ্ণা (কামনা) এবং সঙ্গ (আসক্তি) থেকে যার সম্যক্ ভাবে উদ্ভব হয় — তাকে রজোগুণ মানা হলে, সেক্ষেত্রে রজোগুণ এগুলির কার্য বলে গণ্য হবে ; এবং তৃষ্ণা ও সঙ্গের সম্যক্ উদ্ভব যার থেকে হয়, তার নাম রজোগুণ বলে মেনে নিলে রজোগুণ তার কারণ বলে গণ্য হবে। বীজ-বৃক্ষের মতো দুটি কথাই ঠিক। তাই এর দুটি অর্থই হওয়া সম্ভব।

প্রশ্ন—কর্মের আসক্তি কী এবং তার দ্বারা রজোগুণের জীবাত্মাকে আবদ্ধ করার কী অর্থ ?

উত্তর—'আমি এই সব কর্ম করি'—কর্মে কর্তৃত্ব-ভাবের এই অহংবোধের ফলে 'আমার ঐ ফল লাভ হবে' এরূপ মনে করে কর্ম এবং তার ফলের সঙ্গে নিজ সম্বন্ধ স্থাপন করার নাম '**কর্মসঙ্গ**'। এর ফলে রজোগুণের দ্বারা জীবাত্মাকে জন্ম-মৃত্যুরূপ জগৎ-সংসারে যে আবদ্ধ করে রাখা, সেটিই হল কর্মসঙ্গের দ্বারা জীবাত্মাকে আবদ্ধ করা।

সম্বন্ধ—এবার তমোগুণের স্বরূপ এবং তার দ্বারা জীবাত্মার বন্ধনের প্রকার জানাচ্ছেন—

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥ ৮

হে অর্জুন ! সকল দেহাভিমানীর মোহগ্রস্তকারক এই তমোগুণকে অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন বলে জানবে। এটি এই জীবাত্মাকে প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রার দ্বারা আবদ্ধ করে॥ ৮

প্রশ্ন—তমোগুণের সকল দেহাভিমানীকে মোহগ্রস্ত করার অর্থ কী ?

উত্তর—অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদিতে জ্ঞানশক্তির অভাব ঘটিয়ে তাতে মোহ উৎপন্ন করাই হল তমোগুণের দ্বারা সব দেহাভিমানীকে মোহগ্রস্ত করা। যাঁদের অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে এবং যাঁদের শরীরে অহং ও মমত্ববোধ থাকে—সেইসব প্রাণী নিদ্রার সময় অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদিতে মোহ উৎপন্ন হওয়ায় নিজেদের মোহগ্রস্ত বলে মনে করেন। কিন্তু যাঁর অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদিসহ শরীরে অহংভাব থাকে না, এরূপ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ সেগুলির সঙ্গে নিজের কোনো সম্বন্ধ মানেন না ; তাই এখানে তমোগুণকে 'সমস্ত দেহাভিমানীদের মোহগ্রস্তকারী' বলা হয়েছে।

প্রশ্ন— তমোগুণকে অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন বলার অভিপ্রায় কী ? সপ্তদশ শ্লোকে অজ্ঞানের উৎপত্তি তো তমোগুণ থেকে বলা হয়েছে ?

উত্তর— তমোগুণ থেকে অজ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং অজ্ঞান থেকে তমোগুণ বাড়ে। এই দুইয়ের মধ্যেও বীজ ও বৃক্ষের ন্যায় অন্যোন্যাশ্রয় সম্বন্ধ, অজ্ঞান বীজস্থানীয় এবং তমোগুণ বৃক্ষস্থানীয়। সেইজন্য কোথাও তমোগুণ থেকে অজ্ঞানের আবার কোথাও অজ্ঞান থেকে তমোগুণের উৎপত্তি বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—'**প্রমাদ**', '**আলস্য**', '**নিদ্রা**'—এই তিনটি শব্দের অর্থ কী এবং এগুলির দ্বারা তমোগুণের জীবাত্মাকে আবদ্ধ করা কী ?

উত্তর — অন্তঃকরণ এবং ইন্দ্রিয়াদির ব্যর্থ চেষ্টার এবং শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য পালনে অবহেলাকে বলা হয় প্রমাদ। কর্তব্য-কর্মে অপ্রবৃত্তিরূপ নিরুদ্যমতাকে বলা হয় আলস্য। তন্দ্রা, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—এ সবের নাম 'নিদ্রা'। এগুলির দ্বারা জীবাত্মাকে মুক্তির সাধন থেকে বঞ্চিত রেখে জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারে আবদ্ধ করে রাখে— এই হল তমোগুণের প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রার দ্বারা জীবাত্মাকে আবদ্ধ করা।

সম্বন্ধ—এইভাবে সত্ত্বঃ, রজঃ ও তম—এই তিনগুণের স্বরূপ এবং তার দ্বারা জীবাত্মার আবদ্ধ হওয়ার প্রকার জানিয়ে এবার ঐ তিনগুণের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ জানাচ্ছেন—

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত॥ ৯

হে অর্জুন ! সত্ত্বগুণ সুখে আসক্ত করে, রজোগুণ কর্মে এবং তমোগুণ জ্ঞানকে আবৃত করে প্রমাদে আসক্ত করে॥ ৯

প্রশ্ন—'সুখ' শব্দ এখানে কোন্ সুখের বাচক এবং সত্ত্বগুণের দ্বারা মানুষকে আসক্ত করার মানে কী ?

উত্তর—'সুখ' শব্দটি এখানে সাত্ত্বিক সুখের বাচক (১৮।৩৬, ৩৭) এবং সত্ত্বগুণের ফলে মানুষকে জাগতিক ভোগ, কর্মপ্রচেষ্টা, প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা থেকে নিবৃত্ত করে আত্মচিন্তা ইত্যাদি দ্বারা সাত্ত্বিক সুখে প্রবৃত্ত করা—এটিই হল সেই ব্যক্তিকে সত্ত্বগুণের সুখে আসক্ত করা।

প্রশ্ন—'**কর্ম**' শব্দটি এখানে কোন্ কর্মের বাচক এবং রজোগুণে মানুষকে আসক্ত করা কী ?

উত্তর—এখানে 'কর্ম' শব্দটি (ইহলোক ও পরলোকের ভোগরূপ ফলপ্রদানকারী) শাস্ত্রবিহিত সকাম কর্মের বাচক। নানাপ্রকার ভোগের আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন করে সেইসব ভোগ প্রাপ্তির জন্য ঐ সকল কর্মে মানুষকে প্রবৃত্ত করাই হল রজোগুণের মানুষকে তাতে সংযুক্ত করা।

প্রশ্ন—তমোগুণের দ্বারা মানুষের জ্ঞান আবৃত করে তাদের প্রমাদে প্রবৃত্ত করার মানে কী ? এই বাক্যে '**তু**' এবং '**উত**' এই দুটি অব্যয়পদ ব্যবহারের অর্থ কী ?

উত্তর—তমোগুণ বৃদ্ধি পেলে কখনও মানুষের কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ণয় করার বিবেকশক্তি নষ্ট করে দেয় আবার কখনও অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়ের চেতনার বিনাশ করে নিদ্রাবৃত্তি উৎপন্ন করে। এই হল তার মানুষের জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করা ; এবং কর্তব্যপালনে অবহেলা করিয়ে ব্যর্থ চেষ্টায় নিযুক্ত করা হল 'প্রমাদে' প্রবৃত্ত করা।

এই বাক্যে '**তু**' অব্যয় প্রয়োগের এই তাৎপর্য যে, তমোগুণ শুধু জ্ঞানকে আবৃত করেই ক্ষান্ত হয় না, অন্য কাজও করে। '**উত**' প্রয়োগের দ্বারা লক্ষ্য করানো হয়েছে যে এটি যেমন জ্ঞানকে আবৃত করে প্রমাদে প্রবৃত্ত করে, তেমনই নিদ্রা ও আলস্যেও প্রবৃত্ত করে। অভিপ্রায় হল যে এটি যখন বিবেকবোধকে আবৃত করে, তখন প্রমাদে তো প্রবৃত্ত করেই আর যখন অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়ের চেতন-শক্তিরূপ জ্ঞানকে ক্ষীণ এবং আবৃত করে, তখন সেটি (তমোগুণ) নিদ্রা ও আলস্যেও প্রবৃত্ত করে।

সম্বন্ধ—সত্ত্বাদি তিনগুণ যখন নিজ নিজ কার্যে জীবকে নিযুক্ত করে, তখন সেইগুলি ঐরূপ করতে কীভাবে সমর্থ হয়, পরের শ্লোকে তা জানাচ্ছেন—

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥ ১০

হে ভারত ! রজোগুণ ও তমোগুণকে অভিভূত করে সত্ত্বগুণ প্রবল হয়, সত্ত্বগুণ ও তমোগুণকে অভিভূত করে রজোগুণ এবং তেমনই সত্ত্বগুণ ও রজোগুণকে অভিভূত করে তমোগুণ প্রবল হয়॥ ১০[১]

প্রশ্ন—রজোগুণ ও তমোগুণকে অভিভূত করে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি পাওয়া কী ?

উত্তর—রজোগুণ ও তমোগুণের প্রবৃত্তি দমন করে যখন সত্ত্বগুণ তার প্রভাব বিস্তার করে, তখন শরীর,

[১]শ্রীমদ্ভাগবতে গুণাদি বৃদ্ধিতে নিম্নলিখিত দশটি হেতু বলা হয়েছে—

আগমোঽপঃ প্রজা দেশঃ কালঃ কর্ম চ জন্ম চ। ধ্যানং মন্ত্রোঽথ সংস্কারো দশৈতে গুণহেতবঃ॥ (১১।১৩।৪)

'শাস্ত্র, জল, সন্তান, দেশ, কাল, কর্ম, জন্ম, চিন্তা, মন্ত্র এবং সংস্কার—এই দশটি হল গুণাদির কারণ অর্থাৎ গুণসমূহের বৃদ্ধিকারক। অভিপ্রায় হল এই যে উপরোক্ত পদার্থগুলি যে গুণসম্পন্ন হয়, সেগুলির সঙ্গ দ্বারা সেই সেই গুণ বৃদ্ধি পায়।

ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণে প্রকাশমানতা, বিবেক এবং বৈরাগ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা অতীব শান্ত ও সুখময় হয়ে যায়। সুতরাং তখন রজোগুণের কার্য লোভ, প্রবৃত্তি ও ভোগ-বাসনাদি এবং তমোগুণের কার্য নিদ্রা, আলস্য এবং প্রমাদ ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব হতে পারে না। এইভাবে দুটি গুণ দমন করে সত্ত্বগুণের জ্ঞান, প্রকাশ ও সুখ ইত্যাদি উৎপন্ন করাই হল রজোগুণ ও তমোগুণকে অভিভূত করে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি পাওয়া।

প্রশ্ন—সত্ত্বগুণ ও তমোগুণকে অভিভূত করে রজোগুণের বৃদ্ধি পাওয়া কী ?

উত্তর—সত্ত্বগুণ এবং তমোগুণের প্রবৃত্তি দমন করে যখন রজোগুণ তার প্রভাব বিস্তার করে, তখন শরীর, ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণে চঞ্চলতা, অশান্তি, লোভ, ভোগবাসনা ও নানাপ্রকার কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার উৎকট আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়। সেইজন্য সেই সময় সত্ত্বগুণের কার্য—প্রকাশমানতা, বিবেকশক্তি, শান্তি ইত্যাদির অভাব হয়। তমোগুণের কার্য—নিদ্রা, প্রমাদ, আলস্য ইত্যাদিও তখন স্তিমিত হয়ে যায়। এই হল সত্ত্বগুণ ও তমোগুণকে অভিভূত করে রজোগুণের বৃদ্ধি পাওয়া।

প্রশ্ন—সত্ত্বগুণ ও রজোগুণকে অভিভূত করে তমোগুণের বৃদ্ধি পাওয়া কী ?

উত্তর—যখন সত্ত্বগুণ ও রজোগুণের প্রবৃত্তি রোধ করে তমোগুণ তার প্রভাব বিস্তার করে, সেই সময় শরীর, ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণে মোহ ইত্যাদি বৃদ্ধি পায় এবং প্রমাদে প্রবৃত্তি হয়, বৃত্তিগুলি বিবেকশূণ্য হয়ে যায়। সুতরাং সত্ত্বগুণের কার্য প্রকাশ ও জ্ঞানের এবং রজোগুণের কার্য কর্মে প্রবৃত্তি ও ভোগবাসনার আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির অভাব হয়ে যায় ; এগুলি প্রকট হতে পারে না। একেই বলে সত্ত্বগুণ ও রজোগুণকে অভিভূত করে তমোগুণের বৃদ্ধি পাওয়া।

সম্বন্ধ—এইভাবে দুটি গুণ অভিভূত করে অপর গুণ বৃদ্ধি পাওয়ার কথা বলা হল। এখন প্রত্যেক গুণ বৃদ্ধির লক্ষণ জানার ইচ্ছা হওয়ায় প্রথমে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধির লক্ষণ বলা হচ্ছে—

সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত॥ ১১

যখন এই দেহের অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদিতে চৈতন্য ও বিবেকবুদ্ধি উৎপন্ন হয়, তখন বুঝতে হবে যে সত্ত্বঃগুণ বৃদ্ধি হয়েছে ॥ ১১

প্রশ্ন—'**যদা**' এবং '**তদা**' এই কালবাচক পদ ও '**বিদ্যাৎ**' ক্রিয়া প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—এগুলি তথা '**বিদ্যাৎ**' ক্রিয়াপদ প্রয়োগ করে ভগবান এই ভাব প্রকাশ করেছেন যে, এই শ্লোকে বলা লক্ষণসমূহের যখন প্রাদুর্ভাব ও বৃদ্ধি হয়, তখন বুঝতে হবে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়েছে। সেই সময় মানুষকে সতর্ক হয়ে তার মনকে ভজন ও ধ্যানে নিযুক্ত রাখার চেষ্টা করা উচিত ; তাহলে সত্ত্বগুণের প্রবৃত্তি দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হতে পারে ; নচেৎ তাকে অবহেলা করলে শীঘ্রই তমোগুণ বা রজোগুণ তাকে অভিভূত করে নিজ নিজ প্রভাব বিস্তার করে অনুরূপ কার্য আরম্ভ করতে পারে।

প্রশ্ন—'**দেহে**'র সঙ্গে '**অস্মিন্**' পদ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'**অস্মিন্**' পদ প্রয়োগ করে ভগবান মনুষ্য-দেহের বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন করেছেন। অভিপ্রায় হল এই শ্লোকে বলা সত্ত্বগুণের বৃদ্ধির সুযোগ মনুষ্যদেহেই পাওয়া সম্ভব এবং এই শরীরেই সত্ত্বগুণের সহায়তায় মানুষ মুক্তি লাভ করতে সক্ষম, অন্য যোনিতে সেই অধিকার নেই।

প্রশ্ন—শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণে প্রকাশ ও জ্ঞান উৎপন্ন হওয়া কী ?

উত্তর—শরীরে চৈতন্যবোধ, লঘুতা এবং ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণে নির্মলতা ও চেতনার আধিক্য হওয়াই হল প্রকাশের উৎপন্ন হওয়া। সত্য-অসত্য ও কর্তব্য-অকর্তব্যের নির্ণয়কারী বিবেকশক্তির জাগ্রত হওয়াই হল '**জ্ঞানে**'র উৎপন্ন হওয়া। যখন প্রকাশ ও জ্ঞান—এই দুটির প্রাদুর্ভাব হয়, তখন স্বতঃই সংসারে বৈরাগ্য হয়ে মনে উপরতি ও সুখ-শান্তির জোয়ার আসে এবং রাগ-দ্বেষ, দুঃখ-শোক, চিন্তা, ভয়, চঞ্চলতা, নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ ইত্যাদির যেন অভাব হয়ে যায়।

সম্বন্ধ—এইভাবে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধির লক্ষণ বর্ণনা করে এবার রজোগুণ বৃদ্ধির লক্ষণ জানাচ্ছেন—

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ॥ ১২

হে ভরতর্ষভ অর্জুন ! রজোগুণ বৃদ্ধি হলে লোভ, প্রবৃত্তি, স্বার্থবুদ্ধিতে সকামকর্মে প্রবৃত্তি, অশান্তি এবং বিষয়ভোগের লালসা—এই সব উৎপন্ন হয় ॥ ১২

প্রশ্ন—'লোভ', 'প্রবৃত্তি', 'কর্মারম্ভ', 'অশান্তি' ও 'স্পৃহা' — এই সবগুলির স্বরূপ কী এবং রজোগুণের বৃদ্ধির সময় এদের উৎপন্ন হওয়ার মানে কী ?

উত্তর—ধনের লালসাকে বলে লোভ, যার জন্য মানুষ প্রতিক্ষণ ধনবৃদ্ধির উপায় চিন্তা করতে থাকে এবং ধন ব্যয় করার সঠিক সময় হলেও তা ব্যয় করে না এবং ধন উপার্জনের সময় কর্তব্য-অকর্তব্যের বিচার ত্যাগ করে অন্যের অধিকারের ওপরও হস্তক্ষেপের ইচ্ছা বা চেষ্টা করতে থাকে। নানাপ্রকার কর্ম করার মানসিক ভাবের জাগৃতিকে বলে 'প্রবৃত্তি'। ঐ সব কর্মগুলিকে সকামভাবে শুরু করাকে বলা হয় 'আরম্ভ'। মানসিক চঞ্চলতাকে বলে 'অশান্তি' এবং কোনো প্রকার সাংসারিক বস্তুকে নিজের জন্য আবশ্যক মনে করাকে বলা হয় 'স্পৃহা'।

রজোগুণ বৃদ্ধি পেলে মানুষের অন্তঃকরণে যখন সত্ত্বগুণের কার্য প্রকাশ, বিচারশক্তি ও শান্তি ইত্যাদি এবং তমোগুণের কার্য নিদ্রা ও আলস্য ইত্যাদি দুপ্রকার ভাবই অভিভূত হয়, তখন তাঁর নানাপ্রকার ভোগের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়, তাঁর চিত্তে লোভ বৃদ্ধি পায়, অর্থ সংগ্রহের বিশেষ ইচ্ছা উৎপন্ন হয়, নানাপ্রকার কর্ম করার জন্য নতুন ভাব জাগ্রত হয়, মন চঞ্চল হয়ে যায় এবং সেই ভাব অনুসারে কাজও আরম্ভ হয়ে যায়। এইরূপ রজোগুণ বৃদ্ধির সময় লোভ ইত্যাদি ভাবের প্রাদুর্ভাব হওয়াই হল রজোগুণের উৎপন্ন হওয়া।

প্রশ্ন—এখানে 'ভরতর্ষভ' সম্বোধনের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভরতবংশীয়দের মধ্যে যিনি উত্তম পুরুষ, তাঁকে বলা হয় ভরতর্ষভ। এখানে অর্জুনকে 'ভরতর্ষভ' নামে সম্বোধিত করে ভগবান বলতে চেয়েছেন যে ভরত-বংশীয়দের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তোমার মধ্যে রজোগুণের কার্যরূপ এই লোভ ইত্যাদি নেই।

সম্বন্ধ—এইভাবে রজোগুণের বৃদ্ধির লক্ষণ বর্ণনা করে এবার তমোগুণ বৃদ্ধির লক্ষণ জানাচ্ছেন—

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন॥ ১৩

হে কুরুনন্দন ! তমোগুণ বৃদ্ধি হলে অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়ে অপ্রকাশ, কর্তব্য-কর্মে অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ বা ব্যর্থ চেষ্টা, নিদ্রাদি ও অন্তঃকরণের মোহিনীবৃত্তি—এইসব উৎপন্ন হয় ॥ ১৩

প্রশ্ন—অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, মোহ—এগুলির পৃথক পৃথক স্বরূপ কী ? এবং তমোগুণ বৃদ্ধির সময় এগুলি উৎপন্ন হওয়ার মানে কী ?

উত্তর—ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের দীপ্তির নাম প্রকাশ এবং তার বিপরীত ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের দীপ্তির অভাব হল 'অপ্রকাশ'। এর দ্বারা সত্ত্বগুণ এবং অন্য ভাবেরও অভাব বলে বুঝতে হবে। দ্বাদশ শ্লোকে কথিত রজোগুণের কার্য প্রবৃত্তির বিরোধী ভাবের অর্থাৎ কোনো কর্তব্য-কর্ম আরম্ভ করার ইচ্ছার অভাবকে বলা হয় 'অপ্রবৃত্তি'। এর দ্বারা রজোগুণের অন্যান্য কাজেরও অভাব বলে বুঝে নিতে হবে। শাস্ত্রবিহিত কর্মের অবহেলা এবং ব্যর্থ চেষ্টার নাম 'প্রমাদ'। বিবেকশক্তির বিরোধী মোহিনী বৃত্তি ও নিদ্রার নাম 'মোহ'।

যখন তমোগুণ বৃদ্ধি পায়, সেইসময় মানুষের ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণে দীপ্তির অভাব হয় ; একেই বলে 'অপ্রকাশ' উৎপন্ন হওয়া। কোনো কর্মই ভালো লাগে না,

শুধু পড়ে থেকে সময় কাটাবার ইচ্ছা হয়, একেই বলে 'অপ্রবৃত্তি' উৎপন্ন হওয়া। শরীর ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বৃথা চেষ্টা করা এবং কর্তব্য-কর্মে অবহেলা করাকে বলা হয় 'প্রমাদ'। মনের মোহিত হওয়া, স্মৃতিভ্রংশ হওয়া, তন্দ্রা, স্বপ্ন বা সুষুপ্তি অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া, বিবেকবুদ্ধির অভাব হওয়া, কোনো বিষয় বোঝার ক্ষমতা না থাকা— এই হল 'মোহ' উৎপন্ন হওয়া। এই সব লক্ষণ তমোগুণ বৃদ্ধিকালে উৎপন্ন হয় ; সুতরাং এর কোনো একটি লক্ষণ নিজের মধ্যে দেখলে মানুষের বোঝা উচিত যে তমোগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সম্বন্ধ—এইভাবে তিনগুণ বৃদ্ধির ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ বলে এবার দুটি শ্লোকে ঐ গুণগুলির মধ্যে কোন্ গুণ বৃদ্ধির সময় মৃত্যু হলে মানুষ কোন্ গতি প্রাপ্ত হন, তা জানানো হচ্ছে—

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে॥ ১৪

যদি মানুষ সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যুপ্রাপ্ত হন, তাহলে তিনি উত্তম উপাসকদের নির্মল দিব্য স্বর্গাদি লোক লাভ করেন ॥ ১৪

প্রশ্ন—'**যদা**' ও '**তদা**'—এই কালবাচক অব্যয় পদ প্রয়োগ করে কী ভাব দেখানো হয়েছে এবং সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিতে মৃত্যুপ্রাপ্ত হওয়ার মানে কী ?

উত্তর—'**যদা**' ও '**তদা**'—কালবাচক এই অব্যয় পদ প্রয়োগ করে এই প্রকরণে এরূপ মানুষের গতি নিরূপণ করা হয়েছে, যাদের স্বাভাবিক স্থিতি ভিন্ন গুণে হলেও মৃত্যুকালে সাত্ত্বিক গুণের বৃদ্ধি হয়। এরূপ মানুষের অন্তকালে পূর্ব সংস্কারাদির ফলে কোনো কারণে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হয়—অর্থাৎ এগারোতম শ্লোকের বর্ণনানুসারে তাঁর শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণে 'প্রকাশ' ও 'জ্ঞান' উৎপন্ন হয় এবং সেই সময়েই স্থূল শরীর থেকে মন, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণের সঙ্গে জীবাত্মার সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়াই হল সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিতে মৃত্যুপ্রাপ্ত হওয়া।

প্রশ্ন—'**দেহভৃৎ**' পদটি প্রয়োগের তাৎপর্য কী ?

উত্তর—'**দেহভৃৎ**' পদ প্রয়োগের এই তাৎপর্য যে, যিনি দেহধারী অর্থাৎ যাঁর শরীরে অহং ও মমত্ব বোধ থাকে, তাঁরই পুনর্জন্মরূপ ভিন্ন-ভিন্ন গতি হয়। যাঁর শরীরে অহং-অভিমান নেই, এরূপ জীবন্মুক্ত মহাত্মাদের পুনরাগমন হয় না।

প্রশ্ন—'**লোকান্**'-এর সঙ্গে '**অমলান্**' বিশেষণ প্রয়োগের এবং '**উত্তমবিদাম্**' পদ প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—'**লোকান্**' পদের সঙ্গে '**অমলান্**' বিশেষণ প্রয়োগের অর্থ হল, সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিতে মৃত্যুপ্রাপ্ত ব্যক্তির যে লোক প্রাপ্তি হয়, সেই লোকে মল অর্থাৎ কোনোপ্রকার দোষ বা ক্লেশ নেই ; তা দিব্য, প্রকাশময়, শুদ্ধ এবং সাত্ত্বিক। এখানে '**উত্তমবিদাম্**' পদে উত্তম শব্দে শাস্ত্রবিহিত কর্ম ও উপাসনা লক্ষ্য করানো হয়েছে। যিনি সেটি জানেন, অর্থাৎ নিষ্কামভাবে কর্মসম্পন্নকারী মানুষকে '**উত্তমবিৎ**' বলা হয়। তাঁরা উক্ত কর্ম উপাসনার প্রভাবে যে লোক প্রাপ্ত করেন, সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিতে মৃত্যুপ্রাপ্ত ব্যক্তি সত্ত্বগুণের প্রভাবে সেই লোকই প্রাপ্ত হন।

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে॥ ১৫

রজোগুণের বৃদ্ধিকালে মানুষ দেহত্যাগ করলে কর্মে আসক্ত মনুষ্যকুলে জন্ম হয় এবং তমোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হলে কীট, পশু ইত্যাদি মূঢ় যোনিতে জন্ম হয় ॥ ১৫

প্রশ্ন—রজোগুণের বৃদ্ধিতে মৃত্যুপ্রাপ্ত হলে কী হয় এবং '**কর্মসঙ্গিষু**' পদের অর্থ কী ? তাতে জন্ম নেওয়ার অর্থ কী ?

উত্তর—যে সময় রজোগুণ বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ দ্বাদশ শ্লোক অনুসারে লোভ, প্রবৃত্তি ইত্যাদি রাজসিক ভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়—সেই সময় স্থূল শরীর থেকে মন, ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সঙ্গে জীবাত্মার যদি সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হয়—সেটিই হল রজোগুণ বৃদ্ধিতে মৃত্যুপ্রাপ্ত হওয়া। কর্ম ও তার ফলে যার আসক্তি থাকে, সেই ব্যক্তিকে '**কর্মসঙ্গী**' বলা হয় ; এবং এরূপ ব্যক্তির মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হওয়াই হল তার 'কর্মসঙ্গী'রূপে জন্মগ্রহণ করা।

প্রশ্ন—তমোগুণের বৃদ্ধিতে মৃত্যু হওয়া এবং মূঢ় যোনিতে উৎপন্ন হওয়ার মানে কী ?

উত্তর—যখন তমোগুণ বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ ত্রয়োদশ শ্লোক অনুসারে 'অপ্রকাশ', 'অপ্রবৃত্তি' এবং 'প্রমাদ' ইত্যাদি তামসিকভাব বেড়ে যায়—তখন স্থূল শরীর থেকে মন, ইন্দ্রিয় ও প্রাণসহ জীবাত্মার যদি সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়, সেটিই হল তমোগুণ বৃদ্ধিতে মৃত্যুপ্রাপ্ত হওয়া। কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতা ইত্যাদি যেসব তামসিক যোনি, তাতে জন্ম নেওয়াই হল মূঢ় যোনিতে উৎপন্ন হওয়া।

সম্বন্ধ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনগুণের বৃদ্ধিতে মৃত্যু হলে তার ভিন্ন ভিন্ন ফল বলা হয়েছে ; তাতে জানতে ইচ্ছা হয় যে এইভাবে কখনও একটি গুণ, কখনও অন্য একটি গুণ কেন বৃদ্ধি পায় ? তাতে বলেছেন—

কর্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্॥ ১৬

সাত্ত্বিক কর্মের সুখ, জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি নির্মল ফল, রাজসিক কর্মের ফল দুঃখ এবং তামসিক কর্মের ফল হল অজ্ঞান॥ ১৬

প্রশ্ন—'**সুকৃতস্য**' বিশেষণের সঙ্গে '**কর্মণঃ**' পদ কোন্ কর্মের বাচক ? তার সাত্ত্বিক ও নির্মল ফল কী ?

উত্তর—যে শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্ম নিষ্কামভাবে করা হয়, সেই সাত্ত্বিক কর্মের বাচক এই '**সুকৃতস্য**' বিশেষণের সঙ্গে '**কর্মণঃ**' পদটি। এরূপ কর্ম সংস্কার দ্বারা অন্তঃকরণে জ্ঞান-বৈরাগ্যের যে নির্মল ভাবের বারবার উৎপত্তি হয় এবং মৃত্যুর পর দুঃখ ও দোষরহিত যে দিব্য প্রকাশময় লোক প্রাপ্তি হয়, সেটিই হল তার 'সাত্ত্বিক ও নির্মল ফল'।

প্রশ্ন—রাজসিক কর্ম কোন্গুলি ? তার ফল দুঃখ কীরূপ ?

উত্তর—যে কর্ম ভোগাদি প্রাপ্তির জন্য অহংকার-পূর্বক অত্যন্ত পরিশ্রমের সঙ্গে করা হয় (১৮।২৪), সেগুলি 'রাজসিক' কর্ম। এরূপ কর্ম করার সময় পরিশ্রমরূপ দুঃখ তো হয়ই, কিন্তু তারপরও সেগুলি দুঃখই দিতে থাকে। তার সংস্কার দ্বারা অন্তরে বারংবার ভোগ, কামনা, লোভ, প্রবৃত্তি ইত্যাদি রাজসিক ভাবের স্ফুরণ হতে থাকে, যাতে মন বিক্ষিপ্ত হয়ে অশান্তি ও দুঃখে ভরে যায়। ঐসব কর্মের ফলস্বরূপ যে ভোগ প্রাপ্তি হয়, তাও অজ্ঞতার জন্য সুখরূপে প্রতীত হলেও বস্তুতঃ তা দুঃখরূপই হয়। ফল ভোগ করার জন্য যে বারংবার জন্ম-মরণ চক্রে আবর্তিত হতে হয়, তা তো মহা দুঃখেরই। এইভাবে এর যা কিছু ফল পাওয়া যায়, সেগুলি সব দুঃখরূপই হয়।

প্রশ্ন—তামসিক কর্ম কোন্গুলি এবং তার ফল অজ্ঞান—এর মানে কী ?

উত্তর—যে কর্ম চিন্তা-ভাবনা না করে মূর্খতাবশতঃ করা হয়, যাতে হিংসাদি দোষ পরিপূর্ণভাবে থাকে (১৮।২৫), তাকে '**তামসিক**' কর্ম বলে। তার সংস্কার দ্বারা অন্তঃকরণে মোহ বৃদ্ধি হয় এবং মৃত্যুর পর যে যোনিতে তমোগুণের আধিক্য থাকে—সেরূপ জড়-যোনিতে জন্ম হয় ; এই হল তার ফল '**অজ্ঞান**' অর্থাৎ মূঢ়যোনী প্রাপ্তি।

প্রশ্ন—এখানে গুণাদির ফলের বর্ণনা করার প্রসঙ্গ ছিল, মাঝখানে কর্মফলের কথা বলা হয়েছে কেন ? এটি অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়।

উত্তর—তা নয়। কারণ আগের শ্লোকগুলিতে প্রত্যেক গুণের বৃদ্ধিতে মৃত্যুর ভিন্ন ভিন্ন ফল বলা হয়েছে, সুতরাং গুণাদি বৃদ্ধির কারণরূপ কর্ম-সংস্কারের কথাও বলা আবশ্যক, তাই কর্মের কথা বলা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—প্রত্যেক মানুষের অন্তরে এই তিন প্রকারের কর্ম সংস্কার সঞ্চিত থাকে ; তার মধ্যে যখন যে সংস্কারের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন সাত্ত্বিক ইত্যাদি ভাব বৃদ্ধি পায় এবং সেই অনুসারে নতুন কর্ম হয়ে থাকে। কর্ম থেকে সংস্কার, সংস্কার থেকে সাত্ত্বিকাদি গুণের বৃদ্ধি এবং তেমনই স্মৃতি ; স্মৃতি অনুযায়ী পুনর্জন্ম এবং পুনরায় কর্মের আরম্ভ—এইভাবে এই চক্র চলতে থাকে। এতে অন্তর্কালীন সাত্ত্বিক ইত্যাদি ভাবের ফলের যে বিশেষত্ব আগের শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে, তাও প্রায়শঃ পূর্বকৃত সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কর্মের সম্বন্ধ থেকেই হয়। এদিকে লক্ষ্য করানোর জন্য এই শ্লোকটি বলা হয়েছে, সুতরাং এটি অপ্রাসঙ্গিক নয় ; কারণ গুণ ও কর্ম—উভয়ের সম্বন্ধ থেকেই ভালো-মন্দ যোনিতে জন্ম প্রাপ্তি হয় (৪।১৩)।

সম্বন্ধ—একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শ্লোকে সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণ বৃদ্ধির লক্ষণসমূহের ক্রমানুযায়ী বর্ণনা করা হয়েছে ; পরে সত্ত্বাদি গুণের বৃদ্ধিতে মৃত্যু হওয়ার ভিন্ন ভিন্ন ফল বলা হয়েছে। তাতে জানতে ইচ্ছে হয় যে 'জ্ঞান' ইত্যাদির উৎপত্তিকে সত্ত্বঃ ইত্যাদি গুণ বৃদ্ধির লক্ষণ মানা হয়েছে কেন ? তাই, কার্যের উৎপত্তির দ্বারা কারণের অস্তিত্ব জানার জন্য জ্ঞানাদির উৎপত্তিতে সত্ত্ব ইত্যাদি গুণকে কারণ বলেছেন—

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ॥ ১৭

সত্ত্বগুণ থেকে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, রজোগুণ থেকে অবশ্যই লোভ এবং তমোগুণ থেকে প্রমাদ, মোহ এবং অজ্ঞান উৎপন্ন হয় ॥ ১৭

প্রশ্ন—সত্ত্বগুণ থেকে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এই কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এখানে 'জ্ঞান' শব্দটি উপলক্ষ্য মাত্র। তাই এই কথার দ্বারা বুঝতে হবে যে, সত্ত্বগুণ থেকেই জ্ঞান, প্রকাশ ও সুখ, শান্তি ইত্যাদি সমস্ত সাত্ত্বিক ভাবের উৎপত্তি হয়।

প্রশ্ন—রজোগুণ থেকে লোভ উৎপন্ন হয়, এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'লোভ' শব্দের প্রয়োগও এখানে উপলক্ষ্য মাত্রে করা হয়েছে। এই কথার দ্বারা এটিও বোঝা উচিত যে লোভ, প্রবৃত্তি, আসক্তি, কামনা, স্বার্থপূর্বক কর্মারম্ভ ইত্যাদি সকল রাজসিকভাবের উৎপত্তি রজোগুণ থেকেই হয়।

প্রশ্ন—প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞানের উৎপত্তি তমোগুণ থেকে জানিয়ে এই বাক্যে 'এব' পদ প্রয়োগ করার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'এব' পদের প্রয়োগের এই অভিপ্রায় যে, তমোগুণ থেকে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান তো উৎপন্ন হয়ই, তাছাড়াও নিদ্রা, আলস্য, অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি ইত্যাদি যতপ্রকার তামসিক ভাব আছে সেসবও তমোগুণ থেকেই উৎপন্ন হয়ে থাকে।

সম্বন্ধ—সত্ত্বঃ ইত্যাদি তিনগুণের কার্য জ্ঞান ইত্যাদির বর্ণনা করে এবার সত্ত্বগুণে স্থিতি করানোর জন্য এবং রজঃ ও তমোগুণের ত্যাগ করানোর জন্য তিনগুণে স্থিত ব্যক্তিদের ভিন্ন ভিন্ন গতির প্রতিপাদন করেছেন—

ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥ ১৮

সত্ত্বগুণে স্থিত ব্যক্তি উচ্চলোকে গমন করেন, রজোগুণে স্থিত ব্যক্তি মধ্যলোকে অর্থাৎ মনুষ্যলোকে

জন্ম নেন এবং নিদ্রা-প্রমাদ-আলস্যাদি তামসিক গুণে স্থিত ব্যক্তিগণ অধোগতি অর্থাৎ কীট, পতঙ্গ, পশু ইত্যাদি নীচ যোনিতে জন্মান অথবা নরক প্রাপ্তি করেন ॥ ১৮[1]

প্রশ্ন—'উর্ধ্বম্' পদ কোন্ স্থানের বাচক এবং সত্ত্বগুণে স্থিত ব্যক্তির তাতে গমন করার মানে কী ?

উত্তর—মনুষ্যলোকের ওপরে যত লোক আছে —চতুর্দশ শ্লোকে যার বর্ণনা **'উত্তমবিদাম্'** ও **'অমলান্'** —এই দুই পদের সঙ্গে **'লোকান্'** পদে করা হয়েছে এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের একচল্লিশতম শ্লোকে যা পুণ্যকর্মকারীর লোক বলে মান্য হয়েছে—তারই বাচক হল এই **'উর্ধ্বম্'** পদটি। সাত্ত্বিক ব্যক্তির মৃত্যুর পর ঐ লোক প্রাপ্ত হওয়াকে বলা হয় ঐ লোকে যাওয়া।

প্রশ্ন—'মধ্যে' পদ কোন্ স্থানের বাচক এবং তাতে রাজসিক পুরুষের অবস্থান করার মানে কী ?

উত্তর—'মধ্যে' পদটি মনুষ্যলোকের বাচক। রাজসিক ব্যক্তির মৃত্যুর পর অন্য লোকে না গিয়ে পুনরায় ইহলোকেই মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করাই হল তাঁর 'মধ্য'তে থাকা।

প্রশ্ন—'জঘন্যগুণ' এবং তার বৃত্তি কী, তাতে স্থিত হওয়া এবং তামসিক ব্যক্তির অধোগতি প্রাপ্ত হওয়া কী ?

উত্তর—'জঘন্য' শব্দের অর্থ নীচ বা নিন্দনীয়। সুতরাং **'জঘন্যগুণ'** তমোগুণের বাচক, তার কার্য হল—প্রমাদ, মোহ, অজ্ঞান, অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, নিদ্রা ইত্যাদি বৃত্তিগুলি। এই সবে ব্যাপৃত থাকাই হল 'তাতে স্থিত হওয়া'। এই সব বৃত্তিতে নিযুক্ত মানুষকে 'তামসিক' ব্যক্তি বলা হয়। সেই তামসিক ব্যক্তিদের দেহত্যাগের পর কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ ইত্যাদি নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করা এবং রৌরব, কুম্ভীপাক ইত্যাদি নরকে গমন করে যমযাতনার ভয়ানক কষ্ট ভোগ করা—এই হল তাদের অধোগতি প্রাপ্ত হওয়া।

প্রশ্ন—তিন গুণ বৃদ্ধিতে মৃত্যুপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রায় এইরূপই ভিন্ন ভিন্ন ফলের কথা চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শ্লোকেও বলা হয়েছে, আবার সেগুলি এখানে বলা হয়েছে কেন ?

উত্তর—পূর্বের শ্লোকে 'যদা' ও 'তদা' এই কালবাচক অব্যয় প্রয়োগ করা হয়েছে ; সুতরাং অন্য গুণে স্বাভাবিক স্থিতি হলেও মৃত্যুকালে যে গুণবৃদ্ধিতে মৃত্যু হয়, সেই অনুসারে গতির পরিবর্তন হয়—এই ভাব দেখাবার জন্য সেখানে ভিন্ন ভিন্ন গতির কথা বলা হয়েছে এবং এখানে যাঁর স্বাভাবিক স্থায়ী স্থিতি সত্ত্বাদি গুণে থাকে, তাঁর গতিভেদের বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং এখানে কোনো পুনরুক্তির দোষ নেই।

প্রশ্ন—পঞ্চদশ শ্লোকে বলা হয়েছে তমোগুণে মৃত্যুর ফল কেবলমাত্র মূঢ়যোনি প্রাপ্ত হওয়া, তাহলে এখানে তামসিক ব্যক্তিদের গতির বর্ণনায় **'অধঃ'** পদের অর্থে নরক ইত্যাদি প্রাপ্তির কথা কেন বলা হল ?

উত্তর—ঐখানে সেইসব সাত্ত্বিক ও রাজসিক মানুষদের গতির বর্ণনা আছে, যাঁরা অন্তঃকালে তমোগুণ বৃদ্ধি হলে মৃত্যুপ্রাপ্ত হন। তাই **'অধঃ'** পদ প্রয়োগ না করে **'মূঢ়যোনিষু'** পদ প্রয়োগ করা হয়েছে ; কারণ এরূপ ব্যক্তিদের ঐ গুণের সঙ্গদোষে একপ জন্ম হয়, যেমন সত্ত্বগুণে স্থিত রাজর্ষি ভরতের হরিণজন্ম প্রাপ্তির কথা শোনা যায়। কিন্তু যে সর্বদাই তমোগুণরূপী কর্মে লিপ্ত তামসিক ব্যক্তি, তার নরক ইত্যাদিও প্রাপ্তি হওয়া সম্ভব। ষোড়শ অধ্যায়ের বিংশতিতম শ্লোকে ভগবান একথাও বলেছেন যে, এইসব তামসিক স্বভাবসম্পন্ন মানুষ আসুরীযোনি প্রাপ্ত হয়ে, তারপর তার থেকেও অধমগতি প্রাপ্ত হয়।

সম্বন্ধ—ত্রয়োদশ অধ্যায়ের একুশতম শ্লোকে বলা হয়েছিল যে গুণাদির সঙ্গই মানুষের ভালো-মন্দ যোনিতে জন্মগ্রহণের কারণ হয় ; সেই অনুসারে এই অধ্যায়ের পঞ্চম থেকে অষ্টাদশ শ্লোক পর্যন্ত গুণাদির স্বরূপ এবং গুণাদির কার্য দ্বারা আবদ্ধ মানুষের গতি ইত্যাদির বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই বর্ণনা দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে মানুষের প্রথমে তম ও রজোগুণ পরিত্যাগ করে সত্ত্বগুণে নিজ স্থিতি করা উচিত ; তারপর সত্ত্বগুণও ত্যাগ করে

[1] মহাভারত, অশ্বমেধপর্বের ঊনচল্লিশতম অধ্যায়ের দশম শ্লোকটিরও এর সঙ্গে সামঞ্জস্য দেখা যায়।

গুণাতীত স্থিতিতে উত্তরণ লাভ করা উচিত। অতএব গুণাতীত হওয়ার উপায় এবং গুণাতীত অবস্থার ফল পরবর্তী দুটি শ্লোকে জানাচ্ছেন—

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥ ১৯

যখন দ্রষ্টা তিনগুণ ভিন্ন অন্য কাকেও কর্তারূপে দেখেন না এবং তিনগুণের অতীত সচ্চিদানন্দঘন স্বরূপ আমাকে পরমাত্মারূপে তত্ত্বতঃ জানেন, তখন তিনি আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হন ॥ ১৯

প্রশ্ন—কালবাচক '**যদা**' অব্যয়ের এবং '**দ্রষ্টা**' শব্দ প্রয়োগের এখানে কী তাৎপর্য ?

উত্তর—এই দুটি প্রয়োগ করে বোঝানো হয়েছে যে, এই শ্লোকে মানুষের স্বাভাবিক স্থিতি থেকে পৃথক বিশিষ্ট স্থিতির বর্ণনা করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে মানুষ স্বাভাবিকভাবে নিজেকে শরীরধারী মনে করে কর্মের কর্তা ও ভোক্তা হয়ে থাকে—সে নিজেকে ঐসব কর্মের ও তার ফলের সঙ্গে সম্বন্ধরহিত, উদাসীন দ্রষ্টা বলে মনে করে না। কিন্তু যখন শাস্ত্র ও আচার্যের উপদেশের সাহায্যে বিবেক লাভ করে সে নিজেকে দ্রষ্টা বলে মনে করতে থাকে, তার সেই সময়ের স্থিতির বর্ণনা এখানে করা হচ্ছে।

প্রশ্ন—গুণাদির থেকে পৃথক্ অন্য কাউকে কর্তা না দেখার মানে কী ?

উত্তর—ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ এবং প্রাণ ইত্যাদির শ্রবণ, দর্শন, খাওয়া-দাওয়া, চিন্তন-মনন, শয়ন, আসন, ব্যবহার আদি সকল স্বাভাবিক কাজ হওয়ার সময় সদা-সর্বদা নিজেকে নির্গুণ নিরাকার সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মে অভিন্নভাবে স্থিত দেখে একরূপ চিন্তা করা যে গুণাদির অতিরিক্ত অন্য কেউ কর্তা নয় ; গুণাদির কার্য ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং প্রাণ ইত্যাদিই গুণসকলের কার্যরূপে ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ে আবর্তিত হচ্ছে (৫।৮, ৯) ; সুতরাং গুণই গুণেতে আবর্তিত হচ্ছে (৩।২৮) ; আমার এর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই—একেই বলা হয় গুণের থেকে পৃথক অন্য কাউকে কর্তা না দেখা।

প্রশ্ন—তিন গুণের থেকে অত্যন্ত অতীত কে এবং তাঁকে তত্ত্বতঃ জানার অর্থ কী ?

উত্তর—তিন গুণের অত্যন্ত অতীত অর্থাৎ সম্বন্ধ-রহিত হলেন সচ্চিদানন্দঘন পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা এবং তাঁকে তিন গুণের থেকে সম্বন্ধরহিত ও নিজেকে সেই নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন মনে করে এবং একমাত্র সেই সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন কোনও সত্তাকে না দেখা—সর্বত্র এবং সদা-সর্বদা শুধু পরমাত্মাকেই দেখা, এই হল তাঁকে তত্ত্বতঃ জানা।

প্রশ্ন—একরূপ স্থিতির পর মদ্ভাব অর্থাৎ ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ কী ?

উত্তর—একরূপ স্থিতির পর যে সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মের অভিন্নভাবে সাক্ষাৎ প্রাপ্তি হয়, সেটিই হল ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হওয়া।

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ২০

দেহ উৎপত্তির কারণস্বরূপ এই তিনগুণ অতিক্রম করে জীব জন্ম-মৃত্যু-জরা ইত্যাদি সমস্ত দুঃখ হতে মুক্ত হয়ে পরমানন্দ লাভ করেন ॥ ২০

প্রশ্ন—এখানে '**দেহী**' পদ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে, যিনি আগে নিজেকে দেহে স্থিত (দেহী) বলে মনে করতেন, তিনিই গুণাতীত হওয়ার পর অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করেন।

প্রশ্ন—'**গুণান্**' পদের সঙ্গে '**এতান্**', '**দেহসমুদ্ভবান্**' ও '**ত্রীন্**'—এই বিশেষণগুলি প্রয়োগের অর্থ কী ? এবং তার গুণাদির অতীত হওয়ার মানে কী ?

উত্তর—'**এতান্**'-এর প্রয়োগের অর্থ হল, এই অধ্যায়ে যে গুণাদির স্বরূপ বলা হয়েছে এবং যা এই জীবাত্মাকে শরীরে আবদ্ধ করে ; তার থেকে অতীত

হওয়ার কথা এখানে বলা হচ্ছে। **'দেহসমুদ্ভবান্'** বিশেষণ প্রয়োগ করে দেখানো হয়েছে যে বুদ্ধি, অহংকার ও মন এবং পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচ মহাভূত ও পাঁচ ইন্দ্রিয়ের বিষয়—এই তেইশটি তত্ত্বের জড়রূপ এই স্থূল শরীর প্রকৃতিজনিত গুণাদিরই কার্য ; অতএব এর সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেওয়াই হল গুণাদিতে লিপ্ত হওয়া। **'ত্রীন্'** বিশেষণ প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন যে এই গুণাদির তিনটি ভাগ এবং তিনটির থেকে সম্বন্ধ ত্যাগ হলেই মুক্তি হয়। রজ ও তমের সম্বন্ধ ত্যাগ হওয়ার পর যদি সত্ত্বগুণের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় থাকে তবে তাও মুক্তিতে বাধা হয়ে পুনর্জন্মের কারণ হতে পারে ; সুতরাং তার সঙ্গে সম্পর্কও ত্যাগ করা উচিত। আত্মা প্রকৃতপক্ষে অসঙ্গ ; গুণাদির সঙ্গে তার কোনোরূপ সম্পর্ক নেই ; তা সত্ত্বেও অনাদিসিদ্ধ অজ্ঞানের দ্বারা এর সঙ্গে যে সম্বন্ধ মানা হয়েছে, সেই সম্বন্ধটি জ্ঞানের সাহায্যে ত্যাগ করা এবং নিজেকে নির্গুণ-নিরাকার সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন ও গুণাদি থেকে সর্বতোভাবে সম্বন্ধরহিত বুঝে নেওয়া অর্থাৎ প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুভব করাই হল গুণাদি থেকে অতীত হয়ে যাওয়া।

প্রশ্ন—জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং দুঃখ থেকে বিমুক্ত হওয়া কী এবং তারপর অমৃতকে অনুভব করা কী ?

উত্তর—জন্ম ও মরণ এবং বাল্য, যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থা শরীরের হয় ; আধিব্যাধি ইত্যাদি সর্বপ্রকার দুঃখও ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণাদির সঙ্ঘাতরূপ শরীরেই ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। সুতরাং যার শরীরের সঙ্গে কিছুমাত্র বাস্তবিক সম্বন্ধ থাকে না, এরূপ ব্যক্তি লোকদৃষ্টিতে শরীরে থেকেও প্রকৃতপক্ষে শরীরের ধর্ম জন্ম, মৃত্যু, জরা ইত্যাদি থেকে সদাসর্বদাই মুক্ত। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে শরীর থেকে সর্বতোভাবে সম্বন্ধরহিত হয়ে যাওয়াই হল জন্ম, মৃত্যু, জরা, দুঃখ থেকে চিরতরে মুক্ত হয়ে যাওয়া। এরপর যে অমৃতস্বরূপ সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মকে অভিন্নভাবে প্রত্যক্ষ করা, ঊনিশতম শ্লোকে যা ভগবদ্‌ভাবের প্রাপ্তি নামে বলা হয়েছে—সেটিই এখানে 'অমৃত'-কে অনুভব করা রূপে ব্যক্ত হয়েছে।

সম্বন্ধ—এইরূপে জীবিত-অবস্থাতেই তিন গুণের অতীত হয়ে মানুষ অমৃত প্রাপ্ত করেন—এই রহস্যময় কথা শুনে গুণাতীত পুরুষের লক্ষণ, আচরণ ও গুণাতীত হওয়ার উপায় জানার আগ্রহে অর্জুন জিজ্ঞাসা করছেন—

অর্জুন উবাচ

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ততে॥ ২১

অর্জুন বললেন—হে ভগবন্ ! এই তিনগুণের অতীত ব্যক্তির কী কী লক্ষণ, তাঁর আচরণ কেমন ? হে প্রভু ! মানুষ কী উপায়ে এই তিনগুণ অতিক্রম করতে পারে ? ২১

প্রশ্ন—**'গুণান্'** পদের সঙ্গে **'এতান্'** এবং **'ত্রীন্'** এই পদগুলি বারংবার প্রয়োগ করার কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—এর এই তাৎপর্য যে, যে তিন গুণের বিস্তারিত বর্ণনা এই অধ্যায়ে করা হয়েছে, সেই তিন গুণ অতিক্রম করার বিষয়ে অর্জুন প্রশ্ন করছেন।

প্রশ্ন—**'তিনি কোন্ কোন্ লক্ষণ দ্বারা যুক্ত হন'** এই বাক্যে অর্জুন কী প্রশ্ন করেছেন ?

উত্তর—এই বাক্যে অর্জুন শাস্ত্রদৃষ্টিতে গুণাতীত ব্যক্তির লক্ষণ জিজ্ঞাসা করেছেন—যা গুণাতীত পুরুষদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে থাকে এবং সাধকদের পক্ষে যা সাধনের লক্ষ্যস্বরূপ।

প্রশ্ন—'কী আচরণ যুক্ত হন' এই বাক্যে কী জিজ্ঞাসা করেছেন ?

উত্তর—এর দ্বারা অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছেন যে গুণাতীত ব্যক্তিদের ব্যবহার কেমন হয় ? অর্থাৎ গুণাতীত ব্যক্তি কার সাথে কেমন আচরণ করেন এবং তাঁর চাল-চলন কেমন হয় ? এইসব বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন।

প্রশ্ন—**'প্রভো'** সম্বোধনের দ্বারা অর্জুন কী বলতে চেয়েছেন ?

উত্তর—ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে **'প্রভো'** সম্বোধন করে অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে আপনি সমগ্র জগতের স্বামী, হর্তা, কর্তা ও সর্বসমর্থ পরমেশ্বর—সুতরাং আপনিই এই

বিষয় সম্পূর্ণভাবে বোঝাতে পারেন এবং তাই আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি।

প্রশ্ন—মানুষ এই তিন গুণের অতীত হন কীভাবে ? এই কথায় কী জিজ্ঞাসা করেছেন ?

উত্তর—এই কথায় অর্জুন 'গুণাতীত' হওয়ার উপায় জিজ্ঞাসা করেছেন। অভিপ্রায় হল যে, আপনি আগে ঊনবিংশতি শ্লোকে গুণাতীত হওয়ার যে উপায় বলেছিলেন—তার থেকেও সহজ এমন কোনো উপায় কী আছে, যার সাহায্যে মানুষ শীঘ্রই অনায়াসে এই তিনগুণ অতিক্রম করতে সক্ষম হন।

সম্বন্ধ—অর্জুন একথা জিজ্ঞাসা করায় ভগবান তাঁর প্রশ্নের মধ্যে থেকে 'লক্ষণ' ও 'আচরণ' বিষয়ে দুটি প্রশ্নের উত্তর চারটি শ্লোকে দিয়েছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥ ২২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে অর্জুন ! সত্ত্বগুণের কার্য প্রকাশ, রজোগুণের কার্য প্রবৃত্তি ও তমোগুণের কার্য মোহ আবির্ভূত হলে যিনি দ্বেষ করেন না এবং এই সকলের নিবৃত্তিও আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনি গুণাতীত ॥ ২২

প্রশ্ন—'**প্রকাশম্**' পদের অর্থ কী ? এখানে সত্ত্বগুণের কার্যগুলির মধ্যে কেবল 'প্রকাশ'-এরই প্রাদুর্ভাব ও তিরোভাবে দ্বেষ ও আকাঙ্ক্ষা না করতে বলা হয়েছে কেন ?

উত্তর—শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণে আলস্য ও জড়ত্ব নাশ হয়ে যে লঘুভাব, নির্মলতা ও চৈতন্য আসে—তার নাম 'প্রকাশ'। গুণাতীত ব্যক্তির মধ্যে জ্ঞান, শান্তি ও আনন্দ নিত্য বিরাজ করে, তার কখনও অভাব হয় না। তাই এখানে সত্ত্বগুণের কার্যগুলির মধ্যে শুধু প্রকাশের কথা বলা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, সত্ত্বগুণের প্রকাশবৃত্তি তাঁর শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণে যদি স্বতঃই আবির্ভূত হয়, তাহলে তিনি তাতে দ্বেষ করেন না এবং যখন তিরোহিত হয় তখন পুনরায় তার আগমনের ইচ্ছা করেন না ; তার আবির্ভাব ও তিরোভাবে সর্বদাই তাঁর একপ্রকার স্থিতি থাকে।

প্রশ্ন—'**প্রবৃত্তিম্**' পদটির অভিপ্রায় কী ? এখানে রজোগুণের কার্যগুলির মধ্যে শুধু 'প্রবৃত্তি'র আবির্ভাব ও তিরোভাবেই দ্বেষ ও ইচ্ছার অভাব দেখাবার মানে কী ?

উত্তর—নানা প্রকার কর্ম করার আকাঙ্ক্ষাকে বলা হয় প্রবৃত্তি। এতদ্ব্যতীত কাম, লোভ, স্পৃহা, আসক্তি ইত্যাদি রজোগুণের যেসব কাজ—তা গুণাতীত পুরুষে থাকে না। কর্মের আরম্ভ গুণাতীতের শরীর-ইন্দ্রিয় দ্বারাই হয়, তা 'প্রবৃত্তি'র অন্তর্গত ; সুতরাং এখানে রজোগুণের কার্যগুলির মধ্যে কেবল 'প্রবৃত্তি'-তেই রাগ-দ্বেষের অভাব দেখানো হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে যখন গুণাতীত ব্যক্তির মনে কোনো কর্ম আরম্ভ করার জন্য ইচ্ছা জাগ্রত হয় বা শরীর দ্বারা সেটি আরম্ভ করা হয়, তখন তিনি তাতে দ্বেষ করেন না এবং তা যখন হয় না, তখনও তিনি তা আকাঙ্ক্ষা করেন না। কোনো স্ফুরণ ও ক্রিয়ার আবির্ভাব ও তিরোভাবে তাঁর স্থিতি সর্বদা একই থাকে।

প্রশ্ন—'**মোহম্**' পদটির অভিপ্রায় কী ? এখানে তমোগুণের কার্যগুলির মধ্যে কেবল 'মোহে'র প্রাদুর্ভাবে ও তিরোভাবেই দ্বেষ ও আকাঙ্ক্ষার অভাব দেখাবার অর্থ কী ?

উত্তর—অন্তঃকরণের যা মোহিনী বৃত্তি—যার দ্বারা মানুষের তন্দ্রা, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ইত্যাদি অবস্থা প্রাপ্তি হয় এবং শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণে সত্ত্বগুণের কার্য প্রকাশের অভাব হয়ে যায়—তার নাম 'মোহ'। এতদ্ব্যতীত অজ্ঞান, প্রমাদ ইত্যাদি তমোগুণের যেসব কার্য, গুণাতীতের মধ্যে তার অভাব হয়ে যায় ; কারণ অজ্ঞান তো জ্ঞানের কাছে আসতে পারে না এবং কর্তৃত্ববোধ না থাকলে আর প্রমাদ করবেই বা কে ? তাই এখানে তমোগুণের কার্যগুলির মধ্যে কেবল 'মোহ'র প্রাদুর্ভাব ও তিরোভাবে রাগ-

দ্বেষের অভাব দেখানো হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, যখন গুণাতীত পুরুষের শরীরে তন্দ্রা, স্বপ্ন বা নিদ্রাদি তমোগুণের বৃত্তি পরিব্যাপ্ত হয় তখন গুণাতীত তাতে দ্বেষ করেন না ; এবং যখন সেগুলি নিবৃত্ত হয়, তখন তিনি তার পুনরাবির্ভাবের ইচ্ছা করেন না। উভয় অবস্থাতেই তাঁর স্থিতি সর্বদা একই থাকে।

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্তন্ত ইত্যেব যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥ ২৩

যেমন সাক্ষীর ন্যায় স্থিত হয়ে (উদাসীনসদৃশ) ব্যক্তি গুণাদির দ্বারা বিচলিত হন না এবং গুণই গুণেতে আবর্তিত হচ্ছে, এরূপ জেনে যিনি সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাতে অভিন্নভাবে স্থিত হন এবং সেই স্থিতি থেকে কখনও বিচ্যুত হন না, (তিনিই গুণাতীত) ॥ ২৩

প্রশ্ন—'উদাসীন' কাকে বলে এবং 'তাঁর মতো স্থিত হওয়া' কী ?

উত্তর—কোনো ঘটনা বা বস্তুতে যে ব্যক্তির কোনো প্রকার সম্বন্ধ থাকে না, তাতে যিনি সর্বথা উপরত থাকেন—তাঁকে বলা হয় 'উদাসীন'। গুণাতীত ব্যক্তির তিন গুণের সঙ্গে এবং তার কার্যরূপ শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ এবং সমস্ত পদার্থ ও ঘটনাবলীর সঙ্গে কোনোপ্রকার সম্বন্ধ না থাকায় তাঁকে উদাসীনের ন্যায় স্থিত দেখায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই স্থিতিও তাঁর ঔপচারিক। তার (সেই স্থিতির) সঙ্গেও তাঁর কোনো সম্বন্ধ থাকে না। এই ভাব বোঝাবার জন্য তাঁকে উদাসীনের ন্যায় স্থিত হওয়া বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—গুণাদির দ্বারা বিচলিত না হওয়া মানে কী ?

উত্তর—যে জীবেদের গুণের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে, ইচ্ছা না থাকলেও এই তিনটি গুণ তাঁদের বলপূর্বক নানাপ্রকার কর্মে ও তার ফলভোগে ব্যাপৃত করে এবং তাঁদের সুখী-দুঃখী করে বিক্ষেপ উৎপন্ন করে ও নানা জন্মে ভ্রমণ করাতে থাকে ; কিন্তু যাঁর এই গুণাদির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না, তাঁর ওপর এই গুণসমূহের কোনো প্রভাব পড়ে না। গুণাদির কার্যরূপ শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের অবস্থার পরিবর্তন এবং নানাপ্রকার সাংসারিক পদার্থের সংযোগ-বিয়োগ হতে থাকলেও তিনি নিজ স্থিতিতে সর্বদা নির্বিকার সমভাবসম্পন্ন থাকেন ; এই হল তাঁর গুণাদির দ্বারা বিচলিত না হওয়া।

প্রশ্ন—গুণই গুণাদিতে আবর্তিত হয়, এটি বোঝা এবং বুঝে 'স্থিত হওয়া' কী ?

উত্তর—তৃতীয় অধ্যায়ের আঠাশতম শ্লোকে **'গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে'** দ্বারা যে কথা বলা হয়েছে, সেই কথাই **'গুণা বর্তন্ত ইত্যেব'** দ্বারা বলা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও প্রাণ ইত্যাদি সমস্ত করণ ও শব্দাদি সমস্ত বিষয়—এ সবই গুণাদির বিস্তার ; অতএব ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি ইত্যাদির যে নিজ নিজ বিষয়ে বিচরণ করা—তা গুণাদিরই গুণাদিতে আবর্তিত হওয়া, এর সঙ্গে আত্মার কোনো সম্বন্ধ নেই। আত্মা নিত্য, চেতন, সর্বতোভাবে আসক্তিহীন, সর্বদা একরসসম্পন্ন সচ্চিদানন্দস্বরূপ—এরূপ জেনে নির্গুণ-নিরাকার সচ্চিদানন্দঘন পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মাতে সর্বদার জন্য যে অভিন্নভাবে নিত্য স্থিত হওয়া, সেটিই হল গুণই গুণাদিতে আবর্তিত হচ্ছে, এই জেনে পরমাত্মাতে 'স্থিত হওয়া'।

প্রশ্ন—'ন ইঙ্গতে' ক্রিয়ার প্রয়োগে কী ভাব পরিস্ফুট হয়েছে ?

উত্তর—**'ন ইঙ্গতে'** ক্রিয়ার অর্থ হল 'নড়ে চড়ে না', সুতরাং এটির প্রয়োগে এই ভাব পরিস্ফুট হয়েছে যে গুণাতীত ব্যক্তিকে গুণ বিচলিত করতে পারে না, শুধু তাই নয় ; তিনি নিজেও তাঁর স্থিতি থেকে কখনও কোনো কালে বিচ্যুত হন না ; কারণ সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্ম পরমাত্মাতে অভিন্নভাবে স্থিত হওয়ার পর জীবের পৃথক অস্তিত্ব থাকে না, তাহলে কে বিচলিত হবে এবং কীভাবে হবে ?

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ।। ২৪

যিনি নিরন্তর আত্মভাবে স্থিত, সুখ-দুঃখে সমবুদ্ধি, মাটি, পাথর ও স্বর্ণে সমভাবাপন্ন, জ্ঞানী, প্রিয়-অপ্রিয়ে সমজ্ঞান, নিন্দা-স্তুতিতে সমবোধসম্পন্ন—।। ২৪

প্রশ্ন—'**স্বস্থঃ**' পদ প্রয়োগ করার কী তাৎপর্য এবং সুখ-দুঃখকে সমান মনে করা কী ?

উত্তর—নিজ বাস্তবিক স্বরূপে স্থিত থাকাকে বলা হয় স্বস্থ। এরূপ স্বস্থ ব্যক্তিই সুখ-দুঃখে সম থাকতে পারেন, এই অর্থে এখানে '**স্বস্থঃ**' পদের প্রয়োগ করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে সাধারণ মানুষদের স্থিতি প্রকৃতির কার্যরূপ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—এই তিন প্রকার শরীরের মধ্যে কোনো একটিতেই থাকে ; সুতরাং তাঁরা 'স্বস্থঃ' নন, বরং 'প্রকৃতিস্থ' এবং এইরূপ পুরুষই প্রকৃতির গুণ ভোগ করেন (১৩।২১), তাই তিনি সুখদুঃখে সম হতে পারেন না। গুণাতীত পুরুষের প্রকৃতি ও তার কার্যের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ থাকে না ; সুতরাং তিনি 'স্বস্থ'—নিজ সচ্চিদানন্দস্বরূপে স্থিত। তাই শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণে সুখ ও দুঃখের আবির্ভাব ও তিরোভাব হতে থাকলেও গুণাতীত ব্যক্তির তার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ না থাকায় তিনি তার দ্বারা সুখী-দুঃখী হন না ; তাঁর স্থিতি সর্বদা সম-ই থাকে। এই হল তাঁর সুখ-দুঃখকে সমজ্ঞান করা।

প্রশ্ন—লোষ্ট, অশ্ম ও কাঞ্চন—এই তিনটি শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ কী ? এবং এই তিনটিতে সমভাব কী ?

উত্তর—গোবর ও মাটি মিশিয়ে মাটির ঘরে যে প্রলেপ দেওয়া হয়, তার উদ্বৃত্ত অংশকে বা লোহার ময়লা অংশকে 'লোষ্ট' বলা হয়। অশ্ম বলা হয় পাথরকে এবং কাঞ্চন হল সোনার অপর নাম। এই তিনটিতে গ্রাহ্য ও ত্যাজ্য বুদ্ধি না থাকাই হল সমভাব। এতে সমত্বের বর্ণনা করার তাৎপর্য হল যে, জগতে যত পদার্থ আছে, যাকে লোকে উত্তম, মধ্যম ও নীচ শ্রেণীর মনে করে—গুণাতীতের সেই সবেতে সমতা হয়, তাঁর দৃষ্টিতে সকল পদার্থ মৃগতৃষ্ণার জলের ন্যায় মায়া সদৃশ হওয়ায় কোনো বস্তুতে তাঁর ভেদবুদ্ধি হয় না।

প্রশ্ন—'**ধীরঃ**' পদটির অর্থ কী ?

উত্তর—জ্ঞানী অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিকে 'ধীর' বলা হয়। গুণাতীত ব্যক্তি অতি বড় সুখ-দুঃখ প্রাপ্তিতেও নিজ স্থিতি থেকে বিচলিত হন না (৬।২১, ২২) ; অতএব তাঁর বুদ্ধি সর্বদাই স্থির থাকে।

প্রশ্ন—'প্রিয়' ও 'অপ্রিয়' শব্দ কীসের বাচক ? তাতে সম থাকা মানে কী ?

উত্তর—যে পদার্থ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির অনুকূল এবং তার পোষক, সহায়ক এবং শান্তিপ্রদানকারী হয়, লোকদৃষ্টিতে তাকে 'প্রিয়' বলে ; এবং যে পদার্থ তার প্রতিকূল, তার ক্ষয়কারক, বিরোধী এবং তাপপ্রদানকারী, তাকে লোকদৃষ্টিতে 'অপ্রিয়' বলে মনে করা হয়। এরূপ নানাপ্রকার পদার্থ ও প্রাণীর সঙ্গে শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের সম্পর্ক স্থাপিত হলেও, কোনো কিছুতে ভেদবুদ্ধি না হওয়াকেই বলা হয় 'সেগুলিতে সম থাকা'।

গুণাতীত ব্যক্তির অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদি সহ শরীরের সঙ্গে কোনোপ্রকার সম্পর্ক না থাকায় তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো পদার্থেই তাঁর ভেদভাব হয় না। অভিপ্রায় হল যে, সাধারণ মানুষের প্রিয় বস্তুর সংযোগে এবং অপ্রিয় বস্তুর বিয়োগে রাগ (আসক্তি) ও হর্ষ এবং অপ্রিয়ের সংযোগে এবং প্রিয়র বিয়োগে দ্বেষ ও শোক হয়ে থাকে ; কিন্তু গুণাতীতের মধ্যে এরূপ হয় না ; তিনি সদা-সর্বদা রাগ-দ্বেষ এবং হর্ষ-শোকের অতীত থাকেন।

প্রশ্ন—নিন্দা ও স্তুতি কাকে বলা হয়, সেগুলিকে তুল্য মনে করা মানে কী ?

উত্তর—কারো সত্য ও মিথ্যা দোষের বর্ণনা করাকে বলা হয় নিন্দা, গুণাদির আলোচনা করাকে বলে স্তুতি ; এই দুটির সম্বন্ধ হয় প্রধানতঃ নামের সঙ্গে আর কিছুটা শরীরের সঙ্গে। গুণাতীত ব্যক্তির 'শরীর' এবং তাঁর 'নামে'র সঙ্গে কোনোরকম সম্বন্ধ না থাকায় তাঁর নিন্দা বা স্তুতিতে শোক বা হর্ষ কিছুই হয় না ; নিন্দাকারীর ওপরও তাঁর ক্রোধ জন্মায় না এবং স্তুতিকারীর ওপরও তিনি প্রসন্ন হন না। তাঁর ভাব সদা-সর্বদা একই প্রকার থাকে, এই হল তাঁর ঐ দুটিতে সম থাকা।

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে।। ২৫

যিনি মান-অপমানে সম, শত্রু-মিত্রেও সম এবং সর্ব কর্মে অহংকর্তৃত্ব ভাব বর্জিত (অহংকেন্দ্রিক উদ্যোগত্যাগী), সেই ব্যক্তিকেই বলা হয় গুণাতীত।। ২৫

প্রশ্ন—মান-অপমানে সম থাকা কাকে বলে ?

উত্তর— মান-অপমানের সম্পর্ক বেশি করে শরীরের সঙ্গে হয়। সুতরাং যে ব্যক্তির শরীরের প্রতি অহং ভাব থাকে, সেই সংসারী মানুষ সম্মানে অনুরাগ ও অপমানে দ্বেষ করেন ; অর্থাৎ তাঁর সম্মানে হর্ষ ও অপমানে শোক হয় এবং তিনি সম্মানকারীদের প্রতি প্রীতি ও অপমানকারীদের প্রতি শত্রুভাব পোষণ করেন। কিন্তু 'গুণাতীত' ব্যক্তির শরীরের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ না থাকায় তাঁর শরীরের সম্মানে হর্ষ হয় না এবং অপমান হলেও শোক হয় না। তাঁর দৃষ্টিতে যার মান-অপমান হয়, যার দ্বারা হয় এবং মান-অপমানরূপ যে কাজ—সে সবই মায়িক এবং স্বপ্নবৎ। সুতরাং মান-অপমানে তাঁর মধ্যে কোনোরূপ রাগ-দ্বেষ এবং হর্ষ-শোক উৎপন্ন হয় না। এই হল তার মান-অপমানে সম-ভাবে থাকা।

প্রশ্ন—মিত্র ও শত্রুর ক্ষেত্রে সম থাকা কাকে বলে ?

উত্তর—গুণাতীত ব্যক্তির যদিও নিজের দিক থেকে কোনো প্রাণীতে মিত্র বা শত্রুভাব হয় না, তাই তাঁর দৃষ্টিতে কোনো মিত্র বা শত্রু নেই ; তবুও লোক নিজ নিজ চিন্তা অনুসারে তাঁর মধ্যে মিত্র ও শত্রুভাব কল্পনা করে।

সেই দৃষ্টিতে ভগবানের এই বক্তব্য যে তিনি মিত্র ও শত্রুর ক্ষেত্রে সম থাকেন। অভিপ্রায় হল যে, সংসারী মানুষ যেমন তাঁর সঙ্গে মিত্রতা পোষনকারীর সঙ্গে, তাঁর আত্মীয় এবং হিতৈষীকারীগণের সঙ্গে আত্মীয়তা ও প্রীতির সম্পর্ক রাখেন এবং তাঁদের জন্য নিজ স্বত্ব ত্যাগ করে তাঁদের সাহায্য করেন ; অপরপক্ষে তাঁর সঙ্গে শত্রুতা পোষণকারী ব্যক্তিদের এবং তাঁদের হিতৈষী ও সম্বন্ধীদের সঙ্গে দ্বেষ করেন, তাদের মন্দ করার ইচ্ছা রাখেন ও তাঁদের ক্ষতি করতে নিজশক্তি ব্যয় করেন— গুণাতীত এইরূপ কার্য করেন না। তিনি উভয়পক্ষের প্রতি সমভাব রাখেন, তাঁর দ্বারা রাগ-দ্বেষ ব্যতীতই সমভাবে সকলের হিতের চেষ্টা হয়, তিনি কারো ক্ষতি করেন না এবং তাঁর কিছুতে ভেদবুদ্ধি হয় না। এই হল তাঁর মিত্র ও শত্রুর ক্ষেত্রে সমভাবে থাকা।

প্রশ্ন—'সর্বারম্ভপরিত্যাগী' কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—'আরম্ভ' শব্দটি এখানে ক্রিয়ামাত্রেরই বাচক, অতএব গুণাতীত ব্যক্তির শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির দ্বারা যা কিছু শাস্ত্রানুকূল ক্রিয়া প্রারব্ধানুসারে লোকসংগ্রহের জন্য অর্থাৎ লোকেদের কুপথ থেকে সরিয়ে সুপথে আনার উদ্দেশ্যে করা হয়—তিনি কোনোভাবেই সেসবের কর্তা হন না। এই অর্থে তাঁকে 'সর্বারম্ভপরিত্যাগী' অর্থাৎ 'সমস্ত ক্রিয়া পূর্ণরূপে ত্যাগকারী' বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—'তাঁকে গুণাতীত বলা হয়'—এই বাক্যের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই বাক্যটির দ্বারা অর্জুনের প্রশ্নগুলির মধ্যে দুটি প্রশ্নের উত্তরের উপসংহার করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে বাইশ, তেইশ, চব্বিশ ও পঁচিশতম শ্লোকগুলিতে যে লক্ষণসমূহের বর্ণনা করা হয়েছে—যিনি ঐসব লক্ষণাদি যুক্ত, তাঁকে 'গুণাতীত' বলা হয়। গুণাতীত ব্যক্তিকে চেনার এই হল লক্ষণ এবং এই হল তাঁর আচার-ব্যবহার। তাই যতক্ষণ অন্তঃকরণে রাগ-দ্বেষ, বৈষম্য, হর্ষ-শোক, অবিদ্যা এবং অহংভাবের লেশমাত্রও থাকে, বুঝতে হবে যে ততক্ষণ তিনি গুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হননি।

সম্বন্ধ— এইভাবে অর্জুনের দুটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এবার গুণাতীত হওয়ার উপায়বিষয়ক তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হচ্ছে। যদিও উনবিংশতি শ্লোকে ভগবান গুণাতীত হওয়ার উপায় হিসাবে, নিজেকে অকর্তা মনে করে নির্গুণ-নিরাকার সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মে নিত্য-নিরন্তর স্থিত থাকার কথা বলেছিলেন এবং উপরোক্ত চারটি শ্লোকে গুণাতীতের যে লক্ষণ ও আচরণাদির বর্ণনা করেছেন—তাকে আদর্শ মনে করে তা ধারণ করার অভ্যাসও গুণাতীত হওয়ার উপায়

বলে মনে করা হয় ; কিন্তু অর্জুন এই উপায় ছাড়াও অন্য কোনো সরল উপায় জানার আগ্রহে প্রশ্ন করেছিলেন, তাই তাঁর প্রশ্নের অনুকূল ভগবান অন্য সরল উপায় বলেছেন—

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।। ২৬

যে ব্যক্তি অব্যভিচারী ভক্তিযোগের দ্বারা আমার নিরন্তর উপাসনা করেন, তিনিও ত্রিগুণাতীত হয়ে সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ম লাভে সক্ষম হন ।। ২৬

প্রশ্ন—'অব্যভিচারী ভক্তিযোগ' কাকে বলে এবং তার দ্বারা ভগবানের নিরন্তর ভজনা করা কীরূপ ?

উত্তর—কেবলমাত্র এক পরমেশ্বরই সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনি আমাদের প্রভু, শরণ গ্রহণযোগ্য, পরমগতি ও পরম আশ্রয় এবং মাতা-পিতা, ভাই-বন্ধু, পরম হিতকারী ও সর্বস্ব। তাঁর থেকে বেশি আপন আমাদের আর কেউ নেই—এরূপ মনে করে তাঁর প্রতি যে স্বার্থরহিত অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্বক অনন্যপ্রেম, যে প্রেমে স্বার্থ, অভিমান এবং ব্যভিচারের বিন্দুমাত্র দোষ নেই, যা সর্বথা ও সর্বদা পূর্ণ এবং অটল, যার বিন্দুমাত্র অংশও ভগবান হতে ভিন্ন বস্তুর প্রতি হয় না এবং যার জন্য ভগবানের ক্ষণমাত্র বিস্মৃতিও অসহ্য হয়ে যায়—সেই অনন্য প্রেমের নাম 'অব্যভিচারী ভক্তিযোগ'।

এরূপ ভক্তিযোগের দ্বারা যে নিরন্তর ভগবানের গুণ, প্রভাব ও লীলাসমূহ শ্রবণ, কীর্তন, মনন, তাঁর নাম উচ্চারণ, জপ এবং তাঁর স্বরূপের চিন্তা ইত্যাদি করতে থাকা এবং মন, বুদ্ধি ও শরীরাদি ও সমস্ত পদার্থ ভগবানেরই মনে করে নিষ্কামভাবে নিজেকে কেবল নিমিত্তমাত্র ভেবে তাঁর নির্দেশ অনুসারে তাঁরই সেবারূপে সমস্ত কর্ম তাঁরই জন্য করতে থাকা—এটিই হল অব্যভিচারী ভক্তিযোগ দ্বারা ভগবানকে নিরন্তর ভজনা করা।

প্রশ্ন—'মাম্' পদ এখানে কীসের বাচক ?

উত্তর—'মাম্' পদ এখানে সর্বশক্তিমান, সর্বান্তর্যামী, সর্বব্যাপী, সর্বাধার, সমস্ত জগতের হর্তাকর্তা, পরম দয়ালু, সকলের সুহৃদ্, পরম প্রেমিক সগুণ পরমেশ্বরের বাচক।

প্রশ্ন—'গুণান্' পদের সঙ্গে 'এতান্' পদ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী এবং উপরোক্ত পুরুষের ঐ গুণাদি থেকে অতীত হওয়া কী ?

উত্তর—'গুণান্' পদের সঙ্গে 'এতান্' বিশেষণ প্রয়োগ করে দেখানো হয়েছে যে, এই অধ্যায়ে যে তিন গুণের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, তারই বাচক এই 'গুণান্' পদ এবং এই তিন গুণের সঙ্গে ও তার কার্যরূপ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সঙ্গে এবং সমস্ত সাংসারিক পদার্থের সঙ্গে কিছুমাত্রও সম্বন্ধ না রাখা হল ঐ গুণাদির অতীত হওয়া।

প্রশ্ন—'ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য হয়ে যান' এই বাক্যের অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা দেখানো হয়েছে যে, উপরোক্ত প্রকারে গুণাতীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ব্রহ্মকে অর্থাৎ সেই নির্গুণ-নিরাকার সচ্চিদানন্দঘন পূর্ণব্রহ্ম, যাকে লাভ করার পর আর কিছু পাওয়ার বাকি থাকে না, তাকে অভিন্নভাবে প্রাপ্ত করার যোগ্য হয়ে ওঠেন এবং তখনই তিনি ব্রহ্মকে লাভ করেন।

সম্বন্ধ—উপরোক্ত শ্লোকে সগুণ পরমেশ্বরের উপাসনার ফল নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্মের প্রাপ্তি বলা হয়েছে এবং ঊনবিংশতি শ্লোকে গুণাতীত অবস্থার ফল ভগবদ্ভাবের প্রাপ্তি এবং বিংশতিতম শ্লোকে 'অমৃতে'র প্রাপ্তি বলা হয়েছে। অতএব ফলের বৈষম্যের আশঙ্কা দূর করার জন্য সবকিছুর ঐক্য প্রতিপাদন করে এই অধ্যায়ের উপসংহার করেছেন—

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ।। ২৭

কারণ সেই অবিনাশী পরব্রহ্মের, অমৃতের এবং সনাতন ধর্মের ও অখণ্ড একরসসম্পন্ন আনন্দের আশ্রয় আমিই ॥ ২৭

প্রশ্ন— '**ব্রহ্মণঃ**' পদের সঙ্গে '**অব্যয়স্য**' বিশেষণ প্রয়োগ করার অভিপ্রায় কী এবং সেই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা আমিই, এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'**ব্রহ্মণঃ**' পদের সঙ্গে '**অব্যয়স্য**' বিশেষণ প্রয়োগ করে এই ভাব দেখানো হয়েছে যে, এখানে 'ব্রহ্ম' পদ প্রকৃতির বাচক নয়, কিন্তু নির্গুণ-নিরাকার পরমাত্মার বাচক এবং তাঁর প্রতিষ্ঠা আমিই ; এই কথাটির এখানে অভিপ্রায় এই যে, সেই ব্রহ্ম (আমি) সগুণ পরমেশ্বর থেকে ভিন্ন নয় এবং আমিও তার থেকে ভিন্ন নই। বাস্তবে আমি ও ব্রহ্ম দুটি বস্তু নয়, একই তত্ত্ব। সুতরাং আগের শ্লোকে যে ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে, তা আমারই প্রাপ্তি। কারণ প্রকৃতপক্ষে এক পরব্রহ্ম পরমাত্মারই অধিকারী-ভেদে উপাসনার জন্য ভিন্ন ভিন্ন রূপ বলা হয়েছে। তার মধ্যে পরমাত্মার যে মায়াতীত, অচিন্ত্য, মন-বাক্যের অতীত নির্গুণ-স্বরূপ, তা তো একই, কিন্তু সগুণ রূপের সাকার ও নিরাকার — এরূপ দুটি ভেদ থাকে। যে স্বরূপের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত, যিনি সকলের আশ্রয়, যিনি নিজ অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা সকলের ধারণ পোষণ করেন, সেটি হল ভগবানের সগুণ অব্যক্ত অর্থাৎ নিরাকার রূপ। শ্রীশিব, শ্রীবিষ্ণু, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখ হলেন ভগবানের সাকাররূপ এবং এই সমস্ত জগৎ হল ভগবানের বিরাটস্বরূপ।

প্রশ্ন—'**অমৃতস্য**' পদ কীসের বাচক এবং 'অমৃতের প্রতিষ্ঠা আমিই' এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—'**অমৃতস্য**' পদ হল যাঁকে প্রাপ্ত হলে মানুষ অমর হয়ে যায় অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুরূপ জগৎ থেকে চিরতরে মুক্ত হয়—সেই ব্রহ্মেরই বাচক। তার প্রতিষ্ঠা নিজেকে বলাতে ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, সেই অমৃতও আমিই, অতএব এই অধ্যায়ের বিশতম শ্লোকে এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে যে 'অমৃত' প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে, তা আমারই প্রাপ্তি।

প্রশ্ন—'**শাশ্বতস্য**' বিশেষণের সঙ্গে '**ধর্মস্য**' পদ কীসের বাচক এবং ভগবানের নিজেকে এরূপ ধর্মের প্রতিষ্ঠা বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যা নিত্যধর্ম, দ্বাদশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে যে ধর্মকে '**ধর্ম্যামৃত**' নাম দেওয়া হয়েছে এবং এই প্রকরণে যা গুণাতীতের লক্ষণের নামে বর্ণিত হয়েছে — তার বাচক হল এখানে '**শাশ্বতস্য**' বিশেষণের সঙ্গে '**ধর্মস্য**' পদটি। নিজেকে এইরূপ ধর্মের প্রতিষ্ঠা বলাতে ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, তাঁরা আমার প্রাপ্তির হেতু হওয়ায় আমারই স্বরূপ ; কারণ এই ধর্মের আচরণকারীরা অন্য কোনো ফল পান না, তাঁরা আমাকেই প্রাপ্ত হন।

প্রশ্ন—'**ঐকান্তিকস্য**' বিশেষণের সঙ্গে '**সুখস্য**' পদ কীসের বাচক এবং তার প্রতিষ্ঠা নিজেকে বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—পঞ্চম অধ্যায়ের একবিংশতিতম শ্লোকে যা 'অক্ষয় সুখে'র নামে, ষষ্ঠ অধ্যায়ের একবিংশতিতম শ্লোকে 'আত্যন্তিক সুখে'র নামে এবং আঠাশতম শ্লোকে 'অত্যন্ত সুখে'র নামে বলা হয়েছে—সেই নিত্য পরমানন্দের বাচক হল এখানে কথিত '**ঐকান্তিকস্য**' বিশেষণের সঙ্গে '**সুখস্য**' পদটি। তার প্রতিষ্ঠারূপে নিজেকে জানিয়ে ভগবান বলতে চেয়েছেন যে সেই নিত্য পরমানন্দ হল আমারই স্বরূপ, আমা ভিন্ন কোনো অন্য বস্তু নয়। সুতরাং তার প্রাপ্তি আমারই প্রাপ্তি।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ

পঞ্চদশ অধ্যায়

(পুরুষোত্তমযোগ)

অধ্যায়ের নাম এই অধ্যায়ে সম্পূর্ণ জগতের কর্তা-হর্তা 'সর্বশক্তিমান' সকলের নিয়ন্তা, সর্বব্যাপী, অন্তর্যামী, পরম দয়ালু, সকলের সুহৃদ, সর্বাধার, শরণ গ্রহণযোগ্য, সগুণ পরমেশ্বর পুরুষোত্তম ভগবানের গুণ, প্রভাব ও স্বরূপের বর্ণনা করা হয়েছে। ক্ষর পুরুষ (ক্ষেত্র), অক্ষর পুরুষ (ক্ষেত্রজ্ঞ), ও পুরুষোত্তম (পরমেশ্বর)—এই তিনের বর্ণনা করে ক্ষর এবং অক্ষর থেকে ভগবান কীভাবে উত্তম, তাঁকে কেন 'পুরুষোত্তম' বলা হয়, তাঁকে পুরুষোত্তম বলে জানার কী মাহাত্ম্য এবং কীভাবে তাঁকে লাভ করা যায়—ইত্যাদি বিষয় ভালোভাবে বোঝানো হয়েছে। এইজন্য এই অধ্যায়ের নাম রাখা হয়েছে 'পুরুষোত্তমযোগ'।

সংক্ষিপ্ত অধ্যায়-সার এই অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে অশ্বত্থবৃক্ষের রূপক দ্বারা সংসারের বর্ণনা করা হয়েছে; তৃতীয়তে সংসার-বৃক্ষের আদি, অন্ত ও প্রতিষ্ঠার উপলব্ধি না করার কথা বলে বৈরাগ্যরূপ দৃঢ় শস্ত্র দ্বারা তা ছেদন করার প্রেরণা দিয়ে চতুর্থতে পরমপদস্বরূপ পরমেশ্বরকে লাভ করার জন্য সেই আদিপুরুষের শরণ গ্রহণ করার জন্য বলা হয়েছে। পঞ্চমে সেই পরমপদ প্রাপ্ত পুরুষদের লক্ষণ জানিয়ে ষষ্ঠতে সেই পরমপদকে পরম প্রকাশময় এবং অপুনরাবৃত্তিশীল বলা হয়েছে। তারপর সপ্তম থেকে একাদশ পর্যন্ত জীবের স্বরূপ, মন ও ইন্দ্রিয়সহ তার এক শরীর থেকে অন্য শরীরে গমনের প্রকার, শরীরে থেকে ইন্দ্রিয় ও মনের সাহায্যে বিষয় উপভোগ করার কথা এবং প্রত্যেক অবস্থাতে স্থিত সেই জীবাত্মাকে জ্ঞানীই জানতে পারেন, অশুদ্ধ অন্তঃকরণযুক্ত ব্যক্তি একে কোনোভাবে জানতে পারে না—ইত্যাদি বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বাদশে সমস্ত জগৎ প্রকাশকারী সূর্য ও চন্দ্রে স্থিত তেজকে ভগবানেরই তেজ বলে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশে ভগবানকে পৃথিবীতে প্রবেশ করে সমস্ত প্রাণীদের ধারণকারী, চন্দ্ররূপে সবাকার পোষণকারী এবং বৈশ্বানররূপে সর্বপ্রকার খাদ্য পরিপাককারী এবং পঞ্চদশে সকলের হৃদয়ে অবস্থিত, সকলের স্মৃতি, জ্ঞান ইত্যাদির কারণ, সমস্ত বেদের দ্বারা জ্ঞাতব্য বিষয়, বেদবেত্তা এবং বেদান্তকর্তা বলে জানিয়েছেন। ষোড়শে সমস্ত প্রাণীকে ক্ষর এবং কূটস্থ আত্মাকে অক্ষর পুরুষ বলে জানিয়ে সপ্তদশে তার থেকে ভিন্ন সর্বব্যাপী, সকলের ধারণ-পোষণকারী, অবিনাশী পরমাত্মাকে পুরুষোত্তম বলা হয়েছে। অষ্টাদশে পুরুষোত্তমের প্রসিদ্ধির হেতুর প্রতিপাদন করে ঊনবিংশতিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পুরুষোত্তম বলে জানার মহিমা এবং বিংশতিতে উপরোক্ত গুহ্যতম বিষয়ের জ্ঞানের মহিমা জ্ঞাপন করে অধ্যায়ের উপসংহার করা হয়েছে।

সম্বন্ধ—চতুর্দশ অধ্যায়ের পঞ্চম থেকে অষ্টাদশ শ্লোক পর্যন্ত তিনগুণের স্বরূপ, তার কার্য এবং তার বন্ধনকারিতা এবং আবদ্ধ মানুষদের উত্তম, মধ্যম এবং অধম গতি ইত্যাদির বিস্তারিত বর্ণনা করে ঊনবিংশতি ও বিংশতি শ্লোকে ঐ গুণাদি থেকে অতীত হওয়ার উপায় এবং ফল বলা হয়েছে। পরে অর্জুনের জিজ্ঞাসায় দ্বাবিংশ থেকে পঞ্চবিংশতি শ্লোক পর্যন্ত গুণাতীত পুরুষের লক্ষণ এবং আচরণাদি বর্ণনা করে ষড়্‌বিংশতম শ্লোকে সগুণ পরমেশ্বরের অব্যভিচারী ভক্তিযোগকে গুণাদির অতীত হয়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য যোগ্য হওয়ার সরল উপায় বলে জানিয়েছেন, অতএব ভগবানে অব্যভিচারী ভক্তিযোগরূপ অনন্য প্রেম উৎপন্ন করানোর উদ্দেশ্যে এবার সেই সগুণ পরমেশ্বর পুরুষোত্তম ভগবানের গুণ, প্রভাব এবং স্বরূপের ও গুণাদির অতীত হওয়ার প্রধান সাধন বৈরাগ্য ও ভগবৎ-শরণাগতির বর্ণনা করার জন্য পঞ্চদশ অধ্যায় আরম্ভ করা হয়েছে। এখানে প্রথমে সংসারে বৈরাগ্য উৎপন্ন করানোর উদ্দেশ্যে তিনটি শ্লোক দ্বারা বৃক্ষের রূপে সংসারের বর্ণনা করে বৈরাগ্যরূপ শস্ত্র দ্বারা তার ছেদন করার জন্য বলেছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥ ১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—আদিপুরুষ পরমেশ্বরই হলেন মূল এবং ব্রহ্মা হলেন প্রধান শাখা, এইরূপ যে সংসাররূপী অশ্বত্থগাছ তাকে অবিনাশী বলা হয় এবং বেদসমূহ তার পাতা। এই সংসাররূপী অশ্বত্থবৃক্ষকে যিনি মূলসহ তত্ত্বতঃ জানেন, তিনিই বেদের প্রকৃত তাৎপর্যের জ্ঞাতা ॥ ১

প্রশ্ন— এখানে '**অশ্বত্থ**' শব্দ প্রয়োগের এবং এই সংসাররূপ বৃক্ষকে '**ঊর্ধ্বমূল**' বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর— সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থকে উত্তম বলে গণ্য করা হয়। তাই তার রূপক দ্বারা সংসারের বর্ণনা করার জন্য এখানে 'অশ্বত্থে'র প্রয়োগ করা হয়েছে। '**মূল**' শব্দ কারণের বাচক। এই সংসারবৃক্ষের উৎপত্তি ও তার বিস্তার আদিপুরুষ নারায়ণের থেকেই হয়েছে, একথা চতুর্থ শ্লোকে এবং অন্যত্রও নানাস্থানে বলা হয়েছে। এই আদিপুরুষ পরমেশ্বর নিত্য, অনন্ত ও সকলের আধার। তিনি সগুণরূপে সবার ওপর নিত্যধামে নিবাস করেন, তাই তাঁকে '**ঊর্ধ্ব**' নামে বলা হয়েছে। এই সংসার বৃক্ষ সেই মায়াপতি সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর থেকেই উৎপন্ন হয়েছে, তাই একে '**ঊর্ধ্বমূল**' অর্থাৎ ওপরদিকে মূলবিশিষ্ট বলা হয়। অভিপ্রায় হল যে অন্য সাধারণ বৃক্ষের মূল নীচে মাটির মধ্যে থাকে, কিন্তু এই সংসারবৃক্ষের মূল ওপরে থাকে—এ অত্যন্ত অলৌকিক ব্যাপার।

প্রশ্ন—এই সংসারবৃক্ষ নীচের দিকে শাখাবিশিষ্ট—একথা বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—সংসারবৃক্ষের উৎপত্তির সময় সর্বপ্রথম ব্রহ্মার উদ্ভব হয়, তাই ব্রহ্মাই এর প্রধান শাখা। ব্রহ্মলোক আদিপুরুষ নারায়ণের নিত্যধামের থেকে নীচে এবং ব্রহ্মার অধিকারও ভগবানের থেকে কম — ব্রহ্মা সেই আদিপুরুষ নারায়ণের থেকেই উৎপন্ন হন এবং তাঁরই শাসনে থাকেন—তাই এই সংসারবৃক্ষকে 'নীচের দিকে শাখাবিশিষ্ট' বলা হয়।

প্রশ্ন —'**অব্যয়ম্**' এবং '**প্রাহুঃ**'—এই দুটি পদ প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—এই দুটি পদের প্রয়োগে ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, যদিও এই সংসারবৃক্ষ পরিবর্তনশীল হওয়ায় বিনাশশীল, অনিত্য ও ক্ষণভঙ্গুর, তা সত্ত্বেও এর প্রবাহ অনাদিকাল হতে চলে আসছে, এই প্রবাহের অন্তও দেখা যায় না ; তাই একে অব্যয় অর্থাৎ অবিনাশী বলা হয়। কারণ এর মূল সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর হলেন নিত্য অবিনাশী, কিন্তু বাস্তবে এই সংসারবৃক্ষ অবিনাশী নয়। যদি এটি অব্যয় হত তাহলে পরবর্তী তৃতীয় শ্লোকে বলা হত না যে, এটির স্বরূপ যেমন বলা হয়, তেমন উপলব্ধি হয় না এবং বৈরাগ্যরূপ দৃঢ় শস্ত্রের দ্বারা ছেদন করার কথাও বলা সম্ভব হত না।

প্রশ্ন—বেদাদিকে এই সংসারবৃক্ষের পাতা বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—পাতা বৃক্ষের শাখা থেকে উৎপন্ন এবং বৃক্ষের রক্ষা ও বৃদ্ধিকারী হয়। বেদও এই সংসাররূপ বৃক্ষের প্রধান শাখারূপ ব্রহ্মা থেকে প্রকটিত হয়েছে এবং বেদবিহিত কর্ম দ্বারাই সংসারের বৃদ্ধি ও রক্ষা হয়, তাই বেদকে পাতার স্থান দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন—যিনি এই সংসার বৃক্ষকে জানেন, তিনি বেদাদিকেও জানেন—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মূলসহ এই সংসার বৃক্ষকে এরূপ তত্ত্বতঃ জানেন যে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের মায়াতে উৎপন্ন এই সংসার জাগতিক বৃক্ষের ন্যায় উৎপত্তি-বিনাশশীল এবং ক্ষণিক। অতএব এর জাঁকজমকে না ভুলে এর উৎপন্নকারী মায়াপতি পরমেশ্বরের শরণ গ্রহণ করা উচিত এবং এরূপ হৃদয়ঙ্গম করে সংসারে বীতরাগ ও উপরত হয়ে যিনি ভগবানের শরণাগত হন তিনিই প্রকৃতপক্ষে বেদবেত্তা। কারণ পঞ্চদশ শ্লোকে বলা হয়েছে সর্ববেদের দ্বারা জ্ঞাতব্য হলেন একমাত্র ভগবান। যিনি সংসার-বৃক্ষের এই স্বরূপ জেনে যান, তিনি এর থেকে উপরত হয়ে

ভগবানের শরণ গ্রহণ করেন এবং ভগবানের শরণ গ্রহণেই সমস্ত বেদের তাৎপর্য—তাইজন্য বলা হয়েছে যে, যিনি সংসারবৃক্ষকে জানেন, তিনিই সকল বেদের যথার্থ জ্ঞাতা।

অধশ্চোর্ধ্বং প্রসৃতাস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে॥ ২

এই সংসারবৃক্ষের তিনগুণরূপী জলের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, বিষয় ভোগরূপ প্রবালবিশিষ্ট, দেবতা, মানুষ ও তির্যকাদি যোনিরূপ শাখাগুলি নিম্নে ও উর্ধ্বে সর্বত্র বিস্তৃত এবং মনুষ্যলোকে কর্ম অনুসারে বন্ধনকারক অহং-বোধ, মমতা ও বাসনারূপ শিকড়ও নিম্নে ও উর্ধ্বে—সমস্ত লোক পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে ॥ ২

প্রশ্ন—এই শাখাগুলিকে গুণাদির দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বলার এবং বিষয়াদিকে প্রবাল বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভালো-মন্দ যোনিতে জন্ম প্রাপ্তি হয় গুণাদির সঙ্গ দ্বারা (১৩।২১) এবং সমস্ত লোক ও প্রাণীদের শরীর হল তিন গুণেরই পরিণাম, এই অভিপ্রায়ে ঐ শাখাগুলিকে গুণাদির দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বলা হয়েছে। ঐ শাখাগুলিতেই রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ—এই পাঁচ বিষয় থাকে ; তাই তাদের প্রবাল বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এই সংসার বৃক্ষের বহু শাখা কী এবং তাদের নীচে ওপরে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া কীরূপ ?

উত্তর—ব্রহ্মলোক থেকে পাতাল পর্যন্ত যত লোক আছে এবং তাতে নিবাসকারী যত প্রাণী আছে, এরাই সকলে এই সংসার-বৃক্ষের বহু শাখা এবং শাখাগুলির নীচে পাতাল পর্যন্ত এবং ওপরে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সর্বত্র বিস্তৃত হওয়াই হল তার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া।

প্রশ্ন—'**মূলানি**' পদ কীসের বাচক, তার নীচে এবং ওপরে সর্বলোকে ব্যাপ্ত হওয়ার কথা বলার অভিপ্রায় কী এবং এটি মনুষ্যলোকে কর্মানুসারে আবদ্ধকারী কীভাবে হয় ?

উত্তর—'**মূলানি**' পদটি এখানে অবিদ্যামূলক 'অহংভাব', 'মমতা' ও 'বাসনা'র বাচক। এই তিনটি ব্রহ্মলোক থেকে পাতাল পর্যন্ত সমস্ত লোকে নিবাসকারী পুনর্জন্মগ্রহণকারী প্রাণীদের অন্তঃকরণে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে, তাই এগুলিকে সর্বত্র ব্যাপ্ত বলা হয়েছে। মনুষ্য শরীরে কর্ম করার অধিকার থাকে এবং মনুষ্য শরীরের দ্বারা অহংভাব, মমতা ও বাসনাপূর্বক করা কর্ম বন্ধনের হেতু বলে মানা হয় ; তাই এই মূল মনুষ্যলোকে কর্মানুসারে আবদ্ধকারী হয়। অন্য সব জন্ম হল ভোগ যোনি, তাতে কর্মের অধিকার নেই ; তাই সেখানে অহংবোধ, মমতা ও বাসনারূপ মূল হলেও, তা কর্মানুসারে আবদ্ধকারী হয় না।

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা॥ ৩

এই সংসারবৃক্ষের সম্বন্ধে যেমন বলা হয় বিচার করলে তেমন উপলব্ধি হয় না, কারণ এর আদিও নেই, অন্তও নেই এবং যথাযথ স্থিতিও নেই। সেইজন্য এই অহংবোধ, মমতা ও বাসনারূপ দৃঢ় মূলসম্পন্ন সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষকে দৃঢ় বৈরাগ্যরূপ শস্ত্রের দ্বারা ছেদন করে—॥ ৩

প্রশ্ন—এই সংসারবৃক্ষের রূপ যেমন বলা হয়েছে, এর তেমন উপলব্ধি হয় না—এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথায় ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, শাস্ত্রে এই সংসারবৃক্ষের যেমন স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে এবং তা দেখে এবং তার সম্বন্ধে শুনে যেমন মনে হয়, ঠিকভাবে বিচার করলে এবং তত্ত্ব-জ্ঞান উদয় হলে তেমন উপলব্ধি হয় না। কারণ বিচারের সময়ও এটি বিনাশশীল ও ক্ষণভঙ্গুর বলে প্রতীত হয় এবং তত্ত্বজ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে চিরতরে সম্পর্ক ত্যাগ হয়ে যায়। তত্ত্বজ্ঞানীর জন্য তার অস্তিত্ব থাকেই না। তাই ষোড়শ

শ্লোকে তার বর্ণনা ক্ষর পুরুষের নামে করা হয়েছে।

প্রশ্ন—এর আদি, অন্ত ও স্থিতি নেই—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথায় সংসারবৃক্ষকে অনির্বচনীয় বলা হয়েছে। বলার অভিপ্রায় হল যে, এটি জগৎকল্পের আদিতে উৎপন্ন হয়ে কল্পের অন্তে লীন হয়ে যায়, এইভাবে আদ্যন্ত প্রসিদ্ধ হয়েও এটি জানা যায় না যে এটির প্রকট হওয়া এবং লয় হওয়ার পরম্পরা কবে থেকে শুরু হয়েছে এবং কতদিন চলতে থাকবে। স্থিতিকালেও এটি নিরন্তর পরিবর্তিত হতে থাকে ; আগের মুহূর্তে যে রূপ ছিল, পরমুহূর্তে তা থাকে না। এইভাবে এই সংসার-বৃক্ষের আদি, অন্ত ও স্থিতি—তিনেরই উপলব্ধি হয় না।

প্রশ্ন—এই সংসারকে 'সুবিরূঢ়মূল' বলার অভিপ্রায় কী, অসঙ্গ-শস্ত্র কী এবং তার সাহায্যে সংসার-বৃক্ষ ছেদন করা কীরূপ ?

উত্তর—এই সংসার-বৃক্ষের অবিদ্যামূলক অহং-ভাব, মমতা ও বাসনারূপ মূল অনাদিকাল থেকে পুষ্ট হতে থাকায় অত্যন্ত দৃঢ় হয়ে গেছে ; অতএব যতক্ষণ মূল থেকে তাকে ছেদন করা না হয়, ততক্ষণ এই সংসার-বৃক্ষের উচ্ছেদ হতে পারে না। বৃক্ষের মতো ওপর থেকে কেটে ফেললেও অর্থাৎ বাহ্যিক সম্বন্ধ ত্যাগ করলেও অহং, মমতা ও বাসনা যতক্ষণ ত্যাগ না করা যায়, ততক্ষণ সংসার-বৃক্ষের ছেদন হয় না। এই অর্থে এবং ঐ মূল ছেদন করা অত্যন্ত দুষ্কর, এটি বোঝাবার জন্যই ঐ বৃক্ষকে অতি দৃঢ় মূলের দ্বারা যুক্ত বলেছেন। বিচার-বিবেচনা দ্বারা সমস্ত জগৎকে বিনাশশীল এবং ক্ষণিক মনে করে ইহলোক ও পরলোকে স্ত্রী-পুত্র, অর্থ-সম্পদ, মান-মর্যাদা, প্রতিষ্ঠা এবং স্বর্গ ইত্যাদি সমস্ত ভোগে সুখ, প্রীতি ও রমণীয়তাতে ভেসে না যাওয়া—সেগুলিতে আসক্তির সম্পূর্ণ অভাব হওয়াই হল দৃঢ় বৈরাগ্য, এখানে তাকেই বলা হয়েছে 'অসঙ্গ-শস্ত্র'। এই অসঙ্গ-শস্ত্র দ্বারা যে চরাচর সমস্ত সংসারের চিন্তা ত্যাগ করা—তার থেকে উপরত হওয়া এবং অহংভাব, মমতা ও বাসনারূপ মূল ছেদন করা—এই হল সংসারবৃক্ষকে দৃঢ় বৈরাগ্যরূপ শস্ত্রের দ্বারা সমূলে ছেদন করা।

সম্বন্ধ—এইভাবে বৈরাগ্যরূপ শস্ত্র দ্বারা সংসাররূপ বৃক্ষকে ছেদন করে কী করা উচিত, এবার তা জানাচ্ছেন—

> ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।
> তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী।। ৪

তারপর সর্বতোভাবে সেই পরমপদরূপ পরমেশ্বরকে অন্বেষণ করা উচিত, যাঁকে প্রাপ্ত হলে জগতে আর ফিরে আসতে হয় না এবং যে পরমেশ্বর হতে এই অনাদি সংসারবৃক্ষের (প্রবৃত্তির) বিস্তার হয়েছে, আমি সেই আদিপুরুষ নারায়ণের শরণাগত হই—এইভাবে দৃঢ় নিশ্চয়যুক্ত হয়ে সেই পরমেশ্বরের মনন ও নিদিধ্যাসন করা উচিত।। ৪

প্রশ্ন—সেই পরমপদ কী এবং তার অন্বেষণ করা কী ?

উত্তর—এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে যাকে **'ঊর্ধ্ব'** বলা হয়েছে, চতুর্দশ অধ্যায়ের ছাব্বিশতম শ্লোকে যাকে **'মাম্'** পদে এবং সাতাশতম শ্লোকে **'অহম্'** পদ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে, অন্যান্য স্থলে যাকে কোথাও পরম পদ, কোথাও অব্যয় পদ, আবার কোথাও পরম গতি এবং কোথাও পরম ধামের নামেও বর্ণনা করা হয়েছে—এখানে তাঁকেই পরম পদ নামে বলা হয়েছে। সেই সর্বশক্তিমান, সর্বাধার পরমেশ্বরকে লাভ করার ইচ্ছায় যে বারংবার তাঁর গুণ ও প্রভাবসহ স্বরূপের মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা অন্বেষণ করতে থাকা—এই হল তাঁর পরমপদ অনুসন্ধান করা। অভিপ্রায় হল যে, তৃতীয় শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে বিচারপূর্বক বৈরাগ্য দ্বারা সংসার থেকে সর্বতোভাবে উপরত হয়ে মানুষের সেই পরমপদস্বরূপ পরমেশ্বরের প্রাপ্তির জন্য মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা তাঁর অনুসন্ধান করা উচিত।

প্রশ্ন—যেখানে গেলে মানুষ আর জগতে ফিরে

আসে না—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর— ভগবানের এই কথার অভিপ্রায় হল, আগের বাক্যে যে পরমপদ অনুসন্ধান করার জন্য বলা হয়েছে, সেই পরমপদ আমিই। অর্থাৎ যে সর্বশক্তিমান, সর্বাধার, সকলের ধারণ-পোষণকারী পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হলে মানুষ আর ফিরে আসে না—সেই পরমেশ্বরকে এখানে '**পরমপদ**' নামে বর্ণনা করা হয়েছে। এই কথা অষ্টম অধ্যায়ের একবিংশতিতম শ্লোকেও উল্লিখিত হয়েছে।

প্রশ্ন—'যা হতে এই পুরাতন প্রবৃত্তির বিস্তার হয়েছে' এই বাক্যের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর অভিপ্রায় হল যে, যে আদিপুরুষ পরমেশ্বর হতে এই সংসার বৃক্ষের অনাদি পরম্পরা চলে আসছে এবং যাঁর থেকে এটি উৎপন্ন হয়ে বিস্তার লাভ করেছে, তাঁর শরণ গ্রহণ করলে চিরকালের মতো এই সংসার বৃক্ষের সম্বন্ধ থেকে মুক্ত হয়ে আদিপুরুষ পরমাত্মাকে লাভ করা সম্ভব।

প্রশ্ন—'**তম্**' ও '**আদ্যম্**' এই দুই পদের সঙ্গে '**পুরুষম্**' পদ কীসের বাচক এবং '**প্রপদ্যে**' ক্রিয়ার প্রয়োগ করে এখানে কী ভাব ব্যক্ত হয়েছে ?

উত্তর—'**তম্**' ও '**আদ্যম্**' এই দুটি পদের সঙ্গে '**পুরুষম্**' পদ সেই পুরুষোত্তম ভগবানের বাচক, যাঁর বর্ণনা আগে '**তৎ**' এবং '**পদম্**' দ্বারা করা হয়েছে এবং যাঁর মায়াশক্তির দ্বারা এই চিরকালীন সংসারবৃক্ষের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি বলা হয়েছে। '**প্রপদ্যে**' ক্রিয়ার অর্থ '**আমি তাঁর শরণাগত**'। অতএব এর প্রয়োগে ভগবানের অভিপ্রায় হল, সেই পরমপদস্বরূপ পরমেশ্বরের আশ্রিত হয়ে তাঁর অনুসন্ধান করা উচিত। অভিপ্রায় হল যে নিজের মনে কোনোরূপ অহংভাব পোষণ না করে, সর্বপ্রকারে অনন্য আশ্রয়পূর্বক একমাত্র পরমেশ্বরের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে তাঁর ভরসায় উপরোক্ত প্রকারে তাঁর অন্বেষণ করা উচিত।

প্রশ্ন—'**এব**' অব্যয় প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—'**এব**' অব্যয় প্রয়োগের অর্থ হল, তাঁর প্রাপ্তির জন্য একমাত্র সেই পরমেশ্বরেরই শরণাগত হওয়া উচিত।

সম্বন্ধ—এবার উপরোক্ত প্রকারে আদিপুরুষ পরমপদস্বরূপ পরমেশ্বরের শরণাগত হয়ে তাঁকে প্রাপ্ত করা পুরুষদের লক্ষণ জানাচ্ছেন—

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ।। ৫

যাঁদের মান এবং মোহ বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে, যাঁরা আসক্তি জয় করেছেন, যাঁদের পরমাত্মার স্বরূপে নিত্য-স্থিতি এবং যাঁদের কামনা সম্পূর্ণভাবে নিবৃত্ত হয়েছে—সেই সকল সুখ-দুঃখ নামক দ্বন্দ্ববিমুক্ত জ্ঞানী ব্যক্তি অবিনাশী পরমপদ লাভ করেন।। ৫

প্রশ্ন—'**নির্মানমোহাঃ**' কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'মান' শব্দের দ্বারা এখানে মান-মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা বোঝায় এবং 'মোহ' শব্দ অবিবেক, বিপর্যয়-জ্ঞান এবং ভ্রম ইত্যাদি তমোগুণরূপী ভাবের বাচক। এই দুটি থেকে যিনি রহিত—অর্থাৎ যিনি জাতি, গুণ, ঐশ্বর্য এবং বিদ্যা ইত্যাদির সম্বন্ধে নিজের মধ্যে বিন্দুমাত্র শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান পোষণ করেন না এবং যাঁর মান-মর্যাদা বা প্রতিষ্ঠাতে এবং অবিবেক ও ভ্রম ইত্যাদি তমোগুণের ভাবের সঙ্গে লেশমাত্র সম্বন্ধ থাকে না—সেইরূপ ব্যক্তিকে বলা হয় '**নির্মানমোহাঃ**'।

প্রশ্ন—'**জিতসঙ্গদোষাঃ**' কথার অর্থ কী ?

উত্তর—'সঙ্গ' শব্দ এখানে আসক্তির বাচক। যিনি এই আসক্তিরূপ দোষ চিরতরে জয় করেছেন, যাঁর ইহলোক ও পরলোকের ভোগে বিন্দুমাত্র আসক্তি নেই, বিষয়াদির সঙ্গে সম্বন্ধ হলেও যাঁর অন্তঃকরণে কোনোপ্রকার বিকার উৎপন্ন হয় না—এরূপ ব্যক্তিকে বলা হয় '**জিতসঙ্গদোষাঃ**'।

প্রশ্ন—'**অধ্যাত্মনিত্যাঃ**' কথার তাৎপর্য কী ?

উত্তর—'অধ্যাত্ম' শব্দটি এখানে পরমাত্মার স্বরূপের বাচক। সুতরাং পরমাত্মার স্বরূপে যাঁর নিত্যস্থিতি, যাঁর মুহূর্তমাত্রের জন্যও পরমাত্মার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় না এবং যাঁর স্থিতি সর্বদা অটল থাকে—এরূপ ব্যক্তিকে 'অধ্যাত্মনিত্যাঃ' বলা হয়।

প্রশ্ন—'বিনিবৃত্তকামাঃ' কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—'কাম' শব্দ এখানে সর্বপ্রকার ইচ্ছা, তৃষ্ণা, অপেক্ষা, বাসনা এবং স্পৃহা ইত্যাদি ন্যূনাধিক প্রভেদ সম্পন্ন মনোবৃত্তিরূপ কামনার বাচক। অতএব যাঁর সর্বপ্রকারের কামনা সর্বতোভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে, যাঁর মধ্যে ইচ্ছা, কামনা, তৃষ্ণা এবং বাসনা ইত্যাদির লেশমাত্রও অস্তিত্ব নেই—এরূপ ব্যক্তিকে বলা হয় 'বিনিবৃত্তকামাঃ'।

প্রশ্ন—সুখ-দুঃখরূপ দ্বন্দ্ব কী ? তার থেকে বিমুক্ত হওয়া কাকে বলে ?

উত্তর—শীত-গ্রীষ্ম, প্রিয়-অপ্রিয়, মান-অপমান, স্তুতি-নিন্দা ইত্যাদি দ্বন্দ্বগুলি সুখ ও দুঃখের কারণ হওয়ায় তাদের সুখ-দুঃখ সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এই সবের সঙ্গে কোনোপ্রকার সম্বন্ধ না রাখা অর্থাৎ কোনো দ্বন্দ্বের সংযোগ-বিয়োগে বিন্দুমাত্রও রাগ-দ্বেষ, হর্ষ-শোকাদি বিকার উৎপন্ন না হওয়াই হল ঐসব দ্বন্দ্ব থেকে চিরতরে মুক্ত হওয়া। তাই এরূপ ব্যক্তিদের সুখ-দুঃখনামক দ্বন্দ্ব থেকে বিমুক্ত বলা হয়।

প্রশ্ন—'অমূঢ়াঃ' পদটির অর্থ কী ?

উত্তর—যাঁর মধ্যে মূঢ়তা বা অজ্ঞানের লেশমাত্র থাকে না, সেই জ্ঞানী মহাত্মাদের বাচক হল এই 'অমূঢ়াঃ' পদটি। উপরোক্ত সমস্ত বিশেষণের এটিই বিশেষ্য। এর প্রয়োগ করে ভগবান দেখিয়েছেন যে 'নির্মানমোহাঃ' ইত্যাদি সমস্ত গুণাদি যুক্ত জ্ঞানিগণই পরমপদ প্রাপ্ত হন।

প্রশ্ন—সেই অবিনাশী পরমপদ কী এবং তাকে প্রাপ্ত হওয়া কীরূপ ?

উত্তর—চতুর্থ শ্লোকে যে পদ অনুসন্ধান করার জন্য এবং যে আদি-পুরুষের শরণাগত হতে বলা হয়েছে—সেই সর্বশক্তিমান, সর্বাধার পরমেশ্বরের বাচক হল অবিনাশী পরমপদ। সেই পরমেশ্বরের মায়া দ্বারা বিস্তারপ্রাপ্ত এই সংসার বৃক্ষ হতে সর্বতোভাবে অতীত হয়ে সেই পরমপদস্বরূপ পরমেশ্বরকে লাভ করাই হল অব্যয় পদ প্রাপ্ত হওয়া।

সম্বন্ধ—উপরোক্ত লক্ষণযুক্ত পুরুষ যাঁকে প্রাপ্ত করেন, সেই অবিনাশী পদ কেমন ? এই জিজ্ঞাসা হওয়ায় সেই পরমেশ্বরের স্বরূপভূত পরমপদের মহিমা জানাচ্ছেন—

ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ[1]।
যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ ৬

যে পরমপদ প্রাপ্ত হলে মানুষ আর সংসারে ফিরে আসে না এবং যে স্বয়ংপ্রকাশ পরমপদকে সূর্য, চন্দ্র বা অগ্নি কেউই প্রকাশ করতে পারে না, সেটিই হল আমার পরম ধাম॥ ৬

প্রশ্ন—যাঁকে প্রাপ্ত হলে মানুষ আর ফিরে আসে না, সেই আমার পরম ধাম—এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথায় ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, আমার নিত্যধাম হল সচ্চিদানন্দময়, দিব্য, চেতন এবং আমারই স্বরূপ হওয়ায় বাস্তবে আমার থেকে অভিন্ন। সুতরাং এখানে 'পরমধাম' শব্দটি হল আমার নিত্য ধাম

[1] শ্রুতিতেও বলা হয়েছে—

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥ (কঠোপনিষদ ২।২।১৫)

অর্থাৎ 'সেই পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মাকে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র বা বিদ্যুৎ—কেউই প্রকাশিত করতে পারে না। যখন সূর্য ইত্যাদিও তাঁকে প্রকাশিত করতে পারে না, তখন এই লৌকিক অগ্নির আর কথাই কী ? কারণ এগুলি সব তিনি প্রকাশিত হলে তাঁর পরে প্রকাশিত হয় এবং তাঁর প্রকাশের দ্বারাই এই সব কিছুর প্রকাশ ঘটে।'

তথা আমার স্বরূপ এবং ভাবাদি সবকিছুরই বাচক। অভিপ্রায় হল যে, যেখানে পৌঁছলে কখনো কোনো কালে কোনো অবস্থাতেই পুনরায় এই সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ হতে পারে না, সেটিই হল আমার পরমধাম অর্থাৎ মায়াতীত ধাম আর সেটিই আমার স্বরূপ। একেই অব্যক্ত, অক্ষর এবং পরমগতিও বলা হয় (৮।২১)। এরই বর্ণনা করে শ্রুতিতে বলা হয়েছে—

'যত্র ন সূর্যস্তপতি যত্র ন বায়ুর্বাতি যত্র ন চন্দ্রমা ভাতি যত্র ন নক্ষত্রাণি ভান্তি যত্র নাগ্নির্দহতি যত্র ন মৃত্যুঃ প্রবিশতি যত্র ন দুঃখানি প্রবিশন্তি সদানন্দং পরমানন্দং শান্তং শাশ্বতং সদাশিবং ব্রহ্মাদিবন্দিতং যোগিধ্যেয়ং পরং পদং যত্র গত্বা ন নিবর্তন্তে যোগিনঃ।'

(বৃহজ্জাবাল উপনিষদ্ ৮।৬)

'যেখানে সূর্য তাপ প্রদান করে না, বায়ু যেখানে প্রবাহিত হয় না, চন্দ্র যেখানে প্রকাশিত হয় না, নক্ষত্র চমক প্রদান করে না, অগ্নি যেখানে দহন করে না, যেখানে মৃত্যু প্রবেশ করতে পারে না, যেখানে দুঃখের প্রবেশাধিকার নেই এবং যেখানে গিয়ে যোগী আর ফিরে আসেন না—সেটিই হল সদানন্দ, পরমানন্দ, শান্ত, সনাতন সদা কল্যাণস্বরূপ, ব্রহ্মাদি দেবতাগণ বন্দিত, যোগীদের ধ্যেয় পরমপদ।'

প্রশ্ন—এখানে 'তৎ' পদ কীসের বাচক এবং তাঁকে সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি প্রকাশিত করতে পারে না—এই কথার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—**'তৎ'** পদটি এখানে সেই অবিনাশী পদের নামে কথিত পূর্ণব্রহ্ম পুরুষোত্তমের বাচক এবং সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি তাঁকে প্রকাশিত করতে পারে না—এই কথার দ্বারা তাঁর অপ্রমেয়তা, অচিন্ত্যতা ও অনির্বচনীয়তার নির্দেশ করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে সমস্ত জগতের প্রকাশক সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি এবং এঁরা যাঁর দেবতা—সেই চক্ষু, মন ও বাণী—কেউই সেই পরমপদকে প্রকাশিত করতে পারে না। এর দ্বারা এটাও বুঝে নেওয়া উচিত যে, এছাড়াও আরও যত প্রকাশক তত্ত্ব আছে, তাঁদের মধ্যে কেউই অথবা সকলে একত্র হয়েও সেই পরমপদকে প্রকাশিত করতে সক্ষম নয়। কারণ এগুলি সবই তাঁরই প্রকাশ—তাঁর অস্তিত্ব স্ফূর্তির কোনো একটি অংশ থেকে নিজেরা প্রকাশিত হয় (১৫।১২)। এটিই সর্বতোভাবে যুক্তিযুক্ত যে নিজ প্রকাশককে কেউ কি করে প্রকাশিত করতে পারে? যে চক্ষু, বাক্য ও মন ইত্যাদি কিছুই সেখানে পৌঁছতে পারে না, তারা কীভাবে তাঁর বর্ণনা করতে পারে?

শ্রুতিতেও বলা হয়েছে—

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।।

(ব্রহ্মোপনিষদ্)

'যেখান থেকে মনের সঙ্গে বাণীও তাঁকে প্রাপ্ত না করেই ফিরে আসে, তিনি হলেন পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা।' অতএব সেই অবিনাশী পদ বাক্য ও মন ইত্যাদির অতীব অতীত ; তাঁর স্বরূপ কোনোভাবেই বলা বা বোঝানো যায় না।

সম্বন্ধ—প্রথম তিনটি শ্লোক পর্যন্ত সংসারবৃক্ষের নামে ক্ষর পুরুষের বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে জীবরূপ অক্ষর পুরুষের বন্ধনের কারণ তার দ্বারা মনুষ্যজন্মে অহংভাব, মমতা ও আসক্তিপূর্বক করা কর্মের কথা বলা হয়েছে। সেই বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার উপায়রূপে সৃষ্টিকর্তা আদি-পুরুষের শরণ গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। এতে প্রশ্ন হতে পারে যে উপরোক্ত প্রকারে আবদ্ধ জীবের স্বরূপ কেমন? এবং তার প্রকৃত স্বরূপ কী? তাই সেই সব বিষয় স্পষ্ট করে জানানোর জন্য প্রথমে জীবের স্বরূপ বলেছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি।। ৭

এই দেহে এই সনাতন জীবাত্মা আমারই অংশ এবং সে এই প্রকৃতিতে স্থিত হয়ে মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে।। ৭

প্রশ্ন—'**জীবলোকে**' পদ কীসের বাচক এবং তাতে স্থিত জীবাত্মাকে ভগবান তাঁর সনাতন অংশ বলাতে কী অভিপ্রায় ব্যক্ত হয় ?

উত্তর—'জীবলোকে' পদটি এখানে জীবাত্মার নিবাসস্থান 'শরীরের' বাচক। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—এই তিন প্রকার শরীরই এর অন্তর্ভুক্ত। এতে স্থিত জীবাত্মাকে সনাতন ও নিজ অংশ বলাতে ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, কারণ শরীরে স্থিত জীবসমুদায়ের সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে আমিই এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও পালনকর্তা (১৪।৩,৪), তাই আমি সকলের পরম পিতা। সুতরাং পিতার অংশ যেমন পুত্র, তেমনই জীবসমুদায় আমার অংশ এবং আমি যেমন স্বরূপতঃ চেতন, তেমনই জীবসমুদায়ও চেতন, তাই তারা আমার অংশ। কারণ যে স্বয়ং চেতন, সে কোনো চেতনেরই অংশ হতে পারে, জড়ের নয়। প্রকৃতপক্ষে অংশী থেকে অংশ পৃথক হয় না। আমার ন্যায় জীবসমুদায়ও অনাদি এবং নিত্য, তাই তারা সনাতন এবং আমার থেকে পৃথক নয়।

এতদ্ব্যতীত এখানে অদ্বৈত সিদ্ধান্ত অনুসারে এই মর্মার্থ যথার্থ বলে মনে হয় যে, যেমন সর্বত্র সমভাবে স্থিত বিভাগরহিত মহাকাশ কলসি এবং বাড়ি ইত্যাদির সম্বন্ধে বিভক্তের ন্যায় প্রতীত হয় এবং ঐসব কলসি, বাড়ি ইত্যাদিতে স্থিত আকাশকে মহাকাশেরই অংশ বলে মানা হয়—তেমনই যদিও আমি বিভাগরহিত হয়ে সর্বত্র সমভাবে ব্যাপ্ত, তা সত্ত্বেও আমি ভিন্ন ভিন্ন শরীরের সম্পর্কে পৃথক পৃথক বিভক্তের ন্যায় প্রতীত হই (১৩।১৬) এবং ঐ সমস্ত দেহে স্থিত সকল জীব আমারই অংশ বলে মানা হয়। এই ভাবার্থে ভগবান জীবাত্মাকে তাঁর অংশ বলেছেন।

প্রশ্ন—'**এব**' পদ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'এব' পদ প্রয়োগে ভগবানের অভিপ্রায় হল, এই জীবাত্মা উপরোক্ত প্রকারে আমারই অংশ, সুতরাং স্বরূপতঃ আমার থেকে ভিন্ন নয়।

প্রশ্ন—'**ইন্দ্রিয়াণি**' পদের সঙ্গে '**প্রকৃতিস্থানি**' বিশেষণ প্রয়োগ করার অভিপ্রায় কী এবং তার সংখ্যা মনসহ ছয়টি বলার অভিপ্রায় কী, কারণ মনসহ ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা তো এগারোটি (১৩।৫) বলা হয় ?

উত্তর—ইন্দ্রিয়াদি প্রকৃতির কার্য এবং প্রকৃতির কার্যরূপ শরীরই তার আধার ; এই ভাবার্থে তার সঙ্গে '**প্রকৃতিস্থানি**' বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে। পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং এক মন—এই ছটিরই সব বিষয় অনুভব করায় প্রাধান্য রয়েছে, কর্মেন্দ্রিয়ের কার্যও জ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যতীত সম্পন্ন হয় না ; তাই এখানে মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়াদির সংখ্যা ছয় বলা হয়েছে। সুতরাং পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়কে এর অন্তর্গত বলে বুঝতে হবে।

প্রশ্ন—জীবাত্মার এই মনসহ ছটি ইন্দ্রিয়কে আকর্ষিত করার অর্থ কী ? জীবাত্মা যখন শরীর থেকে নির্গত হন, তখন তিনি কর্মেন্দ্রিয়, প্রাণ ও বুদ্ধিকেও সঙ্গে নিয়ে যান—শাস্ত্রে এরূপ বলা আছে ; তাহলে এখানে এই ছটিকেই আকর্ষণ করার কথা বলার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—জীবাত্মা যখন এক দেহ থেকে অন্য দেহে যায়, তখন প্রথমে দেহ থেকে মনসহ ইন্দ্রিয়াদিকে আকর্ষিত করে সঙ্গে নিয়ে যায় ; এই হল জীবাত্মার মনসহ ইন্দ্রিয়াদিকে আকর্ষিত করা। বিষয়াদি অনুভব করায় মন ও পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রাধান্য হওয়ায় এই ছয়টিকে আকর্ষিত করার কথা বলা হয়েছে। এখানে 'মন' শব্দ অন্তঃকরণের বাচক, সুতরাং বুদ্ধি তারই অন্তর্গত। জীবাত্মা যখন মনসহ ইন্দ্রিয়াদিকে আকর্ষণ করে, তখন প্রাণের দ্বারাই আকর্ষণ করে। সুতরাং পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় ও পাঁচ প্রাণও তার অন্তর্গত বলে বুঝে নিতে হবে।

সম্বন্ধ—এই জীবাত্মা মনসহ ছটি ইন্দ্রিয়কে কখন, কীভাবে এবং কেন আকর্ষিত করে এবং এই মনসহ ছটি ইন্দ্রিয় কোন্‌গুলি ?—এরূপ জিজ্ঞাসা হওয়ায় এবার দুটি শ্লোকে এর উত্তর দেওয়া হচ্ছে—

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥ ৮

বায়ু যেমন গন্ধস্থান হতে গন্ধ আহরণ করে নিয়ে যায়, তেমনই দেহাদির স্বামী জীবাত্মাও শরীর ত্যাগ

করে যাবার সময় মন ও ইন্দ্রিয়াদি সঙ্গে নিয়ে যায় এবং তারপর যে দেহ প্রাপ্ত হয় সেই নতুন দেহে প্রবেশ করে ॥ ৮

প্রশ্ন—এখানে '**আশয়াৎ**' পদ কীসের বাচক এবং গন্ধ ও বায়ুর দৃষ্টান্তের উপযোগিতা কীভাবে সিদ্ধ হয় ?

উত্তর—'**আশয়াৎ**' পদটি যেসব বস্তুতে গন্ধ থাকে—সেই পুষ্প, চন্দন, কেসর ও কস্তুরী ইত্যাদি বস্তুর বাচক। ঐসব বস্তু থেকে গন্ধ আহরণ করে নিয়ে যাবার মতো মনসহ ইন্দ্রিয়াদি নিয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্তে 'আশয়' অর্থাৎ আধারের স্থানে স্থূলশরীর এবং গন্ধের স্থানে সূক্ষ্মশরীর উল্লিখিত হয়েছে, কারণ পুষ্প ইত্যাদি গন্ধযুক্ত পদার্থের সূক্ষ্ম অংশই হল গন্ধ। এখানে বায়ুর স্থানে জীবাত্মাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। বায়ু যেমন গন্ধকে একস্থান থেকে আহরণ করে অন্যস্থানে নিয়ে গিয়ে স্থাপন করে—তেমনই জীবাত্মাও ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও প্রাণের সমুদয়রূপ সূক্ষ্মশরীরকে এক স্থূলশরীর থেকে বার করে অন্য স্থূল শরীরে স্থাপন করে।

প্রশ্ন—এখানে '**এতানি**' পদ কীসের বাচক এবং জীবাত্মাকে ঈশ্বর বলার অর্থ কী ?

উত্তর—'**এতানি**' পদটি উপরোক্ত মনসহ পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বাচক। মন অন্তঃকরণের উপলক্ষণ হওয়ায় বুদ্ধি তার অন্তর্গত এবং পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় ও পাঁচ প্রাণ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অন্তর্গত, সুতরাং এখানে '**এতানি**' পদটি এই সতেরোটি তত্ত্বের সমুদায়রূপ সূক্ষ্ম-শরীরের বোধক। জীবাত্মাকে ঈশ্বর বলাতে ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, ইনি এই মন-বুদ্ধিসহ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের শাসক এবং স্বামী, তাই তিনি এদের আকর্ষিত করতে সক্ষম।

প্রশ্ন—'**যৎ**' পদটি দুবার প্রয়োগ করে '**উৎক্রামতি**' ও '**অবাপ্নোতি**' এই দুটি ক্রিয়া কী ভাবার্থে প্রযুক্ত হয়েছে ?

উত্তর—প্রথমটি হল, জীব যে শরীরকে ত্যাগ করে '**যৎ**' পদটি সেই শরীরের বাচক এবং দ্বিতীয় '**যৎ**' পদটি জীব যে শরীরকে গ্রহণ করে, সেই শরীরের বাচক—এই ভাবার্থে '**যৎ**' পদটি দুবার প্রয়োগ করে '**উৎক্রামতি**' এবং '**অবাপ্নোতি**' এই দুই ক্রিয়ার প্রয়োগ করা হয়েছে। শরীর ত্যাগ করা '**উৎক্রামতি**'র এবং নতুন শরীর গ্রহণ করা '**অবাপ্নোতি**' ক্রিয়ার অর্থ।

প্রশ্ন—দ্বিতীয় অধ্যায়ের চব্বিশতম শ্লোকে আত্মার স্বরূপ অচল বলে মানা হয়েছে, তাহলে এখানে আবার '**সংযাতি**' ক্রিয়া প্রয়োগ করে তার এক দেহ থেকে অন্য দেহে যাওয়ার কথা কী করে বলা হল ?

উত্তর—যদিও জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশ হওয়ায় বস্তুতঃ নিত্য ও অচল, তার কোথাও আসা-যাওয়া সম্ভব নয়—তবুও সূক্ষ্মশরীরের সঙ্গে এর সম্বন্ধ হওয়ায় সূক্ষ্ম-শরীরের দ্বারা এক স্থূলশরীর থেকে অন্য স্থূলশরীরে জীবাত্মার গমন প্রতীত হয় ; তাই এখানে '**সংযাতি**' ক্রিয়া প্রয়োগ করে জীবাত্মার এক শরীর থেকে অন্য শরীরে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের বাইশতম শ্লোকেও এই কথা বলা হয়েছে।

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে॥ ৯

এই দেহস্থিত জীবাত্মা চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক আশ্রয় করে মনের সাহায্যে (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ) বিষয়গুলিকে উপভোগ করে ॥ ৯

প্রশ্ন—জীবাত্মার চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা এবং ত্বক—এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের সহিত মনকে আশ্রয় করা কী ? এদের সাহায্যেই জীবাত্মা বিষয়াদি উপভোগ করে, কথাটির কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে জীবাত্মার সম্পর্ক মেনে নেওয়াই হল তাদের আশ্রয় করা। জীবাত্মা এদের সাহায্যেই বিষয়াদি উপভোগ করে, কথাটির তাৎপর্য হল যে, বাস্তবে আত্মা কর্মের কর্তাও নন অথবা তার ফলস্বরূপ বিষয় এবং সুখ-দুঃখাদির ভোক্তাও নন। কিন্তু প্রকৃতি ও তার কার্যাদির সঙ্গে তার যে অজ্ঞানজনিত অনাদি সম্বন্ধ, তার কারণে তিনি কর্তা-ভোক্তা হয়েছেন। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের একুশতম শ্লোকেও বলা হয়েছে যে প্রকৃতিস্থ

পুরুষই প্রকৃতিজনিত গুণাদি ভোগ করে। শ্রুতিতেও বলা হয়েছে—'**আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ**'। (কঠোপনিষদ্ ১।৩।৪) অর্থাৎ 'মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে যুক্ত আত্মাকেই জ্ঞানিগণ ভোক্তা বলেন।

সম্বন্ধ—জীবাত্মাকে তিন গুণের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীরে গমনকারী এবং শরীরস্থ হয়ে বিষয়াদি উপভোগকারী বলা হয়েছে। অতএব প্রশ্ন হতে পারে যে এরূপ আত্মাকে কে কীভাবে জানতে পারেন এবং কে জানতে পারেন না ? তার উত্তরে ভগবান দুটি শ্লোকে বলেছেন—

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥ ১০

শরীর ত্যাগ করে যাওয়ার সময় অথবা শরীরে অবস্থানপূর্বক বিষয়ভোগ করার সময় বা গুণত্রয়ের সঙ্গে সংযুক্ত এই জীবাত্মাকে অজ্ঞ ব্যক্তিগণ জানতে পারে না, জানতে পারেন কেবল জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন বিবেকবান তত্ত্বতঃ জ্ঞানী ব্যক্তিরাই॥ ১০

প্রশ্ন—'**গুণান্বিতম্**' পদ কীসের বাচক এবং '**অপি**' পদ প্রয়োগ করে তার শরীর ত্যাগ করে যাওয়া, শরীরে অবস্থান করা এবং বিষয়ভোগ করার সময়ও অজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাকে জানতে পারে না—এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'**গুণান্বিতম্**' পদটি এখানে গুণের সঙ্গে সম্বন্ধিত 'প্রকৃতিস্থ পুরুষ' (জীবাত্মা)র বাচক, সুতরাং 'অপি' পদ প্রয়োগের এই তাৎপর্য যে, যদিও তিনি সকলের সামনেই দেহত্যাগ করে যান এবং সকলের সামনেই শরীরে অবস্থান করেন ও বিষয়াদি উপভোগ করেন, তা সত্ত্বেও অজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁর প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারেন না। তাহলে সমস্ত ক্রিয়ারহিত গুণাতীতরূপে স্থিত আত্মাকে অজ্ঞ ব্যক্তিরা কীভাবে বুঝতে পারবেন ?

প্রশ্ন—জ্ঞানরূপ চক্ষুসম্পন্ন বিবেকবান জ্ঞানী ব্যক্তিই তাঁকে তত্ত্বতঃ জানেন, এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথাটির দ্বারা বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তিগণ বিবেকজ্ঞানরূপ চক্ষু প্রাপ্ত হয়েছেন, সেই বিবেকবান জ্ঞানী ঐ আত্মার প্রকৃত স্বরূপকে গুণাদিসহ সম্বন্ধ থাকাকালীনও জানেন অর্থাৎ দেহত্যাগের সময়, দেহে অবস্থান করার সময় এবং বিষয়াদি উপভোগ করার সময়—প্রত্যেক অবস্থাতেই, সেই আত্মা যে বাস্তবে প্রকৃতির সম্পূর্ণ অতীত, শুদ্ধ, বোধস্বরূপ ও অসঙ্গ—এরূপ জানেন।

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ॥ ১১

যত্নশীল যোগিগণই নিজ হৃদয়ে অবস্থিত এই আত্মাকে তত্ত্বত জানতে পারেন, কিন্তু যাঁরা নিজ অন্তঃকরণ শুদ্ধ করেননি, এইরূপ অজ্ঞ ব্যক্তিগণ যত্ন করলেও এই আত্মাকে জানতে পারেন না॥ ১১

প্রশ্ন—'যত্নশীল যোগিগণ' কারা এবং তাঁদের নিজ হৃদয়ে অবস্থিত 'এই আত্মাকে তত্ত্বতঃ জানা' কী ?

উত্তর—যাঁর অন্তঃকরণ শুদ্ধ এবং নিজ বশীভূত, আগের শ্লোকে যে বিবেকবান জ্ঞানীদের বিষয়ে আত্মাকে জানার কথা বলা হয়েছিল এবং যাঁরা আত্মস্বরূপকে জানার জন্য নিরন্তর শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন ইত্যাদি প্রচেষ্টা করে থাকেন—এরূপ উচ্চকোটির সাধকই হলেন 'যত্নশীল যোগীগণ'। যে জীবাত্মার সম্বন্ধে প্রকরণ চলছে এবং যাকে শরীরের সম্বন্ধে হৃদয়ে অবস্থিত বলা হয়েছে, তাঁর নিত্যশুদ্ধ বিজ্ঞানানন্দময় প্রকৃত স্বরূপকে ঠিকভাবে জেনে নেওয়া—এটিই হল তাঁর 'আত্মাকে তত্ত্বতঃ জানা'।

প্রশ্ন—'**অকৃতাত্মানঃ**' এবং '**অচেতসঃ**' পদ

কীরূপ মানুষের বাচক এবং তাঁরা প্রযত্ন করলেও এই আত্মাকে জানতে পারেন না, এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যাঁর অন্তঃকরণ শুদ্ধ নয় অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম ইত্যাদির দ্বারা যাঁর হৃদয়ের কল্মষ সর্বতোভাবে ধৌত হয়নি এবং যিনি ভক্তি ইত্যাদির দ্বারা চিত্ত স্থির করার জন্য কখনো সমুচিত প্রযত্ন করেননি— ঐরূপ মলিন ও বিক্ষিপ্ত অন্তঃকরণযুক্ত ব্যক্তিদের বলা হয় 'অকৃতাত্মা' এবং যাদের অন্তঃকরণে বোধশক্তি নেই, সেই মূঢ় ব্যক্তিদের বলা হয় 'অচেতসঃ'। সুতরাং '**অকৃতাত্মানঃ**' ও '**অচেতসঃ**' পদগুলি হল মল, বিক্ষেপ এবং আবরণ—এই তিন দোষযুক্ত অন্তঃকরণসম্পন্ন রাজসিক ও তামসিক ব্যক্তিদের বাচক। এরূপ মানুষ প্রযত্ন করলেও আত্মাকে জানতে পারেন না। এই কথার তাৎপর্য হল যে, এরূপ মানুষ নিজেদের চিত্ত শুদ্ধ করার চেষ্টা না করে যদি কেবল সেই আত্মাকে জানার জন্য শাস্ত্রালোচনারূপ প্রযত্ন করতে থাকেন, তবুও তাঁরা সেই তত্ত্বকে বুঝতে সক্ষম হন না।

প্রশ্ন— দশম শ্লোকে বলা হয়েছে যে মূঢ়গণ সেই আত্মাকে জানেন না, জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন বিবেকবান জ্ঞানীই তাঁকে জানেন ; আবার এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে, যত্নশীল যোগী তাঁকে জানেন, অশুদ্ধ অন্তঃকরণযুক্ত অজ্ঞ ব্যক্তি তাঁকে জানেন না। এই দুটি বর্ণনায় কী পার্থক্য ?

উত্তর—দশম শ্লোকে কথিত '**বিমূঢ়াঃ**' পদটি সাধারণ অজ্ঞ ব্যক্তিদের বাচক। '**জ্ঞানচক্ষুষঃ**' পদ বিবেকবান জ্ঞানীদের বাচক এবং এই শ্লোকেও '**যোগিনঃ**' পদ সেই বিবেকশীল সাত্ত্বিক উচ্চকোটির সাধকদের বাচক এবং '**অচেতসঃ**' পদ রাজসিক ও তামসিক মানুষদের বাচক। সুতরাং দশম শ্লোকে আত্মার স্বরূপকে জানা ও না জানার যে কথা বলা হয়েছে, সেটিই স্পষ্ট করার জন্য এই শ্লোকে এরূপ বলা হয়েছে যে, সেই বিবেকশীল সাধকগণ তো প্রযত্ন করায় জানেন, কিন্তু অজ্ঞব্যক্তিগণ প্রযত্ন করা সত্ত্বেও জানেন না। সুতরাং এই দুটিতে কোনো পার্থক্য নেই।

সম্বন্ধ—ষষ্ঠ শ্লোকের কথনে দুটি প্রশ্ন ওঠে—প্রথমতঃ সবকিছুর প্রকাশক সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি ইত্যাদি তেজোময় পদার্থ পরমাত্মাকে কেন প্রকাশিত করতে পারে না এবং দ্বিতীয়তঃ পরমধাম প্রাপ্ত হলে পুরুষ কেন আর ফিরে আসে না ? এরমধ্যে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে সপ্তম শ্লোকে জীবাত্মাকে পরমেশ্বরের সনাতন অংশ জানিয়ে একাদশ শ্লোক পর্যন্ত তাঁর স্বরূপ, স্বভাব ও ব্যবহারের বর্ণনা করে তাঁর যথার্থ স্বরূপের জ্ঞাতা জ্ঞানীদের মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে। এবার প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য ভগবান দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শ্লোক পর্যন্ত গুণ, প্রভাব ও ঐশ্বর্যসহ নিজ স্বরূপের বর্ণনা করছেন—

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥ ১২

সূর্যে যে তেজ আছে এবং যা সমগ্র জগৎকে উদ্ভাসিত করে এবং যে তেজ চন্দ্রে ও অগ্নিতে বিদ্যমান—সেই তেজ আমারই বলে জানবে॥ ১২

প্রশ্ন—'**আদিত্যগতম্**' বিশেষণের সঙ্গে '**তেজঃ**' পদ কীসের বাচক এবং সেটি সমস্ত জগৎকে প্রকাশিত করে, এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর— সূর্যমণ্ডলের মহাজ্যোতির বাচক হল '**আদিত্যগতম্**' বিশেষণের সঙ্গে '**তেজঃ**' পদটি ; এবং এটি সমস্ত জগৎকে প্রকাশিত করে, এই কথায় ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, স্থূল জগতের সমস্ত বস্তুকে এক সূর্যের তেজই প্রকাশিত করে।

প্রশ্ন—চন্দ্রে এবং অগ্নিতে স্থিত তেজ কীসের বাচক এবং ঐ তিনবস্তুতে অবস্থিত তেজকে তুমি আমারই তেজ বলে জেনো, এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—চন্দ্রের যে জ্যোৎস্না, তার বাচক চন্দ্রস্থ তেজ এবং অগ্নির যে প্রকাশ, তার বাচক অগ্নিস্থ তেজ। এইরূপ সূর্য, চন্দ্র এবং অগ্নিতে স্থিত সমস্ত তেজকে নিজের তেজ বলাতে ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, ঐ তিনটিতে এবং এঁরা যার দেবতা—সেই

চক্ষু, মন ও বাক্যের বস্তুকে প্রকাশিত করবার যা কিছু শক্তি—তা আমার তেজেরই এক অংশ। সেক্ষেত্রে এই তিনে স্থিত তেজও যখন আমারই তেজের অংশ, তাহলে এই তিনটির সম্বন্ধে তেজযুক্ত অন্যান্য যত পদার্থ আছে সে সবের তেজও যে আমারই তেজ, এতে আর বলার কী আছে ! তাই ষষ্ঠ শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি—এরা আমার স্বরূপ প্রকাশ করতে সমর্থ নয়।

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥ ১৩

আমিই পৃথিবীতে প্রবেশ করে নিজ শক্তির দ্বারা সমস্ত ভূতপ্রাণীকে ধারণ করি এবং রসস্বরূপ চন্দ্ররূপে সমস্ত ঔষধি অর্থাৎ বনস্পতিকে পুষ্ট করি॥ ১৩

প্রশ্ন—আমিই পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হয়ে নিজ শক্তির দ্বারা সমস্ত ভূতপ্রাণীদের ধারণ করি—এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান পৃথিবীকে উপলক্ষ্য করে বিশ্বব্যাপী ধারণাশক্তিকে নিজের অংশ বলে জানিয়েছেন। অভিপ্রায় হল যে এই পৃথিবীতে প্রাণীদের ধারণ করার শক্তি বলে যা প্রতীত হয় এবং এইরূপ অন্য কিছুতে যে ধারণ করার শক্তি থাকে—তা প্রকৃতপক্ষে তাদের নয়, আমারই শক্তির এক অংশ। সুতরাং আমি নিজেই আত্মরূপে পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হয়ে নিজ শক্তির দ্বারা সমস্ত প্রাণীকে ধারণ করি।

প্রশ্ন—'**রসাত্মকঃ**' বিশেষণের সঙ্গে '**সোমঃ**' পদ কীসের বাচক এবং এই বিশেষণ প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—রসই যাঁর স্বরূপ, তাঁকে রসাত্মক বলা হয়, অতএব '**রসাত্মকঃ**' বিশেষণের সঙ্গে '**সোমঃ**' পদ চন্দ্রের বাচক। এখানে '**সোমঃ**'-এর সঙ্গে '**রসাত্মকঃ**' বিশেষণ প্রয়োগের এই তাৎপর্য যে চন্দ্রের স্বরূপ হল রসময় —অমৃতময় এবং সে সকলকে রস প্রদান করে।

প্রশ্ন—'**ঔষধীঃ**' পদ কীসের বাচক এবং 'আমিই চন্দ্র হয়ে সমস্ত ঔষধিদের পুষ্ট করি' এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'**ঔষধীঃ**' পদ পত্র, পুষ্প এবং ফল ইত্যাদি সমস্ত শাখা-প্রশাখা সহ বৃক্ষ, লতা ও তৃণ ইত্যাদি যার বিভাগ—এরূপ সমস্ত বনস্পতির বাচক। এবং '**আমিই চন্দ্ররূপে সমস্ত ঔষধি পোষণ করি**' এই কথায় ভগবানের অভিপ্রায় হল—যেমন চন্দ্রের প্রকাশশক্তি আমারই প্রকাশের অংশ, তেমনই তার যে পোষণ করার শক্তি —তাও আমারই শক্তির এক অংশ ; অতএব আমিই চন্দ্ররূপে প্রকটিত হয়ে সকলকে পোষণ করি।

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্॥ ১৪

আমিই সর্বপ্রাণীর শরীরে অবস্থিত থেকে প্রাণ ও অপান সংযুক্ত বৈশ্বানর অগ্নিরূপে (চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়)—চার প্রকার খাদ্য পরিপাক করি ॥ ১৪

প্রশ্ন—এখানে '**প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ**' বিশেষণের সঙ্গে '**বৈশ্বানরঃ**' পদ কীসের বাচক এবং আমি প্রাণ ও অপান সংযুক্ত হয়ে বৈশ্বানর অগ্নিরূপে চারপ্রকার খাদ্য পরিপাক করি, ভগবানের এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যার জন্য সকলের শরীরে উষ্ণতা থাকে এবং খাদ্য পরিপাক হয়, সমস্ত প্রাণীর দেহে নিবাসকারী সেই অগ্নির বাচক হল এখানে '**প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ**' বিশেষণের সঙ্গে '**বৈশ্বানরঃ**' পদটি। এবং ভগবান 'আমিই প্রাণ ও অপান সংযুক্ত বৈশ্বানর অগ্নিরূপে চার প্রকার খাদ্য পরিপাক করি' এই কথার দ্বারা বলতে চেয়েছেন যে, অগ্নির প্রকাশশক্তি যেমন আমারই তেজের অংশ, তেমনই তার যে উষ্ণতা অর্থাৎ তার যে পরিপাক, প্রকাশ করার

শক্তি—তাও আমারই শক্তির অংশ। সুতরাং আমিই প্রাণ ও অপানের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে প্রাণীদের শরীরে নিবাসকারী বৈশ্বানর অগ্নিরূপে চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় অর্থাৎ দন্ত দ্বারা চর্বণ করে খাওয়া রুটি, ভাত ইত্যাদি, চুষে খাওয়া আখ ইত্যাদি, লেহন করে খাওয়া চাটনি ইত্যাদি এবং পান করে খাওয়া দুধ, জল ইত্যাদি—চার প্রকার খাদ্য পরিপাক করি।

সম্বন্ধ—এইভাবে দশম অধ্যায়ের একচল্লিশতম শ্লোকের ভাবানুসারে সমস্ত প্রকাশশক্তি, ধারণশক্তি, পোষণশক্তি ও পরিপাকশক্তি ইত্যাদি সমস্ত শক্তিকে তাঁর শক্তির এক অংশ বলে—অর্থাৎ যেমন পাখা চালিয়ে হাওয়া ছড়িয়ে দেওয়ায়, আলো জ্বালিয়ে অন্ধকার দূর করায়, জাঁতাকল চালানোয়, জল গরম করায়, রেডিও এবং টিভিতে গান ও ছবি শোনা ও দেখায় মূলত একই বৈদ্যুতিক শক্তি কাজ করে, তেমনই সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি ইত্যাদির দ্বারা সবকিছু প্রকাশিত করায়, পৃথিবী ইত্যাদির দ্বারা সবকিছু ধারণ করায়, চন্দ্রের দ্বারা সকলের পোষণ করায় এবং বৈশ্বানর দ্বারা খাদ্য পরিপাক করায় আমারই শক্তির এক অংশ সব কিছু করে—এই কথা বলে ভগবান এখন তাঁর সর্বান্তর্যামীভাব এবং সর্বজ্ঞ-ভাব প্রভৃতি গুণযুক্ত স্বরূপের বর্ণনা করে নিজেকে সর্বপ্রকারে জানার যোগ্য বলে উল্লেখ করছেন—

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্॥ ১৫

আমিই সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে অবস্থান করি এবং আমা হতেই স্মৃতি, জ্ঞান ও অপোহন হয়। আমিই সর্ববেদ দ্বারা জ্ঞাতব্য বিষয়, বেদান্তের কর্তা এবং বেদার্থবেত্তাও আমিই॥ ১৫

প্রশ্ন—আমি সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত—এই কথার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, আমি যদিও সর্বত্র সমভাবে পরিপূর্ণ, তা সত্ত্বেও সকলের হৃদয়ে আমার বিশেষ অবস্থান, সুতরাং হৃদয় আমার উপলব্ধির বিশেষ স্থান। সেইজন্য 'আমি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত' এমন বলা হয় (১৩।১৭ ; ১৮।৬১) ; কারণ যাঁর অন্তঃকরণ শুদ্ধ ও স্বচ্ছ, তাঁর হৃদয়ে আমার প্রত্যক্ষ দর্শন হয়।

প্রশ্ন—'স্মৃতি', 'জ্ঞান' ও 'অপোহন' শব্দগুলির অর্থ কী? এই তিনটি আমার দ্বারাই হয়, এই কথায় ভগবানের কী অভিপ্রায়?

উত্তর—পূর্বে দেখা-শোনা বা কোনোপ্রকার অনুভব করা বস্তু অথবা ঘটনাবলির স্মরণ করাকে বলা হয় 'স্মৃতি'। কোনো বিষয় সঠিকভাবে জেনে নেওয়াকে বলে 'জ্ঞান'। সংশয়, বিপর্যয় ইত্যাদি বিতর্ক জালের বাচক 'উহন' এবং সেগুলি দূর হওয়াকে বলা হয় 'অপোহন'। এই তিনটিই আমা হতে হয়, এই কথায় ভগবানের এই অভিপ্রায় যে সকলের হৃদয়ে অবস্থিত আমি অন্তর্যামী পরমেশ্বরই সর্ব প্রাণীর কর্মানুসারে উপরোক্ত স্মৃতি, জ্ঞান ও অপোহন ইত্যাদি ভাব তাদের অন্তরে উৎপন্ন করি।

প্রশ্ন—সমগ্র বেদ দ্বারা জ্ঞাতব্য আমিই—এই কথার অর্থ কী?

উত্তর—এই কথায় ভগবানের এই অভিপ্রায় যে আমি সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরই সমগ্র বেদের বিধেয়। অর্থাৎ বেদের মধ্যে কর্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডাত্মক যত রকম বর্ণনা আছে—সে সবেরই অন্তিম লক্ষ্য সংসারে বৈরাগ্য উৎপন্ন করে সর্বপ্রকার অধিকারীদের আমারই জ্ঞান প্রদান করানো। অতএব তার দ্বারা যে ব্যক্তি আমার স্বরূপজ্ঞান লাভ করেন, তিনিই বেদাদির অর্থ সঠিকভাবে বুঝতে পারেন। অপরপক্ষে যাঁরা জাগতিক ভোগে আবদ্ধ হয়ে থাকেন, তাঁরা এর অর্থ ঠিকমতো বুঝতে পারেন না।

প্রশ্ন—'বেদান্ত' শব্দ এখানে কীসের বাচক এবং ভগবান নিজেকে তার কর্তা এবং সমগ্র বেদের জ্ঞাতা বলে কী বলতে চেয়েছেন?

উত্তর—বেদাদির তাৎপর্য নির্ণয় করে অর্থাৎ বেদ-বিষয়ক প্রশ্নাদির সমাধান করে এক পরমাত্মাতে সকলের সমন্বয় করার বাচক হল 'বেদান্ত'। নিজেকে তার কর্তা

বলে ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, বেদাদিতে প্রতীত হওয়া বিরোধগুলির বাস্তবিক সমন্বয় করে মানুষকে শান্তি-প্রদানকারী হলাম আমিই এবং বেদান্তবেত্তাও আমি। অর্থাৎ এর মর্মার্থ হল যে, এগুলির প্রকৃত তাৎপর্য আমিই জানি।

সম্বন্ধ—প্রথম ছটি শ্লোক পর্যন্ত বৃক্ষরূপে সংসারের, দৃঢ় বৈরাগ্যের দ্বারা তার ছেদনের, পরমেশ্বরের শরণ নেওয়ার, পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া ব্যক্তিদের লক্ষণসমূহ এবং পরমধামরূপ পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণনা করে অশ্বত্থবৃক্ষরূপ ক্ষর পুরুষের প্রকরণ পূর্ণ করেছেন। তারপর সপ্তম শ্লোক থেকে 'জীব' শব্দবাচ্য অক্ষর পুরুষের প্রকরণ শুরু করে তাঁর স্বরূপ, শক্তি, স্বভাব ও ব্যবহারের বর্ণনা করে এবং তাঁকে জানার মহিমা বলে একাদশ শ্লোক পর্যন্ত তার প্রকরণ পূর্ণ করেছেন। তারপর দ্বাদশ শ্লোক থেকে পুরুষোত্তমের প্রকরণ শুরু করে পঞ্চদশ পর্যন্ত তাঁর গুণ, প্রভাব ও স্বরূপের বর্ণনা করে সেই প্রকরণ পূর্ণ করেছেন। এবার অধ্যায়ের সমাপ্তি পর্যন্ত পূর্বোক্ত তিন প্রকরণের সারমর্ম সংক্ষেপে জানাবার উদ্দেশ্যে পরের শ্লোকে ক্ষর ও অক্ষর পুরুষের স্বরূপ বলছেন—

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে।। ১৬

এই জগতে অবিনাশী ও বিনাশী, এই দুই প্রকারের পুরুষ আছেন। এঁদের মধ্যে সর্বভূতের শরীর বিনাশশীল এবং জীবাত্মাকে অবিনাশী বলা হয়।। ১৬

প্রশ্ন—'**ইমৌ**' এবং '**দ্বৌ**'—এই দুটি সর্বনাম পদের সঙ্গে '**পুরুষৌ**' পদ কোন্ দুই পুরুষের বাচক এবং একটিকে ক্ষর ও অপরটিকে অক্ষর বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই অধ্যায়ে যে প্রসঙ্গ চলছে, তার মধ্যে দুটি তত্ত্বের বর্ণনা এখানে 'ক্ষর' ও 'অক্ষর' নামে করা হচ্ছে—এই ভাবার্থে '**ইমৌ**' এবং '**দ্বৌ**'—এই দুটি পদ প্রয়োগ করা হয়েছে। যে দুটি তত্ত্বের বর্ণনা সপ্তম অধ্যায়ে 'অপরা' এবং 'পরা' প্রকৃতির নামে (৭।৪-৫), অষ্টম অধ্যায়ে 'অধিভূত' এবং 'অধ্যাত্মের' নামে (৮।৩-৪), ত্রয়োদশ অধ্যায়ে 'ক্ষেত্র' এবং 'ক্ষেত্রজ্ঞে'র নামে (১৩।১) এবং এই অধ্যায়ে প্রথমে 'অশ্বত্থ' ও 'জীবে'র নামে করা হয়েছে—সেই দুটি তত্ত্বের বাচক হল 'পুরুষৌ' পদটি। তার মধ্যে একটিকে 'ক্ষর' এবং অপরটিকে 'অক্ষর' বলে ভগবান বলতে চেয়েছেন যে দুটি হল পরস্পর থেকে পৃথক এবং বৈশিষ্টপূর্ণ।

প্রশ্ন—'সর্বাণি ভূতানি' এবং 'কূটস্থঃ' পদগুলি কীসের বাচক এবং এগুলিকে ক্ষর ও অক্ষর বলা হল কেন ?

উত্তর—'ভূতানি' পদ এখানে সমস্ত জীবের স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ—তিন প্রকার শরীরের বাচক। একেই ত্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে 'ক্ষেত্রে'র নামে অভিহিত করে পঞ্চম শ্লোকে তার স্বরূপ বলা হয়েছে। সেই বর্ণনা দ্বারা এখানে সমস্ত জড়বর্গের বাচক হল 'সর্বাণি' বিশেষণের সঙ্গে 'ভূতানি' পদটি। এই তত্ত্ব বিনাশশীল এবং অনিত্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ে '**অন্তবন্ত ইমে দেহাঃ**' (২।১৮) এবং অষ্টম অধ্যায়ে '**অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ**' (৮।৪) দ্বারা এই কথাই বলা হয়েছে। 'কূটস্থ' শব্দ এখানে সমস্ত শরীরসমূহে স্থিত আত্মার বাচক। এটি সর্বদাই একভাবে থাকে, এর কোনো পরিবর্তন হয় না ; তাই একে 'কূটস্থ' বলা হয়। এর কখনো কোনো অবস্থাতে ক্ষয়, নাশ বা অভাব হয় না ; তাই এটি অক্ষর।

সম্বন্ধ—এইভাবে ক্ষর ও অক্ষর পুরুষের স্বরূপ জানিয়ে এবার দুটি শ্লোকে ঐ দুটির থেকে শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম ভগবানের স্বরূপের এবং পুরুষোত্তম হওয়ার কারণের বর্ণনা করছেন—

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ।। ১৭

এই দুই পুরুষ থেকে উত্তম পুরুষতো ভিন্নই এবং যিনি ত্রিলোকে প্রবেশ করে সকলের ধারণ ও

পোষণ করেন, তাঁকেই অবিনাশী পরমেশ্বর এবং পরমাত্মা বলা হয়॥ ১৭

প্রশ্ন—'উত্তমঃ পুরুষঃ' কীসের বাচক এবং 'তু' ও 'অন্যঃ' এই দুটি পদের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'উত্তমঃ পুরুষঃ' নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সর্বশক্তিমান, পরম দয়ালু, সর্বগুণসম্পন্ন পুরুষোত্তম ভগবানের বাচক এবং 'তু' ও 'অন্য'—এই দুটির দ্বারা পূর্বোক্ত 'ক্ষর' পুরুষ ও 'অক্ষর' পুরুষ থেকে ভগবানের বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, উত্তম পুরুষ পূর্বোক্ত ঐ দুই পুরুষ থেকে পৃথক ও অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ।

প্রশ্ন—যিনি ত্রিলোকে প্রবেশ করে সকলের ধারণ-পোষণ করেন, কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথার দ্বারা পুরুষোত্তমের লক্ষণ নিরূপণ করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, যে সর্বাধার, সর্বব্যাপী পরমেশ্বর সমস্ত জগতে প্রবিষ্ট হয়ে 'পুরুষ' নামে বর্ণিত 'ক্ষর' এবং 'অক্ষর' উভয় তত্ত্বকে ধারণ ও সমস্ত প্রাণীদের পালন করেন—তিনি হলেন ঐ দুটি থেকে ভিন্ন এবং উত্তম 'পুরুষোত্তম'।

প্রশ্ন—যাঁকে অব্যয়, ঈশ্বর এবং পরমাত্মা বলা হয়েছে, এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারাও সেই 'পুরুষোত্তম'-এর লক্ষণই বলা হয়েছে। অভিপ্রায় হল, যিনি তিন লোকে প্রবিষ্ট হয়ে সেগুলির বিনাশ হলেও কখনও বিনাশপ্রাপ্ত হন না, সর্বদাই নির্বিকার, একরস সম্পন্ন থাকেন ; এবং যিনি ক্ষর ও অক্ষর—এই দুইয়ের নিয়ামক ও প্রভু তথা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এবং যিনি গুণাতীত, শুদ্ধ ও সকলের আত্মা—সেই পরমাত্মাই হলেন 'পুরুষোত্তম'।

ক্ষর, অক্ষর এবং ঈশ্বর—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে এই তিন তত্ত্বের বর্ণনা এইভাবে করা হয়েছে—

'ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ।' (১।১০)

'প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতির নাম হল ক্ষর এবং তার ভোক্তা অবিনাশী আত্মার নাম হল অক্ষর। প্রকৃতি ও আত্মা—এই দুজনকেই শাসন করেন এক দেব (পুরুষোত্তম)।'

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥ ১৮

কারণ আমি বিনাশশীল জড়-ক্ষেত্রের অতীত এবং অবিনাশী জীবাত্মা থেকেও উত্তম, সেইজন্য জগতে এবং বেদে আমি পুরুষোত্তম নামে খ্যাত।॥ ১৮

প্রশ্ন—এখানে 'অহম্' পদ প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—'অহম্'-এর প্রয়োগ করে ভগবান উপরোক্ত লক্ষণ দ্বারা যুক্ত পুরুষোত্তম স্বয়ং আমিই, এইভাবে অর্জুনের কাছে তাঁর পরম রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন।

প্রশ্ন—ভগবানের নিজেকে ক্ষরের অতীত এবং অক্ষরের থেকেও উত্তম বলার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—'ক্ষর' পুরুষ থেকে অতীত বলায় ভগবানের অভিপ্রায় হল, আমি ক্ষর পুরুষ থেকে সর্বতোভাবে সম্বন্ধরহিত ও অত্যন্ত বিশিষ্ট—অর্থাৎ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যাকে শরীর ও ক্ষেত্রের নামে বলা হয়েছে, সেই তিনগুণের সমুদয়রূপ সমস্ত বিনাশশীল জড়বর্গ থেকে আমি সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত। অক্ষর থেকে নিজেকে উত্তম বলায় এই অভিপ্রায় যে, ক্ষর পুরুষের মতো অক্ষর থেকে তো আমি অতীত নই, কারণ সেটি আমারই অংশ হওয়ায় অবিনাশী এবং চেতন ; কিন্তু আমি তার থেকে অবশ্যই উত্তম, কারণ সেটি 'প্রকৃতিস্থ' এবং আমি প্রকৃতির অতীত অর্থাৎ গুণাদি থেকে সর্বতোভাবে অতীত। সুতরাং সে অল্পজ্ঞ, আমি সর্বজ্ঞ ; সে নিয়ম্য, আমি নিয়ামক, সে আমার উপাসক, আমি তার প্রভু উপাস্যদেব এবং সে অল্প শক্তিসম্পন্ন আর আমি সর্বশক্তিমান ; সুতরাং তার থেকে আমি সর্বপ্রকারে উত্তম।

প্রশ্ন—'যস্মাৎ' এবং 'অতঃ'—এই হেতুবাচক পদ প্রয়োগ করে আমি লোক ও বেদে 'পুরুষোত্তম' নামে প্রসিদ্ধ, এই কথা বলার অর্থ কী ?

উত্তর—'**যস্মাৎ**' এবং '**অতঃ**'—এই হেতুবাচক পদগুলি প্রয়োগ করে নিজেকে লোক (জগৎ) ও বেদে পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ জানিয়ে ভগবান তাঁর পুরুষোত্তম তত্ত্বকে সিদ্ধ করেছেন। অভিপ্রায় হল যে, উপরোক্ত কারণে আমি ক্ষর হতে অতীত এবং অক্ষরের থেকে উত্তম ; তাই সমগ্র জগতে এবং বেদ-শাস্ত্রাদিতে আমি পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ, অর্থাৎ সকলে আমাকে 'পুরুষোত্তম' বলে।

সম্বন্ধ—এবার উপরোক্ত প্রকারে ভগবানকে পুরুষোত্তম বলে যারা জানেন, তাদের মহিমা ও লক্ষণ জানাচ্ছেন—

যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ববিদ্ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত॥ ১৯

হে ভারত ! যে জ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে এইভাবে তত্ত্বতঃ পুরুষোত্তম বলে জানেন, সেই সর্বজ্ঞ পুরুষ সর্বতোভাবে নিত্য-নিরন্তর পরমেশ্বর বাসুদেব আমাকেই ভজনা করেন॥ ১৯

প্রশ্ন—এখানে '**এবম্**' এর অর্থ কী ?

উত্তর—'**এবম্**' অব্যয় এখানে উপরের দুটি শ্লোকে বর্ণিত বিষয়ের নির্দেশ করছে।

প্রশ্ন—'**মাম্**' কীসের বাচক এবং তাঁকে 'পুরুষোত্তম' বলে জানা কীরূপ ?

উত্তর—'**মাম্**' পদটি এখানে সর্বশক্তিমান, সর্বাধার, সমস্ত জগতের সৃজন, পালন ও সংহারকারী, সকলের পরম সুহৃদ, সকলের একমাত্র নিয়ন্তা, সর্বগুণসম্পন্ন, পরম দয়ালু, পরম প্রেমিক, সর্বান্তর্যামী, সর্বব্যাপী, পরমেশ্বরের বাচক এবং তিনিই উপরোক্ত দুটি শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে ক্ষর ও অক্ষর—উভয় পুরুষের থেকে উত্তম গুণাতীত এবং সর্বগুণসম্পন্ন সাকার-নিরাকার, ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপ পরমপুরুষ পুরুষোত্তম—এইভাবে শ্রদ্ধাসহকারে পূর্ণরূপে তাঁকে স্বীকার করা হল তাঁকে 'পুরুষোত্তম' বলে জানা।

প্রশ্ন—'**অসম্মূঢ়ঃ**' পদটির অর্থ কী ?

উত্তর—যাঁর জ্ঞান সংশয়, বিপর্যয় ইত্যাদি দোষ-শূন্য ; যাঁর মধ্যে একটুও মোহ নেই—তাঁকে বলা হয় '**অসম্মূঢ়ঃ**'। সুতরাং এখানে '**অসম্মূঢ়ঃ**' পদ প্রয়োগ করে ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, যে ব্যক্তি আমাকে সাধারণ মানুষ মনে না করে সাক্ষাৎ সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর পুরুষোত্তম বলে মনে করেন, তাঁর জানাই সঠিক জানা।

প্রশ্ন—'**সর্ববিদ্**' কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—যিনি সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় ভালোভাবে জানেন, তাঁকে বলা হয় '**সর্ববিদ্**'। এই অধ্যায়ে ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তম—এই তিন ভাগে বিভক্ত করে সমস্ত পদার্থের বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং যিনি ক্ষর ও অক্ষর—উভয়ের স্বরূপ যথার্থভাবে জেনে তার থেকেও অত্যন্ত উত্তম পুরুষোত্তমের তত্ত্ব জানেন, তিনিই '**সর্ববিদ্**'—অর্থাৎ সমস্ত পদার্থকে সঠিকভাবে জানেন—তাই তাঁকে '**সর্ববিদ্**' বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—ভগবানকে পুরুষোত্তম বলে জ্ঞাত ব্যক্তির তাঁকে সর্বভাবে ভজনা করা কী এবং 'তিনি আমাকে সর্বভাবে ভজনা করেন'—কথাটির উদ্দেশ্য কী ?

উত্তর—ভগবানকে পুরুষোত্তম বলে মনে করে যে ব্যক্তি সমস্ত জগৎ থেকে অনুরাগ অপসারিত করে কেবলমাত্র পরম প্রেমাস্পদ এক পরমেশ্বরেই পূর্ণ অনুরক্ত হওয়া, বুদ্ধিপূর্বক ভগবানের গুণ, প্রভাব, তত্ত্ব, রহস্য, লীলা, স্বরূপ এবং মহিমার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস করা ; তাঁর নাম, গুণ, প্রভাব, চরিত্র ও স্বরূপ ইত্যাদি শ্রদ্ধা ও প্রেমপূর্বক মনে চিন্তা করা, কানে শোনা, মুখে কীর্তন করা, চক্ষু দ্বারা দর্শন করা এবং তাঁর নির্দেশানুসারে সবকিছু তাঁর মনে করে এবং সবেতে তিনি ব্যাপ্ত মনে করে, কর্তব্য-কর্ম দ্বারা সকলকে সুখী করে তাঁর সেবা ইত্যাদি করা—একেই বলা হয় সর্বপ্রকারে ভগবানের ভজনা করা। 'তিনি সর্বভাবে আমার ভজনা করেন।' এই বাক্যটির প্রয়োগ এখানে ভগবানকে 'পুরুষোত্তম' বলে জ্ঞাত ব্যক্তির পরিচয় জানানোর উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, যিনি ভগবানকে ক্ষর হতে অতীত এবং অক্ষর থেকে উত্তম বলে বুঝতে পারেন, তিনি উপরোক্ত প্রকারে কেবলমাত্র ভগবানেরই নিত্য-নিরন্তর ভজনা করেন—এই হল তাঁর পরিচয়।

সম্বন্ধ—এইভাবে ভগবানকে পুরুষোত্তমরূপে জ্ঞাত পুরুষের মহিমা বর্ণনা করে এবার এই অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়কে গুহ্যতম বলে তা জানার ফল জানিয়ে এই অধ্যায়ের উপসংহার করছেন—

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত॥ ২০

হে নিষ্পাপ অর্জুন! এইভাবে আমি তোমাকে অতি রহস্যযুক্ত গোপনীয় শাস্ত্রের কথা বললাম। এটি তত্ত্বতঃ জেনে মানুষ জ্ঞানী ও কৃতার্থ হয়॥ ২০

প্রশ্ন—'অনঘ' সম্বোধনের অভিপ্রায় কী?

উত্তর—পাপকে বলা হয় 'অঘ'। যাতে পাপ নেই, তাকে **'অনঘ'** বলা হয়। ভগবানের এখানে অর্জুনকে **'অনঘ'** নামে সম্বোধনের এই অভিপ্রায় যে, তোমার মধ্যে পাপ নেই, তোমার অন্তঃকরণ শুদ্ধ ও নির্মল, সুতরাং তুমি আমার গুহ্যতম উপদেশ শোনার ও ধারণ করার উপযুক্ত পাত্র।

প্রশ্ন—'ইতি' এবং **'ইদম্'** পদের সঙ্গে **'শাস্ত্রম্'** পদ এখানে এই অধ্যায়ের বাচক না কি সমগ্র গীতার?

উত্তর— 'ইতি' এবং **'ইদম্'**-এর সঙ্গে **'শাস্ত্রম্'** পদটি এই পঞ্চদশ অধ্যায়ের বাচক; **'ইদম্'** দ্বারা এই অধ্যায়ের এবং **'ইতি'** দ্বারা তার সমাপ্তির নির্দেশ করা হয়েছে এবং তাকে সম্মান জানাবার জন্য তার নাম রাখা হয়েছে **'শাস্ত্র'**।

প্রশ্ন—এই উপদেশকে গুহ্যতম বলার এবং 'আমার দ্বারা কথিত' এই কথাটির অভিপ্রায় কী?

উত্তর—এটিকে গুহ্যতম বলাতে ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, এই অধ্যায়ে আমি প্রধানতঃ সগুণ পরমেশ্বরের গুণ, প্রভাব, তত্ত্ব এবং রহস্যের কথা বর্ণনা করেছি; তাইজন্য এটি অত্যন্ত গোপনীয়। আমি সকলের কাছে এইভাবে আমার গুণ, প্রভাব, তত্ত্ব এবং ঐশ্বর্য প্রকটিত করি না; সুতরাং তুমিও অপাত্রের কাছে এই রহস্য বলবে না। এবং 'এটি আমার দ্বারা কথিত' এই কথা বলে ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, এটি সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর আমার দ্বারা উপদিষ্ট, অতএব এটি সমগ্র বেদ এবং শাস্ত্রাদির পরম সার।

প্রশ্ন—এই শাস্ত্রকে তত্ত্বতঃ জানা কী এবং যাঁরা জানতে পারেন তাঁদের বুদ্ধিমান হওয়া এবং কৃতকৃত্য হওয়া কী?

উত্তর—এই অধ্যায়ে বর্ণিত ভগবানের গুণ, প্রভাব, তত্ত্ব ও স্বরূপ ইত্যাদি ভালোভাবে বুঝে ভগবানকে পূর্বোক্ত প্রকারে সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম বলে জেনে নেওয়াই হল এই শাস্ত্রকে তত্ত্বতঃ জানা। এবং তাঁকে যাঁরা যথার্থভাবে জেনে যান, তাঁদের সেই পুরুষোত্তম ভগবানকে অপরোক্ষভাবে লাভ করা—এই হল তাঁদের বুদ্ধিমান অর্থাৎ জ্ঞানবান হয়ে যাওয়া; আর সমস্ত কর্তব্যকর্ম পূর্ণরূপে সম্পন্ন করা এবং সব কিছুর ফল লাভ করা হল তাঁদের কৃতকৃত্য হওয়া।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

——০——

ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ

ষোড়শ অধ্যায়

(দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগ)

অধ্যায়ের নাম

এই ষোড়শ অধ্যায়ে দেবশব্দবাচ্য পরমেশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তাঁকে লাভ করার যে সব সদ্গুণ ও সদাচার, সেগুলি জেনে ধারণ করার জন্য দৈবীসম্পদের নামে এবং অসুরদের—যে দুর্গুণ ও দুরাচার, সেগুলি জেনে সে সব ত্যাগ করার জন্য আসুরী সম্পদের নামে বিভাগপূর্বক বিস্তৃত বর্ণনা করা হয়েছে। তাই এই অধ্যায়ের নাম রাখা হয়েছে 'দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগ'।

সংক্ষিপ্ত অধ্যায়-সার

এই অধ্যায়ের প্রথম থেকে তৃতীয় শ্লোক পর্যন্ত দৈবীসম্পদ্প্রাপ্ত পুরুষের লক্ষণসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করে চতুর্থতে আসুরীসম্পদের সংক্ষেপে নিরূপণ করা হয়েছে। পঞ্চমে দৈবী সম্পদের ফল মুক্তি ও আসুরীর ফল বন্ধন জানিয়ে অর্জুনকে দৈবীসম্পদযুক্ত বলে আশ্বস্ত করেছেন। ষষ্ঠতে পুনরায় দৈব এবং আসুর—এই দুই-এর ইঙ্গিত করে আসুর সম্পদযুক্তদের সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে শোনার জন্য বলেছেন। তারপর সপ্তম থেকে বিংশতম পর্যন্ত আসুরী প্রকৃতিসম্পন্ন মানুষদের দুর্গুণ, দুর্ভাব ও দুরাচার এবং তাদের দুর্গতির বর্ণনা করেছেন। একুশতমতে আসুরী সম্পদের মধ্যে প্রধান কাম, ক্রোধ ও লোভকে নরকের দ্বার বলে বাইশতমতে সেগুলির থেকে মুক্ত সাধক নিষ্কামভাবে দৈবীসম্পদের সাধনা দ্বারা পরমগতি প্রাপ্ত করেন বলে জানিয়েছেন। তেইশতমতে শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে ইচ্ছানুযায়ী কর্মকারীদের নিন্দা করে চব্বিশতম শ্লোকে শাস্ত্রানুকূল কর্ম করার জন্য প্রেরণা দান করে অধ্যায়ের উপসংহার করেছেন।

সম্বন্ধ—সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে এবং নবম অধ্যায়ের একাদশ ও দ্বাদশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে 'আসুরী ও রাক্ষসী প্রকৃতিকে ধারণকারী মূঢ় ব্যক্তিরা আমার ভজনা করেন না, বরং আমাকে অবজ্ঞা করেন।' নবম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শ্লোকে বলেছেন যে, 'দৈবীপ্রকৃতিযুক্ত মহাত্মাগণ আমাকে সর্বপ্রাণীর আদি ও অবিনাশী জেনে অনন্য প্রেমের সঙ্গে সর্বপ্রকারে নিরন্তর আমার ভজনা করেন।' কিন্তু অন্য প্রসঙ্গ চলতে থাকায় সেখানে দৈবী প্রকৃতি ও আসুরী প্রকৃতির লক্ষণসমূহ বর্ণনা করা সম্ভব হয়নি। আবার পঞ্চদশ অধ্যায়ের ঊনবিংশতিতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে 'যে জ্ঞানী মহাত্মা আমাকে 'পুরুষোত্তম' বলে জানেন, তিনি সর্বপ্রকারে আমার ভজনা করেন।' এতে স্বাভাবিকভাবেই ভগবানকে পুরুষোত্তম জেনে সর্বভাবে তাঁর ভজনাকারী দৈবী প্রকৃতিযুক্ত মহাত্মা পুরুষদের এবং তাঁর ভজনা যাঁরা করেন না, সেই আসুরী প্রকৃতিযুক্ত অজ্ঞানী মানুষদের লক্ষণ কী?—তা জানার ইচ্ছা হয়। অতএব ভগবান এবার উভয়ের লক্ষণ এবং স্বভাবের বিস্তারিত বর্ণনা করার জন্য ষোড়শ অধ্যায় আরম্ভ করছেন। এতে প্রথম তিনটি শ্লোক দ্বারা দৈবীসম্পদযুক্ত সাত্ত্বিক পুরুষদের স্বাভাবিক লক্ষণ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে—

শ্রীভগবানুবাচ

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্‌॥ ১

শ্রীভগবান বললেন—ভয়শূন্যতা, অন্তঃকরণের পূর্ণ নির্মলতা, তত্ত্বজ্ঞানের জন্য ধ্যানযোগে দৃঢ় নিরন্তর স্থিতি, সাত্ত্বিক দান, ইন্দ্রিয়াদি সংযম, ভগবান-দেবতা ও গুরুজনদের পূজা, অগ্নিহোত্রাদি উত্তম কর্মের অনুষ্ঠান, বেদ-শাস্ত্রাদি পঠন-পাঠন, ভগবানের নাম গুণ-কীর্তন, স্বধর্ম পালনের জন্য কষ্ট স্বীকার এবং শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি-সহ অন্তঃকরণের সরলতা ॥ ১

প্রশ্ন—'অভয়' কাকে বলে ?

উত্তর—ইষ্টের বিয়োগ এবং অনিষ্টের সংযোগের আশঙ্কায় মনে যে কাপুরুষতাপূর্ণ বিকার উৎপন্ন হয়, তার নাম ভয়—যেমন প্রতিষ্ঠানাশের ভয়, অপমানের ভয়, নিন্দার ভয়, রোগের ভয়, রাজদণ্ডের ভয়, ভূত-প্রেতের ভয়, মৃত্যুভয় ইত্যাদি। এইগুলির সর্বতোভাবে অভাবের নাম 'অভয়'।

প্রশ্ন—'সত্ত্বসংশুদ্ধি' কী ?

উত্তর—অন্তঃকরণকে বলা হয় 'সত্ত্ব'। অন্তঃকরণে যে রাগ-দ্বেষ, হর্ষ-শোক, মমত্ব-অহংকার ও মোহ-মাৎসর্য ইত্যাদি বিকার ও নানাপ্রকার কলুষিত ভাব থাকে—সেগুলির সর্বতোভাবে অভাব হয়ে অন্তঃকরণ পূর্ণভাবে নির্মল, পরিশুদ্ধ হওয়া—এই হল 'সত্ত্বসংশুদ্ধি' (অন্তঃকরণের সম্যক্ শুদ্ধি)।

প্রশ্ন—'জ্ঞানযোগব্যবস্থিতি' কাকে বলা হয় ?

উত্তর—পরমাত্মার স্বরূপকে যথার্থরূপে জেনে নেওয়াকে বলা হয় 'জ্ঞান' ; এবং তার প্রাপ্তির জন্য পরমাত্মার ধ্যানে যে নিত্য-নিরন্তর স্থিত থাকা, তাকে বলা হয় 'জ্ঞানযোগব্যবস্থিতি'।

প্রশ্ন—'দানম্' পদটির অর্থ কী ?

উত্তর— কর্তব্য মনে করে দেশ, কাল এবং পাত্র বিচার করে নিষ্কামভাবে যে অন্ন, বস্ত্র, বিদ্যা এবং ওষুধ প্রভৃতি বস্তুর বিতরণ করা হয়—তার নাম 'দান' (১৭।২০)।

প্রশ্ন—'দমঃ' পদটি অর্থ কী ?

উত্তর—ইন্দ্রিয়াদিকে বিষয় থেকে সরিয়ে নিজ বশে রাখাকে বলা হয় 'দম'।

প্রশ্ন—'যজ্ঞঃ' পদের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভগবানের এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ, মহাত্মা, অতিথি, মাতা, পিতা ও বড়দের পূজা করা, হোম করা ও বলিবৈশ্বদেব করা ইত্যাদি সবই হল যজ্ঞ।

প্রশ্ন—'স্বাধ্যায়' কাকে বলা হয় ?

উত্তর— বেদ অধ্যয়ন করা, যাতে বিবেক-বৈরাগ্য এবং ভগবানের গুণ, প্রভাব, তত্ত্ব, স্বরূপ এবং তাঁর দিব্য লীলাসমূহ বর্ণিত আছে—সেই শাস্ত্র, ইতিহাস ও পুরাণাদির পঠন-পাঠন করা এবং ভগবানের নাম-গুণাদি কীর্তন করা প্রভৃতি সবই হল স্বাধ্যায়।

প্রশ্ন—'তপঃ' পদ এখানে কীসের বাচক ?

উত্তর— নিজ ধর্মপালনের জন্য কষ্ট সহ্য করে যে অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদিকে তাপিত করা, তাকেই এখানে 'তপঃ' বলা হয়েছে। সপ্তদশ অধ্যায়ে যে শারীরিক, বাচিক ও মানসিক তপের নিরূপণ করা হয়েছে—এইস্থানে 'তপঃ' পদ সেগুলিকে নির্দেশ করে না ; কারণ সেখানে অহিংসা, সত্য, শৌচ, স্বাধ্যায় এবং আর্জব ইত্যাদি যে সব লক্ষণকে তপের অঙ্গরূপে নিরূপণ করা হয়েছে— এই স্থানে সেগুলিকে পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন—'আর্জব' কাকে বলা হয় ?

উত্তর—শরীর, ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের সরলতাকে 'আর্জব' বলা হয়।

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্তং মার্দবং হ্রীরচাপলম্॥ ২

কায়মনোবাক্যে কাউকে কোনোভাবে কষ্ট না দেওয়া, যথার্থ ও প্রিয় ভাষণ, অপরাধকারীর প্রতি ক্রোধ না করা, কর্মাদিতে কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করা, চিত্ত-চাঞ্চল্যের অভাব, পরনিন্দা বর্জন, সর্বভূতে অহেতুক দয়া, ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে বিষয়সমূহের সংযোগ হলেও আসক্ত না হওয়া, কোমলতা, লোক ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণে লজ্জা এবং ব্যর্থ চেষ্টার অভাব ॥ ২

প্রশ্ন—'অহিংসা' কাকে বলে ?

উত্তর—কোনো প্রাণীকে কখনো কোথাও লোভ, মোহ বা ক্রোধবশতঃ বেশি মাত্রায়, মধ্য মাত্রায় বা অল্পপরিমাণেও কোনো প্রকার কষ্ট নিজে দেওয়া, অপরের দ্বারা দেওয়া বা কেউ কাউকে কষ্ট দিলে তা অনুমোদন করা—এ সবই হিংসার অন্তর্গত। কায়মনোবাক্যে এইরূপ হিংসা কোনো কারণেই না করা—অর্থাৎ মন থেকে কারো ক্ষতি কামনা না করা, বাক্য দ্বারা কাউকে খারাপ কথা, কঠোর কথা এবং কোনো ক্ষতিকারক বাক্য না বলা, শরীর দ্বারা কাউকে

আঘাত বা কষ্ট না দেওয়া অথবা কোনোভাবে ক্ষতি না করা—এ সবই অহিংসার ভেদ।

প্রশ্ন—'সত্য' কাকে বলে ?

উত্তর—ইন্দ্রিয়াদি ও অন্তঃকরণ দ্বারা যা কিছু দেখা, শোনা ও অনুভব করা হয়েছে— অপরকে ঠিক তেমনই যথাযথ বোঝাবার জন্য কপটতা ত্যাগ করে যে যথাসম্ভব প্রিয় ও হিতকর বাক্য বলা হয়—তাকেই বলা হয় 'সত্য'।

প্রশ্ন—'অক্রোধঃ' পদটির অর্থ কী ?

উত্তর—স্বভাবদোষে অথবা কারো দ্বারা অপমান, অপকার, নিন্দা বা মনের প্রতিকূল কার্য করা হলে অথবা কটু বাক্য শুনে বা কারো অনৈতিক কাজ দেখে মনে যে এক দ্বেষপূর্ণ উত্তেজক বৃত্তি উৎপন্ন হয়—তা হল ভেতরের ক্রোধ, এরপর যে শরীর ও মনে জ্বালা, মুখে বিকার এবং চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে যায়—তা হল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ক্রোধের স্বরূপ। ঐ জ্বালা এবং জ্বালা প্রদানকারী উভয় প্রকার বৃত্তিকে বলা হয় 'ক্রোধ'। এই বৃত্তির সর্বতোভাবে অভাবের নাম অক্রোধ।

প্রশ্ন—'ত্যাগ' কাকে বলে ?

উত্তর—গুণই শুধুমাত্র গুণে আবর্তিত হয়, এই কর্মগুলির সঙ্গে আমার কোনোই সম্বন্ধ নেই—এরূপ মনে করে, অথবা আমি তো ভগবানের হাতের পুতুল মাত্র, ভগবানই তাঁর ইচ্ছানুসারে আমাকে কায়মনোবাক্যের দ্বারা সমস্ত কর্ম করাচ্ছেন, আমার তো নিজে থেকে কিছু করার শক্তি নেই এবং আমি কিছুই করি না—এরূপ মনে করে কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করাকেই বলে ত্যাগ। অথবা কর্তব্য-কর্ম করাকালীন মমত্ব, আসক্তি, ফল ও স্বার্থ সর্বতোভাবে ত্যাগ করাও ত্যাগ। আত্মোন্নতির পরিপন্থী বস্তু, ভাব ও ক্রিয়ামাত্রের ত্যাগকেও 'ত্যাগ' বলা যায়।

প্রশ্ন—'শান্তি' কাকে বলে ?

উত্তর—জাগতিক চিন্তা-ভাবনার সর্বতোভাবে অভাব হলে বিক্ষেপরহিত অন্তঃকরণে যে সাত্ত্বিক প্রসন্নতা হয়, এখানে তাকে 'শান্তি' বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—'অপৈশুন' কাকে বলা হয় ?

উত্তর—অপরের দোষ দেখা এবং লোকের কাছে তা প্রকট করা, অথবা কারো নিন্দা বা সমালোচনা করাকে বলা হয় পিশুনতা ; এর সর্বতোভাবে অভাবকে বলা হয় 'অপৈশুন'।

প্রশ্ন—সর্বপ্রাণীকে দয়া করা কী ?

উত্তর—কোনো প্রাণীকে দুঃখী দেখে স্বার্থের চিন্তা না করে যে কোনো প্রকারে তার দুঃখ নিবারণ করার এবং সর্বভাবে তাকে সুখী করার যে মনোভাব, তাকে বলা হয় 'দয়া'। অপরকে কষ্ট না দেওয়া হল 'অহিংসা' এবং তাকে সুখী করার মনোভাব হল 'দয়া'। অহিংসা ও দয়াতে এই হল পার্থক্য।

প্রশ্ন—'অলোলুপ্ত্ব' কাকে বলে ?

উত্তর—ইন্দ্রিয় ও বিষয়াদির সংযোগ হলে তাতে আসক্তি হওয়া এবং অপরকে বিষয় ভোগ করতে দেখে সেই বিষয় প্রাপ্তির জন্য মনে লোভের উদ্রেক হওয়া হল 'লোলুপতা' ; এর সর্বতোভাবে অভাবের নাম 'অলোলুপ্ত্ব'।

প্রশ্ন—'মার্দব' কাকে বলে ?

উত্তর—অন্তঃকরণ, বাক্য ও ব্যবহারে কঠোরতার সর্বতোভাবে অভাব হয়ে সেগুলির অতিশয় কোমল হয়ে যাওয়া—একেই বলা হয় 'মার্দব'।

প্রশ্ন—'হ্রী' কাকে বলে ?

উত্তর—বেদ, শাস্ত্র ও লোক-ব্যবহারের বিরুদ্ধ আচরণ না করার স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর সেইরূপ বিরুদ্ধ আচরণে যে সঙ্কোচ হয়, তাকে 'হ্রী' অর্থাৎ লজ্জা বলে।

প্রশ্ন—'অচাপল' কী ?

উত্তর—হাত-পা ইত্যাদি নাড়ানো, অযথা গাছের পাতা প্রভৃতি ছেঁড়া, জমি খনন করা, অকারণে কথা বলা, কোনো কারণ ছাড়া অন্য কথা চিন্তা করা ইত্যাদি হাত-পা, বাক্য ও মনের বৃথা প্রচেষ্টার নাম চপলতা। একে **প্রমাদ**ও বলা হয়। এর সর্বতোভাবে অভাবকেই বলা হয় 'অচাপল'।

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥ ৩

তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য, বাহ্যাভ্যন্তর শুদ্ধি, কারও প্রতি শত্রুভাব না থাকা, এবং নিজের মধ্যে পূজ্যতার

অভিমান না থাকা—হে ভারত ! এই সবই হল দৈবী সম্পদযুক্ত পুরুষদের লক্ষণ ॥ ৩

প্রশ্ন— 'তেজ' কাকে বলে ?

উত্তর—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সেই শক্তি-বিশেষের নাম তেজ, যার প্রভাবে তাঁর সামনে বিষয়াসক্ত ও নীচ-প্রকৃতিযুক্ত মানুষও প্রায়শঃই অন্যায় আচরণ ত্যাগ করে তাঁর কথানুসারে শ্রেষ্ঠ কর্মে প্রবৃত্ত হয়।

প্রশ্ন—'ক্ষমা' শব্দের কী ভাবার্থ ?

উত্তর—নিজের প্রতি অপরাধকারীর প্রতি কোনোপ্রকার দণ্ড প্রদানের ভাব না রাখা, কোনোভাবে তার প্রতি প্রতিহিংসা-পরায়ণ না হওয়া, তার অপরাধকে অপরাধ বলে গণ্য না করা, এবং তা সম্পূর্ণভাবে ভুলে যাওয়াই হল 'ক্ষমা'। অক্রোধে শুধুমাত্র ক্রোধ না থাকার কথাই বলা হয়েছে, কিন্তু ক্ষমাতে অপরাধের ন্যায়োচিত দণ্ড প্রদানের ইচ্ছাও থাকে না। এই হল অক্রোধ এবং ক্ষমার মধ্যে পার্থক্য।

প্রশ্ন—'ধৃতি' কাকে বলে ?

উত্তর—গভীর সংকট, ভয় বা দুঃখ উপস্থিত হলেও তাতে বিচলিত না হওয়া ; কাম-ক্রোধ-ভয়-লোভ প্রভৃতির ফলে কোনোভাবেই নিজধর্ম ও কর্তব্যের প্রতি বিমুখ না হওয়াকে বলে 'ধৃতি' । একেই বলা হয় ধৈর্য।

প্রশ্ন—'শৌচ' কাকে বলা হয় ?

উত্তর — সত্যতাপূর্বক পবিত্র ব্যবহারে দ্রব্যশুদ্ধি হয়, সেই দ্রব্য দ্বারা প্রাপ্ত অন্নে আহার শুদ্ধি হয়, যথাযোগ্য ব্যবহারে আচরণাদি শুদ্ধি হয় এবং জলমাটি ইত্যাদি দ্বারা প্রক্ষালনাদি ক্রিয়ার সাহায্যে শরীর শুদ্ধি হয়। এই সবগুলিকে বাহ্য শৌচ বা বাইরের শুদ্ধি বলে। একেই এখানে 'শৌচ' নামে বলা হয়েছে। অন্তরের শুদ্ধির কথা প্রথম শ্লোকে পৃথকভাবে 'সত্ত্বসংশুদ্ধি' নামে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—'অদ্রোহ' কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—নিজের সঙ্গে শত্রুতাপূর্ণ আচরণকারী প্রাণীদের প্রতি বিন্দুমাত্রও দ্বেষ বা শত্রুতার ভাব না হওয়াকে বলা হয় 'অদ্রোহ'।

প্রশ্ন—'ন অতিমানিতা' কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—নিজেকে শ্রেষ্ঠ, বড় বা পূজ্য বলে মনে করা এবং মান, মর্যাদা, প্রতিষ্ঠা ও পূজা ইত্যাদির বিশেষ বাসনা পোষণ করা এবং বিনা ইচ্ছাতে এই সবের প্রাপ্তিতে বিশেষভাবে প্রসন্ন হওয়া—এ সবই হল অতিমানিতার লক্ষণ। এসবের সম্পূর্ণ অভাবকে বলা হয় 'ন অতিমানিতা'।

প্রশ্ন—'দৈবীসম্পদ্' কাকে বলে ?

উত্তর—ভগবানের নাম 'দেব'। তাই তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত তাঁর প্রাপ্তির সাধনরূপ সদ্‌গুণ এবং সদাচার সমুদয়কে বলা হয় 'দৈবীসম্পদ্'। এগুলিকে 'দৈবীপ্রকৃতি'ও বলা হয়।

প্রশ্ন— এসব হল দৈবীসম্পদযুক্ত পুরুষের লক্ষণ —এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর অভিপ্রায় হল যে এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক থেকে এই শ্লোকের পূর্বার্ধ পর্যন্ত আড়াই শ্লোকে ছাব্বিশ লক্ষণাদির রূপে সেই দৈবীসম্পদরূপ সদ্‌গুণ ও সদাচারেরই বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং যাঁর মধ্যে এই সব লক্ষণ স্বভাবতঃই বিদ্যমান অথবা যিনি সাধনা দ্বারা তা প্রাপ্ত করেছেন, সেই ব্যক্তিই হলেন দৈবী-সম্পদযুক্ত।

সম্বন্ধ—এইরূপ ধারণযোগ্য দৈবীসম্পদযুক্ত পুরুষের লক্ষণ বর্ণনা করে এবার ত্যাজ্য আসুরীসম্পদযুক্ত পুরুষের লক্ষণ সংক্ষেপে বলা হচ্ছে—

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥ ৪

হে পার্থ ! দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞান—এই সকল হল আসুরী সম্পদসহ জাত পুরুষদের লক্ষণ ॥ ৪

প্রশ্ন—'দম্ভ' কাকে বলে ?

উত্তর—মান, মর্যাদা, পূজা ও প্রতিষ্ঠার জন্য, ধন ইত্যাদির লোভে বা কারোকে ঠকাবার অভিপ্রায়ে নিজেকে ধর্মাত্মা, ভগবদ্ভক্ত, জ্ঞানী বা মহাত্মা বলে প্রসিদ্ধি লাভ করা অথবা লোক দেখাবার জন্য ধর্মপালনের, দাতার, ভক্তির, ব্রত-উপবাস ইত্যাদির এবং যোগ সাধনার ভান করা বা যে সাজে সাজলে নিজের স্বার্থসিদ্ধি হয় সেরূপ সেজে নিজের কাজ হাসিল করা, তার ঢং করাকে বলা হয় 'দম্ভ'।

প্রশ্ন—'দর্প' কাকে বলে ?

উত্তর—বিদ্যা, ধন, আত্মীয়-পরিজন, জাতি, অবস্থা, বল ও ঐশ্বর্য ইত্যাদির দ্বারা মনে যে অহংকার হয়—যার জন্য মানুষ অপরকে তুচ্ছ মনে করে তার অবহেলা করে, তার নাম হল 'দর্প'।

প্রশ্ন—'অভিমান' কাকে বলে ?

উত্তর—নিজেকে পূজ্য, শ্রেষ্ঠ বা বড়ো বলে মনে করা, মান, প্রতিষ্ঠা, কীর্তি এবং পূজা ইত্যাদির আশা করা এবং এসবের প্রাপ্তিতে প্রসন্ন হওয়াকেই বলা হয় 'অভিমান'।

প্রশ্ন—'ক্রোধ' কাকে বলে ?

উত্তর—বদ অভ্যাস বা ক্রোধী মানুষের সঙ্গদোষে বা কারো দ্বারা নিজের অপমান, অপকার বা নিন্দা হলে, মনের বিরুদ্ধ কাজ হলে, কারো দুর্বচন শুনে বা কারো অন্যায় দেখে—ইত্যাদি কোনো কারণে অন্তরে যে দ্বেষযুক্ত উত্তেজনা হয়—যার জন্য মানুষের মনে প্রতি-হিংসার ভাব জেগে ওঠে, চক্ষু রক্তবর্ণ হয়, ঠোঁট কাঁপতে থাকে, মুখাকৃতি ভীষণ হয়, বুদ্ধিভ্রংশ হয় এবং কর্তব্যের হুঁশ থাকে না—ইত্যাদি যে কোনো প্রকারের 'উত্তেজিত বৃত্তি'র নাম হল 'ক্রোধ'।

প্রশ্ন—'পারুষ্য' বলতে কী বুঝায় ?

উত্তর—কোমলতার অত্যন্ত অভাব বা কঠোরতাকে বলা হয় 'পারুষ্য'। কারোকে গালাগালি দেওয়া, দুর্বাক্য বলা, বিদ্রূপাত্মক বাক্য বলা ইত্যাদি হল বাক্যের কঠোরতা ; বিনয়ের অভাব হল শরীরের কঠোরতা এবং ক্ষমা ও দয়ার বিরোধী প্রতিহিংসা ও ক্রূরতার ভাবকে বলা হয় মনের কঠোরতা।

প্রশ্ন—'অজ্ঞান' পদ এখানে কীসের বাচক ?

উত্তর—সত্য-অসত্য এবং ধর্ম-অধর্ম ইত্যাদি সঠিক-ভাবে না বোঝা বা সেগুলির সম্পর্কে বিপরীত ধারণা করাই হল 'অজ্ঞান'।

প্রশ্ন—'আসুরীসম্পদ্' কাকে বলা হয় এবং এগুলি সবই হল আসুরীসম্পদ্যুক্ত পুরুষদের লক্ষণ—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভগবানের অস্তিত্ব না মানা এবং ঈশ্বর-বিরোধী নাস্তিক মানুষদের 'অসুর' বলা হয়। এইসব লোকেদের মধ্যে যে দুর্গুণ ও দুরাচার সমুদয় থাকে, সেগুলিকে বলা হয় আসুরীসম্পদ। এসব হল আসুরীসম্পদ্ যুক্ত পুরুষদের লক্ষণ, এই কথার দ্বারা ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, এই শ্লোকে দুর্গুণ ও দুরাচারের সমুদায়রূপ আসুরীসম্পদ সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা হয়েছে। সুতরাং এইসব অথবা এগুলির মধ্যে যে কোনো লক্ষণ যার মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তাকে আসুরীসম্পদ্যুক্ত মানুষ বলে মনে করা উচিত।

সম্বন্ধ—এইভাবে দৈবীসম্পদ এবং আসুরীসম্পদ্যুক্ত পুরুষদের লক্ষণসমূহ বর্ণনা করে ভগবান এবার উভয় সম্পদের ফল জানিয়ে অর্জুনকে দৈবীসম্পদ্যুক্ত বলে আশ্বস্ত করেছেন—

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব॥ ৫

দৈবী-সম্পদ্ সংসারবন্ধন থেকে মুক্তির হেতু এবং আসুরীসম্পদ্ বন্ধনের কারণ। হে অর্জুন ! তুমি শোক কোরো না, কারণ তুমি দৈবীসম্পদ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছ ॥ ৫

প্রশ্ন—দৈবীসম্পদকে মুক্তির হেতু মানা হয়—এই কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এই কথায় ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, প্রথম শ্লোক থেকে তৃতীয় শ্লোক পর্যন্ত সাত্ত্বিক গুণ ও আচরণের সমুদায়রূপ হিসাবে যে দৈবীসম্পদের বর্ণনা করা হয়েছে, তা মানুষকে সংসারবন্ধন থেকে চিরকালের জন্য মুক্ত করে সচ্চিদানন্দঘন পরমেশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করে—বেদ, শাস্ত্র ও মহাত্মাগণ সকলেই এরূপ মনে করেন।

প্রশ্ন—আসুরীসম্পদ বন্ধনের কারণ মানা হয়—এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—এই কথার দ্বারা ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, দুর্গুণ ও দুরাচাররূপ যে রজোমিশ্রিত তমোগুণ প্রধান ভাব সমুদায়, সেগুলিই হল আসুরী সম্পদ—চতুর্থ শ্লোকে যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হয়েছে। সেই সম্পদ মানুষকে সর্বপ্রকারে সংসারে আবদ্ধ করে অধোগতি অভিমুখে নিয়ে যায়। বেদ, শাস্ত্র এবং মহাত্মা সকলেই একথা স্বীকার করেন।

প্রশ্ন—অর্জুনকে 'তুমি দৈবী সম্পদ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছ, সুতরাং শোক কোরো না' ; এই কথা বলার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—এই কথায় ভগবান অর্জুনকে আশ্বস্ত করে বলেছেন যে, তুমি স্বভাবতঃই দৈবীসম্পদ নিয়ে জন্মেছ, দৈবীসম্পদের সমস্ত লক্ষণই তোমার মধ্যে বিদ্যমান। দৈবীসম্পদ সংসার বন্ধন থেকে মুক্তিকারক ; সুতরাং তোমার কল্যাণের বিষয়ে কোনোপ্রকার সন্দেহ নেই। অতএব তোমার শোক করা উচিত নয়।

সম্বন্ধ—এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে এবং এর পূর্বেও দৈবীসম্পদ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু আসুরী সম্পদের বর্ণনা এখন পর্যন্ত অত্যন্ত সংক্ষেপে করা হয়েছে। তাই আসুরী প্রকৃতিসম্পন্ন মানুষদের স্বভাব ও আচার-ব্যবহারের বিস্তারিত বর্ণনা করার জন্য ভগবান এবার তার প্রস্তাবনা করছেন—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু॥ ৬

হে পার্থ ! ইহলোকে দুপ্রকারের ভূতপ্রাণী অর্থাৎ মানুষের সৃষ্টি হয়েছে, এক দৈবী প্রকৃতিসম্পন্ন এবং অন্যটি আসুরী প্রকৃতিসম্পন্ন। এদের মধ্যে দৈবী প্রকৃতিসম্পন্ন মানুষদের কথা বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে, এবার তুমি আসুরী প্রকৃতিসম্পন্ন মানুষদের কথা বিস্তারিতভাবে আমার নিকট শোনো ॥ ৬

প্রশ্ন—'ভূতসর্গৌ' পদের অর্থ 'মনুষ্য সমুদায়' কেন করা হল ?

উত্তর—সৃষ্টিকে 'সর্গ' বলা হয়, ভূতপ্রাণীর সৃষ্টিকে ভূতসর্গ বলা হয়। এখানে 'অস্মিন্ লোকে' দ্বারা মনুষ্য-লোকের ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং এই অধ্যায়ে মানুষদের লক্ষণ বলা হয়েছে, সেইজন্য এখানে 'ভূতসর্গৌ' পদের অর্থ 'মনুষ্য সমুদায়' করা হয়েছে।

প্রশ্ন—মনুষ্যসমাজ দুপ্রকারের বলে তার সঙ্গে 'এব' পদ প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা দেখানো হয়েছে যে, মনুষ্য সমাজের অনেক ভেদ হলেও প্রধানতঃ তার দুটিই বিভাগ, কারণ সব ভিন্নতা এই দুটিরই অন্তর্গত।

প্রশ্ন—এক দৈবী প্রকৃতিসম্পন্ন, আর অপরটি আসুরী প্রকৃতিসম্পন্ন—এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথার দ্বারা স্পষ্টতঃ দুপ্রকারের বিভাগ করে বলা হয়েছে যে, মানুষের এই দুই শ্রেণীর মধ্যে যাঁরা সাত্ত্বিক, তাঁরা তো দৈবী প্রকৃতিসম্পন্ন ; আর যাঁরা রজোমিশ্রিত তমোপ্রধান, তাঁরা আসুরী প্রকৃতিবিশিষ্ট। 'রাক্ষসী' ও 'মোহিনী' স্বভাবসম্পন্ন মানুষদেরও এক্ষেত্রে আসুরী প্রকৃতিবিশিষ্ট বলেই মনে করা উচিত।

প্রশ্ন—দৈবী প্রকৃতিবিশিষ্ট মানুষদের কথা বিস্তারিত-ভাবে বলা হয়েছে, এবার আসুরী প্রকৃতিদের কথাও শোনো—এই বাক্যের অর্থ কী ?

উত্তর—এর অর্থ হল এই অধ্যায়ের প্রথম থেকে তৃতীয় শ্লোক পর্যন্ত এবং অন্য অধ্যায়েও দৈবী প্রকৃতি-সম্পন্ন মানুষদের স্বভাব, আচরণ এবং ব্যবহারাদির বর্ণনা বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে কিন্তু আসুরী প্রকৃতি সম্পন্ন মানুষদের স্বভাব, আচরণ এবং ব্যবহারের বর্ণনা সংক্ষেপেই করা হয়েছে, সুতরাং তা ত্যাগ করার উদ্দেশ্যে তুমি এবার সেগুলি সবিস্তারে শোনো।

সম্বন্ধ—এইভাবে আসুরীপ্রকৃতিযুক্ত মানুষদের লক্ষণ শোনার জন্য অর্জুনকে সতর্ক করে ভগবান এবার তাদের বর্ণনা করছেন—

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥ ৭

আসুরী স্বভাববিশিষ্ট মানুষ প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি— এই দুটিকেই জানে না। তাই তাদের বাহ্যাভ্যন্তর শুদ্ধি নেই, শ্রেষ্ঠ আচরণ নেই এবং সত্যভাষণও নেই ॥ ৭

প্রশ্ন—আসুরী স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি জানে না—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যে কর্মের দ্বারা মানুষের ইহলোকে ও পরলোকে প্রকৃত কল্যাণ হয়, তাকেই বলে কর্তব্য। মানুষের তাতেই প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। আর যে কর্ম করলে অকল্যাণ হয়, সেগুলি অকর্তব্য, তার থেকে নিবৃত্ত থাকা উচিত। ভগবানের বক্তব্যের এই অভিপ্রায় যে আসুরী স্বভাবসম্পন্ন মানুষ এই কর্তব্য-অকর্তব্য সম্বন্ধীয় প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সম্বন্ধে সচেতন নয়, তাই তাদের যা মনে হয়, তারা তাই করে।

প্রশ্ন—তাদের মধ্যে শৌচ, আচার এবং সত্য থাকে না, এ কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—বাহ্যাভ্যন্তরের পবিত্রতাকে বলা হয় 'শৌচ', যার বিস্তারিত আলোচনা ত্রয়োদশ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকের টীকাতে করা হয়েছে ; 'আচার' বলা হয় সেই উত্তম ক্রিয়াগুলিকে, যার দ্বারা পবিত্রতা অর্জন হয় এবং 'সত্য' বলা হয় নিষ্কপট হিতকর যথার্থ ভাষণকে, যার আলোচনা এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকের টীকাতে করা হয়েছে। সুতরাং উপরোক্ত বক্তব্যের এই তাৎপর্য যে, আসুরী স্বভাববিশিষ্ট মানুষদের মধ্যে এই তিনটির কোনটিই থাকে না, বরং তাদের মধ্যে এর বিপরীত অপবিত্রতা, দুরাচার ও মিথ্যাভাষণ থাকে।

প্রশ্ন—এই শ্লোকের উত্তরার্ধে ভগবান তিনবার 'ন'-এর এবং পরে 'অপি' প্রয়োগ করে কী বলতে চেয়েছেন ?

উত্তর—ভগবানের কথার তাৎপর্য হল, আসুরী স্বভাববিশিষ্টদের মধ্যে শুধুমাত্র অপবিত্রতাই নয়, তাদের মধ্যে সদাচার এবং সত্যভাষণও থাকে না।

সম্বন্ধ—আসুরী স্বভাববিশিষ্টদের মধ্যে বিবেক, শৌচ ও সদাচার ইত্যাদির অভাব জানিয়ে এবার তাদের নাস্তিকভাবের বর্ণনা করছেন—

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥ ৮

এই আসুরী প্রকৃতির মানুষেরা বলে থাকে এই জগৎ আশ্রয়রহিত, সর্বতোভাবে সত্যশূন্য, ঈশ্বরবিহীন, শুধুমাত্র কামবশতঃ নারী-পুরুষ সংযোগেই উৎপন্ন। এছাড়া আর কী বা আছে ? ॥ ৮

প্রশ্ন—এই শ্লোকটির অর্থ কী ?

উত্তর—এই শ্লোকে আসুরী প্রকৃতির মানুষদের মনগড়া কল্পনার বর্ণনা করা হয়েছে। এরা মনে করেন যে এই সমগ্র জগতের কোনো ঈশ্বর বা কোনো ধর্মাধর্মের ব্যবস্থা নেই এবং জগতের কোনো নিত্য অস্তিত্বও নেই অর্থাৎ জন্মের আগে বা মৃত্যুর পর কোনো জীবের কোনো অস্তিত্ব নেই, এবং এর কোনো রচয়িতা, নিয়ামক বা শাসক ঈশ্বর বলেও কিছু নেই। এই চরাচর জগৎ শুধুমাত্র নারী-পুরুষের সংযোগেই উৎপন্ন এবং কামই হল তার কারণ। এতদ্ব্যতীত এর আর কোনোই প্রয়োজন নেই।

সম্বন্ধ—এরূপ নাস্তিক সিদ্ধান্তযুক্ত ব্যক্তিদের স্বভাব ও আচরণ কীরূপ হয় ? সেই জিজ্ঞাসার উত্তরে ভগবান এবার পরবর্তী চারটি শ্লোকে তাদের লক্ষণ বর্ণনা করছেন—

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥ ৯

এইরূপ মিথ্যা জ্ঞান অবলম্বন করে যাঁদের স্বভাব বিকৃত হয়েছে এবং বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে, সেইসব অহিতকারী ক্রূরকর্মা ব্যক্তিগণ শুধু জগৎ বিনাশের জন্য জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৯

প্রশ্ন—'**এই মিথ্যা জ্ঞান অবলম্বন করে**'—এই বাক্যাংশের তাৎপর্য কী ?

উত্তর—আসুর স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমস্ত কর্ম এই নাস্তিক্যবাদের সিদ্ধান্তের দৃষ্টিতেই সম্পন্ন হয়ে থাকে, এটি প্রতিপন্ন করার জন্যই এই কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—তাদের '**নষ্টাত্মানঃ**', '**অল্পবুদ্ধয়ঃ**', '**অহিতাঃ**' এবং '**উগ্রকর্মাণঃ**' বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে নাস্তিক সিদ্ধান্তসম্পন্ন মানুষ আত্মার অস্তিত্ব মানে না, তারা শুধু দেহবাদী বা ভৌতিকবাদীই হয় ; এতে তাদের স্বভাব ভ্রষ্ট হয়ে যায়, কোনো প্রকার সৎকার্যে তাদের প্রবৃত্তি হয় না। তাদের বুদ্ধিও ভ্রষ্ট হয়ে যায় ; তারা যা কিছু সিদ্ধান্ত করে, সবই কেবল ভোগ-সুখের দিকে দৃষ্টি রেখে। তারা নিরন্তর সকলের অহিতের কথাই চিন্তা করে, তাতে তাদের নিজেদেরই অহিত হয়ে থাকে। কায়-মনো-বাক্যে তারা চরাচরের প্রাণীদের ভয় দেখাতে, দুঃখ দিতে এবং বিনাশ করার জন্য ভীষণ কর্ম করতে থাকে।

প্রশ্ন—তারা জগতের বিনাশ করতেই সক্ষম—এই বাক্যটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—উপরোক্ত প্রকারের লোকেরা তাদের জীবনে কায়-মনো-বাক্যে এবং বুদ্ধির সাহায্যে যে কাজই করুক, তা সবই সমগ্র প্রাণীজগৎকে কষ্ট দিতে ও বিনাশ করার জন্যই করে। তাই একথা বলা হয়েছে যে তাদের সামর্থ্য শুধু জগতের বিনাশ করার জন্যই হয়ে থাকে।

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাসদ্গ্রাহান্ প্রবর্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥ ১০

এইসব দম্ভ, অভিমান ও মদযুক্ত মানুষেরা দুষ্পূরণীয় কামনার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং অজ্ঞানবশতঃ মিথ্যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ও ভ্রষ্টাচারে প্রবৃত্ত হয়ে সংসারে বিচরণ করে ॥ ১০

প্রশ্ন—'**দম্ভমানমদান্বিতাঃ**' কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—ধন, মান, মর্যাদা, পূজা, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি স্বার্থসাধনের জন্য যেখানে যেমন শ্রেষ্ঠত্বের ভাব প্রদর্শন করতে হয়, বাস্তবে তা না হওয়া সত্ত্বেও, সেইরূপ ভাব প্রদর্শন করাকে বলা হয় 'দম্ভ'। নিজের মধ্যে সম্মানীয় বা পূজ্য হওয়ার অভিমান পোষণ করা হল 'মান' এবং রূপ, গুণ, জাতি, ঐশ্বর্য, বিদ্যা, পদ, ধন, সন্তান ইত্যাদির নেশায় মগ্ন থাকাকে বলা হয় 'মদ'। আসুরী স্বভাববিশিষ্ট মানুষ এই দম্ভ, মান ও মদযুক্ত হয়। তাই তাদের সম্বন্ধে এরূপ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—'**দুষ্পূরম্**' বিশেষণের সঙ্গে '**কামম্**' পদ কীসের বাচক এবং তার আশ্রয় নেওয়া কাকে বলে ?

উত্তর—জগতের ভিন্ন ভিন্ন ভোগ প্রাপ্তির যে ইচ্ছা, যা কোনোভাবেই পূরণ হওয়া সম্ভব নয়, সেই কামনাসমূহের বাচক হল এই '**দুষ্পূরম্**' বিশেষণের সঙ্গে '**কামম্**' পদটি এবং ঐসব কামনা পূর্ণ করার জন্য মনে দৃঢ় সংকল্প রাখাই হল তার আশ্রয় গ্রহণ করা।

প্রশ্ন—অজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কী ?

উত্তর—অজ্ঞানের বশীভূত হয়ে নানাপ্রকার শাস্ত্র-বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তের কল্পনা করে তা হঠকারিতাপূর্বক ধারণা করা হল সেগুলিকে অজ্ঞতাপূর্বক গ্রহণ করা।

প্রশ্ন—'**অশুচিব্রতাঃ**' কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে তাদের খাওয়া-দাওয়া, ওঠা, বসা, চাল-চলন, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেন-দেন, আচার-আচরণ ইত্যাদি সবই শাস্ত্র-বিরুদ্ধও ভ্রষ্ট হয়।

প্রশ্ন—'**প্রবর্তন্তে**' কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর অভিপ্রায় হল, এরা অজ্ঞতাবশতঃ উপরোক্ত ভ্রষ্টাচারযুক্ত হয়ে জগতে ইচ্ছানুযায়ী বিচরণ করে।

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥ ১১

এই ব্যক্তিরা মৃত্যুকাল পর্যন্ত অসংখ্য চিন্তার আশ্রয় নিয়ে বিষয়ভোগে তৎপর হয় এবং 'এটিই সুখ' এইরূপ মনে করে থাকে॥ ১১

প্রশ্ন—তাঁদের মৃত্যু পর্যন্ত অসংখ্য চিন্তার আশ্রয় নিয়ে থাকা বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা দেখানো হয়েছে যে, আসুরী-স্বভাববিশিষ্ট মানুষ ভোগ-সুখের জন্য এইরূপ অসংখ্য চিন্তার আশ্রয় নিয়ে থাকে, যা সারা জীবনেও শেষ হয় না, যা মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বজায় থাকে এবং যা এতো অসংখ্য যে তার কোনো সীমা থাকে না।

প্রশ্ন—বিষয় ভোগ পরায়ণ হওয়ার এবং 'এটিই সুখ' মনে করার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর অভিপ্রায় হল, বিষয়ভোগের সামগ্রী সংগ্রহ করা এবং তা ভোগ করা—কেবল এইটুকুই তাঁদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়। তাই তাঁদের জীবন এগুলিরই অধীন হয়ে থাকে এবং তাদের মনে এই স্থির সিদ্ধান্ত হয় যে 'ব্যাস্, যা কিছু সুখ তা এই ভোগ করার মধ্যেই আছে।'

আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥ ১২

তারা আশার অসংখ্য কামনা জালে আবদ্ধ এবং কাম-ক্রোধের পরায়ণ হয়ে বিষয়ভোগের জন্য অন্যায়ভাবে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করতে থাকে॥ ১২

প্রশ্ন—তারা আশার অসংখ্য জালে আবদ্ধ থাকে—কথাটি বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—আসুরী-স্বভাববিশিষ্ট মানুষদের মনে কাম উপভোগের নানাপ্রকার কল্পনা জাগরিত হয় এবং তারা সেই কল্পনা পূরণের জন্য নানাপ্রকার অসংখ্য আশা পোষণ করতে থাকে। তাদের মন কখনও এ বিষয়ে, কখনো অন্য বিষয়ে আকর্ষিত হতে থাকে। আশার বন্ধন থেকে তারা কখনও মুক্তি পায় না। তাই তাদের অসংখ্য আশার জালে আবদ্ধ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—'কামক্রোধপরায়ণাঃ' কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—আসুরী স্বভাববিশিষ্ট মানুষ সেইসব আশা পূরণের জন্য ভগবান বা কোনো দেবতা, সৎকর্ম অথবা সদ্‌বিচারের আশ্রয় গ্রহণ করে না, তারা শুধু কাম-ক্রোধই অবলম্বন করে থাকে। তাই তাদের কাম-ক্রোধের পরায়ণ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—বিষয়ভোগের জন্য অন্যায়ভাবে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করা কেমন ?

উত্তর—বিষয় ভোগের উদ্দেশ্যে যে কাম-ক্রোধ অবলম্বন করে অন্যায়ভাবে অর্থাৎ চুরি, জোচ্চুরি, ডাকাতি, ছল-কপট, মিথ্যাচার, দম্ভ, মারামারি, কূটনীতি, জুয়া, ধাপ্পাবাজি, বিষ-প্রয়োগ, মিথ্যা-মামলা ও ভয় প্রদান ইত্যাদি শাস্ত্র বিরুদ্ধ নানা উপায় দ্বারা অপরের ধন-সম্পদ হরণ করার চেষ্টা—এগুলিই হল বিষয় ভোগের জন্য অন্যায়ভাবে অর্থসঞ্চয় করার প্রচেষ্টা।

সম্বন্ধ—আগের চারটি শ্লোকে আসুরী স্বভাববিশিষ্ট মানুষদের লক্ষণ ও আচরণ জানিয়ে এবার পরবর্তী চারটি শ্লোকে তাদের 'অহংবোধ', 'মমত্ব' ও 'মোহ'যুক্ত সংকল্পের নিরূপণ করে তাদের দুর্গতির বর্ণনা করছেন—

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥ ১৩

তারা ভাবতে থাকে যে আমি আজ এই ধন লাভ করেছি, এবার এই আশা পূরণ করব। আমার এতো ধন আছে, পরে আরও ধন লাভ হবে ॥ ১৩

প্রশ্ন—এই শ্লোকটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর— 'মনোরথ' শব্দটি এখানে স্ত্রী, পুত্র, ধন, জমি, বাড়ি, মান-মর্যাদা ইত্যাদি সমস্ত মনোবাঞ্ছিত পদার্থের চিন্তার বাচক ; অতএব এই শ্লোকের এই অভিপ্রায় যে, আসুরী স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি অহংকারবশতঃ নানা বিষয় চিন্তা করতে থাকে। তারা মনে করে অমুক অভীষ্ট বস্তু তো আমি পরিশ্রম করে লাভ করেছি, এবার অন্য মনোবাঞ্ছিত বস্তুও নিজের উদ্যমে লাভ করব। আমার কাছে আগে থেকেই এতো ধন ও ঐশ্বর্য আছে, পরে আরও অনেক হবে।

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥ ১৪

এই দুর্জয় শত্রুকে আমি বিনাশ করেছি, এবার অন্য শত্রুদেরও বিনাশ করব। আমি ঈশ্বর, আমি ঐশ্বর্যভোগী। আমি সর্বসিদ্ধিযুক্ত, বলবান ও সুখী ॥ ১৪

প্রশ্ন—ঐ শত্রুকে আমি বধ করেছি, অন্য শত্রুকেও বিনাশ করব—এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর— কামনাপূর্বক উপভোগ করাকেই পরম পুরুষার্থ বলে নির্ণয়কারী আসুরীস্বভাবযুক্ত ব্যক্তি কাম-ক্রোধ পরায়ণ হয়। ঈশ্বর, ধর্ম ও কর্মফলে তাদের একটুও বিশ্বাস থাকে না। তাই তারা অহংকারে উন্মত্ত হয়ে মনে করে 'জগতে এমন কে আছে যে আমার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে বা আমার বিরোধিতা করে বেঁচে থাকতে পারে ?' তাই তারা ক্রুদ্ধ হয়ে অহংকারের সঙ্গে ক্রুরবাক্যে বলে থাকেন, 'ঐ যে অত্যন্ত বলশালী, জগৎপ্রসিদ্ধ প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিল, আমার সঙ্গে শত্রুতা করায় চোখের পলকে তাকে যমপুরী পৌঁছে দিয়েছি ; শুধু তাই নয়, যারাই আমার সঙ্গে শত্রুতা করছে বা করবে তারা যত বলবানই হোক না কেন, আমি অনায়াসেই তাদের মেরে ফেলব।'

প্রশ্ন— আমি ঈশ্বর, ভোগী, সিদ্ধ, বলবান এবং সুখী—এই বাক্যটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর— এর অভিপ্রায় হল, এরা অহংকারে মত্ত হয়ে মনে করে যে 'জগতে আমার থেকে বড় আর কে আছে, আমি যাকে চাইব তাকেই মারব, বাঁচাব, যা খুশী তাই করব।' এবং গর্বের সঙ্গে বলে থাকে, 'আরে, আমি একেবারে আলাদা, স্বাধীন, সমস্ত আমার হাতে, আমি ছাড়া আর কে এতো ঐশ্বর্যশালী আছে, আমিই সব ঐশ্বর্যের মালিক। ঈশ্বরেরও ঈশ্বর আমি। সকলেরই আমাকে পূজা করা উচিত। আমি শুধু ঐশ্বর্যের মালিকই নই, সমস্ত ঐশ্বর্য ভোগও আমিই করি। আমি জীবনে কখনও বিফল হইনি, যেখানে হাত দিয়েছি, সেখানেই সাফল্য আমার অনুসরণ করেছে। আমার জীবন সর্বদা সাফল্যমণ্ডিত, সিদ্ধ। ভবিষ্যতের ঘটনা আমি আগে থেকেই বুঝতে পারি। আমি সব জানি, এমন কিছু নেই যা আমার অগোচর। শুধু তাই নয়, আমি অত্যন্ত বলবান, আমার মনোবল এবং শারীরিক বলের এতটাই প্রভাব যে, যে কেউ এর সাহায্যে জগৎ জয় করতে পারে। এইসব কারণেই আমি অত্যন্ত সুখী ; জগতের সমস্ত সুখ চিরকাল আমার সেবা করে এবং করতে থাকবে'।

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥ ১৫
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥১৬

আমি অত্যন্ত ধনী এবং বহু আত্মীয় পরিবেষ্টিত। আমার মতো আর কে আছে ? আমি যজ্ঞ করব, দান করব, আমোদ-প্রমোদ করব। এইপ্রকার অজ্ঞ, মোহগ্রস্ত এবং নানাভাবে বিভ্রান্তচিত্ত মোহজাল-সমাবৃত এবং বিষয়ভোগে অত্যধিক আসক্ত আসুরী প্রকৃতির ব্যক্তিরা ভয়ানক অপবিত্র নরকে পতিত হয় ॥ ১৫-১৬

প্রশ্ন—আমি অত্যন্ত ধনী এবং বহু আত্মীয় পরিবেষ্টিত, আমার মতো আর কে আছে ? এই কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এর দ্বারা আসুরী প্রকৃতিবিশিষ্ট মানুষের ধন ও আত্মীয় সম্বন্ধীয় দর্প স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, এই আসুরী প্রকৃতিবিশিষ্ট মানুষ অহংকারপূর্বক বলে থাকে যে আমার অর্থের, আত্মীয়-স্বজনের, মিত্র, বান্ধব, সহযোগী এবং সাথীদের কোনো অন্ত নেই। আমার এক ডাকে অসংখ্য মানুষ আমাকে অনুসরণ করতে প্রস্তুত। এইরূপ ধনবল ও জনবলে আমার সমকক্ষ আর কেউ নেই।

প্রশ্ন—আমি যজ্ঞ করব, দান করব—এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা তার যজ্ঞ ও দান সম্বন্ধীয় মিথ্যা অহংকার ব্যক্ত করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, আসুরী স্বভাবসম্পন্ন মানুষ বাস্তবে সাত্ত্বিক যজ্ঞ বা দান করে না এবং তা করতে চায়ও না। শুধু অপরের কাছে দম্ভ প্রদর্শন করার জন্য যজ্ঞ ও দানের মিথ্যা কথা বলে বাস্তবে নিজের দম্ভ প্রকাশ করে বলে থাকে 'আমি ঐ যজ্ঞ করব, বহু দান করব। আমার মতো দাতা এবং যজ্ঞসম্পাদনকারী আর কে আছে?'

প্রশ্ন—আমি আমোদ-প্রমোদ করব—এই কথার তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এর দ্বারা তার সুখ-সম্পর্কীয় মিথ্যা অহংকার দেখানো হয়েছে। এই আসুরী স্বভাববিশিষ্ট মানুষেরা নানাপ্রকার দম্ভ প্রদর্শন করে গর্বে স্ফীত হয়ে বলে থাকে, 'আহা ! এবার কত মজা হবে ; আমরা আনন্দে মগ্ন হয়ে থাকব।'

প্রশ্ন—'ইতি অজ্ঞানবিমোহিতাঃ' কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান দেখিয়েছেন যে, এই আসুরী স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিরা ত্রয়োদশ শ্লোক থেকে এই পর্যন্ত বর্ণিত অহংকাররূপ অজ্ঞান দ্বারা অত্যন্ত মোহগ্রস্ত হয়ে থাকে।

প্রশ্ন—'অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ' কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে আসুরী স্বভাব-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের চিত্ত নানাবিষয়ে নানা প্রকারে বিভ্রান্ত হয়ে থাকে। তারা কোনো বিষয়ে স্থির থাকতে পারে না, বৃথা ঘুরে মরে।

প্রশ্ন—'মোহজালসমাবৃতাঃ' কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর অর্থ হল, মাছ যেমন জালের ফাঁসে আবদ্ধ থাকে, তেমনই আসুরী স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিরা অবিবেকরূপ মোহ-মায়ার জালে আবদ্ধ থাকে।

প্রশ্ন—'কামভোগেষু প্রসক্তাঃ' কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর অর্থ হল, এই আসুরীভোগসম্পন্ন ব্যক্তিরা বিষয় উপভোগকেই জীবনের একমাত্র ধ্যেয় মনে করে তাতেই বিশেষভাবে আসক্ত থাকে।

প্রশ্ন—'এরা অপবিত্র নরকে পতিত হয়'—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ঐ আসুরী প্রকৃতিসম্পন্ন মানুষদের দুর্গতির বর্ণনা করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, উপরোক্ত প্রকারের স্থিতিযুক্ত মানুষ কাম-উপভোগের জন্য নানাপ্রকার পাপাচরণ করে এবং তার ফল ভোগের জন্য তাদের বিষ্ঠা, মূত্র, রুধির ইত্যাদি নোংরায় পূর্ণ দুঃখদায়ক কুম্ভীপাক, রৌরব ইত্যাদি ঘোর নরকে পতিত হতে হয়।

সম্বন্ধ—ভগবান পঞ্চদশ শ্লোকে বলেছিলেন যে, এরা বলে থাকে 'যজ্ঞ করব', তাই পরবর্তী শ্লোকে তাদের যজ্ঞের স্বরূপ জানাচ্ছেন—

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্ ॥ ১৭

নিজেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে সেই অহংকারী ব্যক্তি ধন-মান ও গর্বযুক্ত হয়ে অবিধিপূর্বক শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে নাম-মাত্র যজ্ঞ করে থাকে ॥ ১৭

প্রশ্ন—'**আত্মসম্ভাবিতাঃ**' কাকে বলা হয় ?

উত্তর—যে নিজের মনে নিজেকেই সর্ব বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ, সম্মানীয়, উচ্চ এবং পূজনীয় বলে মনে করে—তাকে বলা হয় '**আত্মসম্ভাবিতাঃ**'।

প্রশ্ন—'**স্তব্ধাঃ**' কথার অর্থ কী ?

উত্তর—যে অহংকারবশতঃ কারো সঙ্গে এমনকি পূজনীয় ব্যক্তিদের সঙ্গেও বিনয়ের সঙ্গে ব্যবহার করে না, তাকে বলা হয় 'স্তব্ধ'।

প্রশ্ন—'**ধনমানমদান্বিতাঃ**' কাকে বলা হয় ।

উত্তর—যে ধন এবং মানের অহংকারে উন্মত্ত থাকে, তাকে '**ধনমানমদান্বিতঃ**' বলা হয়।

প্রশ্ন—শুধু অহংকারের সঙ্গে শাস্ত্রবিধিরহিত নাম-মাত্র হয়ে যজ্ঞ করে—এই বাক্যটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে উপরোক্ত লক্ষণ-যুক্ত আসুরী স্বভাবের মানুষ যে যজ্ঞ করে, তা শাস্ত্রবিধি-রহিত, তা নামমাত্রেই যজ্ঞ হয়ে থাকে। এইসব ব্যক্তিরা শ্রদ্ধাবিহীন হয়ে কেবল দম্ভসহ লোক দেখাবার উদ্দেশ্যেই এরূপ যজ্ঞ করে থাকে, তাদের এই যজ্ঞ তামসিক যজ্ঞ এবং এইজন্যই '**অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ**' কথার অনুসারে এরা নরকে পতিত হয়। তামসিক যজ্ঞের পূর্ণ ব্যাখ্যা সপ্তদশ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

সম্বন্ধ—এইরূপ আসুরী স্বভাববিশিষ্ট মানুষদের যজ্ঞের স্বরূপ জানিয়ে এবার তাদের দুর্গতির কারণরূপ স্বভাবের বর্ণনা করছেন—

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮

অহংকার, বল, দর্প, কামনা এবং ক্রোধপরায়ণ এবং অন্যের নিন্দাকারী এইরূপ ব্যক্তিরা নিজের ও অপরের দেহে অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত আমাকে দ্বেষ করে থাকে ॥ ১৮

প্রশ্ন—অহংকার, বল, দর্প, কাম এবং ক্রোধ-পরায়ণ—এর তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এর তাৎপর্য হল, এই আসুরী স্বভাবের মানুষ অহংকার অবলম্বন করে, বলে থাকে যে 'আমিই ঈশ্বর, সমস্ত কিছু ভোগ করি, সিদ্ধ, বলবান এবং সুখী। এমন কোন্ কাজ আছে, যা আমি করতে না পারি ?' নিজ ক্ষমতার আশ্রয় নিয়ে এরা অন্যের সঙ্গে শত্রুতা করে, ধমক দেয়, মার-ধোর করে এবং অপরকে বিপদে ফেলতে প্রস্তুত থাকে। তারা নিজের বলে বলীয়ান হয়ে কাউকে ধর্তব্যের মধ্যে আনে না। দম্ভের আশ্রয় নিয়ে বড় বড় কথা বলে, আমি মস্ত বড ধনী, অনেক বড় বড় লোক আমার আত্মীয়, আমার মতো আর কে আছে ? কামের আশ্রয় নিয়ে এরা নানাপ্রকার দুরাচার করে থাকে, ক্রোধপরায়ণ হয়ে বলে, যে আমার অনিষ্ট করবে, তাকে আমি মেরে ফেলব। এইভাবে শুধুমাত্র অহংকার, বল, দম্ভ, কাম ও ক্রোধের আশ্রয় নিয়ে, সেই বলে বলীয়ান হয়ে নানাপ্রকার আকাশকুসুম কল্পনা করতে থাকে এবং যা কিছু কর্ম করে সবই এই দোষের প্রেরণায় এবং এগুলিকে অবলম্বন করেই করে। এরা ঈশ্বর, ধর্ম, শাস্ত্র ইত্যাদি কোনো কিছুরই আশ্রয় নেয় না।

প্রশ্ন—এখানে 'চ' অব্যয় প্রয়োগ করা হয়েছে কেন ?

উত্তর—'চ' অব্যয় দ্বারা লক্ষ্য করানো হয়েছে যে, এই আসুরী স্বভাবের মানুষেরা শুধুমাত্র অহংকার, বল, দর্প, কাম-ক্রোধেরই যে পরায়ণ তা নয়, এরা দম্ভ, লোভ, মোহ ইত্যাদি এবং আরও নানা দোষ আশ্রয় করে থাকে।

প্রশ্ন—'**অভ্যসূয়কাঃ**' কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—অন্যের দোষ দেখা, তারপর তা নিয়ে তাদের নিন্দা করা, তাদের গুণ খণ্ডন করা এবং গুণেতে

দোষারোপণ করা—এ সবই হল অসূয়া। আসুরী স্বভাবের মানুষেরা এই সবই করে থাকে। অন্যের তো কথাই নেই, এরা ভগবান এবং সাধু-মহাত্মাদেরও দোষ দেখে থাকে— এই অর্থে এদের বলা হয়েছে 'অভ্যসূয়ক'।

প্রশ্ন—আসুরী প্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিরা 'নিজের এবং অপরের শরীরে স্থিত অন্তর্যামী পরমেশ্বরের সঙ্গে দ্বেষকারী'—একথা বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবানের এই অভিপ্রায় যে আসুরী স্বভাবের মানুষ যে অন্যের সঙ্গে শত্রুতা করে তাদের নানাপ্রকারে কষ্ট দেবার চেষ্টা করে এবং নিজেও কষ্ট ভোগ করে, তা কিন্তু বাস্তবিক আমার সঙ্গেই তাদের দ্বেষ করা, কারণ তাদের এবং অন্যের—সকলের মধ্যেই অন্তর্যামীরূপে আমি পরমেশ্বরই অবস্থান করি। কারোকে দ্বেষ করা বা কারো বিরোধ করা, কারো অহিত করা এবং কারোকে দুঃখ দেওয়া এসবই হল নিজের এবং অন্যের শরীরে স্থিত পরমেশ্বররূপ আমাকেই দ্বেষ করা।

সম্বন্ধ—এইভাবে সপ্তম থেকে অষ্টাদশ শ্লোক পর্যন্ত আসুরী স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিদের দুর্গুণ ও দুরাচারের বর্ণনা করে এবার ঐসব দুর্গুণ-দুরাচার বিষয়ে ত্যাজ্য-বুদ্ধি উৎপন্ন করাবার জন্য পরবর্তী দুটি শ্লোকে ভগবান এইসব ব্যক্তিদের অত্যন্ত নিন্দা করে তাদের দুর্গতির বর্ণনা করছেন—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥ ১৯

সেই দ্বেষপরায়ণ, পাপাচারী, ক্রূর, নরাধমদের আমি জগতে বারংবার আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি॥ ১৯

প্রশ্ন—'দ্বিষতঃ', 'অশুভান্', 'ক্রূরান্' এবং 'নরাধমান্' —এই চারটি বিশেষণের সঙ্গে 'তান্' পদ কীসের বাচক এবং এই বিশেষণগুলির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—উপরোক্ত বিশেষণগুলির সঙ্গে 'তান্' পদ, আগের শ্লোকগুলিতে যার বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে, সেই আসুরী স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাচক। তাদের দুর্গুণ ও দুরাচারই হল তাদের দুর্গতির কারণ, এই অভিপ্রায়ে উপরোক্ত বিশেষণগুলি প্রযুক্ত হয়েছে। তাৎপর্য হল, এরা সকলের সঙ্গে দ্বেষ করে, নানাপ্রকার অশুভ আচরণ করে সমাজ ভ্রষ্ট করে, নির্দয়ভাবে বহু কঠোর কর্মে রত থাকে এবং অকারণে অপরের ক্ষতি করে থাকে। এরা এমনই অধম শ্রেণীর মানুষ, সেইজন্যই আমি বারংবার এদের নীচ যোনিতে নিক্ষেপ করি।

প্রশ্ন—এখানে আসুরী জন্ম বলতে কী নির্দেশ করা হয়েছে ?

উত্তর—সিংহ, বাঘ, সাপ, বিছে, শুয়োর, কুকুর, কাক ইত্যাদি যত পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি আছে —এগুলি সবই আসুরী জন্মের অন্তর্গত।

প্রশ্ন—'অজস্রম্' এবং 'এব' পদের তাৎপর্য কী ?

উত্তর —'অজস্রম্' পদটির দ্বারা বলা হয়েছে যে এদের নিরন্তর হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ বার আসুরী-যোনিতে নিক্ষেপ করা হয়। 'এব' কথার দ্বারা বলা হয়েছে যে, এই সব ব্যক্তি দেবতা, পিতৃপুরুষ বা মনুষ্যজন্ম লাভ না করে পশু-পক্ষী ইত্যাদি নীচ জন্মই প্রাপ্ত হয়।

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥ ২০

হে অর্জুন ! সেই মূঢ় ব্যক্তিগণ আমাকে লাভ না করে জন্মে জন্মে আসুরী-জন্ম প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমশঃ তার থেকেও অত্যন্ত নিম্নগতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ঘোর নরকে পতিত হয়॥ ২০

প্রশ্ন—উপরোক্ত আসুরী স্বভাববিশিষ্ট মূঢ় ব্যক্তিগণের ভগবৎ-প্রাপ্তি তো দূরের কথা, যখন উচ্চগতিই প্রাপ্তি হয় না, শুধু আসুরী জন্মই প্রাপ্ত হয়, তখন ভগবান 'মাম্ অপ্রাপ্য', 'আমাকে না

পেয়ে'—একথা কীজন্য বললেন ?

উত্তর—মনুষ্য-জন্মে জীবের ভগবৎপ্রাপ্তির অধিকার আছে। এই অধিকার লাভ করেও যে ব্যক্তি একথা ভুলে দৈব স্বভাবরূপ ভগবৎপ্রাপ্তির পথ পরিত্যাগ করে আসুরী স্বভাব অবলম্বন করে, সে মনুষ্য-জন্মের সুযোগ লাভ করেও ভগবানকে লাভ করতে পারে না। এই অভিপ্রায়ে একথা বলা হয়েছে। এখানে দয়াময় ভগবান যেন জীবের এই দশায় দুঃখ পেয়ে এইভাবে সতর্ক করছেন যে মনুষ্যদেহ লাভ করার পর আসুরী স্বভাব অবলম্বন করে আমার প্রাপ্তিরূপ জন্মসিদ্ধ অধিকার থেকে যেন বঞ্চিত হোয়ো না।

প্রশ্ন— তারা জন্মে জন্মে আসুরী-জন্ম লাভ করে—একথা বলার তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এই কথায় ভগবানের অভিপ্রায় হল, হাজার লক্ষবার এরা আসুরী যোনিতেই জন্ম গ্রহণ করতে থাকে, তা থেকে উঁচু জন্ম পাওয়া এদের পক্ষে খুবই দুষ্কর।

প্রশ্ন—তার থেকেও অতি অধম গতিই তারা প্রাপ্ত হয়—এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর — এর দ্বারা এই আসুরী স্বভাববিশিষ্ট মানুষদের হাজার-লক্ষবার আসুরী যোনিতে জন্ম নিয়ে পরে তার থেকেও নীচ, মহা যাতনাময় কুম্ভীপাক, মহারৌরব, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র ইত্যাদি ভয়ানক নরকে পতিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ—আসুরী স্বভাববিশিষ্ট মানুষদের ক্রমাগত আসুরী যোনি ও ঘোর নরক প্রাপ্তির কথা শুনে প্রশ্ন হতে পারে যে, তাদের এই দুর্গতি থেকে রক্ষা পেয়ে পরম গতি লাভের কী কোনো উপায় আছে ? তাতে দুটি শ্লোকে ভগবান সমস্ত দুর্গতির প্রধান কারণস্বরূপ আসুরী সম্পত্তির ত্রিবিধ দোষ ত্যাগ করার কথা বলে পরমগতি প্রাপ্তির উপায় জানাচ্ছেন—

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ॥ ২১

কাম, ক্রোধ এবং লোভ—আত্মার বিনাশকারী এই তিনটি হল নরকের দ্বার অর্থাৎ এগুলি আত্মাকে অধোগতিতে নিয়ে যায়। অতএব এই তিনটিকে ত্যাগ করা উচিত ॥ ২১

প্রশ্ন—কাম, ক্রোধ এবং লোভকে নরকের দ্বার বলা হয়েছে কেন ?

উত্তর—স্ত্রী, পুত্রাদি সমস্ত ভোগ কামনাকে বলা হয় 'কাম', এই কামনার বশীভূত হয়েই মানুষ চুরি, ব্যভিচার, অভক্ষ্য ভোজন ইত্যাদি নানা পাপ করে। মনের বিপরীত কার্য হলে যে উত্তেজনাময় বৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাকে বলে 'ক্রোধ' ; ক্রোধের বশীভূত হয়ে মানুষ হিংসা-প্রতিহিংসা ইত্যাদি নানাপ্রকার পাপ করে। ধন-সম্পদ বিষয়ে অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত লালসাকে বলা হয় 'লোভ'। লোভী ব্যক্তি উচিত সময়ে ধন ত্যাগ করে না এবং অনুচিতভাবে ধন উপার্জন ও সংগ্রহ করতে থাকে ; সেই জন্য তার দ্বারা ছল, কপট, চুরি, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি বড় বড় পাপ সংঘটিত হয়। পাপের ফলে তামিস্র ও অতি-তামিস্র ইত্যাদি নরক প্রাপ্তি হয়, তাই এই তিনটিকে নরকের দ্বার বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—কাম, ক্রোধ ও লোভকে আত্মার বিনাশকারী বলা হয় কেন ?

উত্তর—'আত্মা' শব্দটির দ্বারা এখানে জীবাত্মাকে নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু জীবাত্মার কখনও বিনাশ হয় না, অতএব এখানে আত্মার বিনাশের অর্থ হল জীবের অধোগতি। মানুষ যখন থেকে কাম, ক্রোধ, লোভের বশবর্তী হয়, তখন থেকে সে তার বিবেক-বিচার, আচরণ ও ভাব থেকে স্খলিত হতে থাকে। কাম, ক্রোধ ও লোভের জন্য তার দ্বারা এমন কর্ম হতে থাকে, যাতে তার শারীরিক পতন হয় ; তার মন মন্দ চিন্তায় মগ্ন থাকে, বুদ্ধি ভ্রংশ হয়, ক্রিয়া-কর্ম সব দূষিত হয়ে যায় এবং তার ফলে তার বর্তমান জীবন সুখ-শান্তি-পবিত্রতা রহিত হয়ে দুঃখময় হয়ে ওঠে এবং মৃত্যুর পর তার আসুরী যোনিতে জন্ম বা নরক প্রাপ্তি হয়। তাই এই ত্রিবিধ দোষকে 'আত্মার বিনাশকারী' বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—সেইজন্য এই তিনটি ত্যাগ করা উচিত—এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর— এর দ্বারা ভগবান দেখিয়েছেন যে, যখন

এই সিদ্ধান্তে আসা গেল যে, সমস্ত অনর্থের মূলভূত মোহজনিত কাম, ক্রোধ ও লোভই হল অধোগতির কারণ, তখন এগুলিকে মহা-বিষের সমান জেনে তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করা উচিত।

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ২২

হে অর্জুন ! এই তিন নরকের দ্বার হতে মুক্ত পুরুষ নিজ কল্যাণ সাধনে সক্ষম হন, সেইজন্য তিনি পরমগতি প্রাপ্ত করেন, অর্থাৎ আমাকে লাভ করেন॥ ২২

প্রশ্ন—'এতৈঃ' এবং 'ত্রিভীঃ'—এই দুটি পদের সঙ্গে '**তমোদ্বারৈঃ**' পদটি কীসের বাচক এবং এর থেকে বিমুক্ত মানুষকে '**নর**' বলার তাৎপর্য কী ?

উত্তর—আগের শ্লোকে যে কাম, ক্রোধ ও লোভকে নরকের ত্রিবিধ দ্বার বলা হয়েছে, তারই বাচক এখানে '**এতৈঃ**' এবং '**ত্রিভিঃ**' পদের সঙ্গে '**তমোদ্বারৈঃ**' পদটি। তামিস্র এবং অন্ধতামিস্র ইত্যাদি নরক অন্ধকারময় হয়, অজ্ঞানরূপ অন্ধকার থেকে উৎপন্ন দুরাচার এবং দুর্গুণের ফলস্বরূপ ঐগুলির প্রাপ্তি হয়, তথায় অবস্থানকালে জীবদের মোহ এবং দুঃখরূপ তম দ্বারা পরিবৃত হয়ে পড়ে থাকতে হয় ; তাইজন্য তাঁদের 'তম' বলা হয়। কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটি তাদের দ্বার অর্থাৎ কারণ, তাই এগুলিকে 'তমোদ্বার' বলা হয়েছে। এই তিনটি নরকের দ্বার থেকে যাঁরা মুক্ত—সর্বদা দূরে থাকেন, তাঁরাই নিজেদের কল্যাণ সাধন করতে সক্ষম। মনুষ্যদেহ লাভ করে যাঁরা এইরূপ কল্যাণ সাধন করেন, তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে 'নর' (মানুষ)। এই অভিপ্রায়ে তাঁদের '**নর**' বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—নিজ কল্যাণ সাধন করা কাকে বলে ?

উত্তর—কাম, ক্রোধ ও লোভের বশবর্তী হয়ে মানুষ নিজের পতন ঘটায় এবং এর থেকে মুক্ত হওয়া ব্যক্তি নিজ কল্যাণ সাধন করেন। সুতরাং কাম, ক্রোধ ও লোভ ত্যাগ করে শাস্ত্রবিহিত সদ্‌গুণ ও সদাচাররূপ দৈবসম্পদের নিষ্কামভাবে সেবন করাই হল কল্যাণ সাধন করা।

প্রশ্ন—'এর দ্বারা তিনি পরমগতি লাভ করেন'—কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—এই বাক্যে ভগবানের এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে যে, উপরোক্ত ভাবে কাম, ক্রোধ ও লোভের সুবিস্তৃত শাখা-প্রশাখারূপ আসুরীসম্পদ থেকে যথাযথভাবে মুক্তি লাভ করে নিষ্কামভাবে দৈবীসম্পদ সেবন করলে মানুষ পরমগতি অর্থাৎ পরমেশ্বরকে লাভ করেন।

সম্বন্ধ—যারা উপরোক্ত দৈবীসম্পদের আচরণ না করে নিজের ইচ্ছা অনুসারে কর্ম করেন, তারা পরমগতি প্রাপ্ত হয় কি না ? তাতে বলছেন—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ ২৩

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে স্বেচ্ছাচারী হয়ে নিজের ইচ্ছামতো আচরণ করে, সে সিদ্ধিলাভ করে না, পরমগতি এবং সুখ কিছুই প্রাপ্ত করে না॥ ২৩

প্রশ্ন—শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে নিজ ইচ্ছামতো আচরণ করা কী ?

উত্তর—বেদ এবং বেদের সার নিয়ে রচিত স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস ইত্যাদি সবকিছুকে বলা হয় শাস্ত্র। আসুরীসম্পদের আচার-ব্যবহার ইত্যাদি ত্যাগ করা এবং দৈবীসম্পদরূপ কল্যাণকর গুণ-আচরণাদি গ্রহণের জ্ঞান এই শাস্ত্র দ্বারাই হয়ে থাকে। এই কর্তব্য-অকর্তব্য জ্ঞানসম্পাদনকারী শাস্ত্রাদির বিধানকে যারা অবহেলা

করে নিজের বুদ্ধিকে উত্তম মনে করে খুশীমতো মান-মর্যাদা ইত্যাদি কোনো ইচ্ছা বিশেষের প্ররোচনায় আচরণ করেন, তাকেই বলা হয় শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে খুশীমতো আচরণ করা।

প্রশ্ন—এই রূপ আচরণকারী ব্যক্তিগণ সিদ্ধি, সুখ এবং পরমগতি প্রাপ্ত করে না—এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর অভিপ্রায় হল, যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে, তার কর্ম যদি শাস্ত্রনিষিদ্ধ অর্থাৎ পাপ হয় তবে তা দুর্গতির কারণ হয় ; অতএব তার বিষয়ে তো এখানে কোনো কথাই নেই। কিন্তু সে যদি নিজ বুদ্ধিতে ভালো মনে করে কোনো কামনার দ্বারা প্রেরিত হয়ে কর্ম করে তাহলেও সেটি তার খুশীমতো করার ও শাস্ত্রের অবহেলা করার জন্য, তাতে সে কর্তা হয়ে কোনো ফল লাভ করে না অর্থাৎ পরমগতি লাভ করে না—একথা বলাই বাহুল্য, উপরন্তু লৌকিক অণিমাদি সিদ্ধি ও স্বর্গপ্রাপ্তিরূপ সিদ্ধিও প্রাপ্ত হয় না এবং সাত্ত্বিক সুখও লাভ করে না।

সম্বন্ধ—শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে ইচ্ছামতো কর্ম করলে তা নিষ্ফল হয়, এই কথা শুনে প্রশ্ন হতে পারে যে এরূপ অবস্থায় কী করা উচিত ? তাতে বলেছেন—

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি॥ ২৪

কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ধারণে শাস্ত্রই তোমার কাছে প্রমাণ। অতএব কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ধারণে শাস্ত্রবিধি জেনে তোমার কর্ম করা উচিত ॥ ২৪

প্রশ্ন—এই কর্তব্য-অকর্তব্য ব্যবস্থায় শাস্ত্রই প্রমাণ—কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর অভিপ্রায় হল, কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয়—এর ব্যবস্থা শ্রুতি, বেদমূলক স্মৃতি ও পুরাণ-ইতিহাসাদি শাস্ত্র থেকে প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সেই বিষয়ে মানুষের ইচ্ছামতো আচরণ না করে শাস্ত্রকেই প্রমাণ মানা উচিত। অর্থাৎ এই সব শাস্ত্রে যে কর্ম করার বিধান আছে, তাই করা উচিত এবং যা নিষিদ্ধ, তা করা উচিত নয়।

প্রশ্ন—এরূপ জেনে তোমার শাস্ত্রবিধির দ্বারা নির্দিষ্ট কর্ম করাই উচিত—এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে, এইভাবে শাস্ত্রকে প্রমাণ বলে মেনে তোমার শাস্ত্রে বর্ণিত কর্তব্যকর্মই বিধিমতো আচরণ করা উচিত, নিষিদ্ধ কর্ম কখনও নয়। উপরন্তু সেই বিহিত শুভকর্মের আচরণও নিষ্কামভাবে করা উচিত, কারণ শাস্ত্রে নিষ্কামভাবে করা শুভ কর্মাদিকে ভগবৎপ্রাপ্তির হেতু বলা হয়েছে।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

——○——

ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ

সপ্তদশ অধ্যায়

(শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ)

অধ্যায়ের নাম

সপ্তদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জুন শ্রদ্ধাযুক্ত পুরুষের নিষ্ঠা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। তার উত্তরে ভগবান তিন প্রকারের শ্রদ্ধার কথা বলে শ্রদ্ধার অনুসারেই পুরুষের স্বরূপ জানিয়েছেন। তারপর পূজা, যজ্ঞ, তপ ইত্যাদিতে শ্রদ্ধার সম্বন্ধ দেখিয়ে অন্তিম শ্লোকে শ্রদ্ধারহিত ব্যক্তিদের কর্মগুলিকে অসৎ বলে জানিয়েছেন। এইভাবে এই অধ্যায়ে ত্রিবিধ শ্রদ্ধার বিভাগপূর্বক ব্যাখ্যা হওয়ায় এর নাম রাখা হয়েছে **'শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ'**।

সংক্ষিপ্ত অধ্যায়-সার

এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে অর্জুন ভগবানকে শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে শ্রদ্ধাপূর্বক যজ্ঞসম্পাদন-কারীদের নিষ্ঠার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তার উত্তরে ভগবান দ্বিতীয় শ্লোকে গুণাদি অনুসারে ত্রিবিধ স্বাভাবিক শ্রদ্ধার বর্ণনা করেছেন, তৃতীয়তে শ্রদ্ধা অনুসারেই পুরুষের স্বরূপ হয় বলে জানিয়েছেন ; চতুর্থে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা ক্রমশঃ দেবতা, যক্ষ, রাক্ষস ও ভূত-প্রেতাদির পূজা করার কথা বলা হয়েছে ; পঞ্চম ও ষষ্ঠে শাস্ত্রবিরুদ্ধ ঘোর তপস্যাকারীদের নিন্দা করা হয়েছে ; সপ্তমে আহার, যজ্ঞ, তপ ও দানের পার্থক্য শোনার জন্য অর্জুনকে নির্দেশ দিয়েছেন। অষ্টম, নবম ও দশম শ্লোকে ক্রমশঃ সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক আহারের বর্ণনা করা হয়েছে। একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশে ক্রমশঃ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক যজ্ঞের লক্ষণ বলা হয়েছে। চতুর্দশ, পঞ্চদশ এবং ষোড়শে ক্রমশঃ শারীরিক, বাচিক ও মানসিক তপের স্বরূপের কথা বলে, সপ্তদশে সাত্ত্বিক তপের লক্ষণ বলা হয়েছে। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশতিতে ক্রমশঃ রাজসিক ও তামসিক তপস্যার লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে। বিশতম, একুশতম ও বাইশতমতে ক্রমশঃ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক দানের লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে। তেইশতমতে 'ওঁ তৎসৎ'-এর মহিমা বলা হয়েছে। চব্বিশতমতে 'ওঁ'-এর প্রয়োগের, পঁচিশতমতে 'তৎ' শব্দ প্রয়োগের এবং ছাব্বিশতম ও সাতাশতমতে 'সৎ' শব্দ প্রয়োগের ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং শেষে আঠাশতম শ্লোকে শ্রদ্ধাবিহীন হয়ে করা যজ্ঞ, দান, তপস্যা ইত্যাদি কর্মগুলিকে ইহলোকে ও পরলোকে সর্বতোভাবে নিষ্ফল ও অসৎ বলে অধ্যায়ের উপসংহার করেছেন।

সম্বন্ধ—ষোড়শ অধ্যায়ের প্রারম্ভে শ্রীভগবান নিষ্কামভাবে পালিত শাস্ত্রবিহিত গুণ ও আচরণকে দৈবী-সম্পদ নামে বর্ণনা করে তারপর শাস্ত্রবিরুদ্ধ আসুরী সম্পদের কথা বলেছেন। সেই সঙ্গে আসুরী স্বভাববিশিষ্ট পুরুষদের নরকে পতিত হওয়ার কথা বলে জানিয়েছেন যে কাম, ক্রোধ, লোভই হল আসুরী সম্পদের প্রধান দোষ এবং এই তিনটিই হল নরকের দ্বার। এগুলি ত্যাগ করে যিনি আত্মকল্যাণের জন্য সাধন করেন, তিনি পরমগতি লাভ করেন। তারপর বলেছেন যে, যিনি শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে ইচ্ছামতোভাবে যা নিজের ভালো বলে মনে হয়, সেই অনুযায়ী কর্ম করেন, তাঁর সেই কর্মের ফল লাভ হয় না ; সিদ্ধি লাভের আশায় করা কর্ম হতে সিদ্ধিলাভ হয় না ; সুখের জন্য করা কর্ম থেকে সুখ পাওয়া যায় না আর পরমগতি তো পাওয়াই যায় না। অতএব কী করণীয় বা কী অ-করণীয়—এ বিষয়ে ব্যবস্থা প্রদানকারী শাস্ত্রাদির বিধান অনুসারেই নিষ্কামভাবে কর্ম করা উচিত। তখন অর্জুনের মনে এই জিজ্ঞাসার উদয় হয় যে যাঁরা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে ইচ্ছামতো কর্ম করেন, তাঁদের কর্ম ব্যর্থ হয়, তাতো ঠিক। কিন্তু এমন লোকও তো থাকতে পারে যাঁরা শাস্ত্রবিধি না জানায় অথবা অন্য কোনো কারণে তা ত্যাগ করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা যজ্ঞ-পূজাদি শুভ কর্ম শ্রদ্ধাসহ করেন, তাঁদের স্থিতি কী হয় ? এই জিজ্ঞাসা ব্যক্ত করে অর্জুন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করছেন—

অর্জুন উবাচ

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ॥ ১

অর্জুন বললেন — হে কৃষ্ণ ! যেসব ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে দেবতাগণের পূজা করেন, তাদের সেই নিষ্ঠা কীরূপ ? সাত্ত্বিকী, রাজসী না তামসী ? ১ ॥

প্রশ্ন — শাস্ত্রবিধি ত্যাগের কথা ষোড়শ অধ্যায়ের তেইশ-তম শ্লোকেও বলা হয়েছে আবার এখানেও বলা হচ্ছে। এই দুটির তাৎপর্য একই না এতে কোনো পার্থক্য আছে ?

উত্তর— অবশ্যই পার্থক্য আছে। ঐস্থানে অবহেলা করে শাস্ত্রবিধি ত্যাগের কথা বলা হয়েছে আর এখানে বলা হয়েছে অজ্ঞতার কারণে অর্থাৎ না জানার জন্য শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করার কথা। পূর্বের ক্ষেত্রে শাস্ত্রের কোনো পরোয়া নেই, তারা নিজের মনে যে কর্মকে ভালো মনে করে, তাই করে থাকে। তাই ওখানে '**বর্ততে কামকারতঃ**' বলা হয়েছে। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে '**যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ**' অর্থাৎ এঁদের শ্রদ্ধা আছে। যেখানে শ্রদ্ধা থাকে, সেখানে অবহেলা হতে পারে না। এইসব ব্যক্তিদের পরিস্থিতি এবং পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতার জন্য, অবকাশের অভাবে অথবা পরিশ্রম বা অধ্যয়নের অভাবে শাস্ত্রবিধির জ্ঞান হয় না আর সেই অজ্ঞতার জন্যই এঁদের দ্বারা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করা হয়।

প্রশ্ন— '**নিষ্ঠা**' শব্দটির অর্থ কী ?

উত্তর— '**নিষ্ঠা**' শব্দটি এখানে স্থিতির বাচক। কারণ তৃতীয় শ্লোকে এর উত্তর দিতে গিয়ে ভগবান বলেছেন যে, এই ব্যক্তি শ্রদ্ধাময় ; যার যেমন শ্রদ্ধা, সে তেমনই হয় অর্থাৎ তার তেমনই স্থিতি। অতএব এরই নাম '**নিষ্ঠা**'।

প্রশ্ন—'তাঁর নিষ্ঠা সাত্ত্বিকী, রাজসী না তামসী ?' এটি জিজ্ঞাসা করার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ষোড়শ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে ভগবান দৈবী প্রকৃতিসম্পন্ন ও আসুরী প্রকৃতিসম্পন্ন—দুপ্রকার মানুষের বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে দৈবী প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ নিষ্কামভাবে শাস্ত্রবিহিত কর্মের আচরণ করেন, তাই তাঁরা মোক্ষ লাভ করেন। আসুরী স্বভাববিশিষ্টদের মধ্যে যেসব তামসিক লোক পাপকর্মের আচরণ করে তারা তো অধম জন্ম অথবা নরক প্রাপ্ত হয় আর তমোমিশ্রিত রাজসিক লোক, যারা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে ইচ্ছামতো ভালো কর্ম করে, তারা কিন্তু ভালো কর্মের কোনো ফল পায় না, বরং পাপকর্মের ফল তাদের ভোগ করতেই হয়। এই বর্ণনা দ্বারা অর্জুন দৈবী ও আসুরী প্রকৃতিসম্পন্ন মানুষদের বিষয়টি তো বুঝতে পারলেন ; কিন্তু যারা না জেনে শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করেও শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজা ইত্যাদি করে, তারা কীরূপ স্বভাববিশিষ্ট— দৈবী স্বভাববিশিষ্ট না আসুরী স্বভাববিশিষ্ট ? তা সঠিক বোঝা যায়নি। অতএব সেটি বোঝার জন্য অর্জুনের প্রশ্ন হল যে ঐরূপ ব্যক্তিদের স্থিতি সাত্ত্বিকী, রাজসী না তামসী ? অর্থাৎ তারা দৈবী সম্পদবিশিষ্ট না আসুরী সম্পদবিশিষ্ট ?

প্রশ্ন—উপরোক্ত আলোচনায় জানা যায় যে জগতে পাঁচপ্রকার মানুষ থাকতে পারে—

১) যাঁরা শাস্ত্রবিধিও পালন করেন এবং যাঁদের মধ্যে শ্রদ্ধাও আছে।

২) যাঁরা আংশিক ভাবে শাস্ত্রবিধি পালন করেন, কিন্তু যাঁদের মধ্যে শ্রদ্ধা নেই।

৩) যাঁদের শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু শাস্ত্রবিধি পালন করতে পারেন না।

৪) যাঁরা শাস্ত্রবিধিও পালন করেন না এবং যাঁদের শ্রদ্ধাও নেই।

৫) যাঁরা অবহেলা করে শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করেন।

এই পাঁচটির স্বরূপ কী, এঁদের কী গতি হয় এবং প্রধানতঃ গীতার কোন্ কোন্ শ্লোকে এদের বর্ণনা করা হয়েছে ?

উত্তর — ১) যাঁদের শ্রদ্ধাও আছে এবং যাঁরা শাস্ত্রবিধিও পালন করেন, এরূপ পুরুষ দুপ্রকারের হয়— (ক) নিষ্কামভাবে কর্মপালনকারী, (খ) সকামভাবে কর্মপালনকারী। নিষ্কামভাবে আচরণকারী দৈবীসম্পদযুক্ত সাত্ত্বিক-পুরুষ মোক্ষপ্রাপ্ত হন ; এঁদের বর্ণনা প্রধানতঃ ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথম তিনটি শ্লোকে এবং এই অধ্যায়ের একাদশ, চতুর্দশ থেকে সপ্তদশ ও বিশতম শ্লোকে করা

হয়েছে। সকামভাবে আচরণকারী সত্ত্বমিশ্রিত রাজস পুরুষ সিদ্ধি, সুখ ও স্বর্গ লাভ করেন। এঁদের বর্ণনা দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিয়াল্লিশ, তেতাল্লিশ ও চুয়াল্লিশতমতে, চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বাদশে, সপ্তমের বিশতমতে, একুশতমতে ও বাইশতমতে এবং নবম অধ্যায়ের বিশ, একুশ এবং তেইশতম শ্লোকে করা হয়েছে।

২) যে সব ব্যক্তি আংশিকভাবে শাস্ত্রবিধি পালন করে যজ্ঞ, দান, তপস্যা ইত্যাদি কর্ম করে, যাঁদের মধ্যে শ্রদ্ধা থাকে না—সেই সব ব্যক্তিদের কর্ম অসৎ (নিষ্ফল) হয়, তাদের ইহলোক ও পরলোকে ঐসব কর্ম হতে কোনো লাভ হয় না। এই অধ্যায়ের আঠাশতম শ্লোকে এর বর্ণনা করা হয়েছে।

৩) যারা অজ্ঞতাবশতঃ শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে, কিন্তু যাদের মধ্যে শ্রদ্ধা থাকে—এরূপ ব্যক্তি শ্রদ্ধার তারতম্যে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক হয়ে থাকেন। তাদের শ্রদ্ধা অনুসারেই তাদের গতি হয়ে থাকে। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে এদের বর্ণনা করা হয়েছে।

৪) যে সব ব্যক্তি শাস্ত্র মানে না এবং শ্রদ্ধাও নেই ; এদের মধ্যে যারা কাম, ক্রোধ ও লোভের বশবর্তী হয়ে পাপময় জীবন অতিবাহিত করে—সেই আসুরী সম্পদ-বিশিষ্ট লোক নরকে পতিত হয় এবং নীচ জন্ম প্রাপ্ত হয়। এদের বর্ণনা সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে, নবমের দ্বাদশে, ষোড়শ অধ্যায়ের সপ্তম থেকে বিশতম পর্যন্ত এবং এই অধ্যায়ের পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং ত্রয়োদশ শ্লোকে করা হয়েছে।

৫) যে সব ব্যক্তি অবহেলা করে শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে এবং নিজেরা যা ভালো মনে করে, তাই করে—সেই যথেচ্ছাচারী পুরুষদের মধ্যে যাদের কর্ম শাস্ত্র নিষিদ্ধ হয়, সেই তামসিক ব্যক্তিরা নরক প্রভৃতি দুর্গতি প্রাপ্ত হয়—তাদের বর্ণনা চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে। যাদের কর্ম ভালো হয়, সেই রজঃপ্রধান তামসিক ব্যক্তিদের শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করায় কোনো ফল লাভ হয় না। ষোড়শ অধ্যায়ের তেইশতম শ্লোকে এর বর্ণনা করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে যে এদের দ্বারা যে পাপকর্ম সংঘটিত হয় তার ফল—তির্যক যোনি প্রাপ্তি এবং নরক প্রাপ্তি—অবশ্যম্ভাবী।

এই পাঁচটি প্রশ্নের উত্তরের প্রমাণরূপে যে শ্লোক-গুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এছাড়াও অন্যান্য শ্লোকেও এর বর্ণনা আছে ; কিন্তু এখানে সেসব উল্লেখ করা হয়নি।

সম্বন্ধ—অর্জুনের প্রশ্নে ভগবান এবার পরবর্তী দুটি শ্লোকে তার সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥ ২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন — মানুষের শাস্ত্রীয় সংস্কাররহিত শুধুমাত্র স্বভাবজাত শ্রদ্ধা তিন প্রকারের হয়—সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী। সেইগুলি তুমি আমার কাছে শোনো ॥ ২

প্রশ্ন—'**দেহিনাম্**' পদ কোন্ ব্যক্তিদের জন্য প্রযুক্ত হয়েছে ?

উত্তর—যাদের দেহে স্বাভাবিক অহং-অভিমান থাকে, সেই সাধারণ মানুষদের জন্য '**দেহিনাম্**' পদটি প্রযুক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন—'**সা**' এবং '**স্বভাবজা**' এই পদ কীরূপ শ্রদ্ধার বাচক ?

উত্তর—'**সা**' এবং '**স্বভাবজা**' পদ শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে শ্রদ্ধাপূর্বক যজ্ঞসম্পাদনকারী মানুষের মধ্যে থাকা শ্রদ্ধার বাচক। এই শ্রদ্ধা শাস্ত্র থেকে উৎপন্ন নয়, স্বভাব থেকে উৎপন্ন। তাই একে '**স্বভাবজা**' বলা হয়েছে। যে শ্রদ্ধা শাস্ত্র শ্রবণ-পঠন ইত্যাদির থেকে হয়, তাকে বলা হয় '**শাস্ত্রজা**' এবং যা পূর্বজন্মের এবং ইহজন্মের কর্ম সংস্কারানুসারে স্বাভাবিকভাবে হয়, তাকে বলা হয় '**স্বভাবজা**'।

প্রশ্ন —সাত্ত্বিকী, রাজসী, তামসী এবং ত্রিবিধার সঙ্গে '**ইতি**' শব্দ প্রয়োগ করার অর্থ কী ?

উত্তর —এগুলির সঙ্গে '**ইতি**' পদ প্রয়োগ করে ভগবান দেখিয়েছেন যে এই শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, রাজসী এবং তামসী—তিন প্রকারেরই হয়ে থাকে।

সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ॥ ৩

হে ভারত! সব মানুষের শ্রদ্ধা তাঁদের অন্তঃকরণ অনুযায়ী হয়ে থাকে। মানুষ শ্রদ্ধাময়, তাই যে ব্যক্তি যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত, তিনি সেইরূপই হন॥ ৩

প্রশ্ন—সকল মানুষের অর্থে এখানে কী বলা হয়েছে?

উত্তর—আগের শ্লোকে যে দেহাভিমানী মানুষদের জন্য **'দেহিনাম্'** পদ উদ্ধৃত হয়েছিল, তাঁদের জন্যই **'সর্বস্য'** পদটি উদ্ধৃত হয়েছে। অর্থাৎ এখানে দেহাভিমানী সাধারণ মানুষের কথা বলা হয়েছে। কারণ এই শ্লোকের আগে বলা হয়েছে যে, যাঁর যেরূপ শ্রদ্ধা, তিনি নিজেও তেমনই। এই কথা দেহাভিমানী জীবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে, গুণাতীত জ্ঞানীর জন্য নয়।

প্রশ্ন—আগের শ্লোকে শ্রদ্ধাকে **'স্বভাবজা'**-স্বভাব থেকে জাত বলা হয়েছে আর এখানে **'সত্ত্বানুরূপা'** অন্তঃকরণের অনুরূপ বলা হয়েছে, এর অভিপ্রায় কী?

উত্তর—মানুষ সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক — যেরূপ কর্ম করে, তার স্বভাবও তেমনই হয়। স্বভাব অন্তঃকরণেই নিহিত থাকে; অতএব যে যেমন স্বভাববিশিষ্ট, তাকে তেমনই অন্তঃকরণবিশিষ্ট বলে মান্য হয়। তাই তাকে 'স্বভাবজাত' বলা হোক অথবা 'অন্তকরণের অনুরূপ' বলা হোক, ব্যাপার একই।

প্রশ্ন—পুরুষকে 'পর' অর্থাৎ গুণাদি হতে সর্বতোভাবে অতীত বলা হয়েছে (১৩।২২), তাহলে এখানে তাকে 'শ্রদ্ধাময়' বলার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—পুরুষের যথার্থ স্বরূপ তো গুণাতীতই হয়; কিন্তু এখানে সেই পুরুষদের কথা বলা হয়েছে, যারা প্রকৃতিতে স্থিত এবং যাদের প্রকৃতিতে উৎপন্ন তিন গুণাদির সঙ্গে সম্বন্ধ রয়েছে। কারণ গুণজনিত পার্থক্য 'প্রকৃতিস্থ পুরুষ'তেই সম্ভব। যাঁরা গুণাদির অতীত, তাঁদের মধ্যে গুণাদির ভেদ কল্পনাই করা যায় না। ভগবান এখানে বলেছেন যে, যাঁদের অন্তঃকরণের অনুরূপ সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী যেমন শ্রদ্ধা হয়, সেই ব্যক্তিদের নিষ্ঠা বা স্থিতি তেমনই হয়। অর্থাৎ যার যেমন শ্রদ্ধা, তেমনই তার স্বরূপ হয়। এর দ্বারা ভগবান শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও স্বরূপের ঐক্য সম্পাদন করে 'তাঁদের নিষ্ঠা কীরূপ'—অর্জুনের এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

সম্বন্ধ—শ্রদ্ধা অনুসারে মানুষের নিষ্ঠার স্বরূপ বলা হয়েছে; এতে জানতে ইচ্ছা হতে পারে যে এরূপ মানুষের পরিচয় কী এবং কে কেমন নিষ্ঠাসম্পন্ন? তাতে ভগবান বলেছেন—

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥ ৪

সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ দেবতাদের পূজা করেন, রাজসিক ব্যক্তিগণ যক্ষ ও রাক্ষসদের এবং যারা তামসিক ব্যক্তি, তারা ভূত-প্রেতের পূজা করে॥ ৪

প্রশ্ন—সাত্ত্বিক ব্যক্তি দেবতাদের পূজা করেন, এই কথার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—কার্য দেখে কারণের পরিচয় হয়—এই নীতি অনুসারে দেবতা যখন সাত্ত্বিক, তাঁর পূজনকারীও সাত্ত্বিকই হবেন; এবং 'দেবতা যেমন, তেমনই তাঁর পূজারী', এই লোক উক্তি অনুসারে বলা হয়েছে যে দেবতাদের পূজনকারী মানুষ সাত্ত্বিক— সাত্ত্বিক নিষ্ঠাযুক্ত হন। দেবতা দ্বারা এখানে সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, বরুণ, যম, অশ্বিনীকুমার এবং বিশ্বদেব ইত্যাদি শাস্ত্রোক্ত দেবতাদের বুঝতে হবে।

এখানে দেব-পূজারূপ ক্রিয়া সাত্ত্বিক হওয়ায়, যাঁরা তা করেন, তাঁদের সাত্ত্বিক বলা হয়েছে; কিন্তু পূর্ণ সাত্ত্বিক তাঁরাই, যাঁরা সাত্ত্বিক ক্রিয়াকর্ম নিষ্কামভাবে করে থাকেন।

প্রশ্ন—রাজসিক ব্যক্তি যক্ষ-রাক্ষসকে (পূজা

করেন)—এর তাৎপর্য কী ?

উত্তর—দেবতাদের পূজনকারী যেমন সাত্ত্বিক ব্যক্তি, সেই নিয়মে যক্ষ-রাক্ষসদের পূজনকারী ব্যক্তি রাজসিক—রাজসিক নিষ্ঠাসম্পন্ন ; সেটি জানাবার জন্য এরূপ বলা হয়েছে। যক্ষের দ্বারা কুবের প্রমুখ এবং রাক্ষস দ্বারা রাহু-কেতু প্রভৃতিদের বুঝতে হবে।

প্রশ্ন—তামসিক ব্যক্তি ভূত-প্রেতদের পূজা করে—এর তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এর দ্বারাও একথা বলা হয়েছে যে ভূত, প্রেত, পিশাচদের পূজনকারিগণ তামসী নিষ্ঠাসম্পন্ন। মৃত্যুর পর যারা পাপকর্মবশতঃ ভূত-প্রেতাদির বায়ুপ্রধান দেহ প্রাপ্ত হয়, তাদের ভূত-প্রেত বলা হয়।

প্রশ্ন—এদের গতি কেমন হয় ?

উত্তর—'যেমন ইষ্ট তেমনই গতি' প্রসিদ্ধ। দেবতাদের পূজনকারী দেবগতি প্রাপ্ত হন, যক্ষ-রাক্ষসদের পূজনকারী যক্ষ-রাক্ষসদের গতি এবং ভূত-প্রেতদের পূজনকারী তাদেরই মতো রূপ, গুণ ও স্থিতি ইত্যাদি লাভ করে। নবম অধ্যায়ের পঁচিশতম শ্লোকে ভগবান **'যান্তি দেবব্রতা দেবান্', 'ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যাঃ'** ইত্যাদির দ্বারা এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন।

সম্বন্ধ—অজ্ঞতার জন্য শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে ত্রিবিধ স্বাভাবিক শ্রদ্ধাপূর্বক পূজনকারীদের বর্ণনা করা হয়েছে ; কিন্তু শাস্ত্রবিধি ত্যাগকারী শ্রদ্ধাহীন মানুষদের বিষয়ে কিছু বলা হয়নি, তাই প্রশ্ন হচ্ছে যে, যাদের শ্রদ্ধাও নেই এবং যারা শাস্ত্রবিধিও মানে না আর ভয়ানক তপস্যা করে, তারা কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ? তার উত্তরে ভগবান পরবর্তী দুটি শ্লোকে জানাচ্ছেন—

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ॥ ৫

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধিবর্জিত হয়ে শুধুমাত্র মনঃকল্পিত ঘোর তপস্যা করে এবং দম্ভ-অহংকারযুক্ত এবং কামনা, আসক্তি ও বলের অভিমানে যুক্ত হয় ॥ ৫

প্রশ্ন—শাস্ত্রবিধিবর্জিত এবং ঘোর তপস্যা কীরূপ তপস্যাকে বলা হয় ?

উত্তর—শাস্ত্রে যে তপস্যা করার বিধান নেই, যাতে শাস্ত্রবিধি পালন করা হয় না, যাতে নানাপ্রকার আড়ম্বরের দ্বারা শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিকে কষ্ট দেওয়া হয় এবং যার স্বরূপ অত্যন্ত ভয়ানক—এরূপ তপস্যাকে শাস্ত্রবিধি বর্জিত ভয়ানক তপস্যা বলা হয়।

প্রশ্ন—এইরূপ তপস্যাকারী মানুষদের দম্ভ ও অহংকারযুক্ত বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এইরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ ভয়ানক তপস্যাকারী মানুষদের মধ্যে শ্রদ্ধা থাকে না। তারা লোক ঠকাবার জন্য এবং তাদের প্রভাবিত করবার জন্য ভণ্ড সাজে, সর্বদা অহংকারে মত্ত থাকে, তাইজন্য তাদের দম্ভ ও অহংকারযুক্ত বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এরূপ ব্যক্তিদের কামনা, আসক্তি এবং বলের অভিমানে যুক্ত বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—তাদের ভোগে অত্যন্ত আসক্তি থাকে, এরজন্য তাদের চিত্তে অনবরত সেই ভোগের কামনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারা মনে করে, আমি যা চাইব, তাই প্রাপ্ত করব ; আমার মধ্যে অপার শক্তি আছে, আমার শক্তির সমান কার এমন শক্তি আছে যে আমার কাজে বাধা দিতে পারে ? সেই অভিপ্রায়ে এদের কামনা, আসক্তি ও বলের অভিমানে যুক্ত বলা হয়েছে।

কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥ ৬

যারা শরীররূপে স্থিত প্রাণীসমুদায়কে এবং অন্তঃকরণে অবস্থিত পরমাত্মারূপ আমাকে ক্লিষ্ট করে, সেই অজ্ঞানী ব্যক্তিদের তুমি আসুরী স্বভাববিশিষ্ট বলে জানবে ॥ ৬

প্রশ্ন—শরীররূপে স্থিত প্রাণীসমুদায়ের অর্থ কী ?

উত্তর—পঞ্চ মহাভূত, মন, বুদ্ধি, অহংকার, দশ ইন্দ্রিয় ও পাঁচ ইন্দ্রিয়ের বিষয়—এই তেইশটি তত্ত্বসমূহের নাম 'ভূত (প্রাণী) সমুদায়'। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে ক্ষেত্রের নামে এর বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন—এই সব ব্যক্তি প্রাণীসমুদায়কে এবং অন্তঃকরণে অবস্থিত পরমাত্মারূপ আমারও ক্লিষ্টকারী হয়ে থাকে, এই কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—শাস্ত্রের বিপরীত মনঃকল্পিত ভয়ানক তপস্যাকারী ব্যক্তি নানা প্রকারের ভয়ানক আচরণযুক্ত হয়ে উপরোক্ত প্রাণীসমুদায়কে অর্থাৎ শরীরকে ক্ষীণ ও দুর্বল করে দেয়, শুধু তাই নয়, তারা তাদের ভয়ানক আচরণে অন্তঃকরণে অবস্থিত পরমাত্মাকেও ক্লিষ্ট করে। কারণ সকলের হৃদয়েই আত্মারূপে পরমাত্মা অবস্থিত। সুতরাং নিজের আত্মাকে বা অন্য কারো আত্মাকে দুঃখ দেওয়া বাস্তবে পরমাত্মাকেই দুঃখ দেওয়া হয়। তাই তাদের প্রাণীসমুদায় ও পরমাত্মাকে দুঃখ প্রদানকারী বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—'**অচেতসঃ**' পদের অর্থ কী ?

উত্তর—শাস্ত্রের প্রতিকূল আচরণকারী, বোধশক্তি-রহিত, আবরণদোষযুক্ত মূঢ় মানুষদের বাচক হল এই '**অচেতসঃ**' পদটি।

প্রশ্ন—এরূপ ব্যক্তিদের আসুরী-স্বভাববিশিষ্ট বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—উপরোক্ত শাস্ত্রবিধি বর্জিত ভয়ানক তামস তপস্যাকারী, দাম্ভিক ও অহংকারী মানুষ ষোড়শ অধ্যায়ে বর্ণিত আসুরী সম্পদবিশিষ্ট হয়ে থাকে, এই অর্থে তাদের 'আসুরীস্বভাবযুক্ত' বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ—ত্রিবিধ স্বাভাবিক শ্রদ্ধাসম্পন্নদের এবং ভয়ানক তপস্যাকারী ব্যক্তিদের লক্ষণ জানিয়ে ভগবান এবার সাত্ত্বিকের গ্রহণ এবং রাজস-তামসের ত্যাগ করাবার উদ্দেশ্যে সাত্ত্বিক-রাজসিক-তামসিক আহার, যজ্ঞ, তপস্যা ও দানের পার্থক্য শোনার জন্য অর্জুনকে নির্দেশ প্রদান করছেন—

আহারস্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু॥ ৭

আহারও সকলের নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে তিন প্রকার প্রিয় হয়। সেইরূপ যজ্ঞ-তপ-দানও তিন প্রকারের হয়। তার পৃথক্ পৃথক্ ভেদ আমার কাছে শোনো ॥ ৭

প্রশ্ন—'**অপি**' পদটির অর্থ কী ?

উত্তর—'**অপি**' পদ দ্বারা ভগবান দেখিয়েছেন যে, যেমন শ্রদ্ধা ও পূজা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন প্রকারের হয়, তেমনই আহারও তিন প্রকারের হয়।

প্রশ্ন—'**সর্বস্য**' পদের অর্থ কী ?

উত্তর—'**সর্বস্য**' পদ এখানে মনুষ্য মাত্রেরই বাচক, কারণ সকল মানুষই আহার করে এবং এই প্রকরণটিও মানুষের সম্বন্ধিত।

প্রশ্ন—আহারাদি বিষয়ে অর্জুন কোনো প্রশ্ন করেননি, তা সত্ত্বেও বিনা জিজ্ঞাসায় ভগবান আহারাদির বিষয়ে কেন বলেছেন ?

উত্তর—মানুষ যেমন আহার করে, তার প্রকৃতিও সেইরূপ গঠিত হয় এবং সেই প্রকৃতি ও অন্তঃকরণের অনুরূপেই শ্রদ্ধা হয়। আহার শুদ্ধ হলে তার ফলস্বরূপ অন্তঃকরণও শুদ্ধ হবে '**আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ**' (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৭।২৬।২)। অন্তঃকরণের শুদ্ধি দ্বারাই চিন্তা-ভাবনা, মনোভাব, শ্রদ্ধা ইত্যাদি গুণ এবং ক্রিয়াসমূহ শুদ্ধ হয়। অতএব এই প্রসঙ্গে আহারের আলোচনা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, যজন অর্থাৎ দেবতার পূজা সকলে করে না ; কিন্তু আহার সকলেই করে। যেমন, যিনি যেমন গুণসম্পন্ন দেবতা, যক্ষ-রাক্ষস বা ভূত-প্রেতাদির পূজা করেন— তাঁকে সেই অনুসারে সাত্ত্বিক,

রাজসিক ও তামসিক গুণসম্পন্ন বলে মানা হয় ; ঠিক তেমনি সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক আহারের মধ্যে যে আহার যাঁর প্রিয় হয়, তিনি সেই গুণসম্পন্ন ব্যক্তি হন। এই ভাবার্থে শ্লোকে '**প্রিয়ঃ**' পদটি ব্যবহার করে বিশেষভাবে লক্ষ্য করানো হয়েছে। অতএব আহারের দৃষ্টিতেও তার পরিচিতি হতে পারে। তাই ভগবান এখানে আহারের তিনটি বিভাগের কথা বলেছেন এবং সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ করার জন্য ও রাজসিক-তামসিক আহার ত্যাগ করার দৃষ্টিতেও এর তিনটি বিভাগের কথা বলেছেন। এই কথাই যজ্ঞ, দান ও তপস্যার বিষয়েও প্রযোজ্য।

সম্বন্ধ—ভগবান আগের শ্লোকে আহার, যজ্ঞ, তপ ও দানের ভেদ শোনার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন ; সেই অনুসারে এই শ্লোকে গ্রহণ করার উপযোগী সাত্ত্বিক আহারের বর্ণনা করছেন—

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮

আয়ু, বুদ্ধি, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতিবর্ধনকারী, সরস, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর এবং যার সারভাগ দীর্ঘস্থায়ী তথা যা স্বাভাবিকভাবেই প্রিয়—এরূপ আহার সাত্ত্বিক ব্যক্তিদের প্রিয় হয়ে থাকে ॥ ৮

প্রশ্ন—আয়ু, বুদ্ধি, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতি বর্ধন করা কী এবং সেগুলির বৃদ্ধিকারী আহার কোন্‌গুলি ?

উত্তর—১) আয়ুর অর্থ জীবন, জীবনের সীমা বেড়ে যাওয়া হল আয়ুবৃদ্ধি হওয়া।

২) সত্ত্বের অর্থ বুদ্ধি। বুদ্ধির নির্মল, তীক্ষ্ণ এবং যথার্থ ও সূক্ষ্মদর্শী হওয়াকেই বলা হয় সত্ত্বের বৃদ্ধি।

৩) বলের অর্থ সৎকার্যে সাফল্য প্রদানকারী মানসিক ও শারীরিক শক্তি। এই বাহ্যান্তর শক্তির বৃদ্ধিই হল বলবৃদ্ধি।

৪) মানসিক ও শারীরিক রোগাদির বিনাশ হওয়াই হল আরোগ্য বৃদ্ধি।

৫) হৃদয়ে সন্তোষ, সাত্ত্বিক প্রসন্নতা ও পরিপুষ্ট হওয়া এবং মুখ ও শারীরিক অঙ্গে শুদ্ধ ভাবজনিত আনন্দের চিহ্ন প্রকটিত হওয়াকে বলে সুখ ; এগুলির বৃদ্ধিকে বলা হয় সুখবৃদ্ধি।

৬) চিত্তবৃত্তির প্রেমভাবসম্পন্ন হওয়া এবং শরীরে প্রীতিকর চিহ্নের প্রকটিত হওয়াই হল প্রীতির বৃদ্ধি হওয়া।

উপরোক্ত আয়ু, বুদ্ধি ও বল ইত্যাদি বৃদ্ধিকারী যে দুধ, ঘি, শাক, ফল, চিনি, গম, যব, ছোলা, মুগ ও চাল ইত্যাদি সাত্ত্বিক আহার—সেসবগুলিকে জানাবার জন্য আহারের লক্ষণ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এসব আহার কেমন হয় ?

উত্তর—'**রস্যাঃ**', '**স্নিগ্ধাঃ**', '**স্থিরাঃ**', এবং '**হৃদ্যাঃ**'—এই পদগুলির সাহায্যে ভগবান এই বিষয় বুঝিয়েছেন।

১) দুধ, চিনি ইত্যাদি রসযুক্ত পদার্থকে '**রস্যাঃ**' বলা হয়।

২) মাখন, ঘি এবং সাত্ত্বিক পদার্থ থেকে নিষ্কাশিত তেল ইত্যাদি স্নেহযুক্ত পদার্থকে '**স্নিগ্ধাঃ**' বলা হয়।

৩) যেসব পদার্থের সার বহুদিন ধরে শরীরে স্থির থাকে তেমন শক্তি উৎপন্নকারী পদার্থকে বলা হয় '**স্থিরাঃ**'।

৪) যা খারাপ ও অপবিত্র নয় এবং দেখলেই মনে সাত্ত্বিক রুচি উৎপন্ন করে, সেইসব পদার্থকে বলা হয় '**হৃদ্যাঃ**'।

প্রশ্ন—'**আহারাঃ**' কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়—এই চার প্রকার খাওয়ার যোগ্য পদার্থকে আহার বলা হয়। এর ব্যাখ্যা পঞ্চদশ অধ্যায়ের চতুর্দশ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। ওখানে চতুর্বিধ অন্নের নামে এর বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন—ভগবান আগের শ্লোকে আহারের তিনটি ভাগের কথা শুনতে বলেছিলেন, কিন্তু এখানে '**সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ**' দ্বারা আহারকারী পুরুষদের কথা কী করে বললেন ?

উত্তর—যে ব্যক্তি যেমন গুণসম্পন্ন, তাঁর সেই গুণযুক্ত আহার প্রিয় হয়। তাই ব্যক্তিদের কথা বলায় আহারের কথা স্বতঃই এসে যায়। মানুষের আহারবিষয়ক পছন্দের দ্বারা তার পরিচিতি জানাবার উদ্দেশ্যে একথা বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ—সাত্ত্বিক ব্যক্তিদের গ্রহণযোগ্য আহারের বর্ণনা করে এবার পরবর্তী দুটি শ্লোকে রাজসিক ও তামসিক ব্যক্তিদের বর্জনীয় আহারের বর্ণনা করছেন—

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯

কটু, অম্ল, লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, প্রদাহকর এবং দুঃখ-চিন্তা-রোগ উৎপন্নকারী আহার রাজসিক ব্যক্তিদের প্রিয় হয় ॥ ৯

প্রশ্ন—কটু, অম্ল, লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ এবং প্রদাহকর কোন্ খাদ্যকে বলে ?

উত্তর—নিম, করলা এইসব পদার্থ কটু। কিছু ব্যক্তি কালো লঙ্কাকে কটু বলেন, কিন্তু এখানে তীক্ষ্ণ শব্দ পৃথকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, কটু রস তার অন্তর্ভুক্ত, তাই এখানে 'কটু' শব্দের অর্থ তিক্ত মানা হয়েছে। তেঁতুল ইত্যাদি হল অম্ল ; ক্ষার ইত্যাদি নানা প্রকার নুন হল নোনতাজাতীয় ; অত্যন্ত গরম বস্তু হল অতি উষ্ণ ; লাল লঙ্কা ইত্যাদি হল তীক্ষ্ণ, ভাজা অন্ন ইত্যাদি হল রুক্ষ এবং রাই ইত্যাদি পদার্থ হল প্রদাহকারী।

প্রশ্ন—'দুঃখশোকাময়প্রদাঃ' কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—আহার করার সময় গলা ইত্যাদিতে যে কষ্ট হয় এবং জিভ, তালু ইত্যাদির জ্বালা, দাঁতে খাবার আটকানো, চর্বণ করতে কষ্ট, চোখ ও নাকে জল এসে পড়া, হেঁচকী ওঠা ইত্যাদি যেসব কষ্ট হয়—তাকে 'দুঃখ' বলা হয়। আহার করার পরে যে অনুতাপ হয়, তাকে বলা হয় 'শোক' এবং আহার করলে যে অসুখ হয় তাকে বলা হয় 'আময়'। উপরোক্ত কটু, অম্ল ইত্যাদি পদার্থ আহার করলে এই দুঃখ, শোক ও রোগ উৎপন্ন হয়। তাই একে 'দুঃখশোকাময়প্রদাঃ' বলা হয়। অতএব এগুলি বর্জন করা উচিত।

প্রশ্ন—এসব রাজসিক ব্যক্তির প্রিয়, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে উপরোক্ত আহার্য রাজসিক, অতএব যাদের এইসব আহার্য প্রিয় অর্থাৎ রুচিকর, তাদের রজোগুণী বলে জানতে হবে।

যাতযামং গতরসং পূতি পর্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥ ১০

আধপাকা, রসবর্জিত, দুর্গন্ধযুক্ত, বাসী, উচ্ছিষ্ট এবং অপবিত্র আহার তামসিক ব্যক্তিদের প্রিয় হয় ॥ ১০

প্রশ্ন—প্রহরকে বলা হয় **'যাম্'**, অতএব **'যাতযামম্'**-এর অর্থ যে আহার একপ্রহর আগে তৈরি হয়েছে— এরূপ অর্থ না করে, আধপাকা বলা হয়েছে কেন ? কোন্ খাদ্যকে আধপাকা আহার বলা হয় ?

উত্তর—এই শ্লোকে **'পর্যুষিতম্'** বা বাসী অন্নকে তামসিক বলা হয়েছে। **'যাতযামম্'**-এর অর্থ এক প্রহর আগে তৈরি খাদ্য মেনে নিলে 'বাসী' আহার্যকে তামসিক বলার কোনো সার্থকতা থাকে না ; কারণ যখন এক প্রহর আগে তৈরি খাদ্যও তামসিক হয়, তাহলে এক রাত্রি আগে তৈরি খাবারও যে তামসিক হবে, এ তো স্বাভাবিকই সিদ্ধ হয়ে যায়, অতএব তাকে পৃথকভাবে তামসিক বলার কী প্রয়োজন ? সেইজন্যই এখানে **'যাতযামম্'**-এর অর্থ 'আধপাকা' বলা হয়েছে।

আধপাকা সেই ফল বা খাদ্য পদার্থকে বুঝতে হবে যেগুলি পুরোপুরি পাকেনি অথবা যেগুলি পুরো সিদ্ধ হয়নি।

প্রশ্ন—'গতরসম্' পদ কীরূপ আহার্যের বাচক ?

উত্তর—অগ্নি ইত্যাদির সংস্পর্শে, হাওয়া দ্বারা অথবা ঋতু পরিবর্তনের জন্য যেসব রসযুক্ত পদার্থের রস শুকিয়ে গেছে (যেমন কমলালেবু, আখ ইত্যাদির রস

শুকিয়ে যায়) সেগুলিকে 'গতরস' বা রসবিহীন বলা হয়।

প্রশ্ন—'পূতি' পদ কোন্ প্রকারের আহার্যের বাচক ?

উত্তর—যে সব খাদ্য বস্তু স্বভাবতঃই দুর্গন্ধযুক্ত হয় (যেমন পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি) অথবা যাতে কোনো ক্রিয়ার সাহায্যে দুর্গন্ধ উৎপন্ন হয়ে যায়, সেই সব বস্তুকে বলা হয় **'পূতি'**।

প্রশ্ন—**'পর্যুষিতম্'** পদ কীরূপ আহার্যের বাচক ?

উত্তর—আগের দিনের তৈরি করা খাবারকে **'পর্যুষিৎ'** বা বাসী বলা হয়। রাত পোহালে এই খাদ্য পদার্থে বিকৃতি এসে যায় এবং ঐ খাদ্য গ্রহণ করলে নানা প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়। সেইসব ফলকেও বাসী ভাবা উচিত, যেগুলি অনেকদিন আগে গাছ থেকে পেড়ে রাখায়, তাতে বিকৃতি উৎপন্ন হয়েছে।

প্রশ্ন—**'উচ্ছিষ্ট'** কোন্ খাদ্যের বাচক ?

উত্তর—নিজের বা অন্যের ভোজনের পরে উদ্বৃত্ত এঁটো খাবারকে **'উচ্ছিষ্ট'** বলে।

প্রশ্ন—**'অমেধ্যম্'** পদ কীরূপ আহার্যের বাচক ?

উত্তর—মাংস, ডিম ইত্যাদি হিংসাযুক্ত এবং মদ-তাড়ি ইত্যাদি মাদক বস্তু—যা স্বভাবতঃই অপবিত্র অথবা যাতে কোনো প্রকারের সঙ্গদোষে বা কোনো অপবিত্র বস্তু, স্থান, পাত্র বা ব্যক্তির সংস্পর্শে অথবা অন্যায় ও অধর্মের দ্বারা উপার্জিত অসৎ ধনের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়ায় যা অপবিত্র (অশুদ্ধ) হয়ে গেছে—সেই সব বস্তুকে বলা হয় 'অমেধ্য'। এরূপ পদার্থ দৈব পূজায় নিষিদ্ধ বলে মানা হয়।

প্রশ্ন—'চ' এবং **'অপি'** এই অব্যয়গুলি প্রয়োগ করে কী ভাবার্থ প্রকাশ পেয়েছে ?

উত্তর—এগুলির প্রয়োগের এই ভাবার্থ যে, যেসব বস্তুতে উপরোক্ত দোষগুলি অল্প বা অধিক পরিমাণে থাকে, সেসব বস্তু তামসিকই ; তাছাড়াও গাঁজা, ভাং, আফিম, তামাক, বিড়ি-সিগারেট এবং অপবিত্র ঔষধ ইত্যাদি এবং তমোগুণ উৎপন্নকারী যতো খাদ্যবস্তু আছে—সে সবই তামসিক।

প্রশ্ন—এরূপ খাদ্য তামসিক ব্যক্তিদের প্রিয় হয়ে থাকে—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান প্রতিপন্ন করেছেন যে, উপরোক্ত লক্ষণযুক্ত খাদ্যদ্রব্য তামসিক এবং তামসিক প্রকৃতিবিশিষ্ট মানুষ এরূপ আহার্যই পছন্দ করে, এই তাদের পরিচয়।

সম্বন্ধ—এইভাবে আহার্যের তিন প্রকার পার্থক্য জানিয়ে এবার যজ্ঞের তিনটি ভেদের কথা বলা হচ্ছে ; এখানে প্রথমে করণীয় সাত্ত্বিক যজ্ঞের লক্ষণ বলেছেন—

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদৃষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥ ১১

যা শাস্ত্রবিধির দ্বারা নির্দিষ্ট এবং যজ্ঞ করাই কর্তব্য—এইভাবে মনে মনে স্থির করে ফলাকাঙ্ক্ষাবিহীন পুরুষের দ্বারা যে যজ্ঞ করা হয়, তাকে সাত্ত্বিক যজ্ঞ বলে॥ ১১

প্রশ্ন—**'বিধিদৃষ্টঃ'** পদটির অর্থ কী এবং এখানে এই বিশেষণ প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—**'বিধিদৃষ্টঃ'** দ্বারা ভগবানের বলার অভিপ্রায় হল, শ্রৌত ও স্মার্ত যজ্ঞগুলির মধ্যে যে বর্ণ বা আশ্রমের জন্য শাস্ত্রে যে যজ্ঞকে কর্তব্যরূপে বিধান করা হয়েছে, শাস্ত্রবিহিত সেই যজ্ঞই সাত্ত্বিক। শাস্ত্রের বিপরীত ইচ্ছামতো করা যজ্ঞ সাত্ত্বিক নয়।

প্রশ্ন—এখানে **'যজ্ঞঃ'** পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—দেবতা ইত্যাদির উদ্দেশ্যে ঘৃত ইত্যাদির দ্বারা অগ্নিতে যজ্ঞ করা বা অন্য কোনো প্রকারে কোনো বস্তু সমর্পণ করে কারোকে যথাযোগ্য পূজা করাকে **'যজ্ঞ'** বলা হয়।

প্রশ্ন—করাই হল কর্তব্য—এইভাবে মনে একনিষ্ঠ হয়ে যজ্ঞ করাকে সাত্ত্বিক বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যদি ফলের ইচ্ছাই না থাকে তাহলে কর্ম করার প্রয়োজনই বা কী, এরূপ আশঙ্কা থাকলে মানুষের যজ্ঞে প্রবৃত্তিই না হতে পারে, সুতরাং 'করাই হল কর্তব্য' মনে মনে এরূপ স্থির করে যজ্ঞকে সাত্ত্বিক বলে ভগবান

বলতে চেয়েছেন যে, নিজ নিজ বর্ণাশ্রম অনুসারে যার জন্য যে যজ্ঞের শাস্ত্রের বিধান আছে, তাকে অবশ্যই তা করা উচিত। এরূপ শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যরূপ যজ্ঞ না করা বস্তুত ভগবানের আদেশ অমান্য করা হয়—এইভাবে দৃঢ় নিশ্চয়যুক্ত হয়ে নিষ্কামভাবে যে যজ্ঞ করা হয়, সেটিই হল সাত্ত্বিক যজ্ঞ।

প্রশ্ন—'**অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ**' পদ কীরূপ কর্তার বাচক এবং তাঁর করা যজ্ঞকে সাত্ত্বিক বলার অর্থ কী ?

উত্তর—যজ্ঞকারী ব্যক্তি, যিনি এই যজ্ঞের দ্বারা স্ত্রী, পুত্র, অর্থ, মান-মর্যাদা, গৃহ, বিজয়, স্বর্গ ইত্যাদির প্রাপ্তি কিংবা ইহলোক পা পরলোকের কোনোরূপ অনিষ্টের নিবৃত্তি ও কোনোপ্রকার সুখভোগ অথবা দুঃখনিবৃত্তির জন্য বিন্দুমাত্রও কামনা করেন না—তাঁর বাচক হল এই '**অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ**' পদটি (৬।১)। তাঁর দ্বারা কৃত যজ্ঞকে সাত্ত্বিক বলে এখানে বলা হয়েছে যে, ফলের আশায় করা যজ্ঞ বিধিপূর্বকভাবে করা হলেও তা পূর্ণ সাত্ত্বিক হয় না, পূর্ণ সাত্ত্বিক ভাবের জন্য ফলের কামনা ত্যাগ করা অত্যন্ত আবশ্যক।

সম্বন্ধ—এবার রাজসিক যজ্ঞের লক্ষণ জানাচ্ছেন—

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্॥ ১২

কিন্তু হে অর্জুন ! শুধুমাত্র দম্ভ আচরণের জন্য অথবা ফললাভের আকাঙ্ক্ষায় যে যজ্ঞ করা হয়, তাকে রাজসিক যজ্ঞ বলে জানবে॥ ১২

প্রশ্ন—'তু' অব্যয়টির প্রয়োগ করা হয়েছে কেন ?

উত্তর—সাত্ত্বিক যজ্ঞের থেকে এর পার্থক্য দেখাবার জন্য 'তু' অব্যয় প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—দম্ভার্থে যজ্ঞ করা কাকে বলে ?

উত্তর—যজ্ঞ-কর্মে আস্থা না থাকলেও জগতে নিজেকে 'যজ্ঞনিষ্ঠ' বলে প্রসিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যে যজ্ঞ করা হয়, তাকে বলা হয় দম্ভার্থে যজ্ঞ করা।

প্রশ্ন—ফলের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা কাকে বলে ?

উত্তর—স্ত্রী, পুত্র, অর্থ, গৃহ, মান-মর্যাদা, বিজয় ও স্বর্গপ্রাপ্তিরূপ ইহলোক ও পরলোকের সুখ-ভোগের জন্য বা কোনোপ্রকার অনিষ্ট নিবৃত্তির জন্য যে যজ্ঞ করা হয়—তাকে বলা হয় ফল-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা।

প্রশ্ন—'এব', 'অপি' এবং 'চ'—এই অব্যয়গুলি প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—এগুলির প্রয়োগে ভগবানের অভিপ্রায় হল, যে যজ্ঞ কোনো ফলপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে করা হলে তা শাস্ত্রবিহিত এবং শ্রদ্ধাপূর্বক অনুষ্ঠিত হলেও সেটি যদি রাজসিক এবং যা দম্ভ সহকারে করা হয় তবে তা-ও রাজসিক, সুতরাং যাতে এই দুটি দোষই থাকে, তাহলে সেটি যে 'রাজসিক' হবে, তাতে আর বলার কী আছে ?

সম্বন্ধ—এবার সর্বতোভাবে ত্যাজ্য তামসিক যজ্ঞের লক্ষণ জানাচ্ছেন—

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥ ১৩

শাস্ত্রবিধিবর্জিত, অন্নদানরহিত, মন্ত্রবিহীন, দক্ষিণাবিহীন এবং শ্রদ্ধারহিত যজ্ঞকে তামসিক যজ্ঞ বলা হয়॥ ১৩

প্রশ্ন—'**বিধিহীনম্**' পদ কীরূপ যজ্ঞের বাচক ?

উত্তর—যে যজ্ঞ শাস্ত্রবিহিত নয় বা যাতে শাস্ত্রবিধির অভাব থাকে, অথবা যা শাস্ত্রবিধির অবহেলা করে ইচ্ছানুযায়ী করা হয়, তাকে বলা হয় 'বিধিহীন'।

প্রশ্ন—'অসৃষ্টান্নম্' পদ কীরূপ যজ্ঞের বাচক ?

উত্তর—যে যজ্ঞে ব্রাহ্মণ ভোজন বা অন্নদান ইত্যাদির

মাধ্যমে অন্ন প্রদান করা হয় না, তাকে 'অসৃষ্টান্ন' বলা হয়।

প্রশ্ন—'মন্ত্রহীনম্' পদ কীরূপ যজ্ঞের বোধক ?

উত্তর—যে যজ্ঞ শাস্ত্রোক্ত মন্ত্ররহিত হয়, যাতে মন্ত্র প্রয়োগই করা হয়নি বা বিধিমতো করা হয়নি অথবা অবহেলায় ত্রুটি থেকে গেছে— সেই যজ্ঞকে বলা হয় 'মন্ত্রহীন'।

প্রশ্ন—'অদক্ষিণম্' পদ কীরূপ যজ্ঞের বাচক ?

উত্তর—যে যজ্ঞে যজ্ঞ করানো ব্যক্তিকে এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ ব্যক্তিদের দক্ষিণা দেওয়া হয় না, সেই যজ্ঞকে 'অদক্ষিণ' বলা হয়।

প্রশ্ন—'শ্রদ্ধাবিরহিত' যজ্ঞ কোন্‌গুলি ?

উত্তর—যে যজ্ঞ শ্রদ্ধাবিহীনভাবে শুধুমাত্র অহংকার, মান, মোহ, দম্ভ ইত্যাদি প্রণোদিত হয়ে করা হয়—তাকে বলা হয় 'শ্রদ্ধাবিরহিত'।

সম্বন্ধ—এইরূপ তিন প্রকার যজ্ঞের লক্ষণ জানিয়ে, এবার তপস্যার লক্ষণসমূহের প্রকরণ আরম্ভ করে চারটি শ্লোকে সাত্ত্বিক তপস্যার লক্ষণের সূচনায় প্রথমে শারীরিক তপস্যার স্বরূপ বর্ণনা করেছেন—

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥ ১৪

দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের পূজা, পবিত্রতা, সরলতা, ব্রহ্মচর্য এবং অহিংসা —এগুলিকে শরীর-সম্বন্ধীয় তপস্যা বলা হয়॥ ১৪

প্রশ্ন—'দেব', 'দ্বিজ', 'গুরু', 'প্রাজ্ঞ'—এই শব্দগুলি কীসের বাচক এবং এদের 'পূজা করা' কাকে বলে ?

উত্তর—ব্রহ্মা, মহাদেব, সূর্য, চন্দ্র, দুর্গা, অগ্নি, বরুণ, যম, ইন্দ্র ইত্যাদি যতো শাস্ত্রোক্ত দেবতা আছেন—শাস্ত্রে যাঁদের পূজার বিধান দেওয়া আছে— তাঁদের সকলের বাচক হল এই 'দেব' শব্দ। 'দ্বিজ' শব্দ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য— এই তিন বর্ণের বাচক হলেও এখানে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের জন্যই প্রযুক্ত হয়েছে। কারণ শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণই সকলের পূজনীয়। 'গুরু' শব্দটি এখানে মাতা, পিতা, আচার্য, বৃদ্ধ এবং নিজের থেকে যিনি বর্ণ, আশ্রম ও আয়ু ইত্যাদিতে যে কোনোভাবে বড়ো, তাঁদের সকলের বাচক। 'প্রাজ্ঞ' শব্দে যে মহাত্মা পুরুষ পরমেশ্বরের স্বরূপকে যথাযথভাবে জানেন, সেই জ্ঞানী ব্যক্তিকে লক্ষ্য করা হয়েছে। এঁদের সকলের যথাযোগ্য আদর-আপ্যায়ন করা ; নমস্কার জানানো, এঁদের পা ধুয়ে দেওয়া, চন্দন-পুষ্প-ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য ইত্যাদি সমর্পণ করা, যথাযোগ্য সেবা করা এবং এঁদের সুখী করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা, এগুলিই হল এঁদের 'পূজা করা'র অন্তর্গত।

প্রশ্ন—'শৌচম্' পদটি এখানে কোন্ শৌচের বাচক ?

উত্তর—'শৌচম্' পদ এখানে শারীরিক শৌচের বাচক। কারণ বাক্যের শুদ্ধির বর্ণনা পঞ্চদশ শ্লোকে এবং মনশুদ্ধির বর্ণনা ষোড়শ শ্লোকে পৃথকভাবে করা হয়েছে। জল-মাটির দ্বারা শরীরকে স্বচ্ছ ও পবিত্র রাখা এবং শরীর সম্বন্ধীয় সমস্ত কর্মে শুদ্ধ, পবিত্র থাকাকে 'শৌচ' বলে (১৬।৩)।

প্রশ্ন—'আর্জবম্' পদ এখানে কীসের বাচক ?

উত্তর—'আর্জবম্' পদটি সরলতার বাচক। এখানে শারীরিক তপস্যার নিরূপণে এর বর্ণনা করা হয়েছে, অতএব এটি শারীরিক দম্ভ, বক্রতা ইত্যাদির ত্যাগের ও দৈহিক সরলতার বাচক।

প্রশ্ন—'ব্রহ্মচর্যম্' কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এখানে 'ব্রহ্মচর্যম্' পদটি শরীর সম্বন্ধীয় সর্বপ্রকার মৈথুন ত্যাগ এবং ঠিকমতো বীর্য ধারণ করার বোধক।

প্রশ্ন—'অহিংসা' পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—শরীর দ্বারা কোনো প্রাণীকে কোনোভাবে একটুও কষ্ট না দেওয়াকে এখানে 'অহিংসা' বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এগুলিকে 'শারীরিক তপ' বলার উদ্দেশ্য কী ?

উত্তর— উপরোক্ত ক্রিয়াগুলিতে শরীরের প্রাধান্য আছে অর্থাৎ এগুলি বিশেষভাবে শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত এবং এগুলি ইন্দ্রিয়াদিসহ দৈহিক সমস্ত দোষ নষ্ট করে শরীরকে পবিত্র করে, তাই এগুলিকে 'শারীরিক তপ' বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ—এবার বাক্য-সম্বন্ধীয় তপের স্বরূপ জানাচ্ছেন—

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনঞ্চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥ ১৫

যা উদ্বেগকর নয়, প্রিয়, হিতকারক ও যথার্থ ভাষণ এবং বেদশাস্ত্রাদির পাঠ তথা পরমেশ্বরের নাম-জপের অভ্যাস—তাকে বলা হয় বাচিক তপস্যা ॥ ১৫

প্রশ্ন—'অনুদ্বেগকরম্', 'সত্যম্' এবং **'প্রিয়হিতম্'**—এই বিশেষণগুলির অর্থ কী এবং **'বাক্যম্'** পদের সঙ্গে এর প্রয়োগের এবং 'চ' অব্যয়ের অর্থ কী ?

উত্তর—যে বাক্য কারো মনে একটুও উদ্বেগকারী হয় না এবং যা নিন্দা বা পরচর্চাদি দোষ থেকে সর্বতোভাবে রহিত—তাকে বলা হয় 'অনুদ্বেগকর'। যেমন দেখা, শোনা ও অনুভব করা হয়েছে, ঠিক তেমনই অপরকে বোঝাবার জন্য যে যথার্থ বাক্য বলা হয়—তাকে বলা হয় 'সত্য'। যা শ্রবণকারীর প্রিয় মনে হয় এবং কটুতা, রুক্ষতা, তীক্ষ্ণভাব, অপমান করার মনোভাব ইত্যাদি দোষরহিত—এরূপ প্রেমময় মিষ্ট, সরল ও শান্ত বাক্যকে 'প্রিয়' বলা হয়। যার দ্বারা পরিণামে সকলের মঙ্গল হয়, যা হিংসা, দ্বেষ, জ্বালা, শত্রুতা দোষশূন্য এবং প্রেম, দয়া ও মঙ্গলময়—তাকে 'হিত' বলা হয়।

'বাক্যম্' পদের সঙ্গে **'চ'** প্রয়োগে ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, যে বাক্যে অনুদ্বেগকারিতা, সত্যতা, প্রিয়তা, হিতকারিতা—এই সব গুণের সমাবেশ হয় এবং যা শাস্ত্রবর্ণিত বচন সম্বন্ধীয় সর্বপ্রকার দোষবর্জিত—সেই বাক্য উচ্চারণকে বাচিক তপস্যা মানা যেতে পারে ; কিন্তু যার মধ্যে এই সকল দোষের একটুও সমাবেশ থাকে বা উপরোক্ত গুণগুলির কোনো গুণের অভাব থাকে, সেই বাক্য তাহলে বচন সম্বন্ধীয় তপস্যার অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্ন—'স্বাধ্যায়াভ্যসনং' পদটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যথাধিকার বেদ, বেদাঙ্গ, স্মৃতি, পুরাণ ও স্তোত্রাদি পাঠ করা ; ভগবানের গুণ, প্রভাব ও নাম উচ্চারণ করা, ভগবানের স্তুতি করা—এ সবই **'স্বাধ্যায়াভ্যসনম্'** পদের অন্তর্গত।

প্রশ্ন—এই সবগুলিকে বাচিক তপ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—উপরোক্ত সকল গুণই বচনের সঙ্গে সম্বন্ধিত এবং বচনের সমস্ত দোষ নাশ করে অন্তঃকরণ-সহ তাকে পবিত্র করে থাকে, তাই একে বচন-সম্বন্ধীয় তপস্যা বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ—এবার মন-সম্বন্ধীয় তপস্যার স্বরূপ জানাচ্ছেন—

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে॥ ১৬

মনের প্রসন্নতা, সৌম্যভাব, ভগবৎচিন্তা করার স্বভাব, মনের নিরোধ, অন্তঃকরণের ভাবের পবিত্রতা—এইগুলিকে বলা হয় মানসিক তপস্যা ॥ ১৬

প্রশ্ন—'মনঃপ্রসাদঃ' কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—মনের নির্মলতা, প্রসন্নতাকে বলা হয় **'মনঃপ্রসাদ'**। অর্থাৎ বিষাদ-ভয়, চিন্তা, শোক, ব্যাকুলতা-উদ্বিগ্নতা ইত্যাদি দোষরহিত হয়ে মনের বিশুদ্ধ হওয়া এবং প্রসন্নতা, হর্ষ ও বোধশক্তি দ্বারা যুক্ত হওয়াকে বলা হয় 'মনের প্রসাদ'।

প্রশ্ন—'সৌম্যত্বম্' কাকে বলা হয় ?

উত্তর—রুক্ষতা, জ্বালা, হিংসা, প্রতিহিংসা, ক্রূরতা, নির্দয়তা ইত্যাদি তাপকারী দোষ থেকে সর্বতোভাবে রহিত হয়ে মনকে সদা-সর্বদা শান্ত ও শীতল রাখাকেই বলা হয় **'সৌম্যত্ব'**।

প্রশ্ন—'মৌনম্' পদটির অর্থ কী ?

উত্তর—মনকে নিরন্তর ভগবানের গুণ, প্রভাব, তত্ত্ব, স্বরূপ, লীলা ও নাম ইত্যাদির চিন্তায় বা ব্রহ্মবিচারে ব্যাপৃত রাখাই হল 'মৌন'।

প্রশ্ন—'**আত্মবিনিগ্রহ**' কাকে বলে ?

উত্তর—অন্তঃকরণের চাঞ্চল্য সর্বতোভাবে বিনাশ করে তাকে স্থির ও যথাযথভাবে নিজ বশীভূত করাই হল 'আত্মবিনিগ্রহ'।

প্রশ্ন—'ভাবসংশুদ্ধি' কাকে বলে ?

উত্তর—অন্তঃকরণের রাগ-দ্বেষ, কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহ, হিংসা-ঈর্ষা, শত্রুতা-ঘৃণা, তিরস্কার-অপমান, অসহিষ্ণুতা, প্রমাদ, ব্যর্থ-চিন্তা, ইষ্ট-বিরোধ ও অনিষ্ট চিন্তা ইত্যাদি দুর্ভাব সর্বতোভাবে বিনাশ হওয়া এবং এর বিরোধী দয়া, ক্ষমা, প্রেম, বিনয় ইত্যাদি সদ্ভাবসমূহ সদা বিকশিত হওয়াই হল 'ভাবসংশুদ্ধি'।

প্রশ্ন—এই সব গুণগুলিকে মানস (মন-সম্বন্ধীয়) তপস্যা বলার অর্থ কী ?

উত্তর—এই সকল গুণ মনের সঙ্গে সম্বন্ধিত এবং মনকে সমস্ত দোষ থেকে রহিত করে পরম পবিত্র করে তোলে ; তাই একে মানস-তপ বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ—এবার সাত্ত্বিক তপস্যার লক্ষণ জানাচ্ছেন—

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে॥ ১৭

ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ব্যক্তিগণের দ্বারা পরম শ্রদ্ধা সহকারে পূর্বোক্ত তিন প্রকারের (কায়িক, বাচিক ও মানসিক) যে তপস্যা করা হয় তাকে সাত্ত্বিক তপস্যা বলে॥ ১৭

প্রশ্ন—'**নরৈঃ**' পদের সঙ্গে '**অফলাকাঙ্ক্ষিভীঃ**' এবং '**যুক্তৈঃ**' এই দুটি বিশেষণ প্রয়োগ করে কী অর্থ দেখানো হয়েছে ?

উত্তর—যে ব্যক্তি ইহলোকের বা পরলোকের কোনো প্রকার সুখভোগের অথবা দুঃখের নিবৃত্তিরূপ ফলের কখনো কোনো কারণে বিন্দুমাত্র কামনা করেন না, তাঁকে বলা হয় 'অফলাকাঙ্ক্ষী' ; আর যাঁর মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় অনাসক্ত, নিগৃহীত এবং শুদ্ধ হওয়ায় কখনো কোনো প্রকার ভোগের সংস্পর্শে বিচলিত হয় না, যাঁর আসক্তি সর্বতোভাবে বিনাশ হয়েছে, তাঁকে 'যুক্ত' বলা হয়। সুতরাং এগুলি প্রয়োগ করে নিষ্কাম-ভাবের আবশ্যকতা প্রমাণিত করে ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, উপরোক্ত তিন প্রকারের তপস্যা যখন এইরূপ নিষ্কাম পুরুষ দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তখনই তিনি পূর্ণ সাত্ত্বিক পদবাচ্য হন।

প্রশ্ন—কীরূপ শ্রদ্ধাকে '**পরম শ্রদ্ধা**' বলা হয় এবং সেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে তিন প্রকারের তপস্যা করা কাকে বলা হয় ?

উত্তর—শাস্ত্রে উপরোক্ত তপস্যার যা কিছু মহত্ত্ব, প্রভাব ও স্বরূপের কথা বলা হয়েছে—তার ওপর প্রত্যক্ষের থেকেও বেশি সম্মানপূর্বক পূর্ণ বিশ্বাস হওয়া হল 'পরমশ্রদ্ধা' এবং এরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে অতিবড় বিঘ্ন বা কষ্টের কোনো পরোয়া না করে সর্বদা অবিচলিত থেকে অত্যন্ত সম্মান ও উৎসাহ সহকারে উপরোক্ত তপস্যা করতে থাকাকেই বলা হয় পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে তাতে রত থাকা।

প্রশ্ন—'**তপঃ**' পদের সঙ্গে '**তৎ**' এবং '**ত্রিবিধম্**' —এই বিশেষণগুলি প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—এগুলি প্রয়োগ করে ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, শরীর, বাক্য ও মন সম্বন্ধীয় উপরোক্ত তপস্যাই সাত্ত্বিক পদবাচ্য। এছাড়া যে অন্য প্রকারের কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপস্যা—যেগুলি এই অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে '**অশাস্ত্রবিহিতম্**' এবং '**ঘোরম্**' বিশেষণ দিয়ে নিরূপণ করা হয়েছে—সেই তপস্যা সাত্ত্বিক নয়। সেই সঙ্গে এও বলা হয়েছে যে চৌদ্দ, পনেরো এবং ষোলোতম শ্লোকগুলিতে যে কায়িক, বাচিক এবং মানসিক তপস্যার স্বরূপ বলা হয়েছে—তা স্বরূপতঃ সাত্ত্বিক হলেও, সেগুলি পূর্ণ সাত্ত্বিক তখনই হয় ; যখন তা এই শ্লোকে বর্ণিত ভাবানুসারে করা হয়।

সম্বন্ধ—এবার রাজস তপস্যার লক্ষণ জানাচ্ছেন—

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্॥ ১৮

যে তপস্যা সৎকার, মান ও পূজা পাবার আশায় অথবা অন্য কোনো স্বার্থের প্রয়োজনে স্বভাবতঃ বা দম্ভপূর্বক করা হয়, সেই অনিশ্চিত এবং ক্ষণিক ফলপ্রসূ তপস্যাকে রাজসিক তপস্যা বলা হয়॥ ১৮

প্রশ্ন—এখানে 'তপঃ' পদের সঙ্গে 'যৎ' পদ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভগবানের এখানে 'তপঃ' পদের সঙ্গে 'যৎ' পদ প্রয়োগের এই অভিপ্রায় যে, শাস্ত্রে যতপ্রকার ব্রত, উপবাস, সংযম ইত্যাদির বর্ণনা আছে—সেই সব তপস্যা যদি সৎকার, মান ও পূজাদির জন্য করা হয়, তাহলে তা রাজস তপস্যার অন্তর্ভুক্ত হয়।

প্রশ্ন—সৎকার, মান ও পূজার জন্য 'তপস্যা' করা কী ? এবং 'চ' ও 'এব' প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—তপস্যার প্রসিদ্ধিতে জগতে এইরূপ খ্যাতি হয় যে, এই ব্যক্তি অত্যন্ত বড় তপস্বী, এঁর সমকক্ষ আর কে আছেন, ইনি অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি—একে বলা হয় 'সৎকার'। কারোকে তপস্বী মনে করে তাঁকে আপ্যায়ন করা, তাঁর সামনে উঠে দাঁড়ানো, প্রণাম করা, মানপত্র দেওয়া বা অন্য কোনোভাবে তাঁকে সম্মান জানানোকে বলা হয় 'মান'। তাঁকে আরতি করা, পা ধুয়ে দেওয়া, পত্র-পুষ্পাদি দ্বারা ষোড়শোপচারে পূজা করা, তাঁর নির্দেশ পালন করা—এই সবকে বলে 'পূজা'।

এই সব কিছুর জন্য যে লৌকিক ও শাস্ত্রীয় তপস্যার আচরণ করা হয়—তাকেই বলা হয় সৎকার, মান ও পূজার জন্য তপস্যা করা। 'চ' এবং 'এব' প্রয়োগ করে বোঝানো হয়েছে যে, এগুলি ব্যতীত অন্য কোনো স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য করা তপস্যাও রাজসিক হয়ে থাকে।

প্রশ্ন—দম্ভ সহকারে 'তপস্যা' করা কীরূপ ?

উত্তর—তপস্যাতে প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস না থাকলেও লোককে বিভ্রান্ত করে কোনোপ্রকার স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তপস্বীর মতো সেজে কোনো লৌকিক বা শাস্ত্রীয় তপস্যার যে আচরণ করা হয়, তাকে বলা হয় দম্ভ সহকারে তপস্যা করা।

প্রশ্ন—স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে তপস্যা দম্ভপূর্বক করা হয়, তাকেই 'রাজসিক' মানা হয় না কি শুধু স্বার্থের সম্বন্ধেই রাজসিক হয়ে যায় ?

উত্তর—শুধু স্বার্থের সম্বন্ধেই রাজসিক হয়ে যায় ; আর যদি সেই সঙ্গে দম্ভও থাকে, তাহলে তো বলার কিছু নেই।

প্রশ্ন—রাজসিক তপস্যাকে 'অধ্রুব' এবং 'চল' বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যে ফল প্রাপ্তির জন্য অনুষ্ঠান করা হয়, তা প্রাপ্ত হওয়া বা না হওয়া নিশ্চিত নয়, তাই তাকে বলা হয় 'অধ্রুব' এবং যে ফল প্রাপ্তি হয়, তাও সর্বদা থাকে না, তা অবশ্যই বিনাশপ্রাপ্ত হয়, সেই জন্য তাকে 'চল' বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ—এবার তামসিক তপস্যার লক্ষণ জানাচ্ছেন, যা সর্বদা ত্যজনীয়—

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ১৯

যে তপস্যা হটকারিতাপূর্বক, মন-বাক্য ও শরীরের কষ্ট দিয়ে অথবা অন্যের অনিষ্ট করার জন্য করা হয়—তাকে তামসিক তপস্যা বলে॥ ১৯

প্রশ্ন—এখানে 'তপঃ' শব্দের সঙ্গে 'যৎ' পদের প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যে তপস্যার বর্ণনা এই অধ্যায়ের পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে করা হয়েছে, যা অশাস্ত্রীয়, মনোকল্পিত, ঘোর

এবং স্বভাবতঃই তামসিক, যা দম্ভপূর্বক বা অজ্ঞতাবশতঃ গাছের ডালে পা বেঁধে মাথা নীচু করে ঝোলা, লোহার কাঁটার ওপরে বসা অথবা এইরূপ অন্যান্য ভয়ানক ঘোর কর্ম কু-ভাব পোষণ করে কষ্ট সহ্য করে করা হয়—এখানে সেইসব ক্রিয়াকেই 'তামসিক তপস্যা' নামে নির্দেশ করা হয়েছে, এই অর্থে 'তপঃ' পদের সঙ্গে 'যৎ' পদটি প্রযুক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন— '**মূঢ়গ্রাহ**' কাকে বলে এবং তার সাহায্যে তপস্যা করা কীরূপ ?

উত্তর—তপস্যার প্রকৃত লক্ষণ না জেনে, যে কোনো ক্রিয়াকে তপস্যা মনে করে তা করার যে হটকারিতা বা দুরাগ্রহ, তাকেই বলা হয় 'মূঢ়গ্রাহ'। এরূপ আগ্রহ রেখে কোনোরূপ শারীরিক, বাচিক বা মানসিক কষ্ট সহ্য করার তামসিক কর্মকে তপস্যা মনে করে রত থাকা হল মূঢ়তাপূর্ণ আগ্রহ সহ তপস্যা করা।

প্রশ্ন—আত্মসম্বন্ধীয় পীড়ার সঙ্গে তপস্যা করা কী ?

উত্তর—এখানে আত্মা শব্দ মন, বাক্য ও শরীর—এই সবের বাচক এবং এই সবগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত যে কষ্ট, তাকে বলা হয় 'আত্মসম্বন্ধীয় পীড়া'। অতএব মন, বাক্য এবং শরীর—এই সবগুলিকে অথবা এর যে কোনো একটিকে অনুচিত কষ্ট দিয়ে যে অশাস্ত্রীয় তপস্যা করা হয়, তাকেই বলা আত্মসম্বন্ধীয় পীড়াসহ তপস্যা করা।

প্রশ্ন—অপরের অনিষ্ট করার জন্য তপস্যা করা কেমন ?

উত্তর—অন্যের সম্পত্তির হরণ, সম্পত্তির বিনাশ, কারো বংশ উচ্ছেদ করা অথবা অপরের কোনোপ্রকার অনিষ্ট করার জন্য নিজের কায়-মনো-বাক্যে যে তাপ সহন করা—তাকেই বলে অন্যের অনিষ্ট করার জন্য তপস্যা করা।

প্রশ্ন—এখানে '**বা**' অব্যয় প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'**বা**' অব্যয় প্রয়োগ করে ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, যে তপস্যা উপরোক্ত লক্ষণগুলির মধ্যে কোনো একটি লক্ষণের সঙ্গে যুক্ত, তাকেই তামসিক তপস্যা বলা হয়।

সম্বন্ধ—তিন প্রকার তপস্যার লক্ষণ জানিয়ে এবারে দানের তিনটি ভাগ বলার জন্য প্রথমে সাত্ত্বিক দানের লক্ষণ জানাচ্ছেন—

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥ ২০

দান করা কর্তব্য—এই মনোভাব রেখে প্রত্যুপকারের আশা না করে পবিত্র স্থানে, যথা সময়ে ও যোগ্য পাত্রে যে দান করা হয়, তাকে বলা হয় সাত্ত্বিক দান॥ ২০

প্রশ্ন—এখানে '**ইতি**' অব্যয়ের সঙ্গে '**দাতব্যম্**' পদ প্রয়োগের তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এর প্রয়োগ করে ভগবান সত্ত্বগুণের পূর্ণতায় নিষ্কামভাবের প্রাধান্য প্রতিপাদন করে দেখিয়েছেন যে, বর্ণ, আশ্রম, অবস্থা ও পরিস্থিতি অনুসারে শাস্ত্রবিহিত দান করা—নিজের স্বত্বকে যথাসাধ্য অপরের হিতে লাগানো মানুষের পরম কর্তব্য। যদি তাঁরা এরূপ না করেন, তাহলে মনুষ্যত্ব থেকে পতন হয় এবং ভগবানের কল্যাণময় নির্দেশের অনাদর করা হয়। সুতরাং যে দান কেবল কর্তব্য-বুদ্ধি থেকেই করা হয়, যাতে ইহলোক এবং পরলোকের কোনো ফলের বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা না থাকে—সেই দানই হল পূর্ণরূপে সাত্ত্বিক দান।

প্রশ্ন—এখানে 'দেশ' এবং 'কাল' শব্দ কোন্ দেশ-কালের বাচক ?

উত্তর—যে দেশে, যে কালে, যে বস্তুর প্রয়োজন হয়, সেই বস্তুর দানের দ্বারা সকলকে যথাসাধ্য সুখী করার জন্য সেটিই যোগ্য দেশ এবং কাল কথিত হয়। যেমন—যে স্থানে, যখন দুর্ভিক্ষ বা মরাকবলিত হয়েছে, তা তীর্থস্থান বা পর্বকাল না হলেও সেই স্থান এবং সেই সময় তখন অন্ন ও জল দানের উপযুক্ত সময়। তাছাড়াও সাধারণ অবস্থায় কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, মথুরা, কাশী, প্রয়াগ, নৈমিষারণ্য ইত্যাদি তীর্থস্থান এবং গ্রহণ, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, সংক্রান্তি, একাদশী ইত্যাদি পুণ্যকাল—যা দানের জন্য প্রশস্ত বলা হয়েছে—এগুলি অবশ্যই উপযুক্ত

দেশ-কাল। এই সবেরই বাচক হল 'দেশ' এবং 'কাল' শব্দ।

প্রশ্ন—'পাত্র' শব্দ কীসের বাচক ?

উত্তর—যার কাছে যে সময় যে বস্তুর অভাব থাকে, সে সেখানেই, সেই সময় ঐ বস্তুর দানের পাত্র। যেমন —ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, উলঙ্গ, দরিদ্র, রোগী, আর্ত, অনাথ এবং ভীতসন্ত্রস্ত প্রাণী অন্ন, জল, বস্ত্র, নির্বাহের উপযুক্ত অর্থ, ঔষধ, আশ্বাস, আশ্রয় ও অভয়দানের পাত্র। আর্ত প্রাণীদের ক্ষেত্রে জাতি, দেশ ও কালের কোনো অন্তরায় হয় না। তাদের আর্তদশাই তাদের পাত্রতার নির্দেশ করে। এতদ্ব্যতীত যাঁরা শ্রেষ্ঠ আচরণকারী বিদ্বান, ব্রাহ্মণ, উত্তম ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী, সন্ন্যাসী এবং সেবাব্রতী—যাঁদের যে বস্তু দান করা শাস্ত্রে কর্তব্য বলে উল্লিখিত আছে—তাঁরা তো নিজ নিজ অধিকার অনুযায়ী সাধ্যমতো অর্থ ইত্যাদি সকল প্রয়োজনীয় বস্তুরই দান গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র।

প্রশ্ন—এখানে '**অনুপকারিণে**' পদ কী উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয়েছে ? নিজের উপকারকারীকে কিছু দেওয়া অনুচিত, নাকি সেটি রাজস দান ?

উত্তর—যিনি উপকার করেছেন, তাঁর সেবা করা, যথাসাধ্য সুখী করার চেষ্টা করা মানুষেরই কর্তব্য, তাঁর মনুষ্যত্ব। শুধু তাই নয়, ভালো মানুষ উপকারীর সেবা না করে থাকতেই পারেন না। তিনি জানেন প্রকৃত উপকারীর প্রতিদান করা তো তাঁকে অপমান করার সামিল, কারণ প্রকৃত উপকারের প্রতিদান কেউই করতে পারেন না ; তাই তিনি কেবল নিজের সন্তুষ্টির জন্য তাঁর সেবা করেন এবং যতো সেবা করেন, ততোই তাঁর দৃষ্টিতে অল্পই মনে হয়। তিনি কৃতজ্ঞতায় নত হয়ে থাকেন। শ্রীরামচরিতমানসে ভগবান শ্রীরামভক্ত হনুমানকে বলেছেন—

> **সুনু কপি তোহি সমান উপকারী।**
> **নহিঁ কোউ সুর নর মুনি তনু ধারী॥**
> **প্রতি উপকার করৌঁ কা তোরা।**
> **সনমুখ হোই ন সকত মন মোরা॥**

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে গোপীজনের নিকট ঋণী বলে ঘোষণা করেছেন। এমতাবস্থায় উপকারকারীকে কিছু দেওয়া অনুচিত বা রাজসিক কখনো হতে পারে না। কিন্তু এটি 'দানের' শ্রেণীতে নেই। এটি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এক স্বাভাবিক প্রচেষ্টা। যাঁরা এঁকে দান বলে মনে করেন, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে উপকারীকে অপমান করেন, আর যাঁরা উপকারীকে সেবা করতে চান না, তাঁরা কৃতঘ্ন শ্রেণীর ব্যক্তি। সুতরাং উপকারকারীর সেবা অবশ্যই করাই উচিত।

ভগবানের এখানে অনুপকারীকে দান দেওয়ার কথা বলাতে এই অভিপ্রায় বোধ হয় যে, দানকারী ব্যক্তি দান করার পরিবর্তে কোনোপ্রকার উপকার পাওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা যেন না রাখেন। যার সঙ্গে কোনোপ্রকারের স্বার্থের বিন্দুমাত্রও সম্বন্ধ মনের মধ্যে থাকে না, সেই ব্যক্তিকে যে দান করা হয়, সেটিই সাত্ত্বিক দান। এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে দাতার স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগের কথাই বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ—এবার রাজসিক দানের লক্ষণ জানাচ্ছেন—

> **যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।**
> **দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥ ২১**

কিন্তু যে দান ক্লেশপূর্বক ও প্রত্যুপকারের আশায় অথবা ফললাভের উদ্দেশ্যে করা, তাকে বলা হয় রাজসিক দান॥ ২১

প্রশ্ন—'তু' কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—সাত্ত্বিক দানের থেকে রাজসিক দানের পার্থক্য দেখাবার জন্য এখানে 'তু' কথাটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—ক্লেশপূর্বক দান করা কী ?

উত্তর—দান পাওয়ার জন্য ধরণা দেওয়া, জেদ করা, ভয় দেখানো অথবা কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির চাপ সৃষ্টি করার ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুঃখিত চিত্তে, নিরুপায় হয়ে যে দান করা হয়, তাকে বলে ক্লেশপূর্বক বা কষ্টসহকারে দান করা।

প্রশ্ন—প্রত্যুপকারের জন্য দান করা কী ?

উত্তর—যে ব্যক্তির দ্বারা স্বার্থসিদ্ধি হয় বা ভবিষ্যতে যার দ্বারা কোনো ছোট বা বড় কাজ উদ্ধারের সম্ভাবনা থাকে, এরূপ ব্যক্তিকে দান করা প্রকৃত দান নয়, এতো পরিবর্তে কিছু পাবার আশায় দেওয়া ! যেমন আজকাল তিথি বিশেষে বা অন্য কোনো কারণে দানের সংকল্প করে এমন ব্রাহ্মণদের দান করা হয়, যাঁরা নিজেদের বা নিজের আত্মীয়-বন্ধুদের কাজে আসেন অথবা এমন সংস্থা বা তার পরিচালককে দেওয়া হয়, যাতে পরিবর্তে নানাপ্রকার স্বার্থ-সিদ্ধির সম্ভাবনা থাকে—একেই বলা হয় প্রত্যুপকারের জন্য দান করা।

প্রশ্ন—ফলের উদ্দেশ্যে দান করা কী ?

উত্তর—মান-মর্যাদা-প্রতিষ্ঠা ও স্বর্গাদি ইহলোক ও পরলোকের ভোগ প্রাপ্তির জন্য বা রোগাদি নিবৃত্তির জন্য যে কোনো বস্তু কোনো ব্যক্তি বা সংস্থাকে যে দান করা হয়, তাকে বলে ফলের উদ্দেশ্যে দান করা। কিছু কিছু ব্যক্তি একরূপ দানের পরিবর্তে একাধিক সুবিধা পেতে চান—

যেমন—ক) যাঁকে দান করা হয়েছে, তিনি উপকার মনে রেখে সময়মতো ভালো-মন্দ কাজে তাঁদের পক্ষ নেবেন।

খ) খ্যাতি হবে, যার দ্বারা প্রতিষ্ঠা ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

গ) খবরের কাগজে নাম ছাপা হলে লোকে মনে করবে খুব ধনী ব্যক্তি, তাতে ব্যবসায়ে নানা সুবিধা হয়ে আরও অর্থ লাভ হবে।

ঘ) খুব খ্যাতি হলে ছেলেমেয়েদের বড়ো ঘরে বিবাহ হবে এবং তাতে নানাপ্রকার স্বার্থসিদ্ধি হবে।

ঙ) শাস্ত্রানুসারে পরলোকে দানের কয়েকগুণ উত্তম ফল অবশ্যই লাভ হবে।

এইরূপ ভাবনার ফলে মানুষ দানের মহত্ত্ব অত্যন্ত হেয় করে।

প্রশ্ন—'বা', 'পুনঃ' এবং 'চ'—এই তিনটি অব্যয় প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—এই তিনটি অব্যয় প্রয়োগের তাৎপর্য হল, উপরোক্ত তিন প্রকারের মধ্যে কোনো একটি মনোভাব রেখে দান করলেও সেটি রাজসিক দান পদবাচ্য হয়।

সম্বন্ধ—এবার তামসিক দানের লক্ষণ জানাচ্ছেন—

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ২২

যে দান সৎকার-রহিতভাবে, অবজ্ঞাপূর্বক অযোগ্য পাত্রে, অপবিত্র স্থানে ও অশুভ সময়ে দেওয়া হয়, তাকে তামসিক দান বলা হয়॥ ২২

প্রশ্ন—সৎকাররহিতভাবে করা দানের স্বরূপ কী ?

উত্তর—দান গ্রহণের জন্য আগত উপযুক্ত ব্যক্তিকে সম্মান না করে অর্থাৎ যথাযোগ্য সমাদর, কুশল প্রশ্ন, প্রিয়ভাষণ ও আসন দিয়ে সম্মান না করে যে রুক্ষভাবে দান করা হয়—তাকে বলে সৎকাররহিত দান।

প্রশ্ন—অবজ্ঞাপূর্বক প্রদত্ত দান কোন্‌গুলি ?

উত্তর—নানাপ্রকার কটুকথা বলে, ধমক দিয়ে, আবার যেন না আসে কড়া করে তা বলে, ঠাট্টা করে বা অন্য কোনোভাবে দৈহিক ও বাক্যের ভঙ্গি দ্বারা অপমানিত করে যে দান করা হয়—সেগুলি হল অবজ্ঞাপূর্বক প্রদত্ত দান।

প্রশ্ন—দানের জন্য অযোগ্য দেশ-কাল কী এবং তাতে দেওয়া দানকে তামসিক বলা হয় কেন ?

উত্তর—যে দেশ (স্থান) এবং কাল দানের জন্য উপযুক্ত নয় অর্থাৎ যে দেশে এবং কালে দান দেওয়া আবশ্যক নয় অথবা যেখানে দান করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ (যেমন ম্লেচ্ছ দেশে গরু দান করা, গ্রহণের সময় কন্যাদান করা ইত্যাদি) সেই দেশ এবং কাল দানের জন্য অযোগ্য ; এবং সেখানে করা দান দাতাকে নরকভোগী করে। তাই সেটি তামসিক দান।

প্রশ্ন—দানের জন্য অপাত্র কে ? তাকে দান করা

তামসিক কেন ?

উত্তর—যে ব্যক্তিকে দান করার প্রয়োজন নেই এবং শাস্ত্রে যাকে দান করার নিষেধ রয়েছে, (যেমন ধর্মধ্বজী, পাষণ্ড, কপটাচারী, হিংসুটে, পরনিন্দাকারী, অন্যের জীবিকা অপহরণকারী, মিথ্যা বিনয়প্রদর্শনকারী, মদ্যপ, মাংসাদি অভক্ষ্য খাদ্য গ্রহণকারী, চোর, ব্যভিচারী, ঠগ, জুয়াড়ি এবং নাস্তিক ইত্যাদি) এরা দানের যোগ্য নয়, তাদের দান করলে তা ব্যর্থ হয় এবং দাতা নরকগামী হয়। তাই এরূপ দানকে তামসিক দান বলা হয়। অবশ্য ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত, বস্ত্রহীন, রোগী, আর্ত মানুষদের প্রয়োজনমতো অন্ন-জল-বস্ত্র-ঔষধ ইত্যাদি দেওয়াতে কোনো নিষেধ নেই।

সম্বন্ধ—এইরূপ সাত্ত্বিক যজ্ঞ, তপস্যা, দান ইত্যাদিকে করণীয় বলার উদ্দেশ্যে এবং রাজসিক-তামসিককে ত্যাগের জন্য এই সবগুলির তিনপ্রকার বিভাগ করা হয়েছে। এবার এই সাত্ত্বিক যজ্ঞ, দান, তপস্যা কেন শ্রেষ্ঠ, ভগবানের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক এবং ঐ সাত্ত্বিক যজ্ঞ, তপস্যা ও দানে যদি কোনো অঙ্গ-বৈগুণ্য হয়ে যায় তাহলে তা কীভাবে দূর হয়—এই সব জানাতে পরবর্তী প্রকরণ আরম্ভ করা হচ্ছে—

ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥ ২৩

ওঁ, তৎ, সৎ—এই তিনটি শব্দের দ্বারা সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মের তিন প্রকার নাম বলা হয়েছে। এঁর দ্বারা সৃষ্টির আদিতে যজ্ঞের কর্তা ব্রাহ্মণ, যজ্ঞের কারণ বেদ এবং যজ্ঞরূপ ক্রিয়া রচিত হয়েছে॥ ২৩

প্রশ্ন—ব্রহ্ম অর্থাৎ সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের অনেক নাম, তাহলে এখানে শুধু তাঁর তিনটি নামের বর্ণনা কেন করা হয়েছে ?

উত্তর—পরমাত্মার 'ওঁ', 'তৎ' এবং 'সৎ'—বেদে এই তিনটি নামকে প্রধান বলে মানা হয়েছে। যজ্ঞ, তপ, দান ইত্যাদি শুভকর্মের সঙ্গে এই নামগুলির বিশেষ সম্বন্ধ আছে। তাই এখানে এই তিনটি নামের বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন—'তেন' পদ দ্বারা এখানে উপরোক্ত তিনটি নাম গ্রহণ করা হয়েছে নাকি এই তিনটি নাম দ্বারা যে পরমাত্মাকে লক্ষ্য করা হয়েছে তাঁকে গ্রহণ করা হয়েছে ?

উত্তর—যে পরমাত্মার এই তিনটি নাম তাঁরই বাচক হল এখানে 'তেন' পদটি।

প্রশ্ন—তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে যজ্ঞসহ সমস্ত প্রজার উৎপত্তি হয়েছে প্রজাপতি ব্রহ্মা হতে (৩।১০) আর এখানে বলা হয়েছে ব্রাহ্মণাদির উৎপত্তি হয়েছে পরমেশ্বরের দ্বারা, এর অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—প্রজাপতি ব্রহ্মার উৎপত্তি পরমাত্মা থেকে এবং প্রজাপতি থেকে সমস্ত ব্রাহ্মণ, বেদ এবং যজ্ঞাদি উৎপন্ন হয়েছে—তাই কোথাও এগুলি পরমেশ্বর থেকে উৎপন্ন বলা হয়েছে আবার কোথাও প্রজাপতি থেকে উৎপন্ন বলা হয়েছে, কিন্তু অর্থ একই।

প্রশ্ন—ব্রাহ্মণ, বেদ এবং যজ্ঞ—এই তিনটি কার বাচক ? 'পুরা' পদ কোন্ সময়ের বাচক ?

উত্তর—'ব্রাহ্মণ' শব্দ ব্রাহ্মণাদি সমস্ত প্রজার, 'বেদ' শব্দ চারটি বেদের, 'যজ্ঞ' শব্দ যজ্ঞ, তপস্যা, দান ইত্যাদি সমস্ত শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্মের এবং 'পুরা' পদটি সৃষ্টির আদিকালের বাচক।

প্রশ্ন—পরমেশ্বরের উপরোক্ত তিনটি নাম জানিয়ে আবার পরমেশ্বর থেকে সৃষ্টির আদিকালে ব্রাহ্মণাদির উৎপত্তি হয়েছে, এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা বুঝতে হবে যে, যে পরমাত্মা থেকে সমস্ত কর্তা, কর্ম এবং কর্ম-বিধির উৎপত্তি হয়েছে, সেই ভগবানের বাচক হল 'ওঁ', 'তৎ' এবং 'সৎ'—এই তিনটি নাম, সুতরাং এর উচ্চারণাদির দ্বারা সেই সবগুলির অঙ্গ-বৈগুণ্য বিদূরিত হয়। সুতরাং প্রত্যেক কর্মের আরম্ভে পরমেশ্বরের নাম উচ্চারণ করা পরম আবশ্যক।

সম্বন্ধ—পরমেশ্বরের উপরোক্ত ওঁ, তৎ এবং সৎ—এই তিনটি নামের সঙ্গে যজ্ঞ, দান, তপস্যাদির কী সম্বন্ধ ? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে প্রথমে 'ওঁ' প্রয়োগের কথা বলেছেন—

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্॥ ২৪

সেইজন্য বেদমন্ত্রাদি উচ্চারণকারী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ শাস্ত্রবিধান অনুযায়ী যজ্ঞ, দান, তপস্যাদি কর্ম সর্বদা 'ওঁ' এই ব্রহ্মবাচক শব্দ প্রথমে উচ্চারণ করে আরম্ভ করেন॥ ২৪

প্রশ্ন—হেতুবাচক 'তস্মাৎ' পদ প্রয়োগ করে এখানে বেদবাদীগণের শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞক্রিয়া সর্বদা ওঁ-কার উচ্চারণ করেই আরম্ভ করা হয়—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভগবান এর দ্বারা প্রধানতঃ নামের মহিমা প্রতিপন্ন করেছেন। তাৎপর্য হল, যে পরমেশ্বর থেকে এই যজ্ঞ কর্মের উৎপত্তি হয়েছে, তাঁর নাম হওয়ায় ওঁ-কার উচ্চারণ দ্বারা সমস্ত কর্মের অঙ্গ-বৈগুণ্য বিদূরিত হয়ে তা পবিত্র ও কল্যাণপ্রদ হয়ে ওঠে। ভগবানের নামের এই অপার মহিমা। সেইজন্য বেদবাদী অর্থাৎ বেদোক্ত মন্ত্রাদির উচ্চারণপূর্বক যজ্ঞ কর্ম করার অধিকারী বিদ্বান, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাদির যজ্ঞ, দান, তপস্যা ইত্যাদি সমস্ত শাস্ত্রবিহিত শুভ কর্ম সর্বদা ওঁ-কার উচ্চারণপূর্বকই হয়ে থাকে। তাঁরা কখনো কোনো কালে কোনো শুভ কর্ম ভগবানের পবিত্র নাম 'ওঁ-কার' উচ্চারণ না করে করেন না। অতএব সকলেরই তাই করা উচিত।

সম্বন্ধ—এইভাবে ওঁ-কার প্রয়োগের কথা বলে এবার পরমেশ্বরের 'তৎ' নাম প্রয়োগের বর্ণনা করছেন—

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ॥ ২৫

'তৎ' এই ব্রহ্মবাচক দ্বিতীয় শব্দ উচ্চারণ করে মোক্ষলাভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ সমস্ত কিছু সেই পরমাত্মারই এই মনোভাবে ফলাকাঙ্ক্ষা না করে নানাবিধ যজ্ঞ-তপস্যা-দানাদি কর্মের অনুষ্ঠান করেন॥ ২৫

প্রশ্ন—'ইতি' পদের সঙ্গে 'তৎ' পদের এখানে কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—'তৎ' পদ হল পরমেশ্বরের নাম। তাঁকে স্মরণের উদ্দেশ্যে এখানে 'ইতি'র সঙ্গে এটির প্রয়োগ করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, কল্যাণকামী মানুষ প্রতিটি কর্ম করার সময় ভগবানের এই 'তৎ' নাম স্মরণ করে, 'যে পরমেশ্বর থেকে এই সমস্ত জগতের উৎপত্তি, তাঁরই সব এবং তাঁরই বস্তু দ্বারা, তাঁর নির্দেশানুসারে তাঁরই জন্য আমার দ্বারা এই যজ্ঞাদি কর্ম সম্পন্ন হচ্ছে ; অতএব আমি কেবল নিমিত্তমাত্র'—এরূপ মনোভাব রেখে কল্যাণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি সর্বতোভাবে অহং-মমত্ব ত্যাগ করে কর্ম সম্পাদন করেন।

প্রশ্ন—মোক্ষলাভাকাঙ্ক্ষী সাধকগণ কর্মফলের আশা রেখে কর্ম করেন না, এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—মোক্ষকামী সাধকগণ ফলাকাঙ্ক্ষা না রেখে সমস্ত কর্ম করেন—ভগবানের এই কথার অভিপ্রায় হল যে, যাঁরা বেদের নির্দেশানুসারে বিহিত কর্ম করেন তাঁরা সকলেই ফলের ইচ্ছা বা অহং-মমত্ব ত্যাগ করেন না, কিন্তু যাঁরা কল্যাণকামী ব্যক্তি, যাঁদের পরমেশ্বরের প্রাপ্তি ব্যতীত অন্য কোনো বস্তুর প্রয়োজন নেই—তাঁরা সমস্ত কর্ম অহং, মমত্ব, আসক্তি ও ফলকামনা সর্বতোভাবে ত্যাগ করে শুধু পরমেশ্বরের জন্য তাঁরই নির্দেশানুসারে সমস্ত কর্ম করে থাকেন। এর দ্বারা ভগবান ফলকামনা ত্যাগের মহত্ত্ব জ্ঞাপন করেছেন।

সম্বন্ধ—এইরূপ 'তৎ' নাম প্রয়োগের কথা বলে এবার পরমেশ্বরের 'সৎ' নাম প্রয়োগের কথা দুটি শ্লোকে বলেছেন—

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥ ২৬

হে পার্থ ! সদ্‌ভাব ও সাধুভাব বোঝাবার জন্য 'সৎ' এই তৃতীয় ব্রহ্মবাচক শব্দ প্রয়োগ করা হয় এবং শুভকর্মেও 'সৎ' শব্দ ব্যবহৃত হয় ॥ ২৬

প্রশ্ন—'সদ্ভাব' এখানে কীসের বাচক ? এতে পরমাত্মার 'সৎ' নামের প্রয়োগ করা হয়েছে কেন ?

উত্তর—'সদ্ভাব' নিত্য ভাবের অর্থাৎ যার অস্তিত্ব সর্বদা থাকে, সেই অবিনাশী তত্ত্বের বাচক এবং সেটিই পরমেশ্বরের স্বরূপ। তাই তাকে 'সৎ' নামে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—'সাধুভাব' কোন্ ভাবের বাচক এবং এতে পরমাত্মার 'সৎ' নামের প্রয়োগ করা হয়েছে কেন ?

উত্তর—অন্তঃকরণের শুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ ভাবকে বলা হয় 'সাধুভাব'। এটি পরমেশ্বরের প্রাপ্তিতে হেতু হয়ে থাকে, তাই এতে পরমেশ্বরের 'সৎ' নাম প্রয়োগ করা হয় অর্থাৎ তাকে 'সদ্ভাব' বলা হয়।

প্রশ্ন—'প্রশস্ত কর্ম' কোন্‌টি এবং তাতে 'সৎ' শব্দ প্রয়োগ করা হয় কেন ?

উত্তর—শাস্ত্রবিহিত করার উপযুক্ত যেসব শুভকর্ম, সেগুলিই প্রশস্ত—শ্রেষ্ঠ কর্ম এবং সেগুলি নিষ্কামভাবে করলে পরমাত্মা প্রাপ্তির হেতু হয়ে থাকে ; তাই তাতে পরমাত্মার 'সৎ' নাম প্রয়োগ করা হয়, অর্থাৎ তাকে 'সৎ কর্ম' বলা হয়।

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে॥ ২৭

এবং যজ্ঞ, তপস্যা ও দানে যে স্থিতি, তাকেও 'সৎ' বলা হয় এবং ভগবৎপ্রীতির নিমিত্ত যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাকেও 'সৎ' নামে অভিহিত করা হয় ॥ ২৭

প্রশ্ন—যজ্ঞ, তপস্যা ও দান দ্বারা এখানে কোন্ যজ্ঞ, তপ ও দানের গ্রহণ নির্দেশ করা হয়েছে এবং 'স্থিতি' শব্দ কোন্ ভাবের বাচক এবং তা সৎ—একথা বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যজ্ঞ, তপস্যা ও দানের দ্বারা এখানে সাত্ত্বিক যজ্ঞ, তপ ও দানের নির্দেশ করা হয়েছে। এগুলিতে যে শ্রদ্ধা ও প্রেমপূর্বক আস্তিক্য বুদ্ধি থাকে, যাকে নিষ্ঠা বলে, তারই বাচক হল এই 'স্থিতি' শব্দটি ; এরূপ স্থিতি পরমেশ্বর প্রাপ্তিতে হেতু হয়ে থাকে, তাই তাকে 'সৎ' বলা হয়।

প্রশ্ন—'তদর্থীয়ম্' বিশেষণের সঙ্গে 'কর্ম' পদ কোন্ কর্মের বাচক এবং তাকে 'সৎ' বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যে কর্ম কেবল ভগবানের নির্দেশানুসারে তাঁরই জন্য করা হয়, যাতে কর্তার একটুও স্বার্থ থাকে না—তার বাচক হল এখানে 'তদর্থীয়ম্' বিশেষণের সঙ্গে 'কর্ম' পদটি। এরূপ কর্ম অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করে সেই ব্যক্তিকে পরমেশ্বর প্রাপ্তি করায়, তাই তাকে 'সৎ' বলে।

প্রশ্ন—'এব' প্রয়োগের কী তাৎপর্য ?

উত্তর—'এব' প্রয়োগের তাৎপর্য হল যে, এরূপ কর্মকে 'সৎ' বলা হয় ; এতে কোনো সংশয় নেই। সেই সঙ্গে এই তাৎপর্যও রয়েছে যে, এরূপ কর্মই প্রকৃতপক্ষে 'সৎ', অন্য সব কর্মের ফল অনিত্য হওয়ায়, সেগুলিকে 'সৎ' বলা যায় না।

সম্বন্ধ—এইভাবে শ্রদ্ধা-সহ করা শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ, তপ, দানাদি কর্মের মহত্ত্ব বলা হয়েছে ; এতে জিজ্ঞাসা হতে পারে যে, যেসব শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ কর্মাদি শ্রদ্ধাবিহীন হয়ে করা হয়, তার কী ফল হয় ? ভগবান এবারে এই অধ্যায়ের উপসংহার করে বলেছেন—

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ॥ ২৮

হে অর্জুন ! অশ্রদ্ধাপূর্বক করা যজ্ঞ, দান, তপস্যা বা অন্য কোনো শুভকর্মকে বলা হয় 'অসৎ' ; সেইজন্য সেইসব কর্ম ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও ফলদায়ক হয় না॥ ২৮

প্রশ্ন—শ্রদ্ধাবিহীন হয়ে করা যজ্ঞ, দান ও তপস্যা এবং অন্য সমস্ত শাস্ত্রবিহিত কর্মকে **'অসৎ'** বলার এখানে অর্থ কী এবং এগুলি ইহলোক ও পরলোকে লাভপ্রদ হয় না, এ কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও অন্যান্য শুভ কর্ম শ্রদ্ধাপূর্বক করা হলেই অন্তঃকরণের শুদ্ধিতে এবং ইহলোক ও পরলোকে ফল প্রদান করতে সমর্থ হয়। শ্রদ্ধাবিহীন হয়ে করা কর্ম ব্যর্থ হয়, তাই তাকে **'অসৎ'** এবং ইহলোকে ও পরলোকে কোথাও লাভপ্রদ নয়—এই কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—**'যৎ'** এর সঙ্গে **'কৃতম্'** পদের অর্থ যদি নিষিদ্ধ কর্ম মানা হয়, তাতে ক্ষতি কী ?

উত্তর—নিষিদ্ধ কর্ম করায় শ্রদ্ধার প্রয়োজন নেই এবং তার ফলও শ্রদ্ধার ওপর নির্ভর করে না। সেগুলি তারাই করে, যাদের শাস্ত্র, মহাপুরুষ এবং ঈশ্বরে পূর্ণ শ্রদ্ধা থাকে না এবং পাপকর্মের ফললাভে যারা বিশ্বাস করে না। তা সত্ত্বেও তাদের দুঃখরূপ ফল অবশ্যই ভোগ করতে হয়। সুতরাং এখানে **'যৎকৃতম্'** দ্বারা পাপ কর্ম গ্রহণীয় নয়। এতদ্ব্যতীত যজ্ঞ, দান ও তপরূপ শুভক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে উল্লিখিত **'যৎকৃতম্'** পদটি সেই জাতিরই কর্মের ইঙ্গিত বহন করে। সুতরাং 'এসব কর্ম ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও লাভপ্রদ হয় না'—এই কথাটি কখনো পাপকর্মের লক্ষ্য হতে পারে না, কারণ এগুলি সর্বদা দুঃখের হেতু হওয়ায় তাদের লাভপ্রদ হওয়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই। সুতরাং এখানে শ্রদ্ধাবিহীন হয়ে করা শুভ কর্মেরই প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে, অশুভ কর্মের নয়।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ

অষ্টাদশ অধ্যায়

(মোক্ষসন্ন্যাসযোগ)

অধ্যায়ের নাম জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার বন্ধন থেকে চিরতরে মুক্ত হয়ে পরমানন্দ স্বরূপ পরমাত্মাকে লাভ করার নামই মোক্ষ ; এই অধ্যায়ে পূর্বোক্ত সমস্ত অধ্যায়ের সার সংগ্রহ করে মোক্ষের উপায়স্বরূপ সাংখ্যযোগকে সন্ন্যাসের নামে এবং কর্মযোগকে ত্যাগের নামে অঙ্গ-উপাঙ্গসহ বর্ণনা করা হয়েছে, সেইজন্য এবং সাক্ষাৎ মোক্ষরূপ পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে সর্ব কর্মের সন্ন্যাস অর্থাৎ ত্যাগ করার কথা বলে উপদেশের উপসংহার করা হয়েছে (১৮।৬৬), তাইজন্যও এই অধ্যায়ের নাম রাখা হয়েছে **'মোক্ষসন্ন্যাসযোগ'**।

সংক্ষিপ্ত অধ্যায়-সার এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে অর্জুন সন্ন্যাস এবং ত্যাগের তত্ত্ব জানার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন ; দ্বিতীয় ও তৃতীয়তে ভগবান এই বিষয়ে অন্যান্য বিজ্ঞজনের মত জানিয়েছেন ; চতুর্থ ও পঞ্চমে অর্জুনকে ত্যাগের বিষয়ে নিজের সিদ্ধান্ত শুনতে বলে কর্তব্যকর্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ না করার ঔচিত্য প্রমাণ করে ষষ্ঠতে ত্যাগের সম্বন্ধে তাঁর নিশ্চিত মত বলেছেন এবং সেটি অন্য মতের থেকে উত্তম বলে জানিয়েছেন। তারপর সপ্তম, অষ্টম, নবমে ক্রমশঃ তামসিক, রাজসিক, সাত্ত্বিক ত্যাগের লক্ষণ জানিয়ে দশমে ও একাদশে সাত্ত্বিক ত্যাগীর লক্ষণসমূহ বর্ণনা করেছেন। দ্বাদশে ত্যাগী ব্যক্তিদের মহত্ত্ব প্রতিপাদন করে এই প্রসঙ্গের (ত্যাগের) উপসংহার করেছেন। পরে পঞ্চদশ পর্যন্ত অর্জুনকে সাংখ্য (সন্ন্যাসের) বিষয় শোনার জন্য বলে সাংখ্য সিদ্ধান্ত অনুসারে কর্মাদির সিদ্ধিতে অধিষ্ঠানাদি পাঁচটি কারণের বর্ণনা করেছেন এবং ষোড়শে শুদ্ধ আত্মাকে কর্তা বলে যারা মনে করে তাদের নিন্দা করে সপ্তদশে কর্তৃত্বের অভিমান রহিত হয়ে কর্মরত ব্যক্তির প্রশংসা করেছেন। অষ্টাদশে কর্ম প্রেরণা এবং কর্ম সংগ্রহের স্বরূপ জানিয়ে উনবিংশতে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তার ত্রিবিধ বিভাগ জানাবার প্রস্তাব করে বিংশতি থেকে অষ্টাবিংশতম পর্যন্ত ক্রমশঃ তার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদের বর্ণনা করেছেন। উনত্রিশতমতে বুদ্ধি ও ধৃতির ত্রিবিধ ভেদের কথা বলার প্রস্তাব করে, ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশতম পর্যন্ত ক্রমশঃ তাদের সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—তিন বিভাগের বর্ণনা করেছেন। ছত্রিশ থেকে উনচল্লিশ পর্যন্ত সুখের সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—তিন ভেদ বলে, চল্লিশতম শ্লোকে গুণাদির প্রসঙ্গের উপসংহার করে সমস্ত জগৎকে ত্রিগুণময় বলেছেন। অতঃপর একচল্লিশতমতে চারবর্ণের স্বাভাবিক কর্মের প্রসঙ্গ আরম্ভ করে বিয়াল্লিশতমতে ব্রাহ্মণের, তেতাল্লিশতমতে ক্ষত্রিয়ের এবং চুয়াল্লিশতমতে বৈশ্য ও শূদ্রের স্বাভাবিক কর্মের বর্ণনা করেছেন। পঁয়তাল্লিশতমতে নিজ নিজ বর্ণ-ধর্ম পালন দ্বারা পরম সিদ্ধি লাভের কথা বলে ছেচল্লিশতমতে তার বিধি নির্দেশ করেছেন, পরে সাতচল্লিশতম ও আটচল্লিশতমতে স্বধর্মের প্রশংসা করে তা ত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন। তারপর উনপঞ্চাশতম শ্লোক থেকে পুনরায় সাংখ্যযোগের প্রসঙ্গ আরম্ভ করে সন্ন্যাসের দ্বারা পরম সিদ্ধি লাভের কথা বলে পঞ্চাশতমতে জ্ঞানের পরানিষ্ঠা বর্ণনা করার প্রতিজ্ঞা করে একান্নতম থেকে পঞ্চান্নতম পর্যন্ত ফলসহ জ্ঞাননিষ্ঠার বর্ণনা করেছেন। তারপর ছাপ্পান্নতম থেকে আটান্নতম পর্যন্ত ভক্তিপ্রধান কর্মযোগের মহত্ত্ব ও ফলের কথা বলে অর্জুনকে সেইরূপ আচরণ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং সেই মতো আচরণ না করলে সম্ভাব্য ক্ষতির কথা জানিয়েছেন। উনষাটতম থেকে ষাটতমতে প্রকৃতির প্রাবল্যের জন্য স্বাভাবিক কর্মত্যাগে সামর্থ্যের অভাবের কথা জানিয়ে একষট্টি ও বাষট্টিতমতে বলেছেন পরমেশ্বরই সকলের নিয়ন্তা, সর্বান্তর্যামী এবং সর্বপ্রকারে তাঁর শরণাগত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তেষট্টিতমতে সেই বিষয়ের উপসংহার করে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন উপদিষ্ট সমস্ত বিষয় ভালোভাবে বিচার-বিবেচনা করে যা ভালো মনে হয়

তদনুসারে আচরণ করতে। চৌষট্টিতমতে পুনরায় সমগ্র গীতার সাররূপ সর্বগুহ্যতম রহস্য শোনার নির্দেশ দিয়েছেন। পঁয়ষট্টিতম ও ছেষট্টিতমতে অনন্য শরণাগতিরূপ সর্বগুহ্যতম উপদেশের ফলসহ বর্ণনা করে ভগবান অর্জুনকে তাঁর শরণাগত হওয়ার নির্দেশ দিয়ে গীতা উপদেশের উপসংহার করেছেন। তারপর সাতষট্টিতমতে চতুর্বিধ অনধিকারীদের গীতার উপদেশ না দেবার কথা বলে আটষট্টিতম ও উনসত্তরতমতে গীতাপ্রচারের, সত্তরতমতে গীতা অধ্যয়নের এবং একাত্তরতমতে কেবল শ্রদ্ধা সহকারে গীতা শ্রবণের মাহাত্ম্য জানিয়েছেন। বাহাত্তরতমতে ভগবান অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি একাগ্রতাসহ গীতা শুনেছেন কিনা এবং তার মোহ বিনাশ হয়েছে কিনা ! তিয়াত্তরতমতে অর্জুন তাঁর মোহনাশ এবং স্মৃতিলাভ করে সংশয়রহিত হওয়ার কথা জানিয়ে ভগবানের নির্দেশ পালন করার কথা স্বীকার করেছেন। তারপর চুয়াত্তরতম থেকে সাতাত্তরতম শ্লোক পর্যন্ত সঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথনরূপ গীতাশাস্ত্রের উপদেশের মহিমা ব্যাখ্যা করে সেই সংবাদ ও ভগবানের বিরাট রূপের স্মৃতিতে নিজের বারবার বিস্মিত ও হর্ষিত হওয়ার কথা বলেছেন এবং আটাত্তরতম শ্লোকে জানিয়েছেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন যে পক্ষে, তাঁদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী—এই কথা ঘোষণা করে অধ্যায়ের উপসংহার করেছেন।

সম্বন্ধ—দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশতম শ্লোক থেকে গীতা উপদেশের আরম্ভ হয়েছে। সেখান থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত ভগবান জ্ঞানযোগের উপদেশ প্রদান করেন এবং প্রসঙ্গবশতঃ ক্ষাত্রধর্মের দৃষ্টিতে যুদ্ধ করার কর্তব্য পালনের কথা বলে উনচল্লিশতম শ্লোক থেকে অধ্যায়ের সমাপ্তি পর্যন্ত কর্মযোগের উপদেশ দিয়েছেন, তারপর তৃতীয় অধ্যায় থেকে সপ্তদশ অধ্যায় পর্যন্ত কোথাও জ্ঞানযোগের দৃষ্টিতে, কোথাও কর্মযোগের দৃষ্টিতে ঈশ্বর লাভের অনেক সাধন-পথের নির্দেশ করেছেন। সেই সব শোনার পর অর্জুন এবার এই অষ্টাদশ অধ্যায়ে সমস্ত অধ্যায়ের উপদেশের সার জানার উদ্দেশ্যে ভগবানের কাছে সন্ন্যাস অর্থাৎ জ্ঞানযোগের এবং ত্যাগ অর্থাৎ ফলাসক্তি ত্যাগরূপ কর্মযোগের তত্ত্ব যথাযথভাবে পৃথক-পৃথকরূপে জানার ইচ্ছা প্রকট করেছেন—

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিষূদন।। ১

অর্জুন বললেন—হে মহাবাহো ! হে অন্তর্যামী ! হে বাসুদেব ! আমি সন্ন্যাস এবং ত্যাগের তত্ত্ব পৃথকভাবে জানতে ইচ্ছা করি।। ১

প্রশ্ন—এখানে **'মহাবাহো', 'হৃষীকেশ'** এবং **'কেশিনিষূদন'** এই তিন সম্বোধন প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—অর্জুনের এই সম্বোধনের তাৎপর্য হল, আপনি সর্বশক্তিমান, সর্বান্তর্যামী এবং সমস্ত দোষ বিনাশকারী সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। তাই আমি আপনার কাছ থেকে যা কিছু জানতে চাই, তা আপনি যথাযথভাবে জানেন। সুতরাং আমার প্রার্থনা অনুসারে আপনি এই বিষয়টি আমাকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিন যাতে আমি সম্পূর্ণরূপে যথাযথভাবে তা বুঝতে পারি এবং আমার সব শংকা সর্বতোভাবে নাশ হয়।

প্রশ্ন—আমি সন্ন্যাস এবং ত্যাগের তত্ত্ব পৃথকভাবে জানতে চাই, এই কথায় অর্জুনের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—উপর্যুক্ত কথার দ্বারা অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে, সন্ন্যাসের (জ্ঞানযোগের) কী স্বরূপ, এর অন্তর্নিহিত কী তাৎপর্য এবং এতে কোন্ কর্ম সহায়ক এবং কোন্গুলি বাধাস্বরূপ, উপাসনাসহ সাংখ্যযোগের এবং শুধু সাংখ্যযোগের সাধনা কীভাবে করা যায় ; এইরূপ ত্যাগের (ফলাসক্তি ত্যাগরূপ কর্মযোগের) স্বরূপ কী ; শুধুমাত্র কর্মযোগের সাধন-পথ কেমন ; এর জন্য কী করা উপযোগী, কী করা বাধাস্বরূপ ; ভক্তি-মিশ্রিত কর্মযোগ কোন্‌টি, ভক্তিপ্রধান কর্মযোগ কী, লৌকিক ও শাস্ত্রীয় কর্ম করাকালীন ভক্তিমিশ্রিত ও ভক্তি-প্রধান কর্মযোগের সাধনা কীভাবে করা হয়—এইসব বিষয় আমি ভালো করে জানতে চাই। এতদ্ব্যতীত এই দুই সাধনের

পৃথক পৃথক লক্ষণ এবং স্বরূপও আমি জানতে চাই। আপনি কৃপা করে আমাকে এই দুটি বিষয় পৃথক ভাবে বুঝিয়ে দিন যাতে একটি অপরটির সঙ্গে মিশিয়ে না ফেলি এবং দুটির পার্থক্য ভালোভাবে আমার বোধগম্য হয়।

প্রশ্ন—উপরোক্ত প্রকারে সন্ন্যাস এবং ত্যাগের তত্ত্ব বোঝাবার জন্য ভগবান কোন্ কোন্ শ্লোকে কী কী বিষয় বলেছেন ?

উত্তর—এই অধ্যায়ের তেরোতম থেকে সতেরোতম শ্লোক পর্যন্ত সন্ন্যাসের (জ্ঞানযোগের) স্বরূপ জানিয়েছেন। উনিশতম থেকে চল্লিশতম পর্যন্ত রাজসিক, তামসিক বিরোধী এবং এই সাধনের পক্ষে উপযোগী সাত্ত্বিক ভাব ও কর্মের কথা বলেছেন। পঞ্চাশতম থেকে পঞ্চান্নতম শ্লোক পর্যন্ত উপাসনাসহ সাংখ্যযোগের বিধি ও ফলের কথা বলেছেন এবং সতেরোতম শ্লোকে শুধু সাংখ্যযোগের সাধনার প্রকার জানিয়েছেন।

এইরূপে ষষ্ঠ শ্লোকে (ফলাসক্তি ত্যাগরূপ) কর্মযোগের স্বরূপ বলেছেন। নবম শ্লোকে সাত্ত্বিক ত্যাগের নামে শুধু কর্মযোগের সাধন প্রণালী বলেছেন। সাতচল্লিশ ও আটচল্লিশতম শ্লোকে এই সাধনের পক্ষে স্বধর্ম পালন উপযোগী বলেছেন। সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকে বর্ণিত তামসিক ও রাজসিক ত্যাগকে এর অন্তরায় বলে জানিয়েছেন। পঁয়তাল্লিশ ও ছেচল্লিশতম শ্লোকে ভক্তিমিশ্রিত কর্মযোগের এবং ছাপ্পান্ন থেকে ছেষট্টিতম শ্লোক পর্যন্ত ভক্তিপ্রধান কর্মযোগের বর্ণনা করা হয়েছে। ছেচল্লিশতম শ্লোকে লৌকিক ও শাস্ত্রীয় সমস্ত কর্ম করা কালে ভক্তিমিশ্রিত কর্মযোগের সাধন করার রীতি জানিয়েছেন এবং সাতান্নতম শ্লোকে ভগবান ভক্তিপ্রধান কর্মযোগের সাধন করার প্রণালী বলেছেন।

সম্বন্ধ—অর্জুনের এরূপ জিজ্ঞাসায় ভগবান তাঁর সিদ্ধান্ত জানাবার পূর্বে সন্ন্যাস ও ত্যাগের বিষয়ে দুটি শ্লোকের দ্বারা অন্যান্য বিদ্বানদের ভিন্ন ভিন্ন মত জানিয়েছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ ২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—পণ্ডিতেরা কেউ কেউ কাম্য কর্মের ত্যাগকেই সন্ন্যাস বলে জানেন, আবার অন্যান্য বিচারশীল ব্যক্তি সর্বকর্ম ফল ত্যাগকেই ত্যাগ বলে থাকেন॥ ২

প্রশ্ন—'কাম্যকর্ম' কোন্ কর্মের নাম এবং কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি সেই ত্যাগকে 'সন্ন্যাস' বলে মনে করেন, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—স্ত্রী, পুত্র, ধন ও স্বর্গ ইত্যাদি প্রিয় বস্তু প্রাপ্তি এবং রোগ-সংকট ইত্যাদি অপ্রিয় নিবৃত্তির জন্য যজ্ঞ, দান, তপস্যা, উপাসনা ইত্যাদি যেসব শুভ কর্মের শাস্ত্রে বিধান আছে অর্থাৎ যেসব কর্মের বিধানে এসব বলা হয়েছে যে অমুক ফলের ইচ্ছা হলে মানুষ এই কর্ম করবে, কিন্তু ঐ ফলের ইচ্ছা না হলে সেটি না করলে কোনো ক্ষতি নেই—এরূপ শুভ কর্মের নাম কাম্যকর্ম।

'অনেক পণ্ডিতই কাম্যকর্ম ত্যাগকে সন্ন্যাস বলে মনে করেন' ভগবানের এই কথার অভিপ্রায় হল, অন্যান্য বিদ্বানের মত হল উপরোক্ত কর্ম একেবারেই ত্যাগ করাকে সন্ন্যাস বলা হয়। তাঁদের মতে সন্ন্যাসী তাঁরাই, যাঁরা কাম্যকর্মের অনুষ্ঠান না করে শুধুমাত্র নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্তব্য-কর্মগুলিই বিধিবৎ পালন করেন।

প্রশ্ন—'সর্বকর্ম' শব্দ কোন্ কর্মগুলির বাচক এবং তার ফলত্যাগ করা কী ? বহু বিচারশীল ব্যক্তি সর্বকর্মের ফলত্যাগকে ত্যাগ বলে থাকেন, এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ঈশ্বরের ভক্তি, দেবতাদের পূজা, মাতা-পিতা-গুরুজনাদির সেবা, যজ্ঞ, দান, তপস্যা এবং বর্ণাশ্রম অনুসারে জীবিকা অর্জনের কর্ম এবং শরীর সম্বন্ধীয় খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি যত প্রকার শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্ম—অর্থাৎ যে বর্ণ ও যে আশ্রমে স্থিত মানুষের জন্য শাস্ত্রে যে কর্তব্যকর্মের বিধান রয়েছে এবং যা না করলে

নীতি, ধর্ম ও কর্মের পরম্পরাতে বাধা আসে—সেই সমস্ত কর্মের বাচক হল এই 'সর্বকর্ম' শব্দটি এবং এই সকল কর্মের ফলরূপে প্রাপ্ত স্ত্রী, পুত্র, ধন, মান, মর্যাদা, প্রতিষ্ঠা, স্বর্গসুখ ইত্যাদি ইহলোক ও পরলোকে যত ভোগ আছে—সেই সবের কামনা চিরতরে ত্যাগ করা, কোনো কর্মের সঙ্গে কোনো প্রকার ফলের সম্বন্ধ যোগ না করা, এ সবই হল উপরোক্ত সমস্ত কর্মের ফলত্যাগ করার অন্তর্গত।

'আবার কোনও বিচারশীল ব্যক্তি সমস্ত কর্মফল ত্যাগকেই ত্যাগ বলে থাকেন'—ভগবানের এই বাক্যের তাৎপর্য হল, নিত্য এবং অনিত্য বস্তুর বিচারপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তি উপরোক্ত প্রকারে সমস্ত কর্মের ফলত্যাগ করে কেবল কর্তব্যকর্মের অনুষ্ঠানের পালনকেই ত্যাগ মনে করেন, তাই তাঁরা সেইরূপ মনোভাব রেখে সমস্ত কর্তব্যকর্ম করে থাকেন।

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে।। ৩

কোনো কোনো বিদ্বান এমন কথা বলেন যে কর্মমাত্রই দোষযুক্ত, অতএব কর্মত্যাগ করা উচিত আবার অপর পণ্ডিতগণ বলেন যে, যজ্ঞ, দান ও তপস্যাকর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়।। ৩

প্রশ্ন—কোনো বিদ্বান বলেন যে কর্মমাত্রই দোষযুক্ত, তাই তা ত্যজনীয়—এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এই বাক্যের অর্থ হল, কর্মারম্ভ মাত্রেই কিছু না কিছু পাপের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়ে যায়, সুতরাং বিহিত কর্মও সর্বতোভাবে নির্দোষ নয়। এই দৃষ্টিতেই ভগবান পরে বলেছেন—**'সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ'** (১৮।৪৮) 'আরম্ভ করা সমস্ত কর্মই ধূমাবৃত অগ্নির মতো দোষযুক্ত হয়'। তাই বহু বিদ্বানদের বক্তব্য হল যে কল্যাণকামী সকল মানুষের নিত্য-নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম সবই সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা উচিত অর্থাৎ সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করা উচিত।

প্রশ্ন—অন্য বিদ্বানেরা বলেন যে যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম ত্যজনীয় নয়—এই বাক্যটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এর তাৎপর্য হল, অনেক বিদ্বানদের মতে যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম বাস্তবে দোষযুক্ত নয়। তাঁরা মনে করেন, ঐসব কর্মের প্রারম্ভে যেসব অবশ্যম্ভাবী হিংসাদি পাপ হতে দেখা যায়, তা প্রকৃতপক্ষে পাপ নয়; বরং শাস্ত্রাদি বিহিত হওয়ায় যজ্ঞ, দান, তপস্যারূপ কর্ম আসলে মানুষকে পবিত্র করে তোলে। তাই কল্যাণকামী মানুষের নিষিদ্ধ কর্মই ত্যাগ করা উচিত, শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্মসমূহ নয়।

সম্বন্ধ—এইভাবে সন্ন্যাস ও ত্যাগের বিষয়ে বিদ্বানদের ভিন্ন ভিন্ন মত জানিয়ে এবার ভগবান ত্যাগের বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত জানাচ্ছেন—

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সম্প্রকীর্তিতঃ।। ৪

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন ! সন্ন্যাস এবং ত্যাগ, এই দুটির মধ্যে প্রথমে তুমি ত্যাগের বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত শোনো। ত্যাগ তিন প্রকারের বলা হয়েছে, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক।। ৪

প্রশ্ন—এখানে **'ভরতসত্তম'** এবং **'পুরুষব্যাঘ্র'** এই দুটি বিশেষণের অর্থ কী ?

উত্তর—ভরতবংশীয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে বলা হয় **'ভরতসত্তম'** এবং পুরুষদের মধ্যে যিনি সিংহের মতো বীর, তাঁকে **'পুরুষব্যাঘ্র'** বলা হয়। ভগবানের এই দুটি সম্বোধন প্রয়োগের এই তাৎপর্য যে, তুমি ভরতবংশীয়দের মধ্যে উত্তম ও বীর পুরুষ, সুতরাং যে ত্যাগের বিষয়ে বলা হচ্ছে সেই তিন প্রকার ত্যাগের মধ্যে

তামসিক ও রাজসিক ত্যাগ না করে তুমি সাত্ত্বিক ত্যাগরূপ কর্মযোগের অনুষ্ঠান করতে সক্ষম।

প্রশ্ন—'তত্র' শব্দটির অর্থ কী এবং এখানে সেটি প্রয়োগের কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—'তত্র' কথাটির অর্থ হল উপরোক্ত দুটি বিষয়ে অর্থাৎ 'ত্যাগ' ও 'সন্ন্যাস' বিষয়ে। এটি প্রয়োগ করার অর্থ হল যে, অর্জুন ভগবানের কাছে সন্ন্যাস এবং ত্যাগ—এই দুটির তত্ত্ব বলার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, 'ঐ দুটির মধ্যে' ভগবান এখানে প্রথমে শুধু ত্যাগের তত্ত্ব বিষয়ে বলার প্রারম্ভ করেছেন। অর্জুন দুটির তত্ত্ব পৃথকভাবে বলার কথা বলেছিলেন, ভগবান তার কোনো প্রতিবাদ না করে ত্যাগের বিষয়ই বলার ইঙ্গিত করেছেন ; এতে মনে হয় যে ভগবান 'সন্ন্যাসের' প্রকরণ এর পরে আরম্ভ করবেন।

প্রশ্ন—ত্যাগের বিষয়ে তুমি আমার সিদ্ধান্ত শোনো—এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, তুমি যে দুটি বিষয় জানতে ইচ্ছা করেছ, সেই বিষয়ে আমি এখন পর্যন্ত অন্যান্যদের মতামত বলেছি। এবার আমি তোমাকে নিজের মতানুসারে ঐ দুটির মধ্যে ত্যাগের তত্ত্ব ভালোভাবে বলছি, তুমি সাবধানে শোনো।

প্রশ্ন—ত্যাগ (সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে) তিন প্রকার বলা হয়েছে, এই কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান শাস্ত্রাদিকে সম্মান জানাবার জন্য তাঁর মতকে শাস্ত্রসম্মত বলে জানিয়েছেন। অভিপ্রায় হল যে শাস্ত্রে ত্যাগকে তিন প্রকার মানা হয়েছে, সেগুলি আমি তোমাকে যথাযথরূপে জানাব।

সম্বন্ধ—এইভাবে ত্যাগের তত্ত্ব শোনার জন্য অর্জুনকে সতর্ক করে ভগবান এবার সেই ত্যাগের স্বরূপ বলার জন্য প্রথম দুটি শ্লোকে শাস্ত্রবিহিত শুভকর্ম করার বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত জানাচ্ছেন—

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥ ৫

যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়, বরং এগুলি অবশ্য করণীয়। কারণ যজ্ঞ, দান ও তপস্যা—এই তিনটিই বুদ্ধিমান পুরুষদের পবিত্র করে॥ ৫

প্রশ্ন—যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়, বরং অবশ্য কর্তব্য—এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথার দ্বারা ভগবান শাস্ত্রবিহিত কর্মকে অবশ্য কর্তব্য বলে জানিয়েছেন। অভিপ্রায় হল যে, শাস্ত্রে নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রম অনুসারে যার জন্য যে কর্মের বিধান করা হয়েছে—যাকে যে সময় যেরূপ যজ্ঞ করার জন্য, দান করার জন্য ও তপস্যা করার জন্য বলা হয়েছে—তার সেগুলি অবশ্যই করা উচিত অর্থাৎ শাস্ত্র নির্দেশ অবহেলা করা উচিত নয় ; কারণ এই রূপ ত্যাগের দ্বারা কোনোরূপ লাভ হওয়া তো দূরের কথা, বরং ক্ষতিই হয়ে থাকে। তাই মানুষের এই সব কর্মের অনুষ্ঠান অবশ্যই করা উচিত। কীভাবে এইসব অনুষ্ঠান করা উচিত, পরবর্তী শ্লোকে তা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—'মনীষিণাম্' পদ কোন্ মানুষদের বাচক এবং যজ্ঞ, দান ও তপস্যা—এই সব কর্মই তাঁদের পবিত্র করে তোলে, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—বর্ণাশ্রম অনুসারে যার জন্য যা কর্তব্যকর্মরূপে বলা হয়েছে, সেই শাস্ত্রবিহিত কর্মগুলি শাস্ত্রবিধি অনুসারে সর্বতোভাবে নিষ্কামভাবে যথাযথ অনুষ্ঠানকারী বুদ্ধিমান মুমুক্ষু ব্যক্তিদের বাচক হল এই **'মনীষিণাম্'** পদটি। তাঁদের দ্বারা অনুষ্ঠিত যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্মসকল বন্ধনকারক হয় না, অপরপক্ষে তা তাঁদের অন্তঃকরণকে পবিত্র করে তোলে ; অতএব মানুষের নিষ্কামভাবে যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম অবশ্যই করা উচিত। এই অর্থে এখানে এই কথা বলা হয়েছে যে, যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম মনীষী ব্যক্তিদের পবিত্রকারী হয়।

এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥ ৬

অতএব, হে পার্থ! যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম এবং অন্যান্য সব কর্তব্যকর্ম, আসক্তি ও ফলকামনা ত্যাগ করে অবশ্যই করা উচিত। এই হল আমার নিশ্চিত ও উত্তম মত॥ ৬

প্রশ্ন—'এতানি' পদ কোন্ কর্মগুলির বাচক, এখানে 'তু' এবং 'অপি'—এই অব্যয়গুলি প্রয়োগ করার অর্থ কী?

উত্তর—'এতানি' পদ এখানে উপরোক্ত যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্মের বাচক। সেই সঙ্গে 'তু' এবং 'অপি'—এই দুই অব্যয় পদ প্রয়োগ করে এগুলি ছাড়াও মাতা-পিতা-গুরুজনদের সেবা, বর্ণাশ্রমানুসারে জীবিকা-নির্বাহের কর্ম এবং শরীর সম্পর্কীয় খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি যত শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্ম রয়েছে—সে সবের সমাহার করা হয়েছে।

প্রশ্ন—এই সকল কর্ম আসক্তি ও ফলত্যাগ করে করা উচিত, এই কথার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—ভগবানের এই কথার তাৎপর্য হল, শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য-কর্মের অনুষ্ঠান মমতা ও আসক্তি সর্বতোভাবে ত্যাগ করে এবং তার থেকে প্রাপ্ত হওয়া ইহলোক ও পরলোকের ভোগরূপ ফলেও আসক্তি ও কামনা সর্বতোভাবে ত্যাগ করে করা উচিত। এর দ্বারা এই তাৎপর্যও বুঝতে হবে যে মুমুক্ষু ব্যক্তির কাম্যকর্ম ও নিষিদ্ধ কর্মাচরণ করা উচিত নয়।

প্রশ্ন—এটি আমার নিশ্চিত ও উত্তম মত—এই কথাটির অভিপ্রায় কী এবং আগে যে বিদ্বানদের মত বলা হয়েছিল, তার থেকে ভগবানের মতের কী বৈশিষ্ট্য?

উত্তর—এটি আমার নিশ্চিত করা উত্তম মত, এই কথার দ্বারা ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, আমার মতে একেই বলা হয় ত্যাগ; কারণ এই প্রকার কর্মে নিযুক্ত মানুষ সমস্ত কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরমপদ লাভ করেন, কর্মের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্কই থাকে না।

ওপরে বিদ্বানদের মতানুসারে যে ত্যাগ ও সন্ন্যাসের লক্ষণ বলা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ নয়। কারণ শুধুমাত্র কাম্যকর্ম বাহ্যতঃ ত্যাগ করলেও অন্যান্য নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম ও তার ফলেতে মানুষের মমতা, আসক্তি ও কামনা থাকলে, তা বন্ধনের হেতু হয়ে ওঠে। সব কর্মফলের ইচ্ছা ত্যাগ করলেও ঐসব কর্মে মমতা ও আসক্তি থাকায় সেসব বন্ধনকারক হতে পারে। অহংবোধ, মমতা, আসক্তি ও কামনা ত্যাগ না করে যদি সমস্ত কর্মকে দোষযুক্ত মনে করে কর্তব্যকর্মও বাহ্যরূপে ত্যাগ করা হয়, তাহলে মানুষ কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না; কারণ এরূপ করলে সে বিহিত-কর্ম ত্যাগরূপ প্রত্যবায়ের ভাগী হয়। তেমনই যজ্ঞ, দান, তপস্যারূপ কর্ম করতে থাকলেও যদি তাঁতে আসক্তি ও ফলকামনা ত্যাগ না হয়, তবে তা বন্ধনের কারণ হয়ে ওঠে। তাই ঐ সকল বিদ্বান কথিত সন্ন্যাস ও ত্যাগের দ্বারা মানুষ কর্মবন্ধন থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হতে পারে না। ভগবানের বক্তব্য অনুসারে সমস্ত কর্মে মমতা, আসক্তি ও ফলত্যাগ করাই হল পূর্ণ ত্যাগ। এরূপ করলে কর্মবন্ধন চিরতরে দূর হয়। কারণ কর্ম স্বরূপতঃ বন্ধনকারক নয়; তার প্রতি মমতা, আসক্তি এবং ফলের সম্বন্ধই বন্ধন-কারক হয়। ভগবানের মতের এই হল বৈশিষ্ট্য।

সম্বন্ধ—এইভাবে তাঁর সুনিশ্চিত মত জানিয়ে এবার ভগবান শাস্ত্রে কথিত তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক—এই তিন প্রকার ত্যাগের মধ্যে সাত্ত্বিক ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ এবং সেটিই কর্তব্য; অপর দুটি ত্যাগ প্রকৃত ত্যাগ নয়, সুতরাং সেরূপ ত্যাগ অবাঞ্ছনীয়—এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এবং তাঁর মত শাস্ত্রের অনুরূপ তা জানাবার জন্য তিনটি শ্লোকে ক্রমশঃ তিন প্রকার ত্যাগের লক্ষণ জানিয়ে, প্রথমে নিকৃষ্ট শ্রেণীর তামসিক ত্যাগের লক্ষণ জানাচ্ছেন—

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ॥ ৭

(নিষিদ্ধ এবং কাম্যকর্ম ত্যাগ করাই উচিত) কিন্তু নিত্যকর্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ করা উচিত নয়। মোহবশতঃ নিত্যকর্ম ত্যাগ করাকে বলা হয় তামস ত্যাগ।। ৭

প্রশ্ন—'**নিয়তস্য**' বিশেষণের সঙ্গে '**কর্মণঃ**' পদ কোন্ কর্মের বাচক এবং সেগুলি স্বরূপতঃ ত্যাগ করা উচিত নয় কেন ?

উত্তর—বর্ণ, আশ্রম, স্বভাব ও পরিস্থিতি অনুযায়ী যে ব্যক্তির জন্য যজ্ঞ, দান, তপস্যা, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, উপদেশ, যুদ্ধ, প্রজাপালন, পশুপালন, কৃষি, ব্যবসায়, সেবা ও খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি যেসব কর্ম শাস্ত্রে অবশ্য কর্তব্য বলা হয়েছে, তারজন্য সেটিই হল নির্দিষ্ট কর্ম। এরূপ কর্ম স্বরূপতঃ পরিত্যাগকারী ব্যক্তি, নিজ কর্তব্য পালন না করায় পাপভাগী হন ; কারণ এর দ্বারা কর্ম পরম্পরা নষ্ট হয়ে যায় এবং জগতে বিপ্লব (অরাজকতা) হয় (৩।২৩-২৪)। তাই নির্দিষ্ট কর্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ করা উচিত নয়।

প্রশ্ন—মোহবশতঃ সেগুলি ত্যাগ করা, তামসিক ত্যাগ। এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথার অর্থ হল যে, কোনো ব্যক্তি যদি নিজ বর্ণ, আশ্রম, স্বভাব ও পরিস্থিতি অনুসারে শাস্ত্রের বিধান করা কর্তব্যকর্ম ত্যাগকে ভ্রমবশতঃ মুক্তির কারণ মনে করে সেই হেতু পরিত্যাগ করে—তবে তার সেই ত্যাগ মোহবশতঃ হওয়ায় তাকে তামসিক ত্যাগ বলে। কেননা মোহের উৎপত্তি তমোগুণ থেকে হয় (১৪।১৩, ১৭)। তামসিক ব্যক্তিদের অধোগতি প্রাপ্তি হয় বলে বলা হয়েছে (১৪।১৮)। তাই উপরোক্ত ত্যাগ এরূপ ত্যাগ নয়, যা করলে মানুষ কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে। এটি প্রত্যবায়ের হেতু হওয়ায় অপরপক্ষে অধোগতিতে নিয়ে যায়।

সম্বন্ধ—তামসিক ত্যাগ নিরূপণ করে এবার রাজসিক ত্যাগের লক্ষণ জানাচ্ছেন—

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ।। ৮

কর্ম দুঃখকর—এই কথা ভেবে যিনি দৈহিক ক্লেশের ভয়ে কর্ম ত্যাগ করেন, তিনি এইরূপ রাজস ত্যাগ দ্বারা ত্যাগের ফল মোক্ষ লাভ করতে পারেন না।। ৮

প্রশ্ন—'যৎ' পদের সঙ্গে '**কর্ম**' পদ কোন্ কর্মের বাচক এবং তাকে দুঃখরূপ মনে করে দৈহিক ক্লেশের ভয়ে সেগুলি ত্যাগ করা কী ?

উত্তর—সপ্তম শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা সকল শাস্ত্র-বিহিত কর্তব্যকর্মের বাচক হল এখানে '**যৎ**' পদের সঙ্গে '**কর্ম**' পদটি। ঐ সকল কর্মের পালনকালে মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরের পরিশ্রম হয় ; নানাপ্রকার বিঘ্ন এসে পড়ে, অনেক সামগ্রী একত্রিত করতে হয়, দৈহিক আরাম ত্যাগ করতে হয় ; ব্রত, উপবাস ইত্যাদি দ্বারা কষ্ট সহ্য করতে হয় এবং বহুপ্রকার নিয়মাদি পালন করতে হয়—এইজন্য সমস্ত কর্মকে দুঃখরূপ মনে করে মন, ইন্দ্রিয় এবং দৈহিক ক্লেশ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং আরাম করার ইচ্ছায় যে যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি শাস্ত্রবিহিত কর্ম ত্যাগ করা হয়—একেই বলে সেগুলি দুঃখরূপ মনে করে দৈহিক কষ্টের ভয়ে সেগুলি পরিত্যাগ করা।

প্রশ্ন—তিনি এরূপ রাজস ত্যাগ করে ত্যাগের ফল লাভ করেন না—এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর অর্থ হল যে, এরূপ ভাবনায় বিহিত কর্ম ত্যাগ করে যে সন্ন্যাস নেওয়া হয়, তাকে বলে রাজস ত্যাগ ; কারণ মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরের আরামে আসক্তি হওয়া হল রজোগুণের কাজ। সুতরাং ঐরূপ ত্যাগকারী ব্যক্তি প্রকৃত ত্যাগের ফল, যা সমস্ত কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত করে পরমাত্মাকে লাভ করায়, তা পান না ; কারণ মানুষের মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরে যতক্ষণ মমতা ও আসক্তি থাকে—ততক্ষণ তিনি কোনোভাবেই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন না। তাই এই রাজস ত্যাগ নামেই ত্যাগ, প্রকৃত ত্যাগ নয়। তাই কল্যাণাকাঙ্ক্ষী সাধকদের এরূপ ত্যাগ করা উচিত নয়। এইরূপ ত্যাগে ত্যাগের ফল পাওয়া তো দূরের কথা, উল্টে বিহিত কর্ম পালন না করার জন্য পাপ হতে পারে।

সম্বন্ধ—এবার উত্তম শ্রেণীর সাত্ত্বিক ত্যাগের লক্ষণ জানাচ্ছেন—

কার্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥ ৯

হে অর্জুন ! যা শাস্ত্রবিহিত কর্ম, সেগুলি করা কর্তব্য—এই ভাব নিয়ে আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে যে কর্ম করা হয়, তাকে বলে সাত্ত্বিক ত্যাগ॥ ৯

প্রশ্ন—এখানে **'নিয়তম্'** বিশেষণের সঙ্গে **'কর্ম'** পদ কোন্ কর্মের বাচক এবং তা কর্তব্য মনে করে আসক্তি ও ফলত্যাগ করে করা কী ?

উত্তর—বর্ণ, আশ্রম, স্বভাব ও পরিস্থিতি অনুযায়ী যে ব্যক্তির জন্য যে কর্ম শাস্ত্রে অবশ্য কর্তব্য বলা হয়েছে—যার ব্যাখ্যা ষষ্ঠ শ্লোকে করা হয়েছে—সেই সমস্ত কর্মের বাচক হল এখানে **'নিয়তম্'** বিশেষণের সঙ্গে **'কর্ম'** পদটি ; সুতরাং এর দ্বারা বুঝতে হবে যে নিষিদ্ধ এবং কাম্য কর্ম নির্দিষ্ট কর্ম নয়। উপরোক্ত নির্দিষ্ট কর্ম মানুষের অবশ্যই করা উচিত। এগুলি না করলে ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করা হয়—এই ভাবে ভাবিত হয়ে ঐসব কর্মে এবং তার ফলরূপ ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত ভোগে মমতা, আসক্তি ও কামনা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে উৎসাহপূর্বক বিধিবৎ তা করতে থাকা—একেই বলে কর্তব্য মনে করে আসক্তি ও ফলত্যাগ করে সেগুলি পালন করা।

প্রশ্ন—এইরূপ কর্মানুষ্ঠানকে সাত্ত্বিক ত্যাগ বলার অভিপ্রায় কী ? কারণ এ তো কর্মত্যাগ নয় ? উল্টে কর্ম করা ?

উত্তর—এই কর্মানুষ্ঠানরূপ কর্মযোগকে সাত্ত্বিক ত্যাগ বলে ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, শাস্ত্রবিহিত আবশ্যক কর্তব্যকর্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ না করে তাতে এবং তার ফলস্বরূপ সমস্ত পদার্থে আসক্তি ও কামনা সর্বতোভাবে ত্যাগ করাই হল ভগবানের মতে প্রকৃত ত্যাগ ; কর্মের ফলরূপ ইহলোক ও পরলোকের ভোগে আসক্তি ও কামনা ত্যাগ না করে অন্য কোনোভাবে প্রেরিত হয়ে বিহিত কর্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ করা প্রকৃত ত্যাগ নয়। কারণ ত্যাগের পরিণাম হওয়া উচিত কর্ম থেকে সর্বতোভাবে সম্বন্ধবিচ্ছেদ ; এবং তা মমতা, আসক্তি ও কামনা ত্যাগের দ্বারাই হতে পারে—কেবল স্বরূপতঃ (বাহ্যতঃ) কর্মত্যাগ দ্বারা নয়। সুতরাং কর্মে আসক্তি ও ফলেচ্ছার ত্যাগই হল সাত্ত্বিক ত্যাগ।

সম্বন্ধ—উপরোক্ত প্রকারে সাত্ত্বিকত্যাগী ব্যক্তির নিষিদ্ধ ও কাম্যকর্মের স্বরূপতঃ ত্যাগে এবং কর্তব্যকর্মের পালনে কী ভাব থাকে, এই প্রশ্নে সাত্ত্বিক ত্যাগী ব্যক্তির অন্তিম স্থিতির লক্ষণ জানাচ্ছেন—

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ॥ ১০

যে ব্যক্তি অশুভ কর্মে দ্বেষ করেন না এবং শুভ কর্মে আসক্ত হন না—সেই শুদ্ধ সত্ত্বগুণযুক্ত ব্যক্তিই সংশয়রহিত, বুদ্ধিমান এবং প্রকৃত ত্যাগী॥ ১০

প্রশ্ন—**'অকুশলম্'** বিশেষণের সঙ্গে **'কর্ম'** পদ কোন্ কর্মের বাচক এবং সাত্ত্বিক ত্যাগী ব্যক্তি তাতে দ্বেষ করেন না, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এখানে **'অকুশলম্'** বিশেষণের সঙ্গে **'কর্ম'** পদটি শাস্ত্র-নিষিদ্ধ পাপকর্ম ও কাম্যকর্মের বাচক। কারণ পাপকর্ম মানুষকে নানাপ্রকার অধম-জন্ম ও নরকে নিক্ষেপ করে এবং কাম্যকর্মও ফলভোগের জন্য পুনর্জন্ম প্রদান করে। এইরূপ দুটিই বন্ধনের হেতু হওয়ায় তাদের অকুশল বলা হয়। সাত্ত্বিক ত্যাগী তাতে দ্বেষ করেন না—এই কথাটির তাৎপর্য হল, সাত্ত্বিক ত্যাগীর রাগ-দ্বেষ সর্বতোভাবে বিনাশ হওয়ায় তিনি যে নিষিদ্ধ ও কাম্যকর্ম ত্যাগ করেন, তা দ্বেষবুদ্ধিতে করেন না ; কিন্তু

অকুশল কর্ম ত্যাগ করা মানুষের কর্তব্য, এই ভাব নিয়ে লোকসংগ্রহার্থে সেগুলি ত্যাগ করেন।

প্রশ্ন—**'কুশলে'** পদ কোন্ কর্মের বাচক এবং সাত্ত্বিক ত্যাগী তাতে আসক্ত হন না, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—**'কুশলে'** পদটি এখানে শাস্ত্রবিহিত নিত্য-নৈমিত্তিক যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি শুভ কর্মের এবং বর্ণাশ্রমানুকূল সমস্ত কর্তব্যকর্মের বাচক। নিষ্কামভাবে করা উপরোক্ত কর্ম মানুষের পূর্বকৃত সঞ্চিত পাপের নাশ করে তাকে মুক্ত করতে সক্ষম, তাই এগুলিকে কুশল বলা হয়। সাত্ত্বিক ত্যাগী ঐসব কুশল কর্মে আসক্ত হন না—এই কথার তাৎপর্য হল, তিনি যে শুভ কর্মসমূহ বিধিবৎ পালন করেন, তা আসক্তিপূর্বক করেন না ; শাস্ত্রবিহিত কর্ম করা মানুষের কর্তব্য—এই ভাব নিয়ে সেই সকল কর্মে মমতা, আসক্তি ও ফলেচ্ছা ত্যাগ করে লোকসংগ্রহের জন্য তার অনুষ্ঠান করেন।

প্রশ্ন—সেই শুদ্ধ, সত্ত্বগুণযুক্ত ব্যক্তি সংশয়রহিত, বুদ্ধিমান এবং প্রকৃত ত্যাগী—এই কথার কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—অভিপ্রায় হল, এইরূপ রাগ-দ্বেষ রহিত হয়ে শুধুমাত্র কর্তব্যবুদ্ধির দ্বারা কর্ম পালন ও ত্যাগকারী শুদ্ধ-সত্ত্ব-গুণযুক্ত ব্যক্তি সংশয়রহিত হন অর্থাৎ তিনি সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত করেছেন যে এই কর্মযোগরূপ সাত্ত্বিক ত্যাগই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত করে পরমপদ প্রাপ্তির পূর্ণ সাধন। তাই তিনি হলেন বুদ্ধিমান এবং প্রকৃত ত্যাগী পুরুষ।

সম্বন্ধ—উপরোক্ত শ্লোকে সাত্ত্বিক ত্যাগীকে অর্থাৎ নিষ্কামভাবে কর্তব্যকর্মের অনুষ্ঠানকারী কর্মযোগীকে প্রকৃত ত্যাগী বলা হয়েছে। এতে প্রশ্ন হতে পারে যে, নিষিদ্ধ ও কাম্যকর্মের ন্যায় অন্য সমস্ত কর্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ করা মানুষও তাহলে প্রকৃত ত্যাগী হতে পারেন, অতএব শুধু নিষ্কামভাবে কর্ম অনুষ্ঠানকারীদেরই কেন প্রকৃত ত্যাগী বলা হয়েছে ? এর উত্তরে বলছেন—

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥ ১১

কারণ দেহাভিমানী মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে সমস্ত কর্ম ত্যাগ করা সম্ভব নয়। তাই যিনি কর্মফল ত্যাগ করেন, তাঁকেই ত্যাগী বলা হয়॥ ১১

প্রশ্ন—**'দেহভৃতা'** পদ এখানে কীসের বাচক এবং তার দ্বারা সব কর্ম সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করা সম্ভব নয়, এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যারা দেহের ধারণ-পোষণ করে, এরূপ সমস্ত মনুষ্য সমুদায়ের বাচক হল এই 'দেহভৃতা' পদটি। তাই দেহধারী কোনো মানুষের পক্ষেই সম্পূর্ণভাবে সব কর্ম ত্যাগ করা সম্ভব নয়, এই কথার তাৎপর্য হল, দেহধারী কোনো মানুষ কর্ম ছাড়া থাকতে পারেন না (৩।৫)। কারণ কর্ম না করলে শরীর-নির্বাহ হওয়া সম্ভব নয় (৩।৮)। তাই মানুষ যে কোনো আশ্রমেই থাকুন না কেন—যতক্ষণ জীবিত থাকবেন, ততক্ষণ নিজ পরিস্থিতি অনুসারে খাওয়া-দাওয়া, শোয়া-বসা, চলা-ফেরা, কথা বলা ইত্যাদি কিছু না কিছু কর্ম তো তাঁকে করতেই হবে। অতএব সম্পূর্ণভাবে সমস্ত কর্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ করা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন—**'কর্মফলত্যাগী'** পদ কোন্ মানুষের বাচক এবং যিনি কর্মফলের ত্যাগকারী তিনিই ত্যাগী, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—কর্ম এবং তার ফলে মমতা, আসক্তি ও কামনা ত্যাগ করে শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্মের অনুষ্ঠানকারী কর্মযোগীর বাচক হল এই **'কর্মফলত্যাগী'** পদটি। সুতরাং যিনি কর্মফলের ত্যাগকারী, তিনিই ত্যাগী—এই কথার তাৎপর্য হল, মানুষ মাত্রকেই কিছু না কিছু কর্ম করতেই হয়, কর্ম না করে কেউ থাকতেই পারে না ; তাই যিনি নিষিদ্ধ ও কাম্যকর্ম চিরতরে ত্যাগ করে যথাবশ্যক শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান করে থাকেন এবং সেইসকল কর্মে এবং তার ফলে মমতা, আসক্তি ও কামনা সর্বতোভাবে ত্যাগ করেন—তিনিই প্রকৃত

(নিয়ন্ত্রিত) ত্যাগী।

বাহ্যতঃ ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া সংযম করে মনে মনে বিষয়চিন্তাকারী ব্যক্তি ত্যাগী নন এবং অহং, মমতা ও আসক্তি বজায় রেখে শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি কর্তব্যকর্ম স্বরূপতঃ পরিত্যাগকারী ব্যক্তিও ত্যাগী নন।

সম্বন্ধ—পূর্বশ্লোকে বলা হয়েছে যে 'যিনি কর্মফলের ত্যাগী, তিনিই প্রকৃত ত্যাগী'। এতে প্রশ্ন হতে পারে যে, কর্মের ফল না চাইলেও কৃতকর্ম কখনো ফল না দিয়ে নষ্ট হয় না—যেমন বীজ রোপণ করলে তা সময়মতো বৃক্ষে পরিণত হয়, তেমনই কৃতকর্মের ফল কোনো না কোনো জন্মে তাকে অবশ্যই ভোগ করতে হয় ; তাই কেবল কর্মফল ত্যাগের দ্বারা মানুষ ত্যাগী অর্থাৎ 'কর্মবন্ধন থেকে রহিত' কী করে হতে পারেন ? এরূপ শঙ্কার উত্তরে জানাচ্ছেন—

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ॥ ১২

যাঁরা ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেন না, তাঁদের ভালো, মন্দ ও ভালো-মন্দ মিশ্রিত, এইরূপ তিন প্রকারের ফল মৃত্যুর পরেও হয়। কিন্তু যাঁরা কর্মফল ত্যাগ করেছেন তাঁদের কখনো কর্মফল ভোগ করতে হয় না॥ ১২

প্রশ্ন—**'অত্যাগিনাম্'** পদটি কিরূপ মনুষ্যের বাচক এবং তাঁদের কর্মগুলির ভালো-মন্দ ও মিশ্রিত—তিন প্রকার ফল কী। মৃত্যুর পরেও তাদের অবশ্যই ফল লাভ হয়—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যিনি নিজের সম্পাদিত কর্মে এবং তার ফলে মমতা, আসক্তি ও কামনা ত্যাগ করেননি এবং আসক্তি ও ফলেচ্ছাসহ সর্বপ্রকার কর্ম করেন—এরূপ সাধারণ ব্যক্তিদের বাচক হল **'অত্যাগিনাম্'** পদটি।

তাঁদের শুভ কর্মের ফলরূপে স্বর্গপ্রাপ্তি বা অন্য কোনো প্রকার জাগতিক ইষ্ট ভোগপ্রাপ্তিরূপ ফল হল ভালো ফল ; এবং পাপকর্মের ফল হল পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ ইত্যাদি তির্যক যোনি বা নরক অথবা অন্য কোনোপ্রকার দুঃখ প্রাপ্তি। এইরূপ যেসব প্রাণী মনুষ্যজন্ম লাভ করে কখনো ইষ্ট ও কখনো অনিষ্টফল ভোগ করে, তাকে বলে মিশ্রিত ফল। এই হল তাদের কর্মের তিন প্রকার ফল। মৃত্যুর পর এই তিন প্রকার ফল তাঁরা অবশ্যই লাভ করেন—এই কথার তাৎপর্য হল, ঐসব ব্যক্তিদের কর্মফল ভোগ না করা পর্যন্ত নষ্ট হয় না, জন্মজন্মান্তরে সেগুলি শুভাশুভ ফল দিতে থাকে, তাই এরূপ মানুষেরা সংসারচক্রে আবর্তিত হতে থাকেন।

প্রশ্ন—এখানে **'প্রেত্য'** পদে বলা হয়েছে যে, তাঁদের কর্মের ফল মৃত্যুর পরে লাভ হয় ; তাহলে কি জীবিতাবস্থায় তাঁদের কর্মের ফল হয় না ?

উত্তর—বর্তমান জন্মে মানুষ প্রায়শঃ পূর্বকৃত কর্মে উদ্ভূত প্রারব্ধের ফল ভোগ করে, নতুন কর্মের ফলভোগ বর্তমান জন্মে প্রায়শই হয় না ; তাই একটি মনুষ্যজন্মে কৃত কর্মের ফল অনেক জন্ম ধরে অবশ্যই ভোগ করতে হয়—এটি লক্ষ্য করানোর জন্য এখানে **'প্রেত্য'** পদটি প্রয়োগ করে মৃত্যুর পরে ফল ভোগ করার কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—**'তু'** অব্যয়ের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—কর্মফল যাঁরা ত্যাগ করেন না, তাঁদের থেকে যাঁরা কর্মফল ত্যাগ করেন, তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য প্রতিপন্ন করার জন্য এখানে **'তু'** অব্যয় ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্ন—**'সন্ন্যাসিনাম্'** পদ কোন্ ব্যক্তিদের বাচক এবং তাঁদের কখনো কর্মের ফল হয় না, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—কর্মে এবং তার ফলে মমতা, আসক্তি ও কামনা যিনি সর্বতোভাবে ত্যাগ করেছেন ; দশম শ্লোকে ত্যাগীর নামে যাঁর লক্ষণ বলা হয়েছে ; ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে যাঁর জন্য 'সন্ন্যাসী' ও 'যোগী' উভয় পদ প্রয়োগ করা হয়েছে, দ্বিতীয় অধ্যায়ের একান্নতম শ্লোকে যাঁর অনাময় পদপ্রাপ্তি হওয়ার কথা বলা হয়েছে—সেই কর্মযোগীদের বাচক হল এই **'সন্ন্যাসিনাম্'** পদ।

সুতরাং সন্ন্যাসীদের কখনো কর্মের ফল হয় না —এই কথার তাৎপর্য হল, এইভাবে কর্মফল ত্যাগ করা ত্যাগী মানুষ যত কর্ম করেন, সেগুলি ভেজে নেওয়া বীজের ন্যায় হয়, তাতে ফল উৎপন্ন করার শক্তি থাকে না ; তেমনই যজ্ঞার্থে করা নিষ্কাম কর্ম দ্বারা পূর্ব সঞ্চিত সমস্ত শুভাশুভ কর্ম বিনাশপ্রাপ্ত হয় (৪।২৩)। সেইজন্য তাঁদের ইহজন্মে বা জন্মান্তরে করা কোনো কর্মের, কোনোপ্রকার ফল, কোনো অবস্থাতে—জীবিতাবস্থায় বা মৃত্যুর পর, কখনো লাভ হয় না ; তাঁরা কর্মবন্ধন থেকে চিরতরে মুক্ত হয়ে যান।

সম্বন্ধ—অর্জুন প্রথম শ্লোকে সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব পৃথকভাবে জানার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। তার উত্তর দিতে গিয়ে ভগবান দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকে এই বিষয়ে বিদ্বানদের ভিন্ন ভিন্ন মত জানিয়ে চতুর্থ থেকে দ্বাদশ শ্লোক পর্যন্ত তাঁর নিজের মত অনুযায়ী ত্যাগের অর্থাৎ কর্মযোগের তত্ত্ব ভালোভাবে বুঝিয়েছেন ; এবার সন্ন্যাসের অর্থাৎ সাংখ্যযোগের তত্ত্ব বোঝাবার জন্য প্রথমে সাংখ্য সিদ্ধান্তের অনুসারে কর্ম-সিদ্ধির পাঁচটি কারণ জানাচ্ছেন—

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্॥ ১৩

হে মহাবাহো ! সমস্ত কর্মের সিদ্ধির এই হল পাঁচটি হেতু, যা কর্মবন্ধন থেকে মুক্তির উপায় নির্দেশকারী সাংখ্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে ; সেইগুলি তুমি আমার কাছ থেকে ভালোভাবে শোনো॥ ১৩

প্রশ্ন—'সর্বকর্মণাম্' পদ এখানে কোন্ কর্মের বাচক এবং তার সিদ্ধি কী ?

উত্তর—'সর্বকর্মণাম্' পদটি এখানে শাস্ত্রবিহিত ও নিষিদ্ধ—সর্বপ্রকার কর্মের বাচক এবং কোনো কর্ম সম্পূর্ণ হয়ে ফলোন্মুখ হওয়াই হল তার সিদ্ধ হওয়া।

প্রশ্ন—'কৃতান্তে' বিশেষণের সঙ্গে **'সাংখ্যে'** পদ কীসের বাচক এবং তাতে সমস্ত কর্ম সিদ্ধির এই পাঁচ কারণ বলা হয়েছে, সেগুলি তুমি আমার কাছ থেকে জেনে নাও—এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—কর্মাদিকে বলা হয় 'কৃত'। সুতরাং যে শাস্ত্রে কর্ম সমাপ্তির উপায় বলা হয়েছে, তার নাম 'কৃতান্ত'। 'সাংখ্য' কথাটির অর্থ হল জ্ঞান (**সম্যক্ খ্যায়তে জ্ঞায়তে পরমাত্মাঽনেনেতি সাংখ্যং তত্ত্বজ্ঞানম্**)। অতএব যে শাস্ত্রে তত্ত্বজ্ঞানের সাধনরূপ জ্ঞানযোগের প্রতিপাদন করা হয়েছে, তাকে বলা হয় সাংখ্য। তাই এখানে **'কৃতান্তে'** বিশেষণের সঙ্গে **'সাংখ্যে'** পদ সেই শাস্ত্রের বাচক বলে মনে হয়, যাতে জ্ঞানযোগের যথাযথ প্রতিপাদন করা হয়েছে এবং যাতে সমস্ত কর্ম প্রকৃতি দ্বারা সম্পাদিত এবং আত্মাকে সর্বতোভাবে অকর্তা জানিয়ে কর্ম বিনাশ করার রীতি বলা হয়েছে।

তাই এখানে সাংখ্য সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ কর্ম সিদ্ধির এই পাঁচ হেতু বলা হয়েছে, তুমি সেগুলি আমার কাছ থেকে যথাযথভাবে জেনে নাও—এই কথায় ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, আত্মার অকর্তৃত্ব প্রমাণিত করার জন্য উপরোক্ত জ্ঞানযোগের প্রতিপাদনকারী শাস্ত্রে সমস্ত কর্ম সিদ্ধির যে পাঁচটি হেতু বলা হয়েছে—যে পাঁচটির সম্বন্ধ দ্বারা সমস্ত কর্ম করা হয়, আমি সেগুলি তোমাকে বলছি ; তুমি মনোযোগ দিয়ে তা শোনো।

সম্বন্ধ—এবার সেই পাঁচটি হেতুর নাম বলছেন—

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণং চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্॥ ১৪

এই বিষয়ে অর্থাৎ কর্মের সিদ্ধিতে অধিষ্ঠান, কর্তা এবং বিভিন্ন প্রকারের করণ, নানাবিধ চেষ্টা এবং পঞ্চম কারণ হল দৈব॥ ১৪

প্রশ্ন—'অধিষ্ঠানম্' পদ এখানে কীসের বাচক ?

উত্তর—'অধিষ্ঠানম্' পদ এখানে মুখ্যতঃ করণ এবং ক্রিয়ার আধাররূপ শরীরের বাচক ; কিন্তু গৌণতঃ যজ্ঞাদি কর্মে তৎবিষয়ক ক্রিয়ার আধাররূপ ভূমি ইত্যাদির বাচক বলেও মনে করা যেতে পারে।

প্রশ্ন—'কর্তা' পদ এখানে কীসের বাচক ?

উত্তর—এখানে **'কর্তা'** পদ প্রকৃতিস্থ পুরুষের বাচক। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের একুশতম শ্লোকে একে ভোক্তা বলা হয়েছে এবং তৃতীয় অধ্যায়ের সাতাশতম শ্লোকে একেই **'অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা'** বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—'পৃথগ্বিধম্' বিশেষণের সঙ্গে **'করণম্'** পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—মন, বুদ্ধি, অহংকার হল অন্তরের করণ এবং পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়—এই হল দশটি বাইরের করণ ; এতদ্ব্যতীত আরও যেসব দ্রব্যাদি উপকরণ যজ্ঞ কর্ম করাতে সহায়ক হয়, সেসবই বাহ্য করণের অন্তর্গত। এইরূপ বিভিন্ন কর্ম করায় যতপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন দ্বার বা সহায়ক আছে, সে সবেরই বাচক হল এই **'পৃথগ্বিধম্'** বিশেষণের সঙ্গে **'করণম্'** পদটি।

প্রশ্ন—'বিবিধাঃ' এবং **'পৃথক্'**—এই দুই পদের সঙ্গে **'চেষ্টাঃ'** কীসের বাচক ?

উত্তর—একস্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া, হাত-পা ইত্যাদি অঙ্গ সঞ্চালন, শ্বাস নেওয়া-ছাড়া, চক্ষু খোলা-বন্ধ করা, মনে সংকল্প-বিকল্প হওয়া ইত্যাদি যতপ্রকার কার্য—সেই নানাপ্রকারের বিভিন্ন ধরণের সমস্ত প্রচেষ্টার বাচক হল এখানে **'বিবিধাঃ'** এবং **'পৃথক্'**—এই দুটি পদের সঙ্গে **'চেষ্টাঃ'** পদটি।

প্রশ্ন—'দৈবম্' পদ এখানে কীসের বাচক এবং তার সঙ্গে **'পঞ্চমম্'** পদ প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—পূর্বকৃত শুভাশুভ কর্মের সংস্কারের বাচক হল **'দৈবম্'** পদটি, প্রারব্ধও এর অন্তর্গত। অনেকে একে **'অদৃষ্ট'**ও বলে থাকেন। এর সঙ্গে **'পঞ্চমম্'** পদ প্রয়োগ করে 'পঞ্চ' সংখ্যার পূরণ লক্ষিত হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, পূর্বশ্লোকে যে পাঁচটি হেতু শোনার কথা বলা হয়েছে, তারমধ্যে চারটি হেতু দৈবের আগে পৃথকভাবে বলা হয়েছে। পঞ্চম হেতু হল দৈব।

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ।। ১৫

মানুষ শরীর, মন ও দেহের দ্বারা শাস্ত্রানুকূল বা অশাস্ত্রীয় যা কিছু কর্ম করে, এই পাঁচটি হল তার কারণ।। ১৫

প্রশ্ন—'নরঃ' পদটি এখানে কীসের বাচক এবং সেটি প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—'নরঃ' পদ এখানে মানুষের বাচক। এটি প্রয়োগের তাৎপর্য হল মনুষ্যদেহেই প্রাণী পাপ ও পুণ্যরূপ নতুন কর্ম করতে সক্ষম। অন্য যে সব ভোগযোনি, তাতে শুধু পূর্বকৃত কর্মের ফলই ভোগ করা যায়, নতুন কর্ম করার অধিকার তাতে নেই।

প্রশ্ন—'শরীর বাঙ্মনোভিঃ' পদে 'শরীর', 'বাক্' এবং 'মনস্' দ্বারা কাকে গ্রহণ করা হয়েছে ? এখানে এই পদ প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—উপরোক্ত পদে **'শরীর'** শব্দ দ্বারা বাক্য ছাড়াও সমস্ত ইন্দ্রিয়সহ স্থূল শরীরকে গ্রহণ করতে হবে, **'বাক্'** শব্দের দ্বারা বাক্য এবং 'মনস্' শব্দ দ্বারা সমস্ত অন্তঃকরণকে গ্রহণ করা উচিত। মানুষ যত রকমের পাপ-পুণ্য কর্ম করে, শাস্ত্রকারগণ সেসবগুলিকে কায়িক, বাচিক ও মানসিক—এই তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। সুতরাং এই পদ প্রয়োগ করে সমস্ত শুভাশুভ কর্মের সমাহার করা হয়েছে।

প্রশ্ন—'ন্যায্যম্' পদ কোন্ কর্মের বাচক ?

উত্তর—বর্ণ, আশ্রম, প্রকৃতি ও পরিস্থিতি ভেদে যার জন্য যে কর্তব্যকর্ম স্থির করা হয়েছে—সেই সকল ন্যায়-পূর্বক করা যজ্ঞ, দান, তপস্যা, বিদ্যাধ্যয়ন, যুদ্ধ, কৃষি, গোরক্ষা, ব্যবসায়, সেবা ইত্যাদি সমস্ত শাস্ত্রবিহিত কর্মের বাচক হল এই **'ন্যায্যম্'** পদটি।

প্রশ্ন—'বিপরীতম্' পদ কোন্ কর্মের বাচক ?

উত্তর—বর্ণ, আশ্রম, প্রকৃতি ও পরিস্থিতির পার্থক্যে

যার জন্য যে কর্ম শাস্ত্রে নিষেধ করা হয়েছে এবং যে কর্ম নীতি ও ধর্মের প্রতিকূল—যেমন অসত্য-ভাষণ, চুরি, ব্যভিচার, হিংসা, মদ্যপান, অভক্ষ্য-ভোজন ইত্যাদি সেই সমস্ত পাপ-কর্মের বাচক হল এই '**বিপরীতম্**' পদটি।

প্রশ্ন—'**যৎ**' পদের সঙ্গে '**কর্ম**' পদটি কীসের বাচক এবং তার কারণরূপে এই পাঁচটিকে চিহ্নিত করার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'**যৎ**' পদের সঙ্গে '**কর্ম**' পদটি এখানে মন, বাক্য ও শরীর দ্বারা করা যত পাপ ও পুণ্যকর্ম—যার জন্য জীবকে জন্ম-জন্মান্তরে ফলভোগ করতে হয়—সেইসব কর্মের বাচক। এবং 'তার এই পাঁচটি কারণ'—এই বাক্যের অর্থ হল, এই পাঁচটির সংযোগ ব্যতীত কোনো কর্ম সম্পন্ন হয় না ; শুভাশুভ যত কর্ম হয়, সেসব এই পাঁচটির সাহায্যেই হয়। এর মধ্যে কোনো একটি না থাকলে কর্ম পূর্ণ হয় না। তাই কর্তৃত্বশূন্য হয়ে সম্পাদিত কর্ম বাস্তবে কর্ম নয়, সপ্তদশ শ্লোকে এই কথা বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ—এইভাবে সাংখ্যযোগের সিদ্ধান্ত অনুসারে সমস্ত কর্মের সিদ্ধির হেতুভূত অধিষ্ঠানাদি পাঁচ কারণ নিরূপণ করে এবার, বাস্তবে আত্মার কর্মের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই, আত্মা সর্বতোভাবে শুদ্ধ, নির্বিকার ও অকর্তা—এ বিষয়টি বোঝাবার জন্য প্রথমে আত্মাকে যাঁরা কর্তা বলে মানেন, তাঁদের নিন্দা করেছেন—

তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ॥ ১৬

এরূপ সত্ত্বেও যে ব্যক্তি অশুদ্ধ বুদ্ধির জন্য কর্ম করা কালে শুদ্ধস্বরূপ আত্মাকে কর্তা বলে মনে করে, সেই মলিন বুদ্ধিসম্পন্ন অজ্ঞানী ব্যক্তি ঠিকমতো বোঝে না॥ ১৬

প্রশ্ন—এখানে '**এবম্**'-এর সঙ্গে '**সতি**' পদের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'**এবম্**'-এর সঙ্গে '**সতি**' পদ প্রয়োগের অভিপ্রায় হল, সমস্ত কর্ম সম্পন্ন হওয়ায় উপরোক্ত অধিষ্ঠানাদিই হল কারণ, সেই কর্মের সঙ্গে আত্মার বাস্তবিক কোনো সম্পর্ক নেই ; তাই কোনোভাবেই আত্মাকে কর্তা মনে করা সম্ভব নয়। তবুও মানুষ যে মূর্খতাবশতঃ নিজেকে কর্মের কর্তা বলে মনে করে, এ অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা !

প্রশ্ন—'**অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ**' কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—সৎসঙ্গ এবং সৎ-শাস্ত্রাদির অনুশীলনের দ্বারা বিবেক, বিচার এবং শম-দমাদি আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা যাঁর বুদ্ধি পরিমার্জিত হয়নি—এরূপ নিরেট অজ্ঞানী মানুষকে 'অকৃতবুদ্ধি' বলা হয়। তাই এখানে '**অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ**' পদ প্রয়োগ করে আত্মাকে কর্তা মানার হেতু বলা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে প্রকৃতপক্ষে আত্মার কর্মের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ না থাকলেও বিবেক-বিচারের শক্তি না থাকায় অজ্ঞতাবশতঃ মানুষ আত্মাকে কর্তা মনে করে থাকে।

প্রশ্ন—'**আত্মানম্**' পদের সঙ্গে '**কেবলম্**' বিশেষণ প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—'**কেবলম্**' বিশেষণ প্রয়োগ করে আত্মার প্রকৃত স্বরূপের লক্ষণ বলা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, আত্মার প্রকৃত স্বরূপ 'কেবল' অর্থাৎ সর্বতোভাবে শুদ্ধ, নির্বিকার এবং আসক্তিরহিত। শ্রুতিতেও বলা আছে যে '**অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ**' (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৩।১৫-১৬) 'এই আত্মা প্রকৃতপক্ষে সর্বথা আসক্তি-বর্জিত'। সুতরাং অসঙ্গ আত্মার কর্মের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে তাকে কর্মাদির কর্তা মনে করা একেবারেই বিপরীত ধারণা।

প্রশ্ন—'**সঃ**' কথার সঙ্গে '**দুর্মতিঃ**' বিশেষণ দিয়ে এই কথা বলার অর্থ কী যে তিনি ঠিকমতো বোঝেন না ?

উত্তর—উপরোক্তভাবে আত্মাকে কর্তা বলে মনে করা মানুষের বুদ্ধি দূষিত, তাঁর মধ্যে আত্মস্বরূপ ঠিকমতো বোঝার শক্তি নেই—এই অর্থে এখানে '**দুর্মতিঃ**' বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে। তিনি ঠিকমতো জানেন না, এই কথার তাৎপর্য হল, যিনি ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ঊনত্রিশতম শ্লোকের কথানুসারে সমস্ত কর্মকে

প্রকৃতির লীলা বলে মনে করেন, তিনিই প্রকৃত বোদ্ধা। এর বিপরীত যাঁরা আত্মাকে কর্তা বলে মনে করেন, তাঁরা অজ্ঞান ও অহংকারে মোহিত (৩।২৭), তাই তাঁদের বোঝা ভুল—ঠিক নয়।

প্রশ্ন—চতুর্দশ শ্লোকে কর্ম সম্পন্ন করার যে পাঁচটি কারণ বলা হয়েছে—তার মধ্যে অধিষ্ঠানাদি চারটি কারণই প্রকৃতিজনিত। কিন্তু 'কর্তা' রূপ পঞ্চম কারণ 'প্রকৃতিস্থ' পুরুষকে মানা হয়েছে ; আর এখানে বলা হয়েছে যে আত্মা কর্তা নন, তিনি আসক্তিরহিত। এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই বিষয়ে এই কথা বুঝতে হবে যে আত্মা প্রকৃতপক্ষে নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, নির্বিকার এবং সর্বতোভাবে আসক্তিবর্জিত ; প্রকৃতির সঙ্গে, প্রকৃতিজনিত পদার্থের সঙ্গে বা কর্মের সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নেই। কিন্তু অনাদিসিদ্ধ অবিদ্যার জন্য আসক্তিহীন আত্মাকেই এই প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত বলে প্রতীত হয়। তাই তিনি (আত্মা) প্রকৃতি দ্বারা সম্পাদিত ক্রিয়াগুলিতে মিথ্যা অহং আরোপ করে নিজেই সেই কর্মগুলির কর্তা হয়ে যান। এইভাবে কর্তা হয়ে যাওয়া পুরুষকেই বলা হয় 'প্রকৃতিস্থ' পুরুষ। তিনি যখনই প্রকৃতি দ্বারা সম্পন্ন হওয়া ক্রিয়াগুলির কর্তা হন, তখনই সেই ক্রিয়াগুলির 'কর্ম' সংজ্ঞা হয় এবং ঐসব কর্ম ফলদায়ক হয়ে যায়। তাই সেই প্রকৃতিস্থ পুরুষকে ভালো-মন্দ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ঐসব কর্মের ফল ভোগ করতে হয় (১৩।২১)। তাই চতুর্দশ শ্লোকে কর্ম সিদ্ধির পাঁচটি হেতুর মধ্যে একটি হেতু—যাকে 'কর্তা' মানা হয়েছে, তা হল প্রকৃতিস্থিত পুরুষ এবং এখানে আত্মার 'কেবল' অর্থাৎ সঙ্গরহিত, শুদ্ধ, স্বরূপের বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং তাঁকে অকর্তা বলে তাঁর প্রকৃত স্বরূপের লক্ষণ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যিনি আত্মার যথার্থ স্বরূপ জেনে যান, তাঁর কর্মে 'কর্তা'রূপ পঞ্চম হেতু থাকে না। এইজন্য তাঁর দ্বারা হওয়া কর্ম বাস্তবে 'কর্ম' সংজ্ঞাপদ বাচ্য নয়। এই বিষয়টি পরের শ্লোকে বোঝানো হয়েছে।

সম্বন্ধ—আত্মা সর্বতোভাবে শুদ্ধ, নির্বিকার এবং অকর্তা—এই বিষয়টি বোঝাবার জন্য আত্মাকে যাঁরা 'কর্তা' মনে করেন, তাঁদের নিন্দা করে এবার আত্মার প্রকৃত স্বরূপ জেনে তাঁকে যাঁরা অকর্তা মনে করেন, তাঁদের স্তুতি করছেন—

যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥ ১৭

যে ব্যক্তির অন্তঃকরণে 'আমি কর্তা' এই ভাব নেই এবং যাঁর বুদ্ধি সাংসারিক পদার্থ ও কর্মে লিপ্ত হয় না, তিনি জগতের সকলকে হত্যা করলেও প্রকৃতপক্ষে হত্যা করেন না এবং পাপেও লিপ্ত হন না॥ ১৭

প্রশ্ন—এখানে 'যস্য' পদ কীসের বাচক এবং 'আমি কর্তা'—এই ভাব না থাকা কী ?

উত্তর—এখানে 'যস্য' পদটি সমস্ত কর্মকে প্রকৃতির লীলা মনে করা সাংখ্য যোগীর বাচক। এরূপ ব্যক্তির দেহাভিমান না থাকায় কর্তৃত্ববোধের চিরতরে বিনাশ হয়ে যায়—অর্থাৎ মন, ইন্দ্রিয় ও শরীর দ্বারা করা সমস্ত ক্রিয়াতে 'আমি অমুক কর্ম করেছি, এ আমার কর্তব্য', এইরূপ মনোভাবের লেশমাত্র না থাকা—তাকেই বলা হয় 'আমি কর্তা' এই ভাব না হওয়া।

প্রশ্ন—বুদ্ধির লিপ্ত না হওয়া কী ?

উত্তর— কর্মে এবং তার ফলরূপ স্ত্রী, পুত্র, ধন, গৃহ, মান, মর্যাদা, স্বর্গসুখ ইত্যাদি ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত পদার্থে মমতা, আসক্তি ও কামনার বিনাশ হওয়া ; কোনো কর্মে বা তার ফলে নিজের কোনোরূপ সম্বন্ধ না মনে করা এবং ঐ সব কিছুকে স্বপ্নকালের কর্ম ও ভোগের মতো ক্ষণস্থায়ী, বিনাশশীল এবং কল্পিত মনে করায় অন্তঃকরণে সেগুলির সংস্কার সঞ্চয় না হওয়া—একেই বলা হয় বুদ্ধির লিপ্ত না হওয়া।

প্রশ্ন— সেই ব্যক্তি সকল লোককে হত্যা করলেও প্রকৃতপক্ষে হত্যা করেন না এবং পাপেও আবদ্ধ হন না—এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে উপরোক্ত ভাবে

আত্মস্বরূপ যথাযথভাবে জেনে যাওয়ায় যাঁর অজ্ঞান-জনিত অহংভাব চিরতরে বিনষ্ট হয়েছে ; মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও শরীরে অহংভাব-মমতা সর্বতোভাবে নাশ হয়ে যাওয়ায় তাঁর দ্বারা হওয়া কর্মে বা কর্মের ফলে যাঁর লেশমাত্রও সম্বন্ধ থাকে না—সেই ব্যক্তির মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় দ্বারা লোকসংগ্রহার্থে প্রারব্ধানুসারে যেসব কর্ম করা হয়, সেসব শাস্ত্রানুকূল ও সকলের হিতকারীই হয় ; কারণ অহং, মমতা, আসক্তি ও স্বার্থবুদ্ধির অভাব হওয়ায় পাপকর্মের আচরণের আর কোনো কারণই থাকে না। সুতরাং যেমন অগ্নি, বায়ু, জল ইত্যাদির দ্বারা প্রারব্ধবশতঃ কোনো প্রাণীর মৃত্যু হলে, তারা সেই প্রাণীর হত্যাকারী হয় না এবং সেই কর্মে আবদ্ধও হয় না—তেমনই উপরোক্ত মহাপুরুষ স্বধর্ম পালনকালে যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি শুভ কর্ম করে তার কর্তা হন না এবং তার ফলেও আবদ্ধ হন না, এতে আর বলার কী আছে। কিন্তু ক্ষত্রিয়ধর্মের পালনে অর্থাৎ কোনো কারণে অবস্থা বিশেষে সমস্ত প্রাণীর সংহাররূপ ক্রূর কর্ম করেও তিনি সেই কর্মের কর্তা হন না এবং তার ফলেও আবদ্ধ হন না। অর্থাৎ লোকদৃষ্টিতে সমস্ত কর্ম করলেও তিনি সেই কর্ম থেকে সর্বতোভাবে বন্ধনরহিত হন।

অভিপ্রায় হল যে, ভগবান যেমন সমগ্র জগতের উৎপত্তি, পালন ও সংহারাদি কার্য করেও বাস্তবে তার কর্তা নন (৪।১৩) এবং ঐ কর্মের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ নেই (৪।১৪ ; ৯।৯)—তেমনই সাংখ্যযোগীরও মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় দ্বারা হওয়া সমস্ত কর্মের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ থাকে না। একথা ঠিক যে তাঁর অন্তঃকরণ অত্যন্ত শুদ্ধ এবং অহং, মমতা, আসক্তি ও স্বার্থবুদ্ধি রহিত হওয়ায় তাঁর মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় দ্বারা রাগ-দ্বেষ ও অজ্ঞানমূলক চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাভাষণ, হিংসা, কপটাচার, দম্ভ ইত্যাদি পাপকর্ম হয় না ; তাঁর সমস্ত ক্রিয়া বর্ণাশ্রম ও পরিস্থিতি অনুসারে শাস্ত্রানুকূলই হয়ে থাকে। এতে তাঁকে কোনোপ্রকার চেষ্টা করতে হয় না। তাঁর স্বভাবই সেইভাবে গড়ে ওঠে।

সম্বন্ধ—এইভাবে সন্ন্যাসের (জ্ঞানযোগের) তত্ত্ব বোঝাবার জন্য আত্মার অকর্তৃত্ব-ভাব প্রতিপাদন করে এবার সেই অনুসারে কর্মের খুঁটিনাটি বোঝাবার জন্য কর্মপ্রেরণা ও কর্মসংগ্রহের প্রতিপাদন করেছেন—

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা।
করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ।। ১৮

জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়—এই তিনটি হল সকল কর্ম প্রবৃত্তির হেতু এবং কর্তা, করণ ও ক্রিয়া—এই তিনটি হল কর্মসংগ্রহের হেতু।। ১৮

প্রশ্ন—জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এই তিনটি পদ পৃথকভাবে কোন্ কোন্ তত্ত্বের বাচক এবং এই তিনটি কর্মপ্রবৃত্তির হেতু—এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—কোনো পদার্থের স্বরূপ যিনি নির্ধারণ করেন, তাঁকে বলা হয় 'জ্ঞাতা', তিনি যে বৃত্তির সাহায্যে বস্তুর স্বরূপ নির্ধারণ করেন, তাকে বলে 'জ্ঞান' এবং যে বস্তুর স্বরূপ নির্ধারণ করেন, তাকে বলা হয় 'জ্ঞেয়'। এই হল তিন প্রকার কর্ম প্রবৃত্তি—এই কথার দ্বারা এই ভাবার্থ প্রকাশিত হয় যে, এই তিনের সংযোগেই মানুষের কর্মে প্রবৃত্তি হয় অর্থাৎ এই তিনটির সম্বন্ধই মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে। কারণ মানুষ যখন জ্ঞান-বৃত্তি দ্বারা স্থির করেন যে অমুক বস্তুর সাহায্যে ঐ ভাবে ঐ কর্মগুলি আমাকে করতে হবে, তখন তাঁর সেই কর্মে প্রবৃত্তি হয়।

প্রশ্ন—কর্তা, করণ ও কর্ম—এই তিনটি পদ পৃথক-ভাবে কোন্ কোন্ তত্ত্বের বাচক এবং এটি হল তিন প্রকারের কর্ম সংগ্রহ, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—দেখা, শোনা, বোঝা, স্মরণ করা, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি সমস্ত কর্ম যিনি করেন, সেই প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিকে 'কর্তা' বলা হয় ; তাঁর যে মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা উপরোক্ত সমস্ত ক্রিয়া করা হয়—তার বাচক 'করণ' পদ এবং উপরোক্ত সমস্ত ক্রিয়ার বাচক হল 'কর্ম' পদ। 'এই হল তিন প্রকারের কর্ম-সংগ্রহ'—এই কথার অর্থ হল এই তিনের সংযোগেই কর্ম-সংগ্রহ হয় ; কারণ মানুষ যখন নিজে কর্তা হয়ে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদির

সাহায্যে (ক্রিয়া করে) কোনো কর্ম করেন— তখনই কর্ম সম্পন্ন হয়, এছাড়া কোনো কর্ম সম্পন্ন হতে পারে না। চতুর্দশ শ্লোকে কর্ম সিদ্ধির হেতুতে অধিষ্ঠানাদি যে পাঁচটি কারণ বলা হয়েছে, তার মধ্যে অধিষ্ঠান এবং দৈবকে বাদ দিয়ে বাকি তিনটির নাম দেওয়া হয়েছে কর্ম-সংগ্রহ ; কারণ ঐ পাঁচটির মধ্যেও উপরোক্ত তিনটি হল মুখ্য হেতু।

সম্বন্ধ—এইরূপ সাংখ্যযোগের সিদ্ধান্তের দ্বারা কর্ম-প্রেরণা ও কর্ম সংগ্রহের নিরূপণ করে এবার তত্ত্বজ্ঞানের সহায়ক সাত্ত্বিক ভাব গ্রহণ করবার জন্য এবং তার বিরুদ্ধ রাজসিক, তামসিক ভাবগুলি ত্যাগ করবার জন্য উপরোক্ত কর্মপ্রেরণা ও কর্মসংগ্রহের নামে কথিত জ্ঞানাদি থেকে জ্ঞান, কর্ম এবং কর্তার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—ক্রমানুসারে এই গুণ ত্রিবিধ পার্থক্য বলার প্রস্তাবনা করছেন—

জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি॥ ১৯

সাংখ্য শাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তাকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণের ভেদ অনুসারে তিন প্রকারের বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলিও তুমি যথাযথভাবে আমার কাছে শোনো॥ ১৯

প্রশ্ন—'**গুণসংখ্যানে**' পদ কীসের বাচক এবং তাতে গুণাদি ভেদে তিন প্রকারের বলা জ্ঞান, কর্ম ও কর্তার বিষয়ে শোনার জন্য বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যে শাস্ত্রে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণাদির সম্বন্ধে সমস্ত পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন ভেদের গণনা করা হয়েছে, সেই শাস্ত্রের বাচক হল '**গুণসংখ্যানে**' পদটি। সুতরাং তাতে উল্লিখিত গুণাদি ভেদে তিন প্রকারের জ্ঞান, কর্ম ও কর্তার কথা শোনার জন্য বলে ভগবান সেই শাস্ত্রকে এই বিষয়ে সম্মান দিয়েছেন এবং সেই কথিত উপদেশ মনোযোগ সহকারে শোনার জন্য অর্জুনকে সতর্ক করছেন।

মনে রাখতে হবে যে, জ্ঞাতা এবং কর্তা পৃথক পৃথক নয়, সেইজন্য ভগবান জ্ঞাতার পৃথক ভেদ বলেননি এবং বুদ্ধির ও ধৃতির নামে করণের ভেদ, আর সুখের নামে জ্ঞেয়র ভেদ পরে বর্ণনা করবেন। এইজন্য এখানে পূর্বোক্ত ছটির মধ্যে তিনটির ভেদ প্রথমে বলার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

সম্বন্ধ—পূর্বশ্লোকে যে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদ ক্রমশঃ বলার প্রস্তাব করা হয়েছিল—সেই অনুযায়ী প্রথমে সাত্ত্বিক জ্ঞানের লক্ষণ জানাচ্ছেন—

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥ ২০

যে জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ পৃথক পৃথকরূপে অবস্থিত সর্বভূতে একই অবিনাশী পরমাত্মতত্ত্বকে অবিভক্তরূপে সমভাবে দেখে, সেই জ্ঞানকে তুমি সাত্ত্বিক জ্ঞান বলে জানবে॥ ২০

প্রশ্ন—'**যেন**' পদ এখানে কীসের বাচক এবং তার দ্বারা পৃথক পৃথক প্রাণীতে একই অবিনাশী পরমাত্ম-তত্ত্বকে অবিভক্তরূপে দেখা কী ?

উত্তর—'**যেন**' পদ এখানে সাংখ্যযোগের সাধনার দ্বারা হওয়া সেই উপলব্ধির বাচক, যার বর্ণনা ষষ্ঠ অধ্যায়ের উনত্রিশতম শ্লোকে এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ের সাতাশতম শ্লোকে করা হয়েছে। যেমন, আকাশ-তত্ত্ব জ্ঞাত ব্যক্তি কলসী, বাড়ি, গুহা, স্বর্গ, পাতাল এবং সমস্ত বস্তুসহ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে একই আকাশ-তত্ত্ব নিরীক্ষণ করেন—তেমনই লোকদৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতীত হওয়া সমস্ত চরাচর প্রাণীতে সেই অনুভবের দ্বারা যে এক অদ্বিতীয়, অবিনাশী, নির্বিকার, জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মতত্ত্বকে বিভাগরহিত ও সমভাবে ব্যাপ্ত বলে অবলোকন করা—অর্থাৎ লোকদৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হওয়া সমস্ত প্রাণীকে এবং

নিজেকেও এক অবিনাশী পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করা—এই হল পৃথক পৃথক প্রাণীতে এক অবিনাশী পরমাত্মতত্ত্বকে বিভাগরহিতভাবে অবলোকন করা।

প্রশ্ন—এই জ্ঞানকে তুমি সাত্ত্বিক জ্ঞান বলে জেনো—এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথায় ভগবানের অভিপ্রায় হল, যাঁর অনুভব এরূপ যথার্থ, তাঁর জ্ঞানই বাস্তবে প্রকৃত জ্ঞান। সুতরাং কল্যাণকামী মানুষের এটিই লাভ করার চেষ্টা করা উচিত। এছাড়া যতপ্রকার সাংসারিক জ্ঞান আছে, সেসব নামমাত্রেই জ্ঞান, যথার্থ জ্ঞান নয়।

সম্বন্ধ—এবার রাজসিক জ্ঞানের লক্ষণ জানাচ্ছেন—

পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্‌বিধান্।
বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥ ২১

কিন্তু যে জ্ঞানের দ্বারা মানুষ বহুধা বিভক্ত সমস্ত প্রাণীতে অবস্থিত নানা ভাবকে পৃথক পৃথক রূপে দেখে, সেই জ্ঞানকে তুমি রাজস জ্ঞান বলে জানবে॥ ২১

প্রশ্ন—সমস্ত প্রাণীতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের নানা ভাব পৃথক পৃথকভাবে জানা কী ?

উত্তর—কীট, পতঙ্গ, পশু-পক্ষী, মানুষ, রাক্ষস, দেবতা ইত্যাদি যত প্রাণী—সেই সবের আত্মাকে তাদের শরীরের আকৃতি এবং স্বভাবের ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অনেক এবং পৃথক পৃথক বলে বোঝা—অর্থাৎ মনে করা যে প্রত্যেক শরীরে আত্মা পৃথক পৃথক ও অনেক এবং পরস্পর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ—এই হল সমস্ত প্রাণীতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের নানা ভাবকে পৃথকভাবে দেখা।

প্রশ্ন—ঐ জ্ঞানকে তুমি রাজস জ্ঞান বলে জানবে —এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, উপরোক্ত প্রকারের যে অনুভব, তা হল রাজস জ্ঞান। অর্থাৎ তা নামমাত্রেই জ্ঞান, প্রকৃত জ্ঞান নয়। অর্থাৎ, যেমন আকাশ-তত্ত্ব না জানা মানুষ ভিন্ন ভিন্ন কলসী, ঘট ইত্যাদিতে স্থিত আকাশকে পৃথকভাবে ছিন্ন ছিন্ন আকাশ বলে মনে করে এবং তাতে অবস্থিত সুগন্ধ-দুর্গন্ধকে তারই সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বলে মনে করে ও একের থেকে অন্যকে পৃথক ভাবে, কিন্তু তার এই মনে করা ভুল। তেমনই আত্ম-তত্ত্ব না জানায় সমস্ত প্রাণীর শরীরে পৃথক পৃথক বহু আত্মা অবস্থিত বলে মনে করাও ভ্রমমাত্র।

সম্বন্ধ—এবার তামস জ্ঞানের লক্ষণ জানাচ্ছেন—

যৎ তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্॥ ২২

কিন্তু যে জ্ঞান কোনো একটি কার্যরূপ শরীরেই সম্পূর্ণের ন্যায় আসক্ত, সেই যুক্তিবিহীন, তাত্ত্বিক অর্থরহিত ও তুচ্ছ জ্ঞানকে তামস জ্ঞান বলা হয়॥ ২২

প্রশ্ন—এখানে 'তু' পদের কী অর্থ ?

উত্তর—পূর্বোক্ত সাত্ত্বিক জ্ঞান ও রাজসিক জ্ঞানের থেকে এই জ্ঞানকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট বলার জন্য 'তু' অব্যয় প্রযুক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন—যে জ্ঞান এক কার্যরূপ শরীরেই সম্পূর্ণের ন্যায় আসক্ত—কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথার দ্বারা তামস জ্ঞানের প্রধান লক্ষণ জানানো হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, যে বিপরীত জ্ঞানের দ্বারা মানুষ প্রকৃতির কার্যরূপ শরীরকে নিজের স্বরূপ বলে মনে করে এবং সেই ধারণাবদ্ধ হয়ে

সেই ক্ষণভঙ্গুর শরীরে সর্বস্বের মতো আসক্ত হয়ে থাকে—অর্থাৎ দেহের সুখে সুখী এবং তার দুঃখে দুঃখী হয় ও তার (শরীরের) নাশকেই সর্বনাশ মনে করে, আত্মাকে তার থেকে ভিন্ন এবং সর্বব্যাপী বলে মনে করে না—সেই জ্ঞান প্রকৃত পক্ষে জ্ঞান নয়। তাই ভগবান এই শ্লোকে 'জ্ঞান' শব্দও প্রয়োগ করেননি, কারণ এটি বিপরীত জ্ঞান, বাস্তবে এটি অজ্ঞানেরই পদবাচ্য।

প্রশ্ন—এই জ্ঞানকে **'অহৈতুকম্'** অর্থাৎ যুক্তিবিহীন বলার অর্থ কী ?

উত্তর—এর অর্থ হল, এইরূপ বুদ্ধি বিবেকশীল মানুষের হয় না, অল্পবুদ্ধি মানুষও চিন্তা করলে জড় শরীর এবং চেতন আত্মার পার্থক্য বুঝতে পারে ; সুতরাং যেখানে যুক্তি ও বিবেক থাকে, সেখানে এমন জ্ঞান থাকতে পারে না।

প্রশ্ন—এই জ্ঞানকে তাত্ত্বিক অর্থরহিত ও অল্প বলার অর্থ কী ?

উত্তর—একে তাত্ত্বিক অর্থরহিত ও অল্প বলার তাৎপর্য হল, এই জ্ঞানে যা বোঝা যায়, তা যথার্থ নয় অর্থাৎ এটি বস্তুর স্বরূপকে প্রকৃতভাবে বোঝাবার জ্ঞান নয়, এটি বিপর্যয় জ্ঞান ও অত্যন্ত তুচ্ছ ; তাই এটি পরিত্যাজ্য।

প্রশ্ন—এই জ্ঞানকে তামস বলা হয়—এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথার তাৎপর্য হল, উপরোক্ত লক্ষণযুক্ত যে বিপর্যয় (বিপরীত) জ্ঞান, তা হল তামস অর্থাৎ অত্যধিক তমোগুণযুক্ত মানুষের এরূপ ধারণা হয়ে থাকে। কেননা বলা হয়েছে অজ্ঞান হল তমোগুণের কার্য।

সম্বন্ধ—এবার সাত্ত্বিক কর্মের লক্ষণ জানাচ্ছেন—

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে।। ২৩

যে কর্ম শাস্ত্রবিধির দ্বারা নির্দিষ্ট এবং কর্তৃত্বাভিমানশূন্য ব্যক্তির দ্বারা ফলাকাঙ্ক্ষারহিত ও রাগদ্বেষ-বর্জিত হয়ে করা হয়, তাকে সাত্ত্বিক কর্ম বলে।। ২৩

প্রশ্ন—**'নিয়তম্'** বিশেষণের সঙ্গে **'কর্ম'** পদ এখানে কোন্ কর্মের বাচক এবং **'নিয়তম্'** বিশেষণ প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—বর্ণ, আশ্রম, প্রকৃতি ও পরিস্থিতির জন্য যে ব্যক্তির জন্য যে কর্ম অবশ্য কর্তব্য বলা হয়েছে—সেই শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ, দান, তপস্যা, জীবিকা ও শরীর নির্বাহের সমস্ত শ্রেষ্ঠ কর্মের বাচক হল এখানে **'নিয়তম্'** বিশেষণের সঙ্গে **'কর্ম'** পদটি। **'নিয়তম্'** বিশেষণ প্রয়োগের অর্থ হল, কেবল শাস্ত্রবিহিত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্তব্যকর্মই সাত্ত্বিক হতে পারে, কাম্য কর্ম ও নিষিদ্ধ কর্ম সাত্ত্বিক হতে পারে না।

প্রশ্ন—**'সঙ্গরহিতম্'** বিশেষণের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে **'সঙ্গ'** পদের অর্থ আসক্তির অভাব নয় কারণ আসক্তির অভাব **'অরাগদ্বেষতঃ'** পদে আলাদাভাবে বলা হয়েছে। তাই এখানে যাঁরা কর্মে কর্তৃত্বের অভিমান করে সেই কর্মের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ স্থাপন করেন, তার নাম 'সঙ্গ' বলে বোঝা উচিত। আর যে কর্মে এরূপ সঙ্গ নেই, অর্থাৎ যা কর্তৃত্ব বিনা এবং দেহাভিমান ছাড়াই করা হয়—সেই কর্মগুলিকে সঙ্গরহিত কর্ম বলে জানা উচিত। সেইজন্য **'সঙ্গরহিতম্'** বিশেষণ প্রয়োগের তাৎপর্য হল, উপরোক্ত শাস্ত্রবিহিত কর্মও 'সঙ্গরহিত' হলেই সাত্ত্বিক হয়, নাহলে সেই সকল কর্মের সাত্ত্বিক সংজ্ঞা হয় না।

প্রশ্ন—**'অফলপ্রেপ্সুনা'** পদ কীসের বাচক এবং ঐরূপ পুরুষ দ্বারা রাগ-দ্বেষ ব্যতীত অনুষ্ঠিত কর্ম কীরূপ কর্মকে বলা হয় ?

উত্তর—কর্মের ফলরূপ ইহলোক ও পরলোকে যত ভোগ আছে, তাতে মমতা ও আসক্তির অভাব হওয়ায় যাঁর ঐ ভোগে বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা থাকে না, যিনি কোনো কর্মের দ্বারা নিজের কোনোরূপ স্বার্থ সিদ্ধ করতে

চান না, যিনি নিজের জন্য কোনো বস্তুর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না— এরূপ স্বার্থবুদ্ধিরহিত ব্যক্তির বাচক হল **'অফলপ্রেপ্সুনা'** পদ। এরূপ ব্যক্তি দ্বারা অনুষ্ঠিত যে সকল কর্মে কর্তার আসক্তি ও দ্বেষ নেই, অর্থাৎ যার অনুষ্ঠান রাগ-দ্বেষ ব্যতীত শুধু লোক সংগ্রহার্থে করা হয়— সেই কর্মগুলিকে বিনা রাগ-দ্বেষে অনুষ্ঠিত **'কর্ম'** বলা হয়।

প্রশ্ন—সেই কর্মকে সাত্ত্বিক বলা হয়— এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—সেই কর্মকে সাত্ত্বিক বলা হয়—এই কথার অভিপ্রায় হল যে, যে কর্মে উপরোক্ত সমস্ত লক্ষণ পূর্ণরূপে ঘটে, সেই কর্মই হল পূর্ণরূপে সাত্ত্বিক। যদি উপরোক্ত ভাবগুলির মধ্যে কোনো একটি ভাবেরও ঘাটতি থাকে, তাহলে তাঁর সাত্ত্বিকতায় ততটাই ন্যূনতা আছে বলে জানতে হবে। এছাড়া এর দ্বারা এটিও বুঝতে হবে যে সত্ত্বগুণ ও সাত্ত্বিক কর্ম দ্বারাই জ্ঞান উৎপন্ন হয় ; সুতরাং পরমাত্মার তত্ত্বের ইচ্ছাভিলাষী ব্যক্তির উপরোক্ত সাত্ত্বিক কর্মেরই আচরণ করা উচিত, রাজস-তামস আচরণ করে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত নয়।

প্রশ্ন—এই শ্লোকে বলা সাত্ত্বিক কর্মে এবং নবম শ্লোকে উদ্ধৃত সাত্ত্বিক ত্যাগে কী পার্থক্য ?

উত্তর—এই শ্লোকে সাংখ্য নিষ্ঠার দৃষ্টিতে সাত্ত্বিক কর্মের লক্ষণ বলা হয়েছে, এইজন্য **'সঙ্গরহিতম্'** পদ দ্বারা তাতে কর্তৃত্বাভিমান ও **'অরাগদ্বেষতঃ'** পদ দ্বারা তাতে রাগ-দ্বেষের অভাব দেখানো হয়েছে। কিন্তু নবম শ্লোকে কর্মযোগের দৃষ্টিতে অনুষ্ঠিত কর্মে আসক্তি ও ফলেচ্ছার ত্যাগকে সাত্ত্বিক ত্যাগ বলে জানানো হয়েছে, সেইজন্য ঐ স্থানে কর্তৃত্বের অভাবের কথা বলা হয়নি, বরং কর্তব্য বুদ্ধির দ্বারা কর্ম করার কথা বলা হয়েছে। দুটির মধ্যে এই হল পার্থক্য। উভয়েরই ফল হল তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বর-প্রাপ্তি ; সেইজন্য প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মধ্যে কোনো ভেদ নেই, শুধু আচরণের প্রকার- ভেদ রয়েছে।

সম্বন্ধ—এবার রাজস কর্মের লক্ষণ জানাচ্ছেন—

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্।। ২৪

কিন্তু যে কর্ম বহু কষ্টসাধ্য, ফলকামনাযুক্ত ও অহংকারযুক্ত পুরুষের দ্বারা করা হয়, সেই কর্মকে রাজস কর্ম বলা হয়।। ২৪

প্রশ্ন—'বহুলায়াসম্' বিশেষণের সঙ্গে **'কর্ম'** পদ কোন্ কর্মের বাচক, এই বিশেষণের এখানে প্রয়োগ করার অর্থ কী ?

উত্তর—যে সব কর্মে নানাপ্রকারের বহু ক্রিয়ার বিধান আছে এবং শরীরে অহংকার থাকায় যে কর্মগুলি মানুষ গুরুভার বলে মনে করে অত্যন্ত পরিশ্রম ও দুঃখের সঙ্গে নির্বাহ করে, সেই সমস্ত কাম্যকর্ম এবং ব্যবহারিক কর্মের বাচক হল **'বহুলায়াসম্'** পদের সঙ্গে **'কর্ম'** পদটি। এই বিশেষণ প্রয়োগ করে সাত্ত্বিক কর্ম থেকে রাজস কর্মের পার্থক্য স্পষ্ট করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, সাত্ত্বিক কর্মের আচরণকারী কর্তার শরীরে অহংকার থাকে না এবং তাঁর কর্মে কর্তৃত্ববোধও থাকে না। তাই তাঁর কোনো কর্ম (ক্রিয়া) করতে কোনো প্রকার পরিশ্রম বা ক্লেশবোধ হয় না, তাঁর কর্ম তাই আয়াসযুক্ত নয়। কিন্তু রাজস কর্মের কর্তার শরীরে অহংকার থাকায় তিনি শরীরের পরিশ্রম ও দুঃখে স্বয়ং দুঃখী হন। তাই তাঁর প্রত্যেক কর্মে পরিশ্রম বোধ হয়। এছাড়া সাত্ত্বিক কর্মের কর্তা শুধুমাত্র শাস্ত্রদৃষ্টিতে বা লোকদৃষ্টিতে কর্তব্যরূপে প্রাপ্ত কর্মই করে থাকেন, তাই তাঁর দ্বারা কর্মের বিস্তার হয় না ; কিন্তু রাজস কর্মের কর্তা আসক্তি ও কামনায় প্রেরিত হয়ে প্রতিদিন নতুন নতুন কর্মে নিয়োজিত থাকেন, এতে তাঁর কর্ম বহু বিস্তারিত হয়। সেইজন্যও **'বহুলায়াসম্'** বিশেষণ প্রয়োগ করে বহু পরিশ্রমযুক্ত কর্মকে রাজস বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—'কামেপ্সুনা' পদ কীরূপ পুরুষদের বাচক ?

উত্তর—ইন্দ্রিয়াদির ভোগে মমতা ও আসক্তি থাকায় যিনি নিরন্তর নানাপ্রকার ভোগের কামনা পোষণ করেন এবং যে কর্মই করেন তার ফলরূপে স্ত্রী, পুত্র, অর্থ,

গৃহ, মান, মর্যাদা, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ইহলোক ও পরলোকে সুখভোগ লাভের উদ্দেশ্যেই করেন—এইরূপই স্বার্থপরায়ণ পুরুষদের বাচক হল এই **'কামেপ্সুনা'** পদটি।

প্রশ্ন—**'বা'** পদ প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—**'বা'** পদ প্রয়োগের তাৎপর্য হল যে, যে কর্ম ভোগপ্রাপ্তির জন্য করা হয় তা হল রাজস, আর যাতে ভোগেচ্ছা থাকে না, কিন্তু অহংকারপূর্বক করা হয়—তাও রাজস। অভিপ্রায় হল যে, যে ব্যক্তির মধ্যে ভোগের কামনা এবং অহংকার দুই-ই থাকে, তাঁর দ্বারা করা কর্ম যে রাজসই হবে—এতে আর বলার কী আছে। কিন্তু এর মধ্যে কোনো কর্ম একটি দোষে যুক্ত হলেও সেটি রাজসই হয়।

প্রশ্ন—**'সাহঙ্কারেণ'** পদ কীরূপ মানুষের বাচক ?

উত্তর—যে ব্যক্তির মধ্যে অহং-অভিমান থাকে এবং যিনি প্রত্যেক কর্ম অহংকার-পূর্বক করেন এবং আমি অমুক কর্ম করি, আমার মতো আর কে আছে, আমি এই কাজ করতে পারি, ঐকাজ করতে পারি—যারা এই প্রকার মনোভাব পোষণ করে ও এইরূপ কথা বলে, সেই সব মানুষের বাচক হল এই **'সাহঙ্কারেণ'** পদটি।

প্রশ্ন—তাকে রাজস কর্ম বলা হয়—এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা এই অর্থ প্রকাশিত হয় যে, উপরোক্ত ভাবে কৃত কর্ম হল রাজস এবং রাজস কর্মের ফল হল দুঃখ (১৪।১৬) এবং রজোগুণ কর্মের আসক্তি দ্বারা মানুষকে আবদ্ধ করে (১৪।৭)। সুতরাং মুক্তিকামী ব্যক্তির এরূপ কর্ম করা উচিত নয়।

সম্বন্ধ—এবার তামস কর্মের লক্ষণ জানাচ্ছেন—

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনবেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে॥ ২৫

যে কর্ম পরিণাম, ক্ষতি, হিংসা ও সামর্থ্যের বিচার না করে শুধু অজ্ঞানবশতঃ আরম্ভ করা হয়—তাকে তামস কর্ম বলা হয়॥ ২৫

প্রশ্ন—পরিণাম, ক্ষতি, হিংসা ও সামর্থ্যের বিচার করা কী এবং এর বিচার না করে শুধু মোহবশতঃ কর্ম আরম্ভ করার কী অর্থ ?

উত্তর—কোনো কর্ম আরম্ভ করার আগে নিজের বুদ্ধির দ্বারা বিচার করে ভেবে নেওয়া যে, অমুক কর্ম করলে তার ভবিষ্যৎ পরিণাম অমুক প্রকার সুখ বা অমুক প্রকার দুঃখের কারণ হবে, এই হল তার পরিণাম বিচার করা। অথবা এ কথা চিন্তা করা যে অমুক কর্মে এতো অর্থ ব্যয় করতে হবে, এতো পরিশ্রম করতে হবে, এতো সময় লাগবে, অমুক অংশে ধর্মের হানি হবে এবং অমুক-অমুক প্রকারের অন্য ক্ষতি হবে—এই হল ক্ষতির বিচার করা। আর এরূপ চিন্তা করা যে, অমুক কর্ম করলে অমুক মানুষের বা অন্য প্রাণীর এত প্রকারে কষ্ট হবে, অমুক মানুষ বা অন্য প্রাণীর জীবন নষ্ট হবে—এই হল হিংসার বিচার করা। এইরূপ এও চিন্তা করা যে অমুক কর্ম করার জন্য এতো সামর্থ্যের প্রয়োজন, সুতরাং তা সম্পন্ন করার ক্ষমতা আমার মধ্যে আছে কি নেই—এ হল পৌরুষ বা সামর্থ্যের বিচার করা। এইভাবে পরিণাম, ক্ষতি, হিংসা ও পৌরুষ—এই চারটি বা চারটির মধ্যে কোনো একটিরও বিচার না করে 'যা হবে, তা দেখা যাবে' এইরূপ দুঃসাহস করে শুধু অজ্ঞতা সহকারে যে কোন কর্ম আরম্ভ করা—এই হল পরিণাম, ক্ষতি, হিংসা ও পৌরুষের বিচার না করে শুধু মোহবশতঃ কর্মের আরম্ভ করা।

প্রশ্ন—সেই কর্মকে তামস বলা হয়—এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথার তাৎপর্য হল, এরূপ চিন্তা-ভাবনা না করে যে কর্ম আরম্ভ করা হয়, সেই কর্ম তমোগুণের কার্য মোহ দ্বারা আরম্ভ করার ফলে সেটিকে তামস কর্ম বলা হয়। তামস কর্মের ফল অজ্ঞান অর্থাৎ শূকর, কুকুর, বৃক্ষ ইত্যাদি জ্ঞান বিরহিত জন্ম বা নরক প্রাপ্তি বলা হয়েছে (১৪।১৮) ; সুতরাং কল্যাণাকাঙ্ক্ষী মানুষের এরূপ কর্ম করা উচিত নয়।

সম্বন্ধ—এবার সাত্ত্বিক কর্তার লক্ষণ জানাচ্ছেন—

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে।। ২৬

যিনি অনাসক্ত, অহংকারশূন্য বাক্য কথনকারী, ধৈর্যশীল, উৎসাহযুক্ত, কার্য সিদ্ধি হওয়া বা না হওয়াতে হর্ষ-শোকাদি বিকাররহিত—তাঁকে সাত্ত্বিক কর্তা বলা হয়।। ২৬

প্রশ্ন—কেমন মানুষকে **'মুক্তসঙ্গ'** বলা হয় ?

উত্তর—যে ব্যক্তির কর্ম এবং তার ফলস্বরূপ সমস্ত ভোগে লেশমাত্রও সম্বন্ধ থাকে না—অর্থাৎ মন, ইন্দ্রিয় ও শরীর দ্বারা যা কিছু কর্ম করা হয় তাতে এবং তার ফলরূপ মান, মর্যাদা, প্রতিষ্ঠা, স্ত্রী, পুত্র, ধন, গৃহ ইত্যাদি ইহলোক ও পরলোকের সর্বপ্রকার ভোগে যাঁর একটুও মমতা, আসক্তি ও কামনা থাকে না—সেই মানুষকে **'মুক্তসঙ্গ'** বলা হয়।

প্রশ্ন—**'অনহংবাদী'** কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এবং শরীর—এই অনাত্মপদার্থে আত্মবুদ্ধি না থাকায় যিনি কোনো কর্মে কর্তৃত্বের অভিমান পোষণ করেন না এবং এই কারণে যিনি আসুরী প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের ন্যায়, 'আমি অমুক কামনা সিদ্ধ করেছি, অমুকটি সিদ্ধ করব ; আমি ঈশ্বর, ভোগী, বলবান, সুখী ; আমার মতো কে আছে, আমি যজ্ঞ করব, দান করব (১৬।১৩, ১৪, ১৫)' ইত্যাদি অহংকারী বাক্য বলেন না,—বরং সরলভাবে অভিমানশূন্য কথা বলেন—এরূপ মানুষকে বলা হয় **'অনহংবাদী'**।

প্রশ্ন—**'ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ'** পদে 'ধৃতি' ও 'উৎসাহ' কীরূপ মনোভাবের বাচক এবং এই দুটি দ্বারা যুক্ত পুরুষের লক্ষণ কী ?

উত্তর— শাস্ত্রবিহিত যে কোনও স্বধর্মপালনকালে অতি বড় বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হলেও তাতে বিচলিত না হওয়াকে বলা হয় 'ধৃতি'। এবং কর্ম-সম্পাদনে সাফল্য প্রাপ্ত না হলে বা আমার যদি ফলের ইচ্ছা না থাকে, তাহলে কর্ম করার প্রয়োজনীয়তা কী—এরূপ ধারণা করে কোনো কর্মে বিমুখ না হওয়া, এবং সফলতা প্রাপ্ত মানুষ এবং কর্মফলাকাঙ্ক্ষী মানুষ যেমন কর্ম করেন, সেইভাবে শ্রদ্ধাপূর্বক কর্ম করার জন্য উৎসুক থাকাকে বলা হয় 'উৎসাহ'। এই দুই গুণযুক্ত ব্যক্তি অতি বড় বিঘ্ন উপস্থিত হলেও নিজ কর্তব্য ত্যাগ করেন না, বরং অত্যন্ত উৎসাহপূর্বক সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে নিজ কর্তব্যে অবিচল থাকেন। এই হল তাঁর লক্ষণ।

প্রশ্ন—**'সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ নির্বিকারঃ'** এই বিশেষণ কীরূপ মানুষের বাচক ?

উত্তর—সাধারণ মানুষদের যেসব কর্মে আসক্তি হয় এবং যে সকল কর্ম তাঁরা অনুকূল ফল লাভের উপায় বলে মনে করেন, তাতে সফল হলে তাঁদের মনে অত্যন্ত আনন্দ হয় আর কোনোরূপ বাধা-বিঘ্নের দরুণ সেটি অসম্পূর্ণ হলে তাঁদের অত্যন্ত কষ্ট হয় ; তেমনই তাঁদের অন্তঃকরণে কর্মের সাফল্য-বিফলতা নিয়ে নানাপ্রকারের চিন্তা-ভাবনা হয়ে থাকে। সুতরাং অহং, মমতা, আসক্তি এবং ফলেচ্ছা না থাকায় যে ব্যক্তি কোনো কর্মে আনন্দিত হন না এবং বাধা পড়লে দুঃখিত হন না এবং যাঁর মধ্যে তদনুরূপ অন্য কোনো প্রকারের কোনো বিকার হয় না, যিনি সর্বসময় সর্বাবস্থায় সদা-সর্বদা সমভাবে থাকেন—সেইরূপ সমতাযুক্ত পুরুষের বাচক হল **'সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ নির্বিকারঃ'** বিশেষণটি।

প্রশ্ন—সেই কর্তাকে সাত্ত্বিক বলা হয়—এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তির মধ্যে উপরোক্ত সমস্ত ভাবের সমাবেশ হয়েছে, তিনি পূর্ণ সাত্ত্বিক আর যাঁর মধ্যে যে ভাবের যতটা ঘাটতি থাকে, তাঁর মধ্যে সাত্ত্বিকতার ততটাই অভাব বলে জানতে হবে। এইরূপ সাত্ত্বিক ভাব পরমাত্মার জ্ঞানকে প্রকটিত করে, তাই মুক্তিকামী ব্যক্তির সাত্ত্বিক কর্তাই হওয়া উচিত।

সম্বন্ধ—এবার রাজস কর্তার লক্ষণ জানাচ্ছেন—

রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ॥ ২৭

যে ব্যক্তি আসক্তিযুক্ত, কর্মফলাকাঙ্ক্ষী, লোভী, পরপীড়াকারী, অশুদ্ধাচারী, হর্ষ-বিষাদযুক্ত—এইরূপ কর্তাকে রাজস বলা হয়॥ ২৭

প্রশ্ন—'**রাগী**' পদ কেমন মানুষের বাচক?

উত্তর—যে ব্যক্তির কর্মে এবং তার ফলরূপ ইহলোক ও পরলোকের ভোগে মমতা ও আসক্তি থাকে—অর্থাৎ যিনি প্রতিটি কর্মে ও তার ফলে আসক্ত থাকেন—সেইরূপ ব্যক্তিদের বলা হয় 'রাগী' (আসক্তি-যুক্ত)।

প্রশ্ন—'**কর্মফলপ্রেপ্সুঃ**' পদ কীরূপ মানুষের বাচক?

উত্তর—যিনি কর্মের ফলরূপ স্ত্রী, পুত্র, ধন, গৃহ, মান, মর্যাদা, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ইহলোক ও পরলোকের নানাপ্রকার ভোগের আকাঙ্ক্ষা করেন এবং যে কর্মই করেন, তা ভোগপ্রাপ্তির জন্যই করেন—এরূপ স্বার্থপরায়ণ ব্যক্তিদের বাচক হল '**কর্মফলপ্রেপ্সুঃ**' পদ।

প্রশ্ন—'**লুব্ধঃ**' পদ কীরূপ মানুষের বাচক?

উত্তর—ধনাদি পদার্থে আসক্তি থাকায় যিনি ন্যায়তঃ প্রয়োজন অনুসার নিজ শক্তি অনুযায়ী অর্থব্যয় করেন না এবং ন্যায়-অন্যায় বিচার না করে সর্বদা অর্থসংগ্রহের ইচ্ছাপোষণ করেন, এমনকি অপরের স্বত্ব কেড়ে নেওয়ারও চেষ্টা করেন—সেইরূপ লোভী মানুষের বাচক হল এই 'লুব্ধঃ' পদটি।

প্রশ্ন—'**হিংসাত্মকঃ**' পদ কীরূপ মানুষের বাচক?

উত্তর—যাঁর যে কোনোভাবেই অপরকে কষ্ট দেওয়ার স্বভাব, যিনি নিজের ইচ্ছাপূরণের জন্য রাগ-দ্বেষপূর্বক কর্ম করার সময় অন্যের কষ্টের কথা একটুও না ভেবে নিজের আরাম ও ভোগের জন্য অপরকে কষ্ট দিতে থাকেন—সেই হিংসাপরায়ণ ব্যক্তিদের বাচক হল এই '**হিংসাত্মকঃ**' পদটি।

প্রশ্ন—'**অশুচিঃ**' পদ কীরূপ মানুষের বাচক?

উত্তর—যাঁর মধ্যে বাহ্যশুচি ও সদাচারের অভাব থাকে অর্থাৎ যিনি শাস্ত্রবিধি অনুসারে জল-মৃত্তিকা দ্বারা দেহ ও বস্ত্র শুদ্ধ রাখেন না এবং যথাযোগ্য ব্যবহারকালে নিজের আচরণও শুদ্ধ রাখেন না এবং ভোগাদিতে আসক্ত হয়ে নানাপ্রকার ভোগপ্রাপ্তির জন্য শৌচাচার ও সদাচার পরিত্যাগ করেন, সেইসব ব্যক্তির বাচক হল '**অশুচিঃ**' পদটি।

প্রশ্ন—'**হর্ষশোকান্বিতঃ**' পদ কীরূপ মানুষের বাচক?

উত্তর—প্রত্যেক ক্রিয়া এবং তার ফলে রাগ-দ্বেষ থাকায় প্রতিটি কর্ম করার সময় এবং প্রত্যেক ঘটনাতে যিনি কখনো আনন্দিত ও কখনো দুঃখিত হন—এইরূপ যাঁর অন্তঃকরণে সর্বদা হর্ষ-বিষাদ হতে থাকে, সেইসব মানুষের বাচক হল এই '**হর্ষশোকান্বিতঃ**' পদটি।

প্রশ্ন—সেই কর্তাকে রাজস বলা হয়—এই কথার অর্থ কী?

উত্তর—এই কথার তাৎপর্য হল, যে ব্যক্তি উপরোক্ত সমস্ত ভাবযুক্ত অথবা এর মধ্যের কয়েকটি ভাবে যুক্ত হয়েও কর্ম করেন, তিনি 'রাজস কর্তা'। রাজস কর্তা-র বারংবার জন্ম-জন্মান্তর ধরে জন্ম-মৃত্যু হতে থাকে, তিনি সংসারচক্র থেকে মুক্ত হন না। তাই মুক্তিকামী ব্যক্তিদের 'রাজস কর্তা' হওয়া উচিত নয়।

সম্বন্ধ—এবার তামস কর্তার লক্ষণ জানাচ্ছেন—

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠোঽনৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে॥ ২৮

যিনি অযুক্ত, শিক্ষারহিত, দাম্ভিক, ধূর্ত, অন্যের জীবিকা নাশক, বিষণ্ণ, অলস ও দীর্ঘসূত্রী—তাঁকে তামস কর্তা বলা হয়॥ ২৮

প্রশ্ন—'**অযুক্তঃ**' পদ কীরূপ মানুষের বাচক ?

উত্তর—যাঁর মন ও ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত নয়, বরং তিনিই ঐগুলির বশে থাকেন, যাঁর মধ্যে শ্রদ্ধা ও আস্তিকতার অভাব থাকে— সেরূপ ব্যক্তির বাচক হল '**অযুক্তঃ**' পদ।

প্রশ্ন—'**প্রাকৃতঃ**' পদ কীরূপ মানুষের বাচক ?

উত্তর—যাঁর কোনোপ্রকার সুশিক্ষা নেই, যাঁর স্বভাব অপরিণত বুদ্ধি বালকের ন্যায়, যাঁর কোনো কর্তব্য জ্ঞান নেই (১৬।৭), যাঁর অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদির সংশোধন হয়নি—এরূপ সংস্কারবর্জিত স্বাভাবিক মূর্খের বাচক হল '**প্রাকৃতঃ**' পদ।

প্রশ্ন—'**স্তব্ধঃ**' পদ কীরূপ মানুষের বাচক ?

উত্তর—যাঁর স্বভাব অত্যন্ত কঠোর এবং যাঁর মধ্যে বিনয়ের অত্যন্ত অভাব, যিনি সর্বদা দম্ভে পূর্ণ থাকেন —নিজের সমকক্ষ বলে কাউকে মনে করেন না—এরূপ দাম্ভিক ব্যক্তির বাচক হল '**স্তব্ধঃ**' পদ।

প্রশ্ন—'**শঠঃ**' পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—যিনি অপরকে ঠকান—প্রবঞ্চক, বিদ্বেষকে লুকিয়ে গুপ্তভাবে অপরের ক্ষতি করেন, যিনি অন্যের অনিষ্ট করার কথা মনে মনে ভেবে নানা পরিকল্পনা করতে থাকেন, সেই ধূর্ত ব্যক্তিদের বাচক হল এই '**শঠঃ**' পদটি।

প্রশ্ন—'**নৈষ্কৃতিকঃ**' পদ কীরূপ মানুষের বাচক ?

উত্তর—যিনি নানাভাবে অন্যের জীবিকা নষ্ট করেন, অপরের জীবিকায় বাধা দেওয়াই যাঁর স্বভাব —এরূপ মানুষের বাচক হল '**নৈষ্কৃতিকঃ**' পদ।

প্রশ্ন—'**অলসঃ**' পদ কীরূপ মানুষের বাচক ?

উত্তর—যাঁর দিন রাত শুয়ে-বসে থাকারই স্বভাব, কোনো শাস্ত্রীয় ও ব্যবহারিক কর্তব্য-কর্মে যাঁর প্রবৃত্তি ও উৎসাহ নেই, যাঁর অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয় আলস্যে পূর্ণ—এরূপ অলস ব্যক্তিদের বাচক হল '**অলসঃ**' পদ।

প্রশ্ন—'**বিষাদী**' কাকে বলা হয় ?

উত্তর—যিনি দিন-রাত শোকমগ্ন হয়ে থাকেন, যাঁর চিন্তার কোনো অন্ত নেই (১৬।১১)—এরূপ চিন্তাপরায়ণ ব্যক্তিকে '**বিষাদী**' বলা হয়।

প্রশ্ন—'**দীর্ঘসূত্রী**' কাকে বলে ?

উত্তর—কোনো কাজ আরম্ভ করে যে বহুদিন ধরে তা শেষ করে না—আজ করব, কাল করব, এরূপ চিন্তা করতে করতে একদিনের করা কাজকে বহুদিন ধরে বিলম্ব করতে থাকে এবং তবুও তা সম্পূর্ণ করতে পারে না—এরূপ শিথিল প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিকে বলা হয় '**দীর্ঘসূত্রী**'।

প্রশ্ন—সেই ব্যক্তিকে তামস বলা হয়, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথার তাৎপর্য হল উপরোক্ত বিশেষণ-যুক্ত সকল অবগুণই হল তমোগুণের ধর্ম। সুতরাং যে ব্যক্তির মধ্যে উপরোক্ত সমস্ত লক্ষণ দেখা যায় বা কয়েকটি লক্ষণও দেখা যায়, তাকে তামস কর্তা বলে জানতে হবে। তামসিক ব্যক্তিদের অধোগতি হয় (১৪।১৮) ; তারা নানাপ্রকার পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি নীচজন্ম প্রাপ্ত হয় (১৪।১৫)—সুতরাং কল্যাণ আকাঙ্ক্ষাকারী ব্যক্তির নিজের মধ্যে কোনোরূপ তামসিক লক্ষণ থাকতে দেওয়া উচিত নয়।

সম্বন্ধ—এইভাবে তত্ত্বজ্ঞানে সহায়ক সাত্ত্বিক ভাব গ্রহণ করানোর জন্য এবং এর বিরোধী রাজস-তামস ভাব ত্যাগ করাবার জন্য কর্মপ্রেরণা ও কর্মসংগ্রহের মধ্যে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তার সাত্ত্বিকাদি ক্রমান্বয়ে তিন প্রকার ভেদ জানিয়ে এবার বুদ্ধি ও ধৃতির ক্রমশঃ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এইরূপ ত্রিবিধ পার্থক্য জানাবার প্রস্তাবনা করছেন—

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয়॥ ২৯

হে ধনঞ্জয় ! তুমি এবার বুদ্ধি ও ধৃতির গুণানুসারে তিন প্রকারের পার্থক্য আমার থেকে বিভাগপূর্বক সম্পূর্ণভাবে শোনো॥ ২৯

প্রশ্ন—এই শ্লোকে 'বুদ্ধি' ও 'ধৃতি' শব্দ কীসের বাচক এবং সেগুলির গুণাদি অনুসারে তিন প্রকারের ভেদ সম্পূর্ণভাবে বিভাগপূর্বক শোনার জন্য বলার তাৎপর্য কী ?

উত্তর—'বুদ্ধি' শব্দটি এখানে নিশ্চয়কারী শক্তি বিশেষের বাচক, একে অন্তঃকরণও বলা হয়। কুড়ি, একুশ ও বাইশতম শ্লোকে যে জ্ঞানের তিন ভেদ বলা হয়েছে, তা বুদ্ধি থেকে উৎপন্ন জ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধির বৃত্তিবিশেষ এবং এখানে কথিত বুদ্ধি হল তার কারণ। অষ্টাদশ শ্লোকে 'জ্ঞান' শব্দ কর্মপ্রেরণার অন্তর্গত হয়েছে এবং বুদ্ধিকে 'করণ' নামে কর্মসংগ্রহে গ্রহণ করা হয়েছে, জ্ঞান ও বুদ্ধির এই হল পার্থক্য। এখানে কর্ম-সংগ্রহে বর্ণিত করণগুলির সাত্ত্বিক-রাজসিক-তামসিক পার্থক্যগুলি ভালোভাবে বোঝাবার জন্য প্রধান 'করণ' বুদ্ধির তিনটি ভেদ বলা হয়েছে।

'ধৃতি' শব্দ ধারণা করার শক্তি বিশেষের বাচক, এটিও বুদ্ধিরই বৃত্তি বিশেষ। মানুষ কোনো ক্রিয়া বা ভাবকে এই শক্তির দ্বারা দৃঢ়তাপূর্বক ধারণ করে। সেইজন্য সেটি 'করণের'ই অন্তর্গত। ছাব্বিশতম শ্লোকে সাত্ত্বিক কর্তার লক্ষণে 'ধৃতি' শব্দের প্রয়োগ হয়েছিল, এতে মনে হতে পারে যে 'ধৃতি' শুধু সাত্ত্বিকই হয় ; কিন্তু তা নয়, এরও তিনটি ভাগ হয়—এই কথা বোঝাবার জন্য এই প্রকরণে 'ধৃতি'র তিনটি ভেদের কথা বলা হয়েছে।

এখানে গুণাদি অনুসারে বুদ্ধি ও ধৃতির তিনটি ভেদ সম্পূর্ণভাবে বিভাগপূর্বক শোনার জন্য বলে ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, আমি তোমাকে বুদ্ধিতত্ত্ব ও ধৃতিতত্ত্বের লক্ষণ—যা সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের সম্বন্ধে তিন প্রকারের হয়—সম্পূর্ণভাবে পৃথক পৃথক জানাচ্ছি। অতএব সাত্ত্বিক বুদ্ধি ও সাত্ত্বিক ধৃতি ধারণ এবং রাজস-তামস বুদ্ধি ও ধৃতি ত্যাগ করার জন্য তুমি এই দুটি তত্ত্বের সমস্ত লক্ষণসমূহ সাবধানতার সঙ্গে শোনো।

সম্বন্ধ—পূর্বশ্লোকে যে বুদ্ধি ও ধৃতির সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক তিনপ্রকার পার্থক্য ক্রমশঃ জানাবার প্রস্তাব করেছিলেন, সেই অনুসারে প্রথমে সাত্ত্বিক বুদ্ধির লক্ষণ বলছেন—

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥ ৩০

হে পার্থ ! যে বুদ্ধির দ্বারা প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ, কর্তব্য ও অকর্তব্য, ভয় ও অভয়, বন্ধন ও মোক্ষকে ঠিকমতো জানা যায়—তা হল সাত্ত্বিকী বুদ্ধি।। ৩০

প্রশ্ন—'প্রবৃত্তিমার্গ' কোন্ মার্গকে বলে, তাকে ঠিকমতো জানা কী ?

উত্তর—গৃহস্থ-বাণপ্রস্থাদি আশ্রমে থেকে মমতা, আসক্তি, অহংকার ও ফলেচ্ছা ত্যাগ করে ঈশ্বর লাভের জন্য তাঁর উপাসনা করা এবং নিজ বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুসারে শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ, দান, তপস্যা ইত্যাদি শুভ কর্ম, জীবিকা-কর্ম ও শরীর-সম্বন্ধীয় খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি কর্মগুলি নিষ্কাম ভাবপূর্বক আচরণরূপ যে পরমাত্মা প্রাপ্ত করার মার্গ—তা হল প্রবৃত্তিমার্গ। আর রাজা জনক, অম্বরীষ, মহর্ষি বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্যের মতো সেই মার্গকে ঠিকমতো জেনে সেই অনুসারে চলাই হল তাকে যথার্থরূপে জানা।

প্রশ্ন—'নিবৃত্তিমার্গ' কাকে বলে এবং তা যথার্থ জানা কী ?

উত্তর—সমস্ত কর্ম ও ভোগকে বাইরে থেকে ও ভেতর থেকে সর্বতোভাবে ত্যাগ করে সন্ন্যাস আশ্রমে থেকে ঈশ্বর লাভের জন্য সর্বপ্রকার সাংসারিক প্রপঞ্চ থেকে উপরত হয়ে অহং, মমতা ও আসক্তি ত্যাগপূর্বক শম, দম, তিতিক্ষা ইত্যাদি সাধনার দ্বারা নিরন্তর শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করা বা শুধু ভগবানের ভজন, স্মরণ, কীর্তনাদিতে ব্যাপৃত থাকা—এইরূপ পরমাত্মাকে লাভ করার যে মার্গ, তার নাম নিবৃত্তিমার্গ। শ্রী সনক, নারদ, ঋষভদেব ও শুকদেবের ন্যায় সেই মার্গকে ঠিকমতো জেনে সেই অনুসারে চলা হল তাকে যথার্থভাবে জানা।

প্রশ্ন—'কর্তব্য' কী এবং 'অকর্তব্য' কী ? এই দুটিকে জানার অর্থ কী ?

উত্তর—বর্ণ, আশ্রম, প্রকৃতি, পরিস্থিতি এবং দেশ-কাল অনুসারে যার জন্য যে সময়ে, যে কর্ম করা উচিত—সেটিই হল তার কর্তব্য এবং যে সময়, যার জন্য যে কর্ম ত্যাজ্য সেটিই হল তার অকর্তব্য। এই দুটি যথাযথভাবে বুঝে নেওয়া অর্থাৎ কোনো কর্ম উপস্থিত হলে, সেটি আমার কর্তব্য না অকর্তব্য, এটি যথার্থরূপে স্থির করাই হল কর্তব্য ও অকর্তব্য যথার্থ ভাবে জানা।

প্রশ্ন—'ভয়' কী এবং 'অভয়' কাকে বলা হয় ? এই দুটিকে যথার্থ জানা কী ?

উত্তর—কোনো দুঃখপ্রদ বস্তু বা ঘটনা উপস্থিত হলে বা তার সম্ভাবনা হলে মানুষের অন্তঃকরণে যে এক আকুলতাপূর্ণ কম্পবৃত্তির উদ্ভব হয়, তাকে বলে 'ভয়' এবং এর বিপরীত যে ভয় না থাকার বৃত্তি, তাকে বলা হয় 'অভয়'। এই দুটির তত্ত্ব জেনে নেওয়া অর্থাৎ ভয় কী এবং অভয় কাকে বলে, কোন্ কোন্ কারণে মানুষের ভয় হয় আর কীভাবে তা নিবৃত্ত হয়ে 'অভয়' অবস্থা প্রাপ্ত হতে পারে ; এই বিষয় ভালোভাবে জেনে নির্ভয় হয়ে যাওয়াই হল ভয় ও অভয়—এই দুটিকে যথার্থভাবে জানা।

প্রশ্ন—বন্ধন ও মোক্ষ কী ?

উত্তর—শুভাশুভ কর্মাদির ফলস্বরূপ জীবকে যে অনাদিকাল ধরে নিরন্তর পরবশ হয়ে জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হতে হয়, তাকেই বলে বন্ধন। আর সৎসঙ্গের প্রভাবে কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগাদি সাধন-গুলির মধ্যে কোনো একটি সাধন দ্বারা ভগবৎ-কৃপায় সমস্ত শুভাশুভ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া এবং জীবের ভগবানকে প্রাপ্ত করাই হল মোক্ষ।

প্রশ্ন—বন্ধন ও মোক্ষকে যথার্থভাবে জানা কী ?

উত্তর—বন্ধন কী, কী কারণে জীবের এই বন্ধন, কী কী কারণে এই বন্ধন দৃঢ় হয়—এই সব বিষয় ভালোভাবে জেনে নেওয়া হল এই বন্ধনকে যথার্থভাবে জানা এবং ঐ বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া কী এবং কোন্ কোন্ উপায়ে কীভাবে মানুষ বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে, এসব কথা ঠিকমতো জানাই হল মোক্ষকে সঠিকভাবে জানা।

প্রশ্ন—সেই বুদ্ধি সাত্ত্বিকী, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর— এর দ্বারা এই অর্থ প্রকাশিত হয় যে, যে বুদ্ধি উপরোক্ত বিষয় ঠিকমতো নির্ণয় করতে পারে, এর মধ্যে কোনো বিষয় নির্ণয় করতে তার ভুলও হয় না বা সংশয়ও থাকে না—যখন যে বিষয়ে নির্ণয় করার প্রয়োজন হয়, তখন তার সঠিক নির্ণয় করে—সেই বুদ্ধি হল সাত্ত্বিকী। সাত্ত্বিকী বুদ্ধি মানুষকে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত করে পরমপদ প্রাপ্তি করায়, সুতরাং কল্যাণাকাঙ্ক্ষী মানুষের নিজ বুদ্ধিকে সাত্ত্বিকী করে গঠন করা উচিত।

সম্বন্ধ—এবার রাজসী বুদ্ধির লক্ষণ জানাচ্ছেন—

যয়া ধর্মমধর্মঞ্চ কার্যঞ্চাকার্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী॥ ৩১

হে পার্থ ! মানুষ যে বুদ্ধির সাহায্যে ধর্ম-অধর্ম ও কর্তব্য-অকর্তব্য বিষয়ে যথাযথ জানতে পারে না, তা হল রাজসী বুদ্ধি॥ ৩১

প্রশ্ন—'ধর্ম' কাকে বলে এবং 'অধর্ম' কাকে বলে, এই দুটি প্রকৃত ভাবে না জানা কাকে বলে ?

উত্তর—অহিংসা, সত্য, দয়া, শান্তি, ব্রহ্মচর্য, শম, দম, তিতিক্ষা ও যজ্ঞ, দান, তপস্যা, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, প্রজাপালন, কৃষি, পশুপালন এবং সেবা ইত্যাদি বর্ণাশ্রমানুসারে যতপ্রকার শুভকর্ম শাস্ত্রে আছে, যেগুলির আচরণের ফল ইহলোক ও পরলোকের সুখভোগ বলা হয়েছে এবং যা অন্যের হিতের জন্য কৃত কর্ম, সেই সবকে

বলা হয় ধর্ম[১]। আর মিথ্যা, কপটাচার, চুরি, ব্যভিচার, হিংসা, দম্ভ, অভক্ষ্য-ভক্ষণ ইত্যাদি যত পাপ-কর্ম—শাস্ত্রে যার ফল দুঃখ বলা হয়েছে, সেই সব হল অধর্ম। কোন্ সময় কী পরিস্থিতিতে কোন্ কর্মটি ধর্ম ও কোন্টি অধর্ম—তা ঠিকমতো সিদ্ধান্ত গ্রহণে বুদ্ধির কুণ্ঠিত হওয়া বা সংশয়যুক্ত হওয়া ইত্যাদি হল ঐ দুটি সঠিক না জানা।

প্রশ্ন—'কার্য' এবং 'অকার্য' কাকে বলে ? ধর্ম-অধর্মে এবং কর্তব্য-অকর্তব্যে কী পার্থক্য এবং কর্তব্য-অকর্তব্যকে সঠিকভাবে না জানা কী ?

উত্তর—বর্ণ, আশ্রম, প্রকৃতি, পরিস্থিতি ও দেশ-

[১]শাস্ত্রে ধর্মের বিশাল মহিমা গীত হয়েছে। বৃহদ্ধর্মপুরাণে বলা হয়েছে—

এই বিশ্বের রক্ষাকারী বৃষভরূপ ধর্মের চারটি চরণ মানা হয়। সত্যযুগে চারটি চরণ স্থাপিত থাকে, ত্রেতাতে তিন, দ্বাপরে দুই এবং কলিযুগে একটি চরণ স্থিত থাকে।

ধর্মের চারটি চরণ—সত্য, দয়া, শান্তি ও অহিংসা।

'সত্যং দয়া তথা শান্তিরহিংসা চেতি কীর্তিতা। ধর্মস্যাবয়বাস্ত্বেত চত্বারঃ পূর্ণতাং গতাঃ॥'

এর মধ্যে সত্যের বারোটি বিভাগ আছে—

'অমিথ্যাবচনং সত্যং স্বীকারপ্রতিপালনম্। প্রিয়বাক্যং গুরোঃ সেবা দৃঢ়ং চৈব ব্রতং কৃতম্॥

আস্তিক্যং সাধুসঙ্গশ্চ পিতুর্মাতুঃ প্রিয়ঙ্করঃ। শুচিত্বং দ্বিবিধং চৈব হ্রীরসঞ্চয় এব চ॥'

'মিথ্যা না বলা, কথা দিয়ে রক্ষা করা, প্রিয় বাক্য বলা, গুরু সেবা করা, দৃঢ়ভাবে নিয়ম পালন, আস্তিকতা, সাধুসঙ্গ, মাতা-পিতার প্রিয়কার্য সম্পাদন করা, বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচ, লজ্জা এবং অপরিগ্রহ।'

দয়ার ছয়টি প্রকার—

'পরোপকারো দানং চ সর্বদা স্মিতভাষণম্। বিনয়ো ন্যূনতাভাবস্বীকারঃ সমতামতিঃ॥'

'পরোপকার, দান, সর্বদা হাসামুখ, বিনয়, নিজেকে ছোটো বলে ভাবা ও সমত্ববুদ্ধি।'

শান্তির ত্রিশটি লক্ষণ—

'অনসূয়াল্পসন্তোষ ইন্দ্রিয়াণাং চ সংযমঃ। অসঙ্গো মৌনমেবং দেবপূজাবিধৌ মতিঃ॥

অকুতশ্চিদ্ভয়ত্বং চ গাম্ভীর্যং স্থিরচিত্ততা। অরূক্ষতাবঃ সর্বত্র নিঃস্পৃহত্বং দৃঢ়া মতিঃ॥

বিবর্জনং হ্যকার্যাণাং সমঃ পূজাপমানয়োঃ। শ্লাঘা পরগুণোঽস্তেয়ং ব্রহ্মচর্যং ধৃতিঃ ক্ষমা॥

আতিথ্যং চ জপো হোমস্তীর্থসেবাঽর্যসেবনম্। অমৎসরো বন্ধমোক্ষজ্ঞানং সন্ন্যাসভাবনা॥

সহিষ্ণুতা সুদুঃখেষু অকার্পণ্যমমূর্খতা।'

'কারো দোষ না দেখা, অল্পে সন্তুষ্ট, ইন্দ্রিয় সংযম, ভোগে অনাসক্তি, মৌন, দেবপূজায় মন দেওয়া, নির্ভীকতা, গাম্ভীর্য, চিত্তের স্থৈর্য, রুক্ষতার অভাব, সর্বত্র নিঃস্পৃহতা, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, অকরণীয় কার্যত্যাগ, মানাপমানে সমতা, অপরের গুণে শ্লাঘা, চুরি না করা, ব্রহ্মচর্য, ধৈর্য, ক্ষমা, অতিথিসৎকার, জপ, হোম, তীর্থসেবা, শ্রেষ্ঠ পুরুষদের সেবা, মৎসরহীনতা, বন্ধন-মোক্ষর জ্ঞান, সন্ন্যাস-চিন্তা, অতি দুঃখেও সহিষ্ণুতা, কৃপণতার অভাব ও মূর্খতার অভাব।'

অহিংসার সাতটি লক্ষণ—

'অহিংসা ত্বাসনজয়ঃ পরপীড়াবিবর্জনম্।

শ্রদ্ধা চাতিথ্যসেবা চ শান্তরূপপ্রদর্শনম্॥

আত্মীয়তা চ সর্বত্র আত্মবুদ্ধিঃ পরাত্মসু।'

'আসনজয়, কায়মনোবাক্যে কাউকে দুঃখ না দেয়া, শ্রদ্ধা, অতিথি সৎকার, শান্তভাবের প্রদর্শন, সর্বত্র আত্মীয়তা এবং অপরের প্রতিও আত্মবুদ্ধি।'

এই হল ধর্ম। এই ধর্মের অল্প আচরণও পরম লাভদায়ক এবং এর বিপরীত আচরণ মহা ক্ষতিকারক—

'যথা স্বল্পমধর্মং হি জনয়েত্তৎ তু মহদ্ভয়ম্। স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥'

(বৃহদ্ধর্মপুরাণ, পূর্বখণ্ড ১।৪৭)

'স্বল্প অধর্ম আচরণও যেমন মহা-ভয় উৎপন্নকারী হয়, তেমনই এই ধর্মের অল্প আচরণও মহাভয় থেকে রক্ষা করে।'

এই চতুষ্পাদ ধর্ম পালনের সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ বর্ণাশ্রম অনুসারে ধর্মের আচরণ করা উচিত।

কাল অনুসারে যে মানুষের জন্য যে শাস্ত্রবিহিত কর্ম নির্দিষ্ট রয়েছে—তা হল কার্য (কর্তব্য) এবং যাঁর জন্য যে কর্ম শাস্ত্রে না করার বিধান রয়েছে—নিষিদ্ধ বলা হয়েছে, যা করা উচিত নয়—সেটি হল অকার্য (অকর্তব্য)। শাস্ত্র-নিষিদ্ধ পাপকর্ম সকলের জন্যই অকার্য, কিন্তু শাস্ত্রবিহিত শুভকর্মও কারো জন্য বিহিত অর্থাৎ কার্য আবার কারও জন্য সেটি অকার্য। যেমন শূদ্রের জন্য সেবা করা হল কার্য, আর যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন ইত্যাদি অকার্য ; সন্ন্যাসীর জন্য বিবেক, বৈরাগ্য, শম, দমাদি হল কার্য আর যজ্ঞ-দান ইত্যাদির আচরণ অকার্য ; ব্রাহ্মণদের জন্য যজ্ঞ করা-করানো, দান দেওয়া-নেওয়া, বেদ পড়া-পড়ানো হল কার্য, আর চাকরি করা অকার্য ; বৈশ্যদের জন্য কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য ইত্যাদি হল কার্য এবং দান গ্রহণ অকার্য। তেমনই স্বর্গ কামনাকারী মানুষদের জন্য কাম্য-কর্ম হল কার্য, আর মুমুক্ষুদের জন্য সেটি অকার্য। অনাসক্ত ব্রাহ্মণের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ হল কার্য, আর ভোগাসক্তদের জন্য সেটি হল অকার্য। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে শাস্ত্রবিহিত ধর্ম হলেই তা সকলের জন্য কর্তব্য হয় না। এইরূপ ধর্ম কার্যও হতে পারে, আবার অকার্যও হতে পারে। ধর্ম-অধর্ম এবং কার্য-অকার্যের এই হল পার্থক্য। যে কোনো কর্ম করার বা না করার সময়ে 'অমুক কর্ম আমার পক্ষে কর্তব্য না অকর্তব্য, আমার কোন্ কর্ম কীভাবে করা উচিত এবং কোন্‌টি করা উচিত নয়'—এগুলির সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বুদ্ধির যে কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে যাওয়া বা সংশয়যুক্ত হয়ে যাওয়া—একেই বলা হয় কর্তব্য-অকর্তব্য সঠিকভাবে না জানা।

প্রশ্ন—এই বুদ্ধি রাজসী, এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথার অভিপ্রায় হল, যে বুদ্ধির দ্বারা মানুষ ধর্ম-অধর্ম এবং কর্তব্য-অকর্তব্য বিষয়ে সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, এবং তদনুরূপ অন্যান্য বিষয়ও সঠিকভাবে নির্ণয় করতে সক্ষম নয়—সেই বুদ্ধি রজোগুণের প্রভাবে বিবেক-বিচারে অপ্রতিষ্ঠিত, বিক্ষিপ্ত ও অস্থির থাকে, তাই সেই বুদ্ধি হল রাজসিক। রাজস অর্থাৎ রজোগুণের ফল দুঃখ বলা হয়েছে ; অতএব কল্যাণকামী পুরুষদের উচিত সৎসঙ্গ, সদ্‌-গ্রন্থাদি অধ্যয়ন ও সদ্‌বিচারের অনুশীলন দ্বারা বুদ্ধিতে স্থিত রাজস ভাব ত্যাগ করে সাত্ত্বিক ভাব উৎপন্ন করা ও সেটি বুদ্ধির জন্য সচেষ্ট থাকা।

সম্বন্ধ—এবার তামসী বুদ্ধির লক্ষণ জানাচ্ছেন—

অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী॥ ৩২

হে পার্থ ! যে বুদ্ধি তমোগুণে আবৃত হয়ে অধর্মকে ধর্ম মনে করে এবং সর্ব বিষয়ে বিপরীত অর্থ করে, তাকে বলে তামসী বুদ্ধি॥ ৩২

প্রশ্ন—অধর্মকে ধর্ম মানা এবং ধর্মকে অধর্ম মানা কাকে বলে ?

উত্তর—ঈশ্বরনিন্দা, দেবনিন্দা, শাস্ত্র-বিরোধ, মাতা-পিতা-গুরু ইত্যাদির অপমান, বর্ণাশ্রমধর্মের প্রতিকূল আচরণ, অসন্তোষ, দম্ভ, কপটাচার, ব্যভিচার, অসত্যভাষণ, পরপীড়ন, অভক্ষ্যভোজন, যথেচ্ছাচার ও পরসম্বাপহরণ ইত্যাদি নিষিদ্ধ পাপকর্মকে ধর্ম মনে করা ও ধৃতি, ক্ষমা, মনোনিগ্রহ, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, হ্রী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ, ঈশ্বরপূজা, দেবোপাসনা, শাস্ত্রসেবন, বর্ণাশ্রম-ধর্মানুসার আচরণ, মাতা-পিতা-গুরুজনের আদেশ পালন, সারল্য, ব্রহ্মচর্য, সাত্ত্বিক আহার, অহিংসা ও পরোপকার ইত্যাদি শাস্ত্রবিহিত পুণ্যকর্মকে অধর্ম মনে করা—এই হল অধর্মকে ধর্ম এবং ধর্মকে অধর্ম বলে মানা।

প্রশ্ন—অন্য সব পদার্থকে বিপরীত মনে করা কী ?

উত্তর—অধর্মকে ধর্ম মনে করার ন্যায় অকর্তব্যকে কর্তব্য, দুঃখকে সুখ, অনিত্যকে নিত্য, অশুদ্ধকে শুদ্ধ ও ক্ষতিকে লাভ মনে করা—ইত্যাদি যতপ্রকার বিপরীত জ্ঞান—সেসবই হল অন্য পদার্থকে বিপরীত মেনে নেওয়ার অন্তর্গত।

প্রশ্ন—সেই বুদ্ধি তামসিক—এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর অর্থ হল, তমোগুণে আবৃত থাকায় যে বুদ্ধির বিবেকশক্তি যেন সর্বতোভাবে লুপ্তপ্রায় হয়েছে, সেই কারণে যার দ্বারা প্রত্যেক বিষয়ে একেবারে বিপরীত বুদ্ধি হয়—সেই বুদ্ধি তামসিক। এরূপ বুদ্ধি মানুষকে অধোগতিতে নিয়ে যায় ; তাই কল্যাণকামী মানুষের এইরূপ বিপরীত বুদ্ধি সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত।

সম্বন্ধ—এবার সাত্ত্বিকী ধৃতির লক্ষণ জানাচ্ছেন—

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥ ৩৩

হে পার্থ ! যে অব্যভিচারিণী ধারণাশক্তিতে মানুষ ধ্যানযোগের দ্বারা মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াগুলি ধারণ করেন, তাকে সাত্ত্বিকী ধৃতি বলে॥ ৩৩

প্রশ্ন—এখানে **'অব্যভিচারিণ্যা'** বিশেষণের সঙ্গে **'ধৃত্যা'** পদ কীসের বাচক ? তাতে ধ্যানযোগের দ্বারা মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া ধারণ করা কী ?

উত্তর—যে কোনো ক্রিয়া, ভাব বা বৃত্তিকে ধারণ করার, তাকে দৃঢ়তাপূর্বক স্থির রাখার যে শক্তিবিশেষ, যার দ্বারা ধারণ করা কোনো ক্রিয়া, ভাবনা বা বৃত্তি বিচলিত হয় না, বরং চিরকাল ধরে স্থির থাকে, সেই শক্তির নাম 'ধৃতি'। কিন্তু যে পর্যন্ত মানুষ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে, নানা বিষয়কে ধারণ করতে থাকে, ততদিন এই ধৃতির ব্যভিচার দোষ নষ্ট হয় না, কিন্তু মানুষ যখন এই ধৃতির দ্বারা এক অটল উদ্দেশ্য স্থির করে নেয়, সেই সময় এটি 'অব্যভিচারিণী' হয়ে যায়। সাত্ত্বিক ধৃতির একটিই উদ্দেশ্য হয়—পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করা। সেইজন্য একে 'অব্যভিচারিণী' বলা হয়। এইরূপ ধারণাশক্তির বাচক হল এখানে **'অব্যভিচারিণ্যা'** বিশেষণের সঙ্গে **'ধৃত্যা'** পদটি। এরূপ ধারণাশক্তির দ্বারা পরমাত্মাকে লাভ করার জন্য ধ্যানযোগ দ্বারা মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াসমূহ পরমাত্মাতে যে অটলরূপে ধরে রাখা—এই হল উপরোক্ত ধৃতির ধ্যানযোগের দ্বারা মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াগুলি ধারণ করা।

প্রশ্ন—সেই ধৃতি সাত্ত্বিকী, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথার তাৎপর্য হল যে, যে ধৃতি পরমাত্মার প্রাপ্তিরূপ একই উদ্দেশ্যে সর্বদা স্থির থাকে, যা নিজ লক্ষ্য থেকে কখনো বিচলিত হয় না, যার ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য নেই, যার দ্বারা মানুষ পরমাত্মাকে পাওয়ার জন্য মন ও ইন্দ্রিয়াদি পরমাত্মাতে নিযুক্ত করে রাখে এবং কোনো কারণেই তাকে বিষয়ে আসক্ত ও চঞ্চল হতে না দিয়ে সর্বদা নিজের বশে রাখে—সেই ধৃতিকে সাত্ত্বিক বলা হয়। এইরূপ ধারণাশক্তি মানুষকে শীঘ্রই পরমাত্মার প্রাপ্তি করায়। অতএব কল্যাণ আকাঙ্ক্ষাকারী ব্যক্তির উচিত তাঁর ধারণাশক্তিকে এইরূপ সাত্ত্বিক করার জন্য সচেষ্ট থাকা।

সম্বন্ধ—এবার রাজসী ধৃতির লক্ষণ জানাচ্ছেন—

যয়া তু ধর্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী॥ ৩৪

কিন্তু হে পৃথাপুত্র অর্জুন ! ফলাসক্ত মানুষ যে ধারণাশক্তির দ্বারা অত্যন্ত আসক্তিপূর্বক ধর্ম, অর্থ ও কামনাকে ধারণ করেন, তাকে রাজসী ধৃতি বলে॥ ৩৪

প্রশ্ন—**'ফলাকাঙ্ক্ষী'** পদ কীরূপ মানুষের বাচক এবং এরূপ মানুষের ধারণাশক্তির দ্বারা অত্যন্ত আসক্তিসহ ধর্ম, অর্থ ও কামনা—এই তিনটি ধারণ করা কী ?

উত্তর—**'ফলাকাঙ্ক্ষী'** পদটি কর্মের ফলস্বরূপ ইহলোক ও পরলোকের বিভিন্ন প্রকার ভোগাদি কামনাকারী সকাম মানুষের বাচক। এরূপ মানুষ যে নিজ ধারণাশক্তির দ্বারা অত্যন্ত আসক্তিপূর্বক ধর্মপালন করে—এই হল তাঁর ধৃতির দ্বারা ধর্মকে ধারণ করা এবং ধনাদি পদার্থ এবং তার দ্বারা সিদ্ধ হওয়া ভোগাদিকেই জীবনের লক্ষ্য মনে করে অত্যন্ত আসক্তি দ্বারা তাকে দৃঢ়তাসহকারে ধরে রাখা—এই হল ঐ ধৃতির দ্বারা তার অর্থ ও কামনাকে ধারণ করা।

প্রশ্ন—সেই ধারণাশক্তি রাজসিক, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথার অর্থ হল যে, যে ধৃতির দ্বারা মানুষ মোক্ষের সাধনার দিকে একটুও লক্ষ্য না করে কেবল উপরোক্ত প্রকারে ধর্ম, অর্থ ও কামনা—এই তিনটিকেই ধারণ করে রাখে, রজোগুণের সঙ্গে সম্বন্ধিত হওয়ায় সেই 'ধৃতি' হল রাজসী। কারণ আসক্তি ও কামনা—এগুলি সবই হল রজোগুণের কার্য। এই প্রকার ধৃতি মানুষকে কর্মের দ্বারা আবদ্ধ করে। সুতরাং কল্যাণকামী মানুষের নিজ ধারণাশক্তিকে রাজসী হতে না দিয়ে সাত্ত্বিকী করার চেষ্টা করা উচিত।

সম্বন্ধ—এবার তামসী ধৃতির লক্ষণ জানাচ্ছেন—

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী॥ ৩৫

হে পার্থ! দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যে ধারণাশক্তির দ্বারা নিদ্রা, ভয়, চিন্তা, দুঃখ ও মদ (মত্তভাব) ত্যাগ করে না অর্থাৎ এগুলি ধারণ করে রাখে—তাকে তামসী ধৃতি বলে॥ ৩৫

প্রশ্ন—**'দুর্মেধাঃ'** পদ কীরূপ মানুষের বাচক, এখানে সেটি প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর-যার বুদ্ধি অতি মন্দ ও মলিন, যার অন্তঃকরণ অন্যের ক্ষতি করার চিন্তায় মগ্ন থাকে—এরূপ দুষ্টবুদ্ধি মানুষের বাচক হল **'দুর্মেধাঃ'** পদটি। এটি প্রয়োগের অভিপ্রায় হল যে, এরূপ মানুষের 'ধৃতি' হয় তামসী।

প্রশ্ন—স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ ও মদ—এই শব্দগুলি পৃথকভাবে কোন্ কোন্ ভাবের বাচক এবং ধৃতির দ্বারা এগুলিকে ত্যাগ না করা অর্থাৎ ধারণ করে থাকা কী ?

উত্তর—নিদ্রা ও তন্দ্রা যা মন ও ইন্দ্রিয়কে তমসাচ্ছন্ন, বাহ্যক্রিয়ারহিত ও মূঢ় ভাবসম্পন্ন করার বৃত্তি—সেই সবকে বলা হয় স্বপ্ন। ধনাদি পদার্থের নাশ, মৃত্যু, দুঃখপ্রাপ্তি, সুখনাশ তথা এইরূপ অন্যান্য অনিষ্ট প্রাপ্তি জনিত আশঙ্কায় অন্তঃকরণে যে আকুলতা, অস্থিরতা ও ঘাবড়ানোর ভাব হয়—তার নাম ভয় ; মনে উদিত হওয়া নানাপ্রকার দুশ্চিন্তাকে বলা হয় শোক ; তার জন্য ইন্দ্রিয়ে যে সন্তাপ হয়, তাকে বলা হয় বিষাদ, এটি হল শোকেরই স্থূল ভাব। তথা ধন, জন, বল ইত্যাদির জন্য হওয়া এবং বিবেক, ভবিষ্যতের বিচার ও দূরদর্শিতারহিত যে উন্মত্ত বৃত্তি, তাকে বলা হয় মদ ; একে গর্ব, দাম্ভিকতা এবং উন্মত্ততাও বলে। এইসব প্রমাদ ইত্যাদি অন্যান্য তামস ভাবগুলিকে অন্তঃকরণ থেকে দূর করার চেষ্টা না করে এতে ডুবে থাকা, একেই বলে ধৃতির সাহায্যে একে ত্যাগ না করা অর্থাৎ ধারণ করে থাকা।

প্রশ্ন—এই ধারণাশক্তি তামসী, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর তাৎপর্য হল, ত্যাগ করার যোগ্য উপরোক্ত তামস ভাবকে মানুষ যে ধৃতির কারণে ত্যাগ করতে পারে না, অর্থাৎ যে ধারণাশক্তির জন্য উপরোক্ত ভাব মানুষের অন্তঃকরণে স্বভাবতঃই ধৃত হয়ে থাকে—তা হল তামসী ধৃতি। এই ধৃতি সর্বতোভাবে অনর্থের হেতু, অতএব কল্যাণকামী ব্যক্তির একে দ্রুত ও সর্বতোভাবে ত্যাগ করা উচিত।

সম্বন্ধ—এইরূপ সাত্ত্বিকী বুদ্ধি ও ধৃতির গ্রহণ এবং রাজসী-তামসী বুদ্ধি ও ধৃতি ত্যাগ করাবার জন্য বুদ্ধি ও ধৃতির সাত্ত্বিক ইত্যাদি তিন প্রকার ভেদ ক্রমশঃ জানিয়ে এবার, মানুষ যার জন্য সব কর্ম করে, সেই সুখেরও সাত্ত্বিক,

রাজসিক ও তামসিক—এইরূপ তিনটি পার্থক্যও ক্রমশঃ বলতে আরম্ভ করে, প্রথমে সাত্ত্বিক সুখের লক্ষণগুলি নির্ধারণ করছেন—

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি॥ ৩৬
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥ ৩৭

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এবার তিনপ্রকার সুখের বিষয় তুমি আমার কাছে শোনো। যে সুখে মানুষ ভজন, ধ্যান ও সেবাদির অভ্যাসের দ্বারা পরিতৃপ্ত হয় এবং দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পায়—এরূপ সুখ, যা আরম্ভে বিষতুল্য বলে প্রতীত হলেও, পরিণামে অমৃতের ন্যায়; সেই পরমাত্ম-বিষয়ক বুদ্ধির প্রসাদে উৎপন্ন সুখকে সাত্ত্বিক সুখ বলা হয়॥ ৩৬-৩৭

প্রশ্ন—এবার তিন প্রকার সুখের কথা তুমি আমার কাছে শোনো, এই কথার অর্থ কী?

উত্তর—ভগবান এর দ্বারা বলতে চেয়েছেন যে, আমি যেমন জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, বুদ্ধি ও ধৃতির সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক পার্থক্য বলেছি, তেমনই সাত্ত্বিক সুখ লাভ করাবার জন্য ও রাজস-তামস সুখ ত্যাগ করাবার জন্য এবার তোমাকে সুখেরও তিনটি বিভাগের কথা বলছি। তুমি সাবধানে সেটি শোনো।

প্রশ্ন—'যত্র' পদ কোন্ সুখের বাচক এবং অভ্যাসে রমণ করা—এই কথাটির অর্থ কী?

উত্তর—প্রশান্ত চিত্ত যোগী যে সুখ লাভ করেন (৬।২৭), সেই উত্তম সুখের বাচক হল 'যত্র' পদটি। মানুষ তখনই এই সুখ অনুভব করেন, যখন তিনি ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত ভোগ-সুখকে ক্ষণিক মনে করে সে সব থেকে আসক্তি সরিয়ে এনে নিরন্তর পরমাত্ম স্বরূপের চিন্তার অভ্যাস করেন (৫।২১)। সাধন ব্যতীত তা অনুভব করা যায় না—এই অর্থে এই সুখকে 'যাতে অভ্যাসের দ্বারা রমণ করা হয়' এই লক্ষণের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন—যার দ্বারা দুঃখের চিরতরে সমাপ্তি হয়, এই কথার অর্থ কী?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে, যে সুখে রমণকারী ব্যক্তি আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—সর্বপ্রকার দুঃখের সম্বন্ধ থেকে মুক্ত হন; যে সুখের অনুভূতি হলে নিরতিশয় সুখ-স্বরূপ সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্ম পরমাত্মার প্রাপ্তি হয় বলে বলা হয়েছে (৫।২১, ২৪, ৬।২৮) সেটিই হল সাত্ত্বিক সুখ।

প্রশ্ন—এখানে 'অগ্রে' পদ কোন্ সময়ের বাচক এবং আরম্ভকালে সাত্ত্বিক সুখকে বিষতুল্য প্রতীত হওয়া কী?

উত্তর—মানুষ যখন সাত্ত্বিক সুখের মহিমা শুনে তা লাভ করার ইচ্ছায় তার উপায়ভূত বিবেক, বৈরাগ্য, শম, দম, তিতিক্ষাদি সাধনে ব্যাপৃত হয়—সেই সময়ের বাচক হল এই 'অগ্রে' পদটি। ছেলেরা যেমন পরিজনদের কাছে বিদ্যার মহিমা শুনে বিদ্যাভ্যাসের চেষ্টা করে, কিন্তু তার গুরুত্ব প্রকৃতভাবে অনুভব না করায় অভ্যাসারম্ভের প্রারম্ভে খেলাধুলা ছেড়ে বিদ্যাভ্যাসে রত হওয়া কষ্টপ্রদ ও কঠিন মনে হয়, তেমনই সাত্ত্বিক সুখের জন্য অভ্যাস করতে থাকা ব্যক্তিরও বিষয়-ভোগ ত্যাগ করে সংযম-পূর্বক, বিবেক, বৈরাগ্য, শম, দম, তিতিক্ষাদি সাধনে ব্যাপৃত থাকা অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ও কষ্টপ্রদ প্রতীত হয়, এই হল আরম্ভ কালে সাত্ত্বিক সুখকে বিষতুল্য প্রতীত হওয়া।

প্রশ্ন—সেই সুখ পরিণামে অমৃততুল্য হয়—এই কথার অর্থ কী?

উত্তর—এর দ্বারা দেখানো হয়েছে যে, সাত্ত্বিক সুখ লাভের জন্য সাধন করতে করতে সাধকের যখন সেই ধ্যানজনিত সুখ অনুভূত হতে থাকে, তখন তাঁর সেটি অমৃততুল্য বলে প্রতীত হয়; এবং তাঁর কাছে জগতের সমস্ত ভোগ-সুখ তুচ্ছ, নগণ্য ও দুঃখরূপ প্রতীত হয়।

প্রশ্ন—সেই পরমাত্মবিষয়ক বুদ্ধির প্রসাদে হওয়া সুখকে সাত্ত্বিক বলা হয়, এই কথাটির অর্থ কী?

উত্তর—উপরোক্ত প্রকারে অভ্যাস করতে করতে

নিরন্তর পরমাত্মার ধ্যান করার ফলস্বরূপ অন্তঃকরণ স্বচ্ছ হলে এই সুখ অনুভূত হয়, তাই এই সুখকে পরমাত্ম বুদ্ধির প্রসাদ থেকে উৎপন্ন বলা হয়েছে। এটি সাত্ত্বিক সুখ—এই কথার তাৎপর্য হল, এই সুখই উত্তম সুখ, রাজস ও তামস সুখ বাস্তবে সুখই নয়। সেগুলি নামেই মাত্র সুখ, পরিণামে তা দুঃখেরই রূপ। সুতরাং নিজের কল্যাণকামী ব্যক্তির রাজস-তামস সুখে আবদ্ধ না হয়ে নিরন্তর সাত্ত্বিক সুখেই রমণ করা উচিত।

সম্বন্ধ—এবার রাজস সুখের লক্ষণ জানাচ্ছেন—

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥ ৩৮

যে সুখ বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদির সংযোগে হয়, যা ভোগকালের প্রথমে অমৃততুল্য প্রতীত হলেও পরিণামে বিষতুল্য—সেই সুখকে বলা হয় রাজস সুখ ॥ ৩৮

প্রশ্ন—'অগ্রে' পদ কোন্ সময়ের বাচক, সেই সময় ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগে উৎপন্ন হওয়া সুখ অমৃত-তুল্যরূপে প্রতীত হয়—এ কথার কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—রাজস সুখ লাভের জন্য যখন মানুষ মন ও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোনো বিষয় উপভোগ করতে আরম্ভ করেন, সেই সময়ের বাচক হল এই **'অগ্রে'** পদটি। এই সুখের উৎপত্তি ইন্দ্রিয় ও বিষয় সংযোগে হয়—এর অভিপ্রায় হল যে, মানুষ যতক্ষণ মনসহ ইন্দ্রিয় দ্বারা কোনো বিষয় উপভোগ করেন, ততক্ষণ তাঁর সেই সুখ অনুভূত হয় এবং আসক্তির জন্য তাঁর সেটি অত্যন্ত প্রিয় বলে মনে হয় ; সেই সময় তাঁর কাছে অদৃশ্য (পারমার্থিক) সুখ তুচ্ছ বলে মনে হয়। এই হল সুখভোগের সময়ে তা অমৃততুল্য বলে প্রতীত হওয়া।

প্রশ্ন—রাজস সুখ পরিণামে বিষতুল্য, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর তাৎপর্য হল যে, এই রাজস সুখ-ভোগের পরিণাম বিষের ন্যায় দুঃখপ্রদ হয়। এই রাজস সুখ প্রতীতীমাত্র, প্রকৃত সুখ নয়। অভিপ্রায় হল যে, মন ও ইন্দ্রিয় দ্বারা আসক্তি-সহকারে সুখবুদ্ধিপূর্বক বিষয় উপভোগ করলে অন্তঃকরণে তার সংস্কার মুদ্রিত হয়ে যায়, যার ফলে মানুষ পুনরায় সেই বিষয় ভোগ প্রাপ্তির জন্য কামনা করে। সেইজন্য সে আসক্তিবশতঃ নানাপ্রকার পাপকর্ম করে থাকে এবং সেই পাপকর্মের ফল ভোগ করার জন্য তার কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী ইত্যাদি বহু প্রকারের অধম জন্ম গ্রহণ করতে হয় আর যন্ত্রণাময় নরকে গিয়ে ভীষণ দুঃখ পেতে হয়।

বিষয়াসক্তি বৃদ্ধি পেলে পুনরায় তার প্রাপ্তি না হলে সেটির অভাবের দুঃখ অনুভূত হয় এবং তার বিচ্ছেদের সময়ও অত্যন্ত দুঃখ হয়। অন্যের কাছে নিজের থেকে অধিক সুখ-সম্পত্তি দেখে ঈর্ষার জ্বালা অনুভব হয়। ভোগের পর শরীরে বল, বীর্য, বুদ্ধি, তেজ ও শক্তি হ্রাসে এবং ক্লান্তির জন্য মহাকষ্ট অনুভব হয়। পরিণামে এই প্রকার আরও বহু কষ্ট পেতে হয়। তাই বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগে হওয়া এই ক্ষণস্থায়ী সুখ যদিও সর্বপ্রকারেই দুঃখময়, তবুও রোগী যেমন আসক্তিবশতঃ স্বাদের লোভে পরিণাম চিন্তা না করে কুপথ্য গ্রহণ করে এবং পরিণামে রোগ বৃদ্ধি হলে দুঃখ পায় বা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, অথবা পতঙ্গ যেমন প্রদীপের শিখাতে সুখবুদ্ধিবশতঃ প্রবেশ করতে যায় এবং পরিণামে আগুনে পুড়ে কষ্ট সহ্য করে মরে যায়—তেমনই বিষয়াসক্ত মানুষও মূর্খতা ও আসক্তি-বশতঃ পরিণাম চিন্তা না করে সুখ-বুদ্ধির দ্বারা বিষয় চিন্তা করে পরিণামে নানাপ্রকার ভীষণ দুঃখ ভোগ করে।

প্রশ্ন—সেই সুখকে রাজস সুখ বলা হয়, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর অর্থ হল, উপরোক্ত লক্ষণযুক্ত যে ক্ষণিক সুখের প্রতীতীমাত্র, বিষয়াসক্তির জন্যই তা সুখরূপ বলে মনে হয় এবং আসক্তি হল রজোগুণের স্বরূপ। সুতরাং সেটি হল রাজস এবং এটি আসক্তির দ্বারা মানুষকে আবদ্ধ করে (১৪।৭)। তাই কল্যাণকামী ব্যক্তিদের এরূপ সুখে আবদ্ধ হওয়া উচিত নয়।

সম্বন্ধ—এবার তামস সুখের লক্ষণ জানাচ্ছেন—

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্‌॥ ৩৯

যে সুখ ভোগকালে ও পরিণামে আত্মাকে মোহগ্রস্ত করে—নিদ্রা, আলস্য এবং প্রমাদ হতে উৎপন্ন সেই সুখকে তামস সুখ বলা হয় ॥ ৩৯

প্রশ্ন—নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদজনিত সুখ কী এবং সেটি ভোগের সময় বা পরিণামে আত্মাকে কী করে মোহগ্রস্ত করে ?

উত্তর—নিদ্রাকালে মন ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া রুদ্ধ থাকায়, ক্লান্তিবশতঃ দুঃখ দূর হওয়ায় এবং মন ও ইন্দ্রিয়ের বিশ্রাম হওয়ায় যে সুখ অনুভূত হয়, তাকে বলে নিদ্রাজনিত সুখ। যতক্ষণ নিদ্রায় থাকা যায়, সেই সুখ ততক্ষণ স্থায়ী হয়, সব সময় থাকে না—তাই এটি ক্ষণিক। তাছাড়া সেই সময় মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়তে প্রকাশের অভাব হয়, কোনো বস্তু অনুভব করার শক্তি থাকে না ; সেইজন্য এই সুখ ভোগ-কালে আত্মাকে অর্থাৎ অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়কে এবং এর প্রতি অভিমান পোষণকারী ব্যক্তিকে মোহগ্রস্ত করে। এই সুখের আসক্তির জন্য পরিণামে মানুষকে অজ্ঞানময় বৃক্ষ, পাহাড় ইত্যাদি জড় জন্ম গ্রহণ করতে হয়, অতএব এটি পরিণামেও মোহগ্রস্তকারী হয়।

এইভাবে সমস্ত কর্মত্যাগ করে অবস্থান করার সময় মন, ইন্দ্রিয় ও দৈহিক পরিশ্রম ত্যাগ করায় যে আরাম অনুভূত হয়, সেটি হল আলস্যজনিত সুখ। এটিও নিদ্রাজনিত সুখের ন্যায় মন, ইন্দ্রিয়তে জ্ঞানের প্রকাশের অভাব সূচিত করে ভোগকালে সেই সবকিছুকে মোহগ্রস্ত করে এবং মোহ ও আসক্তির জন্য জড় যোনিতে নিপতিত করে পরিণামেও মোহ উৎপন্নকারী হয়।

চিত্ত বিনোদনের জন্য আসক্তিবশতঃ করা ব্যর্থ ক্রিয়াসমূহ এবং অজ্ঞতাবশতঃ কর্তব্য-কর্মের অবহেলা করে সেসব ত্যাগ করাকে বলে প্রমাদ। ব্যর্থ ক্রিয়া করাতে, মনের প্রসন্নতার জন্য এবং কর্তব্য ত্যাগ করায় পরিশ্রম থেকে রক্ষা পাওয়ায় মূর্খতাবশতঃ যে সুখ প্রতীত হয়, তা হল প্রমাদজনিত সুখ। মানুষ যখন যে কোনো ভাবে চিত্ত বিনোদনের জন্য বৃথা ক্রিয়া করেন, সেই সময় তাঁর কর্তব্য-অকর্তব্যের কোনো জ্ঞান থাকে না, তাঁর বিচারশক্তি মোহ দ্বারা আবৃত হয়। বিচার-ক্ষমতা আচ্ছাদিত হওয়ায় কর্তব্যে অবহেলা হয়। সেইজন্য এই প্রমাদজনিত সুখ ভোগের সময় আত্মাকে মোহগ্রস্ত করে। উপরোক্ত বৃথাকর্মে অজ্ঞান ও আসক্তিবশতঃ কৃত মিথ্যা, কপটাচার, হিংসাদি পাপকর্ম এবং কর্তব্য-কর্ম ত্যাগের ফল ভোগ করার জন্য এরূপ ব্যক্তিদের শূকর-কুকুর ইত্যাদি নীচ জন্ম বা নরক প্রাপ্তি হয় ; অতএব এটি পরিণামেও আত্মাকে মোহগ্রস্ত করে।

প্রশ্ন—সেই সুখ তামস, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে, নিদ্রা, প্রমাদ, আলস্য—এই তিনটিই তমোগুণের কাজ (১৪।১৭) ; অতএব এর দ্বারা উৎপন্ন সুখ হল তামস সুখ। এবং এই নিদ্রা আলস্য ও প্রমাদাদিতে সুখবুদ্ধি করিয়েই এই তমোগুণ মানুষকে আবদ্ধ করে (১৪।৮) ; তাই কল্যাণকামী ব্যক্তির এই ক্ষণস্থায়ী, মোহকারক ও প্রতীতীমাত্র সুখে আবদ্ধ হওয়া ঠিক নয়।

সম্বন্ধ—এইভাবে অষ্টাদশ শ্লোক থেকে বর্ণিত প্রধান প্রধান পদার্থের সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস—এরূপ তিন প্রকার পার্থক্য জানিয়ে এবার এই প্রকরণের উপসংহার করে জগতের সমস্ত পদার্থ তিন গুণের সঙ্গে সংযুক্ত বলে ভগবান জানিয়েছেন—

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ॥ ৪০

পৃথিবীতে বা অন্তরীক্ষে অথবা দেবতাদের মধ্যে এমন কোনো প্রাণী বা বস্তু নেই, যা প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন এই তিন গুণ থেকে রহিত ॥ ৪০

প্রশ্ন—এখানে '**পৃথিব্যাম্**', '**দিবি**' ও '**দেবেষু**' পদ পৃথকভাবে কীসের বাচক এবং '**পুনঃ**' পদ প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—'**পৃথিব্যাম্**' পদটি পৃথিবীর, তার অন্তর্গত সমস্ত পাতাল লোকের এবং ঐ লোকে স্থিত সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম প্রাণী ও পদার্থের বাচক। '**দিবি**' পৃথিবী থেকে ওপরের অন্তরীক্ষের এবং তাতে স্থিত সমস্ত প্রাণী ও পদার্থের বাচক। '**দেবেষু**' পদ সমস্ত দেবতাদের এবং তাছাড়া তাদের বিভিন্ন লোকের এবং তাদের সঙ্গে সম্বন্ধিত সমস্ত পদার্থের বাচক। এছাড়াও জগতে আরও যেসব বস্তু বা প্রাণী আছে, সেগুলি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য '**পুনঃ**' পদ প্রযুক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন—'**সত্ত্বম্**' পদ কীসের বাচক এবং এমন কোনো সত্ত্বা নেই যা প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন এই তিন গুণ থেকে রহিত, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—'**সত্ত্বম্**' পদটি এখানে বস্তুমাত্র অর্থাৎ সর্বপ্রকার প্রাণী এবং সমস্ত পদার্থের বাচক এবং 'এরূপ কোনো সত্ত্বা নেই যা প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন এই তিন গুণ থেকে রহিত' এই কথার তাৎপর্য হল, সমস্ত পদার্থ প্রকৃতিজনিত সত্ত্ব, রজ, তম— এই তিনগুণের কার্য এবং প্রকৃতিজনিত গুণাদির সংযোগের দ্বারাই প্রাণীদের নানাপ্রকার জন্ম লাভ হয় (১৩।২১)। তাই পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দেবলোকের এবং অন্য সব লোকের প্রাণী ও পদার্থের মধ্যে এমন কোনো প্রাণী বা পদার্থ নেই যা এই তিন গুণ থেকে রহিত বা এর অতীত। কারণ বাস্তবিক সমস্ত জড়বর্গ গুণাদির কার্য হওয়ায় গুণময়ই এবং সমস্ত প্রাণী এই গুণাদির মাধ্যমে এই গুণের কার্যরূপ পদার্থের সঙ্গে সম্বন্ধিত, তাই এগুলিও সব তিনগুণের সঙ্গে যুক্ত।

প্রশ্ন—সৃষ্টির মধ্যে গুণাতীত ব্যক্তিও তো আছেন, তা হলে একথা কেন বলা হল যে কোনো প্রাণই গুণাদি রহিত নয় ?

উত্তর—যদিও লোকদৃষ্টিতে সৃষ্টির মধ্যে গুণাতীত ব্যক্তিরা আছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁদের দৃষ্টিতে সৃষ্টিও নেই এবং সৃষ্টি বা শরীরের মধ্যে তাঁদের স্থিতিও নেই। তাঁরা তো পরমাত্মাতেই অভিন্নভাবে স্থিত। সুতরাং তাঁরা পরমাত্মস্বরূপই। অতএব তাঁদের সাধারণ প্রাণীর মধ্যে গণ্য করা যায় না। তাঁদের মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় ইত্যাদির সংঘাতরূপ শরীরকে—যা সকলের কাছে প্রত্যক্ষ তা ধরে নিয়ে যদি তাঁদের প্রাণী বলা হয়, তাতে আপত্তি নেই, কারণ সেই সংঘাত তো গুণসমূহের কাজ, সুতরাং তাকে গুণাদির অতীত বলা যাবে কীভাবে ? তাই একথা বলায় কোনো আপত্তি নেই যে, সৃষ্টির মধ্যে কোনো প্রাণী বা পদার্থই তিন গুণের অতীত নয়।

সম্বন্ধ—এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে অর্জুন সন্ন্যাস এবং ত্যাগের তত্ত্ব পৃথকভাবে জানতে চেয়েছিলেন। তাই উভয়ের তত্ত্ব বোঝাবার জন্য প্রথমে এই বিষয়ে বিদ্বানদের মতামত জানিয়ে চতুর্থ থেকে দ্বাদশ শ্লোক পর্যন্ত ভগবান তাঁর মতানুসারে ত্যাগ ও ত্যাগীর লক্ষণ বলেছেন। তারপর তেরো থেকে সতেরোতম শ্লোক পর্যন্ত সন্ন্যাসের (সাংখ্যের) স্বরূপ নিরূপণ করে সন্ন্যাসের সহায়ক সত্ত্বগুণের গ্রহণ ও তার বিরোধী রজ ও তম ত্যাগ করাবার জন্য আঠারো থেকে চল্লিশতম শ্লোক পর্যন্ত গুণাদি অনুসারে জ্ঞান, কর্ম, কর্তা ইত্যাদি প্রধান প্রধান পদার্থের ভাগ জানিয়েছেন এবং শেষে সমস্ত জগৎকে গুণের দ্বারা যুক্ত বলে সেই বিষয়ের উপসংহার করেছেন।

ত্যাগের স্বরূপ বলার সময় ভগবান বলেছেন যে নিত্যকর্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ করা উচিত নয় (১৮।৭), বরং নির্দিষ্ট কর্ম আসক্তি ও ফলত্যাগপূর্বক করতে থাকাই প্রকৃত ত্যাগ (১৮।৯), কিন্তু সেখানে একথা বলা হয়নি যে কার জন্য কোন্ কর্ম নির্দিষ্ট। সুতরাং এবার সংক্ষেপে নির্দিষ্ট কর্মের স্বরূপ, ত্যাগের নামে বর্ণিত কর্মযোগে ভক্তির সহযোগ এবং তার ফল পরম সিদ্ধিপ্রাপ্তি জানাবার জন্য পুনরায় সেই ত্যাগরূপ কর্মযোগের প্রকরণ আরম্ভ করে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের স্বাভাবিক নির্দিষ্ট কর্ম বলার প্রস্তাবনা করছেন—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ৪১

হে পরন্তপ ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের কর্ম স্বভাবজাত গুণ-অনুযায়ী দ্বারা ভাগ করা হয়েছে ॥ ৪১

প্রশ্ন—'**ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং**' এই পদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিনটি শব্দের সমাস করার এবং '**শূদ্রাণাম্**' পদে শূদ্রদের আলাদা করে বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন জাতিই দ্বিজ। তিন জাতিরই যজ্ঞোপবীতধারণপূর্বক বেদাধ্যয়নে এবং যজ্ঞাদি বৈদিক কর্মে অধিকার আছে ; সেইজন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য— এই তিন শব্দের সমাস করা হয়েছে। শূদ্রগণ দ্বিজ নয়, তাই তাদের যজ্ঞোপবীত-ধারণে, বেদাধ্যয়নে এবং যজ্ঞাদি কর্মে অধিকার নেই—এই অর্থে '**শূদ্রাণাম্**' পদের দ্বারা তাদের পৃথক করা হয়েছে।

প্রশ্ন—'**গুণৈঃ**' পদের সঙ্গে '**স্বভাবপ্রভবৈঃ**' বিশেষণ প্রয়োগের অর্থ কী এবং ঐ গুণগুলির দ্বারা উপরোক্ত চার বর্ণের কর্মগুলি ভাগ করা হয়েছে, এই কথার কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—প্রাণীদের জন্ম-জন্মান্তরে করা কর্মের যে সংস্কার, তাকে বলা হয় স্বভাব, সেই স্বভাবের অনুরূপেই প্রাণীদের অন্তঃকরণে সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনগুণের সংস্কারের উৎপত্তি হয়। এটি লক্ষ্য করানোর জন্য '**গুণৈঃ**' পদের সঙ্গে '**স্বভাবপ্রভবৈঃ**' বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে। এবং গুণাদির দ্বারা চার বর্ণের কর্মের বিভাগ করা হয়েছে, এই কথাটির অর্থ হল যে ঐ গুণবৃত্তি অনুসারেই ব্রাহ্মণাদি বর্ণে মানুষ উৎপন্ন হয় ; সেই জন্য ঐ গুণাদির অনুরূপই শাস্ত্রে চার বর্ণের কর্মগুলি ভাগ করা হয়েছে। যাঁর স্বভাবে সত্ত্বগুণ অধিক হয়, তিনি হন ব্রাহ্মণ ; তাই তাঁর স্বাভাবিক কর্ম শম-দম ইত্যাদি বলা হয়েছে। যাঁর স্বভাবে সত্ত্বমিশ্রিত রজোগুণ বেশি থাকে, তিনি হলেন ক্ষত্রিয় ; সেইজন্য তাঁর স্বাভাবিক কর্ম শৌর্য, তেজ ইত্যাদি বলা হয়েছে। যাঁর স্বভাবে তমোমিশ্রিত রজোগুণ অধিক হয় তিনি হলেন বৈশ্য ; তাই তাঁর স্বাভাবিক কর্ম কৃষি, গোরক্ষা ইত্যাদি বলা হয়েছে এবং যাঁর স্বভাবে রজোমিশ্রিত তমোগুণ বেশি হয়, তিনি হলেন শূদ্র ; তাই তাঁর স্বাভাবিক কর্ম তিন বর্ণের সেবা করা বলা হয়েছে। এই কথা চতুর্থ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ—পূর্বশ্লোকের কথন অনুসারে প্রথমে ব্রাহ্মণদের স্বাভাবিক কর্ম বলছেন—

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্।। ৪২

অন্তঃকরণের সংযম, ইন্দ্রিয়াদি দমন, ধর্মপালনের জন্য কষ্ট সহ্য করা, বাহ্যাভ্যন্তরে শুচি থাকা, অপরের অপরাধ ক্ষমা করা, কায়-মনো-বাক্যে সরল থাকা, বেদ-শাস্ত্র-ঈশ্বর ও পরলোকাদিতে শ্রদ্ধা রাখা, বেদ-গ্রন্থাদি অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করা এবং পরমাত্ম-তত্ত্ব অনুভব করা—এসবই হল ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম ।। ৪২

প্রশ্ন—'শম' কাকে বলে ?

উত্তর—অন্তঃকরণকে বশীভূত করে তাকে বিক্ষেপ-রহিত—শান্ত করা ও সাংসারিক বিষয়াদির চিন্তা ত্যাগ করাকে বলা হয় 'শম'।

প্রশ্ন—'দম' কাকে বলে ?

উত্তর—সমস্ত ইন্দ্রিয়াদিকে বশীভূত করা এবং বশীভূত ইন্দ্রিয়াদিকে বাহ্য বিষয় থেকে সরিয়ে এনে পরমাত্মার প্রাপ্তির সাধনে নিয়োগ করা হল 'দম'।

প্রশ্ন—এখানে 'তপ' শব্দটির কী অর্থ বুঝাতে হবে ?

উত্তর—স্বধর্ম পালনের জন্য কষ্ট সহ্য করা—অর্থাৎ অহিংসা মহাব্রত পালন করা, ভোগ সামগ্রী ত্যাগ করে সরলভাবে থাকা, একাদশী ইত্যাদি ব্রত উপবাস পালন করা এবং বনে বাস করা—এগুলি সবই হল 'তপ' শব্দের অন্তর্গত।

প্রশ্ন—'শৌচ' কাকে বলা হয় ?

উত্তর—ষোড়শ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে 'শৌচ'-এর ব্যাখ্যায় বাহ্য-শুদ্ধির কথা বলা হয়েছে এবং প্রথম শ্লোকে সত্ত্বশুদ্ধির নামে অন্তঃকরণের শুদ্ধির কথা বলা হয়েছে ; এখানে ঐ দুটিকে 'শৌচ' শব্দের অন্তর্গত বলে ধরা হয়েছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকেও এই

শুদ্ধির বর্ণনা আছে। অভিপ্রায় হল যে মন, ইন্দ্রিয় এবং শরীরকে ও তার দ্বারা অনুষ্ঠিত ক্রিয়াগুলিকে পবিত্র রাখা, তাতে কোনোপ্রকার অশুদ্ধি প্রবেশ করতে না দেওয়াকেই বলা হয় 'শৌচ'।

প্রশ্ন—'ক্ষান্তি' কাকে বলা হয় ?

উত্তর—অপরের অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়াকে 'ক্ষান্তি' বলে। দশম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকের ব্যাখ্যায় ক্ষমার নামে এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকের ব্যাখ্যায় ক্ষান্তির নামে এটি বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে।[১]

প্রশ্ন—'আর্জবম্' কাকে বলে ?

উত্তর—মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরকে সরল রাখা অর্থাৎ মনে কোনপ্রকার দুরাগ্রহ বা বক্রতা পোষণ না করা ; মনের যেমন ভাব, সেইমতো ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা প্রকাশ করা ; তাছাড়া শরীরেও কোনোপ্রকার দাম্ভিকতা না রাখা—এ-সবই আর্জবের অন্তর্গত।

প্রশ্ন—'আস্তিক্যম্' পদের অর্থ কী ?

উত্তর—'আস্তিক্যম্' পদটি আস্তিকতার বাচক। বেদ, শাস্ত্র, ঈশ্বর ও পরলোক—এই সবের অস্তিত্বে পূর্ণ বিশ্বাস রাখা ; বেদ, শাস্ত্র ও মহাত্মাগণের বচনকে যথার্থ মনে করা এবং ধর্মপালনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা—এ সবই আস্তিকতার লক্ষণ।

প্রশ্ন—'জ্ঞান' কাকে বলে ?

উত্তর—বেদ, শাস্ত্র শ্রদ্ধাপূর্বক অধ্যয়ন-অধ্যাপন করা এবং তাতে বর্ণিত উপদেশাবলী যথাযথ অনুভব করাকে এখানে 'জ্ঞান' বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—'বিজ্ঞানম্' পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—বেদ, শাস্ত্রে উদ্ধৃত এবং মহাপুরুষদের কাছে শ্রুত সাধনা দ্বারা পরমাত্মার স্বরূপ সাক্ষাৎ দর্শন করাকে এখানে 'বিজ্ঞান' বলা হয়েছে।

---

[১]একবার গাধিপুত্র মহারাজ বিশ্বামিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে এসে পৌঁছান। তাঁর সঙ্গে অনেক সৈন্য ছিল। নন্দিনী নামের কামধেনু গাভীর প্রসাদে বশিষ্ঠ সৈন্যসহ রাজাকে নানাপ্রকার আহার করান এবং রত্ন, বস্ত্রাভূষণ উপহার দেন। বিশ্বামিত্রের মন গাভীর জন্য লালায়িত হয় এবং তিনি সেটি বশিষ্ঠের কাছে যাচ্ঞা করেন। বশিষ্ঠ বলেন—'এই গাভীকে আমি দেবতা, অতিথি, পিতৃগণ ও যজ্ঞের জন্য রেখেছি তাই এটি দেওয়া সম্ভব নয়।' বিশ্বামিত্রের জনবল ও অস্ত্রবলের গর্ব ছিল, তিনি জোর করে নন্দিনীকে নিয়ে যেতে প্রয়াসী হন। নন্দিনী ক্রন্দন করে বশিষ্ঠকে বলেন—'ভগবন্! বিশ্বামিত্রের নির্দয় সৈন্যরা আমাকে নির্মমভাবে বেত্রাঘাত করছে, আপনি কী করে এদের অত্যাচার সহ্য করছেন ?' বশিষ্ঠ বললেন—

ক্ষত্রিয়াণাং বলং তেজো ব্রাহ্মণানাং ক্ষমা বলম্।
ক্ষমা মাং ভজতে যস্মাদগম্যতাং যদি রোচতে॥ (মহাভারত, আদিপর্ব ১৭৪।২৯)

'ক্ষত্রিয়দের বল তেজ, ব্রাহ্মণদের বল ক্ষমা। আমি ক্ষমা ত্যাগ করতে পারব না, তোমার ইচ্ছা হলে চলে যাও।' নন্দিনী বললেন—'আপনি আমাকে ত্যাগ না করলে, কেউ আমাকে বলপূর্বক নিয়ে যেতে পারবে না।' বশিষ্ঠ বললেন—'আমি ত্যাগ করছি না, তুমি থাকতে পারলে থেকে যাও।'

তখন নন্দিনী রৌদ্ররূপ ধারণ করেন, তাঁর পুচ্ছ থেকে অগ্নি বর্ষিত হতে থাকে, অতঃপর পুচ্ছ থেকে বহু ম্লেচ্ছ জাতি উৎপন্ন হয়। বিশ্বামিত্রের সেনারা হেরে যায়। নন্দিনীর সেনা বিশ্বামিত্রের একটি সেনাকেও হত করেনি, তারা ভয়ে পালিয়ে যায়। বিশ্বামিত্রকে রক্ষা করার জন্য কাউকে দেখা যায়নি। তখন বিশ্বামিত্র আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলেন—'ধিগ্বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজোবলং বলম্' (মহাভারত আদিপর্ব ১৭৪।৪৫)।

'ক্ষত্রিয়ের বলকে ধিক্কার, ব্রাহ্মণের তেজই প্রকৃত বল।' তারপর শাপবশতঃ রাক্ষস হওয়া রাজা কল্মাষপাদ বিশ্বামিত্রের প্রেরণায় বশিষ্ঠের সব পুত্রকে হত্যা করেন, তবুও বশিষ্ঠ প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করেননি।

বাল্মীকি রামায়ণে উল্লিখিত আছে যে, তারপর বিশ্বামিত্র রাজ্য ত্যাগ করে মহাতপস্যায় রত হন এবং হাজার বছর উগ্র তপস্যার প্রতাপে ক্রমশঃ রাজর্ষি ও মহর্ষি পদ লাভ করে শেষে ব্রহ্মর্ষি হন। দেবতাদের অনুরোধে ক্ষমাশীল মহর্ষি বশিষ্ঠও তাঁকে 'ব্রহ্মর্ষি' বলে মেনে নেন।

বিশ্বামিত্রোঽপি ধর্মাত্মা লব্ধ্বা ব্রাহ্মণ্যমুত্তমম্।
পূজয়ামাস ব্রহ্মর্ষিং বসিষ্ঠং জপতাং বরম্॥ (বাল্মীকীয় রামায়ণ ১।৬৫।২৭)

'ধর্মাত্মা বিশ্বামিত্রও উত্তম ব্রাহ্মণপদ লাভ করে মন্ত্র-জপকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষি শ্রী বশিষ্ঠের পূজা করেন।'

প্রশ্ন—এসব ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম, কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর অর্থ হল, ব্রাহ্মণের মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য থাকে সেইজন্য উপরোক্ত কর্মে তাঁর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়। তাঁর স্বভাব উপরোক্ত কর্মের অনুকূল হয়, তাই উপরোক্ত কর্ম করায় তাঁর কোনোরূপ কষ্ট হয় না। এই কর্মগুলিতে অনেক সাধারণ ধর্মেরও বর্ণনা করা হয়েছে। এতে বোঝা উচিত যে ক্ষত্রিয়াদি অন্য বর্ণের জন্য এগুলি স্বাভাবিক কর্ম না হলেও ঈশ্বরের প্রাপ্তিতে সকলেরই অধিকার আছে, তাই তাঁদের জন্য এসব যত্ন-সাধ্য কর্তব্যকর্ম।

প্রশ্ন—মনুস্মৃতিতে তো বলা হয়েছে ব্রাহ্মণের কর্ম স্বয়ং অধ্যয়ন করা ও অপরকে অধ্যয়ন করানো, স্বয়ং যজ্ঞ করা এবং অপরকে যজ্ঞ করানো আর স্বয়ং দান নেওয়া ও অপরকে দান দেওয়া—এই ছয় প্রকার কর্মের কথা[1]। এখানে শম, দম ইত্যাদি প্রায় সাধারণ ধর্ম-গুলিকেই ব্রাহ্মণদের কর্ম বলা হয়েছে। এর অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে উল্লিখিত কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম, তাই ব্রাহ্মণের স্বভাবের সঙ্গে এর বিশেষ সম্বন্ধ আছে ; সেইজন্য ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্মের মধ্যে এগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, বেশি বিস্তৃত করা হয়নি। এছাড়া মনুস্মৃতি ইত্যাদিতে যা বলা হয়েছে, সেগুলিও এর সঙ্গে গণ্য করতে হবে।

সম্বন্ধ—এইভাবে ব্রাহ্মণদের স্বাভাবিক কর্মের কথা জানিয়ে এবার ক্ষত্রিয়দের স্বাভাবিক কর্মের কথা জানাচ্ছেন—

শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্॥ ৪৩

শৌর্য, তেজ, ধৈর্য, দক্ষতা, যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করা, দান করা এবং শাসন ক্ষমতা এবং স্বাভিমান এ সবই ক্ষত্রিয়দের স্বভাবজাত কর্ম॥ ৪৩

প্রশ্ন—'শৌর্য' কাকে বলে ?

উত্তর—অতি বড় বলবান শত্রুর ন্যায়পূর্বক সম্মুখীন হতে ভয় না পাওয়া এবং ন্যায়যুদ্ধ করতে সর্বদা উৎসাহিত থাকা ও যুদ্ধের সময় সাহসপূর্বক পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ করাই হল 'শৌর্য'। পিতামহ ভীষ্মের জীবন এর জ্বলন্ত উদাহরণ।[2]

প্রশ্ন—'তেজ' কাকে বলে ?

উত্তর—যে শক্তির প্রভাবে মানুষ অন্যের আধিপত্য

---

[1] অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা। দানং প্রতিগ্রহং চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥ (মনুস্মৃতি ১।৮৮)

[2] আবাল্য ব্রহ্মচারী পিতামহ ভীষ্মে ক্ষত্রিয়োচিত সমস্ত গুণ বর্তমান ছিল। তিনি সুপ্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় শত্রু ভগবান পরশুরামের থেকে ব্রহ্মবিদ্যা শিখেছিলেন। পরশুরাম যখন কাশীরাজকন্যা অম্বাকে বিবাহ করার জন্য ভীষ্মকে অত্যন্ত জোর করেন, তখন ভীষ্ম অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে নিজ সত্য রক্ষার জন্য তা করতে অস্বীকার করেন ; কিন্তু পরশুরাম যখন তা কিছুতেই মেনে না নিয়ে তাঁকে ধমক দিতে থাকেন, তখন তিনি পরিষ্কারভাবে বললেন—

ন ভয়ান্নাপ্যনুক্রোশান্নার্থলোভান্ন কাময়া। ক্ষাত্রং ধর্মমহং জহ্যামিতি মে ব্রতমাহিতম্॥
যচ্চাপি কত্থসে রাম বহুশঃ পরিষৎসু বৈ। নির্জিতাঃ ক্ষত্রিয়া লোকে ময়ৈকেনেতি তচ্ছৃণু॥
ন তদা জাতবান্ ভীষ্মঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি মদ্বিধঃ। পশ্চাজ্জাতানি তেজাংসি তৃণেষু জ্বলিতং ত্বয়া॥
ব্যপনেষ্যামি তে দর্পং যুদ্ধে রাম ন সংশয়ঃ। (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ১৭৮)

'ভয়, দয়া, অর্থলোভ ও কামনার জন্য আমি কখনো ক্ষাত্র-ধর্ম ত্যাগ করতে পারব না—এ আমার ধারণ করা ব্রত। হে পরশুরাম ! আপনি সকলের সামনে অত্যন্ত বড় করে বলে থাকেন যে 'আমি একলাই অনেক (একুশ) বার ক্ষত্রিয়দের বিনাশ করেছি', তাহলে শুনুন—সেই সময় ভীষ্ম বা ভীষ্মের সমকক্ষ কোনো ক্ষত্রিয় জন্মায়নি। আপনি তৃণের ওপর আপনার প্রতাপ দেখিয়েছেন। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে তেজস্বী পরে উৎপন্ন হয়েছে। তাহলে হে পরশুরাম ! শুনুন। আমি যুদ্ধে আপনার দর্প

স্বীকার করে কোনো কর্তব্য পালনে কখনো বিমুখ হয় না এবং অন্যান্য লোকেরা তার সম্মুখে অমর্যাদাপূর্ণ ও বিরুদ্ধাচরণ করতে ভয় পায়, সেই শক্তিকে বলে 'তেজ'। একে প্রতাপ এবং প্রভাবও বলা হয়।

প্রশ্ন—'ধৈর্য' কাকে বলে ?

উত্তর—অতি বড় সংকট উপস্থিত হলে, যুদ্ধস্থলে শরীরে ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হলে, নিজ পুত্র-পৌত্রাদির মৃত্যু হলে, সর্বস্ব বিনাশপ্রাপ্ত হলে বা এইরূপ অন্য

নিঃসন্দেহে চূর্ণ করে দেব।'

পরশুরাম ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হল এবং তেইশ দিন একনাগাড়ে যুদ্ধ হতে থাকল, কিন্তু পরশুরাম ভীষ্মকে পরাস্ত করতে পারলেন না। শেষে নারদ প্রমুখ দেবর্ষিগণ ও ভীষ্মজননী গঙ্গা প্রকটিত হয়ে মধ্যস্থতা করায় এবং পরশুরাম ধনুক ত্যাগ করায় যুদ্ধ সমাপ্ত হয়। ভীষ্ম যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শনও করেননি বা আগে অস্ত্র ত্যাগও করেননি (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ১৮৫)।

মহাভারতের আঠারো দিনের যুদ্ধে ভীষ্ম একাকী দশদিন কৌরব পক্ষের সেনাপতি পদে আসীন ছিলেন। বাকি আটদিনে একাধিক সেনাপতি বদল হয়েছিল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতের যুদ্ধে অস্ত্র-গ্রহণ না করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। বলা হয় ভীষ্ম কোনো কারণবশতঃ পণ করেছিলেন যে, 'আমি ভগবানকে অস্ত্রগ্রহণ করিয়ে ছাড়ব।' মহাভারতে একথা এইভাবে না থাকলেও সুরদাস ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞার সুন্দর বর্ণনা করেছেন—

আজ জো হরিহি ন সস্ত্র গহাউঁ।
তৌ লাজৌ গঙ্গা জননী কো, সান্তনু সুত ন কহাউঁ॥
স্যন্দন খণ্ডি মহারথ খণ্ডৌ, কপিধ্বজ সহিত ডুলাউঁ। ইতী ন করৌঁ সপথ মোহি হরি কী, ক্ষত্রিয় গতিহি ন পাউঁ॥
পাণ্ডবদল সনমুখ হ্বৈ ধাউঁ, সরিতা রুধির বহাউঁ। সুরদাস রনভূমি বিজয় বিন, জিয়ত ন পীঠ দিখাউঁ॥

যাই হোক ; মহাভারতে আছে—যুদ্ধারম্ভের তৃতীয় দিনে পিতামহ ভীষ্ম যখন প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধে রত ছিলেন, তখন ভগবান ক্রুদ্ধ হয়ে ঘোড়ার রাশ ছেড়ে সূর্যের ন্যায় প্রভাযুক্ত তাঁর চক্র হাতে নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে নামেন। শ্রীকৃষ্ণের হাতে চক্র দেখে সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করে উঠলেন। ভগবান প্রলয়কালের অগ্নির ন্যায় অত্যন্ত বেগে ভীষ্মের দিকে দৌড়তে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণকে চক্র নিয়ে তাঁর দিকে আসতে দেখে ভীষ্ম একটুও ভয় পাননি, তিনি অবিচলিতভাবে ধনুকে টংকার তুলে বলতে লাগলেন—'হে দেবদেব ! হে জগন্নিবাস ! হে মাধব ! হে চক্রপাণি ! আসুন, আমি আপনাকে প্রণাম করি। হে সকলের শরণদাতা ! আমাকে বলপূর্বক এই শ্রেষ্ঠ রথের নীচে ফেলে দিন। হে শ্রীকৃষ্ণ ! আজ আপনার হাতে মৃত্যু হলে আমার ইহলোক ও পরলোকে অত্যন্ত কল্যাণ হবে। হে যদুনাথ ! আপনি স্বয়ং আমাকে মারতে আসছেন, এতে ত্রিলোকে আমার গৌরব বৃদ্ধি পেল।' অর্জুন পেছন থেকে দৌড়ে গিয়ে ভগবানের পা ধরে কোনোমতে তাঁকে ফিরিয়ে আনেন (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ৫৯)।

নবম দিনের কথা, ভগবান দেখলেন—ভীষ্ম পাণ্ডবসেনার মধ্যে প্রলয় বাধিয়ে দিয়েছেন। ভগবান ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে চাবুক নিয়ে আবার ভীষ্মের দিকে দৌড়ে গেলেন। ভগবানের তেজে যেন পদে পদে পৃথিবী ফেটে যাচ্ছিল। কৌরবপক্ষের বীরেরা ভয় পেয়ে গেলেন এবং 'ভীষ্ম মরে গেলেন, ভীষ্ম মরে গেলেন'—বলে চেঁচাতে লাগলেন। হাতির ওপর লাফিয়ে পড়া সিংহের মতো ভগবানকে নিজের দিকে আসতে দেখে ভীষ্ম একটুও বিচলিত না হয়ে ধনুক তুলে বললেন—

এহ্যেহি পুণ্ডরীকাক্ষ দেবদেব নমোঽস্তু তে। মামদ্য সাত্বতশ্রেষ্ঠ পাতয়স্ব মহাহবে॥
ত্বয়া হি দেব সংগ্রামে হতস্যাপি মমানঘ। শ্রেয় এব পরং কৃষ্ণ লোকে ভবতি সর্বতঃ॥
সম্ভাবিতোঽস্মি গোবিন্দ ত্রৈলোক্যেনাদ্য সংযুগে। প্রহরস্ব যথেষ্টং বৈ দাসোঽস্মি তব চানঘ॥

(মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ১০৬।৬৪-৬৬)

'হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! হে দেবদেব ! আপনাকে প্রণাম। হে যাদবশ্রেষ্ঠ ! আসুন, আসুন, আজ এই মহাযুদ্ধে আমাকে বধ করে আমার বীরগতি প্রদান করুন। হে অনঘ ! হে দেবদেব শ্রীকৃষ্ণ ! আজ আপনার হাতে মৃত্যু হলে আমার সর্বতোভাবে কল্যাণ হবে। হে গোবিন্দ। যুদ্ধে আপনার এই উদ্যোগে আজ আমি ত্রিভুবনে সম্মানিত হলাম। হে নিষ্পাপ ! আমি আপনার দাস, আপনি প্রাণভরে আমাকে প্রহার করুন।'

অর্জুন দৌড়ে ভগবানের হাত ধরলেও ভগবান থামলেন না, তাঁকে টেনে নিয়ে এগোতে লাগলেন। পরে অর্জুনের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করালে এবং ভীষ্মকে হত্যা করার শপথ করলে তখন ভগবান শান্ত হলেন।

কোনোপ্রকার ভীষণ বিপত্তি এলেও যিনি ব্যাকুল হন না এবং নিজ কর্তব্য পালনে কখনো বিচলিত না হয়ে ন্যায়ানুকূল কর্তব্য পালনে ব্যাপৃত থাকেন—তাকেই বলা হয় 'ধৈর্য'।

প্রশ্ন—'চতুরতা' কী ?

উত্তর—পরস্পর কলহকারীদের মধ্যে ন্যায় স্থাপন করানোতে, নিজ কর্তব্য নির্ণয় ও পালন করায়, যুদ্ধ করায় এবং শত্রু, মিত্র ও মধ্যস্থদের সঙ্গে যথাযোগ্য

দশদিন মহাযুদ্ধের পর ভীষ্ম যখন মৃত্যুর কথা চিন্তা করছিলেন, তখন আকাশে অবস্থিত ঋষি এবং বসুগণ তাঁকে বললেন—'হে তাত ! তুমি যা চিন্তা করছ, তাই আমাদের ইচ্ছা।' তারপর শিখণ্ডীর সামনে বাণ না চালানোয় বালব্রহ্মচারী ভীষ্ম অর্জুনের বাণে বিদ্ধ হয়ে শরশয্যায় পতিত হন। পড়ার সময় ভীষ্ম সূর্যকে দক্ষিণায়নে দেখেন, তাই তিনি প্রাণত্যাগ করেননি। গঙ্গা মহর্ষিদের হংসরূপে তাঁর কাছে প্রেরণ করলেন। ভীষ্ম বলেন—'উত্তরায়ণে সূর্য যাওয়া পর্যন্ত আমি জীবিত থাকব, উপযুক্ত সময় এলেই আমি প্রাণত্যাগ করব।' ভীষ্মের শরীরে এমন দু'আঙুল স্থান খালি ছিল না, যেখানে অর্জুন নিক্ষিপ্ত বাণ বিদ্ধ ছিল না (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ১১৯)। তাঁর মাথাটি কেবল নীচের দিকে ঝুলছিল। তিনি বালিশ চেয়েছিলেন। দুর্যোধনেরা অতি সুন্দর নরম বালিশ দ্রুত এনে হাজির করলেন। ভীষ্ম মৃদুহাস্যে বললেন—'বীরসকল ! এই বালিশ বীরশয্যার যোগ্য নয়।' শেষে অর্জুনকে বললেন—'পুত্র ! আমাকে উপযুক্ত বালিশ দাও।' অর্জুন তিনটি বাণ তাঁর মস্তকের নীচে এমন ভাবে স্থাপন করলেন যে মাথা উঁচুতে উঠে গেল, বাণটি বালিশের কাজ করল। ভীষ্ম প্রসন্ন হয়ে বললেন—

এবমেব মহাবাহো ধর্মেষু পরিতিষ্ঠতা। স্বপ্তব্যং ক্ষত্রিয়েণাজৌ শরতল্পগতেন বৈ॥ (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব, ১২০।৪৯)

'হে মহাবাহো ! দৃঢ়তাপূর্বক ক্ষাত্রধর্মে স্থিত থাকা ক্ষত্রিয়দের রণাঙ্গনে প্রাণত্যাগকালে শরশয্যার ওপর এইভাবে শায়িত হওয়া উচিত।'

ভীষ্ম বাণের দ্বারা আহত হয়ে শরশয্যায় শায়িত রইলেন। তা দেখে বাণ তোলার জন্য অভিজ্ঞ শল্যবৈদ্যকে আনা হল। তখন ভীষ্ম বললেন—'আমার তো ক্ষত্রিয়দের পরমগতি লাভ হয়েছে, এখন এই চিকিৎসকদের প্রয়োজন কী ?' (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ১২০)

আঘাতের ফলে ভীষ্মের অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছিল। তিনি ঠাণ্ডা জল চাইলেন। লোকে কলসী করে ঠাণ্ডা জল নিয়ে দৌড়ে এলো। ভীষ্ম বললেন—'আমি শরশয্যায় শয়ন করে উত্তরায়ণের প্রহর গুনছি, আপনারা আমার জন্য একী এনেছেন ?' শেষে অর্জুনকে ডেকে বললেন—'বৎস ! আমার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে, তুমি পারবে, আমাকে জল খাওয়াও।' অর্জুন রথে উঠে গাণ্ডীবে শর সংযোজন করে ভীষ্মের ডানদিকের মাটিতে পার্জন্যাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। তখনই সেখান থেকে অমৃতের ন্যায় সুগন্ধিযুক্ত উত্তম জলের ধারা নির্গত হয়ে ভীষ্মের মুখে পড়তে লাগল, ভীষ্ম জলপান করে তৃপ্ত হলেন (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ১২১)।

মহাভারতের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে ভীষ্মের কাছে গেলেন। শীর্ষস্থানীয় সকল ব্রহ্মবেত্তা ও ঋষি-মুনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ভীষ্ম ভগবানকে দেখে প্রণাম ও স্তব করলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মকে বললেন—উত্তরায়ণ আসতে এখনও দেরী আছে, তারমধ্যে আপনি যে ধর্মশাস্ত্রের জ্ঞান সম্পন্ন করেছেন, তা যুধিষ্ঠিরকে শুনিয়ে তাঁর শোক প্রশমিত করুন।' ভীষ্ম তখন বললেন—'প্রভো ! আমার শরীর বাণের আঘাতে জর্জরিত, মন-বুদ্ধি চঞ্চল, কথা বলার শক্তি নেই, বারংবার মূর্চ্ছা হচ্ছে, শুধু আপনার কৃপাতেই বেঁচে আছি ; তা সত্ত্বেও আপনার মতো জগদ্গুরুর সামনে কিছু বলাও ধৃষ্টতা হবে। আমি বলতে পারছি না, ক্ষমা করুন।' প্রেমে ছলছল চোখে ভগবান গদগদ স্বরে বললেন—'ভীষ্ম ! তোমার গ্লানি, মূর্চ্ছা, জ্বালা, ব্যথা, ক্ষুধা, ক্লেশ, মোহ—আমার কৃপায় সব এখনই দূর হয়ে যাবে ; তোমার অন্তরে সর্বপ্রকার জ্ঞানের স্ফুরণ হবে ; তোমার বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা হবে, তোমার মন নিত্য সত্ত্বগুণে স্থির হয়ে যাবে। তুমি ধর্ম বা যে কোনো বিদ্যা চিন্তা করবে, সেটিই তোমার বুদ্ধির অন্তর্গত হবে।' শ্রীকৃষ্ণ আবার বললেন, 'আমি নিজে উপদেশ না দিয়ে, তোমাকে দিয়ে করাচ্ছি যাতে আমার ভক্তের যশ ও কীর্তি আরও বৃদ্ধি পায়।' ভগবৎ প্রসাদে ভীষ্মের শরীরের সমস্ত ব্যথা-বেদনা তখনই দূর হয়ে গেল, তাঁর অন্তঃকরণ সতর্ক ও বুদ্ধি সর্বতোভাবে জাগ্রত হল। ব্রহ্মচর্য, অনুভব, জ্ঞান ও ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে অগাধ জ্ঞানী ভীষ্ম যেভাবে দশদিন যুদ্ধে তরুণ উৎসাহে যুদ্ধ করছিলেন, সেইভাবে উৎসাহের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরকে ধর্মের সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণভাবে উপদেশ প্রদান করেন এবং তাঁর শোক-সন্তপ্ত হৃদয়কে শান্ত করেন (মহাভারত, শান্তিপর্ব ও অনুশাসনপর্ব)।

আটান্নদিন শরশয্যায় থাকার পর সূর্য উত্তরায়ণে গেলে ভীষ্ম প্রাণত্যাগ করা স্থির করেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলেন—'হে ভগবন্ ! হে দেবদেব ! হে সুরাসুর বন্দিত ! হে ত্রিবিক্রম ! হে শঙ্খচক্র গদাধারী ! আমি আপনাকে প্রণাম করি। হে

ব্যবহার ইত্যাদি করায় যে কৌশল, তারই নাম 'চতুরতা' বা দক্ষতা।

প্রশ্ন—যুদ্ধে না পালানো কাকে বলে ?

উত্তর—যুদ্ধ করার সময় মহাসংকট উপস্থিত হলেও পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করা, সর্ব অবস্থায় ন্যায়তঃ সম্মুখে থেকে নিজ শক্তি প্রয়োগ করতে থাকা এবং প্রাণের পরোয়া না করে যুদ্ধে অবিচল থাকাকে বলে 'যুদ্ধ থেকে না পালানো'। এই ধর্ম মনে রেখে বীর বালক অভিমন্যু ছ'জন মহারথীর সঙ্গে একাকী যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দেন কিন্তু অস্ত্রত্যাগ করেননি (মহাভারত, দ্রোণপর্ব ৪৯।২২)। আধুনিক কালেও রাজস্থানের ইতিহাসে এরূপ অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়, যাতে বীর রাজপুতেরা হেরে গেলেও শত্রুকে পিঠ দেখাননি এবং একাকী শত-সহস্র সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণত্যাগ করেছেন।

প্রশ্ন—দান করা কী ?

উত্তর— নিজের স্বত্ব উদারতাসহ যথাবশ্যক যোগ্য পাত্রকে অর্পণ করাকে বলা হয় দান করা (১৭।২০)।

প্রশ্ন—'ঈশ্বরভাব' কাকে বলে ?

উত্তর— শাসনের দ্বারা লোককে অন্যায় আচরণ থেকে নিবৃত্ত করে সদাচারে প্রবৃত্ত করা, দুরাচারীদের দণ্ড প্রদান করা, লোকেদের নিজের নির্দেশের ন্যায়যুক্ত পালন করানো ও সমস্ত প্রজার হিতের কথা ভেবে নিঃস্বার্থভাবে প্রেমপূর্বক পুত্রের ন্যায় তাদের রক্ষা ও পালন-পোষণ করা—একেই বলে ঈশ্বর-ভাব।

প্রশ্ন—এ সবই ক্ষত্রিয়দের স্বাভাবিক কর্ম, একথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে, ক্ষত্রিয়দের স্বভাবে সত্ত্বমিশ্রিত রজোগুণের প্রাধান্য থাকে ; তাই উপরোক্ত কর্মে তাঁদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকে, এসব পালন করায় তাঁদের কোনো কষ্ট হয় না। এই সব কর্মেও যে ধৈর্য, দান ইত্যাদি সাধারণ ধর্ম থাকে, তাতে সকলের অধিকার থাকায় এগুলি অন্য বর্ণের লোকের জন্য অধর্ম বা পরধর্ম নয়, কিন্তু এগুলি তাঁদের স্বাভাবিক কর্ম নয়, সেইজন্য এগুলি তাঁদের পক্ষে কষ্টকর ও চেষ্টাসাধ্য।

প্রশ্ন — মনুস্মৃতিতে সংক্ষিপ্ত ভাবে বলা হয়েছে যে[1] ক্ষত্রিয়দের কর্ম হল প্রজাপালন করা, দান করা, যজ্ঞ করা, বেদাদি অধ্যয়ন করা এবং বিষয়াসক্ত না হওয়া আর এখানে প্রায় অন্য কথা বলা হয়েছে, এর অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে ক্ষত্রিয়দের স্বভাবের সঙ্গে বিশেষ-ভাবে সম্বন্ধিত কর্মসমূহের বর্ণনা করা হয়েছে ; সুতরাং মনুস্মৃতিতে উদ্ধৃত কর্মগুলির মধ্যে ক্ষত্রিয়দের স্বভাবের সঙ্গে বিশেষ ভাবে সম্বন্ধিত প্রজাপালন ও দান—এই দুটি কর্ম এখানে উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু তাঁদের অন্যান্য কর্তব্যকর্মের এখানে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়নি। তাই এগুলি ব্যতীত অন্যান্য যে সব কর্ম ক্ষত্রিয়দের জন্য অন্যত্র কর্তব্য বলে উদ্ধৃত হয়েছে, সেগুলিকেও এরই অন্তর্গত বলে বুঝতে হবে।

বাসুদেব ! হিরণ্যাত্মা, পরমপুরুষ, সবিতা, বিরাট, জীবরূপ, অনুরূপ পরমাত্মা ও সনাতন আপনিই ! হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! হে পুরুষোত্তম ! আপনি আমাকে উদ্ধার করুন। হে শ্রীকৃষ্ণ, হে বৈকুণ্ঠ ! হে পুরুষোত্তম ! এবার আমাকে যাওয়ার আদেশ দিন। আমি মন্দবুদ্ধি দুর্যোধনকে অনেক বুঝিয়েছি—'যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধর্মো যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ।'

'যেখানে শ্রীকৃষ্ণ, সেখানেই ধর্ম, যেখানে ধর্ম, সেখানেই বিজয়। কিন্তু সেই মূর্খ আমার কথা শোনেনি। আমি আপনাকে জানি, আপনিই পুরাণ পুরুষ। আপনি নারায়ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েছেন।'

স মাং ত্বমনুজানীহি কৃষ্ণ মোক্ষ্যে কলেবরম্।

ত্বয়াহং সমনুজ্ঞাতো গচ্ছেয়ং পরমাং গতিম্॥ (মহাভারত, অনুশাসনপর্ব ১৬৭।৪৫)

'হে শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি আদেশ দিন, আমি শরীর ত্যাগ করি। আপনার আদেশে শরীর ত্যাগ করে আমি পরম গতি লাভ করব।'

ভগবান আদেশ দিলেন, তখন ভীষ্ম যোগবলে বায়ু রোধ করে প্রাণকে ক্রমশঃ ওপরে ওঠাতে আরম্ভ করলেন। প্রাণবায়ু যে অঙ্গ ত্যাগ করে ওপরে উঠছিল, সেই অঙ্গের বাণ তৎক্ষণাৎ পড়ে যাচ্ছিল এবং ক্ষত মুছে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভীষ্মের শরীর থেকে সমস্ত বাণ পড়ে গেল, শরীরে একটিও ক্ষত রইল না। প্রাণ ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে ওপরে উঠে গেল। লোকেরা দেখল, ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে নির্গত তেজ দেখতে দেখতে আকাশে বিলীন হয়ে গেল।

[1]প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥ (মনুস্মৃতি ১।৮৯)

সম্বন্ধ—এইভাবে ক্ষত্রিয়দের স্বাভাবিক কর্মের বর্ণনা করে এবার বৈশ্য ও শূদ্রদের স্বাভাবিক কর্ম বলেছেন—

কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যম্ বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥ ৪৪

কৃষি, গোপালন, ক্রয়-বিক্রয়রূপ সত্য ব্যবহার—এসব বৈশ্যদের স্বভাবজাত কর্ম এবং সর্ব বর্ণের সেবা করা হল শূদ্রদের স্বাভাবিক কর্ম॥ ৪৪

প্রশ্ন—'কৃষি' অর্থাৎ চাষ করা কী ?

উত্তর—ন্যায়প্রাপ্ত জমিতে বীজ বপন করে ধান, গম, ছোলা, মুগ, হলুদ, ধনে ইত্যাদি সব খাদ্য-পদার্থ, কাপাস এবং নানাপ্রকার ঔষধি ও এইরূপ দেবতা, মানুষ, পশু-পক্ষী ইত্যাদির উপযোগী অন্য পবিত্র বস্তু উৎপন্ন করাকে বলা হয় 'কৃষি' বা চাষ করা।

প্রশ্ন—'গৌরক্ষ্য' বা গোপালন কাকে বলে ?

উত্তর—নন্দ প্রমুখ 'গোপেদের' ন্যায় নিজ গৃহে গরু রাখা, তাকে জঙ্গলে চরানো, গৃহে যথাবশ্যক ঘাস-জল দেওয়া, হিংস্র জন্তু থেকে রক্ষা করা, তাদের থেকে দুধ, দই, ঘি ইত্যাদি উৎপন্ন করে লোকেদের প্রয়োজন পূর্ণ করা এবং তার পরিবর্তে প্রাপ্ত অর্থে নিজ পরিবারসহ গরুদের ন্যায়তঃ ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা, একেই বলা হয় 'গৌরক্ষ্য' বা গোপালন।

পশুদের মধ্যে গরুই প্রধান এবং মানুষের জন্য সব থেকে অধিক উপকারী প্রাণী গরুই। তাই ভগবান এখানে **'পশুপালনম্'** পদের প্রয়োগ না করে তার পরিবর্তে 'গৌরক্ষ্য' পদ প্রয়োগ করেছেন। সুতরাং জানতে হবে যে, মানুষের উপযোগী মোষ, উট, ঘোড়া, হাতি ইত্যাদি অন্যান্য পশুদের পালন করাও বৈশ্যদের কর্ম। গোপালন অবশ্যই এই সবের থেকে সর্বাধিক মহত্ত্বপূর্ণ কর্তব্য।

প্রশ্ন—বাণিজ্য অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়রূপ সত্য-ব্যবহার কাকে বলে ?

উত্তর—মানুষ এবং দেবতা, পশু, পক্ষী ইত্যাদি অন্য সমস্ত প্রাণীদের উপযোগী সমস্ত পবিত্র বস্তুসমূহ ধর্মানুকূল কেনা-বেচা ও প্রয়োজনানুসারে সেসব এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পৌঁছে সাধারণ লোকের আবশ্যকতা পূর্ণ করাকে বলা হয় বাণিজ্য বা ক্রয়-বিক্রয়রূপে ব্যবহার। বাণিজ্য করার সময়, বস্তু কেনা-বেচার সময়, মাপ-ওজন ও গোণার সময় কম দেওয়া বা বেশি নিয়ে নেওয়া, বস্তুটি বদল করে বা একটি বস্তুর সঙ্গে অন্যটি মিলিয়ে ভালো বস্তুর বদলে খারাপ বস্তু দিয়ে দেওয়া, খারাপ বস্তুর বদলে ভালো বস্তু নিয়ে নেওয়া, দালালি ইত্যাদির দ্বারা নির্ধারিত অর্থের চেয়ে বেশি নেওয়া বা কম দেওয়া, এবং তদনুরূপ কোনো বিষয়ে মিথ্যা, কপটাচার, চুরি বা জোর করে অথবা অন্য কোনোভাবে অন্যায় ব্যবহার দ্বারা অপরের স্বত্ব হরণ করা—এসব হল বাণিজ্যিক দোষ। এই সব দোষ রহিত হয়ে সত্য ও ন্যায়যুক্তভাবে পবিত্র বস্তু কেনা-বেচাকে, বলা হয় ক্রয়-বিক্রয়রূপ সত্য ব্যবহার। তুলাধার এরূপ ক্রয়-বিক্রয়রূপ ব্যবহার দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।[১]

প্রশ্ন—এসব বৈশ্যদের স্বাভাবিক কর্ম, এই কথাটির

[১]কাশীতে তুলাধার নামে এক বৈশ্য ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি মহাতপস্বী ও ধর্মাত্মা ছিলেন। ন্যায় ও সত্যের আশ্রয় নিয়ে ক্রয়-বিক্রয়রূপ ব্যবসা করতেন।

জাজলি নামে এক ব্রাহ্মণ সমুদ্রতীরে কঠিন তপস্যা করতেন। তাঁর জটাতে পাখিরা বাসা বানিয়েছিল, তাতে তাঁর নিজ তপস্যায় অত্যন্ত গর্ব হয়েছিল। তখন দৈববাণী হয় যে, 'হে জাজলি ! তুমি তুলাধারের মতো ধার্মিক নও, সে তোমার ন্যায় গর্ব করে না।' জাজলি কাশীতে এসে দেখলেন যে তুলাধার ফল, মূল, ঘি, মশলা ইত্যাদি বিক্রী করছেন। তুলাধার স্বাগত সৎকার ও প্রণাম করে জাজলিকে বললেন—'আপনি সমুদ্রের তীরে বড়ো তপস্যা করেছেন। আপনার চুলের জটায় পাখির বাচ্চা হয়েছে তাতে আপনার গর্ব হয়েছে, এখন আপনি দৈববাণী শুনে এখানে এসেছেন, বলুন, আমি আপনার কী সেবা করব।' তুলাধারের এরূপ জ্ঞান দেখে জাজলি আশ্চর্যান্বিত হলেন, তিনি তুলাধারকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুলাধার তখন তাঁকে ধর্মের অত্যন্ত সুন্দর কথা শোনালেন। জাজলি তুলাধারের কাছে ধর্মের কথা শুনে অত্যন্ত শান্তি পেলেন। মহাভারতের শান্তিপর্বে ২৬১ থেকে ২৬৪ অধ্যায় পর্যন্ত এই সুন্দর উপাখ্যান রয়েছে।

অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে বৈশ্যের স্বভাবে তমোমিশ্রিত রজোগুণ প্রধান হয়, সেইজন্য তাঁর উপরোক্ত কর্মে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়। তাঁর স্বভাব উপরোক্ত কর্মসমূহের অনুকূল হয়, তাই এগুলি করতে তাঁর কোনো কষ্ট হয় না।

প্রশ্ন—মনুস্মৃতিতে তো উপরোক্ত কর্ম ব্যতীত যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান ও সুদ গ্রহণ—বৈশ্যদের জন্য চারটি কর্ম অধিক বলা আছে ;[1] এখানে তার বর্ণনা করা হয়নি কেন ?

উত্তর—এখানে বৈশ্যের স্বভাবের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্বন্ধিত কর্মগুলির বর্ণনা করা হয়েছে ; যজ্ঞাদি শুভকর্ম দ্বিজদের কর্ম, সুতরাং সেগুলি বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্মে গণ্য হয়নি এবং বৈশ্যের কর্মগুলির মধ্যে সুদ নেওয়াকে অন্য কর্ম থেকে হীন মনে করা হয়েছে, তাই এটিকেও স্বাভাবিক কর্মের মধ্যে গণনা করা হয়নি। এছাড়া শম-দম ইত্যাদি মুক্তির আরও যেসব সাধন আছে, তাতে সকলের অধিকার থাকায় এটি বৈশ্যের স্বধর্ম থেকে পৃথক নয়। কিন্তু বৈশ্যের তাতে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয় না, তাই তাঁদের স্বাভাবিক কর্মের মধ্যে এগুলি ধরা হয়নি।

প্রশ্ন—'**পরিচর্যাত্মকম্**' অর্থাৎ সকল বর্ণের সেবা করা কাকে বলে ?

উত্তর—উপরোক্ত দ্বিজাতি বর্ণদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের দাসবৃত্তিতে থাকা, তাঁদের আদেশ পালন করা, জল তুলে দেওয়া, জীবন-নির্বাহের কাজে সাহায্য করা, তাঁদের পশুদের পালন করা, কাপড় পরিষ্কার করা, ক্ষৌরকর্ম করা ইত্যাদি যত সেবাকার্য আছে, সেসব করে তাঁদের সন্তুষ্ট রাখা অথবা সকলের প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরি করে তার বিনিময়ে নিজ নিজ জীবিকা নির্বাহ করা—এ সবই '**পরিচর্যাত্মকম্**' অর্থাৎ সর্ব বর্ণের সেবা রূপ কর্মের অন্তর্গত।

প্রশ্ন—এসব শূদ্রেরও স্বাভাবিক কর্ম, এই কথার অর্থ কী এবং এখানে 'অপি' পদ প্রয়োগের কী তাৎপর্য ?

উত্তর—শূদ্রদের স্বভাবে রজোমিশ্রিত তমোগুণ প্রধান হয়, তাই উপরোক্ত সেবাকার্যে তাঁদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়। এইসব কর্ম তাঁদের স্বভাবের অনুকূল হয় এবং এসব করতে তাঁদের কোনোরূপ কষ্ট বোধ হয় না। এখানে ভগবানের '**অপি**' পদ প্রয়োগ করার তাৎপর্য হল, অন্য বর্ণের লোকেদের কাছে যেমন তাঁদের অনুরূপ কর্ম স্বাভাবিক হয়ে থাকে, তেমনই শূদ্রের জন্যও সেবাকর্ম স্বাভাবিক ; সেই সঙ্গে এই ভাবও প্রকাশ করেছেন যে, শূদ্রের কেবল সেবা কর্মই কর্তব্য[2] এবং সেটিই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক, অতএব তাঁর পক্ষে সেটি পালন করাই অত্যন্ত সহজ।[3]

---

[1]পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। বণিক্ পথং কুসীদং চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ।। (মনুস্মৃতি ১।৯০)

[2]একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম সমাদিশৎ। এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া।। (মনুস্মৃতি ১।৯১)

'ভগবান শূদ্রের জন্য কেবল একটি কর্মই বলেছেন যে দোষদৃষ্টি ত্যাগ করে পূর্বোক্ত দ্বিজদের সেবা করা।'

[3]আজকাল বলা হয় যে বর্ণবিভাগ উচ্চবর্ণের অধিকারী ব্যক্তিদের স্বার্থপূর্ণ সৃষ্টি, কিন্তু ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় যে, সমাজ-শরীরের সুব্যবস্থার জন্য বর্ণধর্ম অত্যন্ত প্রয়োজন এবং এটি মানুষের সৃষ্টও নয়। বর্ণধর্ম ভগবান দ্বারা রচিত। স্বয়ং ভগবান বলেছেন—'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্মবিভাগশঃ' (গীতা ৪।১৩)।

'গুণ এবং কর্মবিভাগে চার বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) আমিই সৃষ্টি করেছি।' ভারতে দিব্য দৃষ্টিসম্পন্ন ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিগণ ভগবানের নির্মিত এই সত্য প্রত্যক্ষরূপে প্রাপ্ত করেছিলেন এবং এই সত্যের ওপর সমাজ নির্মাণ করে তাকে সুব্যবস্থিত, শান্তি, শীলময়, সুখী, কর্মপ্রবণ, স্বার্থদৃষ্টিশূন্য, কল্যাণপ্রদ ও সুরক্ষিত করেছেন। সামাজিক সুব্যবস্থার জন্য সর্বদেশে ও সর্বকালে মানুষের চার বিভাগের প্রয়োজন হয়েছিল এবং সবেতেই চারটি ভাগ ছিল এবং আছে। কিন্তু এই ঋষিদের দেশে এটি যেমন সুব্যবস্থিত রূপে ছিল, অন্য কোথাও তেমনভাবে ছিল না।'

সমাজে ধর্মস্থাপন ও রক্ষার জন্য, সমাজ-জীবনকে সুখী রাখার জন্য সমাজের জীবন-পদ্ধতিতে কোনো বাধা উপস্থিত হলে, প্রয়োজন মতো সেই বাধা দূর করার জন্য, কর্মপ্রবাহের চক্র থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য, সমস্যা দূরীকরণের জন্য এবং ধর্ম সংকট উপস্থিত হলে সমুচিত ব্যবস্থা প্রদানের জন্য পরিষ্কৃত ও নির্মল মস্তিষ্কের প্রয়োজনীয়তা থাকে। ধর্মের এবং ধর্মে স্থিত সমাজকে ভৌতিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য বাহুবলের প্রয়োজন হয়। মস্তিষ্ক ও বাহুকে যথাযোগ্যভাবে পোষণ করার জন্য অর্থ ও

সম্বন্ধ—এইভাবে চারবর্ণের স্বাভাবিক কর্মের বর্ণনা করে এবার ভক্তিযুক্ত কর্মযোগের স্বরূপ ও ফল বলার জন্য এবং সেই কর্মের কীরূপ আচরণ করলে মানুষ অনায়াসে পরম সিদ্ধিলাভ করতে সক্ষম হন—দুটি শ্লোকে তাই জানাচ্ছেন—

স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥ ৪৫

নিজ নিজ স্বাভাবিক কর্মে তৎপর ব্যক্তি ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ পরম সিদ্ধি লাভ করেন। নিজ স্বাভাবিক কর্মে তৎপর ব্যক্তি কীরূপে কর্মের দ্বারা পরম সিদ্ধি লাভ করেন, আমার কাছে সেই বিধি শোনো॥ ৪৫

অন্নের প্রয়োজন হয় এবং উপরোক্ত কর্ম যথাযোগ্যভাবে সম্পন্ন করানোর জন্য শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজনীয়তা থাকে।

তাই সমাজ-শরীরের মস্তিষ্ক হল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় হল বাহু, বৈশ্য উরু এবং শূদ্র হল চরণ। চারটি একই সমাজ-শরীরের চার আবশ্যক অঙ্গ এবং একটি অপরের সাহায্যে সুরক্ষিত ও জীবিত থাকে। ঘৃণা বা অবহেলার কথা তো দূরের ব্যাপার, এরমধ্যে কাউকে বিন্দুমাত্র অপমান বা অবহেলা করা সম্ভবই নয়। এতে কোনো উচ্চ-নীচের কল্পনাও করা যায় না। নিজ নিজ স্থানের কার্যানুসারে চারটিই প্রধান। ব্রাহ্মণ জ্ঞানবলে, ক্ষত্রিয় বাহুবলে, বৈশ্য ধনবলে এবং শূদ্র জনবল ও শ্রমবলে বড় এবং চারজনেরই পূর্ণ উপযোগিতা আছে। এঁদের উৎপত্তিও ভগবানের শরীর থেকেই হয়েছে—ব্রাহ্মণের উৎপত্তি ভগবানের শ্রীমুখ থেকে, ক্ষত্রিয়ের বাহু থেকে ও বৈশ্যের উরু থেকে এবং শূদ্রের উৎপত্তি চরণ থেকে।

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ। ঊরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্‌ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥

(ঋগ্বেদ স. ১০।৯০।১২)

কিন্তু এঁদের নিজের নিজের বল স্ব-স্বার্থসিদ্ধির জন্যও নয় বা অন্য কাউকে দমন করে নিজে বড় হওয়ার জন্যও নয়। সমাজ-শরীরের আবশ্যক অঙ্গের রূপে এঁদের যোগ্যতা অনুসারে কর্মবিভাগ হয়েছে। এগুলি কেবলমাত্র ধর্মপালন করা ও করানোর জন্য। উচ্চ-নীচের ভাব না থেকে যথাযোগ্য কর্ম-বিভাগ হওয়াতেই চার বর্ণের মধ্যে শক্তি-সামঞ্জস্য বজায় থাকে। কেউ কাউকে অবহেলা বা ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত করতে পারে না। এই কর্মবিভাগ এবং কর্মাধিকারের সুদৃঢ় আধারে রচিত এই বর্ণধর্ম এতো সুব্যবস্থিত যে এতে শক্তি-সামঞ্জস্য স্বতঃই বিরাজ করে। স্বয়ং ভগবান এবং ধর্মনির্মাতা ঋষিগণ প্রত্যেক বর্ণের কর্মগুলি পৃথকভাবে স্পষ্ট নির্দেশ করে সকলকে তাঁদের নিজ নিজ ধর্ম নির্বিঘ্নে পালন করার জন্য আরও সুবিধা করে দিয়েছেন এবং স্বকর্ম পূর্ণভাবে পালন হলে শক্তি-সামঞ্জস্যতে কখনো বাধা আসতে পারে না।

ইউরোপ ইত্যাদি মহাদেশে স্বাভাবিকভাবেই মনুষ্য-সমাজের চারটি ভাগ থাকলেও নির্দিষ্ট নিয়ম না থাকায় সেখানে শক্তি-সামঞ্জস্য নেই। তারজন্য কখনো জ্ঞানবল সৈন্যবলকে দমন করে, কখনো জনবল ধনবলকে অবদমিত করে। ভারতীয় বর্ণবিভাগে এরূপ না হয়ে সবার জন্য পৃথক-পৃথক কর্ম নির্দিষ্ট আছে।

ঋষিসেবিত বর্ণধর্মে ব্রাহ্মণের পদ সর্বোচ্চ, তিনি সমাজের ধর্মের নির্মাতা, তাঁর রচিত নিয়ম সকলে মানেন। তিনি সবাকার গুরু ও পথপ্রদর্শক। কিন্তু তিনি অর্থসংগ্রহ করেন না, দণ্ডপ্রদান করেন না, ভোগ-বিলাসে তাঁর রুচি থাকে না, স্বার্থ বলে কিছু তাঁর জীবনে নেই। ধনৈশ্বর্যকেও পদগৌরবকে ধুলার মতো মনে করে ফল-মূলের ওপর জীবন-নির্বাহ করেন এবং সপরিবারে দূরে বনে বাস করেন। দিন-রাত তপস্যা, ধর্মসাধন ও জ্ঞানার্জনে ব্যাপৃত থাকেন। নিজ শম, দম, ক্ষমা, তিতিক্ষা সমন্বিত মহা তপোবলের প্রভাবে দুর্লভ জ্ঞাননেত্র লাভ করেন এবং সেই জ্ঞানের দিব্য জ্যোতির দ্বারা সত্য দর্শন করে সেই সত্যকে কোনো স্বার্থ ছাড়াই সদাচারপরায়ণ, সাধু-স্বভাব ব্যক্তিদের মাধ্যমে সমাজে বিতরণ করেন। পরিবর্তে কিছুই চান না। সমাজ নিজ ইচ্ছায় যা দেয় বা ভিক্ষা দ্বারা যা পাওয়া যায়, তাতেই তিনি অত্যন্ত সরলতার সঙ্গে জীবন-নির্বাহ করেন। তাঁর জীবনের এটিই হল ধর্মময় আদর্শ।

ক্ষত্রিয় সকলকে শাসন করেন। অপরাধীকে দণ্ড ও সদাচারীকে পুরস্কৃত করেন। দণ্ডবলের দ্বারা দুষ্টকে মাথা তুলতে দেন না। দুরাচারীদের, চোরদের, ডাকাতদের এবং শত্রুদের হাত থেকে ধর্ম ও সমাজকে রক্ষা করেন। ক্ষত্রিয় দণ্ড দিলেও আইন নিজে রচনা করেন না। ব্রাহ্মণ নির্মিত আইন অনুযায়ীই তিনি আচরণ করেন। ব্রাহ্মণরচিত আইনানুসারেই তাঁরা প্রজাদের থেকে কর আদায় করেন এবং সেই অনুযায়ী প্রজাহিতের জন্য ব্যবস্থাসহ তা ব্যয় করেন। আইন তৈরি করেন ব্রাহ্মণ এবং ধনভাণ্ডার থাকে বৈশ্যের কাছে। ক্ষত্রিয় শুধুমাত্র বিধি অনুসারে ব্যবস্থাপক ও সংরক্ষক মাত্র।

প্রশ্ন—এই বাক্যে 'স্বে' পদ দুবার প্রয়োগ করে কী অর্থের প্রতি লক্ষ্য করানো হয়েছে ? 'সংসিদ্ধিম্' পদ কোন্ সিদ্ধির বাচক ?

উত্তর—এখানে 'স্বে' পদটি দুবার প্রয়োগে ভগবানের অভিপ্রায় হল, যে ব্যক্তির যেটি স্বাভাবিক কর্ম সেটির অনুষ্ঠান করলে তার পরমপদ লাভ হয়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের তাঁর শম-দমাদি কর্মে, ক্ষত্রিয়ের শৌর্য-বীর্যে, প্রজাপালন ও দানাদি কর্মে, বৈশ্যের কৃষি ইত্যাদি কর্মে যে ফল প্রাপ্তি হয়, শূদ্রের সেই ফল লাভ হয় শুধুমাত্র সেবারূপ কর্মের দ্বারা। তাই যার যেটি স্বাভাবিক কর্ম, তার

ধনের মূল বাণিজ্য, পশু ও অন্ন—এসব বৈশ্যের হাতে থাকে। বৈশ্য ধন-উপার্জন করেন, তাকে বাড়িয়ে তোলেন, কিন্তু তা নিজের জন্য নয়। তিনি ব্রাহ্মণের জ্ঞান এবং ক্ষত্রিয়ের বলে সংরক্ষিত হয়ে ধনকে সর্ববর্ণের হিতে সেই বিধান অনুসারে ব্যয় করেন। শাসন করাতেও তাঁর কোনো অধিকার থাকে না এবং তাতে তাঁর কোনো প্রয়োজনও নেই। কারণ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় তাঁর বাণিজ্যে কখনো কোনো হস্তক্ষেপ করেন না। স্বার্থবশতঃ তাঁর ধন কখনো আহরণ করেন না, বরং তা রক্ষা করেন এবং জ্ঞানবল ও বাহুবলে এমন সুব্যবস্থা করেন, যাতে তাঁর নিজের ব্যবসা সুচারুভাবে চলতে পারে। এতে বৈশ্যের মনে কোনো অসন্তোষ থাকে না। বৈশ্য প্রসন্নতার সঙ্গে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য মেনে নেন এবং তার প্রয়োজনীয়তাও বোঝেন, কারণ তাতেই তাঁর মঙ্গল। তিনি খুশি হয়ে রাজাকে কর দেন, ব্রাহ্মণের সেবা করেন এবং বিধিমতো আদর-সহ শূদ্রকে যথেষ্ট অন্ন-বস্ত্র প্রদান করেন।

বাকি থাকে শূদ্র। স্বাভাবিকভাবে শূদ্র জনসংখ্যায় অধিক হয়। তাঁদের শারীরিক শক্তি প্রবল, কিন্তু মানসিক শক্তি কিছু কম। তাই শারীরিক শ্রমই তাঁর ভাগে অধিক মাত্রায় প্রযোজ্য। সমাজের জন্য শারীরিক শক্তির অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তাও থাকে। তাই এঁর শারীরিক শক্তির মূল্য কোনো অংশে কম নয়। শূদ্রের জনবলের ওপরই তিন বর্ণের প্রতিষ্ঠা। এটিই আধার, কারণ পায়ের বলেই শরীর চলে। তাই শূদ্রকে তিন বর্ণই তাদের প্রিয় অঙ্গ বলে মানেন। তাঁর শ্রমের পরিবর্তে বৈশ্য প্রচুর অর্থ দান করেন, ক্ষত্রিয় তাঁর ধন-জন রক্ষা করেন, ব্রাহ্মণ তাঁকে ধর্ম ও ভগবদ্প্রাপ্তির পথ দেখান। স্বার্থসিদ্ধির জন্য কেউ শূদ্রের বৃত্তি হরণ করেন না বা স্বার্থবশতঃ তাঁকে কেউ কম পারিশ্রমিক দেন না অথবা তাঁকে নিজের থেকে ছোটো মনে করে তাঁর প্রতি কোনোপ্রকার খারাপ ব্যবহারও করেন না। সকলেই মনে করেন যে সবাই নিজ নিজ অধিকারই পেয়েছেন, কেউ কারো উপর দয়া-দাক্ষিণ্য করছেন না। সকলেই একে অপরকে সাহায্য করেন এবং সকলে নিজ-নিজ উন্নতির সঙ্গে অন্যেরও উন্নতি সম্পাদন করেন এবং মনে করেন যে ওঁর উন্নতিতে আমার উন্নতি এবং অবনতিতে আমারও অবনতি। এরূপ অবস্থায় জনবলযুক্ত শূদ্র সন্তুষ্ট থাকেন, চারবর্ণের কেউ কাউকে ঠকায় না এবং কেউ কারো দ্বারা অপমানিত হয় না।

এক গৃহের চার ভ্রাতার ন্যায় এক গৃহেরই উন্নতির জন্য চার ভাই প্রসন্নতাসহ যোগ্যতা অনুসারে ভাগ করে নিজ নিজ প্রয়োজনীয় কর্তব্যপালনে ব্যাপৃত থাকেন। এই চারবর্ণ পরস্পর—ব্রাহ্মণ ধর্মস্থাপন দ্বারা, ক্ষত্রিয় বাহুবল দ্বারা, বৈশ্য ধনবল দ্বারা ও শূদ্র শরীরের শ্রমবল দ্বারা একে অপরের হিতসাধন করে সমাজের শক্তিবৃদ্ধি করেন। এঁরা কেউই একই প্রকারের কর্ম পালনে আগ্রহী হন না এবং পৃথক পৃথক কর্ম পালনের দরুণ কোনো উচ্চ-নীচ ভাব মনে স্থান দেন না। এতে তাঁদের শক্তি-সামঞ্জস্য বজায় থাকে এবং ধর্ম উত্তরোত্তর পরিপুষ্ট হয়। বর্ণাশ্রম ধর্মের এই হল প্রকৃত স্বরূপ।

এইভাবে গুণ ও কর্মের বিভাগেই বর্ণবিভাগ হয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে ইচ্ছামতো কর্ম দ্বারা বর্ণ পরিবর্তন করা যায়। বর্ণের মূল হল জন্ম এবং কর্ম হল তার স্বরূপ রক্ষার প্রধান উপায়। এইরূপ জন্ম ও কর্ম দুই-ই বর্ণ রক্ষার জন্য প্রয়োজন। কেবল কর্ম দ্বারা বর্ণকে যারা মানে, তারা প্রকৃতপক্ষে বর্ণকে মানে না। বর্ণ যদি কর্ম অনুসারে মানা হয়, তাহলে এক দিনে একই মানুষকে না জানি কতবার বর্ণ পরিবর্তন করতে হয়। তাহলে তো সমাজে কোনো নিয়ম-শৃঙ্খলাই থাকবে না। সর্বত্র অব্যবস্থা ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু ভারতীয় বর্ণাশ্রম-ধর্মে এরূপ হয় না। যদি শুধু কর্ম দ্বারা বর্ণ মানা যেত, তাহলে যুদ্ধের সময় ব্রাহ্মণোচিত কর্ম করার জন্য প্রস্তুত অর্জুনকে ভগবান গীতাতে ক্ষত্রিয়ধর্মের উপদেশ প্রদান করতেন না। মানুষের পূর্বকৃত শুভাশুভ কর্মানুসারেই তার বিভিন্ন বর্ণে জন্ম হয়। যার যে বর্ণে জন্ম হয়, তাকে সেই বর্ণের নির্দিষ্ট কর্মের আচরণ করা উচিত, কারণ সেটিই তার স্বধর্ম। স্বধর্ম পালনকালে মৃত্যু হওয়াকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কল্যাণকারক বলে জানিয়েছেন। 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়'। সেই সঙ্গে 'পরধর্ম'কে ভয়াবহ বলে জানিয়েছেন। একথা ঠিকই ; কারণ সকল বর্ণের স্বধর্ম পালন দ্বারাই সামাজিক শক্তি-সামঞ্জস্য বজায় থাকে, এবং তখনই সমাজ-ধর্মের রক্ষা ও উন্নতি হয়ে থাকে। স্বধর্ম ত্যাগ এবং পরধর্ম গ্রহণ, ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর। দুঃখের কথা হল, বিভিন্ন কারণে আর্যজাতির এই বর্ণ ব্যবস্থা এখন শিথিল হয়ে যাচ্ছে। এখন কোন বর্ণই আর নিজ ধর্মের ওপর অধিষ্ঠিত নয়। সকলেই ইচ্ছামতো আচার-আচরণ করায় তা ক্রমশঃ নিম্নগামী হচ্ছে এবং এর কুফলও প্রত্যক্ষভাবে দেখা যাচ্ছে।

পক্ষে সেটিই পরম কল্যাণপ্রদ ; কল্যাণের জন্য এক বর্ণকে অন্য বর্ণের কর্ম গ্রহণ করার কোনো প্রয়োজন নেই।

'সংসিদ্ধিম্' পদটি এখানে অন্তঃকরণের শুদ্ধিরূপ সিদ্ধির বা স্বর্গপ্রাপ্তির অথবা অণিমাদি সিদ্ধির বাচক নয় ; এটি হল সেই পরম সিদ্ধির বাচক, যাকে পরমাত্মার প্রাপ্তি, পরমগতির প্রাপ্তি, শাশ্বত পদের প্রাপ্তি, পরম-পদের প্রাপ্তি ও নির্বাণ ব্রহ্মের প্রাপ্তি বলা হয়। এছাড়া ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্মে জ্ঞান ও বিজ্ঞানও অন্তর্নিহিত রয়েছে ; তাই তার ফল পরমগতি লাভ ব্যতীত অন্য কিছু মানা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন—এখানে **'নরঃ'** পদ কীসের বাচক এবং তার প্রয়োগ করে 'নিজ নিজ কর্মে ব্যাপৃত মানুষ পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হন' একথা বলার অর্থ কী ?

উত্তর—এখানে **'নরঃ'** পদটি চার বর্ণের অন্তর্গত সকল মানুষের বাচক, তাই এটি প্রয়োগ করে 'নিজ নিজ কর্মে ব্যাপৃত মানুষ পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হন' এই কথার দ্বারা মানুষ মাত্রেরই মোক্ষ-প্রাপ্তিতে অধিকার আছে বলে জানানো হয়েছে। সেই সঙ্গে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর লাভের জন্য কর্তব্য-কর্ম স্বরূপতঃ (বাহ্যতঃ) ত্যাগ করার কোনো প্রয়োজন নেই। পরমাত্মাকে উদ্দেশ্য করে সদা-সর্বদা বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম করতে করতেই মানুষ পরমাত্মাকে লাভ করতে সক্ষম (১৮।৫৬)।

প্রশ্ন—নিজ স্বাভাবিক কর্মে ব্যাপৃত মানুষ যেভাবে কর্মে রত থেকে পরম সিদ্ধি লাভ করেন, সেই বিধি তুমি শোন—এই বাক্যটির অর্থ কী ?

উত্তর—পূর্বার্ধে বলা হয়েছিল যে, নিজ নিজ কর্মে ব্যাপৃত মানুষ পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত হন ; এতে প্রশ্ন হতে পারে যে, কর্ম তো মানুষের বন্ধনকারক হয়, তাহলে তাতে তৎপরতার সঙ্গে ব্যাপৃত থাকা মানুষ কীভাবে পরম সিদ্ধি লাভ করবেন ? তার সমাধান করার জন্য ভগবান তাই একথা বলেছেন। অভিপ্রায় হল যে, ঐসব কর্মে ব্যাপৃত থেকে পরমপদ লাভ করার উপায় আমি তোমাকে পরবর্তী শ্লোকে স্পষ্ট করে জানাচ্ছি, তুমি সতর্কতার সঙ্গে তা শোনো।

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।। ৪৬

যে পরমেশ্বর হতে সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি হয়েছে এবং যিনি সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, সেই পরমেশ্বরকে নিজের স্বাভাবিক কর্মের দ্বারা অর্চনা করে মানুষ পরম সিদ্ধি লাভ করেন।। ৪৬

প্রশ্ন—যে পরমেশ্বর হতে সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি হয়েছে এবং যিনি সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—নিজ নিজ কর্ম দ্বারা ভগবানের পূজা করার উপায় জানাবার জন্য প্রথমে এই কথার দ্বারা ভগবানের গুণ, প্রভাব ও শক্তিসহ তাঁর সর্বব্যাপী স্বরূপকে লক্ষ্য করানো হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, মানুষের নিজের প্রতিটি কর্তব্যকর্ম পালন করার সময় মনে রাখতে হবে যে সম্পূর্ণ চরাচরের প্রাণীসহ এই সমগ্র বিশ্ব ভগবানের থেকেই উৎপন্ন হয়েছে এবং ভগবানের দ্বারাই পরিব্যাপ্ত, অর্থাৎ ভগবানই তাঁর যোগমায়ার দ্বারা জগৎরূপে প্রকটিত। তাই এই জগৎ তাঁরই স্বরূপ। এই সমগ্র বিশ্ব কীভাবে ভগবান দ্বারা পরিব্যাপ্ত, একথা নবম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বোঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন—নিজ স্বাভাবিক কর্ম দ্বারা পরমেশ্বরের পূজা করা কী ?

উত্তর—ভগবান এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারকারী, সর্বশক্তিমান, সর্বাধার, সকলের প্রেরক, সবাকার আত্মা, সর্বান্তর্যামী ও সর্বব্যাপী। এই সমগ্র জগৎ তাঁরই সৃষ্টি এবং তিনি স্বয়ংই নিজ যোগমায়া দ্বারা জগতের রূপে প্রকটিত হয়েছেন। অতএব এই সম্পূর্ণ জগৎ হল ভগবানের। আমার শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং আমার দ্বারা যা কিছু যজ্ঞ, দান ইত্যাদি স্ববর্ণোচিত কর্ম করা হয়—সে সবই ভগবানের এবং আমি স্বয়ংও ভগবানেরই। সমস্ত দেবতাদের এবং অন্যান্য প্রাণীদের আত্মা হওয়ায় ইনি সর্বকর্মের ভোক্তা (৫।২৯)—পরম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসসহ এরূপ মনে করে সমস্ত কর্মে মমতা, আসক্তি ও ফলেচ্ছা চিরতরে ত্যাগ করে ভগবানের

নির্দেশানুসারে তাঁর প্রসন্নতার জন্য নিজ স্বাভাবিক কর্ম করা— যা হল সমস্ত জগতের সেবা করা— অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীকে সুখী করার জন্য উপরোক্ত প্রকারে স্বার্থত্যাগ করে নিজ কর্তব্য পালন করা—একেই বলা হয় নিজ স্বাভাবিক কর্ম দ্বারা পরমেশ্বরের পূজা করা।

প্রশ্ন— উপরোক্ত ভাবে নিজ কর্ম দ্বারা ভগবানের পূজা করে মানুষ পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হন, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথার তাৎপর্য হল, প্রতিটি মানুষ, তা তিনি যে কোনো বর্ণ বা আশ্রমের হোন না কেন, নিজ নিজ কর্ম দ্বারা ভগবানের পূজা করে পরম সিদ্ধিরূপ পরমাত্মাকে লাভ করতে সক্ষম। পরমাত্মাকে লাভ করায় সকলের সমান অধিকার। নিজ শম-দমাদি কর্মকে উপরোক্ত প্রকারে ভগবানে সমর্পণ করে তার দ্বারা ভগবানের পূজনকারী ব্রাহ্মণ যে পদ লাভ করেন ; তেমনই নিজ শৌর্য-বীর্য ইত্যাদি কর্ম দ্বারা ভগবানের অর্চনাকারী ক্ষত্রিয়ও সেই প্রদ প্রাপ্ত হন, সেইরূপ কৃষি ইত্যাদি কর্ম দ্বারা ভগবানের পূজনকারী বৈশ্য এবং নিজ সেবা-সম্বন্ধীয় কর্ম দ্বারা ভগবানের পূজনকারী শূদ্রও সেই পরমপদই লাভ করেন। সুতরাং কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করার এটি অতি সহজ পথ। অতএব মানুষের উচিত উপযুক্ত ভাবে ভাবিত হয়ে নিজ নিজ কর্তব্য পালনের দ্বারা পরমেশ্বরের অর্চনা করার অভ্যাসে সচেষ্ট থাকা।

সম্বন্ধ—পূর্বশ্লোকে বলা হয়েছে যে মানুষ তাঁর স্বাভাবিক কর্ম দ্বারা পরমেশ্বরের পূজা করে পরম সিদ্ধি লাভ করেন। তাতে প্রশ্ন হতে পারে যে, যদি কোনো ক্ষত্রিয় যুদ্ধের ন্যায় নিজ ক্রূর কর্ম ত্যাগ করে ব্রাহ্মণদের মতো অধ্যয়ন ইত্যাদি শান্তিপূর্ণ কর্মে নিজ জীবন নির্বাহ করে পরমাত্মাকে লাভ করার চেষ্টা করেন বা এইরূপ কোনো বৈশ্য বা শূদ্র নিজ কর্মকে উচ্চ বর্ণের কর্মের থেকে হীন মনে করে তাকে ত্যাগ করে নিজের থেকে উচ্চবর্ণের বৃত্তির দ্বারা জীবন নির্বাহ করে পরমাত্মাকে লাভ করার চেষ্টা করেন, তাহলে সেটা উচিত হবে কী ? এর উত্তরে অপরের ধর্মের থেকে স্বধর্মকে শ্রেষ্ঠ জানিয়ে ভগবান তা ত্যাগ করতে নিষেধ করছেন—

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ৪৭

উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত অন্যের ধর্ম হতে গুণরহিত নিজ স্বধর্ম শ্রেষ্ঠ ; কারণ স্বভাবনির্দিষ্ট স্বধর্মরূপ কর্ম করলে মানুষের পাপ হয় না॥ ৪৭

প্রশ্ন—'**স্বনুষ্ঠিতাৎ**' বিশেষণের সঙ্গে '**পরধর্মাৎ**' পদ কীসের বাচক এবং তার দ্বারা গুণরহিত স্বধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলার কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—যে ধর্ম সর্বাঙ্গভাবে অনুষ্ঠান করা হয়, তাকে '**সু-অনুষ্ঠিত**' বলা হয়। কিন্তু এই শ্লোকে স্বধর্মের সঙ্গে বিগুণ বিশেষণ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং পরধর্মের সঙ্গে গুণ-সম্পন্ন বিশেষণ প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে বুঝে নিতে হবে যে, যে কর্ম গুণযুক্ত এবং যার অনুষ্ঠান যথাযথভাবে করা হয়েছে, কিন্তু যেটি অনুষ্ঠানকারীর জন্য বিহিত নয়, অন্যের জন্য বিহিত— সেই কর্মগুলির বাচক হল এখানে '**স্বনুষ্ঠিতাৎ**' বিশেষণের সঙ্গে '**পরধর্মাৎ**' পদটি। বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়াদির থেকে ব্রাহ্মণের বিহিত ধর্মে অহিংসাদি সদ্‌গুণের আধিক্য থাকে, গৃহস্থের থেকে সন্ন্যাস-আশ্রমের ধর্মে সদ্‌গুণের বাহুল্য থাকে, তেমনই শূদ্রের থেকে বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের কর্ম গুণযুক্ত হয়। অতএব উপরোক্ত ঐ পরধর্মের থেকে গুণরহিত স্বধর্মকে শ্রেষ্ঠ জানিয়ে এই ভাব প্রকাশিত হয়েছে যে, যেমন দেখতে কুরূপ এবং গুণহীন হলেও স্ত্রীর পক্ষে তাঁর পতির সেবা করাই কল্যাণপ্রদ— তেমনই দেখতে গুণহীন হলেও এবং তার অনুষ্ঠানে কিছু বৈগুণ্য হলেও, যার জন্য যে কর্ম বিহিত, তাই তার পক্ষে কল্যাণপ্রদ।

প্রশ্ন—'**স্বধর্মঃ**' পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—বর্ণ, আশ্রম, স্বভাব এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী যে ব্যক্তির জন্য যে কর্ম বিহিত, তার পক্ষে সেটিই হল তার স্বধর্ম। অভিপ্রায় হল যে, মিথ্যা,

কপটাচার, চুরি, হিংসা, ব্যভিচার ইত্যাদি নিষিদ্ধ কর্ম কারো স্বধর্ম নয় এবং কাম্যকর্মও কারুর জন্য অবশ্য কর্তব্য কর্ম নয়। তাই এগুলি কারো স্বধর্ম রূপে গণ্য হয় না। এগুলিকে বাদ দিয়ে যে বর্ণ ও আশ্রমের জন্য যে বিশেষ ধর্ম নির্ধারিত হয়েছে, যাতে সেই বর্ণ ছাড়া অন্য বর্ণের লোকের অধিকার নেই—সেগুলি হল ঐসকল বর্ণ-আশ্রমবাসীদের জন্য পৃথক পৃথক স্বধর্ম এবং যেসকল কর্মে শুধু দ্বিজদেরই অধিকার বলা হয়েছে, সেই বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞাদি কর্ম দ্বিজদেরই স্বধর্ম। যে সকল কর্মে সকল বর্ণাশ্রমেরই নারী-পুরুষের অধিকার থাকে, যথা ঈশ্বর ভক্তি, সত্যভাষণ, মাতা-পিতার সেবা, ইন্দ্রিয়াদি সংযম, ব্রহ্মচর্যপালন ও বিনয়াদি সাধারণ ধর্ম—এগুলি সকলেরই স্বধর্ম।

প্রশ্ন—'**স্বধর্মে**'র সঙ্গে '**বিগুণঃ**' বিশেষণ দেওয়ার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'**বিগুণঃ**' পদ গুণের ন্যূনতার দ্যোতক। ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম যুদ্ধ করা ও দুষ্টকে শাসন করা ইত্যাদি বলা হয়েছে ; তার মধ্যে অহিংসা ও শান্তি ইত্যাদি গুণের ন্যূনতা আছে বলে মনে হয়। তেমনই বৈশ্যের 'কৃষি' ইত্যাদি কর্মেও হিংসাদি দোষের বাহুল্য থাকে, সেইজন্য ব্রাহ্মণদের শান্তিময় কর্মের থেকে এগুলি বিগুণই অর্থাৎ গুণহীন। শূদ্রদের কর্ম তো বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়দের থেকেও নিম্নশ্রেণীর। এতদ্ব্যতীত ঐসব কর্মের পালনে কোনো কিছু বাদ পড়ে যাওয়াও হল গুণের কম হওয়া। উপরোক্তভাবে স্বধর্মে গুণের ঘাটতি থাকলেও তা পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই অভিপ্রায়ে '**স্বধর্মঃ**'র সঙ্গে '**বিগুণঃ**' বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রশ্ন—'**স্বভাবনিয়তম্**' বিশেষণের সঙ্গে '**কর্ম**' পদ কীসের বাচক এবং তা করলে মানুষ পাপভাগী হয় না, একথার অর্থ কী ?

উত্তর—যে বর্ণ ও আশ্রমে অবস্থিত মানুষের জন্য তার স্বভাব অনুসারে যে কর্ম শাস্ত্র দ্বারা নির্দিষ্ট, সেটিই তার 'স্বভাবনির্দিষ্ট' কর্ম। সুতরাং উপরোক্ত স্বধর্মেরই বাচক হল এখানে '**স্বভাবনিয়তম্**' বিশেষণের সঙ্গে '**কর্ম**' পদটি। সেই সকল কর্ম করলে মানুষ পাপের ভাগী হয় না—এই কথাটির অর্থ হল, ঐসব কর্ম ন্যায়তঃ আচরণ করার সময় তাতে যে আনুষঙ্গিক হিংসা ইত্যাদি পাপ হয়, তা তাকে স্পর্শ করে না। কিন্তু অন্যের ধর্ম পালনের সময় তাতে হিংসাদি দোষ কম হলেও পরবৃত্তিচ্ছেদন ইত্যাদি জনিত পাপ হয়, তাই গুণরহিত হলেও স্বধর্ম গুণযুক্ত পরধর্মের থেকে শ্রেষ্ঠ।

সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥ ৪৮

অতএব, হে কুন্তীপুত্র ! দোষযুক্ত হলেও সহজকর্ম ত্যাগ করা উচিত নয় ; কারণ ধূমাবৃত অগ্নির ন্যায় সমস্ত কর্মই কোনো না কোনোভাবে দোষযুক্ত ॥ ৪৮

প্রশ্ন—'**সহজম্**' বিশেষণের সঙ্গে '**কর্ম**' কোন্ কর্মের বাচক এবং দোষযুক্ত হলেও সহজ কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—বর্ণ, আশ্রম, স্বভাব এবং পরিস্থিতি অনুসারে যার জন্য যে কর্ম নির্দিষ্ট হয়েছে, তার জন্য সেটিই হল সহজকর্ম। অতএব এই অধ্যায়ে যে কর্মগুলির বর্ণনা স্বধর্ম, স্বকর্ম, নির্দিষ্ট কর্ম, স্বভাবনির্দিষ্ট কর্ম ও স্বভাবজ কর্ম নামে করা হয়েছে, তারই বাচক হল এখানে '**সহজম্**' বিশেষণের সঙ্গে '**কর্ম**' পদটি।

দোষযুক্ত হলেও সহজকর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়—এই বাক্যের তাৎপর্য হল, যে স্বাভাবিক কর্ম শ্রেষ্ঠ গুণাদিযুক্ত হয়, তাকে ত্যাগ করা উচিত নয়—তাতে তো বলার কিছু নেই ; কিন্তু যাতে সাধারণতঃ হিংসাদি-দোষের মিশ্রণ দেখা যায়, সেগুলিও শাস্ত্রবিহিত এবং ন্যায়োচিত হওয়ায় তা দোষযুক্ত প্রতীত হলেও বাস্তবে দোষযুক্ত নয়। তাই সেসব কর্মও ত্যাগ করা উচিত নয়, অর্থাৎ তার আচরণ করা উচিত। কারণ সেগুলি করলে মানুষ পাপভাগী হন না বরং তা ত্যাগ করলেই পাপের ভাগী হতে হয়।

প্রশ্ন—'**হি**' অব্যয় প্রয়োগ করে সকল কর্মকে ধূমাবৃত অগ্নির ন্যায় দোষযুক্ত বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'**হি**' পদ এখানে হেতুর অর্থে ব্যবহৃত,

এটি প্রয়োগ করে এখানে সমস্ত কর্মকে ধূমাবৃত অগ্নির ন্যায় দোষযুক্ত বলার অভিপ্রায় হল যে, অগ্নি যেমন ধোঁয়ার সঙ্গে ওতপ্রোতোভাবে থাকে, ধোঁয়া কখনো আগুনের থেকে একেবারে আলাদা থাকতে পারে না—তেমনই আরম্ভ মাত্রই দোষযুক্ত, ক্রিয়ামাত্রের দ্বারা কোনো না কোনো ভাবে কোনো না কোনো প্রাণী-হিংসা করা হয়। কারণ সন্ন্যাস-আশ্রমেও শৌচ, স্নান, ভিক্ষা ইত্যাদি কর্ম দ্বারা কোনো না কোনো অংশে প্রাণী হিংসা হয়েই থাকে এবং ব্রাহ্মণের যজ্ঞাদি কর্মেও আরম্ভের বাহুল্য থাকায় ক্ষুদ্র প্রাণীদের প্রতি হিংসা করা হয়। সেইজন্য কোনো বর্ণ-আশ্রমের কর্ম সাধারণ দৃষ্টিতে সম্পূর্ণভাবে দোষরহিত নয় আর কর্ম না করে কেউ থাকতে পারে না (৩।৫) ; তাই স্বধর্ম ত্যাগ করলেও মানুষকে কিছু না কিছু কর্ম তো করতেই হবে এবং তিনি যা কিছু করবেন, তাই দোষযুক্ত হবে। সেইজন্য ঐ কর্ম হীন বা দোষযুক্ত—এরূপ মনে করে মানুষের কখনো স্বধর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়, বরং তাতে মমতা, আসক্তি ও ফলেচ্ছা রূপ দোষ ত্যাগ করে ন্যায়সঙ্গতভাবে তা পালন করা উচিত। তাহলে মানুষের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়ে তাঁর শীঘ্রই ঈশ্বর লাভ হবে।

সম্বন্ধ—অর্জুনের জিজ্ঞাসায় ত্যাগ ও সন্ন্যাসের তত্ত্ব বোঝাবার জন্য ভগবান চতুর্থ থেকে দ্বাদশ শ্লোক পর্যন্ত ত্যাগের বিষয় বলেছেন এবং ত্রয়োদশ থেকে চল্লিশতম শ্লোক পর্যন্ত সন্ন্যাস অর্থাৎ সাংখ্য সম্বন্ধে নিরূপণ করেছেন। পরে একচল্লিশতম শ্লোক থেকে এই পর্যন্ত কর্মযোগরূপ ত্যাগের তত্ত্ব বোঝাবার জন্য স্বাভাবিক কর্মের স্বরূপ এবং তা অবশ্য পালনীয় জানিয়ে তথা কর্মযোগে ভক্তির সহযোগ দেখিয়ে তার ফল বলেছেন ভগবদ্প্রাপ্তি। কিন্তু ওখানে সন্ন্যাসের প্রকরণে একথা বলা হয়নি যে, সন্ন্যাসের ফল কী হয় এবং কর্মে কর্তৃত্বের অহংবোধ ত্যাগ করে উপাসনাসহ কীভাবে সাংখ্যযোগের সাধনা করা উচিত ? সুতরাং এখানে উপাসনাসহ বিবেক ও বৈরাগ্যপূর্বক একান্তে থেকে সাধনা করার বিধি এবং তার ফল জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে পুনরায় সাংখ্যযোগের প্রকরণ আরম্ভ করছেন—

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥ ৪৯

সর্বত্র অনাসক্তি বুদ্ধিসম্পন্ন, নিস্পৃহ, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সাংখ্যযোগের দ্বারা সেই পরম নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধিলাভ করেন॥ ৪৯

প্রশ্ন—**'সর্বত্র অসক্তবুদ্ধিঃ'**, **'বিগতস্পৃহঃ'** এবং **'জিতাত্মা'** এই তিনটি বিশেষণের পৃথক পৃথক অর্থ কী এবং এখানে এগুলি কেন প্রয়োগ করা হয়েছে ?

উত্তর—অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়সহ দেহে, তাঁর দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্মে ও সমস্ত ভোগে এবং চরাচর প্রাণীসহ সমস্ত জগতে যাঁর আসক্তি সর্বতোভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছে, যাঁর মন, বুদ্ধিতে কোথাও কোনো স্পৃহা নেই—তিনি হলেন **'সর্বত্র অসক্তবুদ্ধি'**। যাঁর স্পৃহার বিনাশ হয়েছে, যাঁর কোনো সাংসারিক বস্তুর বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা নেই, তাঁকে বলা হয় **'বিগতস্পৃহঃ'**। যিনি ইন্দ্রিয়াদিসহ অন্তঃকরণ বশীভূত করেছেন, তাঁকে বলা হয় **'জিতাত্মা'**। এখানে সন্ন্যাসযোগের অধিকারী নিরূপণ করার জন্য এই তিনটি বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, যাঁরা উপরোক্ত তিন গুণাদি সম্পন্ন হন, তাঁরাই সাংখ্যযোগের দ্বারা পরমাত্মার যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম।

প্রশ্ন—এখানে **'সন্ন্যাসেন'** পদ কোন্ সাধনের বাচক এবং **'পরমাম্'** বিশেষণের সঙ্গে **'নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিম্'** পদ কোন্ সিদ্ধির বাচক ; সন্ন্যাসের দ্বারা তা কীভাবে প্রাপ্ত হয় ?

উত্তর—এখানে **'সন্ন্যাসেন'** পদটি জ্ঞানযোগের বাচক, একে সাংখ্যযোগও বলে। এর স্বরূপ ভগবান একান্নতম থেকে তিপ্পান্নতম শ্লোক পর্যন্ত বলেছেন। এর সাধনের ফল—যা কর্মবন্ধন থেকে চিরতরে মুক্ত করে সচ্চিদানন্দঘন নির্বিকার পরমাত্মার প্রকৃত জ্ঞানলাভ করায়, তার বাচক এখানে **'পরমাম্'** বিশেষণের সঙ্গে **'নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিম্'** পদটি এবং উপরোক্ত সাংখ্য যোগের দ্বারা পরমাত্মার যে যথার্থ জ্ঞান লাভ করা, তাই হল সন্ন্যাসের দ্বারা এই সিদ্ধি লাভ করা।

সম্বন্ধ—উপরোক্ত শ্লোকে বলা হয়েছে যে, সন্ন্যাসের দ্বারা মানুষ পরম নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধিলাভ করেন ; তাতে প্রশ্ন হতে পারে যে, সেই সন্ন্যাসের (সাংখ্যযোগের) স্বরূপ কী এবং তার দ্বারা মানুষ কোন্ ক্রমানুসারে সিদ্ধিলাভ করে ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন ? সুতরাং এই সব বিষয় জানানোর প্রস্তাবনা করে ভগবান অর্জুনকে শোনার জন্য সতর্ক করছেন—

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা।। ৫০

যা জ্ঞানযোগের পরানিষ্ঠা, সেই নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি লাভ করে মানুষ যে ভাবে ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়, হে কৌন্তেয় ! তুমি সংক্ষেপে তা আমার কাছে শোনো।। ৫০

প্রশ্ন—'পরা' বিশেষণের সঙ্গে **'নিষ্ঠা'** পদটি এখানে কীসের বাচক ?

উত্তর—জ্ঞানযোগের যা অন্তিম স্থিতি, যাকে পরাভক্তি এবং তত্ত্বজ্ঞানও বলা হয়, যা সমস্ত সাধনার অন্তিম সীমা, তার বাচক হল এখানে **'পরা'** বিশেষণের সঙ্গে **'নিষ্ঠা'** পদটি। জ্ঞানযোগের সাধনগুলিকে জ্ঞাননিষ্ঠা বলা হয় এবং সেই সাধনার ফলরূপ তত্ত্ব জ্ঞানকে বলা হয় 'পরানিষ্ঠা'।

প্রশ্ন—এখানে **'সিদ্ধিম্'** পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—পূর্বশ্লোকে যাকে নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধির নামে বলা হয়েছে, এখানে যাকে জ্ঞানের পরানিষ্ঠা নামে বলা হয়েছে এবং চুয়ান্নতম শ্লোকে পরাভক্তির নামে যার বর্ণনা করা হয়েছে, তারই বাচক হল এইখানে **'সিদ্ধিম্'** পদটি।

প্রশ্ন—**'যথা'** পদটির অর্থ কী ?

উত্তর—শুদ্ধ অন্তঃকরণযুক্ত অধিকারী ব্যক্তি যে বিধি দ্বারা জ্ঞানের পরানিষ্ঠা অর্থাৎ পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লাভ করেন, সেই বিধির অর্থাৎ অঙ্গ-উপাঙ্গসহ জ্ঞানযোগের প্রকারের বাচক হল এখানে **'যথা'** পদটি।

প্রশ্ন—উপরোক্ত সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তির কখন ব্রহ্মলাভ হয় ?

উত্তর—সিদ্ধিপ্রাপ্তির পর ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে কোনো দেরি হয় না, তৎক্ষণাৎ তার প্রাপ্তি হয়।

প্রশ্ন—'ব্রহ্ম'পদ কীসের বাচক এবং তাকে প্রাপ্ত হওয়া কী ?

উত্তর—নিত্য-নির্বিকার, নির্গুণ-নিরাকার, সচ্চিদানন্দ-ঘন, পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মার বাচক হল **'ব্রহ্ম'** পদটি এবং তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা পঞ্চান্নতম শ্লোকের বর্ণনানুসারে অভিন্নভাবে তাঁতে প্রবিষ্ট হওয়াই হল তাঁকে লাভ করা।

প্রশ্ন—**'যথা'** পদ কীসের বাচক এবং 'তুমি সেটি সংক্ষেপে আমার কাছে শোনো', এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—**'যথা'** পদের দ্বারা বিধিকে লক্ষ্য করানো হয়েছে, সুতরাং তারই বাচক হল এখানে **'যথা'** পদটি। 'তা তুমি সংক্ষেপে আমার কাছে শোনো'—এই কথার তাৎপর্য হল, তার বিস্তারিত বর্ণনা না করে আমি সংক্ষেপে সেই বিষয় তোমাকে বলব। তুমি তাই এটি মনোযোগ সহকারে শোনো, নাহলে তা বুঝতে পারবে না।

সম্বন্ধ—পূর্বশ্লোকে করা প্রস্তাব অনুসারে এবার তিনটি শ্লোকে অঙ্গ-উপাঙ্গসহ জ্ঞানযোগের বর্ণনা করছেন—

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ।। ৫১
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ।। ৫২
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।। ৫৩

বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত, সাত্ত্বিক, মিতভোজী, শব্দাদি বিষয় ত্যাগ করে একান্ত ও শুদ্ধস্থানে বসবাসকারী,

সাত্ত্বিক ধারণশক্তির দ্বারা অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয় সংযম করে কায়মনোবাক্যে সংযমী, রাগ-দ্বেষ সর্বতোভাবে বর্জন করে দৃঢ় বৈরাগ্য অবলম্বনকারী, অহংকার-বল-দর্প-কাম-ক্রোধ ও পরিগ্রহ ত্যাগ করে নিরন্তর ধ্যানযোগে নিরত, মমত্বশূন্য, প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তি সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মে অভিন্নভাবে অবস্থান করতে সমর্থ হন॥ ৫১-৫৩

প্রশ্ন—'বিশুদ্ধ বুদ্ধি' কাকে বলে এবং তাতে যুক্ত হওয়া কী ?

উত্তর—পূর্বকৃত পাপের সংস্কাররহিত অন্তঃকরণকে 'বিশুদ্ধ বুদ্ধি' বলা হয় এবং যাঁর অন্তঃকরণ এইভাবে শুদ্ধ হয়ে গিয়েছে, তাঁকে বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত বলা হয়।

প্রশ্ন—'লঘ্বাশী' কাকে বলে ?

উত্তর—যিনি সাধারণ, স্বাস্থ্যের অনুকূল, সুপাচ্য ও সাত্ত্বিক পদার্থের (১৭।৮) এবং নিজ প্রকৃতি, প্রয়োজন এবং শক্তির অনুরূপ নিয়মিত ও পরিমিত ভোজন করেন —সেরূপ যুক্ত আহারকারী ব্যক্তিকে 'লঘ্বাশী' (৬।১৭) বলা হয়।

প্রশ্ন—শব্দাদি বিষয় ত্যাগ করে একান্ত ও শুদ্ধ দেশে বসবাস করা কী ?

উত্তর—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের যে সব সাংসারিক ভোগে রুচি, সেসব ত্যাগ করে অর্থাৎ সেসব ভোগে নিজ জীবনের অমূল্য সময় ব্যয় না করে—নিরন্তর সাধনা করার জন্য, যেস্থানে বায়ু পবিত্র, যেখানে বহুলোক যাতায়াত করে না, যা স্বভাবতঃ একান্ত ও নির্মল, যা ঝেড়ে-মুছে এবং ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে— সেইরূপ নদীতীর, দেবালয়, বন ও পাহাড়ের গুহা ইত্যাদি স্থানে বসবাস করাই হল শব্দাদি বিষয় ত্যাগ করে একান্ত ও শুদ্ধ দেশে বসবাস করা।

প্রশ্ন—সাত্ত্বিক ধারণাশক্তির দ্বারা অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদি সংযম করা কাকে বলে এবং এইভাবে মন, বাক্য ও শরীরকে বশ করা কীরূপ ?

উত্তর—এই অধ্যায়ের তেত্রিশতম শ্লোকে যার লক্ষণ বলা হয়েছে, সেই অটল ধারণাশক্তি দ্বারা বিশুদ্ধ আগ্রহে অন্তঃকরণকে সাংসারিক বিষয় চিন্তা থেকে নিবৃত্ত করে ইন্দ্রিয়াদিকে ভোগে প্রবৃত্ত হতে না দেওয়া হল সাত্ত্বিক ধারণা দ্বারা অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদি সংযম করা। এইপ্রকার সংযম দ্বারা যিনি মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরকে নিজের অধীন করে নেন, যার ফলে এগুলিতে স্বেচ্ছাচারিতা ও বুদ্ধি বিচলিত করা শক্তির অভাব হয়—একেই বলা হয় মন, বাক্য ও শরীরকে বশীভূত করা।

প্রশ্ন—রাগ ও দ্বেষ—এই দুটি চিরতরে বিনাশ করে যথাযথভাবে বৈরাগ্যের আশ্রয় নেওয়া কাকে বলে ?

উত্তর—ইন্দ্রিয়ের প্রতিটি ভোগ্যপদার্থে রাগ ও দ্বেষ—দুইই লুকিয়ে থাকে, এগুলি সাধকের মহাশত্রু (৩।৩৪)। অতএব ইহলোক বা পরলোকের কোনো ভোগে, কোনো প্রাণীতে, পদার্থে, ক্রিয়া অথবা ঘটনাতে বিন্দুমাত্র আসক্তি বা দ্বেষ পোষণ না করে, রাগ-দ্বেষের সর্বতোভাবে নাশ করতে হয় ; এইভাবে রাগ-দ্বেষ নাশ করে নিঃস্পৃহভাবে বৈরাগ্যে মগ্ন থাকা, একেই বলা হয় রাগ-দ্বেষ নাশ করে যথাযথভাবে বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করা।

প্রশ্ন—অহংকার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ ত্যাগ করা এবং এই সব ত্যাগ করে নিরন্তর ধ্যানযোগ পরায়ণ হয়ে থাকা কাকে বলে ?

উত্তর—শরীর, ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণে যে আত্ম-বুদ্ধি থাকে—তার নাম অহংকার ; তার জন্যই মানুষ মন, বুদ্ধি ও শরীর দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্মগুলিতে নিজেকে কর্তা বলে মনে করে। অতএব এই দেহাভিমান চিরতরে ত্যাগ করা হল যথার্থভাবে অহংকারকে ত্যাগ করা। অন্যায়ভাবে, বলপূর্বক অন্যের ওপর যে প্রভুত্ব করার সাহস, তাকে বলা হয় 'বল', এইরূপ দুঃসাহস সর্বতোভাবে ত্যাগ করা হল 'বল' ত্যাগ করা। ধন, জন, বিদ্যা, জাতি ও শারীরিক শক্তি ইত্যাদির জন্য যে গর্ব —তার নাম দর্প ; এই ভাব সর্বতোভাবে ত্যাগ করা হল দর্পকে ত্যাগ করা। ইহলোক ও পরলোকের ভোগাদি প্রাপ্ত করার আকাঙ্ক্ষাকে বলা হয় 'কাম', একে চিরতরে ত্যাগ করা হল কাম ত্যাগ করা। নিজ মনের প্রতিকূল আচরণকারীদের ওপর এবং নীতিবিরুদ্ধ ব্যবহার-কারীদের ওপর অন্তঃকরণে যে উত্তেজনার ভাব উৎপন্ন হয়—যেজন্য মানুষের চোখ লাল হয়ে যায়, ঠোঁট কাঁপতে থাকে, হৃদয়ে জ্বালা হয়, মুখ বিকৃত হয়ে যায়—একে বলা হয় ক্রোধ ; একে সর্বতোভাবে ত্যাগ করে দেওয়া,

কোনো অবস্থাতেই এরূপ ভাব উৎপন্ন হতে না দেওয়া হল ক্রোধ ত্যাগ করা। সাংসারিক ভোগ সামগ্রীর নাম 'পরিগ্রহ', অতএব সেই সব সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করাই হল মুখ্যতঃ পরিগ্রহ-ত্যাগ। কিন্তু প্রকারান্তরে সাংসারিক ভোগ করার উদ্দেশ্যে কোনো বস্তু সংগ্রহ না করাও পরিগ্রহ ত্যাগের অন্তর্গত ধরা হয়।

এইভাবে এই সব ত্যাগ করেও পূর্বোক্ত প্রকারে সাত্ত্বিক ধৃতির দ্বারা মন-ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াকে রুদ্ধ করে, সমস্ত স্ফুরণাদিকে চিরতরে নাশ করে, নিত্য-নিরন্তর সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মকে অভিন্নভাবে চিন্তা করা (৬।২৫) অর্থাৎ উঠতে-বসতে, শুয়ে-জেগে, খাওয়া-দাওয়া বা স্নানাদির মতো আবশ্যক কর্ম করার সময়ও নিত্য-নিরন্তর পরমাত্মার স্বরূপ চিন্তা করতে থাকা এবং সেটিকেই সব থেকে বড়ো পরম কর্তব্য বলে মনে করাই হল ধ্যানযোগের পরায়ণ হয়ে থাকা।

প্রশ্ন—'মমতা থেকে রহিত হওয়া' কী ?

উত্তর—মন ও ইন্দ্রিয়সহ শরীরে, সমস্ত প্রাণীতে, কর্মে, সমস্ত ভোগে ও জাতি, কুল, দেশ, বর্ণ ও আশ্রমের প্রতি মমতা সর্বতোভাবে ত্যাগ করা ; কোনো বস্তু, ক্রিয়া বা প্রাণীতে 'অমুক পদার্থ বা প্রাণী আমার আর অমুক আমার নয়, পরের' এইপ্রকার ভেদভাব পোষণ না করাকে বলে 'মমতা থেকে রহিত হওয়া'।

প্রশ্ন—'**শান্তঃ**' পদ কীরূপ মানুষের বাচক ?

উত্তর—উপরোক্ত সাধনার ফলে যাঁর অন্তঃকরণের বিক্ষেপ দূর হয়েছে এবং এইজন্য যাঁর অন্তঃকরণ অটল শান্তি ও শুদ্ধ সাত্ত্বিক প্রসন্নতায় পরিপূর্ণ, '**শান্তঃ**' পদ এরূপ উপরত মানুষের বাচক।

প্রশ্ন—উপরোক্ত বিশেষণাদির বর্ণনা করে, এরূপ ব্যক্তি সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মে অভিন্নভাবে স্থিতি লাভের পাত্র হন—এ কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথা বলার অভিপ্রায় হল, উপরোক্ত প্রকারে সাধনাকারী মানুষ এরূপ সাধন সম্পন্ন হলে ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করার অধিকারী হয়ে ওঠেন এবং তৎক্ষণাৎই ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করেন ; অর্থাৎ তাঁর দৃষ্টিতে আত্মা ও পরমাত্মার ভেদভাব সর্বতোভাবে বিনষ্ট হয়ে 'আমিই সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ম' এরূপ দৃঢ় স্থিতি লাভ হয়। সেই সময় তিনি নিজেকে সমগ্র জগতে স্থিত এবং সমগ্র জগৎকে নিজের মধ্যে কল্পিত দেখেন (৬।২৯)।

সম্বন্ধ—এইরূপ অঙ্গ-উপাঙ্গসহ সন্ন্যাসের অর্থাৎ সাংখ্যযোগের স্বরূপ জানিয়ে এবার সেই সাধনার দ্বারা ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত যোগীর লক্ষণ এবং তাঁর জ্ঞানযোগের পরানিষ্ঠা রূপ ভক্তি প্রাপ্ত হওয়ার কথা জানাচ্ছেন—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ ৫৪

তারপর সেই সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মে একাত্মভাবে স্থিত, প্রসন্নচিত্ত যোগী কোনো কিছুর জন্য শোক করেন না বা কোনো কিছু আকাঙ্ক্ষাও করেন না ; এইভাবে সর্বপ্রাণীতে সমভাবযুক্ত যোগী আমার পরাভক্তি লাভ করেন॥ ৫৪

প্রশ্ন—'**ব্রহ্মভূতঃ**' পদ কীরূপ স্থিতিযুক্ত যোগীর বাচক ?

উত্তর—যিনি সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মে অভিন্নভাবে স্থিত হয়ে যান, যাঁর দৃষ্টিতে এক সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোনো বস্তুর অস্তিত্ব নেই, '**অহং ব্রহ্মাস্মি**'—আমি ব্রহ্ম (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ১।৪।১০), '**সোঽহমস্মি**'—সেই ব্রহ্ম আমিই, ইত্যাদি মহাবাক্য অনুসারে যাঁর পরমাত্মাতে অভিন্নভাবে নিত্য অটল স্থিতি হয়—এরূপ সাংখ্যযোগীর বাচক হল এখানে '**ব্রহ্মভূতঃ**' পদটি। পঞ্চম অধ্যায়ের চব্বিশতম শ্লোকেও এইরূপ স্থিতিসম্পন্ন যোগীকে '**ব্রহ্মভূত**' বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—'**প্রসন্নাত্মা**' পদটির অর্থ কী ?

উত্তর—যাঁর মন পবিত্র, স্বচ্ছ ও শান্ত এবং নিরন্তর শুদ্ধ প্রসন্ন থাকে, তাঁকে বলা হয় '**প্রসন্নাত্মা**'। এই বিশেষণ প্রয়োগের অভিপ্রায় হল যে, ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত ব্যক্তির দৃষ্টিতে এক সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোনো বস্তুর অস্তিত্ব না থাকায় তাঁর মন সদা প্রসন্ন থাকে, কখনো কোনো কারণে বিক্ষুব্ধ হয় না।

প্রশ্ন—ব্রহ্মভূত যোগী শোকও করেন না এবং আকাঙ্ক্ষাও করেন না, এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথায় ব্রহ্মভূত যোগীর লক্ষণ বলা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, ব্রহ্মভূত যোগীর সর্বত্র ব্রহ্মবুদ্ধি হওয়ায় সংসারের কোনো বস্তুতেই তাঁর ভিন্ন প্রতীতি, রমণীয় বুদ্ধি বা মমতা থাকে না। তাই শরীরাদির সঙ্গে কারো সংযোগ-বিয়োগ হলে তাঁর কিছু যায়-আসে না। সেইজন্য তিনি কোনো অবস্থায়, কোনো কারণে বিন্দুমাত্রও চিন্তা বা শোক করেন না। তিনি পূর্ণকাম হয়ে যান, কারণ কোনো বস্তুতে তাঁর ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য দৃষ্টি থাকে না, যেহেতু তিনি বিন্দুমাত্রও কোনো কিছুর কামনা করেন না।

প্রশ্ন—**'সর্বেষু ভূতেষু সমঃ'** এই বিশেষণের অর্থ কী ?

উত্তর—এই বিশেষণ প্রয়োগের মাধ্যমে ঐ ব্রহ্মভূত যোগীর সমস্ত প্রাণীতে সমভাব দেখানো হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, তিনি কোনো প্রাণীকেই নিজের থেকে পৃথক মনে করেন না—তাই তাঁর কোনো কিছুর প্রতি ভেদভাব হয় না, সবার প্রতি সমভাব হয় ; এই একই ভাব ষষ্ঠ অধ্যায়ের ঊনত্রিংশতম শ্লোকে **'সর্বত্র সমদর্শনঃ'** পদেও বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—**'পরাম্'** বিশেষণের সঙ্গে এখানে **'মদ্ভক্তিম্'** পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—যা জ্ঞানযোগের ফল, যাকে জ্ঞানের পরানিষ্ঠা এবং তত্ত্বজ্ঞানও বলা হয়, তারই বাচক হল এখানে **'পরাম্'** বিশেষণের সঙ্গে **'মদ্ভক্তিম্'** পদটি। কারণ তা সেই জ্ঞানযোগীকে পরমাত্মার প্রকৃত স্বরূপের সাক্ষাৎ করিয়ে তাতে অভিন্নভাবে প্রবিষ্ট করিয়ে থাকে।

সম্বন্ধ—এইভাবে ব্রহ্মভূত যোগীর পরাভক্তি প্রাপ্তির কথা বলে এবার তার ফল জানাচ্ছেন—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ ৫৫

সেই পরাভক্তির দ্বারা তিনি পরমাত্মস্বরূপী আমাকে, অর্থাৎ আমি কে এবং কতটা, তা সঠিকভাবে তত্ত্বতঃ জানতে পারেন এবং সেই ভক্তির দ্বারা তত্ত্বতঃ আমাকে জেনে তখনই আমার মধ্যে প্রবিষ্ট হন॥ ৫৫

প্রশ্ন—**'ভক্ত্যা'** পদটি এখানে কীসের বাচক ?

উত্তর—পূর্বশ্লোকে যাকে **'পরাম্'** বিশেষণের সঙ্গে **'মদ্ভক্তিম্'** পদের দ্বারা এবং পঞ্চাশতম শ্লোকে জ্ঞানের পরানিষ্ঠা নামে বর্ণনা করা হয়েছে, সেই তত্ত্বজ্ঞানের বাচক হল **'ভক্ত্যা'** পদটি। এই হল জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ ও ধ্যানযোগ ইত্যাদি সমস্ত সাধনার ফল। এর দ্বারাই সব সাধকদের পরমাত্মার প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞান হয়ে তাঁর প্রাপ্তি হয়। এইরূপ সমস্ত সাধনার ফলের সমাহার অর্থে এখানে জ্ঞানযোগের প্রকরণে **'ভক্ত্যা'** পদ প্রযুক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন—এই ভক্তির দ্বারা যোগী আমাকে, আমি কে এবং কতটা, তা যথার্থ তত্ত্বতঃ জানতে পারেন—এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে, এই পরাভক্তিরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গেই সেই যোগী ঐ তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে আমার প্রকৃত স্বরূপ জানতে পারেন। আমার নির্গুণ-নিরাকার রূপ কী এবং সগুণ-নিরাকার ও সগুণ-সাকার রূপ কী, আমি নিরাকার থেকে কীভাবে সাকার হই আর পুনরায় সাকার থেকে নিরাকার—ইত্যাদি কোনো কিছুই তাঁর জানতে বাকি থাকে না। তাই তাঁর দৃষ্টিতে কোনোপ্রকার ভেদভাব থাকে না। এইভাবে জ্ঞানযোগের সাধন দ্বারা প্রাপ্ত নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্মের সঙ্গে সগুণ ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদন করার জন্য এখানে জ্ঞানযোগের প্রকরণে ভগবান ব্রহ্মের স্থানে **'মাম্'** পদটি প্রয়োগ করেছেন।

প্রশ্ন—**'ততঃ'** পদের অর্থ কী ?

উত্তর—**'ততঃ'** পদটি হেতুবাচক। পরমাত্মার স্বরূপ জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পরমাত্মার প্রাপ্তি হয়— তাতে

কালের ব্যবধান থাকে না, তাই এখানে 'ততঃ' পদের অর্থ পশ্চাৎ করা হয়নি। সুতরাং এটি যার প্রকরণ তার হেতুর বাচক হল 'ততঃ' পদটি এবং এখানে 'জ্ঞাত্বা' পদের সঙ্গে তার হেতুর অনুবাদ করারও প্রয়োজনীয়তা ছিল—সেইজন্য 'ততঃ' পদের অর্থ পূর্বার্ধে বর্ণিত 'পরা ভক্তি' বোঝা উচিত।

প্রশ্ন—এখানে **'তদনন্তরম্'** পদের অর্থ তৎক্ষণাৎ কীভাবে করা হল? **'জ্ঞাত্বা'** পদের সঙ্গে **'তদনন্তরম্'** পদ প্রয়োগ করা হয়েছে, এর দ্বারা **'বিশতে'** ক্রিয়ার অর্থ তো এই হওয়া উচিত যে, মানুষ প্রথমে ভগবানের স্বরূপ প্রকৃতরূপে জানেন এবং তার পরে তাতে প্রবিষ্ট হন।

উত্তর—তা নয়; কিন্তু **'জ্ঞাত্বা'** পদ দ্বারা কালের ব্যবধানের যে সম্ভাবনা ছিল, তা দূর করার জন্যই এখানে **'তদনন্তরম্'** পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। তাৎপর্য হল যে, ভগবানের তত্ত্বজ্ঞান হওয়া ও তাঁর প্রাপ্তিতে কোনো কালের ব্যবধান থাকে না। ভগবানের স্বরূপকে সঠিকভাবে জানা এবং তাঁতে প্রবিষ্ট হওয়া—দুটি এক সঙ্গেই হয়। ভগবান সকলের আত্মরূপ হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে কারো অপ্রাপ্ত নন। তাই তাঁর প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর প্রাপ্তি হয়। সেই লক্ষ্যে এখানে **'তদনন্তরম্'** পদের অর্থ **'তৎক্ষণাৎ'** করা হয়েছে, কারণ কালান্তরের বোধ তো **'জ্ঞাত্বা'** পদের দ্বারাই হয়ে থাকে, তার জন্য **'তদনন্তরম্'** পদটি প্রয়োগের প্রয়োজন ছিল না।

সম্বন্ধ—এইভাবে অর্জুনের জিজ্ঞাসা অনুসারে ত্যাগের অর্থাৎ কর্মযোগের এবং সন্ন্যাসের অর্থাৎ সাংখ্যযোগের তত্ত্ব পৃথকভাবে বুঝিয়ে এই প্রকরণ এখানেই শেষ করেছেন। কিন্তু যেহেতু এই বর্ণনায় ভগবান বলেননি যে উভয়ের মধ্যে কোন্ সাধনটি তোমার পক্ষে পালনীয়, তাই অর্জুনকে ভক্তিপ্রধান কর্মযোগ গ্রহণের উদ্দেশ্যে এবার ভক্তিপ্রধান কর্মযোগের মহিমা জানাচ্ছেন—

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥ ৫৬

মৎ পরায়ণ কর্মযোগী সমস্ত কর্ম সর্বদা করতে থেকেও আমার কৃপায় সনাতন অবিনাশী পরমপদ লাভ করেন॥ ৫৬

প্রশ্ন—**'মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ'** পদ কীসের বাচক?

উত্তর—সমস্ত কর্ম এবং তার ফলরূপ সমস্ত ভোগের আশ্রয় ত্যাগ করে যিনি ভগবানের আশ্রিত হয়েছেন, যিনি তাঁর মন-ইন্দ্রিয়সহ শরীরকে, তার দ্বারা করা সমস্ত কর্ম এবং তার ফলসমূহ ভগবানে সমর্পণ করে সেসব থেকে মমতা, আসক্তি, কামনা সরিয়ে ভগবৎ-পরায়ণ হয়েছেন, যিনি ভগবানকেই নিজের পরম প্রাপ্য, পরম প্রিয়, পরম হিতৈষী, পরম আধার ও সর্বস্ব ভেবে ভগবানের বিধানে সর্বদা প্রসন্ন থাকেন—কোনো সাংসারিক বস্তুর সংযোগ-বিয়োগে বা কোনো ঘটনায় হর্ষ-শোক করেন না, সর্বদা ভগবানের ওপরই নির্ভর করেন এবং যা কিছু কর্ম করেন, ভগবানের নির্দেশানুসারে তাঁরই প্রসন্নতার জন্য, নিজেকে শুধুমাত্র নিমিত্ত মনে করে, তাঁরই প্রেরণা ও শক্তি দ্বারা, ভগবান যেমন করান, তেমনই করেন এবং নিজেকে সর্বতোভাবে ভগবানের অধীন বলে মনে করেন—এরূপ ভক্তিপ্রধান কর্মযোগীর বাচক হল এই **'মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ'** পদটি।

প্রশ্ন—**'সর্বকর্মাণি'** পদ এখানে কোন্ কর্মের বাচক?

উত্তর—নিজ বর্ণ ও আশ্রম অনুসারে শাস্ত্রবিহিত যত রকম কর্তব্যকর্ম আছে, যার বর্ণনা প্রথমে **'নিয়তং কর্ম'** এবং **'স্বভাবজং কর্ম'** নামে করা হয়েছে এবং যা ভগবানের নির্দেশ ও প্রেরণার অনুকূল—সেই সমস্ত কর্মের বাচক হল **'সর্বকর্মাণি'** পদটি।

প্রশ্ন—এখানে **'অপি'** অব্যয় প্রয়োগের অর্থ কী?

উত্তর—**'অপি'** অব্যয় প্রয়োগ করে এখানে ভক্তি-প্রধান কর্মযোগীর মহিমা বলা হয়েছে এবং কর্মযোগের

সুগমতা দেখানো হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, সাংখ্যযোগী সমস্ত পরিগ্রহ এবং সমস্ত ভোগ ত্যাগ করে নির্জন দেশে, নিরন্তর পরমাত্মার ধ্যানের সাধন করে যে পরমাত্মাকে লাভ করেন, ভগবদাশ্রয়ী কর্মযোগী স্ববর্ণাশ্রমোচিত সমস্ত কর্ম সর্বদা করেও সেই পরমাত্মাকেই লাভ করেন ; উভয়ের ফলে কোনোরকম পার্থক্য হয় না।

প্রশ্ন—'**শাশ্বতম্**' ও '**অব্যয়ম্**' বিশেষণের সঙ্গে '**পদম্**' পদ কীসের বাচক এবং ভক্তিপ্রধান কর্মযোগীর ভগবানের কৃপায় তাঁকে লাভ করা কীরূপ ?

উত্তর—যিনি চিরকাল আছেন এবং চিরকাল থাকেন, যাঁর কখনো অভাব হয় না—সেই সচ্চিদানন্দঘন পূর্ণব্রহ্ম, সর্বশক্তিমান, সর্বাধার পরমেশ্বরের বাচক হল উপরোক্ত বিশেষণের সঙ্গে '**পদম্**' পদটি। তিনিই পরম প্রাপ্য, এটি লক্ষ্য করাবার জন্য তাঁকে 'পদ'—এই নামে অভিহিত করা হয়েছে। পঁয়তাল্লিশতম শ্লোকে যাকে 'সংসিদ্ধি'র প্রাপ্তি, ছেচল্লিশতমতে 'সিদ্ধি'র প্রাপ্তি ও পঞ্চান্নতম শ্লোকে '**মাম্**' পদবাচ্য পরমেশ্বরের প্রাপ্তি বলা হয়েছে, এখানে তাকেই '**শাশ্বতম্**' ও '**অব্যয়ম্**' বিশেষণের সঙ্গে '**পদম্**' পদের দ্বারা ভগবানের প্রাপ্তি বলা হয়েছে। অভিপ্রায় হল বিভিন্ন নামে একই তত্ত্বের বর্ণনা করা। উপরোক্ত ভক্তিপ্রধান কর্মযোগীর ভাবে ভাবিত এবং প্রসন্ন হয়ে, তাঁর ওপর অতিশয় অনুগ্রহ করে ভগবান নিজেই তাঁকে পরা ভক্তিরূপ বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন (১০।১০)। সেই বুদ্ধিযোগের দ্বারা ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ জেনে যে ঐ ভক্তের ভগবানে তন্ময় হয়ে যাওয়া—সচ্চিদানন্দঘন পরমেশ্বরে প্রবিষ্ট হয়ে যাওয়া—এই হল তাঁর উপরোক্ত পরমপদ লাভ করা।

সম্বন্ধ—এইভাবে ভক্তিপ্রধান কর্মযোগীর মহিমা বর্ণনা করে এবার তিনি অর্জুনকে ঐরূপই হয়ে ওঠার জন্য নির্দেশ প্রদান করছেন—

চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব।। ৫৭

সমস্ত কর্ম মনে মনে আমাকে সমর্পণ করে সমবুদ্ধিরূপ যোগ অবলম্বন করে, মৎপরায়ণ হয়ে নিরন্তর আমাতে চিত্ত রাখো।। ৫৭

প্রশ্ন—সমস্ত কর্ম মনে মনে ভগবানে অর্পণ করা কী ?

উত্তর—নিজের মন, ইন্দ্রিয় ও শরীর এবং সেগুলির দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্মসমূহ ও সংসারের সমস্ত বস্তু ভগবানের মনে করে সেসবে মমতা, আসক্তি ও কামনা চিরতরে ত্যাগ করা এবং 'আমার কিছু করার শক্তি নেই, ভগবানই সর্বপ্রকারের শক্তি প্রদান করে আমার দ্বারা তাঁর ইচ্ছানুসারে সমস্ত কর্ম করাচ্ছেন, আমি কিছুই করি না'—এরূপ ভেবে ভগবানের নির্দেশানুসারে তাঁরই জন্য, তাঁরই প্রেরণায়, যেমন করান তেমনই, নিমিত্তমাত্র হয়ে সমস্ত কর্ম পুতুলের মতো করতে থাকা—একেই বলা হয় সমস্ত কর্ম মনে মনে ভগবানে অর্পণ করা।

প্রশ্ন—'**বুদ্ধিযোগম্**' পদ কীসের বাচক এবং তাকে অবলম্বন করা কী ?

উত্তর—সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে, সুখ ও দুঃখে, ক্ষতি ও লাভে, এইরূপ জগতের সমস্ত পদার্থে ও প্রাণীতে যে সমবুদ্ধি অবলম্বন করা—তার বাচক '**বুদ্ধিযোগম্**' পদটি। তাই যা কিছু হয়, সব ভগবানের ইচ্ছা ও প্রেরণাতেই হয়—এরূপ মনে করে সমস্ত বস্তুতে, সমস্ত প্রাণীতে ও সমস্ত ঘটনাবলীতে রাগ-দ্বেষ, হর্ষ-শোকাদি বিষমভাব রহিত হয়ে সদা-সর্বদা সমভাবে যুক্ত থাকাই হল উপরোক্ত বুদ্ধিযোগ অবলম্বন করা।

প্রশ্ন—ভগবদ্‌পরায়ণ হওয়া কাকে বলে ?

উত্তর—ভগবানকেই নিজ পরম প্রাপ্য, পরম গতি, পরম হিতৈষী, পরম প্রিয় এবং পরমাধার বলে মানা, তাঁর বিধানে সর্বদা সন্তুষ্ট থাকা ও তাঁর প্রাপ্তির সাধনায় সর্বদা তৎপর হয়ে থাকাই হল ভগবদ্‌পরায়ণ হওয়া।

প্রশ্ন—নিরন্তর ভগবানে চিত্তযুক্ত হওয়া কী ?

উত্তর—মন-বুদ্ধিকে অটলভাবে ভগবানে নিয়োজিত করা, ভগবান ব্যতীত অন্য কিছুকে বিন্দুমাত্র

আপন বলে মনে না করে অনন্য প্রেমসহ নিরন্তর ভগবানকেই চিন্তা করতে থাকা, ক্ষণমাত্রও ভগবানের বিস্মৃতি অসহ্য মনে হওয়া ; ওঠা-বসা, চলা- ফেরা, খাওয়া-দাওয়া, শোয়া-জাগা ইত্যাদি সমস্ত কর্ম করার সময়ও মনে মনে নিত্য-নিরন্তর ভগবদ্-দর্শন করতে থাকা—একেই বলে নিরন্তর ভগবানে চিত্ত যুক্ত হওয়া। নবম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে এবং এখানে পঁয়ষট্টিতম শ্লোকে **'মন্মনা ভব'** দ্বারাও এই কথাই বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ—ভগবান এইভাবে অর্জুনকে ভক্তিপ্রধান কর্মযোগী হওয়ার আদেশ প্রদান করে এবার সেই আদেশ পালন করার ফল জানিয়ে, সেটি না মানলে যে অত্যন্ত ক্ষতি হয়, তা দেখিয়েছেন—

মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি॥ ৫৮

উপরোক্ত প্রকারে মদ্‌গতচিত্ত হয়ে তুমি আমার কৃপায় সমস্ত সংকট অনায়াসেই অতিক্রম করবে, কিন্তু যদি অহংকারবশতঃ আমার কথা না শোনো, তবে বিনাশপ্রাপ্ত হবে অর্থাৎ পরমার্থ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যাবে ॥ ৫৮

প্রশ্ন—আমাতে চিত্তযুক্ত হয়ে তুমি আমার কৃপায় সমস্ত সংকট অনায়াসে পার হয়ে যাবে, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এই বাক্যে ভগবান দেখিয়েছেন যে, পূর্বশ্লোকের নির্দেশ অনুসারে সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করে এবং মৎপরায়ণ হয়ে নিরন্তর আমাতে মন নিবিষ্ট করে রাখলে তোমার আর কিছু করতে হবে না, আমার কৃপার প্রভাবে তোমার ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত দুঃখ অনায়াসেই বিদূরিত হবে। তুমি সর্বপ্রকার দুর্গুণ, দুরাচার রহিত হয়ে চিরদিনের জন্য জন্ম-মৃত্যুরূপ মহাসংকট থেকে মুক্ত হয়ে যাবে এবং নিত্য আনন্দঘন পরমেশ্বররূপে আমাকে লাভ করবে।

প্রশ্ন—**'অথ'** ও **'চেৎ'**—এই দুটি অব্যয়ের অর্থ কী এবং 'অহংকারবশতঃ আমার কথা না শুনলে বিনাশ-প্রাপ্ত হবে'—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—**'অথ'** পদটি পক্ষান্তর বোধক এবং **'চেৎ'**, **'যদি'**র অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। এই দুটি অব্যয়ের সঙ্গে উপরোক্ত বাক্য দ্বারা ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, তুমি আমার ভক্ত এবং প্রিয়সখা, সেইজন্য তুমি অবশ্যই আমার নির্দেশ পালন করবে। তবুও তোমাকে সাবধান করার জন্য আমি বলছি যে, আমার নির্দেশ পালন করলে যেমন তোমার মহালাভ হবে তেমনই তা পালন না করলে অত্যন্ত ক্ষতি হবে। তাই তুমি যদি অহংকারবশতঃ অর্থাৎ নিজেকে বুদ্ধিমান বা সমর্থ মনে করে আমার কথা না শোনো—আমার নির্দেশ পালন না করে নিজ ইচ্ছামতো কাজ কর, তবে তুমি বিনাশপ্রাপ্ত হবে। তখন তুমি ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও প্রকৃত সুখ ও শান্তি পাবে না এবং নিজ কর্তব্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে বর্তমান অবস্থান থেকে পতিত হবে।

প্রশ্ন—ভগবান অর্জুনকে আগেই বলেছেন যে, তুমি আমার ভক্ত (৪।৩), এবং একথাও বলেছেন যে **'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি'** অর্থাৎ আমার ভক্তের কখনো বিনাশ হয় না (৯।৩১) আর এখানে বলেছেন যে, তুমি বিনাশপ্রাপ্ত হবে অর্থাৎ তোমার পতন হবে, এই বিরুদ্ধ বাক্যের সমাধান কী ?

উত্তর—ভগবান নিজেই উপরোক্ত বাক্যে **'চেৎ'** পদ প্রয়োগ করে এই বিরোধের সমাধান করেছেন। অভিপ্রায় হল যে, ভগবানের ভক্তের কখনো পতন হয় না, একথা ধ্রুব সত্য এবং এও সত্য যে অর্জুন ভগবানের পরম ভক্ত। তাই তিনি যে ভগবানের কথা শুনবেন না, তাঁর নির্দেশ পালন করবেন না—তা হতেই পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি অহংকারবশতঃ তিনি ভগবানের আদেশ অবহেলা করেন, তাহলে তাঁকে ভগবানের ভক্ত বলে মনে করা যাবে না। তাই সেইক্ষেত্রে তাঁর পতন হওয়াও যুক্তিসঙ্গত।

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে অহংকারবশতঃ ভগবানের নির্দেশ না মানলে যে পতনের কথা বলা হয়েছিল, সেটিই দৃঢ়তার সঙ্গে জানাবার জন্য ভগবান দুটি শ্লোকের দ্বারা অর্জুনের যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্তে দোষের লক্ষ্য করাচ্ছেন—

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি॥ ৫৯

তুমি যে অহংকারবশতঃ মনে করছ যে, 'আমি যুদ্ধ করব না', তোমার এই সিদ্ধান্ত মিথ্যা ; কারণ তোমার স্বভাবই জোর করে তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করবে ॥ ৫৯

প্রশ্ন—এই যে তুমি অহংকারবশতঃ মনে করছ যে 'আমি যুদ্ধ করব না', এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভগবান প্রথমে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিলে (২।৩) অর্জুন ভগবানকে বলেছিলেন যে 'ন যোৎস্যে' —আমি যুদ্ধ করব না (২।৯), সেই কথা স্মরণ করিয়ে এই কথাটি ভগবান বলেছেন। অভিপ্রায় হল যে, তুমি যে মনে করছ 'আমি যুদ্ধ করব না', তোমার এই মনে করা হল শুধুমাত্র তোমার অহংকার, কারণ যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার তোমার কোনো ক্ষমতা নেই। অতএব এই রূপ অজ্ঞতাজনিত অহংকারের বশীভূত হয়ে নিজেকে পণ্ডিত, সক্ষম ও স্বাধীন মনে করা এবং নিজের সেই ক্ষমতায় নির্ভর করে স্থির করা যে ঐ কাজ এইভাবে সম্পন্ন করব আর ঐ কাজ থেকে বিরত থাকব, তা খুবই অনুচিত হবে।

প্রশ্ন—তোমার এই সিদ্ধান্ত মিথ্যা, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথায় ভগবানের অভিপ্রায় হল, তোমার এই ধারণা স্থায়ী হবে না, অর্থাৎ তুমি যুদ্ধ না করে থাকতে পারবে না। কারণ তুমি প্রকৃতির অধীন, স্বাধীন নও।

প্রশ্ন—এখানে 'প্রকৃতিঃ' পদটি কীসের বাচক এবং তোমার প্রকৃতি তোমাকে জোর করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করবে, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম সংস্কার যা বর্তমান জন্মে স্বভাবরূপে গঠিত হয়েছে, সেই সবের বাচক হল এখানে 'প্রকৃতিঃ' পদটি, একে স্বভাবও বলা হয়। এই স্বভাব অনুসারেই মানুষ ভিন্ন ভিন্ন কর্মের অধিকারীরূপে জন্ম নেয় এবং সেই স্বভাব অনুসারেই ভিন্ন ভিন্ন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন কর্মে প্রবৃত্ত হয়। তাই এখানে উপরোক্ত বাক্য দ্বারা ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, যে স্বভাবের জন্য তোমার ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম হয়েছে, তোমার ইচ্ছা না থাকলেও সেই স্বভাব তোমাকে জোর করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করবে। পরিস্থিতি অনুসারে বীরতাসহ যুদ্ধ করা, যুদ্ধে ভয় না পাওয়া বা যুদ্ধ থেকে পলায়ন না করা —এগুলি তোমার সহজ কর্ম। তাই তুমি এসব না করে থাকতে পারবে না, তোমাকে অবশ্যই যুদ্ধ করতে হবে। এখানে ক্ষত্রিয় হওয়ার জন্য অর্জুনকে যুদ্ধ বিষয়ে যা বলা হয়েছে, সেই কথা অন্যান্য বর্ণের লোকেদের ক্ষেত্রেও নিজ নিজ স্বাভাবিক কর্মের বিষয়ে প্রযোজ্য বলে বুঝে নিতে হবে।

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা।
কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥ ৬০

হে কুন্তীপুত্র ! যে কর্ম তুমি মোহবশতঃ করতে চাও না, সেই কর্মই তুমি পূর্বকৃত স্বাভাবিক কর্মে আবদ্ধ হওয়ায় বাধ্য হয়ে করবে ॥ ৬০

প্রশ্ন—'কৌন্তেয়' সম্বোধনের অর্থ কী ?

উত্তর—অর্জুনের মা কুন্তীদেবী অত্যন্ত বীর নারী ছিলেন, তিনি নিজে শ্রীকৃষ্ণের মাধ্যমে খবর পাঠাবার সময় পাণ্ডবদের যুদ্ধের জন্য উৎসাহ প্রদান করেছিলেন। তাই ভগবান এখানে অর্জুনকে 'কৌন্তেয়' নামে সম্বোধিত করে বলতে চেয়েছেন যে, তুমি বীর মাতার পুত্র, নিজেও শূরবীর, অতএব তুমি যুদ্ধ না করে থাকতে পারবে না।

প্রশ্ন—যে কর্ম তুমি মোহবশতঃ করতে চাও না, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—ভগবানের এই কথার অভিপ্রায় হল, তুমি

ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ করা তোমার স্বাভাবিক ধর্ম, সুতরাং এটি তোমার জন্য পাপকর্ম নয়। তাই এটি না করার বাসনা তোমার মনে কোনোভাবেই ওঠা উচিত নয়। উপরন্তু ন্যায্যভাবে প্রাপ্ত যুদ্ধরূপ সহজকর্ম যে তুমি করতে চাইছ না—এ অতি অবিবেচনা প্রসূত, এর কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই।

প্রশ্ন—সে কর্মও তুমি তোমার স্বাভাবিক কর্মবন্ধনের বশীভূত হয়ে করবে, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—ভগবান এর দ্বারা বলতে চেয়েছেন যে, যুদ্ধ করা তোমার স্বাভাবিক কর্ম, তুমি তাতে আবদ্ধ রয়েছ অর্থাৎ যুদ্ধের সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সেইজন্য তোমার ইচ্ছা না থাকলেও তোমাকে তা সবলে নিজের দিকে আকর্ষণ করবে এবং তোমাকে স্বভাবের বশীভূত হয়ে তা করতে হবে। তাই আমার নির্দেশানুসারে অর্থাৎ সাতান্নতম শ্লোকে বলা বিধি অনুসারে যদি তা করো তাহলে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আমাকে লাভ করবে, না হলে রাগ-দ্বেষের জালে আবদ্ধ হয়ে জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারসাগরে ভ্রমণ করতে থাকবে।

নদীর স্রোতে ভেসে যাওয়া মানুষ যেমন স্রোতের সম্মুখীন হয়ে নদী পার হতে পারে না, বরং নিজের বিনাশ করে ; আর যে ব্যক্তি কোনো কাঠ বা নৌকার আশ্রয় নিয়ে অথবা সন্তরণ কলার সাহায্যে সাঁতার দিয়ে সেই জলস্রোত ধীরে ধীরে কাটিয়ে পার হয়ে তীরে এসে পৌঁছায়, তেমনই প্রকৃতির প্রবাহে ভাসমান মানুষ যদি হঠতাপূর্বক প্রকৃতির মোকাবিলা করেন অর্থাৎ জোর করে কর্তব্যকর্ম ত্যাগ করেন, তাহলে তিনি প্রকৃতির প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন না, বরং তাতে আরও আবদ্ধ হয়ে পড়েন। আর যিনি পরমেশ্বরের বা কর্মযোগের আশ্রয় নিয়ে বা জ্ঞানমার্গ অনুসারে নিজেকে প্রকৃতি থেকে ঊর্ধ্বে তুলে প্রকৃতির (স্বভাবের) অনুকূল কর্ম করতে থাকেন, তিনি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃতির অতীত হয়ে যান, অর্থাৎ পরমাত্মাকে লাভ করেন।

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে বলা হয়েছে যে, কর্ম করাতে মানুষ স্বভাবের অধীন ; তাতে প্রশ্ন হতে পারে যে, প্রকৃতি বা স্বভাব তো হল জড়, সেটি কীভাবে কাউকে নিজের বশে করতে পারে ? এর উত্তরে ভগবান জানাচ্ছেন—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া॥ ৬১

হে অর্জুন ! অন্তর্যামী পরমেশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত রয়েছেন। তিনি শরীর-রূপ যন্ত্রে আরূঢ় সকল প্রাণীকে তাদের কর্ম অনুসারে নিজ মায়ার দ্বারা চালিত করেন ॥ ৬১

প্রশ্ন—এখানে শরীরকে যন্ত্রের রূপ দেওয়ার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে শরীরকে যন্ত্রের রূপ দিয়ে ভগবান এই কথা বলতে চেয়েছেন যে, যেমন রেলগাড়ি ইত্যাদি কোনো যন্ত্রে চড়া মানুষ নিজে চলে না, রেলগাড়ি বা সেই যন্ত্রটি চললে প্রকৃতপক্ষে তারও চলা হয়—তেমনই আত্মা যদিও নিশ্চল, কোনো ক্রিয়ার সঙ্গেই বাস্তবে তার কোনো সম্বন্ধ নেই, তবুও অনাদি সিদ্ধ অজ্ঞতার জন্য শরীরের সঙ্গে তার সম্বন্ধ মেনে নেওয়ায় সেই শরীরের ক্রিয়াকে তার (সেই ব্যক্তির) ক্রিয়া মনে করা হয়।

ঈশ্বরকে সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত বলে এই ভাব ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যন্ত্রের চালক যেমন স্বয়ং ঐ যন্ত্রেই থাকে, তেমনই ঈশ্বরও সর্বপ্রাণীর অন্তরে অবস্থিত এবং তাদের হৃদয়ে অবস্থিত হয়েই তিনি তাদের কর্মানুসারে পরিচালিত করেন। তাই ঈশ্বরের কোনো বিধানেই কোনো ভুল হতে পারে না ; কারণ তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ। তিনি সকলের সমস্ত কর্ম যথাযথভাবে জানেন।

প্রশ্ন—'যন্ত্রারূঢানি' বিশেষণের সঙ্গে 'ভূতানি' পদ কীসের বাচক এবং নিজের মায়া দ্বারা ভগবানের তাদের ভ্রমণ করানো কীরূপ ?

উত্তর—শরীররূপ যন্ত্রে স্থিত সমস্ত প্রাণীর বাচক হল 'যন্ত্রারূঢানি' বিশেষণের সঙ্গে 'ভূতানি' পদটি। এদের সকলকে তাদের পূর্বার্জিত কর্ম-সংস্কার অনুসারে ফল ভোগ করাবার জন্য বারংবার নানা যোনিতে উৎপন্ন করা

ও বিভিন্ন পদার্থ, ক্রিয়া এবং প্রাণীদের সঙ্গে তাদের সংযোগ-বিয়োগ করানো এবং তাদের স্বভাব (প্রকৃতি) অনুযায়ী তাদের পুনরায় কর্মে নিয়োগ করা— এই হল ভগবানের ঐসব প্রাণীকে নিজ মায়া দ্বারা ভ্রমণ করানো।

প্রশ্ন—কর্ম করা বা না করায় মানুষ স্বাধীন না পরাধীন ? যদি পরাধীন হয় তাহলে কীভাবে এবং কার অধীন—প্রকৃতির না স্বভাবের নাকি ঈশ্বরের ? কারণ কোথাও তো মানুষের কর্মে অধিকার বলে (২।৪৭) তাকে স্বাধীন বলা হয়েছে, কোথাও প্রকৃতির অধীন (৩।৩৩) আবার কোথাও ঈশ্বরের অধীন (১০।৮) বলা হয়েছে। এই অধ্যায়েরও উনষাট এবং ষাটতম শ্লোকে প্রকৃতির ও স্বভাবের অধীন বলা হয়েছে, তাই এটির স্পষ্টীকরণ হওয়া উচিত।

উত্তর—কর্ম করা বা না করায় মানুষ পরাধীন, তাই বলা হয়েছে যে, কোনো প্রাণীই কর্ম না করে একমুহূর্ত থাকতে পারে না (৩।৫)। মানুষের যে কর্মে অধিকার বলা হয়েছে, তার অভিপ্রায়ও তাকে স্বাধীন বলা নয়, বরং পরাধীনই বলা। কারণ তার দ্বারা কর্ম ত্যাগ অসম্ভব বলে জানানো হয়েছে। তারপর এই জিজ্ঞাসা বাকী থাকে যে, কার অধীনস্থ হয়ে মানুষ কর্ম করে, এই সম্বন্ধে বলা যায় যে মানুষ প্রকৃতির অধীন, স্বভাবের অধীন এবং ঈশ্বরের অধীন— এই তিনটি হল একই ব্যাপার। কারণ স্বভাব ও প্রকৃতি হল পর্যায়বাচী শব্দ এবং ঈশ্বর স্বয়ং নিরপেক্ষভাবে অর্থাৎ সর্বদা নির্লিপ্ত থেকেই ঐসব জীবেদের প্রকৃতির অনুরূপ তাঁর মায়াশক্তি দ্বারা তাদের কর্মে নিযুক্ত করেন। তাই ঈশ্বরের অধীন বললে প্রকৃতির অধীনই বলা হয়। অন্যদিকে ঈশ্বরই প্রকৃতির প্রভু এবং প্রেরক, সেইজন্য প্রকৃতির অধীন বলাও ঈশ্বরেরই অধীন বলা হয়।

বাকি থাকে এই বিষয় যে, মানুষ যদি সর্বতোভাবেই পরাধীন হয় তাহলে তার উদ্ধার হওয়ার উপায় কী এবং তার জন্য কর্তব্য-অকর্তব্য বিধানকারী শাস্ত্রেরই বা কী প্রয়োজন ? তার উত্তর হল যে, কর্তব্য-অকর্তব্য বিধানকারী শাস্ত্র মানুষকে তার স্বাভাবিক কর্ম থেকে সরাবার জন্য বা তার দ্বারা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম করানোর জন্য নয় বরং সেই কর্ম করা কালে রাগ (আসক্তি)-দ্বেষের বশীভূত হয়ে সে যে অন্যায় করে বসে— সেই অন্যায় ত্যাগ করিয়ে তাকে ন্যায়পূর্বক কর্তব্যকর্মে নিয়োগ করার জন্যই কর্তব্য-অকর্তব্য বিধানকারী শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। তাই মানুষ কর্ম করায় স্বভাবের অধীন হয়েও সেই স্বভাব শোধরাতে পরাধীন নয়। তাই যদি সে শাস্ত্র ও মহাপুরুষদের উপদেশে সচেতন হয়ে প্রকৃতির প্রেরক সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের শরণ গ্রহণ করে এবং রাগ-দ্বেষ-বিকারসমূহ পরিত্যাগ করে শাস্ত্রবিধি অনুসারে ন্যায়পূর্বক নিজ স্বাভাবিক কর্ম নিষ্কামভাবে করে নিজ জীবন অতিবাহিত করে তাহলে তার উদ্ধার লাভ সম্ভব।

সম্বন্ধ—উপরোক্ত শ্লোকের দ্বারা একথা প্রমাণিত হল যে, মানুষ কর্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ করায় স্বাধীন নয়, তাকে তার নিজ স্বভাবের বশে স্বাভাবিক কর্মে প্রবৃত্ত হতেই হয়, কারণ সর্বশক্তিমান সর্বান্তর্যামী পরমেশ্বর স্বয়ং সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত হয়ে তাদের প্রকৃতি অনুসারে তাদের পরিভ্রমণ করান এবং তাঁর প্রেরণার প্রতিবাদ করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। তাতে প্রশ্ন আসে যে, যদি তাই হয়, তাহলে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরম শান্তিলাভের জন্য মানুষের কী করা উচিত ? ভগবান তাই অর্জুনকে তাঁর কর্তব্য নির্দেশ করে বলছেন—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।। ৬২

হে ভারত ! তুমি সর্বতোভাবে সেই পরমেশ্বরেরই শরণ গ্রহণ করো। সেই পরমাত্মার কৃপাতেই তুমি পরম শান্তি ও সনাতন পরমধাম লাভ করবে ।। ৬২

প্রশ্ন—'**তম্**' পদ কীসের বাচক এবং সর্বপ্রকারে তাঁর শরণ গ্রহণ করা কী ?

উত্তর—যে সর্বশক্তিমান, সর্বাধার, সবাকার প্রেরক, সর্বান্তর্যামী, সর্বব্যাপী পরমেশ্বরকে পূর্বশ্লোকে

সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে স্থিত বলা হয়েছে, তাঁরই বাচক হল 'তম্' পদটি। নিজ মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি, প্রাণকে এবং সমস্ত ধন, জন ইত্যাদিকে তাঁকে সমর্পণ করে তাঁর উপরই নির্ভর করাই হল সর্বপ্রকারে সেই পরমেশ্বরের শরণাগত হওয়া।

অর্থাৎ ভগবানের গুণ, প্রভাব, তত্ত্ব এবং স্বরূপের শ্রদ্ধাপূর্বক নিশ্চয় করে ভগবানকেই পরম প্রাপ্য, পরম গতি, পরম আশ্রয় ও সর্বস্ব বলে মনে করা এবং তাঁকে নিজের প্রভু, ভর্তা, প্রেরক, রক্ষক এবং পরম হিতৈষী জেনে সর্বপ্রকারে তাঁর ওপর নির্ভর করে নির্ভয় হয়ে যাওয়া এবং সব কিছু তাঁর জেনে ও ভগবানকে সর্বব্যাপী জেনে সমস্ত কর্মে মমতা, অভিমান, আসক্তি ও কামনা ত্যাগ করে ভগবানের নির্দেশানুসারে নিজ কর্ম দ্বারা সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত পরমেশ্বরের সেবা করা, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি যা কিছু প্রাপ্তি হয় সেসবই ভগবান প্রেরিত পুরস্কার মনে করে সর্বদা সন্তুষ্ট থাকা, ভগবানের কোনো বিধানে বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট না হওয়া, মান-মর্যাদা-প্রতিষ্ঠা ত্যাগ করে ভগবান ব্যতীত অন্য কোনো জাগতিক বস্তুতে মমতা বা আসক্তি না রাখা ; অতিশয় শ্রদ্ধা ও অনন্য প্রেমসহ ভগবানের নাম, গুণ, প্রভাব, লীলা, তত্ত্ব ও স্বরূপের নিত্য-নিরন্তর শ্রবণ, চিন্তন এবং আলোচনা—এসব ভাব ও ক্রিয়া হল সর্বপ্রকারে পরমেশ্বরের শরণ গ্রহণের অন্তর্গত।

প্রশ্ন— পরমেশ্বরের দয়ায় পরম শান্তি ও সনাতন পরম ধাম লাভ কী ?

উত্তর—উপরোক্ত প্রকারে ভগবানের শরণ-গ্রহণকারী ভক্তের ওপর পরম দয়ালু, পরম সুহৃদ, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের দয়ার অপার স্রোত প্রবাহিত হয় ; যা ভক্তের সমস্ত দুঃখ ও বন্ধন চিরদিনের মতো ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এইরূপ ভক্ত যিনি সমস্ত দুঃখ থেকে, সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে চিরকালের মতো পরমানন্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান ও সচ্চিদানন্দঘন পূর্ণব্রহ্ম সনাতন পরমেশ্বরকে লাভ করেন, সেটিই হল পরমেশ্বরের কৃপায় ভক্তের পরম শান্তি ও সনাতন পরমধাম লাভ করা।

সম্বন্ধ—ভগবান এইভাবে অর্জুনকে অন্তর্যামী পরমেশ্বরের শরণ গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়ে এবার উক্ত উপদেশের উপসংহার করে বলছেন—

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥ ৬৩

এইভাবে গুহ্য থেকে অতি গুহ্য জ্ঞান আমি তোমাকে বললাম। এখন তুমি এই রহস্যময় জ্ঞানকে সম্পূর্ণভাবে যথাযথ বিচার করে, যেমন চাও তেমনই করো ॥ ৬৩

প্রশ্ন—'**ইতি**' পদটির এখানে কী অর্থ ?

উত্তর—এখানে '**ইতি**' পদটি উপদেশ সমাপ্তির বোধক এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক থেকে এপর্যন্ত ভগবান যা কিছু বলেছেন, সেই সবকিছুর নির্দেশকারী।

প্রশ্ন—'জ্ঞানম্' পদটি এখানে কোন্ জ্ঞানের বাচক এবং তার সঙ্গে '**গুহ্যাৎ গুহ্যতরম্**' বিশেষণ দিয়ে কী অর্থ করা হয়েছে ?

উত্তর—ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক থেকে আরম্ভ করে এই পর্যন্ত অর্জুনকে তাঁর গুণ, প্রভাব, তত্ত্ব ও স্বরূপের রহস্য যথাযথভাবে বোঝাবার জন্য যে সকল কথা বলেছেন—সেই সমস্ত উপদেশের বাচক হল '**জ্ঞানম্**' পদটি। সেই সমস্ত উপদেশ প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের জ্ঞান অবগত করায়, তাই তার নাম রাখা হয়েছে 'জ্ঞান'। সংসারে এবং শাস্ত্রে যত গোপনীয় রহস্যের বিষয় বলা হয়েছে—সে সবের মধ্যে ভগবানের গুণ, প্রভাব ও স্বরূপের প্রকৃত জ্ঞান-গর্ভ উপদেশ সব থেকে বেশি গোপন রাখার উপযুক্ত বলে মানা হয়েছে ; তাই এই উপদেশের মহত্ত্ব বোঝাবার জন্য এবং এই কথা জানাবার জন্য যে, অনধিকারীর কাছে এই বিষয় প্রকটিত করা উচিত নয়, এখানে '**জ্ঞানম্**' পদের সঙ্গে 'গুহ্যাৎ গুহ্যতরম্' বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—'**ময়া**', '**তে**' এবং '**আখ্যাতম্**' এই

পদগুলির অর্থ কী ?

উত্তর—'ময়া' পদ দ্বারা ভগবান জানাচ্ছেন যে, আমি আমার (পরমেশ্বরের) গুণ, প্রভাব ও স্বরূপের তত্ত্ব যতটা এবং যেমনভাবে বলতে পারি, অন্য কেউ তেমনভাবে বলতে পারে না। তাই আমার দ্বারা কথিত এই জ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবং 'তে' পদের অর্থ হল, তোমাকে এর অধিকারী মনে করে তোমার হিতার্থে আমি এই উপদেশ বলেছি এবং 'আখ্যাতম্' পদের এই অভিপ্রায় যে, আমার যা কিছু বলার ছিল সব বলেছি, এখন আর কিছু বলা বাকী নেই।

প্রশ্ন—এই রহস্যপূর্ণ জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে যথাযথ বিচার করে যেমন চাও তেমনই করো, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক থেকে উপদেশ শুরু করে ভগবান অর্জুনকে স্থানে স্থানে (২।১৮ ; ৩৭ ; ৩।৩০ ; ৮।৭ ; ১১।৩৪) সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগের সাধনা অনুসারে স্বধর্মরূপ যুদ্ধ করা কর্তব্য বলে জানিয়ে তাঁর শরণ গ্রহণ করতে বলেছেন। তারপর অষ্টাদশ অধ্যায়ে অর্জুনের জিজ্ঞাসা অনুসারে সন্ন্যাস ও ত্যাগ (যোগ)-এর তত্ত্ব ভালোভাবে বোঝাবার পর পুনরায় ছাপ্পান্ন এবং সাতান্নতম শ্লোকে ভক্তিপ্রধান কর্মযোগের মহিমা বর্ণনা করে অর্জুনকে তাঁর শরণ গ্রহণ করতে বলেছেন। এতেও অর্জুনের কাছ থেকে কোনো স্বীকৃতিমূলক কথা না শোনায় ভগবান পুনরায় সেই নির্দেশ পালন করার মহাফলের কথা বলে জানিয়েছেন যে, সেটি মেনে না নিলে অত্যন্ত ক্ষতি হবে। তাতেও কোনো উত্তর না পেয়ে অর্জুনকে পুনরায় সাবধান করার জন্য বলেছেন যে, পরমেশ্বর সকলের প্রেরক এবং সকলের হৃদয়ে স্থিত এবং অর্জুনকে তাঁর শরণ গ্রহণ করতে বলেছেন। তাতেও যখন অর্জুন কোনো উত্তর দিলেন না, তখন এই শ্লোকের পূর্বার্ধে উপদেশের উপসংহার করে এবং তাঁর কথিত উপদেশের গুরুত্ব দেখিয়ে এই বাক্য দ্বারা পুনরায় বিচার করার জন্য অর্জুনকে সাবধান করে শেষকালে বলেছেন **'যথেচ্ছসি তথা কুরু'** অর্থাৎ উপরোক্ত প্রকারে বিচার করার পর তুমি যা ভালো বোঝ, তেমনই করো। অভিপ্রায় হল যে, আমি যে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদি বহু প্রকার সাধনার কথা বলেছি, তার মধ্যে তোমার যে সাধনাটি ঠিক বলে মনে হয়, সেটিই পালন করো অথবা তুমি যা ভালো মনে করো, সেটিই করো।

সম্বন্ধ—এইভাবে অর্জুনকে সমস্ত উপদেশ বিচার-বিবেচনা করে নিজ কর্তব্য নির্ধারণ করতে বলার পরও অর্জুন যখন কোনো উত্তর দিলেন না এবং নিজেকে অনধিকারী ও কর্তব্য স্থির করতে অক্ষম মনে করে বিষণ্ণচিত্ত ও হতচকিত হয়ে গেলেন, তখন সবার হৃদয়ের কথা যিনি জানেন সেই অন্তর্যামী ভগবান স্বয়ং অর্জুনের ওপর দয়া করে তাঁকে সমগ্র গীতার উপদেশের সার জানাতে মনস্থ করে বলতে লাগলেন—

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্।। ৬৪

সর্বাপেক্ষা গোপনীয় থেকেও অতিশয় গোপনীয় আমার পরম রহস্যময় কথা তুমি আবার শোনো। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, তাই এই পরম হিতকারক বাক্য তোমাকে আবার বলছি ॥ ৬৪

প্রশ্ন—'বচঃ' পদের সঙ্গে **'সর্বগুহ্যতমম্'** ও 'পরমম্' এই দুটি বিশেষণ প্রয়োগ করার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—ভগবান অর্জুনকে এ পর্যন্ত যত কথা বলেছেন, তা সবই গোপন রাখার উপযুক্ত ; তাই ভগবান সেগুলিকে স্থানে স্থানে 'পরম গুহ্য' ও 'উত্তম রহস্য' বলেছেন। ঐ সব উপদেশের মধ্যেও ভগবান যেখানে বিশেষ করে নিজের গুণ, প্রভাব, স্বরূপ, মহিমা ও ঐশ্বর্য প্রকট করে অর্থাৎ 'আমিই স্বয়ং সর্বব্যাপী, সর্বাধার, সর্বশক্তিমান, সাক্ষাৎ সগুণ-নির্গুণ পরমেশ্বর' —এইভাবে ঘোষণা করে অর্জুনকে তাঁর ভজনা করার জন্য এবং শরণ গ্রহণ করার জন্য বলেছেন, সেইসকল বচন অত্যন্ত গোপনীয়। তাই ভগবান নবম অধ্যায়ের

প্রথম শ্লোকে **'গুহ্যতমম্'** ও দ্বিতীয়তে **'রাজগুহ্যম্'** বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন ; কারণ ঐ অধ্যায়ে ভগবান তাঁর গুণ, প্রভাব, স্বরূপ, রহস্য ও ঐশ্বর্যের যথাযথ বর্ণনা করে অর্জুনকে স্পষ্টভাবে তাঁর ভজনা করার এবং শরণ গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এইভাবে দশম অধ্যায়ে পুনরায় তদনুরূপ নিজের শরণাগতির বিষয় আরম্ভ করার সময় প্রথম শ্লোকে **'বচঃ'**র সঙ্গে **'পরমম্'** বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন। তাই ভগবান এখানে **'বচঃ'** পদের সঙ্গে **'সর্বগুহ্যতমম্'** এবং **'পরমম্'** বিশেষণ দিয়ে এই ভাব প্রকাশ করেছেন যে, আমার কথিত উপদেশেও—যা অত্যন্ত গোপন রাখার যোগ্য এবং সব থেকে মহত্ত্বপূর্ণ, সেটি আমি পরবর্তী দুটি শ্লোকে জানাব।

প্রশ্ন—ঐ উপদেশ আবার শোনার জন্য বলার অর্থ কী ?

উত্তর—সেগুলি আবার শুনতে বলার অর্থ হল, এখন আমি তোমাকে যা বলতে চাইছি, তা আগেও বলেছি (৯।৩৪ ; ১২।৬-৭ ; ১৮।৫৬-৫৭) ; কিন্তু তুমি তা বিশেষভাবে গ্রহণ করতে পারনি, তাই সেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ সমস্ত উপদেশ থেকে আলাদা করে আমি তোমাকে আবার বলছি। তুমি সাবধানে শোনো।

প্রশ্ন—'দৃঢ়ম্'-এর সঙ্গে **'ইষ্টঃ'** পদে কী অর্থ জানিয়েছেন ?

উত্তর—তেষট্টিতম শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে তাঁর কর্তব্য স্থির করার জন্য স্বাধীনভাবে বিচার করতে বলেছেন, এর ভার তিনি নিজের ওপর রাখেননি। এই কথা শুনে অর্জুন বিষণ্ণ হয়ে গেলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন, ভগবান এমন কথা বলছেন কেন, আমার কি ভগবানের ওপর বিশ্বাস নেই, আমি কি তাঁর ভক্ত ও প্রেমিক নই ? তাই **'দৃঢ়ম্'** ও **'ইষ্টঃ'** এই দুটি পদের দ্বারা ভগবান অর্জুনের বিষণ্ণতা দূর করার জন্য তাঁকে উৎসাহিত করে বলতে চেয়েছেন যে, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, তোমার সঙ্গে আমার ভালোবাসার সম্পর্ক অটুট ; সুতরাং তুমি কোনো দুঃখ কোরো না।

প্রশ্ন—'ততঃ' অব্যয় প্রয়োগের এবং 'আমি তোমাকে পরম হিতের কথা বলব', এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—'ততঃ' পদটি হেতুবাচক, এর প্রয়োগ করে এবং অর্জুনকে তাঁর হিতের কথা বলার অঙ্গীকার করে ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, তুমি আমার ঘনিষ্ঠ প্রেমিক। তাই তোমার থেকে কোনো কিছু লুকিয়ে না রেখে গোপনীয় থেকে অতি গোপনীয় কথা তোমার হিতার্থে আমি তোমাকে বলব আর আমি যা কিছু বলব, সেসবই তোমার অত্যন্ত হিতের বিষয় হবে।

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে ভগবান যে সর্বগুহ্যতম কথা বলার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এবার তা পালন করে বলছেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ ৬৫

হে অর্জুন ! তুমি আমার প্রতি মনযুক্ত হও, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা করো এবং আমাকে প্রণাম করো। এরূপ করলে তুমি আমাকেই লাভ করবে, আমি তোমার কাছে একথা সত্য প্রতিজ্ঞা করে বলছি ; কারণ তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় ॥ ৬৫

প্রশ্ন—ভগবানে মনযুক্ত হওয়া কী ?

উত্তর—ভগবানকে সর্বশক্তিমান, সর্বাধার, সর্বজ্ঞ, সর্বান্তর্যামী, সর্বব্যাপী, সর্বেশ্বর এবং পরম সৌন্দর্য, মাধুর্য ও ঐশ্বর্য ইত্যাদি গুণের সমুদ্র জেনে অনন্য প্রেমপূর্বক নিশ্চলভাবে মনকে ভগবানে যুক্ত করা, মুহূর্তমাত্রও তাঁর বিস্মৃতি সহ্য করতে না পারা হল 'ভগবানে মনযুক্ত' হওয়া। এর বিশেষ ব্যাখ্যা নবম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে করা হয়েছে।

প্রশ্ন—ভগবানের ভক্ত হওয়া কী ?

উত্তর—ভগবানকেই একমাত্র নিজের ভর্তা, প্রভু, সংরক্ষক, পরমগতি ও পরম আশ্রয় মনে করে সর্বদা তাঁর অধীন হয়ে যাওয়া, বিন্দুমাত্রও নিজের স্বাধীনতা না রাখা,

সর্বপ্রকারে তাঁর ওপর নির্ভর করা, তাঁর প্রতিটি বিধানে সর্বদা সন্তুষ্ট থাকা এবং তাঁর নির্দেশ সর্বদা পালন করা ও তাঁকে অত্যন্ত প্রেমপূর্বক শ্রদ্ধা করা, এই হল 'ভগবানের ভক্ত হওয়া'।

প্রশ্ন—ভগবানের পূজা করা কী ?

উত্তর—নবম অধ্যায়ের ছাব্বিশতম শ্লোকের বর্ণনানুসারে পত্রপুষ্পের দ্বারা শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রেমপূর্বক ভগবদ্‌বিগ্রহের পূজা করা ; মনে মনে ভগবানের আবাহন করে তাঁর মানসিক পূজা করা, তাঁর বাক্য ও লীলাভূমি তথা বিগ্রহের সর্বপ্রকারে আদর-সম্মান করা ও সবেতে ভগবান ব্যাপ্ত মনে করে বা সমস্ত প্রাণীকে ভগবানের স্বরূপ ভেবে তাদের যথাযোগ্য সেবা-পূজা আদর-সংকার করা ইত্যাদি সবই হল এর অন্তর্গত। এর বর্ণনা নবম অধ্যায়ের ছাব্বিশতম থেকে আঠাশতম শ্লোকের ব্যাখ্যায় ও চৌত্রিশতম শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন—'**মাম্‌**' পদ কীসের বাচক এবং তাঁকে প্রণাম করা কী ?

উত্তর—যে পরমেশ্বরের সগুণ-নির্গুণ, সাকার-নিরাকার অনেক রূপ, যিনি অর্জুনের কাছে শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রকটিত হয়ে গীতার উপদেশ দিয়েছেন ; যিনি রামরূপে প্রকটিত হয়ে জগতে ধর্মের মর্যাদা স্থাপন করেছেন, নৃসিংহরূপ ধারণ করে ভক্ত প্রহ্লাদকে উদ্ধার করেছেন—সেই সর্বশক্তিমান, সর্বগুণসম্পন্ন, অন্তর্যামী, পরমাধার, সমগ্র পুরুষোত্তমের বাচক হল '**মাম্‌**' পদটি।

তাঁর যে কোনো রূপ, চিত্র, চরণচিহ্ন বা চরণ পাদুকাকে অথবা তাঁর গুণ, প্রভাব ও তত্ত্ব বর্ণনাকারী শাস্ত্রকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করা বা সমস্ত প্রাণীতে তাঁকে ব্যাপ্ত বা সমস্ত প্রাণীকে ভগবানের স্বরূপ মনে করে সকলকে প্রণাম করা হল 'ভগবানকেই প্রণাম করা'। এর বিস্তারিত বিবরণ নবম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন—এরূপ করলে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হবে, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—ভগবান এর দ্বারা বলতে চেয়েছেন যে, উপরোক্তভাবে সাধন করার পর তুমি অবশ্যই সচ্চিদানন্দঘন, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বররূপ আমাকে অবশ্যই লাভ করবে, এতে কোনোই সংশয় নেই। ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া কী, এ বিষয়ও নবম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকের ব্যাখ্যাতে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—আমি তোমার কাছে সত্য করে প্রতিজ্ঞা করছি, এর অর্থ কী ?

উত্তর—অর্জুন ভগবানের প্রিয় ভক্ত এবং সখা ছিলেন ; তাই তাঁর প্রতি প্রেমবশতঃ ও দয়াপূর্বক, তাঁর বিশ্বাস দৃঢ় করাবার জন্য এবং অর্জুনকে নিমিত্ত করে অন্য অধিকারী মানুষদেরও বিশ্বাস দৃঢ় করাবার জন্য ভগবান উপরোক্ত কথাগুলি বলেছেন। অভিপ্রায় হল যে, উপরোক্তভাবে সাধনাকারী ভক্ত আমাকে লাভ করেন, সুতরাং এই কথায় দৃঢ় বিশ্বাস করে মানুষকে এরূপ হওয়ার জন্যে দৃঢ়ভাবে চেষ্টা করা উচিত।

প্রশ্ন—তুমি আমার প্রিয়, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথায় প্রেমময় ভগবান উপরোক্ত প্রতিজ্ঞা করার কারণ জানিয়েছেন। অভিপ্রায় হল যে, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, তোমার প্রতি আমার যে প্রেম, সেই প্রেমবশতঃ বাধ্য হয়ে তোমার বিশ্বাস দৃঢ় করাবার জন্য আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি, নচেৎ এরূপ প্রতিজ্ঞা করার আমার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই[১]।

প্রশ্ন—এই শ্লোকে ভগবান যে চারটি সাধনার কথা

---

[১]যে মহাত্মা অর্জুনের জন্য ভগবান স্বয়ং তাঁর শ্রীমুখে গীতার দিব্য উপদেশ প্রদান করেছেন, তাঁর মহিমা কে বর্ণনা করতে পারে ? মহাভারতের উদ্যোগপর্বে বলা হয়েছে—

এষ নারায়ণঃ কৃষ্ণঃ ফাল্গুনশ্চ নরঃ স্মৃতঃ। নারায়ণো নরশ্চৈব সত্ত্বমেকং দ্বিধা কৃতম্‌।। (৪৯।২০)

'এই শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ নারায়ণ এবং অর্জুনকে নর বলা হয় ; এই নারায়ণ ও নর দুই রূপে প্রকটিত একই সত্তা।'

এখানে সংক্ষেপে বলা হচ্ছে যে, অর্জুনের প্রতি ভগবানের কত প্রেম ছিল। এর থেকে জানা যাবে যে অর্জুন ভগবানকে কতটা ভালোবাসতেন।

বনবিহার, জলবিহার, রাজদরবার, যজ্ঞানুষ্ঠান ইত্যাদিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রায়শঃ অর্জুনের সঙ্গে থাকতেন। তাঁদের পরস্পরের মধ্যে এতো মিল ছিল যে, অন্তঃপুর পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে পবিত্র ও বিশুদ্ধ প্রেমের নিদর্শন দৃশ্য দেখা যেত। সঞ্জয় পাণ্ডবদের ওখান থেকে ফিরে ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন—'শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রেম আমি প্রত্যক্ষ করেছি। আমি ওঁদের

বলেছেন, ঐ চারটি সাধনা করলেই ঈশ্বর লাভ হয়, নাকি তার মধ্যে এক একটি করলেও হয় ?

উত্তর—যিনি চারটি সাধনা পূর্ণরূপে করে থাকেন, তিনি যে ভগবানকে লাভ করবেন — এতে বলার কিছু নেই ; কিন্তু এর মধ্যে এক একটি সাধনার দ্বারাও ঈশ্বর লাভ হতে পারে। কারণ ভগবান নিজেই অষ্টম অধ্যায়ের চতুর্দশতম শ্লোকে কেবলমাত্র অনন্য চিন্তন দ্বারা তাঁর প্রাপ্তি সুলভ বলে জানিয়েছেন ; সপ্তম অধ্যায়ের তেইশতম এবং নবম অধ্যায়ের পঁচিশতম শ্লোকে তাঁর ভক্তরা তাঁকে লাভ করেন বলেছেন এবং নবম অধ্যায়ের ছাব্বিশতম থেকে আঠাশতম এবং এই অধ্যায়ের ছেচল্লিশতম শ্লোকে কেবল পূজার দ্বারা তাঁর প্রাপ্তির কথা জানিয়েছেন। একথা অবশ্য ঠিক যে উপরোক্ত এক একটি সাধন প্রধানভাবে যাঁরা করেন তাঁদের মধ্যে তো অন্য সব বিষয় আনুষঙ্গিকরূপে থাকেই এবং শ্রদ্ধা-ভক্তির ভাব তো সকলের মধ্যেই থাকে।

দুজনের সঙ্গে কথা বলার জন্য অত্যন্ত বিনীতভাবে ওঁদের অন্তঃপুরে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম সেই দুই মহাত্মা উত্তম বস্ত্রাভূষণ পরিধান করে মহামূল্যবান আসনে বিরাজমান। অর্জুনের কোলের ওপর শ্রীকৃষ্ণের চরণ এবং দ্রৌপদী ও সত্যভামার কোলে অর্জুনের দুটি পা। আমাকে দেখে অর্জুন সোনার পিঁড়ি এগিয়ে দিয়ে আমাকে বসতে বললেন, আমি বিনয়ের সঙ্গে তাঁকে স্পর্শ করে নীচেই বসে পড়লাম।'

বনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, সেখানে কথাবার্তার মধ্যে তিনি অর্জুনকে বললেন—

মমৈব ত্বং তবৈবাহং যে মদীয়াস্তবৈব তে। যস্ত্বাং দ্বেষ্টি স মাং দ্বেষ্টি যস্ত্বামনু স মামনু॥ (মহাভারত, বনপর্ব ১২।৪৫)

'হে অর্জুন, তুমি আমার আর আমি তোমার। আমার যা আছে, তা তোমারই অর্থাৎ আমার কাছে যা আছে, তার ওপর তোমার পূর্ণ অধিকার আছে। যে তোমার সঙ্গে শত্রুতা করবে, সে আমারও শত্রু আর যে তোমার অনুবর্তী (সাথী), সে আমারও সাথী।'

পাণ্ডবসেনাদের সংহার কর্মে ভীষ্মের যখন নয় দিন পার হয়ে গেল, তখন যুধিষ্ঠির একদিন রাত্রিকালে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে ভগবানকে বললেন—'হে শ্রীকৃষ্ণ ! ভীষ্মের সঙ্গে এমন যুদ্ধ হচ্ছে যেন জ্বলন্ত আগুনের জ্যোতিতে পতঙ্গের গিয়ে পড়া। আপনি বলুন এবার কী করা যায়।' ভগবান তখন যুধিষ্ঠিরকে আশ্বস্ত করে বললেন—'আপনি চিন্তা করবেন না, আপনি আদেশ করলে আমি ভীষ্মকে বধ করতে পারি। আপনি স্থিরভাবে জেনে রাখুন যে অর্জুন ভীষ্মকে বধ করবেন।' তারপর অর্জুনের সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক জানিয়ে ভগবান বলেছিলেন—

তব ভ্রাতা মম সখা সম্বন্ধী শিষ্য এব চ। মাংসান্যুৎকৃত্য দাস্যামি ফাল্গুনার্থে মহীপতে॥
এষ চাপি নরব্যাঘ্রো মৎকৃতে জীবিতং ত্যজেৎ। এষ নঃ সময়স্তাত তারয়েম পরস্পরম্॥

(মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ১০৭।৩৩-৩৪)

'হে রাজন্ ! আপনার ভাই অর্জুন আমার মিত্র, সম্বন্ধী এবং শিষ্য। অর্জুনের জন্য আমি আমার শরীর থেকে মাংস কেটেও দিতে পারি। পুরুষসিংহ অর্জুনও আমার জন্য প্রাণ দিতে পারে। হে তাত ! আমাদের দুই মিত্রের প্রতিজ্ঞা হল যে পরস্পর একে অপরকে সংকট থেকে উদ্ধার করব।'

এর দ্বারা বোঝা যায় যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনের সঙ্গে কীরূপ বিশেষ প্রেমের সম্বন্ধ ছিল। কর্ণের কাছে ইন্দ্রের কাছ থেকে পাওয়া এক অমোঘ শক্তি ছিল। ইন্দ্র বলেছিলেন যে, 'এই শক্তি তুমি যার ওপর প্রয়োগ করবে, তার অবশ্যই মৃত্যু হবে। কিন্তু এটি একবারই প্রয়োগ করা যাবে।' কর্ণ সেই শক্তি অর্জুনের জন্য সংরক্ষণ করেছিলেন। দুর্যোধনেরা বারংবার তাঁকে বলতেন—'তুমি শক্তিটি প্রয়োগ করে অর্জুনকে বধ করছ না কেন ?' কর্ণ অর্জুনকে মারতে চাইতেন, কিন্তু সামনে এলেই অর্জুনের রথের ওপর সারথিরূপে অবস্থিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্ণের ওপর এমন মোহিনী মায়া নিয়ে তাকাতেন যে কর্ণ শক্তি প্রয়োগ করতে ভুলে যেতেন। ভীমপুত্র ঘটোৎকচ যখন রাক্ষসী মায়ায় ভীষণভাবে কৌরবসেনাদের সংহার করছিলেন, তখন দুর্যোধনেরা সকলেই ভয় পেয়ে গেলেন। সকলেই কর্ণকে ডেকে বললেন—'ইন্দ্রের শক্তি প্রয়োগ করে আগে একে বধ করো, যাতে আমাদের প্রাণরক্ষা পায়। এই অর্ধেক রাতে এই রাক্ষস যদি আমাদের সকলকে বধ করে, তাহলে অর্জুনকে বধ করার জন্য সঞ্চিত শক্তি আমাদের কোন্ কাজে আসবে ?' অতএব কর্ণকে সেই শক্তি ঘটোৎকচের ওপর প্রয়োগ করতে হল এবং তার আঘাতে তৎক্ষণাৎ ঘটোৎকচের মৃত্যু হল। ঘটোৎকচের মৃত্যুতে সমস্ত পাণ্ডব-পরিবার অত্যন্ত দুঃখ পেলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ খুব খুশি হলেন এবং আনন্দে বারংবার অর্জুনকে জড়িয়ে ধরতে লাগলেন। পরে তিনি সাত্যকিকে বলেছিলেন—'হে সাত্যকে ! যুদ্ধের সময় আমিই কর্ণকে মোহগ্রস্ত করে

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ৬৬

সমস্ত ধর্ম অর্থাৎ সমস্ত কর্তব্যকর্ম আমাতে অর্পণ করে তুমি সর্বশক্তিমান, সর্বাধার পরমেশ্বররূপে একমাত্র আমার শরণ নাও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হতে মুক্ত করব, তুমি শোক কোরো না ॥ ৬৬

প্রশ্ন—'**সর্বধর্মান্**' এখানে কোন্ ধর্মগুলির বাচক এবং তা ত্যাগ করা কী ?

উত্তর—বর্ণ, আশ্রম, স্বভাব ও পরিস্থিতি অনুসারে যে ব্যক্তির জন্য যে কর্ম কর্তব্যরূপে নির্ধারিত হয়েছে ;

রেখেছিলাম, তাই এখনও পর্যন্ত সে অর্জুনের ওপর ঐ শক্তি প্রয়োগ করতে পারেনি। অর্জুনকে বধ করতে সক্ষম ঐ শক্তি যতদিন কর্ণের কাছে ছিল, ততদিন আমি অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম। চিন্তায় আমার রাতে ঘুম আসত না আর হৃদয়ে সুখ ছিল না। এখন সেই অমোঘ শক্তি ব্যর্থ জেনে অর্জুন কালের মুখ থেকে রক্ষা পেয়েছে বলে আমি মনে করি। দেখো আমার কাছে মাতা-পিতা, তোমরা, ভাই-বন্ধু, এমনকি আমার প্রাণও অর্জুনের থেকে বেশি প্রিয় নয়। আমি যেভাবে যুদ্ধে অর্জুনকে রক্ষা করা প্রয়োজন মনে করি, সেরকম কাউকে মনে করি না। ত্রিলোকের রাজ্যের থেকেও যদি কোনো দুর্লভ বস্তু থাকে তা-ও আমি অর্জুনের পরিবর্তে চাই না। এখন অর্জুনের যেন পুনর্জন্ম হওয়ায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত।'

ত্রৈলোক্যরাজ্যাদ্যৎ কিঞ্চিদ্ ভবেদন্যৎসুদুর্লভম্। নেচ্ছেয়ং সাত্বতাহং তদ্বিনা পার্থং ধনঞ্জয়ম্॥
অতঃ প্রহর্ষঃ সুমহান্ যুযুধানাদ্য মেঽভবৎ। মৃতং প্রত্যাগতমিব দৃষ্টা পার্থং ধনঞ্জয়ম্॥

(মহাভারত, দ্রোণপর্ব ১৮২।৪৪-৪৫)

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের মৈত্রী এতো প্রসিদ্ধ ছিল যে স্বয়ং দুর্যোধনও একবার একথা বলেছিলেন—

আত্মা হি কৃষ্ণঃ পার্থস্য কৃষ্ণস্যাত্মা ধনঞ্জয়ঃ॥
যদ্ ব্রূয়াদর্জুনঃ কৃষ্ণং সর্বং কুর্যাদসংশয়ম্।
কৃষ্ণো ধনঞ্জয়স্যার্থে স্বর্গলোকমপি ত্যজেৎ॥
তথৈব পার্থঃ কৃষ্ণার্থে প্রাণানপি পরিত্যজেৎ।

(মহাভারত, সভাপর্ব ৫২।৩১-৩৩)

'শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের আত্মা এবং অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে যদি কিছু করতে বলেন, শ্রীকৃষ্ণ সেসব করতে পারেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের জন্য দিব্যলোকও ত্যাগ করতে পারেন এবং সেইরূপ অর্জুনও শ্রীকৃষ্ণের জন্য প্রাণত্যাগ করতে পারেন।'

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের আদর্শ প্রীতির আরও অনেক উদাহরণ আছে। তার জন্য মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতের সেই সকল স্থানে অবলোকন করা উচিত।

অর্জুনের এই বিলক্ষণ প্রেমের প্রভাবেই ভগবানকে গুহ্যাদ্‌গুহ্যতর জ্ঞানের থেকেও অত্যন্ত গুহ্য সর্বগুহ্যতম তাঁর পুরুষোত্তম স্বরূপের রহস্য অর্জুনকে বলতে হয়েছিল এবং এই প্রেমের প্রতাপেই পরমধামেও অর্জুন ভগবানের অত্যন্ত দুর্লভ সেবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, যার জন্য বড় বড় ব্রহ্মবাদী মহাপুরুষও আকাঙ্ক্ষা করে থাকেন। স্বর্গারোহণের পর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির দিব্য দেহ ধারণ করে পরমধামে গিয়ে দেখলেন—

দদর্শ তত্র গোবিন্দং ব্রাহ্মেণ বপুষান্বিতম্॥
দীপ্যমানং স্ববপুষা দিব্যৈরস্ত্রৈরুপস্থিতম্।
চক্রপ্রভৃতিভির্ঘোরৈর্দিব্যৈঃ পুরুষবিগ্রহৈঃ॥
উপাস্যমানং বীরেণ ফাল্গুনেন সুবর্চসা॥

(মহাভারত, স্বর্গারোহণ ৪।২—৪)

'ভগবান গোবিন্দ সেখানে নিজ ব্রাহ্মশরীরে যুক্ত, দেদীপ্যমান তাঁর শরীর। তাঁর নিকটে চক্র ইত্যাদি দিব্য অস্ত্র এবং অন্যান্য ভয়ানক অস্ত্র দিব্য পুরুষ-শরীর ধারণ করে তাঁর সেবা করছে ! মহা তেজস্বী বীর অর্জুনও ভগবানের সেবা করছেন।' গীতাতত্ত্বকে ভালোভাবে শুনলে, বুঝলে এবং ধারণ করলে এই 'পরম-ফল' লাভ হয়। এবং অর্জুনের ন্যায় ইন্দ্রিয়সংযমী, মহাত্যাগী, বিচক্ষণ জ্ঞানী—বিশেষ করে ভগবানের পরম প্রিয় সখা, সেবক ও শিষ্যের এই পরম ফল লাভ করা সর্বতোভাবে যথাযথ।

দ্বাদশ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে **'সর্বাণি'** বিশেষণের সঙ্গে **'কর্মাণি'** পদ দ্বারা এবং এই অধ্যায়ের সাতান্নতম শ্লোকে **'সর্বকর্মাণি'** পদ দ্বারা যার বর্ণনা করা হয়েছে—সেই শাস্ত্রবিহিত সমস্ত কর্মের বাচক হল **'সর্বধর্মান্'** পদটি। ঐ সমস্ত কর্ম—যা ঐ দুটি শ্লোকের ব্যাখ্যার বর্ণনা অনুসারে ভগবানকে সমর্পিত করা হয়, তাই হল সেগুলির ত্যাগ। কারণ ভগবান এই অধ্যায়ে ত্যাগের স্বরূপ বলার সময় সপ্তম শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে নির্দিষ্ট কর্ম স্বরূপতঃ (বাহ্যভাবে) ত্যাগ করা উচিত নয় ; তাই সেগুলিকে মোহপূর্বক ত্যাগ করাকে বলে তামস ত্যাগ। সুতরাং এখানে **'পরিত্যজ্য'** পদে সমস্ত কর্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ করাকে মানা যায় না।

এতদ্ব্যতীত ভগবান অর্জুনকে ক্ষাত্রধর্মরূপ যুদ্ধ পরিত্যাগ না করার জন্য এবং সমস্ত কর্ম ভগবানে অর্পণ করে যুদ্ধ করার জন্য স্থানে স্থানে নির্দেশ দিয়েছেন (৩।৩০ ; ৮।৭ ; ১১।৩৪) এবং সমগ্র গীতা ভালোভাবে শোনার পর এই অধ্যায়ের তিয়াত্তরতম শ্লোকে অর্জুন নিজে ভগবানের কাছে কথা দিয়েছেন যে **'করিষ্যে বচনং তব'** (আপনার আদেশ পালন করব) তারপর স্বধর্মরূপ যুদ্ধই করেছেন। তাই এখানে সমস্ত কর্ম ভগবানে সমর্পণ করা অর্থাৎ সবই ভগবানের মনে করে মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরে এবং এগুলির দ্বারা করা কর্মে ও তার ফলরূপ সমস্ত ভোগে মমতা, আসক্তি, অভিমান ও কামনা সর্বতোভাবে ত্যাগ করা এবং কেবল ভগবানের জন্যই ভগবানের নির্দেশ ও প্রেরণা অনুসারে, তিনি যেমন করাবেন তেমনই পুতুলের মতো সেগুলি করতে থাকা—এই হল এখানে সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করা, সেগুলি স্বরূপতঃ ত্যাগ করা নয়।

প্রশ্ন—এইভাবে সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করে তারপর শুধু একমাত্র পরমেশ্বরের শরণাগত হওয়া কাকে বলে ?

উত্তর—উপরোক্ত প্রকারে সমস্ত কর্ম ভগবানে সমর্পণ করে দ্বাদশ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে, নবম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ও এই অধ্যায়ের সাতান্নতম শ্লোকে কথিত প্রকারে ভগবানকেই নিজের পরম প্রাপ্য, পরম গতি, পরমাধার, পরম প্রিয়, পরম হিতৈষী, পরম সুহৃদ, পরমাত্মীয় ও ভর্তা, স্বামী, সংরক্ষক মনে করে, উঠতে-বসতে, খেতে-শুতে, চলা-ফেরায় এবং প্রত্যেক কর্মে তাঁর নির্দেশ পালন করে শ্রদ্ধাপূর্বক অনন্যপ্রেমে নিত্য-নিরন্তর তাঁর চিন্তা করতে থাকা, তাঁর বিধানে সর্বদা সন্তুষ্ট থাকা এবং সর্বপ্রকারে ভক্ত প্রহ্লাদের ন্যায় কেবলমাত্র ভগবানের ওপরই নির্ভর করে পরমেশ্বরেরই শরণ গ্রহণ করা—এই হল সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র তাঁরই শরণ গ্রহণ করা।

প্রশ্ন—আমি তোমাকে সর্বপাপ থেকে মুক্ত করে দেব, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—শুভাশুভ কর্মের ফলরূপ যে কর্মবন্ধন—যাতে আবদ্ধ হয়ে মানুষ জন্ম-জন্মান্তরে নানা জন্মে আবর্তিত হয়, সেই কর্মবন্ধনের বাচক হল এখানে 'পাপ' এবং সেই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত করে দেওয়াই হল পাপ থেকে মুক্ত করা। তাই তৃতীয় অধ্যায়ের একত্রিশতম শ্লোকে **'কর্মভিঃ মুচ্যন্তে'** দ্বারা, দ্বাদশ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে **'মৃত্যুসংসার সাগরাৎ সমুদ্ধর্তা ভবামি'** দ্বারা এবং এই অধ্যায়ের আটান্নতম শ্লোকে **'মৎপ্রসাদাৎ সর্বদুর্গাণি তরিষ্যসি'** দ্বারা যে কথা বলা হয়েছে—সেই কথাই এখানে **'আমি তোমাকে সর্ব পাপ থেকে মুক্ত করে দেব'**—এই বাক্য দ্বারা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—**'মা শুচঃ'** অর্থাৎ তুমি শোক কোরো না, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথায় ভগবান অর্জুনকে আশ্বস্ত করে গীতার উপদেশের উপসংহার করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক থেকে **'অশোচ্যান্'** পদ দ্বারা যে উপদেশ আরম্ভ করেছিলেন, **'মা শুচঃ'** পদে তার উপসংহার করে দেখিয়েছেন যে, দ্বিতীয় অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে তো তুমি আমার শরণাগতি স্বীকার করেছ, অতএব এবার সম্পূর্ণভাবে আমার শরণাগত হও এবং তারপর তুমি কোনো চিন্তা কোরো না বরং চিরতরে শোক ত্যাগ করে সদা-সর্বদা পরমেশ্বররূপ আমাতে নির্ভর করো। এইরূপে শোকের সর্বতোভাবে বিনাশ এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বরলাভ-ই হল গীতা উপদেশের মুখ্য তাৎপর্য।

সম্বন্ধ—ভগবান এইভাবে গীতা উপদেশের উপসংহার করে এবার সেই উপদেশের অধ্যাপন ও অধ্যয়নাদির মাহাত্ম্য জানাবার জন্য প্রথমে অনধিকারীর লক্ষণ বলে তাদের গীতার উপদেশ শোনাবার নিষেধ করেছেন—

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যসূয়তি॥ ৬৭

তুমি এই গীতারূপ রহস্যময় উপদেশ কখনো তপস্যাহীন, ভক্তিহীন এবং শুনতে আগ্রহী নয় এমন ব্যক্তিদের বলবে না ; আর যারা আমার প্রতি দোষদৃষ্টি রাখে, তাদের তো কখনো বলবে না ॥ ৬৭

প্রশ্ন—'**ইদম্**' পদ এখানে কীসের বাচক এবং এটি তপস্যাহীন ব্যক্তিকে কোনো কালে বলা উচিত নয়, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক থেকে উপরোক্ত শ্লোক পর্যন্ত অর্জুনকে নিজ গুণ, প্রভাব, রহস্য ও স্বরূপের তত্ত্ব বোঝাবার জন্য ভগবান যে উপদেশ দিয়েছেন, সেই সব উপদেশের বাচক হল এই '**ইদম্**' পদটি। এর অধিকারী স্থির করার দৃষ্টিতে ভগবান চারটি দোষযুক্ত মানুষদের এই উপদেশ শোনাতে বারণ করেছেন। তার মধ্যে উপরোক্ত বাক্য দ্বারা তপস্যাহীন ব্যক্তিদের এটি শোনাতে বারণ করেছেন।

অভিপ্রায় হল যে, এই গীতাশাস্ত্র অত্যন্ত গোপন রাখার যোগ্য বিষয়, তবুও তুমি আমার অত্যন্ত প্রেমিক ভক্ত ও দৈবীসম্পদযুক্ত, তাই এর অধিকারী মনে করে তোমার হিতের জন্য তোমাকে এই উপদেশ দিয়েছি। সুতরাং যে ব্যক্তি স্বধর্মপালনরূপ তপস্যা করেন না, ভোগের আসক্তিবশতঃ জাগতিক বিষয়-সুখের লোভে নিজ ধর্ম ত্যাগ করে পাপকর্মে প্রবৃত্ত হন—এরূপ ব্যক্তিকে আমার গুণ, প্রভাব ও তত্ত্ববর্ণনায় পরিপূর্ণ এই গীতাশাস্ত্র শোনানো উচিত নয় ; কারণ তিনি এটি গ্রহণ করতে পারবেন না এবং সেইসঙ্গে আমার অসম্মানও করা হবে।

প্রশ্ন—ভক্তিহীন মানুষকেও কখনো বলা উচিত নয়, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভক্তিহীন ব্যক্তিকে উপরোক্ত উপদেশ শোনাতে বারণ করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, যার আমিরূপ পরমেশ্বরে বিশ্বাস, প্রেম ও পূজ্য-ভাব নেই, যে নিজেকেই সর্বেসর্বা বলে ভাবা নাস্তিক—এরূপ ব্যক্তিকেও এই অত্যন্ত গোপনীয় গীতাশাস্ত্র শোনানো উচিত নয়, কারণ তিনি এটি শুনে এর তাৎপর্য বুঝতে না পারায় এটি ধারণ করতে পারবেন না।

প্রশ্ন—'**অশুশ্রূষবে**' পদ কীসের বাচক, তাকে গীতার উপদেশ না শোনানোর জন্য বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যাঁর গীতাশাস্ত্র শোনার ইচ্ছা থাকে না, তাঁর বাচক হল এই '**অশুশ্রূষবে**' পদটি। তাঁকে শোনাতে বারণ করায় ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, যদি কোনো ব্যক্তি নিজ ধর্ম পালনরূপ তপস্যাও করেন কিন্তু গীতাশাস্ত্রে শ্রদ্ধা ও প্রেম না থাকায়, তিনি তা শুনতে না চান, তবে তাঁকেও এই পরম গোপনীয় শাস্ত্র শোনানো উচিত নয় ; কারণ এরূপ ব্যক্তি অনীহাবশতঃ শুনেও তা ধারণ করতে পারেন না, তাতে আমার উপদেশ এবং আমার অসম্মান করা হয়।

প্রশ্ন—যিনি আমাতে দোষদৃষ্টি রাখেন, তাঁকে তো বলাই উচিত নয়—এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে, জগতের উদ্ধার করার জন্য সগুণরূপে প্রকটিত আমি রূপ পরমেশ্বরে যাঁর দোষদৃষ্টি থাকে, যিনি আমার গুণে দোষারোপ করে আমার নিন্দা করেন, এরূপ ব্যক্তিকে তো কোনোভাবেই এই উপদেশ শোনানো উচিত নয় ; কারণ তিনি আমার গুণ, প্রভাব ও ঐশ্বর্য সহ্য করতে না পারায় এই উপদেশ শুনে আগের থেকেও বেশি করে আমার অবজ্ঞা করবেন এবং তার দ্বারা অধিক পাপের ভাগী হবেন।

প্রশ্ন— উপরোক্ত চারটি দোষ যাঁর মধ্যে থাকে, তাঁকে এই উপদেশ বলা উচিত নয়, নাকি চারটির মধ্যে যাঁর একটি, দুটি বা তিনটি দোষ থাকে — তাকেও শোনানো উচিত নয় ?

উত্তর—চারটির মধ্যে একটি দোষও যাঁর নেই, তিনিই এই উপদেশের পূর্ণ অধিকারী ; তাছাড়া যাঁর মধ্যে সর্বধর্মপালনরূপ তপস্যার অভাব থাকে, এছাড়া অন্য তিনটি দোষ থাকে না, তিনি অধিকারী এবং যিনি তপস্বীও নন, ভগবানের পূর্ণ ভক্তও নন কিন্তু গীতা শুনতে আগ্রহী, তিনি কিছুটা অংশে অধিকারী। কিন্তু যিনি ভগবানে দোষদৃষ্টি রাখেন—তাঁর নিন্দা করেন, তিনি সর্বতোভাবে অনধিকারী ; তাঁকে কখনো বলা উচিত নয়।

সম্বন্ধ—এইভাবে গীতোক্ত উপদেশের অনধিকারীদের লক্ষণ জানিয়ে এবার ভগবান দুটি শ্লোকে নিজের ভক্তদের মধ্যে উপদেশের বর্ণনার ফল ও মাহাত্ম্য জানাচ্ছেন—

য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ॥ ৬৮

যিনি আমার প্রতি পরম ভক্তিপূর্বক এই পরম গুহ্য গীতাশাস্ত্র আমার ভক্তদের নিকট বলবেন, তিনি আমাকেই লাভ করবেন—এতে কোনো সন্দেহ নেই ॥ ৬৮

প্রশ্ন—**'ইমম্'** পদ কীসের বাচক এবং এর সঙ্গে **'পরমম্'** এবং **'গুহ্যম্'**—এই দুটি বিশেষণ প্রয়োগ করার অর্থ কী ?

উত্তর—**'ইমম্'** পদটি এখানে গীতার সমস্ত উপদেশের বাচক। এর সঙ্গে **'পরমম্'** ও **'গুহ্যম্'** বিশেষণ প্রয়োগে ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, এই উপদেশ মানুষকে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত করে সাক্ষাৎ আমাকে (পরমেশ্বরকে) লাভ করায়। ফলে এটি অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ ও গোপনীয় রাখার উপযুক্ত।

প্রশ্ন—**'মদ্ভক্তেষু'** পদ কীসের বাচক, এর প্রয়োগ করে এখানে কী বলা হয়েছে ?

উত্তর—যাঁর ভগবানে শ্রদ্ধা থাকে, যিনি ভগবানকে সমস্ত জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও পালনকারী, সর্বশক্তিমান, সর্বেশ্বর জেনে তাঁকে প্রেম করেন, যাঁর চিত্তে ভগবানের গুণ, প্রভাব, লীলা ও তত্ত্বকথা শোনার আগ্রহ থাকে এবং শুনে প্রসন্নতা লাভ হয়—তাঁর বাচক হল এই **'মদ্ভক্তেষু'** পদটি। এটি প্রয়োগ করে এখানে গীতার অধিকারীদের নির্ণয় করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, যে আমার ভক্ত হয়, তার মধ্যে পূর্বশ্লোকে বর্ণিত চারটি দোষ আপনিই নাশ হয়ে যায়। সুতরাং যে আমার ভক্ত, সে-ই এর অধিকারী এবং সব মানুষই—তা সে যে কোনো বর্ণ বা জাতির হোক না কেন—আমার ভক্ত হতে পারে (৯।৩২) ; অতএব বর্ণ ও জাতি ইত্যাদির জন্য কেউই এর অনধিকারী নয়।

প্রশ্ন—ভগবানে পরম প্রেম পোষণ করে ভগবানের ভক্তদের মধ্যে এই উপদেশ বলা কীরূপ ?

উত্তর—স্বয়ং ভগবানে বা তাঁর বাক্যে অত্যন্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে এবং ভগবানের নাম, গুণ, লীলা, প্রভাব ও স্বরূপের স্মৃতিতে তাঁর প্রেমে বিহ্বল হয়ে কেবল ভগবানেরই প্রসন্নতার জন্য নিষ্কামভাবে উপরোক্ত ভগবদ্ভক্তদের মধ্যে এই গীতাশাস্ত্র বর্ণনা করা অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তদের এর মূল শ্লোক অধ্যয়ন করানো, তার ব্যাখ্যা করে অর্থ বোঝানো, শুদ্ধভাবে পাঠ করানো, এর ভাবগুলিকে যথাযথভাবে প্রকট করা, শ্রোতাদের প্রশ্নের সমাধান করে গীতার উপদেশ তাঁদের হৃদয়ঙ্গম করানো এবং গীতার উপদেশানুযায়ী চলার জন্য তাঁদের মনে দৃঢ় সংকল্প উৎপন্ন করানো ইত্যাদি হল ভগবানে পরম প্রেম পোষণ করে ভগবানের ভক্তদের মধ্যে গীতার উপদেশ বলার অন্তর্গত।

প্রশ্ন—তাঁরা আমাকেই প্রাপ্ত হন—এতে কোনো সন্দেহ নেই, এই বাক্যটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান দেখিয়েছেন যে, এইভাবে যেসব ভক্ত কেবল আমার ভক্তি লাভের উদ্দেশেই নিষ্কামভাবে আমার ভাবসমূহ অধিকারী ব্যক্তিদের মধ্যে প্রচার করেন, তাঁরা আমাকেই লাভ করেন—এতে কোনোই সন্দেহ নেই—অর্থাৎ আমাকে লাভ করার এটি ঐকান্তিক উপায়, তাই আমাকে পেতে আগ্রহী ভক্তদের এই গীতাশাস্ত্রের কথন ও প্রচার কার্য অবশ্যই করা উচিত।

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি॥ ৬৯

মানুষের মধ্যে তাঁর থেকে প্রিয় কর্ম সম্পাদনকারী আমার আর কেউ নেই এবং পৃথিবীতে তাঁর থেকে আমার প্রিয় ভবিষ্যতে কেউ হবে না ॥ ৬৯

প্রশ্ন—'**তস্মাৎ**' পদটি এখানে কীসের বাচক এবং মানুষের মধ্যে তাঁর থেকে বেশি প্রিয় কর্ম সম্পাদনকারী আমার আর কেউ নেই, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—'**তস্মাৎ**' পদটি হল এখানে পূর্ব শ্লোকে বর্ণিত, ভগবদ্‌ভক্তদের মধ্যে এই গীতাশাস্ত্রের ব্যাখ্যাকারী, গীতাশাস্ত্রের মর্মজ্ঞ, শ্রদ্ধাযুক্ত, প্রেমিক ভগবদ্‌ভক্তের বাচক। তাঁর থেকে বেশি প্রিয় আমার আর কেউ নেই। এই বাক্য দ্বারা ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে, যজ্ঞ, দান, তপস্যা, সেবা, পূজা, জপ, ধ্যান ইত্যাদি আমার যত প্রিয় কাজ—'তার থেকেও সবথেকে বেশি প্রিয় কাজ হল আমার ভাবসমূহ আমার ভক্তদের মধ্যে প্রচার করা।' এই কাজের মতো জগতে আর কোনো কাজ আমার এতো প্রিয় নয়। কারণ তিনি নিজ স্বার্থ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে শুধু আমারই প্রিয় কার্য করেন, তাই তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয়।

প্রশ্ন—সারা পৃথিবীতে তাঁর থেকে বেশি প্রিয় আমার কাছে ভবিষ্যতে আর কেউ হবে না, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান এই কথা ঘোষণা করেছেন যে, কেবল এই সময়ই তাঁর থেকে বেশি প্রিয় আমার কেউ নেই, তা নয় ; কিন্তু তাঁর থেকে বেশি প্রিয় কেউ ভবিষ্যতেও হতে পারে, তা-ও সম্ভব নয়। কারণ যখন সেই কাজ থেকে অন্য কোনো প্রিয় কাজ আমার নেই, তখন অন্য কোন্ সাধনার দ্বারা কোন্ ব্যক্তি তার থেকে আমার প্রিয়তর হবেন ? তাই আমাকে পাওয়ার যেসব সাধন আছে, সেসবের মধ্যে ভক্তিপূর্বক আমার 'ভক্তদের মধ্যে আমার ভাব বিস্তাররূপ' এই সাধন সর্বোত্তম—এই মনে করে আমার ভক্তদের এই কাজে সংলগ্ন থাকা উচিত।

সম্বন্ধ—ভগবান এইভাবে উপরোক্ত দুটি শ্লোকে শ্রদ্ধা-ভক্তিপূর্বক ভগবদ্‌ভক্তদের মধ্যে গীতাশাস্ত্রের প্রচার করার ফল ও মাহাত্ম্য জানিয়েছেন ; কিন্তু সকলেই এই কাজ করতে সক্ষম নয় ; এর অধিকারীও অত্যন্ত বিরল হয়। তাই এবার গীতাশাস্ত্র অধ্যয়ন করার মাহাত্ম্য জানাচ্ছেন—

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ।। ৭০

যে ব্যক্তি আমাদের উভয়ের এই ধর্মময় সংবাদরূপ গীতাশাস্ত্র পাঠ করবেন, তাঁর সেই জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা আমি পূজিত হব, এই আমার মত ।। ৭০

প্রশ্ন—'**আবয়োঃ সংবাদম্**'—কথাটির সঙ্গে '**ইমম্**' পদ কীসের বাচক এবং তার সঙ্গে '**ধর্ম্যম্**' বিশেষণ প্রয়োগ করার অর্থ কী ?

উত্তর—অর্জুন ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্নোত্তর রূপে যে এই গীতাশাস্ত্র, যাকে আটষট্টিতম শ্লোকে 'পরম গুহ্যতম' বলা হয়েছে—তারই বাচক হল '**আবয়োঃ সংবাদম্**' এর সঙ্গে '**ইমম্**' পদটি। এর সঙ্গে '**ধর্ম্যম্**' বিশেষণ দিয়ে ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, এ সাক্ষাৎ আমার (পরমেশ্বর) কথিত শাস্ত্র, তাই এতে যা কিছু উপদেশ প্রদান করা হয়েছে, সে সবই ধর্মের দ্বারা গ্রথিত। কোনো বিষয়ই ধর্মবিরুদ্ধ বা বৃথা নয়। তাই এতে কথিত উপদেশ পালন করা মানুষের পরম কর্তব্য।

প্রশ্ন—গীতাশাস্ত্র অধ্যয়ন করা কী ?

উত্তর—গীতার মর্মজ্ঞ ও ভগবদ্‌ভক্ত দ্বারা এই গীতাশাস্ত্র পাঠ করা, এটি নিত্য পাঠ করা, এর অর্থ পাঠ করা, অর্থের ওপর বিচার করা এবং এর অর্থ সম্বন্ধে জ্ঞাত ভক্তদের কাছ থেকে এর অর্থ বোঝার চেষ্টা করা ইত্যাদি সব অভ্যাসই হল গীতাশাস্ত্র অধ্যয়নের অন্তর্গত।

শ্লোকের অর্থ না বুঝে গীতাপাঠ করা এবং তা নিত্য পাঠ করার থেকে তার অর্থও পড়া এবং অর্থজ্ঞানের সঙ্গে তার নিত্য পাঠ করা অধিক উত্তম। আবার এর অর্থ বুঝে পড়া বা পাঠ করার সময় প্রেমে বিহ্বল হওয়া তার থেকে উত্তম।

প্রশ্ন— তার দ্বারাও আমি জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা পূজিত হব, এই আমার মত—এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান গীতাশাস্ত্রের উপরোক্ত

প্রকারে অধ্যয়নের মাহাত্ম্য জানিয়েছেন। অভিপ্রায় হল যে, এই গীতাশাস্ত্র অধ্যয়ন করলে মানুষের আমার সগুণ-নির্গুণ ও সাকার-নিরাকার তত্ত্বের যথার্থ জ্ঞান হয়ে যায়। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার তত্ত্ব জানার জন্য এই গীতাশাস্ত্র অধ্যয়ন করবেন, আমি মনে করব যে তিনি জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারাই আমার পূজা করেন। এই জ্ঞানযজ্ঞরূপ সাধন অন্য দ্রব্যময় সাধনের থেকে অত্যন্ত উত্তম বলে মানা হয়েছে (৪।৩৩)। কারণ সকল সাধনার অন্তিম ফল ভগবানের তত্ত্ব যথাযথভাবে জেনে নেওয়া এবং সেই ফল এই জ্ঞানযজ্ঞের সাহায্যে অনায়াসে পাওয়া যায়, তাই কল্যাণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের তৎপরতার সঙ্গে গীতা অধ্যয়ন করা উচিত।

সম্বন্ধ—এইভাবে গীতাশাস্ত্র অধ্যয়নের মাহাত্ম্য জানিয়ে, এবার যাঁরা উপরোক্ত প্রকারে অধ্যয়ন করতে অসমর্থ—এরূপ ব্যক্তিদের জন্য গীতা শ্রবণের ফল বলেছেন—

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্॥ ৭১

যেসব ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে, দোষদৃষ্টিরহিত হয়ে এই গীতাশাস্ত্র শ্রবণ করেন, তিনিও পাপমুক্ত হয়ে উত্তমকর্মকারীদের শ্রেষ্ঠ লোক প্রাপ্ত হন ॥ ৭১

প্রশ্ন—এখানে **'নরঃ'** পদ প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—এখানে **'নরঃ'** পদ প্রয়োগের তাৎপর্য হল, যাঁর মধ্যে এই গীতাশাস্ত্র শ্রবণ করার শ্রদ্ধাপূর্বক রুচি নেই, তিনি মানুষ নামের যোগ্য নন, কারণ তাঁর মনুষ্যজন্ম লাভ করাই বৃথা। তাইজন্য তিনি মানুষরূপে পশুরই তুল্য।

প্রশ্ন—শ্রদ্ধাযুক্ত ও দোষদৃষ্টি রহিত হয়ে গীতাশাস্ত্র শ্রবণ করা কাকে বলে ?

উত্তর—ভগবানের অস্তিত্বে এবং তাঁর গুণ-প্রভাবে বিশ্বাস করে এবং এই গীতাশাস্ত্র সাক্ষাৎ ভগবানেরই বাণী, এতে যা কিছু বলা আছে, সেসবই যথার্থ—এরূপ দৃঢ় ধারণা করে এবং তার বক্তার ওপর বিশ্বাস করে প্রেম ও রুচি-সহ গীতার মূল শ্লোক পাঠ বা তার অর্থের ব্যাখ্যা শ্রবণ, একেই বলা হয় শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে গীতাশাস্ত্র শ্রবণ করা। এটি শ্রবণ করার সময় ভগবানের ওপর বা তাঁর বচনের ওপর কোনোপ্রকার দোষারোপ না করা ও গীতাশাস্ত্রের কোনোভাবে অবজ্ঞা না করা—এই হল দোষদৃষ্টি রহিত হয়ে তা শ্রবণ করা।

প্রশ্ন—**'শৃণুয়াৎ'**-এর সঙ্গে **'অপি'** পদ প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—**'শৃণুয়াৎ'**-এর সঙ্গে **'অপি'** পদ প্রয়োগের এই অভিপ্রায় যে, যিনি আটষট্টিতম শ্লোকের বর্ণনানুসারে গীতাশাস্ত্র অপরকে অধ্যয়ন করান এবং যিনি সত্তরতম শ্লোকের কথানুসারে নিজে অধ্যয়ন করেন, তাঁদের তো কথাই নেই, যাঁরা এটি শ্রদ্ধাপূর্বক কেবলমাত্র শ্রবণ করেন, তাঁরাও পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যান। তাই যাঁদের এটি অধ্যাপন বা অধ্যয়ন করার সুযোগ হয় না, তাঁদের এটি অবশ্যই শ্রবণ করা উচিত।

প্রশ্ন—শ্রবণকারীদের পাপ হতে মুক্ত হয়ে উত্তম কর্ম সম্পাদনকারী শ্রেষ্ঠ লোক প্রাপ্ত হওয়া কী এবং এখানে **'সঃ'**-এর সঙ্গে **'অপি'** পদ প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—জন্ম-জন্মান্তরে কৃত পশু-পক্ষী ইত্যাদি নীচ যোনি ও নরকের হেতুভূত পাপকর্ম, তার থেকে মুক্ত হয়ে ইন্দ্রলোক থেকে ভগবানের পরমধাম পর্যন্ত নিজ নিজ প্রেম ও শ্রদ্ধার অনুরূপ বিভিন্ন লোকে নিবাস করা—এই হল তাঁদের পাপকর্ম থেকে মুক্ত হয়ে পুণ্যকর্মকারীদের শ্রেষ্ঠলোক প্রাপ্ত হওয়া।

'সঃ'-এর সঙ্গে **'অপি'** পদ প্রয়োগ করে দেখানো হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এর অধ্যাপন ও অধ্যয়ন করতে না পেরে উপরোক্তভাবে শুধু শ্রবণ করবেন, তিনিও পাপের ফল থেকে মুক্ত হবেন—যার ফলে তাঁর পশু-পক্ষী ইত্যাদি জন্ম বা নরক প্রাপ্তি হবে না ; বরং তিনি উত্তম কর্মকারীদের শ্রেষ্ঠলোক লাভ করবেন।

সম্বন্ধ—এইভাবে গীতাশাস্ত্রের কথন, পঠন ও শ্রবণের মাহাত্ম্য জানিয়ে এবার ভগবান স্বয়ং সব কিছু জেনেও অর্জুনকে সচেতন করার জন্য তাঁর কাছে তাঁর স্থিতি সম্বন্ধে জানতে চাইছেন—

কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয়॥ ৭২

হে পার্থ ! তুমি কি এই গীতাশাস্ত্র একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করেছ ? হে ধনঞ্জয় ! তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ কি নষ্ট হয়েছে ? ৭২

প্রশ্ন—'এতৎ' পদ এখানে কীসের বাচক ? 'তুমি কি এটি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করেছ ?' এই প্রশ্নের অর্থ কী ?

উত্তর—দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক থেকে আরম্ভ করে এই অধ্যায়ের ছেষট্টিতম শ্লোক পর্যন্ত ভগবান যে দিব্য উপদেশ প্রদান করেছেন, সেই পরম গোপনীয় সমস্ত উপদেশের বাচক হল এই 'এতৎ' পদটি। সেই উপদেশের মহত্ত্ব প্রকট করার জন্যই ভগবান এখানে অর্জুনকে উপরোক্ত প্রশ্ন করেছেন। অভিপ্রায় হল যে, আমার এই উপদেশ অত্যন্ত দুর্লভ, আমি প্রত্যেক মানুষের কাছে 'আমিই সাক্ষাৎ পরমেশ্বর, তুমি আমার শরণ গ্রহণ কর', এইসব কথা বলতে পারব না, অতএব তুমি আমার উপদেশ ভালোভাবে মন দিয়ে শুনেছ তো ? কারণ তুমি যদি এতে মন না দিয়ে থাক, তাহলে নিঃসন্দেহে অত্যন্ত ভুল করেছ।

প্রশ্ন—তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ নষ্ট হয়েছে কি ? এই প্রশ্নের অর্থ কী ?

উত্তর—এই প্রশ্নের দ্বারা ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, যদি তুমি এই উপদেশ ভালোভাবে শুনে থাক, তাহলে তার ফল অবশ্যই হবে। তাই তুমি যে মোহগ্রস্ত হয়ে ধর্মের বিষয়ে নিজেকে মূঢ়চেতা বলেছিলে (২।৭) এবং নিজের স্বধর্ম পালন করাকে পাপ বলে মনে করছিলে (১।৩৬) তথা সমস্ত কর্তব্যকর্ম ত্যাগ করে ভিক্ষান্নে জীবন অতিবাহিত করাকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছিলে (২।৫) এবং যেজন্য তুমি স্বজনবধের ভয়ে ব্যাকুল হয়েছিলে (১।৪৫-৪৭) আর নিজ কর্তব্য স্থির করতে পারছিলে না (২।৬-৭)—তোমার সেই অজ্ঞানজনিত মোহ এখন নষ্ট হয়েছে কি না ? আমার উপদেশ যদি তুমি মন দিয়ে শুনে থাক তাহলে অবশ্যই তোমার মোহ দূর হওয়া উচিত। আর তা যদি না হয়ে থাকে, তবে বুঝতে হবে যে তুমি এই উপদেশ একাগ্র চিত্তে শোননি।

এখানে ভগবানের এই দুটি প্রশ্ন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এর দ্বারা বলা হয়েছে যে, মানুষের এই গীতাশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও শ্রবণ অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে একাগ্রচিত্তে তৎপর হয়ে করা উচিত। যতক্ষণ অজ্ঞানজনিত মোহ সর্বতোভাবে নাশ না হয়, ততক্ষণ বুঝতে হবে যে আমি ভগবানের উপদেশ ঠিকমতো বুঝতে পারিনি, সুতরাং পুনরায় তা শ্রদ্ধা ও বিবেকসহ মনন করা উচিত।

সম্বন্ধ—ভগবান অর্জুনকে এভাবে জিজ্ঞাসা করায়, অর্জুন এবার ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নিজ স্থিতির বর্ণনা করছেন—

অর্জুন উবাচ

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥ ৭৩

অর্জুন বললেন—হে অচ্যুত ! আপনার কৃপায় আমার মোহ দূর হয়েছে এবং আমি স্মৃতি ফিরে পেয়েছি। এখন আমি নিঃসংশয় হয়েছি, অতএব আমি আপনার আদেশ পালন করব ॥ ৭৩

প্রশ্ন—এখানে 'অচ্যুত' সম্বোধন করার অর্থ কী ?

উত্তর—ভগবানকে 'অচ্যুত' নামে সম্বোধন করে অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে, আপনি সাক্ষাৎ নির্বিকার, পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, সর্বশক্তিমান, অবিনাশী পরমেশ্বর

—এই কথা আমি সঠিকভাবে জেনে গিয়েছি।

প্রশ্ন—'আপনার কৃপায় আমার মোহ নাশ হয়েছে' এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—অর্জুন এর দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ভগবানের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। অর্জুনের বলার অভিপ্রায় হল যে, আপনি এই দিব্য উপদেশ প্রদান করে আমাকে অত্যন্ত দয়া করেছেন, আপনার উপদেশ শুনে আমার অজ্ঞানজনিত মোহ সর্বতোভাবে নাশ হয়েছে, অর্থাৎ আপনার গুণ, প্রভাব, ঐশ্বর্য ও স্বরূপকে সঠিকভাবে না জানায় যে মোহ দ্বারা ব্যাপ্ত হয়ে আমি আপনার আদেশ পালন করতে প্রস্তুত ছিলাম না (২।৯) এবং আত্মীয়-বন্ধু বিনাশের ভয়ে শোকে ব্যাকুল হয়েছিলাম (১।২৮-৪৭) সেই সব মোহ এখন সর্বতোভাবে নষ্ট হয়ে গেছে।

প্রশ্ন—'আমি স্মৃতি লাভ করেছি'—এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথায় অর্জুনের অভিপ্রায় হল, আমার অজ্ঞানজনিত মোহ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আমার অন্তঃকরণে দিব্যজ্ঞান প্রকাশিত হয়েছে ; তাতে আমি আপনার গুণ, প্রভাব, ঐশ্বর্য ও স্বরূপের পূর্ণস্মৃতি লাভ করেছি এবং আপনার সমগ্র রূপ আমি প্রত্যক্ষ করেছি—আমার কাছে আর কিছুই অজ্ঞাত নেই।

প্রশ্ন—'আমি সংশয়রহিত হয়ে অবস্থান করছি' এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে, এখন আপনার গুণ, প্রভাব, ঐশ্বর্য ও সগুণ-নির্গুণ, সাকার-নিরাকার স্বরূপের বিষয়ে এবং ধর্ম-অধর্ম ও কর্তব্য-অকর্তব্য ইত্যাদির বিষয়ে আমার আর কোনো সংশয় নেই। আমার সব সংশয় দূর হয়েছে এবং সংশয় নাশ হওয়ায় আমার অন্তঃকরণের সমস্ত চাঞ্চল্যের অবসান হয়েছে।

প্রশ্ন—'আমি আপনার আদেশ পালন করব'—এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথায় অর্জুনের অভিপ্রায় হল, 'আপনার দয়াতে আমি কৃতকৃত্য হয়েছি। আমার আর কোনো কর্তব্য বাকি নেই। সুতরাং আপনার কথা অনুযায়ী লোকসংগ্রহের জন্য যুদ্ধাদি সমস্ত কর্ম, আপনি যেমন করাবেন, নিমিত্তমাত্র হয়ে লীলারূপে আমি তেমনই করব।'

সম্বন্ধ—এইভাবে ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন অনুসারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সংবাদরূপ গীতাশাস্ত্রের বর্ণনা করে এবার তার উপসংহার করে সঞ্জয় দুটি শ্লোকে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গীতার মহত্ত্ব প্রকটিত করছেন—

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্॥ ৭৪

সঞ্জয় বললেন—এইভাবে আমি ভগবান শ্রীবাসুদেব ও অর্জুনের এই অদ্ভুত রহস্যময় ও রোমাঞ্চকর কথোপকথন শুনেছি ॥ ৭৪

প্রশ্ন—'**ইতি**' পদটির অর্থ কী ?

উত্তর—'**ইতি**' পদের দ্বারা এখানে গীতা উপদেশের সমাপ্তি দেখানো হয়েছে।

প্রশ্ন—ভগবানকে 'বাসুদেব' নাম প্রয়োগ করে এবং 'পার্থ'র সঙ্গে 'মহাত্মা' বিশেষণ দিয়ে কী বলা হয়েছে ?

উত্তর—সঞ্জয় এর দ্বারা গীতা মহত্ত্ব প্রকটিত করেছেন। অভিপ্রায় হল যে, সাক্ষাৎ নরঋষির অবতার মহাত্মা অর্জুনের জিজ্ঞাসায় সবার হৃদয়ে নিবাসকারী সর্বব্যাপী পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই উপদেশ প্রদান করেন, তাই এটি অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ। অন্য কোনো শাস্ত্র এর সমকক্ষ হতে পারে না, কারণ এটি সমস্ত শাস্ত্রের সার[১]।

[১]গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ। যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা॥ (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ৪৩।১)

'গীতাকেই সম্যক্‌ভাবে শ্রবণ, কীর্তন, পঠন-পাঠন, মনন ও ধারণ করা উচিত। অন্য শাস্ত্র অধ্যয়নের কী প্রয়োজন ? কারণ এটি স্বয়ং পদ্মনাভ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মুখমণ্ডল থেকে নিঃসৃত।'

প্রশ্ন—এখানে 'সংবাদম্' পদের সঙ্গে '**অদ্ভুতম্**' এবং '**রোমহর্ষণম্**' বিশেষণ প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—এই দুটি বিশেষণ প্রয়োগে সঞ্জয়ের অভিপ্রায় হল, মহাত্মা অর্জুনের জিজ্ঞাসায় সাক্ষাৎ পরমেশ্বর কথিত উপদেশ অত্যন্ত অদ্ভুত অর্থাৎ আশ্চর্যজনক ও অসাধারণ। এর দ্বারা মানুষের ভগবানের দিব্য অলৌকিক গুণ, প্রভাব ও ঐশ্বর্যসমন্বিত সমগ্ররূপের পূর্ণ জ্ঞান হয়ে যায় এবং মানুষ এটি যেমন-যেমন শোনেন ও বোঝেন, তেমন-তেমনই হর্ষ ও বিস্ময়াভিভূত হয়ে পুলকিত হয়ে ওঠেন, তাঁর শরীরে রোমাঞ্চ হতে থাকে।

প্রশ্ন—'**অশ্রৌষম্**' পদটির অর্থ কী ?

উত্তর—সঞ্জয় এর দ্বারা বলতে চেয়েছেন যে, এরূপ অদ্ভুত আশ্চর্যময় উপদেশ সে আমি শুনেছি, আমার পক্ষে এ অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়।

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানেতদ্ গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্॥ ৭৫

শ্রীবেদব্যাসের কৃপায় দিব্যদৃষ্টি লাভ করে আমি এই পরম গোপনীয় যোগের কথা স্বয়ং যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনকে বলছিলেন, আমি তখন সেটি প্রত্যক্ষভাবে শুনেছি ॥ ৭৫

প্রশ্ন—'**ব্যাসপ্রসাদাৎ**' পদটির অর্থ কী ?

উত্তর—সঞ্জয় এর দ্বারা ব্যাসদেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। অভিপ্রায় হল যে, ভগবান ব্যাসদেব কৃপা করে আমাকে যে দিব্যদৃষ্টি অর্থাৎ দূরদেশে ঘটা সমস্ত ঘটনা দেখা, শোনা ও বোঝার অদ্ভুত শক্তি প্রদান করেছেন—সেইজন্য আজ আমি ভগবানের এই দিব্য উপদেশ শুনতে পেয়েছি ; নাহলে এ সুযোগ আমি কী করে পেতাম ?

প্রশ্ন—'**এতৎ**' পদ এখানে কীসের বাচক এবং তার সঙ্গে '**পরম্**', '**গুহ্যম্**' এবং '**যোগম্**'—এই তিনটি বিশেষণ প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—'**এতৎ**' পদটি হল শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের কথোপকথনরূপ এই গীতাশাস্ত্রের বাচক। এর সঙ্গে '**পরম**' বিশেষণ প্রয়োগ করে বলা হয়েছে যে, এটি অত্যন্ত উত্তম। '**গুহ্যম্**' বিশেষণের তাৎপর্য হল এটি অত্যন্ত গোপনীয়। সুতরাং অনধিকারীর সামনে এর বর্ণনা করা উচিত নয়। এবং '**যোগম্**' বিশেষণের অর্থ হল, এটিতে ঈশ্বর লাভের উপায় স্বরূপ কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ও ভক্তিযোগ ইত্যাদি সাধনসমূহের ভালোভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এটি স্বয়ং অর্থাৎ শ্রদ্ধাপূর্বক গীতাপাঠ ও স্বতন্ত্র-ভাবে পরমাত্মাপ্রাপ্তির সাধন হওয়ায়, এটি নিজেও যোগরূপ-ই।

প্রশ্ন—উপরোক্ত বিশেষণাদিযুক্ত এই উপদেশ আমি স্বয়ং যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুনের প্রতি বলতে প্রত্যক্ষভাবে শুনেছি, এই বাক্যের অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছেন যে, এই গীতাশাস্ত্র—যা আমি আপনাকে শোনালাম—কারো কাছে শোনা কথা নয়, সমস্ত যোগশক্তির অধ্যক্ষ সর্বশক্তিমান স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই শ্রীমুখ থেকে, তিনি যখন অর্জুনকে এগুলি বলছিলেন—আমি প্রত্যক্ষভাবে শুনেছি।

সম্বন্ধ—এইভাবে অতিদুর্লভ গীতাশাস্ত্র শোনার মহত্ত্ব প্রকাশ করে সঞ্জয় এবার নিজ স্থিতির বর্ণনা করে সেই উপদেশের স্মৃতির গুরুত্ব প্রকট করছেন—

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ॥ ৭৬

হে রাজন্ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের এই রহস্যময়, কল্যাণকারী, অদ্ভুত কথোপকথন পুনঃ পুনঃ স্মরণ করে আমি বারংবার হর্ষোৎফুল্ল হচ্ছি ॥ ৭৬

প্রশ্ন—'পুণ্যম্' এবং **'অদ্ভুতম্'**—এই দুই বিশেষণের অর্থ কী ?

উত্তর—'পুণ্যম্' ও **'অদ্ভুতম্'**—এই দুটি বিশেষণ প্রয়োগ করে সঞ্জয় বলতে চেয়েছেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের দিব্য কথোপকথনরূপ এই গীতাশাস্ত্র তার অধ্যয়ন, অধ্যাপন, শ্রবণ, মনন ও বর্ণনা আদিতে নিযুক্ত ব্যক্তিকে পরম পবিত্র করে সর্বপ্রকারে তাঁর কল্যাণসাধন করে এবং এটি ভগবানের আশ্চর্যময় গুণ, প্রভাব, ঐশ্বর্য, তত্ত্ব-রহস্য ও স্বরূপ উন্মোচিত করে, সুতরাং এটি অত্যন্ত পবিত্র, দিব্য ও অলৌকিক।

প্রশ্ন—এটি বারংবার স্মরণ করে আমি পুনঃপুনঃ হর্ষান্বিত হচ্ছি—এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা সঞ্জয় তাঁর অবস্থার বর্ণনা করে গীতা উপদেশের স্মৃতির মহত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। অভিপ্রায় হল যে, ভগবান বর্ণিত এই উপদেশ আমার হৃদয়কে এতো আকর্ষণ করেছে যে এখন আমার কোনো কথাই ভালো লাগছে না, আমার মনে বারংবার সেই উপদেশের স্মৃতি জাগ্রত হচ্ছে এবং সেই ভাবের আবেশে আমি অসীম হর্ষ অনুভব করছি, প্রেম ও হর্ষে আমি বিহ্বল হয়ে যাচ্ছি।

সম্বন্ধ—সঞ্জয় এইভাবে গীতাশাস্ত্রের স্মৃতির মহত্ত্ব জানিয়ে এবার নিজের অবস্থার বর্ণনা করে ভগবানের বিরাটরূপের স্মৃতির মহত্ত্ব দেখিয়েছেন—

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ॥ ৭৭

হে রাজন্! শ্রীহরির সেই অত্যন্ত অদ্ভুত রূপও পুনঃ পুনঃ স্মরণ করে আমার চিত্তে মহাবিস্ময় হচ্ছে এবং আমি বারংবার হর্ষান্বিত হচ্ছি ॥ ৭৭

প্রশ্ন—ভগবানের 'হরি' নামের অর্থ কী ?

উত্তর—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণ, প্রভাব, লীলা, ঐশ্বর্য, মহিমা, নাম ও স্বরূপের শ্রবণ, মনন, কীর্তন, দর্শন ও স্পর্শ ইত্যাদি করলে মানুষের সমস্ত পাপ নাশ হয়ে যায় ; তাঁর সঙ্গে কোনোভাবে সম্বন্ধ স্থাপিত হলে তিনি মানুষের সমস্ত পাপ, অজ্ঞান এবং দুঃখ হরণ করেন এবং তিনি ভক্তদের মনহরণকারী। তাই তাঁকে 'হরি' বলা হয়।

প্রশ্ন—'তৎ' এবং **'অতি অদ্ভুতম্'** বিশেষণের সঙ্গে **'রূপম্'** পদ ভগবানের কোন্ রূপের বাচক ?

উত্তর—অতি আশ্চর্যময় দিব্য বিশ্বরূপ—ভগবান যা অর্জুনকে দর্শন করিয়েছিলেন এবং যার দর্শনের মহত্ত্ব ভগবান একাদশ অধ্যায়ের সাতচল্লিশ ও আটচল্লিশতম শ্লোকে নিজে জানিয়েছেন, সেই বিরাটস্বরূপের বাচক হল এখানে **'তৎ'** ও **'অতি অদ্ভুতম্'** বিশেষণের সঙ্গে **'রূপম্'** পদটি।

প্রশ্ন—সেই রূপ বারংবার স্মরণ করে আমি মহা আশ্চর্য হচ্ছি—কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—সঞ্জয়ের এই কথার তাৎপর্য হল, ভগবানের সেই রূপের স্মৃতি আমার চিত্ত থেকে অপসারিত হচ্ছে না, সেই রূপ আমি বারংবার স্মরণ করছি আর আশ্চর্য হয়ে ভাবছি যে, ভগবানের সেই অতিশয় দুর্লভ দিব্যরূপ আমি কী করে দর্শন করলাম ! আমার তো এমন কিছু পুণ্য ছিল না, যাতে এইরূপ আমি দর্শন করতে পারি। আহা ! ভগবানের অহৈতুকী দয়াই এর একমাত্র কারণ। সেই সঙ্গে সেই রূপের অত্যন্ত অদ্ভুত দৃশ্য ও ঘটনাবলী স্মরণ করে আমি অত্যন্ত বিস্ময়াভিভূত হচ্ছি যে, আহা ! ভগবানের কীরূপ বিচিত্র যোগশক্তি।

প্রশ্ন—আমি বারংবার হর্ষান্বিত হচ্ছি, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে, আমি যে শুধু আশ্চর্যান্বিত হয়েছি, তা নয়, তাঁকে বার বার স্মরণ করে আমি আনন্দে ও প্রেমে বিহ্বল হয়ে যাচ্ছি। আমার এই আনন্দের কোনো সীমা নেই !

সম্বন্ধ—এইভাবে নিজের অবস্থান বর্ণনা করে, গীতার উপদেশ এবং ভগবানের অদ্ভুত রূপের স্মৃতির মহত্ত্ব প্রকাশ করে, সঞ্জয় এবার ধৃতরাষ্ট্রকে পাণ্ডবদের বিজয়ের সম্ভাবনা নিশ্চিত জানিয়ে এই অধ্যায়ের উপসংহার করছেন—

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥ ৭৮

হে রাজন্! যেখানে যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং গাণ্ডীব ধনুর্ধারী অর্জুন, সেইখানেই শ্রী, বিজয়, বিভূতি ও অচল নীতি বিদ্যমান—এই হল আমার মত॥ ৭৮

প্রশ্ন—শ্রীকৃষ্ণকে যোগেশ্বর সম্বোধনে এবং অর্জুনকে ধনুর্ধর সম্বোধন করে এই শ্লোকে সঞ্জয় কী বলতে চেয়েছেন?

উত্তর—ধৃতরাষ্ট্রের মনে সন্ধির ইচ্ছা উৎপন্ন করার উদ্দেশ্যে এই শ্লোকে সঞ্জয় উপরোক্ত বিশেষণ দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এবং অর্জুনের প্রভাব জানিয়ে পাণ্ডবদের বিজয়ের নিশ্চিত সম্ভাবনার কথা জানাচ্ছেন। অভিপ্রায় হল যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত যোগশক্তির প্রভু; তিনি তাঁর যোগশক্তির দ্বারা মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত জগতের উৎপত্তি, পালন ও সংহার করতে সক্ষম। সেই সাক্ষাৎ নারায়ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহায়ক, তখন তাঁর বিজয়লাভে প্রশ্ন কীসের?

এতদ্ব্যতীত অর্জুনও নর ঋষির অবতার, ভগবানের প্রিয় সখা ও গাণ্ডীব ধনুর্ধারী মহাবীর পুরুষ। তিনিও তাঁর ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের জয় লাভের জন্য কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছেন। সুতরাং এখন যুধিষ্ঠিরের সমকক্ষ কে হতে পারেন? কারণ সূর্য যেখানে থাকেন, আলোও সেখানে থাকে—তেমনই যেখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন থাকেন, সেখানেই সমস্ত শোভা, সারা ঐশ্বর্য ও অটল ন্যায় (ধর্ম)—এসব তাঁদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে এবং যে পক্ষে ধর্ম থাকে, তাঁদেরই বিজয় হয়। তাই পাণ্ডবদের বিজয়ে কোনো প্রকারের সন্দেহ নেই। যদি এখনও আপনি নিজের কল্যাণ চান, তাহলে আপনার পুত্রদের বুঝিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করুন।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
মোক্ষসন্ন্যাসযোগো নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮॥

—○—

'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' আনন্দচিদ্ঘন, ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ, চরাচরবন্দিত, পরমপুরুষোত্তম, সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্যবাণী। এটি অনন্ত রহস্যপূর্ণ। পরম দয়াময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপা দ্বারাই আংশিকভাবে এর রহস্য বোঝা সম্ভব। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা ও প্রেমময় বিশুদ্ধ ভক্তিতে নিজ হৃদয় পূর্ণ করে ভগবদ্গীতার মনন করেন, তিনিই ভগবদ্কৃপা প্রত্যক্ষ অনুভব করে গীতা স্বরূপের কোনো অংশে প্রবেশ করতে সক্ষম হন। সুতরাং কল্যাণাকাঙ্ক্ষী নর-নারীর উচিত যে, তাঁরা ভক্তপ্রবর অর্জুনকে আদর্শ মনে করে নিজের মধ্যে অর্জুনের মতো দৈবীগুণ অর্জন করে শ্রদ্ধা-ভক্তিপূর্বক গীতা শ্রবণ, মনন ও অধ্যয়ন করবেন এবং ভগবানের আদেশানুসারে যথাযোগ্য তৎপরতার সঙ্গে সাধনে নিয়োজিত হবেন। যে ব্যক্তি এরূপ করেন, তাঁর অন্তঃকরণে নিত্য নব-নব পরমানন্দদায়ক অনুপম ও দিব্য ভাবের স্ফুরণ হতে থাকে এবং তিনি সর্বতোভাবে শুদ্ধান্তঃকরণ হয়ে ভগবানের অলৌকিক কৃপা-সুধার রসাস্বাদন করে শীঘ্রই ভগবানকে লাভ করেন।

—○—

গীতা-মাহাত্ম্য

শ্রীভগবানুবাচ

ন বন্ধোঽস্তি ন মোক্ষোঽস্তি ব্রহ্মৈবাস্তি নিরাময়ম্।
নৈকমস্তি ন চ দ্বিত্বং সচ্চিৎকারং বিজৃম্ভতে॥ ১
গীতাসারমিদং শাস্ত্রং সর্বশাস্ত্রসুনিশ্চিতম্।
যত্র স্থিতং ব্রহ্মজ্ঞানং বেদশাস্ত্রসুনিশ্চিতম্॥ ২
ইদং শাস্ত্রং ময়া প্রোক্তং গুহ্যবেদার্থদর্পনম্।
যঃ পঠেৎ প্রয়তো ভূত্বা স গচ্ছেদ্ বিষ্ণুশাশ্বতম্॥ ৩

শ্রীভগবান বললেন—বন্ধন নেই, মোক্ষ নেই, কেবল নিরাময় ব্রহ্মই সর্বত্র বিরাজমান।

অদ্বৈতে নেই, দ্বৈতেও নেই, কেবল সচ্চিদানন্দেই সকল স্থান পূর্ণ হয়ে আছে॥ ১ ॥

গীতার সারভূত এই শাস্ত্র হল সকল শাস্ত্রের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত।

বেদশাস্ত্রের দ্বারা ভালোভাবে নিরূপিত ব্রহ্মজ্ঞান এতে বিদ্যমান॥ ২ ॥

আমার দ্বারা কথিত এই গীতা-শাস্ত্র বেদের গূঢ় অর্থকে দর্পণের মতো প্রকাশ করে।

যে পবিত্র হয়ে ইন্দ্রিয় এবং মনকে বশীভূত করে এঁর পাঠ করে, সে সনাতন ভগবান বিষ্ণুস্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হয়॥ ৩ ॥

এতৎ পুণ্যং পাপহরং ধন্যং দুঃখপ্রণাশনম্।
পঠতাং শৃণ্বতাং বাপি বিষ্ণোর্মাহাত্ম্যমুত্তমম্॥ ৪
অষ্টাদশপুরাণানি নবব্যাকরণানি চ।
নির্মথ্য চতুরো বেদান্ মুনিনা ভারতং কৃতম্॥ ৫
ভারতোদধিনির্মথ্য গীতানির্মথিতস্য চ।
সারমুদ্ধৃত্য কৃষ্ণেন অর্জুনস্য মুখে হুতম্॥ ৬
মলনির্মোচনং পুংসাং গঙ্গাস্নানং দিনে দিনে।
সকৃদ্ গীতাম্ভসি স্নানং সংসারমলনাশনম্॥ ৭
গীতানামসহস্রেণ স্তবরাজো বিনির্মিতঃ।
যস্য কুক্ষৌ চ বর্তেত সোঽপি নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥ ৮

ভগবান বিষ্ণুর এই উত্তম মাহাত্ম্য গীতাশাস্ত্র পাঠ করলে এবং শ্রবণ করলে পুণ্য সঞ্চিত হয়, পাপ বিনষ্ট হয়, মানুষ ধন্য হয়ে যায় এবং তার সমস্ত দুঃখ বিদূরিত হয়॥ ৪ ॥ মহামুনি বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণ, নয় ব্যাকরণ এবং চার বেদ মন্থন করে মহাভারত রচনা করেন॥ ৫ ॥ আবার মহাভারতরূপী সমুদ্রকে মন্থন করায় গীতা প্রকটিত হল। সেই গীতাকেও মন্থন করে গীতাসার রূপ তার অর্থ নিষ্কাশণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মুখে তা আহুতিরূপে ঢেলে দিয়েছেন॥ ৬ ॥ গঙ্গায় প্রতিদিন স্নান করলে মানুষের ময়লা দূর হয়ে যায়। গীতারূপিণী গঙ্গার জলে একবার মাত্র স্নান করলেই সমগ্র সংসারের মল সম্পূর্ণ বিনাশ হয়ে যায়॥ ৭ ॥ গীতার সহস্র নামের দ্বারা যে স্তবরাজ বিরচিত হয়েছে, সেইটি যাঁর কুক্ষিতে (হৃদয়ে) বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ যিনি মনে মনে তাঁকে সর্বদা স্মরণ করেন, বলা হয় যে, তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণে পরিণত হয়ে যান॥ ৮ ॥

সর্ববেদময়ী গীতা সর্বধর্মময়ো মনুঃ।
সর্বতীর্থময়ী গঙ্গা সর্বদেবময়ো হরিঃ॥ ৯
পাদস্যাপ্যর্ধপাদং বা শ্লোকং শ্লোকার্ধমেব বা।
নিত্যং ধারয়তে যস্তু স মোক্ষমধিগচ্ছতি॥ ১০
কৃষ্ণবৃক্ষসমুদ্ভূতা গীতামৃতহরীতকী।
মানুষৈঃ কিং ন খাদ্যেত কলৌ মলবিরেচনী॥ ১১
গঙ্গা গীতা তথা ভিক্ষুঃ কপিলাশ্বত্থসেবনম্।
বাসরং পদ্মনাভস্য পাবনং কিং কলৌ যুগে॥ ১২
গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্ বিনিঃসৃতা॥ ১৩
আপদং নরকং ঘোরং গীতাধ্যায়ী ন পশ্যতি॥ ১৪

গীতা সম্পূর্ণ বেদময়ী, মনুস্মৃতি সর্বধর্মময়ী, গঙ্গা সর্বতীর্থময়ী এবং ভগবান বিষ্ণু হলেন সর্বদেবময়॥ ৯ ॥ যিনি গীতার পুরো একটি শ্লোক, অর্ধশ্লোক, একটি চরণ অথবা অর্ধচরণও প্রতিদিন পাঠপূর্বক ধারণ করেন, তিনি অন্তে মোক্ষপ্রাপ্ত হন॥ ১০॥ শ্রীকৃষ্ণরূপী বৃক্ষ হতে আবির্ভূত গীতারূপ অমৃতময়ী হরীতকী মানুষ কেন ভক্ষণ করে না, যা কলির সমস্ত মলকে দেহ হতে নিষ্কাশিত করে॥ ১১॥ কলিযুগে গঙ্গা, গীতা, সন্ন্যাসী, কপিলা গাভী, অশ্বত্থ-বৃক্ষসেবা এবং একাদশী তথা ভগবান বিষ্ণুর চিহ্নিত তিথি (একাদশী)— এদের চেয়ে বেশী পবিত্রকারী আর কি বস্তু আছে ? ॥ ১২॥ গীতাকেই সুষ্ঠুভাবে পাঠ করা কর্তব্য। বিস্তৃতভাবে অন্য শাস্ত্র পাঠের আর প্রয়োজন কী ? সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণুর মুখপদ্ম হতে এই গীতার আবির্ভাব॥ ১৩॥

গীতার অধ্যয়ন যিনি করেন, তাঁকে আপদ-বিপদ ও ঘোর নরক দেখতে হয় না॥ ১৪॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে শ্রীগীতাসারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-মাহাত্ম্যং সম্পূর্ণম্।

শ্রীস্কন্দপুরাণে ব্রহ্মবিদ্যারূপ যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে শ্রীগীতাসারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ।

মহাভারতে গীতার মাহাত্ম্য

গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রসংগ্রহৈঃ। যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্‌বিনিঃসৃতা॥
সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা সর্বদেবময়ো হরিঃ। সর্বতীর্থময়ী গঙ্গা সর্ববেদময়ো মনুঃ॥
গীতা গঙ্গা চ গায়ত্রী গোবিন্দেতি হৃদি স্থিতে। চতুর্গকারসংযুক্তে পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥
ভারতামৃতসর্বস্বগীতায়া মথিতস্য চ। সারমুদ্‌ধৃত্য কৃষ্ণেন অর্জুনস্য মুখে হুতম্॥

(মহাভারত ভীষ্মপর্ব ৪৩—১,২,৩,৪)

অন্যান্য শাস্ত্রাদি সংগ্রহ করার কী প্রয়োজন ? শুধুমাত্র গীতাগ্রন্থেরই সম্যক্‌ভাবে পঠন-পাঠন করা উচিত, কেননা ইহা ভগবান পদ্মনাভ বিষ্ণুর শ্রীমুখ পদ্ম হতে প্রকাশিত হয়েছে। গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী, শ্রীহরি সর্বদেবময়, গঙ্গা সর্বতীর্থময়ী এবং মনু হলেন সর্ববেদময়। গীতা, গঙ্গা, গায়ত্রী এবং গোবিন্দ—এই চারটি নাম যাঁর হৃদয়ে বাস করে, তাঁর পুনর্জন্ম হয় না। মহাভারতরূপী অমৃতের সর্বস্ব গীতাকে মন্থন করে তার সার বের করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মুখে এটিকে আহুতি দিয়েছেন।

যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈর্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ॥
ধ্যানাবস্থিত-তদ্‌গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো। যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥

ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও মরুৎ (পবন) দিব্য—অলৌকিক স্তব দ্বারা যাঁকে স্তুতি করেন, সামবেদবিৎ সামগায়কগণ অঙ্গসহ[১], পদপাঠ, ক্রমপাঠাদিযুক্ত স্বরভাগ সমৃদ্ধ উপনিষদ্ সহ বেদসকলের দ্বারা যাঁর গুণগাথা বা স্বরূপ গান করেন, যোগিগণ ধ্যানে বসে তদ্‌গতচিত্ত হয়ে মনের দ্বারা যাঁকে দর্শন করেন এবং দেব ও দানবগণ যাঁর অন্ত—চরম ও পরম তত্ত্ব জানতে পারেন না, সেই দেব (জ্যোতিস্বরূপ পরমেশ্বর) শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি। (এই শ্লোকটি যেরূপ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার ধ্যানমালায় আছে, সেইরূপ শ্রীমদ্‌ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেও উল্লিখিত আছে।)।

শান্তাকারং ভুজগশয়নং পদ্মনাভং সুরেশং। বিশ্বাধারং গগনসদৃশ্যং মেঘবর্ণং শুভাঙ্গম্॥
লক্ষ্মীকান্তং কমলনয়নং যোগিভির্ধ্যানগম্যং। বন্দে বিষ্ণু ভবভয়হরং সর্বলোকৈকনাথম্॥

যাঁর আকৃতি সদা শান্ত অর্থাৎ গুণত্রয়ের ও প্রকৃতির অতীত বলে সর্ববিকারশূন্য, যিনি ভুজগ—অনন্তশয্যায় শয়ন করে আছেন, যাঁর নাভিদেশ হতে পদ্ম উৎপন্ন হয়ে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে ধারণ করে বিরাজমান, যিনি দেবগণের নিয়ামক ও পরিচালক, যিনি বিশ্বের— চতুর্দশ ভুবনের আধার অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধরে রেখেছেন অথবা বিশ্বই যাঁর আধার অর্থাৎ যিনি বিশ্বরূপে বিরাজমান, গগনসদৃশ অর্থাৎ যিনি গগনতুল্য স্বচ্ছ ও সদা উন্মুক্ত, মেঘ—বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় শ্যামলসুন্দর বর্ণ, শুভাঙ্গ—যাঁর প্রতি অঙ্গে কেবল শুভেরই সমাবেশ অর্থাৎ পরম মঙ্গলময়, লক্ষ্মীকান্ত—লক্ষ্মীদেবীর পরমারাধ্য পতিদেব, কমলনয়ন—যাঁর নয়নযুগল কমলের ন্যায় সুন্দর ও প্রফুল্ল, যোগিগণের ধ্যানলভ্য পরম ও চরম তত্ত্ব, যিনি সমস্ত লোকের একমাত্র নাথ— পরিত্রাণ কর্তা এবং ভবভয়হর অর্থাৎ সংসার ভয়নাশকারী, আমি সেই শ্রীবিষ্ণুকে—সর্বব্যাপী পরমেশ্বরকে বন্দনা—অবনতমস্তকে প্রণাম করি॥

---

[১] বেদের ছয়টি অঙ্গ—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ।

বেদের স্বরমান সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য—বেদোক্ত মন্ত্রসমূহের একাদশ প্রকার পাঠ দেখা যায়। তাদের মধ্যে সংহিতা পাঠ, পদপাঠ এবং ক্রমপাঠ এই ত্রিবিধ পাঠকেই প্রধানরূপে গ্রহণ করা হয়। এই ত্রিবিধ পাঠের মধ্যে সংহিতাপাঠকে যোগ্য প্রকৃতি বলে আর পদপাঠ ও ক্রমপাঠ—এই দুই পাঠকে শুদ্ধা প্রকৃতি বলে। এই ত্রিবিধ প্রকৃতি পাঠ ব্যতীত আরও আট প্রকারের পাঠ আছে, যাদের বিকৃতি পাঠ বলে। এরূপে সর্বসাকুল্যে ১১ প্রকার পাঠ পরিলক্ষিত হয়। আট প্রকার বিকৃতির পাঠের নাম মহর্ষি পতঞ্জলির শিষ্য ব্যাড়িমুনি তাঁর 'জটাপটল' গ্রন্থে একটি শ্লোকে লিপিবদ্ধ করেছেন—

জটা মালা শিখা লেখা ধ্বজো দণ্ডো রথো ঘনঃ। অষ্টৌ বিকৃতয়ঃ প্রোক্তাঃ ক্রমপূর্বা মনীষিভিঃ॥

জটা, মালা, শিখা, লেখা, ধ্বজ, দণ্ড, রথ এবং ঘন—এই আট প্রকার বিকৃতি পাঠ কথিত হয়েছে।

সামবেদবিৎ বৈদিকগণ এই ত্রিবিধ প্রকৃতিপাঠ ও অষ্টবিধ বিকৃতিপাঠ দ্বারা যে বেদপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ও তদীয় মহিমা গান করেন।

''সাঙ্গ-পদক্রমোপনিষদৈঃ বেদৈঃ গায়ন্তি যং সামগাঃ'' এই বাক্যের নির্গলিতার্থ।

আরতী

জয় ভগবদ্‌গীতে, জয় ভগবদ্‌গীতে।
হরি-হিয়-কমল-বিহারিণি সুন্দর সুপুনীতে॥ জয়.
কর্ম-সুমর্ম-প্রকাশিনি কামাসক্তিহরা।
তত্ত্বজ্ঞান-বিকাশিনি বিদ্যা ব্রহ্ম পরা॥ জয়.
নিশ্চল-ভক্তি-বিধায়িনি নির্মল মলহারী।
শরণ-রহস্য-প্রদায়িনি সব বিধি সুখকারী॥ জয়.
রাগ-দ্বেষ-বিদারিণি কারিণি মোদ সদা।
ভব-ভয়-হারিণি তারিণি পরমানন্দপ্রদা॥ জয়.
আসুর-ভাব-বিনাশিনি নাশিনি তম-রজনী।
দৈবী সদ্‌গুণদায়িনি হরি-রসিকা সজনী॥ জয়.
সমতা, ত্যাগ সিখাবনি, হরি-মুখকী বানী।
সকল শাস্ত্রকী স্বামিনি, শ্রুতিয়োঁকী রানী॥ জয়.
দয়া-সুধা বরসাবনি মাতু! কৃপা কীজৈ।
হরিপদ-প্রেম দান কর অপনো কর লীজৈ॥ জয়.

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার প্রভাব

গীতা জ্ঞানের অগাধ সমুদ্র। এর ভিতরে জ্ঞানের অনন্ত ভাণ্ডার নিহিত। গীতার তত্ত্ব আলোচনা করতে বড় বড় দিগ্‌গজ পণ্ডিত এবং তত্ত্বালোচক মহাত্মাদের বাণীও কুণ্ঠিত হয়। কেননা এর পূর্ণ রহস্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণই জানেন। তাঁর পরে এর সঙ্কলনকর্তা ব্যাসদেব এবং শ্রোতা অর্জুনের কথা বলা যায়। এই রকম অগাধ রহস্যময়ী গীতার অভিপ্রায় এবং মহত্ত্ব আমার পক্ষে বর্ণনা করা একটি সাধারণ পাখির আকাশের ঠিকানা খোঁজার চেষ্টা করার মতো। গীতা অনন্ত ভাবসমূহের অগাধ জলরাশি। রত্নাকরের গভীরে ডুব দিলে যেমন রত্ন পাওয়া যায় তেমনই গীতা সাগরের গভীরে নিমজ্জন করলে জিজ্ঞাসু ব্যক্তি নিত্য নতুন বিশিষ্ট ভাবরত্নরাশি উপলব্ধি করেন।

গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী—এটি সকল উপনিষদের সার। উপনিষদের সূত্রগুলিতে যেমন বিশেষ ভাবের সমাবেশ আছে তেমনই তার চেয়েও উচ্চতর ভাবের সমাবেশ এর শ্লোকগুলিতে পরিপূর্ণ। এর শ্লোকগুলিকে শ্লোক না বলে মন্ত্র বলা উচিত। ভগবানের মুখ নিঃসৃত হওয়ায় এগুলি বস্তুত মন্ত্রেরও অধিক পরম মন্ত্র। তবু এগুলিকে কেন শ্লোক বলা হয় ? তার কারণ হল, নারী এবং শূদ্ররা যেমন বেদমন্ত্র উচ্চারণে বঞ্চিত থাকে সেই রকম এই বেচারীরা যাতে এই অনুপম গীতা শাস্ত্র থেকে বঞ্চিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই গীতার ভগবদ্‌বাণীকে শ্লোক বলা হয়েছে। যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকল জীবের কল্যাণের জন্য এই তাত্ত্বিক গ্রন্থরত্ন অর্জুনকে উপলক্ষ করে সংসারে প্রকটিত করেছেন। এঁর প্রচারকদের প্রশংসা করে ভগবান ভক্তদের মধ্যে এটিকে প্রচার করার জন্য স্পষ্ট আদেশ দিয়েছেন—সেই প্রচারক যেই হোক না কেন।

য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ॥
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি॥

(গীতা ১৮।৬৮-৬৯)

'যে ব্যক্তি আমার প্রতি প্রীতিবশতঃ এই পরম রহস্যময় গীতা শাস্ত্র আমার ভক্তদের কাছে বর্ণনা করবে সে অবশ্যই আমাকে লাভ করবে। মনুষ্যের মধ্যে তাঁর চেয়ে প্রিয়তম আমার কেউ নেই এবং ভবিষ্যতেও তাঁর চেয়ে অধিক প্রিয়তম আমার কেউই হবে না।'

গীতার প্রচার-ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ এবং শিথিল নয়। ভগবান একথা বলেননি যে অমুক জাতি বা বর্ণাশ্রমের মধ্যে অথবা অমুক দেশে এর প্রচার করা উচিত। ভক্ত হলে তিনি মুসলমান হোন, খ্রীষ্টান হোন, ব্রাহ্মণ অথবা শূদ্র যাই হোন, সকলেই এর অধিকারী। তবে ভগবান একথা অবশ্যই বলেছেন—

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥

(গীতা ১৮।৬৭)

'তোমার কল্যাণের উদ্দেশ্যে কথিত গীতারূপ এই পরম রহস্যকে কোনো কালে তপরহিত মানুষের কাছে বলা উচিত নয়। আর যে ভক্তিরহিত, শুনতে অনিচ্ছুক এবং আমার নিন্দাকারী তার কাছেও বলা উচিত নয়।' এই নিষেধও যথার্থ। ব্রাহ্মণ হয়েও সে যদি অভক্ত হয় তাহলে সে এর অধিকারী নয়। শূদ্রও যদি ভক্ত হয় তাহলে সে অধিকারী। জাত-পাত, উচ্চ-নীচের কোনো ভেদ এতে নেই। অনধিকারীদের সম্পর্কে তো আরও বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে। সেগুলি সবই ঠিক। ভক্তদের জন্য সোজাসুজি আদেশ দেওয়া হয়েছে, অতএব যিনি ভক্ত তিনি নিন্দা করতে পারেন না। ভক্তদের মধ্যে ভগবানের অমৃতবচন শোনার উৎকণ্ঠা থাকে। প্রেমী ভক্তের কাছে নিজের প্রিয়তমের কথা না শোনার প্রশ্নই ওঠে না। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি থাকায় তাঁর মধ্যে তপ তো এসেই গিয়েছে। তাতে এইটিই প্রমাণিত হয় যে যিনিই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, তিনিই গীতার অধিকারী। এর প্রত্যেকটি শ্লোককে মন্ত্র অথবা সূত্র যা কিছু মনে করে তাকে যতই গুরুত্ব দেওয়া হোক, তা পর্যাপ্ত নয়। মাখন যেমন দুধের সার, তেমনই গীতাও সকল উপনিষদের সারাংশ। সেইজন্য ব্যাসদেব বলেছেন—

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

উপনিষদগুলি হল গাভী, ভগবান গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ হলেন দোহনকারী, পার্থ হলেন গোবৎস, গীতারূপ মহান অমৃতই হল দুধ। উত্তম বুদ্ধি সম্পন্ন অধিকারী হলেন তার ভোক্তা।

গীতার মাধ্যমে এইরকম জ্ঞান লাভ হলে মানুষের অন্য কোনো জ্ঞানের প্রয়োজন থাকে না। এতে সকল শাস্ত্রের পরিসমাপ্তি। গীতার গভীরে ডুব দিলে এঁর মধ্য থেকে অনেক অনুপম রত্ন পাওয়া যায়। একাগ্র চিত্তে মনন করলে জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলে যায়। তাই বলা হয়েছে—

গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা॥

(মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ৪৩।১)

গীতা ভগবানের স্বরূপ, শ্বাস—ভাব। এই শ্লোকের **'পদ্মনাভ'** এবং **'মুখপদ্ম'** শব্দ দুটিতে খুবই বিশিষ্ট ভাব অন্তর্নিহিত রয়েছে। এদের পারস্পরিক যে ভিন্নতা এবং রহস্য সেদিকেও মন দিতে হবে। ভগবানকে **'পদ্মনাভ'** বলা হয়। কেননা তাঁর নাভি থেকে পদ্ম নির্গত হয়েছে এবং সেই পদ্ম থেকে ব্রহ্মার সৃষ্টি হয়েছে। ব্রহ্মার মুখ থেকে চারটি বেদ নিঃসৃত হয়েছে এবং সকল শাস্ত্র হল সেই বেদেরই বিস্তার। তাহলে এখন গীতার উৎপত্তি সম্পর্কে চিন্তা করুন ! গীতা স্বয়ং পরমাত্মার মুখপদ্ম থেকে নিঃসৃত হয়েছে। সুতরাং এটি হল ভগবানের হৃদয়। তাই একথা মানতে হয় যে গীতার মধ্যে সকল শাস্ত্র সমাবিষ্ট। যিনি কেবল গীতার সম্যক্ অনুশীলন করেছেন তাঁর অন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন নেই। তাঁর কল্যাণের জন্য গীতার একটি শ্লোকই যথেষ্ট।

এখন 'সুগীতা'-র অর্থ সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে। এটা ঠিক যে কেবল গীতা পাঠেই পাঠকের কল্যাণ হতে পারে। কেননা ভগবান শপথ করে বলেছেন—

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ॥

(গীতা ১৮।৭০)

তবে পাঠকের মধ্যে ঘাটতি এইটুকুই যে সে তাঁর তত্ত্ব জানে না। তার চেয়ে উত্তম হল সে যে এঁর অর্থ এবং ভাবকে জেনে শ্রদ্ধা-ভক্তির সঙ্গে এটি পাঠ করে। এই ভাবে যে একটি মাত্র শ্লোক পাঠ করে তাকে পূর্বজন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করা হবে। এই অনুসারে গীতার পাঠ শেষ করতে যদিও দুটি বছর লাগবে তবু ৭০০ শ্লোকের কেবল নিত্য পাঠের অপেক্ষা এরূপ অধ্যয়নকারী অধিক লাভান্বিত হবেন। আবার অর্থ এবং ভাব উপলব্ধি করে যিনি গীতার পাঠ করেন তাঁর চেয়েও তিনিই উত্তম যিনি তাঁর জীবনকে গীতা অনুসারে চালিত করেন। তিনি যদি দু বছরে একটি মাত্র শ্লোক জীবনে বাস্তবায়িত করেন তাহলেও তিনিই উত্তম। কিন্তু সর্বোত্তম হলেন তিনি, যিনি পরমাত্মাকে প্রাপ্তির সাধনামণ্ডিত শ্লোকগুলির মধ্যে একটিকেও ধারণ করেন। একজন লোক লক্ষ লক্ষ শ্লোক পাঠ করে ফেললেন আর একজন পাঠ করলেন সাতশোটি এবং তৃতীয়জন কেবল একটি। কিন্তু আমাদের এইটি মানতে হবে যে যিনি কেবল একটি শ্লোককেও আচরণে বাস্তবায়িত করেন তিনি লক্ষ লক্ষ শ্লোকের পাঠকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর গীতার সবকটি শ্লোককে অধ্যয়ন করে যিনি সেগুলিকে সম্পূর্ণরূপে জীবনে কার্যান্বিত করেন তিনিই 'গীতা সুগীতা' নাম সার্থক করেছেন। গীতা-অনুসারে যিনি জীবন যাপন করেন সেই জ্ঞানী হলেন গীতার চৈতন্যময় মূর্তি।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে, গীতায় কথিত কোন্ শ্লোকগুলি থেকে শুধুমাত্র একটিমাত্র শ্লোক বেছে নিয়ে জীবনে ধারণ করলে মানুষের কল্যাণ হয়, তাহলে সেটির সঠিক নির্ণয় করা খুবই কঠিন। কেননা গীতার প্রায় সব শ্লোকই জ্ঞানপূর্ণ এবং কল্যাণকর। তাহলেও সমগ্র গীতার এক-তৃতীয়াংশ শ্লোক এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলে মনে হয় যার মধ্য থেকে একটিকেও ভালভাবে বুঝে কার্যান্বিত করলে অর্থাৎ সেই অনুসারে আচরণ করলে মানুষ পরমপদকে লাভ করতে পারে। বিস্তারভয়ে সেই শ্লোকগুলির পূর্ণ তালিকা না দিয়ে পাঠকদের অবগতির জন্য কয়েকটি শ্লোকের উল্লেখ করা হচ্ছে—

অধ্যায়—২, শ্লোক—২০, ৭১ ; অ.—৩, শ্লো.—১৭-৩০ ; অ.—৪, শ্লো.—২০-২৭ ; অ.—৫, শ্লো.—১০, ১৭, ১৮, ২৯ ; অ.—৬, শ্লো.—১৪, ৩০, ৩১, ৪৭ ; অ.—৭, শ্লো.—৭, ১৪, ১৯ ; অ.—৮, শ্লো.—৭, ১৪, ২২ ; অ.—৯, শ্লো.—২৬, ২৯, ৩২, ৩৪ ; অ.—১০, শ্লো.—৯, ৪২ ; অ.—১১, শ্লো.—৫৪, ৫৫ ; অ.—১২, শ্লো.—২, ৮, ১৩, ১৪ ; অ.—১৩, শ্লো.—১৫, ২৪, ২৫, ৩০ ; অ.—১৪, শ্লো.—১৯, ২৬ ; অ.—১৫, শ্লো.—৫, ১৫ ; অ.—১৬, শ্লো.—১ ; অ.—১৭, শ্লো.—১৬ ; এবং অধ্যায়—১৮, শ্লো.—৪৬, ৫৬, ৫৭, ৬২, ৬৫, ৬৬।

উপরোক্ত শ্লোকগুলির একটিকেও যিনি কার্যান্বিত করেন তিনি মুক্ত হয়ে যান। যিনি গীতার অর্থ এবং ভাব উপলব্ধি করে শ্রদ্ধা-প্রেমের সঙ্গে তার অনুসরণ করেন তাঁর প্রতিটি রোমকূপে গীতা সেইভাবে অধিষ্ঠান করেন, যেমনভাবে পরম ভাগবত শ্রীহনুমানের প্রতিটি রোমকূপে

রাম সমাবিষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি যখন শ্রদ্ধা ও প্রেমের সঙ্গে গীতা পাঠ করেন তখন মনে হয় যে তাঁর **প্রতিটি রোমকূপ থেকে যেন গীতার সুমধুর সঙ্গীত রস প্রবাহিত হচ্ছে।**

গীতার বিষয়-বিভাগ

গীতার বিষয় খুবই গভীর এবং রহস্যপূর্ণ। সাধারণ মানুষদের তো কথাই নেই, এতে বড় বড় বিদ্বানেরাও হতচকিত হয়ে যান। কেউ কেউ তো নিজেদের ধারণানুসারেই এর অর্থ করে থাকেন। তাঁরা এ থেকে তাঁদের মতানুসারে সমাধানও পেয়ে থাকেন। কেননা এতে কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান সব বিষয়েরই সমাবেশ রয়েছে। আর যেখানে যে বিষয়টি এসেছে সেখানে ভগবান সেই বিষয়টির যথার্থ প্রশংসা করেছেন। তাই নিজেদের মতকে পুষ্ট করার জন্য বিদ্বানেরা এতে তাঁদের মতের অনুকূল সিদ্ধান্ত পেয়ে যান। এজন্য এঁরা নরম মোমের মতো নিজেদের সিদ্ধান্তকে টেনে গীতার মতের অনুকূলে নিয়ে যান। যাঁরা অদ্বৈতবাদী (একমাত্র ব্রহ্মকে যাঁরা মানেন) তাঁরা গীতার প্রায় সমস্ত শ্লোককে অভেদের দিকে, যাঁরা দ্বৈতবাদী তাঁরা দ্বৈতের দিকে আর কর্মযোগীরা কর্মের দিকে একে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। অর্থাৎ জ্ঞানীদের কাছে এই গীতা শাস্ত্র জ্ঞানের, ভক্তের কাছে ভক্তিযোগের এবং কর্মযোগীর কাছে কর্মের প্রতিপাদক বলে প্রতীত হয়। ভগবান অর্জুনের কাছে খুবই গুরুত্ব সহকারে এই রহস্যময় গ্রন্থ বর্ণনা করেছেন। তাই পৃথিবীর প্রায় সমস্ত মানুষ একে আত্মস্থ করে উন্মুক্ত গলায় ঘোষণা করে যে গীতায় তাদেরই সিদ্ধান্তের প্রতিপাদন করা হয়েছে। কিন্তু ভগবান দ্বৈত, অদ্বৈত অথবা বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি কোনো বাদ বা ধর্ম, সম্প্রদায়, জাতি কিংবা বিশেষ কোনও দেশকে লক্ষ্য করে এটি রচনা করেননি। এতে না আছে কোনো ধর্মের নিন্দা, না আছে কোনো ধর্মের পুষ্টিকরণ। এটি এক স্বতন্ত্র গ্রন্থ এবং ভগবানের দ্বারা কথিত হওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবেই একে প্রামাণ্য বলে মেনে নেওয়া উচিত। অন্য শাস্ত্রের প্রমাণের প্রয়োজন এর নেই। এটি স্বয়ং অন্য শাস্ত্রের প্রমাণ স্বরূপ।

কোনো কোনো আচার্য বলে থাকেন যে এর প্রথম ছটি অধ্যায়ে কর্মের, দ্বিতীয় ছটি অধ্যায়ে ভক্তির এবং পরের ছটি অধ্যায়ে জ্ঞানের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের এই কথা কিয়দাংশে মানা যেতে পারে। কিন্তু যদি মনোযোগের সঙ্গে দেখা হয় তাহলে বোঝা যাবে যে দ্বিতীয় থেকে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত সব অধ্যায়েই কম বেশি কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং গভীর বিবেচনা করলে গীতার বিভাগ নিম্নরূপ হওয়াই উচিত—

প্রথম অধ্যায়ে মোহ এবং স্নেহের কারণে অর্জুনের যে শোক ও বিষাদ হয়েছিল তার বর্ণনা থাকায় এই অধ্যায়ের নাম দেওয়া হয়েছে অর্জুন-বিষাদ যোগ। এতে কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের উপদেশের প্রসঙ্গ নেই। এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হল অর্জুনকে উপদেশের অধিকারী করে তোলা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্য এবং নিষ্কাম কর্মযোগের বর্ণনা আছে। প্রধানত ২য় অধ্যায়ের ৩৯ সংখ্যক শ্লোক থেকে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৪ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত ভগবান বিস্তৃতভাবে নিষ্কাম কর্মযোগের বিষয়কে নানারকম যুক্তি দিয়ে বর্ণনা করেছেন। ভক্তি এবং জ্ঞানের কথাও প্রসঙ্গত এসে গিয়েছে ; যেমন, ৫ম অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোক থেকে ২৬তম শ্লোক পর্যন্ত জ্ঞানের কথা এবং ৪র্থ অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ থেকে ১১শ পর্যন্ত ভক্তির কথা বলা হয়েছে। শেষ ষষ্ঠতম অধ্যায়ে ধ্যানযোগের প্রতিপাদন করা হয়েছে, অন্যভাবে আমরা এটিকে মনঃসংযোগের বিষয় বলতে পারি। এজন্য এর নাম হল আত্মসংযমযোগ। ৭ম থেকে ১২শ অধ্যায় পর্যন্ত তত্ত্ব ও প্রভাবসহ ভগবানের ভক্তির রহস্য নানা রকম যুক্তির দ্বারা উত্থাপন করে বোঝানো হয়েছে। এইজন্য ভগবান ভক্তির সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করেছেন। এই ছটি অধ্যায়ের সমূহকে ভক্তিযোগ বা উপাসনাকাণ্ড নামও দেওয়া যায়। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায় দুটিতে তো প্রধানতঃ প্রভাব সহকারে জ্ঞানযোগের কথা বলা হয়েছে। পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবানের রহস্য ও প্রভাবসহ ভক্তিযোগের বর্ণনা রয়েছে। ১৬শ অধ্যায়ে দৈবী ও আসুরী সম্পদসম্পন্ন মানুষদের লক্ষণ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ও নীচ পুরুষদের আচরণের উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা মানুষের বিধি-নিষেধ সম্পর্কে জ্ঞান হয়। তাই একে অংশত জ্ঞানযোগপ্রতিপাদক মনে করলে কোনো আপত্তি নেই। ১৭শ অধ্যায়ে শ্রদ্ধার তত্ত্ব বোঝাবার জন্য প্রায়ই নিষ্কাম কর্মযোগ : বুদ্ধিপূর্বক যজ্ঞ, দান এবং তপাদি কর্মগুলির বিভাগ করা হয়েছে। অতএব

একে নিষ্কাম-কর্মযোগ-বিষয়ের অধ্যায় বলেই মনে করা উচিত। ১৮শ অধ্যায়ে ভগবান উপসংহাররূপে সকল বিষয়ের বর্ণনা করেছেন। যথা, ১ থেকে ১২ এবং ৪১ থেকে ৪৮ শ্লোক পর্যন্ত কর্মযোগ, ১৩ থেকে ৪০ এবং ৪৯ থেকে ৫৫ শ্লোক পর্যন্ত জ্ঞানযোগ এবং ৫৬ থেকে ৬৬ শ্লোক পর্যন্ত কর্মসহ ভক্তিযোগের বর্ণনা করা হয়েছে।

গীতোপদেশের প্রারম্ভ ও পর্যবসান

গীতার মুখ্য উপদেশের প্রারম্ভ **'অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্'** প্রভৃতি শ্লোক থেকে হয়েছে, এইজন্য লোকেরা এটিকে গীতার বীজ বলেন। কিন্তু **'কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাব'** (২।৭) প্রভৃতি শ্লোকগুলিকেও বীজ বলা হয় ; কেননা অর্জুনের ভগবৎ-শরণ হওয়ার কারণেই ভগবানের দ্বারা এই গীতোপনিষদ্ কথিত হয়েছে। গীতার পর্যবসান — সমাপ্তি শরণাগতিতে হয়েছে, যথা—

সর্বধর্মান্‌পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

(১৮।৬৬)

'সকল ধর্ম অর্থাৎ সকল কর্মের আশ্রয়কে ত্যাগ করে কেবল এক আমাকেই —সচ্চিদানন্দঘন বাসুদেব পরমাত্মার অনন্য শরণকে প্রাপ্ত করো। আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করে দেব। তুমি শোক করো না।'

প্রশ্ন— ভগবান অর্জুনকে কী শেখাতে চেয়েছিলেন ?

উত্তর—তত্ত্ব ও প্রভাবসহকারে ভক্তিপ্রধান কর্মযোগ।

প্রশ্ন— গীতাতে প্রধানত ধারণ করার যোগ্য কত-গুলি বিষয় আছে ?

উত্তর—ভক্তি, কর্ম, ধ্যান এবং কর্মযোগ। এই চারটি বিষয় দুটি নিষ্ঠার (সাংখ্য ও কর্ম) অন্তর্গত।

প্রশ্ন— গীতা অনুসারে যে সিদ্ধ পুরুষ পরমাত্মাকে লাভ করেছেন তাঁর প্রায় সকল লক্ষণগুলির (মালাকে গেঁথে রাখার সুতার মতো) আধারস্বরূপ লক্ষণ কী ?

উত্তর—সমতা।

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥

(গীতা ৫।১৯)

যাঁদের মন সমত্ব-ভাবে অবস্থিত—তাঁরা ইহলোকে থেকেও এই জন্ম-মরণ রূপ সংসারকে অতিক্রম করেছেন। যেহেতু সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা নির্দোষ এবং সম, সেই হেতু তাঁরা সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাতেই অবস্থান করেন।

মান-অপমান, সুখ-দুঃখ, মিত্র-শত্রু এবং ব্রাহ্মণ-চণ্ডালে যাঁরা সমবুদ্ধি—গীতার দৃষ্টিতে তাঁরাই জ্ঞানী।

প্রশ্ন—গীতা কী শেখায় ?

উত্তর—আত্মতত্ত্বের জ্ঞান এবং ঈশ্বরে ভক্তি, স্বার্থ ত্যাগ এবং ধর্মপালনের জন্য প্রাণোৎসর্গ। যিনি এই চারটির মধ্যে কেবল একটিকেও জীবনে ধারণ করেন —একটিকেও সম্যকভাবে অনুশীলন করেন, তিনি স্বয়ং মুক্ত এবং পবিত্র হয়ে অপরের কল্যাণে সক্ষম হতে পারেন। যাঁর মধ্যে পরমাত্মাকে দর্শন করবার জন্য তীব্র উৎকণ্ঠা—যিনি খুব তাড়াতাড়ি পরমাত্মাকে পেতে ইচ্ছুক, তাঁকে ধর্মের জন্য নিজের প্রাণকে হাতের মুঠোয় ধরে থাকতে হবে। যিনি ঈশ্বরের আদেশ মনে করে নিজের প্রাণকে ধর্মের বেদিতে বিসর্জন দেন, তাঁর প্রাণ-বিসর্জন প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মার জন্যই হয়ে থাকে। ফলে ঈশ্বরকেও তখন তাঁর কল্যাণ করার জন্য বাধ্য হতে হয়। গুরু গোবিন্দ সিং-এর সন্তানগণ যেমন ধর্ম-রক্ষার জন্য নিজেদের প্রাণকে আহুতি দিয়ে মুক্তি লাভ করেছিল, তেমনই যিনি ধর্ম অর্থাৎ ঈশ্বরের জন্য সবকিছু আহুতি দিতে সর্বদাই প্রস্তুত, তাঁর কল্যাণ সম্পর্কে কী সংশয় থাকতে পারে ?

'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ।' (গীতা ৩।৩৫)

আত্মতত্ত্ব সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর মানুষ নির্ভয় হয়ে যায়। কেননা তিনি একথা ভালভাবেই বুঝে নেন যে আত্মার কখনও বিনাশ হয় না।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

(গীতা ২।২০)

যতদিন মানুষের হৃদয়ে কারও থেকে বিন্দুমাত্র ভয় থাকে ততদিন বুঝে নিতে হবে আত্মতত্ত্ব থেকে সে বহুদূরে অবস্থিত। ঈশ্বরের শরণাগতির রহস্যের যাঁর জ্ঞান হয়েছে সেই মানুষ ধর্মের জন্য, ঈশ্বরের জন্য হাসতে হাসতে প্রাণকে আহুতি দিতে পারেন। এইটিই তাঁর পরীক্ষা। প্রকৃত স্বার্থত্যাগও এইটিই। ভগবৎ-বচনের গুরুত্ব এবং রহস্যকে যে ব্যক্তি বুঝেছেন তিনি প্রয়োজন

হলে স্ত্রী, পুত্র, অর্থাদির কথা বাদ দিন, প্রাণোৎসর্গ করতেও এতটুকু কুণ্ঠিত হন না। তিনি তার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকেন। যে মানুষ ধর্ম অর্থাৎ কর্তব্য পালনের তত্ত্ব জেনে নিয়েছেন, তাঁর কোনো কর্মেই মান-সম্মান প্রভৃতি বড় বড় স্বার্থেরও বিন্দুমাত্র চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না। এমন মানুষদের জীবন-ধারণ কেবল ভগবানের প্রীত্যর্থে অথবা লোকহিতার্থেই হয়ে থাকে।

প্রশ্ন—গীতায় সর্বশ্রেষ্ঠ শ্লোক কোন্‌টি ?

উত্তর—সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
(গীতা ১৮।৬৬)

এই শ্লোকে কথিত শরণের প্রকারের ব্যাখ্যা শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার ৯ম অধ্যায়ের ৩৪ সংখ্যক শ্লোকে এবং ১৮শ অধ্যায়ের ৬৫তম সংখ্যক শ্লোকে বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে।

প্রশ্ন — ভগবান তাঁর প্রদত্ত উপদেশগুলির মধ্যে গুহ্যতম উপদেশ কোন্‌টিকে বলেছেন ?

উত্তর—মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। **'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য'** প্রভৃতিকে (১৮।৬৫-৬৬)

প্রশ্ন—ভগবানের গীতা বলার আসল উদ্দেশ্য কী ?

উত্তর— অর্জুনকে সম্পূর্ণরূপে নিজের শরণাগত করা।

প্রশ্ন—এটি কোথায় সম্পূর্ণ হয়েছে ?

উত্তর—১৮শ অধ্যায়ের ৭৩ সংখ্যক শ্লোকে—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥

'হে অচ্যুত! আপনার কৃপায় আমার মোহ দূর হয়ে গিয়েছে, আমি স্মৃতি লাভ করেছি, এজন্য আমি সংশয়-রহিত হয়ে স্থিত হয়েছি এবং আমি আপনার আদেশ পালন করব।'

গীতার সর্বজনপ্রিয়তা

কয়েকজন সজ্জন ব্যক্তি গীতার সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন করেছেন। তাঁদের যে উত্তর দেওয়া হয়েছিল তা সকলের পক্ষে উপযোগী হওয়ায় প্রকাশিত করা হল।

প্রশ্ন—গীতার উপর অনেক আচার্যের অনেক টীকা আছে। সেগুলির মধ্যে আপনি কোন্‌টিকে উত্তম এবং যথার্থ বলে মনে করেন ?

উত্তর—যাঁরা ভগবৎপ্রাপ্ত মহাপুরুষ সেইসকল আচার্যের টীকাগুলিকে আমি উত্তম এবং যথার্থ বলে মনে করি।

প্রশ্ন—আচার্য তো অনেক হয়েছেন। তাঁদের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ আছে, এমনকি তাঁদের টীকার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। শঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদ প্রতিপাদন করেছেন, রামানুজাচার্য করেছেন বিশিষ্টাদ্বৈত। তেমনই অন্যান্য আচার্যরাও ভিন্ন ভিন্ন মতের প্রতিপাদন করে টীকা লিখেছেন। তাহলে সব টীকাই কি করে যথার্থ হতে পারে ? সত্য তো একটিই হয়।

উত্তর—তর্কের দৃষ্টিতে আপনি যা বলছেন তা ঠিক। ধরে নেওয়া গেল যে গীতার একশ টীকা আছে এবং সেগুলির প্রত্যেকটি পরস্পরের ভিন্ন। তাহলে প্রত্যেকটি টীকাই বাকি ৯৯টি টীকার বিরোধী। এই দৃষ্টিতে তো একটি টীকাও সঠিক নয়। কিন্তু যে কোনো আচার্যের টীকা অনুসারে যদি ভালোভাবে জীবন গঠন করা হয় তাহলে তার দ্বারাই ঈশ্বর প্রাপ্তি হতে পারে। এই যুক্তিতে সব টীকাই ঠিক।

প্রশ্ন—আপনি কোন্ টীকাকে সর্বোপরি মনে করেন এবং আপনি কোন্‌টির অনুগামী ?

উত্তর—আমি তো সব কটিকেই উত্তম মনে করি এবং আমি কোনো একটির অনুগামী নই, আমি সবগুলিরই অনুগামী। কেননা আমি প্রায় সবগুলিরই ভাল কথা গ্রহণ করেছি এবং অনেক টীকা থেকে সাহায্য নিয়েছি এবং নিচ্ছি। সকল আচার্যই আমার পূজনীয় এবং আমি সকলকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখি এবং যে কোনো আচার্যের কৃত টীকা অনুসরণ করলে পরমাত্মাকে পাওয়া যায় বলে মনে করি। তবে আমি টীকাগুলি অপেক্ষা মূলকেই সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করি। কেননা কোনো আচার্যই মূলের বিরোধিতা করেননি। বরং ভগবৎ বাক্য হওয়ায় সকলেই মূলকে সম্মান করেন এবং তার প্রশংসা করেন। সকলেই মূলকে আধার করে অগ্রসর হন এবং তাকে আশ্রয় করেই সকলকে পরিচালিত করতে চান। এইজন্য আচার্যদের টীকাগুলি অপেক্ষা মূলই সর্বোত্তম।

প্রশ্ন— শঙ্করাচার্য গীতার অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যা করেন এবং ভক্তিমার্গের লোকেরা দ্বৈতবাদী ব্যাখ্যা করেন আর

কর্মমার্গের লোকেরা কর্মযোগের ব্যাখ্যা করেন। তাহলে গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় কোন্‌টি—জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, না কর্মযোগ ? এবং তাঁরা কি তাঁদের কথা টানা-হ্যাঁচড়া করে প্রতিপাদন করেন, নাকি তাঁরা এমনটিই বিশ্বাস করেন।

উত্তর—তাঁদের সম্পর্কে টানা-হ্যাঁচড়া করার কথা বলা তো তাঁদের মানসিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করা ! তাই এসব কথা বলা উচিত নয়। গীতার যেমন অর্থ তাঁদের কাছে প্রতীত হয়েছে তাঁরা সেই রকমই লিখেছেন। গীতার পক্ষে এটি একটা গৌরব, কেননা সকল মতের লোকেরাই গীতাকে আশ্রয় করেছেন। গীতা এই রকমই এক রহস্যময় গ্রন্থ যাতে সকলেই তাঁদের মত ওতপ্রোতরূপে সন্নিবিষ্ট দেখতে পান। কেননা বাস্তবে গীতাতে জ্ঞানযোগ (অদ্বৈতবাদ), ভক্তিযোগ (দ্বৈতবাদ) এবং কর্মযোগ (নিষ্কাম কর্ম)—সব-কিছুই যথাযথভাবে প্রতিপাদন করা হয়েছে।

প্রশ্ন—ভগবৎপ্রাপ্ত মানুষদের প্রাপ্তব্য বস্তু তো এক। গীতা গ্রন্থটি এবং গীতার বক্তাও এক। তবুও গীতার অর্থ আচার্যদের কাছে বিভিন্ন হয় কেন ?

উত্তর—সকলের প্রাপ্য বস্তু এক হলেও সকলের পূর্ব সংস্কার, সঙ্গ, সাধন, স্বভাব এবং বুদ্ধি ভিন্ন হওয়ায় তাঁদের কথা বলার, বোঝাবার শৈলী এবং পদ্ধতি ভিন্ন হয়ে থাকে। তাছাড়া ভগবান যে সময় যে মানুষের দ্বারা যে ভাব প্রচার করতে চান সেই ভাবই সেই আচার্যের কাছে সেই সময় প্রকট হয়ে যায় এবং তাঁর কাছে গীতার অর্থ এবং ভাব তখন সেই রকমই প্রতীত হয়ে থাকে।

প্রশ্ন—যখন সকলের কথা ভিন্ন ভিন্ন হয়, তখন সকলের কথাই যথার্থ কি করে হতে পারে ?

উত্তর—এক দৃষ্টিতে সকলের কথাই যথার্থ আবার অন্য দৃষ্টিতে কারও কথাই যথার্থ নয়। ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ পরিণাম সকলের ক্ষেত্রে এক হলেও সকলের কথা আলাদা আলাদা হতে পারে। যেমন, দ্বিতীয়ার চাঁদকে দেখাবার জন্য কেউ বলতে পারে যে চাঁদ হল ঐ গাছটার চূড়া থেকে এক বিঘত উপরে। আর একজন বলতে পারে যে চাঁদ অমুক বাড়িটার কোণ ঘেঁষে রয়েছে। আর তৃতীয় লোকটি মাটিতে খড়ি দিয়ে এঁকে বলতে পারে চাঁদের আকৃতি এই রকম এবং ঐ উড়ন্ত পাখির দুটি ডানার মাঝখানে তাকে দেখা যাচ্ছে। আবার চতুর্থ লোকটি নলখাগড়ার আকারের কথা জানিয়ে ইঙ্গিত করতে পারে যে চাঁদ আমার ঠিক আঙুলের সামনে দেখা যাচ্ছে। এই সমস্ত লোকের যেমন লক্ষ্য হল চাঁদকে দেখান এবং তারা শুভ উদ্দেশ্যেই নিজেদের প্রক্রিয়া জানান এবং তাদের কথায় পরস্পরের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য থাকে, তেমনই সব আচার্যেরই উদ্দেশ্য এক, কারণ সকলেই সাধকদের ভগবৎপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই কথা বলেন। কিন্তু তাঁদের কথায় প্রচুর ভিন্নতা থাকে। অন্তিম পরিণাম এক হওয়ায় সকলের কথাই ঠিক। অর্থাৎ যে কোনো আচার্যের কথানুসারে চললে প্রকৃত ভগবৎপ্রাপ্তি হয়ে যায়। এই যুক্তিতে সকলের কথাই যথার্থ। কিন্তু যদি শব্দার্থ নিয়ে তর্ক করেন তাহলে কারও কথাই ঠিক মনে হয় না। কারণ বাস্তবে চাঁদ গাছের এক বিঘত উপরে নেই, বাড়ির কোণ ঘেঁষা নয়, পাখির ডানার মাঝখানে নেই এবং আঙুলের ঠিক সামনেই তার অবস্থান নয়। আর চাঁদের আকৃতিও তাদের কথার মতো নয়। শব্দ নিয়ে তর্ক করলে কোনো কথাই খাটে না।

প্রশ্ন—ভগবৎ বাক্যস্বরূপ গীতার মূল শ্লোকের প্রতি শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি গীতার যথার্থ অর্থ জানতে আগ্রহী থাকে। কিন্তু গীতার অনেক টীকা পড়ে তারা সংশয়গ্রস্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং তারা যাতে গীতার যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারে তার জন্য তাদের কী করা উচিত ?

উত্তর—যাঁরা ভগবৎ বাক্যকে অমোঘ মনে করে সেই অনুসারে নিজেদের জীবন যাপন করার জন্য ভগবানের উপর নির্ভর করেন এবং নিজেদের বুদ্ধি অনুসারে বিশুদ্ধ মনোভাব নিয়ে মূল শব্দগুলির অর্থের দিকে দৃষ্টি রেখে নিমগ্ন হন ও তার স্বাধ্যায় ও অনুশীলন করতে থাকেন, ভগবৎ কৃপায় তাঁদের সংশয় ভ্রম সবই দূর হয়ে যায়। গীতার অমোঘ এবং যথার্থ জ্ঞান স্বতঃই তাঁদের অন্তরে প্রকাশিত হয়।

প্রশ্ন—যাঁরা ভগবৎপ্রাপ্ত ব্যক্তি নয় এমন অনেক মানুষও গীতার নানা রকম টীকা রচনা করেন। সেইসব টীকা অনুশীলন করেও কি ভগবৎপ্রাপ্তি হতে পারে ?

উত্তর—যারা গীতাকে ইষ্ট মনে করে ভগবৎ বাক্যকে যথার্থ বলে মনে করে এবং নিজেদের জীবনকে গীতাময় করবার জন্য গীতার উপর নির্ভরশীল হয়ে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাসহ মূল গীতাকে অথবা কেবল টীকাগুলিকেই অনুশীলন করতে থাকে, গীতা স্বয়ং তাদের বিভিন্ন টীকা পাঠের ফলে উৎপন্ন ভুল ধারণাকে দূর করে তাদের মধ্যে যথার্থ বোধ সঞ্চার করে দেয়।

প্রশ্ন—কোনো টীকা ভগবৎপ্রাপ্ত মহাপুরুষ কৃত, নাকি কোনো সাধারণ মানুষের রচনা তা কি করে নির্ণয় করা যাবে ?

উত্তর—যে টীকা অধ্যয়ন করলে পরমাত্মার এবং গীতার প্রতি শ্রদ্ধা-প্রেম বর্ধিত হয়, সংগুণ ও সৎ-ভাবনা

জাগ্রত হয় এবং সেই টীকার প্রতি আকর্ষণ হয়, সেই টীকাকেই ভগবৎপ্রাপ্ত মহাপুরুষ কৃত টীকা বলে মনে করা উচিত।

প্রশ্ন—সকল মতাবলম্বী ও সম্প্রদায়ের লোকেরা গীতাকে আত্মস্থ করে এবং তাতে নিজেদেরই ভাবনার প্রতিফলন দেখে। তাহলে ভগবান কী ভবিষ্যতে যেসব ভাবনা উত্থিত হতে পারে তার কথা মনে রেখেই গীতার বক্তব্য উপস্থাপিত করেছিলেন ?

উত্তর—ভগবান তো ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের সকল বিষয়ের সমস্ত কথাই জানেন। ভগবান গীতায় বলেছেন—

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন।। (৭।২৬)

'হে অর্জুন! অতীতে বিগত এবং বর্তমানে স্থিত তথা পরবর্তীকালে আগত সর্বভূতকে আমি জানি। কিন্তু আমাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি রহিত কোনো মানুষ জানে না।'

এজন্য ভগবান ঐ সব ভাবকে মনে রেখেই যদি গীতার কথা বলে থাকেন তবে তা অসম্ভব কিছু নয়। আর গীতার সিদ্ধান্তই এমন অলৌকিক ও যথার্থ যে সৎ মনোভাব নিয়ে ত্যাগপূর্বক যেসব আচার্য তার প্রচার করেন তাঁদের হৃদয়ে গীতার যথার্থ ভাব স্বাভাবিকভাবেই উৎপন্ন হয়ে থাকে। এজন্য শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিয়ে দেখলে তাঁরা গীতার মধ্যে নিজেদের ভাবসমূহকেই দেখতে পান।

প্রশ্ন—গীতার মধ্যে এমন কি বিশিষ্টতা আছে, যেজন্য সনাতন ধর্ম ছাড়া যাঁরা অন্য মত মানেন তাঁরাও গীতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যান ?

উত্তর—গীতায় কোনো ব্যক্তির বা কোনো মতের নিন্দা করা হয়নি। যে কথা বলা হয়েছে তা যুক্তিযুক্ত এবং ন্যায়সঙ্গত। ভাব এবং আচরণের নিরিখেই ভাল-মন্দ মানুষের নির্ণয় করা হয়েছে, কোনো জাতি বা বাহ্যিক বিশেষ চিহ্নের দ্বারা তা করা হয়নি। সকল মানুষের আত্ম-কল্যাণের অধিকারের কথা বলা হয়েছে, সর্বপ্রিয় সমতাকে বিশিষ্টতা দেওয়া হয়েছে এবং সমতাকেই সাধক ও সিদ্ধির কষ্টিপাথর বলে গণ্য করা হয়েছে। গীতাকে কেবল শুনলে ও বুঝলেই শান্তি লাভ হতে পারে, তাহলে সেই অনুসারে যারা চলবে তাদের সম্পর্কে আর কী বলার আছে! গীতার ভাষা, ভাব, অর্থ, জ্ঞান, তার পদ্য রচনা এবং তার গীত খুবই সুমধুর, সুন্দর, সুগম এবং রুচিকর। এজন্য সকল শ্রেণীর মানুষ গীতার প্রতি আকৃষ্ট হন।

প্রশ্ন—গীতা পাঠ করা, অথবা তাকে গাওয়া বা তার অর্থ বোঝা, নাকি তার ভাব অনুধাবন করা, কোন্‌টি উত্তম ?

উত্তর—পাঠ করা অপেক্ষা প্রেমপূর্বক মধুর স্বরে গান করা উত্তম। গান করার সঙ্গে সঙ্গে অর্থ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আরও উত্তম। গীতার ভাবকে হৃদয়ে ধারণ করা তার চেয়েও বেশি উত্তম আর সেই ভাব অনুসারে নিজের জীবনকে গঠন করা হল সর্বোত্তম।

প্রশ্ন—গীতাতে প্রথমে কর্ম, পরে উপাসনা এবং তদনন্তর জ্ঞানের সাধনায় মুক্তি—এই রকম সাধন-প্রণালী আছে অথবা কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ—এই তিনটি স্বতন্ত্ররূপে মুক্তিদায়ক ?

উত্তর—প্রথমে কর্ম, পরে উপাসনা এবং তারপরে জ্ঞানের সাধনায় মুক্তি হয়—এই পর্যায়ের কথাও আছে আবার এগুলির অতিরিক্ত স্বতন্ত্ররূপে কেবল কর্মযোগ, কেবল ভক্তিযোগ অথবা কেবল জ্ঞানযোগের দ্বারাও মুক্তির কথাও বলা হয়েছে। যেমন—

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে।।
(গীতা ১৩।২৪)

'কত মানুষই তো সেই পরমাত্মাকে পরিশুদ্ধ সূক্ষ্ম-বুদ্ধির দ্বারা ধ্যান করতঃ হৃদয়ে দেখতে পান। অন্য অনেকে জ্ঞানযোগের দ্বারা আবার কেউ কেউ কর্মযোগের দ্বারা তাঁকে দর্শন অর্থাৎ তাঁকে লাভ করেন।'

যদি বলেন যে জ্ঞান ছাড়া মুক্তি হয় না—(**ঋতে জ্ঞানান্ন মুক্তিঃ**) তো ঠিক আছে, কিন্তু নিষ্কাম কর্মের দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে সাধকের নিজে থেকেই তত্ত্বজ্ঞান হয়ে যায়।

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎস্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।।
(গীতা ৪।৩৮)

'এই জগতে নিঃসন্দেহে জ্ঞানের মতো পবিত্রকারী আর কিছুই নেই। কিছু কাল ধরে কর্মযোগের দ্বারা শুদ্ধ অন্তঃকরণযুক্ত মানুষ সেই জ্ঞানকে নিজেদের আত্মায় লাভ করেন।'

এইভাবে ভেদ ভাবে উপাসনার ফলেও ভগবৎ কৃপার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান হয়ে যায়।

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।।
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।।

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥
(গীতা ১০।৯-১১)

'যাঁরা নিরন্তর আমাতে মন নিমগ্ন করেছেন এবং আমাতেই প্রাণ অর্পণ করেছেন সেই ভক্তগণ পরস্পরের মধ্যে আমার প্রতি ভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করে গুণ ও প্রভাবসহ আমার চর্চা করে পরম সন্তোষ লাভ করেন এবং পরম প্রেমানন্দ উপভোগ করেন। যাঁরা সতত আমাতে চিত্তার্পণ করে প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করেন সেই সকল ভক্তকে আমি ঈদৃশ তত্ত্বজ্ঞানরূপ যোগ প্রদান করি, তার দ্বারা তাঁরা আমাকে লাভ করে থাকেন। তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করবার জন্য আমি তাঁদের অন্তঃকরণে অবস্থিত হয়ে স্বয়ং উজ্জ্বল জ্ঞানরূপ দীপ দ্বারা তাঁদের অজ্ঞানান্ধকার দূর করে দিই।'

এই রকম জ্ঞানযোগের সাধনার দ্বারাও তত্ত্বজ্ঞান হয়ে যায় এবং জ্ঞান হয়ে গেলে মুক্তি অর্থাৎ পরমাত্মাকে লাভ করা যায়।

প্রশ্ন—কর্মযোগের সঙ্গে ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগের সঙ্গে কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ এবং জ্ঞানযোগের সঙ্গে কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ এক সঙ্গে থাকতে পারে, না পারে না ?

উত্তর— কর্মযোগের সঙ্গে ভক্তিযোগ এবং পরমাত্মার স্বরূপের জ্ঞান থাকতে পারে। কিন্তু অভেদোপাসনারূপ জ্ঞানযোগ তার সঙ্গে একই কালে থাকতে পারে না। কেননা কর্মযোগে ভেদবুদ্ধি ও সংসারের সত্তা থাকে আর জ্ঞানযোগ-এর বিপরীত অভেদবুদ্ধি এবং সংসারের অনস্তিত্ব থাকে। এজন্য কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ পরস্পর বিরোধী ভাবনার সাধনা হওয়ায় দুটি একই কালে এক সঙ্গে হতে পারে না।

ভক্তিযোগের (ভেদোপাসনা) সঙ্গে কর্মযোগ এবং পরমাত্মার স্বরূপের জ্ঞান থাকতে পারে ; কিন্তু অভেদোপাসনারূপ জ্ঞানযোগ থাকতে পারে না। কেননা একই পুরুষের দ্বারা একই কালে পরস্পর বিরোধী ভাব হওয়ায় ভেদোপাসনা ও অভেদোপাসনা এক সঙ্গে হতে পারে না।

জ্ঞানযোগের সঙ্গে শাস্ত্রবিহিত কর্ম থাকতে পারে ; কিন্তু কর্মযোগ এবং ভক্তিযোগ থাকতে পারে না, কেননা জ্ঞানযোগে অদ্বৈতভাব আর কর্মযোগ এবং ভক্তিযোগে দ্বৈতভাব থাকে। অতএব একই পুরুষে একই কালে দু রকমের ভাবের সহাবস্থান সম্ভব নয়। অর্থাৎ অভেদ জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তিযোগ এবং কর্মযোগ একই সঙ্গে থাকতে পারে না। কিন্তু ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ দুটিতেই দ্বৈতভাব এবং সংসারের সত্তা সমান থাকার কারণে ঐ দুটি একসঙ্গে থাকতে পারে।

প্রশ্ন —ভগবৎপ্রাপ্ত আচার্যদের মধ্যে কোন্ কোন্ আচার্যের সিদ্ধান্ত নির্দোষ ?

উত্তর—ভগবৎপ্রাপ্ত আচার্যেরা যা মান্য করে থাকেন তাকেই তাঁদের মতানুসারীগণ সিদ্ধান্ত বলেন। কিন্তু বাস্তবে যা অন্তিমে প্রাপ্ত হয়, সেইটিই হল সিদ্ধান্ত এবং সকলের ক্ষেত্রেই সেটি এক। তাঁদের মতকে যে সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হয় তার কারণ হল এই যে তাকে সিদ্ধান্ত বলে মেনে নিলে সাধনায় তৎপরতা আসে। এইজন্য তাঁদের মতকে সিদ্ধান্তের রূপ দেওয়া উচিতই হয়েছে। আর ভগবৎপ্রাপ্ত আচার্যদের প্রদর্শিত পথ শ্রদ্ধাবানদের কাছে মুক্তিদায়ক হওয়ায় তা নির্দোষ। কিন্তু তর্কের দৃষ্টিতে বিচার করলে কোনো কিছুই নির্দোষ বলে প্রমাণিত হতে পারে না।

প্রশ্ন — আপনি দ্বৈত (ভেদোপাসনা) এবং অদ্বৈত (অভেদোপাসনা) — এই দুটির মধ্যে কোন্‌টিকে উত্তম মনে করেন এবং সাধকদের জন্য কোন্‌টিকে শ্রেষ্ঠ বলেন ?

উত্তর—দুটিকেই উত্তম মনে করি এবং যিনি যেটির অধিকারী তাঁর কাছে সেটিকেই শ্রেষ্ঠ বলে থাকি।

প্রশ্ন—কে কোন্‌টির অধিকারী এটি আপনি কি করে ঠিক করেন ?

উত্তর— ভেদোপাসনাতে যাঁর শ্রদ্ধা এবং রুচি তিনি ভেদোপাসনার এবং অভেদোপাসনাতে যাঁর শ্রদ্ধা ও রুচি তিনি অভেদোপাসনার অধিকারী। কিন্তু যতক্ষণ না শ্রদ্ধা ও রুচির সঠিক নির্ণয় করা যাচ্ছে ততক্ষণ পরমাত্মার নামজপ, তাঁর স্বরূপের ধ্যান, সৎপুরুষদের সঙ্গ, সৎ শাস্ত্রের অধ্যয়ন —এইগুলিকে আমি সকল সাধকদের জন্য উত্তম বলে মনে করি।

প্রশ্ন—আপনি সাধকদের কোন্ নামের জপ এবং কোন্ স্বরূপের ধ্যান করতে বলেন ?

উত্তর — সাধকেরা এযাবৎ ওঁ, শিব, রাম, কৃষ্ণ, নারায়ণ, হরি প্রভৃতির মধ্যে যে নামটি জপ করে এসেছেন এবং যে সাকার-নিরাকার, সগুণ-নির্গুণ রূপের ধ্যান করে এসেছেন অথবা যে নাম ও রূপের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা-রুচি আছে সেইটিকেই করবার কথা বলা হয়ে থাকে। কিংবা প্রশ্ন করবার সময় তাঁর ভাবানুসারে আমার হৃদয়ে যেরকম ভাব উৎপন্ন হয় সেই অনুসারে বলা হয়ে থাকে।